

শরৎ রচনাবলী



শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



শরৎচন্দ্রের হাতে আঁকা ছবি ৫

শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৭

গ্রন্থ-পরিচিতি ১৩

উপন্যাস

বড়দিদি ২৩

বিরাজ বৌ ৫৩

পরিণীতা ১১৭

পণ্ডিতমশাই ১৪৯

পল্লী-সমাজ ২০৩

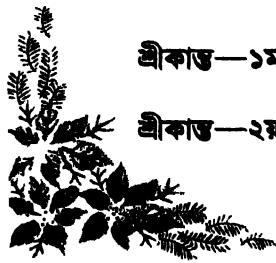
চন্দ্রনাথ ২৬৯

বৈকুণ্ঠের উইল ৩১২

অরক্ষণীয়া ৩৪৫

শ্রীকান্ত—১ম ৩৭৭

শ্রীকান্ত—২য় ৪৫৩





শ্রীকান্ত—৩য়

শ্রীকান্ত—৪র্থ



৫৩৩

৬১৯

গল্প

বিন্দুর ছেলে

৭১৫

রামের সুমতি

৭৪৫

পথ-নির্দেশ

৭৬৬

মেজদিদি

৭৮৭

দর্পচূর্ণ

৮০৪

আঁধারে আলো

৮২৪

কাশীনাথ

৮৩৫

আলো ও ছায়া

৮৫৬

মন্দির

৮৬৭

বোঝা

৮৭৬

অনুপমার প্রেম

৮৮৭

নাটক



ষোড়শী



৯০২



শ্রী শ্রী চণ্ডী (বড় বড় হরকে মূল শ্লোক ও বাংলা অনুবাদ সহ)

শ্রীম কথিত - শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত

বঙ্কিম রচনাবলী ১ম ও ২য় * মধুসূদন রচনাবলী

শরৎ রচনাবলী (তিন খণ্ড) * শার্লক হোমস্ রচনাবলী

সেকস্পীয়ার রচনাবলী * সুকুমার রচনাবলী

উপেন্দ্র কিশোর রচনাবলী * কালিদাস রচনাবলী

ব্রহ্মলোক্যনাথ মুখো রচনাবলী

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় গল্প সমগ্র * বাছাইগল্প * ছোট গল্প

সতির পতি * সত্যবালা * দু'শতকের সেরা ভৌতিক

আকাশবানী - খ্যাত বেলা'দের

গৃহিণীর অভিধাণ * উলবোনা অভিধাণ

চাইনিজ রান্না * উলবোনা * রান্না বান্না

টিকিনের টুকিটাকি * আধুনিক সেলাই কাটিং

আমাদের প্রকাশনার ডেল কার্পেগীর বই

- ১। সুখী জীবন ও কর্মের সন্ধানে - (In Search of Happy Life and Work)
- ২। সফল্য ও ব্যক্তিত্বের সহজ পাঠ - (An Esday Way of Success and Personality)
- ৩। স্ত্রী যখন বান্ধবী - (When Wife is the Friend)
- ৪। জনসংযোগের সহজ কথা - (The Mystery of Mass Communication)
- ৫। উন্নতি ও সখ্যতার রহস্য - (How to win friends and influence the people)
- ৬। নতুন জীবনের ঠিকানা - (How to become Super Salesman)
- ৭। প্রশাসনিক মনস্তত্ত্বের রূপরেখা - (Out line of Administrative Psychology)
- ৮। মনের রহস্য সন্ধানে - (Mind Control methods of Mental Dynamics)
- ৯। মানসিক শান্তির চাবিকাঠি - (Grow Rich with Peace of Mind)
- ১০। নিশ্চিন্ত জীবনের অন্বেষণ - (How to Stop Worrying and Start Living)
- ১১। ভাষণের মন্ত্রমালা - (Public Speaking)
- ১২। সাফল্যের স্বর্ণশিখর প্রাপ্তি - (How to make an Habit of Succeeding)
- ১৩। বিশ্বায়নের পটভূমি - (One world)
- ১৪। স্মৃতির রহস্য উন্মোচনে - (Unveiling the Mystery of Memory)
- ১৫। বাচনের সম্মোহন রহস্য - (Sixty days of Vocabulary)

শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী

হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর নামে ছোট গ্রাম। গ্রামটি ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন থেকে মাইল দুই উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (বাংলা ১২৮৩, ৩১শে ভাদ্র) শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। প্রভাসচন্দ্র, প্রকাশচন্দ্র দুই ছোট ভাই এবং অনিলা দেবী ও সুশীলা দেবী নামে দুই বোনও ছিলেন। অনিলা দেবী ছিলেন ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় আর সুশীলা দেবী ছিলেন সবার ছোট।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল এম্বাল পাস করে কিছুদিন এফ. এ পড়েছিলেন। তিনি অস্থিরচিত্ত, ভবঘুরে মানুষ ছিলেন। কিছুদিন চাকরি করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। গল্প-উপন্যাস লিখতেন বটে কিন্তু লেখা সম্পূর্ণ করতেন না। অভাবের জন্য তিনি বেশীর ভাগ সময় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরে স্বশ্রুতবাড়িতে থাকতেন। তাই শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা কেটেছিল ভাগলপুরে মামার বাড়িতে।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ২৪-পরগণা জেলার হালিশহরে। কদারনাথ ভাগলপুরে কালেক্টারি অফিসের কেরানি ছিলেন বলে ভাগলপুরেই সপরিবারে বাস করতেন ছোট চার ভাই পরিবারসহ।

শরৎচন্দ্র বয়স যখন পাঁচ বছর সেই সময় তাঁর পিতা তাঁকে গ্রামের (দেবানন্দপুরের) প্যারী পণ্ডিতের (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। এখানে দু-তিন বছর পড়েন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তিনি মেধাবী, ও ভীষন দুরন্ত ছিলেন।

প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ার সময় সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য দেবানন্দপুরে একটি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। শরৎচন্দ্রের পিতা শরৎচন্দ্রকে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে এনে সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের স্কুলে ভর্তি করে দেন শরৎচন্দ্র বছর তিনেক পড়েন এখানে।

এই সময় শরৎচন্দ্রের পিতা বিহারের ডিহিরিতে চাকরি পেয়ে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের ভাগলপুরে স্বশ্রুতবাড়িতে রেখে যান। পরে তিনি পরিবার ডিহিরিতে নিয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু পড়বার জন্য ভাগলপুরেই থেকে গেলেন। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে এলে তাঁর মাতামহ দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি করে দেন। ঐ ক্লাসে শরৎচন্দ্রের মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথও পড়তেন। সে বছরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে শরৎচন্দ্র এবং ফণীন্দ্রনাথ উভয়েই পাস করেছিলেন।

ছাত্রবৃত্তি পাস করে শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের জেলা স্কুলে সেকালের সেডেনথ্ ক্লাসে অর্থাৎ বর্তমানের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

ছাত্রবৃত্তিতে তখন ইংরাজী পড়ানো হত না। বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় একটু বেশী করেই পড়ানো হত। শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাস করার ফলে জেলা স্কুলের সেডেনথ্ ক্লাসের বাংলা অঙ্ক ইত্যাদি তাঁর কাছে অতি সোজা বলে মনে হত। তাঁকে কেবল ইংরাজীই যা পড়তে হত। ফলে সে বছরের শেষে পরীক্ষায় ইংরাজী এবং অন্যান্য বিষয়ে শরৎচন্দ্র এত বেশী নম্বর পেয়েছিলেন যে, শিক্ষকমশায়রা তাঁকে ডবল প্রমোশন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে ফিফ্ ক্লাসে উঠেছিলেন। তখনকার দিনে স্কুলের নীচের দিক থেকে ক্লাস গণনা হত। ফার্স্ট ক্লাস হল বর্তমানের ক্লাস টেন বা দশম শ্রেণী।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র জেলা স্কুলের ফোরথ্ ক্লাসে উঠলেন, সেই সময় তাঁর পিতার ডিহিরির চাকরি চলে গেলে পরিবারবর্গকে নিয়ে আবার দেবানন্দপুরে ফিরে আসেন।

দেবানন্দপুরে এসে এই বছরই ১৮৮৯ জুলাই মাসে হগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের ফোরথ ক্লাসে ভর্তি হলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ফার্স্ট ক্লাসে পড়ার সময় তাঁর পিতা অভাবের জন্য আর স্কুলের মাহিনা দিতে পারলেন না, ফলে শরৎচন্দ্র পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় সতের বছর বয়সে সর্বপ্রথম পাঠশালার সহপাঠী কাশীনাথের নাম নিয়ে ‘কাশীনাথ’ নামে একটি গল্প লেখেন। এ ছাড়া ‘ব্রহ্মদৈত্য’ নামে আরও একটি গল্প লিখেছিলেন। ব্রহ্মদৈত্য গল্পটি পাওয়া যায় নাই।

দেবানন্দপুরে মতিলালের অভাব তীব্র হয়ে ওঠায় তিনি তখন বাধ্য হয়ে আবার সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে গেলেন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে আবার স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রবল আগ্রহাঙ্কিত হলেন। কিন্তু হগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের বকেয়া মাহিনা মিটিয়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনার টাকা নেই। ১৮৯২ জানুয়ারী মাসে তাঁর মাতামহের মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের দুই মামার মধ্যে বড়মামা ঠাকুরদাসের চাকরি ছিল না। ছোটমামা বিপ্রদাস সামান্য বেতনে সেই সবে একটা চাকরিতে ঢুকেছেন। তাঁকে একাই তাঁর নিজের, দাদার এবং ভগ্নীপতির সংসার চালাতে হয়।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং শরৎচন্দ্রের মামাদের প্রতিবেশী ছিলেন। পাঁচকড়িবাবুর পিতা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের মাতামহের বন্ধু ছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র পাঁচকড়িবাবুকে মামা বলতেন। পড়ার আগ্রহ দেখে পাঁচকড়িবাবুই শরৎচন্দ্রকে তাঁদের স্কুলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ ফেব্রুয়ারী মাসে এন্ট্রান্স পাস করেন। এন্ট্রান্স পাস করে মণীন্দ্রনাথ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হলেন। অভাবের জন্য শরৎচন্দ্রকে কলেজে ভর্তি করতে পারলেন না।

শরৎচন্দ্রের পড়া হবে না দেখে মণীন্দ্রনাথের মা কুসুমকামিনী দেবীর বড় দয়া হল। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁর দুই ছোট ছেলেকে পড়াবার বিনিময়ে শরৎচন্দ্রকে কলেজে ভর্তি এবং প্রতি মাসে মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। শরৎচন্দ্র রাত্রে মণীন্দ্রনাথের ছোট দু ভাই সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে পড়াতে। অন্য ছোট ছেলেরাও তাঁর কাছে অমনি পড়ত।

টাকার অভাবে কলেজের পাঠ্য বইও কিনতে পারেন নি। তিনি মণীন্দ্রনাথের এবং বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে রাত জেগে পড়তেন এবং সকালেই বই ফেরৎ দিয়ে আসতেন। কলেজে এইভাবে দু বছর পড়েও টেস্ট পরীক্ষার শেষে এফ. এ. পরীক্ষার ফি মাত্র কুড়ি টাকা জোগাড় করতে না পারায়, পরীক্ষাই দিতে পারলেন না। এই সময়টায় শরৎচন্দ্র মামার বাড়িতে ছিলেন না, কারণ ১৮৯৫ নভেম্বর মাসে শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হওয়ায় তার পিতা মতিলাল শ্বশুরালয় ছেড়ে পুত্রকন্যাদের নিয়ে মাইলখানেক দূরে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে মাটির ঘরে পুত্রকন্যাদের নিয়ে থাকতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলা দেবীর ইতিপূর্বে হাওড়া জেলায় গোবিন্দপুর গ্রামে বিয়ে হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র কলেজের পড়া ছেড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবে মিশে অভিনয় ও খেলাধুলা করে এবং নির্ভীক, পরোপকারী মহাপ্রাণ এক আদর্শ যুবক রাজেন মজুমদারের সঙ্গে মিশে তাঁর পরোপকারমূলক কাজের নিত্য সঙ্গী হলেন। (শরৎচন্দ্র তাঁর ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে একেই ইন্দ্রনাথরূপে চিত্রিত করে গেছেন।) শরৎচন্দ্র এই সময় প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টদেব বাড়িতে মিশে সেখানে নিজের একটা জায়গা করেছিলেন এবং সেখানে বসে দিন-রাত গল্প-উপন্যাস লিখতেন। শরৎচন্দ্র এই সময় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ

(মাতামহের তৃতীয় জাতার পুত্র), এঁদের বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার এবং প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর ছোট বোন নিরুপমা দেবী প্রভৃতিকে নিয়ে একটা সাহিত্য সভাও গঠন করেছিলেন। সপ্তাহে একদিন করে সাহিত্য সভার অধিবেশন হত সভায় সভারা যে যাঁর লেখা পড়তেন। নিরুপমা দেবীর সভায় যেতেন না দাদা বিভূতিবাবুর হাত দিয়ে লেখা পাঠিয়ে দিতেন। সাহিত্য সভার 'ছায়া' নামে হাতে-লেখা একটা মুখপত্র ছিল। শরৎচন্দ্র এই সময়েই তাঁর বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা প্রভৃতি উপন্যাস এবং অনুপমার প্রেম, আলো ও ছায়া, বোঝা, হরিচরণ প্রভৃতি গল্পগুলি রচনা করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা দেবানন্দপুরের ঘরবাড়ি সমস্ত বিক্রি করে এর-ওর কাছে ধার দেনা করে কোন রকমে সংসার চালাতেন। শরৎচন্দ্র এই সময় বনেন্দ্রী রাজ এস্টেটে অল্প কিছুদিনের জন্য একটা চাকরি করেছিলেন। হঠাৎ একদিন পিতার উপর রাগ করে সন্ন্যাসী সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এই ঘুরে বেড়াবার সময় যখন তিনি মজঃফরপুরে আসেন, তখন একদিন তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে ভাগলপুরে এলেন। এসে কোন রকমে পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ছোট ভাই দুটিকে আত্মীয়দের কাছে এবং ছোট বোনটিকে বাড়ির মালিক মহিলাটির কাছে রেখে (শরৎচন্দ্রের ছোটমামা পরে একে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনিই এর বিয়েও দিয়েছিলেন) ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় এসে তিনি উপেন মামার দাদা কলকাতা হাইকোর্টের উকিল লালমোহন গঙ্গৈ পাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর কাছে ৩০ টাকা মাহিনায় হিন্দী পেপার বৃকের ইংরাজী তর্জমা করার একটা চাকরি মাস ছয়েক মত করেন। এর পর (জানুয়ারী ১৯০৩) বর্মায় চলে যান। বর্মায় গিয়ে লালমোহনবাবুর ভগ্নিপতি রেশ্মুনের অ্যাডভোকেট অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন।

শরৎচন্দ্র রেশ্মুন যাওয়ার আগে কলকাতার বৌবাজারে সুরেন মামা ও গিরীন মামার সঙ্গে দেখা করতে গেলে (এঁরা তখন দুজনেই কলকাতায় কলেজে পড়তেন) গিরীন মামার অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির নামে একটা গল্প লিখে কুস্তলীন প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। গল্পটিতে নিজের নাম না দিয়ে সুরেনবাবুর নাম দিয়েছিলেন। দেড়শ গল্পের মধ্যে 'মন্দির' প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।

শরৎচন্দ্র রেশ্মুনে গেলে কিছুদিন পরে মেসোমশায় অঘোরবাবু বর্মণ রেলওয়ের অডিট অফিসে তাঁর একটা চাকরি করে দেন। বছর দুই পরে হঠাৎ অঘোরবাবুর মৃত্যুর ফলে তাঁর পরিবারবর্গ রেশ্মুন ছেড়ে দেশে চলে আসেন। শরৎচন্দ্রের রেলের চাকরিটিও চলে যায়। শরৎচন্দ্র তখন তাঁর রেশ্মুনের এক বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেণ্ডতে যান। পেণ্ড রেশ্মুন থেকে ৪৫ মাইল উত্তরে। পেণ্ডতে গিয়ে তিনি গিরীনবাবুর বন্ধু অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। অবিনাশবাবুর বাড়ি ছিল দেবানন্দপুরের অদূরে বৈদ্যবাটীতে। তাই অবিনাশবাবু দেশের লোক হিসাবে খুবই আদর-যত্নে রেখেছিলেন।

অবিনাশবাবুর বাড়িতে থাকাকালে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস অফিসের ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। মণিবাবু ১৯০৬ এপ্রিল মাসে নিজের অফিসে তাঁর একটা চাকরি করে দেন। শরৎচন্দ্র এই চাকরি পেয়ে পেণ্ড থেকে রেশ্মুন চলে আসেন। এই চাকরি পাওয়ার আগে শরৎচন্দ্র মাঝে লাঙ্গলাবিনে কিছুদিন এক ধানের ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র মণিবাবুর দেওয়া এই চাকরিই ১৯১৬ এপ্রিল পর্যন্ত করেছিলেন। ১৯১২-তে শরৎচন্দ্রের অফিস বর্মার একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র রেশ্মুনে থাকার সময় বেশীর ভাগ সময়টাই কাটিয়েছেন

শহরের উপকণ্ঠে রোটাটং-পোজনডং অঞ্চলে। এখানে শহরের কারখানার মিস্ত্রীরাই বসবাস করত। শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন। তিনি তাদের চাকরির দরখাস্ত লিখে দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিতেন, অসুখে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, বিপদে আপদে সাহায্যও করতেন। মিস্ত্রীরা শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করত এবং দাদাঠাকুর বলে ডাকত। শরৎচন্দ্র এদের নিয়ে একটা সঙ্ঘীর্তনের দলও গড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীপন্নীতে থাকার সময় তাঁর বাসার নীচে চক্রবর্তী উপাধিকারী এক মিস্ত্রী থাকত। তাঁর শান্তি নামে একটি কন্যা ছিল। চক্রবর্তী এক বন্ধু মাতাল মিস্ত্রীর সঙ্গে তার কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কন্যা কিন্তু এই বিবাহে রাজী হয় না। তাই চক্রবর্তীর কন্যা একদিন ঐ বিপদে উদ্ধার করার জন্য শরৎচন্দ্রের পায়ে পড়ে অনুরোধ করে। তখন শরৎচন্দ্র বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের একটি পুত্রও হয়। পুত্রের বয়স যখন এক বৎসর, সেই সময় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তি দেবী এবং শিশুপুত্র উভয়েরই মৃত্যু হয়। শান্তি দেবীর মৃত্যুর অনেকদিন পরে ঐ রেঙ্গুনেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বিবাহের আগে এই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল মোক্ষদা বয়স ১৪। বিবাহের পর শরৎচন্দ্র তাঁর নাম বদলে হিরণ্ময়ী নাম দিয়েছিলেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর বাবার নাম কৃষ্ণ দাস অধিকারী। তাঁর বাড়ি মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর নিকটে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। কৃষ্ণবাবু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর আট বছরের কনিষ্ঠা কন্যা মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে এক মিস্ত্রী বন্ধুর সঙ্গে রেঙ্গুনে এসেছিলেন। তাঁর পুত্র ছিল না।

হিরণ্ময়ী দেবী যখন তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার বিশেষ পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের জোরেই হিরণ্ময়ী দেবীর বাবা একদিন সকালে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করে বলেন, আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে আমায় দায়মুক্ত করেন তা বড় উপকার হয়।

শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও কৃষ্ণবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত এড়াতে না পেরে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন। হিরণ্ময়ী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। বিয়ের আগে হিরণ্ময়ী দেবী লেখাপড়া জানতেন না। পরে শরৎচন্দ্র তাঁকে লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী বরাবরই শান্তস্বভাবা, সেবাপরায়ণা ও ধর্মশীলা ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখে শান্তিতেই কাটিয়ে গেছেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চাকরি করার সময় বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা, গান বাজনা এবং সাহিত্য-চর্চাও করতেন। অনেক ছবিও এঁকেছেন। মিস্ত্রীপন্নীতে বোটাটং-এর ল্যান্ডাডাউন স্ট্রীটে যখন তিনি একটা কাঠের বাড়ির দোতলায় থাকতেন, সেই সময় ১৯১২-৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর বাসায় আগুন লাগে। সেই আগুনে কয়েকটি বইয়ের পাখুলিপি, কিছু অয়েল পেণ্টিং এবং এক সাহেবের কাছ থেকে কেনা অনেক বই সমেত তাঁর বাসাটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

রেঙ্গুনে থাকাকালে ১৯১২ অক্টোবর মাসে অফিসে এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। এই সময় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফৎ যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয় হলে ফণীবাবু তাঁর কাগজে লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে লেখা পাঠিয়ে দেবেন বলে কথা দেন এবং কথামত শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে তাঁর 'রামের স্মৃতি' গল্পটি পাঠিয়ে দেন। ফণীবাবু এই গল্প তাঁর কাগজে ১০১৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। রামের স্মৃতি যমুনায় প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র এই গল্প লিখেই সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে পরিচিত হন মহাশক্তিশালী লেখক হিসাবে।

ইতিপূর্বে ১৩১৪ সালে ভারতী পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই লেখা পড়ে শরৎচন্দ্রকে প্রতিভাবান লেখক বলে বুঝতে পেরেছিলেন। বিভূতিভূষণের বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের লেখার খাতা থেকে 'বড়দিদি' নকল করে এনেছিলেন এবং পরে শরৎচন্দ্রকে না জানিয়ে এটি ভারতীতে প্রকাশ করেছিলেন।

'রামের সুমতি' প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষ এবং সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার কর্তৃপক্ষও তাঁদের কাগজের জন্য শরৎচন্দ্রকে লিখতে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র যমুনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও লিখতে আরম্ভ করেন। শেষে যমুনা ছেড়ে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই লিখতে থাকেন। ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ তাঁর বইও প্রকাশ করতে শুরু করেন। যমুনা-সম্পাদক ফণী পালই অবশ্য প্রথম তাঁর 'বড়দিদি' উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সময় ফণীবাবুর বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকারও তাঁদের দোকান এম. সি. সরকার এও সঙ্গ থেকে শরৎচন্দ্রের পরিশীতা, পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি কয়েকটা বই প্রকাশ করেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র পা-ফোলা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি স্থির করেন অফিসে এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে কবিরাজী চিকিৎসা করাবেন। অফিসে ছুটি চাইতে যাওয়ায় উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া হয়। ফলে শরৎচন্দ্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে চলে আসেন। তাঁর রেঙ্গুনে জীবনের শেষ দিকে আর মিস্ট্রীপন্নীতে থাকতেন না। এই সময় প্রথমে কিছুদিন ছিলেন ৫৭/৯ লুইস স্ট্রীটে। তারপর ছিলেন ৫৪/৩৬ স্ট্রীটে।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে সত্বীক এসে প্রথমে হাওড়া শহরে ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে প্রায় ৮ মাস ছিলেন। তারপর এ বাড়ি ছেড়ে তিনি পাশেই ৪নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে প্রায় ৯ বছর ছিলেন। তারপর এখান থেকে শিবপুর ট্রাম ডিপোর কাছে ৪৯/৪ কালীকুমার মুখার্জী লেনে গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ভাড়া নিয়ে বছরখানেক ছিলেন। এইখানে থাকার সময়েই তিনি তাঁর দিদিদের গ্রাম গোবিন্দপুরের পাশেই সামতাবেড়ের জায়গা কিনে একটা সুন্দর মাটির বাড়ি তৈরী করান। বাড়িটি একেবারে রূপনারায়ণের গায়েই। শরৎচন্দ্র ১৯২৬ ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতে চলে যান।

শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাস রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন নাম হয়েছিল স্বামী বেদানন্দ। শরৎচন্দ্র ছোটভাই প্রকাশকে এনে কাছে রাখেন এবং তাঁর বিয়ে দেন। প্রকাশবাবুর এক কন্যা ও এক পুত্র। হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময়েই শরৎচন্দ্র তাঁর বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাই ঐ সময়টাকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি তখন দেশবন্ধুর আহ্বানে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মাঝে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ তিনি একবার হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে চাইলেও দেশবন্ধু তা করতে দেন নি।

শরৎচন্দ্র অহিংস কংগ্রেসে একজন সামান্য নেতা হলেও বরাবরই কিন্তু ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামী বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা সংক্ষেপে বি ভি দলের সর্বাধিনায়ক প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিপ্লবী শচীন সান্যাল প্রমুখ ছাড়াও বারীন ঘোষ, উপেন

বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর হৃদয়তা ছিল। বিপিনবাবু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা হতেন। শরৎচন্দ্র বহু বিপ্লবীকে রিভলবার, বন্দুকের গুলী এবং অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মহাবিপ্লবী সূর্য সেনকেও তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বাজ্রে শিবপুরে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে বিচিত্রার আসরে। শরৎচন্দ্র বাল্যবন্ধু ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শরৎচন্দ্র বিচিত্রার আসরে ১৩২৪ ১৪ই চৈত্র তারিখে তাঁর বিলাসী গল্পটি পড়েছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। শরৎচন্দ্র নানা প্রয়োজনে বহুবার শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোয় কবির কাছে গেছেন। শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় বাড়ি করলে সেখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় কবি একবার শরৎচন্দ্রের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। কবির সত্তর বছর বয়সের সময় দেশবাসী যখন কলকাতার টাউন হলে তাঁকে অভিনন্দন জানায় সেই বিখ্যাত মানপত্রটি রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কবিও নিজে একবার শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বরাবরই দরিদ্র লোকদের অসুখে চিকিৎসা করা তাঁর একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোগী দেখে তিনি শুধু ওষুধই দিতেন না, অনেকের পথ্যও কিনে দিতেন। শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ি অঞ্চলের বহু দুঃস্থ পরিবারকে বিশেষ করে অনাথ বিধবাদের গাসিক অর্থসাহায্য করতেন।

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ি থাকার সময় তিন-চারটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। শেষ দিকে কলকাতার বালীগঞ্জে একটা বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাড়িটি দোতলা এবং দেখতে ভারী সুন্দর। ঠিকানা হল-২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড।

কলকাতায় বাড়ি হলে ও কখন কলকাতায়, আবার কখন সামতাবেড়ি এইভাবে কাটাতেন। কলকাতায় থাকাকালে কলকাতার তখনকার সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দুটি নাম-করা প্রতিষ্ঠান রবিবাসর ও রসচক্রের সদস্যরা তাঁকে অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। রসচক্রের সদস্যরা শরৎচন্দ্রকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করেছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. উপাধি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগন্নারীণী পদক উপহার দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একবার বি. এ. পরীক্ষায় বাংলার পেপারসেটার বা প্রশ্নকর্তাও নিযুক্ত করেছিলেন। এসব ছাড়া, দেশবাসীও তাঁকে তখন ‘অপরাজেয় কথাশিল্পী’, ‘সাহিত্য সম্রাট’ এই আখ্যায় বিভূষিত করেছিলেন। বৈদ্যবাটী যুব সংঘ, শিবপুর সাহিত্য সংসদ, যশোহর সাহিত্য সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ও সাধারণভাবে দেশবাসীর পক্ষ থেকে একাধিকবার তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

শরৎচন্দ্র কেবল গায়ক, বাদক, অভিনেতা ও চিকিৎসকই ছিলেন না, মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন একজন দরদী মানুষ। মানুষের, এমন কি জীবজন্তুর দুঃখ-দুর্দশা দেখলে তাঁর চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ত।

পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতিই তার দরদ ছিল সবচেয়ে বেশী। আবার সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজ-পরিত্যক্তা, লালিত্য ও পতিতা নারীদের প্রতি তাঁর করুণা ছিল অপরিসীম। পতিতা নারীদের ভুল পথে যাওয়ার জন্য তিনি হৃদয়ে একটা ব্যথা বেদনা অনুভব করতেন।

জীবজন্তুর প্রতি স্নেহবশতঃ শরৎচন্দ্র বহু বছর কলকাতা পশুক্ষেত্র নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। এক সময় অবশ্য তিনি একজন ছোটখাট শিকারীও ছিলেন। মাহ ধরতে এবং বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে বিশেষ পটু ছিলেন। বন্ধ সীতারঙ্গ ছিলেন। সাপুড়েদের মত অতি অনায়াসেই বিষধর সাপও ধরতে পারতেন।

তিনি ছিলেন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ, বন্ধুবৎসল ও পট্টভ্রমিক। বিলাসী না হলেও কিছুটা সৌখীন ছিলেন বিশেষ করে বেশভূষায় ও লেখার ব্যাপারে। তিনি ঘরোয়া বৈঠকে খুব গল্প করতে পারতেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি কিছুদিন জুরে ভোগেন। জুর ছাড়লে ডাক্তারের উপদেশ মত দেওঘর বেড়াতে গিয়ে তিন-চার মাস থাকেন। দেওঘর থেকে ফিরে এসে কিছুদিন সামান্য সুস্থ থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসে আবার অসুখে পড়লেন। পাকাশয়ের পীড়া দেখা দিয়ে ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। যা খান আদৌ হজম হয় না পেটেও যন্ত্রণা। ডাক্তাররা এক্স-রে করে দেখলেন, যকৃতেও পাকস্থলীতে ক্যানসার হয়েছে। সেইসময় শরৎচন্দ্র একটি উইল করেন। উইলে তিনি তাঁর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে জীবনসম্বন্ধ দান করেন। হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের পুত্র বা পুত্রবা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবেন, (হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন ১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৭ পর্যন্ত)।

কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ-ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রকে দেখে হিরণ্ময়ীকে বলেন যে, অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ডাঃ ম্যাকে সাহেবের সুপারিশে শরৎচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ কলকাতার ৫নং সুবার্বন হাসপাতাল রোডে একটি ইউরোপীয় নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর নেশার জিনিস সিগারেট খেতে না দেওয়ায়, সকালে ও বিকালে দেখা করবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় কারো সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া তাছাড়া ইউরোপীয় নার্সরা এদেশীয় লোক বলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নাকি ভাল ব্যবহার করতেন না। এই সব কারণে শরৎচন্দ্র দুদিন পরে সেখান থেকে চলে এসে ডাঃ সুশীল চ্যাটার্জীর ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরাসে 'পার্ক নার্সিং হোমে' ভর্তি হলেন।

সেই সময়কার বিখ্যাত সাজন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন করে শরৎচন্দ্রকে বাঁচাতে পারলেন না। অপারেশন হয়েছিল ১২/১/৩৮ তারিখে। এর পর শরৎচন্দ্র চারদিন বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দিনটা ছিল রবিবার, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৬ই জানুয়ারী (বাংলা ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ)। এই দিনই বেলা দশটা দশ মিনিটের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬১ বৎসর ৪ মাস।

গ্রন্থ-পরিচিতি

বড়দিদি— বড়দিদিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম বাল্য রচনা। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে ১৩১৪ সালে বড়দিদি উপন্যাসটি ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের মাতুলও প্রিয় বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন শরৎচন্দ্র প্রথমে ঐ উপন্যাসটি প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তা প্রকাশিত হয় নি। ভারতীতে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বই প্রকাশ করেন যমুনা সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পাল। শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েই বই নকল করেছিলেন

কনীবাবু।

বিরাজ বৌ— ১৩২৩ সালে পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় বিরাজ বৌ প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে ‘বিরাজ বৌ’ বই আকারে প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

পরিণীতা— পরিণীতা একটি বড় গল্প ১৩২০ সালে ফাল্গুন সংখ্যায় যমুনায় প্রকাশিত হয়, পরের বছর শ্রাবণমাসে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিতমশাই— পণ্ডিতমশাই ১৩২১ সালের, বৈশাখ, শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই বছরই বই আকারে প্রকাশিত হয়।

পল্লী-সমাজ— বই আকারে প্রকাশের আগে ১৩২২ সালে আশ্বিন, অগ্রহায়ণ পৌষ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম ৯টি পরিচ্ছেদে শেষ করবেন ভেবেই বইটি প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে আরো ১০টি পরিচ্ছেদ যুক্ত করে মোট ১৯টি পরিচ্ছেদে শেষ করেন। এই বইটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী বই আকারে প্রকাশিত হয়।

চন্দ্রনাথ— বাল্যরচনা, যমুনা পত্রিকায় ১৩২০ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে ছিল পরে ঐ বছর ফাল্গুন মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয়। (১৯১৬, ১২ মার্চ)

বৈকুণ্ঠের উইল— ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ঐ বছর ভাদ্র মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয় (১৯১৬ ২৮শে আগস্ট)

অরুণগীয়া— ভারতবর্ষে ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ঐ বছর কার্তিক মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৬, ২০শে নভেম্বর। এই গ্রন্থের উপসংহার প্রথমে যা করেছিলেন পরে তার পরিবর্তন করেন।

শ্রীকান্ত— উপন্যাসটি ১৩২২ মাঘ মাস থেকে ‘ভারতবর্ষে’ প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। তখন লেখাটি ‘শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী’ নামে ছাপা হয় এবং লেখকের নাম থাকে ‘শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা’। মাঘ এবং ফাল্গুন দুমাস লেখকের নাম ছিল শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা। তার পরের দুমাসে ছিল শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার পর থেকে শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নামই থাকে।

‘শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী’ ১৩২২ মাঘে শুরু হয়ে একটানা ধারাবাহিকভাবে ১৩২৩ মাঘ পর্যন্ত চললে, এই তের মাসে যতটা ছাপা হয়েছিল, ততটা নিয়ে ‘শ্রীকান্ত ১ম পর্ব’ বই আকারে প্রকাশিত হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৭, মাঘ ১৩২৩। এই ‘শ্রীকান্ত ১ম পর্ব’ প্রকাশের সময় ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে ‘শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী’ যা বেরিয়েছিল, তার গোড়ার দিকের কিছুটা বইয়ে বাদ দেওয়া হয়।

এরপর ‘শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী’ আবার ‘ভারতবর্ষে’ শুরু হয় ১৩২৪ আষাঢ় মাস থেকে। চলে ১৩২৫ আশ্বিন পর্যন্ত। মাঝে ১৩২৪ আশ্বিন ও কার্তিক এবং ১৩২৫ শ্রাবণ - তিন মাস বন্ধ থাকে। এই আশ্বিন মাস পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাই নিয়ে ‘শ্রীকান্ত ২য় পর্ব’ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের তারিখ ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, ভাদ্র ১৩২৫।

‘শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী’ তৃতীয় পর্যায় আবার ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় শুরু হয় ১৩২৭ পৌষ থেকে এবং চলে ১৩২৮ পৌষ পর্যন্ত। এবারেও ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে ১৩২৭ চৈত্র এবং ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে। ১৩২৮ পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে তৃতীয় পর্যায় ‘শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী’র ন বম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়।

অনেক মাস কেটে যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের এই অসমাপ্ত ‘শ্রীকান্ত’র ভ্রমণ কাহিনীকে আর সমাপ্ত করলেন না। না লেখার হেতু, তিনি তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং চরকা ও খন্দর প্রচারে খুব ব্যস্ত।

তৃতীয় পর্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’র ভ্রমণ কাহিনী’ ভারতবর্ষে অসমাপ্ত হয়ে পাঁচ বছরেরও বেশী পড়ে রইল। শেষে বাকি আর ছটা পরিচ্ছেদ লিখে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে না প্রকাশ করে মোট পনের পরিচ্ছেদে একেবারে বই আকারে ‘শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব’ প্রকাশ করলেন। এই ৩য় পর্ব প্রকাশের তারিখ - ১৮ই এপ্রিল ১৯২৭, চৈত্র ১৩৩৩। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ প্রকাশ করেন।

‘শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব’ বই প্রকাশিত হওয়ার পর আরও পাঁচটা বছর কেটে গেল। ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ‘বিচিত্রা’ মাসিক পত্রিকায় ‘শ্রীকান্ত’র ভ্রমণ কাহিনী’র বদলে ‘শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব’ নামে ছাপা শুরু হয়েছে। এই ‘শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব’ বিচিত্রায় চলে ১৩৩৯ মাঘ পর্যন্ত। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় বই শেষ করার স্থান, তারিখ ও সময় হিসাবে লেখা ছিল - সামতাবেড়, ২৫শে পৌষ ১৩৩৯। রাত্রি ১১টা।

বিচিত্রায় ঐ বার সংখ্যায় সমাপ্ত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব নিয়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৯৩৩এর ১৩ই মার্চ, চৈত্র ১৩৩৯ তারিখে।

শরৎচন্দ্র ১৩৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সামতাবেড় থেকে দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন - ‘পঞ্চম পর্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ করে দেবো। অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ ভালো হয় নি, তবে থাকলো এই খান্নেই রথ।’

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব খুব ভাল হয়েছে, দিলীপবাবু একথা বলা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত ৫ম পর্ব আর লেখেন নি। শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব খুব ভাল লেগেছে বলে যে দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, একথা শরৎচন্দ্রেরই একটা চিঠি থেকে জানা যায়। তিনি সামতাবেড় থেকে ১৩৪০ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে দিলীপবাবুকে লিখে ছিলেন - ‘শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভাল লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে, - কারণ, এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন করে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভাল লাগার জন্যেই।’

শুধু শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব কেন, শ্রীকান্ত’র প্রতিটি পর্বই যে শরৎচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগার জন্য মন দিয়ে লিখেছিলেন, তাতে সন্দেহই নেই। তবুও এই শ্রীকান্ত যখন ভারতবর্ষে প্রথম লিখতে শুরু করেন, তখন এই বইটি সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই মনের মধ্যে একটা সংকোচ ছিল, এই বই হয়ত ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপার অনুপযুক্ত। তাই তিনি রেঙ্গুন থেকে ভারতবর্ষ পত্রিকার স্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন শরৎচন্দ্রের নামটা ব্যবহার করতে না।

মেজদিদি— এই গল্পগ্রন্থটি বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ভারতবর্ষে ১৩২১ সালের কার্তিক মাস ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে মেজদিদি, দর্পচূর্ণ ও আঁধারে আলো তিনটি গল্প সমষ্টি।

কাশীনাথ— গ্রন্থটিতে মোট সাতটি গল্প ছিল। এই বই ১৯১৭ ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। ‘কাশীনাথ’ ‘সাহিত্য’ ফাল্গুন, চৈত্র ১৩১৯, ‘আলো ও ছায়া’ ‘যমুনা’ আষাঢ় ও ভাদ্র ১৩২০, ‘মন্দির’ ‘কুন্ডলীন’ পুরস্কার ১৩০৯, ‘বোঝা’ ‘যমুনা’ কার্তিক ও পৌষ ১৯১৯, ‘অনুপমার প্রেম’ ‘সাহিত্য’ চৈত্র ১৩২০, ‘বাল্যস্মৃতি’ ‘সাহিত্য’ মাঘ ১৩১৯, ‘হরিচরণ’ ‘সাহিত্য’ আষাঢ় ১৩২১।

বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প—‘যমুনা’ পত্রিকায় ভারতবর্ষে বিরাজ বৌ প্রকাশিত হওয়ার আগে, রামের স্মৃতি, পথনির্দেশ ও বিন্দুর ছেলে যথাক্রমে ১৩১৯ ফাল্গুন, চৈত্র,

১৩২০ বৈশাখ ও ১৩২০ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এই 'কিশোর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' বই-এর শেষ গল্প পথ-নির্দেশ পড়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তখন শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন, 'সফলতা যে কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়! আপনার 'পথ-নির্দেশ' পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে, অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না; কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম যে, যে-পথটা বড় তাহা নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই।' ১৯১৪ তরা জুলাই বই আকারে প্রকাশিত হয়।

মোড়শী—এটি দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ, ১৯২৭ ১৩ই আগষ্ট প্রকাশিত হয়, ১৩৩৪, ২১শে শ্রাবণ "নাট্য মন্দিরে" নাটকটি অভিনীত হয়।

নারীর মূল্য—এই প্রবন্ধটি শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে লিখেছিলেন। ১৩২০ যমুনার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বই আকারে হয় ১৯২৪ ১৮ই মার্চ।

দেবদাস—এটি বাল্য-রচনা। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে তাঁর নিষেধসত্ত্বেও ভারতবর্ষের প্রমথনাথ ভট্টাচার্য দেবদাসের পাণ্ডুলিপিটি শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ছেপেছিলেন ১৩২৩ চৈত্র এবং ১৩২৪ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় পরে ১৩২৪ আষাঢ় মাসেই (৩০শে জুন ১৯১৭) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে।

নিষ্কৃতি—১৩২১ বৈশাখ সংখ্যা যমুনা প্রতিকায় এই বই এর গোড়ার অংশের কিছুটা প্রথম প্রকাশিত হয়। যমুনায় প্রকাশিত হয় 'ঘর-ভাঙ্গ' নামে। পরে যমুনায় প্রকাশিত ঐ অংশটি সহ সমস্তটি 'নিষ্কৃতি' নামে ১৩২৩ ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩২৪ আষাঢ় মাসে (১লা জুলাই ১৯১৭) বই আকারে প্রকাশিত হয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে।

চরিত্রহীন—শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ ১১ই নভেম্বর এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স থেকে।

চরিত্রহীন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩২০ কার্তিক-চৈত্র এবং ১৩২১ কয়েক মাস 'যমুনা' প্রতিকায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

চরিত্রহীন ১৩২০ কার্তিক সংখ্যা যমুনায় প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু হলেও, এ বইয়ের অস্তুতঃ অনেকটাই বহু আগের লেখা। নানা পরোক্ষ ইঙ্গিত থেকে জানা যায় যে ১৯০১/২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই উপন্যাসের অংশবিশেষ লেখা হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। তারপর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে ১৯১১/১২ খ্রীষ্টাব্দে আবার এটি লিখতে শুরু করেন। ৫০০ পাতা লিখে বই যখন শেষ করে আনেন, সেই সময় তিনি রেঙ্গুনে যে কাঠের বাড়ির দোতলায় থাকতেন, সেই বাড়ির নীচের তলায় ৫. ২. ১২ তারিখে আগুন লাগে। ফলে বহু জিনিসপত্রের সঙ্গে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এই সময় শরৎচন্দ্র বঙ্কু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, - 'আপুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের manuscript...' তিনি পুনরায় এটি লিখতে শুরু করেন এবং ১৯১২ অক্টোবর মাস যখন অফিসে ছুটি নিয়ে দেশে আসেন, তখন ঐ অসমাপ্ত চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে এনেছিলেন এবং দেশে এসে হাওড়া শিবপুরে থাকাকালেও চরিত্রহীন লিখতেন।

গৃহদাহ—এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১০ ২০শে মার্চ (ফাল্গুন, ১৩২৬) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে।

'গৃহদাহ' ১৩২৩ মাঘ-চৈত্র, ১৩২৪ বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩২৫ পৌষ-

চৈত্র এবং ১৩২৬ আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এখানে দেখা যাচ্ছে, গৃহদাহ ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় ১৩২৪ কার্তিক এবং ১৩২৬ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়নি। আর ১৩২৪-এর চৈত্র থেকে ১৩২৫-এর অগ্রহায়ণ পর্যন্তও একটানা দীর্ঘ ন'মাস ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে।

ভারতবর্ষে একটানা দীর্ঘ ন'মাস গৃহদাহ না লেখার কারণ, ঐ ১৩২৪-২৫ সালেই শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষে তাঁর 'দত্তা' এবং 'শ্রীকান্ত ২য় পর্ব' উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেছিলেন। দত্তা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৪ পৌষ থেকে ১৩২৫ ভাদ্র, এই ন' সংখ্যায়। আর শ্রীকান্ত ২য় পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল, ১৩২৪ আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র এবং ১৩২৫ বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়।

দত্তা— বইটি ১৩২৪ পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ঐ বছরই ভাদ্র মাসে (২রা সেপ্টেম্বর ১৯১৮) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়। অনেকদিন থেকেই 'দত্তা' উপন্যাসের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে দেখা না গেলেও প্রথমদিকের সংস্করণগুলিতে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটি তাঁর দিদি অনিলা দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষে যখন দত্তা প্রকাশিত হয়, তখন ভারতবর্ষে গৃহদাহ উপন্যাসটিও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, এই দুটি উপন্যাসেই তিনি ব্রাহ্মচরিত্র চিত্রিত করেন।

আগের মেয়ে— আগে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। একেবারে বই হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৭ আশ্বিন (অক্টোবর ১৯২০) মাসে শিশির পাবলিশিং হাউস এটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। গৃহদাহ প্রকাশের কয়েক মাস পরেই শরৎচন্দ্রের এই বইটি প্রকাশিত হয়।

দেনা-পাওনা— ১৩২৭ আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র, ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র, ১৩২৯ বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র এবং ১৩৩০ বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৩০ ভাদ্র মাসে (১৪ই আগস্ট ১৯২৩) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

হরিলক্ষ্মী— এই গল্প-গ্রন্থটি ১৯২৬ ১৩ই মার্চ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্ণ নামে তিনটি গল্প ছিল। এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে, প্রথমে যথাক্রমে ১৩৩২ শারদীয়া বসুমতীতে এবং ১৩২৯ আশ্বিন ও মাঘ মাসের বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল। মহেশ গল্পটি শুধু বঙ্গবাণীতেই নয়, ১৩২৯-এর আশ্বিন সংখ্যা পম্প্রীক পত্রিকায়ও তখন প্রকাশিত হয়েছিল।

নববিধান— 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৩০ মাঘ-ফাল্গুন এবং ১৩৩১ বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের এই বইটি তাঁর অন্যান্য বই এর তুলনায় বিক্রি হয়েছে কম। এর প্রকাশকাল (কার্তিক ১৩৩১) থেকে ১৩৬০ আশ্বিন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ২৯ বছরে মাত্র ৮টি সংস্করণ শেষ হয়েছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে তাঁর অন্য বই এইরকম অনেক বেশী সংস্করণ হয়েছে। এই বহুল প্রচলিত না হওয়ার কারণই হয়ত, 'নববিধান'র পরবর্তী সংস্করণে ছাপাখানার ভুলও ঢেকেছে কমই। কারণ, একখানি প্রথম সংস্করণ 'নববিধান' পেয়ে তার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ মিলিয়ে দেখা গেল, দু একটা শব্দ বাদ যাওয়া বা দু একটা শব্দের পরিবর্তন ছাড়া ভুলই নেইই। একটা ভুল যেমন— স্নানান্তে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আচড়াইতেছিল, এর বদলে ছাপা হচ্ছিল— স্নানান্তে অভয়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আচড়াইতেছিল।

স্বামী— একটি গল্প-সমষ্টির গ্রন্থ। এতে দুটি গল্প ছিল স্বামী ও একাদশী বৈরাগী। স্বামী গল্পটি ১৩২৪ কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে এই দুটি গল্প নিয়ে ঐ বছরই ফাল্গুন মাসে (১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৮) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স বই আকারে প্রকাশ করেন।

নারায়ণ-সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশের (তখনও দেশবন্ধু হননি) অনুরোধে শরৎচন্দ্র নারায়ণে স্বামী গল্পটি দিয়েছিলেন। এতে চিত্তরঞ্জন এত খুশী হয়েছিলেন যে, গল্পটির সম্মান-মূল্য হিসাবে শরৎচন্দ্রকে একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, শরৎচন্দ্র চেকে যত টাকা ইচ্ছা বসিয়ে নেবেন। শরৎচন্দ্র চেক নিয়ে তাকে একশ টাকা লিখেছিলেন মাত্র।

ছবি— ১৯২০ ১৬ই জানুয়ারী তারিখে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে ছবি, বিলাসী ও মামলার ফল নামে তিনটি গল্প ছিল। এই গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে প্রথমে যথাক্রমে ১৩২৬ পূজা-বার্ষিকী পাবণীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংলণ্ডের পটভূমিকায় লেখা ‘কোরেল’ নামে শরৎচন্দ্রের একটি বাল্য-রচনা ছিল। শরৎচন্দ্র ঐ কোরেল গল্পটিকে একটু অদল-বদল করে ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় ছবি গল্পটি রচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ১৩২৪ ১৪ই চৈত্র তারিখে কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা আসরে বিলাসী গল্পটি লিখে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন। ভারতী সম্পাদক মহিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা) অন্য দিনের মত সেদিনও বিচিত্রার আসরে উপস্থিত ছিলেন। সভা-শেষে তিনি শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে বিলাসী গল্পটি নিয়ে পরের মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। বিচিত্রার আসরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েরও পরিচয় হয়েছিল। এই সময়েই ১৩২৫ সালে নগেনবাবু ‘পাবণী’ নামে যে পূজা-বার্ষিকী সংকলন করেছিলেন, তাতে শরৎচন্দ্রের ‘মামলার ফল’ গল্পটি নিয়ে দিয়েছিলেন।

মনে হয় শরৎচন্দ্রের মামলার ফল গল্পটি তাঁর দিদির বাড়ি হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর অঞ্চলের কাহিনী নিয়ে লেখা। এই গল্পে যে পাঁচলার কথা আছে, সেই পাঁচলা গোবিন্দপুরের নিকটের গ্রাম।

রমা— এই নাটকটি শরৎচন্দ্রের ‘পল্লী-সমাজ’ উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাটকটি পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৮ ৪ঠা আগষ্ট (শ্রাবণ ১৩৩৫)। প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। রমা প্রথম অভিনীত হয় ১৩৩৫ ১৯শে শ্রাবণ কলকাতায় স্টার থিয়েটারে। অভিনয় করে ‘আর্ট থিয়েটার লিমিটেড’। রমা ১৩৩৫ শ্রাবণ মাসে প্রথম অভিনীত হলেও, এই নাটকটি রচিত হয়েছিল অস্তিত্ব: বছর-আড়াই আগে।

পথের দাবী— ১৯২৬ ৩১শে আগষ্ট (ভাদ্র ১৩৩৩) তারিখে এই বই প্রথম প্রকাশিত হয়। বই এর প্রকাশক ছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর কটন প্রেসের সত্যকিন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে তৎকালীন ইংরাজ সরকার বইটিকে রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করে বাজেয়াপ্ত করে। সরকার লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে কিছু না বলে শুধু বইটিরই প্রচার বন্ধ করে দেন।

পথের দাবী রাজরোষমুক্ত হয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছরেই এই বই এর ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। পথের দাবী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩২৯ ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩০ বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, ১৩৩২ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক-ফাল্গুন ও ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যা ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র এক সময় এক খণ্ড পথের দাবী নিয়ে তাতে কিছু সংশোধন করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক দিন পরে তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী সেই বইটি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেন। বই অনুযায়ীই এর পাঠ রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে।

শেষ প্রশ্ন— পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে দীর্ঘদিন ধরে মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে প্রকাশের তারিখগুলো - ১৩৩৪ শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, ১৩৩৬ বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৭ চৈত্র এবং ১৩৩৮ সালের বৈশাখ।

শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্ন লেখেন তাঁর শেষ বয়সে। এই বইটি লেখার সময় তিনি প্রায়ই নানা রোগে ভুগতেন। আর লেখাতেও তাঁর তখন প্রবল আলস্য, এই-সব কারণেই শেষ প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে মাসে মাসে লেখার কথা হলেও, এত মাস বাদ দিয়ে দিয়ে লিখেছেন। শেষ প্রশ্ন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখের মাঝামাঝি। (২রা মে ১৯৩১)।

শেষ প্রশ্ন যখন ভারতবর্ষে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন কিছু প্রগতি পন্থী চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন এ বই লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তেমনি হিন্দু সমাজের কেঁদার দল এই লেখা পাড় শরৎচন্দ্রের প্রতি নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। শেষ প্রশ্ন বই বেরুলে এঁরা আরও ক্ষিঃ হন বইয়ের প্রকাশকের উপরও ক্রুদ্ধ হন।

বিপ্রদাস— পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে এই ভাবে ১৩৩৯ ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪০ বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন এবং ১৩৪১ বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্তিক-মাঘ সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিপ্রদাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ ১লা ফেব্রুয়ারি (মাঘ ১৩৪১)। প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

ভারতে: মুক্তি আন্দোলনে একটি বিখ্যাত বিপ্লবী সংস্থা ছিল বেঙ্গল ভলানট্যার্স বা সংক্ষেপে বি. ভি.। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহবাজন। বি. ভি. দলের বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের 'বকসার পর দেউলি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এক জায়গায় বলেছেন - 'শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পথের দাবী'র মাল-মশলা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া।'

এই বি. ভি. দলের একটি মুখপত্র ছিল, নাম - 'বেণু'। শরৎচন্দ্র বি. ভি. -র কর্মীদের প্রতি স্নেহবশতঃ লেখার জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক না নিয়েই এই বেণুতে তাঁর বিপ্রদাস উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেছিলেন। বিপ্রদাস উপন্যাসের ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৩য় ও ৫ম ভর্ষের (১৩৩৬-১৩৩৮) বেণুতে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময়ে বি. ভি.-র প্রথম সারির কর্মী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের রাইটার্স বিল্ডিংসে অলিঙ্গ্যুচ্ছের জন্য এই দলের অনেকেই গ্রেপ্তার হন। ফলে বেণু বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রায় বছর-দুই পরে শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকায় বিপ্রদাস উপন্যাসটি আবার গোড়া থেকে ছাপতে শুরু করেন এবং ধারাবাহিকভাবে সমস্ত উপন্যাসটি ছাপেন।

শুভদা— বাল্য-রচনা। তবুও এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে। কেন এত পরে প্রকাশিত হ'ল, তার একটা ইতিহাস আছে।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পন্নীতে থাকার সময় যখন প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টদেব বাড়িতে বসে লিখতেন ও পড়তেন, সেই সময় বিভূতিবাবুর বোন নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিলেন। ফলে 'শুভদা'র প্রভাব তাঁর প্রথম

বয়সের লেখা 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসে বিশেষভাবে পড়ে। এ সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়ন্তী' পত্রিকায় নিরুপমা দেবী নিজেই লিখেছেন—

'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রকাশিত হলে, শরৎচন্দ্র বইটি পড়ে দেখেন যে, তাতে তাঁর 'শুভদা' উপন্যাসের কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

'শুভদা' প্রকাশিত হলে, পাছে নিরুপমা দেবী হয় হয়ে পড়েন, এই ভেবে শরৎচন্দ্র তাঁর 'শুভদা' উপন্যাস ছাপলেনই না। তবে পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট না করে রেখে দিলেন, এই আশায় যে, অবসর পেলে পরে গল্পটিকে বদলে আবার নতুন করে লিখবেন। 'শুভদা' পাণ্ডুলিপি পড়ে রইল, অবসর আর হয়ে উঠল না। তখন শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে একদিন ওটিকে আর না রেখে পুড়িয়ে ফেলাই মনস্থ করলেন।

শরৎচন্দ্র এই সময় তাঁর হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের বাড়িতে থাকতেন। একদিন তিনি তাঁর ভায়ে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে (দিদি অনিলা দেবীর মেজ দেওরের ছেলে) ইনি শরৎচন্দ্রের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখতেন) বহু পুরাতন কাগজপত্রের সঙ্গে 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিটি গোড়াতে দিলেন। রামকৃষ্ণবাবু কিন্তু কাগজ গোড়াবার সময় 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে শরৎচন্দ্রেরই একটি আলমারির বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন কিছু দিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে আলমারীতে বই খঁটতে গিয়ে শুভদা পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পেলেন। শরৎচন্দ্র কি ভেবে পাণ্ডুলিপিটি আর নষ্ট করলেন না - রেখেই দিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, যখন পাণ্ডুলিপিটা রক্ষা পেয়েই গেল, তখন পারি তো নতুন করে লিখব। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৫ আশ্বিনে ছোটদের 'মাধুকরীতে' প্রকাশিত হয়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এত সল ১৯৩৮ জুন মাসে এ বইটি প্রকাশ করেন।

অনুরাধা-সতী ও পরেশ— এই গল্প-গ্রন্থটি ১৯৩৪ মার্চ মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সল থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে অনুরাধা গল্পটি ১৩৪০ চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষে, সতী গল্পটি ১৩৩৪ আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গবাণীতে এবং পরে গল্পটি ১৩৩২ পূজা-বার্ষিকী 'শরতের ফুল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

ছেলেবেলার গল্প— একটি গল্প-গ্রন্থ। গল্পগুলি প্রধানতঃ ছোটদের উপযোগী করে লেখা। এই জনাই এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি সম্বোধন করে লিখেছিলেন "এর আগে তোমাদের জন্য কখনো লিখিনি। যারা তোমাদের প্রিয়-লেখক, তাঁদের মুখে শুনি তোমাদের খুশি করা বড় শক্ত অথচ সম্পাদকরা অনুরোধ করেছেন কয়টি গল্প লিখে দিতে। এ যেন কুমোরের কাছে কুড়ুল গড়বার ফরমাশ। এই বিপদে হঠাৎ মনে পড়লো এক বালা-বজুর কথা ভাবলাম, আজ তারই দু-একটা গল্প বলি। শুনে খুশি হও ভালই।"

শরৎচন্দ্রের এই বালা-বজু হলেন - ভাগলপুরের রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার বা রাজু, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত গ্রন্থে 'ইন্দ্রনাথ'-রূপে যাকে অমর করে গেছেন।

এই বালা-বজুর মোট ডুট পাঁচ এবং একটি স্মৃতি-কথা আছে। এই ছ'টি গল্পের একটি (কলকাতার নতুনদা) আশ্বিন-বার্ষিকী ১ম পর্বের ৭ম পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ। অহেতুক পুনরাবৃত্তি ভেবে আমরা এই অংশটি এই খণ্ডে বাদ দিয়েছি। এই রচনাগুলি গ্রন্থ ভূক্ত হওয়ার আগে কোথায় কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটা তালিকা দিলাম - লালু - চৈত্র, চৈত্র ১৩৪৪, ছেলেধরা - পূজা-বার্ষিকী 'ছোটদের আহরিক' ১৩৪২, কলকাতার নতুনদা - বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা' ১৩৪৩, লালু - পূজা-বার্ষিকী, 'সোনার কাঠি' ১৩৪৪, বালা-বজুর পূর্বের একটা দিনের কাহিনী - পাঠশালা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৪৪। দেওঘরের

২৯৭
২২/৪/০৭

স্মৃতি - ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪৪। একটি 'লালু' গল্প পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়ে এই গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই বইটি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর তিন মাস পরে ১৩৪৫ বৈশাখ মাসে এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিজয়া— এই নাটকটি তাঁর 'দস্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ। বিজয়া প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-২৪শে ডিসেম্বর তারিখে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে।

বিজয়া নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৩৪১-৬ই পৌষ তারিখে কলকাতার স্টার থিয়েটারে। অভিনয় করেন নব নাট্যমন্দিরের শিল্পীরা। নব নাট্যমন্দির হল শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রতিষ্ঠিত পুরাতন নাট্যমন্দিরেরই পরিবর্তিত নাম।

শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত)— ভারতবর্ষ - ১৩৩৯-এর আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্তিক, ফাল্গুন এবং ১৩৪২-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থের ১৫ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখেছিলেন।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী— শরৎচন্দ্রের যে-সব রচনা বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, অথচ তাঁর কোনও গ্রন্থের সন্নিবেশিত হয়নি, এই গ্রন্থটি প্রধানতঃ সেই-সব রচনারই সংকলন। সংকলন করেন ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেনবাবু এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের রচনা ছাড়া তাঁর অনেকগুলি মৌখিক অভিভাষণ এবং কথোপকথনও দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র কোম্পগর পাঠচক্রে যে মৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন, ডাঃ জ্যোতির্ময় বসু সভায় বসে সেটি লিখে নিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র পরে একথা জানতে পেলে এ লেখাটা নিয়ে তাতে কিছু পরিবর্তনও পরিবর্ধন করে 'বিচিত্রা' সম্পাদক মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে 'বাঙলা বই-এর দুঃখ' নাম দিয়ে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন। এটি মৌখিক অভিভাষণ হলেও শরৎচন্দ্র এতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছিলেন।

স্বপ্নেশ ও সাহিত্য— এটি শরৎচন্দ্রের রচিত কিছু প্রবন্ধ, অভিভাষণ প্রভৃতির একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। প্রকাশ করেন কলকাতার আর্থ পাবলিশিং কোম্পানী।

তরুণের বিদ্রোহ— ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টারের ছুটিতে রংপুর শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক সম্মিলনীর অবসরকালে পূর্বে একই মঞ্চে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ঐ যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের সেদিনের অভিভাষণটিকে কলকাতার সরস্বতী লাইব্রেরী 'তরুণের বিদ্রোহ' নাম দিয়ে বই আকারে ছেপে প্রকাশ করেন। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৯ এর ১৮ই এপ্রিল।

১৩২৮ ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা নারায়ন পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'সত্য ও মিথ্যা' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। কলকাতার আর্থ পাবলিশিং কোম্পানী সরস্বতী লাইব্রেরীর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ' পুস্তিকাটি নিয়ে তার সঙ্গে এই 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধটি যোগ করে পরিবর্ধিত আকারে 'তরুণের বিদ্রোহ' বইটির নতুন সংস্করণ ২৫শে আগস্ট ১৯৩২ প্রথম প্রকাশিত হয়।

শ্রীকান্তের পরিভ্রমণ অংশ— শ্রীকান্ত উপন্যাসটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় পত্রিকায় সময় সংখ্যার অংশবিশেষ শরৎচন্দ্র বাদ দিয়েছিলেন, কিছু রদবদলও করেছিলেন। সেই বাদ দেওয়া অংশ ও সংযোজন অংশ দেওয়া হয়েছে এখানে এই রচনাবলীতে।

সব শেষে শরৎচন্দ্রের রচিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের একটা কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দেওয়া গেল। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থগুলি ছাড়া শরৎচন্দ্রের কিছু

অসমাপ্ত এবং টুকরো লেখাও আছে—

১৯১৩ সেপ্টেম্বর	...	বড়দিদি (উপন্যাস)
১৯১৪ মে	...	বিবাজ বৌ (উপন্যাস)
জুলাই	...	বিন্দুর ছেলে (গল্প-সমষ্টি)
আগস্ট	...	পরিণীতা (গল্প)
সেপ্টেম্বর	...	পশ্চিমশাহী (উপন্যাস)
১৯১৫ ডিসেম্বর	...	মেজদিদি (গল্প-সমষ্টি)
১৯১৬ জানুয়ারী	...	পল্লী-সমাজ (উপন্যাস)
মার্চ	...	চন্দ্রনাথ (উপন্যাস)
আগস্ট	...	বৈকুণ্ঠের উইল (গল্প)
নভেম্বর	..	অবক্ষণীয়া (গল্প)
১৯১৭ ফেব্রুয়ারী	...	শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (উপন্যাস)
জুন	...	দেবদাস (উপন্যাস)
জুলাই	...	নিষ্কৃতি (গল্প)
সেপ্টেম্বর	...	কাশীনাথ (গল্প-সমষ্টি)
নভেম্বর	...	চবিত্রহীন (উপন্যাস)
১৯১৮ ফেব্রুয়ারী	...	স্বামী (গল্প-সমষ্টি)
সেপ্টেম্বর	...	দস্তা (উপন্যাস)
সেপ্টেম্বর	...	শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস)
১৯২০ জানুয়ারী	...	ছবি (গল্প-সমষ্টি)
মার্চ	...	গৃহদাহ (উপন্যাস)
অক্টোবর	...	বামুনের মেয়ে (উপন্যাস)
১৯২৩ এপ্রিল	...	নারীব মূল্য (প্রবন্ধ)
আগস্ট	...	দেনা-পাওনা (উপন্যাস)
১৯২৪ অক্টোবর	...	নব-বিধান (উপন্যাস)
১৯২৬ মার্চ	...	হরিলক্ষ্মী (গল্প-সমষ্টি)
আগস্ট	...	পথেব দাবী (উপন্যাস)
১৯২৭ এপ্রিল	...	শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (উপন্যাস)
আগস্ট	...	ষোড়শী ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ)
১৯২৮ আগস্ট	...	বমা ('পল্লী-সমাজ'র নাট্যরূপ)
১৯২৯ এপ্রিল	...	তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ সংগ্রহ)
১৯৩১ মে	...	শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)
১৯৩২ আগস্ট	...	স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)
১৯৩৩ মার্চ	...	শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস)
১৯৩৪ মার্চ	...	অনুবাধা, সতী ও পরেশ (গল্প-সমষ্টি)
ডিসেম্বর	...	বিজয়া ('দস্তা'র নাট্যরূপ)
১৯৩৫ ফেব্রুয়ারী	..	বিপ্রদাস (উপন্যাস)
		[মৃত্যুর পর প্রকাশিত]
১৯৩৮ এপ্রিল	...	ছেলেবেলার গল্প (তরুণপাঠ্য গল্প-সমষ্টি)
জুন	...	শুভদা (উপন্যাস)

বড়দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জুলিয়া উঠিতেও পারে, আবার ঝপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন—সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।

গৃহস্থ-কন্যারা মাটির দীপ সাজাইবার সময় যেমন তৈল ও সলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাঠি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে,—এই ক্ষুদ্র কাঠিটির তখন বড় প্রয়োজন—উষ্কাইয়া দিতে হয় ; এটি না হইলে তৈল এবং সলিতা সত্ত্বেও প্রদীপের জ্বলা চলে না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও কতকটা এইরূপ। বল, বুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে, তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ যেমন সে উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকীটুকু সে তেমন নীরব আলস্যভরে ছাড়িয়া দিয়া চূপ করিয়া থাকিতে পারে। তখনই একজন লোকের প্রয়োজন—সে উষ্কাইয়া দিবে।

সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। এই বাঙ্গলাদেশের সহিত তাঁহার বোশ কিছু সম্বন্ধ ছিল না। এইখানেই সুরেন্দ্র তাহার কুড়ি বৎসর বয়সে এম. এ. পাশ করে ; কতকটা তাহার নিজের গুণে, কতকটা বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কি না। সুরেন্দ্র বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জীব এ জগতে বাস করে, না, এই বিমাতার ইচ্ছাই একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম, শোয়া-বসা, পড়াশুনা, পাশ প্রভৃতি সারিয়া লয়। এই বিমাতাটি, নিজের সন্তানের প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রের হেফাজতের সীমা ছিল না। থুথু ফেলাটি পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। এই কর্তব্যপরায়াণা স্ত্রীলোকটির শাসনে থাকিয়া সুরেন্দ্র নামে লেখাপড়া শিখিল, কিন্তু আত্মনির্ভরতা শিখিল না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোন কর্মই যে তাহার দ্বারা সর্বঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে, ইহা সে বুঝিত না। কখন যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে এবং কখন তাহাকে কি করিতে হইবে, সেজন্য সে সম্পূর্ণরূপে আর একজনের উপর নির্ভর করিত। ঘুম পাইতেছে কি ক্ষুধা বোধ হইতেছে, অনেক সময় এটাও সে নিশ্চিত ঠাহর করিতে পারিত না। জ্ঞান হওয়া অবধি, তাহাকে বিমাতার উপর ভার করিয়া এই পঞ্চদশ বর্ষ কাটাইতে হইয়াছে। সুতরাং বিমাতাকে তাহার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাইশ ঘন্টা তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর, পূর্ব হইতেই তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য তাঁহার নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জন দিতে হইত। আহা, সপত্নীপুত্রের জন্য কে কবে এত করিয়া থাকে! পাড়া-প্রতিবাসীরা একমুখে রায়গৃহিণীর সুখ্যাতি না করিয়া উঠিতে পারে না।

সুরেন্দ্রের উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না।—তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর-মুহূর্তে যদি তাহার চোখ-মুখ ছলছল করিত, রায়গৃহিণী সেটি জ্বরের পূর্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিনি দিনের জন্য তাহার সাণ্ড ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে, তাঁহার আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই তাহার শখ এবং বাবুয়ানা করিবার গুণ ইচ্ছা তাঁহার চক্ষু স্পষ্ট ধরা যাইত, এবং সেই মুহূর্তেই দুই-তিন সপ্তাহের জন্য সুরেন্দ্রের বস্ত্রাদি রজক-ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

এমনভাবে সুরেন্দ্রের দিন কাটিতেছিল। এমনি সন্দেহ-সতর্কতার মাঝে তাহার কখনও কখনও মনে হইত, এ জীবনটা বাঁচিবার মত নহে ; কখনও বা সে মনে মনে ভাবিত, বুঝি এমনি করিয়াই সকলের জীবনের প্রভাতটা অতিবাহিত হয়। কিন্তু এক-একদিন আশপাশের লোকগুলা গায়ে পড়িয়া তাহার মাথায় বিভিন্ন ধারণা গুঁজিয়া দিয়া যাইত।

একদিন তাহাই হইল। একজন বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমান ছেলে বিলাত যাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা আছে। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সে অনেকের উপকার করিতে পারে। কথাটা সুরেন্দ্রের মন্দ লাগিল না। বনের পাখির চেয়ে পিঞ্জরের পাখিটাই বেশি ছটফট করে। সুরেন্দ্র কল্পনার চক্ষে যেন একটু মুক্ত বায়ু, একটু স্বাধীনতার আলোক দেখিতে পাইতেছিল, তাই তাহার পরাধীন প্রাণটা উন্মত্তের মত পিঞ্জরের চতুর্দিকে ঝটপট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সে পিতাকে আসিয়া নিবেদন করিল যে, তাহার বিলাত যাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে যে-সকল উন্নতির আশা ছিল—তাহাও সে কহিল। পিতা কহিলেন, ভাবিয়া দেখিব। কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছা একেবারে প্রতিকূল। তিনি পিতা-পুত্রের মাঝখানে ঝড়ের মত আসিয়া পড়িয়া এমনি অটুহাসি হাসিলেন যে, দুইজনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

গৃহিণী কহিলে তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দাও—না হইলে সুরোকে সামলাইবে কে? যে জানে না, কখন কি খাইতে হয়, কখন কি পরিতে হয়, তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ? বাড়ির ঘোড়াটাকে সেখানে পাঠান যা, ওকে পাঠানও তাই। ঘোড়াগরুতে বুঝিতে পারে যে, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে, কি ঘুম পাইয়াছে—তোমার সুরো তাও পারে না। তারপর আবার হাসি।

হাস্যের আধিক্য-দর্শনে রায়মহাশয় বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথও মনে করিল যে, এরূপ অকাটা যুক্তির বিপর্যয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ করা যায় না। বিলাত যাইবার আশা সে ত্যাগ করিল। তাহার বন্ধু এ কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল। কিন্তু বিলাত যাইবার আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও সে বলিয়া দিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে কহিল যে, এরূপ পরাধীনভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া শ্রেয়ঃ ; এবং ইহাও নিশ্চয় যে, এরূপ সম্মানের সহিত যে এম. এ. পাশ করিতে পারে—উদরান্নের জন্য তাহাকে লালিয়াইতে হইতে হয় না।

সুরেন্দ্র বাটী আসিয়া এ কথা ভাবিতে বসিল। যত ভাবিল, তত সে দেখিতে পাইল যে, বন্ধু ঠিক বলিয়াছে—ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল। সবাই কিছু বিলাত যাইতে পারে না, কিন্তু এমন জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি হইয়াও সকলকে দিন কাটাইতে হয় না।

একদিন গভীর রাত্রে সে স্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া গাড়িতে বসিল এবং ডাকযোগে পিতাকে পত্র লিখিয়া দিল যে, কিছুদিনের জন্য সে বাড়ি পরিত্যাগ করিতেছে, অনর্থক অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ লাভ হইবে না, এবং সন্ধান পাইলেও যে সে বাটীতে ফিবিয়া আসিবে, এরূপ সম্ভাবনাও নাই।

রায়মহাশয় গৃহিণীকে এ পত্র দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, সুরো এখন মানুষ হইয়াছে—বিদ্যা শিখিয়াছে—পাখা বাহির হইয়াছে—এখন উড়িয়া পলাইবে না ত কখন পলাইবে!

তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিলেন—কলিকাতায় যাহারা পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে পত্র দিলেন ; কিন্তু কোন উপায় হইল না। সুরেন্দ্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিল। এখানে তিরস্কার করিবারও কেহ নাই, দিবানিশি শাসনে রাখিতেও কেহ চাহে না। মুখ শুকাইলে কেহ ফিরিয়া

দেখে না, মুখ ভারী হইলেও কেহ লক্ষ্য করে না। এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। এখানে শিক্ষাও জোটে, করুণারও কেহ লক্ষ্য করে না। এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। এখানে শিক্ষাও জোটে, করুণারও স্থান আছে, আশ্রয়ও মিলে,—কিন্তু আপনার চেষ্টা চাই; যেচ্ছায় কেহই তোমার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।

খাইবার চেষ্টা যে আপনাকে করিতে হয়, আশ্রয়ের স্থানটুকু যে নিজেকে খুঁজিয়া লইতে হয়, কিংবা, নিদ্রা এবং ক্ষুধার মাঝে যে একটু প্রভেদ আছে—এইখানে আসিয়া সে এইবার প্রথম শিক্ষা করিল।—কতদিন হইল, সে বাড়ি ছাড়িয়াছে! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীরটাও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, অর্থও ফুরাইয়া আসিতেছে, বস্ত্রাদি মলিন এবং জীর্ণ হইতে চলিল, রাত্রে শুইয়া থাকিবার স্থানটুকুরও কোন ঠিকানা নাই—সুরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। বাটাতে পত্র লিখিতেও ইচ্ছা হয় না—বড় লজ্জা করে, এবং সকলের উপর যখন তাহার বিমাতার সেই গ্নেহ-কঠিন মুখখানি মনে পড়ে, তখন বাটী যাইবার ইচ্ছা একেবারে আকাশকুসুম হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে যে সে কখনও ছিল এ কথা ভাবিতেও তাহার ভয় হয়।

একদিন সে তাহারই মত একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া বলিল, বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?—লোকটা একটু বোকা ধরনের—না হইলে উপহাস করিত। সে বলিল, চাকরি করিয়া খাটিয়া খাই। কলিকাতায় রোজগারের ভাবনা কি?

সুরেন্দ্র বলিল, আমাকে একটা চাকরি করিয়া দিতে পার?

সে কহিল, তুমি কি কাজ জান?

সুরেন্দ্রনাথ কোন কাজই জানিত না, তাই সে চূপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

তুমি কি ভদ্রলোক?—সুরেন্দ্র মাথা নাড়িল।

তবে লেখাপড়া শেখনি কেন?

শিখেছি।

সে লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল, তবে ঐ বড় বাড়িতে যাও। ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে—একটা কিছু কাজ করিয়া দিবেই। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ ফটকের কাছে আসিল। একবার দাঁড়াইল, আবার পিছাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল—আবার ফিরিয়া গেল। সেদিন আর কিছু হইল না। পরদিনও ঐরূপ করিয়া কাটিল। দুই দিন ধরিয়া সে ফটকের নিকট উমেদারি করিয়া তৃতীয় দিবসে অপেক্ষাকৃত সাহস সঞ্চয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি চান?

বাবুকে—

বাবু বাড়ি নৈই।

সুরেন্দ্রনাথের বুকখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল—একটা নিতান্ত শক্ত কাজের হাত হইতে সে পরিত্রাণ পাইল। বাবু বাড়ি নাই। চাকরির কথা, দুঃখের কাহিনী বলিতে হইল না, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরিয়া গিয়া, দোকানে বসিয়া পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া খানিকক্ষণ সে মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং মনে মনে রীতিমত আলোচনা করিতে লাগিল যে, পরদিন কেমন করিয়া কথাবার্তা কহিতে পারিলে তাহার নিশ্চিত একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

পরদিন কিন্তু উৎসাহটা তেমন রহিল না। বাটীর যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ফটকের নিকট আসিয়া একেবারে সে দমিয়া পড়িল—পা আর কোন মতেই ভিতরে যাইতে চাহে না। আজ তাহার কিছুতেই মনে হইতেছে না যে, সে নিজের কাজের জন্যই নিজে আসিয়াছে—ঠিক মনে হইতেছিল, যেন জোর করিয়া আর কেহ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দ্বারের কাছে সে আর উমেদারি করিবে না, তাই

ভিতরে আসিল। সেই ভৃত্যটার সহিত দেখা হইল। সে বলিল, বাবু বাড়ি আছেন, দেখা করবেন কি?

হাঁ।

তবে চলুন।

এটা আরও কঠিন! জমিদারবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি। রীতিমত সাহেবী ধরনের সাজান আসবাবপত্র। কক্ষের পর কক্ষ, মারবেল-প্রস্তরের সোপানাবলী, বাড়লঠান লাল কাপড়ে ঢাকা প্রতি কক্ষে শোভা পাইতেছে, ভিত্তি-সংলগ্ন প্রকাণ্ড মুকুর, কত ছবি, কত টোপগ্রাফ। এ-সকল অপরের পক্ষে যাহাই হউক, সুরেন্দ্রের নিকট নূতন নহে। কারণ, তাহার পিতার বাটীও দরিরদ্রের কুটীর নহে; আর যাহাই হউক, সে দরিদ্র পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয় নাই। সুরেন্দ্র বাঁধিতেছিল—সেই লোকটির কথা, যাহার সহিত দেখা করিতে, অনুনয়-বিনয় করিতে যাইতেছে,—তিনি কি প্রশ্ন করিবেন, এবং সে কি উত্তর দিবে।

কিন্তু এত ভাবিবার সময় নাই—কর্তা সম্মুখে বসিয়া ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন, কি প্রয়োজন?

আজ তিন দিন ধরিয়া সুরেন্দ্র এই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গেল, বলিল, আমি—আমি—ব্রজরাজ লাহিড়ী পূর্ববঙ্গের জমিদার। মাথায় দুই-চারিগাছা চুলও পাকিয়াছে—বাতিকে নহে, ঠিক বয়সেই পাকিয়াছিল। বড়লোক, অনেককে দেখিয়াছিলেন; তাই চট করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অনেকটা বুঝিয়া লইলেন, কহিলেন, হাঁ বাপু, কি চাও তুমি?

কোন একটা—

কি একটা?

চাকরি—

ব্রজরাজবাবু মুদু হাসিয়া বলিলেন, আমি চাকরি দিতে পারি এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?

পথে একজনের সহিত দেখা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে-ই আপনার কথা—

ভাল। তোমার বাড়ি কোথায়?

পশ্চিমে।

সেখানে কে আছে?—সুরেন্দ্রনাথ সব কথা বলিল।

তোমার পিতা কি করেন?

অবস্থাবৈগুণ্যে সুরেন্দ্র নূতন ধাঁচ শিখিয়াছিল—একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, সামান্য চাকরি করেন।

তাতে চলে না, তাই তুমি উপার্জন করিতে চাও?

হাঁ।

এখানে কোথায় থাকো?

কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই—যেখানে সেখানে।

ব্রজবাবুর দয়া হইল। সুরেন্দ্রনাথকে কাছে বসাইয়া তিনি বলিলেন, তুমি এখনও বালক মাত্র। এই বয়সে বাড়ি ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া দুঃখ হইতেছে। আমি নিজে যদিও কোনও চাকরি দিতে পারি না, কিন্তু যাহাতে কিছু যোগাড় হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।

আচ্ছা, খালিয়া সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ব্রজবাবু তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা করিবার নাই?

না।

ইহাতেই তোমার কাজ হইয়া গেল? কি উপায় করিতে পারি, কবে করিতে পারি,—কিছুই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে না?

সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু সহাস্যে বলিলেন, এখন কোথায় যাইবে? কোন একটা দোকানে।

সেইখানেই আহার করিবে?

প্রতিদিন তাহাই করি।

তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখিয়াছ?

কিছু শিখিয়াছি।

আমার ছেলেকে পড়াইতে পারিবে?

সুরেন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, পারিব।

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন। তাঁহার মনে হইল, দুঃখে এবং দ্রাবিড়্যে তাহার মাথার ঠিক নাই, কেননা, কাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং কি শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা না জানিয়াই অতটা আনন্দিত হওয়া তাঁহার নিকটে পাগলামি বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন, যদি সে বলে, আমি বি. এ. ক্লাসে পড়ি, তখন তুমি কি করিয়া পড়াইবে?

সুরেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া বলিল, তা একরকম হইবে—

ব্রজবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, বস্তু, এই বাবুটির থাকিবার জায়গা করিয়া দাও, এবং স্নানাহারের যোগাড় দেখ।—পরে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পর আবার ডাকিয়া পাঠাইব। তুমি আমার বাড়িতেই থাক। যতদিন কোন চাকরির উপায় না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পারিবে।

দ্বিপ্রহরের আহার করিতে গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে ডাকিয়া কহিলেন, মা, একজন দুঃখী লোককে বাড়িতে স্থান দিয়াছি।

কে, বাবা?

দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। লেখাপড়া বোধ হয় কিছু জানে, কেননা, তোমার দাদাকে পড়াইবার কথা বলাতে, তাহাতেই সে স্বীকার করিয়াছিল। বি. এ. ক্লাসের ছেলেকে সে পড়াইতে সাহস করিতে পারে, অস্তিত্বঃ তোমার ছোট বোনটিকে সে নিশ্চয়ই পড়াইতে পারিবে। মনে করিতেছি সে-ই প্রমীলার মাস্টার থাকুক।

মাধবী আপত্তি করিল না।

সন্ধ্যার পর তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া, ব্রজবাবু তাহাই বলিয়া দিলেন। পরদিন হইতে সুরেন্দ্রনথ প্রমীলাকে পড়াইতে লাগিল।

প্রমীলার বয়স সাত বৎসর। সে বোধোদয় পড়ে। বড়দিদি মাধবীর নিকট ফার্স বুকের ভেকের গল্প পর্যন্ত পাড়িয়াছিল। সে খাতাপত্র বই, স্নেট, পেন্সিল, ছবি, লজ্জেন্স প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল। —ডবল স্কলর স্কলার—সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া দিল—ডবল স্কলর স্কলার—নড়িও না।

প্রমীলা পড়িতে লাগিল, ডবল স্কলর স্কলার—নড়িও না।

তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া স্নেট টানিয়া লইয়া—পেন্সিল হাতে করিয়া আঁক পাড়িয়া বসিল। প্রবলেমের পর প্রবলেম সলভ হইতে লাগিল—ঘড়িতে সাতটার পর আটটা, তারপর নয়টা বজিতে লাগিল। প্রমীলা কখনও এ-পাশ কখনও ও-পাশ ফিরিয়া, ছবির পাতা উন্টাইয়া, শুইয়া বসিয়া লজ্জেন্স মুখে পুরিয়া নিরীহ ভেকের সর্বাস্তে মসীলিপ্ত করিতে করিতে পড়িতে লাগিল, ডবল স্কলর স্কলার—নড়িও না।

মাস্টারমশাই, বাড়ি যাই?

যাও।

সকালবেলাটা তাহার এইরূপেই কাটে। কিন্তু, দুপুরবেলার কাজটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চাকুরির যাহাতে উপায় হয়, এজন্য ব্রজবাবু অনুগ্রহ করিয়া দু-একজন ভদ্রলোকের নামে

খানকতক পত্র দিয়ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইগুলি পকেটে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সন্ধান করিয়া তাহাদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখে, কত বড় বাড়ি, কয়টা জানালা, বাহিরে কতগুলি ঘর, ভিতল কি ত্রিতল, সম্মুখে কোন ল্যাম্প-পোস্ট আছে কি না, তাহার পর সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসে।

কলিকাতায় আসিয়াই সে কতকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়াছিল, বাড়ি হইতেও কতকগুলি লইয়া আসিঃ ছিল। এখন সেইগুলি সে গ্যাসের আলোকে অধ্যয়ন করিতে থাকে। ব্রজবাবু কাজকর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হয় চুপ করিয়া থাকে, নাহয় বলে, ভ্রমলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজ চারি বৎসর হইল ব্রজরাজবাবুর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—বুড়া বয়সের এ দুঃখ বুড়াতেই বোঝে। কিন্তু সে কথা যাক—তাঁহার আদরের কন্যা মাধবী দেবী যে এই তার ষোল বৎসর বয়সেই স্বামী হারাইয়াছে—ইহাই ব্রজরাজের শরীরের অর্ধেক রক্ত শুষিয়া লইয়াছে। সাধ করিয়া ঘটা করিয়া তিনি মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। নিজের অনেক টাকা,—তাই অর্থের প্রতি নজর দেন নাই, ছেলোটর বিষয়-আশয় আছে কি না, খোঁজ লন নাই, শুধু দেখিয়াছিলেন, ছেলোট লেখাপড়া করিতেছে, রূপবান, সৎ, সাধুচরিত্র ইহাই লক্ষ্য করিয়া মাধবীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

এগার বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইয়াছিল। তিন বৎসর সে স্বামীর কাছে ছিল। যত্ন মেহ, ভালবাসা সবই সে পাইয়াছিল।

কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বাঁচিলেন না। মাধবীর এ জীবনের সাধ মুছিয়া দিয়া, ব্রজরাজের বক্ষে শেল হানিয়া, তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মরিবার সময় মাধবী যখন বড় কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিয়াছিলেন, মাধবী, তোমাকে যে ছাড়িয়া যাইতেছি, এইটিই আমার সব চেয়ে দুঃখ। মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি যে আজীব ক্রেশ পাইবে, এইটি আমাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। তোমাকে যে যত্ন করিতে পাইলাম না—

দরবিগলিত অশ্রুরাশি যোগেন্দ্রের শীর্ণবক্ষে ঝরিয়া পড়িল। মাধবী তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, আবার যখন তোমার পায়ে গিয়া পড়িব, তখন যত্ন করিও—

যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, মাধবী, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও। যার মুখ ক্লিষ্ট মলিন দেখিবে তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিও—আর কি বলিব, মাধবী—আবার উচ্ছ্বসিত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—মাধবী তাহা মুছাইয়া দিল।—সৎপথে থাকিও—তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।

সেই অবধি মাধবী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার ছিল, স্বামীর চিতাভস্মের সহিত সবগুলি সে ইহজন্মের মত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। এ জীবনের কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা! বিধবা হইলে কিছু সে-সব যায় না,—মাধবী তখন স্বামীর কথা ভাবে। তিনি যখন নাই, তখন আর কেন? কাহার জন্য পরের হিংসা করিব! কাহার জন্য আর পরের চোখে জল বহাইব! আর এ সকল হীন প্রবৃত্তি তাহার কোন কালেই ছিল না, বড়লোকের মেয়ে—কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার অতৃপ্ত ছিল না—হিংসা-দ্বেষ কোনদর্শি শিখেও নাই।

তাহার নিজের হৃদয়ে অনেক ফুল ফোটে, আগে সে ফুলে মালা গাঁথিয়া সে স্বামীর গলায় পরাইয়া দিত। এখন স্বামী নাই, তাই বলিয়া ফুলগাছটি সে কাটিয়া ফেলে নাই। এখনো তাহাতে ডেমনি ফুল ফোটে, ভূমে লুটাইয়া পড়ে। এখন সে মালা গাঁথিতে যায় না সত্য, গুচ্ছ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া গীন-দুঃখীকে তাহা বিলাইয়া দেয়। যাহার নাই, তাহাকেই দেয়, এতটুকু কার্পণ্য

নাই, এতটুকু মুখ ভারী করা নাই।

ব্রজবাবুর গৃহিণী যেদিন পরলোকগমন করেন, সেই দিন হইতে এ সংসারে আর শৃঙ্খলা ছিল না। সবাই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত ; কেহ কাহাকেও দেখিত না, কেহ কাহারও পানে চাহিত না। সকলেরই এক-একজন ভৃত্য মোতায়েন ছিল, তাহারা আপন আপন প্রভুর কাজ করিত। রন্ধনশালায় পাচক রন্ধন করিত, বৃহৎ অন্নসত্রের মত লোকে পাতপড়িয়া বসিয়া খাইত। কেহ খাইতে পাইত, কেহ পাইত না। সে দুঃখ কেহ চাহিয়াও দেখিত না।

কিন্তু যেদিন হইতে মাধবী তাহার ভ্রাতৃ মাসের ভবা গঙ্গার মত রূপ, স্নেহ, মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে যেন সমস্ত সংসারে নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সবাই কহে, ‘বড়দিদি’, সবাই বলে মাধবী। বাড়ির পোষা কুকুরটা পর্যন্ত দিনান্তে একবার ‘বড়দিদি’কে দেখিতে চাহে। এত লোকের মধ্যে সেও যেন একজনকে স্নেহময়ী সর্বময়ী বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছে। বাড়ির প্রভু হইতে সরকার, গোমস্তা, দাস, দাসী সবাই ভাবে, বড়দিদির কথা, সবাই তাহার উপর নির্ভর করে ; সকলেরই মনে মনে একটা ধারণা যে, যে কারণেই হোক, এই বড়দিদিটির উপর তাহার একটু বিশেষ দাবি আছে।

স্বর্গের কল্পতরু কখনও দেখি নাই, দেখিব কি না তাহাও জানি না, সুতরাং তাহার কথা বলিতেও পারিলাম না। কিন্তু, এই ব্রজবাবুর সংসারবতী লোকগুলো একটি কল্পতরু পাইয়াছিল। তলায় গিয়া হাত পাতিত, আর হাসিমুখে ফিরিয়া আসিত।

এরূপ পরিবারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ একটা নূতন ধরনের জীবন অভিবাহিত করিবার উপায় দেখিতে পাহল। সকলে যখন একজনেরই উপর সমস্ত ভার রাখিয়াছে, তখন সেও তাহাদের মতই করিতে লাগিল। কিন্তু, অপরের অপেক্ষা তাহার ধারণা একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ভাবিত, ‘বড়দিদি’ বলিয়া একটি জীবন্ত পদার্থ বাটীর মধ্যে থাকে, সকলকে দেখে, সব আবদার সহ্য করে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহারই নিকট পাওয়া যায়। কলিকাতায় রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজেদের জন্য নিজে ভাবিবার প্রয়োজনটা সে কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি সে একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত কোন একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল, বা পরে ভাবিতে হইবে।

জামা, কাপড়, জুতা, ছাতি, হুড়ি—যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তাহার কক্ষে প্রচুর আছে। রুমালটি পর্যন্ত তাহার জন্য সযত্নে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। প্রথমে কৌতূহল হইত, সে জিজ্ঞাসা করিত, এ সব কোথা হইতে আসিল? উত্তর পাইন্ত, ‘বড়দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন।’ জলখাবরের থালাটি পর্যন্ত দেখিলে সে আজকাল বুঝিতে পারে, ইহাতে বড়দিদির সযত্ন স্পর্শ ঘটিয়াছে।—অঙ্ক কথিতে বসিয়া একদিন তাহার কম্পাসের কথা মনে পড়িল ; প্রমীলাকে কহিল, প্রমীলা! বড়দিদির কাছ থেকে কম্পাস নিয়ে এস।

কম্পাস লইয়া বড়দিদিকে কাজ করিতে হয় না, ইহা তাহার নিকট ছিল না ; কিন্তু বাজারে তখনই সে লোক পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেখিল, তাহার টেবিলের উপর প্রার্থিত বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। পরদিন সকালে প্রমীলা কহিল, মাস্টারমশাই, কাল দিদি ঐটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।—তাহার পর মধ্যে মধ্যে সে এক-আধটা জিনিস চাহিয়া বসিত যে, মাধবী সেজন্য বিপদে পড়িয়া যাইত। অনেক অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইত। কিন্তু কখনও সে বলে নাই, দিতে পারিব না।

কিংবা কখনও সে হঠাৎ হয়ত প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদির নিকট হইতে পাঁচখানা পুরাতন কাপড় লইয়া এস ; ভিখারীদের দিতে হইবে। নূতন-পুরাতন বাছিবার অবসর মাধবীর সব সময় থাকিত না ; সে আপনার পাঁচখানা কাপড় পাঠাইয়া দিয়া, উপরের গবাক্ষ হইতে দেখিত—চারি-পাঁচজন দুঃখী লোক কলরব করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেছে—তাহারাই বস্ত্রলাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের এই ছোটখাটো আবেদন-অভ্যাচার নিতাই মাধবীকে সহ্য করিতে হইত। ক্রমশঃ এ সকল এরূপ অভ্যাস হইয়া গেল যে, মাধবীর মনে হইত না, একটা নূতন জীব তাহার সংসারে আসিয়া দৈনন্দিন কার্যকলাপের মাঝখানটিতে নূতন রকমের ছোটখাটো উপদ্রব তুলিয়াছে।

গুণু তাহাই নহে। এই নূতন জীবটির জন্য মাধবীকে আজকাল খুবই সতর্ক থাকিতে হয়, বড় বেশি খোঁজ লইতে হয়। সে যদি সব জিনিস চাহিয়া লইত, তাহা হইলেও মাধবীর অর্ধেক পরিশ্রম কমিয়া যাইত ; সে যে নিজের কোন জিনিসই চাহে না—এইটিই বড় ভাবনার কথা। প্রথমে সে জানিতে পারে নাই যে, সুরেন্দ্রনাথ নিত্যন্ত অন্যমনস্কপ্রকৃতির লোক। প্রাতঃকালে চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সে হয়ত খায় না। জলখাবার হয়ত স্পর্শ করিতেও তাহার মনে থাকে না, হয়ত বা কুকুরের মুখে তুলিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। খাইতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনের সে কোন সন্ধানই রাখে না, পাশে ঠেলিয়া নীচে ফেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া যায় ; যেন কোন দ্রব্যই তাহার মনে ধরে না। ভৃত্যেরা আসিয়া কহে, মাস্টারবাবু পাগল, কিছু দেখে না, কিছু জানে না—বই নিয়েই বসে আছে।

ব্রজবাবু মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, চাকরির কোনরূপ সুবিধা হইতেছে কি না। সুরেন্দ্র সে কথার ভাসা ভাসা উত্তর দেয়। মাধবী পিতার নিকট সেসব শুনিতে পায়, সে-ই কেবল বুঝিতে পারে যে, চাকরির জন্য মাস্টারবাবুর একতিল উদ্যোগ নাই, ইচ্ছাও নাই। যাহা আপাততঃ হইয়াছে, তাহাতেই সে পরম সন্তুষ্ট।

বেলা দশটা বাজিলেই বড়দিদির নিকট হইতে স্নানাহারের তাগিদ আসে। ভাল করিয়া আহার না করিলে বড়দিদির হইয়া প্রমীলা অনুযোগ করিয়া যায়। অধিক রাত্রি পর্যন্ত বই লইয়া বসিয়া থাকিলে ভৃত্যেরা গ্যাসের চাবি বন্ধ করিয়া দেয়, বারণ করিলে শুনে না—বড়দিদির হুকুম।—একদিন মাধবী পিতার কাছে হাসিয়া বলিল, বাবা, প্রমীলা যেমন, তার মাস্টারও ঠিক তেমনি।

কেন মা ?

দু'জনেই ছেলোমনুষ। প্রমীলা যেমন বোঝে না, তার কখন কি দরকার, কখন কি খাইতে হয়, কখন শুইতে হয়, কখন কি করা উচিত, তার মাস্টারও সেইরকম, নিজের কিছুই বোঝে না—অথচ, অসময়ে এমনি জিনিস চাহিয়া বসে যে, জ্ঞান হইলে তাহা আর কেহ চায় না।

ব্রজবাবু বুঝিতে পারিলেন না, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মাধবী হাসিয়া বলিল, তোমার মেয়েটি বোঝে, কখন তার কি দরকার ?

তা বোঝে না ?

অথচ, অসময়ে উৎপাত করে ত ?

তা করে।

মাস্টারবাবু তাই করে—

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, ছেলোট বোধহয় একটু পাগল।

পাগল নয়। উনি বোধ হয় বড়লোকের ছেলে।

ব্রজবাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া জানিলে ?

মাধবী জানিত না, কিন্তু এমনি বুঝিত। সুরেন্দ্র যে নিজের একটি কাজও নিজে করিতে পারে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, পরে করিয়া দিলে হয়, না করিয়া দিলে হয় না—এই অক্ষমতাই তাহাকে মাধবীর নিকটে ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইত—এটা তাহার পূর্বের অভ্যাস। বিশেষ এই নূতন ধরনের আহার-প্রণালীটা মাধবীকে আরো চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। কোন খাদ্যদ্রব্যই যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, কিছুই সে তৃপ্তিপূর্বক আহার করে না—কোনটির উপরই স্পৃহা নাই, এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায়

সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা,—খাইতে দিলে খায়, না দিলে খায় না—এ সকল তাহার নিকট বড় রহস্যময় বোধ হইত। একটা অজ্ঞাত করুণাচক্ষুও সেই জন্য এই অজ্ঞাত মাস্টারবাবুর উপর পড়িয়াছিল। সে যে লজ্জা করিয়া চাহে না, তাহা নহে, তাহার প্রয়োজন হয় না, তাই সে চাহে না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কিন্তু আর সময়-অসময় থাকে না—একেবারে বড়দিদির নিকট আবেদন আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধবী মুখ টিপিয়া হাসে, মনে হয়, এ লোকটি নিতান্ত বালকের মত সরল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনোরমা মাধবীর বাল্যকালের সখী, তাহাকে বহুদিন পত্র লেখা হয় নাই, উত্তর না পাইয়া সে বিষম চটিয়া গিয়াছিল। আজ দ্বিপ্রহরের পর একটু সময় করিয়া, মাধবী তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। এমন সময় প্রমীলা আসিয়া ডাকিল, বড়দিদি! মাধবী। মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

মাস্টারমশায়ের চশমা কোথায় হারিয়ে গেছে—একটা চশমা দাও। মাধবী হাসিয়া ফেলিল।

তোমার মাস্টারমশায়কে বল গে, আমি কি চশমার দোকান করি? প্রমীলা ছুটিয়া যাইতেছিল। মাধবী তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল, কোথায় যাচ্ছিস?

বলতে।

তার চেয়ে সরকারমশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।—প্রমীলা সরকারমশায়কে ডাকিয়া অনিলে, মাধবী বলিয়া দিল—মাস্টারবাবু চশমা হারিয়েছেন, ভাল দেখে একটা কিনে দাও গে।

সরকার চালিয়া গেলে, সে মনোরমাকে পত্র লিখিল, শেষে লিখিয়া দিল—

প্রমীলার জন্য বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন—তাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধ হয়, ইহার পূর্বে সে কখনও বাটীর বাহির হয় নাই — সংসারের কিছুই জানে না। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইয়া তাহার একদণ্ডও চলে না। আমার অর্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে,—তোমাদের পত্র লিখিব আর কখন? এখন যদি তোমার শীঘ্র আসা হয়, তাহা হইলে, এই অকর্মণ্য লোকটিকে দেখাইয়া দিব। এমন অকেজো, অন্যমনস্ক লোক, তুমি জন্মে দেখ নাই। খাইতে দিলে খায়, না দিলে চূপ করিয়া উপবাস করে। হয়ত সমস্ত দিনের মধ্যেও তাহার মনেও পড়ে না যে, তাহার আহার ইইয়াছে কি না! একদিনের জন্যও সে আপনাকে চালাইয়া লইতে পারে না। তাই ভাবি এমন লোক সংসারে বাহির হয় কেন? শুনিতে পাই, তাহার পিতামাতা আছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ। আমি ত বোধ হয়, এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না!

মনোরমা তামাশা করিয়া উত্তর লিখিল—তোমার পত্রে অন্যান্য সংবাদে মধ্যে জানিতে পারিলাম যে, তুমি বাড়িতে একটি বাদর পুষ্টিয়াছ, আর তুমি তার সীতাদেবী ইইয়াছ। কিন্তু তবু একটু সাবধান করিয়া দিতেছি। ইতি—মনোরমা।

পত্র পড়িয়া মাধবীর মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর লিখিল—তোমার পোড়া মুখ, তাই কাহাকে কি ঠাট্টা করিতে হয়, জান না।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, প্রমীলা, তোমার মাস্টারমশায়ের চশমা কেমন হয়েছে?

প্রমীলা বলিল, বেশ।

কেমন করে জানলে?

মাস্টারমশায় সেই চশমা চোখে দিয়ে বেশ বই পড়েন—তাই জানলুম।

মাধবী কহিল, তিনি নিজে কিছু বলেন নি?

কিছু না।

একটি কথাও না? ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, কিছু না?

না, কিছু না।

মাধবীর সদাশ্রয় মুখ যেন মুহূর্তের জন্য মলিন হইল; কিন্তু তখনি হাসিয়া কহিল, তোমার মাস্টারকে বলে দিয়া, তিনি যেন আর হারিয়ে না ফেলেন।

আচ্ছা, বলে দেব।

দূর পাগলি, তা কি বলতে আছে! তিনি হয়ত কিছু মনে করবেন।

তবে কি বলব না?

না।

শিবচন্দ্র মাধবীর দাদা। মাধবী একদিন তাহাকে ধরিয়া বলিল, দাদা, প্রমীলাব মাস্টার রাতদিন কি পড়ে, জান?—শিবচন্দ্র বি. এ. ক্লাসে পড়ে। ক্ষুদ্র প্রমীলার শিক্ষক-শ্রেণীর লোক ওলা তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। উপেক্ষা করিয়া বলিল, নাটক-নভেল পড়ে, আর কি পড়িবে?

মাধবীর বিশ্বাস হইল না। প্রমীলাকে দিয়া একখানা পুস্তক লুকাইয়া আনিয়া, তাহার দাদার হাতে দিয়া বলিল, নাটক-নভেল ব'লে ত বোধ হয় না!—শিবচন্দ্র আগাগোড়া কিছু বুঝিল না। শুধু এইটুকু বুঝিল যে, ইহার একবিন্দুও তাহার জানা নাই এবং এখানি গণিতের পুস্তক।

ভগিনীর নিকট সম্মান হারাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কহিল, এটা অঙ্কের বই ইঙ্কলে নীচের ক্লাসে পড়া হয়। বিষয়মুখে মাধবী প্রশ্ন করিল, কোন পাশের পড়া নয়? কলেজের বই নয়?—শুধু হাসিয়া শিবচন্দ্র বলিল, না, কিছুই নয়।—কিন্তু সেইদিন হইতে শিবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কখনও সুরেন্দ্রের সম্মুখে পড়িত না। মনে মনে ভয় ছিল, পাছে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, পাছে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং পিতার আদেশে তাহাকে প্রাতঃকালটা প্রমীলার সহিত একসঙ্গে এই মাস্টারটার নিকট খাতা-পেন্সিল লইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

কিছুদিন পরে মাধবী পিতাকে কহিল, বাবা, আমি দিনকতকের জন্য কাশী যাব।

ব্রজবাবু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন,—সে কি মা? তুমি কাশী গেলে এ সংসারে কি হইবে?

মাধবী হাসিয়া বলিল, আমি আবার ত আসিব, একেবারে যাইতেছি না ত।

মাধবী হাসিল। পিতার চক্ষে কিন্তু জল আসিতেছিল। মাধবী বুঝিতে পারিল, এরূপ কথা বলা অনায়াস হইতেছে। সামলাইয়া লইবার জন্য কহিল, শুধু দিনকতকের জন্য বেড়াইয়া আসিব।

তা যাও—কিন্তু মা, সংসার চলবে না।

আমি ছাড়া সংসার চলবে না?

চলবে না কেন মা, চলবে। হাল ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেমন ক'রে চলে—এ ও তেমন চলবে।

কিন্তু, কাশী যাওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সেখানে তাহার বিধবা ননদিনী একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করেন, তাহাকে একবার দেখিতে হইবে।—কাশী যাইবার দিন সে প্রত্যেককে ডাকিয়া সংসারের ভার দিয়া গেল। বুড়ি দাসীকে ডাকিয়া, পিতা, দাদা, ও প্রমীলাকে বিশেষরূপে দেখিবার জন্য অনুরোধ ও উপদেশ দিয়া দিল; কিন্তু মাস্টারের কথা কাহাকেও কহিল না। ছুলিয়া যায় নাই—ইচ্ছা করিয়াই বলিল না। সম্ভ্রতি তাহার উপর একটু রাগ হইয়াছিল। মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন কি সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই। তাই মাধবী বিদেশে গিয়া এহ অকর্মণ্য সংসারনভিষ্ট উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে যে, সে একজন ছিল। একটা কৌতুক করিতে দোষ কি? সে না থাকিলে ইহার কেমনভাবে দিন কাটে, দেখিতে হানি কি? তাই সে সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রব্লেম সল্ড করিতেছিল। প্রমীলা কহিল, কাল রাত্রে দিদি কাশী গিয়াছেন। কথাটা তাহার কানে গেল না। কিন্তু দিন দুই-দিন পরে যখন সে দেখিতে পাইল, দশটার সময় আহারের জন্য আর পীড়াপীড়ি হয় না,—কোনদিন বা একটা-দুইটা বাজিয়া যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতে গিয়া দেখে বোধ হয় সেগুলি আর তেমনি পরিষ্কার নাই, জলখাবারের থালাটা তেমন সবত্ব-সজ্জিত নহে। রাত্রে গ্যাসের চাবি কেহ বন্ধ করিতে আসে না, পড়ার বৌকে দুইটা-তিনটা বাজিয়া যায়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, উঠিতে বেলা হয়, সমস্ত দিন চোখের পাতা ছাড়িয়া ঘুম কিছুতেই যাইতে চাহে না। শরীর যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন সুরেন্দ্রনাথের মনে হইল, এ সংসারে একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গরম বোধ হইলে তবে লোকে সাধারণ সন্ধান করে। সুরেন্দ্রনাথ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, প্রমীলা, বড়দিদি এখানে নাই, না?

সে বলিল, দিদি কাশী গিয়াছেন।

তাইত!

দিনদুই পরে হঠাৎ প্রমীলার পানে চাহিয়া সে কহিল, বড়দিদি কবে আসবেন?

একমাস পরে!

সুরেন্দ্রনাথ পুস্তকে মনোযোগ করিল। আরও পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ পেন্সিলটা পুস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, প্রমীলা, একমাসের আর কত বাকী?

অনেক দিন।

পেন্সিল তুলিয়া লইয়া সুরেন্দ্রনাথ চশমা খুলিয়া কাচ দুইটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর চক্ষু দিয়া পুস্তকের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিনে কহিল, প্রমীলা বড়দিদিকে তুমি চিঠি লেখ না?

লিখি বৈ কি!

তাড়াতাড়ি আসতে লেখনি?

না।

সুরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তাইত।

প্রমীলা বলিল, মাস্টারমশায়, বড়দিদি এলে বেশ হয়, না?

বেশ হয়।

আসতে লিখে দেব?

সুরেন্দ্রনাথ শ্রুত্ব হইয়া বলিল, দাও।

আপনার কথা লিখে দেব?

দাও।

'দাও' বলিতে তাহার কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইল না। কেননা, জগতের কোন আদবকায়দা সে জানিত না। বড়দিদিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা যে তাহার মানায় না, ভাল শুনিতে হয় না, এটা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। যে না থাকিলে তাহার বড় ক্রেশ হয়, যাহার অবর্তমানে তাহার চলিতেছে না—তাহাকে আসিতে বলায় সে কিছুই অসঙ্গত মনে করিল না।

এ জগতে যাহার কৌতূহল কম, সে সাধারণ মনুষ্য-সমাজের একটু বাহিরে। যে দলে সাধারণ মনুষ্য বিচরণ করে, সে দলে তাহার মেলা চলে না। সাধারণের মতামত তাহার মতামতের সহিত মিশ্র খায় না। কৌতূহলী হওয়া সুরেন্দ্রের স্বভাব নহে। যতটা তাহার প্রয়োজন, ততটাই সে জানিতে চাহে, তাহার বাহিরে যেচ্ছাপূর্বক এক পদও যাইতে তাহার ইচ্ছা হইত না, সময়ও পাইত না। তাই বড়দিদির সম্বন্ধে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। এতদিন এ সংসারে তাহার অভিবাহিত হইল, এই তিনি মাস ধরিয়া সে বড়দিদির উপর ভর দিয়া পরম আরামে কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, এই জীবটি কেমন। কত বড়, কত

বয়স, কেমন দেখিতে, কত গুণ, কিছুই সে জানিত না, জানিবার বাসনা হয় নাই, একবার মনেও পড়ে নাই। ইহার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ত লোকের সাহায্য হয়!—সবাই কহে, বড়দিদি, সেও কহে, বড়দিদি। সবাই তাহার নিকট স্নেহ-যত্ন পায়, সেও পায়। বিশ্বের ভাণ্ডার তাহার নিকট গচ্ছিত আছে, যে চাহে সে পায়—সুরেন্দ্রও লইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের কথা আর কি? মেঘের কাজ—জল বরিষণ করা, বড়দিদির কাজ—স্নেহ-যত্ন করা। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন যে হাত পাতে, সে-ই জল পায়। বড়দিদির নিকট হাত পাতিলে অভীষ্ট-পদার্থ পাওয়া যায়। মেঘের মতই বুঝি সে অন্ধ, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাহীন। মোটের উপর সে এমনি ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল। আসিয়া অবধি সে যে ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছিল—আজও তাহাই আছে। শুধু এই কাশীগমন ঘটনাটির পর হইতে এইটুকু সে বেশি জানিয়াছে, বড়দিদি ভিন্ন তাহার একদণ্ডও চলিতে পারে না।

সে যখন বাড়িতে ছিল, তখন তাহার পিতাকে জানিত, বিমাতাকে জানিত। তাঁহাদের কর্তব্য ঃ তাহা বুঝিত, কিন্তু বড়দিদি বলিয়া কাহারও সহিত পরিচিত হয় নাই—যখন পরিচয় হইয়াছে, তখন সে এমনিই বুঝিয়াছে। কিন্তু মানুষটিকে সে চিনে না, জানে না, শুধু নামটি জানে, নামটি চেনে, লোকটি তাহার কেহ নহে। নামটি সর্বস্ব।

লোক যেমন ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পায় না, শুধু নামটি শিখিয়া রাখে, দুঃখে-কষ্টে সেই নামটির সম্মুখে সমস্ত হৃদয় মুক্ত করে, নতজানু হইয়া করুণাভিক্ষা চাহে, চক্ষে জল আসে, মুছিয়া ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে কাহাকে যেন দেখিতে চাহে—কিছুই দেখা যায় না; অস্পষ্ট জিহ্বা শুধু দুইটি কথা অস্ফুট উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যায়। দুঃখ পাইয়া তাই সুরেন্দ্রনাথও অস্ফুটে উচ্চারণ করিল, 'বড়দিদি'!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তখনও সূর্যোদয় হয় নাই, পূর্বদিক রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র। প্রমীলা আসিয়া নিদ্রিত সুরেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল—মাস্টারমশায়! সুরেন্দ্রনাথের অলস চক্ষু দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল—কি প্রমীলা?

বড়দিদি এসেছেন। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিল। প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, চল, দেখে আসি।—এই দেখিবার বাসনাটি তাহার মনে কেমন করিয়া উদয় হইল বলা যায় না, এবং এতদিন পরে কেন যে সে প্রমীলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু সে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধবীর কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রমীলা ডাকিল, বড়দিদি।

বড়দিদি অনামনস্ক হইয়া কি একটি কাজ করিতেছিল, কহিল, কি দিদি!

মাস্টারমশাই—

দুইজনে ততক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। মাধবী শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল; মাথার উপর এক হাত কাপড় টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্রনাথ কহিতেছিল, বড়দিদি, তোমার জন্য আমি বড় কষ্টে—মাধবী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিষম লজ্জায় জিভ কাটিয়া মনে মনে বলিল, ছি-ছি!

তুমি চলে গেলে—

মাধবী মনে মনে বলিল, কি লজ্জা!

মাধবী মৃদুকণ্ঠে কহিল, প্রমীলা, মাস্টারমশায়কে বাহিরে যাইতে বল।

প্রমীলা ছোট হইলেও তাহার দিদির আচরণ দেখিয়া বুঝিতেছিল যে, কাজটা ঠিক হয় নাই। বলিল, চলুন মাস্টারমশাই—

অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, চল। বেশি কথা সে

কহিতে জানিত না, বেশি কথা বলিতে সে চায় নাই, তবে সারাদিন মেঘের পর সূর্য উঠিলে, হঠাৎ যেমন লোকে সেদিকে চাহিতে চায় ক্ষণকালের জন্য যেমন মনে থাকে না যে সূর্যের পানে চাহিতে নাই, কিংবা চাহিলে চক্ষু পীড়িত হয়, তেমনি একমাস মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে থাকিয়া প্রথম সূর্যোদয়ের সহিত সুরেন্দ্রনাথ পরম আত্মদে চাহিয়া দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু ফল যে একরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সে জানিত না।—সেইদিন হইতে তাহার যত্নটা একটু কমিয়া আসিল। মাধবী যেন একটু লজ্জা করিত। বিন্দু দাসী নাকি কথাটা লইয়া একটু হাসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজকাল সে যেন দেখিতে পায়, তাহার বড়দিদের অসীম ভাণ্ডার সসীম হইয়াছে। ভগিনীর যত্ন, জননীর মেহ-পরশ, যেন তাহার আর গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।

একদিন সে প্রমীলাকে কহিল, বড়দিদি আমার উপর রাগ করেছেন না?

প্রমীলা বলিল, হাঁ।

কেন রে?

আপনি অমন করে বাড়ির ভিতর গিয়েছিলেন কেন?

যেতে নেই, না?

তা কি যেতে হয়? দিদি খুব রাগ করেছে।

সুরেন্দ্র পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া বলিল তাইত—

তারপর একদিন দুপুরবেলা মেঘ করিয়া ঝড় জল আসিল। ব্রজরাজবাবু আজ দুদিন হইল বাড়ি নাই; ভ্রমাদারি দেখিতে গিয়াছিলেন। মাধবীর হাতে কিছু কাজ ছিল না, প্রমীলাও বড় উপদ্রব করিতেছিল, মাধবী তাহাকে ধরিয়া কহিল, প্রমীলা, তোর বই নিয়ে আয়, দেখি কত পড়েছিস।

প্রমীলা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মাধবী বলিল, নিয়ে আয়।

বড়দিদি, রাস্তিরে আনব।

না, এখনি আন। নিতান্ত দৃষ্টিত মনে তখন সে বই আনিতে গেল। আনিয়া বলিল, মাস্টারমশাই কিছুই পড়ায় নি—খালি আপনি পড়ে। মাধবী জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। আগাগোড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল যে, সত্যি মাস্টারমশাই কিছুই পড়ান নাই; অধিকন্তু সে যাহা শিখিয়াছিল, শিক্ষক নিযুক্ত করিবার পর, এই তিন-চারিমাস ধরিয়া বেশ ধীরে ধীরে সবটুকু ভুলিয়া গিয়াছে। মাধবী বিরক্ত হইয়া বিন্দুকে ডাকিয়া কহিল, বিন্দু, মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে আয় ত, কেন প্রমীলাকে এতদিন একটুও পড়ান নি?—বিন্দু যখন জিজ্ঞাসা করিতে গেল, মাস্টার তখন প্রবলেম ভাবিতেছিল। বিন্দু কহিল, মাস্টারমশায়, বড়দিদি বলচেন যে, আপনি ছোটদিদিকে কিছু পড়ান নি কেন? মাস্টারমশায় শুনিতে পাইল না। এবার বিন্দু জোরে বলিল, মাস্টারমশায়?

কি?

বড়দিদি বলচেন—

কি বলচেন?

ছোটদিদিকে পড়ান নি কেন?

অন্যমনস্ক হইয়া সে জবাব দিল,—ভাল লাগে না।

বিন্দু ভাবিল, মন্দ নয়। একথা সে মাধবীকে জানাইল। মাধবীর রাগ হইল, সে নীচে আসিয়া দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বিন্দুকে দিয়া বলাইল, ছোটদিদিকে একেবারে পড়ান নি কেন? কথাটা বার দুই-তিন জিজ্ঞাসা করিবার পরে, সুরেন্দ্রনাথ কহিল, আমি পারব না।

মাধবী ভাবিল, এ কেমন কথা!

বিন্দু বলিল; তবে আপনি কি জন্য আছেন?

না থাকলে কোথা যাব?

তবে পড়ান না কেন?

সুরেন্দ্রনাথের এবার চৈতন্য হইল! ফিরিয়া বসিয়া কহিল, কি বলচ?

বিন্দু এতক্ষণ ধরিয়া কি কহিতেছিল, তাহাই আবার আবৃত্তি করিল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন কহিল, সে ত রোজ পড়ে!

পড়ে, কিন্তু আপনি দেখেন কি?

না। আমার সময় হয় না।

তবে এ বাড়িতে কেন আছেন?—সুরেন্দ্র চূপ করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।

আপনি আর পড়াতে পারবেন না?

না। আমার পড়াতে ভাল লাগে না।

১ ধবী ভিতর হইতে কহিল, জিজ্ঞাসা কর্ বিন্দু, কেন এতদিন তবে মিছা কথা বলে আসছেন? বিন্দু তাহাই কহিল। শুনিয়া সুরেন্দ্রের প্রবলেমের জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। একটু দুঃখিত হইল, একটু ভাবিয়া বলিল, তাহিত, বড় ভুল হয়েছে।

এই চার মাস ধরে ক্রমাগত ভুল?

হ্যাঁ, তাহিত হয়েছে দেখছি—তা কথাটা আমার তত মনে ছিল না।

পরদিন প্রমীলা পড়িতে আসিল না, সুরেন্দ্রেরও তত মনে হইল না। তার পরদিনও আসিল না— সেদিনও অমনি গেল।

তৃতীয় দিবস প্রমীলাকে না দেখিতে পাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ একজন ভৃত্যকে কহিল, প্রমীলাকে ডেকে আন।

ভৃত্য ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ছোটদিদি আর আপনার কাছে পড়বেন না।

কার কাছে তবে পড়বে?

ভৃত্য বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, অন্য মাস্টার আসবে।

বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তা দুই-তিনখানা বই বগলে গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চশমাটা খাপে পুরিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ভৃত্য কহিল, এ সময়ে কোথায় যাচ্ছেন? বড়দিদিকে বলে দিও, আমি যাচ্ছি।

আর আসবেন না?

সুরেন্দ্রনাথ একথা শুনিতে পাইল না? বিনা উত্তরে ফটকের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি সুরেন্দ্র ফিরিল না। ভৃত্য তখন মাধবীকে সংবাদ দিল যে, মাস্টারমহাশয় চলিয়া গিয়াছেন।

কোথায় গেছেন?

তা জানি না। বেলা নটার সময় চলে যান। যাবার সময় আমায় বলে নায যে বড়দিদিকে ব'লো আমি চলে যাচ্ছি।

সে কিরে? না খেয়ে চলে গেলেন? মাধবী উদ্বিগ্ন হইল।

তারপর সে নিজে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে আসিয়া দেখিল—সব জিনিসপত্রই তেমনি আছে, টেবিলের উপর চশমাটি খাপেমোড়া রাখা আছে, শুধু বই কয়খানি নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল—সুরেন্দ্রনাথ আসিল না। পরদিন মাধবী দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিয়া দিল, তোমরা অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিলে দশ টাকা পুরস্কার পাইবে। পুরস্কারের লোভে তাহারা ছুটির্ল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রমীলা কাঁদিয়া কহিল, বড়দিদি, তিনি চলে গেলেন কেন?

মাধবী তাহাকে সরাইয়া দিলা কহিল, বাইরে যা, কাঁদিস নে।

দুইদিন, তিনদিন করিয়া যত দিন যাইতে লাগিল, মাধবী তত অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বিন্দু কহিল, বড়দিদি, তা এত খোঁজাখুঁজি কেন? কলকাতা শহরে আর কি মাস্টার পাওয়া যায় না?

মাধবী ব্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তুই দূর হ! একটা মানুষ একটি পয়সা হাতে না নিয়ে চলে গেল, আর তুই বলিস খোঁজাখুঁজি কেন?

তার কাছে একটিও পয়সা নেই, তা কি ক'রে জানলে?

তা আমি জানি, কিন্তু তোর অত কথায় কাজ কি?

বিন্দু চুপ করিয়া গেল। ক্রমে যখন সাতদিন কাটিয়া গেল, অথচ কেহ ফিরিয়া আসিল না, তখন মাধবী একরূপ অন্নজল ত্যাগ করিল। তাহার মনে হইত, সুরেন্দ্রনাথ অনাহারে আছে। যে বাড়ির জিনিস চাহিয়া খাইতে পারে না, পরের কাছে কি সে চাহিতে পারে? তাহার দৃঢ় ধারণা সুরেন্দ্রনাথের কিনিয়া খাইবার পয়সা নাই, শিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, ছোটছেলের মত অসহায় অবস্থায় হয়ত বা কোন ফুটপাতে বসিয়া কাঁদিতেছে, না হয় কোন গাছের তলায় বই মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে।

ব্রজরাজবাবু ফিরিয়া আসিয়া সব কথা শুনিয়া মাধবীকে কহিলেন, কাজটা ভাল হয়নি মা। মাধবী কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিনদিন অনাহারে কাটিল, কলের জলে পয়সা লাগ না, তাই ক্ষুধা পাইলে পেট ভরিয়া জল খাইত।

একদিন রাত্রে অবসন্ন শরীরে সে কালীঘাটে যাইতেছিল, কোথায় নাকি শুনিয়াছিল, সেখানে খাইতে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার মেঘ করিয়াছিল, চৌরঙ্গীর মোড়ে একখানা গাড়ি তাহার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ান কোনরূপে অশ্বের বেগ সংবরণ করিতে পারিয়াছিল। সুরেন্দ্র প্রাণে মরিল না বটে কিন্তু বক্ষে ও পার্শ্বে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। পুলিশ আসিয়া গাড়ি করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। চার-পাঁচদিন অজ্ঞান অবস্থায় অতীত হইবার পর, রাত্রে চক্ষু চাহিয়া কহিল, বড়দিদি!

কলেজের একজন ছাত্র, যে সে-রাত্রে ডিউটিতে ছিল, শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র কহিল, বড়দিদি এসেছেন? কাল সকালে আসবেন।

পরদিন সুরেন্দ্রের বেশ সজ্জন হইল, কিন্তু বড়দিদির কথা কহিল না, প্রবল জ্বরে সমস্তদিন ছটফট করিয়া সন্ধ্যার সময় একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি হাসপাতালে আছি?

হ্যাঁ?

কেন?

আপনি গাড়িচাপা পড়েছিলেন।

বাঁচার আশা আছে?

নিশ্চয়।

পরদিন সেই ছাত্রটি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আত্মীয় কেহ এখানে আছেন? কেহ না।

তবে সে-রাত্রে বড়দিদি বলে ডাকছিলেন কাকে? তিনি কি এখানে আছেন?

আছেন, কিন্তু তিনি আসতে পারবেন না। আমার পিতাকে সংবাদ দিতে পারেন?

পারি।

সুরেন্দ্রনাথ পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেই ছাত্রটি সেদিন পত্র লিখিয়া দিল। তাহার পর বড়দিদির সন্ধান লইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে আসতে পারেন, আমরা সে বন্দোবস্ত করতে পারি। আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঠিকানা জানতে পারলে তাঁকেও

সংবাদ দিতে পারি।

সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ব্রজরাজবাবুর ঠিকানা কহিয়া দিল।

আমার বাসা ব্রজরাজবাবুর বাড়ির নিকটেই, আজ তাঁকে আপনার অবস্থা জানাব। যদি ইচ্ছা করেন, তিনি দেখতে আসতে পারেন।

সুরেন্দ্র কথা কহিল না। মনে মনে বুঝিল—বড়দিদির আসা অসম্ভব। ছাত্রটি কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া ব্রজবাবুকে সংবাদ দিল। ব্রজবাবু চমকিত হইলেন—বাঁচবে ত?

সম্পূর্ণ আশা আছে।

বাড়ির ভিতর গিয়া কন্যাকে কহিলেন, মাধবী, যা ভাবছিলাম তাই হয়েছে। সুরেন গাড়িচাপা পড়ে হাসপাতালে আছে।

মাধবীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

তোমার নাম ক'রে নাকি বড়দিদি বলে ডাকছিল। তুমি দেখতে যাবে? এই সময় পার্শ্বের ক'ক প্রমীলা খনঝন করিয়া কি-সব ফেলিয়া দিল। মাধবী সেইদিকে ছুটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া কহিল, তুমি দেখে এসো, আমি যেতে পারব না।

ব্রজবাবু দুঃখিতভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সে বনের পশু, তার উপরে কি রাগ করে? মাধবী কথা কহিল না। তবে ব্রজবাবু একাকী সুরেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বড়দুঃখ হইল, কহিলেন, সুরেন, তোমার পিতামাতাকে সংবাদ দিলে হয় না?

সংবাদ দিয়েছি।

কোন ভয় নেই, তাঁরা আসলেই একটা বন্দোবস্ত করে দেব।

ব্রজবাবু টাকাকড়ির জন্য চিন্তা করিয়া কহিলেন, বরং আমাকে তাঁদের ঠিকানা বলে দাও, যাতে তাঁদের এখানে আসার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তা করে দেব।

সুরেন্দ্র কথাটা তেমন বুঝিল না। বলিল, বাবা আসবেন, অসুবিধা আর কি আছে?

ব্রজবাবু বাড়ি ফিরিয়া মাধবীকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন।

সেই অবধি নিতা তিনি একবার করিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইতেন। তাহার উপর একটা স্নেহ জন্মিয়াছিল? একদিন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মাধবী, তুমি ঠিক বুঝেছিলে, সুরেনের পিতা বেশ অর্থবান লোক।

মাধবী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করে জানলে?

তার পিতা একজন বড় উকিল; কাল রাতে তিনি এসেছেন।

মাধবী মৌন হইয়া রহিল। তাহার পিতা কহিলেন, সুরেন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। কেন?

ব্রজবাজবাবু কহিলেন, তাহার পিতার সহিত আজ আলাপ হইল। তিনি সেকথা সমস্ত বলিলেন। এই বৎসর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সম্মানের সহিত সুরেন এম. এ. পাশ করিলে বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অনামনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া তাঁহার পিতা সাহস করিয়া পাঠাইতে চাহেন নাই; তাই রাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। সে ভাল হইলে তিনি বাটী লইয়া যাইবেন।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, উচ্ছসিত অশ্রু সংবরণ করিয়া লইয়া মাধবী বলিল, তাই ভাল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছয় মাস হইল সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মাধবী একটিবার মাত্র মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছিল, আর লেখে নাই।

পূজার সময় মনোরমা পিতৃভবনে আসিয়া মাধবীকে ধরিয়া বসিল, তোর বাঁদর দেখা। মনোরমা তাহার চিবুকে হাত দিয়া সুর করিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিল—

আমি এলাম ছুটে দেখব বলে
কেমন শোভে পোড়ার বাদর—

তোমার ঐ রাসা চরণতলে।

সেই যে পুষেছিলি?

কবে?

মনোরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে নেহ। যে তোকে বৈ আর জানত না?

মাধবী কথাটা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিল, তাই অল্পে অল্পে মুখখানি বিবর্ণ হইতেছিল; তথাপি আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, ও—তাঁর কথা? তিনি আপনি চলে গেছেন।

অমন রাসা পা-দুটি তার পছন্দ হ'ল না?

মাধবী মুখ ফিরাইয়া—কথা কহিল না। মনোরমা হাত দিয়া আদর করিয়া তাহার মুখ ফিরাইল—কৌতুক করিতে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষে একরাশি জল আনিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া কহিল, একি মাধবী!

মাধবী আর সামলাইতে পারিল না—চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মনোরমার বিষ্ময়ের সীমা নাই—একটা উপযুক্ত কথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ কাঁদিতে দিল। তাহার পর জোর করিয়া মুখ হইতে অঞ্চল খুলিয়া লইয়া নিতান্ত দুঃখিত-ভাবে বলিল, একটা সামান্য কৌতুক সইতে পারিলে না বোন!

মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যে বিধবা দিদি!

তাহার পর দুইজনেই চুপকরিয়া রহিল। দুইজনেই নীরবে কাঁদিতে লাগিল। মনোরমা কাঁদিতেছিল মাধবীর দুঃখে—সে বিধবা, তাই বলিয়া। কিন্তু মাধবীর অন্য কারণ ছিল। এখনি না জানিয়া মনোরমা যে ঠাট্টা করিয়াছে, যে তোকে বৈ আর জানত না—মাধবী তাহাই ভাবিতেছিল। এ কথা যে নিতান্ত সত্য, সে তাহা জানিত। অনেকক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, কাজটা কিন্তু ভাল হয়নি।

কোন কাজটা?

তা কি ব'লে দিতে হবে বোন?—আমি সব বুঝেছি।

এই ছয় মাস ধরিয়া যে—কথা মাধবী প্রাণপণে লুকাইয়া আসিতেছিল, মনোরমার কাছে আর তাহা লুকাইতে পারিল না। ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় ছেলে-মানুষের মত কাঁদিল।

শেষকালে মনোরমা বলিল, কিন্তু গেল কেন?

আমি যেতে ব'লেছিলাম।

বেশ ক'রেছিলে—বুদ্ধিমতীর মত কাজ ক'রেছিলে।

মাধবী বুঝিল, মনোরমা কিছুই বোঝে নাই—তাই একে একে সব কথা বুঝাইয়া কহিল। তাহার পর বলিল, কিন্তু তিনি যদি না বাঁচতেন, তাহলে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম। মনোরমা মনে মনে কহিল,—এখনি বা তার কম কি?

সেদিন বড় দুঃখিত হইয়া সে বাড়ি চলিয়া গেল। সেই রাত্রেই কাগজ-কলম লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল—

তুমি ঠিক বলিতে—ঈলোককে বিশ্বাস নাই। আমিও আজ তাহাই বলিতেছি, কেননা, মাধবী আমাকে শিখাইয়াছে। আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতে জানি, তাই তাহাকে দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সাহস হয় না; সমস্ত ঈর্জাতিকে দোষ দিই—বিধাতাকে দোষ দিই—তিনি কি জন্য এত কোমল, এই জলের মত তরল পদার্থ দিয়া নারীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন? এত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এ হৃদয় কে গড়িতে সাধিয়াছিল? তাহার চরণে প্রার্থনা, যেন এ হৃদয়গুলো একটু শক্ত করিয়া নির্মাণ করা হয়। আর তোমার চরণে প্রার্থনা, যেন ঐ পায়ে মাথা

রাখিয়া ঐ মুখপানে চাহিয়া মরিতে পারি। মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,—সে আমার আজন্মের ধারণা ও ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। আমাকেও বেশি বিশ্বাস করিও না—শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাইও। তাহার স্বামী উত্তর লিখিলেন—

যাহার রূপ আছে, সে দেখাইবেই। যাহার গুণ আছে, সে প্রকাশ করিবেই। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যে ভালবাসিতে জানে,—সে ভালবাসিবেই। মাধবীলতা রসাল বৃক্ষে অবলম্বন করে, ইহা জগতের রীতি—তুমি আমি কি করিতে পারি? তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি—সেজন্য চিন্তিত হইও না।

মনোরমা স্বামীর পত্র মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ-উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া লিখিল—মাধবী পোড়ামুখী—বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর-একজনকে ভালবাসিয়াছে!

পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিলেন। তাহার পর কৌতুক করিয়া লিখিলেন,—মাধবী পোড়ামুখী, তাহাকে আর সন্দেহ নাই, কেননা, বিধবা হইয়া মনে মনে আর-একজনকে ভালবাসিয়াছে। তোমাদের রাগ হইবার কথা—বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার কোন চিন্তা নাই, এমন সুবিধা কিছুতেই ছাড়িও না। এই অবসরটুকুর মধ্যে পরম আরামে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসিয়া লইও। কিন্তু, কি জান মনোরমা, তুমি আমাকে আশ্চর্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ-ক্লেশ ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী! তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দুইজনে সেটিকে দেখিয়া আসিব।

মনোরমা রাগ করিয়া তাহার উত্তর দিল না।

কিন্তু মাধবীর চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়াছে। কাজকর্মে তেমন বাঁধনি নাই—একটু টিলা রকমের হইয়াছে। সকলকে যত্ন আত্মীয়তা করিবার ইচ্ছা তেমনই আছে, বরং বাড়িয়াছে—কিন্তু সব কাজগুলা আর তেমন মনে থাকে না—মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়।

এখনো সবাই কহে, ‘বড়দিদি’, এখনো সবাই সেই কল্পতরুটির পানে চাহিয়া থাকে, হাত পাতে, অভীষ্ট ফল পায়; কিন্তু গাছ আর তেমন সরস সতেজ নাই। পুরাতন লোকগুলির মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়—পাছে শুকাইয়া যায়।

মনোরমা নিত্য আসে, অন্যান্য কথা হয়—শুধু একথা আর হয় না। মাধবী দুঃখিত হয়, মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে। আর এসকল কথার আলোচনা যত না হয়, ততই ভাল। হতভাগী যদি ভুলিতে পারে, মনোরমা একথাও ভাবে।

সুরেন্দ্রনাথ আরাম হইয়া পিতার সহিত বাটী চলিয়া গিয়াছে। বিমাতা তাঁহার যত্নটা একটু কম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাই সুরেন্দ্র শরীরে একটু আরাম পাইয়াছে, কিন্তু শরীর বেশ সারিতে পারে নাই—অস্তুরে একটু ব্যথা আছে। রূপ-যৌবনের আকাঙ্ক্ষা-পিপাসা এখনো তাহার মনে উদয় হয় নাই,—এসব সে জানিত না। পূর্বের মত এখনো সে অন্যমনস্ক, আত্মনির্ভরশূন্য। কিন্তু কাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এইটাই সে খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই সেই যে নিজের কাজ নিজে দেখিতে পারে, তাহাও নহে আজও পরের পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু পূর্বের মত তেমন আর মনে ধরে না, সব কাজেই যেন একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, একটু খুঁতখুঁত করে। তাহার বিমাতা দেখিয়া শুনিয়া কহেন, সুরো আজকাল বদলে গেছে।

মধ্যে একদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল। বড় কষ্ট হইয়াছিল; চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বিমাতা কাছে বসিয়াছিলেন—তিনিও একটা নতুন জিনিস দেখিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, সুরো, কেন বাবা?

সুরেন্দ্র চূপ করিয়া রহিল। তারপর একখানা পোস্টকার্ড চাহিয়া লইয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়া দিল—বড়দিদি, আমার জ্বর হইয়াছে, বড় কষ্ট হইতেছে।

পত্রখানা ডাকঘরে পৌঁছিল না। প্রথমে শয্যা হইতে মেঝের উপর পড়িল, তাহার পর যে ঘর ঝাঁটাইতে আসিল সে বেদনার খোসা, বিস্কুটের টুকরা, আঙ্গুরের তুলা এবং সেই চিঠিখানি, সব একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল,—সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা থুলা মাখিয়া, হাওয়ায় উড়িয়া, শিশিরে ভিজিয়া, রোদ খাইয়া অবশেষে একটা বাবলা গাছের তলায় পড়িয়া রহিল।

প্রথমে সে একখানি মূর্তিমতী উস্তরের আশায় চাহিয়া রহিল, তাহার পর একখানি হস্তাক্ষর—কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেল, কিছুই আসিল না। ক্রমে তাহার জ্বর সারিয়া গেল—পথ্য করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর, তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। ঘটনা যদিও নূতন, কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রের পিতা রায়মহাশয় ইহা বহুদিন হইতে জানিতেন এবং আশা করিতেন। সুরেন্দ্রের মাতামহ পাবনা জেলার একজন মধ্যবিস্তৃত জমিদার। কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামে জমিদারি; বাৎসরিক আয় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। একে তিনি অপুত্রক, খরচপত্র স্বভাবতঃ কম, তাহাতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিলেন। তাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে সমস্ত বৈভব একমাত্র দৈহিক সুরেন্দ্রনাথ পাইবে, রায়মহাশয় ইহা স্থির জানিতেন। তাহাই হইল। রায়মহাশয় সংবাদ পাইলেন, শ্বশুরমহাশয় আসন্ন মৃত্যুশয্যায়ায় শয়ন করিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুত্রকে লইয়া পাবনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু পৌছাইবার পূর্বেই শ্বশুরমহাশয় পরলোকগমন করিলেন।

সমারোহ করিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তি হইল। শৃঙ্খলিত জমিদারিতে আরো শৃঙ্খলার ঘটা পড়িয়া গেল। পরিপক্ব বুদ্ধি প্রাচীন উকীল রায়মহাশয়ের কড়া বন্দোবস্তে, প্রজারা সমস্ত হইয়া উঠিল।

এখন সুরেন্দ্রের বিবাহ হওয়া আবশ্যিক। ঘটকের আনাগোনায়া গ্রামময় আন্দোলন পড়িয়া গেল। পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যে বাড়িতে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল, সেই বাড়িতেই ঘটকের দল ঘন ঘন পদধূলি দিয়া পিতামাতাকে আপ্যায়িত ও অশান্ত করিতে লাগিল—এমন-ভাবে দুই মাস, ছয় মাস অতিবাহিত হইল।

অবশেষে বিমাতা আসিলেন, তাঁহার সম্পর্কের যে কেহ ছিল, সেও আসিল—বন্ধু-বান্ধবে গৃহ পুরিয়া গেল।

তাহার পর, একদিন প্রভাতে, বাঁশি বাজাইয়া, ঢাকের প্রচণ্ড শব্দ করিয়া, কাঁসির খন্‌খন্‌ আওয়াজে সমস্ত গ্রাম পরিপূরিত করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া আসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রায়মহাশয়ও আর নাই, ব্রজরাজ লাহিড়ী ও স্বর্গে গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের বিমাতা স্বর্গীয় স্বামী-দত্ত সমস্ত সম্পত্তি টাকাকড়ি লইয়া পিতৃভবনে বাস করিতেছেন—আজকাল সুরেন্দ্রনাথের যেমন সুখ্যাতি, তেমনই অখ্যাতি। একদল লোক কহে, এমন বন্ধুবৎসল, উদারচেতা, অমায়িক ইয়ার-প্রতিপালক জমিদার আর নাই। অন্যদল কহে, এমন উৎপীড়ক, অত্যাচারী জমিদার এ-তলাটে কখনও জন্মায় নাই।

আমরা জানি এ দুইটা-কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের জন্য সত্য, দ্বিতীয়টা তাঁহার ম্যানেজার মধুরনাথবাবুর জন্য সত্য।—সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় আজকাল খুব একদল ইয়ার বসিতেছে। তাহারা পরম সুখে সংসারের সাথ মিটাইয়া লইতেছে। পান-তামাক, মদ-মাংস—কোন ভাবনা তাহাদিগকে করিতে হয় না। চাহিতেও হয় না—আপনি মুখে আসে।

ম্যানেজার মধুরবাবুর ইহাতে খুব উৎসাহ। খরচ যোগাইতে তিনি মুক্তহস্ত। কিন্তু এজন্য

জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না ; তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা সে ব্যয় বহন করে। মধুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার জো নাই। ঘর জ্বালাইতে, ভিটা-ছাড়া করিতে, কাছারিঘরের ক্ষুদ্র কুঠরিতে আবদ্ধ করিতে তাঁহার সাহস এবং উৎসাহের সীমা নাই।

প্রজার আকুল ক্রন্দন মাঝে মাঝে শান্তি দেবীর কর্ণে প্রবেশ করে। সে স্বামীকে অনুযোগ করিয়া কহে, তুমি নিজে জমিদারি না দেখলে সব যে জ্বলে পুড়ে যায়।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গে—তাইত, তাইত, এসব কথা কি সত্য?

সত্য নয়? নিন্দায় যে দেশ ভরে গেল—তোমারই কানে কেবল এসব পৌঁছায় না। চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার নিয়ে বসে থাকলে কি এসব কেউ শুনতে পায়? কাজ নেই অমন ম্যানেজার, দূর করে তাড়িয়ে দাও।

সুরেন্দ্র দুঃখিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া কহে, তাইত, কাল থেকে আমি নিজে সব দেখব। তাহার পর কিছুদিন জমিদারি দেখিবার তাড়া পড়িয়া যায়। মধুরনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠেন, গম্ভীরভাবে তখন কহেন, সুরেনবাবু, এমন করলে কি জমিদারি রাখতে পারবে?

সুরেন্দ্রনাথ শুদ্ধ হাসি হাসিয়া কহে, দুঃখীর রক্ত শুষে এমন জমিদারিতে কাজ কি মধুরবাবু?

তবে আমাকে বিদায় দাও, আমি চলে যাই।

সুরেন্দ্রনাথ অমনি নরম হইয়া যায়। তাহার পর যাহা ছিল, তাহাই হয়। সুরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা হইতে আর বাহির হয় না।

সম্প্রতি আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। বাগানবাটা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে নাকি এলোকেশী বলিয়া কে একটা মানুষ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। নাচিতে গাহিতে খুব মজবুত, দেখিতে-শুনিতেও মন্দ নয়। ভগ্ন-মধুচক্র মৌমাছির মত বৈঠকখানা ছাড়িয়া ঝাঁক ঝাঁকিয়া ইয়ারের দল সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ রাখিবার স্থান নাই ; সুরেন্দ্রনাথকেও তাহারা সেইদিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

আজ তিনদিন হইল—শান্তির স্বামিদর্শন ঘটে নাই। চারদিনের দিন সে স্বামীকে পাইয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, এতদিন ছিলে কোথায়?

বাগানবাড়িতে।

সেখানে কে আছে যে, তিনদিন ধরে পড়েছিলে?

তাইত—

সব কথায় তাইত। আমি সমস্ত শুনিছি—বলিতে বলিতে শান্তি কাদিয়া ফেলিল—আমি কি দোষ করেছি যে, আমাকে পায়ে ঠেলছ?

কৈ তা ত আমি—

আবার কি করে পায়ে ঠেলতে হয়? এর চেয়ে অপমান আমাদের আর কি আছে?

তাইত—তা ওরা সব—

শান্তি যেন সে কথা শুনিতে পাইল না। আরও কাদিয়া কহিল, তুমি স্বামী, আমার দেবতা! আমার ইহকাল! আমার পরকাল! আমি কি তোমাকে চিনি! আমি ত জানি, আমি তোমার কেউ নই, একদিনের জন্যও তোমার মন পাই না। এ যাতনা তোমাকে বলব কি! পাছে তুমি লজ্জা পাও, পাছে তোমার ক্রোধ হয়, তাই কোন কথা বলি না।

শান্তি, বে ? কাঁদ ?

কেন কাঁদ! অস্ত্রযমী জানেন। তাও বুঝতে পারি যে তুমি অস্ত্র কর না—তোমারও মনে ক্রোধ আছে—তুমি আর কি করবে? তাহার পর চক্ষু মুছিয়া বলিল, আমি আজীবন যাতনা পাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি জানতে পারি—

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া স্বহস্তে তাহার চক্ষু মুছিয়া সন্দেহে কহিল, তা হ'লে

কি কর, শান্তি?

এ কথার কি আর উত্তর আছে? শান্তি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুকাল পরে শান্তি কহিল, তোমার শরীরও আজকাল ভাল নেই।

আজ কেন, পাঁচ বছর থেকে নেই। যেদিন কলকাতায় গাড়িচাপা পড়েছিলাম, বৃকেপিঠে আঘাত পেয়ে একমাস শয্যায় পড়েছিলাম, সে অবধি শরীর ভাল নেই। সে ব্যথা কিছুতেই গেল না, মাঝে মাঝে নিজেই অশ্চর্য হই, কেমন করে বেঁচে আছি।

শান্তি তাড়াতাড়ি স্বামীর বৃকে হাত দিয়া বলিল, চল, দেশ ছেড়ে আমরা কলকাতায় যাই, সেখানে ভাল ডাক্তার আছে—

সুরেন্দ্র সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—তাই চল। সেখানে বড়দিদিও আছেন।

শান্তি বলিল, তোমার বড়দিদিকে আমারও বড় দেখতে ইচ্ছে করে, তাঁকে আনবে ত?

আনব বৈ কি! তাহার পর ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, নিশ্চয় আসবেন, আমি ম'রে যাছি শুনলে—

শান্তি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—তোমার পায়ে পড়ি, আর ওসব ব'লো না।

আহা, তিনি যদি আসেন ত আমার কোনো দুঃখই থাকে না।

অভিমাণে শান্তির বৃক পুড়িয়া গেল। এইমাত্র সে বলিয়াছিল, স্বামীর সে কেহ নহে। সুরেন্দ্র কিন্তু অত বুঝিল না। অত দেখিল না, যাহা বলিতেছিল, তাহাতে বড় আনন্দ হয়, কহিল, তুমি নিশ্চয় গিয়ে বড়দিদিকে ডেকে এনো, কেমন? শান্তি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল।

তিনি এলে দেখতে পাবে, আমার কোন কষ্ট থাকবে না।

শান্তির চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরদিন সে দাসীকে দিয়া মথুরাবাবুকে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, বাগানবাটিতে যাহাকে আনা হইয়াছে, এখন তাহাকে তাড়াইয়া না দিলে, তাহার আর ম্যানেজারের কাজ করিতে হইবে না। স্বামীকে শাসাইয়া বলিল, আর যাই হোক, তুমি বাড়ির বা'র হ'লে আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।

তাইত, ওঁর কিন্তু—

আমি 'কিন্তু'র ব্যবস্থা করছি। বলিয়া শান্তি দাসীকে পুনর্বার ডাকিয়া হুকুম দিয়া দিল—দরোয়ানকে ব'লে দে, যেন ঐ হতভাগারা আমার বাড়িতে না ঢুকতে পায়!

আর সুবিধা নাই দেখিয়া মথুরাবাবু এলোকেশীকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইয়ারদলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি চুটাইয়া জমিদারি দেখিতে মন দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের সম্প্রতি কলিকাতায় যাওয়া হইল না, বৃকের ব্যথাটা আপাততঃ কিছু কম বোধ হইতেছে। শান্তিরও কলিকাতা যাইতে তেমন উৎসাহ নাই। এখানে থাকিয়া যতখানি সম্ভব, সে স্বামীসেবার আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে একজন বিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া দেখাইল। বিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বৃকের অবস্থা যেমন আছে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই সম্ভব নহে।

অবসর বুঝিয়া ম্যানেজারবাবু যেরূপ কাজ দেখিতেছিলেন, তাহাতে গ্রামে গ্রামে দ্বিগুণ হাহাকার উঠিল। শান্তি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইত, কিন্তু স্বামীকে জানাইতে সাহস করিত না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বাটিতে ব্রজবাবুর স্থানে শিবচন্দ্র এখন কর্তা। মাধবীর পরিবর্তে নূতন বধু এখন গৃহিণী। মাধবী এখনও এখানে আছে। তাই শিবচন্দ্র স্নেহ-যত্ন করে, কিন্তু মাধবীর এখানে থাকিতে আর মন নাই। বাড়ির দাস-দাসী, সরকার-গোমস্তা, এখনো 'বড়দিদি' বলে, কিন্তু

সবাই বুঝে যে, আর একজনের হাতে এখন সিন্দুকের চাবি পড়িয়াছে। তাই বলিয়া শিবচন্দ্রের স্ত্রী যে মাধবীকে অবজ্ঞা বা অমর্যাদা করে তাহা নহে, কিন্তু সে এমন ভাবটি দেখাইয়া যায়, যাহাতে মাধবী বেশ বুঝিতে পারে যে, এই নূতন স্ত্রীলোকটির অনুমতি পরামর্শ ব্যতীত সব কাজ করা এখন আর তাহার মানায় না।

তখন বাপের আমল ছিল, এখন ভাইয়ের আমল হইয়াছে। কাজেই একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে। আগে আদর ছিল, আবদার ছিল—এখন আদর আছে, কিন্তু আবদার নাই। বাপের আদরে সে সর্বময়ী ছিল, এখন ‘আত্মীয়-কুটুম্বের’ দলে পড়িয়াছে।

এখন যদি কেহ বলেন যে, আমি শিবচন্দ্র কিংবা তাহার স্ত্রীর দোষ দিতেছি, সোজা করিয়া না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিন্দা করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। সংসারে যাহা নিয়ম, যে রীতি-নীতি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। মাধবীর যেন কপাল পড়িয়াছে, তাহার আপনার বলিবার স্থান নাই, তাই বলিয়া অপরে নিজের দখল ছাড়িবে কেন? স্বামীর দ্রব্যে স্ত্রীর অধিকার, এ কথা কে না জানে? শিবচন্দ্রের স্ত্রী কি শুধু এ কথা বুঝে না? শিবচন্দ্র নাহয় মাধবীর ভ্রাতা, কিন্তু সে মাধবীর কে? পরের জন্য সে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে কেন? মাধবী সব বুঝিতে পারে। বৌ যখন ছোট ছিল, তখন ব্রজবাবু বাঁচিয়া ছিলেন, তখন মাধবীর নিকট প্রমীলাতে ও তাহাতে প্রভেদ ছিল না। এখন কথার অনৈক্য হয়। সে চিরদিন অভিমানিনী, তাই সে সকলের নীচে। কথা সহিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে কথা সহে না। যেখানে তার জোর নাই সেখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়। মনে দুঃখ পাইলে নীরবে সহিয়া যায়—শিবচন্দ্রকে কিছুই বলে না। স্নেহের দোহাই দেওয়া তাহার অভ্যাসের বাহিরে তাই আত্মীয়তার ধূয়া ধরিয়া অধিকার কায়েম করিতে, তাহার সমস্ত শরীরে মনে থিক্কার উঠে। সামান্য স্ত্রীলোকের মত ঝগড়া-কলহে তাহার যে কত ঘৃণা তাহা শুধু সে-ই জানে।

একদিন শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, দাদা, আমি ঋগ্‌শুরবাড়ি যাব। শিবচন্দ্র বিস্মিত হইল।—সে কি মাধবী, সেখানে ত কেউ নেই!

মাধবী ‘মুত স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, ছোট ভাগ্নে কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে আছে, তাকে নিয়ে আমি গোলাগায়ে বেশ থাকব।

পাবনা জেলার গোলাগায়ে মাধবীর ঋগ্‌শুরবাড়ি। শিবচন্দ্র অল্প হাসিয়া বলিল, তা কি হয়, সেখানে যে তোর বড় কষ্ট হবে।

কেন কষ্ট হবে দাদা? বাড়িটা এখনো প’ড়ে যায়নি। দু’বিঘা দশ বিঘা জমি-জিরাতও আছে, একটি বিঘবার কি তাতে চলে না?

চলার কথা নয়। টাকার ভাবনা নেই, কিন্তু তোর যে বড় কষ্ট হবে মাধবী!

কষ্ট কিছুই নয়।

শিবচন্দ্র কিছু ভাবিয়া বলিল, কেন যাবি বোন? আমাকে সব খুলে বল দেখি, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।—ইতিপূর্বে শিবচন্দ্র বোধ হয় স্ত্রীর নিকট ভগিনীর বিরুদ্ধে কিছু গুনিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তাহাই মনে হইয়াছিল। লজ্জায় মাধবীর সমস্ত মুখ রাস্তা হইয়া উঠিল। সে বলিল, দাদা, তুমি কি মনে কর, আমি ঝগড়া করে তোমার বাড়ি থেকে যাব?

শিবচন্দ্র বড় লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, না না, তা নয়। আমি ও-কথা বলিনে, কিন্তু এ বাড়ি চিরদিনই তোমার, আজ কেন তবে চলে যেতে চাও?

যুগপৎ দুই জনেরই সেই স্নেহময় পিতার কথা মনে পড়িল। দুই জনের চক্ষেই জল দেখা দিল। চোখ মুছিয়া মাধবী বলিল, আবার আসব। তোমার ছেলের যখন পৈতা হবে, তখন নিয়ে এস। এখন যাই!

সে ত আট-দশ বছরের কথা।

যদি বেঁচে থাকি, তা হ'লে আসব।

কোনরূপেই মাধবী এখানে থাকিতে সম্মত হইল না, যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নূতনবৌকে সংসার বুঝাইয়া দিল, দাস-দাসীকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিল। শেষ দিনটিতে শিবচন্দ্র অক্ষপূর্ণ-চক্ষে ভগিনীর কাছে আসিয়া বলিল, মাধবী, তোর দাদা কখনো 'ত' তোকে কিছু বলেনি? মাধবী হাসিল, বলিল—সে কি কথা দাদা?

তা নয়; যদি কোন অশুভক্ষণে, যদি কোনদিন মুখ থেকে অসাবধানে কিছু—

না দাদা, সে-সব কিছু নয়।

সত্যি কথা?

সত্যি!

তবে যা। তোর নিজের বাড়ি যেতে আর মানা করব না। যেখানে ভাল লাগে—। তবে সর্বদা সংবাদ দিতে ভুলিস নি।

প্রথমে মাধবী কাশী গিয়া ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইল, তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া গোলাগাঁয়ে আসিয়া এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে স্বামী-ভবনে প্রবেশ করিল।

তখন গোলাগাঁয়ে চাটুয়ে মহাশয়ের বড় বিপদ ঘটিল। তিনি এবং যোগেন্দ্রের পিতা উভয়ে বড় বন্ধু ছিলেন। তাই মৃত্যুকালে যোগেন্দ্র যে কয় বিঘা জমি-জায়দাদ ছিল, তাহারই হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবিতকালে, তিনি যে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, যোগেন্দ্র সে সকলের বিশেষ কোন সংবাদও লইত না। শ্বশুরমহাশয়ের অনেক টাকা, তাই এই ক্ষুদ্র পিতৃ-দত্ত বৈয়াক্তিক তাহার যত্নের বাহিরে ছিল। তাহার পর সে মরিবার পর চাটুয়ে মহাশয় ন্যায় অধিকারে বিনা বাধায় সে-সকল ভোগদখল করিতেছিলেন। এখন বিধবা মাধবী এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সৃশঙ্কল নিয়মবদ্ধ পাতা সংসারে গোলমাল বাধাইয়া দিল। সুতরাং, চাটুয়ে মহাশয়ের ইহা অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল, এবং মাধবী যে হিংসা করিয়াই এমনটি করিয়াছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, তাইত বৌমা, তোমার দু' বিঘা যে জমি আছে, তার দশ বৎসরের খাজনা মায় সুদসুদ্ধ একশত টাকা বাকি আছে, সেটা না দিলে জমি নিলাম হবার মত হয়েছে। মাধবী ভাগিনেয় সন্তোষকুমারকে দিয়া বলাইল যে, টাকার জন্য চিন্তা নাই এবং অবিলম্বে একশত টাকা বাহিরে পাঠাইয়া দিল। অবশ্য এ টাকা চাটুয়ে মহাশয়ের অন্য কাজে লাগিল।

মাধবী কিন্তু এত সহজে ছাড়িবার লোক নহে, সে সন্তোষকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, শুধু দুই বিঘা জমির নির্ভর করিয়া তাহার স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না, সুতরাং বাকী যেসব জমি-জায়গা আছে, তাহা কোথায় এবং কাহার নিকট আছে?

চাটুয়ে মহাশয় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিলেন যে, তাহা সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিছু বা বন্দোবস্ত আছে। এই আট-দশ বছর ধরিয়া জমিদারের খাজনা না দিলে জমি-জায়গা কিরূপে থাকা সম্ভব?

মাধবী কহিল, জমির কিছু কি উপস্থিত হইত না যে, এই কয়টা টাকা খাজনা দেওয়া হয় নাই? আর যদি যথার্থই বিক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কে বিক্রয় করিয়াছে, এবং এখন কাহার নিকট আছে, সংবাদ পাইলে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যায়। কাগজপত্রই বা কোথায়? চাটুয়ে মহাশয় অবশ্য কিছু জবাব দিয়াছিলেন কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ বিড়বিড় করিয়া কত কি বকিলেন, তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া, নামাবলি কোমরে জড়াইয়া একখানা থান কাপড় গামছায় বাঁধিয়া লইয়া জমিদারবাবুর কাছারি লালতা-গাঁ অভিমুখে রওনা হইলেন। এই লালতা-গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বাটী, এবং ম্যানেজার মথুরবাবুর কাছারি। ব্রাহ্মণ আট-দশ ক্রোশ বরাবর হাঁটিয়া একেবারে মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—দোহাই বাবা, গরীব ব্রাহ্মণকে বুঝি পথে পথে ভিক্ষে করে খেতে হয়।

এমন ত অনেকে আসে! মথুরাবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, হয়েছে কি?

বাবা, যক্ষে কর।

কি হয়েছে তোমার?

বিধু চাটুয্যে তখন মাধবী-দত্ত একশত টাকা দক্ষিণা হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি ধর্মান্তার, আপনি না রক্ষা করলে আমার সর্বস্ব যায়!

আচ্ছা, খুলে বল।

গোলাগায়ের রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধু কোথা থেকে এতদিন পরে ফিরে এসে, আমার সমস্ত দখল করতে চায়।

মথুরাবাবু হাসিলেন—সে তোমার সমস্ত দখল করতে চায়, না, তুমি তাব সর্বস্ব দখল করতে চাও—কোনটা?

ব্রাহ্মণ তখন হাতে পৈতা জড়াইয়া ম্যানেজারের হাত চাপিয়া ধরিলেন—আমি যে এই দশ বছর থেকে সরকারের খাজনা যুগিয়ে আসছি?

জমি ভোগ করচ, খাজনা দেবে না?

দোহাই আপনার—

ভাবটা মথুরাবাবু বেশ বুঝিলেন—বিধবাকে ফাঁকি দিতে চাও ত? ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

কয় বিঘা জমি?

পঁচিশ বিঘা।

মথুরাবাবু হিসাব করিয়া বলিলেন, অন্ততঃ তিন হাজার টাকা। জমিদার কাছারিতে কি সেলামি দেবে?

যা হুকুম হবে তাই,—তিন শ' টাকা।

তিন শ' টাকা দিয়ে তিন হাজার টাকা নেবে? আমার দ্বারা কিছু হবে না।

ব্রাহ্মণ শুষ্কচক্ষে জল বাহির করিয়া বলিল, কত টাকা হুকুম হয়?

এক হাজার দিতে পারবে?

তাহার পর গোপনে বহুক্ষণ ধরিয়া দু'জনে পরামর্শ হইল, ফল এই দাঁড়াইল যে, 'যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকী খাজনা বাবদ দশ বৎসরের সুদে-আসলে দেড়সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল। কিন্তু মাধবীর নিকটে তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রী হইয়া গেল, এবং দেড়-মাস পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে বাকী খাজনার দায়ে জমিদার সরকার হইতে তাহার মায় বাটীসুদ্ধ নিলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।

মাধবী একজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিল, তোমাদের দেশ কি মগের মুদ্রুক?

কেন বল দেখি?

তা নয় ত কি? একজন ঠিকিয়ে আমার সর্বস্ব নিতে চায়, তোমরা দেখচ না?

সে বলিল, আমরা আর কি করব? জমিদার যদি নিলাম করে, আমরা দুঃখী লোক তাতে কি করতে পারি?

তা যেন হ'ল, কিন্তু আমার বাড়ি নিলাম হবে, আর আমাকে সংবাদ নেই? কেনম তোমাদের জমিদার?

সে তখন সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল, এমন উৎপীড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার, এ দেশে কেহ কখনও পূর্বে শ্রবণে নাই। সে আরও কত কি কহিল। এ যাবৎ যাহা কিছু শ্রোতৃপুরুষেরা অধঃগত ছিল, সমস্ত একে একে খুলিয়া বলিলে, মাধবী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'জমিদারবাবুর সঙ্গে' নিজে দেখা করলে হয় না? ভাগিনেয় সম্ভাবকুমারের জন্য মাধবী

তাহাও করিতে স্বীকৃত ছিল।

সে তখন কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু কথা দিয়া গেল যে, কাল তাহার বোনপোর নিকট সব কথা ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়া বলিবে। তাহার বোনপো দুই-তিনবার লালতাগ্রামে গিয়াছিল; জমিদার সরকারের অনেক কথা সে জানিত। এমন কি, সেদিন সে বাগানবাড়িতে এলোকেশীর সংবাদ পর্যন্ত শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর মাসিমা তা যখন সে মুখখানা যথাসম্ভব গভীর করিয়া বলিল, এই বিধবা পুত্রবধূটির বয়স কত?

মাসিমা তা বলিল, কুড়ি-একুশ হবে।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, দেখতে কেমন?

মাসিমা তা কহিল, পরীর মত।

তখন সে মুখভঙ্গী-সহকারে কহিল, দেখা করলে কাজ হ'তে পারে; কিন্তু আমি বলি, তিনি আজ রাখেই নৌকা ভাড়া ক'রে বাপের বাড়ি প্রস্থান করুন।

কেন রে?

এই যে বলচ—সে দেখতে পরীর মত।

কেন, তাতে কি?

তাতেই সব। দেখতে পরীর মত হলে জমিদার সুরেন রায়ের কাছে রক্ষে নেই।

মাসিমা তা গালে হাত দিলেন,—বলিস কি, এমন!

বোনপো মৃদু হাসিয়া কহিল, হাঁ, এমন। দেশসুদ্ধ লোক এ কথা জানে।

তবে ত দেখা করা উচিত নয়?

কিছুতেই নয়।

কিন্তু বিষয়-আশয় যে সব যাবে!

চাটুয়ে মহাশয় যখন এর ভিতর আছেন, তখন বিষয়ের আশা নেই। তার উপর গৃহস্থঘরের মেয়ে—ধর্মটাও কি যাবে?

পরদিন তিনি মাধবীকে সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। জমিদার সুরেন রায়ের কথা সে সমস্ত দিন চিন্তা করিল। মাধবী ভাবিল, সুরেন রায়! নামটি বড় পরিচিত, কিন্তু লোকটির সহিত ত মিলিতেছে না। এ নাম সে কত দিন মনে মনে ভাবিয়াছে। সে আজ পাঁচ বৎসর হইল। ডুলিয়া ছিল, —আবার বহুদিন পরে মনে পড়িল।

স্বপ্নে ও নিদ্রায় মাধবীর সে রাত্রি বড় দুখে কাটিল। অনেকবার পুরানো কথাগুলো মনে পড়িতেছিল, অনেকবার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। সন্তোষকুমার তাহার মুখপানে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, মামীমা, আমি মা'র কাছে যাব।

মাধবী নিজেও কয়েকবার এ কথা ভাবিতেছিল, কেননা, এখানকার বাস যখন উঠিয়াছে, তখন কাশীবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। সন্তোষের জন্য সে জমিদারের সহিত দেখা করিবে মনে করিয়াছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিবেদন করিতেছে। তা ছাড়া এখন যেখানেই সে যাক, একটা নুতন ভাবনা, একটা নুতন উপসর্গ হইয়াছে। সেটা এই রূপ-যৌবনের কথা! মাধবী মনে করিল, এগুলো তাহার মনে পড়ে নাই, মনে করাইয়া দিতে কেহ ছিল না। স্বামী মরিবার পর যখন বাপের বাড়ি ফিরিয়া গেল, তখন সকলে ডাকিল, 'বড়দিদি', সবাই ডাকিল 'মা'! এই সম্মানের ডাকগুলি তাহার মনকে আরও বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ছাই রূপ-যৌবন! যেখানে তাহাকে বড়দিদির কাজ করিতে হইত, জননীর স্নেহ-যত্ন বিলাহিতে হইত, সেখানে কি এসব কথা মনে থাকে! মনে ছিল না, মনে পড়িয়াছে, তাই ভাবনাও হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই 'যৌবন'ের উল্লেখটা! লজ্জায় মলিন হাসি হাসিয়া কহিল, এখানকার লোকগুলো কি অন্ধ, না পশু! কিন্তু মাধবী ভুল করিয়াছিল—সকলেরই মন তাহার মত একুশ-বাইশ বছরে বৃদ্ধ হইয়া যায় না।

ইহার তিনদিন বাদে যখন জমিদারের শিয়াদা তাহার দ্বারপথে আসন করিয়া বসিল এবং হাঁক-ডাক করিয়া গ্রামবাসীকে জানাইতে লাগিল যে, সুরেন রায় আর একটা নূতন কীর্তি করিয়াছে, তখন মাধবী সন্তোষের হাত ধরিয়া দাসীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল।

বাটার অদূরেই নদী ; মাঝিকে কহিয়া দিল, সোমরাপুরে যাইতে হইবে। একবার প্রমীলাকে দেখিয়া যাইতে হইবে।

গোলাগাঁ হইতে পনের ক্রোশ দূরে সোমরাপুরে প্রমীলার বিবাহ হইয়াছিল। আজি এক বৎসর হইতে সে স্বশ্রুত করিতেছে। সে হয়ত কলিকাতায় যাইবে, কিন্তু মাধবী তখন কোথায় থাকিবে? তাই একবার দেখা করা।

সকালবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়া চলিল ; বাতাস অনুকূল ছিল না, তাই ধীরমহুর গমনে ক্ষুদ্র নৌকা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া, শিয়াকুল ও বেতঝোপের কাঁটা বাঁচাইয়া, শরবাড়ি চেলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। সন্তোষকুমারের আনন্দ ধরে না। সে ছইয়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা ও ডগা ছিড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাঝিরা কহিল, বাতাস না থামিলে, কাল দুপুর পর্যন্ত নৌকা সোমরাপুরে লাগিবে না।

আজ মাধবীর একাদশী, কিন্তু সন্তোষকুমারের জন্য কোথাও পালি বাঁধিয়া, পাক করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইবে। মাঝি কহিল, দিল্লোপাড়ার গঞ্জে নৌকা বাঁধিলে বেশ সুবিধা হইবে, সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়।

দাসী কহিল, তাই কর বাপু, যেন দশটা-এগারটার মধ্যে ছেলোটো খেতে পায়।

নবম পরিচ্ছেদ

কার্তিক মাস যায় যায়। একটু শীত পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের উপরের ঘরে জানালার ভিতর দিয়া প্রাতঃসূর্যালোক প্রবেশ করায় বড় মধুর বোধ হইতেছে। জানালার কাছে অনেকগুলি বাঁধা-খাটা ও কাগজপত্র লইয়া টেবিলের এক পাশে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন ; আদায়-উসুল, বাকি-বকেয়া, জমা-খরচ, বন্দোবস্ত, মামলা-মকদ্দমার নথীপত্র সব একে একে উন্টাইয়া দেখিতেছিলেন। এসব দেখাশুনা একরকম আবশ্যিকও হইয়া পড়িয়াছিল এবং না হইলে সময়ও কাটে না। শান্তির সহিত এ জন্য অনেকখানি ঝগড়া করিতে হইয়াছিল। অনেক করিয়া তবে তাহাকে সে বুঝাইতে পারিয়াছিল যে, অন্ধরের পানে চাহিলেই মানুষের বুকের ব্যথা বাড়িয়া যায় না, কিংবা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। অগত্যা শান্তি স্বীকার করিয়াছে এবং আবশ্যিকমত সাহায্যও করিতেছে।

আজকাল স্বামীর উপর তাহার পুরা অধিকার—তাহার একটি কথাও অমান্য হয় না। কোন দিনই হয় নই, শুধু পাঁচজন হতভাগা ইয়ার-বন্ধু মিলিয়া দিন-কতক শান্তিকে বড় দুঃখ দিয়েছিল। ত্রীর আদেশে সুরেন্দ্রের বাহির-বাটীতে পর্যন্ত যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শ ও উপদেশ শান্তি প্রাণপণে খাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছে।

এইমাত্র সে কাছে বসিয়া রাজা ফিতা দিয়া কাগজের বাণ্ডিল বাঁধিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ একখানা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সহসা ডাকিলেন, শান্তি!

শান্তি কোথায় গিয়াছিল—কিছুক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকছিলে?

হাঁ, আমি একবার কাছারিঘরে যাব।

না। কি চাই বল, আমি আনিয়া দিচ্ছি।

কিছু চাই না, একবার মধুরবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

তাকে ডাকিয়ে পাঠাই, তোমাকে যেতে হবে না। কিন্তু, এমন সময় তাঁকে কেন?

ব'লে দেব যে অগ্রহায়ণ মাস থেকে তাঁকে আর কাজ করতে হবে না।

শান্তি বিস্মিত হইল ; কিন্তু সঙ্কট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তাঁর অপরাধ?

অপরাধ যে কি, তা এখন ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছেন। তাহার পর আদালতের সার্টিফিকেট ও কয়েকখানা কাগজপত্র দেখাইয়া কহিলেন, এই দেখ, গোলাগায়ে একজন বিধবার ঘর-বাড়ি সমস্ত বেনামী নীলামে খরিদ ক'রে নিয়েচে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেনি।

শান্তি দুঃখিত হইয়া কহিল, আহা বিধবা? তবে এ কাজটা ভাল হয়নি—কিন্তু বিক্রি হ'ল কেন?

দশ বৎসরের খাজনা বাকি ছিল ; সুদে-আসলে দেড়-হাজার টাকার নালিশ হয়েছিল। কহিল, তা ম্যানেজাররাবুর বা শেষ কি? অত টাকা কেমন ক'রে ছেড়ে দেন?

সুরেন্দ্রনাথ অনামনক হইয়া ভাবিতে লাগিল। শান্তি প্রশ্ন করিল, অত টাকা ছেড়ে দেবে?

দেব না ত কি, অসহায় বিধবাকে বাড়ি-ছাড়া করব? তুমি কি পরামর্শ দাও?

কথাটার ভিতর যতটুকু জ্বালা ছিল, সবটুকু শান্তির গায়ে লাগিল। অপ্রতিভ হইয়া দুঃখিতভাবে সে বলিল, না, বাড়ি-ছাড়া করতে বলি না। আর তোমার টাকা তুমি দান করবে, আমি তাতে বাধা দেব কেন?

সুরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, সে নয় শান্তি, আমার টাকা কি তোমার নয়? কিন্তু বল দেখি, আমি যখন না থাকব, তখন তুমি—

ও কি কথা:-

তুমি—আমি যা ভালবাসি, তা করবে ত?

শান্তির চোখে জল আসিল, কেন না, স্বামীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, বলিল, ও কথা কেন বল?

বড় ভাল লাগে, তাই বলি। তুমি, আমার কথা, আমার সাথ-ইচ্ছা জেনে রাখবে না শান্তি? শান্তি চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাথা নাড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, আমার বড়দিদির নাম।

শান্তি অঞ্চল সরাইয়া সুরেন্দ্রর মুখপানে চাহিল।

সুরেন্দ্র একখানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, এই দেখ, আমার বড়দিদির নাম।

কোথায়?

এই দেখ, মাধবী দেবী যাঁর বাড়ি নীলাম হয়েছে।

একমুহুর্তে শান্তি অনেক কথা বুঝিল। কহিল, তাই বুঝি সমস্ত ফিরিয়ে দিতে চাইছ?

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, তাই হ'লে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেব—সমস্ত—সব!

মাধবীর কথায় শান্তি একটু দুঃখিত হইয়া পড়িল ; ভিতরে বোধ হয় একটু হিংসার ভাব ছিল। কহিল, তিনি হয় ত তোমার বড়দিদি নন। শুধু মাধবী নাম আছে। নামেতেই এই!

বড়দিদির নামের একটু সম্মান করব না?

তা কর, কিন্তু তিনি নিজে কিছু জানতে পারবেন না।

তা পারবেন না—কিন্তু আমি কি অসম্মান করতে পারি?

নাম ত এমন কত লোকের আছে।

আছে! তুমি দুর্গা নাম লিখে তাতে পা দিতে পার?

ছি! ও-কি কথা? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে—

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, ঠাকুর-দেবতার নাম নাই নিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, যদি একটি কাজ করতে পার।

শান্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল, কি কাজ?

সেয়ালের গারে সুরেন্দ্রনাথের একটি ছবি ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই ছবিটি যদি—

কি?

চারিজন ব্রাহ্মণ দিগে নদীর তীরে পোড়াতে পার।

অদূরে বজ্রাঘাত হইলে লোকের যেমন প্রথমে সমস্ত রক্ত নিমেষে সরিয়া যায়, মুখখানা সর্পদন্ত রোগীর মত নীলবর্ণ হইয়া থাকে, শান্তির প্রথমে সেইরূপ অবস্থা হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখে চোখে রক্ত ফিরিয়া আসিল—তাহার পর করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত শাস্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া রাজার অর্ধেক রাজস্ব মানত করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, এই বড়দিদি যিনিই হউন, ইহার সম্বন্ধে সে আর কোন কথা কহিবে না। তাহার পরে ঘরে দ্বার দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে অশ্রুমেদন করিল। এ জীবনে এমন কটু কথা সে আর কখনও শোনে নাই!

সুরেন্দ্রনাথও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন,— কাছারিঘরে মথুরাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলাগাঁয়ে কার সম্পত্তি নিলাম হয়েছে?

মৃত রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূর।

কেন?

দশ বছরের মাল-গুজারি বাকি ছিল।

কই খাতা দেখি?

মথুরানাথ প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তাহার পর কহিল, খাতা-পত্র এখনও পাবনা থেকে আনা হয়নি।

আনতে লোক পাঠাও। বিধবাব থাকবাব স্থানটুকু পর্যন্ত রাখোনি?

বোধ হয় নেই।

তবে সে কোথায় থাকবে?

মথুরানাথ সাহস সঙ্কয় কবিয়া কহিল, এতদিন যেখানে ছিল, সেখানে থাকবে বোধ হয়।

এতদিন কোথায় ছিল?

কলিকাতায়। তাহার পিতার বাটিতে।

পিতার নাম কি জান?

জানি। ব্রজরাজ লাহিড়ী।

বিধবার নাম?

মাধবী-দেবী।

নতমুখে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মথুরানাথ ভাবগতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হ'ল?—সুরেন্দ্রনাথ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, একটা ভাল ঘোড়া, শীঘ্র জিন কবিত্তে বল—আমি এখন গোলাগাঁয়ে যাব। এখন থেকে গোলাগাঁ কতদূর জান? প্রায় দশ ক্রোশ।

এখন ন'টা বেজেছে—একটার মধ্যে পৌছিতে পারব।

ঘোড়া আসিলে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া কহিলেন, কোন্ দিকে?

উত্তর দিকে, পূর্ব পশ্চিমে যেতে হবে।

তাহার পর চাবুক খাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ কথা শুনিয়া শান্তি ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিল,—ঠাকুর, এই তোমার মনে ছিল! আর কি ফিরে পাব!—তাহার পর দুজন পাইক ঘোড়ায় চড়িয়া গোলাগাঁ উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। জানালা দিয়া তাহা দেখিয়া শান্তি ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল—মা দুর্গা! জোড়া

মোব দেব—যা চাও, তাই দেব—টাকে ফিরিয়ে দাও—বুক চিরে রক্ত দেব—যত চাও—
হে মা দুর্গা, যত চাও—যতক্ষণ না তোমার পিপাসা মিটে।

গোলাগাঁ নৌছিতে আর দুই ক্রোশ আছে। অশ্বের স্কুর পর্যন্ত কেনায় ভরিয়া গিয়াছে।
প্রাণপণে ধূলা উড়াইয়া, আল ডিঙ্গাইয়া, খানা টপকাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর
প্রচণ্ড সূর্য।

ঘোড়ার উপর থাকিয়াই সুরেন্দ্রের গা-বমি-বমি করিয়া উঠিল ; ভিতরের প্রত্যেক নাড়ী
যেন ছিড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহার পর টপ করিয়া ফোঁটাদুই-তিন রক্ত কব বহিয়া
ধূলিধূসরিত। পিরানের উপর পড়িল ; সুরেন্দ্রনাথ হাত দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। একটার
পূর্বেই গোলাগাঁয়ে উপস্থিত হইলেন। পথের ধারে দোকানে জিন্সাসা করিলেন, এই গোলাগাঁ?
হাঁ।

রামতনু সান্যালের বাটা?

এ দিকে।

আবার ঘোড়া ছুটিল। অল্পক্ষণে বাঙ্কিত বাটার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারেই একজন সিপাহী বসিয়াছিল ; প্রভুকে দেখিয়া সে প্রশ্নাম করিল।

বাটিতে কে আছেন?

কেউ না।

কেউ না? কোথায় গেলেন?

ভোরের নৌকা করে চলে গেছেন।

কোথায়—কোন পথে?

দক্ষিণ দিকে।

নদীর ধারে ধারে পথ আছে? ঘোড়া দৌড়তে পারবে?

বলতে পারি না। বোধ হয় নেই।

পুনর্বীর ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। ক্রোশ-দুই আসিয়া আর পথ নাই। ঘোড়া চলে না। ঘোড়া
ছাড়িয়া দিয়া তখন সুরেন্দ্রনাথ পদব্রজে চলিলেন। একবার চাহিয়া দেখিলেন—জামার উপর
অনেক ফোঁটা রক্ত ধূলায় জমিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠ বাহিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। নদীতে নামিয়া
অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন, তার পর প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে আর জুতা নাই—
সর্বাসে কাদা, মাঝে শোণিতের দাগ! বৃকের উপর কে যেন রক্ত ছিটাইয়া দিয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিল। পা আর চলে না—যেন এইবার শুইতে পারিলেই জন্মের মত
ঘুমাইয়া পড়িবে—তাই যেন অস্তিম শয্যায় এই জীবনের মহা-বিশ্রামের আশায় সে উন্মত্তের
মত ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দেখে যতটুকু শক্তি আছে, সমস্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষশয্যা
আশ্রয় করিবে, আর উঠিবে না!

নদীর বাকের পাশে—একখানা নৌকা না? কলমীশাকের দল কাটিয়া পথ করিতেছে!
সুরেন্দ্র ডাকিল, ‘বড়দিদি’! শুদ্ধকণ্ঠে শব্দ বাহির হইল না—ওধু দুই ফোঁটা রক্ত বাহির হইল।

‘বড়দিদি’—আবার দুই ফোঁটা রক্ত।

কলমীর দল নৌকার গতি রোধ করিতেছে। সুরেন্দ্র কাছে আসিয়া পড়িল।

আবার ডাকিল, ‘বড়দিদি’।

সমস্ত দিনের উপবাস ও মনঃকণ্ঠে মাধবী নির্জীবের মত নিম্নিত সন্তোষকুমারের পার্শ্বে চক্ষু
মুদ্রিয়া শুইয়াছিল। সহসা কানে শব্দ পৌছিল ; পুরাতন পরিচিত স্বরে—কে ডাকে না!

মাধবী উঠিয়া বসিল। ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। সর্বাসে ধূলা-কাদা-মাখা—
মাস্টারমহাশয় না?

ও নয়নভার্য মা, মাঝিকে শীগগির নৌকা লাগাতে বল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে কাদার উপর শুইয়া পড়িতেছিলেন।

সকলে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিয়া আনিла। মুখে চোখে জল দিল। একজন মাঝি চিনিও, সে कहিল, লালতাগাঁয়ের জমিদার। মাধবী ইট-কবচ সূক্ত বর্ণহার কষ্ট হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, লালতাগাঁয়ে এই রাত্রে পৌছিতে পার? সবাইকে এক-একটা হার দেব।—সোনার হার দেখিয়া তাহাদের মধ্যে তিনজন গুণ ঘাড়ে লইয়া নাখিয়া পড়িল।—মাঠাকরন, চাঁদনি রাতে ; ভোর নাগাদ পৌছে দেব।

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মাধবীর মুখে এখন অবগুষ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিরদংশ অন্ধলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র कहিল, তুমি বড়দিদি?—অঞ্চল দিয়া মাধবী সমস্ত তাহার গুষ্ঠ-সংলগ্ন রক্তবিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

তুমি বড়দিদি?

আমি মাধবী।

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুছিয়া মৃদুরে বলিলেন, আঃ—তাই!

বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকহিয়া ছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। অথরের কোণে সরস হাসি তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—বড়দিদি, যে কষ্ট!

ভগ্নভঙ্গ ছলছল করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। ছইয়ের ভিতর সুরেন্দ্রের মুখের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। নয়নতারার মা একটা ভাঙ্গা পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে कहিলেন, কোথায় যাচ্ছিলে?

মাধবী ভগ্নকণ্ঠে कहিল, প্রবীলার স্বপ্নরবাড়ি।

ছিঃ—এমন করে কি কুটুমের বাড়ি যেতে আছে দিদি?

দশম পরিচ্ছেদ

নিজের অট্টালিকায়, তাহার শয়নকক্ষে, বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আছে। পা-দুটি শান্তি কোলে করিয়া অন্ধজলে খুঁইয়া দিতেছে। পাবনায় বতগুলি ডাক্তার-কবিরাজ সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমেও রক্ত বন্ধ করিতে পারিতেছে না। পাঁচ বৎসর পূর্বেকার সেই আঘাতে এখন রক্ত-বমন করিতেছে।

মাধবীর অন্তরের কথা তুলিয়া বলিতে পারিব না। আমি নিজেও ভাল জানি না, বোধ করি, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ি ছইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর কিরাইতে পারে নাই ; পাঁচ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে কিরাইয়া আনিয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখের পানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন গুলিতে না পায়—হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, বড়দিদি, সেদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলে। আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিচ্ছিলামকেমন, শোধ হ'ল ত?

মুহুর্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুপ্ত-মস্তক সুরেন্দ্রের স্বপ্নের পার্শ্বে রাখিল,—যখন জ্ঞান হইল, তখন বাগীচের ফ্রন্টনের রোল উঠিয়াছে।



বিরাজবৌ

এক

হগলি জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাশ্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাশ্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্তন গাইতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি ছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনই একটা অখ্যাতিও ছিল। কিন্তু ছোটভাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে শ্রমকর্ম এবং কৃষ। মানুষ মরিয়াছে শুনিলেই তাহার সন্ধ্যার পর গা ছম্‌ছম করিত। দাদার মত অমন মুখও নয়, গোঁয়ারতুমির ধার দিয়াও সে চলিত না। সকালবেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হগলির আদালতের পশ্চিমদিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জি লিখিয়া যা উপার্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিয়া সেগুলি বাস্তবে বন্ধ করিয়া ফেলিত। রাগের ঘরের দরজা-জানালা বহুস্তে বন্ধ করিত এবং ক্রীকে দিয়া পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করাইয়া লইয়া তবে ঘুমাইত।

আজ সকালে নীলাশ্বর চণ্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার অনুঢ়া ভগিনী হরিমতি নিঃশব্দে আসিয়া পিঠের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাশ্বর হাঁকাটা দেওয়াতে ঠেস দিয়া রাখিয়া আশ্বাস করিয়া এক হাত তাহার বোনের মাথার উপর রাখিয়া, স্নেহে কহিল, সকালবেলাই কান্না কেন দিদি?

হরিমতি মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাখাইয়া দিতে দিতে জানাইল যে, বৌদি গাল টিপিয়া দিয়াছে এবং ‘কানী’ বলিয়া গাল দিয়াছে।

নীলাশ্বর হাসিয়া বলিল, তোমাকে ‘কানী’ বলে? অমন দুটি চোক থাকতে যে কানী বলে, সে-ই কানী। কিন্তু গাল টিপে দেয় কেন?

হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিছিমিছি।

মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি, বলিয়া বোনের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, বিরাজবৌ?

বড়বধূর নাম বিরাজ। তাহার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সকলে বিরাজবৌ বলিয়া ডাকিত। এখন তাহার বয়স উনিশ-কুড়ি। শাশুড়ীর মরণের পর হইতে সে গৃহিণী। বিরাজ অসামান্য সুন্দরী। চার-পাঁচ বছর পূর্বে তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সেই অবধি সে নিঃসন্তান। রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল, স্বামীর ডাকে বাহিরে আসিয়া ভাইবোনকে একসঙ্গে দেখিয়া জুলিয়া উঠিয়া বলিল, পোড়ামুখী আবার নালিশ করতে গিয়েছিলি?

নীলাশ্বর বলিল, কেন যাবে না? তুমি ‘কানী’ বলেচ, সেটা তোমার মিছে কথা। কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন?

বিরাজ কহিল, অত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জল দেওয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচে। আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। ওকে মারা উচিত।—নীলাশ্বর বলিল, না। ঝিকে গয়লা-বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি দিদি, হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন? ও কাজটা ত তোমার নয়।

হরিমতি দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনে করেছি দুধ দোয়া হয়ে গেছে।

আর কোন দিন মনে ক'রো! বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীলাশ্বর হাসিয়া বলিল, তুমিও একদিন ওর বয়সে মায়ের পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে

মনে করেছিলে, ঝাঁচার পাখি উড়তে পারে না। মনে পড়ে?

বিরাজ কিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, পড়ে, কিন্তু ও বসয়ে নয়—আরও ছোট ছিলাম। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, চল না! দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি আম পাকল কি না।

তাই চল দিদি।

যদু চাকর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, নারায়ণ ঠাকুরদা বসে আছেন।

নীলাক্ষর একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, এর মধ্যেই এসে বসে আছেন?

রামাখরের ভিতর হইতে বিরাজ এ কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া চোঁটাইয়া বলিল, যেতে বলে দে খুড়োকে। স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, সকালবেলাতেই যদি ও-সব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কি-সব হচ্ছে আজকাল!

নীলাক্ষর জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভগিনীর হাত ধরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায় সরস্বতী নদীর মৃদু স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্বাঙ্গ শৈবালে পরিপূর্ণ; শুধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশেপাশে শৈবালমুক্ত অগভীর তলদেশের বিভক্ত শুষ্কগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের মত সূর্যালোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীরে এককণ্ড কালো পাথর সমীপস্থ সমাধিস্থূপের প্রাচীরগাত্র হইতে কোন এক অতীত দিনের বর্ষার খরস্রোতে স্থলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। এ বাড়ির বধুরা প্রতিসন্ধ্যায় তাহার একাংশে মৃত্যুস্থার উদ্দেশ্য দীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। সেই পাথরখানির একধারে আসিয়া নীলাক্ষর ছোটবোনটির হাত ধরিয়া বলিল। নদীর উভয় তীরেই বড় বড় আমবাগান এবং বাঁশঝাড়, দুই-একটা বহু প্রাচীন অশ্বখ, বট নদীর উপর পর্যন্ত ঝুকিয়া পড়িয়া শাখা মেলিয়া দিয়াছে। ইহাদের শাখায় কতকাল কত পাখি নিরুদ্বেগে বাসা বাঁধিয়াছে, কত শাবক বড় করিয়াছে, কত ফল খাইয়াছে, কত গান গাহিয়াছে, তাহারই ছায়ায় বসিয়া ভাইবোন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, কৌদি কেন, তোমাকে বোষ্টমঠাকুর বলে ডাকে?

নীলাক্ষর গলায় তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি বোষ্টম বলেই ডাকে।

হরিমতি অবিশ্বাস করিয়া বলিল, যাঃ—তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে! আচ্ছা, ভিক্ষে কেন করে দাদা?

নেই বলেই করে।

হরিমতি মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু নেই? তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই—কিছুটি নেই?

নীলাক্ষর স্নেহে হাত দিয়া বোনটির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া বলিল, কিছুটি নেই দিদি, কিছুটি নেই—বোষ্টম হলে কিছুটি থাকতে নেই।

হরিমতি বলিল, তবে সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না?

নীলাক্ষর বলিল, তোর দাদাই কি তাদের দিয়েছে রে?

কেন দাও না দাদা, আমাদের ত এত আছে।

নীলাক্ষর সহাস্যে বলিল, তবুও তোর দাদা দিতে পারে না। কিন্তু তুই যখন রাজার বৌ হবি দিদি, তখন দিস।

হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল যাঃ—

নীলাক্ষর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুষন করিল। মাবাপ-মরা এই

ছোটবোনটিকে সে যে কত ভালবাসিত তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড়বো-
বুটার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করে। সেইদিন
হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া
পোড়াইয়াছে, কীর্তন গাহিয়াছে। গাঁজা খাইয়াছে; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্তের
জন্য অবহেলা করে নাই। এমন করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই হরিমতি মায়ের
মত অসম্বোধে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদৃশ্যে পুরাতন ঝির গলা শোনা গেল—পুঁটি, বোমা ডাকচেন, দুধ খাবে এস।

হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, দাদা, তুমি বলে দাও না, এখন দুধ খাব না।

কেন খাবে না দিদি?

হরিমতি বলিল, এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু, যে গাল টিপে দেবে, সে-ই বুঝবে
না।

দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, পুঁটি!

নীলাম্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, যা, তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয়
বোন, আমি বসে আছি।

হরিমতি অগ্রসর মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুরবেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল,
আচ্ছা, তুমিই বলে দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে
না, ও খাবে না, সে খাবে না—শেষকালে কিনা মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে!

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল, এই ত, এত তরকারি হয়েছে!

এত কত! ঐ থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষমানুষ খেতে
পারে? এ শহর নয় যে, সব জিনিস পাওয়া যাবে! পাড়াগাঁ, এখানে সম্বলের মধ্যে ঐ পুকুরের
মাছ—তাও কিনা তুমি ছেড়ে দিলে? পুঁটি, কোথায় গেলি? বাতাস করবি আয়—সে ত হবে
না—আজ যদি একটি ভাত পড়ে থাকে ত তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

নীলাম্বর হাসিমুখে নিশ্চেষ্টে আহার করিতে লাগিল।

বিরাজ রাগিয়া বলিল, কি হাস, আমার গা জ্বালা করে। দিন দিন তোমার খাওয়া কমে
আসছে—সে খবর রাখ? গলায় হাড় বোরবার জো হচ্ছে, সেক্ষেত্রে চেয়ে দেখ।

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি, ও তোমার মনের ভুল।

বিরাজ কহিল, মনের ভুল? তুমি শুধে একটি ভাত কম খেলে আমি বলি দিতে পারি, রতি
পরিমাণ রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধরে দিতে পারি, তা জান? যা ত পুঁটি, পাখা রেখে
রান্নাঘর থেকে তোর দাদার দুধ নিয়ে আয়।

হরিমতি একধারে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে শুরু করিয়াছিল, পাখা রাখিয়া দুধ আনিতে
গেল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, ধন্যকন্ম করবার ঢের সময় আছে। আজ ও-বাড়ির পিসীমা
এসেছিলেন, শুনে বললেন; এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, গায়ের
জোর কমে যায়—না না, সে হবে না—শেষকালে কি হতে কি হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে
আমি দেব না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার হয়ে তুই বেশী করে খাস, তা হলেই হবে।

বিরাজ রাগিয়া গিয়া বলিল, হাড়ি-কেওয়ার মত আবার তুইতোকারি!

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া গিয়া বলিল, মনে থাকে না রে। ছেলেবেলার অভ্যাস যেতে চায়
না—কত তোর কান মলে দিয়েচি মনে আছে?

বিরাজ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে আবার নেই! ছোটটি পেয়ে আমার উপর কম অত্যাচার করেচ তুমি! বাবাকে লুকিয়ে, মাকে সরিয়ে আমাকে দিয়ে তুমি কত তামাক সাজিয়েচ! কত শরতান লোক তুমি।

নীলাশ্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আজও সেই সব মনে আছে? কিন্তু তখন থেকেই তোকে ভালবাসতাম।

বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল, চুপ কর, পুঁটি আসচে।

হরিমতি দুখের বাটি পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। বিরাজ উঠিয়া গিয়া হাত খুইয়া আসিয়া স্বামীর সন্নিহিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আমাকে পাখাটা দে পুঁটি—যা তুই খেলবে যা।

পুঁটি চলিয়া গেলে বিরাজ বাতাস করিতে করিতে বলিল, সত্যি বলচি—অত ছোট-বেলায় বিয়ে হওয়া ভাল নয়।

নীলাশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, কেন নয়? আমি ত বলি, মেয়েদের খুব ছেলেবেলায় বিয়ে হওয়াই ভাল।

বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমার কথা আলাদা, কেননা, আমি তোমার হাতে পড়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার দুই বজ্জাত জ্ঞানদ ছিল না—আমি দশ বছর বয়স থেকেই গিল্লী। কিন্তু, আর পাঁচজনের ঘরেও দেখচি ত, ঐ যে ছোটবেলা থেকে বকাঝকা মারধব শুরু হয়ে যায়—শেবে বাড় হয়েও সে দোষ ঘোচে না—বকাঝকা থাকে না। সেই জন্যেই ত আমি আমার পুঁটির নামটি করিনে—নইলে, পরশুও রাজেশ্বরীতলার ঘোষালদের বাড়ি থেকে ঘটকী এসেছিল; সর্ব্বাঙ্গে গয়না—হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না আরও দু-বছর থাক।

নীলাশ্বর মুখ তুলিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুই কি পশ নিয়ে মেয়ে বেচবি নাকি রে?

বিরাজ বলিল, কেন নেব না? আমার একটা ছেলে থাকলে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আনতে হ'ত না? অমাকে তোমরা তিন শ টাকা দিয়ে কিনে আননি? ঠাকুরপোর বিয়েতে পাঁচ শ টাকা দিতে হয়নি? না না, তুমি আমার ও-সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম, আমি তাই করব।

নীলাশ্বর অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা—এ খবর কে তোকে দিলে? আমরা পণ দিই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিইনে—আমি পুঁটিকে দান করব।

বিরাজ স্বামীর মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, তাই কর—এখন খাও—ছুতো করে যেন উঠে যেও না।

নীলাশ্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি বুঝি ছুতো করে উঠে যাই?

বিরাজ কহিল, না—একদিনও না। ও দোষটি তোমার শত্রুরেও দিতে পারবে না। এজন্যে কতদিন যে আমাকে উপোস করে কাটাতে হয়েছে, সে ছোটবো জানে। ও কি! খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

বিরাজ ব্যস্ত হইয়া পাখাটা ফেলিয়া দিয়া দুখের বাটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মাথা খাও, উঠ না—ও পুঁটি শিগগির যা—ছোটবোয়ের কাছ থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে আয়—না না, ঘাড় নাড়লে হবে না—তোমার কখনও পেট ভরেনি—মাইরি বলচি, আমি তা হলে ভাত খাব না—কাল রাত্তির একটা পর্যন্ত জেগে সন্দেশ তৈরি করেচি।

হরিমতি একটা রেকাবিতে সবগুলো সন্দেশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া পাতের কাছে রাখিয়া দিল।

নীলাশ্বর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বল, এতগুলো সন্দেশ এখন খেতে পারি?

বিরাজ মিষ্টানের পরিমাণ দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে খাও—পারবে।

তবু খেতে হবে?

বিরাজ কহিল, হাঁ। হয়, মাছ ছাড়তে পাবে না, না হয় এ-জিনিসটা একটু বেশী করে খেতেই হবে।—নীলাধর রেকাবিটা টানিয়া লইয়া বলিল, তোর এই খাবার জুলুমের ভয়ে ইচ্ছে করে বনে গিয়ে বাস করি।

পুটি বলিয়া উঠিল, আমাকেও দাদা—

বিরাজ ধমক দিয়া উঠিল, চুপ কর পোড়ামুখী, খাবিনে ত বাঁচবি কি করে? এই নালিশ করা বেরুবে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

দুই

মাস দেড়েক পরে, পাঁচ দিন জ্বরভোগের পর আজ সকাল হইতে নীলাধরের জ্বর ছিল না। বিরাজ বাসী কাপড় ছাড়াইয়া, স্বহস্তে কাচা কাপড় পরাইয়া দিয়া, মেঝের বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। নীলাধর জানালায় বাহিরে একটা নারিকেল বৃক্ষের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। ছোট বোন হরিমতি কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিল। অনতিকাল পরেই নান করিয়া রাজার সিঁড় চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া পটবস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিল। সমস্ত ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। নীলাধর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ও কি?

বিরাজ বলিল, যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পূজো পাঠিয়ে দিই গে, বলিয়া শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দিয়া স্বামীর কপালের উদ্ভাগ অনুভব করিয়া বলিল, না জ্বর নেই। জানিনে এ বছর মার মনে কি আছে। ঘরে ঘরে কি কাণ্ড যে শুরু হয়েছে—আজ সকালে গুনলাম, আমাদের মাঁভ মোড়লের ছেলের সর্বাসে মার অনুগ্রহ হয়েছে—দেহে ভিল রাখবার স্থান নেই।

নীলাধর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মতির কোন ছেলের বসন্ত দেখা দিয়েছে?

বড়ছেলের। মা শীতলা, গাঁ ঠাণ্ডা কর মা! আহা ঐ ছেলেই ওর রোজগারী। গেল শনিবারের শেষ-রাতিরে ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ তোমার গায়ে হাত পড়ায় দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ভয়ে বৃকের রক্ত কাঠ হয়ে গেল। উঠে বসে অনেককণ কাদলুম, তার পরে মানস করলুম, মা শীতলা, ভাল যদি কর মা, তবেই তো তোমার পূজো দিয়ে আবার খাব-দাব, না হলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া দুকৌটা জল পড়িল।—নীলাধর আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি উপোস করে আছ নাকি?

হরিমতি কহিল, হাঁ দাদা, কিছু খায় না বৌদি—কেবল সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর আর এক ঘটি জল খেয়ে আছে—কারণ কথা শোনে না।

নীলাধর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, এইগুলো তোমার পাগলামি নয়?

বিরাজ আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, পাগলামি নয়? আসল পাগলামি! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে ত বুঝতে, স্বামী কি বস্তু।—তখন বুঝতে, এমন দিনে তার জ্বর হলে, বৃকের ভিতরে কি করতে থাকে। বলিয়া উঠিয়া বাহিতেছিল, পাড়াইয়া বলিল, পুটি, যি পূজো নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে যাস ত যা, শিগগির করে নি গে।

পুটি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নীলাধর হাসিয়া বলিল, সে ও পারবে। বরং তোমার চেয়ে ওই ভাল পারবে।

বিরাজ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। বলিল, তা মনে করো না। ভাই বল আর বাপ-মাই বল, মেয়েমানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ-মা গেলে দুঃখ-কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্বস্ব যায়। এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি, তা, দুর্ভাবনার চাপে একবার মনে হয়নি যে উপোস করে আছি—কিন্তু কৈ, ডাক ত তোমার কোন বোনকে দেখি কেমন—

নীলাধর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আবার!

বিরাজ বলিল, তবে বল কেন? পাগলামি করেচি সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেচেন, তিনিই জানেন। আমি ত তাহলে একটি দিনও বাঁচতুম না, সিঁধির এ সিঁদুর

তোলবার আগে এ সিঁথে পাথর দিয়ে চেষ্টা ফেলতুম। শুভযাত্রা করে লোকে মুখ দেখবে না, শুভকর্মে লোকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে না, এ দুটো শুধু-হাত লোকের কাছে বার করতে পারব না, লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পারব না, ছি ছি, সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা? সেকালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল, সে ছিল ঠিক কাজ। পুরুষমানুষে তখন মেয়েমানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতো, এখন বোঝে না।

নীলাশ্বর কহিল, না, তুই বুঝিয়ে দি গে।

বিরাজ বলিল, তা পারি। আর শুধু আমিই কেন, তোমাকে পেয়ে যে-কেউ তোমাকে হারাবে, সেই বুঝিয়ে দিতে পারবে—আমি একলা নয়। যাক, কি সব বকে যাচ্ছি, বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর একবার স্বামীর বুকের উত্তাপ হাত দিয়া অনুভব করিয়া বলিল, গায়ে কোথাও ব্যাথা নেই ত?

নীলাশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

বিরাজ বলিল, তবে আর কোন ভয় নেই। আজ আমার ক্ষিদে পেয়েছে—যাই এইবার দুটো রাঁধবার বেগাঘাড় করি গে—সত্যি বলচি তোমাকে, আজ কেউ যদি আমার একখানা হাত কেটে দেয়, তাহলেও বোধ করি রাগ হয় না।

যদু চাকর বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, মা, কবিরাজমশাইকে এখন ডেকে আনতে হবে কি?—নীলাশ্বর কহিল, না না, আর আবশ্যক নেই।

যদু তথাপি গৃহিণীর অনুমতির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, না? যা ডেকে নিয়ে আয়, একবার ভাল করে দেখে যান।

দিন-তিনের পরে আরোগ্যলাভ করিয়া নীলাশ্বর বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিল, মতি মোড়ল আসিয়া কাদিয়া পড়িল—দাঠাকুর, তুমি একবার না দেখলে ত আমার হিমন্ত আর বাঁচে না। একবার পায়ের ধুলা দাও দেবতা, তাহলে যদি এ-যাত্রা সে বেঁচে—। আর সে বলিতে পারিল না—আকুলভাবে কাদিতে লাগিল।

নীলাশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, গায়ে কি খুব বেশী বেরিয়েছে মতি?

মতি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল, সে আর কি বলব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েছেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুন্দা, কিছুই ত জানি নে কি করতে হয়—একবার চল, বলিয়া সে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।

নীলাশ্বর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া কোমলস্বরে বলিল, কিছু ভয় নেই মতি, তুই যা, আমি পরে যাব।

তাহার কান্নাকাটির কাছে সে নিজের অসুখের কথা বলিতে পারিল না। বিশেষ, সকল রকম রোগের সেবা করিয়া এ বিষয়ে তাহার এত অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, আশপাশের গ্রামের মধ্যে কাহারও শক্ত অসুখ-বিসুখে তাহাকে একবার না দেখাইয়া, তাহার মুখের আশ্বাস-বাক্য না শুনিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা কিছুতেই ভরসা পাইত না। নীলাশ্বর এ কথা নিজেও জানিত। ভাতার কবিরাজের ঔষধের চেয়ে, দেশের অশিক্ষিত লোকের দল তাহার পায়ের ধুলা, তাহার হাতের জলপড়াকে যে অধিক শ্রদ্ধা করে, ইহা সে বুদ্ধিত বলিয়াই কাহাকেও কোনদিন কিরাইয়া দিতে পারিত না। মতি চাঁড়াল আর একবার কাদিয়া, আর একবার পায়ের ধুলার দাবী জানাইয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নীলাশ্বর উষ্ম হইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার দেহ তখনও ঈষৎ দুর্বল ছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। সে ভাবিতে লাগিল, বাড়ির বাহির হইবে কি করিয়া। সে বিরাজকে অত্যন্ত ভয় করিতে, তাহার কাছে এ কথা মুখে আনিব কি করিয়া?

ঠিক এই সময়ে ভিতরের উঠান হইতে হরিমতির সূতীন্দ্র কঠের ডাক আসিল, দাদা,—বৌদি ঘরে এসে শুতে কলছে।

নীলাশ্বর জবাব দিল না।

মিনিট-খানেক পরেই হরিমতি নিজে আসিয়া হাজির হইল। বলিল, শুনতে পাওনি দাদা? নীলাশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিমতি কহিল, সেই চারটি খেয়ে বসে আছ,—বৌদি বলচে, আর বসে থাকতে হবে না, একটু শোও গে।—নীলাশ্বর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি করচে রে পুটি?

হরিমতি কহিল, এইবার ভাত খেতে বসেচে।

নীলাশ্বর আদর করিয়া বলিল, লক্ষ্মী দিদি আমার, একটি কাজ করবি?

পুটি মাথা নাড়িয়া বলিল, করব।

নীলাশ্বর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া কহিল, আস্তে আস্তে আমার চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি!

চাদর আর ছাতি?

নীলাশ্বর কহিল, হঁ।—হরিমতি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বৌদি ঠিক এই দিকে মুখ করে খেতে বসেচে যে!

নীলাশ্বর শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, পারবি নে আনতে?

হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া দুই-তিনবার মাথা নাড়িয়া বলিল, না দাদা, দেখে ফেলবে; তুমি শোবে চল।

বেলা তখন প্রায় দুইটা, বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিকে চাহিয়া সে শুধু-মাথায় পথে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না, হতাশ হইয়া ছোটবোনের হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি কিছুক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। নীলাশ্বর চূপ করিয়া মনে মনে নানারূপে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে লাগিল, কথটা ঠিক কি রকম করিয়া পাড়িতে পারলে খুব সম্ভব বিরাজের করুণা উদ্রেক করিবে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজ ঘরের শীতল মসৃণ সিমেন্টের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বকের তলায় একটা বালিশ দিয়া মগ্ন হইয়া মামা ও মামীকে চারপাতা-জোড়া পত্র লিখিতেছিল। কি করিয়া এ বাড়িতে শুদ্ধমাত্র মা শীতলার কৃপায় মরা বাঁচিয়াছে কি করিয়া যে এ যাত্রা সিঁধীর সিঁদুর ও হাতের নোয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, লিখিয়া লিখিয়া ক্রমাগত লিখিয়াও সে কাহিনী শেষ হইতেছিল না, এমন সময় খাটের উপর হইতে নীলাশ্বর হঠাৎ ডাকিয়া বলিল, একটি কথা রাখবে বিরাজ?

বিরাজ দোয়াতের মধ্যে কলমটা ছাড়িয়া দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কি কথা?

যদি রাখ ত বলি।

বিরাজ কহিল, রাখাবার মত হলেই রাখবো—কি কথা?

নীলাশ্বর মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, বলে লাভ নেই বিরাজ, তুমি কথা আমার রাখতে পারবে না।

বিরাজ আর প্রশ্ন করিল না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পত্রটা শেষ করিবার জন্য আর একবার ঝুকিয়া পড়িল। কিন্তু চিঠিতে মন দিতে পারিল না—ভিতরে ভিতরে কৌতূহলটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা বল, আমি কথা রাখব।

নীলাশ্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে বলিল, দুপুরবেলা মতি চাঁড়াল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। তাদের বিশ্বাস, আমার পায়ের খুলো না পড়লে তার ছিমছম বাঁচবে না—আমাকে একবার যেতে হবে।

তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে?

কি করব বিরাজ, কথা দিয়েচি—আমাকে একবার যেতেই হবে।

কথা দিলে কেন?

নীলাশ্বর চূপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ কঠিনভাবে বলিল, তুমি কি মনে কর, তোমার প্রাণটা তোমার একলার, ওতে কারও কিছু বলবার নেই? তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার?

নীলাধর কথাটা লম্বু করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শ্রীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার হাসি আসিল না। কোনমতে বলিয়া ফেলিল, কিন্তু তার কান্না দেখলে—

বিরাজ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ঠিক ত! তার কান্না দেখলে—কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি? বলিয়া চারপাতা-জোড়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া কুচিকুচি করিয়া ছিড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, উঃ! পুরুষমানুষেরা কি! চার দিন চার রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটালুম—ও হাতে হাতে তার প্রতিফল দিতে চলল! ঘরে ঘরে জ্বর, ঘরে ঘরে বসন্ত—এই রোগা দেহ নিয়ে ও রোগী বাঁটতে চলল—আচ্ছা যাও, আমার ভগবান আছেন। বলিয়া আর একবার বালিশে বুক দিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

নীলাধরের গুতাধরে অতি সুস্থ, অতি কীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে বলিল, সে ভরসা কি তোদের আছে বিরাজ যে, কথায় কথায় ভগবানের দোহাই পাড়িস!

বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ক্রোধের স্তরে বলিল, না, ভগবানের উপর ভরসা শুধু তোমাদের একচেটে, আমাদের নয়। আমরা কীর্তন গাইনে, তুলসীর মালা পরিনে, মড়া পোড়াই নে, তাই আমাদের নয়,—একলা তোমাদের।

নীলাধর তাহার রাগ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, রাগ করিস নে বিরাজ, সত্যিই তাই। তুই একা নয়—তোরা সবাই ওই! ভগবানের ওপর ভরসা করে থাকতে যতটা জোরের দরকার ততটা জোর মেয়েমানুষের দেহে থাকে না—তাতে তোর দোষ কি?

বিরাজ আরও রাগিয়া বলিল, না দোষ কেন, ওটা মেয়েমানুষের গুণ। কিন্তু, গায়ের জোরেই যদি এত দরকার ত বাঘ-ভালুকের গায়েও ত আরও জোর আছে। আর জোর থাক ভাল, না থাক ভাল, এই রোগী দেহ নিয়ে তোমাকে আমি আর বার হতে দেব না—তা তুমি যত উর্কই কর না কেন।

নীলাধর আর কথা কহিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বিরাজও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, বেলা গেল—যাই বলিয়া উঠিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে দীপ জ্বালিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসিয়া দেখিল, স্বামী শয্যা়া নাই। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, পুটি, তোর দাদা কৈ রে? যা, বাইরে দেখে আয় ত!

পুটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, মিনিট-পাঁচেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোথাও নেই—নদীর ধারেও না।—বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হঁ। তার পরে রান্নাঘরের দুরারে আসিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

তিন

বহর-তিনেক পরের কথা বলিতেছি। মাস-দুই পূর্বে হরিমতি শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে; ছোটতাই নীলাধর এক বাটাতে থাকিয়াও পৃথগ্ন হইয়াছে। বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় সন্ধ্যার হায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সেইখানে নীলাধর একটা হেঁড়া মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। বিরাজ নিঃশব্দে আসিয়া কাছে পাঁড়িল। নীলাধর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, হঠাৎ বাইরে যে?

বিরাজ একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

কি?

বিরাজ বলিল, কি খেলে মরণ হয় বলে দিতে পার?

নীলাধর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, হয় বলে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল, কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্।

ওকিয়ে যাচ্ছি কে বললে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া এক মুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিল, তারপরে বলিল, হাঁ গা, কেউ বলে দেবে তবে আমি জানব, এ কি সত্যিই তোমার মনের কথা?

নীলাস্বর একটুখানি হাসিল। নিজের কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, না রে, তা নয়। তবে তোর নাকি বড় ভুল হয়—তাই জিজ্ঞেস করি, এ কি আর কেউ বলেচে, না নিজেই ঠিক করেচিস?

বিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। বলিল, কত বললুম তোমাকে পুঁটির আমার অমন জায়গায় বিয়ে দিও না—কিছুতেই কথা শুনলে না। নগদ যা ছিল গেল, আমার গায়ের গয়নাগুলো গেল, যদু মোড়লের দরুন ডাক্তারী বাঁধা পড়ল, দুখানা বাপান বিক্রি করলে, তার উপর এই দু'সন অজন্মা। বল আমাকে, কি করে তুমি জামাইয়ের পড়ার খরচ মাসে মাসে যোগাবে? একটা কিছু হলেই পুঁটিকে ঝোঁটা সহিতে হবে—সে আমার অভিমাত্রী মেয়ে, কিছুতেই তোমার নিন্দে শুনতে পারবে না—শেষে কি হতে কি হবে ভগবান জানেন—কেন তুমি এমন কাজ করলে?

নীলাস্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তা ছাড়া পুঁটির ভাল করতে গিয়ে দিনরাত ভেবে ভেবে যে শেষে তুমি আমার সর্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর দু-পাঁচ বিঘে জমি বিক্রি করে শ-পাঁচেক টাকা জোগাড় করে গলায় কাপড় দিয়ে জামাইয়ের বাপকে বল গে, এই নিয়ে আমাদের রেহাই দিন মশাই, আমরা গরীব, আর পারব না। এতে ভালমন্দ পুঁটির অদ্ভুত যা হয় তা হোক।

তথাপি নীলাস্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পারবে না বলতে?—নীলাস্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারি, কিন্তু সবই যদি বিক্রি করে ফেলি বিরাজ, আমাদের হবে কি?

বিরাজ বলিল, হবে আবার কি! বিষয় বাঁধা দিয়ে মহাজনের সুদ আর মুখনাড়া সহ্য করার চেয়ে এ ঢেল ভালো। আমার একটা ছেলেপিলে নেই যে তার জন্যে ভাবনা—আমরা দু'টো শ্রাণী—যেমন করে হোক চলে যাবে। নিতান্ত না চলে, তুমি বোষ্টমঠাকুর ত আছই, আমি না হয় বোষ্টমী হয়ে পড়ব—দু'জনে বৃন্দাবন করে বেড়াব।

নীলাস্বর একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুই কি করবি, মন্দিরা বাজাবি?

হঁ বাজাব? নেছাত না পারি, তোমার ঝুলি বয়ে বেড়াতে পারব ত! তোমার মুখের কৃষ্ণাম শুনে পণ্ড-পঙ্কী হির হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের দুটো শ্রাণীর খাওয়া চলবে না? চল, ঘরে চল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে।

ঘরে আসিয়া বিরাজ স্বামীর মুখের কাছে প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া কক্ষকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, না সাহস হয় না, এমন বোষ্টমটিকে আর পাঁচজন বোষ্টমীর সামনে প্রাণ ধরে বার করতে পারব না—তার চেয়ে এখানে ওকিয়ে মরি সে ভাল। নীলাস্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, ওরে সেখানে শুধু বোষ্টমীই থাকে না, বোষ্টমও থাকে।

বিরাজ বলিল, তা থাক। একজন দুজন কেন, হাজার হাজার লক লক থাক,—বলিয়া প্রদীপটা বহাছানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া গভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা, শুনি সংসারে সতী অসতী দুই-ই আছে—অসতী মন্ত্ৰেমানুব কখন চোখে দেখিনি—আমার বড় দেখতে সাধ হয়, তারা কি রকম! ঠিক আমাদের মত, না আর কোন রকম। তারা কি করে, কি ভাবে, ক্রি খায়, কেমন করে শুয়ে ঘুমায়—এ-সব আমার দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, তুমি দেখেচ?

নীলাস্বর বলিল, দেখেচি।

দেখেচ? আচ্ছা, এই আমি যেমন করে বসে কথা কইচি তারা কি এমন করে বসে যার-

তার সঙ্গে কথা কয়?

নীলাশ্বর হাসিয়া বলিল, তা বলতে—পারিনে—আমি ততটা দেখিনি।

বিরাজ ক্ষণকাল নির্নিমেষ চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সর্বাসে কাঁটা দিয়া তাহার সর্বশরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল।

নীলাশ্বর দেখিতে পাইয়া বলিল, ও কি রে?

বিরাজ বলিল, উঃ, কি—তারা দুর্গা! দুর্গা! সন্ধ্যাবেলা কি কথা উঠে পড়ল—কৈ সন্ধ্যা করলে না?

নীলাশ্বর বলিল, এই উঠি।

হাঁ যাও, হাত-পা ধুয়ে এস, আমি এই ঘরেই আসন পেতে ঠিক করে দিচ্ছি।

দিন পাঁচ-ছয় পরে রাত্রি দশটার সময় নীলাশ্বর বিছানায় শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া শুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া ধূমপান করিতেছিল। বিরাজ সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া শুইবার পূর্বে মেঝের বসিয়া নিজের জন্য খুব বড় করিয়া একটা পান সাজিতে সাজিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, শাস্ত্রের কথা কি সমস্ত সত্যি?

নীলাশ্বর নলটা একপাশে রাখিয়া জ্বীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, শাস্ত্রের কথা সত্যি নয় ত কি মিথ্যে?

বিরাজ বলিল, না মিথ্যে বলচি নে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে?

নীলাশ্বর মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আমি পণ্ডিত নই বিরাজ, সব কথা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যা সত্যি, তা সেকালেও সত্যি, একালেও সত্যি।

বিরাজ বলিল, আচ্ছা মনে কর সাবিত্রী-সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে সে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, এ কি সত্যি হতে পারে?

নীলাশ্বর বলিল, কেন পারে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয়ই পারেন।

তা হলে আমিও ত পারি?

নীলাশ্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই কি তাঁর মত সতী নাকি? তাঁরা হলেন দেবতা।

বিরাজ পানের বাটটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, হলেনই বা দেবতা! সতী হচ্ছে আমিই বা তাঁর চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে, কিন্তু মনে-জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, এ কথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে একটিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হ'ন আর যেই হ'ন।

নীলাশ্বর জবাব দিল না, তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বিরাজ প্রদীপ সূমুখে আনিয়া পান সাজিতেছিল, তাহার মুখের উপরে সমস্ত আলোটাই পড়িয়াছিল, সেই আলোকে নীলাশ্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি এক রকমের আশ্চর্য দ্যুতি বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিকিয়া পড়িতেছে। নীলাশ্বর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল, তা হলে তুমিও পারবে বোধ হয়।

বিরাজ উঠিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, এই আশীর্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্বত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যদি যথার্থ সত্যি হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি—তার পরে, এই পায়ে মাথা রেখে যেন মরি—যেন এই সিঁদুর এই নোয়া নিয়েই চিতায় গুতে পাই।—নীলাশ্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হয়েছে রে বিরাজ, আজ?

বিরাজের দুই চোখে জল টলটল করিতেছিল, তৎসময়ে তাহার গুষ্ঠাধরে অতি মৃদু অতি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, আর একদিন শুনো, আজ নয়। আজ শুধু আশীর্বাদ কর, মরণকালে যেন এই দুই পায়ের ধূলো পাই, যেন তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার মুখের পানে চেয়ে মরতে পারি।

সে আর বলিতে পারিল না। এইবার তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

নীলাশ্বর ভয় পাইয়া তাহাকে জোর করিয়া বৃকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, কি হয়েছে রে আজ? কেউ কিছু বলেছে কি?

বিরাজ স্বামীর বৃকে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল; জবাব দিল না।

নীলাশ্বর পুনরায় কহিল, কোনদিন ত তুই এমন করিস নি বিরাজ—কি হয়েছে, বল!

বিরাজ গোপনে চক্ষু মুছিল, কিন্তু মুখ তুলিল না। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো।

নীলাশ্বর আর পীড়াপীড়ি করিল না, তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া নিঃশব্দে সাজুনা দিতে লাগিল। সে ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়া কিছু জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংসারে আর পূর্বের সচ্ছলতা ছিল না। উপর্যুপরি দুই সন অজন্মা; গোলায় ধান নাই, পুকুরে জল নাই, মাছ নাই—কলাবাগান শুকাইয়া উঠিতেছে, লেবুবাগানের কাঁচা লেবু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার উপর উদ্ভ্রমণেরা আসা-যাওয়া শুণু করিয়াছিল এবং পুটির শব্দও ছেলের পড়ানোর খরচের জন্য মিঠেকড়া চিঠি পাঠাইতেছিলেন। এত কথা বিরাজ জানিত না। অনেক অশ্রীভিকর সংবাদই নীলাশ্বর প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এই সমস্ত কথাই কেহ বিরাজকে শুনাইয়া গিয়াছে।

সহসা বিরাজ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল; কহিল একটি কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবে?

নীলাশ্বর গান মনে অধিকতর শঙ্কিত হইয়া বলিল, কি কথা?

বিরাজের সমস্ত সৌন্দর্যের বড় সৌন্দর্য ছিল তার মুখের হাসি। সে সেই হাসি আর একবার হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কালো-কুচ্ছিত নই ত?

নীলাশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

যদি কালো-কুচ্ছিত হতুম, তাহলে আমাকে কি করে এত ভালসালতে?

এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া যদিও সে কিছু বিস্মিত হইল, তথাপি একটা গুরুতর ভার তাহার বৃকের উপর হইতে যেন সহসা গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

সে খুশী হইয়া বলিল, ছেলেবেলা থেকে একটি পরমা সুন্দরীকেই ভালবেসে এসেছি—কি করে বলব এখন, সে কালো-কুচ্ছিত হলে কি করতুম?

বিরাজ দুই বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেঁটন করিয়া আরও সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল, আমি বলব? তা হলেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাসতে।

তথাপি নীলাশ্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তুমি ভাবচ, কি করে জানলুম?—না?

এবার নীলাশ্বর আস্তে আস্তে বলিল, ঠিক তাই ভাবচি—কি করে জানলে।

বিরাজ গলা ছাড়িয়া দিয়া বৃকের একধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার মন বলে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি, তুমি নিজেও নিজেই কত চেন না। তাই জানি, আমাকে তুমি এমনই ভালই বাসতে, যা অন্যায়, যাতে পাপ হয়, এমন কাজ তুমি কখন করতে পার না—স্বীকারে ভাল না বাসা অন্যায়, তাই আমি জানি, যদি আমি কানা-খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদরই পেতুম।

নীলাশ্বর জবাব দিল না।

বিরাজ একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া সহসা হাত বাড়াইয়া আন্দাজ করিয়া চোখের কোণে আঙুল দিয়া বলিল, জল কেন?

নীলাশ্বর তাহার হাতটি সযত্নে সরাইয়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, জানলে কি করে?

বিরাজ বলিল, ভুলে যাও কেন যে, আমার নব্বছ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। ভুলে যাও কেন যে তোমাকে পেয়ে তবে তোমাকে পেয়েছি। নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে,

আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি?

নীলাশ্বর কথা কহিল না। আবার তাহার নিম্নলিখিত চোখে দুই কোণ বাহিয়া কৌটা কৌটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, ভেব না, মা মরণকালে তোমার আমার হাতে পুটিকে দিয়ে গিয়েছেন, সেই পুটির ভাল হবে বলে যা ভাল বুঝেচ তাই করেচ—স্বর্গে থেকে মা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। তুমি শুধু এখন সুস্থ হও, ঋণমুক্ত হও—যদি সর্বস্ব যায় তাও যাক।

নীলাশ্বর চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে কহিল, তুই জানিস নে বিরাজ, আমি কি করেচি—আমি তোর—

বিরাজ বলিতে দিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, সব জানি আমি। আর জানি, না জানি, ভেবে ভেবে তোমাকে আমি রোগা হতে দিতে যে পারব না সেটা নিশ্চয় জানি। না, সে হবে না—যার যা পাওয়া দিয়ে দাও, দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, তার পরে মাথার ওপর ভগবান আছেন, পায়ের নীচে আমি আছি।—নীলাশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চূপ করিয়া রহিল।

চার

আরও ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। হরিমতির বিবাহের পূর্বেই ছোটভাই বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল, নীলাশ্বরের নিজেদের ভাগে যাহা পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশ সেই সময়েই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—বলা বাহুল্য, পীতাম্বর এক কপর্দক দিয়াও সাহায্য করে নাই। অবশিষ্ট জমিজমা যাহা ছিল তাহাই একটির পর একটি বন্ধক দিয়া নীলাশ্বর বিবাহের শর্ত পালন করিয়া ভগিনীপতির পড়ার খরচ যোগাইতে লাগিল এবং সংসার চালাইতে লাগিল। এইরূপে দিন দিন নিজেকে সে ক্রমাগত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু মমতাবশে কোনমতেই পৈতৃক সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ বৈকালে ও-পাড়ার ভোলানাথ মুখুয্যে আসিয়া বাকী সুদের জন্য কয়েকটা কথা কড়া করিয়াই বলিয়া গিয়াছিল, আড়ালে দাঁড়াইয়া বিরাজ তাহা সমস্তই শুনিল এবং নীলাশ্বর ঘরে আসিতেই, সে রান্নাঘর হইতে নিঃশব্দে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই নীলাশ্বর মনে মনে প্রমাদ গণিল। ফোভে অপমানে বিরাজের বুকের ভিতরটা চ্ছ করিয়া ছলিতেছিল। কিন্তু সে ভাব সংযত করিয়া হাত দিয়া খাট দেখাইয়া দিয়া প্রশান্ত-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, ঐখানে বস।

নীলাশ্বর শব্দ্যর উপর বসিতেই সে নীচে পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, হয় আমাকে ঋণমুক্ত কর, না হয়, আজ তোমার পা ছুঁয়ে দিবি করব।

নীলাশ্বর বুঝিল, সে সমস্ত শুনিয়াছে, তাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঝুকিয়া পড়িয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইয়া ব্রিঙ্ককণ্ঠে বলিল, হি বিরাজ, সামান্যতেই হৃদয়হার্য হ'সনে।

বিরাজ মুখের উপর হইতে তাহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, এতেও মানুষ আত্মহারা না হয়, কিসে হয় বল শুনি।

নীলাশ্বর কি জবাব দিবে হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না, চূপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ বকিল, চূপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

নীলাশ্বর মৃদুকণ্ঠে বলিল, জবাব দেবার কিছুই নেই বিরাজ, কিন্তু—

বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিন্তুতে হবে না। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে লোক তোমাকে অপমান করে যাবে, কানে শুনে আমি সহ্য করে থাকব—এ ভরসা মনে ঠাই দিও না। হয় তার উপায় কর, না হয় আমি আত্মঘাতী হব।

নীলাশ্বর ভরে ভরে কহিল, একদিনেই কী উপায় করব বিরাজ?

বেশ, দুদিন পরে কি উপায় করবে, তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।

নীলাশ্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, একটা অসম্ভব আশা করে নিজেকে ভুল বুঝিয়ে না—আমার সর্বনাশ করো না! যত দিন যাবে ততই বেশী জড়িয়ে পড়বে, দোহাই তোমার, আমি ভিক্ষে চাইটি—তোমার দুটি পায়ে ধরছি, এই বেলা যা হয় একটা পথ কর।—বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুভরা কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভুল মুখ্যের কথাগুলো তাহার বুকের ভিতরে শূল হানিতে লাগিল।

নীলাশ্বর হাত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, অধীর হলে কি হবে বিরাজ? একটা বছর যদি ষোল আনা ফসল পাই, বার আনা বিষয় উদ্ধার করে নিতে পারব। কিন্তু বিক্রি করে ফেললে আত ত হবে না সেটা ভেবে দেখ।

বিরাজ আশ্রয়রে বলিল, দেখচি; আসচে বছরেই যে ষোল আনা ফসল পাবে, তারই বা ঠিকানা কি? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব দুঃখ সহিতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সহিতে পারিনে।

নীলাশ্বর নিজে তাহা বেশ জানিত, তাই কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ পুনরায় কহিল, শুধু এই কি আমার সমস্ত দুঃখ? দিবারাত্রি ভেবে ভেবে তুমি আমার চোখের সামনে শুকিয়ে উঠচ, এমন সোনার মূর্তি কালি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে তুমিই বল, এও সহ্য করবার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর কতদিন যোগীনের পড়ার খরচ যোগাতে হবে?

আরও একটা বছর। তা হলেই সে ডাক্তার হতে পারবে।

বিরাজ একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, পুটিকে মানুষ করেচি—সে আমার রাজরানী হ'ক, কিন্তু সে হতে আমার এত দুঃখ ঘটবে জানলে, ছোটবেলায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতুম। এমন করে নিজের মাথায় বাজ হানতুম না। হা ভগবান! বড়লোক তারা, কোন কষ্ট, কোন অভাব নেই, তবুও জোঁকের মত আমার রক্ত শুঁবে নিতে তাদের এতটুকুও দয়া-মায়া হচ্ছে না!—বলিয়া একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুকণ নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিরাজ মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চারিদিকে অভাব, চারিদিকে আকাল, গরীব-দুঃখীরা ত এরই মধ্যে কেউ উপোস, কেউ একবেলা খেতে শুরু করেছে, এমন দুঃসময়েও আমরা পরের ছেলে মানুষ করবো কেন? পুটির খণ্ডরের অভাব নেই, সে বড়লোক; সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে, আমরা পড়াব কেন? যা হয়েছে তা হয়েছে, তুমি আর ধার করতে পাবে না।

নীলাশ্বর অতিকষ্টে শুষ্কহাসি ওঠাশ্রান্তে টানিয়া আনিয়া বলিল, সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেচি যে। তার কি হবে?

বিরাজ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কিছু হবে না। শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হ'ত, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন। আর আমি ত তোমারই অর্ধেক, যদি কিছু ঐতে পাপ হয়, আমি আমার নিজের মাথায় নিয়ে জন্ম জন্ম নরকে ভুঁবে থাকব; তোমার কিছু ভয় নেই—তুমি আর ঋণ করো না।

নীলাশ্বর কাতরদৃষ্টিতে একটিবার মাত্র স্বীর মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণেই নিরুপায়ের মত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ধর্মগ্রাণ স্বামীর অন্তরের নিপাকরণ দুঃখের লেশমাত্রও তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু সে আর সহিতে পারিতেছিল না। যথার্থই স্বামী তাহার সর্বস্ব ছিল। সেই স্বামীর অহমিশি চিত্তাক্রান্ত শুষ্ক অবসর মুখেব পানে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিতেছিল। এতক্ষণ কোনমতে সে কল্যা চাপিয়া কথা কহিতেছিল, আর পারিল না। সবেগে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুপাইয়া কঁদিয়া উঠিল।

নীলাশ্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত বিরাজের মাথার উপরে রাখিয়া নির্বাক নিশ্চল হইয়া বসিয়া

রহিল। বহুক্ষণ কান্নার পরে তাহার দুঃখের অসহ তীব্রতা মলীকৃত হইয়া আসিলে সে তেমনই মুখ লুকাইয়া কঁদিতে কঁদিতে বলিল, ছেলেবেলা থেকে যতদূর আমার মনে পড়ে, কোন দিন তোমার মুখ শুকনো দেখিনি, কোন দিন তোমার মুখ ভার করতে দেখিনি; এখন তোমার পানে চাইলেই আমার বুকের মধ্যে রাবণের চিত্রা জ্বলতে থাকে—তুমি নিজের পানে চাও, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ। সভ্যই কি শেবকালে আমাকে পথের ভিখারিণী করবে? সে কি তুমিই সইতে পারবে?

নীলাম্বর তথালি উত্তর দিতে পারিল না, অনামনস্কের মত তাহার চুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। এমন সময়ে ঘরের বাহিরে পুরানো ষি সুন্দরী ডাকিয়া বলিল, বৌমা, উনুন জ্বলে দেব কি?

বিরাজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী পুনরায় কহিল, উনুন জ্বলে দেব?

বিরাজ অস্পষ্টভাবে বলিল, সে, তোদের জন্যে রাঁধতে হবে, আমি আর কিছু খাব না।

ষি বড় গলায় নীলাম্বরকে শুনাইয়া বলিল, তুমি কি মা, তবে রাস্তিরে খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে? না খেয়ে খেয়ে যে একেবারে আধখানি হয়ে গেলে!

বিরাজ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরের দিকে লইয়া গেল।

জ্বলন্ত উনুনের আলো বিরাজের মুখের উপর পড়িয়াছিল। অদূরে বসিয়া সুন্দরী হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ বলিল, সত্যি কথা মা, তোমার মত রূপ আমি মানুষের কখন দেখিনি—এত রূপ রাজা-রাজাডার ঘরেও নেই।

বিরাজ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল, তুই রাজারাজাডার ঘরের খবর রাখিস?

সুন্দরীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপসী বলিয়া তাহারও এক সময় খ্যাতি ছিল, সে খ্যাতি আজিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

সে বলিত, কবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কবে বিধবা হইয়াছিল, কিছুই মনে পড়ে না কিন্তু সধবার সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। তাহাদের গ্রাম কৃষ্ণপুরে এ সুখ্যাতিও তাহার ছিল। এখন হাসিয়া বলিল, রাজারাজাডার ঘরের খবর রাখি বৈ কি মা! না হলে সেদিন তাকে বাঁটাগেটা কতুম।

এবার বিরাজ রীতিমত রাগ করিল, বলিল, তুই যখন তখন ঐ কথাই বলিস কেন সুন্দরী? তাদের যা খুশি বলেচে, তাতে তুই বা বাঁটাগেটা করবি কেন? আর আমাকেই বা নাহ'ক শোনাবি কেন? উনি রাগী মানুষ, ওনলে কি বলবেন বল ত?

সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বাবু ওনবেন কেন মা? এও কি একটা কথার মত কথা!

কথার মত কথা নয়, সে কথা কি তুই আমাকে বুঝিয়ে বলবি? তা ছাড়া যা হয়ে বয়ে চুকে শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তোলবার দরকারই বা কি?

সুন্দরী খপ করিয়া বলিল, কোথায় চুকবুকে শেষ হয়েছে মা? কালও যে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে—বিরাজ রাগিয়া উঠিল। বলিল, তুই গেলি কেন? তুই আমার কাছে চাকরি করবি, আর যে ডাকবে তার কাছে ছুটে যাবি? তুই নিজে না বললি সেদিন তাঁরা সব কলকাতায় চলে গেছেন?

সুন্দরী বলিল, সত্যি কথাই বলেছিলাম মা। কাল-সুই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন, আবার লেখটি সব এলফোন। আর আমার কথা যদি বললে মা, শিলাটা ডাকতে এলে, না বলি কি করে? তাঁরা এ দুইজনের জরিমানা, জরিমানা দুইখী একটা—একটা জরিমানা করি কি ভরসা?

বিরাজ কখনকাল তাহাঁতা খাতিয়া কহিল, তাঁরা এ দুইজনের জরিমানা নাকি?

সুন্দরী সহাস্যে বলিল, হাঁ মা, এ মহালগা তাঁরাই কিনেছেন—বাবু তাঁর খাতিয়ে আছেন—তল সত্যি মা, রাজপুত্র জ রাজপুত্র! কিনা দুখ চোখের—

বিরাজ সহসা থামাইয়া দিয়া বলিল, থাম্ থাম্, চুপ্ কর্, ও-সব কথা তোকে জিজ্ঞেস করিনি—কি তোকে বললে, তাই বল।

সুন্দরী এবার মনে মনে বিরক্ত হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া ক্ষুণ্ণরূপে বলিল, কি কথা আর হবে মা, কেবল তোমারই কথা।

বিরাজ 'হেঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এইবার কথাটা বুঝাইয়া বলি। বছর-দুই পূর্বে এই মহালটা কলিকাতার এক জমিদারের হস্তগত হয়; তাহার ছোটছেলে রাজেন্দ্রকুমার অতিশয় অসচ্চরিত্র এবং দুর্দান্ত। পিতা তাহাকে কাজকর্মে কতকটা শিক্ষিত ও সংযত করিতে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই কাছাকাছি কোন একটা মহালে প্রেরণ করিতে চাহেন। গত বৎসর সে এইখানে আসে। রীতিমত কাছারি-বাটী না থাকায়, সে সমুদ্রতীরের পরপারে গ্রাণ্ড ট্র্যাক রোডের ধারে একটা আমবাগানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে কাজকর্ম শিখিবার ধার দিয়া চলে না। পাখি শিকার করিতে ভালবাসিত, হুইকির ফ্লাস্ক পিঠে বাঁধিয়া বন্দুক ও চার-পাঁচটা কুকুর লইয়া সমস্ত দিন নদীর ধারে বনে বনে পাখি মারিয়া বেড়াইত। এই অবস্থায় মাস-ছয়েক পূর্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে গোধূলির স্বর্ণাভামণ্ডিত সিন্ধুবসনা বিরাজের উপর তাহার চক্ষু পড়ে। বিরাজের এই ঘাটটি চারদিকের বড় বড় গাছে আবৃত থাকায় কোন দিক হইতে দেখা যাইত না। বিরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ-কলস তুলিয়া লইয়া উপর দিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিসীম লোকটির সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল! রাজেন্দ্র পাখির সন্ধান করিতে করিতে এদিকে আসিয়াছিল, অদূরস্থিত সমাধিস্থপের উপর দাঁড়াইয়া সে বিরাজকে দেখিল। মানুষের এত রূপ হয়, সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু, আর সে চোখ ফিরাইতেও পারিল না। অপলকদৃষ্টিতে চিত্রার্ণবের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরশি বিভোর হইয়া দেখিতে লাগিল। বিরাজ আশ্চর্যবসনে কোমনতে লম্ভা নিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল। এই অরণ্যপরিবৃত, ভদ্রসমাজ-পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এত রূপ কেমন করিয়া কি করিয়া আসিল। এই অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যময়ীর পরিচয় সে সন্ধান করিয়া সেই রাএই জানিয়া লইল এবং তখন হইতেই এই একমাত্র চিন্তা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা রহিল না। ইহার পরে আরও দুইবার বিরাজের চোখে চোখে পড়িয়াছিল।

বিরাজ বাড়িতে আসিয়া সুন্দরীকে ডাকিয়া বলিল, যা' ত সুন্দরী, ঘাটের ধারে কে একটা লোক গীরস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মানা করে দি গে, যেন আর কোনদিন আমাদের বাগানে না ঢোকে।

সুন্দরী মানা করিতে আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিল, বাবু আপনি!

রাজেন্দ্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি?

সুন্দরী বলিল, আজ্ঞে হাঁ বাবু, আপনাকে আর কে না চেনে?

আমি কোথায় থাকি, জান?

সুন্দরী কহিল, জানি।

রাজেন্দ্র বলিল, আজ একবার ওখানে আসতে পার?

সুন্দরী সন্দেহহীন মুখে মীচু করিয়া আড়ো আড়ো জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবু?

দয়কার আছে, একবার যেও, বলিয়া রাজেন্দ্র বন্দুক কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর অনেকবার সুন্দরী গোপনে ও নিতান্ত গোপনের জমিদারী কাছারিতে গিয়াছে, অনেক কথা বিরাজের সম্বন্ধে উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। সুন্দরী নির্বোধ ছিল না; সে বিরাজবৌকে চিনিত। বাহিরে হইতে এই বধূটিকে যতই মধুর এবং কোমল দেখাক না কেন,

ভিতরের প্রকৃতি যে তাহার উগ্র এবং পাথরের মত কঠিন ছিল, সুন্দরী তাহা ঠিক জানিত। বিরাজের সঙ্গে আরও একটা বস্তু ছিল, সে তাহার অপরিমেয় সাহস। তা সে মানুষ বলেই হোক, আর সাপ-কোপ, ভূত-প্রভৃতি হোক—ভয় কাহাকে বলে ইহা সে একেবারেই জানিত না। সুন্দরী কতকটা সে কারণেও এতদিন তাহার মুখ খুলিতে পারে নাই।

বিরাজ উনুনের কাঠটা ঠেলিয়া দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আচ্ছা সুন্দরী, তুই ত অনেকবার সেখানে গিয়েছিস, অনেক কথাও কয়েচিস, কিন্তু আমাকে ত একটি কথাও বলিস নি।—সুন্দরী প্রথমটা কিছু হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া কহিল, কে তোমাকে বললে মা, আমি অনেক কথা কয়ে এসেচি?

বিরাজ বলিল, কেউ বলেনি, আমি নিজেই জানি। আমার কপালের পেছনে আরও দুটো চোখ-কান আছে। বলি, কাল ক'টাকা বকশিশ নিয়ে এলি? দশ টাকা?

সুন্দরী বিষয়ে অবাধ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে একটা পাণুর ছায়া পড়িল, উনুনের অস্পষ্ট আলোকেও বিরাজ তাহা দেখিল এবং সে যে কথা খুজিয়া পাইতেছে না তাহাও বুঝিল।

ঈশ্বর হাসিয়া বলিল, সুন্দরী, তোর বুকের পাটা এত বড় হবে না যে, তুই আমার কাছে মুখ খুলবি; কিন্তু, কেন মিছে আনাগোনা করে, টাকা খেয়ে শেষে বড়লোকের কোপে পড়বি? কাল থেকে এ বাড়িতে আর ঢুকিস নে। তোর হাতের জল পায়ে ঢালতেও আমার ঘেন্না করে। এতদিন তোর সব কথা জানতুম না, দুর্দিন আগে তাও শুনেচি। কিন্তু যা, আঁচলে যে দশ টাকার নোট বাঁধা আছে, ফিরিয়ে দি গে, দিয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখ-খান্ধা করে খে গে। নিজে বরসকালে যা করেচিস, সে ত আর ফিরবে না, কিন্তু আর পাঁচজনের সর্বনাশ করতে যাসনে।

সুন্দরী কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার জিত মুখের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

বিরাজ তাহাও দেখিল। দেখিয়া, বলিল, মিথ্যে কথা বলে আর কি হবে? এ-সব কথা আমি কাউকে বলব না। তোর আঁচলে বাঁধা নোট কোথা থেকে এল, সে কথা আমি আগে বুঝিনি, কিন্তু, এখন সব বুঝতে পাচ্ছি। যা, আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম—কাল আর আমার বাড়ি ঢুকিস নে।

এ কি কথা! নিদারুণ বিষয়ে সুন্দরী বাকশূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। এ বাটীতে তাহার কাজ গেল, এমন অসম্ভব কথা সে মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতেও পারিল না। সে যে অনেক দিনের দাসী! সে বিরাজের বিবাহ দিয়াছে, হরিমতিতে মানুষ করিয়াছে, গৃহিণীর সহিত তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে—সেও যে এ বাটীর একজন। আজ তাহাকেই বিরাজবৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল! ক্ষোভ এবং অভিমান তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল—একমুহুর্তে বড় রকমের জবাবদিহি, কত রকমের কথা তাহার জিহায়ে পর্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ শব্দ করিতে পারিল না—বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

বিরাজ মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু সেও কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হাঁড়ির জল কয়িয়া গিয়াছে। অদূরে একটা পিঙ্গলের কলসীতে জল ছিল, ঘটি লইয়া তাহার কাছে আসিল; কিন্তু কি ভাবিয়া একমুহুর্তে হির হইয়া থাকিয়া ঘাটটা রাখিয়া দিয়া বলিল, না, তোর হাতের জল হুঁলে ওর অকল্যাণ হবে—তুই এ হাত দিয়ে টাকা নিয়েচিস।

সুন্দরী এ ভিরঙ্কারেও উত্তর দিতে পারিল না।

বিরাজ আজ একটা শ্রীপ জ্বালিয়া কলসীটা তুলিয়া লইয়া এই রাস্তাে সুটীভেদ্য অন্ধকারে আমবাগানের ভিতর গিয়া একা নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল।

বিরাজ চলিয়া গেল, সুন্দরীর একবার মনে হইল সেও পিছনে যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারে সর্দীপ বনপথ, চারিদিকের প্রাচীর, সপ্তগ্রামের জানা-অজানা সমাধিস্থল, ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ—সমস্ত দৃশ্যটা তাহার মনের মধ্যে উদ্ভিত হইবামাত্র তাহার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সে অশ্রুটধরে ‘মা গো’ বলিয়া ডাক হইয়া বসিয়া রহিল।

পাঁচ

দিন-দুই পরে নীলাধর বলিল, সুন্দরীকে দেখিচি নে কেন বিরাজ?

বিরাজ বলিল, আমি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাধর 'পরিহাস' মনে করিয়া বলিল, বেশ করেচ। বল না কি হয়েছে তার?

বিরাজ বলিল, কি আবার হবে, আমি সত্যিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাধর তথাপি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, তাকে ছাড়িয়ে দেবে কি করে? আর সে যত দোষই করুক, কতদিনের পুরনো লোক তা জান? কি করেছিল সে?

বিরাজ বলিল, ভাল বুঝেচি, তাই ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাধর বিরক্ত হইল, বলিল, কিসে ভাল বুঝলে তাই জিজ্ঞেস করি।

বিরাজ স্বামীর মনের ভাব বুঝিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি ভাল বুঝেচি—ছাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি ভাল বুঝ, ফিরিয়ে আন গে।—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রাস্তাঘরে চলিয়া গেল।

নীলাধর বুঝিল বিরাজ রাগিয়াছে, আর কোন কথা কহিল না। সে ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া রাস্তাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু ছাড়িয়ে যে

কাজ

করবে কে?

এখান বিবাহ মুখ ফিরাইয়া হাসিল। তাহার পরে বলিল, তুমি।

নীলাধর হাসিয়া বলিল, তবে দাও এঁটো বাসনগুলো মেজে ধুয়ে আনি।

বিরাজ হাতের খুঁটিটা খনাৎ করিয়া ফেলিয়া হাত ধুইয়া কাছে আসিয়া পায়ে ধূলী মাথায় লইয়া বলিল, যাও তুমি এখন থেকে। একটা তামাশা করবার জো নেই—তা হলেই এমন কথা বলে বসবে যে, কানে শুনলে পাপ হয়।

নীলাধর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, এও কানে শুনলে পাপ হয়? তোর পাপ যে কিসে হয় না, তা ত বুঝিলে বিরাজ?

বিরাজ বলিল, তুমি সব বোঝ। না বুঝলে এত কাজ থাকতে এঁটো বাসনের কথা ভুলতে না—যাও, আর বেলা ক'রো না, ন্নান করে এসো—আমার রান্না হয়ে গেছে।

নীলাধর চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল বলিল, সত্যি কথা বিরাজ, সংসারের কাজকর্ম করবে কে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া বলিল, সে হবে না, দাসী-চাকরের কাজ আমি তোমায় করতে দিতে পারব না। সুন্দরী কোন দোষ করেনি, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্য তুমি তাকে সরিয়েচ, বল সত্যি কিনা?

বিরাজ বলিল, না সত্যি নয়! সে যথার্থই দোষ করেছে।

কি দোষ?

তা আমি বলব না। যাও, আর বসে থেক না, ন্নান করে এসো।—বলিয়া বিরাজও দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাধরকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কৈ গেলে না? এখনও বসে আছ যে?

নীলাধর ব্রুদুহয়ে বলিল, যাই—কিন্তু, বিরাজ, এ ত আমি সহিতে পারব না, তোমাকে উপব্রুতি করতে দেব কি করে?

কথাটা শুনিয়া বিরাজ খুশী হইল না। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি করবে তুমি? সুন্দরীকে না চাও আর কোন লোক রাখি—তুমি একাই বা থাকবে কি করে?

যেমন করেই থাকি না কেন, আমি আর লোক চাইনে।

নীলাশ্বর বলিল, না, সে হবে না। যতক্ষণ সংসারে আছি ততদিন মান-অপমানও আছে ; পাড়ার লোক শুনে কি বলবে ?

বিরাজ অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, পাড়ার লোকে শুনে কি বলবে এইটাই তোমার আসল ভয়। আমি কি করে থাকব, আমার দুঃখ-কষ্ট হবে, এ কেবল তোমার একটা হল।

নীলাশ্বর কুক-বিশ্বরে চোখ তুলিয়া বলিল, হল ?

বিরাজ বলিল, হাঁ, হল। আজকাল আমি সব দেখেছি। আমার মুখের দিকে যদি চাইতে, আমার দুঃখ ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুনে, তা হলে আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না।

নীলাশ্বর বলিল, তোমার একটা কথাও শুনিনি ?

বিরাজ জোর দিয়া বলিল, না, একটাও না। যখন যা বলেছি, তাই কোন না কোন হল করে উড়িয়ে দিয়ে—তুমি কেবল ভেবেচ নিজের পাপ হবে, মিথ্যে কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে—একবারও ভেবেচ কি, আমার কি হবে ?

নীলাশ্বর বলিল, আমার পাপ কি তোমার পাপ নয়, আমার অপযশে কি তোমার অপযশ হবে না ?

এবার বিরাজ রীতিমত ক্রুদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণভাবে বলিল, দেখ ও—সব ছেলেভুলানো কথা—ওতে ভোলবার বয়স আমার আর নেই। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—কেবল তুমি নিজের কথা ভাব, আর কিছু ভাব না। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ কথা মুখ দিয়ে বার করেত হ'ল—আজ নিজের ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দুটো ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি করে বেড়াতে হবে। তবে একটা কথা এই যে, সে তোমাকে চোখে দেখতেও হবে না, কানে শুনেও হবে না—কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জা ত হবে না, ভাবনা-চিন্তা করবারও দরকার নেই—এই না ?

নীলাশ্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটির দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ কক্ষণ তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ-কষ্ট হয়েছে বলেই রাগ করে বলচ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না, এ তুমি ঠিক জান।

বিরাজ বলিল, তাই আগে জানতুম বটে, কিন্তু কষ্ট যে কি, তা কষ্টে না পড়লে যেমন ঠিক বোঝা যায় না, পুরুষমানুষের মায়্যা-দয়াও তেমনই, সময় না হ'লে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু, তোমার সঙ্গে এই দুপুরবেলায় আমি রাগারাগি করতে চাইনে—যা বলছি তাই কর, যাও নেয়ে এসো।

নীলাশ্বর 'যাচ্ছি' বলিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, আজ দু বছর হতে চলল, পুঁটির আমার বিয়ে হয়েছে। তার আগে থেকে আজ পর্যন্ত সব কথা সেদিন আমি মনে মনে ভেবে দেখছিলাম—আমার একটা কথাও তুমি শোননি। যখন যা কিছু বলেছি, সমস্তই একটা একটা করে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে গেছ। লোকে বাড়ির দাসী-চাকরেরও একটা কথা রাখে, কিন্তু তুমি তাও আমার রাখনি।

নীলাশ্বর কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমার সঙ্গে ভর্ক করব না। কত বড় ঘেঁসায় যে আমি ইন্দিদেবতার নাম করে দিবি করেছি, তোমাকে আমার একটি কথাও বলতে যাব না, সে কথা তুমিও শুনেও পেতে না, আজ যদি না কথার কথা কহি পড়ত। এখন হয়ত তোমার মনে পড়বে না, কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন আমি মাথার ব্যথায় ঘুমিয়ে পড়ি ; তোমাকে সের খুলে দিতে সেরি হয়েছিল বলে মারতে উঠেছিলে, আমার অসুখের কথা বিশ্বাস করনি। সেইদিন থেকে দিবি করেছিলাম, অসুখের কথা

আর জানাব না—জাজ পর্বত সে দিখি ভাঙ্গিনি।

নীলাধর মুখ তুলিতেই দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল। সে সহসা উঠিয়া আসিয়া বিরাজের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়া উদ্ধিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিল, সে হবে না বিরাজ, কক্ষণ তোমার সেহ ভাল নেই। কি অসুখ হয়েছে বল—বলতেই হবে।

বিরাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ছাড়—লাগচে।

লাগুক—বল কি হয়েছে?

বিরাজ শুদ্ধভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কৈ, কিছুই ত হয়নি, বেশ আছি।

নীলাধর অবিশ্বাস করিয়া বলিল, না, কিছুতেই তুমি বেশ নেই। না হলে, কখন তুমি সেই কত বৎসরের পুরনো কথা তুলে আমার মনে কষ্ট দিতে না—বিশেষ যার জন্যে কতদিন, কত মাপ চেয়েচি।

আচ্ছা, আর কোন দিন বলব না,—বলিয়া বিরাজ নিজেকে মুক্ত করিয়া ঈষৎ সরিয়া বলিল।

নীলাধর তাহার কথার অর্থ বুঝিল, কিন্তু আর কিছু বলিল না। তার পর মিনিট দুই-তিন চূপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

রাত্রে প্রদীপের আলোকে বসিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতেছিল। নীলাধর খাটের উপর শুইয়া নিঃশব্দে তাহাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল, এ জন্মে তোমার ত কোন দোষ-অপরাধ শত্রুতেও দিতে পারে না, কিন্তু তোমার পূর্বজন্মের পাপ ছিল, না হলে কিছুতেই এমন হ'ত না।

বিরাজ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ত না?

নীলাধর কহিল, তোমার সমস্ত দেহ-মন ভগবান রাজারানীর উপযুক্ত করে গড়ে ছিলেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

নীলাধর চূপ করিয়া রহিল।

বিরাজ একমুহূর্ত উত্তরের আশায় থাকিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, এ খবর কখন তোমাকে ভগবান দিয়ে গেলেন?

নীলাধর কহিল, চোখ-কান থাকলে ভগবান সকলকেই খবর দেন।

বিরাজ 'হঁ' বলিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

নীলাধর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তখন বলছিলে, আমি কোন কথা তোমার শুনিতে, হয়ত তাই সত্যি, কিন্তু তা কি শুধু একলা আমারই দোষ?

বিরাজ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, বেশ ত, আমার দোষটাই দেখিয়ে দাও?

নীলাধর বলিল, তোমার দোষ দেখাতে পারব না ; কিন্তু আজ একটা সত্যি কথা বলব। তুমি নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা করেই দেখ। কিন্তু এটা ত একবার ভেবে দেখ না, তোমার মত ক'টা মেয়েমানুষ এমন নির্গুণ মূর্খের হাতে পড়ে? এইটেই তোমার পূর্বজন্মের পাপ, নইলে তোমার ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়।

বিরাজ নিঃশব্দে চিঠি লিখিতে লাগিল। বোধ করি সে মনে করিল ইহার জবাব দিবে না ; কিন্তু থাকিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুনে আমি খুশী হই?

কি সব কথা?

বিরাজ বলিল, এই যেমন রাজারানী হতে পারতুম—শুধু তোমার হাতে পড়েই এমন হয়েছে, এই সব ; মনে কর, এ শুনে আমার আত্মা হয়, না যে বলে তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে?

নীলাধর দেখিল, বিরাজ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে সে

আশা করে নাই, তাই মনে মনে সঙ্কুচিত এবং কুচিঁত হইয়া পড়িল; কিন্তু কি বলিয়া প্রসন্ন করিলে, সহসা তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

বিরাজ বলিল, রূপ, রূপ, রূপ। শুনে শুনে কান আমার ভোঁতা হয়ে গেল। আর যারা বলে, তাদের না হয় এইটেই সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু তুমি স্বামী, এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে ধরে এত বড় হয়েচি, তুমিও কি এর বেশী আমার আর কিছু দেখ না? এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় বস্তু? তুমি কি বলে এ কথা মুখে আন? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না, এই দিয়ে তোমাকে তুলিয়ে রাখতে চাই?

নীলাক্ষর অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্তমত খাইয়া বলিতে গেল, না না—

বিরাজ কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই, সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হলে ভালবাসতে কিনা! মনে পড়ে?

নীলাক্ষর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পড়ে, কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—

বিরাজ বলিল, হী বলেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হলেও ভালবাসতে, কেননা, আমাকে বিয়ে করেছে। গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বউ, আমাকে এ-সব কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না? এর পূর্বেও আমাকে তুমি এ কথা বলেচ।—বলিতে বলিতে তাহার ক্রোধে অভিমানে চোখে জল আসিয়া পড়িল, এবং সে জল প্রদীপের আলোকে চকচক করিয়া উঠিল। নীলাক্ষর দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

বিরাজ নিজেই একদিন বলিয়া দিয়াছিল, তিনি হাত ধরিলে আর তাহার রাগ থাকে না।

নীলাক্ষর সেই কথা হঠাৎ স্মরণ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার দান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া পাশ্বে উপবেশন করিয়া চূপ করিয়া রহিল।

বিরাজ বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সেই রায়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে জাগিয়া ছিল। এক সময়ে নীলাক্ষর সহসা দ্বীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ কেন অত রাগ, বিরাজ?

বিরাজ জবাব দিল, কেন তুমি ও-সব কথা বললে?

নীলাক্ষর বলিল, আমি ত মন্দ কথা বলিনি!

বিরাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, অধীরভাবে বলিল, তবু বলবে মন্দ কথা নয়? খুব মন্দ কথা। অত্যন্ত মন্দ কথা। ওই জন্যেই সুন্দরীকে—

সে আর বলিল না, চূপ করিয়া গেল।

নীলাক্ষর আর প্রথ্য করিল না।

তখন বিরাজ নিজেই বলিল, দেখ, জেরা ক'রো না—আমি কচি খুকি নই—ভালমন্দ বুঝি। তাড়াবার মত দোষ করেছে বলেই তাড়িয়েচি। কেন, কি বৃশ্চাৎ, এত কথা তুমি পুরুষমানুষ নাই শুনলে।

না, আর অত শুনতে চাইনে, বলিয়া নীলাক্ষর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরাইয়া গেল।

পৃথগ্ন হইবার দুই-চারি দিন পরেই ছোটভাই গীতাম্বর বাটীর মাঝখানে দরমা ও ছোট ভাশের বেড়া দিয়া নিজের অংশ আবাদ করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে দরজা ফুটাইয়া এবং তাহারই সম্মুখে একটি ছোট বৈঠকখানা-ঘর করিয়া সে সর্ব্বকমে নিজের বাড়িটিকে বেশ মানানসই বরখা করে করিয়া লইয়া মহা আরামে জীবন-যাপন করিতেছিল। কোনদিনই প্রায় সে দাদার সহিত বড় একটা কথাবার্তা বলিত না। এখন সমস্ত একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এদিকে বিরাজকে প্রায় সমস্তদিন একলাটি কাটাইতে হইত। সুন্দরী রাণার পর হইতে শুধু যে সমস্ত স্বাক্ষর তাহারই করিতে হইত তাহা নহে; যে-সব কাজ পূর্বে দাসীতে করিত, সেইগুলি লোকলজ্জাবশতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাকে সমাধা করিয়া লইবার জন্য অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত। এমনই একদিন কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ ও-বাড়ি হইতে

বেড়ার ফাঁক দিয়া অতি মৃদুভাবে ডাক আসিল, দিদি!

রাত অনেক হইয়াছিল। বিরাজ চমকিয়া মুখ তুলিল। তেমনই মৃদুস্বরে আবার কহিল, দিদি, আমি মোহিনী।

বিরাজ আশ্চর্য হইয়া বলিল, কে, ছোটবৌ! এত রাত্তিরে?

হাঁ দিদি, আমি। একবারটি কাছে এসো।

বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতেই ছোটবৌ চুপি চুপি বলিল, দিদি, বঠাকুর ঘুমিয়েছেন?

বিরাজ বলিল, হাঁ।

মোহিনী বলিল, দিদি, একটা কথা আছে, কিন্তু বলতে পাচ্ছি নে,—বলিয়া চুপ করিল।

বিরাজ তাহার কণ্ঠের স্বরে বুঝিল ছোটবৌ কাঁদিতেছে। চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে ছোটবৌ?

ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না, বোধ করি, সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। এবং নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল।

বিরাজ সখিঃ হইয়া বলিল, কি ছোটবৌ?

এবার সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিল, বঠাকুরের নামে নালিশ হয়েছে,—কাল সমন না কি বার হবে, কি হবে দিদি?

বিরাজ ভয় পাইল, কিন্তু সে-ভাবে গোপন করিয়া বলিল, সমন বার হবে, তার আর ভয় কি ছোটবৌ?

ভয় নেই দিদি?

বিরাজ বলিল, ভয় আর কি! কিন্তু নালিশ করলে কে?

ছোটবৌ বলিল, ভুল মুখুয্যে।

বিরাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, থাক আর বলতে হবে না—বুঝেছি। মুখ্যোমশাই ঠর কাছের টাকা পাবেন, তাই বোধ করি নালিশ করেছেন। কিন্তু তাতে ভয়ের কথা কিছু নেই ছোটবৌ। তারপর উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে ছোটবৌ কহিল, দিদি, কোনদিন তোমার সঙ্গে আমি বেশী কথা কইনি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই—আজ ছোটবোনের একটি কথা রাখবে দিদি?

তাহার কণ্ঠস্বরে বিরাজ আশ্রয় হইয়া গিয়াছিল, এখন অধিকতর আশ্রয় হইয়া বলিল, কেন রাখব না বোন?

তবে, একবারটি হাত পাত। বিরাজ হাত পাতিতেই একটি ক্ষুদ্র কোমল হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া বলিল,—কেন ছোটবৌ?

ছোটবৌ কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, এইটে বিক্রি করে হোক, বাঁধা দিয়ে হোক, ওর টাকা শোধ করে দাও দিদি।

এই আকস্মিক অব্যাহিত ও অচিন্ত্যপূর্ব সহানুভূতিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাজ অভিভূত হইয়া পড়িল—কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু 'চললুম দিদি', বলিয়া ছোটবৌ সরিয়া যায় দেখিয়া, সে ত্যাগাতাড়ি ডাকিয়া উঠিল, যেও না ছোটবৌ, শোন।

ছোটবৌ শিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন দিদি?

বিরাজ সেই ফাঁকটা দিয়া তৎক্ষণাৎ অপর দিকে হারটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, ছি, এ-সব করতে নেই।

ছোটবৌ তাহা লইয়া ক্ষুদ্রস্বরে প্রশ্ন করিল, কেন করতে নেই?

বিরাজ বলিল, ঠাকুরপেণ্ডে শুনলে কি বলবেন?

কিন্তু তিনি ত শুনতে পারেন না।

আজ না হোক দু-দিন পরে জানতে পারবেন, তখন কি হবে?

ছোটবৌ বলিল, তিনি কোনদিন জানতে পারবেন না, দিদি। গত বছর যা মরবার সময়

এটি নুকিরে আমাকে দিয়ে যান, তখন থেকে কোনদিন পারনি, কোনদিন বার করিনি—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, এটি ছুঁমি নাও!

তাহার কাতর অনুনয়ে বিরাজের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া এই নিঃসঙ্গায়া রমণীর আচরণের সহিত সহোদরের আচরণ তুলনা করিয়া দেখিল। তারপর হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আজকের কথা মরণকাল পর্যন্ত আমার মনে থাকবে বোন। কিন্তু এ আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া স্বামীকে লুকিয়ে কোন যেয়েমানুষের কোনও কাজই উচিত নয় ছোটবৌ! তাতে তোমার আমার দু'জনেরই পাপ।

ছোটবৌ বলিল, ছুঁমি সব কথা জান না তাই বলচ—কিন্তু ধর্মার্থ আমারও ত আছে দিদি,—আমিই বা মরণকালে কি জবাব দেব?

বিরাজ আর একবার চোখ মুছিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোটবৌ, শুধু তোমাকেই এতদিন চিনতে পারিনি; কিন্তু তোমাকে ত মরণকালে কোন জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ তোমার অন্তর্যামী নিজেই লিখে নিয়েচেন। যাও, রাত হ'ল, শোও গে বোন।—বলিয়া প্রত্যাশ্বরের অবসর না দিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু সেও ঘরে ঢুকিতে পারিল না। অন্ধকার বারান্দার একধারে আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার নালিশ মকদ্দমার কথা মনে হইল না, কিন্তু ওই স্বপ্নভাবিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজায়ের সৰ্বক্ষণ কথাগুলি মনে করিয়া প্রস্রবণের মত তাহার দুই চোখ বাহিয়া নিরন্তর জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ সব চেয়ে দুঃখটা তাহার এই বাজিতে লাগিল যে, এতদিন এত কাছে পাইয়াও সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, চিনিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা না করিলেও একটি দিনও তাহার হইয়া কখন ভাল কথা বলে নাই। সুতীক্ষ্ণ বাজের আলো একমুহুর্তে যেমন করিয়া অন্ধকারে চিরিয়া ফেলে, আজ ছোটবৌ তেমনই করিয়া তাহার বুকের অন্তস্তল পর্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে কঁাদিতে কঁাদিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ কাহার হস্তস্পর্শে সে খড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল, নীলাশ্বর আসিয়া তাহার শিরেরের কাছে বসিয়াছে।

নীলাশ্বর সংক্ষেপে বলিল, ঘরে চল, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বিরাজ কোন কথা না বলিয়া স্বামীর দেহ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া নিজীবের মত শুইয়া পড়িল।

ছয়

এক বৎসর কাটিয়াছে। এ বৎসর দুই আনা ফসলও পাওয়া যায় নাই। যে জমিওলা হইতেই প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত, তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখ্যোমশাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে, ছোটভাই সীতাম্বর তাহা গোপনে নিজের নামে ফিরাইয়া লইয়াছে—তাঁহাও জানাজানি হইয়াছে। হালের একটা গরু মরিয়াছে। পুকুর রোদে ফাটিতেছে—বিরাজ কোনদিকে চাহিয়া আর কুলকিনারা দেখিতে পাইল না। দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অথচ অব্যক্ত মন্দ যাতনায় সর্বদেহটা যেরকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসর হইয়া আসিতে থাকে, সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল। আঁধারে সে যখন তখন হাসিত, কথার কথায় ছল ধরিয়া পরিহাস করিত, কিন্তু এখন বাড়ির মধ্যে এমন একটি লোক নাই যে সে কথা কহে। অথচ কেহ দেখা করিতে আসিলে, সংবাদ লইতে আসিলেও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। অভিমানী প্রকৃতি তাহার, পাড়ার লোকের একটা কথাতেও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সংসারের কাছে তাহার সে আর লেশমাত্র উৎসাহ নাই, তাহা তাহার কাজের দিকে চোখ ফিরাইলেই চোখে পড়ে। তাহার ঘরের শয্যা মলিন, ঝাঁপড়ের আলনা অগোছান, ভিনিসপত্র অপরিস্কার—সে কীট বিদ্যা ঘরের কোণে জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে—ছুঁলিয়া কেলিয়া দিবার মত—জোয়ও

সে যেন নিজের দেহের মধ্যে আর খুঁজিয়া পায় না। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে নীলাশ্বর ছোটবোন হরিমতিকে দুইবার আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পাঠায় নাই। দিন-পনের হইল একখানা টিষ্ঠি লিখিয়াছিল, হরিমতির খণ্ডর তাহার জবাব পর্যন্ত দেয় নাই। কিন্তু বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্যন্ত করিবার জো নাই। সে একেবারে আশুনের মত জুলিয়া উঠে। পুটিকে মানুষ করিয়াছে, মায়ের মত ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার সমস্ত সন্তেব পর্যন্ত আজকাল তাহার কাছে বিধ হইয়া থিয়াছে।

আজ সকালে নীলাশ্বর গ্রামের পোস্ট আপিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিম্বমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পুটির খণ্ডর একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না—এ পূজাতেও বোধ করি বোনটিকে একবার দেখতে পেলেন না।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে একবার মুখ তুলিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

সেইদিন দুপুরবেলা আহায়ে বসিয়া নীলাশ্বর আস্তে আস্তে বলিল, তার নাম করলেও তুমি জ্বলে ওঠ—সে কি কোন দোষ করেছে?

বিরাজ অদুরেই বসিয়া ছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, জ্বলে উঠি কে বললে?

কে বলবে, আমি নিজেই টের পাই।

বিরাজ ক্ষণকাল স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, পেলেই ভাল। বলিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল, নীলাশ্বর ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আজকাল এমন হয়ে উঠচ কেন? এ যেন একেবারে বদলে গেছে।

বিরাজ ফরিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা মন দিয়া শুনিয়া বলিল, বদলালেই বদলাতে হয়, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ইহার দুই-তিন দিন পরে অপরাহ্নবেলায় নীলাশ্বর বাহিরের চতীমণ্ডপে একা বসিয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিল, বিরাজ পিছনে আসিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাশ্বর মুখ তুলিয়া বলিল, কি?

বিরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জবাব দিল না।

নীলাশ্বর মুখ নীচু করিতেই বিরাজ রুদ্ধস্বরে বলিল, আর একবার মুখ তোল দেখি।

নীলাশ্বর মুখও তুলিল না, জবাবও দিল না; চুপ করিয়া রহিল?

বিরাজ পূর্ববৎ কঠিনভাবে বলিল, এই যে চোখ-রাস্তা হয়েছে, জবাব ঐগুলো খেতে শুরু করে?

নীলাশ্বর কথা কহিল না, ভয়ে চোখ নীচু করিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। একে ত চিরদিনই সে তাহাকে ভয় করে, তাহাতে কিছুদিন হইতেই বিরাজ এমনই একরাশি উত্তণ্ড বারুদের মত হইয়া আছে যে, কখন কিভাবে জুলিয়া উঠিবে তাহা আন্দাজ পর্যন্ত করিবার জো ছিল না।

বিরাজও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, সেই ভাল, গাঙ্গা-গুলি খেয়ে বোমভোলা হয়ে বসে থাকবার এই ত সময়, বলিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। সেদিন গেল, পরদিন গেল, নীলাশ্বর আর থাকিতে না পারিয়া সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকালবেলা পীতাম্বরকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, পুটির খণ্ডর ত একটা জবাব পর্যন্ত দিল না—তুই একবার চেষ্টা করে দেখ না, যদি ঝুলটিকে দুটো দিনের ভরেও আমতে পারিস!

পীতাম্বর দাদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি থাকতে আমি আবার কি চেষ্টা করব?

নীলাশ্বর তাহার শঠতা বুঝিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু, যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল, তা হোক, যেমন আমার, তোরও ত সে তেমনই যেন। না হয় মনে কর না আমি মরে গেছি—এখন, তুই শুধু একলা আছিস।

শ্রীমন্ত শঙ্কর, বা সত্যি না হা ছোয়ার মত আমি মনে করতে পারিনে। আর তোমাকে চিনি। আমার মনে না, আমাকেই বা দেখে কেন?

আজ্ঞা! তাই ভাল, এ নিজে হোক, সঙ্গে আমি বগড়া করতে চাইনে, কিন্তু আমার জিহ্বার জবাব দেয় না এই জন্যে তু হোক ডাকিলি—বা বলাচি, প্যারিস কি না, তাই বলা!

নীতাস্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল?

করলে কি হ'তঃ

भीताय नमः, सान्ना-पारमहि दिव्य ।

নীলাশ্বরের মাথার মধ্যে আশুন ছালিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিত্তে লাগিল, তবুও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, তা হলে পারবি নে?

পীতাম্বর বলিল, না। আর, পুঁটির খণ্ডরও যা, নিজের খণ্ডরও তাই—এঁরা গুরুজন। তিনি যখন পাঠ্যে ইচ্ছা করেন না; তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারিনে—ও স্বভাব আমার নয়।

তাহার কথা শুনিয়া নীলাম্বরের একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া লাধি মারিয়া উহার ঐ মুখ গুঁড়া করিয়া ফেলে, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, যা, বেরো—যা আমার সামনে থেকে।

নীতাম্বরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, খামকা রাগ কর কেন দাদা? না গেলে তুমি কি আমাকে জোর করে তাড়াতে পার?

নীলাশ্বর দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, বুড়া বয়সে মার খেয়ে যদি না মরতে চাস, সরে যা আমার সমুখ থেকে!

তথাপি রীতাস্বর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু, নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিল, ব্যাস! একটি কথাও না—যাও।

গোয়ার নীলান্বরের গায়ের জোর প্রসিদ্ধ ছিল।

পীতাম্বর আর কথা কহিতে সাহস করিলা না, আশ্বে আশ্বে বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ গোলযোগ ওনিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, হি, সমস্ত জেনেওনে কি ভাইয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করতে আছে?

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে জবাব দিল, জানি বলে কি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব? আমার সব সত্য হয় বিরাজ, শুণুমি সত্য হয় না।

বিরাজ বলিল, কিন্তু তুমি এ একা নও, আজ হাত ধরে বার করে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবার ভাব কি?

নীলাদ্রয় বলিল, না। তিনি ভাবেন, তিনি ভাবেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাইনে।

বিরাজ জমিদার ছিল, ত্রাটিক। যার কাজের মধ্যে খোল বাজানো আর মহাতারত পড়া—
তার ভাবনা-চিন্তে মিছে।

কথাগুলি বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া বলে নাই, নীলাচরের কানেও তাহা সম্বন্ধবর্ণ করিল না, তথাপি সে সম্বন্ধভাবে বসিল, ওগুলো আমি সবচেয়ে বড় কাজ বলেই মনে করি। জা ছাড়া, তাহাতে থাকলেই কি কপালের মেখা মুছে যাবে? বলিয়া সে একবার কপালে হাত দিয়া বলিল, চোখে বেশ বিবাহ এইখানে লেখা ছিল, সত্য অনেক রাক্ষস-মহারাক্ষসকে গাছতলায় বাস করিতে হইতেন— অমিঃ অতিঃ ভাঃ।

বিরক্ত অঙ্গরের মধ্য দখ হুঁসা নাইতেছিল, বলিল, ও-সব মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়। যা হাড়া, তুলিই না, ছয় পাখতলায় বাস করতে পার, আমি ত পারিনে! মেয়েমানুষের লক্ষ্যশব্দ আছে—সত্যকে, খোলামেয়ে করে হোক, দাসীবৃত্তি করে হোক, একটুখানি আত্মায়ের মধ্যে বাস করতেই হবে। ছোটকিছরের মন বুগিয়ে থাকতে না পার,

অন্ততঃ হাঁড়াহাতি করে সব দিক মাটি কর না।—বলিয়া সে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রীতে ইতিপূর্বে অনেকবার অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। নীলাশ্বর তাহা জানিত, কিন্তু আজ যাহা হইয়া গেল, তাহা কলহ নহে—এ ধূর্ত তাহার কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে শুভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করেক মুহূর্ত পরেই বিরাজ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, অমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বেলা হয়েছে—যাও, মানিকিয়া করে দুটো খাও—যে কটা দিন পাওয়া যায়, সেই কটা দিনই লাভ।—বলিয়া আর একবার সে স্বামীর বৃকে শূল বিধিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ঘরে দেওয়ালে একটি রাখাক্ষের পট ঝোলানো ছিল, সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া নীলাশ্বর হঠাৎ কাদিয়া ফেলিল; কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পায়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

আর বিরাজ? সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই তাহার চোখে যখন তখন জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। যাহার এতটুকু কষ্ট সে সহিতে পারিত না, তাহাকে এত বড় শক্ত কথা নিজের মুখে বলিয়া অবধি তাহার দুঃখ ও আত্মশ্লানির সীমা ছিল না। সমস্ত দিন জলস্পর্শ করিল না, কাদিয়া মিছামিছি এ-ঘর ঘর করিয়া ফিরিল, তার পর সম্ভার সময় তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রশাম করিয়াই একেবারে ফুপাইয়া কাদিয়া উঠিল।

সমস্ত বাড়ি নির্জন, নিস্তব্ধ। নীলাশ্বর বাড়ি নাই, তিনি দুপুরবেলা একটিবারমাত্র পাতের কাছে বসিয়াই উঠিয়া গিয়াছিলেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

বিরাজ কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার কাছে কি বলিবে—আজ কোন দিকে চাহিয়া কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, সেইখানে অজ্ঞকার উঠানের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতে লাগিল। কেবলই বলিতে লাগিল,—অন্তর্ধামী ঠাকুর একটিবার মুখ তুলে চাও। যে লোক কোন দোষ, কোন পাপ করতে জানে না, তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর—আর আমি সহিতে পারব না।

রাত্রি তখন নটা বাজিয়া গিয়াছিল, নীলাশ্বর নিঃশব্দে আসিয়া শয়্যায় শুইয়া পড়িল। বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পায়ের কাছে বসিল। নীলাশ্বর চাহিয়া দেখিল না কথাও কহিল না।

খানিক পরে বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটা হাত রাখিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। আরও মিনিট-পাঁচেক নিস্তব্ধে কাটিল—বিরাজের লুপ্ত অভিমান ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে বলিল, সমস্ত দিন যে খেঁশে না, এটা কার ওপর রাগ করে শুনি?

ইহাতেও নীলাশ্বর জবাব দিল না।

বিরাজ বলিল, বল না শুনি?

নীলাশ্বর উদাসভাবে বলিল, শুনে কি হবে?

বিরাজ বলিল, তবু শুনিই না।

এবার নীলাশ্বর অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সূতীক শূলের মত উদাত্ত করিয়া বলিল, তোর আমি গুরুজন বিরাজ, খেলার জিনিস নয়।

তাহার চোখের চাহনি, গলায় শব্দ শুনিয়া বিরাজ সর্দরে চমকিয়া, স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আর্ত, এমন গভীর কঠোর সে ত কোন দিক শুনে নাই।

সাত

বঙ্গরার গল্পে কয়েকটা পিতলের কবজার কারখানা ছিল। এ পাড়ার চাঁড়ালদের মেয়েরা মাটির ছাঁচ তৈরি করিয়া বিক্রি করিয়া আসিত। অসহ্য দুঃখের জ্বালার বিরাজ তাহাদেরই একটি মেয়েকে ডাকিয়া ছাঁচ তৈরি করিতে শিখিয়া লইয়াছিল। সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী এবং অসাধারণ

কর্মপটু, দু'দিনেই এ কিয়দ আয়ত্ত করিয়া লইয়া সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্যাপারীরা আসিয়া এতলি নগদ মূল্য দিয়া কিনিয়া লইয়া যাইত। রোজ এমনই করিয়া সে আট আনা উপার্জন করিতেছিল, অথচ, স্বামীর কাছে লজ্জায় তাক্য প্রকাশ করিতে পারিত না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাতে নিশেদে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই কাজ করিত। আজ রাতেও তাহাই করিতে আসিয়াছিল এবং ক্রান্তিবশতঃ কোন এক সময়ে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলাধর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শয্যার কাছকেও দেখিতে না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের হাতে তখনও কদা মাখা, আশে পাশে তৈরী হাঁচ পড়িয়া আছে এবং তাহারই একধারে হিমের মধ্যে ভিজা মাটির উপরে পড়িয়া সে ঘুমাইতেছে। আজ তিনিদিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা ছিল না। তদুত্তর অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া বিরাজের তুলুটিত সুগন্ধ মাথাটি সাবধানে নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। বিরাজ আগিল না, শুধু একটিবার নড়িয়া-চড়িয়া পা-দুটি আরও একটু গুটাইয়া লইয়া ভাল করিয়া শুইল। নীলাধর বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অপর হাতে অদূরবর্তী স্তিমিত-দীপশিখাটি আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একদৃষ্টে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কি হইয়াছে! কৈ, এতদিন সে ত চাহিয়া দেখে নাই! বিরাজের চোখের কোণে এমন কালি পড়িয়াছে! ভূর উপর, সুন্দর সুডৌল ললাটে দৃষ্টিভঙ্গার এত সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়াছে! একটা অবোধ, অব্যক্ত অপরিণীত বৈদন্য তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লগিল এবং অসাবধানে একফোঁটা বড় অশ্রু বিরাজের নিম্নলিখিত চোখের পাতার উপর টপ করিয়া পড়িবারাত্রই সে চোখ চাহিয়া দেখিল। ক্ষণকাল নিশেদে চাহিয়া রহিল, তার পর দুই হাত প্রসারিত করিয়া স্বামীর বক্ষ বেঁটন করিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল। নীলাধর সেইভাবে বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাটিল—কেহ কথা কহিল না। তারপর রাত্রি যখন আর বেশী বাকী নাই, পূর্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, তখন নীলাধর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সম্মুখে বলিল, আর হিমে থেকো না বিরাজ, ঘরে চল।

চল, বলিয়া বিরাজ উঠিয়া পড়িল, এবং স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। সকালবেলা নীলাধর বলিল, যা তোর আমার বাড়ি থেকে দিন-কতক ঘুরে আয় বিরাজ, আমিও একবার কলকাতায় যাই।

কলকাতায় গিয়ে কি হবে?

নীলাধর কহিল, কত রকম উপার্জনের পথ 'সেখানে' আছে, যা 'হোক একটা উপায় হইবে—কথা শোন বিরাজ, মাস-কয়েক সেখানে গিয়ে থাক্ গে!

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কতদিনে আমাকে ফিরিয়ে আনবে?

নীলাধর বলিল, ছ মাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনব, তোকে আমি কথা দিচ্ছি।

'আচ্ছা' বলিয়া বিরাজ সন্মত হইল।

দিন চার-পাঁচ পরে গরুর গাড়ি আসিল, আমার বাড়ি যাইতে আট-দশ ক্রোশ এই উপায়েই যাইতে হয়। অথচ বিরাজের ব্যবহারে যাত্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

নীলাধর ব্যস্ত হইতে লাগিল, ভাগিল দিতে লাগিল।

বিরাজ কান কানিতে করিতে বলিয়া বলিল, আজ ত আমি যাব না—আমার অসুখ কষ্টে।

নীলাধর অলস হইয়া বলিল, অসুখ কষ্টে কি রে?

বিরাজ বলিল, হাঁ, অসুখ কষ্টে—বড় অসুখ কষ্টে,—বলিয়া মুখ ভার করিয়া পিড়লের কলসীটা কাঁকালে তুলিয়া লইয়া নদীতে জল আসিতে চলিয়া গেল। সেদিন গাড়ি ফিরিয়া গেল। রাত্রি অনেক লম্বালাগি, অনেক বেলায়ানোর পর সে দু'দিন পরে যাইতে সন্মত হইল। দু'দিন পরে আবার গাড়ি আসিল।

নীলাধর সংকল্প লিখিয়াই বিরাজ একেবারে থাকিয়া বলিল,—না, আমি কখন যাব না।

নীলাশ্বর আরও আশ্চর্য হইয়া বলিল, যাবিনে কেন?

বিলাস কাদিয়া ফেলিল—না, আমি যাব না। আমার গয়না কৈ, আমি দীন-দুঃখীর মত কিছুতেই যাব না।

নীলাশ্বর রাগিয়া বলিল, আজ তোর গয়না নাই সত্যি, কিন্তু যখন ছিল, তখন ত একদিন ফিরেও চাসনি?

বিলাস চূপ করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নীলাশ্বর পুনরায় কহিল, তোর ছল আমি বুঝি। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিলই, তবে ভেবেছিলাম, দুঃখে-কষ্টে বুঝি তোর ঈশ হয়েছে—তা দেখছি কিছুই হয়নি! ভাল, তুইও শুকিয়ে মর, আমিও মরি।—বলিয়া সে বাহিরে গিয়া গাড়ি ফিরাইয়া দিল।

দুপুরবেলায় নীলাশ্বর ঘরের ভিতর ঘুমাইতেছিল, পীতাম্বর নিজের কাজে গিয়াছিল, ছোটবৌ বেড়ার ফাঁক দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, দিদি, অপরাধ নিও না, তোমায় আমি আর বোঝাব কি, কিন্তু দু'দিন ঘুরে এলে না কেন?

বিলাস মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, ওঁকে বন্ধ করে রেখো না দিদি, বিপদের দিনে একটিবার বুক বাঁধ, ভগবান দু'দিনে মুখ তুলে চাইবেন।

বিলাস আস্তে আস্তে বলিল, আমি ত বুক বেঁধেই আছি, ছোটবৌ!

ছোটবৌ একটু জোর দিয়া বলিল, তবে যাও দিদি, ওঁকে পুরুষমানুষের মত উপার্জন করতে দাও—জামি বলচি, তোমার প্রতি ভগবান দু'দিনে প্রসন্ন হবেন।

বিলাস একবার মুখ তুলিল, কি কথা বলিতে গেল, তার পর মুখ হেঁট করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, পারবে না যেতে?

এবার বিলাস মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ঘুম ভেঙ্গে উঠে ওঁর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না। যা পারব না ছোটবৌ, সে কাজ আমাকে ব'লো না,—বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ছোটবৌ কাদ-কাদ হইয়া ডাকিয়া বলিল, যেও না দিদি, শোন, তোমাকে দিন-কতক এখান থেকে যেতেই হবে—না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বিলাস ফিরিয়া দাঁড়াইল, একমুহুর্তে স্থির থাকিয়া বলিল, ও বুঝেছি—সুন্দরী এসেছিল বুঝি?

ছোটবৌ মাথা নাড়িয়া বলিল, এসেছিল।

তাই চলে যেতে বলচ?

তাই বলচি দিদি, তুমি যাও এখান থেকে।

বিলাস আবার ক্লশকালে মৌন হইয়া রহিল; তার পরে বলিল, একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব?

ছোটবৌ বলিল, কুকুর পাগল হ'লে তাকে ভয় ত করতেই হয় দিদি! তা ছাড়া, তোমার একার জন্যেও নয়, ভেবে দেখ, এই নিয়ে আরও কত কি অনিষ্ট ঘটতে পারে।

বিলাস আবার চূপ করিয়া রহিল। তারপর উচ্ছতভাবে মুখ তুলিয়া বলিল, না, কোনমতেই যাব না,—বলিয়া ছোটবৌকে প্রত্যক্ষরূপে অবসরমাত্র না গিয়া ক্রমশঃ সরিয়া গেল। কিন্তু তাহার যেন ভয় করিতে লাগিল।

ভাষ্যসের ঘাটের ঠিক পরপারে দু'দিন হইতে আড়ম্বর করিয়া একটা স্নানের ঘাট এবং নদীতে জল না থাকা সত্ত্বেও মাহ ধরিবারও মত প্রস্তুত হইতেছিল। বিলাস মনে মনে বুঝিল, এ-সব কোম।

নীলাশ্বরও একদিন স্নান করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে ঘাট বাঁধলে কহা বিলাস?

বিরাজ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি জানি?—বলিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল। তাহার ডাব দেখিয়া নীলাশ্বর অধাক হইয়া গেল। কিন্তু সেইদিন হইতে বিরাজ যখন তখন জল আনিতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। হয় অতি প্রত্যুষে, না হয় একটুখানি রাত্রি হইলে তবে সে নদীতে বাহিত, এ ছাড়া সহস্র কাজ অটিকাইলেও সে ও-মুখো হইত না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, তাহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ এই অত্যাচার ও অকথ্য ইতরতার বিরুদ্ধে সে স্বামীর কাছেও সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিল না।

দিন-চারেক পরে নীলাশ্বরই একদিন ঘাট হইতে আসিয়া হাসিয়া বলিল, নূতন জমিদারের সাজ-সরঞ্জাম দেখেচিস বিরাজ?

বিরাজ বুঝিতে পারিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, দেখচি বৈ কি।

নীলাশ্বর পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল, লোকটা পাগল নাকি, তাই আমি ভাবচি। নীতে দুটো পুটিমাছ থাকবার জল নেই, লোকটা সকাল থেকে একটা মস্ত হইল-বাঁধা ছিপ ফেলে সারাদিন বসে আছে।

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল, সে কোনমতেই স্বামীর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

নীলাশ্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু এ ত ঠিক নয়। ভদ্রলোকের খিড়কির ঘাটের সামনে সমস্ত দিন বসে থাকলে মেয়েছেলেরাই বা যায় কি করে? আচ্ছা, তোদের নিশ্চয়ই ত ভারী অসুবিধে হচ্ছে।

বিরাজ বলিল, হলেই বা করব?

নীলাশ্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাই হবে কেন? ছিপ নিয়ে পাগলামি করবার কি আর জায়গা নেই? না, না, কাল সকালেই আমি কাছারিতে গিয়ে বলে আসব—শখ হয়, উনি আর কোথাও ছিপ নিয়ে বসে থাকুন গে; কিন্তু আমাদের নিশ্চয়ই ত ভারী অসুবিধে হচ্ছে।

বিরাজ বলিল, হলেই বা কি করব?

নীলাশ্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাই হবে কেন? ছিপ নিয়ে পাগলামি করবার কি আর জায়গা নেই? না, না, কাল সকালেই আমি কাছারিতে গিয়ে বলে আসব—শখ হয়, উনি আর কোথাও ছিপ নিয়ে বসে থাকুন গে; কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে ও-সব চলবে না।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, তোমাকে ও-সব বলতে যেতে হবে না; নদী আমাদের একলার নয় যে, তুমি বারণ করে আসবে।

নীলাশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, তুই বলিস কি বিরাজ! নাই হ'ল নদী আমার; কিন্তু লোকের একটা ভালমন্দ বিবেচনা থাকবে না? আমি কালই গিয়ে বলে আসব, না শোনে নিজেই এসব ঘাট-ফাট টান মেয়ে ভেসে ফেলব, তার পরে যা পারে সে করুক।

কথা শুনিয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করতে?

নীলাশ্বর কহিল, কেন যাব না? বড়লোক বলে যা ইচ্ছে অত্যাচার করবে, তাই সয়ে থাকতে হবে?

অত্যাচার করচে তুমি প্রমাণ করতে পার?

নীলাশ্বর রাগিয়া বলিল, আমি এত তর্কের ধার ধারিনে; স্পষ্ট দেখচি অন্যায় করচে, আর তুই বলিস প্রমাণ করতে পার? পারি, না পারি সে আমি বুঝব।

বিরাজ একমুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, দেখ, মাথাটা একটু ঠান্ডা কর। বাদের দুটোলা ডাব জোটে না, তাদের মুখে এ কথা শুনে লোকে গায়ে খুণু দেবে। কিসে আর কিসে, তুমি চাও জমিদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে!

কথাটা এতই রূঢ়ভাবে বিরাজের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, নীলাশ্বর সহ্য করিতে পারিলে না, সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। চৈতন্য হারিয়া বলিল, তুই আমাকে কি কুকুর-

বেড়াল মনে করিস যে, যখন তখন সব কথায় ঐ খাবার খেঁটা তুলিস! কোন্ দিন তোর দুবেলা ভাত জোটে না?

দুখে-কষ্টে বিরাজের আর পূর্বের ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা ছিল না, সেও জুলিয়া উঠিয়া জবাব দিল, দিল, মিছে চেষ্টাও না। যা করে দুবেলা ভাত জুটে, সে তুমি জান না বটে, কিন্তু জানি আমি, আর জানেন অস্ত্রধারী। এই নিয়ে কোন কথা যদি তুমি বলতে যাও ত আমি বিব খেয়ে মরব। বলিয়াই মুখ তুলিয়া দেখিল, নীলাশ্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই চোখে একটা বিহ্বল হতবুদ্ধি দৃষ্টি—সে চাহনির সম্মুখে বিরাজ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর একটা কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেল, ভবুও নীলাশ্বর তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একধারে শুক হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ না বুঝিয়া যেন একেবারে নিশ্চিন্দ অসাড় হইয়া গেল। কানে তাহার কেবলই বাজিতে লাগিল বিরাজের শেষ কথাটা—কি করিয়া সংসার চলিতেছে! এবং কেমনই মনে পড়িতে লাগিল, সেদিনের সেই অন্ধকারে গভীর রাতে ঘরের বাহিরে ভূশম্ভায় সুপ্ত বিরাজের শ্রান্ত অবসন্ন মুখ। সত্যিই ত! দিন যে কি করিয়া চলিতেছে এবং কেমন করিয়া যে তাহা শুই অসহায়া রমণী একাকিনী চলাইতেছে, সে কথা আর ত তাহার জানিতে বাকী নাই। অনতিপূর্বে বিরাজের শব্দ কথা শব্দ তীরের মতই তাহার বুকে আসিয়া বিধিয়াছিল, শুধু যে মিলিয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, ধীরে ধীরে শব্দায় বিশ্বয়ে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার বিরাজ ত শুধু আজকের বিরাজ নয়, সে যে কতকাল, কত যুগ-যুগান্তের। তাহার বিচার ত শুধু দুটো দিনের ব্যবহারে, দুটো অসহিষ্ণু কথার উপরে করা চলে না! সে-হৃদয় যে কি দিয়া পরিপূর্ণ, সে কথা ত তার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না। এইবার তাহার দুই চোখ বাহিয়া দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ দুই হাত জোড় করিয়া উর্ধ্বমুখে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবান, আমার যা আছে সব নাও, কিন্তু আমার একে নিও না। বলিতেই একটা প্রচণ্ড ইচ্ছায় বেগ সেই মুহূর্তেই তাহার শ্রিয়তমাকে বৃকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার জন্য তাহাকে যেন একেবারে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। সে ছুটিয়া আসিয়া বিরাজের রুদ্ধস্বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, সে যা দিয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, বিরাজ!

বিরাজ মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

নীলাশ্বর বলিল, কি কচ্চিস বিরাজ, পোর খোল!

বিরাজ সভয়ে নিঃশব্দে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাশ্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলে দে না বিরাজ!

এবার বিরাজ কাঁদ-কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, তুমি মারবে না বল?

মারব!

কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাশ্বরের হৃৎপিণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিল; বেদনায়, লজ্জায়, অভিমানে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা চৌকাঠ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিল না; সে না জানিয়া ছুরির উপর উপর ছুরি মারিয়া কাঁদিয়া বলিল, আর আমি এখন কথা ক'ব না—বল, মারবে না?

নীলাশ্বর অশ্রুচস্বরে, কোনমতে একটা 'না' বলিতে পারিল মাত্র। সভয়ে ধীরে ধীরে অর্গল মুক্তি করিবামাত্রই নীলাশ্বর টলিতে টলিতে ভিতর ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া শয্যা উপর শুইয়া পড়িল। তাহার নিম্নলিখিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া ছব করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর এমন মুখ ত বিরাজ কোন দিন দেখে নাই! সমস্তই বৃথিল। শিয়রের কাছে উঠিয়া আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথা নিজের ক্রোড়ের উপর তুলিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘরের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, তথাপি উভয়ের কেহই শ্বশ্রু বৃথিল না। তাহাদের কথা বোধ করি শুধু অস্ত্রধারীই শুনিলেন।

আট

তবুও নীলাশ্বর ভাবিতেছিল—এ কথা বিরাজ মুখে আনিলে কি করিয়া! সে তাহাকে মারধর করিতেও পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা তাহার জন্মিল কেন? একে ত সংসার দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই, তাহার উপর প্রতিদিন এ কি হইতে লাগিল? দু'দিন যায় না, বিবাদ বাধে, কথায় কথায় মনোমালিন্য, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে মতভেদ হয়। সর্বোপরি তাহার এমন বিরাজ দিন দিন এমন হইয়া যাইতে লাগিল—অথচ কোন দিকে চাহিয়া সে এই দুঃখের সাগরের কিনারা দেখিল না। নীলাশ্বরের ভগবানের চরণে অচলা ভক্তি ছিল, অদৃষ্টের লেখায় অসীম বিশ্বাস ছিল, সে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও মনে মনে দোষ দিল না, কাহারও নিন্দা করিল না—চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে টাঙ্কানো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সমুখে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাদিয়া বলিতে লাগিল, ভগবান, যদি এত দুঃখেই ফেলবে মনে ছিল, তবে এতবড় নিরুপায় করে আমাকে গড়লে কেন? সে যে কত নিরুপায়, সে কথা তাহার অপেক্ষা বেশী আর কেহই জানে না। লেখাপড়া শিখে নাই, কোন রকমের কাজকর্ম জানিত না, জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে, কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া! আর তাহার কিছুই নহে—সমস্ত গিয়াছে। তাই, দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে করিয়া! আর তাহার কিছুই নাই—সমস্ত গিয়াছে। তাই, দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর থাকিবে না, বিরাজকে লইয়া যেখানে দু'চোখ যায় যাইবে; কিন্তু এই সাত-পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া কোন্ দেব-মন্দিরের ঘরে বসিয়া, কোন্ গাছের তলায় শুইয়া সে সুখ পাইবে! এই ক্ষুদ্র নদী, এই গাছপালায় ঘেরা বাড়ি, এই ঘরে-বাহিরে আজন্মপরিচিত লোকের মুখ—সমস্ত ছাড়িয়া সে কোন্ দেশে, কোন্ স্বর্ণে গিয়া একটা দিনও বাঁচিবে! এই বটীতে তাহার মা মরিয়াছে, এই চণ্ডীমণ্ডপে সে তাহার মূমূর্ষু পিতার শেষ সেবা করিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিয়াছে—এইখানে সে পুটিকে মানুষ করিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়াছে—এই ঘরবাড়ির মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে! সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কাদিতে লাগিল। আর এই কি তাহার সব দুঃখ? তাহার বোনটিকে সে কোথায় দিয়া আসিল, তাহার একটা সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না; কতদিন হইয়া গেল, তাহার মুখ দেখে নাই, তাহার স্তনীক্ষু কণ্ঠের 'দাদা' ডাক শুনিতে পায় নাই—পরের ঘরে সে কি দুঃখ পাইতেছে, কত কান্না কাদিতেছে, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অথচ বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্যন্ত করিবার জো নাই। সে তাহাকে মানুষ করিয়াও এমন করিয়া ভুলিতে পারিল, কিন্তু সে ভুলিবে কি করিয়া? তাহার মায়ের পেটের বোন, হাতে কাঁখে করিয়া বড় করিয়াছে, যেখানে গিয়াছে সঙ্গে করিয়া গিয়াছে—সেজন্য কত কথা, কত উপহাস সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই পুটিকে কাদাইয়া রাখিয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা যাইতে পারে নাই। এ-সব কথা শুধু সে জানে, আর সেই ছোটবোনটি জানে।

বিরাজ জানিয়াও জানে না। একটা কথা পর্যন্ত বলে না। পুটির সম্বন্ধে সে যেন পাষণমূর্তির মত একেবারে চিরদিনের জন্য নির্বাক হইয়া গিয়াছে। সে যে মনে মনে তাহার সেই নিরপরাধা বোনটিকে অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, এ চিন্তা তাহাকে শূলের মত বিধিত; কিন্তু এ সম্বন্ধে একবিন্দু আলোচনার পথ পর্যন্ত ছিল না। কোন একটা কথা বলিতে গেলেই বিরাজ থামাইয়া বলে, ও-সব কথা থাক—সে রাজরানী হোক, কিন্তু তার কথায় কাজ নেই। এই 'রাজরানী' কথাটা বিরাজ এমনভাবে উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া যাইত যে, নীলাশ্বরের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে থাকিত। পাছে তাহার উপর গুরুজনের অভিসম্পাত পড়ে, পাছে কোন অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিত, লুকাইয়া 'হরির লুঠ' দিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোপনে ঐ একটা টাকা সংগ্রহ করিয়া একখানি কাপড় ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সুন্দরীকে গিয়া ধরিল।

সুন্দরী বসিতে আসন দিল, তামাক সাজিয়া দিল। নীলাশ্বর আসন গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রীর্ণ মলিন উত্তরীরের ভিতর হইতে সেই কাপড়খানি বাহির করিয়া বলিল, তুই ত তাকে মানুষ করেচিস সুন্দরী, যা একবার দেখে আয়। আর সে বলিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া চাদরে চোখ মুছিল।

সুন্দরী ইহাদের কষ্টের কথা জানিত। গ্রামের সকলেই জানিত। কহিল, সে কেমন আছে বড়বাবু?

নীলাশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে।

সুন্দরীর বুদ্ধি-বিশেষনা ছিল, সে আর প্রশ্ন করিল না। পরদিন সকালেই যাইবে জানাইতে নীলাশ্বর কিছু পাথেয় দিতে গেল, সুন্দরী তাহা গ্রহণ করিল না; কহিল, না বড়বাবু, তুমি কাপড় কিনে ফেলেচ, না হলে এও আমি নিয়ে যেতাম না—তোমার মত আমিও যে তাকে মানুষ করেচি।

নীলাশ্বরের চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখ ফিরাইয়া ক্রমাগত চোখ মুছিতে লাগিল। এমন একটা সমবেদনার কথা সে কাহারও কাছে পায় নাই। সবাই কহে, সে ভুল করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, পুঁটি হইতেই তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। উঠিবার উদ্যোগ করিয়া সে সুন্দরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল যেন এই সব দুঃখ-কষ্টের কথা পুঁটি কোনসময়ে জানিতে পারে।

নীলাশ্বর চলিয়া গেল, সুন্দরীও এইবার একফোঁটা চোখের জল আঁচলে মুছিল। এই লোকটিতে মনে মনে সবাই ভালবাসিত, সবাই ভক্তি করিত।

সেদিন বিজয়ার অপরাহ্ন, বিরাজ শোবার ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল। সন্ধ্যা না হইতেই কেহ খুড়ো বলিয়া বাড়ি ঢুকিল, কেহ নীলদা বলিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিল।

নীলাশ্বর শুদ্ধমুখে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যথারীতি প্রণাম-কোলাকুলির পর তাহারা বৌঠানকে প্রণাম করিবার জন্য ভিতরের দিকে চলিল।

নীলাশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিল, বিরাজ রান্নাঘরেও নাই, শোবার ঘরেরও দ্বার রুদ্ধ। সে করাঘাত করিয়া ডাকিল, ছেলেরা তোমাকে প্রণাম করতে এসেচে বিরাজ।

বিরাজ ভিতর হইতে বলিল, আমার জ্বর হয়েছে—উঠতে পারব না।

তাহারা চলিয়া যাইবার খানিক পরেই আবার দ্বারে ঘা পড়িল। বিরাজ জবাব দিল না। দ্বারের বাহিরে মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি, আমি মোহিনী—একবারটি দোর খোল।

তথাপি বিরাজ কথা কহিল না।

মোহিনী কহিল, সে হবে না দিদি, সারারাত এই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেও থাকব, কিন্তু আজকের দিনে তোমার আশীর্বাদ না নিয়ে যাব না।

বিরাজ উঠিয়া কপাট খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মোহিনীর বাঁ হাতে এক চুপড়ি খাবার, ডান হাতে ঘটিতে সিঁদ্ধি-গোলা। সে পাক্কের কাছে নামিয়া রাখিয়া দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, শুধু এই আশীর্বাদ কর দিদি। যেন তোমার মত হতে পারি—তোমার মুখ থেকে আমি আর কোন আশীর্বাদ পেতে চাইনে।

বিরাজ সম্মল চক্ষু আঁচলে মুছিয়া নিঃশব্দে ছোটবধুর অবনত মস্তকে হাত রাখিল।

ছোটবৌ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজকের দিনে চোখের জল ফেলেতে নেই, কিন্তু, সে কথা ত তোমাকে বলতে পারলুম না দিদি; তোমার দেহের বাতাসও যদি আমার দেহে লেগে থাকে ত, সেই জ্বরে বলে যাচ্ছি, আসচে বছরে এমনই দিনে সে কথা বলব।

মোহিনী চলিয়া গেলে বিরাজ সেইসব ঘরে তুলিয়া রাখিয়া ঘিরে হইয়া বসিল। মোহিনী যে অহর্নিশ তাহাকে চোখে চোখ রাখে, এ কথা আজ সে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল। তার

পর কত ছেলে আসিল, গেল, বিরাজ আর ঘরে দোর দিল না, এই সব দিয়া আজিকার দিনের আচার পালন করিল।

পরদিন সকালবেলা সে ক্লান্তভাবে দাওয়ার বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সুন্দরী আসিয়া প্রশ্নাম করিল।

বিরাজ আশীর্বাদ করিয়া বসিতে বলিল।

সুন্দরী বসিয়াই বলিল, কাল রাত্তির হয়ে গেল, তাই আজ সকালেই বলতে এলুম। কিন্তু যাই বল বোমা, এমন জানলে আমি কিছুতেই যেতুম না।

বিরাজ বুঝিতে পারিল না—চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল, বাড়িতে কেউ নেই—সবই গেছে পশ্চিমে হাওয়া খেতে। আছে এক বুড়ো পিসী, তার শক্ত শক্ত কথা কি বোমা, বলে, ফিরিয়ে নিয়ে যা। জামাইয়ের পর্যন্ত একখানা কাপড় পাঠায় নি, শুধু একখানা সুতোর কাপড় নিয়ে পূজোর তত্ত্ব কন্তে এসেচে! তারপর ছোটলোক, চামার, চোখেব চামড়া নেই—এ যে কত বললে, তা আর বলে কি হবে।

বিরাজ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কে কাকে বললে রে?

সুন্দরী বলিল, কেন, আমাদের বাবুকে।

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল। সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিল না। কহিল, আমাদের বাবুকে কে বললে তাই বল।

এবার সুন্দরীও কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিল, তাই ত এতক্ষণ বলচি বোমা! পুঁটির বুড়ো পিসশাউড়ির কি দয়, কি তেজ মা, কাপড়খানা নিলে না, ফিরিয়ে দিলে ;—বলিয়া কাপড়খানা আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিল।

এবার বিরাজ সমস্ত বুঝিল। সে একদৃষ্টে বস্ত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার অন্তরে বাহিরে আশ্রয় ধরিয়া গেল।

নীলাশ্বর বাহিরে গিয়াছিল, কত বেলায় আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, সুন্দরী অপেক্ষা করিতে পারিল না, চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা নীলাশ্বর আহার করিতে বসিয়াছিল, বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া অদূরে সেই কাপড়খানা রাখিয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

নীলাশ্বর মুখ তুলিয়া দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা যে এমন ভাবে বিরাজের গোচরে আসিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এখন কোন প্রশ্ন না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিরাজ কহিল, কেন তারা নিলে না, কেন গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলে, সব কথা সুন্দরীর কাছে গেলেই শুনতে পাবে।

তথাপি নীলাশ্বর মুখ তলিল না, কিংবা একটি কথাও শুনিতে চাহিল না।

বিরাজও চুপ করিল।

নীলাশ্বরের ক্ষুধাভ্রম একেবারে চলিয়া গিয়াছিল, সে ভীত অবনতমুখে কেবলই অনুভব করিতে লাগিল,—বিরাজ তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতেছে।

সন্ধ্যাবেলা সুন্দরীর ঘরে গিয়া সব কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নীলাশ্বর কহিল, পশ্চিমে যখন বেড়াতে গেছে, তখন সে নিশ্চয় ভালই আছে, না সুন্দরী?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভাল আছে বৈ কি বাবু।

নীলাশ্বরের মুখ ক্ষমুস্রভাব ধারণ করিল, কহিল, কত বড়টি হয়েছে দেখলি?

সুন্দরী হাসিয়া বলিল, দেখা ত হয়নি বাবু! নীলাশ্বর নিজের প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া বলিল, তা বটে, কিন্তু দাসী-চাকরের কাছেও শুনলি ত?

না বাবু। তার পিসশাউড়ি মাগীর যে কথাবার্তা, যে হাত-পা নাড়া, তাতে আর জিজ্ঞেস

করব কি, পালাতেই পথ পাইনি।

নীলাশ্বর কণকাল ঘির থাকিয়া কুক-সুখ কহিল, আচ্ছা, পুটি আমার রোগা হয়ে গেছে, কি একটু মোটাসোটা হয়েছে—তোর কি মনে হয়?

প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুন্দরী ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে কহিল, মোটাসোটা হইয়া থাকবে।—নীলাশ্বর আশান্ত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, শুনে এসেচিস বোধ করি, না?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবু, শুনে কিছুই আসিনি।

তবে জানলি কি করে?

এবার সুন্দরী বিরক্ত হইল, কহিল, জানলুম আর কোথায়? তুমি বললে আমার কি মনে হয়, তাই বললুম—হয়ত মোটাসোটা হয়েছে।

নীলাশ্বর মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তা বটে। তারপর কয়েক মুহূর্ত সুন্দরীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আজ তবে যাই সুন্দরী, আর একদিন আসব।

সুন্দরী মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বস্তুত তাহার অপরাধ ছিল না। এক ত বলিবার কিছুই ছিল না, তাহাতে ঘণ্টা-দুই হইতে নিরন্তর এক কথা এক শব্দ করিয়া বকিয়াও সে নীলাশ্বরের কৌতুহল মিটাইতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কহিল, হাঁ বাবু, রাত হ'ল, আজ এসো, আর একদিন সকালে এলে সব কথা হবে।—এতক্ষণ নীলাশ্বর সুন্দরীর উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিল এবং 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরীঃ উৎকণ্ঠার একটা বিশেষ হেতু ছিল।

এই সময়টার ও-পাড়ার নিতাই গাঙ্গুলী প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইতে পায়ের ধূলা দিয়া যাইতেন। তাহার এই ধূলাটা পাছে মনিবের সাক্ষাতেই পড়ে, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও নানা কারণে এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে এবং জমিদারের অনুগ্রহে লজ্জা গর্বেই রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই নিষ্কলঙ্ক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের সম্মুখে হীনতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

নীলাশ্বর চলিয়া গেলে সে পুলকিতচিত্তে দ্বার বন্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সুমুখে চাহিতেই দেখিল, নীলাশ্বর ফিরিয়া আসিতেছে। সে দোর ধরিয়া বিরক্তমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মুখে দ্বাদশীর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল।

নীলাশ্বর কাছে আসিয়া একবার ইতস্তত করিল, তাহার পর চাদরের খুঁট হইতে খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর কাছে বুলতে ত লজ্জা নেই সুন্দরী, সবই জানিস—এই আধুলিটি শুধু আছে, নে। বলিয়া হাত তুলিয়া দিতে গেল। সুন্দরী জিত কাটিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

নীলাশ্বর বলিল, কত কষ্ট দিলাম—যাওয়া-আসার খরচ পর্যন্ত দিতে পারিনি। আর সে বলিতে পারিল না, কান্নায় তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল।

সুন্দরী একমুহূর্ত কি ভাবিল, পরক্ষণে হাত পাতিয়া বলিল, দাও। তুমি যাই হও, আমার চিরদিনের মনিব—আমার 'না' বল সাজে না। বলিয়া আধুলিটি হাতে লইয়া মাথায়া ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, তবে আর একবার ভিতরে এসো, বলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল।

নীলাশ্বর পিছনে পিছনে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী ঘরে ঢুকিটা মিনিট-খানেক পরে ফিলিয়া আসিয়া নীলাশ্বরের পায়ের কাছে একমুঠা টাকা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলাশ্বর বিষয়ে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে চেয়ে থাকতে ত হবে না বাবু, আমি চিরকালের দাসী, শূদ্র হলেও এ জোর শুধু আমারই

আছে, বলিয়া হেঁট হইয়া টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া চাদরে বাঁধিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ তোমারই দেওয়া টাকা বাবু, তীর্থ করব বলে দেবতার নামে তুলে রেখেছিলুম—আর যেতে হ'ল না—দেবতা নিজে ঘরে এসে নিয়ে গেলেন।

নীলাস্বর তখনও কথা কহিতে পারিল না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, বৌমা একলা আছেন, আর না, যাও—কিন্তু এ কথা তিনি যেন কিছুতেই না জানতে পারেন।

নীলাস্বর কি একটা বলিতে গেল, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, হাজার হলেও শুনব না বাবু। আজ আমার মান না রাখলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। তাহার হাতের মধ্যে তখনও চাদরের সেই অংশটা ধরা ছিল, এমন সময় 'কি হচ্ছে গো?' বলিয়া নিতাই গাঙ্গুলী খোলা দরজার ভিতর দিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী চাদর ছাড়িয়া দিল।

নীলাস্বর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাই ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল ও হোঁড়টা নীলু না?

সুন্দরী মনে মনে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, হী, আমার মনিব।

শুনি, খেতে পায় না—এত রাঙিতে যে?

কাজ ছিল, তাই এসেছিলেন।

ও—কাজ ছিল? বলিয়া নিতাই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ভাবটা এই যে, তাহার মত বয়সের লোকের চোখে ধুলি নিক্ষেপ সহজ কর্ম নয়।

সুন্দরীও হাসির অর্থ স্পষ্ট বুঝিল। নিতাইয়ের বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে, মাথার চুল বারো আনা পাকিয়াছে—তাহার—গোঁফ-দড়ি কামান, মাথায় শিখা, কপালে সকালের চন্দনের ফোঁটা তখনও রহিয়াছে—সুন্দরী তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির অর্থ বোঝা নিতাইয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সে কিছু উদ্বেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, অমন করে চেয়ে আছ যে?

দেখচি।

কি দেখচ?

দেখচি তোমারও বামুন, আর যিনি চলে গেলেন তিনিও বামুন, কিন্তু, কি আকাশ-পাতাল তফাত।—নিতাই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্ন করিল, তফাত কিসে?

সুন্দরী একটুখানি হাসিয়া বলিল, বুড়ো মানুষ, আর হিমে থেকো না, দাওয়ায় উঠে ব'স। মাইরি বলচি গাঙ্গুলীমশাই, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, আমার মনিবের পায়ের এক ফোঁটা ধুলো গেলে তোমাদের মত কতগুলি গাঙ্গুলী কত জন্ম উদ্ধার হতে পারে!

তাহার কথা শুনিয়া নিতাই ক্রোধে বিষ্ময়ে বাক্তব্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সুন্দরী একটা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে অত্যন্ত সহজভাবে বলিতে লাগিল, রাগ ক'রো না ঠাকুর, কথাটা সত্যি। আজ বলে নয়, বরাবরই দেখে আসচি ত আমার মনিবের পৈতেগাছটার দিকে চোখ পড়লে চোখ যেন ঠিকরে যায়—মনে হয়, ওঁর গলার ওপরে যেন আকাশের বিদ্যুৎ খেলা করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তোমাদের দেখ—দেখলেই আমার হাসি পায়। বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রথম হইতেই নিতাই স্বর্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, এখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখ আগুনের মত করিয়া চোঁচাইয়া উঠিল, অত দর্প করিস নে সুন্দরী—মুখ পচে যাবে।

সুন্দরী কলিকাটায় হুঁ দিতে কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, কিছু হবে না—নাও, তামাক খাও। বরং তোমার মুখই ম'লে পুড়বে না—আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ।

নিতাই কলিকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী তাহার উত্তরীরের এক অংশ ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, ব'স ব'স, মাথা খাও—

ক্ৰুদ্ধ নিতাই নিজের উত্তরীয় সজোরে টানিয়া লইয়া—গোদায় যাও, গোদায় যাও—নিপাত যাও—বলিয়া শাপ দিতে দিতে দ্রুতপতে প্রস্থান করিল।

সুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া খুব খানিকটা হাসিল, তার পর উঠিয়া আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল—কিসে আর কিসে! বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি যেন লেগে রয়েছে তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না—যেন আগুন জ্বলচে!

ময়

ঠিক কাহার অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু কথটা বিকৃত হইয়া বিরাজের কানে উঠিতে বাকী থাকিল না। সেদিন আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন ও বাড়ির পিসীমা। বিরাজ সমস্ত মন দিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, ওঁর একটা কান কেটে নেওয়া উচিত পিসীমা।

পিসীমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন, জানি ত ওকে—এমন ফাজিল মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি আছে কি!

বিরাজ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, কবে আবার তুমি সুন্দরীর ওখানে গেলে?

নীলাধর ভয়ে শুক হইয়া গিয়া জবাব দিল, অনেকদিন আগে পুঁটির খবরটা নিতে গিয়েছিলাম।

আর যেও না। তার স্বভাব-চরিত্র শুনতে পাই ভারী মন্দ হয়েছে, বলিয়া সে নিজের কাছে চলিয়া গেল। তারপর কতদিন কাটিয়া গেল। সূর্যদেব ওঠেন এবং অস্ত্র যান, তাঁকে ধরিয়া রাখিবার জো নাই বলিয়াই বোধ করি শীত গেল, গ্রীষ্মও যাই-যাই করিতে লাগিল। বিরাজের মুখের উপর একটা গাঢ় ছায়া ক্রমশ গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ চোখে দৃষ্টি ক্রান্ত এবং শরতর। যে-কেহ তাহার দিকে চাহিতে যায়, তাহারই চোখ যেন আপনি ঝুকিয়া পড়ে। শুল্কিক পীঠ বিষধর, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা প্রায়ই হয় না। তিনি কখন চোরের মত আসেন যান, সেদিকে সে যেন দৃষ্টিপাতই করে না। সবাই তাহাকে ভয় করে, শুধু করে না ছোটবৌ। সে সুযোগ পাইলেই যখন তখন আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। প্রথম প্রথম বিরাজ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। চোখ রাস্তাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শরু কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে।

সেদিন দশহরা। অতি প্রত্যুষে ছোটবৌ লুকাইয়া আসিয়া ধরিল, এখনও কেউ ওঠেনি দিদি, চল না একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।

ও-পারে জমিদারের ঘাট তৈরী হওয়া পর্যন্ত তাহার নদীতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

দুই জায়ে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, অদূরে একটা গাছতলায় জমিদার রাজেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থানটা হইতে তখনো সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায় নাই, তথাপি দু'জনেই লোকটাকে চিনিল। ছোটবৌ ভয়ে জড়জড় হইয়া বিরাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ অতিশয় বিস্মিত হইল। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? কিন্তু পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনা তাহার মনে উঠিল, হয়ত সে প্রত্যহ এমন করিয়াই প্রহরা দিয়া থাকে। মুহূর্তের এক অংশ মাত্র বিরাজ বিধা করিল, তারপর ছোটজায়ের একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, দাঁড়াস নে ছোটবৌ, চল আস।

ডাছাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর দ্রুতপদে ফিরিয়া গিয়া রাজেন্দ্রের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, অস্পষ্ট আলোকেও সে দৃষ্টি রাজেন্দ্র সহিতে পারিল না, মুখ নামাইল। বিরাজ বলিল, আপনি ভ্রমসন্ধান, বড়লোক, এ কি প্রবৃত্তি আপনার!

রাজেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—জবাব দিতে পারিল না। বিরাজ বলিতে লাগিল, আপনার জমিদারি যত বড়ই হোক, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা আমার। হাত দিয়া ওপারের ঘাটটা দেখাইয়া বলিল, আপনি যে কত বড় ইতর, তা সবাই জানে, আমিও জানি। বোধ করি, আপনার মা-বোন নেই। অনেকদিন আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুকতে

নিবেশ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি।

রাজেন্দ্র এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে তখনও কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ বলিল, আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিনলে কখনই আসতেন না। তাই, আজ বলে দিচ্ছি, আর কখনও আসবার পূর্বে তাঁকে চেনবার চেষ্টা করে দেখবেন, বলিয়া বিরাজ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাড়িতে ঢুকিতে যাইতেছে, দেখিল, পীতাম্বর একটা গাড়ি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কহদিন হইতেই তাহার সহিত বাক্যলাপ ছিল না, তথাপি সে ডাকিয়া বলিল, বৌঠান, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সে ও-ই জমিদারবাবু, না?

চক্কর নিমেষে বিরাজের চোখ-মুখ রাসা হইয়া উঠিল; সে 'হী' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া নিজের কথা সে তখনই ভুলিল, কিন্তু ছোটবৌর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ হইয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি জানি, তাহাকে ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়াছে কি না! কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, মিনিট-দশেক পরে ও-বাড়ি হইতে একটি মারের শব্দ ও চাপা কান্নার আর্তস্বর উঠিল।

বিরাজ ছুটিয়া আসিয়া রাস্তাঘরে ঢুকিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছিল; পীতাম্বরের তর্জন ও প্রহারের শব্দ মুহূর্তকাল কান পাতিয়া শুনি, এবং পরক্ষণেই বেড়ার কাছে আসিয়া লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ও-বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইল।

বেড়া ভাঙ্গার শব্দে পীতাম্বর চমকিয়া মুখ তুলিয়া সুমুখেই যমের মত বড়ভাইকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া ধামিল।

নীলাম্বর ভূ-শারিতা ছোটবধূকে সন্ধান করিয়া বলিল, ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই। ছোটবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলে নীলাম্বর সহজভাবে বলিল, বৌমার সামনে আর তোর অপমান করব না, কিন্তু, এই কথাটা আমার ভুলও অবহেলা করিস নে যে, আমি যতদিন ও-বাড়িতে আছি ততদিন এ-সব চলবে না। যে হাতটা তুই ওর গায়ে তুলবি, তোর সেই হাতটা ভেঙ্গে দিয়ে যাব—বলিয়া কিরিয়া বাইতেছিল।

পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, বাড়ি চ'ড়ে মারতে এলে, কিন্তু কারণ জান? নীলাম্বর কিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, জানতেও চাইনে।

পীতাম্বর বলিল, তা চাইবে কেন? আমাকে দেখচি তা হ'লে নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হবে।

নীলাম্বর তাহার মুখপানে অন্ধকণ চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, ভিটে ছেড়ে কাকে পালাতে হবে, সে আমি জানি—তোকে মনে ক'রে দিতে হবে না। কিন্তু, যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোকে সবুর ক'রে থাকতেই হবে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম। বলিয়া আবার কিরিবার উপক্রম করিতেই পীতাম্বর সহসা সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, তবে তোমাকে জানিয়ে দিই দাদা, পরকে শাসন করবার আগে ঘর শাসন করা ভাল।

নীলাম্বর চাহিয়া রহিল। পীতাম্বর সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, ও পারের ঘাটটা কার জন্য ত? বেশ। আমি সেই খেকে ছোটবৌকে ঘাটে বেতে মানা ক'রে দিই। আজ রাত থাকতে উঠে বোঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলেন—এমনই হয়ত রোজই যান, কে জানে!

নীলাম্বর আশ্চর্য হইয়া বলিল, এই সোবে গায়ে হাত তুললি?

পীতাম্বর বলিল, আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলের—কি জানি, রাজেন্দ্রবাবু না কি নাম ওর—দেখ-বিসেখে সুখ্যাতি ধরে না। আজ যে বৌঠান তার সঙ্গে আধখণ্টা ধ'রে গল্প করছিলেন কেন?

নীলাম্বর বুকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, কে কথা কইছিল রে? বিরাজবৌ?

হী, তিনিই?

তুই চোখে দেখেছিস?

পীতাম্বর মুখে ভাঙা হাসিবার মত করিয়া বলিল, তুমি আমাকে দেখতে পার না, জানি—আমার সে বিচার নারায়ণ করবেন—কিন্তু—

নীলাম্বর ধমকাইয়া উঠিল,—আবার ঐ নাম মুখে আনে! কি বলবি বল।

পীতাম্বর চমকিয়া উঠিয়া ঈষৎ ধামিয়া রুটবরে বলিতে লাগিল, চোখে না দেখে কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়। ঘর শাসন করত না পার, পরকে ভেড়ে মারতে এস না।

নীলাম্বরের মাথার উপর অকস্মাৎ বেন বাড়ি পড়িল। কলকাল উদ্ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে প্রশ্ন করিল, আধঘণ্টা ধরে পল্ল করছিল, কে? বিরাজবৌ? তুই চোখে দেখেছিল? পীতাম্বর দু-এক-পা কিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, চোখেই দেখেছি। আধঘণ্টার হয়ত বেশী হতেও পারে।

আবার নীলাম্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ভাল, তাই যদি হয়, কি করে জানিলি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না?

পীতাম্বর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা জানি নে। তবে আমার মারধর করা উচিত হয়নি, কেননা ঘাট তৈরী ছোটবৌর জন্য হয়নি।

মুহূর্তের উদ্বেজনায় নীলাম্বর দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই ধামিয়া পড়িল, তৎপরে পীতাম্বরের মূখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুই জানোয়ার, তাতে ছোটভাই। বড়ভাই হ'য়ে আমি আর তোকে অভিসম্পাত করব না, আমি মাগ করলুম, কিন্তু আজ তুই যে-কথা গুরুজনকে বললি, ভগবান হয়ত তোকে মাগ করবেন না—যা,—বলিয়া সে ধীরে ধীরে এ-ধারে আসিয়া ভাঙ্গা বেড়াটা নিজেই বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

বিরাজ কান পাতিয়া সমস্ত শুনিла। লজ্জায় ঘুণার তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছিল, একবার ভাবিল, সামনে গিয়া নিজের সব কথা বলে, কিন্তু, পা বাড়াইতে পারিল না। তাহার রূপের উপর পরপুরুষের লুকুদৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বামীর সমুখে এ কথা নিজের মুখে সে কি করিয়া উচ্চারণ করিবে!

বেড়া বাঁধিয়া গিয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা ভাত বাড়িয়া গিয়া বিরাজ আড়ালে বসিয়া রহিল, রাগের স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে নিঃশব্দে শয্যায়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং প্রভাতে তাহার ঘুম ভাঙা গর পূর্বেই বাহির হইয়া গেল।

এমন করিয়া পলাইয়া বেড়াইয়া যখন দু'দিন কাটিয়া গেল, অখচ নীলাম্বর কোন প্রশ্ন করিল না, তখন আর এক ধরনের আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। স্ত্রী সম্বন্ধে এতবড় অপবাদের কথা স্বামীর মনে কৌতূহল জাগে না, ইহার কোন সম্ভব ত হেতু সে বুঝিয়া পাইল না; কিংবা ঘটনাটির তিনি বিশিষ্ট হইয়াছেন এ সম্ভাবনাও তাহাকে সাক্ষ্য দিতে পারিল না। এ দুইদিন একনিকে বেমন সে পা চাকিয়া ফিরিয়াছে, অপর দিকে ভেমনই অনুকূল আশা করিয়াছে, এইবার কথা উঠিবে; এইবার করিয়া স্বামীর পায়ে নীচে তাহার বুকের ভারী বোকাটা নামাইয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু, কৈ কিছুই যে হইল না! স্বামী নির্বাক হইয়া রহিলেন।

একবার সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত কখনো তিনি আলো বিকাশ করেন নাই, কিন্তু এই তাহার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাটো কি তাহার চোখে পড়িয়া সংশয় উদ্ভব করিতেছে না! অখচ বাহা এতদিন পর্যন্ত সে গোপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা নিজেই বা আজ বাড়িয়া বলিবে কিরূপে? সেদিনটাও এমনই করিয়া কাটিল। পরদিন সকালে ভগ্নার্ত ভারাক্রমক হইয়া সে কোনমতে ঘরের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা তাহার বুকের পটীর ভলম্পে আলোড়িত করিয়া দুর্ভাগ্যের মত বাহির হইয়া আসিল, আর যদি ঠাকুরপের কথা বিকাশ

করেই থাকেন তা হ'লে?

নীলাধর আঙ্গিক শেষ করিয়া কারোখান করিতে যাইতেছিল, সে ঝড়ের মত সূর্যকে অসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিস্মিত নীলাধর মুখ তুলিতেই বিরাজ সজোরে নিজের জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়া বলিয়া উঠিল, কেন, কি করেচি? কথা কও না যে বড়?

নীলাধর হাসিল। বলিল, পালিয়ে বেড়ালে কথা কই কার সঙ্গে?

পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তুমি ডাকতে পারনি একবার?

নীলাধর বলিল, যে লোক পালিয়ে বেড়ায় তাকে ডাকলে পাণ হয়।

পাণ হয়? তাহলে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেচ বল?

সত্যি কথা বিশ্বাস করব না?

বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, অকস্মিকতায় চোঁচাইয়া বলিল, সত্যি নয়—ভয়ঙ্কর মিছে কথা। কেন তুমি বিশ্বাস করলে?

তুমি নদীর ধারে কথা বলনি?

বিরাজ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, হাঁ বলেচি।

নীলাধর বলিল, আমি ঐটুকুই বিশ্বাস করেচি।

বিরাজ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যদি বিশ্বাসই করেচ, তবে ঐ ইতরটার মত শাসন করলে না কেন?

নীলাধর আবার হাসিল। সদ্য-প্রস্থটিত কুলের মত নির্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল, তবে কাছে আয়, ছেলেবেলার মত আর একবার কান মলে দিই।

চকের পলকে বিরাজ সুমুখে অসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং পরক্ষণেই তাহার বুকের উপরে সজোরে কাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেঁটন করিয়া ঝুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাধর কাঁদিতে নিবেদন করিল না। তাহার নিজের দু চোখও জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে স্বীর মাথার উপরে নিঃশব্দে ডান হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কিছুকণে কান্নার প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি তাকে বলেছিলুম জান?

নীলাধর স্নেহে মৃদুস্বরে বলিল, জানি; তাকে আসতে বারণ করে দিয়েচ।

কে তোমাকে বললে?

নীলাধর সহাস্যে কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু একটা অচেনা লোকের সঙ্গে বন্ধন কথা করেচ, তখন অনেক দুঃখেই করেচ। সে কথা ও-ছাড়া আর কি হতে পারে বিরাজ!

বিরাজের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল।

নীলাধর বলিতে লাগিল, কিন্তু কাজটা ভাল করনি। আমাকে জানান উচিত ছিল, আমিই গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আমি অনেকদিন পূর্বেই তার মনের ডাব টের পেয়েছি, কতদিন সকালে বিকালে তাকে দেখতেও পেয়েছি, কিন্তু তোমার নিবেদন মনে করেই কোনদিন কিছু বলিনি।

সেমি সম্মুখ হইতেই আকাশে মেঘ মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাগে স্বামীস্বীতে বিছানার ওইয়া আবার কথা উঠিল।

নীলাধর বলিল, আজ সারাদিন তাকে দেখবার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

বিরাজ ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন? কেন?

দুটো কথা না বললে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়ে থাকতে হবে—তাই।

ভয়ে উত্তেজনার বিরাজ বলিয়া বলিল, না হবে না, কিছুতেই হবে না; এই নিয়ে তুমি

তাকে একটি কথাও বলতে পারে না।

তাহার মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীলাখর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি বামী, আমার কি একটা কর্তব্য নেই?

বিরাজ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিল, বামীর অন্য কর্তব্য আগে কর, তারপরে এ কর্তব্য করতে যেও।

কি? বলিয়া নীলাখর কণকাল তত্বিত হইয়া থাকিয়া, অবশেষে মৃদুস্বরে 'আচ্ছা' বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া চূপ করিয়া শুইল।—বিরাজ তেমনইভাবে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কি কথা স্বেচ্ছা তাহার মুখ দিয়া আজ বাহির হইয়া গেল!

বাহিরে বর্ষার প্রথম বারিপাতের দ্রুত লক্ষ শ্রোতা জানালার ভিতর দিয়া ভিজামাটির গন্ধ বহিয়া আনিতে লাগিল, ভিতরে বামী-ব্রী নির্বাক শুভ হইয়া রহিল।—রুদ্ধপন পরে নীলাখর গভীর আর্দ্রকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, আমি যে কত অনশ্লব্ধ, সিরাজ, তা তোর কাছে যেমন শিবি, তেমন আর কারও কাছে নয়।—

বিরাজ কি কথা বলিতে চাছিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া শব্দ ফুটিল না।

কয়দিন পরে আজ এই অসহ্য দুঃখসৈন্যপীড়িত দম্পতিটির সন্ধির সূত্রপাতেই, আবার তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

দশ

মধ্যাহ্নে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছোটবৌ বিরাজের পায়ের নীচে কাঁদিয়া স্নানিয়া পড়িল। বামীর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই দুইদিন ধরিয়া সে অনুক্ষণ এই সুযোগটুকু প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কাঁদিয়া বলিল, শাপ-সম্পাত দিও না দিদি, আমার মুখ চেয়ে একে ছাপ কর, ওঁর কিছু হ'লে বাঁচব না।

বিরাজ হাত বরিয়া তাহাকে তুলিয়া বিবর গভীর-মুখে বলিল, আমি অভিসম্পাত সেব না বোন, আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু তোর মত সতীলক্ষ্মীর দেখে বিনামোমে হাত তুললে মা দুর্গা সহ্য করবেন না যে!

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কি করব দিদি, ঐ তাঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেখে অমন রাগ দিয়েছে, তিনিই মাগ করবেন। তবুও এমন সেব-সেবতা নেই যে, এজন্য মানত করিনি, কিন্তু মহাপানী আমি, আমার ডাকে কেউ কান নিলে না। এমন একটা দিন যার না দিদি,—বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিরাজ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে ছোটবৌর ডান রপের উপর একটা বীকা গাড় কাল দাগ পড়িয়াছে, সময়ে বলিয়া উঠিল, তোর কপালে কি মারের দাগ নাকি রে?

ছোটবৌ লজ্জিত-মুখ করিয়া ঘাড় নাড়িল।

কি দিয়ে মারলে?

বামীর লজ্জার মোহিনী মুখ তুলিতে পারিতেছিল না; নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, রাগ হলে ওঁর জান থাকে না দিদি।

তা আমি, তবু কি দিয়ে মারলে?

মোহিনী তেমনই নতমুখে থাকিয়াই বলিল, পায়ে চটখুঁত। ছিল—

বিরাজ শুভ হইয়া বলিয়া রহিল—তাহার দই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃতকণ্ঠে বলিল, জুড়া দিয়ে মারলে! কি করে সহ্য করে রইলি ছোটবৌ?

ছোটবৌ একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি।

বিরাজ সে কথা যেন কানে গুলিতে পাইল না, তেমনই বিকৃত গলায় বলিল, আবার তারই জন্যে তোমার পায়ে—

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল, না ছোটবৌ, না, মিছে কথা বলিস নে—এ অপমান আমি

সইতে পারিনে।

ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া বলিল, নিজের অপমান সইতে পারাটাই খুব বড় পারা সিদি? তোমার মত স্বামী-সৌভাগ্য সংসারে মেরেমানুষের অদৃষ্টে জোটে না, তবুও তুমি বা সয়ে আছ, সে সইতে গেলে আমরা ঠাট্টা হয়ে বই। তাঁর মুখে হাসি নেই, মনের ভিতর সুখ নেই, তোমায় রাতদিন চোখে দেখতে হচ্ছে; অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না সিদি।

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ খণ করিয়া হাত দিয়া তাহার পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, ঠেকে কমা করলে? তোমার মুখ থেকে না ওমলে আমি কিছুতেই পা ছাড়ব না—তুমি প্রসন্ন না হ'লে ঠেকে কেউ রকে করতে পারবে না সিদি।

বিরাজ পা সরাইয়া লইয়া হাত দিয়া ছোটবৌর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিল মাপ করলুম।

ছোটবৌ আর একবার পা'র ধূলা মাখায় লইয়া আনন্দিতমুখে চলিয়া গেল।

কিন্তু বিরাজ অভিভূতের মত সেইখানেই বহুক্ষণ স্থব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যেন বারংবার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, এই দেখে শেষ বিরাজ!

সেই অবধি অনেকদিন পর্যন্ত ছোটবৌ এ বাড়িতে আসে নাই, কিন্তু একটি চোখ, একটি কান এই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। আজ বেলা একটা বাজে, সে অতি সাবধানে এমিক ওমিকে চাহিয়া এ বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিরাজ গালে হাত দিয়া রান্নাঘরে দাওয়ায় একবারে শুক হইয়া বসিয়া ছিল, তেমনই করিয়া রহিল।

ছোটবৌ কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া নিজের মাথায় স্পর্শ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সিদি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ?

বিরাজ মুখ কিরাইয়া তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল, তুই হ'তিস নে?—ছোটবৌ বলিল, তোমার সঙ্গে ভুলনা করে আমাকে অপরাধী কর না সিদি, এই দুটি পা'র ধূলোর যোগ্যও ত আমি নই, কিন্তু তুমি বল, কেন এমন কষ্ট? কেন, বঠাকুরুকে আজ খেতে দিলে না?

জারি ত খেতে বারণ করিনি!

ছোটবৌ বলিল, বারণ করনি সে কথা ঠিক, কিন্তু, কেন একবার গেলে না? তিনি খেতে বসে কতবার ডাকলেন। একটা সাড়া পর্যন্ত দিলে না। আজ তুমিই বল, এতে দুঃখ হয় নি না? একটবার কাছে গেলে ত তিনি ভাত কেলে উঠি যেতেন না।

তথাপি বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিতে লাগিল, হাত-জোড়া ছিল ব'লে আমাতে ত ভুলাতে পারবে না সিদি! চিরকাল সমস্ত কাজ কেলে রেখে তাঁকে সুমুখে বসে খাইয়েচ—সংসারে এর চেয়ে বড় কাজ তোমার কোনদিন ছিল না, আজ—

কথা শেষ না হইবার পূর্বেই বিরাজ উন্মাদের মত তাহার একটা হাত ধরিয়া সঙ্গেসঙ্গে টান দিয়া বলিল, তবে দেখবি আয়। বলিয়া টানিয়া আনিয়া রান্নাঘরের মাঝখানে পাড় করাইয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ চেয়ে দেখ!

ছোটবৌ চাহিয়া দেখিল একটা কাল পাখরে অপরিষ্কৃত মোটা চালের ভাত এক তাহারই একবারে অনেকটা কলমি-শাকসিদ্ধ, আর কিছুই নাই।

আজ কোন উপায় না দেখিয়া বিরাজ এইগুলি নদী হইতে ছিড়িয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ছোটবৌর দুচোখ বাহিরা করকর করিয়া অন্ধ করিয়া পড়িল, কিন্তু, বিরাজের চোখে অঙ্গের আভাস আর নাই। দুই জনে নিঃশব্দে সুখোন্মুখি চাহিয়া রহিল।

বিরাজ অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, তুইও ত মেয়েমানুষ, তাকেও রেখে স্বামীর পাতে ভাত দিতে হয়, তুই বল, পৃথিবীতে কেউ কি সমুখে বসে স্বামীর ও খাওয়া চোখে দেখতে পারে? আগে বল, ব'লে যা, তোর মুখে যা আসে তাই ব'লে আমাকে গাল দে, আমি কথা ক'ব না।

হোটবৌ একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া তেমনই অঝোরে জল করিয়া পড়িতে লাগিল।—বিরাজ বলিতে লাগিল, 'সেবাং রাজার ঘোষে যদি কোনদিন তাঁর একটি ভাতও কম খাওয়া হয়েছে, ত, সারাদিন বুকের ভিতর আমার কি হুঁচ বিধেছে, সে আর কেউ না জানে তা তুই জানিস হোটবৌ, আজ তাঁর কিসের সময় আমাকে এ এনে দিতে হয়—তাও বুঝি আর জোটে না—

আর সে সম্মু করিতে পারিল না, হোটজার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ফুপাইয়া কঁদিয়া উঠিল। তারপর, সহোদরার মত এই দুই রমণী বহুকণ পর্বন্ত বাতপাশে আবদ্ধ রহিল, বহুকণ ধরিয়া এই দুই অভিন্ন নারীজন্মের নিঃশব্দে অক্ষজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর বিরাজ রাখা তুলিয়া বলিল, না তাকে লুকাব না, কেননা, আমার দুষ্ট বৃথতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমি সরে না গেলে ওঁর কষ্ট বাবে না। কিন্তু, থেকে ত ও-মুখ না মেখে একটা দিনও কাটাতে পারব না। আমি যাব, বল আমি গেলে ওঁকে দেখবি?

হোটবৌ চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?

বিরাজের শুভ ওষ্ঠাধরে কঠিন শীতল হাসির রেখা পড়িল, বোধ করি একবার সে দ্বিধাও করিল, তারপর বলিল, কি করে জানব বোন কোথায় যেতে হয়, ওনি ওর চেয়ে পাপ নাকি আর নেই, তা সে বাই হোক এ জ্বালা এড়াব ত!

এবার মেহিনী বৃত্তিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, হি হি, ও কথা এনো না মিথি! আত্মহত্যার কথা যে বলে তার পাপ, যে কানে শোনে তার পাপ, হি হি, কি হয়ে গেলে তুমি!

বিরাজ হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, তা জানিনে। শুধু জানি, ওঁকে আর খেতে দিতে পারছি নে। আজ আমাকে হুঁরে কথা দে তুই, যেমন ক'রে পারিস দুই ডায়ে মিল করে মিথি।

কথা দিলুম, বলিয়া মেহিনী সহসা বসিয়া পড়িয়া বিরাজের ঋণী পিয়া ধরিয়া বলিল, তবে আমাকেও আজ একটা ভিক্ষে দেবে বল?—বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কি?

তবে এক মিনিট সবুর কর আমি আসছি, বলিয়া সে পা বাড়াইতেই বিরাজ জাঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না হাসনে। আমি একটা ভিল পর্বন্ত কর কাছে নেব না।

কেন নেবে না?

বিরাজ প্রকলবেগে রাখা নাড়িয়া বলিল, না সে কেনহুটেই হবে না, আর আমি করত কিছু নিতে পারব না।—হোটবৌ কণ্ঠের জ্বলন্ত হিরণ্ময়িত বড়জার আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিল। তারপর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, তবে শোন মিথি। কেন জানিনে, আগে তুমি আমাকে ভালকসনে না, ভাল ক'রে কথা কইতে না, সেজন্য কত যে নুকের বলে কঁপেচি, কত দেখেবীকে ডেকেচি, তার সংখ্যাই নাই। আজ তাঁরও মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমিও ছোটবেলা বলে ডেকেচ। এখন একবার ভেবে দেখ, আমাকে এই অবস্থার মধ্যে কিছু না করতে গেলে তুমি কিরকম ক'রে বেড়াতে?

বিরাজ জবাব দিতে পারিল না। মুখ বীচু করিয়া রহিল।—হোটবৌ উঠিয়া দিয়া অনতিকাল পরে একটা বড় ধামার সর্বগ্রন্থর আঘাত পূর্ণ করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল।

বিরাজ হির হইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে এখন কাছে আসিয়া তাহার জাঁচলের একটা বুট তুলিয়া একখানা মোহর বঁধিতে লাগিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া সম্মুখে টেলিয়া দিয়া টেঁচাইয়া উঠিল, না, ও কিছুতেই হবে না—স'রে খেলো না।

মোহিনী থাকা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। এ আমার বৃঠাকুর আমাকে বিয়ের সময়ে দিয়েছিলেন। বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া আর একবার হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাখায় লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

এগার

মগরার এতদিনের নিতলের কবজার কারখানা যেদিন সহসা বন্ধ হইয়া গেল এবং এই খবরটা চাঁড়ালদের সেই মেয়েটি বিরাজকে দিতে আসিয়া ছাঁচ বিক্রির অভাবে নিজের নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধার অনর্গল বকিতে লাগিল, বিরাজ তখন চূপ করিয়া শুনিল। তারপর একটি ক্ষুদ্র শিখাস কেলিল মাত্র। মেয়েটি মনে করিল, তাহার দুঃখের অংশী মিলিল না, তাই ক্ষুদ্র হইয়া ফিরিয়া গেল। হায় রে, অবোধ দুঃখীর মেয়ে, তুই কি করিয়া বুঝিবে সেইটুকু শিখাসে কি ছিল, সে, নীরবতার আড়ালে কি কড় বহিতে লাগিল। শান্ত নির্বাক ধরিত্রীর অস্তৃতলে কি আশুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কেথায় পাইবি!

নীলাধর আসিয়া বলিল, সে কাজ পাইয়াছে। আগামী পূজার সময় হইতে কলিকাতার এক নামজাদা কীর্তনের দলে সে খোল বাজাইবে।

খবর শুনিয়া বিরাজের মুখে মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংস্বেবে সমস্ত ভদ্র-সমাজের সম্মুখে গাহিয়া বাজাইয়া ফিরিবে! তবে, আহা! ভূটিবে! লজ্জায় থিকারে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া নিবেদন করিতেও পারিল না—আর যে কোন উপায় নাই। সজ্জার অন্ধকারে নীলাধর সে মুখের ছবি দেখিতে পাইল না—ভালই হইল।

ভাঁটার টানে জল যেমন প্রতিমূহূর্তে স্রবচ্ছিন্ন ভটপ্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনি করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল। অতি দ্রুত অতি সুশ্পষ্টভাবে ঠিক তেমনি করিয়া তাহার দেহতটের সমস্ত মলিনতা নিরন্তর অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার দেবদাহিত অতুল যৌবনশ্রী কোথায় অস্তিত্ব হইয়া যাইতে লাগিল। দেহ শুষ্ক, মুখ স্নান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—যেন কি একটা ভয়ের বস্তু সে অহরহ দেখিতেছে। অথচ তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। ছিল শুধু ছোটবৌ; সেও মাসাধিক কাল ভাইয়ের অসুখে বাপের বাড়ি গিয়াছে। নীলাধর দিনের বেলা প্রায়ই ঘরে থাকে না। যখন আসে তখন রাত্রির আধার, তাহার দুই চোখ প্রায়ই রাসা, শিখাস উক বহে। বিরাজ সবই দেখিতে পায়, সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু কোনো কথাই বলে না। বলিতে ইচ্ছাও করে না, তাহার সামান্য কথাবার্তা কহিতেও এমনি ক্লান্ত বোধ হয়।

কয়েকদিন হইল, বিকাল হইতে তাহার শীত করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিতেছিল, এই লইয়াই তাহাকে ভিমিত সজ্জা-দীপটি হাতে করিয়া রাসাঘরে প্রবেশ করিতে হইত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল। ঠাকুর-দেবতাকে বিরাজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতেও বলে না, পূর্বের মত প্রার্থনা জানায় না। আত্মিক শেষ করিয়া গলার আঁচল দিয়া যখন প্রশাম করে, তখন শুধু মনে মনে বলে, ঠাকুর যে পথে যাচ্ছি, সে পথে যেন একই শিগগির করে যেতে পাই।

সেদিন প্রাক্কালের সংক্ৰান্তি। সকাল হইতে ঘন-বৃষ্টিপাতের আর বিরাম ছিল না। তিন দিন জ্বর-ভোগের পর বিরাজ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আবুল হইয়া সজ্জার পর বিদ্যানায় উঠিয়া বসিল। নীলাধর বাড়ি ছিল না। পরন্তু, ত্রীর এত জ্বর দেখিয়াও তাহাকে ত্রীরামপুরের এক ধনাঢ্য শিষ্যের-বাড়িতে কিছু প্রান্তির আশায় বাহিতে হইয়াছে, কিন্তু কথা ছিল কোনোমতেই রাত্রিবাস করিবে না, যেমন করিয়া হউক সেইদিনই সজ্জা নাগাদ ফিরিয়া আসিবে। পরও গিয়াছে, কাল গিয়াছে, আজও বাহিতে বসিয়াছে, তাহার দেখা নাই। অনেকদিনের পর আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাজ যখন-তখন কাঁদিয়াছে। অনেকদিনের পর আজ সে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পায়ে মানত করিতে করিতে তাহার সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে। আর কিছুতেই ওইয়া থাকিতে না

পারিয়া, সখ্যা ছালিয়া দিয়া একটা গামছা মাথায ফেলিয়া কানিতে কানিতে বাহিরে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে যতদূর পারিল, চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, চতীমণ্ডলের পৈঠায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ পরে ফুকরিয়া কানিয়া উঠিল। কি জানি, তাহার কি ঘটিল! একে দুখে কণ্টে ভ্রামাচারে সেই তাহার দুর্বল, তাহাতে পথভ্রম—কোথায় অসুখ হইয়া পড়িলেন, না গাড়ি-খোড়া চাপা পড়িলেন, কি হইল, কি সর্বনাশ ঘটিল—ঘরে বসিয়া সে কি করিয়া বলিবে, কেমন করিয়া কি উপায় করিবে! আর একটা বিপদ, বাড়িতে শীতাত্তরও নাই, কাল বৈকালে সে ছোটবধূকে আনিতে গিয়াছে, সমস্ত বাড়ির মধ্যে বিরাজ একেবারে একা। আবার সে নিজেও পীড়িত। আজ দুপুর হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরে এমন এতটুকু কিছু ছিল না যে সে খায়। দুদিন শুধু জল খাইয়া আছে। জলে ভিজিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে কোনোমতে হাতে পায়ে ভর দিয়া পৈঠা ছাড়িয়া চতীমণ্ডলের ভিতরে ঢুকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা বুড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় ঘা পড়িল। বিরাজ একবার কান পাতিয়া শুনিল, দ্বিতীয় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ‘বাই’ বলিয়া চোখের পলকে কপাট খুলিয়া ফেলিল। অথচ, মুহূর্ত পূর্বে সে উঠিয়া বসিতে পারিতেছিল না।

যে কল্পনাত করিতেছিল, সে ও-পাড়ার চামাদের ছেলে। বলিল, মাঠাকরন, মাঠাকুর একটা শুকনা কাপড় চাইলে—নাও।

বিরাজ ভাল বুঝিতে পারিল না, চৌকাঠে ভর দিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল কাপড় চাইলেন? কোথায় তিনি?

ছেলেটি জবাব দিল, গোপাল ঠাকুরের বাপের গতি ক’রে এই সবাই ফিরে এলেন যে।

গতি ক’রে? বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গোপাল চক্রবর্তী তাহাদের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। তাহার বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, দিন-মুই পূর্বে তাঁহাকে ত্রিবেণীতে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল, আজ ত্রিশহরে তিনি মরিয়াছেন, দাহ করিয়া এইমাত্র সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি সব সংবাদ দিয়া শেষকালে, জানাইল, মাঠাকুরের মত এ অঞ্চলে কেউ নাতী ধরতে পারে না, তাই তিনিও সেইদিন হ’তে সঙ্গে ছিলেন।

বিরাজ চলিতে চলিতে ভিতরে আসিয়া তাহার হাতে একখানা ব’ড় দিয়া, লব্যা আশ্রয় করিল।

জনপ্রাণীশূনা অন্ধকার ঘরের মধ্যে যাহার স্ত্রী একা, জ্বরে, দৃষ্টিভ্রম, অনাহারে মৃতকর, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিমূক্ত, সেই হতভাগিনীর বলিবার, কি করিবার আর কি বাকী থাকে! আজ তাহার অবসর বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দৃঢ়তর বলিয়া দিতে লাগিল,—বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নেই। তোর মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই—স্বামীও নেই; আছে শুধু মম। তাঁর কাছে ভিন্ন তোর জুড়াবার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, কিষ্কির ডাকে, বাতাসের শব্দে কেবল নাই-নাই শব্দই তাহার দুই কানের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁড়ারে ঢাল নাই, গোলায় ধান নাই, বাগানে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই,—সূখ নাই, শান্তি নাই। বাস্তব নাই—ও বাড়িতে ছোটবেী নাই, সকলের সঙ্গে আর তা: স্মৃতিও নাই। অথচ আশ্চর্য এই, কাহারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কোন্ডের ভাবও তাহার মনে উঠিল না। এক বৎসর পূর্বে স্বামীর এই হৃদয়হীনতার শতাংশের একাংশ বোধ করি তাহাকে ক্রোধে পাগল করিয়া তুলিত; কিন্তু, আজ কি-একরকম স্বত্ব অবসাদ তাহাকে অসাড় করিয়া আনিতে লাগিল।

এমনই মিজীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে কত কি ভাবিয়া দেখিতে চাহিল, ভাবিতেও লাগিল, কিন্তু সমস্ত ভাবনাই এলোমেলো। অথচ ইহারই মধ্যে অভ্যাসবশে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয়নি যে।

আর শুইয়া থাকিতে পারিল না ; ছরিত-পদে বিছানা ছাড়িয়া শ্রীপ হাতে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, রাঁধিবার মত যদি কোথাও কিছু থাকে। কিন্তু কিছুই নাই—একটা কণাও তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরে আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া এক-মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপরে হাতের শ্রীপ হুঁ দিয়া নিবাইয়া রাখিয়া খিড়কির কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কি নিবিড় অন্ধকার! ভীষণ শুষ্কতা, ঘন গুম্বাকণ্টকাকীর্ণ সর্বাঙ্গ পিচ্ছল পথ, কিছুই তাহার গতিরোধ করিল না। বাগানের অপর প্রান্তে বনের মধ্যে চাঁড়ালদের ক্ষুদ্র কুটার, সে সেইদিকে চলিল। বাহিরে প্রাচীর ছিল না, বিরাজ একেবারে প্রান্তরের উপরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, তুলসী!—ডাক শুনিয়া তুলসী আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল—এই আধারে হুমি কেন মা?—বিরাজ কহিল, চাটু চাল দে!

চাল দেব? বলিয়া তুলসী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এই অস্তুত প্রার্থনায় কোন অর্থ বজিয়া পাইল না।—বিরাজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে থাকিস নে তুলসী, একটু শিগগির ক'রে দে।

তুলসী আরও দু' একটা প্রথের পর চাল আনিয়া বিরাজের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু এ মোটা চালে কি কাজ হবে মা? এ তো তোমরা খেতে পারবে না।

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারব।

তারপর তুলসী আলো লইয়া পথ দেখাইতে চাহিল। বিরাজ নিষেধ করিয়া বলিল, কাজ নেই, তুই একা ফিরে আসতে পারবি নে। বলিয়া নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। আজ চাঁড়ালের ঘরে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেল, অথচ এত বড় অপমান তাহাকে তেমন করিয়া বিধিল না—শোক, দুঃখ, অপমান, অভিমান, কোন বস্তুরই তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি তাহার দেহে ছিল না।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল নীলাধর আসিয়াছে। স্বামীকে সে তিন দিন দেখে নাই, চোখ পড়িবামাত্রই দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত উদ্দাম হইয়া উঠিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ক্রমাগত ঐনিকে টানিতে লাগিল, কিন্তু, এখন আর তাহাকে এক-পা টলাইতে পারিল না।

তীব্র তড়িৎ-সম্পর্শে ধাতু যেমন শক্তিময় হইয়া উঠে, স্বামীকে কাছে পাইয়া চক্ষের নিমেষে সে তেমনই শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে গুরু হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলাধর একটিবার-মাত্র মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়াছিল—সেই দৃষ্টিতেই বিরাজ দেখিয়াছিল, তাহার দুই চোখ জবার মত ঘোর রক্তবর্ণ—মড়া গোড়াইতে গিয়া তাহার যে এই তিন দিন অবিক্রম গাঁজা খাইয়াছে, সে কথা তাহার অগোচরে রহিল না। মিনিট পাঁচছয় এইভাবে থাকিয়া কাছে সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাওয়া হয়নি?

নীলাধর বলিল, না।—বিরাজ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল, নীলাধর সহসা ডাকিয়া বলিল, শোন, এত রাতিরে একা কোথায় গিয়েছিলে?

বিরাজ দাঁড়াইয়া পড়িয়া একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—ঘাটে।

নীলাধর অকিঞ্চাসের স্বরে বলিল, না, ঘাটে ভুমি যাও নি।

তবে যমের বাড়ি গিয়েছিলুম, বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে ভাত বাড়িয়া যখন সে ডাকিতে আসিল, নীলাধর তখন চোখ বুজিয়া কিম্বাইতেছিল। অত্যধিক গাঁজার মহিমায় তাহার মাথা তখন উত্তপ্ত এবং বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব প্রথের অনুবৃত্তি-স্বরূপে কহিল, কোথা গিয়েছিলে?

বিরাজ নিজের উদ্যত জিহ্বাকে সজোরে দংশন করিয়া নিবৃত্তি করিয়া শাস্তভাবে বলিল, আজ খেতে শোও, সে কথা কল শুনো।

নীলাধর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজই শুনব। কোথায় ছিলে বল?

তাহার জিসের ভঙ্গী দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিল, বলিল, যদি না বলি? বলতেই হবে, বল।

আমি তা কিছুতেই বলব না। আগে খেয়ে শোও তখন শুনেতে পাবে।

নীলাশ্বর এ হাসিটুক লক্ষ্য করিল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মুখ তুলিল—সে চোখে আর আশ্রয় ভাব নাই, হিংসা ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ভীষণকণ্ঠে বলিল, না কিছুতেই না; কোনমতেই না, না শুনে তোমার হোঁয়া জল পর্যন্ত খাব না।

বিরাজ চমকিয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চমকায় না। সে টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে পিছাইয়া গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি বললে? আমার হোঁয়া জল পর্যন্ত খাবে না?

না, কোন মতেই না।

কেন? নীলাশ্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, আবার জিজ্ঞেস কর কেন?

বিরাজ নিঃশব্দে স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল, বুঝি! আর জিজ্ঞেস করব না। আমিও কোন মতে বলব না, কেননা কাল যখন তোমার ঈশ হবে তখন নিজেই বুঝবে—এখন তুমি তোমাতেই নেই।

নেশাখোর সব সহিতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধিভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, গাঁজা খেয়েছি এই বলছিস ত? গাঁজা আজ আমি নতুন খাইনি যে, জ্ঞান যদি নষ্ট। বরং জ্ঞান হারিয়েচিস তুই, তুই আর তোমতে নেই।

বিরাজ তেমনি মুখের পানে চাহিয়া রহিল।—নীলাশ্বর বলিল, করে চোখে ধুলো দিতে চাস বিরাজ? আমার? আমি অতি মুখ, তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোটভাই, যথার্থ ভায়ের কাজই করেছিল। নইলে কেন তুই বলতে পারিস নে কোথা ছিল? কেন মিছে কথা বললি—তুই ঘাটে ছিলি?—বিরাজের দুই চোখ এখন পাগলের চকুর মত ধকমক করিতে লাগিল, তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল, মিছে কথা বলছিনু, এ কথা শুনেলে তুমি লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে, হয়ত তোমার খাওয়া হবে না তাই,—কিন্তু সে ভয় মিছে—তোমার লজ্জা-শরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই। কিন্তু, তুমি মিছে কথা বলিনি? একটা পণ্ডিত এত বড় ছল করতে লজ্জা হ'ত, কিন্তু তোমার হল না। সাধুকহ! রোগা ক্রীকে ঘরে একা যেখানে কোন শিষ্যের বাড়িতে তিন দিন মনে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে বল।

নীলাশ্বর আর সহিতে পারিল না। বলচি, বলিয়া হাতের কাছের পুণ্য পানের জিকটি বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। বন্ধ-ডিবা তাহার কপালে লাগিয়া ঝনঝন করিয়া খুলিয়া নীচে পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চেখের কোণ বাহিয়া, ঠোঁটের প্রান্ত বাহিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া উঠিল।

বিরাজ বী হাতে কপাল টিপিয়া ধবিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আমাকে মারলে!

নীলাশ্বরের ঠোট মুখ কাপিতে লাগিল, বলিল, না, মারিনি। কিন্তু দুঃখ সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস নে—অলক্ষী, দুঃখ হয়ে যা'।

বিরাজ উঠিয়া পাড়াইয়া বলিল, যাক! এক পা গিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিল, কিন্তু সম্মত হবে ত? কাল যখন মনে পড়বে, জুবেব উপব আমাকে মেবেঁচ—তাড়িয়ে দিয়েচ, আমি তিন দিন খাইনি, তবু এই অন্ধকারে তোমার জন্যে ভিক্ষা করে এনেচি—সইতে পারবে ত? এই অলক্ষীকে ছেড়ে থাকতে পাববে ত?

রক্ত দেখিয়া নীলাশ্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল—সে মুখে মত চূপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিরাজ অঁচল দিয়া মুছিয়া বলিল, এই এক বছর যাই-যাই করচি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। চেয়ে দেখ, দেখে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এক পা চলতে পারিনে—আমি যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অলবদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায়

মুখ দেখাব না। তোমার পায়ের নীচে মরবার লোভ আমার সবচেয়ে বড় লোভ,—সেই লোভটাই আমি কোনমতে ছাড়তে পারছিলাম না—আজ ছাড়লাম,—বলিয়া কপাল মুহিতে মুহিতে ঝিড়কির খোলা দোর দিয়া আর একবার অন্ধকারে বাগানের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নীলাশ্বর কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু জিভ নাড়িতে পারিল না। ছুটিয়া পিছনে যাইতে চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। কোন্ মারামর্মে তাহাকে অচল পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া বিরাজ অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ একবার ওই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ, ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়্য মৃদুপ্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কুল ভাসাইয়া চলিয়াছে! যে কালো পাথরখণ্ডটার উপর একদিন বসন্ত-প্রভাতে দুইটি ভাইবোনকে অসীম স্নেহসুখে এক হইয়া বসিতে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কালো পাথরটার উপর বিরাজ আজিকার আধার রায়ে কি হৃদয় লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীর-ভিত্তিতে থাকা খাইয়া আবর্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেইদিকে একবার ঝুকিয়া দেখিয়া সন্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নীচে কালো পাথর, মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশ, সমুখে কালো জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ স্তব্ধ বনানী—আর বৃকের ভিতর জাগিতেছে তাদের চেয়ে কালো আবহুত্যাশ্রবণ। সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া নিজেব হাত-পা বাঁধিতে লাগিল।

বার

প্রভাতের আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, টিপিটিপি জল পড়িতেছিল। নীলাশ্বর খোলা দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সুপ্তকর্ণে শব্দ আসিল, হাঁ গা, বিরাজবৌমা!

নীলাশ্বর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। হয়ত, শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুহিতে মুহিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে তুলসী ডাকিতেছে। কাল সমস্ত রাত্রি বনে বনে প্রতি বৃক্ষতলে ঝুঞ্জিয়া ঝুঞ্জিয়া কাঁদিয়া ঘণ্টা-ঝাকেক পূর্বে শ্রান্ত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় বসিয়াছিল, তার পর কখন ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।—তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায় বাবু?

নীলাশ্বর হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুই তবে কাকে ডাকছিলি?

তুলসী বলিল, বৌমাকেই ত ডাকছি বাবু! কাল এক পহরে রেতে কোথাও কিছু নেই, এই আঁধারে মা গিয়ে আমাদের বাড়ি মোটা চাল চেয়ে আনলে, তাই সকালে দোর খোলা পেয়ে জানতে এলাম, সে চলে কি কাজ হ'ল?

নীলাশ্বর মনে মনে সমস্ত বৃথিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না তুলসী বলিল, এত ভোরে তবে ঝিড়কি খুললে কে? তবে বৃষ্টি বৌমা ঘাটে গেছেন, বলিয়া চলিয়া গেল।

নদীর ধারে প্রতি গর্ত, প্রতি বীক, প্রতি ঘোপ-ঝাড় অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত দিন অদ্ভুত অরাত নীলাশ্বর সহসা একস্থানে থামিয়া পড়িয়া বলিল, এ কি পাগলামি আমার মাথায় চাপিয়াছে! আমি যে সারাদিন খাই নাই, এখনও কি একথা তাহার মনে পড়িতে বাকী আছে? এর পরেও সে কি কোথাও কোন কারণে একমুহূর্ত থাকিতে পারে? তবে একি অদ্ভুত কাণ্ড সকাল হইতে করিয়া কিরিতেছি! এ-সব চোখের সামনে এমনই সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, তাহার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গা একেবারে খুঁছিয়া মুছিয়া গেল, সে কাদা চেলিয়া, মাঠ ভাঙ্গিয়া উর্ব্বাশাসে ঘরের দিকে ছুটিল। বেলা যখন যায়-যায়, পশ্চিমাকাশে সূর্যসেব কণকালের জন্য মেঘের কাঁকে রক্তমুখ বাহির করিয়াছেন, সে তখন বাড়ি ঢুকিয়া সোজা রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঘের উপর তখনও আসন পাতা, তখনও গভীররাত্রির বাড়ী ভাত ওকাইয়া পড়িয়া আছে—

আরশোলা হাঁদুরে ছিটাছটি করিতেছে—কেহ মুক্ত করে নাই। সে ভোরের আধারে ঠাহর করে নাই ; এখন ভাতের চোহারা দেখিয়াই বুঝিল, ইহাই তুলসীর মোটা চাল, ইহাই অকৃত্রিম স্বামীর জন্য বিরাজ ছুরে কাঁপিতে কাঁপিতে অঙ্ককারে লুকাইয়া ভিঁকা করিয়া আনিয়াছিল, ইহারই জন্য সে মার খাইয়াছে, অশ্রাব্য কটু কথা শুনিয়া লজ্জায় বিকারে বর্বার দুরন্ত রাতে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

নীলাশ্বর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেয়েমানুষের মত গভীর আতনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যখন এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তখন আর আসিবার কথা ভাবিতে পারিল না। সে স্বীকে চিন্তিত। সে যে কত অভিমাত্রী, প্রাণ গেলেও সে যে পরের ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া এই কলঙ্ক প্রকাশ করিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিল বলিয়াই তাহার বুকের ভিতর এত সঙ্কর এমন হাহাকার উঠিল। তারপর উপড় হইয়া পড়িয়া দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতে লাগিল, এ আমি সইতে পারব না বিরাজ, তুই আয়।

সন্ধ্যা হইল, এ বাড়িতে কেহ দীপ জ্বালিল না ; রাত্রি হইল, রান্নাঘরে কেহ রন্ধিতে প্রবেশ করিল না ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া গেল, কেহ মুছাইয়া দিল না। দুদিনের উপবাসীকে কেহ খাইতে ডাকিল না। বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল, ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের শিখা তাহার মুদ্রিত চক্ষুর ভিতর পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দুর্যোগের বার্তা জানাইয়া যাইতে লাগিল ; তথাপি সে উঠিয়া বসিল না, চোখ মেলিল না, একভাবে মুখ গুঁজিয়া গেল।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সকাল। বাহিরের দিকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরজায় একটা গো-শকট দাঁড়াইয়া আছে, বাস্তব হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই ছোটবৌ ঘোমটা টানিয়া দিয়া নামিয়া পড়িল। অগ্রজের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া পীতাম্বর ওধারে সরিয়া গেল। ছোটবৌ কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই নীলাশ্বর অশ্রুটস্বরে কি-একটা অলীকান্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া বন্ধ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত ছোটবৌ হেঁট মাথা তুলিতে সে দ্রুতপদে কোন দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছোটবৌ জীবনে আজ প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুভারাক্রান্ত রক্তাক্ত চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? দুঃখ-কষ্টে দিদি আশ্রয়ার্থী হলেন, তবুও আমরা পর হয়ে থাকব? তুমি থাকতে পাঁ থাক গে, আমি আজ থেকে ও-বাড়ির সব কাজ করব।—পীতাম্বর চমকাইয়া উঠিল—সে কি কথা।

মোহিনী তুলসীর কাছে যতটুকু শুনিয়াছিল এবং নিজে যাহা অনুমান করিয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কহিল।

পীতাম্বর সহজে বিশ্বাস করিবার লোক নয়। কহিল, তার দেহ ভেসে উঠবে ত!

ছোটবৌ চোখ মুছিয়া বলিল, না উঠতেও পারে। স্নোতে ভেসে গেছেন, সতী-লক্ষ্মীর দেহ মা গঙ্গা হ্রদত বৃকে ভুলে নিয়েছেন। তা ছাড়া কে বা সন্ধান করচে, কে বা খুঁজে বেড়িয়েচে বল?

পীতাম্বর প্রথমটা বিশ্বাস করিল না, শেষটা করিল : বলিল, আচ্ছা, আমি খোঁজ করছি। একটু ভাবিয়া বলিল, বৌঠান মামার বাড়ি চলে গায়নি ত?

মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, কখনো না। দিদা বড় অভিমাত্রী, তিনি কোথাও যাননি, নদীতেই প্রাণ দিয়েছেন।

আচ্ছা, তাও দেখছি, বলিয়া পীতাম্বর শুদ্ধমুখে বাহিরে চলিয়া গেল। বৌঠানের জন্য আজ ইতম্ব তাহার প্রাণটা খরাপ হইয়া গেল। লোকজন নিযুক্ত করিয়া একজন প্রজ্ঞাকে বিরাজের মাঝার বাড়ি পাঠাইয়া জীবনে আজ সে প্রথম পুণ্যের কাজ করিল। স্বীকে ডাকিয়া বলিল, যদুকে দিয়ে উঠানের বেড়াটা ঝাঙ্গিয়ে দাও, আর যা পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায়

না,—বলিয়া শুড় মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া কাজে চলিয়া গেল। চার-পাঁচ মিল কামাই হওয়ার তাহার অনেক কতি হইয়াছিল।

কাজ করিতে করিতে ছোটবৌ ক্রমাগত চোখ মুহিতে মুহিতে ভাবিতেছে, ইনি যে মুখের পানে চাহিতে পারেন নাই, সে মুখ না জানি কি হইয়া গিয়াছে।

নীলাধর চতীমণ্ডপের মাঝখানে চোখ বুজিয়া শুক হইয়া বসিয়া ছিল। সুমুখের দেখালে টান মন রাখাক্ষের যুগলমূর্তির পট। এই পটখানি নাকি জাগ্রত। যখন রেলগাড়ি হয় নাই, তখন তাহাদের পিতামহ পায়ে হাঁটিয়া এখানি বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার সহিত পটখানি মানুষের গলায় কথা কহিত, এ ইতিহাস নীলাধর তাহার জননীর কাছে বহুবার শুনিয়াছিল। ঠাকুর-দেবতা জিনিসটা তাহার কাছে ঝাপসা ব্যাপার ছিল না। তেমন করিয়া ডাকার মত ডাকিতে পারিলে এরা যে সুমুখে আসেন, কথা ক'ন, এ সমস্ত তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। তাই ইতিপূর্বে গোপনে গোপনে এই পাটখানিকে কথা কহাইবার কত প্রয়াস সে যে করিয়াছে, তাহার অবধি নাই, কিন্তু সফল হয় নাই। অথচ এই নিষ্ফলতার হেতু সে নিজের অক্ষমতার উপরেই দিয়া আসিয়াছে; এমন সংশয় কোনদিন মনে উঠে নাই, পট সত্যি কথা কহে কি না। লেখাপড়া সে শিখে নাই। বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তারপর বিরাজের কাছে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে এবং এক-আধটু চিঠিপত্র লিখিতে শিখিয়াছিল—শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থের কোন ধার ধারিত না, তাই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার নিতান্তই মোটা ধরনের ছিল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিতর্কও সহিতে পারিত না ছেলেবেলায় এই সব লইয়া কখনও-বা নীতাম্বরের সহিত কখনও বা বিবাক্তের সহিত হাংলিট হইয়া যাইত।

বিরাজ তাহার অপেক্ষা মাত্র চার বছরের ছোট ছিল। তেমন মানিত না। একবার সে মনে খাইয়া নীলাধরের পট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। শাস্তি উভয়কে ছাড়িয়া দিয়া বিরাজকে ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, ছি মা ওকতনকে এমন করে ক'মতে দিতে নেই বিরাজ কাদিতে কাদিতে বলিয়াছিল, ও আমাকে আগে মেরেছিল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া লগ্ন দিয়াছিলেন, বিরাজের গায়ে কখন যেন সে হাত না তোলে। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর আজ প্রায় ত্রিশ হইয়াছে—সেই অবধি মাতৃভক্ত নীলাধর সেদিন পর্যন্ত মাতৃ-অজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

আজ শুক হইয়া বসিয়া পুরাতন দিনের এইসব বিস্মৃত কাহিনী মনে করিয়া প্রথমে সে মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া তাহার জাগ্রত ঠাকুরকে দুটা সোজা কথায় বিড়বিড় করিয়া বুকাইয়া বলিতেছিল—অন্তর্যামী ঠাকুর! তুমি ত সমস্তই দেখতে পেয়েচ। সে যখন এতটুকু অপরাধ করেনি, তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। কোণ বাড়িয়া জল করিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল।

বাবা!

নীলাধর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ছোটবৌ অদূরে বসিয়া আছে। তাহার মুখে সামান্য একটু ঘোমটা, সে সহজকণ্ঠে বলিল, আমি আপনাব মেয়ে, বাবা, ভেতরে আসুন, ম্যান কলে আজ আপনাকে গুটি খেতে হবে।

প্রথমে নীলাধর নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল—কত যুগ যেন গত হইয়াছে, তাহাকে কেহ খাইতে ডাকে নাই। ছোটবৌ পুনরায় বলিল, বাবা, রান্না হয়ে গেছে।

এইবার সে বুঝিল। একবার তাহার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তার পর সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—রান্না হয়ে গেল মা!

গ্রামের সবাই শুনিল, সবাই বিশ্বাস করিল, বিরাজবৌ ভুলে ডাকিয়া মরিয়াছে; বিশ্বাস করিল না শুধু ধূর্ত নীতাম্বর। সে মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, এই নদীতে এত বীক, এত কোপাকাড়, হৃৎদেহ কোথাও-না-কোথাও আটকাইবে। নদীতে নৌকা লইয়া, ধারে ধারে

বেড়াইয়া, তটকুরের দলক বন-জঙ্গল লোক দিয়া গর ভর অনুসন্ধান করিয়াও যখন শবের কোন চিহ্নই পাকরা পেল না, তখন ভাস্কর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, যেমন আর বহি কলক, নদীতে ডুবিয়া মরে নাই। কিছুকাল পূর্বে একটা সম্ভেদ ভাস্কর মনে উঠিয়াছিল, আবার সেই সম্ভেদটাই মনের মধ্যে পাক বাহিতে লাগিল। অথচ কাহ্নারো কাছে বলিবার জো নাই। একবার মোহিনীকে বলিতে গিয়াছিল, সে জিত কাটিয়া কানে আঙুল দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল বলল, তা হলে ঠাকুর-দেবতাও মিছে, রাতও মিছে, দিনও মিছে। সেখানে টানানো অঙ্গপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, দিদি ঠর অংশ ছিলেন। এ কথা আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি জানি, বলিয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বর রাগ করিল না—হঠাৎ সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

মোহিনী ভাস্করের সহিত কথা কহিতে শুরু করিয়াছে। ভাত বাড়িয়া দিয়া একটুখানি আড়ালে বসিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। সমস্ত সংসারের মাঝে শুধু সেই জানিল কি ঘটিয়াছিল, শুধু সেই বুঝিল, কি মর্মান্তিক ব্যাথা ঠর বুকে বঁধিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, মা, যত দোষই করে থাকি না কেন, জানে ত করিনি, তবে কি করে মায়া কাটিয়ে চলে গেল? আর সেইটে পারছিল না, তাই কি গেল মা?

মোহিনী অনেক কথা জানিত। একবার ইচ্ছা হইল বলে, দিদি যাবে বলিয়াই একদিন স্বামীর ভার তাহার উপরে দিয়াছিল। কিন্তু চাপ করিয়া রহিল।

পীতাম্বর স্বীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কও?

মোহিনী জবাব দিল, বাবা বলি, তাই কথা কই।

পীতাম্বর হাসিয়া বলিল, কিন্তু লোকে শুনে নিজে করবে যে।

মোহিনী কহিল, লোকে আর কি পারে যে করবে? তাদের কাছে তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ঠকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি ত লোকের নিজে আমি মাথায় পেতে নেব।—বলিয়া কাছে চলিয়া গেল।

ভের

পনের মাস গত হইয়াছে। আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ-আভাস জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপরাহ্নবেলায় নীলাম্বর একখানা কম্পন আসনের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত ক্লেশ, মুখ ঈষৎ পাতুর, মাথায় ছোট্ট জটা, চোখে বেরোগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। মহাভারতখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিধবা শ্রাবস্ত্রয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা, পুটিদের বোধ করি আজ আর আসা হইল না।

গুহবস্ত্রপরিহিতা নিরাভরণা ছোট্টো অনতিদূর বসিয়া এতকণ মহাভারত শুনিতেছিল, বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, না বাবা, এখনও সময় আছে—আসতেও পারে। দুদান্ত শত্রুরের মৃত্যুতে পুটি এখন স্বাধীন। সে স্বামীপুত্র ও দাসদাসী সঙ্গে করিয়া আজ বাপের বাড়ি আসিতেছে এবং পূজার কয়দিন এখানেই থাকিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছে। আজিও সে কোনও সংবাদই জানে না। তাহার মৃত্যুসমা বৌদিদি নাই—ছয়মাস পূর্বে সর্পঘাতে ছোট্টাল মরিয়াছে, কোন কথাই সে জানে না।

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই বোধ করি ছিল ভাল, একসঙ্গে একেতলা সে কি সেইটে পারবে মা!

প্রিয়তমা ছোট্টগিনীকে স্মরণ করিয়া বহুদিন পরে আজ তাহার শুদ্ধ চক্রে জল দেখা দিল। যে রাতে পীতাম্বর সর্পদষ্ট হইয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আমার কোন গুহপত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় মুখে লাগ, এতে যদি না বাঁচি, আর বঁচতেও চাইনে, বলিয়া সর্বপ্রকার ঝাড়ফুক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার পায়ের নীচে মাথা ঘষিয়াছিল এবং যাতনায় অব্যাহতি পাইবার আশায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত

পা ছাড়ে নাই, সেইদিন নীলাধর তাহার শেষ কাপা কাঁদিয়া চূর্ণ করিয়াছিল, আজ আবার সেই চোখে জল আসিরাছে। পরিত্রতা সাধী ছোটবধু নিজের চোখের জল গোপনে মুছিয়া নীরব হইয়া রছিল।

নীলাধর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, সেজন্যেও তত দুঃখ করিনি মা ; আমার নীতাধরের মত বিরাজকেও যদি ভগবান নিতেন ত আজ আমার সুখের দিন। সে ত হ'ল না। পুটি এখন বড় হয়েছে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে, তাই মায়ের মতন বৌদির এ কলঙ্ক শুনলে বল ত মা, তার বুকের ভিতর কি করতে থাকবে! আর ত সে মুখ তুলে চাইতেও পারবে না!

সুন্দরী আশ্চর্যান্বিত আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাস-দুই পূর্বে নীলাধরের কাছে কবুল করিয়া ফেলিয়াছিল, সে রাগে বিরাজ মরে নাই, জমিদার রাজেন্দ্রর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে নীলাধরের মনোকষ্ট আর দেখিতে পারিতেছিল না। মনে করিয়াছিল, এ কথায় সে ক্রোধের বশে হয়ত দুঃখ ভুলিতে পারিবে। ঘরে আসিয়া নীলাধর এ কথা বলিয়াছিল।

সেই কথা মনে করিয়া ছোটবৌ খানিকক্ষণ চূর্ণ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝিকে জানিয়ে কাজ নেই।

কি করে লুকাবে মা? যখন জিজ্ঞেস করবে, বৌদির কি হয়েছিল, তখন কি জবাব দেবে?

ছোটবৌ বলিল, যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েছেন—তাই।

নীলাধর মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয় না মা। শুনেচি, পাপ গোপন করলেই বাড়ে ; আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভরা আর বাড়িয়ে দেব না। বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সেটুকু হাসিতে কত ব্যথা, কত ক্রমা, তাহা ছোটবৌ বুঝিল। খানিক পরে ছোটবৌ অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল, এ-সব কথা হয়ত সত্যি নয়, বাবা!

কোন সব কথা মা? তোমার দিদির কথা?

ছোটবৌ নতমুখে মৌন হইয়া রছিল।

নীলাধর বলিল, সত্যি বৈ কি মা—সব সত্যি। জান ত মা, রেগে গেলে সে পাগলীর জ্ঞান থাকত না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হ'ল তখনও তাই। তাতে যে অত্যাচার, যে অপমান আমি করেছিলাম, সে সহ্য করতে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পারতেন না—সে ত মানুষ। নীলাধর হাত দিয়া এককোঁটা অশ্রু মুছিয়া বলিল, মনে হ'লে বুক ফেটে যায় মা, হতভাগী তিন দিন খায় নি, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে আমার জন্যে দুটি চাল ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, সেই অপরাধে আমি—আর যেন বলিতে পারিল না, কোঁচার খুঁট মুখে ওজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে নিরোধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোটবৌ নিজেও তেমনি করিয়া কাঁদিতেছিল, সেও কথা কহিল না। বহুকাল কাটিল।

বহুকালে নীলাধর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখমুখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, অনেক কথাই ভুঁমি জান, তবু শোন মা। কি করে জানিনে, সেই রাতেই সে অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে উঠে, তারপর—উঃ—টাকার লোভে সুন্দরী পাগলীকে আমার সেই রাতেই রাজেনবাবুর বজরার চুলে দিয়ে আসে—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী নিজেকে ভুলিয়া, লজ্জা-শরম ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কক্ষ সত্যি নয় বাবা, কক্ষ সত্যি নয়। দিদির দেহে প্রাণ থাকতে এমন কাজ তাকে কেউ করাতো পারবে না। তিনি সে সুন্দরীর মুখ পর্যন্ত দেখতেন না।

নীলাধর শান্তভাবে বলিল, তাও শুনেচি। হয়ত, তোমার কথাই সত্যি মা, দেখে তার প্রাণ ছিল না। ভাল ক'রে জানবুঝি হ'বার পূর্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায়নি, আজও ত আমার কাছে আছে,—বলিয়া সে চোখ বুজিয়া তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থ হৃদয় পর্যন্ত তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

ছোটবৌ মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত পাতুর নিমীলিত মুখের পানে চাহিয়া রছিল। সে মুখে ক্রোধ

বা হিসাব-সেবের এতটুকু দ্বারা নাই—আছে শুধু অপরিণীত ব্যথা ও অনন্ত ক্রমের অনির্বচনীয় মহিমা। সে গলায় আঁচল দিয়া শ্রম করিয়া মনে মনে তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে মনে মনে বলিল, দিদি চিনেছিল, তাহাতেই একটি দিনও ছেড়ে থাকতে চাইত না।

দীর্ঘ চার বৎসর পর পুটি বাপের বাড়ি আসিয়াছে এবং বড়মানুষের মতই আসিয়াছে। তাহার স্বামী, ছয় মাসের শিশুপুত্র, পাঁচ-ছয়জন দাসদাসী এবং গণিত ভিনিসপত্রে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্টেশনে নামিয়াই যদু চাকরের কাছে খবর শুনিয়া সে সেইখান হইতে কাঁদিতে শুরু করিয়াছিল। উচ্চরোলে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ি ঢুকিয়া দাদার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে রাতে নিজে জলস্পর্শ করিল না, দাদাকেও ছাড়িল না ; এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই সে একটু একটু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল। আগে বৌদিকে বরঞ্চ সে ভয় করিত, সঙ্কোচ করিত, কিন্তু দাদাকে ঠিক পুরুষমানুষও মনে করিত না, সঙ্কোচও করিত না, সমস্ত আবদার উপস্রব তাহার দাদার উপরেই ছিল। শ্বশুরবাড়ি যাইবার পূর্বের দিনও সে বৌদির কাছে তাড়া বাইয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহার সেই দাদাকে যাহারা এতদিন ধরিয়া এত দুঃখ দিয়াছে, এমন জীর্ণ শীর্ণ এমন পাগলের মত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার ক্রোধ ও ঘেবের পরিসীমা রহিল না। তাহার দাদার এত বড় দুঃখের কাছে পুটি আপনার সমস্ত দুঃখকেই একবারে তুচ্ছ করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরকুলের উপর ঘৃণা জন্মিল, ছোটদার সর্পাঘাত তাহাকে বিধিল না এবং তাহার দুঃখিনী বিধবার দিক হইতে সে জন্মিল, ছোটদার সর্পাঘাত তাহাকে বিধিল না। এবং তাহার দুঃখিনী বিধবার দিক হইতে সে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দুদিন পরে সে তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, আমি দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাব, তুমি এইসব লটবহর নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, না হয় তুমিও সঙ্গে চল।

যতীন অনেক যুক্তি-তর্কের পর শেষ কাজটাই সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর একবার ভিনিসপত্র বাধাবাধিব উদ্যোগে প্রস্থান করিল। যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। পুটি সুন্দরীকে একবার গোপনে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে আসিল না। যে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাকে বলিয়া দিল, এ মুখ দেখাইতে পারিব না এবং যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি আর কিছু বলিবার নাই। পুটি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পুটির নিদারুণ উপেক্ষা ও ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে ক্রুরূপ বিধিল, তাহা অস্ত্রযামি ভিন্ন আর কেহ জানিল না। সে হাতজোড় করিয়া মনে মনে বড়জাকে স্মরণ করিয়া বলিল, দিদি, তুমি ছাড়া আমাকে আর কে বুঝবে! যেখানেই থাক, তুমি যদি আমাকে কমা করে থাক, সেই আমার সর্বস্ব। চিরদিনই সে নিস্তব্ধ-প্রকৃতির, আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল। কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না। ভাতরকে খাওয়াইবার ভার পুটি লইয়াছিল। এ-কয়দিন সেখানেও বসিবার তাহার আকস্মিক হইল না।

যাইবার দিন নীলাদর অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি যাব না মা?

ছোটবৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

পুটি ছেলে কোলে করিয়া দাদার পাশে আসিয়া শ্রান্তি লাগিল।

নীলাদর বলিল, সে হয় না মা। তুমি একলাটি কেমন করেই বা থাকবে, আর খেবেই বা কি হবে মা? চল।

ছোটবৌ তেমনিই হেঁটমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা। আমি কোথাও যেতে পারব না।

ছোটবৌর বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। বিধবা মেয়েকে তারা অনেকবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই যায় নাই।

নীলাধর তখন মনে করিত, সে শুধু তাহারই জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু এখন শূন্য বাটীতে কি হেতু একা পড়িয়া থাকিতে চাহে, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কেন কোথাও যেতে পারবে না মা? ছোটবৌ চুপ করিয়া রহিল।

না বললে ত আমার যাওয়া হবে না মা!

ছোটবৌ মুদুকটে বলিল, আপনি যান, আমি থাকি।

কেন?

ছোটবৌ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মনে মনে একটা সঙ্কোচের জড়তা যেন প্রাণপণে কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর ঢোক গিলিয়া অতি মৃতকটে বলিল কখনও দিদি যদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা।

নীলাধর চমকিয়া উঠিল। খর বিদ্যুৎ চোখমুখ ধাক্কা দিলে যেমন হয়। তেমনিই চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তেই নিজেই সংবরণ করিয়া লইয়া অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া কহিল, ছি মা, তুমিও যদি এমন ক্ষাপার মত কথা বল, এমন অব্যবহায়ে যাও, তাহলে আমার উপায় কি হবে? ছোটবৌ চোখের পলকে চোখ বুজিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণে সংশয়লেশহীন হির মুদুরে বলিল, অব্যবহায়ে বাবা। আপনাদের যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠতে দেখব, ততদিন কারো কোন কথা আমি বিশ্বাস করব না।

ভাইবোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে তেমনই সুদৃঢ়কটে বলিতে লাগিল, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্পল হতে পারে না। সতীলক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশার পথ চেয়ে থাকব—আমাকে কোথাও যেতে বলবেন না বাবা।—বলিয়া এক নিশ্বাসে অনেক কথা কহার জন্য মুখ হেঁট করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নীলাধর আর সহিতে পারিল না; যে কামা তাহার গলা পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কোথাও একটু আড়ালে গিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পুটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পাবে নীচে বসাইয়া দিয়া আত্ম প্রথম সে বিধবা ব্রাহ্মজ্ঞার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুটস্বরে কাদিয়া উঠিল—বৌদি! কখনো তোমাকে চিন্তে পারিনি, বৌদি—আমাকে মাগ কর।

ছোটবৌ হেঁট হইয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া অশ্রু গোপন করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

চোদ্দ

বিরাজের মরহাট উচিত ছিল, কিন্তু মরিল না। সেই রাতে, মরিবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাহার বহুদিনব্যাপী দুঃখদৈন্যসীড়িত দুর্বল বিকৃত মস্তিষ্ক অনাহার ও অপমানের অসহ্য আঘাতে মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। মৃত্যু বুকে করিয়া যখন আঁচল দিয়া হাত-পা বাঁধিতেছিল তখন কোথায় বাজ পড়িল; সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীর আলোকে ও-পারের সেই স্নানের ঘাট ও সেই মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। এতলা এতক্ষণ ঠিক যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহারই দৃষ্টির অপেক্ষা করিয়াছিল, চোখ-চোখি হইবামাত্রই ইশারা করিয়া ডাক দিল। বিরাজ সহসা ভীষণকটে বলিয়া উঠিল, সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্যন্ত খাবেন না, কিন্তু এ পাণ্ডিত্য খাবে ত! কেন!

কামারের জাঁতার মুখে জ্বলন্ত কয়লা যেমন করিয়া গর্জিয়া জ্বলিয়া ছাই হয়, বিরাজের প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের মুখে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার অতুল্য অমূল্য হৃদয়খানি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে স্বামী তুলিল, ধর্ম তুলিল, মরণ তুলিল, একদৃষ্টে প্রাণপণে ও-পারে ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। আবার কড়মড় করিয়া অন্ধকার আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিয়া

উঠিল, তাহার বিস্ময়িত দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, একবার মুখ বাড়িয়া জলের পানে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ির দিকে দেখিল। তাহার পর লম্বহস্তে নিজের বাঁধা বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া চক্ষের নিম্নে অন্ধকার বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহার দ্রুত পদক্ষেপে কত কি সরসর খসখস করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে সুন্দরীর কাছে চলিয়াছিল। পক্ষানন ঠাকুরতলায় তাহার ঘর। পূজা দিতে গিয়া কতবার তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। এ গ্রামে বধু হইলেও শৈশবে এ গ্রামের প্রায় সমস্ত পথঘাটই সে চিনিতে, অন্ধকালের মধ্যেই সে সুন্দরীর রুদ্ধ জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ঘণ্টা-দুই পরেই কাঙালী জেলে তাহার পানসিখানি ওপারের দিকে ভাসাইয়া দিল। অনেক রাত্রেই সে পয়সার লোভে সুন্দরীকে ওপারে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, আজ শুধু একটির পরিবর্তে দুটি রমনী নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্ধকারে বিরাজেব মুখ সে দেখিতে পাইল না, পাইলেও চিনিতে পারিল না। তাহাদের ঘাটের কাছে আসিয়া দূর হইতে অন্ধকার তীরে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ স্বভূদেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিরাজ চোখ বুজিয়া রহিল।

সুন্দরী চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করিল, কে অমন করে মারলে বৌমা?

বিরাজ অধীর হইয়া বলিল, আমার গায়ে হাত তুলতে পারে সে ছাড়া আর কে, সুন্দরী! যে বার বার ভিক্সেস কচ্ছি? সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া চুপ কবিয়া রহিল।

আরো ঘণ্টা-দুই পরে একখানি সুসজ্জিত বজরা নোঙ্গর তুলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, তুই সঙ্গে যাবিনে?

না বৌমা, আমি এখানে না থাকলে লোকের সন্দেহ করবে, যাও মা, ভয় নেই, আমার দেখা হবে।

বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পানসিতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

জমিদারের সূত্রী বজরা বিরাজকে লইয়া তীত ছাড়িয়া ত্রিবেণী অভিমুখে যাত্রা করিল। দাঁড়ের লক্ষ লাগিয়া বাতাস চালিয়া আসিল। দূরে একধারে মৌন রাজেশ্বর নতমুখে বসিয়া মদ খাইতে চাপালা, বিরাজ পাশ-পাশের মত জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আজ রাজেশ্বর অনেক মদ খাইয়াছিল। মদের নেশা তাহার দেহের রক্তকে উত্তপ্ত এবং মগজকে উত্তপ্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল। বজরা যখন সপ্তগ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল। বিরাজের রুদ্ধ চুল এলাইয়া লুটাইতেছে, মাথার ঠাণ্ডা শস্য কাঁধের উপর পড়িয়াছে—কিছুতেই তাহার চৈতন্য নাই। কে আসিল, কে কাছে বসিল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কিন্তু রাজেশ্বরের একি হইল? একাকী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ভূতপ্রভেতব ভয় মানুষের বৃকের মধ্যে যেমন তোলপাড় করিয়া উঠে, তাহারও সমস্ত বুক জড়িয়া ঠিক তেমনিই আতঙ্কের ঝড় উঠিল। সে চাহিয়াই রহিল, ডাকিয়া আলাপ করিতে পারিল না।

অথচ এই রমণীটির জন্য সে কি না করিয়াছে! দুই বৎসর অহনিশ মনে মনে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে, নিশ্চয় আগরণে ধান করিয়াছে, চোখেব দেখা পোষাব লোভে আহাব-নিশ্চয় তুলিয়া বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াছে—তাহার স্বপ্নের আগোড় এই সংবাদ আজ যখন সুন্দরী ঘুম ভাঙাইয়া তাহার কানে কানে কহিয়াছিল, সে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া বক্ষণ পর্যন্ত এ সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

সমুখে নদী বাকিয়া গিয়া উভয় তীরের দুই একাধি বাঁশঝাড়, বহু প্রাচীন বট ও পাকুড় গাছের ভিত্তব দিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বাঁশ, কল্লি ও গাছের ডাল জলের উপর পর্যন্ত ঝুকিয়া পড়িয়া সমস্ত স্থানটাকে নিবিড় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। বজরা এইখানে প্রবেশ করিবার পূর্বক্ষণে রাজেশ্বর সাহস সজ্জ করিয়া কঠোর জড়তা কাটাইয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল, তুমি—আপনি—আপনি ভেতরে গিয়ে একবার বসুন—গায়ে ডালপালা লাগবে।

বিরাজ মুখ কিরীয়া চাহিল। সুখে একটা কুসুম দীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই কীপ আলোকে সোপাচোপি হইল, পূর্বেও ইহা—তখন দুর্বৃত্ত গরের জমির উপর দাঁড়াইয়াও সে দৃষ্টি সহিতে পারিতাহিল। কিন্তু আজ নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে মাতাল করিয়াও সে এ চাহনির সুখে রাখা সোজা রাখিতে পারিল না—ঘাড় হেঁট করিল।

কিন্তু, বিরাজ চাহিয়াই রহিল। তাহার এত কাহে পরপুরুষ বসিয়া, অথচ মুখে তাহার আবরণ নাই। মাথার এতটুকু আঁচল পর্বতও নাই। এই সময়ে বজরা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া হাত দিয়া ডালপালা সরাইতে ব্যস্ত হইল। নদী অপেক্ষাকৃত সর্পিণ হওয়ার তাঁটার চানও এখনে অভ্যস্ত প্রথর। ওরে সাবধান!—বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়ীদেব সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশে—লাগবে,—ভিতরে আসুন—বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল।

বিরাজ মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্রচালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ ‘মা গো’ বলিয়া চৈতন্য উঠিল।

সে চীৎকারে রাজেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তখন অস্পষ্ট দীপালোকে বিরাজের দুই চোখ ও রক্তমাখা সিঁথার সিঁথুর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মাতার সে আওনের সুমুখ ইহাতে আহত কুকুরের ন্যায় একটা ভীত ও বিকৃত শব্দ করিয়া কাঁপিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানুষ না জানিয়া অন্ধকারে পায়ের নীচে ক্রেদান্ত শীতল ও পিচ্ছিল সরীসৃপ মাড়াইয়া ধরিলে যেভাবে লাকাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিরাজ ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।—একবার জলের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে ‘মা গো। এ কি কলুষ মা!’ বলিয়া অন্ধকারে অতল জলের মধ্যে কাঁপিয়া পড়িল।

দাঁড়ী-মাঝিরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ছুটাছুটি করিয়া বজরা উলটাইয়া ফেলবার উপক্রম করিল,—আর কিছুই করিতে পারিল না। সবাই প্রাণপণে জলের দিকে চাহিয়াও সে দূর্তের অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু রাজেন্দ্র একচুল নড়িল না। নেশা তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্রোতের টানে বজরা আপনি বাহিরে আসিয়া পড়িয়া মাঝি উদ্ভিগ্নমুখে কাহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, কি করা যাবে? পুলিশ খবর দিতে হবে ত? রাজেন্দ্র বিহুলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, কেন, জেলে যাবার জন্যে? গদাই, যেমন করে পারিস পালা। গদাই-মাঝি পুরানো লোক, বাবুকে চিনিত, সবাই চিনে—তাই, ব্যাপারটা আগেই কতক অনুমান করিয়াছিল। এখন এই ইঙ্গিতে তাহার চোখ খুলিয়া গেল। সে অপর সকলকে একত্র করিয়া চুপিচুপি আদেশ দিয়া বজরা উড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার কাছাকাছি আসিয়া রাজেন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। গত রজনীর সুগভীর অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া সে যে চোখমুখ দেখিয়াছিল, স্মরণ করিয়া আজ দিনের বেলায় এতদূরে আসিয়াও তাহার গা হুমহুম করিতে লাগিল। সে মনে মনে নিজের কান মলিয়া বলিল, ইহাঙ্গীবনে ও-কাজ আর নয়। কিসের মধ্যে যে কি লুকানো থাকে কেহই জানে না। পাগলী যে কাল চোখ দিয়া পৈতৃক প্রাণটা ওবিয়া লয় নাই ইহাই সে পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং কোন কারণে কখনও যে সে ওমুখো হইতে পারিবে, সে ভরসা তাহার রহিল না। সূর্য কুলটা লইয়াই এতাবৎ নাড়াচাড়া করিয়াছে। সতী যে কি বস্তু তাহা জানিত না। আজ পাণিষ্ঠের কলুষিত জীপনে প্রথম চৈতন্য হইল, খোলস লইয়া খেলা করা চলে, কিন্তু জীবন্ত বিষধর অতবড় জরিদারপুত্রেও ক্রীড়ার সামগ্রী নয়।

পনর

সেদিন অপরাহ্নে যে স্ত্রীলোকটি বিরাজের শিয়রে বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরাজ জানিল, সে হুগলির হাসপাতালে আছে। দীর্ঘকাল ব্যত-শ্রেণী বিকারের পর, যখন

হইতে তাহার বঁশ হইয়াছে, তখন হইতেই সে ধীরে ধীরে নিজের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একে একে অনেক কথা মনেও পড়িয়াছে।

একদিন বর্ষার রাতে স্বামী তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার নীড়ার জ্বর, উপবাসে অবসন্ন, ভগ্নসহ, বিমল মন, সে নিদারুণ অপবাদ সত্য করিতে পারে নাই, দুঃখে দুঃখে অনেকদিন হইতেই সে হরত পাগল হইয়া আসিতেছিল। সেদিন অভিমানে ঘুণায়, আর তাহার মুখ দেখিবে না বলিয়া, সমস্ত বীধন ডাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নদীতে মরিতে গিয়াছিল—কিন্তু, মরে নাই।

তাহার পর জ্বর ও বিকারের বোকে বজরার উঠিয়াছিল এবং অর্ধপথে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সাতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল, ভিজা মাথায়, ভিজা কাপড়ে সারারাত্রি একাকী বসিয়া জ্বরে কাঁপিয়াছিল, শেষে কি করিয়া না জানি, এক গৃহস্থের দরজায় ওইয়া পড়িয়াছিল। এতটাই মনে পড়ে। কে এখানে আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কতদিন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—মনে পড়ে না। আর মনে পড়ে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা—পরপুরুষ আশ্রয় করিয়া গ্রামের বাহির হইয়াছিল।

ইহার পরে আর সে ভাবিতে পারিল না—ভাবিতে চাহিত না। তারপর ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যতের দিক হইতে নিজের চিন্তাকে সে শাপপথে বিলিষ্ট করিয়া রাখিল। কিন্তু ভবিষ্যতের দিক হইতে নিজের চিন্তাকে সে শাপপথে বিলিষ্ট করিয়া রাখিল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা তাহার প্রতি অনু-পরমাণু অহর্নিশ ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিল সত্য, কিন্তু যে যবনিকা ফেলা আছে তাহার এতটুকু কোণ তুলিয়া দেখিতেও ভয়ে তাহার সর্বদা হিম হইয়া যাইত, মাথা ঝিমঝিম করিয়া ঘূঁহার মত বোধ হইত। একদিন অগ্রহায়ণের শ্রবাবে সেই স্থীলোকটি আসিয়া তাহাকে কহিল, এখন সে ভাল হইয়াছে। এইবার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে। বিরাজ 'আচ্ছা' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে স্থীলোকটি হাসপাতালের লোক। সে বুঝিয়াছিল, এ নীড়িতার আত্মীয়-বন্ধন সম্ভবতঃ কেহ নাই, কহিল, রাগ করো না বাছা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যারা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন তারা আর কোনদিন ত দেখতে এলেন না, তারা কি তোমার আপনার লোক নয়? বিরাজ বলিল, না, তাঁদের কখনও চোখে দেখিনি। একদিন বর্ষার রাতে আমি ত্রিবেণীর কাছে জলে ডুবে যাই। তারা বোধ করি দয়া কবে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।

ওং, জলে ডুবেছিলে? তোমার বাড়ি কোথা গা?

বিরাজ মামার বাড়ির নাম করিয়া বলিল, আমি সেখানেই যাব, সে আমার আপনার লোক আছে।

স্থীলোকটির বয়স হইয়াছিল এবং বিরাজের মধুর স্বভাবে, শুধু একটু মমতাও ভাসিয়াছিল, দয়ালু-কণ্ঠে বলিল, তাই যাও বাছা, একটু সন্ধ্যানে থেকো, দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

বিরাজ একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর ভাল কি হবে মা? এ চোখও ভাল হবে না, এ হাতও সারবে না।

রোগের পর তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। স্থীলোকটির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কহিল, কলা যায় না বাছা, সেরে যেতে পারে।

পরদিন সে নিজের একখানি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং কিছু পাথর দিয়া গেল, বিরাজ তাহা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতো, সহসা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি নিজের মুখখানা একবার দেখব—একটা আয়িশি যদি—

আছে বৈ কি, এখনই এনে দিচ্ছি, বলিয়া অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি মণ্ডপ বিরাজের হাতে দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বিরাজ আর একবার তাহার লোহার খাটের উপর ফিরিয়া গিয়া আয়িশি খুলিয়া বসিল। প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিবামাত্রই একটা অপরিমেয় ঘুণায়

ভাষার মুখ পড়ীর আঁতকে কানিয়া উঠিল। মাথা ঘুড়িত—তাহার সেই আকাশভরা মেঘের মত কাল চুল কৈ? সমস্ত মুখ এমন করিয়া কে কতবিকৃত করিয়া দিল? সেই পদ্মপলাশ চক্ষু কোথায় গেল? অমন অভুলনীর কাঁচা সোনার মত বর্ণ কে হরণ করিল? ভগবান! এ কি গুরুদণ্ড করিয়াছ! যদি কখনও দেখা হয়, এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে! যতদিন এ মেহে প্রাণ থাকে, ততদিন আশা একেবারে নির্মূল হইয়া মরে না। তাই, তাহারও হয়ত অতি ক্রীণ একটু আশা অস্ত্রসেলিলার মত নিভৃত অস্ত্রস্থলে তখনও বহিতেছিল। দয়াময়! সেটুকু শুকাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল!

তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পরে রোগশয্যা শুইয়া স্বামীর মুখ যখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, তখন কখনও বা সহসা মনে হইত, যাহা সে করিয়াছে, সে ত অজ্ঞান হইয়াই করিয়াছে, তবে কি সে অপরাধের কমা হয় না? সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, শুধু কি ইহাও নাই? অভাবমী ত জ্ঞানেন, যথার্থ পাপ সে করে নাই, তথাপি যেটুকুও হইয়াছে, সেটুকুও কি তাহার এতদিনের স্বামী-সেবায় মুছিবে না? মাঝে মাঝে বলিত, তাঁর মনে ত বাগ থাকে না, যদি হঠাৎ গিয়া পায়ের উপর পড়ি, সব কথা খুলে বলি, আমার মুখেব পানে চোখে কি কবেন তা হলে? তাহা হইলে সম্ভবত কি যে করেন, কল্পনাকে সে যে কত বড়ে, কতভাবে ফুটাইয়া দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, ঘুম পাইলে উঠিয়া গিয়া চোখেমুখে জন দিয়া আবার নুতন করিয়া ভাবিতে বসিত—হা ভগবান! তাহার সেই বিচিত্র ছবিটাকে কেন এমন করিয়া দুই পায়ে মাড়াইয়া শুঁড়াইয়া দিলে! সে তাহার স্বামীর পায়ের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া কোন লজ্জায় আর এ-মুখ ভুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিবে!

ঘরে আর একজন রোগিণী ছিল, সে বিরাজের কান্না দেখিয়া উঠিয়া হাসিয়া বিষমের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি হল গা? কেন কাঁদচ?

সে বিরাজের কান্নার হেতু জানিতে চায়!

বিরাজ ভাড়াভাড়ি চোখ মুছিয়া বসিল এবং কোনদিকে না চাহিয়া দীর্ঘ দীর্ঘে ব্যস্ত হইয়া গেল।

সেইদিন লোকপরিপূর্ণ শঙ্করমুখের রাজপথের এক প্রান্তে বাহিয়া যখন সে প্রাণে প্রাণে অনুভবিত ক্লান্ত চরণ দুটিকে সারাজীবনের অনুদ্বিষ্ট যাত্রায় প্রথম পরিচালিত করিল, তখন বৃক চিহ্নিত একটা দীর্ঘাশ্ব বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, ভগবান! হয়ত ভাঙাই কবিয়াছে; আর কেহ চাহিয়া দেখিবে না—এই মুখ, এই চোখ, হয়ত এই যাত্রারই উপযুক্ত। গ্রামের লোক জানিয়াছে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা। তাই, যে মুখ ভুলিয়া তাহার গ্রামের মুখ, তাহার স্বামীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে মুখ হয়ত এমন হওয়াই তোমার মঙ্গলের বিধান। বিরাজ পথ চলিতে লাগিল।

বোল

কতদিন গত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে সে দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভয়দেহ অসমর্থ হইল—গৃহস্থ বিদায় দিলেন। তখন হইতে ভিকাই তাহার উপকীর্ণিকা। সে পথে পথে ভিক্ষা করে, গাছতলায় রাখিয়া খায়, গাছতলায় শোয়। এই বর্তমান জীবনে, তাহার অস্তিত্বের তিলমাত্র চিহ্নও আর বিদ্যমান নাই। তাহার শতজিহ্ব বস্ত্র, জটবীণা কক্ষ একটুখানি চুল, মলিন ভিকালক একখানি ছোট কাঁথা গায়ে। তাহার তেমনই মেহ, তেমনই বর্ণ,—তেমনই সব। অথচ এই তাহার পচিল বসের মাত্র বয়স, এই দেহেরই তুলনা একদিন স্বর্ণেরও মিলিত না। অস্তিত্ব হইতে ছিড়িয়া আনিয়া ভগবান তাহাকে একবারে নুতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সে নিজেও সব ভুলিয়াছে। শুধু ভুলিতে পারে নাই দুটা কথা। 'দাও' বলিতে এখনও তাহার মুখে এক ছুটিয়া আসে—আজও কথাটা গলা দিয়া স্পষ্ট বাহির করিতে পারে না। আর ভুলিতে পারে না যে, তাহাকে অনেক দূরে গিয়া মরিতে হইবে। মরণের সেই স্থানটুকু তাহার কোন স্পোষ্টের

তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু এটা জানে, তাহা বন্ধুরে। সেই সুদূরের জন্যই সে অবিশ্রাম পথ চলিয়াছে। সে যে কোনমতেই এ দশা তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না, এবং দোষ তাহার যত অশ্রমেই হউক, এ অবস্থা চোখে দেখিলে তাহার যে বুক ফাটিয়া যাইবে, তাহা এক মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

একটা বৎসর পথ হাঁটিতেছে, কিন্তু কোথায় তাহার অপরিচিত গম্যস্থান? কোথায় কোন ভূমিশ্যায় এই লজ্জাহত তপু মাথাটা পড়িয়া এই লাঞ্চিত জীবনটা শিংশে শেষ করিতে পাইবে? আজ দুদিন হইতে সে একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে—উঠিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে রোগ ঘিরিয়াছে—কাশি, জ্বর, বৃকে ব্যথা। দুর্বল দেহে শব্দ অসুখে পড়িয়া হাসপাতালে গিয়াছিল, ভাল হইতে না হইতেই এই পথশ্রম, অনশন ও অর্ধশয়ন। তাহার বড় সবলদেহ ছিল বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে, আর বুঝি থাকে না। আত্ম চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, এই বৃক্ষতলেই কি সেই গম্যস্থান? ইহাব জন্যই কি সে এত দ্রুত, এত পথ অবিশ্রাম হাঁটিয়াছে? আর কি সে উঠিবে না? বেলা অবসান হইয়া গেল, গাছের সর্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোমুখ সূর্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল, সন্ধ্যার শব্দধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া তাহার কানে পৌছিল, সেই সঙ্গে তাহার নির্মলিত চোখের সম্মুখে অপরিচিত গৃহস্থবধূদেব শান্ত মঙ্গল মূর্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, তাতে না ভাবিয়া যে যায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসীতলায় দীপ দিয়া কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে,—এ সমস্তই সে চোখে দেখিতে লাগিল, কানে শুনিতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পায় নাই, তাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে তাহার আত্ম ঐশ্বর্য মগিয়া লয় নাই। এ-সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু আজ আর পারিল না। শাশুর আহানে তাহার ক্ষুধিত তৃষিত হৃদয় কোন নিবেশ না মানিয়া গৃহস্থবধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনশ্চক্রে প্রতি ঘরদোর, প্রতি প্রাঙ্গণপ্রান্তর, বাধান তুলসীবৈদী, প্রতি দীপটি পর্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহাব চেনা : সবগুলিতেই এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে! আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধাতরঙ্গ রহিল না, স্ফিটার যাতনা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া নিবস্তর বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহারাই রাখিতে গেল, সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করিয়া অনেক রাতে যখন তাহার নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তাহারই স্বামী! আর তাহার চোখের পলক পড়িল না, একদৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। গৃহ ছাড়িয়া পর্যন্ত এমন করিয়া একটি রাত্রিও তাহার কাছে আসে নাই! আজ তাহার ভাগ্যে এ কি অসহ সুখ! নিদ্রায় জাগরণে, তন্মায় স্বপনে, এ কি মধুর নিশাযাপন! বিরাম চক্ষল হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। ভখনও পূর্বগগন যজ্ঞ হয় নাই, তখনও দূসর জ্যোৎস্না শাখা ও পাণ্ডব ফাঁকে ফাঁকে নমিয়া বৃক্ষতলে, তাহার চারিদিকে সপুণ্ডের মত করিয়া রহিয়াছে। সে ভাবিতেছিল, সে যদি অসতী, তবে কেন তিনি আজ এমন করিয়া দেখা দিলেন? তাহার পালনে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই কি জাতিয়া দিয়া গেলেন? তবে এ এক-মুহূর্ত কোথাও সে বিলম্ব করিতে পারিবে না। সে উদগ্রীব হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি সহসা তাহার রুদ্ধদৃষ্টি সজোরে উন্ম্যাটিত করিয়া সমস্ত হৃদয় আনন্দে মাধুর্যে ভরিয়া দিয়া গিয়াছে। আর দেখা হউক না না হউক, আর ত তাহাকে এক নিমিষের জন্য স্বামী হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারিবে না! এমন করিয়া তাহাকে যে পাবার পথ ছিল, অথচ, সে ব্যর্থ্য এতদিন স্বামীছাড়া হইয়া দুঃখ পাইয়াছে, এই ক্রটিটা তাহাকে গভীর বেদনায় পুনঃ পুনঃ বিধি লাগিল। আজ কি করিয়া না জানি, তাহার স্থিরবিশ্বাস হইয়াছে

ভিনি ডাকিতেছেন।

বিরাজ মুকুটে বলিল, ঠিক ত! এই দেখটা কি আমার আপনার বে, তাঁর অনুমতি ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছি। আমার বিচার করিবার অধিকার আমার নয়, তাঁর। যা করিবার ভিন্দি করিবেন, আমি সব কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া ছুটি লইব। বিরাজ প্রত্যাবর্তন করিল।

আজ তাহার সেই লবু, পদক্ষেপ যেন কঠিন মাহির উপর পড়িতেছে না, মন পরিশূর্ণ, কোথাও এতটুকু লানি নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, একি বিষম ভুল! এ কি অহংকার তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! এই কুরূপ কুৎসতি মুখ বিশ্বের সমুখে বাহির করিতে লজ্জা হয় নাই, শুধু লজ্জা হইয়াছিল তাঁর কাছে, বাঁর কাছে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার তাহার নয় বৎসর বয়সে বিধাতা স্বয়ং নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সতের

পুটি দাদাকে মুহূর্তের বিজ্ঞাম দেয় না। পূজার সময় হইতে পৌষের শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত নগরের পর নগর, তীর্থের পর তীর্থে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল। তার অল্প বয়স, সুস্থ সবল দেহ, অসীম কৌতুহল, তাহার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলা নীলাশ্বরের সাধ্যাতীত—সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কোথাও বসিয়া একটুখানি জিরাইয়া লইবার ইচ্ছা না হইয়া কেন যে সমস্ত দেহটা তাহার ঘরের পানে চাহিয়া অহর্নিশ পালাই পালাই করিতেছে, ভাড়াএকান্ত মন দেশে ফিরিবার জন্য দিবানিশি কাদিয়া কাদিয়া নালিশ জানাইতেছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। কি আছে দেশে? কেন এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে মন বসে না? ছোটটৌ মাখে মাখে পুটিকে চিঠি দেয়, তাহাতেও এমন কোনও কথা থাকে না, তথাপি সেই বন-জঙ্গলের অগ্নিজ্বালা টানে তাহার শীর্ণদেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতে লাগিল। পুটি চায়—দাদা সব ভালিয়া আবার তেমনি হয়। তেমনিই সুস্থ সদানন্দ, তেমনিই মুখে মুখে গান, মনে করিত, আর দুদিন যাক। কিন্তু দুদিন করিয়া চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। বাড়ি ছাড়িয়া আসিবার দিনে মোহিনীর কথায় ব্যবহারে বিরাজের উপর তাহার একটা করুণাব ভাব আসিয়াছিল, তাহার কথাগুলো বিশ্বাসও করিয়াছিল। দাদা ভাল হইয়া গেলে ছেলেবেলায় কথা মনে করিয়া সে হয়ত মনে মনে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেও পারিত। বস্তুতঃ ক্ষমা করিবার ক্ষমা, সেই বৌদিগকে একটুখানি মাধুর্যের সহিত স্মরণ করিবার জন্য এক সময়ে নিজেও ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিতেছে কৈ? দাদা ভাল হইতেছে কৈ? একে ত সংসারের এমন কোনও দুঃখ, কোনও হেতু সে কল্পনা করিতেও পারে না বাহাতে এই মানুষটিকে এত দুঃখে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। বৌদি ভাল হউক, মন্দ হউক, পুটি আর ভ্রক্ষেপ করে না, কিন্তু ভ্যাগ করিয়া বাইবার অমাজনীয় অপরাধে যে স্ত্রী অপরাধিনী, তাহার প্রতি বিষেবেরও তাহার যেন অন্ত রহিল না। সেই হতভাগিনীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ এমন করিয়া মনে মনে লালন করিয়া, যে মানুষ নিজেই ক্ষয় করিয়া আনিতেছে, তাহারও প্রতি তাহার চিন্ত প্রসন্ন হইল না।

একদিন সকালে সে মুখ ভার করিয়া আসিয়া বলিল, দাদা, বাড়ি যাই চল। নীলাশ্বর কিছু বিব্রিত হইয়াই যোনের মুখের পানে চাহিল, কারণ মাঘ মাসটা প্রয়োগে কাটাইয়া বাইবার কথা ছিল। পুটি দাদার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, একটা দিনও আর থাকতে চাইনে, কালই যাব। তাহার রুটভাব অবলোকন করিয়া নীলাশ্বর একটুখানি বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল, কেন রে পুটি?

পুটি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার কাদিয়া ফেলিল। অজ্ঞ-বিকৃতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, কি হবে থেকে? তোমার ভাল লাগচে না, ভূমি যাই যাই করে প্রতিদিন ওকিরে উঠচ, না, আমি কিছুতেই একদিনও থাকব না।

নীলাশ্বর সঙ্গেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, কিরে গেলেই কি ভাল হয়ে যাবে রে? এ দেহ সারবে বলে আর আমার ভরসা হয় না পুটি—তাই চল বোন, যা হবার করে পিরেই হোক।

দাদার কথা শুনিয়া পুটি অধিকতর কানিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুমি সঙ্গসর্বদা তাকে এমন করে ভাববে? শুধু ভেবেই ত এমন হয়ে যাক।

কে বললে আমি তাকে সর্বদা ভাবি?

পুটি ভেমনই ভাবে জবাব দিল, কে আবার কবে, আমি নিজেই জানি।

তুই তাকে ভাবিস নে?

পুটি চোখ মুছিয়া উচ্ছতভাবে বলিল, না, ভাবিনে। তাকে ভাবলে পাণ হয়।

নীলাশ্বর চমকিত হইল—কি হয়?

পাণ হয়। তার নাম মুখে আনলে মুখ অণুচি হয়, মনে আনলে রান করতে হয়,—বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দাদার স্নেহকোমল দৃষ্টি একনিমেবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। নীলাশ্বর বোনের মুখের দিকে চাহিয়া কঠিনস্বরে বলিল, পুটি!

ডাক শুনিয়া সে ভীত ও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল? সে দাদার বড় আদরের বোন, ছেলেবেলা, ১৭ বছর অপরাধে কখনও এমন চোখ দেখে নাই, এমন গলা শুনে নাই। এমন বড়বয়সে বকুনি খাইয়া তাহার কোড়ে ও অভিমানে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নীলাশ্বর আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলে, সে চোখে আঁচল দিয়া ফুপাইয়া কানিতে লাগিল। দুপুরবেলা দাদার আহ্বারের সময় কাছে গেল না, অপরাহ্নে দাসীর হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলাশ্বর ডাকিল না, কথাটি বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাশ্বর আফ্রিক শেষ করিয়া সেই আসনে চূপ করিয়া বসিয়া আছে, পুটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠের উপর মুখ রাখিল। এটা তাহার নালিশ করার ধরন। ছেলেবেলায় অপরাধ করিয়া বৌদির তাড়া খাইয়া এমনই করিয়া সে অভিযোগ করিত। নীলাশ্বরের সহসা তাহা মনে পড়িয়া দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া কোমলস্বরে বলিল, কি রে?

পুটি পিঠ ছাড়িয়া দিয়া কোলের উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া দিতে লাগিল। নীলাশ্বর তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। বংশ পরে পুটি কান্নার সুরে বলিল, আর বলব না দাদা!

নীলাশ্বর হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না আর বল না।

পুটি চূপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলাশ্বর তাহার মনের কথা বুঝিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সে তোরে গুরুজন। শুধু সম্পর্কে নয় পুটি, তোকে মায়ের মত মানুষ করে তোরে মায়ের মতই হয়েছে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোরে মুখের ও—কথায় গভীর অপরাধ হয়। পুটি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কেন সে আনাদের এমন করে ফেলে রেখে গেল!

কেন যে গেল পুটি, সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্বগামী তিনি জানেন। সে নিজেও জানতেন না—তখন সে পাগল হয়েছিল, তার এতটুকু জ্ঞান থাকলে সে আত্মহত্যা করত, এ কাজ করত না।

পুটি আর একবার চোখ মুছিয়া ভান্সা গলায় বলিল, কিন্তু—এখন, তবে কেন আসে না দাদা?

কেন আসে না? আসবার জো নেই বলেই আসে না দিদি, বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া কণকাল পরেই বলিল, যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে, তার এতটুকু ভেরবার পথ থাকলে সে ফিরে আসত—একটা দিনও কোথাও থাকত না। এ

কথা কি তুই নিজেই বুঝিস নে পুটি?

পুটি মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বুঝি দাদা।

নীলাধর উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, তাই বল বোন; সে আসতে চায়, পায় না। সে যে কি শাস্তি পুটি, তা তোরা দেখতে পাসনে বটে, কিন্তু চোখ বুজলে আমি তা দেখি! সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় করে আনতে রে, আর কিছুই নয়।

পুটি কাঁদিয়া ফেলিল।

নীলাধর হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন-তখন বলত। এক সাধ, শেষ সময়ে আমার কেবল কোলে যেন মাথা রাখতে পায়; আর সাধ, সীতা-গাবিত্রীর মত হয়ে মরণের পরে যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেছে।

পুটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাধর রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, তোরা সবাই তার অপরাধ দিস্, বারণ করতে পারিনে বলে আমিও চুপ করে থাকি, কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দিই কি করে বল দেখি? তিনি ত দেখেচেন, কার ভুল, কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে ডুবে গেল। তুই বল, আমি কোন্ মুখে তার দোষ দিই, আমি তাকে আশীর্বাদ না করে কি করে থাকি? না বোন, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হোক, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নেই। নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম, ভগবান করুন, যেন পরজন্মেও থাকে পাই। সে আর বলিতে পারিল না, এইখানে তাহার গলা একেবারে ধবিয়া গেল।

পুটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া দাদার চোখ মুছাইয়া দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল, সহসা তাহার মনে হইল, দাদা যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া বলিল যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, কিন্তু, আমি তোমাকে একটি দিনও কোথাও একলা ছেড়ে দেব না।

নীলাধর মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

বিরাজ জগন্নাথের পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই পথ ধরিয়া যখন সে অনুষ্টি মৃত্যুশয্যা অনুসন্ধান-গিয়াছিল, সেই যাওয়ায় আর এই আসায় কি প্রভেদ? এখন সে গাড়ি যাইতেছে। তাহার দুর্বল দেহ পথে যতই সকাভের বিশ্রাম-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, সে হুইই ব্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোন কারণে কোথাও বিলম্ব করিতে সে সম্মত নয়। তাহার কাশি যন্মায় পরিণত হইয়াছে, ইহা সে টের পাইয়াছিল, তাই আশঙ্কায় অবদিত ছিল না, পাছে যাওয়া না ঘটে। ছেলেবেলা হইতে একটা বিশ্বাস তাহার বড় দৃঢ় ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। সে এই উপায়ে মরণের পূর্বে একবার নিজেব দেহটাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে নির্ভয়ে মহানন্দে জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। কিন্তু দামোদরের এখানে আসিয়া তাহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল—আর কিছুতেই পা চলিল না। সে হতভাল হইয়া একটা গাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। এ কি ভয়ানক অপরাধ যে, এত করিয়াও তাহার শেষ আশা মিটিল না! তাহার এ-জন্ম গেল, পরজন্মেও আশা নাই, তবে সে আর কি করিবে! আশা নাই, তবুও সে গাছতলায় পড়িয়া সারাদিন হাতজোড় করিয়া স্বামীকে পায়ে মিনতি জানাইতে লাগিল।

পরদিন তারকেশ্বরের কাছাকাছি কোথায় হটবার ছিল। প্রভাত হইতে সেই পথে গরব গাড়ি চলিতে লাগিল। সে সাহসে ভয় করিয়া এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানকে আবেদন করিল। বুড়ো মানুষ তাহার কান্না দেখিয়া, সম্মত হইয়া তাহাকে গাড়ি করিয়া তারকেশ্বরে পৌছাইয়া দিয়া গেল। বিরাজ স্থির করিল, এই মন্দিরের আশেপাশে কোথাও সে পড়িয়া থাকিবে। এখানে কত লোক আসে যায়, যদি কোন উপায়ে একবার ছোটবৌর কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

আঠার

কঠিন ব্যাপিসীত ও কত নদনাবী কত কামিনায় এই দেবদাম্পত্যের পেরিয়া উত্তমতঃ পড়িয়া আছে, তাহাদের মতো আসিয়া বিবাহ অনেকদিনের পর প্রকৃত বার্তা অনুভব করিল। তাহাদের মত তাহারও ব্যাপি আছে, কামনা আছে, সে তাই নইয়া এখনো মীমবে পড়িয়া থাকিতে পড়িবে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, কাহারও অর্থহীন কোঁতুল চরিতার্থ করিতে হইবে না মনে করিয়া এত দুখের মাঝেও আনন্দ পাইল। কিন্তু বোধ হইত ব্যক্তিরা চলিতে লাজুক মামের এই দুর্ভাগ্য ঋণে ও অন্যতরে ছয়দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটিবে বলিয়াও আশা হইল না, কেহ আসিবে বলিয়াও ভবসা রহিল না। ভবসা রহিল শুধু মৃত্যুর—সে তাবই জন্য আর একবার নিজেদের প্রস্তুত করিতে লাজিল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অপবাক না হইতেই তাহার বোধ হইতে লাজিল। ও বলিয়া তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি বড় উঠিল, মুতকচ্ছ দিহতা মনে একেবারে মিলেগেল ভূমি মা পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, বুঝি, আজই সব সাক্ষ হইবে কেন এখন হইতেই মন্দিরের পিছনে মুখ তুলিয়া পড়িয়া ছিল, দ্বিপ্রহরে সাবুরের পূজা হইয়া গেল অন্যদিনের মত উতিয়া আসিয়া নমস্কার করিতে পড়িল না। মনে মনে করিল এতদিন হস্তাক্ষর লেখা সে শুধু মিনতি জানাইয়াছে। সে পূজার সময়, কাজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে এ ভয়েই কোন দাবী থাকে নাই, শুধু অবতরণের আশংকাই না যায়, ইতিমধ্যে চড়িয়াছে না বুঝি, অপবাদ করার বার্তা যেন এ জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে পর্যন্ত ব্যাপ্ত না হইতে পায়, এই ভিত্তিতে মগ্নিয়াছে কিন্তু বলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার দাবা সমস্ত এক আশ্চর্য পথে ফিরিয়া গেল। ভিতরে ভাব বঠিল না বৈদ্যেরে ভাব দেখা নিল। সমস্ত চিত্ত ভবিষ্যৎ এক অপর অভিমানেই সব আনন্দচলন মাদুরে বাঁজিয়া উঠিল। সে তাহাতেই মগ্ন হইয়া কেবলই চলিতে লাজিল, কেন তবে ভূমি বসেছিল।

অজ্ঞানসত্তাে কখন তাহার পঙ্গু বা হাতযানি স্থলিত হইয়া পথের উপর পড়িয়াছিল, সে মনে পড়ে না, সমস্ত তাহাবই উপর একটা কঠিন কথা পড়িয়া। সে অক্ষুণ্ণের কাঁচেরকি করিয়া হঠাৎ এটা যাওয়াযাওয়ার পথ। সে ব্যক্তি না দেখিয়া যখন লোক হাতের মাড়াইয়া দিয়াছিল। সে আশ্চর্য লাভে ও ব্যক্তিও হইয়া ফিবিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আহা হা—কণ, এমন করে পথের উপর শুয়ে আছে, বড় অন্যায় কবেচি—কেনী লাগেনি ও।

চক্ষুর পলকে বিরোধ মুখের কাপড় সরিয়া চাহিয়া দেখিল, তার আর একটা অক্ষুণ্ণে মনি করিয়া চাপ করিল। এই ব্যক্তি নীলাধর। সে একবার একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া সরিয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইল। পশ্চিম দিক্তে মেঘ ছিল না, উজ্জ্বলবিস্তৃত স্বর্ণভা মন্দিরের চতায়, গাছের অশ্রুত চড়িয়া পড়িয়াছিল, নীলাধর দূরে দাঁড়াইয়া পট্টকে কহিল, ওই রোগা মেয়েমানুষটিকে বড় মড়িয়ে দিয়েচি বোন, দেখ দেখি যদি কিছু দিতে পারিস—বোধ করি কিছুকি।

পুটি চড়িয়া দাঁড়িল, কানেকটি একদৃষ্টে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া। ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের কিয়দংশ বহুবৃত্ত, ওখাপি মনে হইল, এ মুখ যেন সে পূর্বে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, হী গা তোমার ব্যক্তি কোথায়?

সাতগায়, বলিয়া কানেকটি হাসিল।

বিরাজের সবচেয়ে মধুর সংস্কার ছিল তাহার মুখের হাসি, এ হাসি সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও কুল কাবরান হইল না ভগ্নে এ য বৌদি, বলিয়া সেই মুহূর্তেই পুটি সেই জীবন্তির মতের উপর উপর হইয়া পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া কর্ণদয়া উঠিল।

নীলাধর দূরে দাঁড়াইয়া লম্বায়েছিল, কথাবার্তা শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বুঝিল। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এবং তাহাও অস্পষ্টমতক নিবন্ধন করিল। তাহার লোকেরে বালিল,

শরৎ প্রথম দণ্ড। ৩

এখানে কাদিসনে পুটি, ওঠে, বলিয়া ভগিনীকে সরাইয়া দিয়া ত্রীর শীর্ণদেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বৃকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

চিকিৎসার জন্য, উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য বিরাজকে অনেক সাধ্য-সাধনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনমতেই তাহাকে রাজী করান যায় নাই। আর ঘর ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

নীলাশ্বর পুটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল, আর কটা দিন বোন? যেখানে যেমন করে ও থাকতে চায়, দে। আর ওকে তোরা পীড়াপীড়ি করিস নে।

তারকেশ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে প্রথম আবেদন জানাইয়াছিল, তাহাকে ঘরে লইয়া চল, তাহার নিজের শয্যার উপরে শোয়াইয়া দাও। ঘরের উপর, ঘরের প্রতি সামগ্রীটির উপর এবং স্বামীর উপর তাহার কি ভীষণ ভ্রূষণ, তাহা যে-কেহ চোখে দেখে সে-ই উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। দিব্যারাত্রির অধিকাংশ সময়মই সে জুরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু একটু সজাগ হইলেই ঘরের প্রতি বস্তুটি তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া দেখে।

নীলাশ্বর শয্যা ছাড়িয়া প্রায়ই কোথাও যায় না এবং প্রায়ই সজল চক্ষে প্রার্থনা করে, ভগবান, অনেক শাস্তি দিয়াছ, এইবার ক্ষমা কর। যে লোক পরলোকে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ইহলোকের মোহ কাটিইয়া দাও।

গৃহত্যাগিনীর গৃহের উপর এই নিদারুণ আকর্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। কাল হইতে তাহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ সারাদিন ভুল বকিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া চাহিল, পুটি কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ের কাছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ছোটবৌ শিয়রের কাছে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া বলিল, ছোটবৌ না?

ছোটবৌ মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, ঠাঁ দিদি, আমি মোহিনী।

পুটি কোথায়?

ছোটবৌ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, তোমার পায়ের কাছে ঘুমাচ্ছে।

উনি কৈ?

ও ঘরে আহঁক কচ্ছেন।

তবে জামিও করি বলিয়া সে চোখ বুজিয়া মনে মনে জপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডান হাতে ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল, তারপর ছোটবৌয়ের মুখের পানে ফিরিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, দোষ করি আজই চললুম বোন, কিন্তু আবার যেন দেখা হয়, আবার যেন তোকেই এমনি কাছে পাই।

বিরাজের সময় যে একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কাল হইতে তাহা সকলেই টের পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ছোটবৌ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

বিরাজের বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে কণ্ঠস্বর আর নত করিয়া চুপি চুপি বলিল, ছোটবৌ, সুন্দরীকে একবার ডাকতে পারিস?

ছোটবৌ রুদ্ধস্বরে বলিল, আর তাকে কেন দিদি? সে আসবে না।

আসবে রে আসবে। একবার ডাকা—আমি তাকে মাপ করে আশীর্বাদ করে যাই। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কারও ওপর কোন ক্ষোভ নেই। ভগবান আমাকে যখন ক্ষমা করেছেন, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়েছেন, আমিও তখন সকলকে ক্ষমা করে যেতে চাই।

ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, এ আর ক্ষমা কি দিদি? কিনা অপরাধে এত দণ্ড দিয়েও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না—ভিনি তোমাকেও নিতে বসেছেন। একটা হাত নিলেন, চোখ নিলেন, তবুও যদি তোমাকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে দিতেন—

বিরাজ হাসিয়া উঠিল। বলিল, কি করতিস আমাকে নিয়ে? পাড়ায় দুর্নীম রটেছে—আমাব বঁচে থাকায় আর ত লাভ নেই বোন।

ছেটিবৌ গলায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, আছে দিদি, তা ছাড়া ও ত'মিথো দুর্নাম ওতে আমরা ভয় করিনে।

তোরা কবিস নে, আমি কবি। দুর্নাম মিথো নয়, খুব সঠিক। আমার অপবাদ যতটুকুই হোক থাক ছেটিবৌ, তার পরে আব হিদুর ঘরের মেয়েদে বাঁচা চলে না। তোরা ভগবানদে দয়া নেই বলচিস, কিন্তু-

তাহাব কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই পুটি উচ্ছ্বসিত কান্নার সুরে চোখিয়া উঠিল, ওঃ ভাবি দয়া ভগবানদে।

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া কান্দিতেছিল আর শুনিতেছিল। আর সত্য বলিতে না পারিয়া অমন করিয়া উঠিল। কান্দিয়া বলিল, তা'ন একটুকু দয়া নেই, এটুকু দিয়া'ন নেই-বা'ন অমন পানি হাদে'ন কিছু চল না, আর আমাদে'নই তিনি এমনই করে শাস্তি দিয়ে'ন।

তাহাব কান্নার নিকট চোখিয়া বিবাহ নিষেধের প্রতিবেদন লিখিল। কিন্তু পূর্বেই বুঝিয়াছিল। তারপরে কহিল কোথের ঘরে বলিল, চুপ কর পোড়ামুঠো, চুপসে।

পুটি ছুটিয়া আসিয়া তাহাব গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বাসেরে করিয়া উঠিল, তুমি মাদে না বৌদি, আমরা কেউ সন্তোষ পাব'ন না তুমি ওসু'র বাও-আর কোথাও চল-তাহাব পুটি পায়ে পড়ি বৌদি, আর দু'টা দিন বাচ।

তাহাব সম্মান শব্দে আত্মিক ফেলিয়া নীলাম্বর হৃৎকান্দে কাণ্ডে অতিয়া শুনিতে লিখিল পুটির যা মুখে আসিল, সে শুনি করিয়া ক্রোধেরে অনুভব করিতে লিখিল হৃৎকান্দে বিনে পান দুই চোখ বহিয়া বড় বড় অশ্রু'র স্রোত করিয়া পড়িল। ছুটিয়া সমস্ত হাত মুঠিয়া দিয়া পুটিকে চাপিয়া লইতেই, সে তাহাব বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সকলেরে কানদিত্য করিয়া বুকিয়া কান্দিতে লিখিল। বহুক্ষণ পরে নিবৃত্ত হইবারে ভয়করণে বলিতে লিখিল, কান্দিস না পুটি, শোন-নীলাম্বর আড়ালে দাঁড়িয়া শুনিতে লিখিল, বিবাহের চাহে-সম্মান দিলে'ন অস্বাভাব্য তাহাব যত্নেরে অবসান হইয়াছে তাহা সে বুঝিল বিবাহ বলিতে লিখিল না বুকে হাঁস সে'ন দিস না পুটি, কি সূক্ষ্ম দিয়া'ন, তু'ন সে কত দয়া, সে বহু আমায় চোখ কেই-বিশা'ন না-মরাত আমার বাঁচা, সে কথা আমি শোনেই তোরা বুঝি'ন, আর বলচিস-একটু হাত আর একটা চোখ নিষে'চেন, সে'ন দুর্নাম আগে পাছে যেতেই-কিন্তু এটুকু শাস্তি নিয়ে-ত'ন হাদে'ন কোলে আমাকে ফি'বিয়ে দিয়ে'চেন, সেটা কি করে ভুলবি পুটি।

ছাই ফি'বিয়ে দিয়ে'চেন, বলিয়া পুটি কান্দিতই লিখিল

ভগবানদে দয়া বা সূক্ষ্মবিচারের একটা দর্শন সে বিশ্বাস করিল না-বহু সমস্ত গোপনীয় তাহাব কাছে গোপন অগোপন ও অবিচার বলিয়াই মনে হইতে লিখিল-অন্যক পুরে বিবাহ বলিল, পুটি, অনেকক্ষণ চৈতন্য রে, তোরা দাদাকে একবার ডাব

নীলাম্বর আড়ালেই ছিল, অসিতই ছেটিবৌ কিন্তু'ন চণ্ডিয়া সখিয়া দাঁড়ইল-নীলাম্বর শিয়রে বসিয়া হাঁস ভান হাটা সাবধানে নিজের হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ি-স্বপ্নে লিখিল-সত্যি বিবাহেরে আর কিছু ছিল না, সে যে জ্বরের উপর এত কথা বলিতেছে এই ইহকালে অবসানদে সঙ্গে খুব সম্ভব সমস্তই শেষ হইবে, তাহা সে পূর্বে অনুমান করিয়াছিল, এমন এতই বুঝিল।

বিবাহ বলিল, বেশ হাত দে'ন, বলিয়াই হাসি-

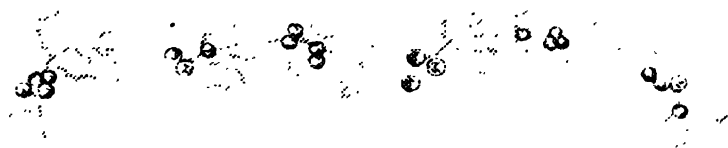
সহসা সে মর্মান্তিক পরিভ্রাস করিয়া ফেলিল। এই উপলক্ষ করিয়াই সে এত কাণ্ড ঘটাইয়াছে, তাহা সকলেইই মনে পড়িয়া গেল-বেদনায় নীলাম্বরের মুখ লিখল হইয়া দিয়াছে, বিবাহও বোধ করি তাহা দর্শিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ অনুগত হইয়া বলিল, না, না, তা করিনা-স'নই বলাচি, আর কত দাঁবা-বলিয়া চোঁকা করিয়া নিজের মাথা ঘুঁরি'ন-ক্রোধে তুলিয়া দিয়া বলিল, সকলে'ন সমুখে আন একবার তুমি বল, আমাকে অপ দাও'ন।

নীলাম্বর রুদ্ধস্বরে 'কবোচ' বলিয়া হাত দিয়া চোখ মুড়িল

বিরাজ ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া থাকিয়া, মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, জ্ঞানে, অজ্ঞানে এতদিনে ঘরকন্মায় কতই না দোষ-ঘাট করেছি— ছোটবৌ, তুমিও শোন, পুটি তুমিও শোন দিদি, তোমরা সব ভুলে আজ আমাকে বিদেয় দাও— আমি চলুম। বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদতল বুজিতে লাগিল। নীলাম্বর মাথার বালিশটা এক পাশে সরাইয়া দিয়া উপরে পা তুলিতেই বিরাজ হাত দিয়া ক্রমাগত পায়ের ধূলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হল— আর কিছু বাকী নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ— এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে। বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অশ্রুটস্বরে কহিল, এমনই কবে আমাকে নিয়ে থাক, কোথাও যেও না, বলিয়া নীরব হইল। সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলেই শুদ্ধমুখে বসিয়া রহিল। বাত্রি বারোটাব পর হইতে আবার সে ভুল বকিতে লাগিল। নদী, বাপাইয়া পড়ার কথা— হাসপাতালবকথা— নিরুদ্দেশ পথের কথা— কিন্তু, সব কথার মধ্যে অত্যাশ্রয় একাগ্র পতিপ্রেম। মুহূর্তের ভ্রম কি কবিয়া সে সতী সাক্ষাৎ দক্ষ করিয়াছে শুধুই তাই।

এ কয়দিন তাহারই সমুখে বসিয়া নীলাম্বরকে আহাব করিতে হইত, সেদিন মাঝে মাঝে সে পুটিকে ডাকিয়া ছোটবৌকে ডাকিয়া বকিতে লাগিল। তার পর, ভোববেলায় সমস্ত ডাকাডাকি দমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল আর সে চাহিল না, আর সে কথা কহিল না, স্বামীকে দেহে মাথা রাখিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনীর সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল।



পরিণীতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তিশেল বৃকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের তার নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ কবি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল - যখন প্রত্যয়েই অশ্রুপূর্ণ হইতে সাধন পৌছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্নিয়মে পক্ষম কন্যাস ওন্দাদান করিয়াছেন।

গুরুচরণ সাট ঢাকা বেতনের কেদারী। সুতরাং দেহটিও যেমন সিকাগাভিত ঘোড়ার মত শুষ্ক শীর্ণ, চোখেমুখেও যেমন তাহাদেব মত একটা নিম্মান নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব, তথাপি এই ভয়ঙ্কর শুভ সাধনে আজ তাহার হৃৎকটা, তাহেই বহিল, তিনি জীব পৈতৃক প্রতিশ্রুতি 'সে নিয়া বসিলেন'। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবারও আর তাহার কোদ বহিল না।

শুভ সাধন বহিয়া আনিয়াছিল তাহার পুত্রস বন্য। দশমবর্ষিয়া আশ্বকালী সে বলিল, বাবা, চল না দেখাবে।

গুরুচরণ মোদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা, এক গেলান ভাল আন ত শুভ

মোরা ভাল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেল, গুরুচরণের সর্দয়ে মনে পড়িল সুখিতা হৃদয়ে বকর্মের মর্যাদা কথা। তার পরে ভিত্তর দিনে, স্ত্রীকালে গর্ভে অসিলে, মনে হোলে পড়িলে গর্ভে ক্রাসের মাথার পেলিকা-পেলিকা লইয়া পাগলের মত ঘোড়ার লোকজনকে বলিত পিষ্ট করিয়া কাপটিয়া আনিতে গেল, তেমনি মনে মনে শব্দ করিয়া ইহাও মনে মনে মনে দুর্ভিক্ষবর্ষি শুভ করিয়া চুকিতে লাগিল। মনে পড়িল গত বৎসর তাহার দ্বিতীয়া কন্যার শুভবিবাহে, সৌভাগ্যের এই দ্বিতীয় ভ্রমসন্ধিতে বাধা পড়িয়াছে এবং তাহারও ছয় মাসের সুদ বাকী। দুর্ভিক্ষের আর মাসখানেক মাত্র দিনের মধ্যে মেঘকমলার ওচারা শুভ পাগাইতে ইহারে অসিলে কাল লাই অতি পবিত্র ভেঁটি ভেঁটি মিলে নাই আজ বেলার বাগেটার মধ্যে বিলাসে হিসার পাগাইতে ইহারে, কাল বতসাহের শুকম জর্জর করিয়াছেন ময়লা বহু পদিয়া কেহ অসিলে চুকিতে পড়িলে না, মাইন ইহারে, অথচ গত সপ্তাহ ইহারে বজ্রকব সন্ধান মিলিতেছে না, সম্মানের অর্ধেক কাপড় চাপড় লইয়া সে কোথ করি নিবদেষ। গুরুচরণ আর 'সে নিয়া বসিলেন' বলিলেন না, শুকটা উচু করিয়া ঘরিয়া এলিয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই বজ্রকব শহরে প্রতিদিন কত লোক গাতি ফোড়া চাপ পড়িয়া অপঘাতে মরে, তাবা কি আমার চেয়েও হেমান পায় বেঁধে জপন। 'দয়াময়'। তুমার দয়ায় একটা ভানি মেটাবগুণী যদি বৃকেব উপর দিয়া চলিয়া যায়।

গম্বাকালী ভাল আনিয়া বলিল, বাবা ওর, চল এনেছি।

গুরুচরণ উরিয়া সমস্তটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, মা, যা মা, গেলানটা নিয়ে যা।

সে চলিয়া গেল গুরুচরণ আবার শুইয়া পড়িলেন।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মামা, চা এনেছি ওর।

চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উরিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পাতল চাহিয়া ইহাও অর্ধেক ভাল। সেন নিবদ্য। গেল, বাবা, মনে সাধাব্যত জেগে অসিলে মা, বাবা আমার কাছে এসে একবার বোস। ললিতা সলজ্জাসে কাছে বসিয়া বলিল, আমি রান্ডের জাগান মামা।

এই জীর্ণ শীর্ণ গুরুভারগ্রস্ত অকালবৃদ্ধ মাতুলের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন সুগভীর বাহ্যে তার চেয়ে বেঁধে এ সাধাবে আর কেহ অনুভব করিত না।

গুরুচরণ বলিলেন, তা হোক, আমার কাছে আয়।

ললিতা কাছে আসিয়া বসিতেই গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত দিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, আমার এই মাটিকে রাজার ঘরে দিতে পারতুম, তবেই জানতুম একটা কাজ কল্লম ললিতা মাথা হেঁট করিয়া চা, চাশিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হাঁ মা, তার দুখী আমার ঘরে এসে দিনরাত্রি খাটতে

হয়, না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, দিবাবাত্রি খাটতে হবে কেন মামা? সবাই কাজ করে, আমিও করি। এইবার গুরুচরণ হাসিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন, হাঁ ললিতা, আজ তবে রান্নাবান্নার কি হবে মা?

ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন মামা, আমি রাঁধব যে।

গুরুচরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই রাঁধনি কি মা, রাঁধতে কি তুই জানিস?

জানি মামা। আমি মামীমার কাছে সব শিখে নিয়েছি।

গুরুচরণ চায়ের বাটিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিলেন, সত্যি?

সত্যি! মামীমা দেখিয়ে দেন,—আমি কতদিন রাঁধি যে। বলিয়াই মুখ মীচু করিল।

তাহার অনন্ত মাথাব উপর হাত রাখিয়া গুরুচরণ নিঃশব্দে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার একটা গুরুতর দুর্ভাবনা দূর হইল।

এই ঘবটি গলির উপরেই। চা পান করিতে করিতে জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় গুরুচরণ চোঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিলেন, শেখর নাকি? শোন, শোন।

একজন দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা ঘরে প্রবেশ করিল।

গুরুচরণ বলিলেন, বাসো, আঙ সন্ধ্যা তোমার খুড়ীমার কাণ্ডটা শুনেচ বোধ হয়।

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, কাণ্ড আর কি, মেয়ে হয়েছে তাই?

গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমিও বলবে তাই, কিন্তু তাই যে কি সে শুধু আমিই জানি যে!

শেখর কহিল, ও-রকম বলবেন না মাকা, খুড়ীমা শুনেলে বড় কষ্ট পাবেন। তা'হলে ভগবান যাকে পাঠিয়েছেন তাকে আদর-আত্মদ করে ডেকে নেওয়া উচিত।

গুরুচরণ মূহুর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আদর-আত্মদ করা উচিত, সে আমিও জানি। কিন্তু বাবা, ভগবানও ত সুবিচার করেন না। আমি গরীব, আমার ঘরে এত কেন? এই বাড়িটুকু পর্যন্ত তোমার বাপের কাছে বাঁধা পড়েছে, তা পড়ুক, সে জন্যে দুঃখ করিনে শেখর, কিন্তু এই হাতে-হাতেই দেখে না বাবা, এই যে আমার ললিতা, মা-বাপ-মরা সোনার পুতুল, একে শুধু বাজার ঘরেই মানায়। কি করে একে প্রাণ ধরে যার-তার হাতে তুলে দিই বল ত? বাজার মুকুটে যে কোহিনূর ছিল, তেমনি কোহিনূর বাশীকৃত করে আমার এই মা'টিকে গুজন করলেও দাম হয় না। কিন্তু নে, তা বুঝবে। পয়সার অভাবে এমন রত্নকেও আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে। বল দেখি বাবা, সে-সময়ে কি রকম শোন বুকে বাজবে? তেরো বছর বয়স হ'লো, কিন্তু হাতে আমার এমন তেরোটা পয়সা নেই যে, একটা সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থির করি।—গুরুচরণের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেখর চুপ করিয়া রহিল।

গুরুচরণ পুনরায় কহিলেন, শেখরনাথ, দেখো তা বাবা, তেমনাব বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যদি এই মেয়েটার কোন গতি করে দিতে পার। আজকাল অনেক ছেলে শুনেচি টাকাকড়ির দিকে ঢোকে দেখে না, শুধু মেয়ে দেখেই পছন্দ করে। তেমনি যদি দৈবাৎ একটা মিলে যায় শেখর, তা হলে বলচি আমি, আমার আশীর্বাদে তুমি রাজ্য হবে। আর কি বলব বাবা, এ পাড়ায় হোমোদের আগ্রহে আমি অর্ধি, তোমার বাবা আমাকে ছোট ভায়ের মতই দেখেন।

শেখর মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞা তা দেখব।

গুরুচরণ বলিলেন, তুলো না বাবা, দেখো। ললিতা ত অতি বছর বয়স থেকে হোমোদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তুমিও দেখতে পাচ্ছ ও কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন শিল্পী শাস্ত্র। এককোঁটা মেয়ে, আজ থেকে ও-ই আমাদের রাঁধাবাড়ী করবে, দেবে-ধোবে, সমস্তই এখন ওর মাথায়।

এই সময়ে ললিতা একটাবার চোখ তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। তাহার গুচ্ছাধনের উভয় প্রান্ত ঈষৎ প্রসারিত হইল মাত্র। গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ওর বাপট কি কিছু কম বোজগার করেছে, কিন্তু সমস্তই এমন করে দান করে গেল যে, এই একটা মেয়ের জন্যেও কিছু রেখে গেল না।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন, আর রেখে গেল না-ই না বলি কি করে? সে যত লোকের যত দুঃখ ঘুচিয়েছে, তার সমস্ত ফলটুকুই আমার এই মা'টিকে দিয়ে গেছে, তা নইলে কি এতটুকু মেয়ে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে! তুমিই বল না শেখর, সত্য কি না? শেখর হাসিতে লাগিল। জবাব দিল না।

সে উঠিবার উপক্রম করিতেই গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, এমন সকালেই কোথা যাচ্ছ? শেখর বলিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি—একটা কেস আছে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুরুচরণ আশ্রয় একবার স্বয়ং করাইয়া বলিলেন, কথটা একটু মনে রাখো বাবা! ও একটা শ্যামবর্ণ বটো, কিন্তু চোখমুখ, এমন হাসি, এত দয়ামায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।

শেখর মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। এই ছেলেটির বয়স পঁচিশ-চাৰ্ব্বিশ। এম এ পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশ করিতেছিল, গত বৎসর হইতে এটর্নি হইয়াছে। তাহার পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবাবে লক্ষপতি হইয়া কয়েক বৎসর হইতে বাবসা চাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া হেজারবি করিতেছিলেন, বড় ছেলে অবিনাশ উকিল,—ছেটি ছেলে এই শেখরনাথ! তাহার প্রকাণ্ড হেতল বাড়ি পাড়ার মাথায় উঠিয়াছিল, এবং ইহার একটা খোলা ছাদের সহিত গুরুচরণের ছাদটা মিশিয়া থাকায় উভয় পরিবারে অত্যন্ত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বাড়ির মেয়েকা এই পথেই যাত্রা করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবর্ণবর্ণের এক বড়লোকের ঘরে বসেছিল, হঠাৎই শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল সেদিন তাহারো দেখিতে আসিয়া। আগামী মাসের কোন একটা শুভদিন স্থির করিয়া যাইতে চাহিলেন কিন্তু শেখরের জননী স্বাকার করিলেন না, দিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ছেলে, নিজে শেখর পছন্দ করিলে তবে বিবাহ দিবে।

নবীন রায়ের চোখ ছিল শুষ্ক তাৎক্ষণিক দিলে তিনি গহিলাব এই গোলমালে কথায় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এ আবার কি কথা! মেয়ে ও দেখাই আছে। কথাবার্তা পাকা হলে যাক, তার পরে অন্তঃকরণ করার দিন ভাল করে দেখালেই হবে।

তথাপি গহিলা সম্মত হইলেন না পাকা কথা কহিতে দিলেন না, নবীন রায় সেদিন রাগ করিয়া অনেক বেলায় আহার করিলেন এবং দিবানিদ্ৰাটি বাহিরের ঘরেই দিলেন।

শেখরনাথ লোকটা কিছু লৌখিক। সে হেতল'য় সে ঘরটিতে ধান, সতি অতিশয় সুসজ্জিত। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্নবেলায় সে সেই ঘরের বড় আর... সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়ে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ললিতা ঘরে ঢুকিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী দেখতে যাবে, না?

শেখর ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই ত, তিন বেশ করে সজ্জায় দাঁড় দিচ্ছি, কী যাতে পছন্দ করে, ললিতা হাসিল। বলিল এখনও আমার সম্মত নই শেখরনাথ—আমি টাকা নিতে এসেছি, বলিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া একটা দেড়ফুট খুলিয়া গাঁদা গাঁদা গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাধিয়া লইয়া যেন কতটা নিজের মনেই বলিল, টাকা ও দরকাব হলেই নিয়ে যাবি, কিন্তু এ শোধ হবে কি করে?—শেখর চুলের একপাশ বৃকশ দিয়া সমস্ত উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোধ হবে, না হচ্ছে!

ললিতা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া বহিল।

শেখর বলিল, চেয়ে রইলে, বুঝতে পারলে না।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আরও একটু বড় হও, তখন বুঝতে পারবে, বলিয়া শেখর জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল। রাতে শেখর একটা কোচের উপর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সে এড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল। মা একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, মেয়ে কি বরম দেখে এলি রে?

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ।

শেখরের মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু এমন সুন্দর ওঁহা হার দেহের বাঁধন যে দেখিলে পয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক মনে হইত না। আবার এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃহৃদয়টি ছিল, তাহা আরও নবীন আরও কোমল। তিনি পাড়াগায়ের মেয়ে : পাড়াগায়ের স্ত্রীয়ায় সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শহরের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্য বেরমান দেখায় নাই। শহরের চাকলাসজ্জীবতা এবং আচার-ব্যবহারও যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, জম্ভুমির নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মাধুর্যও তেমনি হারাইয়া ফেলেন নাই। এই মাটি যে শেখরের কণ্ড বড় গর্বের বস্তু ছিল, সে-কথা তাহার মা-ও জানিতেন না। জদদীশ্বর শেখরকে অনেক বস্তু দিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য, রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি—কিন্তু এই জননীর সন্তান হইতে পারেন ভাগ্যটাকেই সে কায়মনে ভগবানের সবচেয়ে বড় দান বলিয়া মনে করিত।

মা বলিলেন, 'বেশ' বলে চুপ করে রইলি যে রে!

শেখর আবার হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, যা জিজ্ঞেস করলে ওহি ও বললাম।

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, কে বললি? রঙ কেমন, ফরসা? কার মত হবে? আমানির লাল হাত মত?—শেখর মুখ তুলিয়া বলিল, লালতা ত কালো মা, ওর চেয়ে ফরসা!

মুখচোখ কেমন?

তাও মন্দ নয়।

তবে কতটুকু বলি?

এবার শেখর চুপ করিয়া রহিল।

মা ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ না? মুখটি লেখাপড়া শিখেছে কেমন?

শেখর বলিল, সে ত জিজ্ঞাসা করিনি মা!

অতিশয় আশ্চর্য হইয়া মা বলিলেন, জিজ্ঞেস করিস নি কি রে? যেটা আশ্চর্য হইল সেটা সবচেয়ে দরকারী জিনিস, সেইটেই জেনে আসিস নি?

শেখর হাসিয়া বলিল, না মা, ওকথা আমার মনেই ছিল না।

ছেলের কথা শুনিয়া এবার তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে ভূই ওখানে বিয়ে করবি নে দেখি?

শেখর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় ললিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ললিতা ধীরে ধীরে ভুবনেশ্বরীর পিছনে আসিয়া দাঁড়িল। তিনি হা হাতে দিয়া হাতের সন্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি মা?

ললিতা চুপি চুপি বলিল, কিছুর না মা।

ললিতা পূর্বে ইঁহাকে মাসীমা বলিত, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—এবার আমি ত মাসী হইনে ললিতে, মা হই। তখন হইতে সে মা বলিয়া ডাকিত। ভুবনেশ্বরী হাতের পুস্তক হাতে কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন, কিছুর না? তবে বুঝি আমাকে কিছু একটা বল দেখি? এসেছিস? ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

শেখর কহিল, দেখতে এসেছে, রাগনে কখন?

মা বলিলেন, ধাবে কেন?

শেখর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞেস করিল, কে তবে ওদের রাগনে মা? ওর মামাও ও সেদিন বললেন, ললিতাই রাধাবাড়া সব কাজ করবে।

মা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ওর মামার কি, যা হোক একটা বললেই হ'ল। ওর বিয়ে ওয়ারি, ওর হাতে থাকে কে? আমাদের বামনঠাকুরনকে পাঠিয়ে দিচ্চি, তিনি রাধাবাড়ি করছেন। ওরাই আমাদের রাধাবাড়া করছেন—আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতেই আড্ডা কাটাই।

শেখর বুঝিল, মা এই দুঃখী পরিবারের শুকতার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। সে একটা কুস্তুর

নিশ্চয় ফেলিয়া চুপ করিল।—মাস-খানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর শেখর নিজের ঘরে কোচের উপর কাণ্ড হইয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল, এমন সময়ে ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া শব্দ-সাদা করিয়া দেরাজ খুলিতে লাগিল। শেখর বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি?

ললিতা বলিল, টাকা নিচ্ছি।

ঐ, বলিয়া শেখর পড়িতে লাগিল। ললিতা খাচলে টাকা বদিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর সে সাজিয়া-শুজিয়া আসিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা শেখর চাহিয়া দেখে। কহিল, দশ টাকা নিলুম শেখরদা। শেখর 'আচ্ছা' বলিল, কিন্তু চাহিয়া দেখিল না। অগত্যা সে এটা-ওটা ন্যাড়াতে লাগিল, মিছামিছি দৈব কাণ্ডে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। তখন ধীরে ধীরে বসিবে হইয়া গেল। কিন্তু গেলেই এ চলে না, আবার তাহাকে বিবিয়া আসিয়া দোবদোডায় দাঁড়াইতে হইল। 'অজ্ঞ তাহারা' থিয়েটার দেখিতে যাউরে।

শেখরের বিনা শুকুমে সে যে কোথাও যাউতে পারে না, ইহা সে জানিত। কেহই তাহাকে ইচ্ছা বলিয়া কৈ নাহি কিংবা কেন, কি জন্য, এসব তর্কও কোনদিন মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবনযাত্রাই যে একটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যোখানে যুগি যাউতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামীর অনুমতিই তাহাকে পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে ছায়েব 'অতুল্য' দাঁড়াইয়া আছে অতুল্য বলিল 'আমরা' ত থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।

তাঁহার মুকুটে শেখরের কানে গেল না— সে ভাব দিল না

ললিতা এখন আরো একটু থলো চড়িয়া বলিল, সবটি আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে যে এবং শেখর শুনিতে পাইল, বইখনো একপাশে নামাইয়া দাঁড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল কি যোচ্ছ? ললিতা একমুহুরে চুপ করিয়া বলিল এ ক্ষণে বুদ্ধি ক'ল গেল। 'আমরা' থিয়েটারে যাচ্ছি যে শেখর বলিল, আমবা কারা?

হামি, অম্বাকালি 'চাকবাল', ওর মামা

মামাটি কে?

ললিতা বলিল, তাঁর নাম 'গিদি'নবাব' পাঁচ-ছদ্মিন হ'লে মুকুটের বাড়ি পকে এসেছেন, একমুহুরে বি. এ. পড়বেন - বেশ লোক সে।

বাহ নাম, মাম, বেশা—এ যে দিবা আলপ হয়ে গেছে দেখছি। এতেই র-পাঁচ দিন মাথার চিকিৎসা পর্যন্ত দখলে পড়ি।—তাস খেলা শুঁছিল বোধ করি?

হ্যাঁ, শেখরের কথা বলান মনে দেখিয়া ললিতা ভয় পাইয়া গেল। সে মনেও করে নাই, একপ একটা প্রকাণ্ড উদ্ভিগে পারে। সে চুপ করিয়া বসিল।

শেখর বলিল, এ ক'দিন খুব তাস চলছিল, না?

ললিতা ঢোক গিলিয়া মুদুরবে কহিল, চাক বললে যে।

চাক বললে? কি বললে? বলিয়া শেখর মাথা তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, একেবারে

কাপড় পরে তৈরী হয়ে আসা হ'চ্ছে,—আচ্ছা যাও।

ললিতা গেল না, সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বসিল।

পাশের বাড়ির চাকবাল তাহার সমবয়সী এবং সহি। তাহারা ব্রাহ্ম। শেখর ঐ পৈশক ছাড়া তাহাদের সকলকেই চিনিত। গিরীন পাঁচ-সাত বৎসর বয়সে কিছুদিনের জন্য একবার এদিকে আসিয়াছিল। এতদিন বাঁকপুরে পড়িত, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই, আসেও নাই। তাই শেখর তাহাকে চিনিত না। ললিতা তথাপি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, মিছে দাঁড়িয়ে বইলে কেন, যাও। বলিয়া মুখের সমুখেই বই তুলিয়া লইল।

মুগ্ধ চুপ করিয়া থাকার পরে ললিতা আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, যাব? যেতেই শু বললুম, ললিতা।

শেখরের ভাব দেখিয়া ললিতার খিয়েটার দেখিবার সাধ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার না গেলেও যে নয়।

কথা হইয়াছিল, সে অর্ধেক খরচ দিবে এবং চারুর মামা অর্ধেক দিবে।

চারুর ওখানে সকলেই তাহার জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং যত বিলম্ব হইতেছে তাহাদের অধৈর্যও তত বাড়িতেছে, ইহা সে চোখের উপর দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। অনুমতি না পাইয়া যাইবে এত সাহস তাহার ছিল না। আবার মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটি—যাব?

শেখর বইটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া ধমকাইয়া উঠিল, বিরক্ত করো না ললিতা, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, ভালমন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

ললিতা চ-কিয়া উঠিল। শেখরের কাছে বকুনি খাওয়া তাহার নূতন নহে; অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু দু-তিন বৎসরের মধ্যে এরকম শুনে নাই। ওদিকে বন্ধুহা অপেক্ষা করিয়া আছে, সেও কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইতিমধ্যে টাকা আনিতে আসিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের কাছেই বা সে কি বলিবে?

কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তাহার শেখরের তরফ হইতে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেই জোরেই সে একেবারে কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু যে সেই স্বাধীনতাই এমন রূঢ়ভাবে খর্ব হইয়া গেল তাহা নহে, যেজন্য হইল সে কারণটা যে কতবড় লজ্জার, তাহাই আজ তাহার তের বছর বয়সে প্রথম উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া সে আরো মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিজেও ঘরে গিয়া ঝিকে দিয়া আম্মাকালীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া কহিল, তোরা আজ যা কালী, আমার বড় অসুখ কচ্ছে, সইকে বল গে আমি যেতে পারব না।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ সেজদি?

মাথা ধরেচে, গা বমি-বমি কচ্ছে—ভাবী অসুখ কচ্ছে, বলিয়া সে বিদ্বানময় পাশ ফিরাইয়া শুইল। তারপর চারু আসিয়া সাধাসাধি করিল, পীড়াপীড়ি করিল, মামীকে দিয়া সুপারিশ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজী করিতে পারিল না। আম্মাকালী হাতে দশটা টাকা পাইয়া যাইবার জন্য ছুটছুটি করিতেছিল। পাছে এই-সব হাঙ্গামায় পড়িয়া যাওয়া না ঘটে, এই ভয়ে সে চাককে আড়ালে ডাকিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, সেজদির অসুখ কচ্ছে—সে নাই গেল চারুদি। আম্মাকে টাকা দিয়েছে, এই দ্যাখো—আমরা যাই চল। চারু বুঝিল, আম্মাকালী বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে কাহারো খাটো নয়। সে সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুবালার মা মনোরমার তাস খেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু সংসারে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খেলার ঝোঁক যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। তাহার এই ক্রটি শুধরাইয়া যাইত ললিতাকে পাইলে। সে খুব ভাল খেলিতে পারিত। মনোরমার মামাত ভাই গিরীন্দ্র আসা পর্যন্ত ও-কয়দিন সমস্ত দুপুরবেলা তাহার ঘরে তাসের বিরাট আড্ডা বসিতেছিল। গিরীন পুরুষমানুষ, খেলে ভাল, সুতরাং তার বিপক্ষে বসিতে গেলে মনোরমার ললিতাকে চাই-ই।

খিয়েটার দেখার পরের দিন যথাসময়ে ললিতা উপস্থিত হইল না দেখিয়া মনোরমা ঝিকে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতা তখন একটি মোটা খাতায় একখানা ইংরাজী বই হইতে বাংলা তর্জমা করিতেছিল, গেল না।

তাহার সই আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না, তখন মনোরমা নিজে আসিয়া তাহার খাতাপত্র একদিকে টান মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, নে, ওঠ। বড় হয়ে তোকে জিজ্ঞাসিত করতে হবে না, বরং তাস খেলতেই হবে—চল।

ললিতা মনে মনে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া, কাদ-কাদ হইয়া জানাইল, আজ তাহাও কিছুতেই যাবার

জ্ঞো নাই, বরং কাল ঘাইবে। মনোরমা কিছুতেই গুলিলেন না, অবশেষে মামীকে জানাইয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; সুতরাং তাহাকে আজও গিয়া গিরানোর বিপক্ষে বসিয়া হাস খেলিতে হইল। কিন্তু, খেলা জমিল না। এদিকে সে এতটুকু মন দিতে পারিল না। সমস্ত সময়টা আড় হইয়া রহিল এবং বেলা না পড়িতেই উঠিয়া পড়িল। ঘাইবার সময় গিরান বলিল, রাতে আপনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু গেলেন না, কাল আপনার ঘাই চলুন।

ললিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, আমার বড় অসুখ কর্ছেছিল।

গিরান হাসিয়া বলিল, এখন ও অসুখ সেবেচে, চলুন কাল যেতে হবে।

না না, কাল আমার সময় হবে না, বলিয়া ললিতা তৎপরে প্রস্থান করিল। আজ শুধু যে শেখরের ভায়া তাহার খেলায় মন লাগে নাই এটা নহে, এতদে নিজেবও তাঁর লজ্জা কবিতোছিল।

শেখরের বাড়ির মত, এই বাড়িতেও সে ছেলেরা হইতে আসা যাওয়া করিয়াছে এবং ঘরের লোকের মতই সকলের সমুখে বহির হইয়াছে। এটি চাকর মামার সুনামও বর্ডিত হইতে, কথা বলিতে, প্রথম হইতেই এতদে কোনও দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু, আজ গিরানের সমুখে বসিয়া সমস্ত খেলাব সময়টা কেমন করিয়া যেন এতদে কেবল মনে হইতেছিল, এই কয়েকদিনের পরিত্যক্ত গিরান তত্বে একটু বিশেষ শ্রীতিব চোখে দেখিতেছে। পুরুষের শ্রীতিব চক্ষু যে এতদে লজ্জাব বস্তু তাহা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করে নাই।

বাড়িতে একবার দেখা দিয়াই সে তাড়াহাড়ি ও-বর্ডিতে শেখরের ঘরে গিয়া চুপিল, এবং একেবারে কামে লাগিয়া গেল। ছেলেরা হইতে এ ঘরের ছোটখাটো কাজগুলি তাহাকেই করিতে হইত। বই প্রভৃতি গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, টেবিল সাভাইয়া দেওয়া, দেখা ও-কলম কাড়িয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখা, এ সমস্ত সে না করিলে আর কেহ করিত না। ছদ্ম-সাত দিনের অব্যাহতায় অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত ঐটি শেখরের করিয়া আসিবার পূর্বেই নিগোষ করিয়া ফেলিয়া ও-কলম কাড়িয়া লাগিয়া গেল।

ললিতা সময় পাইলেই রাতে রাতে পাকিত এবং সে নিজে কাপড়ের পর মনে করিত না বলিয়া এ-বাড়িতে তাহাকেও কেহ পর মনে করিত না। আট বছর বয়সে তা-রপ হাবিয়া মামার বর্ডিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতে সে ছোটবোনটির মত শেখরের অংশপাংশ ঘূঁরিয়া তাহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়া মনুষ্য হইতেছে।

সে যে শেখরের বিশেষ স্নেহের পাশে এতদে সবাই জর্জিত ও শুধু সেই হয় যে এখন তা-রপ উঠিয়াছে তাহাই কেহ জানিত না, ললিতাও না। শিওর হইতে শেখরের কা, তাহাকে একটুভায়ে এও অপায়াপ্ত আদর পাঠিতে সবাই দেখিয়া আসিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তাহা কোন আদরই কাহাবই চোখে বিসদৃশ বোধ হয় না, কিংবা কোন ব্যবহারই কাহাবও দৃষ্টি অকর্ষণ করে না। করে না বলিয়াই সে যে কোনও দিন বদলপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে সম্ভাবনাও কাহাবও মনে উদয় হয় নাই। ললিতাদের বাড়িতেও হয় নাই, ভুবনেশ্বরীর মনেও হয় নাই।

ললিতা ভারিয়া বাখিয়াছিল, কাজ শেষ করিয়া শেখর আসিবার পূর্বেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু অনামনস্থ ছিল বলিয়া ঘড়ির দিকে নজর করে নাই। এতদে দ্বারের পিছরে জুত বসামত লজ্জা মুখ তুলিয়াই একপাশে সবিয়া দাঁড়াইল।

শেখর একটা গমিঠাটা আরম্ভ-চৌকির উপর হেলান দিয়া শুই। না-য়া বলিল, ফেরা হ'ল কখন? ঘূটো? তিনটে? মুখে কথা নেই কেন?

ললিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর বিরক্ত হইয়া বলিল, নীচে যাও, মা ডাকছেন।

ভুবনেশ্বরী ডাড়াবের সমুখে বসিয়া জলখাবার সাজাইতেছিলেন, ললিতা কাছে আসিয়া বলিল, ডাকছিলে মা?

শৈ ডাকিনি ও, বলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পাশে চাইয়াই বাললেন, মুখখানি এখন শুকনো কেন লালিতে? কিন্তু আসনি বুঝি এখনো?

ললিতা ঘাড় নাড়িল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, আচ্ছা, যা তোর দাদাকে খাবার দিয়ে আমার কাছে আয়।

ললিতা খাবার হাতে করিয়া খানিক পরে, উপরে আসিয়া দেখিল, ওখানো শেখর তেমনভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, অফিসের পোশাকও ছাড়ে নাই, হাতমুখও ধোয় নাই। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, খাবার এনেচি।

শেখর চাহিয়া দেখিল না। বলিল, কোথাও রেখে দিয়ে যাও।

ললিতা রাখিয়া দিল না, হাতে করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর না চাহিয়াও বুঝিতেছিল, ললিতা যায় নাই—দাঁড়াইয়া আছে। মিনিট দুই পরে নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ললিতা, আমার দেরি আছে, বেশে নীচে যাও।

ললিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে রাগিতোঁছিল, মৃদুস্বরে বলিল, থাক দেরি, আমারও নীচে কোন কাজ নেই।

শেখর চোখ চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে কথা বেরিয়েছে। নীচে কাজ না থাকে তবুও নীচে আছে ত? তাও না থাকে, তার পরের বাড়িতেও আছে ত? বাড়ি ত তোমার একটি নাকি বাকি আছে?

নয়ই ত! বলিয়া রাগ করিয়া ললিতা খাবারের থালাটা দুম করিয়া টেবিলে বারান্দা দিক দিক করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শেখর চোঁচাইয়া বলিল, সন্ধ্যার পরে একবার এসো।

এক শ-বার আমি ওপর-নীচে করতে পারিনে, বলিয়া ললিতা চলিয়া গেল।

নীচে আসবামাত্রই মা বলিলেন, দাদাকে তোর খাবার দিয়ে এলি, পান দিয়ে এলি, এ

আমার ক্ষিদে পেয়েছে মা, আমি আর পারিনে, আর কেউ দিয়ে আসুক, বলিয়া ললিতা হাসিয়া পড়িল।—মা তাহার কষ্ট মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, দুই-তিন দিন খাবার খাবে খাবার খাবে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ললিতা প্রত্যুত্তর না কারিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

সে থিয়েটার দেখিতে যায় নাই—তবুও শেখর তাহাকে বকিয়াছিল, এই বলে, তুমি যাও, শেখরকে দেখা দেয় নাই, অথচ সে অফিসে চলিয়া গেলে দুপূর্ববেলা ঘিরে ঘুরে আসিয়াছিল। শেখর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দুদিন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তখন সে যায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ পাড়ার একজন অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত, তাহার পেরে ললিতা বড় দয়া ছিল, আসিলেই তাহাকে একটি করিয়া টাকা দিত। টাকাটি হাতে পাঠিয়া সে তা সমস্ত খরচ এবং অসম্ভব আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতে থাকিত, সেইগুলি শুনিতে সে অতিশয় ভালবাসিত। সে বলিত, ললিতা পূর্বজন্মে তাহার আপনার মা ছিল, এবং ইহা সে ললিতাকে ভালবাসাই কেমন করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সেই বৃদ্ধা ছেলেটি তাহার আজ সকালেই ঘরে আসিয়া উচ্চারণ করিল, আমার মা-জননী কোথায় গো?

সন্তানের আহ্বানে আজ ললিতা কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন শেখর ঘরে আছে সে তাহা আনিতে যায় কিরূপে? এদিক-সেদিক চাহিয়া মামীর কাছে গেল। মামী এইমাত্র ঘর সরাইয়া আসিয়া বিরক্ত-মুখে শুনিতে বসিয়াছিলেন, তাহাকে কিছু না বলিতে পারিয়া সে চিহ্নিত হাসিয়া মুক বাড়াইয়া দেখিল, ভিক্ষুক দোরগোড়ায় লাঠিটি ঠেস দিয়া রাখিয়া বেশ চাপিয়া বসিয়াছে। তাই ললিতা কখনও তাহাকে নিরাশ করে নাই, আজ শুধুহাত ফিরাইয়া দিতে তাহার মন সজল না।

ভিক্ষুক আবার ডাক দিল।

আল্লাকালী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেজর্দি, তোমার সেই ছেলে এসেছে।

ললিতা বলিল, কালী, একটা কাজ কর না ভাই। আমার হাতজোড়া, তুই একটিনাও ছুটে গিয়ে, শেখরদার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে আয়।

কালো ছুটিয়া চর্নিয়া দেল, স্বানিক পদে ওহনি ছুটিয়া আসিয়া ললিতার হাতে একটা টাকা দিয়া
 বলিল, এত নাও।

ନାମିତ୍ରା ଡିଡ଼ିଂସା ନାମିତ୍ରା, ଶୋବନନା ନି. ନାମିତ୍ରା ନେତ୍ର

[illegible]

ଆମିନି ବି.ବି.ଏ. ସମାଜରେ ୦.୧ %

ନା. ଅମଳ ବିହାରୀ ନା. କବିତା ଓ ଆଶାକାନ୍ତ ମାଡ଼ି ନାହିଁବା ହେଲା କବିତା ଓ ଚଳିତା ଦୋଳ।

ନୀଳିମାଳା ଚିତ୍ରାବଳୀ ଦିନାକାର କାମର ନିମ୍ନ ଅନାମିତେକ ଉପ ନିଆଁହାଁଆ ଧାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗ୍ରହଣ କାକାଞ୍ଚିଟା ଗୁଣିତେ
 ନୀଳିମାଳା ଚିତ୍ରାବଳୀ ଦିନାକାର କାମର ନିମ୍ନ ଅନାମିତେକ ଉପ ନିଆଁହାଁଆ ଧାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗ୍ରହଣ କାକାଞ୍ଚିଟା ଗୁଣିତେ

এ কর্মদিনে প্রভাসের আড়ত পূর্ণ হোলে চমকেছিল অতি দুঃখবোধে। বলিতা জেলে না, মাথা দাঁড়িয়ে বসিয়া শুভ্রা দাঁড়িত। অত্যন্ত মত্ত প্রভাস ভাবি মনে বাদ্যে এইরা গিয়াছিল। বিকলবেলা কলিকাতা রাস্তা চমকিত। দাঁড়িত। শুভ্রা পড়ে গেলো নিরন্তর কোথায় যাবে আর যামনে। কালী মাথা নাড়িয়া দাঁড়িত। এই রাত্রে :

உதவி செய்வது நமது கடமை.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਜੀਨੀਓ: ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟਲ

১৯৯০ খ্রিঃ ১০ই আগস্ট তারিখে ঢাকা মহানগর পৌরসভার পক্ষে
 প্রার্থী হইয়া নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণা চালাইয়া আসিতেছেন।
 তিনি বলেন, তিনি নির্বাচন জয় করিলেই তিনি পৌরসভার
 পক্ষে প্রচারণা চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন, তিনি
 নির্বাচন জয় করিলেই তিনি পৌরসভার পক্ষে প্রচারণা
 চালাইয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন, তিনি নির্বাচন জয়
 করিলেই তিনি পৌরসভার পক্ষে প্রচারণা চালাইয়া আসিতেছেন।

কলিকাতা জেলা কৃষক কল্যাণ সমিতি প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের মধ্যে কৃষক কল্যাণ সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

কালী অর্চনা করিয়া ১০৮ শ্রবণ এই প্রাণীমুখ ভাবপরিবর্তনের ফলে সে কিছুই বাকিল না।

[illegible]

এই দুইদিনের মধ্যেই এতকাল এতকাল ও অনেককাল এইখানে অপরাহ্নে বসেই যেতে লাগল। অনেক সময়ই এতকাল এতকাল ও অনেককাল এইখানে অপরাহ্নে বসেই যেতে লাগল। অনেক সময়ই এতকাল এতকাল ও অনেককাল এইখানে অপরাহ্নে বসেই যেতে লাগল।

মুন্সেফেরা বলিলেন, 'ক' কার হস্তে 'খ'টি, 'গ'ক ঠিক না হয়, আর আমরা তিনজনেই খেলি।

গিৰাঁন নিকটস্থ হোৱাৰ বাবে, তেওঁলোকে কি খোজা হয় দিদি? ও-বাঁওৰ ললিতাকে একবাব
চাকাত পাতাত ন?

ਸ੍ਰੀ ਅਸਿੰਦ੍ਰ ਨੰ ।

শিষ্টাংশ বিমর্ষ হইয়া, ভিজ্ঞান আনন্দ, এক আসবে না, ওদের বাড়িতে থানা ক'বে নিয়েচে বোধ হয়, না।

মানবদেহে যাতে মাটিয়া পোকেরা, না, ওর মাঝে মাঝে সে বকম মনুষ্য নয়—সে নিজেই আসে না।

গিরীশ হঠাৎ খুশী হইয়া বলিল, তা হলে তুমি নিজে আজ একবার গেলেনি আসবেন,—কথটা গুলিয়া ফেলিয়া সে নিভে মনেই ভাবে অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মনোদ্রমা হাসিয়া ফেরিলেন। অজ্ঞা, ওই যাই, বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং যানিক পরে
লনি দাকে ধবিয়া আনিয়া এস পাড়িয়া দসিলেন।

মর্দিন (যেটা হয় নাই, আলম অঙ্গ সময়ের মধ্যেই বেশ উদ্ভিয়া গেল। ননিভারা জিতিতেছিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সহসা এ. আসিয়া দাঁড়িয়া বলিল, সেঙদি, শেখরান ডাকচেন—জলদি!

ললিতার দুই চক্ষু পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাস-দেওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, শেখরদা অফিসে যাননি ? কি জানি, চলে এসচেন, বলিয়া সে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

ললিতা তাস রাখিয়া দিয়া মনোরমার মুখপানে চাহিয়া কৃষ্টিভাবে বলিল, যাই সই-মা।

মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সে কি রে, আর দু-হাত দেখে যা।

ললিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না সই-মা, ইনি তা হলে বড় রাগ করবেন, বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গিরীন প্রহ্ন করিল, শেখরদাদা আবার কে দিদি ?

মনোরমা বলিলেন, এ যে সুমুখের ফকটওয়ালা বড় বাড়িটা।

গিরীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও—ওই বাড়ি। নবীনবাবু তাঁদের আত্মীয় বৃথা ?

মনোরমা মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আত্মীয় কেমন ! ললিতাদেবী এ ভিটেটুকু পর্যন্ত বড়ো আত্মসাৎ করবার ফিকিরে আছেন।

গিরীন আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

মনোরমা তখন গল্প করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া গত বৎসর টাকার অভাবে গুণচন্দ্রবাবু মেজমোয়ের বিবাহ হইতেছিল না, পরে অসম্ভব সুদে নবীন বায় টাকা ধার দিয়া বাড়িখানি পুনঃ রাখিয়াছেন ; এ টাকা কোনদিন শোধ হইবে না এবং অবশেষে বাড়িটা নবীন বায়ই গ্রহণ করিবেন।

মনোরমা সমস্ত কথা বলিয়া পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুড়ার আত্মরিক ইচ্ছা গুণচন্দ্রবাবু ভাস্কর বাড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এখানে ছোট ছোলে শেখরের জন্য একটি বড় একমেব বাড়ি তৈরি করেন—দুই ছেলের দুই আলাদা বাড়ি—মতলব মন্দ নয়।

ইতিহাস শুনিয়া গিরীনের ক্রেশ বোধ হইতেছিল, ভিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, গুণচন্দ্রবাবু আরও ৩ মেয়ে আছে, তাদের বা বিয়ে কি করে দেবেন ?

মনোরমা বলিলেন নিজের ত আছেই, তা ছাড়া ললিতা ও ব. বাপ-মা নেই, সমস্ত ভাব এই গরীবের ওপর। বড় হয়ে উঠেছে, এই বছরের মধ্যে বিয়ে না দিলেই নয়। ওদের সমাজে সাহায্য করবে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে—আমারা বেশ আছি গিরীন।

গিরীন চুপ করিয়া রহিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, সেদিন ললিতার কথা নিয়েই ওর মামা আমান কাছে কৈদে ফেললে—কি করে যে কি হবে তার কিছুই স্থির নেই—ওর ভাবনা ভেবেই গুণচন্দ্রবাবু পেটে অন্ন-জল যায় না,—হাঁ গিরীন, মুন্সেরে তাদের কোন বন্ধুবান্ধব এমন নেই যে, শুধু মেয়ে দেবে বিয়ে করে ? এমন মেয়ে কিন্তু পাওয়া শক্ত।

গিরীন বিষণ্ণভাবে মুদু হাসিয়া বলিল, বন্ধুবান্ধব আর পাবো কোথায় দিদি, তবে টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারি।

গিরীনের পিতা ভাস্করি করিয়া অনেকটাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তবই এখন সে মালিক।

মনোরমা বলিলেন, টাকা তুই খার দিবি ?

খার আর কি দেব দিদি—ইচ্ছে হয়, উনি শোধ দেবেন, না হয় নাই দেবেন।

মনোরমা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, তোর টাকা দিয়ে লাভ ? ওরা আমাদের আত্মীয়ও নয়, সমাজের লোকও নয়—এমন কে কাকে টাকা দেয় ?

গিরীন তাহার বোনের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে কহিল, সমাজের লোক নাই হলেন, বাঙ্গালী ত ? ওর একান্ত অভাব, আর আমার নিস্তর রয়েছে,—তুমি একবার বলে দেখো না দিদি, উনি যদি নিতে রাজী হন, আমি দিতে পারি। ললিতা তাঁদেরও কেউ নয়, আমাদেরও কেউ নয়—তার বিয়ের সমস্ত ব্যয় না হয় আমিই দেব।

তাহার কথা শুনিয়া মনোরমা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহাতে তাহার নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, তথাপি এত টাকা একজন আর একজনকে দিতেছে দেখিলে অনেক স্বীলোকই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

চাক্র এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে মহা খুশী হইয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তাই দাও মামা, আমি সেই-মাকে বলে আসচি।

তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই খাম চাক্র, ছেলেমানুষ—এ-সব কথায় থাকিস নে। বলতে হয় আমিই বলব।

গিরীন কহিল, তাই বলা দিদি। পরশু রাত্তায় উপর দাঁড়িয়েই গুরুচরণবাবুর সঙ্গে একটুখানি আলাপ হয়েছিল, কথায়বার্তায় মনে হল— বেশ সরল লোক ; তুমি কি বল ?

মনোরমা বলিলেন, আমিও তাই বলি, সবাই তাই বলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বড় সাদাসিধে মানুষ। সেইজন্যেই ত দুঃখ হয় গিরীন, এমন লোকটিকে হয়ত বাড়িঘর ছেড়ে নিরাশ্রয় হতে হবে। তাই সাক্ষী দেখলি নে গিরীন, শেখরবাবু ডাকচেন বলতেই ললিতা কি-রকম তাড়াতাড়ি উঠে পালালো, বাড়িসুদ্ধ লোক ওদের কাছে যেন বিক্রি হয়ে আছে। কিন্তু, যত খোশামোদই করুন না কেন, নবীন রায়ের হাতে গিয়ে একবার যখন পড়েচে, বেহাই পাবে, এ ভবস' কেউ করে না।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বলবে ত দিদি ?

আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব। দিয়ে যদি তুই উপকার করতে পারিস, 'ভানই' ত ; বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোবই বা এত চাড় কেন গিরীন ?

চাড় আর কি দিদি, দুঃখ-কষ্টে পরম্পরের সাহায্য করতেই হয়, বলিয়া সে ঈষৎ সলজ্জ-মুখে প্রস্তাব করিল। দ্বাবের দিক দিয়াই আলাপ ফিরায়া আসিয়া বলিল :

তাহার দিদি বলিলেন, আবার বসলি ত ?

গিরীন হাসিমুখে বলিল, অত যে কাঁদুনি গাইলে দিদি, হয়ত সব সত্যি নয়।

মনোরমা বিন্মিত হইয়া বলিলেন, কেন ?

গিরীন বলিতে লাগিল, ওদের ললিতা যেবকম টাকা খরচ করে সে ত দুঃখীও মত মোটেই নয় দিদি। সেদিন আমরা থিয়েটার দেখতে গেলুম, ও নিজে গেল না, তবু দশ টাকা ওর বোনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। চাক্রকে জিজ্ঞেস কর না, কিরকম খরচ করে : মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম ওব নিজের খরচই চলে না যে।—মনোরমা লিঙ্কাস করিলেন ত ?

চাক্র বলিল, সত্যি মা। ও-সব শেখরবাবুর টাকা, শুধু এখন নয়, ছেলেরা থেকে ওই শেখরদাদ আলমাবি খুলে টাকা নিয়ে আসে— কেউ কিছু বলে না।

মনোরমা মেয়ের দিকে চাহিয়া সন্দেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা ত শেখরবাবু ভানেন ?

চাক্র মাথা নাড়িয়া বলিল, জানেন, সুমুখেই চাবি খুলে নিয়ে আসে। গেল মাসে আম্মাকালীর পুতুলের বিয়েতে অত টাকা কে দিলে ? সবই ত সেই দিলে।

মনোরমা ভাবিয়া বলিলেন, কি জানি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক বটে, বুড়োর মত ছেলেরা এমন চামার নয়—ওঁরা সব মায়ের হাত পেয়েচে— তাই দয়াধর্ম আছে। তা ছাড়া, ললিতা মেয়েটি নাকি খুব ভাল, ছেলেবেলা থেকে কাছে কাছে থাকে, দাদা বলে ডাকে, তাই ওকে মারা-মমতাও সবাই করে। হাঁ চাক্র, তুই ত যাওরা-আসা করিস, ওদের শেখরের এই মাঘ মাসে নাকি বিয়ে হবে ? ওনেচি, বুড়ো অনেক টাকা পাবে।

চাক্র বলিল, হাঁ মা, এই মাঘ মাসেই হবে—সব ঠিক হয়ে গেছে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরুচরণ লোকটি সেই ধাতের মানুষ—যাহার সহিত যে-কোনও বয়সের লোক অসন্তোষে আলাপ করিতে পারে। দুই-চারদিনের আলাপে গিরীনের সহিত তাহার একটা স্বায়া সখ্যতা জন্মিয়া গিয়াছিল। গুরুচরণের চিন্তের বা মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না বলিয়া তঁকে করিতেও তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তর্কে পরাজিত হইলেও ওঁরনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ ত্রিনি গিরীনকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিস হইতে ফিরিতেই তাহার দিবা অবসান হইয়া যাইল :। তাৎ-মুখ ধুইয়াই বলিতে, ললিতে, চা তৈরি হ'লো মা ? কালী,

যা যা, তোর গিরীনমামাকে এইভাবে ডেকে আন। তাবপর উভয়ে চা খাওয়া এবং তর্ক চালিতে থাকিত।
ললিতা! কোন কোন দিন মামার আড়ালে বসিয়া চূপ করিয়া শুনিত। সেদিন গিরীনের যুক্তিতর্ক
শতমুখে উৎসারিত হইতে থাকিত। তর্কটা প্রায়ই আধুনিক সমাজের বিলুপ্তি হইত। সমাজের
হৃদয়হীনতা, অসঙ্গত উপদ্রব এবং অত্যাচার—এ সমস্তই সত্য কথা।

একে ত সমর্থন করিবার বাস্তবিক কিছু নাই, তাহাতে গুরুচরণে উৎপাড়িত অশান্ত হৃদয়ের স্রোত
গিরীনের কথাগুলি বড়ই খাপ খাইত। তিনি শেষকালে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, ঠিক কথা গিরীন। কোন
ইচ্ছে আর না করে নিজের মেয়েদের যথাসময়ে ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে, কিন্তু দিই কি কবে? সমাজে
বলচেন দাও বিয়ে—মেয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু দেবার বন্দোবস্ত করে ত দিতে পারেন না। যা বলেচ
গিরীন, এই আমাকে দিয়েই দ্যাখ না কেন, বাড়িটুকু পর্যন্ত বন্ধক পড়েছে, দুদিন পরে ছেলেমেয়ের
হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—সমাজ তখন ত বলবেন না, এসো, আমার বাড়িতে আশ্রয় নাও।
কি বল হে?

গিরীন হয়ত চূপ করিয়া থাকিত, গুরুচরণ নিজেই বলিতেন, খুব সত্য কথা। এমন সমাজ থেকে
জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই না খাই, শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে
সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাসায় আর গলা চেপে ধরে সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও
নয়—এ সমাজ বড়লোকের জন্যে। ভাল, তাহাই থাক, আমাদের কাজ নাই। বলিয়া গুরুচরণ সত্য
চূপ করিতেন।

যুক্তিতর্কগুলি ললিতা শুধুই মন দিয়া শুনিত না, রাগে লিহানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিত
নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিত। প্রতি কথাটি তাহার মনের উপর গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া
উঠিতেছিল। সে মনে মনে বলিত, যথার্থই গিরীনবাবুর কথাগুলি অতিশয় ন্যায়সঙ্গত।

মামাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, সেই মামার স্বপক্ষে টানিয়া গিরীন যাহাই কিছু বলিত, সমস্তই
তাহার কাছে অপ্রাস্ত সত্য বলিয়া মনে হইত। তাহার মামা, বিশেষ করিয়া তাহার জন্য ব্যতীত হইয়া
উঠিতেছে, অন্ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে—তাহার নির্বিরোধী দুঃখী মামা তাহাকে আশ্রয় দিয়াই—এ
ক্লেশ পাইতেছে! কিন্তু কেন? কেন মামার জাত যাবে? আজ আমার বিয়ে দিয়া, কাল যদি বিয়ে
হয়ে ঘরে ফিরে আসি, তাহলে ত জাত যাবে না। অথচ তফাত কিসের? গিরীনের এই সমস্ত কথা
প্রতিধ্বনি সে তাহার ভারত্বের হৃদয় হইতে বাহির করিয় আবার একবার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা
করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

তাহার মামার হইয়া, মামার দুঃখ বুঝিয়া, যে-কেহ কথা কহিত, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, তাহার
মতের সহিত মত না মিলাইয়া ললিতার অন্য পথ ছিল না। সে গিরীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে
লাগিল। ক্রমশঃ গুরুচরণের মত সেও সম্ভার চা-পানের সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে গিরীন ললিতাকে 'আপনি' বলিয়া ডাকিত। গুরুচরণ নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, ওকে
আবার 'আপনি' কেন গিরীন, 'তুমি' বলে ডেকো। তখন হইতে সে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে শুরু
করিয়াছিল।

একদিন গিরীন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি চা খাও না ললিতা?

ললিতা মুখ নীচ করিয়া ঘাড় নাড়িলে, গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, ওর শেখরদার কারণ আছে।
মেয়েমানুষের চা খাওয়া সে ভালবাসে না।

হেতু ওনিয়া যে গিরীন সুখী হইতে পারে নাই, ললিতা সেটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল।

আজ ওনিবার। অন্যদিনের অপেক্ষা এই দিনটার সত্য ভাসিতে অধিক বিলম্ব হইল।

চা-খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ আজ আলোচনায় তেমন উৎসাহের সহিত যোগ দিতে
পারিতেছিলেন না, মাঝে মাঝে কি-একরকম অনামনস্ত্ব হইয়া পড়িতেছিলেন।

গিরীন সহজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ আপনার মেহটা সোপ করি তেমন ভাল
নাই?

গুরুচরণ হুঁকটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন, কেন? মেহ ত বেশ ভালই আছে।

গিরীন সঙ্কোচের সহিত বলিল, 'তাহলে অফিসে কি কিছু--

না, তাও ত কিছু নয়, বলিয়া গুরুচরণ একটু বিষ্ময়ের সহিত গিরীনের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার ভিতরের উদ্বেগ যে বাহিরে প্রকাশ পাইছিল তাহা এই নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষটি বুঝিতে পারেন নাই।

ললিতা পূর্বে একেবারেই চাপ করিয়া থাকিত, কিন্তু আজকাল দু-একটা কথাই মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিল। সে বলিল, হাঁ মামা, আজ প্রেমার ব্যস্ত মন ভাল নেই।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ও সেই কথা! হাঁ মা, ঠিক ধরচিস বটে, আজ আমার সতিই মন ভাল নেই।

ললিতা ও গিরীন উভয়েই তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গুরুচরণ বলিলেন, নবীনদা সমস্ত জেনেওনে গোটা-কতক শব্দ কথা পথে দাঁড়িয়েই শুনিতে দিলেন। আর তাঁরই বা শেষ কি, হ'মাস হয়ে গেল, একটা পরস্য সুদ দিতে পারলুম না, তা আসল দূরে থাক।

ব্যাপারটা ললিতা বুঝিয়াই চাপা দিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মামা পাছে ঘরের লজ্জাকর কথাগুলো পরের কাছে ব্যস্ত করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবে না মামা, সে-সব পরে হবে।

কিন্তু গুরুচরণ সেদিক দিয়াও গেলেন না। বরং বিবস্ত্রভাবে হাসিয়া বলিলেন, পরে আর কি হবে মা? তা নয় গিরীন, আমার এই মাটি চায় তার বুড়ো ছেলেটি যেন কিছু ভাবনা-চিন্তা না করে। কিন্তু বাইরের লোকে যে তোর দুঃখী মামার দুঃখটা চেয়ে দেখতেই চান, ললিতে।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, নবীনবাবু আজ কি বললেন?

গিরীন যে সমস্ত কথাই জানে ললিতা তাহা জানিত না, তাই তাহার প্রশ্নটিকে অসঙ্গত কৌতূহল মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

গুরুচরণ খুলিয়া বলিলেন। নবীন রায়ের স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি রোগ কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকের বায়ু-পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থের প্রয়োজন, অতএব এই সময়ে গুরুচরণের সমস্ত সুদ এবং কিছু আসল দিতে হইবে।

গিরীন ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, একটা কথা আপনাকে বন্দী শিল করবে বলতে পারিনি, যদি কিছু না মনে করেন আজ তা হলে বলি।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমাকে কোন কথা বলতে কেউ কখন ত সঙ্কোচ করে না গিরীন,—কি কথা?

গিরীন বলিল, দিদির কাছে শুনেচি, নবীন বাবুর খুব বেশী সুদ। তাই বলি, আমার অনেক টাকাই ত অমনি পড়ে রয়েছে, কোনও কাজেই আসে না, আর, তাঁরও দরকার, নাইয় এই ষণটা শোধ করেই দিন না?—ললিতা ও গুরুচরণ উভয়েই আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গিরীন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিল, আমার এখন ত টাকার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই তাই যখন আপনার সুবিধা হবে, ফিরিয়ে দিলেই চলবে, ওঁদের আবশ্যক, সেইজন্যে বলছিলাম যদি—

গুরুচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, সমস্ত টাকাটা তুমি দেবে?

গিরীন মুখ নীচু করিয়া বলিল, বেশ ত, তাঁদের উপকার হয়—

গুরুচরণ প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে আন্না কালী, দুটিয়া আসিয়া পড়িল। সেজ্জদি, জলদি—শেখরদা কাপড় পরে নিতে বললেন—খিয়েটার দেখতে যেতে হবে,—বলিয়াই যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনই করিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাগ্ৰতা দেখিয়া গুরুচরণ হাসিলে, ললিতা স্থির হইয়া রহিল।

আন্না গলি মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কে, উঠলে না সেজ্জদি, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তখাপি ললিতা উঠিবার বেলা লক্ষণ প্রকাশ করিল না। সে শেষ পর্যন্ত শুনিয়া যাইতে চায়, কিন্তু শব্দ (প্রথম খণ্ড)—৯

গুরুচরণ কাশীর মুখের নিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া ললিতার মাথাখানি একটা হাট দিয়া বলিলেন, তাহলে—বা মা, মেরি করিস নে—তোর জন্যে দুখি সবাই অপেক্ষা করে আছে।

অগত্যা ললিতাকে উঠিতে হইল। কিন্তু, বাইবার পূর্বে গিরীনের মুখের পানে সে যে গভীর কৃতজ্ঞদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, গিরীজ তাহা দেখিতে পাইল।

মিনিট-সন্দেহ পরে কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে পান দিবার খুজা করিয়া আর একবার বাহিরের দ্বারে নিঃশব্দ-পনক্ষেপে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গিরীম চলিয়া গিয়াছে। একাকী গুরুচরণ মোটা বালিশটা মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার মুদিত চকুর দুই পাশ বাহিয়া জল করিতেছে। এ যে অমল্যাক, ললিতা তাহা খুঁজিল। খুঁজিল বলিয়াই তাঁহার খান ভানিয়া মিল না, যেমন নিশেবে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমননি নিশেবে বাহির হইয়া গেল।—অনতিকাল পরে সে যখন শেখরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার নিজের চোখ দুটিও অজ্ঞতরে হলহল করিতেছিল। কালী ছিল না, সে সকলের আগে পাড়িতে গিয়া বলিয়াছিল, একাকী শেখর তাহার ঘরের মাঝখানে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি ললিতার অপেক্ষাতেই ছিল, মুখ তুলিয়া তাহার জলভাষাক্রান্ত চোখ দুটি লক্ষ্য করিল।

সে আট-নয় দিন ললিতাকে দেখিতে লা পাইয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সে তাহা তুলিয়া উব্বিয় হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি, কানচ নাকি?

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িল।

এই করণিনের একান্ত অঙ্গার্মনে শেখরের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাই সে কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া সহসা ললিতার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, সত্যিই কানচ যে! হ'লো কি?

ললিতা এবার নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কানিয়া ফেলিল।

যত পরিচ্ছেদ

নবীন রায় সমস্ত সুদ আসল কড়াক্রান্তি গণিয়া লইয়া বন্ধকী কাগজখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, বলি, টাকাটা দিলে কে হে?

গুরুচরণ নম্রভাবে কহিলে, সেটা জিজ্ঞেস করবেন মা দাদা, বলতে নিবেদ আছে।

টাকাটা ফেরত পাইয়া নবীন কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হন নাই, এটা আশাও করেন নাই, ইচ্ছাও করেন নাই। বরং বাড়িটা ভানিয়া ফেলিয়া কিরূপ নুতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, তাহাই তাবিত্তা রাবিত্তাছিলেন। শ্রম করিয়া বলিলেন, তা এখন নিবেদ ত হবেই। ভায়া, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। দোষ, টাকাটা কিরে চাওয়ার, নইলে কলিকাল বলেচে কেন!

গুরুচরণ অন্তস্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, সে কি কথা দাদা! আপনার টাকার অপটাই শোধ করেরি, কিন্তু আপনার দয়ার কণ ত শোধ করতে পারিনি।

নবীন হাসিলেন। তিনি পাকা লোক, এ-সকল কথা বিশ্বাস করিলে ওড় বেচিয়া এত টাকা করিতে পারিতেন না। বলিলেন, সে বলি সত্যিই ভাবতে ভায়া, তা হলে এমন করে শোধ করে দিতে না। না হয় একবার টাকাটাই চেয়েছিলাম, সেও তোমারই বৌতানের অসুখের জন্যে, আমার নিজের জন্যে কিছু নয়,—বলি কত সুদে বন্ধক রাখলে বাড়িটা?

গুরুচরণ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বন্ধক রাবিনি—সুদের কথাও কিছু হয়নি।

নবীন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, বল কি, শুধু-হাতে?

হী দাদা, একরকম তাই বটে। ছেলেটি বড় সৎ, বড় দয়ার শরীর।

ছেলেটি? ছেলেটি কে?

গুরুচরণ এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। যতটা বলিয়া ফেলিয়া ছিলেন এতটাও তাঁহার বলা উচিত ছিল না।

নবীন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, যখন নিবেদ আছে তখন কাজ নেই, কিন্তু

সংসারের অনেক জিনিসই সেখিচি বলে এইটুকু সাবধান করে দিই ভায়া, তিনি যেই হোন, এত ভাল করতে গিয়ে শেষকালে যেন ফ্যাসসে না ফেলেন।

গুরুচরণ সে-কথার আর জবাব না দিরা নমস্কার করিয়া কাগজখানি হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় প্রতি বৎসরই ছুবনেশ্বরী এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে ঘুরিয়া আসিতেন। তাহার অজীর্ণ রোগ ছিল, ইহাতে উপকার হইত। রোগ বেশী নয়। নবীন গুরুচরণের কাছে সেদিন কার্যোদ্ধারের জন্যই বাড়িইয়া বলিয়াছিলেন। যাই হোক, যাত্রার আয়োজন হইতেছিল।

সেদিন সকালবেলা একটা চামড়ার তোরঙ্গে শেখর তাহার আবশ্যকীয় শৌখিন জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল।

অন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, শেখরদা, তোমারা কাল যাবে, না?

শেখর তোরঙ্গ হাতে মুখ তুলিয়া বলিল, কালী, তোর সেজদিকে ডেকে দে, কি সঙ্গে নেবে-টেবে, এই সময়ে দিয়ে যাক। ললিতা প্রতি বৎসর যাত্রের সঙ্গে যাইত, এবারেও বাইবে তাহাই শেখর জানিত।

কালী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এবার সেজদি ত যাবে না!

কেন যাবে না?

কালী কহিল, বাঃ কি করে যাবে! মাঘ-ফাল্গুন মাসে গুর বিয়ে হবে, বাবা বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে।—শেখর নির্নিবন্ধে চোখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কালী বাড়ি ভিতরে যাহা গুলিয়াছিল উৎসাহের সহিত ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু বলেছেন বড় টাকা লাগে ভাল পাশুর চাই। বাবা আজও অফিসে যাবেন না, খেয়েদেয়ে কোথায় ছেলে দেখতে যাবেন; গিরীনবাবুও সঙ্গে যাবেন।

শেখর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল এবং কেন যে ললিতা আর আসিতে চাহে না তাহারও যেন কতকটা কারণ বুঝিতে পারিল।

কালী বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু খুব ভালমানুষ শেখরদা। মেজলির বিয়ের সময় আমাদের বাড়ি জ্যাঠামশায়ের কাছে বাঁধা ছিল ত, বাবা বলেছিলেন, আর দু'মাস-তিনমাস পরেই আমাদের সবাইকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হ'ত, তাই গিরীনবাবু টাকা দিলেন। কাল সব টাকা জ্যাঠামশায়কে বাবা ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেজদি বলছিল, আর আমাদের কোনও স্ত্রী নেই, সতি না শেখরদা?

প্রত্যুত্তরে শেখর কিছুই বলিতে পারিল না, তেমনিই চাহিয়া রহিল।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ শেখরদা?

এইবার শেখরের চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না বে। কালী, তোর সেজদিকে একবার শিগগির ডেকে দে, বল আমি ডাকচি, যা ছুটে যা।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শেখর খোলা তোরঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কেন্ দ্রব্যো তাহার প্রয়োজন, কেন্ দ্রব্যো প্রয়োজন নাই, সমস্তই এখন তাহার চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া গেল।

ডাক শুনিয়া ললিতা উপরে আসিয়া প্রথমে জানালার ঝাঁক দিয়া দেখিল, তাহার শেখরদা মেঝের উপর একদুটো মাটির দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার ঐ-বসন মুখের ভাব সে পূর্বে কখনও দেখে নাই। ললিতা আশ্চর্য হইল, ভয় পাইল। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে শেখর 'এসো' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ললিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডাকাইলে?

হ্যাঁ, বলিয়া শেখর কলকাল স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালের পাড়িটেই আমি মাকে নিয়ে পশ্চিমে যাবি, এবার কিরতে হয়ত মেরি হবে। এই চাবি নাও, তোমার খরচের টাকাখন্ডি ও-সেরাজের মধ্যেই রইল।

প্রতিলার ললিতাও সঙ্গে যায়। গন্তব্যে এই উপলক্ষে সে কি আনন্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছিল, এবার সে কাজটা শেষদা একা করিতেছে, খোলা তোরঙ্গের দিকে চাহিবারই ললিতার

তাহা মনে পড়িল।

শেখর তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, সাবধানে থেকো—আর যদি কোন কিছুর বিশেষ আবশ্যক হয়, দাদার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে চিঠি লিখো।

অতঃপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। এবার ললিতা সঙ্গে যাইবে না, শেখর তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার কারণটাও হয়ত শুনিয়াছে মনে করিয়া ললিতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ শেখর কহিল, আচ্ছা যাও এখন, আমাকে আবার এইগুলো শুদ্ধিয়ে নিতে হবে। বেলা হ'ল আজ একবার অফিসেও যেতে হবে।

ললিতা খোলা তোরঙ্গের সমুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, তুমি নান কর গে, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।

তাহলে ত ভালই হয়, বলিয়া শেখর চাবির গোছাটা ললিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার কি কি দরকার হয়, তা ভুলে যাওনি ত ?

ললিতা মাথা ঝুঁকাইয়া তোরঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল, সে-কথার কোন জবাব দিল না।

শেখর নীচে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কাশীর সমস্ত সংবাদই সত্য। গুরুচরণ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, সে কথাও সত্য। ললিতার পাত্র ছিন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে তাহাও সত্য। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নান করিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে নানাহার শেষ করিয়া অফিসের পোশাক পরিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল।

এই দুই ঘণ্টাকাল ললিতা কিছুই করে নাই, তোরঙ্গের একটা পাটির উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শেখরের পদশব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার দুই চোখ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু, শেখর তাহা দেখিয়াও দেখিল না, অফিসের পোশাক পরিতে পরিতে সহজভাবে বলিল, এখন পারবে না ললিতা, দুপুরবেলা এসে শুদ্ধিয়ে রেখো। বলিয়া প্রস্তুত হইয়া অফিসে চলিয়া গেল। সে ললিতার রাস্তা চোখের ছেঁড়ু ঠিক বুঝিয়াছিল, কিন্তু সব দিক বেশ করিয়া চিন্তা না করা পর্যন্ত আর কোন কথা বলিতে সাহস কবিল না।

সেদিন অপরাহ্নে মামাদের চা দিতে আসিয়া ললিতা সহসা জড়সড় হইয়া পড়িল। আজ শেখর বসিয়া ছিল। সে গুরুচরণবাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিল।

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া দু বাটি চা প্রস্তুত করিয়া গিরীন ও তাহার মামার সম্মুখে দিতেই গিরীন কহিল, শেখরবাবুকে চা দিলে না ললিতা ?

ললিতা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, শেখরদা চা খান না।

গিরীন আর কিছু বলিল না, ললিতার নিজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শেখর নিজে এটা খায় না, অগরে খায় তাহাও ইচ্ছা করে না।

চায়ের বাটি হাতে তুলিয়া লইয়া গুরুচরণ পাত্রের কথা পাড়িলেন। ছেলেটি বি. এ. পড়িতেছে, ইত্যাদি বিস্তারিত সূচ্যাদি করিয়া শেষে বলিলেন, অথচ আমাদের গিরীনের পছন্দ হয়নি। অবশ্য ছেলেটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নয় বটে, কিন্তু পুরুষমানুষের রূপ আর কোন কাজে লাগে, গুণ থাকলেই যথেষ্ট।

কোনমতে বিবাহটা হইয়া গেলেই গুরুচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

শেখরের সহিত গিরীনের এইমাত্র সামান্য পরিচয় হইয়াছিল। শেখর তাহার দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গিরীনবাবুর পছন্দ হলো না কেন ? ছেলেটি লেখাপড়া করছে, অবস্থাও ভাল,—এই ত সুপাত্র।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু সে ঠিক বুঝিয়াছিল কেন ইহার পছন্দ হয় নাই এবং কেন ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু, গিরীন সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে, পারিল না, তাহার মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ

হইল, শেখর তাহাও লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাকা, কাল মাকে নিয়ে পশ্চিমে চললুম, ঠিক সময়ে খবর দিতে যেন ভুলে যাবেন না।

গুরুচরণ বলিলেন, সে কি বাবা, তোমরাই যে আমার সব। তা ছাড়া, ললিতার মা উপস্থিত না থাকলে ত কোনও কাজই হতে পারবে না। কি বলিস মা ললিতা? বলিয়া হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, সে উঠে গেল কখন?

শেখর কহিল, কথা উঠতেই পালিয়েচে।

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালাবে বৈ কি,—হাজার হোক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে ত। বলিয়া সহসা একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মা আমার একাধারে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী! এমন মেয়ে বড় ভাগ্যে মেলে শেখরনাথ! কথাটা উচ্চারণ করিতেই তাঁর শীর্ণ কৃশ মুখের উপর গভীর স্নেহের এমন একটা স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াপাত হইল যে, গিরীন ও শেখর উভয়েই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে মনে মনে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চায়ের মজলিস হইতে নিঃশব্দে পলাইয়া আসিয়া ললিতা শেখরের ঘরে ঢুকিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের নীচে একটা তোরঙ্গ আনিয়া শেখরের গরম বস্ত্রগুলি পাট করিয়া শুছাইয়া রাখিতেছিল। শেখরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে নিবাক হইয়া রহিল। মকদ্দমাসংক্রান্ত হারিয়া মানুষ যে-রকম মুখ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আইসে, এ-বেলার মানুষকে যেন ও-বেলায় সহসা আর চিনিতে পারা যায় না এই একঘণ্টার মধ্যে তেমনি শেখরকে ললিতা যেন ঠিক চিনিতে পারিল না। তাহার মুখের উপর সর্বস্ব হারানোর সমস্ত চিহ্ন যেন কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

শেখর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্ছে ললিতা?

ললিতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা হাত লইয়া কঁদ-কঁদ হইয়া বলিল, কি হয়েছে শেখরদা?

কৈ, কিছুই হয়নি ত, বলিয়া শেখর জোর করিয়ায় একটু হাসিল। ললিতার করম্পর্শে তাহার মুখে কতকটা সজীবতা ফিরিয়া আসিল। সে নিকটস্থ একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সেই প্রশ্নই করিল, তোমার হচ্ছে কি?

ললিতা কহিল, মোটা ওভারকোটটা সঙ্গে দিতে ভুলেছিলুম, সেইটাই। . . . এসেচি।

শেখর শুনিতে লাগিল। ললিতা এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিল, গতবারে গাড়িতে তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, বড় কোট ত অনেকগুলোই ছিল, কিন্তু খুব মোটাসোটা একটাও ছিল না। তাই আমি ফিরে এসেই দোকানে মাগ দিয়ে এইটে তৈরী করিয়েছিলুম, বলিয়া সে খুব ভারী একটা ওভারকোট তুলিয়া আনিয়া শেখরের কাছে রাখিল।

শেখর হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, কৈ, আমাকে বলনি ত?

ললিতা হাসিয়া বলিল, তুমি 'বাবু' মানুষ, তোমাকে বললে কি এত মোটা কোট তৈরী করতে দিতে? তাই বলিনি, তৈরী করিয়ে তুলে রেখেছিলুম।—বলিয়া সেটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, ঠিক উপরেই রহিল, তোরঙ্গ খুললেই পাবে—শীত করলে গায়ে দিও ছুঁনা না যেন।

আচ্ছা, বলিয়া শেখর নির্নিমেধ চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, না, এমন হতেই পারে না।

কি হতে পারে না? গায়ে দেবে না?—শেখর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, সে-কথা নয়—ও অন্য কথা। আচ্ছা ললিতা, মার জিনিসপত্র গোছান হয়েছে কি না জানো?

ললিতা কহিল, জানি, দুপুরবেলা আমিই সে-সমস্ত ওছিয়ে দিয়েছি, বলিয়া সে আর একবার সমস্ত দ্রব্য তাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিতে লাগিল।

শেখর কলকাল চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ললিতা, আসচে

বহর আমার উপায় কি হবে বলতে পার?

ললিতা চোখ তুলিয়া বলিল, কেন?

কেন সে আমিই টের পাচ্ছি তাই, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের কথাটা চাপা দিবার জন্য শুকনুখে প্রফুরতা টানিয়া আনিয়া বলিল, কিন্তু পরের ঘরে বাবার আগে কোথায় কি আছে না আছে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে যেরো—নইলে দরকারের সময় কিছুই খুঁজে পাব না।

ললিতা রাগিয়া বলিল, যাও—

শেখর এতক্ষণে হাসিল, বলিল, যাও ত জানি, কিন্তু সত্যিই উপায় হবে কি? আমার শখ ত আছে বোল আনা, কিন্তু এক কড়ার শক্তি নেই। এ-সব কাজ চাকর দিয়েও হয় না—এখন থেকে দেখছি, তোমার আমার মত হতে হবে—এক কাপড় এক চাদর সঞ্চাল করে—যা হয় তাই হবে।

ললিতা চাবির গোছটা মেকের উপর ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শেখর চোঁচাইয়া বলিল, কাল সকালে একবার এসো।

ললিতা ওনিয়াও ওনিল না, দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় নামিয়া গেল। বাড়ি গিয়া দেখিল, ছাদের এক কোণে চাদের আলোয় বসিয়া আল্লাকালী একরাশ গাঁদাফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। ললিতা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, হিমে বসে কি করছিস কালী?

কালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, মালা গাঁথি—আজ রাত্তিরে আমার মেয়ের বিয়ে।

কৈ, আমাকে বলিস নি ত?

ঠিক ছিল না সেজদি। এখন বাবা পাঁজি দেখে বললেন, আজ রাত্তিরে ছাড়া আর এ-মাসে দিন নেই। মেয়ে বড় হয়েছে, আর রাখতে পারিনে, যেমন-তেমন করে বিদেয় করছি। সেজদি, দুটো টাকা দাও না, জলখাবার আনাই।—ললিতা হাসিয়া বলিল, টাকার বেলায় সেজদি। বা, আমান বলিশের নীচে আছে, নিগে যা। হী রে কালী, গাঁদাফুলে কি বিয়ে হয়?

কালী গম্ভীরভাবে বলিল, হয়। অন্য ফুল না গেলে হয়। আমি কতগুলো মেয়ে পার করলুম সেজদি। আমি সব জানি,—বলিয়া খাবার আনাইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে বলিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল।

খানিক পরে কালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর সকলকেই বলা হয়েছে শুধু শেখরদাকে বলা হয়নি—যাই, বলে আসি, নইলে তিনি দুঃখ করবেন, বলিয়া ও ও-বাড়ি চলিয়া গেল।

কালী পাকা গৃহিনী, সমস্ত কাজকর্মই সে সুশৃঙ্খলার করে। শেখরদাদাকে সংবাদ দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, তিনি একছড়া মালা চাইলেন। যাও না সেজদি, শিগগির করে নিয়ে এসো না। আমি ততক্ষণ এদিকে বন্দোবস্ত করি—লগ্ন শুরু হয়ে গেছে, আর সময় নেই।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি পারব না কালী, তুই দিয়ে আর।

আচ্ছা বাচ্চি। ওই বড় ছড়াটা দাও, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

ললিতা হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া কি ডাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসছি।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যাও সেজদি, আমার অনেক কাজ—মরবার কুরসত নেই।

তার মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গী দেখিয়া ললিতা হাসিয়া ফেলিল। একেবারে পাকা বুড়ী, বলিয়া হাসিয়া মালা লইয়া চলিয়া গেল। কব্যাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শেখর একমনে চিঠি লিখিতেছে। দোর খুলিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতেও শেখর টের পাইল না! তখন কলকাল চুল করিয়া থাকিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালাছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই চৌকির পিছনে বলিয়া পড়িল।

শেখর প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এই কালী! পরক্ষণেই খাড় ফিরিয়া দেখিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, ও কি করলে ললিতা!

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেখরের মুখের ভাবে ইতঃ শব্দিত হইয়া বলিল, কেন, কি?

শেখর পূর্ণমাত্রায় পাণ্ডীৰ্য বজায় রাখিয়া বলিল, জান না কি? কালীকে জিজ্ঞেস করে এসো, আজকের রাত্তিরে গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয়!

এখন ললিতা বুকিল। চকের নিম্নে তাহার সমস্ত মুখ ভীষণ লজ্জার রাজ্য হইয়া উঠিল, সে না, কখনো না,—কখনো না, বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘর হইরে বাহির হইয়া গেল।

শেখর ডাকিয়া বলিল, যেয়ো না ললিতা, শুনে যাও—বিশেষ কাজ আছে—

শেখরের ডাক তাহার কানে গেল বটে, কিন্তু তলিবে কে? কোথাও সে থামিতে পারিল না, সৌড়িয়া আশিয়া নিম্নের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একেবারে চোখ বুজিয়া বিছানায় গুইয়া পড়িল।

এই পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া সে শেখরের ঘনিষ্ঠ সবেবে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন এমন কথা শোনে নাই। একে ত গভীরপ্রকৃতি শেখর কখনই তাহাকে পরিহাস করিত না, করিলেও এতবড় লজ্জাকর পরিহাস যে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, ইহা সে ত কল্পনা করিতেও পারিত না। লজ্জায় সমুচিত হইয়া মিনিট-কুড়ি পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিয়া বলিল। অথচ, শেখরকে সে মনে মনে ভয় করিত, তিনি বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাই যাইবে কি না ইহাই ললিতা উঠিয়া বলিয়া ভাবিতেছিল। ও-বাড়ির খির গলা শোনা গেল, ললিতাদি কোথায় গা, ছোটখাবু একবার ডাকচেন—

ললিতা বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, যাজি, যাও। উপরে আসিয়া কবাট ফাঁক করিয়া দেখিল শেখর তখনও চিঠি লিখিতেছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কেন?

শেখর লিখিতে লিখিতে বলিল, কাছে এসো বলছি।

না, এখন থেকে বল।

শেখর মনে মনে হাসিয়া বলিল, হঠাৎ কি একটা কাজ করে ফেললে বল ত?

ললিতা কষ্টভাবে বলিল, যাও—আবার!

শেখর মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমার দোষ কি! তুমিই ত করে গেলে—

কিন্তু করিনি—তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর কহিল, সেইজন্যই ত ডেকে পাঠিয়েছি ললিতা! কাছে এসো, ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি অর্ধেকটা করে গেছ, সরে এসো, আমি সেটা সম্পূর্ণ করে দি।

ললিতা ঘরের অন্তরালে কলকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিল, সত্যি বলছি তোমাকে, ও-রকম ঠাট্টা করলে আর কোনদিন তোমার সামনে আসবো না—বলচি, ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া মাথাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, নিয়ে যাও।

তুমি এখন থেকে ছুঁড়ে দাও।

শেখর ছাড় নাড়িয়া বলিল, কাছে না এলে পাবে না।

তবে আমার কাজ নেই, বলিয়া ললিতা রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শেখর ঠেঁচাইয়া বলিল, কিন্তু অর্ধেকটা হয়ে থাকলো—

থাকে থাক, বলিয়া ললিতা যথার্থই রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নীচে গেল না। পূর্বদিকে খোলা ছাদের একান্তে গিয়া রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তখন সমুখের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং শীতের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার চারিমুক ভাসিয়া বাহিতেছিল। উপরে স্বচ্ছ নির্মল নীলাকাশ। সে একবার শেখরের ঘরের দিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ তরিয়া উর্ধ্বমুখে চাহিয়া রহিল এইবার তাহার চোখ ছালা করিয়া লজ্জায় অভিমানে দুই চোখ জলে ফরিয়া গেল। সে এত ছোট নহে যে, এ-সব কথাই তাৎপর্য সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রস্ত করিতে পারে না, তবে কেন তাহাকে এমন মর্মান্তিক উপহাস করা! সে যে কত তুচ্ছ, কত নীচে, এ-কথা বুঝিবার তাহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। সে ঠিক জানে, সে অনাথ এবং ১০-পায় বলিয়া তাহাকে সবাই আদর ও যত্ন করে—শেখরও করে, তাহার জননীও করেন। তাহার আপনায় বলিতে কেহ নাই, সত্যকার দায়িত্ব তাহার কন্ডারও উপর নির্ভর করে না বলিয়াই গিরীন্দ্র সম্পূর্ণ পর হইয়াও তথ্যকে উদ্ধার করিয়া দিবার কথা তুলিতে পারিয়াছেন।

ললিতা চোখ মুদ্রিয়া মনে মনে বলিল, এই কলিকাতার সমাজে তাহার মামার অবস্থা ত শেখরের কত নীচে, সে আবার সেই মামার আশ্রিত গলগ্রহ। ওদিকে সমান ঘরে শেখরের বিবাহের কথাবার্তা

চলিতেছে, দু'দিন আগেই হউক, পাছেই হউক, সেই ঘরেই একদিন হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষে নবীন রায় কত টাকা আদায় করিবেন, সে-সব আলোচনাও সে শেখরের জননীর কাছে শুনিয়াছে।

তবে কেন, তাহাকে হঠাৎ আজ এমন করিয়া শেখরদা অপমান করিয়া বলিল। এই সব কথা ললিতা সুমুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের মনে মগ্ন হইয়া আলোচনা করিতেছিল, সহসা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শেখর নিঃশব্দে হাসিতেছে। ইতিপূর্বে যে উপায়ে মালাটা সে শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে সেই গাঁদা ফুলের মালাটা তাহার নিজের গলায় ফিরায়া আসিয়াছে। কান্নায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু সে জোর করিয়া নিকুন্তস্বরে বলিল, কেন এমন করলে?

তুমি কবেছিলে কেন?

আমি কিছু করিনি, বলিয়াই সে মালাটা টান মারিয়া ছিড়িয়া ফেলিবার জন্য হাত দিয়াই হঠাৎ শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। আর ছিড়িয়া ফেলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কাদিয়া বলিল, আমার কেউ নেই বলেই ত তুমি এমন করে আমাকে অপমান করচ।

শেখর এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, ললিতার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। এ ত ছেলেমানুষের কথা নয়! কহিল, আমি অপমান করছি, না, তুমি আমাকে অপমান করছ?

ললিতা চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আমি কৈ অপমান করলুম?

শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল, এখন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে। আজকাল বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছিলে ললিতা, আমি বিদেশ যাবার আগে সেইটেই তোমার বন্ধ করে দিলাম।—বলিয়া চুপ করিল।

ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতলে দু'জনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নীচ হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শীখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেখর কহিল, আর হিমে দাঁড়িয়ে থেক না, নীচে যাও।

যাকি, বলিয়া ললিতা এতক্ষণ পরে তাহার পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রমাণ কবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করব বলে দিয়ে যাও।

শেখর হাসিল। একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বৃকের উপরে টানিয়া আনিয়া নত হইয়া তাহার অধরে শুষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, কিছুই বলে দিতে হবে না। ললিতা, আজ থেকে আপনিই বৃকতে পারবে।—ললিতার সর্বশরীর রোমাক্ষিত হইয়া কাদিয়া উঠিল।

সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি হঠাৎ তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ফেলেছি বলেই কি তুমি এ-রকম করলে?

শেখর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু স্থির করে উঠতে পারিনি আজ স্থির করেছি, কেন না, আজই ঠিক বৃকতে পেরেছি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ললিতা বলিল, কিন্তু তোমার বাবা ওনলে ভয়ানক রাগ করবেন, মা ওনলে দুঃখ করবেন—এ হবো না শে—

বাবা ওনলে রাগ করবেন সত্যি, কিন্তু মা খুব খুশী হবেন। সে যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে—এখন তুমিও ফেরাতে পার না, আমিও পারিনে। যাও, নীচে গিয়ে মাকে প্রণাম কর গে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস-তিনের পরে একদিন গুরুচরণ স্নানমুখে নবীন রায়ের ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর বসিবার উপক্রম করিতেই, তিনি চিৎকার করিয়া নিবেদন করিলেন, না না না, এখানে নয়—এ টোক্তির উপর বসো গিয়ে। আমি অসময়ে আবার স্নান করতে পারব না—বলি, জাত দিয়েচ না কি হে?

গুরুচরণ দূরে একটা টোক্তির উপর বসিয়া পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

দিন-চান্দক পূর্বে সে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিল, আজ সেই সংবাদটা নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া গোড়া হিন্দু নবীনের ক্ষতিগোচর হইয়াছে। নবীনের চোখ দিয়া অগ্নি-তুলিকা বাহির হইতে

লাগিল, কিন্তু গুরুচরণ তেমনি মৌন নতমুখে বসিয়া রহিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজটা করিয়া অবধি বাড়িতে কান্নাকাটি এবং অশান্তির পরিসীমা ছিল না।

নবীন পুনরায় তর্জন করিয়া উঠিলেন, বল না হে, সত্যি কি না?

গুরুচরণ জলভারাক্রান্ত দুই চক্ষু তুলিয়া বলিল, আরে, সত্যি।

কেন এমন কাজ করলে? তোমার মাইনে ও মোটে ষাটটি টাকা, তুমি—কোথেকে নবীন রায়েদ মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

গুরুচরণ চোখ মুছিয়া, কক্ষকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, জ্ঞান ছিল না দাদা। দুঃখের জ্বালায় গলতেই দড়ি দেবো, কি ব্রাহ্মজ্ঞানীই হ'বে, কিছুই যাওঁরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম, আত্মঘাতী না হলে ব্রাহ্মজ্ঞানীই হই, তাই ব্রাহ্মজ্ঞানীই হয়ে গেলুম।

গুরুচরণ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন চীৎকার করিয়া বলিলেন, বেশ করেচ, নিজেব গলায় দড়ি না দিতে পেরে ভাতের গলায় দড়ি টানিয়ে দিয়েছ—আজ্ঞা যাও, আর আমাদের সামনে কালামুখ বা'ব করো না, এখন গীরা-সব মস্ত্রী হয়েচেন, তাঁদের সঙ্গেই থাক গে—মেরোসেব হাড়ি-মুচির ঘাবে দেও গে যাও, বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

নবীন রাগে অভিমানে কি যে করিবেন প্রথমটা কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। গুরুচরণ হাতের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে, আর শীঘ্র মৃত্যুব্রমণে আসিবে, এ সম্ভাবনাও নাই—তাঁই নিখল আক্রোশে ছুটফট করিয়া আপাতত ভক্ত করিবার আর কোন ফন্দি বুদ্ধিয়া না পাইয়া, সেইদিনই মিস্ত্রী ডাকিয়া চামের যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া একটা মস্ত প্রাচীর তুলিয়া দিলেন।

এই সংবাদ বহুদূর-প্রবাসে বসিয়া ভুবনেশ্বরী শেখরের মুখে শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—শেখর, এ মতি-বুদ্ধি কে দেল তাকে?

মতি-বুদ্ধি কে দিয়েছিল শেখর তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল। সে উল্লেখ না করিয়া বলিল, কিন্তু মা, দু'দিন পাবে তোমরাই তো তাঁকে একঘরে করে রাখতে। এতগুলি মেয়ের বিয়ে তিনি কি করে দিচ্ছেন, আমি ও ভেবে পাইনে।

ভুবনেশ্বরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, কিছুই আটকে থাকে না শেখর। আর সেজন্য আগে থেকে জ্ঞাত দিতে হলে অনেককেই দিতে হয়। ভগবান যাদের সংসারে পাঠিয়েছেন, তিনিই তাদের ভার নিভেন।

শেখর চুপ করিয়া বহিল। ভুবনেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার লাধা ভায়েটাকে যদি সঙ্গে আনতুম, তা হলে যা হয় একটা উপায় আমাদের করে দিতে হতো—দিতামও। আমি ত জানিনে গুরুচরণ এই-সব মতলব করেই পাঠিয়ে দিলে না। আমি মনে করেছিলুম বুদ্ধি সত্যিই তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে—শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি লজ্জিতভাবে বলিল, বেশ ত মা, এখন বাড়ি গিয়ে তাই কর না কেন? সে ত আর ব্রাহ্ম হয়নি—তার মামাই হয়েছে—আর তিনিও কিছু তার যথার্থ আপনার কেউ ন'ন। ললিতার কেউ নেই বলেই তাঁর ঘরে মানস হচ্ছে।

ভুবনেশ্বরী ভাবিয়া বলিলেন, তা বটে, কিন্তু কর্তা এক রকমের মানুষ তিনি কিছুতেই রাজী হবেন না। হয়ত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেবেন না।

শেখরের নিজের মনেও এই আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে আর একমিনিটও তাহার বিদেশে থাকিবার ইচ্ছা রহিল না। দু-তিনদিন চিন্তিত অগ্রসর-মুখে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিল, আর ভাল লাগচে না মা, চল বাড়ি যাই।

ভুবনেশ্বরী ভৎসনাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই চল শেখর, আমারও কিছু ভাল লাগচে না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মাতাপুত্র উভয়েই দেখিলেন, ছাদের সেই যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া প্রাচীর উঠিয়াছে। গুরুচরণদের সহিত আর কোনও সম্পর্ক রাখা, এমন কি, মুখের আলাপ রাখাও যে কর্তার অভিপ্রেত নয়, তা কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়াই উভয়ে বুঝিলেন।

সন্ধ্যায় শেখরের স্নানের সময় মা উপস্থিত ছিলেন, দুই-একটা পরে বলিলেন, ওদের গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গেই ললিতার স্নানে দেখার কথাবার্তা হচ্ছে। আমি তা আগেই বুঝেছিলুম।

শেখর মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কে বললে?

ওর মামী। দুপুরবেলা কর্তা ঘুমোলে আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেছি। সেই অবধি কেঁসে কেঁসে চোখ মুখ তুলিয়ে ফেললে। কপকাল মৌন থাকিয়া তিনি নিজের চোখ দুটি আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কপাল, শেখর, কপাল। এই কপালের লেখা কেউ খতোতে পারে না—তার আর দোষ সিঁই বল! বাই হোক, গিরীন ছেলেটি ভাল, সদ্বিত্তিও আছে, ললিতার কষ্ট হবে না,—বলিয়া চুপ করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শেখর কোন কথাই বলিল না—মুখ নীচু করিয়া খাবারগুলো হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সেও উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যায় পর একটুখানি ঘুরিয়া আসিবার জন্য সে পথে বাহির হইয়াছিল। তখন গুরুচরণের বাহিরের ঘরে প্রাত্যহিক চা-পানের সভা বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত হাসি এবং কথাবার্তা চলিতেছিল। তথাকার কোলাহল শেখরের কানে বাইবামাত্র সে একবার ঘির হইয়া কি ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকিয়া সেই শব্দ অসুরণ করিয়া গুরুচরণের বাহিরের ঘরে আসিয়া পৌঁড়িল। তৎক্ষণাৎ কলরব থামিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

শেখর ফিরিয়া আসিয়াছিল এ সংবাদ ললিতা ছাড়া আর কেহ জানিত না। আজ গিরীন্দ্র এবং আরও একজন ভ্রমলোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিস্মিত-মুখে শেখরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং গিরীন মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। সর্বাপেক্ষা অধিক চৈতন্যেছিলেন গুরুচরণ নিজে, তাঁহার মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাঁহার হাতের কাছে বসিয়া ললিতা তখনও চা তৈরি করিতেছিল, একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

শেখর সরিয়া আসিয়া তত্পরোপদেশের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রশ্ন করিল এবং একধারে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, এ কি, একেবারে সমস্ত নিবে গেল যে!

গুরুচরণ মুদুকঠে বোধ করি আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন বোকা গেল না।

ভ্রমুর মনের ভাব শেখর বুঝিল, তাই সময় দিবার জন্য নিজেই কথা পড়িল। কাল সকালের গাড়িতে ফিরিয়া আসিবার কথা, জননীর রোগ উপশম হইবার কথা, পল্লিমের কথা, আরও কত কি সংবাদ অনর্গল বকিয়া গিয়া শেষে সেই অপরিচিত বৃকটির মুখের দিকে চাহিল।

গুরুচরণ এককণ্ঠে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিলেন, ছেলেটির পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের গিরীনের বন্ধু। এক জায়গায় বাড়ি, একত্রে লেখাপড়া শেখা, অতি সংক্ষেপে—শ্যামবাজারে থাকেন, তবুও আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্বত প্রায়ই এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যান।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিল, হী, খুব ভাল ছেলে। কতকগুলি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকা, আর সব খবর ভাল ত?

গুরুচরণ জবাব দিলেন না, মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শেখর উঠিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ কী-কীল ঘরে বলিয়া উঠিলেন, মাঝে মাঝে এসো বাবা, একেবারে যেন ত্যাগ করো না। সব কথা শুনে ত?—ওনটি বৈ কি, বলিয়া শেখর অন্যরের দিকে চলিয়া গেল।

তার পরেই ভিতর হইতে গৃহিণীর কল্লার শব্দ উঠিল, বাহিরে বসিয়া গুরুচরণ হেঁট মুখে কৌতুহল বুট দিয়া নিজের চোখের জল মুছিতে লাগিলেন এবং গিরীন অপরাধীর মত মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ললিতা পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

কিছুকাল পরে শেখর রন্ধাঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিতে গিয়া দেখিল, অন্ধকার কব্যাটের আড়ালে ললিতা পৌঁড়িয়া আছে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রশ্ন করিল এবং পৌঁড়িয়া উঠিয়া বৃকের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া মুহূর্তকাল নিশ্চয়ই কি যেন জ্ঞাপন করিয়া রহিল, তার পর গিচ্ছাইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?

কৈ, আমি ত চিঠি পাইনি—কি লিখেছিলে?

ললিতা বলিল, অনেক কথা। সে যাক। সব শুনেচ ত, এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল।

শেখর বিশ্বরের ঘরে কহিল, আমার হুকুম! আমার হুকুম কি হবে?

ললিতা শঙ্কিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

আমার ওপর, আর কার ওপর নিতে পারো?

তোমার ওপরেই বা দেব কেন? আর দিলেই বা তুমি ওনবে কেন? শেখরের কঠোর পতীর, ইবং করণ।

এবার ললিতা মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া, আর একবার কাছে সরিয়া আসিয়া কাদ-কাদ গলায় বলিল, বাও—এখন তোমার ডামাশা ভাল লাগছে না। পারো পড়ি, কি হবে বল? ভয়ে রাঙিরে আমার ঘুম হয় না।

ভয় কিসের?

কেন যা হোক। ভয় হবে না, তুমি কাছে নেই, মা কাছে নেই, মাঝে থেকে মামা কি-সব কাণ্ড করে বসলেন—এখন মা যদি আমাকে ঘরে নিতে না চান?

শেখর স্বপ্নকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে সত্যি, মা নিতে চাইবেন না। তোমার মামা অপরের কাছে অনেক টাকা নিয়েছেন, সে-কথা তিনি শুনেছেন। তা ছাড়া, এখন তোমরা ব্রাহ্ম, আমার হিন্দু।

আল্লাহ্‌রানী! এইসময়ে রান্নাঘর হইতে ডাক দিল, সেজদি, মা ডাকছেন।

ললিতা চুঁচাইয়া বলিল, যাচ্ছি, তার পর গলা খাট করিয়া বলিল, মামা যাই হোন, তুমি যা, আমিও তাই। মা তোমাকে যদি ফেলতে না পারেন, আমাকেও ফেলবেন না। আর গিন্নীবাবুর কাছে টাকা নেবার কথা বলচ—তা সে আমি কিরিরে দেব। আর স্বপের টাকা, দু'দিন আগেই হোক, নিছনেই হোক, দিতেই তা হবে।

শেখর প্রস্থ করিল, অত টাকা পাবে কোথায়?

ললিতা শেখরের মুখের পানে একটিবার চোখ তুলিয়া মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, জান না, মেয়েমানুষ কোথায় টাকা পায়? আমিও সেইখানে পাব।

এতকাল শেখর সংযত হইয়া কথা করিতে থাকিলেও ভিতরে পুড়িতেছিল, এবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার মামা তোমাকে বিক্রি করে ফেলেছেন যে!

ললিতা অন্ধকারে শেখরের মুখের ভাব দেখিতে পাইল না, কিন্তু কঠকট পরিবর্তন টের পাইল। সে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, ও-সব মিছে কথা। আমার মামার মত মানুষ সংসারে নেই—তাকে তুমি ঠাট্টা করো না। তাঁর দুখে-কষ্ট তুমি না জানতে পার, কিন্তু পৃথিবীসুখ লোক জানে, বলিয়া একবার ঢোক গিলিয়া, একবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, তা ছাড়া তিনি টাকা নিয়েছেন, আমার বিয়ে হবার পরে, সুতরাং আমাকে বিক্রি করবার অধিকার তাঁর নেই, বিক্রিও করেন নি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি, তুমি ইচ্ছে করলে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রি করে ফেলতে পার কটে!—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সে রাতে বহুকাল পর্যন্ত শেখর বিছানের মত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেছিল, সেদিনকার এককোঁটা ললিতা এত কথা লিখিল কিরূপে... এমন নির্লজ্জ মুখরার মত তাহার মুখের উপর কথা কহিল কি করিয়া?

আজ সে ললিতার ব্যবহারে সত্যি অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, এই ক্রোধের যথার্থ হেতুটা কি, এ যদি শাস্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত রাগ ললিতার উপরে নহে, তাহা সম্পূর্ণ নিজের উপরেই।

ললিতাকে ছাড়িয়া এই করটা মাসের প্রবাস-বাসকালে সে নিজের কলনার নিজেকে আশঙ্ক করিয়া

শুধু কালনিক সুখ-সুখ লাভ-কতিই খতাইয়া দেখিত। কিন্তু ললিতা আজ যে তাহার জীবনের কতখানি, ভবিষ্যতের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত, তাহার অবর্তমানে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন, কত দুঃখকর, বিছানায় শুইয়া এই কথাই সে বার বার আলোচনা করিতে লাগিল। ললিতা শিশুকাল হইতে নিজেদের সংসারে মিশিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া আর সে সংসারের ভিতরে, বাপ-মাতা ভাই-বোনের মাঝখানে নামাইয়া আনিয়া দেখে নাই, দেখিবার কথাও মনে করে নাই। ললিতাকে হয়ত পাওয়া যাইবে না, পিতা-মাতা এ-বিবাহে সম্মতি দিবেন না, হয়ত সে অপার কাহারও হইবে,—দুশ্চিন্তা তাহার বরাবর এই ধার বহিয়াই চলিয়াছিল তাই বিদেশে যাইবার পূর্বের রাতে জোর করিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সে এইদিকের ভাঙ্গনটার মুখের বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিল।

প্রবাসে থাকিয়া গুরুচরণের ধর্মমত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া, শুনিয়া সে ব্যাকুল হইয়া আইনিশি এই চিন্তাই কাঁদিয়াছিল, পাছে ললিতাকে হারাইতে হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক, ভাবনার এই দিকটাই তাহার পরিচিত ছিল, আজ ললিতার স্পষ্ট কথা এইদিকটা সম্বোধন করিয়া দিয়া ভাঙ্গনার ধারা একেবারে উলটা প্রোতে বহাইয়া দিয়া গেল। তখন চিন্তা ছিল, পাছে না পাওয়া যায়, এখন ভাবনা হইল, পাছে না ছাড়া যায়।

শ্যামবাজারের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহারও অত টাকা দিতে শেষ পর্যন্ত লিছাইয়া দীড়াইলেন। শেখরের জননীও মেয়েটি মনঃপূত হইল না। সূতরাং এই দায় হইতে শেখর আপাততঃ অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নবীন রায় দশ-বিশ হাজারের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং সেপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়াও ছিলেন না।

শেখর ভাবিতেছিল, কি করা যায়। সে-রাত্রির সেই কাজটা যে এতবড় গুরুতব হইয়া উঠিলে, ললিতা যে এমন অসম্পূর্ণে বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহার সত্যিই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মতঃ কোন কারণেই ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না, সেদিন এত কথা শেখর ভাবিয়া দেখে নাই। যদিও নিজের মুখের উচ্চারণ করিয়াছিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন তুমিও ফিরাইতে পার না, আমিও না, কিন্তু তখন, আজ যেমন করিয়া সে সমস্তটা ভাবিয়া দেখিতেছে, তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার শক্তিও ছিল না, বোধ করি অবসরও ছিল না।

তখন মাথার উপর চাদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল, শ্রিয়তমার কক্সপন্দন নিজের বুক পাতিয়া প্রথম অনুভবের মোহ ছিল, এবং প্রশমীবা বাহ্যকে অধরসুখা বলিয়াছেন, তাহাই পান করার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ এবং সংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই অর্থলোলুপ পিতার কল্পমূর্তি চোখের উপর জাগিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিল, মা ত ললিতাকে স্নেহ করেন, তখন তাহাকে সম্মত করানো কঠিন হইবে না, এবং দাদাকে দিয়া পিতাকে কোনমতে কোমল করিয়া আনিতে পারিলে, শেষ পর্যন্ত হয়ত কাজটা হইয়াই যাইবে। তা ছাড়া, গুরুচরণ এইভাবে তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের আশার পথটা পাথর দিয়া এমনভাবে আঁটিয়া বন্ধ করেন নাই। এখন যে বিধাতাপুরুষ নিজে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছেন।

বস্তুত শেখরের চিন্তা করিবার বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। সে নিশ্চয় বুঝিতেছিল, পিতাকে সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, জননীকে সম্মত করানোও সম্ভব নহে। এ-কথা যে আর মুখে আনিবাকও পথ নাই।

শেখর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আর একবার অক্ষুণ্ণে আবৃত্তি করিল, কি করা যায়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত, তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে—একবার যাহা সে নিজের ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোনমতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে, সে শেখরের ধর্মপত্নী, তাই আজ সম্ভার অঙ্কুরে অসম্পোকে বৃকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ তুলিয়া অমন করিয়া দীড়াইতে পারিয়াছিল।

পিন্নীদের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা শুরু হইয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাকে ত সম্মত করাইতে পারিবে। আর ত সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। শেখরের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সত্যি ত! সে ত শুধু মালা-বদল করিয়াই কান্ড হয় নাই, তাহাকে বৃকের

উপর টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুষন করিয়াছিল। ললিতা বাধা দেয় নাই—সেই নাই বলিয়াই দেয় নাই—ইহাতে তাহার অধিকার আছে বলিয়াই দেয় নাই, এখন এই ব্যবহারের জবাব সে কার কাছে কি দিবে?

শিতামাতার অমতে ললিতার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু গিন্নীর সহিত ললিতার বিবাহ না হইবার হেতু প্রকাশ পাইবার পর ঘরে-বাহিরে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দশম পরিচ্ছেদ

অসম্ভব বলিয়া শেখর ললিতার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম ক'টা দিন সে মনে মনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে হঠাৎ সে আসিয়া উপস্থিত হয়, পাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, পাছে এই সব লইয়া লোকের কাছে ভাববিদ্বিহি করিতে হয়। কিন্তু কেহই তাহার কৈফিয়ত চাইল না, কোন কথা প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিংবা সে-বাড়ি হইতে এ-বাড়িতে কেহ আসা-যাওয়া পর্যন্ত করিল না। শেখরের ঘরের সমুখে যে খোলা ছাদটা ছিল, তাহার উপরে দাঁড়াইলে ললিতাদের ছাদের সবটুকু দেখা যাইত; পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে সে এই ছাদটায় পর্যন্ত দাঁড়াইত না। কিন্তু যখন নির্বিঘ্নে একমাস কাটিয়া গেল, তখন সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, হাজার হোক মেয়েমানুষের লক্ষ্যশরম আছে, এ-সকল ব্যাপার সে প্রকাশ করিতেই পারে না। সে শুনিয়াছিল, ইহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চাহে না, একথা সে বিশ্বাস করিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাহাদের দেহে এই দুর্বলতা, 'নিঃশব্দ বলিমা' সে মনে মনে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিল। অথচ শাস্তি পাওয়া যায় না কেন? যখন হইতে সে বুঝিল আর ভয় নাই, তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব ব্যাধায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? বহিয়া বহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় ঝাঁপিয়া উঠে কেন? তবে ত ললিতা কোন কথাই বলিবে না—আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় পর্যন্ত মৌন হইয়া থাকিবে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে-বাহিরে তাহার এমন করিয়া আশ্রয় জুলিয়া উঠে কেন?

পূর্বে সে স্বাক্ষার সময় বেড়াইতে বাহির না হইয়া সুমুখের খোলা ছাদটার উপর পদচারণা করিত, আজও তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু একটি দিনও ও-বাড়ির কাছাকাছে ছাদে বেধিতে পাইল না। শুধু একদিন অম্বাকালী কি করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চোখ নামাইয়া ফেলিল এবং শেখর তাহাকে ডাকিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই অম্বা হইয়া গেল। শেখর মনে মনে বুঝিল, তাহারা যে পথ বন্ধ করিয়া প্রাচীর ভুলিয়া দিয়াছে, ইহার অর্থ এ একফোটা . . . দী পর্যন্ত জানিয়াছে।

আরও একমাস গত হইল।

একদিন ভুবনেশ্বরী কথায় কথায় বলিলেন, এর মধ্যে তুই ললিতাটাকে দেখেচিস শেখর?

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না কেন?

মা বলিলেন, প্রায় দু'মাস পরে কাল তাকে ছাদে পেয়ে ডাকলুম—মেয়েটা আমার যেন আর-এক রকমের হয়ে গেছে। রোগা, মুখখানি শুকনো, যেন কত বয়স হয়েছে। এমনি গম্ভীর, কার সাধা দেখে বলে চোন্দ বছরের মেয়ে—তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িত। হাত দিয়, মুছিয়া ফেলিয়া ভায়ী গলায় বলিলেন, পরনের কাপড় যিনি ময়লা, আঁচলের কাছে খানিকটা সেলাই-করা। জিজ্ঞেস করলুম, তোর কাপড় নেই মা? বললে ত আছে, কিন্তু, বিশ্বাস হয় না। কোন্‌দিনই সে ওর মামার পেওয়া কাপড় পরে না, আমিই দিই, আমিও ত ছ-সাত মাস কিছু দিইনি। তিনি আর বলিতে পারিলেন না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন—ললিতাকে যথার্থই তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসিতেন।

শেখর আর-এক দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আমি ছাড়া কোনদিন সে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না। অসময়ে কিমে পেলেও বাড়িতে মুখ ফুটে বলতেও পারে না,—সেও আমি—এ আমার কাছে খুরে বেড়াতো—আমি তার মুখ দেখলেই টের পেতুম। আমার সেই কথাই মনে হয় শেখর, হয়ত মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে কে . . . কেউ তাকে বোকেও না, জিজ্ঞেসও করে না। আমাকে ত শুধু সে

মা বলেই ডাকে না, মায়ের মত ভালও বাসে যে।

শেখর সাহস করিয়া মায়ের মুখের নিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না। বেশিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চাহিয়া থাকিয়াই কহিল, বেশ ত মা, কি তার দরকার ডেকে জিজ্ঞেস করে দাও না কেন?

নেবে কেন? উনি যাওয়া-আসার পথটা পর্বত বন্ধ করে নিলেন। অঝিই বা নিতে যাবো কোন মুখে? ঠাকুরপো দুখের ছালায় না বুকে যেন একটা অন্যায় করেচেন, আমরা আপনার লোকের মত কোথায় একটা প্রারম্ভিত-প্রারম্ভিত করিয়ে ঢেকে দেব, তা নয়, একেবারে পর করে নিলুম। আর তাও বলি, এর পাঁড়াপাঁড়িতেই সে জাত নিয়ে ফেলেছে। কেবল তাগালা, কেবল তাগালা—মনের খেয়ান মানুষ সব করতে পারে। বরং আমি ত বলি, ঠাকুরপো ভালই করেছেন। ঐ গিরীন ছেলেটি আমাদের চেয়ে তাঁর চেয়ে বেশী আপনার, তার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটা সুখে থাকবে তা আমি বলছি। ওনটি, আসচে মাসেই হবে।

হঠাৎ শেখর মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আসচে মাসেই হবে নাকি?

তাই ত ওনি।

শেখর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

মা কিছুকণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ললিতার মুখে তনুলাম, ওর মামার দেহটাও নাকি আজকাল ভাল নেই। না থাকবারই কথা। একে তার নিজের মনের সুখ নেই, তাতে বাড়িতে নিত্য কল্লাকাটি—এক মিনিটের তরেও ও-বাড়িতে বস্তু নেই।

শেখর চুপ করিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল—সে ললিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

এই গলিটায় দুখানা গাড়ির বহুশ্রেণে যাতায়াতের হান হয় না। একখানা গাড়ি খুব একপাশে বেসিয়া না দাঁড়াইলে আর একটা যাইতে পারে না। দিন-দশেক পরে শেখরের অফিস-গাড়ি গুরুচরণের বাটীর সমুখে বাধা পাইয়া স্থির হইল। শেখর অফিস হইতে ফিরিতেছিল, নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ডাক্তার আসিয়াছেন।

সে কিছুদিন পূর্বে মায়ের কাছে শুনিয়াছিল গুরুচরণের শরীর ভাল নাই। তাই মনে করিয়া আর বাড়ি গেল না, সোজা গুরুচরণের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই বটে। গুরুচরণ নিজীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, একপাশে ললিতা এবং গিরীন শুক্মুখে বসিয়া আছে, সমুখে চোকির উপর বসিয়া ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিতেছেন।

গুরুচরণ অশ্রুট-বরে বসিতে বলিলেন, ললিতা মাথায় আঁচলটা আরো একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ডাক্তার পাড়ার লোক, শেখরকে চিনিভেন। রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। গিরীন লিছনে আসিয়া টাকা দিয়া ডাক্তার বিদায় করিবার সময়, তিনি বিশেষ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, রোগ এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এই সময়ে বায়ু-পরিবর্তনের নিত্যম আবশ্যক।

ডাক্তার চলিয়া গেলে উভয়েই আর একবার গুরুচরণের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ললিতা ইশারা করিয়া গিরীনকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া দিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল, শেখর সুমুখের চোকির বসিয়া শুক্ম হইয়া গুরুচরণের নিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ইতিপূর্বে ওনিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন, শেখরের পুনরাগমন জানিতে পারিলেন না।

খানিককণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেখর উঠিয়া গেল, তখনও ললিতা ও গিরীন তেমন চুপি চুপি কথাবার্তা কহিতেছিল, তাহাকে কেহ বসিতে বলিল না, আসিতে বলিল না, একটা কথা পর্বত কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না।

আজ সে শিশুর বুকিয়া আসিল, ললিতা তাহাকে তাহার কঠিন দায় হইতে তিরসিনের মত মুক্তি দিয়াছে—এখন সে শিরতরে হাঁক কেঁদিয়া বাঁচুক—আর শঙ্কা নাই, আর ললিতা তাহাকে জড়াইবে না।

ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে সহস্রবার মনে পড়িল, আজ সে নিজের জোখে দেখিয়া আসিয়াছে গিরীমই ও-বাড়ির পরম বন্ধু সকলের আপা-ভরসা এবং ললিতার ভবিষ্যতের আশ্রয়। সে কেহ নহে, এমন বিশেষের সিনেও ললিতা তাহার একটি মুখের পরামর্শেরও আর প্রত্যাশী নহে।

সে সহসা 'উঃ'—বলিয়া একটা পলীখাটা আরাধ-চৌকির উপর খাড় ঝুঁকিয়া বসিয়া পড়িল। ললিতা তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল যেম সম্পূর্ণ পর— একেবারে অপরিস্ফুট। আবার তাহারই চোখের সুমুখে গিরীমকে আড়ালে ডাকিয়া কত-না পরাকর্শ! অথচ এই লোকটিরই অভিভাবকতায় একদিন তাকেই যিরেটার সেঁটিতে পর্বত বহিতে দেখে নাই।

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মায়ের কঠোর শোনা গেল—তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন, কৈ রে, এখনও হাতমুখ ধুসনি—সন্ধ্যা হয় যে।

শেখর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাহার মুখের উপর মায়ের দৃষ্টি না পড়ে, এইভাবে খাড় ফিরাইয়া রাখিয়া ডাড়াডাড়ি নিচে নামিয়া গেল।

এই কয়টা দিন অনেক কথাই অনেক রকমের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অনুকূল আনাগোনা করিয়াছে, শুধু একটা কথা সে ভাবিয়া দেখিত না, বস্তুত সোম কোনদিকে। একটি আশার কথা সে আজ পর্যন্ত তাহাকে বলে নাই, কিংবা তাহাকে বলিবারও সুযোগ দেয় নাই। বরক, পাছে প্রকল পার, সে কোনরূপ দাবী করিয়া যবে, এই ভয়ে কাঠ হইয়া ছিল। তথানি, সর্বপ্রকারের অপরাধ একা ললিতার মাথায় ঢুকিয়া দিয়াই সে তাহার বিচার করিতেছিল এবং নিজের হিসেস, ক্রোধে, অতিমানে, অপমানে পুড়িয়া মরিভেছিল। বোধ করি, এমনি করিয়াই সংসারের সকল পুরুষ বিচার করে এবং এমনি করিয়াই দণ্ড হয়।

পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সাত দিন কাটিয়াছে, আজও সন্ধ্যার পর নিস্তরু ঘরের মধ্যে সেই আশুন জ্বালিয়া দিয়াই বসিয়াছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই তাহার হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল। কালীর হাত ধরিয়া ললিতা ঘরে ঢুকিয়া নীচে কালেক্টরের উপর স্থির হইয়া বসিল। কালী বলিল, শেখরশা, আমরা দুজনে তোমাকে প্রশাম করতে এসেছি—কাল আমরা চলে যাব।

শেখর কথা কহিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

কালী বলিল, অনেক সোম-অপরাধ তোমার পায়ের আয়রা করেচি শেখরশা, সে-সব ভুলে যেয়ো।

শেখর বুকিল, ইহার একটি কথাও কালীর নিজের মতে, সে শেবানো কথা বলিতেছে মাত্র।

জিজ্ঞাসা করিল, কাল কোথায় থাকে তোমরা?

পশ্চিমে। বাবাকে নিয়ে আমরা সবাই মুসের যাব—সেখানে শিরীনবাবুর বাড়ি আছে। তিনি ভাল হলেও আর আমাদের আসা হবে না, ডাক্তার বলেছেন, এ-মেশ বাবার সহ্য হবে না।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

একটু ভাল, বলিয়া কালী আঁচলের তিতর হইতে কয়েক ছোড়া কাপড় বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, জ্যাঠাইয়া আমাদের কিনে দিয়েছেন।

ললিতা এককণ চুপ করিয়া ছিল, উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর একটি চাবি রাখিয়া দিয়া বলিল, আলমারির এই চাবিটা এতদিন আমার কাছেই ছিল, একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু টাকাকাড়ি ওতে আর নেই, সমস্ত খরচ হয়ে গেছে।

শেখর চুপ করিয়া রহিল।

কালী বলিল, চল সেজনি, রাত্তির হচ্ছে।

ললিতা কিছু বলিবার পূর্বেই এবার শেখর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, কালী, নীচে থেকে আমার জন্যে দুটো পান নিয়ে এসে ত ভাই।

ললিতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুই বোস কালী, আমি এনে দিচ্ছি, বলিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। খানিক পরে পান আনিয়া কালীর হাতে দিল, সে শেখরকে মিয়া জামিল।

পান হাতে লইয়া শেখর নিস্তরু হইয়া বসিয়া রহিল।

চলমুম শেখরশা, বলিয়া কালী পায়ের কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রশাম করিল। ললিতা বেখানে

দাঁড়িয়াছিল, সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শেখর তাহার ভালমন্দ ও আত্মমৰ্যাদা লইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুরমুখে, বিহ্বল হতবুদ্ধির মত ভ্রূক হইয়া বসিয়া রহিল। সে আসিল, যাহা বলিবার ছিল বলিয়া চিরদিনের মত বিদায় লইয়া গেল, কিন্তু শেখরের কিছুই বলা হইল না। যেন, বলিবার কথা তাহার ছিল না, এইভাবে সমস্ত সময়টুকু কাটিয়া গেল। ললিতা কালীকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছিল ; কারণ, সে চাহে না কোন কথা উঠে, ইহাও সে মনে মনে বুঝিল। তাহার পরে, তাহার সর্বশরীর ঝিমঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে উঠিয়া গিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুরুচরণের ভাস্মা দেহ মুসেরের জলহাওয়াতেও আর জোড়া লাগিল না। বৎসর-খানেক পরেই তিনি দুঃখের বোঝা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গিরীন যথাথই তাঁহাকে অভিশয় ভালবাসিয়াছিল এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাহার যথাসাধ্য করিয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি সম্ভল-কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে যেন কোনদিন পর না হইয়া যায় এবং এই গভীর বন্ধুত্ব যেন নিকট আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি ইহা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, অসুখ-বিসৃথের সময় হইল না, কিন্তু পরলোকে বসিয়া যেন দেখিতে পান। গিরীন তখন সানন্দে এবং সর্বাঙ্গঃকরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

গুরুচরণের কলিকাতার বাটীতে যে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহার মুখে ভুবনেশ্বরী মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতেন, গুরুচরণের মৃত্যুসংবাদ তাহারাই দিয়াছিল।

তাহার পর এ-বাড়িতে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। নবীন রায় হঠাৎ মারা গেলেন।

ভুবনেশ্বরী শোকে-দুঃখে পাগলের মত হইয়া বড়বধুর হাতে সংসার সঁপিয়া দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আগামী বৎসর শেখরের বিয়ের সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে তিনি আসিয়া বিবাহ দিয়া যাইবেন।

বিবাহের সম্বন্ধ নবীন রায় নিজেই স্থির করিয়াছিলেন। এবং পূর্বেই হইয়া যাইত, শুধু তাঁহার মৃত্যু হওয়াতেই এক বৎসর স্থগিত ছিল। কন্যাপক্ষের আর বিলম্ব করা চলে না, তাই তাহারা কাল আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিল। এই মাসেই বিবাহ। আজ শেখর জননীকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। আলমারি হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া তোরঙ্গ সাজাইতে গিয়া অনেকদিন পরে তাহার ললিতার কথা মনে পড়িল—সব সে-ই করিত।

তিনি বৎসরের অধিক হইল চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদই সে জানে না। জানিবার চেষ্টাও করে নাই, বোধ করি, ইচ্ছাও ছিল না। ললিতার উপরে ক্রমশঃ তাহার একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সহসা ইচ্ছা করিল, যদি কোনমতে একটা খবর পাওয়া যায়—সে কেমন আছে। অবশ্য ভাল থাকিবারই কথা, কারণ গিরীনের সঙ্গতি আছে, তাহা সে জানিত, তথ্যপি সে শুনিতে ইচ্ছা করে, কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহার কাছে কেমন আছে—এই সব।

ও-বাড়ির ভাড়াটিয়ারাও আর নাই, মাস-দুই হইল বাড়ি খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শেখর একবার ভাবিল, চাকর বাপকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কারণ তাঁহার গিরীনের সংবাদ নিশ্চয় রাখেন। কণকালের জন্য ত্যোৎস গছানো স্থগিত রাখিয়া সে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া এই সব ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পুরাতন দাসী কছিল, ছোটবাবু, কালীর মা একবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শেখর মুখ কিরহিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, কোন্ কালীর মা?

দাসী হাত দিয়া গুরুচরণের বাড়িটা দেখাইয়া বলিল, আমাদের কালীর মা ছোটবাবু, তাঁরা কাল রাত্তিরে ফিরে এসেছেন যে।

চল বাড়ি, বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, সে বাড়িতে পা দিতেই বুকভাঙ্গা কন্নার রোল উঠিল। বিধবা-

বেশখারিশী গুরুচরণের স্ত্রীর কাছে গিয়া সে মাটিতেই বসিয়া পড়িল এবং কৌচাচর খুঁট দিয়া নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল। ও শু গুরুচরণের জন্য নহে, সে নিজের পিতার শোকের আর একবার অভিজুত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইলে ললিতা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে গলার আঁচল দিয়া তাহাকে প্রশান করিল, এবং কণকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শেখর সপ্তদশবর্ষীয়া পরস্ত্রীর পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে বা ডাকিয়া কথা কহিতে পারিল না। তথাপি আড়চোখে যতটা সে দেখিতে পাইয়াছিল, মনে হইল, ললিতা যেন আরও বড় হইয়াছে এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

অনেক কালাকাটির পরে গুরুচরণের বিধবা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, এই বাড়িটা তিনি বিক্রয় করিয়া মুসুরে জামাইয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। বাড়িটা বর্ধমান হইতে শেখরের পিতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন উপযুক্ত মূল্যে তাহারাই ক্রয় করিলে হই। একরকম নিজেদেরই থাকিবে, তাহার নিজেরও কোনরূপ ক্রেশ বোধ হইবে না এবং ভবিষ্যতে কখন তিনি এদেশে আসিলে, দুই-একদিন বাস করিয়া যাইতেও পারিবেন—এই-সব। শেখর, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার যথাসাধ্য করিবে বলায় তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন, দিদি কি এর মধ্যে আসবেন না শেখর?

শেখর জানাইল, আজ রাত্রেই তাঁকে সে আনিতে যাইবে। অতঃপর তিনি একটি একটি করিয়া অন্যান্য সংবাদ জানিয়া লইলেন—শেখরের কবে বিবাহ, কোথায়, কত হাজাব, কত অলঙ্কার, নবীন রায় কি করিয়া মারা গেলেন, দিদি কি করিলে ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন এবং শুনিলেন।

শেখর যখন চটি পাইল, তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। এই সময় গিরীন্দ্র উপর হইতে নানিয়া বোধ করি তাহার দিদির বাটিতে গেল। গুরুচরণের বিধবা দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই শেখরনাথ? এমন ছেলে সংসারে আর হয় না।

শেখরের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহা সে জানাইল এবং আলাপ আছে বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাহিরের বসিবার ঘরের সুমুখে আসিয়া তাহাকে সহসা থামিতে হইল।

অঙ্ককার দরজার আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, শোনো, মাকে কি আজই আনতে যাবে?

শেখর বলিল, হাঁ।

তিনি কি বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছেন?

হাঁ, প্রায় পাগলের মত হয়ে ছিলেন।

তোমার শরীর কেমন আছে?

ভাল আছে, বলিয়া শেখর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া তাহার আপাদমস্তক লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। ললিতার কাছাকাছি দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নিজের দেহটাও যেন অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, এমন মনে হইতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে যেমন-তেমন করিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তখনও গাড়ির বিলম্ব আছে জানিয়া, আর একবার শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে শপথ করিয়া সে ছদ্ময়ের রক্তে রক্তে ঘৃণার দাবানল জ্বালিয়া দিল। দাহনের যাতনায় সে অত্যাধিক মনে মনে অকথ্য ভাবায় তিরস্কার করিল, এমন কি, কুলটা পর্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ করিল না। তখন কথায় কথায় গুরুচরণের স্ত্রী বলিয়াছিলেন, এ শু সুখের বিয়ে নয়, তাই শেষ পর্যন্ত কারো মনে ছিল না, নইলে ললিতা তখন তোমাদের সকলকেই সংবাদ দিতে বলেছিল। ললিতার এই স্পর্ধাটা যেন সমস্ত আত্মনের উপরেও শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেখর মাকে লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার বিবাহের দশ-বারো দিন বিলম্ব ছিল।

দিন-তিনের পরে, একদিন সকালে ললিতা শেখরের মায়ের কাছে বসিয়া একটা ডালায় কি কতকগুলো তুলিতেছিল। শেখর জানিত না, তাই কি একটা কান্ডে 'মা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ

খবরত খহিয়া দাঁড়াইল। ললিতা মুখ নীচু করিয়া কাজ করিতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে?

সে যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা তুলিয়া গিয়া, না, এখন থাক, বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ললিতার মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার হাত দুইটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহার হাত সম্পূর্ণ গিরাভরণ না হইলেও দু'গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। শেখর মনে মনে কুর হসি হাসিয়া বলিল, এ আর এক রকমের ভড়ং। গিরীন সজতিপন্ন তাহা সে জানিত, তাহার পত্নীর হাত এরাগ অলঙ্কারশূন্য। হইবার কোন সজত হেতু সে খুজিয়া পাইল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতেছিল, ললিতাও সেই সিঁড়িতে উপরে উঠিতেছিল, একপাশে বেসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শেখর নিকটে আসিতেই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত মৃদুচুটে বলিল, তোমাকে একটা কথা বলবার আছে।

শেখর একমুহূর্ত্ত স্থির হইয়া বিশ্বয়ের স্বরে বলিল, কাকে? আমাকে?

ললিতা তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, হাঁ তোমাকে।

আমার সঙ্গে আবার কি কথা! বলিয়া শেখর পূর্বাপেক্ষা দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে শেখর তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া সেইদিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিল, নিরতিশয় বিশ্বাসের সহিত চোখ তুলিয়া দেখিল, গিরীন প্রবেশ করিতেছে। গিরীন নমস্কার করিয়া নিকটে চৌকি টানিয়া লইয়া লইয়া বসিল। শেখর প্রতি-নমস্কার করিয়া সংবাদপত্রটা একপাশে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসুস্বরে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চোখের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু, আলাপ ছিল না এবং সে-পক্ষে আজ পর্যন্ত দু'জনের কেহই কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

গিরীন একেবারেই কাজের কথা পাড়িল। বলিল, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি। আমার শাওড়ীঠাকরনের অভিপ্রায় আপনি শুনেছেন—বাড়িটা তিনি আপনাদের কাছে বিক্রি করে ফেলতে চান। আজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, শীঘ্র যা হোক একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই তাঁরা এই মাসেই মুসেরে ফিরে যেতে পারেন।

গিরীন্দকে দেখিবামাত্রই শেখরের বকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছিল, কথাগুলো তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগিল না, অগ্রসর-মুখে বলিল, সে ত ঠিক কথা, কিন্তু বাবার অবর্তমানে দাদাই এখন মালিক, তাঁকে বলা আবশ্যিক।

গিরীন মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আমরাও জানি। কিন্তু আপনি বললেই ত ভাল হয়।

শেখর তেমনিভাবেই জবাব দিল, আপনি বললেও হতে পারে। ও-পক্ষের অভিভাবক এখন আপনিই।

গিরীন কহিল, আমার বলবার আবশ্যিক হলেবলেতে পারি; কিন্তু কাল সেজদি বলছিলেন, আপনি একটু মনোযোগ করলে অতি সহজেই হতে পারে।

শেখর মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে বললেন?

গিরীন বলিল,—সেজদি—ললিতামিদি বলছিলেন—

শেখর বিশ্বাসে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তার পরে গিরীন কি যে বলিয়া গেল, তাহার এককিছুও তাহার কানে গেল না। খানিকক্ষণ বিমূল-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে মাগ করবেন গিরীনবাবু, কিন্তু ললিতার সঙ্গে কি আপনার বিবাহ হয়নি?

গিরীন জিব কাটিয়া বলিল, আছে, না—ওদের সকলকেই আপনি জানেন—কালীর সঙ্গে আমার—

কিন্তু, সে-রকম ত কথা ছিল না।

গিরীন ললিতার মুখে সব কথাই শুনিয়াছিল, কহিল, না, কথা ছিল না, সে-কথা সত্য।

গুরুচরণবাবু মৃত্যুকালে আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন আমি আর কোথাও যেন বিবাহ না করি। আমিও প্রতিশ্রুত হই। তাঁর মৃত্যুর পরে সেজনিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন, অবশ্য, এ-সব কথা আর কেউ জানে না যে, ইতিপূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত আছেন। একথা আর কেউ হয়ত বিশ্বাস করত না, কিন্তু আমি তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করিনি। তা ছাড়া, স্ত্রীলোকের একবারের অধিক বিবাহ হতে পারে না—ও কি?

শেখরের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সেই বাষ্প অন্ধকারায় চোখের কোণ বহিয়া গিন্নীনের সম্মুখেই বরষার করিয়া করিয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে তাহার চৈতন্য ছিল না, তাহার মনেও পড়িল না, পুরুষের সম্মুখেই পুরুষের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর।

গিন্নীনের নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে মনে সন্দেহ ছিলই—আজ সে ললিতার স্বামীকে নিশ্চয় চিনিতে পারিল। শেখর চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল, কিন্তু আপনি ত ললিতাকে স্নেহ করেন?—গিন্নীনের মুখের উপর প্রহসন বেদনার গাড় ছায়া পড়িল, কিন্তু পরকণ্ঠেই সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল, সে কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক। তা ছাড়া, স্নেহ যত বড়ই হোক, জেনে-ওনে কেউ পরের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করে না—যাক, গুরুজ্ঞানের সম্বন্ধে ও-সব আলোচনা আমি করতে চাইনে, বলিয়া সে আর একবার হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ যাই, আবার অন্য সময় দেখা হবে, বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

গিন্নীনের শেখর চিরদিনই মনে মনে বিদ্বেষ করিয়াছে, এইবারে সেই বিদ্বেষ নিবিড় ঘৃণায় পূর্ণবসিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে চলিয়া যাইবামাত্র শেখর উঠিয়া আসিয়া ভূমিতলে বারংবার মাথা ঠেকাইয়া এই অপরিসীম ব্রাহ্ম-স্বকণ্ঠের উদ্দেশে প্রশ্ন করিতে লাগিল। মানুষ নিঃশব্দে যে কত বড় স্বার্থভাগ্য করিতে পারে, হাসিমুখে কি কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে তাহা আজ সে প্রথম দেখিল।

অপরূহবেলায় ভুবনেশ্বরী নিজের ঘরে মেঝের বসিয়া ললিতার সাহায্যে নুতন বস্ত্রের রাশি থাক দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, শেখর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের শয্যার উপর গিয়া বসিল। আজ সে ললিতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পলাইল না। মা চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, কি রে!

শেখর জবাব দিল না, চূপ করিয়া কি-রকম দিতে হবে, হিসেব করে দেখিচি—বোধ করি, আরও কিছু কিনতে হবে, না, মা?

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

শেখর হাসি-মুখে কহিল, আর যদি বিয়ে না করি মা?

ভুবনেশ্বরী হাসিলেন। বলিলেন, তা তুমি পারো, তোমার তপে ষাট নেই।

শেখরও হাসিয়া বলিল, তাই বোধ করি হয়ে দাঁড়ায় মা।

মা গভীর হইয়া বলিলেন, ও কি কথা! অমন অলক্ষণে কথা মুখে আসিস নে।

শেখর বলিল, এতদিন মুখে ত আনিনি মা, কিন্তু আর না আনলে নয়—আর চূপ করে থাকলে মহাপাতক হবে মা—ভুবনেশ্বরী বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত-মুখে চাহিয়া রহিলেন।

শেখর বলিল, তোমার এই ছেলের অনেক অপরাধই তুমি ক্ষমা করে এসেচ, এটাও ক্ষমা কর মা, আমি সত্যি এ বিয়ে করতে পারব না।

পুত্রের কথা ও মুখের ভাব দেখিয়া ভুবনেশ্বরী সত্যি উদ্ভিগ্ন হইলেন, কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন যা তুই এখান থেকে, আমাকে জ্বালাতেন করিস নে শেখর—আমার অনেক কাজ।

শেখর আর একবার হাসিবার স্বার্থ প্রদর্শন করিয়া গুরুবরে বলিল, না মা, সত্যিই বলি তোমাকে, এ বিয়ে হতে পারবে না।

কেন, এ কি ছেলেখেলা?

ছেলেখেলা নয় বলিই ত বলচি মা।

ভুবনেশ্বরী এবার রীতিমত অীত হইয়া সরোবে বলিলেন, কি হয়েছে, আমাকে বুঝিয়ে বল শেখর।

ও-সব গোলমালে কথা আমার ভাল লাগে না।

শেখর মৃদু কণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো মা, আর একদিন বলবো।

আর একদিন বলবি। তিনি কাপড়ের গোছা একেবারে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তবে আজই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এমন সংসারে আমি একটা রাতও কাটাতে চাইনে।

শেখর অথোমুখে বসিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী অবিকতর অস্থির হইয়া বলিলেন, ললিতাও আমার সঙ্গে কাশী যেতে চায়, দেখি তার যদি একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে পারি।—এবার শেখর মুখ তুলিয়া হাসিল, তুমি নিয়ে যাবে, তার আবার বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করবে মা? তোমার হুকুমের বড় ওর আবার কি আছে!

ছেলের হাসিমুখ দেখিয়া তিনি মনে মনে একটা যেন অশান্তি হইলেন, ললিতার পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, তুলি মা ওর কথা! ও মনে করে, আমি ইচ্ছা করলেই যেন যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি! ওর স্বামীর মত নিতে হবে না?

ললিতা জবাব দিল না। শেখরের কথাবার্তার ধরনে সে মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।—শেখর বলিয়া ফেলিল, তাঁকে জানাতে চাও, জানাও গে, সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু তুমি যা বলবে তাই হবে মা, এ আমিও মনে করি, যাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, সেও মনে করে, ও তোমার পূত্রবধূ। বলিয়া ফেলিয়াই শেখর ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী বিষয়ে তৃপ্ত হইয়া গেলেন। জননীর সম্মুখে সন্তানের মুখে এ কি পরিহাস! একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বলি? ও আমার কি?

শেখর মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল। আন্তে আন্তে বলিল, ঐ ত বললুম মা। আত্ম নয়, চার বৎসরের বেশী হ'লো, তুমি সত্যি ওব মা। আমি আর বলতে পারিনে মা, ওকে জিজ্ঞেস কর ও-ই বলবে,—বলিয়াই দেখিল ললিতা গলায় আঁচল দিয়া মাকে প্রশাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেও উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল, এবং উভয়ে একত্রে মায়ের পদশ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রশাম করিয়া শেখর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ভুবনেশ্বরীর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু বরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ললিতাকে সত্যি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সিন্দুক খুলিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহাকে পরাইতে পরাইতে একটু একটু করিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তাই বৃষ্টি গিরীনের কাশীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে?

ললিতা বলিল, হ্যাঁ মা, তাই। গিরীনবাবুর মত মানুষ সংসারে আর আছে কিনা জানি না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে কলতেই, তিনি বিশ্বাস করলেন যে সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন, না করুন, সে তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু তিনি আছেন।

ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি মা! অশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুক, একটু বোস মা, আমি অবিনাশকে জানিয়ে আসি যে, বিয়ের কল হয়ে গেছে, বলিয়া হাসিয়া বড়ছেলের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।



পণ্ডিতমশাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ বোটমের ছোট বোন কুসুমের বালা-ইতিহাসটা এতই বিস্তীর্ণ যে, এখন সে-সব কথা স্মরণ করিলেও সে লজ্জায় দুঃখে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন মেয়েটিকে সূত্ৰী দেখিয়া, বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তাহার পুত্র কন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয় : কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা-মায়ের দুর্নাম উঠে। তাহাকে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিল। সেও রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কষ্টীবদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে ; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন গ্রামে বাড়ি, তাহা একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না, কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কষ্টীবদন ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রচনা, তাহ্যও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। এত কাণ্ড কুসুমের মাও বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়। সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বালা-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। যেমনই গুণ, তেমনই কর্মপটুতা, আবার লেখাপড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বে-মানান দেখাইত না।

এদিকে কন্দাবনেও বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে ; তাহার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ পাঁচ জোড়া ধুতি-চাদর এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি সোনা ও একশ ভরি রূপার অলঙ্কার দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয় ; কিন্তু কুসুম সে কথা কানেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি :—ইহাদের বাপ-মা নাই। তাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণ-কুটারের সঙ্গেই বাস করিয়া উঠিয়াছে, একত্রেই হরপণ্ডিতের পাঠশালা পড়িয়াছে, খেলাধুলা করিয়াছে। আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গীসান্নিধ্য। তাই এসব প্রসঙ্গেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণার লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রদীপ্ত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বালাসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দুর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ; ইহারা কেন তাহার মকর-গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি, ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এ গ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, দিদি, রাজী হ। ধরতে গেলে কন্দাবনই তোমার আসল বর।

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, আসল নকল বুঝিনে দাদা! শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেরাল পেয়েছে যে, যা-ইচ্ছে হবে, তাই করবে? এই বিয়ে, এই কষ্টীবদন ; আবার বিয়ে, আবার কষ্টীবদন ; যাও, ওসব আমার সুমুখে ভুল না। লন্ডলের উনি আমার কেউ নয় ; আমার স্বামী ম'রেছে, আমি বিধবা।

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা ভেজবিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন ধতমত খাইয়া যায়। তথাপি সে ভাবে, আর একরকম করিয়া। সে বড় দুঃখী। এই দু'খানি কুটীর এবং তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র একখানি আম-কাঠালের বাগান ছাড়া আর তাহার কিছু নাই। অতএব নগদ এতগুলি টাকা এবং এত জোড়া ধুতি-চাদর তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া,

তাহাকে সুখী দেখিয়া নিজের সুখী হইতে চাহে।

কতীবরন তাহাদের সমাজে 'চল' আছে, তাই তাহাদের কাঁজ-কাজ করিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু সে যখন মরিয়াছে এবং কৃশাবন, কুসুমের স্বামী যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এত বড় সুযোগের প্রতি দৃকপাত করিতেছে না, তাহা সে কোনরূপেই ভাবিয়া পায় না। শুধু সমাজের কৌজলার ও ছড়িলায়ের মত লইয়া কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই কৃশাবন বহিবে ; তারপর এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজধানী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় খামায় ঘুনসি, মালা, চিরুনি, কৌটা, সিন্দুর, ডেলের মসলা, শিশিরের জন্য ছোট-বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সূচের কারুকার্য ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাঁহা পায়, দিনান্তে সেই পরসাপ্তলি বোনটির হাতে আনিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম মূলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না—পাইবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে কৃশাবনের সহিত দেখা ; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়িতে ধরিয়া আনিল ; হাত-পা ধুইতে জল দিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বিপ্রহরে তাহার মা নানাবিধ ব্যঞ্জননের দ্বারা কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রোদে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হাত-পা ধুইয়া, মুড়ি-মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে সেই সব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষে কহিল, হী, একটা গেরস্থ বটে! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই—মা-লক্ষ্মী যেন উথলে পড়ছেন।

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ হইকে স্নানক্শ মনে করিয়া, কৃশাবনের মা কি রাঁধিয়াছিলেন এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল, খাইরে দাঁড়িয়ে কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রোদ্দুরে কেমনে মাথা ধ'রে অসুখ করবে।

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাহ'লে দাদা বুঝি সারাদিন এই কর্মই কর'রে? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ?

তাহার দাদাও সহ্যসো জবাব দিল, কি করি বল বোন! ছেড়ে না দিলে তো আর জোর করে আসতে পারিনে?

কুসুম কহিল, তা'হলে ও গাঁয়ে আর কোনদিন যেও না।

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না ; জিজ্ঞাসা করিল, যাব না! কেন?

পথে দেখা হ'লেই ত ধরে নিয়ে যাবে। তারা বড়লোক, তাদের কতি নেই ; কিন্তু আমাদের তাহ'লে ত চলেবে না দাদা!

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ভুরু হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা বলিনি দাদা—সে কথা বলিনি ; দু'একদিনে আর কি লোকসান হবে। তা নয়; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী ; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশী মেলামিশি কর'রে?

কুঞ্জ জবাব দিল, আমি তাদের ঘরে ত যেতে যাইনি, কুসুম!

তা যাওনি বটে ; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?

তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস তারাও ত সব বড়লোক, তবে বাস কেন?

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, তাদের সঙ্গে মেলেমেলা খেঁকেই বেলা করি ; তা ছাড়া তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা নেই ; কিন্তু ওদের

কথা আলাদা।

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, সেখানে লজ্জা নেই। মা-লক্ষ্মী তাঁদের দয়া করেছেন, দুপুরসা আছে সভ্য ; কিন্তু এতটুকু সেবাক অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটির মানুষ! কৃন্দাবনের মা আমার হাত দুটি ধরে যেমন করে—

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আবার সেইসব পুরানো কথা! মায়ের নামে ওরা যে এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে আছে!

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ লোকে হিঁসে ক'রে বদনাম দিয়েছিল।

কুসুম কহিল, তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল—কেমন?

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা বটে, তবে কিনা তাতে কৃন্দাবন বেচারীর একটুও দোষ ছিল না। বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, যার দোষই থাক দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি এক শ' বার সেই সব কথা তুলে? আমি পারিনি আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ এখনটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুটবরেই বলিল, তুই ত তর্ক করতে পারিস নে ; কিন্তু আমাকে যে সব দিকে দেখতে হয়! আজ আমি ম'লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস?

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ পতীর-মুখে কহিতে লাগিল, আমি আমাদের মুকব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, তোর শাউড়ী নলডান্নার বুড়ো বাবাজীর মত পর্যন্ত জেনে এসেছে। সবাই খুশী হয়ে মত দিয়েছে, তা জানিস?

কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে, জানি বৈ কি!—বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কষ্টবদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলোচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে,—এ সংবাদ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল ; কিন্তু এ ভাব চাপা দিয়া সহসা ভিত্তপা করিল, এ কি থাকবে দাদা?

কুঞ্জ কোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল—কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাও সংবরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকাতামাক সাজিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া তামাকটা নিঃশেষ করিয়া ইঁকটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ডাক দিল, কুসুম!

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে সিলান্নি করিতে বসিয়াছিল—সাড়া দিল, কেন?

বলি, রাস্তির হচ্ছে না? রাঁধবি কখন?

কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, আর আজ রাঁধবো না।

কেন? তাহি জিজ্ঞেস করি।

কুসুম চৈতন্য হইয়া বলিল, আমি এক শ' বার বকতে পারিনি।

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ইল। চৈতন্য হইয়া বলিল, ছালাতন করিস নে কুসি! অমনথারা করলে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব, তা' বলে দিচ্ছি।

যাও—একুশি যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ী-ডোমের মত, অমন করে হাঁকাহাঁকি করতে দেব না। ইচ্ছা হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চৈত্যাও গে।

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, পোড়ামুখী, তুই ছোটবেলা হয়ে বড়ভাইকে তাড়িয়ে নিস?

কুসুম বলিল, ঐহি। বড় বলে ভূমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি?

বোনের মুখের পানে চাহি—কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল, কিসে যা ইচ্ছে করলুম ওনি?

কেন তবে আমাকে না বলে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?

কেন—তাতে দোষ কি হয়েছে?

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, দোষ হয়েছে। ঢের দোষ হয়েছে। আমি মানা করি দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ বড়ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, কহিল, তুই কি বড়বোন যে, আমাকে হুকুম করবি? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল, না যাবে না। আমি শুনতে পেলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি দাদা!

এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, যদি যাই কি করবি তুই?

কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোঁচাইয়া উঠিল, আমাকে রাগিও না বলছি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বলছি।

কুঞ্জ শব্দব্যস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর ভয়ে সরে যাব? যদি না বাই, কি করতে পারিস তুই?

কুসুম জবাব দিল না; শ্রীপের আলোটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সিলাই করিতে বসিল।

আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল, লোকে কথার বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'। নিজের রাক্ষসীর মত চোঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোর কথা কইলেই—বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অন্ত্যস্ত তৃপ্তি বোধ করিল, উঠিয়া গিয়া ইঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি যখন বড়, আমি যখন কর্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নুতন করিয়া সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় ইঁকিয়া কহিল, চাইনে আমি কারো কথা, এক শ' বার না-না শুনতে আমি চাইনে! আমি যখন কর্তা—আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা বলব তাই—বলিয়া সে সহসা নিছনে পদশব্দ শুনিয়া বাড়ি বাঁকিয়াই দ্রুত হইয়া থামিল।

কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইয়া ছিল; বলিল, বসে বসে কৌদল করবে, না যাবে এখন থেকে?

ঘোটবোনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুমুখের বড়ভাইয়ের কর্তা সাজিবার শব্দ উড়িয়া গেল। তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনিভাবে বলিল, দাদা, যাবে কি না?

এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিটি করিয়া বলিল, বললুম ত তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্ছি।

কুসুম হাত বাড়াইয়া, দাও আমাকে, বলিয়া কলিকটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিট-খানেকপরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা ইঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাকরানের দোকানে যাচ্ছ ত?

কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হী।

কুসুম সহজভাবে বলিল, তাই যাও। কিন্তু বেশী রাত কর না, আমার রান্না শেষ হতে বেশি হবে না।

কুঞ্জ ইঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে কুবাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যাশ্চর্য্য মাত্র করে নাই। সত্যি তাহাদের গৃহে লক্ষী উৎখলিয়া পড়িতেছিল; অথচ সেজন্য কাহারও অজ্ঞান অতিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। কুবাবন ছেলোবেলায় নিজের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া শেখে এবং

তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন ; বন্ধাবন একমাত্র সন্তান হইলেও, এইসব অনাসুট কার্যে পুত্রকে প্রব্রুত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজের চরিত্রগুণে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইহাকে সে নিজের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাতে পড়াইয়া যাইতেন ; তাই কথটা গোপনেই ছিল। গ্রামে কেহই জানিতে পারে নাই—বন্ধা বোষ্টম ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর-পাঁচেক পূর্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। শ্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত, সকালে গৃহকর্ম, বিষয়-আশয় দেখিত ; এবং দুপুরবেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পাড়াপীড়ি করিলে সে তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, যে জন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে ; আর আবশ্যক নেই মা।

মা কল্যাণী করিতেন, কিন্তু সে গুণিত না। এমনই করিয়া বছর-দুই কাটিল।

তারপর হঠাৎ একদিন সে কৃষ্ণ গোটমের বাড়ির সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম নদী হইতে স্নান করিল কলস-কল্কে ঘরে ফিরিতেছিল ; সে তখন সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বন্ধাবন মুহূর্ত্তে চাহিয়া রহিল ; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়িই সে চিনিতে ; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিতে।

এক সন্তান হইলে মাতাপুত্র সে সম্বন্ধ হয়, বন্ধাবন ও জননী মধ্য সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, সে কি হয় বাবা? তাদেব যে দোষ আছে—বন্ধাবন ভাবাব দিল, তা' হউক না, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কথা ভাবিনি কেন?

মা বলিলেন, সেসব কথা তোমার বাবা জানতেন। তিনি যা বুকেছিলেন—করে গেছেন।

বন্ধাবন অভিমানভরে কহিল, সত্যে তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকি ; আমার বিয়ের জন্য তুমি আর পাড়াপীড়ি করো না। বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বন্ধাবনের জননী কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু ফল নাই—কুসুম কোনমতেই সম্মত করেন যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ—ম তাহার নিরীহ, অসমর্থ, ও অল্পবুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া আব কোথাও গিয়াই স্থিতি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয়ত এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন দাদার অনুরোধ ও পাড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না। কিন্তু এ যে আবার কি-সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্যজীবনের বিদ্রুত ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চোঁচামেচি উঠিবে, পাড়ার লোক কৌতুহলী হইয়া দেখিতে আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের সকৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উকিঝুঁকি মারিবে, শেষে দ্বাব ফিরিয়া গিয়া সোজা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে, হাড়ী-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া পেল। ছি ছি, এ-সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে-সব ভদ্রকন্যাশ্রম সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে একভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার-ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোট এ কথা সে মনে ঠাই দিতেও পারে না।

কলস সজ্জায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিঁদুরের চাবিটা সে দাদাব পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সরোবে বলিয়াছিল, আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না। আত্ম প্রত্যতে নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামটিও নাই। কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, কলস বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েছে। কল্যাকার ক্রটি সারিয়া লইবার জন্যই সে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে। কিন্তু কুসুম যাহা অনুমান করিল তাহা

নহে, সে ক্রটি আর একটা। খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যহে উঠিয়া গৃহকর্ম করিতে হইত। ঘর-দুয়ার গোমর দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী ইহিতে স্নান করিয়া জল আনিয়া, তবে দালার জন্য রাধিয়া দিতে হইত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটা-কয়েক মন্টিকা ও বুই-এর কাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিভা-পূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছে—এমন সময় সদরে কয়েকজন্য গোবান আসিয়া থামিল এবং পরক্ষণেই একটি হৌড়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কপালালের নিমিত্ত উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইহাকে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, বেই হ'ন, স্বজাতি।

হৌড়া কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমাকে চেন না মা, তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কৈ?

কুসুম জবাব দিল, তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরিতে বোধকরি দেরি হবে।

আগন্তুক বিশ্বয়ের স্বরে বলিলেন, দেরি হবে কি গো! কাল সে তার ভগিনীপতিকে, আরো চার পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগনে হয়—সবাইকে খেতে বলে এলো—আমিও তাই আজ সকালে বললুম, বৃন্দাবন, গরুর গাড়িটা ঠিক করে আনতে বলে দে বাছা : যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্বাদ করে আসি।

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রশাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর ইহিতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম বুঝিল ইনি শাওড়ী। তিনি আসনে বসিয়া বলিলেন, কাল ষাওয়া-দাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাশা করে বললে—আমি এমনই হতভাগা যে, কুঞ্জলা বড়ভাই-এর মত হয়েও, কোনদিন ডেকে এক ঘটি জল পর্যন্ত খেতে বললেন না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে—কুঞ্জনাথ হাসতে হাসতে তাই সঁকলকে নেমতন্ন ক'রে এল—তারা সবাই এল বলে।

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিরস্ত্রশরীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তার বুদ্ধি-সুদৃষ্টি ছিল : কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁদের সম্মুখে হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সম্বন্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হী বৌমা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে যারনি!

কুসুম খোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই সম্ভ্রান্ত হইয়া বলিলেন, তবু ভালো, তার পর কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া সম্মুখে বলিলেন, ভয় হয়েছিল—আমার পাগলা ছেলেরা বুঝি সব ছুলে বসে আছে! তবে বোধ করি, সে কিছু কিনতে-টিনতে গেছে, একটুনি এসে পড়বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।

কুঞ্জলা, বলিয়া বৃন্দাবন একটা হাঁক দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে—ইহারই মামাতো ভাই।

তাহার মা বলিলেন, কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভিতর একটা সত্তরজ পোতে দাও বাছা—ওরা বসুক।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দালার ঘরের মেঝেতে একটা কবল পাতিয়া দিয়া, কলিকটা হাতে লইয়া তামাক সাড়িয়া আনিতে রাস্তাঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, ও থাক। তামাক আমরা কেউ খাইনে।

কুসুম কলিকটা কেলিয়া দিয়া এইবার রাস্তাঘরের একটা বুটি আঁচর করিয়া শুরু হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠজ্ঞানহীন মূর্খ অপ্রজ্ঞ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে কেলিয়া দিয়া সরিয়া

দাঁড়াইল! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যতাবী অপমানের অপকার, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভীড়ারে সমস্ত জিনিস বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে রানে যাইবার পূর্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, কিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু কিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। সোম অপরাধ করার পরে, ছোটবোনকে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত যে, সচরাচর মানুষ দুটু মনিবকেও এত করে না। সে বড়লোকদের ঘরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল, ঠোকের মাধ্যম—সেই বড়লোকদিককে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস কুঞ্জ কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই সে রাত্রির পূর্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াই কুসুম অপকার অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ হইয়াছিল, যে সিদ্ধকুটির ভিতরে তাহাদের সঙ্কিত গুটি-কয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ হাতেও একটি পরস নাট।

এখন নিরুপায়ভাবে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল কৃন্দাবনের উপর; বাস্তবিক সমস্ত সোম ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্বোধ নিরীহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এইসব পরিহাস করিল! উনি কে যে, দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়ারইবে?

এই তিন সপ্তক কত ছলে, কত উপলক্ষে কৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মত পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কতদিন সকাল-সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটার সম্মুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃখ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে; জানে বলিয়াই, তাহাদিককে অপমান করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে।

কুসুম কাঠের মূর্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন একা সে কি উপায়ে করিবে?

কৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছেলের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ ঘরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি রামাখরের ভিতরে কুসুমের উপর পড়িল—চোখাচোখি হইল, মনে হইল, সে সঙ্গেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক অংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ড উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। সে বুঝিল, ইহা চোখের ভুল; ইহা অসম্ভব।

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইতেই পারে না। কৃন্দাবন অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখাচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানেই চাছিল। ঠিক তাই! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

দ্রুতপদে কৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া রামাখরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলে আমাকে?

কুসুম তেমনিই মৃদুস্বরে বলিল, হঁ।

কৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কুসুম একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, ভারী চাপা গলায় বলিল, জিজ্ঞাস কচ্ছি তোমাকে, আমাদের মত দীন-দুঃখীকে জব্দ করে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরি বাড়বে?

হঠাৎ এ কি অভিযোগ! কৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকতর কঠোরভাবে বলিল, জান না, আমাদের কি ক'রে মিন চলে? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাশা করতে গেলে? কেন এত লোক নিয়ে খেতে এলে?

কৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, এই নালিশের কি জবাব দিবে; কিন্তু স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশী বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, শেষে

সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জলা কোথায়?

কুসুম বলিল, জানিনে। আমাকে কোন কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে খেতে দেবার কিছু নেই নাকি?

কিছু না ; সব ফুরিয়েচে, আমার হাতে টাকাও নাই।

বৃন্দাবন কহিল, এ-গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাকে একটা গামছা দাও—আমি, একেবারে স্নান করে ফিরে আসব। মা জিজ্ঞেস করলে ব'ল আমি নাইতে গেছি। দাঁড়িয়ে থেক না—যাও।

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, কুঞ্জলার তুমি বোন হও, তাই সে পালাতে পেরেচে ; আর কিছু হলে বোধ করি, এমন করে ফেলে যেতে পারত না।

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল, সবাই পারে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ তাও বেশ পারে। বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা তাহাকে বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল।

বৃন্দাবন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এ ভুল হয়ত একদিন ভাঙ্গতেও পারে। ছেলেবেলায় তোমার মায়ের অন্যায়েব জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যও তেমনই আমার দোষ নাই। যাক, এ-সব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও—রাঁধবার যোগাড় কর গে।

রাঁধবার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয় বল, তাই দিই গে।

বৃন্দাবন দু-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ-কথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পার, আমাকে তা সইতেই হবে, কিন্তু রাগের মাথায় তোমার গাভড়াটা কুরকে যেন কটু কথা শুনিয়া দিও না। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।

কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলার ফিসফিস করিয়া বলিল, আমি জন্তু নই, আমার সে-বুদ্ধি আছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশী তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম। মা স্নান করেই চলে এসেছেন, এখনও পূজা-আহিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আগে সেই যোগাড়টা করে দাও গে। আমি চললুম।

যাও, কিন্তু কোথাও গল্প করতে বসে যেও না যেন।

বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, না। কিন্তু দেরি ক'রে বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্ছে। আর একদিনের আশা দাও ত আজ না হয় শিগ'গির ক'রে ফিরে আসি।

সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিত্তরে যাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, আশ্চর্য! একবার মনে হল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমন শাসন করে এসেছ—ভগবানের হাতে বীধা কি আশ্চর্য বীধন কুসুম।

কুসুম দাঁড়াইয়া বলিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া দ্বির হইয়া বলিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, তাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গপনার মতোই জানে নাই, আজিকার কথাবার্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে এক নতুন আনন্দে নতুন ভ্রূণের সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে ষাট ফিরিয়ার সময় বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অঙ্ক-

গঙ্গাদকটে বলিলেন, বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালাম, তা মুখে বলতে পারিনে। সুখী হও মা! বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে একজোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে কৃষ্ণাবনের সাহায্যে নির্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইছাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া বসিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বজ্ঞ-বধূতে এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল না মা, পাগলা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সন্মতি জানাইল।

কৃষ্ণাবনের পিতামহ বাটিতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘরে বসিয়া কৃষ্ণাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল; সেই হেতু কৃষ্ণাবন ঘরে ঢুকিয়া ইহাদিককে দেখিতে পাইল না। সে দেবীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল এবং কিছু মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার পায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, অমন আবছায়ায় বসে কেন মা?

মা সম্মেহে বলিলেন, তা হোক। অম্ম, তুই আমার কাছে এসে একটু বস।

কৃষ্ণাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন বাহি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোনদিন সে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল—যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্রহৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সজুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক পবে মা নিশ্চিত পৌত্রের মাথায় মুখে বলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহাঙ্গুষ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা-মহা আমার এই একফোটা বংশধরকে ফেলে বেখে কোথাও গম্মি এক-পা নড়তে পারিনে, তাই আজ মনে হচ্ছে কৃষ্ণাবন, আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বে... নিয়ে নামিয়েচে। তাকে শিগগির ঘবে আন বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই—দিন-কতক কাশী-কৃষ্ণাবন কবে বেড়াই!

আজ কৃষ্ণাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমন স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাসে কহিল, সে আসবে কেন মা?

মা নিঃসম্বন্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, আসবে বৈ কি! সে এলে তবে ত আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে কৃষ্ণাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হস্তের বালা দু'গাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। তখন বুকেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস দিকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন প'ল, সেইদিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনব।

কৃষ্ণাবন কলকাল যৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সে তোমার বংশধরটিকে দেখবে ত?

মা ভৎসনাৎ বলিলেন, দেখবে বৈ কি! সে ভয় আমার নেই।

কেন নেই মা?

মা বলিলেন, আমি সোনা চিনি কৃষ্ণাবন। অবশ্য খাটি কিনা, এখন বলতে পারিনে, কিন্তু পেতল নয়, গিহাটি নয়, এক-কথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে দিলুম। তা নইলে আমার সংসারে তাকে আনবার কথা তুলতুম না। হী রে কৃষ্ণাবন, বৌমা কি তোার সঙ্গে বরাবরই কথা কন?

কোনদিন নয় মা। তবে আজ বোধ করি বিশেষে পড়েই,—বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ঠিক কথা বাছ। তার লেব নেই ; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়লেই তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায় নি, তোকেই জানিয়েচে।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা, বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, সে বেশ লোক, পাড়াসুদ্ধ নেমন্তন্ন করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তার পর যা হয় তা হোক।

বৃন্দাবনও নিঃশেষে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, ওনামুখ, বৌমাকে সে ভারী ভয় করে—বড় ভাই হয়েছে ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারী মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে থাকবার জো নেই—তা বললে বড়ই হোক আর ছোটই হোক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অখট লজ্জ। এমন মানুষই আমি চাই, যে তার দিলে তার সইতে পারবে। তবেই ত আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব।

কণকাল চুপ করিয়া তখন বলিয়া উঠিলেন, একটি দিনের মধ্যে তাকে কি যে ভালবেসেচি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না—সারা সজ্জাবেলাটা কেবল মনে হয়েছে, কতক্ষণে ঘরে নিয়ে আসব, আবার কতক্ষণে দেখব।

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কুঞ্জনার কথা কি বলছিলে মা?

মা বলিলেন, হী, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে ভূই গোপালকে গাড়ি আনতে বলে দিস, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোফুল বৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে ওনতেও মন্দ না ; তা ছাড়া—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া ঐ এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয়-আশয় রেখে মরেচে, না মা?

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, সে-কথা সত্যি বাছ। কুঞ্জর পক্ষে সবচেয়ে দরকার। নইলে বিয়ে করলেই ত হয় না, যেতে পরতে দেওয়া চাই। আর মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কালো, কিন্তু মুখশ্রী আছে। যাই হোক, দেখি কাল কি করে আসতে পারি।

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, আমিও দিন-রাত দেখাই গে মা। তুমি নিজে যখন যাচ্ছ, তখন শুধু যে ফিরবে না, সে নিশ্চয় জানি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, সেনা-পাণ্ডার কথা, খাওয়ান-দাওয়ানর কথা সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্নে বৃন্দাবনের জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

তখন চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর গাড়ি সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিতপূর চমক গাড়ি হইতে নামিয়া চৌচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাফুলানী পছন্দ করিতে সেও আজ শিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতে ছিলেন, তাহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, কবে দিন স্থির করে এসে মা?

এই মাসের শেষে আর দিন নেই, দুই ভিতরে আর—অনেক কথা আছে ; বলিয়া তিনি হাসিমুখে

ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ভীরু নিজের ঘরে বৌ আসিবে, এই আনন্দে তাঁর বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া, এ একটি দিনে ঘরকানার গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যি ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সম্ভাবনকে স্বার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর-সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ-ধর্ম করিয়া বেড়াইবেন— এইসব সুখস্বপ্নের কাছে আর সমস্ত কাকটী তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোবিন্দের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালার ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া সেখিল, সেদিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, উপোস করে ডাবলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ডাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।

মা বলিলেন, সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাশা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখলুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে এ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক বাবা, তোমারই কথা হচ্ছিল, এস বস। হঠাৎ এ-সময়ে যে?

বস্ত্রবিক্র গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ি আসার এটা সময় নয়।

কুঞ্জনাথ বাড়ি ঢুকিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল, আচ্ছা কুঞ্জনাথ, টের পেলে কি করে? রাতটাও কি চুপ করে থাকতে পারলে না, না হয় কাল সকালে এসেই ওনতে?

মা একটু হাসিলেন। কুঞ্জ কিছু এদিকে দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বোন নয় ত, যেন লাগোয়া!

বৃন্দাবন খাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা কিছু বলে পাঠিয়েছেন বুঝি?

কুঞ্জ সে-প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার এ কি-রকম ভুল! ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হলে কি সর্বনাশ হ'ত বল ত!

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্ভিগ্নমুখ চাহিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি কুঞ্জনাথ?

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া দিয়া কুঞ্জ নিজেকে হালকা করিয়া চাহিল না; তাই বৃন্দাবনের প্রশ্ন কানেও তুলিল না। মাকে বলিল, আগে কি খাওয়াবে, তবে বলব।

মা এবার হাসিলেন; বলিলেন, তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল?

কুঞ্জ কহিল, আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েছে আগে বল?

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া সন্দিকিসুরে বলিলেন, কৈ কিছুই ত হারায় নি!

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হোহো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; পরে নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া একজোড়া সোনার বালা খেলিয়া ধারনা বলিল, তা হলে এটা তোমাদের নয় বলা? বলিয়া মহা আত্মদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা, যাহা কাল এমনই সময়ে পরমস্নেহে স্বপ্নে তিনি পূত্রবধুর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্বাদ সে নির্বোধ কুঞ্জর হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত সেনিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে একটোটা রক্তের চিহ্ন পর্বত নাই। অপরাহ্নের স্নান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পাতুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বৃকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু অন্তর্ভাবী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টার চক্ষের নিম্নে সামলাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বলিল, মা

আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বাল্য, সাধ্য কি যা যে-সে পরে? কুঞ্জা, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ তাই মহা আত্মদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা তাহার ষাণ্ডা-মাওয়ার পরে যখন কুসুম স্নানমুখে বালাজোড়াটি হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আসতে হবে; তখন আনন্দের আভির্ভাষে সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

দূরপাচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনের কথা সত্য নয়,—মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দেতি পারে, কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—ফিরাইয়া দেয়, এ-সব অসম্ভব কাণ্ড তাহার বুদ্ধির ওগোচর। তাই সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার কিরূপ সুখী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্বাদ করিবেন—এইসব।

কিন্তু কে, সে-রকম ত কিছুই হইল না? যাহা হইল, তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না; কিন্তু এতবড় একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা ভাল কথা, একটা আশীর্বাদ না পাইয়া তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বরং বৃন্দাবন তাহাকে যেন তাঁহার সমুখ হইতে বাহিরে ঠাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লঙ্কাবন্দন তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষমমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা বাহির না। বাক্যলাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বৃকের ভিতরটা তখন অপমানের আশুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভাল-মন্দ, মান-অপমান আর ছিল না। মৃত্যু-যাতনা যেমন আয় সর্বপ্রকাব যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননীর অপমানহিত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি ঠিক তেমনিই করিয়া তাহাও সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, একটিমাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল, বৃন্দাবন, আজ ওয়ে যাই তাই বৃন্দাবন বিহুলের মত চাহিয়া বলিল, যাও, কিন্তু আর একদিন এস।

কুঞ্জ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা, কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন, কি উপায়ে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—কাছে গিয়া কোন সাহসনার কথা উচ্চারণ করিবে!

আবার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্মূল করিয়া দিয়া তাহাও উপবাসী, শাস্ত, সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল—সে তাহাব স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাল একটা দিনের মেলামেশায় কুসুম তাহার শাওড়ী ও স্বামীকে যেমন চিনিয়াছিল, তাহারাও যে ঠিক তেমনি চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে হারা লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

যাঁহারা চিনিতে জানেন, তাঁহাদের কাছে এমন করিয়া নিজেকে সারাদিন ধরা দিতে পাইয়া শুধু অভূতপূর্ব আনন্দের হৃদয় তাহার স্মৃতি হইয়া উঠে নাই, নিজের আগোচরে একটা দুশ্চেষ্টা স্নেহের বন্ধনে হৃদয় তাহার স্মৃতি হইয়া উঠে নাই, নিজের আগোচরে একটা দুশ্চেষ্টা স্নেহের বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বাঁধন আজ আপনার হাতে ছিড়িয়া ফেলিয়া বালাজোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল, এবং মিরীহ কুঞ্জনাথ মহা উল্লাসে বাহির হইয়া গেল, তখন যুহুর্ভের জন্য সেই কত-কেননা তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাদিতে লাগিল। যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক মর্মান্তিক হইয়া বাজিবে এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের কি হইয়া বাইবে!

সন্ধ্যা বহুবল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ি ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের

সমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কুলি, আলো জ্বালাস নি রে?

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই দিই দাদা। কখন এলে?

এই ত আসছি, বলিয়া কুঞ্জ সন্ধান করিয়া ঈক-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনো প্রাণীপ সাজানো হয় নাই, এতএব, সেইসব প্রস্তুত করি। আলো জ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ রাতেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। যে লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আত্ম এতবড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অস্বাভিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা কি, এবং কতদূর গিয়াছে ইহাই জানিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দাদাকে তাহার অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোটখাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে বাহিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল, কুসুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তা'হলে ক'র হাতে দিয়ে এলে দাদা?

কুঞ্জ বিষয়াপন্ন হৈয়া বলিল, আমার বাব হাতে, মার হাতে দিয়ে এলুম।

কি বললেন তিনি?

কিছু না, বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ঘেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, তোর শাশুড়ী-ঠাকরুন কি এক-বকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। এমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা একটি কথা বললে না। বরং বন্দাবনকে ভাল বলতে হয়, সে খুশী হয়ে বলতে লাগল, সাধা এক মা, যে-সে লোক তোমার বাবা হাতে বাধতে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, ওই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন—ও কি রে?

কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল, সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না। একথা তিনি বললেন?

হী, সে-ই বললে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা ছাড়া তিনি কোথা নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি—এমন করে আমার পানে চেয়ে বইলেন যে, কি দিলুম, কি বললুম, তা যেন বুঝতেই পারলেন না। বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বাব-দুই ঘাট নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন-চারদিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশ ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এইমাত্র ভাই-বোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ পুড়ে যায়, ও পুড়ে যায়, আশ্চর্য মন তোর কোথায় থাকে কুসী?

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, আমি কারো কেনা দাসী নই ~ ~ ~ না রাখতে—যে ভাল রেখে দেবে তাকে আনো গে।

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত ন স্না বলিল, তুই আগে দুঃ ২, তখন আমি কি না দেখিস। বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কানিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এতবড় সুযোগ সে ভাগ্য করিল না।

দাদার অত্যন্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমন খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া জাম্বাঘরের চৌকাঠে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকামা শুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধ করি তখন দশ, ঘণ্টাখানেক কানিয়া-কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে দাঁড়াইয়া ‘কুঞ্জলা’ ‘কুঞ্জলা’ করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর-ছয়কের একটি ছোটপুট সন্দর শিশু। কুসুম লম্বাভায়ে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্রপথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারই স্বামীর সন্তান, তাহা সে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উঠাকে হিন্দিয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষপঙ্ক্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে সাড়া দিতে, পা বাড়াইতে পারিল না, পাথরের মূর্তির মত একভাবে পলক-বিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাজে সে এইদিকে আসিয়াছিল এবং কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গোয়ান সজ্জিত দেখিয়া তাহার গুত্র ‘চরণ’ পূর্বাঙ্কেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সে-ও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল, কেউ বাড়ি নেই নাকি?

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল, জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

সে বেচারী শুদ্ধমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জায় প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্বাত্ম লজ্জায় অন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোনমতেই সমুখে আসিতে পারিত না। সে একবার একমুহূর্ত দ্বিধা করিল, তারপর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া, কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতের ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়া জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। এতে ত এইমাত্র সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া এমন ছোট মারিয়া কোনদিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুসুম খরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্নিমেধ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবলবেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া করকর করিয়া কাদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, হি বাবা, আমি যে ভা হই।

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোনমতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না, কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার বড় বৃদ্ধি এরে কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাসিয়া ছিড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এতবড় অসম্বিকার সঙ্গে আর আছে? চরণকে যে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, কৃষিত মাতৃহৃদয় কিছুতেই যেন সাত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপারে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি অনেক সুস্থ হইতে পারিত। কহিল, ছেড়ে দাও।

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, মা বল, তাহলে ছেড়ে দেব।

চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে ছেড়ে দেব না, বলিয়া কুসুম বকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, মা না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না।

চরণ কাদ-কাদ হইয়া বলিল, মা।

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বকে চাপিয়া ধরিয়া কাদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল খাওয়া হ'ল রে চরণ?

চরণ কাদিয়া বলিল, ছেড়ে দেয় না যে।

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা-গলায় কহিল, আজ চরণ আমার কাছে থাক।

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, ও থাকতে পারবে কেন? তা ছাড়া, এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল, না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

মন খারাপ কেন?

কুসুম সে-কথার উত্তর দিল না।

কণকাল চূপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়ি ফিরিয়ে দাও, বেলা হয়েচে, আমি নদী থেকে চরণকে মান করিয়ে আনি। বাল্যে আর কোনও প্ৰতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নিচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুশী হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিনী আছে, কিন্তু তাহাতে নমিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাটু-জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া স্নান সারিয়া কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্র বিলক্ষণ সন্তোষ হইয়া গিয়াছে।

ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাদৃত। মাথার আঁচল ললাটে স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের আভাসমাত্রও সে-মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদাঃবিকশিত গোলাপের মত শুষ্ঠাধর চাপাআসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ বা কৃষ্ঠা একেবারে নাই, সহজ-সবল কহিল, এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।

তারপরে?

খাবে।

তারপরে?

খেয়ে একটু ঘুমোবে।

তারপরে?

যাও, আমি জানিনে। এই গামছা নাও—আর দেরি কর না, বলিয়া সে সহাস্যে গামছাটা স্বামীর গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন গামছা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা অতি দীর্ঘশ্বাস জলক্ষেপে মোচন করিয়া শেষে কহিল, বরং তুমি বিলম্ব করো না। চরণকে বা হোক ঠাা খাইয়ে দাও—আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।

যেতেই হবে কেন? গাড়ি ফিরে গেলেই মা বুঝতে পারবেন।

ঠিক সেইজন্যই গাড়ি ফিরে যাবনি, একটু আগে গাছতলার দাঁড়িয়ে আছে।

সংবাদ শুনিয়া কুসুমের হাসিমুখ বলিন হইয়া গেল। শুদ্ধমুখে স্থির থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাহলে আমি বলি, মায়ের অজ্ঞে এখানে তোমার আসাই উচিত হয়নি।

তাহার গুঢ় অভিমানের সুর লক্ষ্য করিয়া কৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু, সে হাসিতে আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজভাবে বলিল, আমি এমন হয়ে মানব হয়েছি কুসুম, যে, মায়ের অমতে এ বাড়িতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারতুম না। যাক, যে কথা শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। যাও আর দেরি করো না, ওকে খাইয়ে দাও গে। বলিয়া কৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল।

কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন-অধোমুখে ছেলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে পিতাপুত্রে গাড়ি চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল, তখন পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?

কৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া বলিল. তোর মা হয় কে বলে দিলে রে?

চরণ জোর দিয়, কহিল, হাঁ, আমার মা-ই ত হয়—হয় না?

কৃন্দাবন ও-কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই থাকতে পারিস তোর মার কাছে?

চরণ খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, পারি বাবা।

আচ্ছা, বলিয়া কৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ির একধারে ওইয়া পড়িল, এবং রৌদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সদর দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার-তের বছরের বালক এদিকে ওদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তুমি কুণ্ড বৈরাগীর বাড়ি দেখিয়ে দিতে পার?

পারি, তুমি কোথা থেকে আসচ?

বাড়র থেকে। পণ্ডিতমশাই চিঠি দিয়েছেন, বলিয়া সে মলিন উত্তরীরের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল উপরে তাহারই নাম। খুলিয়া দেখিল, অনেক লেখা—কৃন্দাবনের স্বাক্ষর।

কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উদ্দেশ্য-আগ্রহ সে প্রাণপণে দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতবে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি পণ্ডিতমশাই কাকে বলছিলে? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে? ছেলেটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, পণ্ডিতমশাই দিলেন।

কুসুম পাঠশালার কথা জানিত না, সুমিত্রে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেন?

চিনি—তিনিই ত পণ্ডিতমশাই।

তার কাছে তুমি পড়?

আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো আছে।

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ-সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া লইল। পাঠশালা বাগীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিতমশাই নিজেই গ্রেট পেনসিল প্রকৃতি কিনিয়া দেন, যে সকল দরিদ্র ছাত্র, দিনের বেলায় অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুইজন বয়স্ক ছাত্র পাঠশালে ইংরাজী পড়ে, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে খুড়ি, কাঁতাসা প্রকৃতি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাসিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাষণ নাই একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্বাদ পর্যন্ত নাই। অথচ, এই তার প্রথম পত্র। ইতিপূর্বে আর কেহ তাহাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু সে তার সঙ্গিনীদের অনেকেই প্রেমপত্র দেখিয়াছে—তাহাকে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ! আগাগোড়া কাজের কথা। কৃন্দাবনের বিবাহের কথা। এ কথা বলিতেই সে কাল আসিয়াছিল। কৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, এবং সমস্ত ব্যয়ভার

তিনিই বহিবেন। সব দিক মিয়ারি এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেননা, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ঘুটিবে। এই ইমতিদা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর-একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার সমস্ত অক্ষরগুলো তাহার চোখে সূক্ষ্মে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কোনমতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাঙ্গের এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

বস্ত পরিত্যক্ত

মাস-খানেক হইল, কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও ছুর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার জো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ-ছয়দিন ছিল। মনের মতন নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিবাহ না হইতেই সে যে-সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভালমতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল, দাদা শান্তভীর পদার্থ। এই দুঃখ-কষ্টের সমস্ত হাড়িয়া ঘরজামাই হইবার জন্য বাগ হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাছিল না। নলডাঙার লোক শুনিলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া, সে মনিহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রি হইল না; অথচ এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন-চারিবার খণ্ডরবাড়ি যাতায়াত করিল। পূর্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভাবী ভয় করিত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয় কোথায় সরিয়া যায়—সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জামানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং বিম্বা। লোক জুটিলে খণ্ডরবাড়ির গল্প এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ তৈয়ার করে।

সেদিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বর্নিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চকচকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, আবার আজও নলডাঙায় যাবে বুঝি?

ঐ, বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে কাভ করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মৃদুস্বরে কহিল, সেখানে এই ত সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মন খারাপ হয়ে আছে কুঞ্জ উতাক্ত হইয়া কহিল, তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।

কুসুমর রাগ হইল। কিন্তু সংবরণ করিয়া বলিল, ভালই থাক। তবু একবার দেখে এসো গে, খণ্ডরবাড়ি কাল যোয়ো।

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল—কাল গেলে কি করে হবে? সেখানে একটি পুরুষ মানুষ পর্যন্ত নেই। ঘরবাড়ি বিষয়-আশয় কি হচ্ছে, না হচ্ছে—সব ভার আমার, মাথায়—আমি একা মানুষ কতদিক সামলাব বল ত?

দাদার কথার ভঙ্গীতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, পারবে সামলাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও—কি জানি কেন সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন হচ্ছে।

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া অতি রুদ্ধস্বরে কহিল, আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন

আমার বিয়ের সময় আসেনি কেন এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক সে, একবার জানতে পারল না, ওনি?

কুসুমের উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শাস্তভাবে বলিল, তাঁর ছর হয়েছিল। হয়নি। নলডালার বসে মা খবর শুনে বললেন, মিছে কথা, চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাজ নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন তা জানিস? নেমকহারাম আর কা'কে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখতেও চাইনে। বলিয়া কুঞ্জ গভীরভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বস্ত্রহাতের মত করেক মুকুট ভক্স থাকিয়া যীরে যীরে বলিল, নেমকহারাম তিনি! নুন ঠাণ্ডে সেইদিন কেন্দ্র করে খাইয়েছিলে, যেদিন ডেকে এনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই সে যেন শুনিতেই পাইল না, এই রকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরায় কহিল, যা তুমি তোমার বিষয়-আশয় বলচ, সে কা'র হত? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কে কা'র বিয়ে দিয়ে দেয়? মা বলেন, ফুল ফুটলে কেউ আটকাতে পারে না। বিয়ে আপনি হয়।

আপনি হয়?

হয়ই ত।

কুসুম আর কথা কহিল না, যীরে যীরে ঘরে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘুণায় তাহার বুক ফাটিয়া বাহিতে লাগিল। হি হি, এ-সব কথা যদি তাঁহারা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাহাদের মনে হইবে, এই দুটি ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট-কুড়ি পরে নুতন জুতার মচমচ শব্দ শুনিবা কুসুম বাহিবে আসিয়া ভিজ্জাসা কবিল, কবে ফিরবে?

কাল সকালে।

অম্মাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় কবে না? লজ্জা হয় না?

কেন, এখানে কি বাধ-ভালুক আছে যে তোকে ধৈর্য ফেলবে? আমি সকালেই ও ফিরে আসব, বলিয়া কুঞ্জ খণ্ডরবাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুভূত দুঃস্বতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেমনি মুখের চেহারা করিয়া কৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে মাপ কব মা, কুসুম দাম আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সাবা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মা ঠাকুর-ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত কবিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি করবি?

তোমার দাসী আনব। যে চরশকে দেখবে, তোমার সেবা করবে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুর-ঘরের কাজ করতেও পারবে। কুসুম দেবে ত মা? প্রশ্ন করিয়া কৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত-দৃষ্টিতে জননীর মুখে পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। করণ, স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুকাল যৌন থাকিয়া ভিজ্জাসা করিলেন, এ কি তুই সত্যি বলছিল কৃন্দাবন?

সত্যি বৈ কি মা! ছেলেবেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান; কিন্তু বড় হয়ে তোমার সামনে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা।

আজ্ঞা, ভেবে দেখি, বলিয়া মা একটু কাজে মন দিলেন।

কৃন্দাবন সুস্থে আসিয়া বলিল, সে হবে না মা। তোমাকে আমি দাবতে সময় দেব না। বা হোক একটা হুকুম দিয়ে এ ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নির্যেই যাব।

কেন ভাবতে সময় দিবনি?

তার কারণ আছে মা। তুমি ভেবে-চিন্তে যা বলবে, সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভালমন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।

মা মুখ তুলিয়া কণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধাসাধি করেছিলুম, তখন ত ওনিস নি কৃন্দাবন?

তা জানি। সেই পাণের ফলই এখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, বলিয়া কৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে এবং ইহা কাজে পরিণত করিতে তাহার যে বিরূপ বাঞ্ছা, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মার চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, এখন থাক কৃন্দাবন, দু'দিন পরে বলব।

কৃন্দাবন জিদ করিয়া কহিল, যে কারণে ইতস্ততঃ করচ মা, তা দু'দিন পরে হবে না। যে তোমাকে অপমার করেছে, ইচ্ছে হয়, তাকে তুমি ক্ষমা করো, কিন্তু আমি করবো না। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। কণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আজ্ঞা, অনুমতি দিলুম।

এ নিশ্বাসের মর্ম কৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু সেও আর কথা কহিল না। নিশ্চক্ষে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পতিতব্রজায়, আপনার চিঠি, বলিয়া পাঠশালের এক ছাত্র আসিয়া একখানা পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি কৃন্দাবন?

জানিনে মা, দেখি, বলিয়া কৃন্দাবন অনামনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। বুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অকরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কটাকুটি নাই, বর্ণতচ্ছিন্ন নাই, উপরে খীচরণকমলেবু পাঠ লেখা আছে, কিন্তু নাচ দস্তবস্ত নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্বে না দেখিলেও তৎক্ষণাৎ বুঝিল, ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে—দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিন্তিতে পারিবে না। কেন, তাহা অপরকে কিছুতেই বলা যায় না, এমন কি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হ'ইবে। তিনি আবার আজও স্বস্তরবাড়ি গেলেন। হরত কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাছ-ভালুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা তাহার নাই। তোমার প্রত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বলে নাই। সারাদিন অকৃত্য। ভয়ে ডাকনায় সহস্রবার ঘর-বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উজ্জ্বল হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রছিল এ এবং এই নির্জন নিস্তব্ধ বসতিতে সমস্ত রাত্রি নিম্নে নিম্নে একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারবার তাহার গায়ে কাঁটা দিতে লগিল, এমন সময়ে বাহিরে চরণের স্তম্ভ-কঠোর মাতৃ-স্বোচ্চ গুনিয়া তাহার জলমগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ স্পষ্ট হইতে পা দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহাঙ্গারদির পরে কুন্দাবনকে নতুন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ চরণ, তোমার বাবা কি কচ্ছেন?

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুটলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া; বলিল, আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।

কুসুম হাতে লইয়া বুলিল, তাহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, নিরেই বাবা চলে গেলেন।

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে চলে গেলেন রে?

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, ঐ যে হোথা থেকে।

এ-পারে এসেছিলেন তিনি?

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, হী, এসেছিলেন ত।

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যেদিন বিগ্রহের তিনি একবিন্দু ভাল পর্বন্ত না খাইয়া চরণকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সে-ও রাগ করিয়া বিতীর্ণ অনুরোধ করিল না, বরং শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা দিলেন না। আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মিটিতে পারে, কিন্তু অন্তর্বাশী জানান, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ির শব্দ শুনিলেও তাহার শিরার রক্ত কিভাবে উদ্গম হইয়া উঠে এবং কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাত্রে আসিলেন না, আজ আসিয়াও ঘরের বাহির হইতে নিঃশেষে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার সেদিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যেদিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হটত শুনিয়া আসিয়াছিল, ভগবান তাহাদের জিনিস তাহাদিগকেই প্রত্যাগণ করিয়া দিয়াছেন।

অবশেষে সত্যি এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে ও কষ্টী রাখে নাই! বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মাকেও অপমান করিতে ছাড়েন নাই। কলকাতার নিমিত্ত সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, সেদিন এত বড় দুর্ঘতি তাহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে সম্বন্ধ সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, এখন তর্ক করিতে লাগিল; কেন, একি আমার নিজের হাতে-গড়া সম্বন্ধ যে, আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি যাইবে, সত্যি তিনি যদি স্বামী নন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের দুটো দুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্তায়, একটি বেলায় অতি ক্ষুদ্র একটুখানি সেবার এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল—কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে-কোন লপথ করিয়া বলিতে পারি। যা শুধু অপমানের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া এই দূরপনয়ে কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাধিয়া দিয়া গিয়াছেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মনে মনে বলিল, যা মরিয়াছে, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবাব আর পথ নাই, কিন্তু আমি যাই বলি না কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধর্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যান্য স্পর্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্শ পা দিয়া ভাদিয়া গুড়িয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না? অস্বীকার কবিবাব, প্রতিবাদ করিবাব আমি কেই নয়, কিন্তু তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাহারও ত নাই!

হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বকলগ চরণের তত্ত্বা ভাদিয়া গেল— কি মা,

কুসুম তাকে বুকে চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, কাকে বেশী ভালবাসিস বল ত চরণ? তাঁর বাবাকে, না আমাকে?

চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমাকে মা।

বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?

হী, দেবো তোর বাবা বখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে তাহার দিবি ত?

হী, দেবো।

কোন অবস্থায় কি দিতে হইবে, ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অঙ্গে কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া কঁোটা কঁোটা ভাল করিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ

সুখিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে করিল, কুম্ভ কি। আশ্চর্য হইল। আর কেহ আসিয়া না যিক্ সে সেবেই।

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে মাড়াপুর নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল, এক বৌড়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানানিধি করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শাওড়ী। ওধু কৌতূহলবশে জামাতার কুটারখানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র বন্যা-রক্তাকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কি না।

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার লিঙ্গ নন্দনে সৌন্দর্য্য অসীম। রাশিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্তকাজ-বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আশ্চর্য্য প্রকাশের রাসি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া বুলিতেছিল। তাহার বামকণ্ঠে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বান্ধ হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি কুম্ভ-জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাড়মুষ্টি কলসিও কোম্পাড়ে এবং যখন পড়ে, তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হী করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাওড়ী বলিয়া উঠিলেন, এই কুসুম বৃদ্ধি ?

কুঞ্জ বৃদ্ধি হইয়া কহিল, হী মা, আমার বোন।

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তাই কুসুম সেইখানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়াবৎ স্খলিত চরণও প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, এ ছেলটিকে কোথায় দেখেচি যেন।—ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আশ্রয়প্রিয় দিয়া কহিল, আমি চরণ। ঠাকুরমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামাবাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সম্মুখে হুসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, ছি বাবা, বলতে নেই! মামীমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বলতে হয়।

কুঞ্জর শাওড়ী বলিলেন, কেনা বোষ্টমের ছেলে বৃদ্ধি? একফোটা ছোড়ার কথা দেখ!

লাকণ বিন্ময়ে কুসুমের হাসিমুখ একমুহুর্তে কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরাক্ষর অসিদ্ধি। অশ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পর, ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া স্নানার্থে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ এ কি ব্যাপার হইয়া গেল।

কুঞ্জ নির্বোধ হইলেও শাওড়ীর এত বড় রুদ্ধ কথাটা তাহার কানে বাজিল। বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিতে, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অস্থির উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুদ্ধিমান ছিল, কুসুম ইহাকে ভ্রার কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাওড়ীও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাঁহারও অভিপ্রায় ছিল না। ওধু লিঙ্গ ও অভ্যাসের দোবেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রাত্রাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরসে পান কাপড়, সিন্ধু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে ডাঙ্গা এবং বাঁধু—নিজের শাওড়ীর তুলনা করিয়া তাহার গুণা বোধ হইল।—স্নানার সহিত তাহার কথাবার্তা হইতেছিল, ছি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে তাহা বেশ বৃদ্ধিতে পারিল।

তিনি পান এবং মোকড়া কিছু বেশী খান। সকাল হইতে শুরু করিয়া পরদিনটাই সেটা ঘনঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলকসেবা অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আসিয়াছিলেন। ছোট ভাগলিটি পর্যন্ত তুলিয়া আনেন নাই।

কুসুম নিত্যপূজা সারিয়া রাঁধিতে বসিয়াছিল, তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিকে ওদিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, কে গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলকসেবা করেন না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাবা?—কুসুম সংক্ষেপে কহিল, আমি ওসব করিনে।

করিনে বললে চলবে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্যন্ত খাবে না যে।

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তাহলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি?

আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুন—কিন্তু পরে খাবে না ত!

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চরণ কখন এল কুসুম?

কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জর শাওড়ী কহিলেন, এই তুমি, কেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে-চাকর গাতিয়ে দিয়েছে ত!—কুঞ্জ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় গুনলে মা?

মা গাষ্টীরের সহিত বলিলেন, আমার আরও চারটে চোখ-কান আছে। তা সত্যি কথা বাছ। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাচাঁটা করলে ভবু তোমার কোন রাস্তা হ'ল না। লোকে নানা কথা বলবেই ত। পাড়ার পাঁচজন ছেলে-ছোকরা আছে, তোমার কোনের এই সোমন্ত বয়স, এমন কাঁচা-সোনার রঙ—লোকে বলে, মন না মতি, পা কস্কাতে, মন টলতে কতক্ষণ বাছা?

কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, সে ঠিক কথা মা।

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ দ্রুত করিয়া কহিল, তুমি এখানে বলে কি কত দাদা! উঠে যাও।

কুঞ্জ খতমত বাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাওড়ী উখ হইয়া বলিলেন, দাদাকে ঢাকলেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছ! এই যে তুমি নীচে চান করে ভিজে কাপড়ে ঢুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখলে মূনির মন টলে কি না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি?

কুসুম চোঁচাইয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনো না—যাও এখান থেকে।

তাহার চীৎকার ও চোখমুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলালিল। কুসুম উঠান হইতে তরকারির কড়াটা দূর করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতগমে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাওড়ী মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাহার ধারণা; এই সহায়-সম্বলহীন মেয়েটা তাহাকে যে হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাঁহিতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেন, তাহা না বুঝিলেও সেদিন দাদার শাওড়ী যে বিবান-সজ্জ করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া, তাহার বলার রসটা ঠিক এই রকম গুনাইল, যেন কল্যাণ একসময়ে প্রবেশপটুকু খালি সজ্জও কুসুম বিশেষ কেন গুঢ় কারণে যায় নাই। সেই গুঢ় কারণটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাহার ত অগোচর নাই-ই, কল্যাণ নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইমিতই কুসুমকে অমন আশ্বহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি অমন করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাওয়ারটা তাহারো যে ভাল কাজ হয় নাই, ইহা সে নিজেও টের পাইয়াছিল।

কুঞ্জর শাওড়ী সেদিন সারাদিন আহার করেন নাই, সেবে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘটি-মানার রাস্তা করিয়াছিলেন। তাহার মান রন্ধার জন্য কুঞ্জ সরস্বতিন ভগিনীকে ভৎসনা করিয়াছিল, কিন্তু রাগারাগি, মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার বাঁহিতে বলে নাই। পরদিন বাটা কিরিবার পূর্বে, কুসুম প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাওড়ী কথা কহেন নাই এবং জামাইকে উপলব্ধ করিয়া কহিয়াছিলেন, কুঞ্জনাথকে ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি দেখতে হবে, এখানে কোন আগলে বসে থাকলেই ত তার চলবে না!

কুসুমের শিক হইতে এ কথার জবাব ছিল; তাই সে নিরুদ্ধর অসোচ্চবে তলিয়া গিয়াছিল। সত্যই ত! দাদা এমিক ওমিক দু'দিন সামলাইবে কি করিয়া

তখন হইতে প্রায় ত্রাস-সুই পত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাওড়ী যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া লইয়াছে। এখন প্রায়ই সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু যদি সে জানিত, সংসারে ইহারই এরূপ হয়, এতটা পরিবর্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের ঘামাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। তাই-কেনের সে স্নেহ নাই, এখন কলহও হয় না। কলহ করিতে

কুসুমের আর অনুভূতি হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন এক রাত্রি বাড়িতে একা থাকতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য দুখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভলিয়াছে।

তথাপি এসব দুঃখও সে ভত গ্রাস্য করে না, কিন্তু সে যে দাদার গলগ্রহ ইহয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উত্তিতে বলিতে বিধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও, বোধ করি দাদা একবার কামিবে না—এককোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে দাদার এই নিষ্ঠুর ক্রটি সে তখনি নিজের চোখের জল দিয়া কালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে, আর সেদিন দোর খোলে না। জন্ম বড় ভায়াতুর ইহিয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু সে-ই মা মা করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে, এবং কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সন্ধ্যা এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে যে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্পল হইল। কারণ যে প্রত্যন্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল, তাহা ত আসিলই না, দু'ছত্র কাগজে-লেখা কবাবও আসিল না। শুধু আসিল কিছু টাকা। বাধা ইহিয়া, নিরুপায় ইহিয়া, কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি যে হটল, মুদুকটে বলিয়া বসিল, এক্ষণি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না!

কুঞ্জ হাত ফিরিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, যা ভেবেছি তাই। অমনি পেছু ডেকে বসিল। দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু এই অকারণ মুখ-বিকৃতিতে তাহার সর্বাপেক্ষে আগুন ধরিয়া গেল, সে পালটা মুখ-বিকৃতি করিল না বটে, কিন্তু অতি কঠোর-বরে বলিল, তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মরবে না। না হলে, আর পর্যন্ত যত পেছু ডেকেছি, মানুষ হলে মরে যেতে। আমি মানুষ নই?

না। কুকুর-বেড়ালও নও—তারা তোমার চেয়ে ভাল—এমন নেকহায়ায় নয়, বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ দুটের দ্রুত একদুজন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরের দরজা তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ দিয়া ঘন্টা-খানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

কুঞ্জের ঘর ভালো-বন্ধ, কুসুমের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—রান্নাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আহ্বায় পরিত্যাগ করিয়া কেউ করিয়া লজ্জা ও আপেক্ষ জানাইয়া ফাঁয়া বাহির হইয়া গেল।

কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকী আছে—উনান নিবিয়া গিয়াছে। চক্কা চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট-মশেক পরে সু-উজ্জ্বল সন্ধ্যা-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ি ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতেই তাহার অন্ধ-কম্বাধিত দুই চোখের লাভ বিপর্যয় দৃষ্টি সর্বত্রই বৃন্দাবনের বিস্তার-বিহুল জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, করনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় ঢুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া কানু জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোল লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাদ-কাদ হইয়া বলিল, মা কাদচে বাবা!

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম তখনও নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই; জবাব দিতে পারিল না।

বৃন্দাবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?

কুসুম রুদ্ধভাবে কহিল, মরে গেছে।

আহা, মরে গেল! কি হয়েছিল?

তাহার গম্ভীরমুখে যে ব্যঙ্গ সঙ্কল্প ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া ছলিয়া উঠিয়া বলিল, য়েথ, তাম্রালা স্ব রো না। মোহ আত্মার ছায়ে পুড়ে যাতে, এখন ওসব ভাল লাগে না। তোয়াকে ডেকে পাঠিয়েচি বলে কি এমননি করে তার শোধ দিতে এলে? বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চাপা-কান্না বৃন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহা তাহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে পাঠিয়েচ কেন?

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারী গলায় কহিল, না এলে আমি বলি কাকে? আগে বরং নিজের কাজেও এদিকে আসতে যেতে, এখন ভুলেও আর এ-পথ মাড়াও না।

বৃন্দাবন কহিল, ভুলতে পারিনি বলেই মাড়াই নে, পারলে হয়ত মাড়াইতুম। যাক্ কি কথা।

এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায়?

বৃন্দাবন হাসিল। তার পরে শাস্তকণ্ঠে কহিল, তাড়া দিইনি, ডাকডাকেই জানতে চাচ্ছি। যেমন করে বললে সুবিধে হয়, কোন্ ত ভূমি তেরনি করেই বল না।

কুসুম কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে আমি অনেকেদিন আপেকা করে আছে—আমি চুল এলো করে, পথেঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই, এ কথা কে রটিয়েছিল?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাধ হইয়া থাকিয়া বলিল, আমি। তারপরে?

ভূমি বটাবে এমন কথা আমি বলিনি, মনেও ভাবিনি, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেদিন বলেওছিলে, ভেবেওছিলে। আমি বড়লোক হয়ে শুধু তোমাদের জন্ম করবার জন্যেই মাকে নিয়ে তাইদের নিয়ে গেলো এসেছিলুম—সে পেরেচি, আজ আর পারিনে? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড়নি!

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েছে। তখন তোমাকে আমি চিনতে পারিনি।

এখন পেরেছ?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাঁড়িকুড়ি রান্নাবান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল।

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চাক্ষু্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, যাক্ গে। আমি ও খাবো না—আগে জানলে রাঁধতেই বেতুম না।

আজ একাদশী বুধি? কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, জানিনে। ওসব আমি করিনে।

কর না?

কুসুম ভেমনি অন্তঃস্বরে নিরন্তর রহিল।

বৃন্দাবন সন্দেহবশে বলিল, আগে করিতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উজ্জ্বল হইয়া কহিল, করিনে আজ্ঞা ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্বনশ করতে চায় না, সেইজন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু সত্যি বলচি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেটা স্ব রো না। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হুন্ কেন?

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, সে আর এক মহাভারত—তোয়াকে শোনাবার আমার খেঁব নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে সেন্তে তুলতে পারবেন না—তার শাস্ত্রীর হুকুম নেই। খেতে পরতে সেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হ'তো। এখন আমি—সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া

দেখিল, আর বলা উচিত কি না। তারপর বলিল, এখন আমি তোমাদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই একদিন একদণ্ডও এখানে আর থাকতে চাইনে।

বৃন্দাবন সহাস্যে প্রস্থ করিল, তাই থাকতে ইচ্ছে নেই?

কুসুম একটাবার চোখ তুলিয়াই মুখ নীচু করিল। এই সহজ সহাস্য প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিল, চরণ তার মায়ের ভায় মিচরই দেবে, কিন্তু কোথায় থাকতে চাও তুমি?

কুসুম তেমনি মতমুখেই বলিল, কি করে জামব? তাঁরই জামেম।

তাঁরা কে?—আমি?

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জ্ঞানহিল।

বৃন্দাবন কহিল, সে হয় না। আমি তোমার কোম বিষয়েই হাত দিতে পারিনে। পারেন শুধু মা। তুমি যেখন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে থাক না কেন, চরণের হাত ধরে যাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেনই। কিন্তু, তোমার দাদা?

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, বলেচি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু কি করে আমি দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?

বৃন্দাবন বলিল, তা জানিনে, কিন্তু পারলে ভাল হ'ত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখতে পাইনে।

কুসুম কঁাকা কঁাকা পাঁকিয়া বলিল, আমি যাব না।

খুশী তোমার।

সংকীর্ণ সরল উত্তর। ইহাতে নিহিত অর্থ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই। এতকণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।—বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সে উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর অতিশয় মন ও কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু এখানেও আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেননা, নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করিতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?—বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেলা হ'ল। চরণ, তুই থাকবি, না যাবি রে? থাকবি? আচ্ছা থাক। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ও-বাড়িতে ওর হাত ধবে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব মস্ত অপমান হ'বে না। যাক চললুম, শিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ও-জ সমস্ত বুঝলুম। আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে, বেলা হ'ল চললুম, আমি কত নিরাশ্রয় তা স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আর কিছু নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বৃন্দাবন ক্ষুণ্ণ ও বিম্বিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং তুমিই নিতে বারংবার অস্বীকার করোচ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্ঘটনা হয়েছিল—মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপর্যবসন্ন করে আমার মা, স্বামী, পুত্র, ঘরবাড়ি সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ নিরাশ্রয়। আজ পর্যন্ত স্বপ্নরবাড়ির মুখ দেখতে পাইনি। অপর্যবসন্ন আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে-বাড়ির বঁী। কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের ওলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে, পাঠাতে চাচ্? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমবা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উল্লেখ করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শাস্ত্রিয় মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মালমসলা যুগিয়ে দেব না। বৃন্দাবন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, চললুম। আমার আর কিছুই

বলবার নেই।—কুসুম ভেমনিভাবে জবাব দিল—হাও। দাঁড়াও, আর একটা কথা। দয়া করে মিথ্যে বলো না—জিজ্ঞেস করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করছি—

কৃশাক্ষণ দুই-এক পা পিরাইল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্ত আশ্চর্যম্বিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, ও কি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনিনি। তাহার অর্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদু অশ্রুচূড়াবে কহিল, তা ছাড়া পরের চলাফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিতও নয়। তোমার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাইনে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করিনে, বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহাঙের ন্যায় নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চরণ কহিল, মা, নদীতে নাইতে যাবে না?

কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া এক-পা এক-পা করিয়া ঘরে আসিয়া শয্যায়া ওইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কুশাইয়া কানিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অনেকদিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাহার বাঙ্কনীয় মনে করেন না। ওদিকের কোন সংবাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেকে অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দাদার সেই একই ভাব—সর্বকন্মেই প্রাণ যেন কুসুমের বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাশ্যে বাতীর বাহির হওয়া কিংবা পূর্বের ন্যায় সন্নিদেষের সহিত সেবাসাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাট-বাজার করিয়া দেয়,—এমনি কথিয়া বাতীরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি যথাযথই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল সূচের কাজ করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিত এবং ক্লেহ দিতে তুলিয়া গেলে সেও তুলিয়া যাইত। এই সমস্ত মহৎ গুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সেই সিলাই করিত। আজ অপরাক্রমে নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্ধ-সমস্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের সূচ তাহার অচল হইয়া রহিল, সে সেই প্রথম দিনের আগাগোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল।

যেদিন তাহার সদলবলে পতালক দাদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং বড় দারে ঠেকিয়া তাহাকে লক্ষ্য-শরম বিসর্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ করিতে হইয়াছিল—সেই সব কথা। দুঃখ তাহার যখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া এই স্মৃতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানাভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটিমাত্র চিন্তাকেই অনির্বচনীয় স্বীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাহার সমস্ত তখনকার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া বাহিত। দুঃখের সেই বাণ-প্রতিবাদ, অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তার পরে রাখিয়া বাড়িয়া পরিকল্পন করিয়া স্বামী-সেবকদিগকে খাওয়ানো, শাতড়ীর সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্য সেই অবশিষ্ট শুষ্ক শীতল, বা হোক কিছু।

তাহার চোখ নিরা টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নারীসেহ ধরিয়া ইহাশেখা অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না, কামনাও করিত না। তাহার মনে হইত, যাহারা এ কার্য নিত্য করিতে পার, এ সঙ্গেতে খুশি তাহাদের আর কিছুই কবী থাকে না।

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেনদিনের কথা। যেদিন তিনি সমদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া

চলিয়া গেলেন। সেদিন সে নিজের বাধা দেয় নাই, বরং হিড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ সঙ্গে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন যত দিন যাইতেছিল, ওই ভয়ই তাহার বুকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যিই যদি সে না আসে, তবে একলগুও সে বাঁচিবে কি করিয়া? আবার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে পূর্বে ছিল, বাহ্য এ দুর্দিনে হয়ত তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষ হুঁহিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরবাসী সুপ্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়া অহনিশি তাহার কানে কানে ঘোষণা করেছে যে, সমস্ত মিথ্যা! তাহার ছেলেবেলায় কলঙ্ক দুর্নাম কিছু সভ্য নয়। সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে এত ভালবাসিতে পারে না; তাহাকে সেবা করিবার, তাহার কাজে লাগিবার জন্য সমস্ত দেহমন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে ভগবান মিস্টারই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন, অন্তরের কোথাও, কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার। গোপালের মা বহুকাল হাটে গিয়াছে, এখন আসিবে, এইজন্য সদর দরজা খোলা ছিল; হঠাৎ ঘর ঠেলিয়া কুঞ্জনাথবাবু চাকর সঙ্গে করিয়া বিলাতি জুতার মচমচ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রুজলবিশত রাসা চোখ লজ্জায় তুলিতে পারিল না।

কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সমুখে আসিয়া কহিল, তোর কৃন্দাকন যে আবার বিয়ে কচ্ছে রে! কুসুমের বক্ষস্পন্দন থামিয়া গেল, সে কণ্ঠে মত নতমুখে বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ গলা চড়াইয়া কহিল, কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি করে জলে বাস করে, আমাকে তাই এইবার দেখতে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের বেটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমিদারিতে বাস করে আমারই অপমান!

কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দ বোষ্টম কে?

কে? আমার প্রজা! আমার পুকুরপাড় ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। সেই ব্যাটার মেয়ে—এই যাক্ষণ মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে—ভূতো, তামাক সাধ্।

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোল নাই, তাই চাকরের আগমন লক্ষ্য করে নাই, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—কুঞ্জ প্রজা করিল, ভূতো, নন্দার মেয়েটো দেখতে কেমন রে?

ভূতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ।

কুঞ্জ আশ্বাসন করিয়া কহিল, বেশ। কখন না, আমার বোনের মত দেখতে? দুঃ—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেচিস?

ভূতো জবাব দিবার পূর্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের সমুখে আসিয়া বলিল, কি রে কুসি, বলেছিলুম না! বেঙ্গা বৈরাগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নৌ—কেমন ফল কি না? মা বলেন, বেদ মিথো হবে, কিন্তু আমার কুঞ্জনাথের বচন মিথো হবে না—ভূতো, মা বলে না?

ঘরের ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না, কিন্তু, কি—একরকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল।

কুঞ্জ কি মনে করিয়া, ঈঁকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া, ঘরের ভেতরে আসিয়া ঝাঁড়াইল।

কুসুম শয্যার উপর উপড় হইয়া পড়িয়াছিল; কখনকাল সেইদিকে চাহিয়া বহুকালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটা জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত, নৈয়া মুছিয়া কেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বলিল এবং বোনের মাথায় একটা হাত রাখিয়া আন্তে আন্তে বলিল, তুই কিছু ভয় করিস নে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখতে পাবি, তোর দাদা যা বলে তাই করে কি না। কিন্তু তুইও ভয়ভয় করতে চাইলি নি বোন—আমরা সবাই মিলে কত সাধাসাধি করলুম, তুই একটা কথাও কারুর কানে তুললি নে। কুঞ্জর শেষ কথাগুলো অশ্রুভারে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর নিজে কে চাপিয়া বসিতে পারিল না—হুৎ করিয়া কানিয়া উঠিল। তাহার জন্য আজও

যে দাদার স্নেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেকদিন ছাড়িয়াছিল।

কুঞ্জর চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সখ্যা হইল। কুঞ্জ আর একবার তাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, তুই অস্থির হ'সমে বোন, আমি বলি যাঁহি; এ বিয়ে কোনমতেই হতে দেব না।

এবার কুসুম কথা কহিল; কানিতে কানিতে বলিল, তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।

কুঞ্জ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল; হাত দেব না? আমার চোখের সামনে বিয়ে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? তুই বলচিস কি কুসুম?

না দাদা, তুমি বাধা দিতে পারবে না।

কুঞ্জ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে জোর অপমান না হয় না হবে, কিন্তু আমি সহিতে পারব না। আমার প্রজা—তুই বলিস কি রে! লোকে ওনলে আমাকে ছি ছি করবে না?—কুসুম বলিলে মুখ লুকাইয়া বাস্তবের মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি হাসা করচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিও না। আমাদের সঙ্গে জাঁদের কোন সম্পর্ক নেই, আর ঘটনাটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে না—বিয়ে হচ্ছে হোক।

কুঞ্জ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, না।

না কেন? আমাকে ভাগ করে তিনি বিয়ে করেছিলেন, না হয় আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুই-ই সমান। তোমার পায়ে ধরচি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে হাস্যামা করে আমার সমস্ত সম্বন্ধ মট করে দিয়ো না—তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।

হুঁ, বলিয়া কুঞ্জ বামিকঙ্কণ গুহ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, জানি ত তোকে চিরকাল। একবার 'না' বললে কার বাপের সাধি 'হাঁ' বলায়। তুই কাবো কথা ভাবি নে, কিন্তু তোর কথা সগাইকে ওনতে হবে।—কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বলিতে লাগিল, আর ধরলে কথাটা মিথো নয়। তুই যখন খবরখবর করবি নে, তখন তখনই সংসারই বা চলে কি করে? এখন না হয় যা আছেন, কিন্তু তিনি ত চিরকাল বেঁচে থাকবেন না।

কুসুম কথা কহিল না।

কুঞ্জ কক্ষকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা কুসুম, সে বিয়ে করুক, না করুক, তুই তবে এত কাঁদচিস কেন?

ইহার আভ জবাব কি?

অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে পুনরায় তাহা প্রবলবেগে করিয়া পড়িতে লাগিল।—কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সেদিনের কথাগুলো স্মরণ করিয়া লজ্জার থিকারে মনে মনে মরিয়া বাহিতে লাগিল। ছি ছি, মরিলেও ত এ লজ্জার হাত হইতে নিদ্ধতিব পথ নাই। এজন্যই তাহার আত্মর দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ সে কতই না সাধিয়াছিল। ওদিকে যখন নুতন করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ির বধূ বলিয়া মর্শ করিয়াছিল। সেখানে কিন্তু পরিমাণ ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পর্বত-প্রমাণ অস্তিম্যান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্মান্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় ঢাপাইয়া দিলে।

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘকাল বাহির হইয়া আসিল—উঃ, এইজন্যই আমার বতাবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিশৃঙ্খল কৌতুহল নাই। আর আমি লজ্জাহীনা, তাহাতে লপথ করিতে গিয়াছিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

কুবাক লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, বাহারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া গণ্য করে। ইহার হাজার রাগ হইলেও সামলহিতে পারে এবং কোনো কারণেই প্রতিপক্ষের রাগাশ্রয়ি হইকাইকি বা উকু তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না।

তথাপি সেদিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অন্যায় অভিযোগে উদ্বেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলো নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই পরদিন প্রত্যহই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ি পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইজিতে বুঝিতে পারিবে এবং হয়ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দূরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল— যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসংকটই হোক, কোন-না-কোন উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া বাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়া ছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুরবেলা গাড়ি একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পণ্ডিতমশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল শুধু ঠাকুরের অরতি-শেষে প্রসাদ ভক্ষণে। এটা বোধ করি, লক্ষ্যবশতই—ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের অমর্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুষ্ক আরতির সময়টায় গৌরাস্ত্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার পদ্মপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে সেদিকেও খরদৃষ্টি রাখিল।

দিন-দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োর সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারম্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসন্ত্রমে উঠিয়া, বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া। চিনতে পারলে না? বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাজ আছে তা পরে জানাব। আমার চিঠিতে তোমার অনেক সূখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্বে একবার দেখতে এলাম—আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃৎকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব ইংরাজী শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। পনের-ষোল বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকেও বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্যবন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব পাঁচ-ছয় বৎসর হইল গম্ভীর, এ. পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষক হইতেছিল, সম্ভ্রান্তি সরকারী চাকরিতে বিশেষ বাইতেছে।

কুশলসি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মামা মিথ্যে কথা বলের কথা, কখনো বাড়িমেও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কিনা তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি তাই, তাই বেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলো বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা বুঝিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার মস্তিষ্কে অগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি তাহারই পরম পুজনীয়

শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, যাক, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বলব না, শুধু আমার মন্তব্য তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, ওনি মাহিনে নাও না, পোড়োদের বই টাই কাপড়-চোপড় পর্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলাম। কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে যোগাড় করলে কি করে বল ত ভায়া।

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বলচি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোনো কাজ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডিত। অন্ততঃ আমার ও এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে লাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে স্টিম হলে তবে গাড়ি চলে, নইলে এতবড় জড় পদার্থটিকে জন-কতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে একটুলও নড়াতে পারবে না। যাক, তুমি এ-সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুলতে না। আমি এইজন্যে বিয়ে পর্যন্ত করিনি যে, তোমাদের মত আমাদের গায়েও লেখাপড়া লেখবার বালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চলল না—ছেলে জুটল না। আমাদের গায়ের ছোটলোকগুলো এমন শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মানসন্ত্রম নষ্ট করে দিন-কতক ছোটলোকদের বাড়ি পর্যন্ত ঘুরেছিলাম—না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাসা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগা ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালা ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, না হে না—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা আমি বলিনি, সে কথা নয়—কি জানো—

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি-কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি, লাঙ্গল ঠেলি, গরু চরাই—ভামাজোড় পরতে পাইনে, সরকারী অফিসের দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে ঢুকলে তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সন্ত্রম নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বলচি ভাই, তোমাকে আমি চাড়াড়বোর মল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেছি। যদি জানতুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কখন এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই! আমার সাতপুরুষ এসেশের ছোটলোকদের সঙ্গে মিলে রয়েছে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এইজন্যই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় জুটেচে; আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসন্তোষে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা ঘৃণে আমাদের অভিমান প্রকাশ করিতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্ভাবী স্বীকার করেন না; তিনি তোমাদের ভাল করাতোও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জার ও কোড়ে অবনতমুখে ওনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় ওতাকাঙক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখিতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বলি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে—যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় ডাক্তার প্রকেশারও আমল পায় না। আমাদের বৃকের মধ্যেও সেখতা বাস করেন, তোমাদের এই অজ্ঞান

করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায্য। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভাল হয়, না হয়, শিকার গুণে আমরা বেশী বুঝি, তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্ছ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্তব্য আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল, দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পনর-আনা লোকই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষাভূষার ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংস্বেবে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকে মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আলঙ্কার আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলে-পিলেদেব লেখাপড়া শেখাতে যেরো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষাভূষাকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর। তবেই শুণু আমাদের তয় ভাসবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে সমাজ ছেড়ে ক্ষত্রিয় বাবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে না। এ যতক্ষণ না করচ ভাই, ততক্ষণ জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালা ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকের শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি তোমার কথাই সত্য। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাজে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে, আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বললুম, আচার-ব্যবহারে। আমাদের বোল-আনা সংসারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে অর্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা হলে কোনদিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সজ্জা-আহ্নিক কর?

না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের বাম্বা?

প্রজুড়িস্ নেই। খেতে পারি।

তা হলে আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেরদের শিক্ষা দেবার সম্বন্ধ তোমার বিড়ম্বনা—কিংবা আরও কিছু বেশী—সেট লগলে তুমি রাগ করবে?

ধুষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। স্বাদের ভাল করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধি-বিবেচনায় ধর্ম-কর্মে এত ঐগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, সজ্জা হয়, এবার একটু পাঠশালার কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার এসব, বলিয়া কেশব উঠিয়া পাড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া

পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি হইলেও কেশব শহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সন্মোহিত বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই পোড়ার দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রশম্য করিল। বাল্যবন্ধুকে ছার পর্বত পৌছাইয়া দিয়া কৃন্দাবন আন্তে আন্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রশম্য করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেছি—বুঝলে ত?

কেশব সলসল হাসিয়া ‘বুঝেচি’ বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, কৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই মানুষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তার পরে?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙ্গে গেছে। শুধু বন্ধুর মত সন্ধিনেয়ে জিজ্ঞেস করছি, এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেরদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েছে সেখানে ক'খ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কাজ কি গভর্নমেন্টের করা উচিত নয়?

কৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়াদের মত হ'ল।

দোষের জন্য রাখুক মারতে যাও দিকি, সে ভাঙনি দুই হাত তুলে বলবে—পণ্ডিতমশাই, মাথুও করেছে। অর্থাৎ মাথুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাখুর দোষ আর থাকে না। এই দেশজোড়া মুঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে গভর্নমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু তোমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকণ্ডক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

কৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথটা ঠিক হ'ল না ভাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, এ এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরী হয় না কেশব, বরং আশীর্বাদ কর যেন এই ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালায় একটি শর্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে প্রত্যহ বাড়ি যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি-একটি ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙ্গলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ—কি ভয়ানক আশা!

কৃন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে। দুর্বল মুহূর্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু সবল মুহূর্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!

কেশব কহিল, কৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার করে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখলে জবাব দেবে বল?

এ আর বেশী কথা কি কেশব?

বেশী কথাও আছে, বলচি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?

তাও করব, বলিয়া কৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাখায় লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের দোল-উৎসব কৃন্দাবনের জন্মদী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিভেন। কাল ভাঙ্য সমাধা হইয়া নিরাশ্রিত। আজ সকলে কৃন্দাবন অত্যন্ত আত্মবিশ্বস্তঃ তখনও শয্যাভ্যাগ করে নাই, বা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, কৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা।

অবশেষে কৃন্দাবন কঠোর কৃন্দাবন বড়কড় করিয়া উঠিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চিনিনে বাছ, তোর পাঠশালার একটি ছাত্র বাইরে বসে বড় কাঁদচে—তার বাপ নাকি ভেদবন্দি হয়ে আর উঠতে পারচে না।

কৃন্দাবন উর্ধ্বাশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাদিয়া উঠিল। পতিতমশাই, বাবা আর চেয়েও দেখচে না, কথাও বলচে না। কৃন্দাবন সঙ্গেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবুর তখন শেষ-সময়। প্রতি বৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্যন্ত টিকিয়াছিল, কৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টা-খানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক-আধজন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাত্রে তাহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দু টাকা ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ, দীর্ঘ অভিভূততার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন, ধারে কারবার করিলে, এসব রোগে তাহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোকগুলো পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া নুন-জল খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সারারাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকালবেলা এই।

কৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর গতি করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদা-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল তাহার অনশন ও অর্দ্ধাশনক্রিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও কৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক গতি করিয়াছে, শিবুরও গতি করিয়া অপরাহ্নবেলায় ঘাঃঃ ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও কৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আয় বোস যতীচরণ, বলিয়া কৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার-দুই ঠোট ফুলাইয়া ‘পতিতমশাই’ বলিয়াই কাদিয়া ফেলিল।

সদা-পিতৃহীন শিশুকে কৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাদিতে কাদিতে কহিল, কেঁটাও বসি কচো!

কেঁটা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালে লিখিতে আসিত।

আজ রাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই কৃন্দাবনের সহিত কেঁটাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিহ্বা দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু অবশ্য কেঁটা মায়েব বুকফাটা কান্না, চিকিৎসকের মর্বাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হইতে গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাতযশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদা-বিধবা জননীর মর্মান্তিক বিলাপে কৃন্দাবনের বুকেব ভিতরটা ছিড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণ বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে ‘পতিতমশাই’ সহস্রবার মনে মনে বলিল, মানুষের সোবের শাস্তি আর যা ইচ্ছে হয় দিয়া ভগবান, শুধু ও শাস্তি দিয়া না—জানি না, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কিনা, কিন্তু নিজের আর ‘শ’ নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক, তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই-তিন নির্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মরমর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা মধ্যটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক পরে আর্ন্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার-পাঁচটি

ছেলে-মেয়ে রাখিয়া হইলোক ড্যাগ করিয়া গ্রহণ করিল।

এইবার গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাহিবার স্থান ছিল, সে পলাইল; অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারাতীততক-মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, অল্পকাল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব?

বৃন্দাবনের বাড়ির সুমুখ দিয়াই গ্রামের বড় পথ, তথায় যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা বাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেইই অল্পকাল প্রতিনিয়ন্তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশপাশের গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাড়লের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই-চারটা পুষ্করিণী পূর্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ কাহারো তাহাতে ভ্রুক্লেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহাৰ্য্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তাহার ভালমন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পান না, অথচ মহামারী প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধ-পথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহের সংস্কার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

ওখু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু বাতীত এই পাঁচ-সাতটা বাতীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের পিতা নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখন দুষ্ট হয় নাই, প্রতিকৌশলী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু, প্রতিদিন বৃন্দাবন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের মুখের পানে চাইলেই তাহার বুকের রক্ত ভোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্যে অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতাপুত্রের মাৎসর্য্যানে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে! তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু গুলিলেই চমকাইয়া উঠে। ডাক্তার আসিলে যায় বটে, কিন্তু তাহার চির দিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। মৃতদেহ সংস্কার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাক্তারিত, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্বাত্মক কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন সংক্রামক বীজ বৃথি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে তাহাকে বাহিরের সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্রিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এ বিষয়ে মাকেও যেন সে সর্বাঙ্গঃকরণে বিশ্বাস করিতে পরিতোছিল না। এমন সময়ে একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিকৌশলী তারিণী মুখুয়োর ছোটছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; বরং তারিণী তাহার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর না বাবা! এবার চরণকে নিয়ে কুই বাহিরে যা।

বৃন্দাবন ছলছল চক্ষে বলিল মা! তুমিও চল।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরঘর ফেলে রেখে!

পুরুতঠাকুরের ওপর ভার দিয়ে চল।

মা অধিকতর বিবিস্ত হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরের ভার অপরে নেবে, আর আমি পাগিয়ে যাব?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, তা' নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে ফিরে এসে ফুলে নিয়ো।

মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয় না বৃন্দাবন। আমার শাওড়ীঠাকরুন এ ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি, তবেই দেব, না হলে আমারই মাথায় থাক। কিন্তু, তোরা যা।

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, এই সময়ে কি করে তোমাকে একা রেখে যাব, মা? ধর যদি—

মা একটু হাসিলেন। বলিলেন, সে ত সুসময় বাবা, তখন জানব, আমার কাজ শেষ হয়েছে, ঠাকুর তাঁর ভার অপরকে দিতে চান। তাই হোক বৃন্দাবন, আমাব আশীর্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা, আমি আমার ঠাকুরঘর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

জননীর অবিচলিত কঠোর অন্ত্র পলাইবার গাশা বৃন্দাবনের তিরোহিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়রূপে কহিল, তাহলে আমারও যাওয়া হবে না। তোমার ঠাকুর আছেন, আমারও মা আছেন। নিজের জন্য আমি এতটুকু ভয় পাইনি মা, শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই আমি থাকতে পারিনি। কিন্তু যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে থাকব। এখন থেকে আর তুমি আমার শুকনো মুখ দেখতে পাবে না মা।

তারিণী মুখখোর ছোট্টেলে মরিয়াছে। পরদিন সকালেবেলা, বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল। তাহাদের পুকুরের খাটের উপরেই একটি ঈলোক কতগুলি কাপড়চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাঁকী আছে। বহুশওগুলিও চোহরা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিলবিয়া উঠিল নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধরূপে কহিল নড়ান কাপড় চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করছেন?

ঈলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল, তাই বোঝা গেল না। বৃন্দাবন বলিল, যতটা খনায় করছেন, তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু আর ধোবেন না—উঠে যান।

সে পরিদ্রুত অপরিদ্রুত বহুগুলি তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়। থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দোঁলল। তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পূত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখমুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নাবতে দাওনি? বৃন্দাবন কহিল, তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেছি।

তারিণী চোঁচাইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় ধোবে? থাকা বাড়লে ধুতে যাবো সন্ধিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাব বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে গ্রামগকে কষ্ট দিতে বর্বংশ হবি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর খড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু চোঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয় : তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি এক উচ্ছন্ন যাই, তত ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করছেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না?

ব্রাহ্মণ উজ্জতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নামতে দেব না।

নাবতে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে?

বৃন্দাবন কহিল, এখানে থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারব। কাপড়চোপড় ধুতে মল মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে?

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী ঢাকর নেই, তখন মানুষ হ'ল ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর,

আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত মিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন ভরসাভীর্ণ অপেক্ষা না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, হী, বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্ছে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ নাকি?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাগড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জল তোলা বন্ধ করিনি।

ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

বিজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, এ তোমার অন্যান্য জিদ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলাবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন এক কথা একশবার বলিতে বলিতে পরিব্রাজ হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ মলে ও-সব পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ও-সব চলবে না, বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বৃন্দাবন ঠিক জানিত, এইখানে ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুষ্করিণীর জল পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্তদিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সংবাদ দিল, পুকুরের জলে কাগড় কাচা হইতেছে এবং তারিণী মুখযো কিছুতেই নিবেধ গুনিতেছেন না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তারিণীর বিধবা কন্যা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোট-বড় অনেকগুলি বস্ত্রখণ্ড জলে কচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে, তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

ছান্দশ পরিচয়

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোব মায়ের কাছে বাবি রে চরণ?

চরণ নাচিয়া উঠিল—বাব বাব।

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে?

চরণ ভৎস্কাপাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, পারব।

বস্ত্রতঃ এ-দিকের সূক্ষ্ম বাঁধাধরা আঁটারাটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাবীদের মুখ দেখিতে পর্বস্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ি, মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কিরকম একটা তীতসন্ত্রস্ত ভাব ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ দিকে মায়ের অগাধ রোহ, অব্যবস্থানতা—স্নান, আহার, খেলা কিছুতে নিবেধ নাই, হাজার সোব করিলেও হাসিমুখে সঙ্গের অনুযোগ ভিন্ন, কাহারও ভুলটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য হটকট করিতে লাগিল।

তবে বা, বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাল জামার-কাগড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া পাড়িতে তুলিয়া দিল এবং সজল-চক্রে ঘেঁসের মুখচুষন করিয়া

তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দু'থের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুকূল সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ না হোক, একদিন অন্তরও সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ি যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হঠাৎ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে কুসুম রাগ করে। মনে মনে বলিল, না, কাজটা ঠিক হ'ল না। অত বড় একজিঙ্গী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে হয়ত উলটো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠবে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটয়া অবিলম্বে গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সুমুখে আসিয়া, বাহির-বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া গেল। চারিদিকে অপরিস্রব—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাদা পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিকে দেখিয়া স্বর্বাঙ্গ অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষুর নিম্নে পিছাইয়া ধরে ঢুকিল। চরণ পূর্বের মত মহোদ্বাসে চৌচামেচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন দ্বিগুণে কঁদিল, কুঞ্জনাথ কৈ?

কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন কহিল, দেখে মনে হয় এ যেন পোড়ো-বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না?

কোথায় ছিলে?

মাস-খানেক পূর্বে কুসুম দাদার শাওড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল, এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছিলুম।

অন্যভাবে কুসুম সর্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এক্ষণে তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটা বসবার জায়গা দাও।

কুসুম তেমন অবজ্ঞাতরে বলিল, কি জানি, কোথায় আসন-টাসন আছে, ব. ১ দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এতবড় অবহেলা তাহাকে সজ্ঞারে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনাবশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল না, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, নম্রস্বরে বলিল, আমি বৈশীকণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যেজন্য এসেছি, বলি। আমাদের ওখানে ভারী ব্যারাম হচ্ছে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিল না, তীব্র অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, ওঃ—তাই দয়া করে নিয়ে এশেচ? কিন্তু অসুখ-বিসুখ নেই কোন দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড় করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, আমি যে সাহসে করি, ঠিক সেই সাহসে। তা'ছাড়া তোমাকেই বোধ করি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত মিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, মা, বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাকব—নাইতে যাবে না, মা?

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে তনাইয়া কহিল, আমার কাছে তোমার থেকে কাজ নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।

বৃন্দাবন অভিযর্থন স্বান একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাও শুনেচ। আজ্ঞা, বলচি তা' হলে। মা একা

আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

থামল কেন?

তার বিশেষ কারণ আছে, সে-কথার আর কাজ নেই।—চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়ছে।

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না করিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট দুই পরে বৃন্দাবন গভীরস্বরে ডাক দিয়া বলিল, আর দেরি করিস্ নে রে, আয়, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনদের আদেশ পালন করিতে শিখিয়াছিল, তথাপি সে মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুদ্রমুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়োয়ান গরু দুটাকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার কাঁক দিয়া স্বামীর ঘুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় ক্লম ও পাণ্ডুর; হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, একবার শোনো। বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, কি?

তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল?

না।

তবে, এমন কেন?

তা ত বলতে পারিনে। বোধ করি ভাবনায় চিন্তায় শুকনো দেখাচ্ছে।

ভাবনা চিন্তা! স্বামীর শীর্ণমুখের পানে চাহিয়া তাহার জ্বালাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথাই পুনর্বীর জ্বলিয়া উঠিল। স্নেহ করিয়া কহিল, তোমার ত খোলো-আনাই সুখের! ভাবনা-চিন্তা কি শুনি? বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ি প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেল বৃন্দাবন কহিল, তোর মাকে প্রশ্নাম করে এলিনে রে?

সে নামিস আসিয়া ঘরের-বাহিরে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল ছুটিয়া পালাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এ কথাটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, কে জানে, যদি আর কখন না বলতে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই! আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাই দিলে না, কিন্তু আমার অবর্তমানে দিয়ো।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—ও সব আমি শুনেও চাইনে।

তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলুম।

আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, তবু সেই রাগের কথা। কুসুম, শুনি তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে কমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা কেন শেখোনি! কিন্তু তুমি চরণের মা, এই অংগার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে কার হাতে হয় বল?

কুসুম হঠাৎ এ কথার জবাব বুঝিয়া পহিল না।

গরু দুটা বাড়ি ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, বাবা এসো না!

কুসুম কিছু বলিবার পূর্বেই বৃন্দাবন 'যাই' বলিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

কুসুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোকগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, মা হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াছ মা! যদি, যখনই আমার

অজ্ঞানে কলকে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছে, যদি সত্যিই নিজের দ্বিগত মর্শের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছে, তবে সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন? কার ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এমন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে? আমার অস্ত্রধারী বাহাদুরগণকে স্বামী-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সে-কথা সপ্রমাণ করিতে পারিত, কোন নিলজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাথিনীর মত নিজের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত? কিংবা সত্যিই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জ্ঞানিতে পাই না কে? তখন কার সাধ্য বিধবার সম্মুখের রূপের গোতে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত?

একস্থানে একভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাত-জোড় করিয়া বলিল, ভগবান, আমার যা হোক একটা উপায় করে দাও। হয় মাথা তুলিয়া সগর্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয় ছেলেবেলার সেই নিশ্চিত্ত নির্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরিয়া দাও, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

ব্রজেন্দ্র পরিচ্ছেদ

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সেদিন দাদার মুখে এই সংবাদ শুনিবার পরে, কি করি, কোথায় পালাই, এমন যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শান্তদীর সঙ্গে দীর্ঘে যাইবার প্রস্তাবে সে বিনাবাক্যব্যয়ে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। কুঞ্জর শান্তদী কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই মত ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব ছোটখাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য কুসুমের ছিল না, নলডাঙ্গায় ফিরিয়া যখন সে বাড়ি আসিতে চাইল, এবং তিনি সাপের মত গর্জন করিয়া বলিলেন, স্যাপার মত কথা বলো না বাছা। আমাদের বড়লোকদের শব্দর পদে পদে—তুমি সোমন্ত মেয়ে, সেখানে গড়ে থাকলে, আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারব না। তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই।

তিনি কণ্ঠকে পরে কহিলেন, ইচ্ছে হয়, দাদার সঙ্গে যাও, ঘরদোর দেখে দাদার সঙ্গেই ঘিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

কুসুম তাহাতেই রাজী হইয়া কাল সন্ধ্যায় ঘরদোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার ঘণ্টা-দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারি চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, স্নানাহার করিয়া নিদ্রা দিল এবং বেলা পড়িলে বোনকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম ঘরদোরে চাবি দিয়া নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া বসিল। সে জানিত, দাদা ইহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই, সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনই কলহাতু। বয়স এখনও বর পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু তাহার কথায় বীধুনি ও বিবের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে কি জানি কেন, চোখের দেখামাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুশী হন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিলেন।

বাড়ির সম্মুখেই পুষ্করিণী, তিন-চার দিন পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলো বাসন লইয়া খুঁইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হাঁ ঠাকুরবি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?

মা অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র প্রশ্নবাক্যে প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন, এ তোমার কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?

মেয়ে উত্তর দিল, আপনার জন আমার, তোমার এ কে যে, পুণ্ডী মানুষকে দিয়ে দাসীবৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না?

প্রত্যুত্তরে মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হইতে বাসনগুলো একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম তন্তুবুজির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া

তা যাক বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই-তিন দিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগ-খাল করিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাহার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইল।

কাল রাতে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী স্নানাহ্নিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, মা ভোল ফেরালেন কেন, তাই ভাবচি ঠাকুরবি!

কুসুম চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মেয়ে মাকে বেশ চিনিত, তাই দু'দিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধ করিয়া মনে মনে আশুন হইয়া উঠিল।

গোবর্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোনপো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঞ্জা-গুলি খাইয়া চেহারাটা এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স পঁয়ত্রিশ কি পঁয়ষট্টি, তাহা ধরিবার জো ছিল না। কেহ মেয়ে দেয় নাই বলিয়া এখনো অবহেলিত। বাড়ি ও-পাড়ায়, পূর্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু সম্প্রতি কোন অজ্ঞাত কারণে মাসীমায়ের প্রতি তাহার ভক্তি-ভালবাসা এতই বড় হইয়া উঠিল যে প্রতাহ যখন তখন 'মাসীমা' বলিয়া হাজির হইয়া, তাহার ঘরে বসিয়া বহুকাল ধরিয়া কথাবার্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্নে ব্রজেশ্বরী কুসুমকে লইয়া পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া ঘাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী-ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তখন আর কিছু না বলিয়া, কোনমতে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া মাসীর সহিত কথা কহিতেছে। কুসুম আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটিয়া ঘরে চলিয়া গেল, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, আজ্ঞা গোবর্ধন দাদা, আগে কোনকালে তোমাকে ত দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বল ত? বাড়ির ভেতরে আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো!

গোবর্ধন জানিত না সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু এই প্রশ্নের ভাবে উৎকণ্ঠায় শব্দবান্ধ হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু মা অগ্নিমূর্তি হইয়া চোখ রাক্ষা করিয়া চৈতাইয়া উঠিলেন, আগে ও-ইচ্ছে হয়নি, ওই আসেনি, এখন ইচ্ছে হয়েছে আসচে। তোর কি?

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করিনে। আমার নিজের জন্যও তত বলিনে না, কিন্তু আমার নন্দ রয়েছে, পরের মেয়ে, তা ত মনে রাখতে হবে।

মা সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, পরের মেয়ের জন্য কি আমার আপনার বোনপো ভাইপোরা পর হয়ে যাবে, না বাড়ি ঢুকবে না? তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পর্দার বিবি, না কারুর সামনে হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাসীদের পর্যন্ত লজ্জা হয়।

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই সে খামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কত ভাবে, কত ছাঁদে, সে দু'দিন আগে মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু তখন আলাদা কথা ছিল, এখন সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন কুসুমকে সে ভালবাসে নাই এখন বাসিয়াছে। এবং এ ধরনের ভালবাসা ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া গোবর্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, গোবর্ধন দাদা, ভাস্করী লজ্জার কথা ভাই, মুখ ফুটে বলতে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেচি। দাদার মত আসতে পার ত এসো, না হলে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি। বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, কি হয়েছে রে গোবর্ধন?

গোবর্ধন মুখ রাক্ষা করিয়া বলিল, তোমার দিকি মাসী, আমি জানিনে—কোন শালা কোরের

ভিতর—মাইরি বলচি—একটা দাঁতন ভাঙতে—জিজ্ঞেস করবে চল ময়রাদের দোকানে—হাসুক ও আমার সঙ্গে ও-পাড়ায়, ভজিয়ে দিচ্ছি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে শুষ্ক হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহির দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেল? আমাকে কি তুমি এখানেও টিকতে দেবে না? আগে কাপড় ছাড়, তারপর বলচি, বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আশ্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দিয়া কহিল, অন্যায় আমি কোনমতেই সহিতে পারিনে ঠাকুরঝি, তা তোমার জন্যই হোক, আর আমার জন্যই হোক। ও হতভাগাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—ওর মতলব আমি টের পেয়েছি।

জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কুসুম কাদ-কাদ হইয়া বলিল, মতলব যার যাই থাক বৌদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার কথা নিয়ে কথা কয়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।

কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বিপদ হবে কেন?

কুসুম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, হবেই। চোখে দেখছি হবে, কপালে সজ্ঞারে আঘাত করিয়া কহিল, এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি, স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না! বলিয়া কাদিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সমস্ত তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্রমকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি নিতান্ত মিথো বলনি। রাগ করো না ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজেরও দোষ কম নয় ঠাকুরঝি!

কুসুম তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নিজের দোষ কি? আমার ছেলেবেলায় ঘটনা সব শুনেচ ত?

ওনেচি। কিন্তু সে আগাগোড়া মিথো। সমস্ত জেনে শুনে এওস্তী মানুষ তুমি—সিঁদুর পর না, নোয়া হাতে রাখ না, স্বামীর ঘর কর না, এ কপালের দোষ, না তোমার নিজের দোষ ভাই? তখন না হয় জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েছে ত? তুমি বল, কোন সম্ভাব্য কবে বিধবার বেশে থাকে?

সমস্তই জানি বৌ, কিন্তু আমি সিঁদুর-নোয়া পরে থাকলেই ত লোকে ওনবে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?

ব্রজেশ্বরী বিষয়ে অবাক হইয়া গিয়া বলিল, সে কি কথা ঠাকুরঝি? এর চে. বেশী প্রমাণ কবে কোন জিনিসের হয়ে থাকে? তুমি কি কিছুই শোননি, এ কথা নিয়ে কি কাণ্ড নন্দজ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়িতেই হয়ে গেল? একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, কেন, তোমার দাদা ত সমস্ত জানেন, তিনি বলেন নি? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্ত জেনেওনেই এখানে এসেচ, তাই পাছে রাগ কর, মনে দুঃখ পায়, সেইজন্যে কোন কথা বলিনি, চুপ করেই আছি। বরং তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার উপর আমার রাগ পর্যন্ত হয়েছিল।

কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া বলিল, আমি কিছু শুনিনি বৌ, কি হয়েছিল বল।

ব্রজেশ্বরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বেশ! যেমন ভাই, তেমনি বোন। ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে নন্দজ্যাঠার মেয়ের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, ব.স. তোমার দাদাই অত হাস্যামা বাধালে, আর শেষে সে-ই চুপ করে আছে। আমার শাশুড়ীর কথা, তোমাদের কথা, ওদের কথা, সমস্তই উঠে—তখন নন্দজ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে পর মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। তারপরে ঠাকুরবাড়ির বড়-বাবাজীকে ডেকে আনা হয়, তিনি শীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথো। কারণ একে ত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমাদের সমাজে এসকল কাজ হতেই পারে না, তা ছাড়া তিনি নন্দজ্যাঠাকে হুকুম দেন, যে এ কাজ করিয়েছিল তাকে হাজির করিয়ে দিতে। তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয় কষ্টীবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু হয়নি।

কুসুম আশ্চর্য্য নিশ্বাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, হয়নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু আমার কথাই বা এত উঠল কেন?

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল, তোমার দাদার একটুখানি বাইয়ের ছিট আছে কিনা, তাই। অপর কেউ কেউ হয়ত চক্ষুলাজ্ঞাতেও এত গণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু ওর ত সে বালাই নেই, তাই চতুর্দিকে তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা যখন সত্যিই তার কষ্টীবদন। দেননি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দজ্যাঠা তাকে মেয়ে দেবে!

কুসুম লজ্জায় কষ্টকিত হইয়া বলিল, ছি ছি, তার পরে?

ব্রজেশ্বরী কহিল, তার পরে আর বেশী কিছু নেই। আমার শাওড়ীঠাকরুন আর নন্দজ্যাঠাইমা এক গায়ের মেয়ে, রাগে-দুঃখে, লজ্জায়-অভিমানে তোমাকে নিয়ে এইখানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে ই কথা হয়—কিন্তু হতে পায়নি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজেও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি কোন ছলে জানান নি? আগে শুনেছিলুম, তোমার জন্যে তিনি নাকি—

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, বৌ, সেদিন হয়ত তিনি তাই বলতেই এসেছিলেন।

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন দিন? সম্ভ্রতি এসেছিলেন?

হী, আমরা যেদিন এখানে আসি সেদিন সকালে।

তার পরে?

আমার দুর্বাবহারে না বলেই ফিরে যান।

ব্রজেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুকতে দাওনি, না কথা কওনি?

কুসুম জবাব দিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁটে করিয়া বসিয়া বহিল।

ব্রজেশ্বরীও আর কোন প্রশ্ন করিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনহইয়া আসিতেছিল, চারিদিকে শীতের শব্দ সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, তুমি একটু বসো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিয়ে একটা শ্রদীপ জ্বলে আনি, বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাদিতেছে। শ্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সত্যিই কান্ডটা ভাল করনি দিদি। অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয়নি।

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, তোমাদেরই কথা তোমাদেরই মুখ থেকে যতদূর শুনেচি, আমার হেমন অবস্থা হলে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি ঝকুম দিতেন, সারা পথ নাকশত দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই বেতুম!

কুসুম পূর্ববৎ থাকিয়াই এবার অশ্রুটে বলিল, বৌ, মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাজে ক'না শক্ত।

কিছু না। গেলে স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাজ কি দিদি? তাও যদি না পাই, তবু ফিরে আসতুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড়জোর বলতেন, তুমি যাও; আমিও বলতুম, তুমি যাও—জোর করে থাকলে কি করতেন তিনি?

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসিহীবার জন্য, সাধুনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকন্তর গম্ভীর হইয়া কহিল, সত্যি বলচি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনে না—যাও তার কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামী-পুত্রকে একা ফেলে রেখে না।

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কঠোরতার পরিবর্তনের কুসুম সব ভুলিয়া থড়থড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বিপদের দিন কেন?

ব্রজেশ্বরী বলিল, বিপদের দিন বৈ কি! অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউটা শুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বললেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যাহ দশজন বায়জন

করে মারা পড়চে—ছি ছি, ওকি কর—পায়ে হাত দিয়ে না ঠাকুরঝি।

কুসুম তাহার দুই-পা চালিয়া ধরিয়া কানিয়া উঠিল,—বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিইনি—আমি কিছু শুনিনি বৌদি—

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এখন শুনেলে ত! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কি করে যাবো?

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে হইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ নিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরিয়া দেখিল, দোর চালিয়া চৌকাঠের ও-দিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই তীব্র স্নেহের সহিত বলিলেন, ঠাকুরঝি—ঠাকুরনকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে শুনি?

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিকভাবে কহিল, বেশ ত মা, ভেতরে এসো বলচি। তোমার কিন্তু কোন ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মতলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।

মা বহুকণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জুলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমি লোকজনকে কু-মতলব দিয়ে থাকি, না? তখন জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেছে, তখন এ বাড়িও ছারখার করবে। সাথে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্রে দেখতে পারে না, এই স্বভাব-সীতির গুণে!

খণ্ডরবাড়ির নামে মা ভাষুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বলি কোন খণ্ডরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেস লো? নন্দ বোষ্ট—

এবার ব্রজেশ্বরী দমক দিয়া উঠিল—সমস্ত জেনে ন্যাকা সেজে শামকা মানুষকে অপমান করে! ন! খণ্ডরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুনেতে হবে।

মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বাকৃদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মায়ের নামে এতবড় অপবাদ দিস!

মেয়ে বলিল, অপবাদ হলেও বাঁচতুম মা, এ যে সত্যি কথা। মাইরি বলচি মা, তোমাদের মত দু-একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়ী মুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বলতে মাথা কাটা যায়। থাক, চেষ্টামচি করো না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দিয়ে, তোমার দিবা করে বলচি মা, কথাটি কব না।

মেয়ের সূতীক্ষ্ম শরের মুখে মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাহারই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, সেখান পাঠিয়ে দিলেই বা তারা ঘরে নেবে কেন? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনেব সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেডাস নে, বলিয়া তিনি প্রভাস্তর না শুনিয়া ইনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুধু পাণ্ডুর মুখখানি উচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনেওনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে স্নেহে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আজ্ঞা, এখন আসচি আমি, বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা প্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্তব্যবিচলিত করিল না। সে কথা নাড়িয়া বলিল, সে হতে পারে না। মা না বললে আমি চরণকে এখানে আনতে পারিনে।

ব্রজেশ্বরী কহিল, অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো, তারা কেমন আছেন।

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! দশ-বিশটা রোজ মরতে সেখানে।

তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও, খবর আনুক।

তা হতে পারে বটে। বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম হ্রাম হইয়া রজনশালায় প্রবেশ করিতে হইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে

দিতে বলিল, মা বারণ করিলেন দিদিঠাকরুন, আজ আর রান্নাঘরে ঢুকা না।

কথাটা শুনিয়াই তাহার বৃকের ভিতরটা কাপিয়া উঠিল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন?

সে ত জানিলে, দিদি, বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অন্যদিকে এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ এ-ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে-সময়ও যখন উজ্জীর্ণ হইয়া গেল, তখন উষেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর-একবার ব্রজেশ্বরীর সজ্জানে বাহিরে আসিতেছিল, মা সুমুখে আসিয়া বলিলেন, আর দেরি করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এস, এ-বেলায় মত যা হোক মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুরবাড়িতে মত জানতে গেছে।

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন মা নিজেই একটু করুণ সুরে বলিলেন, ব্যাটার বৌ যখন, তখন ব্যাটার মতই অশৌচ মানতে হবে। যাই হোক, মাগী দোষে গুণে ভালমানুষই ছিল। সেদিন আমার ব্রজেশ্বরীর সন্ধ্যা করতে এসে কত কথা! আজ ছ'দিন হয়ে গেল, বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা সে যা হবার হয়েছে, এখন মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন। কি নাম বাছা তার? চরণ না? আহা! রাজপুত্র ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদবমি হয়েছে।

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরমিকে তোরা কেউ দেখেছিস রে?

না দিদি, সেই সকালে দেখেছিলুম।

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, সে কি কথা? কোথায় গেল তবে সে?

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জানিলে, আমি ঘরদোর, পুকুর, বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথাও দেখতে পাচ্চিনে।

চোখের জল ও পুকুরের উষ্মে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল—তবে সে আর নেই। মার গল্পনা সইতে না পেরে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে, বলিয়া ছুটিয়া বাইরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কঁচোর খুঁট ধরিয়া ফেলিল বলিল, পোনো—জমন ক'রে যেয়ো না—

আমি কিছু ওনতে চাইনে, বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে স্নেহমানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চৈতাইয়া উঠিল, মা আমার কোনকে স্নেহে ফেলেচে—আর আমি থাকব না, আর এ বাড়ি ঢুকব না—ওরে কুসুম রে—

তাহার শাওড়ী কিছুই জানিভেন না, চাঁৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা ঝুড়িতে লাগিল—ওই রাক্ষুসীই আমার ছোটবোনটিকে খেয়েচে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হ'ল রে।

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে থাকা মারিয়া ফেলিয়া দিল—দূর হ—দূর হ। হুঁসনি অমাকে।

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া একবার স্নেহ করিয়া তাহাকে ধরে লইয়া গিয়া বলিল, শুধু কঁদলে আর কেঁদেই কি কোনকে ফিরে পাবে? আমি বলছি সে কখনো ফিরে মরেনি!

কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, একতাবেই কাঁদিতে লাগিল। এই বোনকে সে অনেক দুঃখকষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং বখাওই তাহাকে প্রাণত্যাগ ভালবাসিত। পূর্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল এবং তাহার অভিমানী ছোটবোনটির মৃতসেহ তাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সঙ্গেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, তুমি হির হও—আমি নিশ্চয়ই বলচি, সে মরেনি।

কুঞ্জ সজলচক্ষে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী, আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, সেখানে সে যাবে না। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখতে পারত না।

ব্রজেশ্বরী কহিল, এটা তোমাদের পাহাড়-পর্বত ডুল! আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি সেও তার স্বামীকে তেমন ভালবাসে। সে যাই হোক, চরণের জন্যও ত সে যেতে পারে!

কিন্তু সে ত বাড়লের পথ চেনে না?

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ডুল করি পৌঁছুতে দেরি হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে, নইলে বাড়ল সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার হলেও, সে একদিন না একদিন জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাপ, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।

চললুম, বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চকচকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল স্বত্বরবাড়িতেই পাড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে, ভূমিদার কুঞ্জনাথবাবু ফেরিওয়াল কুঞ্জ বোষ্টমের সঙ্গে খালি পায়ে বালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে পথ বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ছয়দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শ্রুত্বার পর কেহ কোনদিন এ অধিকার সূকৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ই বলা যায়।

সেদিন তারিখী মুখুয্যের দুর্বাবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিস' গাতে অভিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরনের লোহার নলের কুণ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না এবং বৎসামান্য আয় আসি স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহুপরিমাণে মায়ীভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, এমন একটা বড়-রকমের কুণ, বত ব্যায়ই হোক, নির্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার কার্মে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানী লোক পাঠাইয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্তা ও চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দশী ব্রহ্মবৃত্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুলছেন না?

বৃন্দাবন শব্দ্যর পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা কি এখনো স্নেহে আছেন?

হী দাদা, ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্চেন।

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ কন্ঠাঘাত করিয়া ডাকিল, ওমা—মাগো!

কেহ সাড়া দিল না। বাকিসুদ্ধ সকলে বিলিয়া চৌচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দমাত্র আসিল না। তখন লোহার শাবলের চাড় দিয়া রক্তধার মুক্ত করিয়া ফেলানাই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ যেন বুকের উপর সজোরে থাকা মরিয়া সকলকে বিমূখ করিয়া ফেলিল। সে খাল বৃন্দাবন কুর্জের মধ্যে সামলিয়া নাঃয়া মুখ কিরাইয়া ভিতরে ঢাছিল।

শয্যা শূন্য। মা মাটিতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্নপ্রায়। ঘরময় বিসৃষ্টিকার ভীষণ অন্ধ্রমণ্ডলের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্রেশ দিতে চাহিতেন না, তাই মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাসাইতে লক্ষ্যবোধ করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার এমন অকস্মাৎ, এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। কৃন্দাবনও পারিল না। তথালি নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ বলে চৌকাঠ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ে কাছ গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল; মিনিট-কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে; কৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।

মায়ের সম্পূর্ণ কষ্টরোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ধরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর ব্যর্থব্যর্থ কাঁপাইয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন, তাহা কাহারও কানে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌছিল।

তখন তুলসীমঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাহাকে শোযান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পরে মিলন-শ্রান্ত চক্ষু দুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুগ্ধিত হইয়া গেল।

অন্তঃপর এই ছয়টা দিন-রাত কৃন্দাবনের কাটিল শুধু এই জন্য যে তাহা ভগবানের হাতে। তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর বেলাও করে না, কথাও কহে না। কৃন্দাবন তাহাকে কতক বকয়েব মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল—নানাবিধ কলের গাড়ি, জাহাজ, ছবি-দেওয়া পশু-পক্ষী—‘যে-সমস্ত লইয়া’ ইতিপূর্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাড়ে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমায়েকে যখন চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিশ্রবনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে গাঁড়াইয়া ক্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল।

কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ির বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িমুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশা বিহুল বিষম মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু কৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোনদিন মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে বাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া বাহিত, হির হইতে পহিত না।

এ-কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাসবাবু আসিয়া বসিতেন, কতরকম করিয়া বুকাইতেন, কৃন্দাবন চুপ করিয়া ওনিত বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়ীরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অকস্মাৎ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে ভ্রমের জাহাজের তল্য ঝাঁপিয়া পিয়াছে, জাহাজ চেষ্টা করিলেও এ ভয়প্রসূত কিছুতেই কখনো পৌছিতে না। শেষ পরিশ্রান্তি বাহুর সমুদ্রগর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন শ্রী জীবনের সুর্বৈদ্যেই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইত না, এমন অসময়ে কুসুমেরও হয়ত দর হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এবং সকলের উপর তাহার যা। এমন

মা কে কবে পায়? তিনিও যেন যেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন—বাইবার সময় কথাটি পর্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমন করিয়া তাহার বিপর্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিলে লাগিল, তখন বাড়ির পুরাতন দাসী আসিয়া কাদ-কাদ হইয়া নালিশ করিল, দাদা, শেখরাণে ছেলোটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকো না, আদর কর না, চেয়ে দেখ দেখি, কিরকম হয়ে গেছে!

তাহার কথাগুলো লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্ত্রার ঘোর ভাসিয়া গিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কি হয়েছে চরণের?

দাসী অশ্রুভিত্ত হইয়া বলিল, বালাই, বাট! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাকছেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীরপদে চরণ আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বৃকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কাদিয়া ফেলিল—চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে!

দাসী ধকম দিয়া উঠিল—ছিঃ, ও কি কথা দাদা?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেকদিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

দাসী নিজের কাছে চলিয়া গেলে চরণ চুপ চুপ আবেদন করিল, মার কাছে যাব বাবা।

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে মনে ভারী আরাম বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, তোর মা ত সে বাড়িতে নেই চরণ।

কখন আসবেন তিনি?

কখন আসবেন তিনি?

সে ত জানিনে বাবা। আচ্ছা, আচ্ছাই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি।

চরণ খুশী হইল। সেইদিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চরণকে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রদ্ধের আর দুইদিন বাকী আছে; সকালে বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপে কাছে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল, ভিতরে চরণের ভেদবর্মি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নিজীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদবর্মির চেহারায়া বিস্মৃতিকা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। হাত-পা দুমড়াইয়া ভাসিয়া পড়িল, একবার কেশবকে খবর দণ্ড, বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-খানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা-দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলোটিকে বাঁচান! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক, কিন্তু, সে নির্দোষ। অতি শিশু, ডাক্তারবাবু—একবার পায়ের ধুলো দিন, একবার তাকে দেখুন! তার কষ্ট দেখলে আপনারও মায়্যা হবে!

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তারবাবুরই মায়্যা? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে সময়ে মনে হয়নি, এই পা-দুটোই মাথায় ধরতে হবে!

বৃন্দাবন কাদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা! তাঁকে নিবেদন করেছিলাম—সমস্ত সন্দের ভালর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত জানেন, এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়!

গোপাল পা ছিঁকাইয়া লইয়া বলিলেন, অন্যায় বৈ কি! মায়্যা ভারী অন্যায় করেছে। আমি ডাক্তার আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু' ছন্তর ইংরিজী পড়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ। অতবড় পুত্রে দুখানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই! নইলে বাবুনের তুমি বাট বন্ধ করতে চাও? এত দর্প!

অন্ত অহংকার। যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্য কৃশাবনের কুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—বাট মানচি, পারের ধূলা মাথার নিচ্ছি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন শিশুর গ্রন্থি বাঁচান। এক শ টাকা দেব—দুশ টাকা, পাঁচ শ টাকা—যা চান দেব ডাক্তারবাবু চলুন—ওষুধ দিন। পাঁচ শ টাকা!

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু তা হ'লে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে। এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু, তারিণীমামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহা—ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা দেব, ওষুধ দেব। কিন্তু, সে ত হবার জো নেই! তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু? কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু? তখন তোমাকে নিয়ে ত আমার কাজ চলবে না। বরং এক কাজ কর, খোবালমশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি শ্রাটীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে-পায়ে ধর গে—কি জান কৃশাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—আজকাল টাটকা ভাল ভাল ঔষধ এনেছি—দিলেই সেরে যাবে।

কৃশাবন বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়া পুনরায় কহিলেন, ভয় নেই ছোকরা, যাও মেরি ক'রো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কাজ নেই—যাও, ছুটে যাও।

কৃশাবন উর্ধ্বাঙ্গে কাদিতে কাদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল।

তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া শিশুটের হাসি হাসিয়া কহিলেন, সজ্ঞা-আফিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন ফল কি না! নির্বংশ হলি কি না!

কৃশাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কান্নিয়া কেলিয়া বামীকে বলিলেন, হি হি, এখন অর্থেরে কাজ ক'রো না। যা হবার হয়েছে—আহা শিশু নাবালক—বলে দাও গোপালকে, ওষুধ দিক।

তারিণী বিচাইয়া উঠিল—তুই খাম মানী! পুরুষমানুষের কথায় কথা ক'স নে।

তিনি গভীরত খাইয়া কৃশাবনকে বলিলেন, আমি আশীর্বাদ কচ্ছি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে, বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কৃশাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, না—ভাব না।

এমন সময় শান্ত্রাজ খোবালমহাশয় পাশের বাড়ি হইতে বড়ম পায়ে দিয়া খটখট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হঠাৎ বলিলেন, শান্ত্রে আছে কুকুরকে প্রহর্য দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উজর যায়। এমন করেই কলিকালে ধর্মকর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোক পাড়ে—কেমন হে তারিণী, সেদিন বলিনি তোমাকে, কেন্দা বোটমের ভারী বাড় বেড়েছে। বখন ও আমার কথা মানলে না, তখনই জানি, ওর উপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে হাতে কল দেখলে তারিণী?

তারিণী মনে মনে অশ্রুস্রব হইয়া কহিল, আর আমি! সেদিন পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বসেছিলাম, নির্বংশ হ। খুড়ো, আফিক না করে জলগ্রহণ করিনে! এখন চন্দ্র-সূর্য উঠছে, এখনও জোয়ার-ভাটা খেলছে! বলিয়া ব্যাখা যেমন করিয়া তাহার ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত অজুটার মৃত্যু-বস্ত্রাশর প্রতি চাহিয়া নিজেই অবার লক্ষের আশ্বাসন করিতে থাকে, তেমনি পরিতপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই একমাত্র পুরণোকাহ্নত হতভাগ্য শিউর অপরিণীম ব্যাখা সর্বাত্মে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু কৃশাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূণের দারে সে অনেক সাবির্যছিল, অনেক বলিয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অজ্ঞতম মৃত্যুভয়ের অসহ্য অভ্যাসের এককণে তাহার পূর্ব-বিশ্রোদ-কেন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্মত জগাহিয়া গিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার বহন এই দুই অকর্মিত ব্রাহ্মণের কান্নার নয়ত্রী ও সজ্ঞা-আফিকের তেজে সে নির্বংশ হইতে

বসিয়াছে, এই বাস্তবতার শেষ-সীমাসে না গুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল এবং বেলা দশটার সময় নিরবিদ্য শান্তমুখে নীড়িত সন্তানের শয্যার পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল।

কেশব তখন আশুনা জ্বালিয়া চরণের হাতে পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদ্রাবতন্ত মল্লকৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত গুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়নি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, কলকাতায় চললুম। যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগার ফিরব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে বৃন্দাবন! চললুম, পার ত ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখ ভাই! বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে, পিতাকে কাছে পাইয়া, মার কাছে যাব, বলিয়া ভয়ানক কান্না জড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোনদিনই জিদ করিতে জানিত না, কিন্তু আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কাজ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত-চীৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চীৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্নে, যখন হাতে পায়ে পেটে ঝিল ধরিয়া কঠোর হইয়া গেল।

চত্বের স্বপ্ন দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ি ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গভীর করিয়া একধারে বসিলেন। কেশব সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধমিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, হাঁ, আমিই বাপ বটে; কিন্তু কিছুমাত্র সন্তোষের প্রয়োজন নেই, আপনার যাহা ইচ্ছা বজ্জ্বল করুন। যে বাপ, বারো ঘণ্টাকাল বিনা চিকিৎসার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে পারে, তার সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তারবাবু।

পিতার এত বড় ধৈর্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি ডাক্তার হইলেও সে মানুষ সে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেট করিল।

বৃন্দাবন বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চললুম। পাশেই ঠাকুর-ঘর, আবশ্যক হলে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হবার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন স্পন্দ পাই, বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল—যেদিন তাহার কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়া ছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, পাশের ঘরেই আমার চরণ নিক্ষেপিত হইবে, তববান, আমি সে নাশিল জানাইতে আসি নাই, কিন্তু পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে বাপের চোখের উপর বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে—পিতৃহত্যায় এতটুকু সাধনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কিজন্য? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের কবর কথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত! সে মনে মনে বিনীত, যাহারা ভোমাকে বিশ্বাস করে না তাহাদের কথা তাহারই জানে, কিন্তু আমি ত নিশ্চয় জানি, ভোমার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পত্র পাতাও মাটিতে পড়ে না; তাই আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে? আমার এই অতি ক্ষুদ্র এককোণী চরণের স্মৃতিতে সবসারে কবর কি উপলব্ধ সাধিত হইবে? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আরম্ভ নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিন্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জমিল, কেনই বা এত বড় হইল এবং কেনই বা তাৎক্ষণিক একটি কাজ করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল!

কিছুকণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাহার পদক্ষেপে ধ্যান ভাঙ্গিয়া যখন কৃষ্ণাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম কণ্ঠা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু মেঘ-মুক্ত নির্মল বহু আকাশের তলে ভবিষ্যৎ-জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন, স্ত্রী-মূর্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে এমন আঁধারে আড়ালে বসিয়া আছে!

কৃষ্ণাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত তাঁহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম। তাহার জিজ্ঞাসে ছুটিয়া আসিল, কুসুম, আমার বোল-আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি? কিন্তু বলিল না।

এইমাত্র সে নাকি তাহার চরণেব শিশু-আত্মার মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত সুখদুঃখ, মান-অভিমান বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যুশয্যাশালী সন্তানের অকলাপ করিতে ইচ্ছা করিল না; বরং করুণকণ্ঠে বলিল, আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হ'ত। আজ সমস্ত দিন যত যত্ন পা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কৈদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছিল! কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া কৃষ্ণাবন হাত দিয়া চরণের অস্তিম-শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা। বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা কেইই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ও-কথা বলিতে সাহস করিল না, কৃষ্ণনাথ পর্বত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন কৃষ্ণাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক।

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, ওদের আসতে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।

তারপর সে যেকোন অবলম্বিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ অশ্রুতে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া কৃষ্ণাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেইমিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চীৎকার কবিতা উঠিল—সমস্ত মিছে কথা! যারা কথায় কথায় বলে—ভগবান বা করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোড়োয়ার!

কৃষ্ণাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে দৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিল, যোর রক্তবর্ণ দ্বন্দ্ব দুই চোখ তুলিয়া অন্ধকার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, অশ্রুতে রাগ করতে নেই কেশব।

প্রত্যুত্তরে কেশব 'উঃ'—বলিয়া চুপ করিল।

কিরিয়া আসিবার পথে বাগদীঘের দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, কৃষ্ণাবন থমকিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল, কৃষ্ণাবন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বহুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, কেশব কাল থেকে অহনিশি যে গ্রন্থ আবার মনের মধ্যে উঠেচে, এখন বোধ করি, তার জবাব পেলোম—সংসারের এক ছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।

কেশব এইমাত্র পালাপালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

কৃষ্ণাবন কহিল, তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার ছালা বুঝবে না—বোকা অসম্ভব। এ এমন ছালা যে, মহাশয়র জন্যও কেউ কামনা করে না। কিন্তু এর দামও আছে কেশব, এখন যেন ঠের পাতি, খুব বড়-রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয়, ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।

কেশব তেমনি নিরন্তর-মুখে চাহিয়া রহিল; কৃষ্ণাবন বলিতে লাগিল, এই ছালা আমার জুড়িরে কহিল ওই শিশুদের পাশে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখি, সব শিশুকেই যুকে ঘেঁষে নিতে ইচ্ছা হচ্ছে—চরণ বেঁচে থাকতে শু একটি মিনও এমন হয়নি!

কেশব অবনত-মুখে তনিত্তে তনিত্তে চলিতে লাগিল। পাঠশালার পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোটভাই জলপান ও জল লইয়া যাইতেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, বনমালী, কোথায় যাচ্ছিস রে? বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ?

আমার কাছে একবার আয় তোরা, বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়িয়া দিয়া উভয়কেই একসঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আঃ—আঃ, বুক ছুড়িয়ে গেল রে বনমালী! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল ভাই, চরণকে বৃষ্টি সজাই হারালাম। না, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবে না—এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভেতর থেকেই একদিন তাকে ফিরে পাবো।

কেশব সভয়ে এদিকে ওদিকে চাহিয়া বলিল, ছেড়ে দাও হে বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখতে পেলে ভারী রাগ করবে।

ওঃ—তা বটে। আমি চরণকে পুড়িয়ে আসছি যে! বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী পশ্চিমবঙ্গের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পশ্চিমবঙ্গ সেইখানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উর্ধ্বমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, জগদীশ্বর! চরণকে নিয়েছ, কিন্তু আমার চোখের এই দৃষ্টিটুকু যেন কেড়ে নিয়ে না! আজ যেমন দেখতে দিলে, এমন যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমার চরণের মুখ দেখতে পাই। এমন বৃকে নেবার জন্যে, যেন ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিতে শাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি। কেশব, স্থাপনে দাঁড়িয়ে যাদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয়ত জোড়োর নন।

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ি চল।

চল, বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ আমার বাচালতা মাপ করো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন?

জ্ঞানভঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রাহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্ধতভাবে গর্জিয়া উঠিল, জিজ্ঞেস কর গে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে—সে বলবে, তার জন-তপের তেড়ে; জিজ্ঞেস কর গে আর এক জোড়োরকে—সে বলবে, পূর্বজন্মের পাপে—উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ!

বৃন্দাবন ধীরভাবে বলিল, কেশব, গোখরো সাপের খোলসকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুখের ওপর আরোপ করাও তুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং দ্যাখো।

কেশব সেইসব কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অস্তরে পুড়িয়া যাচ্ছিল, যা মুখে আসিল বলিল, তবে এতবড় দণ্ড কেন?

বৃন্দাবন কহিল, দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার করে, নিজেকে ছোট করে দেখতে আমি চাইনে। এ জীবনে স্মরণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ক্ষম নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরুগৃহ-বাসের গৌরবের ক্রোধ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না কেশব, আজ আমার দুঃখ মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পূর্বশোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বৃক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম, আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাঁদের সবাইকে আমার চরণ ভার নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ কর, আজ যা পেয়েছি, তাকে খেন না হারিয়ে ফেল সব নষ্ট করে বসি।

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া করঝর করিয়া কান্না ফেলিল। সেদিন বৃন্দাবন একটিমাত্র কুপ প্রস্তত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্বদিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস; এ পাড়ায় আর একটা বড়-রকমের কুপ প্রস্তত

না করিলে জলকট্ট এবং স্বাধীন-সীতার নিয়মিত হইবে না। তাই কান্ডের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে এখন কুপ নির্মাণ করা যাইতে পারে, বাহাতে শুধু একটা গ্রামে নয়, পাঁচ-সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে ; উপরন্তু, অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাসেরও সাহায্য করিতে পারিবে।

কৃশাবন খুশী হইয়া সম্মত হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মের দিন, সেবোক্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী করিয়া কোম্বের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, কোম্ব, এই ক'রো তাই, বিবাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবাড়বেলা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও বখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। বসি কোনদিন এমিকে কিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেইদিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাসবাবু এ-কয়দিন সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, কৃশাবন, তোমাকে সাধুনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা। কিন্তু দুঃখ বত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত অনুযায়। অক্ষম অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।

কৃশাবন মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সম্ভব ত আমার নেই মাষ্টারমশাই। বরং সে ত একেবারে অসম্ভব। ছেলের মুখ না দেখতে গেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনার দয়ার আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের পরিত্যক্ত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার সর্ব্ব্ব ত জলকট্ট-মোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে ?

কৃশাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙ্গানো ভিকার কুলি দেখাইয়া বলিল, বৈক্যবের ছেলের কোথাও মুক্তিভিকার অভাব হলে না মাষ্টারমশাই, এইতেই আমার বাকী দিনগুলো যত্নে কেটে যাবে। তা ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্য দিয়ে গেলাম।

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং গ্রামীণ হইলেও ব্রাহ্মের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। তাই তিনিও কুসুমের বখাৰ্ণ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্বরণ করিয়া বলিলেন, সেটা ভাল হইবে না বাবা, তোমার কথা বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হইতেই পারিবে না কৃশাবন।

কৃশাবন মুখ নীচু করিয়া কহিল, তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস কৃশাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্বোপরি এই গৃহত্যাগের সময়ে বৎপরেণাভি ক্রুদ্ধ হইয়া নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, কৃশাবন, জন্মকৃত্য ত্যাগ করবার আশঙ্ক্যতা কি? এখানে বাস করেও ত পূর্বের মত সমস্ত হতে পারে।

কৃশাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া, এ বাড়িতে যেমিকেই চোখ পড়ছে, সেইমিকেই তার ছোট হাত-দুখনির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমাকে কমা করুন মাষ্টারমশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা ও গুরুত্বের গুঁড়ো হয়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিষমবদূষে মৌন রহিলেন।

যে ভাতার চরণের শ্রম-চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেদিনের মর্যাদিক ঘটনা তাঁহাকে আজ্ঞার করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ সেবিবার কৌতূহল ও কৃশাবনের প্রতি অসম্মান আকর্ষণ তাঁহাকে সেইদিন সকলে কিন্ন-আত্মনে আবার কলিকতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশেষে সমস্ত ওদিতহিলেন ; কৃশাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কোম্ব কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি অলাভানি দিয়া এই অতি ভুল পাঠশালার ভার বেহায়া গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কোম্ব, সত্যই কি তুমি এমন উচ্ছল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে পাঠশালা দিয়ে সারাশ্রম থাকবে ?

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্স দেওরই ত আমার ব্যবসা।

ডাক্তার ইবং উদ্বেজিত হইয়া বলিলেন, তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসরি এবং এই পাঠশালার পতিতি কি এক? এতে কি উন্নতি আশা কর তুমি?

কেশব সহজভাবে বলিল, সম্ভবই। টাকা রোজগার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।

নয় জানি। কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয়। উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে রে!—কৃদাবন হাসিল এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্বেই কহিল, সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তারবাবু, আপনাদের নয়? আজ আমার দুর্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এমন দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী-হত্যা হয়, সে কি কারো কোনদিন চোখে পড়ে? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্ভয়ভাবে ভ্যাগ করে চলে না গেলে, আমরা ত এত নিরুপায় হয়ে মরি না! রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অঙ্গ, পরনের বসন যোগায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এইসব গ্রামেই বাস। তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে খেঁতলে খেঁতলে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম. এ. পাশ করবেও যেহেতু মুখ কিরিয়ে দাঁড়িয়েচে।

কেশব আনন্দে উৎসাহে সহসা কৃদাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, কৃদাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যোয়া তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না।

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুই বছর মুখের দিকে প্রজ্ঞায় বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।—

পরদিন কৃদাবন ভিকার বুলিমাত্র স্বস্থল করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে-কোনস্থানে নিজে কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু কৃদাবন সম্মত হয় নাই। কারণ সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণউপেক্ষা করিতে চাহে

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের উপর দিয়া দাস-দাসীপ্রভৃতি সকলের কথ্যাচিত্তা করিয়া ছিল। মায়ের সিন্দুকের সজ্জিত অর্থ তাহাদিনিকেদিয়া বিদায় করিয়াছিল। শুধু কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই, প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যেদিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেইদিন হইতে তাহার প্রতি একটা শিশুর ভাব জন্মিয়া উঠিতেছিল, সেই বিভূষণ তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিষয়ে রূপান্তরিত ্যা উঠিয়াছিল। তাই কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি জন্য আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই এক না লইয়াই নিজের মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রদ্ধা শেষ হইয়া গেলে আপনি চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যদিও কার্যোপলক্ষে বাধা হইয়া কার্যকর কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাছাড়া মুখের পানে সেদিন সকালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ও-দিকে কুসুমও তাহার সহিত দেখা কহিবাবর বা কথা কহিবাবর লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই।

এমনি করিয়া একটয়া দিন কাটিয়াছে, কিন্তু আর ত সময় নাই; তাই আজ কৃদাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে যাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাসী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, এখন তিনি যাবেন ন'।

কৃদাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, এখানে আর ত থাকবার জো নেই, সে কথা বলে দিলে ন' কেন?

দাসী কহিল, বৌমা নিজেই সমস্ত জানেন।

কৃদাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাকবে?

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ।

কৃদাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ ঢুকিতে সাহস করিল না, স্বয়ং ঠেসিয়া ভিতরে চাহিয়াই তাহার সর্বাসে কাঁটা দিয়া উঠিল। দক্ষগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চোখে তাহার উৎকট স্পন্দ চাহনি। আশ্চর্যনি ও পূরুষের কত শীঘ্র মানুষকে কি করিয়া কেলিতে পারে, কৃদাবন এই তাহা প্রথম দেখিয়া সভয়ে পিছুিয়া দাঁড়াইল।

অসাবধানে কপাটের কড়া নাড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল এক সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভেতরে এসো।

বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরত সে প্রকৃতিই নয়, উন্মত্ত নারী কি কাণ্ড করিবে সম্বন্ধ করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিল না, গলায় আঁচল দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৃন্দাবন ভয়ে নড়িতে চড়িতে সাহস করিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম বহুকণ ধরিয়া ওই দুটি পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল, বহুকণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ-কণ্ঠে বলিল, সবাই বলে, তুমি সইতে পেরেচ : কিন্তু আমার বৃকের ভেতর দিবানিশি চুপ করে স্থলে যাচ্ছে, আমি বাঁচব কি করে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?

দু'জনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিবেক-বহি নিব্বিয়া গেল, সে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, কুসুম, আমি যাতে শক্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়ার পথ নেই।

কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরেনি, হারায় নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখতে লিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।

এতকণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে আর-একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ের মুখে রাখিল। কলকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বৃন্দাবন সভয়ে বলিল, আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।

খুব সম্ভব। আমি যাব।

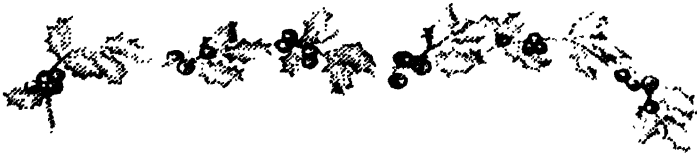
বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য তা পারিনে। তা ছাড়া তুমি হাঁটবে কি করে? —কুসুম অবিকলিত-স্বরে কহিল, আমিও খুব হাঁটতে পারি—হেঁটেই এসেছি। তা ছাড়া ভিক্ষে করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কাজ করে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি। দামাচ সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।

বৃন্দাবন ভাবিতে লাগিল। কুসুম বলিল, ভাবনা মিছে। আমি থাকই। অবহেলার ছেলে হারিয়েচি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।

বৃন্দাবন আরও কলকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, চরণ আমার যে মস্ত্র আমাকে দীক্ষিত করে গেছে, পারবে সেই মস্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে?

কুসুম শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, পারব।

তবে চল, বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর-একবার কেশবের উপর সমস্ত ভাব তুলিয়া দিয়া সেই রাঙেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া গেল।



পদ্মী সমাজ

এক

বেণী বোঝাল মুখ্যোদের অন্দরের প্রান্তে পা দিয়াই সম্মুখে এক শ্রোতা রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিল, এই যে মাসি, রমা কই গা?

মাসি আফ্রিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রামাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রজনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তা হ'লে রমা, কি করবে স্থির করলে?

জ্বলন্ত উদান হইতে লক্ষ্যমান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিসের বড়দা?

বেণী কহিল, তারিণী বুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন! রমেশ ত কাল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই করবে বলে বোধ হচ্ছে;—যাবে না কি?

রমা দুই চক্ষু বিশ্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ি?

বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, সে ত জানি দিদি। আর যেই হোক, তোর কিছুতেই সেখানে যাবি নে। তবে গুন্ডি নাকি ছোঁড়া বাড়ি-বাড়ি নিজে গিয়ে বলবে—বজ্জাতি বৃদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে, তা হ'লে কি বলবে?

রমা সরোষে জবাব দিল, আমি কিছুই বলব না—বাইরের দারোয়ান তার উত্তর দেবে।

পূজানিরতা মাসির কর্ণশ্রুতে এই অত্যন্ত রুচিকর দলাদলির আলোচনা পৌছিবামাত্রই তিনি আফ্রিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোনঝির কথা শেধ না হইতেই অত্যন্ত শৈশবের মত ছটকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, দারোয়ান কেন? আমি বলতে জানিনে? নছার ব্যাটাকে এমন বলাই বলব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখ্যোবাড়িতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমন্তন্ন করতে আমার বাড়িতে? আমি কিছুই ভুলি নি বেণীমাধব! তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও ত আবার আমার যতীন জন্মায় নি—ভেবেছিল, যদু মুখ্যোর সমস্ত বিষয়টা তাহ'লে মুঠোর মধ্যে আসবে—বুঝে না বাবা বেণী! যখন হ'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচাৰ্য্যকে দিয়ে কি-সব ভপ-ভপ, তুঙ্-তাক্ করিয়ে মায়ের কপাটে, আমার আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতেব নোয়া মাথায় সিঁদুর ঘুচে গেল। ছোটজাত হয়ে চায় কিনা যদু মুখ্যোর মেয়েকে বৌ কবতে? তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতেব আগুনটুকু পৰ্ব্বত পেলে না। ছোটজাতের মুখে আগুন? বলিয়া মাসি যেন কুস্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ ছোটজাতের উল্লেখে বেণীর মুখ স্নান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তারিণী ঘোষাল তাহারই বুড়া। রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসিকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, কেন মাসি তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতে-গড়া জিনিস নয়? যে যেখানে জন্মেছে সেই তার ভাল।

বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, না রমা, মাসি ঠিক কথাই বলেছেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন! ছোটবুড়োর এ কথা মুখে আনাই বৈরাগ্যবি। আর তুঙ্-তাকের কথা যদি বল ত সে সত্য। দুনিয়া ছোটবুড়ো আর ঐ বাবা, ভৈরব আচাৰ্য্যের অনাধ্যাক্ষ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েছে আজকাল রমেশের মুকুবি। মাসি কহিলেন, সে ত জানা কথা বেণী! ছোঁড়া দল-বারো বছর ত দেশে আসেনি—এত দিন ছিল কোথায়?

কি করে জানব মাসি। ছোটবুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব, আমাদেরও তাই। গুন্ডি এতদিন নাকি বোকাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাশ করে এসেছে, কেউ বলচে উকিল হয়ে এসেছে, কেউ বলচে সমস্তই ঠিকি—ছোঁড়া নাকি পাড় মাতাল। যখন বাড়ি এসে পৌছল, তখন দুতোষ নাকি জবাফুলের মত রাসা ছিল।

বটে? তা হ'লে তাকে ত বাড়ি ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়!—

বেণী উৎসাহভরে মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?

নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ার রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল, পড়ে বৈ কি! সে ত আমার চেয়ে বেশি বড় নর! তা ছাড়া শীতলাতলার পাঠশালে দুজনই পড়তাম যে। কিন্তু তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভালবাসতেন।

মাসি আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার ভালবাসার মুখে আশুন। সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে। তাদের মতলব ছিল, তোকে কোনমতে হাত করা।

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মাসি! ছোট-খুড়ীমার যে,—

কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসিকে বলিয়া উঠিল, সে সব পুরনো কথার দরকার নেই মাসি।

রমেশের পিতার সহিত রমার বত বিবাহই থাক, তাহার জননীরা সম্বন্ধে রমার কোথার একটু যেন প্রজ্ঞা বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী উৎসাহে সায় দিয়া বলিলেন, তা বটে, তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজ্ঞাও তাঁর কথা উঠলে চোখের জল কেলে।

কি কথার কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী উৎসাহে এ সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তবে এই ত স্থির হ'ল দিদি, নড়চড় হবে না ত?

রমা হাসিল। কহিল, বড়দা, বাবা বলতেন আশুনের শেষ, ফলের শেষ, আর শরৎ শেষ কখনো রাখিনে না মা। তারিণী ঘোষাল জ্যাঠা আমাদের কম ছালা দেয়নি—বাবাকে পর্বন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা, বতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না। রমেশ সেই শরতেরই ছেলে ত! তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার জো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইফোনকে বিষয় ভাগ করে নিজে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা করার ভার শুধু আমারই উপর যে! আমার ত নয়-ই, আমাদের সম্রাটের যারা আছে, তাদের পর্বন্ত যেতে দেখ না। একটু ভাবিয়া কহিল, আচ্ছা বড়দা, এমন করতে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ি যায়?

বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা বাটো করিয়া বলিল, সেই চেউই ত করচি বোন। তুই আমার সম্রাট থাকিস, আর আমি কোনও চিন্তা করি নে। রমেশকে এই কুয়াশুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম আমি, আর এ ভৈরব আচাৰ্য। আর তারিণী ঘোষাল নেই, দেখি এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষা করে!

রমা কহিল, রক্ষে করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি বলে রাখলুম, শত্রুতা করতে এও কম করবে না।

বেণী আরও একটু অপ্রসন্ন হইয়া একবার এদিক-ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উঁচু হইয়া বসিল। তার পর কঠোর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিল, রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেলতে চাও ত, এই বেলা, থেকে গেলে আর হবে না তা নিশ্চয় বলে দিচ্ছি। বিষয়-সম্পত্তি কি করে রক্ষে করতে হয়, এখনও সে শেষে নি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্মূল করতে পারা যায় ত ভবিষ্যতে আর যাবে না; এই কথাটা আমাদের বিবাহের মনে রাখতে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়।

সে আমি বুঝি বড়দা।

তুই না বুঝিস কি দিদি! ভগবান তোকে ছেলে গড়তে গড়তে মেয়ে গড়েছিলেন বৈ ত নয়। কুঠিতে একটা পাক জমিদারও তোর কাছে হাটে যায়, এ কথা আমরা সবাই কলাবলি করি। আচ্ছা, কাল একবার আসব। আজ বেলা হ'ল কই, বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িল। রমা এই প্রশংসাম অত্যন্ত দ্রুত হইয়া উঠিয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার কুকের ভিতর দাঁত করিয়া

উঠিল। প্রাণেশের একপ্রান্ত হইতে অপরিচিত গভীর কণ্ঠের আহ্বান আসিল—রাশী কই রে?

রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলায় তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা তুলিয়া গিয়াছিল। বৈশীর প্রতি চাহিয়া দেখিল তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই রক্ত-মাথা, খালি-পা, উত্তরীরটা মাথায় জড়াইলো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বৈশীর প্রতি চোখ পড়িবার বলিয়া উঠিল, এই যে বড়দা, এখানে? বেশ চলুন, আপনি না হ'লে করবে কে? আমি সারা গা আপনার কাছে বুজি বেড়াচ্ছি। কৈ রাশী কোথায়? বলিয়াই কপাটের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পালাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই যে। আরে ইস, কত বড় হয়েছিস রে? ভাল আছিস?

রমা তেমনি অথোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া ভৎসনা করিল, চিনতে পাচ্ছিস্ রে? আমি তোদের রমেশদা!

এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। কিন্তু মুদকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি ভাল আছেন?

হী ভাই, ভাল আছি। কিন্তু আমাকে আপনি কেন রমা? বৈশীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, রমায় সেই কথাটা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি বড়দা! যখন মা মারা গেলেন; ও তখন ত খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, রমেশদা, তুমি কেঁদে না, আমার মাকে আমার দু'জনে ভাগ করে নেব।—তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত?

কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আঁক ঝুকিয়া পড়িল। সে একটুবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, ঝুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিতে লাগিল, আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকি, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি ভাই হয়েই তোমাদের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্যন্তও করতে পারচি না।

মাসি আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বৈশী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথাও জবাব দিলে না, তখন তিনি সুমুখেব দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি বাপু তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

রমেশ এই মাসিটাকে ইতিপূর্বে দেখে নাই; কারণ সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষে সেই যে যুথুযোবাড়ি ঢুকিয়াছিলেন আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসি বলিলেন, না হ'লে এমন বেহায়া বমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা! বলা নেই, কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ির ভিতর ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার?

রমেশ বুকিমন্টের মত কাঁচ হইয়া চাহিয়া রহিল।

আমি চললুম, বলিয়া বৈশী বাস্ত হইয়া সরিয়া পড়িল।

রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, কি বোকম মাসি তুমি নিজের কাজে বাও না—

মাসি মনে করিলেন, তিনি বোনঝির প্রচ্ছন্ন ইজিতটা বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিব মিশাইয়া কহিলেন, নে রমা, বকিস্ না। যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোমাদের মত চক্কাভা হয় না। বৈশীর অমন ভয়ে পালানর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত ত। আমার বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-ভালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্মবাড়িতে জল তুলতে, ময়দা মাথতে এবে। তারিণী মরেচে, গা-সুস্থ লোকের হাড় জুড়িয়েচে; এ ২৪ আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর সুখের ওপর বলে গেলেই ত পুরুষমানুষের মত কাজ হ'ত।

রমেশ তখনও নিশ্চল জসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতই এ সকল কথা তাহার একান্ত দুঃখেরও অগোচর ছিল। ভিতর হইতে রান্নাঘরে কপাটের শিকলটা কনকন করিয়া নড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহই লক্ষ্যে আসেনা বোঝা করিল না। মাসি রমেশের নির্বাক ও অত্যন্ত পাণ্ডবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরাপি বলিলেন, বাই ছোক বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-দরওয়ান দিয়ে অপমান করাতে

চাইনে—একটু ঈশ করে কাজ করো বাপু—যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতর ঢুকে আবদার করে বেড়াবে! তোমার বাড়িতে আমার রমা কখনও পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে আমি বলে দিলুম।

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোচ্ছিতের মত জাগিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার বিদ্যুত বকের ভিতর হইতে এমন গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমি ও এত কথা জানতাম না—না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম, সেজন্য আমাকে মাপ করো রাশি! বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেশী ভৎসনাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পালায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসির সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আব্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল, সরিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ, শোনালে বটে মাসি! আমার সাখিই ছিল না, অমন করে বলা! এ কি চাকর-সারোয়ানের কাজ রমা! আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কিনা, ছোড়া মুখখানা যেন আবাড়ের মেঘের মত করে বার হয়ে গেল। এই ত—ঠিক হল!

মাসি ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিলেন, খুব ত হ'ল জানি; কিন্তু এই দুটো মেয়ে-মানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বলে গেলেই ত আরও ভাল হ'ত! আর নাই যদি বলতে পারতে, আমি কি বললুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা? অমন সরে পড়া উচিত হয়নি!

মাসির কথার স্বাক্ষে বেশীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভিযোগের কি সাফাই দিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল, এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, তুমি যখন নিজে বলেচ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েছে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিব জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠত না—

মাসি এবং বেশী উভয়েই যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসি রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, কি বললি লা?

কিছু না। আঁহিক করিতে বসে ত সাতবার উঠলে—যাও না, ওটা সরে ফেল না—রান্নাঘরা কি হবে না? বলিতে বলিতে রমা নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেশী শুদ্ধমুখে চুলি চুলি জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মাসি?

কি করে জানব বাছা! ও রাজরাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের মত দাসী-বাঁধীর কর্ম! বলিয়া ক্রোধে, ক্রোধে তিনি মুখখানা কালিবর্ণ করিয়া তাঁহার পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেশী ধীরে ধীরে শ্রব্ধ করিল।

দুই

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অর্জিত হইবার একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যিক। প্রায় শতাব্দী পূর্বে মহাকুলীন বলরাম মুখুয্যে তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া কলকাতার পুর হইতে এসেছেন। মুখুয্যে শুণ্ড কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া, বর্ধমান রাজ-সরকারের চাকরি করিয়া এবং আরও কি কি করিয়া এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই নিকটেই বসবাস করেন। কিন্তু পিতৃশ্রম শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন কর্মতাই ছিল না; তাই দুই-তিনই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষেই নাকি দুই মিতার মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখ-কর্ণন করেন নাই। বলরাম মুখুয্যে যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও ঘোষাল তাঁহার বাড়িতে পা দিলেন না।

কিন্তু তাহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য কথা শুনা গেল। তিনি নিজেই সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্ধেক ভাগ করিয়া নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি এই কুয়াপুরের বিষয় মুখ্যো ও ঘোষালবংশ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে। ইহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকও অস্বীকার করিত না।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ঘোষালবংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট তরফের তারিণী ঘোষাল মোকদ্দম উপলক্ষে জেলায় গিয়া দিন-চয়েক পূর্বে হঠাৎ যেদিন আদালতে ছোট-বড় পাঁচ-সাতটা মূলভূমি মোকদ্দমার শেষফলের প্রতি মুক্কেপ না করিয়া কোথাকার কোন অজানা আদালতের মহামান্য শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাহাদের কুয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বড় তরফের কর্তা বেনী ঘোষাল বৃদ্ধের মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন এবং আরো গোপনে দল পাকাইতে লাগিলেন কি করিয়া বৃদ্ধের আগামী শ্রাব্দের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর খুঁড়া-ডাইপোর মুখ সেখাদেশি ছিল না। বহু বৎসর পূর্বে তারিণীর গুহ শূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাড়ির ভিতরে দাস-দাসী এবং বাহিরে মোকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ কতকি কলেজে এই দুঃসংবাদ পাইয়া পিতার শেষকায় সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘ কাল পরে কাল অপরাহ্নে তাহার শূন্য গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্মপাতি : ময়ো শুধু দুটা দিন বাকি। বৃহস্পতিবার রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই-একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মুক্কেপের উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত কেহ আসিবেই না তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য ও তাহার বাড়ির লোকের আসিয়া কাজ-কর্ম যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধুলির আশা না থাকিলেও উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিয়াছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রমেশ বাড়ির ভিতরে কাজ-কর্ম বাস্তব ছিল; কি জন্যে বাহিরে আসিবেই দেখিল, ইতিমধ্যে জনদুই প্রাচীন ভ্রমলোক আসিয়া বৈঠকখানার বিচরানয় সন্মগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্বেই পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতি বৃদ্ধ পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ি ঢুকিল। তাহার কাঁধে মলিন উস্তরীয়, নাকের উপর একজোড়া ভাঁটার মত মস্ত চশমা—পিছনে দড়ি দিয়া বঁধা। সাদা চুল, সাদা গৌর তাম্বাকের ধূয়ায় ত্র্যম্বক। অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে সেই ভাঁষণ চশমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মূহূর্তকাল চাহিয়া দি— বাক্যবাহ্যে কঁদিয়া ফেলিল। রমেশ চমিল না ইনি কে, কিন্তু যেই হোন বাস্তব হইয়া কাছে আসিয়া তার হাত ধরিতেই সে ভাসা গলায় বলিয়া উঠিল, না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমাবও এমন চাটখোবংশে জন্ম নয় যে, কার ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বেকবে। আসবাব সময়ে তোমার বেনী ঘোষালের মুখের সামনে বলে এলু, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাব্দের আয়োজন করবে, এমন করা চলেয়া যাক, এ অঙ্কলে কেউ চোখেও দেখেনি। একটা ধামিয়া বলিল, আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম করে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্মদাস শুধু ধর্মেরই দাস, আর কারো নয়। এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্যভাষ্যের সমস্ত পৌক্কেষ আত্মসাৎ করিয়া গোবিন্দ গাজুলীর হাত হইতে ঝাঁকটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাতে এক টান দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিল।

ধর্মদাস নিভান্ত অত্যাক্তি করেন নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল। তাহারা শরের একধারে ভিয়ান চড়াইয়াছে—সেনিকে পাড়ার কক্কগলো ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কাল্লালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে—চট্টীমণ্ডলের ও-বারের বারান্দার অনুগত ভৈরব আচার্য থান ফাড়িয়া পাট করিয়া গাধা করিতেছিল—সেনিকেও জন-কয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া মনে মনে রমেশের নিবুদ্ধিভার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। লোকজন, প্রজা-পাঠক বাড়ি পরিপূর্ণ করিয়া কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ মিছামিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়বাক্য্য

দেখিয়া ধর্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল।

প্রত্যাহারের রমেশ শঙ্কুচিহ্ন হইয়া 'না না' বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড়ঘড় করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বুঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্বাগ্রে আসিয়াছিল। সুতরাং ধর্মদাস, যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিবার সুবিধা তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। সে এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিল না। ধর্মদাসকে উদ্দেশ্য করিয়া তাড়াহাড়ি বলিয়া উঠিল, কাল সকালে, বুধলে ধর্মদাসদা, এখানে আসব বলে বেরিয়েও আসা হল না—বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দ বুড়ো, তামাক খেয়ে যাও। একবার ভাললুম, কাজ নেই—তারপর মনে হ'ল ভাবখানা বেণীর দৈর্ঘ্যই যাই না। বেণী কি বললে জান বাবা রমেশ! বললে, বুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুকুবি হয়ে দাঁড়িয়েচ, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, লোকজন খাবে-টাবে ত? আমিই বা ছাড়ি কেন। তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশ কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত এক মুঠো চিড়ের পিঠোয় কাক নেই। বললুম, বেণীবাবু, এই ত পথ, একবার কাজালী-বিলারটা দাঁড়িয়ে দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বৃকের পাটাও বলি একে! এতটা বয়েস হ'ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাসদা, আমাদের সাধাই বা কি! যার কাজ তিনি উপর থেকে করাতেন। তারিণীদা শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বৈ ত নয়!

ধর্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, সে কাসিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলীমশাই, বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া ধর্মদাস আরও ভাল কিছু বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিল, তুমি ত আমার পর নও বাবা—নিতান্ত আপনাব। তোমার যা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ নিস্কৃত্যতা বোনের খুড়তুতো ভগিনী। রাখানগরের বাঁড়ুঘো-বাড়ি—সে সব তারিণীদা জানতেন। তাই যে কোন কাজকর্মে—মামলা-মোকদ্দমা করতে, সাক্ষী নিতে—ডাক গোবিন্দকে!

ধর্মদাস প্রাণপণ-বলে—কাসি থামাইয়া বিচাইয়া উঠিল, কেন বাজে বকিস গোবিন্দ? বক্—বক্—আমি আজকের নয়—না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বললি, আমার জুতা নেই, খালি-পায়ে যাই কি করে? বক্—বক্—তারিণী অমনি আড়াই টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিল। তুই সেই পায়ে গিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি। বক্—বক্—বক্—

গোবিন্দ চক্‌ চক্‌ করিয়া কহিল, এলুম?

এলিনে?

দূর মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী তোর বাবা।

গোবিন্দ তাহার ভাস্ক্রা ছাতি হাতে করিয়া লাক্‌হিয়া উঠিল, তবে রে শালা!

ধর্মদাস তাহার বীণের লাঠি উচাইয়া ধরিয়া হুকার গিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিল। রমেশ শব্দবস্ত্রে উভয়ের মাক্‌খানে আসিয়া পড়িয়া শুভিত হইয়া গেল। ধর্মদাস লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বসিল, ও শালার সম্পর্কে আমি বড় ভাই হই কিনা, তাই শালার আক্ষেপ দেখ—

ওঃ, শালা আমার বড় ভাই! বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

শব্দের বয়রাস্তা ভিন্নান ছড়িয়া গিয়াছিল। চক্‌কিৎ বাহ্যার কাজ-কর্ম নিবৃত্ত ছিল, চৈতন্যে চিন্তা ভাবনা ত্যাগা দেখিবার জন্য সুদূরে ছুটিয়া আসিল। হেলেনদেরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া সভা দেখিতে লাগিল এবং এই সমস্ত লোকের দৃষ্টি সুদূরে রমেশ লজ্জার বিষয়ে হতবুদ্ধির মত শুভ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সুব নিয়া একটা কথাও বহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রতীক, ভ্রষ্টলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান। এত সামান্য কারণে এমন ইত্যরের মত গালিগালাজ করিতে পারে। বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কপড়ের খাক নিতে নিতে সমস্তই দেখিতেছিল, ওনিতেছিল। এখন উঠিয়া

আসিয়া রমেশকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, প্রায় শ'-চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?

রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভিজুত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, ছিঃ গাঙ্গুলীমশাই! বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজ-কর্মের বাড়িতে কত ঠেসাঠেসি রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়—আবার যে-কে সেই হয়। নিন্ উঠুন চাটুয্যেমশাই—দেখুন দেখি আরও খান ফাড়ব কি না?

ধর্মদাস জবাব দিবার পূর্বেই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল, হয়ই ত! হয়ই ত! ঢের হয়! নইলে বিরম কর্ম বলেচে কেন? শান্তরে আছে লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে! সে বছর—তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখ্যো-মশায়ের কন্যা রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিঁদে নিয়ে রাঘব ভট্টাচার্য্যে হারাপ চাটুয্যোতে মাথা-ফাটাফাটি হয়ে গেল? কিন্তু আমি বলি ভৈরব-ভায়া, বাবাজীরা এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভয়ে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলোদের একখানা ক'রে দিলেই নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী, সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্মদাসদা?

ধর্মদাস খাড়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি, বাবাজী! ও ব্যাটারের হাজার দিলেও নাম হ'বাব জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেচে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ!

এখন পর্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বন্ধু-বিতরণেব আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্মান্বিত হইয়া পড়িল। ইহার সূর্য্যুতি-কুসুমিত সম্বন্ধে নত্রে, এখন এইটাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহার বাহাদিরকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্রের সম্মুখে এইমাত্র যে এত বড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড করিয়া বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া রমেশ সংক্ষেপে কহিল, 'আরও দু-শ' কাপড় ঠিক করে রাখুন।

তা নইলে কি হয়? ভৈরবভায়া চল, আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে বল? বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বন্ধুবান্ধব নিকটে গিয়া বসিলেন। রমেশ বাটার ভিতর যাইবার উপক্রম করিতেই ধর্মদাস তাহার একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি অনেক কথা কহিলেন। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মত হইল। কহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল কাপড় গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী আড়চোখে সব দেখিল।

কে গো, বাবাজী কোথায় গো? বলিয়া একটি শীর্ণকায় দৃষ্টিতন্ত্র প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল। ইহার সঙ্গেও গুটি-তিনেক ছেলেমেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরনে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়। বালক দুটি কোমরে এক-একগাছি ধুনসি বাতীত একেবারে দিশম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল, এস দীনদা, বসো। বড় ভাগ্য আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়িল। ছেলোটো একা সারা হয়ে যায়, তা তোমরা—

ধর্মদাস গোবিন্দের প্রতি কটমট করিয়া চাহিল। সে লক্ষ্যপাত্র না করিয়া কহিল, তা তোমরা ত কেউ এদিক মাড়াবে না লাগা—বলিয়া তাহার হাতে কঁকটা তুলিয়া দিল। দীনু ভট্টাচার্য্য আসন গ্রহণ করিয়া দশ হাঁকাটার নিরর্থক গোটাছুই টান দিয়া বলিল, আমি ত ছিলাম — ভায়া—তোমার বৌতাকুলনকে আনতে তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? ওনটি নাকি ভারী আয়োজন হচ্ছে? পথে আসতে ও পায়ের হাটে ওনে এলুম খাইয়ে-দাইয়ে—ছলে-বুড়োর হাতে বোকা করে লুটি আর চার-জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে।

গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, তা ছাড়া হয়ত একখানা করে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনদাকে বলছিলুম বাবাজী,—তোমাদের পাঁচজনর বাপ-মায়ের আশীর্বাদে যোগাড়-সোগাড় একরকম করা ত হয়েছে, কিন্তু বেশী একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে। এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েছে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ির টান রয়েছে : কিন্তু এই যে দীনদা, ধর্মদাসদা, এই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন? দীনদা ত পথ থেকে

চনতে পেয়ে ছুটে আসছেন। ওরে ও বতীচরণ, তামাক দে না রে। বাবা রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই। নিকুতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ বিস্মিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভিতরে বৃষ্টি ধর্মদাস-গিন্নী এসেছে? খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি করো না বাবা। বিটলে বামুন বতই ফোসলাক্, ধর্মদাস-গিন্নীর হাতে তাঁড়ারের চাবি-টাবি দিও না বাবা, কিছুতে দিও না—যি, ময়দা, তেল, নুন, অর্বেক সরিয়ে ফেলাবে। তোমার ভাবনা কি বাবা? আমি গিয়ে তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে এসে তাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্যন্ত লোকসান হবে না।

রমেশ খাঁড় নাড়িয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। ধর্মদাস যে তাহার গৃহীণীকে তাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া দিবার কথা এত গোপনে कहিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আশ্চর্য করিয়াছিল কিরাপে?

উলঙ্গ শিশু-দুটা ছুটিয়া আসিয়া দীনদার কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল—বাবা, সন্দেশ খাব।

দীন একবার রমেশের প্রতি একবার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিল, সন্দেশ কোথায় পাব রে?

কেন, ঐ যে হচ্ছে, বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া দিল।

আমরাও দাঁদামশাই, বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আরও তিন-চারটি ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল।

বেশ ত, বেশ ত, বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল—ও আচার্য্যামশাই, বিকল-বেলায় ছেলেরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, খেয়ে ত আসেনি—ওহে ও, কি নাম তোমার? নিয়ে এস ত ঐ খালাটা এদিকে।

ময়রা সন্দেশের খালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপড় হইয়া পড়িল; বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের খাওয়া দেখিতে দেখিত দীননাথের শুদ্ধদৃষ্টি সম্মল ও তীব্র হইয়া উঠিল—ওরে ও খেদি, খাচ্ছি ত, সন্দেশ হয়েছে কেমন বল দেখি?

বেশ বাবা, বলিয়া খেদি চিবাঁইতে লাগিল। দীন মুদ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ তোমের আবার পছন্দ! মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিগর, এ কড়াটা কেমন নামালে—কি বল গোবিন্দভায়া, এখনও একটু রোদ আছে বলে মনে হচ্ছে না?

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, আন্তে আছে বৈ কি! এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যা অহিকের—

তবে কৈ দাও দেখি একটা গোবিন্দভায়াকে, চোখে দেখুক কেমন কলকাতার কারিগর তোমারা! না, না, আমাকে আবার কেন? তবে আধখানা—আধখানার বেশী নয়। ওরে বতীচরণ, একটু জল আন দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—

রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে গোটা-চারেক খালাও নিয়ে আসিস বতীচরণ।

প্রভুর আদেশমত ভিতর হইতে গোটা-তিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এবং বৃহৎ খালার অর্বেক মিষ্টান্ন এই তিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্রিষ্ট সদ্ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

হাঁ, কলকাতার কারিগর বটে। কি বল ধর্মদাসদা? বলিয়া দীননাথ রুদ্ধনিবাস ত্যাগ করিল। ধর্মদাসদার তখনও শেঘ হয় নাই, এবং যদিও তাহার অব্যক্ত কষ্টের সন্দেশের ভাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ নিভা বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোকা গেল এ বিষয়ে তাহার মতভেদ নাই।

হাঁ, ওজাদি হাত বটে! বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, যদি কষ্টই করলেন ঠাকুরমশাই, তবে মিহিধানটা একটু পরখ করে দিন।

মিহিানা? কই আনো দেখি বাপু?

মিহিানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে এই নূতন বস্ত্রটির সম্ব্যবহার দেখিরা রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। দীননাথ মেয়ের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল, ওরে ও খেদি, ধন্ব দিকি মা এই দুটো মিহিানা।

আমি আর খেতে পারব না বাবা।

পারবি, পারবি। এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বৈ ত নয়! না পারিস্ আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ, কাল সকালে খাস, হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! যেন অমৃত! তা বেশ হয়েছে! মিষ্টি বুঝি দুরকম করলে বাবাজী!

রমেশকে বলিত হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, আজ্ঞে না, রসগোল্লা, কীরমোহন—
আঁ! কীরমোহন! কে সে ত বার করলে না বাপু?

বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া দীননাথ কহিল, খেয়েছিলুম বটে রাখানগরের বোসেদের বাড়িতে। আজও যেন মুখে গেলে রয়েছে। বলিল বিশ্বাস করবে না বাবাজী, কীরমোহন খেতে আমি বজ্র ভালোবাসি।

রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথটা বিশ্বাস করা তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না। রাখাল কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ভেতরে বোধ করি আচাখ্যামশাই অছেন : যা ত রাখাল, কিছু কীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দেখি।

সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। ওখাপি ব্রাহ্মণেরা কীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া বলিল, আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু।

রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, বল গে, আমি আনতে বলচি।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী: রমেশের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া চোখ ঘুরাইয়া কহিল, দেখলে দীনুদা, ভৈরবের আক্কেল? এ যে দেখি মাসরব চেয়ে মাসির বেশী দরদ। সেই জন্যই আমি বলি—

সে কি বলে তাহা না শুনিয়া রাখাল বলিয়া উঠিল, আচাখ্যামশাই কি করবেন? ও-বাড়ি থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে!

ধর্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিল, কে, বড়গিন্নী?

রমেশ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল, জ্যাঠাইমা এসেছেন?

আজ্ঞে হী, তিনি এসেই ছোট-বড় দুই ভাঁড়ারই ভালাবন্ধ করে ফেলেছেন।

বিষয়ে আনন্দে রমেশ দ্বিতীয় কথটি না বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

তিন

জ্যাঠাইমা!

ডাক শুনিয়া বিস্ময়বী ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বেনীর বয়সের : : : তুলনা করিলে তাহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওয়া উচিত নয়, কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশি বলিয়া মনে হয় না।

রমেশ নির্নিমেষ-চক্ষু চাহিয়া রহিল। আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য তাহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সমুখের দুই-একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহু যত্নের বহু সাধনার ফল। সবচেয়ে আশ্চর্য তাহার দুইটি চকুর দৃষ্টি। সেদিকে লক্ষ্যকালে চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অস্বাভাবিক যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে এক সময় বড় ভালবাসিতেন। বধু-বয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাওড়ী-...-দর যন্ত্রণায় লুকাইয়া বসিয়া এই দুটি জায়ে যখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম গ্রহি-বন্ধন হয়। তার পরে, গৃহ-বিশেষ, মামলা-সোকদ্দমা, পৃথক হওয়া, কত রকমের বড়-কাণ্ট। এই দুইটি সংসারের উপর বিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিবাদের উন্মাদে বীধন শিথিল হইয়াছে, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। কল্যাণ পরে সেই ছোটবোয়ের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহারই হাতে সাজানো এই সমস্ত বহু পুরাতন হাড়ি-কলসীর পানে চাহিয়া জ্যাঠাইমার চোখ দিয়া জল করিয়া পড়িতেছিল। রমেশের আহ্বানে যখন

তিনি চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি আরক্ত আর্দ্র চক্ষু-পল্লবের পানে চাহিয়া রমেশ কণকালের জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয় রহিল। জ্যাঠাইয়া তাহা টের পাইলেন। তাহাতেই বোধ করি, এই সঙ্গ-শিড়্ধীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার লেশমাত্র তিনি বাইরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, চিন্তে পারিস্ রমেশ?

জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে যতদিন না সে মামার বাড়ি গিয়াছিল, ততদিন এই জ্যাঠাইয়া তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কিছুতে ছাড়িতে চাহেন নাই। সে-ও মনে পড়িল এবং এ-ও মনে হইল সেদিন ও-বাড়িতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ি নাই বলিয়া দেখা পর্যন্ত করেন নাই। তার পর সেদিন ও-বাড়িতে বৈথীর সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাহার মাসির নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বিবেচ্যরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ছি বাবা, এ সময়ে শক্ত হ'তে হয়।

তাঁহার কঠিনের কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজেই সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল যেখানে অভিমানের কোন মর্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিভ্রম না সংসারে অন্নই আছে। কহিল, শক্ত আমি হয়েছি জ্যাঠাইমা! তাই যা পারতুম নিজেই করতুম, কেন তুমি আবার এলে?

জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, তুই ও আমাকে ডেকে আনিস নি রমেশ, যে, তোকে তার কৈফিয়ত দেব? তা শোন বলি। কাজ-কর্ম হবার আগে আর আমি তাঁড়ার থেকে খাবার-টাবার কোন জিনিস বা'র হতে দেব না; যাবার সময় তাঁড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কাল এসে তোর হাত থেকেই নেব। আর কার হাতে দিসনি যেন। হাঁ রে, সেদিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না। ভাবিয়া কহিল, বড়দা তখন ও বাড়ি ছিলেন না।

প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে স্নেহে অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, আ আমার কপাল! এই বুঝি? হাঁ রে, দেখা হয়নি বলে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের উপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু তোর কাজ ত তোর করা চাই। যা একবার ভাল করে বল গে যা রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হ'তে তোর কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা যে, কোন লোকের হাতেপায়ে ধরে মিটমাট করে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মীমানিক আমার, যা একবার—এখন বোধ হয় সে বাড়িতেই আছে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সশ্রবণও ঘুটিল না, বিবেচ্যরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে ঢের বেশি জানি। তাঁদের কথা শুনিও না। আর আমার সঙ্গে, তোর বড়দার কাছে একবার বাবি চল।

রমেশ খাড়া নাড়িয়া বলিল, না জ্যাঠাইমা, সে হয় না। আর বাইরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা যাঁহি হোন তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।

সে আরও কি কি বলিতে বাহিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার মনে হইল, জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সম্ভার ঢেয়েও বেশি মলিন হইয়া গেল। খানিক পরে তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আজ্ঞা, তবে ভাই। বখন তার কাছে বাওরা হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা করে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিস নি বাবা, কিছুই অটকাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আসবো। বলিয়া বিবেচ্যরী তাঁহার দলীকে ডাকিয়া লইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বীরে বীরে বাহির হইয়া গেলেন; বৈথীর সহিত রমেশের

ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ স্নানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবাজী, বড়গিল্লী এসেছিলেন, না?

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, ওনলুম তাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেলেন, না?

রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় তাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ কহিল, দেখলে ধর্মদাসদা, যা বলেচি তাই। বলি মতলবটা বুঝলে বাবাজী?

রমেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র দীন ভট্টাচার্য তখনও যায় নাই। কারণ তাহার বুদ্ধি-সূক্তি ছিল না। ছেলেমেয়ে লইয়া বাহ্যর দরায় গেষ্ট করিয়া সম্মেলন বহিতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক দুটা আশীর্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাত-পুরুষের স্তব-স্তুতি না করিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিল না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, এ মতলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া? তালাবন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন, তার মানে তাঁড়ার আর কারো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়াছিল; নির্বোধের কথায় জুলিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, বোঝো না সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত? তুমি এসব ব্যাপারের কি বোঝো যে মানে করতে এসেচ?

ধমক বহিয়া দীনব নিকৃষ্টতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উচ্চ হইয়া জবাব দিল, আরে এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোনখানে? ওনচ না, গিল্লীমা স্বয়ং এসে তাঁড়ার বন্ধ করে চাবি নিয়ে গেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ আশ্রয় হইয়া কহিল, ঘরে যাও না ভট্টাচার্য। যে জন্যে ছুটে এসেছিলেন—গুপ্তিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে, আর কেন? ক্ষীরমোহন পরন্তু বেণু, আজ আর হবে না। এখন যাও আমাদের চের কাজ আছে।

দীন লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে বহিতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শাস্ত অথচ কঠিন কঠররে থামিয়া গেল—আপনার হ'ল কি গাঙ্গুলীক্ষণ? যাকে-তাকে এমন খামকা আপমান করছেন কেন?

গোবিন্দ ভৎসিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরকণ্ঠে শুদ্ধহাসি হাসিয়া বলিল, অপমান আবার কাকে করলুম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না সত্যি কথাটি : লচি কি না? ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় ফিরি যে! দেখলে ধর্মদাসদা, দীনে বামনার আশ্রয়? আচ্ছা—

ধর্মদাসদা কি দেখিল, তা সেই জানে, কিন্তু রমেশ লোকটার নির্লজ্জতা ও স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তখন দীন রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, না বাবা, গোবিন্দ সত্যি কথাই বলেচে। আমি বড় গবীর, সেকথা সবাই জানে। ওদের মত আমার ভূমি-জমা-চাষ-বাস কিছুই নেই। একরকম চেয়ে-চিয়ে ভিক্ষে-সিঁকে করেই আমাদের দিন চলে। ভাল জিনিস ছেলে-পিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেননি—তাই বড়-ঘরে কাজকর্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে ক'রো না বাবা, তারিগীদাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, তাঁর তামাকে নিশ্চয় বলচি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে সেখে খুশি হয়েছেন।

হঠাৎ দীনর গভীর শুদ্ধ চোখদুটা জলে ভরিয়া উঠিয়া টপ্- করিয়া দু'কোটা সকলের সুমুখেই বরিয়া পড়ি। রমেশ মুখ কিরিয়া দাঁড়াইল। দীন তাহার মলিন ও শতজিহ্ব উন্মীরপ্রাপ্ত অঙ্গ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, শুধু আমিই নই বাবা। এদিকে আমার মত দুঃখী-গরিব যে যেখানে আছে, তারিগীদেব কয়েক শেতে কেউ কখনো অন্ননি ফেরেনি। সে-কথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাকে টের পেত না যে। আর তোমাদের জ্বালাতন করব না। নে মা খেঁচি ওঠ, হরিখন চল বাবা ঘরে বাই, আবার কাল সকালে আসব,স আর কি বলব বাবা রমেশ, বাপের মত হও, দীর্ঘজীবী

হও।

রমেশ তাহার সঙ্গে আসিয়া আশ্রয়কণ্ঠে কহিল, ভট্টাচার্য্যমশাই, এই দুটো-তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখবেন। আর বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু এ বাড়িতে হরিধনের মায়ের যদি পায়ের ধুলো পড়ে ত ভাগ্য বলে মনে করব।

ভট্টাচার্য্যমশাই ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাদ কাদ হইয়া বলিল, আমি বড় দুঃখী বাবা রমেশ, আমাকে এমন করে বললে যে লজ্জায় মরে বাই।

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্তের জন্য নিজের রাত কথা স্মরণ করিয়া গান্ধূলীমশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই সে থামাইয়া দিয়া উদীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, এ যে আমার নিজের কাজ রমেশ, তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাই ত এসেছি ; ধর্মদাসদা আর আমি দুই ভায়ে ত তোমার ডাকবার অপেক্ষা রাখিনি বাবা।

ধর্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাসিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাসির ধমকে চোখ-মুখ রান্না করিয়া হাত ঘুরাইয়া বলিল, বলি শোন রমেশ, আমরা বেশি ঘোবাল নই। আমাদের জন্মের ঠিক আছে।

তাহার কুৎসিত কথায় রমেশ চমকিয়া উঠিল ; কিন্তু রাগ করিল না। এই অত্যন্ত সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহার শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কত বড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না।

জ্যাঠাইমার সঙ্গেই অনুরোধে এবং তাঁহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে নীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেকীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গান্ধূলীর হাঁকাহাঁকিটাই সবচেয়ে বেশি। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাড়ি রাখিয়া বলিতেছে, এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায় ত আমার গোবিন্দ গান্ধূলী নাম তোমরা বদলে রেখো বেকীবাবু! নবাবী কাণ্ডকারখানা শুনলে ত ? তারিণী ঘোবাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি, তা ত জানি, তবে এত কেন ? হাতে থাকে কর, না থেকে বিবয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা করবে বাপের ছাদ করে, তা ত কখন শুনিনি বাবা! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি বেনীমাধব-বাবু, এ ছোড়া নন্দীদেব গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা করেছে।

বেকী উৎসাহিত হইয়া কহিল, তা হলে কথাটা ত বা'র করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দখুড়ো ?

গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া বলিল, সবুর কর না বাবাজী! একবার ভাল করে চুকেতেই দাও না—তার পরে—বাহিরে দাঁড়িয়ে কে ও ? এ কি রমেশ বাবাজী ? আমরা থাকতে এত রাগিত্তে তুমি কেন বাবা ?

রমেশ সে কথার জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বড়দা, আপনার কাছেই এলুম।

বেকী গভীরতর হইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ শুৎকলাৎ কহিল, আসবে বৈ কি বাবা, একশ'বার আসবে! এ তি তোমারই বাড়ি। আর বড়ভাই পিতৃতুল্য! তাই ত আমরা বেকীবাবুকে বলতে এসেছি, বেকীবাবু তারিণীদার সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক—আর কেন ? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল হালদার-মামা ? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে বাবা—কে আহঁস রে, একখানা কবলের আসন-টাসন পেতে দে না রে। না বেকীবাবু, তুমি বড়ভাই—ভুলিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া বড়গিন্নীঠাকরন যখন বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেকী চমকিয়া উঠিল—মা গিয়েছিলেন ?

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুশি হইল। কিন্তু বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত ধরবটা কলাও করিয়া বলিতে লাগিল, শধু বাওয়া কেন, তাঁড়ার-টাড়ার—কলা-কর্ম বা কিছু তিনিই ত করতেন। আর তিনি না করলে করবেই বা কে ?

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নীঠাকুরের মত মানুষ কি আর আছে? না হবে কেন? না বেশীবাবু, সামনে বললে খোশামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়? বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গভীর হইয়া রহিলেন। বেশী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্তর্যুটে কহিল, আচ্ছা—

গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল, শুধু আচ্ছা নয়, বেশীবাবু! যেতে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার উপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন, নেমস্তন্নটা কি রকম করা হবে একটা ফর্ম করে ফেলা হোক না কেন? কি বল রমেশ বাবাজী? ঠিক কথা কি না হালদারমামা? ধর্মদাসদা চুপ করে রইলে কেন? কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীতকণ্ঠে বলিল, বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেশী গভীর হইয়া কহিল, মা যখন গেছেন তখন আমার যাওয়া-না-যাওয়া—কি বল গোবিন্দবুড়ো?

গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্বেই রমেশ বলিল, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে বড়দা, যদি অসুবিধা না হয় একবার দেখে-ওনে আসবেন।

বেশী চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, দেখলে বেশীবাবু, কথার ভাবখানা!

বেশী অনামনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দর কথাগুলো মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘুণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেশী ঘোষালের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক কোলাহল উদ্‌গম হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার শ্রবণ হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা তাহার ঘরের সুমুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াগম হইলেন। রমেশ? কেন রে?

রমেশ উঠিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা বাস্ত হইয়া বলিলেন, একটা দাঁড়া বাবা, একটা আলো আনতে বলে দি।

আলোয় কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না। বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই এ পাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রস্থ করিলেন, এত রাতিরে যে?

রমেশ মুদুকণ্ঠে কহিল, এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম।

তবেই মুকিলে ফেললি বাবা। এরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, চাটুঘোষশাই—

রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, জানিনে জ্যাঠাইমা, কি এরা বলেন। জানতেও চাইনে—তুমি যা বলবে তাই হবে।

অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তরে বিশেষরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া কলকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু তখন যে বললি রমেশ, এরাই তোর সবচেয়ে আপত্তি? তা যাই হোক, আমার মেয়েমানুষের কথায় কি হবে বাবা? এ গাঁয়ে যে আবার—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে যায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা ক। কর্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার আশ্রয় থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।

রমেশ বিশেষ আশ্চর্য হইল না। কারণ, এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা?

সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস এখানে আপনিই সব জানতে পারবি। কারুর সত্যকার দোষ-

অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যা-অপবাদ, আছে—তা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী-দেওয়ানিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দুদিন আগে যেতুম রমেশ, তা হলে এত উদ্যোগ আরোজন কিছুতে করতে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি, বলিয়া জ্যাঠাইমা এটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে যে কি ছিল, তাহার ঠিক মর্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না। এবং কাহারও সত্যকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে পারে, তাহাও তাহার করিতে পারিল না, বরঞ্চ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী বললেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণশূত্রই নিমন্ত্রণ করে আসব। কিন্তু, তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে ; তুমি হুকুম দাও জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন, এ-রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ। তাতে ভারি গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয় বাবা। সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেছে, তাকে জবরদস্তি ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হলে ত কোনমতে চলতে পারে না রমেশ!

ভাবিয়া সেবিলে রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত তাহা নহে ; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের বড়যন্ত্র এবং নীচশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আঙনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, এ গায়ের সমাজ বলতে ধর্মদাস, গোবিন্দ—এরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা রমেশের উকতা লক্ষ্য করিলেন ; কিন্তু শাস্তকণ্ঠে বলিলেন, শুধু এরা নয় রমেশ, তোমার বড়দা বেশীও সমাজের একজন কর্তা।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করো গে রমেশ! সেবেমাত্র বাড়িতে পা দিয়েই এঁদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।

বিক্ষেপী কতটা দূর চিন্তা করিয়া সে এরূপ উপদেশ দিলেন, তীব্র উত্তেজনার মুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না ; কহিল, তুমি নিজে এইমাত্র বললে জ্যাঠাইমা, নানান কারণে এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত অ্যাক্রোশটাই সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া, আমি যখন সত্যি-মিথ্যা কারো দোষ-অপরাধের কথাই জানিনে, তখন কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অন্যায্য!

জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, আমি তোর গুরুজন, মায়ের মতো। আমার কথাটা না শোনাও ত তোর পক্ষে অন্যায্য!

কি করবো জ্যাঠাইমা, আমি হির করেচি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করবো।

তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিক্ষেপীর মুখ অপ্রসন্ন হইল ; বোধ করি বা মনে মনে বিরক্তও হইলেন ; বলিলেন, তা হলে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা চলনামাত্র।

জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল, কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিক পরে আত্মে আত্মে বলিল, আমি জানতুম জ্যাঠাইমা, বা অন্যায্য নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্বাদ করবে। আমার—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই বিক্ষেপী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু এটাও ত তোমার জন্য উচিত ছিল রমেশ যে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না?

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কাল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবি করিতেছিল, এখন দেখিল, এ দাবির অনেক উর্ধ্বে তাঁর আপন সন্তানের দাবি জায়গা জুড়িয়া আছে। সে কলকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উত্তীর্ণা দাঁড়িয়া চাপা অভিমানের সুরে বলিল, কাল পর্যন্ত তাই জানতুম জ্যাঠাইমা! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, বা পারি আমি একলা করি, তুমি এসো না ; তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।

এই কুণ্ড অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর रहিল না। কিন্তু আর জবাব দিলেন না, অঙ্ককারে চুপ করিয়া বসিয়া रहিলেন। খানিক পরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমার ভাড়া-ঘরের চাবিটা এনে দিই, বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে চাবি আনিয়া রমেশের পায়ের কাছে কেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পতীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘন্টাকয়েক মাত্র পূর্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন। কিন্তু একটা রাত্রিও কাটিল না, তাহাকে আবার নিশ্বাস কেলিয়া বলিতে হইল, না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করেছেন।

চর

বাহিরে এইমাত্র শ্রাব্দ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ির ভিতরে আহ্বারের জন্য পাতা পাতিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল হাঁকাইকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রক্তনশালার কপাটের একপাশে একটি পঁচিন-ছাকিশ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং একটি শ্রোতা রমণী তাহাকে আগলিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিশুল্লিঙ্গ বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখিবামাত্র শ্রোতা চৈতন্য প্রসন্ন করিল, হাঁ বাবা, তুমি গায়ের একজন জমিদার, বলি, যত শোষ কি এ ক্ষোভিত বার্মনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার খুশি শাস্তি দেবে?

গোবিন্দকে দেখিয়াই কহিল, ঐ উনি মুখুয্যেবাড়ির গাছ-পতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে ইস্কুলের নামে দশ টাকা আমার কাছে আদায় করেন নি কি? গায়ের বোল আনা শেতলা-পুজোর ভদ্রো দুজোড়া পাঠার দাম ধরে নেন নি কি? তবে? কতবার ঐ এক কথা নিয়ে খাঁটাখাঁটি করতে চান ওনি?

রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী বসিয়া ছিল, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার রমেশের দিকে একবার শ্রোতার দিকে চাহিয়া গাঙ্গীর গলায় কহিলেন, যদি আমার নামটাই করলে ক্যান্ডমাসি, তবে সত্তা কথা বলি বাছা! খাতির কথা কইবার লোক এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী নয়, সে দেশসুখ লোক জানে। তোমার মেয়ের প্রাণিত্যও হয়েছে, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি—সব মানি। কিন্তু তাকে বন্দিতে ক'টি দিতে ত আমরা ২০০ ম সিইনি! মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কীদ দেব, কিন্তু—

ক্যান্ডমাসি চীৎকার করিয়া উঠিল, ম'লে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পুড়িয়ে এসো বাছা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত নিরে কি কথা কও না? তোমার ছোটভাত যে ঐ ভাড়াঘরে বসে পান সাজচে, সে ত আর বছর মাস-দেড়েক ধরে কেন কান্দীবাস করে অমন হলদে রোপা শলতেটির মত হয়ে কিরে এসেছিল ওনি? সে বড়লোকের বড় কথা বুঝি? বেশি খাঁটিয়ে না বাপু আমি সব জারিজুরি ভেঙ্গে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে খুলো দেওয়া যায় না।

গোবিন্দ ক্যান্ডার মত কাঁপিয়া পড়িল, তবে রে হারামজাদা মাগী—

কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না, বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাতমুখ ঘুরাইয়া কহিল, মারবি নাকি রে? ক্ষোভিত বার্মনিকে খাঁটালে ঠক বাহুতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে তা বলে নিচি। আমার মেয়ে ত রাস্তাঘরে ঢুকতে যারনি; দোরগোড়ার আসন না আসতে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান করে এসেছে, বলি তার বেয়ানের ডাঁতি অপবাদ ছিল না কি? আমি ত আর আজকের নই গো, বলি, আরও বলব, না এতাই হবে?

রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া रहিল। ডেরব আচার্য ব্যস্ত হইয়া ক্যান্ডার হাতটা প্রায় ধরিয়া কেলিয়া সানুনয়ে কহিল, এতাই হবে মাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী ওঠ মা, চল বাছা, আমার সঙ্গে

ও ঘরে গিয়ে বসবি চলে।

পরশ হালদার চাদের কাঁখে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ি থেকে একেবারে ভাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না তা বলে দিচ্ছি। গোবিন্দ! কালীচরণ! ভোম্বাদের মামাকে চাও ত উঠে এসো বলচি। বেশী বোঝাল যে তখন বলেছিল, মামা, যেয়ো না ওখানে। এমন সব খানকী নটীর কাণ্ডকারখানা জানলে কি জাতজন্ম খোয়াতে এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়াই? কালী! উঠে এসো।

মাতুলে পুনঃপুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ বাড়ি হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছর চারেক পূর্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদার বন্ধু তাহার বিধবা ছোট ভগ্নীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল—ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ খণ্ডরবাড়ি যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে এই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, যে যাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলে সমাজপতি হলেন বেশী বোঝাল, পরশ হালদার আর যদু মুখ্যোৎসাহের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না। রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই দুটো মাগীকে কেন বাড়ি ঢুকতে দিয়েছেন, তার জবাব না দিলে আমরা এখানে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ-সাত-দশজন চাদের কাঁখে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহার পাড়াগায়ের লোক, সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন চাল সর্বাপেক্ষা লাভজনক ইহা তাহাদের অবিলম্বিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়েরা যাহারা যা খুশি বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীন ভট্টাচার্য কীদ কীদ হইয়া বার বার স্তম্ভমাসি ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙ্গুলী, একবার হালদার মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিকে হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কর্ম যেন লণ্ডভণ্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল। কিন্তু রমেশ একটি কথা কহিতে পারিল না। একে কুখ্যাত তুচ্ছ্য নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাণ্ডমুখে কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধির মত স্বক হইয়া চাহিয়া রহিল।

রমেশ।

অকস্মাৎ একমুহূর্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিচ্ছেদীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কপাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার মাথার উপর আঁচল ছিল কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপন্থি কখন আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল ইনিই বিচ্ছেদীর, ইনিই বোঝাল-বাড়ির গিন্নীমা।

পল্লীগ্রাম শহরের কড়া পর্দা নাই। তত্ৰাচ বিচ্ছেদীর বড়বাড়ির বধু বলিয়াই হোক কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, যথেষ্ট বরঃপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং সকলেই বড় বিস্মিত হইল। বাহারা শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই, বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ ধামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ছুটিয়া গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেমনি সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, গাঙ্গুলীমশায়কে ভয় দেখাতে মানা করে সে রমেশ। আর হালদারমশায়কে আমার নাম করে বল যে, আমি সবাইকে আমার করে বাড়িতে ডেকে এনেছি, সুকুমারীকে অপমান করবার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজ-কর্মের বাড়িতে হাঁকাহাঁকি, পাগিগালাজ করতে আমি নিবেদন করছি। বীর অনুবিধে হবে তিনি আর কোথাও গিয়ে কখন।

বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানে গুলিতে পাইল। রমেশের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না—ইহলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাঁড়াইয়া দেখিতেও পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দারিদ্র্য নিজের মাথার লইতে দেখিয়া সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে

একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল ; তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চোখ ছাপিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, কে আসিল, না আসিল তাহার খোঁজ লইতে পারে নাই। কিন্তু আর যেই আসুক, জ্যাঠাইয়া যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনার অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ গাঙ্গুলী ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে একজন তাহাদিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে অশ্রুচুট কহিল, বসে পড় না বুড়ো? বোলখানা লুচি, চারছোড়া সন্দেশ কে কোথায় খাইয়ে-দাইয়ে সঙ্গে দেয় বাবা!

পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়া রাখিল এবং আহারের জন্য পাতা পড়িলে তত্ত্বাবধানের ছুতা করিয়া সকলের সঙ্গে পংক্তি-ভোজনে উপবেশন করিল না। যাহারা তাহার এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল তাহারা সকলেই মনে মনে বুঝিল, গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিবে না। অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত এবং প্রত্যেকেই খুদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ি প্রভৃতি বাণীর অনুপস্থিত বালকবালিকার নাম করিয়া যাহা বীথিয়া লইলেন তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে।

সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম প্রায় সারা হইয়া গিয়াছে, রমেশ সদর দরজার বাহিরে একটা পেয়ারাগাছের তলায় অনামনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, মনটা তাহার ভাল ছিল না। দেখিল, দীনু ভট্টাচার্য ছেলেনের লইয়া লুচি-মণ্ডাৎ পক্ষভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া এইরূপ অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইতেছে। সর্বপ্রথমে বেদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত খতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া শুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে—

সবাই যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটা বুঝিতে পারিল : পলাইবার পথ থাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে কহিল, বেদি, এসব কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল রে?

তাহাদের ছোট-বড় পুটলিগুলির ঠিক সদৃশের বেদি দিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া দীনু নিজেই একটুখানি শুদ্ধভাবে হাসিয়া বলিল, পাড়ার ছোটছেলেনের ছেলেনিলেরা আছে ত বাবা, এটো-কাটাগুলো নিয়ে গেলে তাদের দুখানা-চারখানা দিতে পারব। সে যাই হোক বাবা, কেন যে স্পেন্সুড লোক ঠেকে গিলীমা বলে ডাকে তা আজ বুঝলুম।

রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দ্বার পর্যন্ত জালিয়া—হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ভট্টাচার্য্যামশাই, আপনি ত এমিকের সমস্তই জানেন, এ গাঁয়ে এত বারেবি কেন বলতে পারেন?

দীনু মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হায় রে বাবাজী, আমাদের কুয়াপূর ত পসে আছে। যে কাণ্ড এ কদিন ধরে বেদির মামার বাড়িতে দেখে এলুম। বিশ ঘর বামন-কায়েতের বাস নেই; গাঁয়ের মধ্যে কিন্তু চারটে দল। হরনাথ বিবেশ দুটো বিলিতি আমড়া পেড়েছিল বলে তার আপনার ডায়েরকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে। সমস্ত গ্রামেই বাবা এই রকম—তা ছাড়া মামলায় মামলায় একেবারে শতজিহ্বা!—বেদি, হরিধনের হাতটা একবার বদলে নে মা।

রমেশ আবার জিজ্ঞাসা কবিল, এর কি কোন প্রতিকার নেই ভট্টাচার্য্যামশাই?

প্রতিকার আর কি করে হবে বাবা—এ যে ঘোর কলি! ভট্টাচার্য্যামশাই, নিখাস ফেলিয়া কহিল, তবে একটা কথা বলতে পারি বাবাজী। আমি ডিকে-সিকে কর্ত্তে অনেক জায়গাসুই ত বাই—অনেকে অনুগ্রহ করেন। আমি বেশ দেখেছি, তোমাদে—ছেলে-ছোকরাদের দয়াময় আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাঘের। এরা একটু বাগে পেলো আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না করে আর ছেড়ে দেয় না। বলিয়া দীনু বেগম ভঙ্গি করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল।

দীনু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, হাসির কথা নয় বাবাজী, অতি সত্য কথা। আমি নিজেও এটান হরোট—কিন্তু—তুমি যে অজ্ঞকারে অনেকদূর এদিয়ে এলে বাবাজী।

তা হোক ভট্টাচার্য্যমশাই, আপনি বলুন।

কি আর বলব বাবা, পাড়াগাঁ-মারই এই রকম। এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আনলে ধারনিত্য করতে হয়। ক্যাপ্তিবামনি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই তাকে ভয় করে। ভাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই। বৈশীবাবুর হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ও-ই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়ায়।

রমেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। দীনু নিজেই বলিতে লাগিল—এই আমার কথা তুমি দেখে নিও বাবা, ক্যাপ্তিবামনি সহজে নিস্তার পাবে না। গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার দু-দুটো ভীষ্মকলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা। কিন্তু যাই বল বাবা, মাদারী সাহস আছে। আর সাহস থাকবে নাই বা কেন? মুড়ী বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে, সকলের সব কথা টের পায়। ওকে খাঁটালে কোলেছাড়ার সীমা-পরিসীমা থাকবে না বলে দিচ্ছি। অন্যার আর কোন ঘরে নেই বলা? বৈশীবাবুকেও—রমেশ সব্বয়ে বাধা দিয়া বলিল, থাক, বড়দার কথায় আর কাজ নেই—

দীনু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কহিল, থাক বাবা, আমি দুঃখী মানুষ কারো কথায় আমার কাজ নেই। কেউ যদি বৈশীবাবুর কানে তুলে দেয় ত আমার ঘরে আশুন—

রমেশ আবার বাধা দিয়া কহিল, ভট্টাচার্য্যমশাই, আপনার বাড়ি কি আরো দূরে?

না বাবা, বেশি দূর নয়, এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে—কোন দিন যদি—

আসব বৈ কি, নিশ্চয় আসব। বলিয়া রমেশ কিরিতে উদ্দাত হইয়া কহিল, আবার কাল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্তু তার পরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধূলা দেবেন, বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘজীবী হও—বাণের মত হও। বলিয়া দীনু ভট্টাচার্য্য অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্বচন করিয়া ছেলেপুলে লইয়া চলিয়া গেল।

পাঁচ

এ পাড়ার একমাত্র মধু পালের মুদীর দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশ-বারদিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকি দশ টাকা লইয়া বাই নাই বলিয়া রমেশ কি মনে করিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। মধু পাল মহাসমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোটবাবুর আসিবার হেতু ওনিয়া গভীর আশ্চর্যে অবাক হইয়া গেল। যে ধারে, সে উপযাচক হইয়া ঘর বাহির কণশোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বরসে কখনো চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথায় কথায় অনেক কথা হইল। মধু কহিল, দোকান কেনন করে চলবে বাবু? দু আনা, চার আনা, এক টাকা, পাঁচ-সিকে করে শ্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাকি পড়ে আছে। এই দিরে বাড়ি বলে দু'মাসেও আদার হবার জো নেই। এ কি, বাঁড়ুয়েমশাই যে! কেবে এলেন? প্রান্তঃপোজাম হই।

বাঁড়ুয়েমশায়ের বী হাতে একটা গাড়ু, পায়ে নখে গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতে জড়ানো, ডান হাতে কপূপাতার মেড়া চারিটি কুচোঁচিৎ। তিনি ঘোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কাল রাত্তিরে এলুম, তামাক খা মিকি মধু, বলিয়া গাড়ু রাবিয়া হাতের চিৎ ফেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, সৈরবি জেলেদীর আকেল দেখলি মধু, খপ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে? কালে কালে কি হ'ল বল দেখি রে, এই কি এক পয়সার চিৎ? বামুনকে ঠকিয়ে ক-কাল খাবি মাদারী, উজ্জ্বল যেতে হবে না?

মধু বিষয় প্রশ্ন করিয়া কহিল, হাত ধরে ফেললে আপনার?

কুন্ড বাঁড়ুয়েমশায় একবার চারিটিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আড়াইটি পরসা শুণ্ড বাকী, তাই বলে খামকা হটসুন্ড লোকের সামনে হাত ধরবে আমার? কে না দেখলে বল! মাঠ থেকে বসে এসে পাড়ুটি মেজে নদীতে হাঙ-পা ধুয়ে মনে করলুম হাটটা একেবারে ঘুরে বাই। মাদারী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে বসে—আমাকে বজ্রাঘে মললে কি না, কিন্তু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে!

আরে আমার চোকে ধূলা দিতে পারিস? ডালাটা ফর্ করে তুলে ফেলতেই দেখি না—অমনি ফর্ করে হাতটা চেপে ধরে ফেললে। তোর সেই আড়াইটা—আর আড়কের একটা—এই সাড়ে-তিনটে পরসা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস মধু?

মধু সায় দিয়া কহিল, তাও কি হয়?

তবে তাই বল না। গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে বটে ভেলের খোপা-নাপতে বন্ধ করে চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না।

হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবুটি কে মধু?

মধু সগর্বে কহিল, আমাদের ছোটবাবুর ছেলে যে! সেদিনের দশ টাকা বাবী ছিল বলে নিজে বাড়ি বয়ে দিতে এসেছেন।

বাঁড়ুঘোমশায় কুচোচিড়ির অভিযোগ তুলিয়া দুই চক্ষু বিস্মারিত করিয়া কহিলেন, অী, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাক বাবা। হী, এসে শুনলুম একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনও হয়নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল চোখে দেখতে পেলুম না। পাঁচ শালার ধান্নায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাঁড়ির হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে!

রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চূপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু সেকানসুদ্ধ সকলে তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহা কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তামাক সাভিয়া মধু লোকানি বাঁড়ুঘোর হাতে টুকটা তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে? একটা চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত?

হবে না? এ কি এনে দিয়ে লোকপড়া দেখা আমার? হ'লে হবে কি—সেখানে কে থাকতে পারে বল। যেমনি ধোঁয়া তেমনি কাল। বাইরে বেরিয়ে গাড়ি-ঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস ত জানবি তোর বাপের পুণি!

মধু কখনও কলিকাতায় যায় নাই। মেদিনীপুর শহরটা একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে তার আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলেন কি।

বাঁড়ুঘো ইমখ হাসিয়া কহিলেন, তোর রমেশবাবুকে ভিত্তাসা কর না, সত্যি কি মিথ্যে। না মধু, যেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে পড়ে থাকব সেও ভাল, কিন্তু বিশেষ বাবার নামটি যেন কেউ আমার কাছে আর না করে। বললে বিশ্বাস করবি নে, সেখানে সুবনি-কলমি শাক, চালতা, আমড়া, খোড়, মোচা পর্যন্ত কিনে যেতে হয়। পারবি যেতে? এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইদুরটি হয়ে গেছি। দিবারাত্রি পেট ফুটফুট করে, বুক জ্বালা করে, প্রাণ অস্থির হয়ে পালিয়ে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গায়ে বসে জোটে একবেলা একসজ্জা খাব, না সাড়ে, ছেলেমেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করব, বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জার কথা নেই, কিন্তু মা-লক্ষ্মী মাথার থাকুক—বিশেষে কেউ যেন না যায়।

তার আহ্বানী শুনিয়া সকলে যখন সতয়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছে তখন বাঁড়ুঘো উঠিয়া আসিয়া মধুর ভেলের ভাঁড়ের ভিতরে উড়িষী ডুবাইয়া এক ছটাক তেল বা হাতের ভেলের লইয়া অর্ধেকটা দুই নাক ও কানের গর্তে ঢালিয়া দিয়া বাবীটা মাথায় মাখিয়া কেলিলেন ও কহিলেন, বেলা হয়ে গেল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক পরসার নুন দে দেখি মধু, পরসোটা বিকেন্বেলা দিয়ে বাবো!

আবার বিকেন্বেলা? বলিয়া মধু অগ্রসরমুখে নুন দিতে তাহার লোকানে উঠিল। বাঁড়ুঘো গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বিশ্বয়-বিরস্তির ঘরে কহিল উঠিলেন, ভোরা সব হাল কি মধু? এ যে গালে চড় মেরে পরসা নিস দেখি? বলিয়া আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা নুন তুলিয়া চোখের দিয়া সেটা ঢালিয়া লইলেন। গাড়ু হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া ু হাসিয়া বলিলেন, এ ত একই পথ—চল না বাবাজী, গল্প করতে করতে যাই।

চলুন, বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু লোকানি অভিমুখে দাঁড়াইয়া করণকণ্ঠে কহিল, বাঁড়ুঘোমশাই, সেই মরদার পরসা পাঁচ আনা কি অমনি—

বাঁড়ুঘো হাসিয়া উঠিল—হী রে মধু, দুবেলা চোখাচোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নৌ? পাঁচ বাটা-বেটির মতলস কলকাতায় বাওয়া-আসা করতে পাঁচ-পাঁচটা টাকা আমার গলে

গেল—আর এই কি তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল। কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস—দেখলে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে ?

মধু এতটুকু হইয়া অশ্রুটে বলিতে গেল, অনেক দিনের—

হলেই বা অনেক দিনের ? এমন করে সবাই মিলে নিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না, বলিয়া বাঁড়ুয়ে একরকম রাগ করিয়াই নিজের নিজস্বপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া প্রশ্নাম করিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইন্সুলের হেডমাস্টার। দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি : তাই বলি—

রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুইমহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল ; কিন্তু সে সসন্ত্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।

লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর যাই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি বিনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসনগ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোট রকমের ইন্সুল মুখুন্ডে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র পড়ে। দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্ণমেন্ট সাহায্য আছে, তথাপি ইন্সুল আর চলিতে চাহিতেছে না ; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়াছিল তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে ; উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং ঘরের খাইয়া বন্যমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইন্সুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেডমাস্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাস্টার-পণ্ডিত চারিজন এবং তাহাদের ছাত্রভাঙা ষাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতি বৎসর মাহিনার পরীক্ষায় পাস করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম, বিবরণ পাড়ুইমহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দু'জন শিক্ষকের কোনমতে, ও গভর্ণমেন্টের সাহায্যে আর-একজনের সঙ্কলান হয় ; শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন-চারি মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক বাড়িতে আট-দশবার করিয়া হাঁটাচাঁটা করিয়া সাত টাকা চারি আনার বেশি আদায় করিতে পারেন নাই।

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচ-ছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয় এবং এই পাঁচ-ছয়টা গ্রামময় তিন-মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র সাত টাকা চারি আনা আদায় হইয়াছে। রমেশ প্রশ্ন করিল, আপনার মাহিনা কত ?

মাস্টার কহিল, রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পনের আনা। কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাস্টার তাহা বুঝাইয়া বলিল, আজ্ঞে গভর্ণমেন্টের হুকুম কি না, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সাব-ইন্স্টেটোরবাবুকে দেখাতে হয়—নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কেন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন—আমি মিথ্যে বলছি নে।

রমেশ অনেককাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মানহানি হয় না ?

মাস্টার লজ্জিত হইল। কহিল, কি করব রমেশবাবু! কেশীবাবু ও কয়টি টাকাও দিতে নারাজ।

তিনি কঠা বুঝি ?

মাস্টার একবার একটুখানি বিধা করিল ; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে

জানাইল যে, তিনিই সেক্রেটারী বটে ; কিন্তু তিনি একটি পরসাত্ত কখনো খরচ করেন না। যদু মুখুয্যেমহাশয়ের কন্যা—সতীলক্ষ্মী তিনি—তার দয়া না থাকিলে ইকুল অনেক দিন উঠিয়া বাহিত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে, সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারি না।

রমেশ কৌতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর একটি ভাই এ ইকুলে পড়ে না?

রমেশ বলিল, আপনার ইকুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আজ আপনি যান, কাল আমি আপনাদের ওখানে যাব।

যে আজ্ঞে বলিয়া হেডমাস্টার আর একবার রমেশকে প্রশ্ন করিয়া জোর করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বিদায় হইল।

ছয়

বিশেষজ্ঞরী সেদিনের কথাটা সেইদিনেই দলখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেশী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না ; তাই সে গিয়া রমার মাসিকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে না-কি তৎক্ষণ দীপ্ত ফুটাইয়া এক বিরাট অশ্বখ গাছ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসিটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়িয়া যে বিষ উদ্‌গীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে বিশেষজ্ঞরীর রক্তমাংসে—সেইটা কাঠের নয় বলিয়াই হউক, কিংবা এ—কাল সে—কাল নয় বলিয়াই হউক, জ্বলিয়া ভস্মরূপে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশেষজ্ঞরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ, ইহা যে তাঁহার পুত্রের দ্বারস্থি সম্বন্ধিত হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা কথার ভাব দিতে গেলেও এই ঈর্ষালোকের মুখ গিয়া সর্বাগ্রে তাহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরের প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা বমেশের কাগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বাসিয়াছিলেন।

তবে পাড়াগায়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই। রমেশ শুনিতে পাইল। জ্যাঠাইমার জন্য তাহার প্রথম হইতেই বার বাব মনের ভিতরে উৎকণ্ঠা ছিল এবং এই লইয়া মাতা-পুত্রে যে একটা কলহ হইবে সে আশঙ্ক্যও কবিয়াছিল। কিন্তু বেশী যে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন করিয়া অপমান ও নির্যাতন করিবে এই কথাটা সাহসা তাহার কাছে একটা সমিহাদা কাণ্ড বলিয়া মনে হইল এবং পরমুহূর্তেই তাহার ক্রোধের বহি যেন ব্রহ্মরক্ত ভেস করিয়া ছুটি, উঠিল। ভাবিল, ও—বাড়িতে ছুটিয়া গিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া বেশীকে গালগালি করিয়া আসে ; কারণ, যে লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করতে পারে তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাহ-বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হইল, তাহা হয় না। কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। সেদিন দীনুর কাছে এবং কাল মাস্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারি একটা প্রভাব ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দিকে পরিপূর্ণ মৃত্যুতা ও সহস্র প্রকার কলুষ ক্ষুভতার ভিতরে এক জ্যাঠাইমার দলদলটুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া বখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই মুখুয্যে-বতীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাস—তাহা যত কুহু এবং কুহু হোক,—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার এই ঘটনার তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত মন দ্বন্দ্বায় ও বিভ্রান্ত করিয়া গেল। বেশীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসি ও বোনঝিতে মিলিয়া যে অন্যায় করিয়াছে, তাহাতে ওঁর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু এই দুইটা ঈর্ষালোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে এবং বেশীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে তাহাও কোনমতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময় একটা কণ্ড খটিল। মুখুয্যে ও ঘোষালদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্যসেব পল্লীর নিম্নে 'পল্লী' বলিয়া পুস্তকখানাও এইরূপ উত্তরের সাধারণ সম্পত্তি। এক সময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল ; ক্রমশঃ সংস্কার-অভ্যাসে বৃদ্ধি' গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবার পরিণত

হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না। কই, মাগুর প্রকৃতি যে-সকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু ছিল। ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চতীমণ্ডলের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল, ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, সরকারমশাই, লোক পাঠান নি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্ছে যে!

সরকার কলম কানে গুজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে ধরাত্তে?

আবার কে? বেনীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয়াদের খোঁটা দারোয়ানটাও আছে দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগগির পাঠান।

গোপাল কিছুমাত্র চাকলা প্রকাশ করিল না, আমাদের বাবু মাছ-মাংস খান না।

ভৈরব কহিল, নাই খেলেন, কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত!

গোপাল বলিল, আমরা পাঁচজন ত চাই, বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন। কিন্তু রমেশবাবু একটা আলাদা ধরনের। বলিয়া ভৈরবের মুখে বিষয়ের চিহ্ন দেখিয়া, সহাস্যে একটুখানি শ্বেদ করিয়া কহিল, এ ত তুচ্ছ দুটো সিঁটি-মাগুর মাছ, আচাখি-মশাই! সেদিন হাটের উত্তরদিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দু'ঘরে ভাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের কুচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কি করব বাবু? রমেশবাবু আর মুখটা একবার তোলবারও ফুরসত পেলেন না। তারপর পীড়ানীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বললেন, কাঠ? তা আর কি তেঁতুলগাছ নেই? শোন কথা! বললুম, থাকবে না কেন। কিন্তু নাখা অংশ ছেড়ে দেবেনই বা কেন, আর কে কোথায় এমন দেয়? রমেশবাবু বইখানা আবার মেলে ধরে মিনিট-পাঁচেক চুপ করে থেকে বললেন, সে ঠিক। কিন্তু দুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া করা যায় না!

ভৈরব অতিশয় বিস্ময়াগম হইয়া কহিল, বলেন কি!

গোপাল সরকার মৃদু হাসিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া কহিল, বলি ভাল, আচাখিমশাই, বলি ভাল! আমি সেই দিন থেকে বুঝেছি, আর মিছে কেন! ছোটতরফের মা-লক্ষ্মী তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্ধান হয়েছেন!

ভৈরব খনিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু পুকুরটা যে আমার বাড়ির পিছনেই—আমার একবার জানান চাই।

গোপাল কহিল, বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দ্বিবারাত্রি বই নিয়ে থাকলে, আব শরিকদের এত ভয় করলে কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়? যদু ঋষুজের কন্যা—স্ট্রীলোক, সে পর্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে ডেকে না কি সেদিন তামাশা করে বলেছিল, রমেশবাবুকে ব'লে, একটা মাসহারী নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে। এর চেয়ে লজ্জা আর আছে? বলিয়া গোপাল রাগে-দুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বাঁটাতে স্ট্রীলোক নাই। সর্বত্রই অব্যবহৃত দ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙ্গা ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্তব্যকর্ম উদ্বেজিত করিবার জন্য সে সম্পত্তিরক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িবারাত্রি রমেশ কম্পকের তলি খাইয়া যুমন্ত বাঘের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, কি—রোজ রোজ চালাকি নাকি! ভজুয়া?

তাহার এই অভাববীর্য এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্ত্ব হইয়া উঠিল। এই চালাকিটা যে কাহার তাহা সে ঠাহর করিতেই পারিল না। ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অভ্যস্ত বলবান এবং বিশ্বাসী। লাঠিলাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া বকুম করিয়া দিল—সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেউ বাধা দেয় তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি না সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার একপাটি দাঁত বেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে।

ভজুয়া ত এই চায়। সে তাহার তেলেপাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কঁপিয়া উঠিল। সে বাঙ্গলাদেশের তেলে-জলে মানুষ; হাঁকাহাঁকি, চৈচামেচিকে

মোট ভয় করে না। কিন্তু এ যে অতি দুঢ়কায় বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথা কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে ভৈরবের তালু পর্যন্ত দৃশ্চিন্ধ্য গুচ্ছিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিক শুভানুধারী, তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময় মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া সকার-বকার চীৎকার করিয়া দুটো কৈ-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কৈ, কিছুই তাহার হইল না। গালি-গালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব যদি বা একটু হুঙ্কার দিলেন, ততটা তাহার ঠোটকু পর্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক ; বৌজলারীতে জড়াইবার মত তাহা সাহসও নাই, সম্বন্ধও ছিল না। মুহূর্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ড-হাতে ভজুরা ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া গ্রহানের উপক্রম করিতেই ভৈরব অকস্মাৎ কান্দিয়া উঠিয়া রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—ওরে ভোজো, যাস্নে! বাবা রমেশ, রকে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ একদণ্ডও বাঁচব না।

রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিশ্বাসের সীমা-পরিসীমা নাই। ভজুরা অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কান্দ কান্দ ঘরে বলিতে লাগিল, এ কথা ঢাকা থাকবে না বাবা। বৌবাবুর কোপে পড়ে তাহলে একটা দিনেও বাঁচব না। আমার ঘরদোর পর্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিশ্ব এলেও রক্ষা করিতে পারবে না।

রমেশ ঘাড় ঝেঁপিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, কথাটা ঠিক বাবু।

রমেশ ত্রাচারণ কোন ভাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুরাকে তাহার নিজের কাছে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার সদয়ের মধ্যে যে কি তীব্র কষ্টের আকাশেই এই ভৈরব আচার্যের অপরিদ্রা সমীপে ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্ভূমিই দেখিলেন।

সাত

হী রে যতীন, খেলা করছিল ইকুলে যাবিনে?

আমাদের যে আজ কাল দুর্দিন ছুটি দিদি!

মাসি শুনিতে পাইয়া কুৎসিত মুখ আরও বিন্ধী করিয়া বলিলেন, মুখপোড়া ইকুলে? মাসের মধ্যে পনের দিন ছুটি! তুই তাই ওর পিছনে ঢাকা খরচ করিস, আমি হ'লে আঙন ধরিয়ে দিতুম। বলিয়া নিজের কাঁজে চলিয়া গেলেন। বোল আনা মিথ্যাবাদিনী বলিয়া বাহারা মাসির বখাতি প্রচার করিত গ্রাহ্য! ভুলি করিত। এমন এক-আধটা সত্য কথা বলিতেও তিনি পারিতেন এবং আবশ্যক হইলে করিতেও পক্ষাৎপদ হইতেন না।

রমা ছোটভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, ছুটি কেন রে যতীন?

যতীন দিদির কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমাদের ইকুলের চাল ছাওয়া হচ্ছে যে! তারপর চুনকাম হবে—কত বই এসেছে, চার-পাঁচটা চেয়ার টেবিল, একটা আলমারি, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন ভূমি গিয়ে দেখে এসো না দিদি!

রমা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস কি রে!

হী দিদি সত্যি। রমেশবাবু এসেছেন না—তিনি সব ক'রে হচ্ছেন। বলিয়া বালক আরও কি কি বর্ণনায় যাইতেছিল, কিন্তু সুস্থে মাসিকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া এই ছোট-ভাইটির মুখ হইতে সে রমেশের ইকুল সব্বন্ধে অনেক ভাষা সংগ্রহ করিল। প্রত্যাহ দুই-এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া যান, তাহাও শুনি। শুধু জিজ্ঞাসা করিল, হী রে যতীন, তোকে তিনি চিনতে পারেন?

বালক সগর্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, হী—

কি বলে তুই তাঁকে ডাকিস?

এইবার যতীন একটু মুখিলে পড়িল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোৰ্গ-প্রতাপ হেডমাস্টার পৰ্যন্ত যেনাপ টটহু হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। ডাক্তার ত দুইয়ের কথা—ভরসা করিয়া ইহার। কেহ তাহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিমির কাছে বীকার করাও ত সহজ নহে। ছেলেরা মাস্টারদিগকে 'হোটাবাবু' বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিল। তাই সে যুদ্ধি খরচ করিয়া কহিল, আমরা হোটাবাবু বলি। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুঝিতে কিছু বাধী রহিল না। সে তাহাকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, হোটাবাবু কি রে। তিনি যে তোমার দাদা হন। বেণীবাবুকে যেমন বড়দা বলে ডাকিস্ এতে তেমনই হোটাদা বলে ডাকিতে পারিস নে?

বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল—আমার দাদা হন তিনি? সত্যি বল্চ দিদি?

তাই হত হয় রে—বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখন প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু যে-সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই বা সে থাকে কি করিয়া! সে আর একবার হটফট করিয়া বলিল, এখন যাব দিদি?

এত বেলায় কোথায় যাবি রে? বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া যতীন খানিকক্ষণ অশ্রুস্রব্ধ মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?

রমা স্নিগ্ধরূপে কহিল, এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে ডোকেও এমন বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে যতীন? বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। বালক হইলেও সে তাহার দিমির কষ্টবয়ের কি-রকম একটা পরিবর্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে, প্রাণতুল্য ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাস কখন প্রকাশ পাইত না।

যতীন প্রশ্ন করিল, হোটাদার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি?

রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল, হাঁ ভাই, তাঁর সব পড়া সাজ হয়ে গেছে।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, কি করে তুমি জানলে?

প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বক্তব্যঃ এ সম্বন্ধে সে কিংবা গ্রামের আর কেহ কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই তাহাও নয়, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখা-পড়ার জন্য এই অভ্যাসকালের মধ্যেই এরূপ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূৰ্খ নয়।

যতীন এ লইয়া আজ জিদ করিল না। কারণ, ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেই চট করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, আজ্য দিদি, হোটাদা কেন আমাদের বাড়ি আসেন না? বড়দা ত রোজ আসেন।

প্রশ্নটা ঠিক যেন একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ ব্যথার মত রমার সর্বাস্তে বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। তথ্যাদি হাসিয়া কহিল, তুই তাকে ডেকে আনতে পারিস্ নে?

এখনই যাব দিদি? বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওরে, কি পাগলা ছেলে রে তুই, বলিয়া রমা চক্কর পলকে তাহার ভয়-ব্যাকুল দুই বাহু বাড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। খবরদার যতীন—কণ্ঠখনো এমন কাজ করিস নে ভাই, কণ্ঠখনো না। বলিয়া ভাইটিকে সে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতি দ্রুত দৃষ্টি-সংকল্পন স্পষ্ট অনুভব করিয়া যতীন বালক হইলেও এবার বড় বিষয়ে দিমির মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একে ত এমনধারা করিতে কখনও সে পূর্বে দেখে নাই, তা ছাড়া হোটাবাবুকে হোটাদাদা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অন্যপথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। এমন সময়ে মাসির তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে আসিতেই রমা যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনতিকাল পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি বলি বুঝি, রমা ঘাটে চান করতে গেছে! বলি একদমশী বলে কি এতটা

বেলা পর্বন্ত মাথায় একটু তেল-জলও দিতে হবে না? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

রমা জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি যাও মাসি, আমি এখন যাচ্ছি।

যাবি আর কখন? বেরিয়ে দেখে গে বা বেনীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।

মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসির অলঙ্কে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাসঙ্গের উপর মহা কোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা বড় ঝুড়ির প্রায় এক ঝুড়ি। ভাগ করিবার জন্য বেনী নিজেই হাজির হইয়াছেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই—কি মাছ পড়ল হে বেনী। বলিয়া লাঠি হাতে ধর্মদাস প্রবেশ করিল।

তেমন আর কই পড়ল! বলিয়া, বেনী মুখখানা অগ্রসর করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল, আর দেরি করচিস্ কের রে? শীগগির করে দু ভাগ করে ফেল না।

জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কি হচ্ছে গো রমা? অনেকদিন আসতে পারিনি। বলি, মায়ের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই, বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলী বাড়ি ঢুকিলেন।

আসুন, বলিয়া স্মা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

এত ভিড় কিসের গো? বলিয়া গাঙ্গুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য হইয়া গেলেন—বাস! তাই ত গা—মাছ বড় মশ ধরা পড়েনি দেখচি। বাড়ি পুকুরে জাল দেওয়া হ'ল বুঝি?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহলা মনে করিয়া মৎস্য বিভাগের প্রতি বুকিয়া রহিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা সমাধা হইয়া গেল। বেনী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকু চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া দীঘলের প্রতি একটা চোখের ইস্তিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিল এবং মুখ্যোদ্দেশ্যের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথার সমান উচু বাঁশের লাঠি হাতে, একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এমনি দুশমনের মত যে, সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলে-বুড়া সর্বত্র তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আকস্মিক গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কব্জী বলিয়া চিনিল তাহা সেই জানে, দূর হইতে মস্ত একটা সেলাম করিয়া ‘মা-জী’ বলিয়া সম্বোধন করিল এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা যেমনই হোক, কণ্ঠস্বর সত্যি ভয়ানক—অত্যন্ত মোটা এবং ভাসা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দী-বাসলা মেশানো ভাষার সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশবাবুর ভৃত্য এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। রমা বিশ্বাসের প্রভাবেই হোক, বা তাহার সমস্ত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথ্য ঝুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক সহসা উত্তর দিতে পারিল না। লোকটা চকিতে খাড় কিনাইয়া বেনীর ভৃত্যকে উদ্দেশ্য করিয়া গম্ভীর গলবে কহিল, এই যাও মাং।

চাকরটা ভয়ে চার পা লিছাইয়া দাঁড়াইল। আধ-মিনিট পর্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই; তখন বেনী সাহস করিল। যেখানে ছিল সেইখান হইতে বলিল, কিসের ভাগ?

ভৃত্য তাৎক্ষণ্য তাহাকে একটা সেলাম দিয়া সমস্তই কাইল, বাবুজী, আপনাকে নেহি পুছ।

মাসি অনেক দূরে রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বন্‌বন্‌ করিয়া বলিলেন, কি রে বাপু মারবি না কি।

ভৃত্য এক মুহূর্ত তাহার প্রতিচাহিয়া রহিল; পরক্ষণে তাহার ডালা গলার ভরফর হাসিতে বাড়ি তুলিয়া উঠিল। খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু প্রায় লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, মা-জী! তাহার কথার এবং ব্যবহারের অতিশয় সত্মের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুক্কান ছিল, রমা

ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, কি চায় তোর বাবু?

রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুরা হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য সেই কর্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলো লোকের সুমুখে রমা হীন হইতেও পারে না। তাই কটুকণ্ঠে কহিল, তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। কল্গে যা, যা পারে তাই করুক গে।

বহৎ আচ্ছা মা-জী। বলিয়া ভজুরা ভৎসনাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেশীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেরও গ্রহণের উপক্রম করিল। তাহার ব্যবহারে বাড়িসুদ্ধ সকলেই যখন অভ্যস্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ সে কিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া হিন্দি-বাদলার মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্য কমা চাহিল এবং কহিল, মা-জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুরখার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। বাবুজী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাসে ছুই না বটে, কিন্তু—বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বৃকের উপর করখাত করিয়া কহিল, বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয়ত পুকুর-খারই আড দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন; বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেলে। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভজুরা, যা, মা-জীকে জিজ্ঞেস করে আয় ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না, বলিয়া সে অতি সন্ত্রমের সহিত লাঠিসুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উখিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, বাবুজী বলিয়া দিলেন—আর যে যাই বলুক ভজুরা, আমি নিশ্চয় জানি, মা-জীর জবান থেকে কখনও কুটা বাত বার হবে না—সে কখনও পরের জিনিস ছোঁবে না, বলিয়া সে আত্মরিক সন্ত্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবা মাত্র বেশী মেরেসি সর গলায় আশ্ফালন করিয়া কহিল, এমনি করে উনি বিষয় রক্ষে করবেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে করছি, আমি আজ থেকে গড়ের একটা শামুক-গুণলিতেও ওকে হাত দিতে দেব না, বুঝলে না রমা, বলিয়া আদ্বাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। মা-জীর মুখ হইতে কখনো কুটা বাত বাহির হইবে না—ভজুরার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত কমাঞ্চ শব্দে যেন মাখাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাসা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল যেন কোথাও এককোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। সুদ এ জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আঁচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আট

জ্যাঠাইমা!

কে, রমেশ? আর বাবা, ঘরে আয়। বলিয়া আহ্বান করিয়া বিবেচনাপ্রীত তাদ্ভাতিড়ি একখানি মানুষ পাকিয়া দিলেন। ঘরে পা নিরাই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ, জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বলিয়াছিল তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। তাহার ভারি একটা চিন্তাভালার সহিত মনে হইল, ইহার মাসিকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ক্রটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জার মত নিষ্ঠুরে কাছে আনিয়াও বসে। এমিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাপনে রমারও অবস্থাসঙ্কট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এ গ্রামের মেয়ে তাই নয়, রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিততার মত যোমটা টানিয়া দিতেও লজ্জা করে, না দিয়াও সে বসি পায় না। তা ছাড়া মাছ লইয়া এই যে সেদিন একটা কাণ্ড ঘটান গেল। তাই সবদিকে বীচাইয়া বস্ত্রী পায়া যায় সে আজ হইয়া কসিয়াছিল। রমেশ আর সেদিকে চাহিল না। ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া নিরা বীচের-সুহে মানুষের উপর উপেক্ষণ করিয়া কহিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?

রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এলে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়!

জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিলার নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এসুম। এই হরত শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা।

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারত্বান্বিত স্বরের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে উভয়েই বিস্মিত-ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

বলাই বাট্! ওকি কথা বাপ। বলিয়া বিবেকধরীর চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল।

রমেশ শুধু একটু হাসিল।

বিবেকধরী স্নেহাভ্যর্থকৃষ্ণে প্রশ্ন করিলেন, শরীরটা কি এখানে ভাল থাকচে না—বাবা?

রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত কলশালী দেহের পানে বার-দুই দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এ যে খেড়ার বেশের ভাল-কটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্রই খারাপ হয়? তা নয়, শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ড টিকতে পাচ্ছিনে, সমস্ত শ্রাণটা যেন আমার থেকে থেকে খাঁচি খেয়ে উঠচে।

শরীর খারাপ হয় নাই ওনিয়া বিবেকধরী নিশ্চিত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তোর জন্মস্থান—এখানে টিকতে পারছিস নে কেন বল দেখি?

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আমি বলতে চাইনে। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জান।

বিবেকধরী কলকাল মৌন থাকিয়া একটু গভীর হইয়া বলিলেন, সব না জানলেও কতক জানি বটে। কিন্তু সেই জানেই ত বলচি, তোর আর কথাও গেলে চলবে না রমেশ।

রমেশ কহিল, কেন চলবে না জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চার না।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, চার না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ভাল-কটি-খাওয়া ঘেষের বড়ই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্যে?

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। আজ কে যে তাহার সমস্ত চিন্তা জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছলিয়া উঠিয়াছিল তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যে পথটা বরাবর স্টেশনে গিয়া পৌছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আট-দশ বৎসর পূর্বে বৃষ্টির জলজমাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙ্গনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে—প্রায়ই জল কলিয়া থাকে—ছানটা উজ্জীর্ণ হইতে সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্য সময়ে কোনমতে ষোলটিশিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সতর্পণে ইহার পাশ হয়, কিন্তু বর্ষাকালে আর কটের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটা বীশ কেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙ্গা তালের ডোঙ্গা উপড় শ্রিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহার আছাড় খাইয়া, হাত-পা ভাঙ্গিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টামাত্র করে নাই। মেসারস করিতে টাকা-কুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই টাকাটা রমেশ নিজে না দিয়া টাঙ্গা তুলিবার চেষ্টার আট-দশমিন পরিচয় করিয়াছে; কিন্তু আট-দশটা পরস্যা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে খুরিয়া আসিবার সময় পাথর ধারে সেকরামের সোকারের ভিতরে এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কানে যাওয়ার সৈ বাহিরে পাড়াইয়া ওনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে বলিতেছে, একটা পরস্যা কেউ তোরা নিলেন। দেখিলেন নে, ওর নিজের গরজটাই বেশি। জুতো পারে মসমসিয়ে চলা চাই কিনা! না দিলেও আপনি সারিয়ে দেবে তা দেখিস! তা'ড়া এতকাল যে ও ছিল না, আমাদের ইন্টিশান যাওয়া কি আটকে ছিল?

কে আর-একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুযোমশায় বদছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। খোশামোদ করে দুটে লবু বাবু করতে পারলেই বাস! - তখন হইতে সারা সকালবেলাটা এই দুটো কথা তাহাকে যেন আগুন দিয়া পোড়াইতেছিল।

জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই যা দিলেন। বলিলেন, সে ভাঙ্গনটা যে সারাবার চেষ্টা করছিল তার কি হ'ল?

রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, সে হবে না জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পরয়া চালা দেবে না।

বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, সেবে না বলে কি হবে না রে? তোর দাদামশায়ের ত তুই অনেক টাকা পেয়েচিস—এই ক'টা টাকা তুই ত নিজেই দিতে পারিস।

রমেশ একেবারে আশুন হইয়া উঠিল, কহিল, কেন দেব? আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইচ্ছুলের জন্যে খরচ করে ফেলেচি। এ গাঁয়ের কারো জন্যে কিছু করতে নেই। রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল, এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে; ভাল করলে গরজ ঠাণ্ডারায়; কমা করাও মাহাপাপ, ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল।

জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখ-মুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ রাগ করিয়া কহিল, হাসলে যে জ্যাঠাইমা?

না হেসে করি কি বল ত বাছা? বলিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি রমেশ, বল দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে? একটু খামিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, আহা, এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েচেন—তবে এদের মাঝখানে তুই থাক বাবা।

কিন্তু এরা যে আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, তাই থেকেই কি বুঝতে পারিস নে বাবা, এরা তোর রাগ-অভিমানের কত অব্যোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আর, দেখবি সমস্তই এক।

সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে চপ করে বসে আছে মা?—হ্যাঁ রমেশ, তোরা দু'ভাই-বোন কি কথাবার্তা বলিস নে?—না মা সে ক'রো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা হয়ে গেছে সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দু'জন মনান্তর করে থাকলে ত কিছুতেই চলবে না।

রমা মুখ নীচু করিয়াই আছে আঙুলে আঙুলে বলিল, আমি মনান্তর রাখতে চাইনে জ্যাঠাইমা! রমেশলা—আকস্মিক তাহার মুদূর্গে রমেশের গভীর উত্তপ্ত কঠিন হয়ে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এর মধ্যে তুমি কিছুতেই থেকো না জ্যাঠাইমা। সেদিন কোন গতিকে ওঁর মাসির হাতে গ্রাণে বেঁচেছি; আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে তোমাকে চিথিয়ে খেয়ে ফেলে তবে বাড়ি ফিরবেন, বলিয়াই কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতগদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চোঁচাইয়া ডাকিলেন, বাসনে রমেশ, কথা ওনে যা।

রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, না জ্যাঠাইমা; বারা অহঙ্কারের স্পর্শায় তোমাকে পর্বত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি ব'লো না, বলিয়া তাহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই চলিয়া গেল।

বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কামিয়া ফেলিল—এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসিকে শিথিয়ে দিই, না তার জন্য আমি দায়ী?

জ্যাঠাইমা তাহার হৃৎকথানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সম্মুখে বলিলেন, শিথিয়ে যে দাও না একথা সত্যি। কিন্তু তাঁর জন্যে দায়ী তোমাকে কতকটা হতে হয় বৈ কি মা!

রমা অন্য হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সন্তোষে অস্বীকার করিয়া বলিল, কেন দায়ী? কখনো না। আমি যে এর কিছুবিসর্গও জানতাম না জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি মিথ্যে লোভ দিয়ে অপমান করে গেলেন?

বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর ভর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, সকলে ত ভেতরের কথা জানতে

পারে না মা। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখনো নেই, এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি ও জান না মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েছি, তোমার ওপর ওর কত অজ্ঞা, কত বিশ্বাস; সেদিন ঠেঁকুলগাছটা কাটিয়ে দু'ঘরে যখন ভোগ করে নিলে, তখন ও কারো কথার কান দেয়নি যে ওর তাতে অংশ ছিল। তাদের মুখের ওপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই—রমা যখন আছে তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি পাই; সে কখনো পরের জিনিস আশ্বাস্য করবে না। আমি ঠিক জানি মা, এক বিবাদ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর ওই সেই বিশ্বাসই ছিল যদি না সেদিন পাড়পুকুরের—

কথাটার মাঝখানেই বিবেচনারী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার অনন্ত শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, আজ একটা কথা বলি মা তোমাকে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম বড়ই ছোট রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি। কারোর কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই মা সেই জিনিসটিকে তোমরা চারিদিক থেকে ঘা মেরে নষ্ট করে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলছি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।

রমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথাও প্রতিবাদ করিল না। বিবেচনারী আর কিছু বলিলেন না। বানিক পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেলা গেল, আজ বাড়ি যাই জ্যাঠাইমা, বলিয়া প্রশ্ন করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

নয়

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ি পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার সমস্ত উদ্ভ্রাণ যেন জল হইয়া গেল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল—এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কি কষ্টই না পাইতেছিলাম। বাস্তবিক, রাগ করি তাহার উপর? যাহারা এতই সঙ্গীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মূল্য কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিকার অভাবে যাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলস্বয় করাটাকেই নিজেদের বল-স্বস্ত্যের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, তাহাদের উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কটকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছুই হইতে পারে না। তাহার মনে পড়িল, দূরে শহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গজ ওনিয়া, কখনা করিয়া কতবার ভাবিয়াছে—আমাদের বাঙ্গালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রাম-গুলিতে সেই শান্তি-বহুস্বপ্নতা আজও আছে, শান্ত বহুজনাকীর্ণ শহরে নাই। সেখানে স্বল্পে সম্ভূত সর্বল গ্রামবাসীরা সহনুভূতিতে পল্লীয়া যায়, একজনে দু'ঘে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহুত ঐশ্বর্য অক্ষয় হইয়া আছে। হায় রে! এ কি ভয়ানক দ্ব্যস্তি! তাহার শহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এই পরস্পরীকাতরতা চোখে পড়ে নাই! নগরের সঙ্গীর্ণ-চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাণের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে, তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মতে রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে বাহ্য সকলের বড়—সেই ধর্ম আছে এবং সামাজিক চরিত্রও আকিও সেখানে অকুণ্ঠ হইয়া বিরাজ করিতেছে। হা ভগবান! কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই ধর্মীত্ব ধর্ম আমাদেব এ এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, তাহার স্তম্বেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছে কেন? এই বিলুপ্ত বিকৃত শব্দেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পুণ্ডিগন্ধময় পিচ্ছিলতার অহনিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে। অণ্ড সর্বাপেক্ষা মর্যাদিক পনিহাস এই যে, জাতিধর্ম নাই বলিয়া শহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা অশ্রদ্ধারও অস্ত্র নাই।

রমেশ বাড়িতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি শ্রোত্রী স্ত্রীলোক একটি এগার-বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া শুধু ছেলোটর মুখ দেখিয়াই রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমতপের বারান্দায়

বলিয়া লিখিতেছিল ; উঠিয়া অসিয়া কহিল, ছেলেটি দক্ষিণপাড়ার ঘরিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য এসেছে।

ভিক্ষার নাম শুনিয়া রমেশ বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি শুধু ভিক্ষা দিতেই বাড়ি এসেছি সরকারমশাই? গ্রামে কি আর লোক নেই?

গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, সে ঠিক কথা বাবু; কিন্তু কর্তা ত কখনও কারকে ফেরাতেন না ; তাই দায়ে পড়লেই এই বাড়ির দিকেই লোক ছুটে আসে।

ছেলেটির পানে চাহিয়া ছোট্টাটিকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, হাঁ কামিনীর মা, এদের দোষও ত কম নয় বাবা; জ্যান্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত করে দিলে না, এমন মড়া যখন উঠে না, তখন টাকার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে! ঘরে ঘটিটা-বাটিটাও কি নেই বাবু?

কামিনীর মা জ্ঞাতিতে সদগোপ, এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল, বিশ্বাস না হয় বাবু, গিয়ে দেখবে চল। আর কিছু থাকলেও কি মরা-বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি! চোখে না দেখলেও শুনেচ ত সব? এই ছ মাস ধরে আমার যথাসর্বস্ব এই জন্যই ঢেলে দিয়েচি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরবে!

রমেশ এই ব্যাপারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল, এই ছেলেটির বাপ—ঘরিক চক্রবর্তী ছয়মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে ; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ সব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয় মাসকাল তাহার সর্বস্ব এই নিঃশ্বাস-প্রক্রিয়া-পরিবারের জন্য খায় করিয়া ফেলিয়াছে ; আর তাহারও কিছু নাই। সেজন্যে ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভিজ্জাসা করিল, বেলা ত প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয় মড়া পড়েই থাকবে?

সরকার হাসিয়া কহিল, উপায় কি বাবু? অশাস্ত্রের কাজ ত আর হতে পারে না! আর এতে পাড়াপ লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন—যা হোক মড়া পড়ে থাকবে না ; যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে—হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?

ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা কহিল, সিকিটি মুখুন্দের দিয়েছে, আর পরসা চারটি হালদারমশাই দিয়েছেন। কিন্তু যেমন করেই হোক ন সিকির কমে ত হবে না! তাই, বাবু বদি—রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তোমরা বাড়ি যাও বাবু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখন সমস্ত বন্দোবস্ত করে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যক্তি দই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, এমন গরীব এ-পায়ে আর কয় ঘর আছে জানেন আপনি?

সরকার কহিল, দু-তিন ঘর আছে, বেশি নেই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল বাবু, শুধু একটা চালভা গাছ নিয়ে ভাষা করে ঘরিক চক্রোত্তি আর সনাতন হাজরা, দু-ঘরই বছর পাঁচেক আগে শেষ হয়ে গেল। গলাটি একটু খাটো করিয়া কহিল, এতদূর গড়াত না বাবু, শুধু আমাদের বড়বাবু আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী দুজনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা করে তুললেন।

তারপর?

সরকার কহিল, তারপর আমাদের বড়বাবুর কাছেই দু-ঘরের গলা পর্যন্ত এতদিন বাধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে শ্রমতাই কিনে নিয়েছেন। হাঁ, চাবার মেয়ে বটে ওই কামিনীর মা। অসময়ে বামুনের বা করলে এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর গোপাল সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া নিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া মনে মনে বলিল, তোমার আসেই মাখায় তুলে নিলাম ক্যাঠিইমা! মরি এখানে সেও চের ভালো কিন্তু এ দুর্ভাগা গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।

৯

মাসতিনেক পর একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুষ্করিণীটিকে দুধ-পুকুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে এমনি অভিভূত হইয়া অভঙ্গলোকের মত তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কথা মনে হইল না। মেয়েটির বয়স বোধ করি কুড়ির অধিক নয়। রান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিঁড়ি বসনতলে দুই বাত বকের উপর জড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া মূদুকণ্ঠে কহিল, আপনি এখানে যে রমেশের বিশ্বাসের অবধি ছিল না ; কিন্তু তাহার বিহীনতা ঘটিয়া গেল। এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাকে চেনেন?

মেয়েটি কহিল, চিনি। আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন?

রমেশ কহিল, আজই ডোরবেলা। আমার আমার বাড়ি থেকে মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তারা আসেন নি।

এখানে কোথায় আছেন?

রমেশ কহিল, কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি। কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা করে থাকতেই হবে; যেখানে হোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো।

সঙ্গে চাকর আছে?

না, আমি একাই এসেছি।

বেশ যা হোক, বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দুজনের চোখাচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে বেশ কবি একটি ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, তবে আমার সঙ্গে হ আসুন, বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল, আমি যেতে পারি, কেন না, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়; কিন্তু কিছুতেই স্বরণ করতে পারি। আপনার পরিচয় দিন।

তবে মন্দিরের বাটীর একটি অপেক্ষা করুন, আমি পূজোটা সেবে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পাবচয় দেব, বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুখের মতো চাহিয়া রহিল। একি ভীষণ উপদ্রব যৌবনজী! ইহার আশ্রয় বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল; তাহার মুখ, গঠন প্রতি পদক্ষেপ পর্যন্ত রমেশের পরিচিত; অথচ বহুদিন-কাল স্মৃতির কবচ মেতেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল না।

আধ-ঘণ্টা পরে পূজা সারিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আসিল রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল; কিন্তু তেমনই অপরিস্রবের দুর্ভেদ্য প্রকারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ ভিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে আপনার আশ্রয় কেউ নেই?

মেয়েটি উত্তর দিল, না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।

কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল, নইলে আপনাকে যা-নাওয়ার ভারী কষ্ট হ'ত। আমি রমা।

সম্মুখে বসিয়া আহাির করাইয়া পান দিয়া বিশ্রামের জন্য নিঃশব্দ হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া রমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সেই শয্যা পড়িয়া চকু মুদ্রিয়া রমেশের মনে হইল, তাহার এই ভেদীশ বর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগাগোড়া বদলাইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বিশেষে পবিত্রতায় কাটিয়াছে। বাওয়াটার মধ্যে ক্রিয়াবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোন অবস্থাতেই থাকিতে পারে ইহা সে জানিতই না। তাই আজকার এই অচিন্তনীয় পরিবর্তনের মধ্যে তাহার সমস্ত

মন বিষয়ে মাদুর্ঘ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাহার আহ্বানের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিত্য সাধারণ ভোজ্য ও পের দিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইয়াছে। এই জন্য তাহার বড় ভাবনা ছিল পাছে তাহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিশ্চয় হয়। হায় রে পর। হায় রে তাদের নিশা! খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা যে তাহার নিজের কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার সববিধ বিধা-সঙ্কোচ সজোরে হিনাইয়া লইয়া, এই খাওয়ার জায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া আজ সে তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে। আজ ত কোন লজ্জার বাধাই তাহাকে দূরে রাখতে পারিল না ! এই আহ্বারের স্বভাব ক্রটি শুধু যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সুমুখে আসিয়া বসিল। আহ্বার নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়েও কত বেশি, তাহা আর কেহ যদি না জানিল, যিনি সব জানেন তাহা হইবে তাহা গোপন রাখিল না।

দিবানিত্রা রমেশের অভ্যাস ছিল না। তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নব-বর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল। অধনিমীলিত চক্রে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা না-আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মৃদুকণ্ঠ তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আজ যখন বাড়ি যাওয়া হবে না, তখন এইখানেই থাকুন।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু যার বাড়ি তাঁকে এখনো ত দেখতে পেলাম না। তিনি না বললে থাকি কি করে?

রমা সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যুত্তর করিল, তিনি বলছেন থাকতে। এ বাড়ি আমার।

রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ স্থানে বাড়ি কেন?

রমা বলিল, এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই। বটে, কিন্তু এমন সময় সময় হয় যে, পা বাড়াবার জায়গা থাকে না।

রমেশ কহিল, বেশ ত, তেমন সময় নাই এলে?

রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তারকনাথ ঠাকুরের উপর বোধ করি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা বলিল, তেমন ভক্তি আর কই? কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত!

রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ বেঁধিয়া বসিয়া পড়িয়া অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, রায়ে আপনি কি খান?

রমেশ হাসিয়া কহিল, বা জোটে তাই খাই। আমার যেতে বসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রমা কহিল, এত বৈরাগ্য কেন?

ইচ্ছা প্রজ্ঞার বিদ্রূপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল, না। এ শুধু আসল্য।

কিন্তু পরের কাজে ত আপনার আসল্য দেখিনে?

রমেশ কহিল, তার কারণ আছে। পরের কাজে আসল্য করলে ভগবানের কাছে জবাবদিহিতে পড়তে হয়। নিজের কাজেও হয়ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অন্ত নয়।

রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন, কিন্তু তাদের নেই?

রমেশ বলিল, তাদের কথা জানিনে রমা। কেন না, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেখারও কোন ধরাবাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা না-থাকার হিসেব তিনিই জানেন যিনি ইহ-পরকালের ভার নিরেছেন।

রমা কণকাল চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু পরকালের চিন্তা করবার বয়স ত আপনার হয়নি। আপনি

আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।

রমেশ হাসিয়া বলিল, তার মানে তোমার আরও ছয়নি। ভগবান তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক, কিন্তু আমি নিজের স্বপ্নে আজই যে আমার শেষ দিন নয়, এ কথা কখনও মনে করিনে।

তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রবলের আঘাত ছিল, তাহা বোধ করি বুঝা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আপনাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে ত দেখলুম না। মন্দিরের মধ্যে কি আছে না-আছে, তা না হয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে বসে গণ্ডুখ করাটাও কি ভুলে যাচ্ছেন?

রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল, ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করিনে। কিন্তু এ কথা কেন?

রমা বলিল, পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশি কিনা, তাই জিজ্ঞেসা করছি।

রমেশ ইহার জবাব দিল না। তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। রমা আস্তে আস্তে বলিল, দেখুন আমাকে দীর্ঘজীবী হতে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোন দিন কামনা করে না। বলিয়া আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি মরবার জন্যে যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি তা সত্যি নয় বটে, কিন্তু বেশিদিন বেঁচে থাকবার কথা মনে হলেও আমাদের ভয় হয়। কিন্তু আপনার স্বপ্নেও ত সে কথা বাটে না! আপনাকে জোর করে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্ভতা; কিন্তু সংসারে ঢুকে যখন পরের জন্যে মাথাব্যথা হাওয়াটা নিজেরই নিতান্ত ছেলেমানুষ বলে মনে হবে, তখন আমার এই কথাটি স্মরণ করবেন।

প্রত্যন্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল,—আমি তোমাকে স্মরণ করেই বলছি, আজ আমার এ কথা কোনমতেই মনে হচ্ছে না। আমি তোমার ত কেউ নয় রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী বলে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলাম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিতান্ত পায়, আমার ত মনে হয় পথের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তারা পাগল হয়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা বলে চুপ করে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা কেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েচ। এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।

কথা শুনিয়া রমার সর্বত্র কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল, এ ভুলতে আপনার বেশি দিল লাগবে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে ‘অতি তুচ্ছ বলেই মনে পড়বে।

রমেশ কোনও উত্তর করিল না।

রমা কহিল, দেশে গিয়ে যে নিশ্চয় করবেন না, এই আমার ভাগ্য।

রমেশ আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না রমা, নিশ্চয় করব না, সূচ্যাত্তি করেও বেড়াব না। আজকের মিনটা আমার নিশ্বাস-সূচ্যাত্তির বাইরে।

রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রু ফোঁটা টপ্‌টপ করিয়া করিয়া পড়িতে লাগিল।

এপার

দুইদিন অবিশ্রাম বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্নবেলায় একুশ করিয়াছে। চতুর্থদিনে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ জমিদারির হিসাবপত্র দেখিতেছিল; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কীমিয়া পড়িল—ছোটবাবু, এ যাত্রা রকে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধরে আমাদের পথে ভিক্ষা করতে হবে।

রমেশ আবাক হইয়া কহিল, ব্যাপার কি?

চাষীরা কহিল, একশ' বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বার করে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গায়ে একটা ঘরও বেঁচে পাবে না।

কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই-একটা প্রশ্ন করিয়া ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। একশ' বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্বধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ, পশ্চিম ও উত্তরধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক দিয়া জল-নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু-শ' টাকার মাহ্ বিক্রি হয় বলিয়া জমিদার বৈদীবাবু তাহা কড়া পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষীরা আজ সকাল হইতে তাহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া এইমাত্র কাদিতে কাদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে।

রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়িতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বৈদী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছে এবং কাছে হালদার মহাশয় বসিয়া আছেন ; বোধ করি এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, জলার বাঁধ আটকে রাখলে ত আর চলবে না, এখন সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।

বৈদী ঝঁকটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কোন বাঁধটা?

রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল, জলার বাঁধ আর কটা আছে বড়দা? না কাটলে সমস্ত গায়ের ধান হেজে যাবে। জল বার করে দেবার হুকুম দিন।

বৈদী কহিল, সেই সঙ্গে দু-তিন শ' টাকার মাহ্ বেরিয়ে যাবে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা দেবে কে? চাষারা, না তুমি?

রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল, চাষারা গরীব, তারা দিতে ত পারবেই না, আর আমিই বা কেন সে ত বুঝতে পারিনে!

বৈদী জবাব দিল, তা হলে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব সে ত আমি বুঝতে পারিনে!

হালদারের দিকে চাহিয়া বলিল, খুড়ো, এমনি করে ভায়া আমার জমিদারি রাখবেন? ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পড়েই মড়াকারা কাদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দারোয়ান নেই? তার পায়ের নাগরা-সুতো নেই। যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা কর গে; জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে। বলিয়া বৈদী হালদারের সঙ্গে একযোগে হিং-হিং করিয়া নিজেও রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিল।

রমেশের আর সন্ত্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপলে নিজেকে সংবরণ করিতে বিনীতভাবে বলিল, ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু-শ' টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে পরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।

বৈদী হাতটা উ-টাইয়া বলিল, হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই যাক, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক, আমার গোটা সরদটা কোপালেও ত দুটো পয়সা বার হবে না যে ও-শালাদের জন্যে দু-দুশ' টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, এরা সারা বছর খাবে কি?

যেন ভারি হাসির কথা! বৈদী একবার এগাশ হেলিয়া দু'লিয়া, মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, খুখ ফেলিয়া, শেবে হির হইয়া কহিল, খাবে কি? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে 'ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে চল, কর্তারা এমনি করেই বাড়িয়ে ওড়িয়ে এই যে এক-আধটুকরা উজিষ্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়েচেড়ে ওড়িয়ে গাড়িয়ে খেয়েদেয়ে আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে! ওরা খাবে কি? ধার-কর্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটারের ছোটলোক বলেচে কেন?

দু'পায়, লজ্জার, ক্রোধে, কোড়ে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কঠোর শাস্ত রাখিয়াই বলিল,—আপনি যখন কিছুই করবেন না বলে হির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে ভর্ক

করে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চললুম, তার মত হ'লে আপনার একার অমতে কিছু হবে না।

বেণীর মুখ গভীর হইল; বলিল, বেশ, গিয়ে দেখ গে তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া, তাকে ভালোনা সহজ নয়। আর তুমি ভেলেমানুষ, তোমার বাপালো সে চোখের জলে নাকের জলে করে ভাবে ছেড়েছিল। কি বল খুড়ো?

খুড়োর মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না। বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাস করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়িয়া। তাহার মাথার আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসির সেই প্রথম দিনের নিবেদ-বাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে আপেক্ষা করিতেছিল। দু'জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেছ। ভাল বার করে দেবাব জানো তোমার মত নিতে এসেছি।

রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেল; সে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল, সে কেমন করে হবে? তা ছাড়া বড়দার মত নেই।

নেই জানি! হাঁ, একবার অমতে কিছুই আসে যায় না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, ভাল বার করে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন?

রমেশ কহিল, অত জলে কোম বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকটি আমাদের ক্ষতি ঝাঁকান করতেই চাবে। না হলে গ্রাম মারা যায়।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

রমেশ কহিল, তা হলে অনুমতি দিলে?

রমা মৃদুভাবে বলিল, না, অত টাকা লোকসান আমি করতে পারব না।

রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া গ্রাহ্য যেন নিশ্চিত ব্যবস্থা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই সন্তোষান করিতে পারিবে না।

রমা মুখ তুলিয়াই বোধ করি রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল, তা ছাড়া, বিষয় আমার তাইয়ের, আমি অধিতাবক মাত্র।

রমেশ কহিল, না, অর্ধেক তোমার।

রমা বলিল, শুধু নামে। বাকী নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় যতীনই পারে; তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

তখানি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল, রমা, এ ক'টা টাকা? তোমার সব্বা এ দিশের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি করে জানাচ্ছি রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট করে দিও না। যথার্থ বলছি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার, তাই হলেও ভাবিনি।

রমা তেমনি মৃদুভাবেই ওঁচাব দিল, নিজের ক্ষতি করতে পারিনি বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতি; 'ন করে দিন না।

তাহার মৃদুভাবে বিমূঢ় কল্পনা করিয়া রমেশ ক্লিয়া উঠিল। কহিল, রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গায় নাকি ফাঁকি চলে না, মানুষ খাঁটি কি না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেল। কিন্তু তোমাকে আমি এমন করে ভাবিনি। নিঃশব্দে ভেবেছি তুমি এর চেয়ে অনেক উচুতে; কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভাল। তুমি নীচ, জতি ছোটো।

অসহ্য বিস্ময়ে রমা খুঁই চক্। বন্দোবস্ত করিয়া কহিল, কি আমি?

রমেশ কহিল, তুমি অভ্যস্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে কতিপূরণের দাবি করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ কুটে একথা বলতে পারেন নি ; পুরুষমানুষ হয়ে তাঁর মুখে যা বেখেচে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাখেনি। আমি এর চেয়েও বেশি কতিপূরণ করতে পারি—কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা সবচেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করোচ।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ ভেমনি শান্ত ভেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা বলে দিয়ে বাচ্ছি। আমি কি করব, তাই এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনই জোর করে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা করগে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহান শুনিয়া চেষ্টা করগে। বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে, কিন্তু এ কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না।

রমেশ প্রশ্ন করিল, কেন ?

রমা কহিল, কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

তাহার মুখ যে কিরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোট ঝাঁপিয়া গেল, তাহা সজ্জার অঙ্ককারেও রমেশ লক্ষ্য করিতে পারিল। কিন্তু মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না ; তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কলহ-বিবাসের অভিরূচি আমারও নেই। যাই হোক, বাগবিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চললুম।

মাসি উপরে ঠাকুরঘরের আবদ্ধ থাকায় এ সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এই জল-কাদায় সজ্জার পর কোথায় যায় রমা ?

একবার বড়দার ওখানে যাব মাসি।

দাসী কহিল, পথে আর এতটুকু কাদা পাবার জো নেই। দিদিমা। ছোটবাবু এমনি রাত্তা বাঁধিয়ে দিয়েছেন যে, সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরীব দুঃখী সাপের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেচে।

তখন রাত্রি বোধ করি এগারোট। বেলীর চতীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা গলায় আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ব্রহ্মোদ্যমীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন ভীষণাকৃতি হ্রীড় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাই বাঁধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাসা, কিন্তু সে চূপ করিয়া আছে। বেশী চাপা গলায় অনুসর করিতেছেন, কথা শোন আকবর, খানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত হোবাল-বংশের ছেলে নই আমি। পিছনে চাহিয়া কহিল, রমা, তুমি একবার বল না, চূপ করে রইলে কেন ?

কিন্তু রমা ভেমনি কাঠের মত নীরবে বসিয়া রহিল।

আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, সাবাস। হী—মায়ের দুখ খেয়েছিল কটে ছোটবাবু। লাঠি ধরলে বটে।

বেশী ব্যস্ত এবং কুদ্ধ হইয়া কহিল, সেই কথা বলতেই ত বলচি আকবর। কল লাঠিতেতুই জবাব হলি ? সেই হোঁড়ার, না তার হিন্দুস্থানী চাকরটার ?

আকবরের গুঁড়গুঁড়ে ঝবৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল, সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার ? সে কাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু ? কি বলিস রে গহর, তোর পয়লা চোটাই সে বসেছিল না রে ?

আকবরের দুই হোসেই অদূরে জড়সড় লইয়া বসিয়াছিল। তাহারও অনাহত ছিল না। গহর মাথা

নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল, আমার হাতের চেটি পেলে সে ব্যাটা বাচত না। গহ্বরের লাঠিতেই 'বাণ' করে বসে পড়ল, বড়বাবু!

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের শিরপুরের প্রজা; সাবেক দিনের লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পর ক্রোধে ও অভিমানে কিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ ও ধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে। সে নিজেই যে এতবড় লাঠিয়াল, একথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক করে দাঁড়াল দিমিঠাকরান, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতি লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গায়ের দোক মারা পড়বে, তাই কেটেতেই হবে। তোর আপনার গায়েও ত জমিজমা আছে, সমঝে দেখরে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর কামন লাগে?

মুই সেলাম করে কইলাম, আমার কিয়ে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে ক' সুন্দুদি মুখে কাপড় জড়িয়ে অপাৰণ কোদাল মারচে, ওদের মুণ্ডু ক'টা কাঁক করে দিয়ে যাই!

বেণী রাগ সামলানিতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চৈতাইয়া কহিল, বেইমান ব্যাটার—তাকে সেলাম বাড়িয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে—

তাহার তিন বাপ-বোঁটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল, খবরদার বড়বাবু, বেইমান কয়ো না। মোবা মোছলমানের ছায়ে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

কপালে হাতে দিয়া খনিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্য বসে বেইমান কইচ বড়বাবু, চোখে দেখলি জানতি পারতে ছোটবাবু কি?

বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোকে মেরেচে!

আকবর জিত কাটিয়া বলিল, তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?

বেণী কহিল, না হয় আর কিছু বলবি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আর না—কাল ওয়ারেন্ট বার করে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভাল করে আর একবার বুঝিয়ে বল না। মন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিমিঠাকরান, ও পারব না।

বেণী ধমক দিয়া কহিল, পারবি নে কেন?

এবার আকবরও চৈতাইয়া কহিল, কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গায়ের লোকে মোরে সর্বার কয় না? দিমিঠাকরান, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, কৈরিসি হব কোন কালামুয়ে?

রমা মৃদুকণ্ঠে একবার মাত্র কহিল, পারবে না আকবর?

আকবর সবলে মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিমিঠাকরান, আর সব পারি, সময়ে গিয়ে গায়ের চোঁট দেখাতে পারি না। ওঠ রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা ন' শিশ করতি পারব না। বলি তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশার তাহাদের দিকে চাহিয়া মুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্দম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুন্নয়, বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি হোসেনের লইয়া বখন বিলার হইল গেল, রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহাদের দুই চক্ষু অন্ধকারাখিত হইয়া উঠিল এবং আজিকার এত বড় অপমান ও তাহার সম্পূর্ণ

পরাজয়েও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বৃকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পামাণ নামিয়া গেল ; ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ি ফিরিয়া সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়াছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বার

ছেলেবেলায় ৩০দিন রমেশ রমাকে ভালবাসিয়াছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষী ভালবাসা তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে যে কত গভীর সেদিন তারকেশ্বরে ইহা সে প্রথম অনুভব করিয়াছিল এবং সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়াছিল যেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রমার সমস্ত সম্বন্ধ সে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তার পরে সেই নিদারুণ রাত্রির ঘটনার দিন হইতে রমার দিকটাই একেবারে রমেশের কাছে মহামধুর ন্যায় শূন্য ধু-ধু করিতেছিল। কিন্তু সে যে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম, শোয়া-বসা, এমন কি, চিন্তা-অধ্যয়ন পর্যন্ত এমন বিশ্বাস করিয়া দিবে, তাহা রমেশ কল্পনাও করে নাই। তাহাতে গৃহ-বিচ্ছেদ এবং সর্বব্যাপী অনাধীনতায় প্রাণ যখন তাহার একমুহূর্ত আর গ্রামের মধ্যে ভিত্তিতে চাহিতেছিল না, তখন নিম্নলিখিত ঘটনায় সে আর একবার সোজা হইয়া পসিল।

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারি। এখানে মুসলমানের সংখ্যাটি অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া রমেশের কাছে উপস্থিত হইল ; এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিচ তাহারা তাহাদেরই প্রজা, তথাচ তাহাদের ছেলেরিলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাস্টারমহাশয়ের কোনমতেই তাহাদের ছেলেরের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এমন অন্যায়া অন্যায়ের ও কখনও শুনি। তোমাদের ছেলেরের আজই নিয়ে এস, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্তি করে দেব।

তাহারা জানাইল, যদিচ তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু স্বাভাবিক দিয়াই জমি ভোগ করে। সেজন্য হিন্দুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না ; কিন্তু একেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ, ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের স্কুল করিয়া ইচ্ছা করে এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়। কলহ-বিবাদে রমেশ নিজেও ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সৃষ্টি বিবচনা করিয়া সাব দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপ্ত হইল। ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলস্কয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কৃষাপুরের হিন্দুপ্রতিবেশীর মত ইহার প্রতিকথায্য বিবাদ করে না ; করিলেও তাহারা প্রতিহাত এক নম্বর ক্রুদ্ধ করিয়া দিবার জন্য সবারে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুকব্বদের বিচার-ফলাই, সমস্ত অসন্তুষ্ট যেভাবেই হোক, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র-অভদ্র কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোন দিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অসহ্য পারস্পরিক তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অসমতাই এক হিংসা-ঘেঁষের কারণ। অথচ মুসলমানমাত্রই ধর্ম সম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতরফ বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং ইহাতেও পারে না। আর জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমনকি, ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পটীগ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহ-বিবাদের লাভব করিয়া সখা ও দ্বীতি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত করাও পণ্ডিত্যম। সুতরাং এই কলহটা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্য যে ব্যা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সেজন্য তাহার অন্তঃকরণ অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল, ইহারা এমনি খাওয়াখাণি

করিয়াই চিরদিন কাটায়াছে। এবং এমন করিয়াই চিরদিন কাটাতে বাধ্য। ইহাদের ভাল কোনদিন কোনমতেই হইতে পারে না। কিন্তু কথাটা পাকা করিয়া লওয়া ত চাই!

নানা কারণে অনেকদিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে সেদিকে যায় নাই। আজ ভোরে উঠিয়া সে একেবারে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমন বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা তিনি নিজেও জানিতেন না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য হইয়াই দেখিল, জ্যাঠাইমা এত প্রত্যবেই মান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের মেঝেয় বসিয়া চোখে চশমা খাটিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম হইলেন না। বইখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ধরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত সকালেই যে রে?

রমেশ কহিল, অনেক দিন তোমাকে দেখতে পাইনি জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা স্কুল করছি।

বিশেষরূপী বলিলেন, ওনেচি। কিন্তু আমাদের স্কুলে আর পড়াতে যাস্নে কেন বল ত?

রমেশ কহিল, সেই কথাই বলতে এসেছি জ্যাঠাইমা। এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধু পণ্ডিত্রম। যারা কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, অতিমান অহঙ্কার যাদের এত বেশি, তাদের মধ্যে যেটা মরার লাভ কিছুই নেই, শুধু মাঝ থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরং যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় সত্যিকার মঙ্গল হবে, তাঁরা সেইখানেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা কহিলেন, এ কথা ত নতুন নয় রমেশ! পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে কেউ নিজের ওপর নিয়েছে চিরদিনই তার শত্রু-সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায় তুইও তাদের দলে গিয়ে যদি মিশিস্, তা হলে ত চলবে না বাবা! এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে স্কল বাস?

রমেশ হাসিয়া কহিল, ঐ দ্যাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যে তোমার কানে উঠছে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনি। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনি।

জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিস নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবি নে?

রমেশ কহিল, ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা! জাতিভেদ আছে তা মানি, কিন্তু এতে ভাল বলে মানিনি।

কেন?

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন সে তোমাকে বলতে হবে? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদ্যবাদি, এ কি তোমার জানা নেই? সমাজে যাকে ছোটজাত করে রাখা হয়েছে, সে যে বড়কে হিংসা করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে—সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করবার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সাংসানিক নিয়ম আছে, আমরা তাকেই স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছি। এই যে মানুষ গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলাফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হলে ভয় পেয়ে যে ত। মানুষকে ছোট করে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টের পেতে পেতে কেমন করে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসছে এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠছে। তবুও হিংসা হয় না!

বিশেষরূপী হাসিয়া বলিলেন, তোর এত কথা শুনে এখনো ত আমার ঈশ হচ্ছে না রমেশ! যারা তোদের মানুষ ওশে বেড়ায়, তারা যদি ওশে বলতে পারে, এতগুলো ছোটজাত শুধুমাত্র ছোট থাকবার ভয়েই জাত দিয়েছে, তা হলে হয়ত আমার ঈশ হতেও পারে। হিন্দু যে কমে আসছে সে কথা মানি; কিন্তু তার গন্য কারণ আছে। সেটাও সমাজের ক্রটি নিশ্চয়; কিন্তু ছোটজাতের জাত দেওয়া-দেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট বলে কোন হিন্দুই কোনদিন জাত দেয় না।

রমেশ সন্ধি-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাই ত অনুমান করেন জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা বলিলেন, অনুমানের বিরুদ্ধে ত ভর্তুকি চলে না বাবা। কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে, অমুক গায়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্যেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হলেও না হয় পতিতের কথায় কান দিতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।

রমেশ তথাপি ভর্তুকি করিয়া কহিল, কিন্তু যারা ছোটজাত তাহা যে অন্যান্য বড় জাতকে হিংসা করে চলবে, এ ত আমার কাছে ঠিক কথা বলেই মনে হয় জ্যাঠাইমা!

রমেশ তথাপি ভর্তুকি করিয়া কহিল, কিন্তু যারা ছোটজাত তাহা যে অন্যান্য বড় জাতকে হিংসা করে চলবে, এ ত আমার কাছে ঠিক কথা বলেই মনে হয় জ্যাঠাইমা।

রমেশের তীব্র উত্তেজনায় বিবেচনারী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ঠিক কথা নয় বাবা, একটুকুও ঠিক কথা নয়। এ তোদের শহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড়, সে জন্যে কোনো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোটভাই যেমন ছোট বলে বড়ভাইকে হিংসা করে না, দু-একবছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত বামুন হয়নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈতব ও কায়েতের সমান হবার জন্যে একটুও চেষ্টা করে না। বড়ভাইকে একটা শ্রম করতে ছোটভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমনি কায়েতও বামুনের একটুখানি পায়ের ধুলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙ্গালীর যা মেরুদণ্ড—সেই পটীগ্রামে নয়।

রমেশ মনে মনে আশ্চর্য হইয়া কহিল, তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ও-গাঁয়ে ত এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন করে ত চেপে ধরে না। সেমিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বলে কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্বন্ত যায়নি, সে ত তুমি জান!

বিবেচনারী কহিলেন, জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পটীগ্রাম থেকে এ একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি। রমেশ হতাশ ভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এর কি প্রতিকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?

বিবেচনারী বলিলেন, আছে বৈ কি বাবা! প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান। যে পথে তুমি পা দিয়েচিস শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে কেবলি বলি, তুমি তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাসনে।

প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, বিবেচনারী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি বলবি মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশি। কিন্তু তাদের সজীব ধর্মই তাদের সব দিকে শুধরে রেখেছে। একটা কথা বলি রমেশ। পিরপুরে খবর নিলে ওনতে পাবি, জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে করে রেখেছে। সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না বলে। কিন্তু আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তাব বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আখমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে। এ-সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্য; এর সাজা ভগবান ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কিন্তু পটী-সমাজ তাতে ব্রূক্ষেপ করে না।

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক হইয়া গেল, অন্যদিকে তাহার মন ইহােকই হির-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিবেচনারী তাহা মেনে বুঝিয়াই বলিলেন, কলটাকেও উপায় বলে ভুল করিস নে বাবা। যে জন্যে তোর মন থেকে কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হলেই নয়, মনে করে যদি তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে যাস, এমিক-ওমিক দুমিক নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কি না যদি যাচাই করতে চাস রমেশ, শহরের কাছাকাছি দু-চারখানা গ্রাম ঘুরে এসে তাদের সঙ্গে তোর এই কুঁয়া-পুরকে মিলিয়ে দেখিস—আপনি টের পাবি!

কলিকাতার অতি নিকটবর্তী দু-একখানা গ্রামের সহিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চোখরাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর

হইতে যেন একটা কালো পর্দা উঠিয়া গেল এবং গভীর সন্ধ্যা ও বিষয়ে চূপ করিয়া সে বিবেচনারী মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্বানুবৃত্তিরূপে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ করে যাসনে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেচে, তারা যদি তোমার মতই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হতে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।

রমেশের রমার কথা মনে পড়িল। তাই আবার অভিমানের সুরে কহিল, দূরে সরে যেতে আমারও আর দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা!

বিবেচনারী এই সূরটা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু হেতু বুঝিলেন না। কহিলেন, না রমেশ, সে কিছুতেই হতে পারবে না! যদি এসেচিস, যদি কাজ শুরু করেচিস, মাথপাখে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু ত আমার একার নয়?

জ্যাঠাইমা উদ্বীগু হইয়া বলিলেন, তোর একার বৈ কি বাবা, শুধু তোরই মা! দেখতে পাসনে, মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোনদিনই কিছু দাবি করেন নি। তাই তে লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কাহ্না গিয়ে পৌছতে পারেনি, কিন্তু তুই আসবামাত্রই গুনতে পেয়েছিলি।

রমেশ আর ভর্ক কাটল না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে শ্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভরে বিবেচনারী পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্তব্যের একান্ত নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্বদিকে মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়ইয়া সে স্তব্ধ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইতে দেখিল রমার ছোট ভাই যতীন বাহিরে দাঁড়াইয়া লজায় আরক্তমুখে ডাকিতেছে, ছোড়া।

রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাকচ যতীন? আপনাকে।

আমাকে? আমাকে ছোড়া বলতে তোমাকে কে বলে দিলে?

দিদি।

দিদি? তিনি কি বলতে তোমাকে পাঠিয়েছেন?

যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে করে তোর ছোড়াদার বাড়িতে নিয়ে চল—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল।

রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা খামের অ'ড়ালে দাঁড়ইয়া আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল, আজ আমার এ কি সৌভাগ্য! কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে, নিজে কষ্ট করে এলে কেন? এস, ঘরে এস।

রমা একবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর যতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অনুসরণ করিল। তাহার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, আজ একটা জিনিস ভিচ্ছে চাইতে আপনার বাড়িতে এসেচি—বলুন, দেবেন? বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিল। সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বর অকস্মাৎ যেন উদ্গাদ-শব্দে ব্যজিয়া উঠিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া করিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্বেই তাহার মনের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ ৬, ৭ ও আকাঙ্ক্ষা অপরাগ দীপ্তিতে নাচিয়া ফিরিতেছিল—সমস্তই একেবারে নিবিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তথাপি প্রশ্ন করিল, কি চাই বল?

তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল, আগে কথা শুন।

রমেশ কলকাল চূপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, তা পারিনে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না করেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই যে ডেকে লিয়েছ রমা।

রমা আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমি!

রমেশ বলিল, তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কারুর ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বলব! ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করো, না হয় করো না। কিন্তু জিনিসটা যদি না একেবারে মরে নিঃশেষ হয়ে যেত, হয়ত কোনদিনই একথা তোমাকে শোনাতে পারতাম না, বলিয়া একটুখানি চূপ করিয়া পুনরায় কহিল, আজ না কি আর কোন-পক্ষেরই লেশমাত্র কতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই, তাই আজ জানাচ্ছি, তোমাকে অদেয় আমার সেদিন পর্যন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু কেন জান?

রমা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু সমস্ত অন্তঃকরণটা তাহার কেমন একটা লজ্জাকর আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, কিন্তু শুনে রাগ করো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেয়ো না। মনে করো, এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুনচ মাত্র।

রমা মনে মনে প্রাণপণে বাধা দিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মাথা তাহার এমনি ঝুঁকিয়া পড়িল যে, কিছুতেই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। রমেশ তেমনি শান্ত, মৃদু ও নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমাকে ভালবাসতাম রমা। আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি কেউ কখনো বাসেনি : ছেলেবেলায় মার মুখে শুনতাম আমাদের বিয়ে হবে। তারপর যেদিন সমস্ত আশা ভেঙ্গে গেল, সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার তা মনে পড়ে।

কথাগুলো জ্বলন্ত সীসার মত রমার দুই কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দম্ভ করিয়া ফেলিতে লাগিল এবং একান্ত এপরিচিত অনুভূতির অসহ্য তীব্র বেদনায় তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু নিষেধ করিবার কোন উপায় ঝুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত নিরুপায় পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রমা রমেশের বিবাক্ত-মধুর কথাগুলো একটির পর একটি ক্রমাগতই শুনিয়া যাইতে লাগিল।

রমেশ কহিতে লাগিল, তুমি ভাবচ, তোমাকে এ সব কাহিনী শোনানো অন্যায্য। আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল বলেই সেদিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেলে তখনো চূপ করে ছিলাম। কিন্তু সে চূপ করে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না, কহিল, তবে আজকেই বা বাড়িতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?

রমেশ কহিল, অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদের কথা হচ্ছে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না। সে রমেশও আমি আর নেই! যাই হোক, শোন। সেদিন আমার কেন জানিনে, অসংলগ্নে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা বুঝি কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন আমাকে ভালবাসতে আজও তা একেবারে ভুলতে পারনি। তাই ভেবেছিলাম কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব। তার পরে সে রাতে আকবরের নিষেধ মুখে যখন শুনতে পেলাম তুমি নিজে—ও কি বাইরে এত গোলমাল কিসের?

বাবু—

গোপাল সরকারের ব্রহ্ম-ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরের বাহিরে আসিতেই সে কহিল, বাবু, পুলিশের লোক ভজুরাকে গ্রেপ্তার করেছে।

কেন?

গোপালের ভয়ে ঠোট কাঁপিতেছিল; কোনমতে কহিল, পরও রাস্তিরে রাখানগরে ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।

রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, আর একমুহূর্ত থেক না রমা, বিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও; পুলিশ খানাভাঙ্গা করিতে ছাড়বে না।

রমা নীলবর্ণ-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার কোন ভয় নেই ত?

রমেশ কহিল, বলতে পারিনে। কতদূর কি দাঁড়িয়েচে সে শু এখনো জানিনে।

একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সেদিন তাহার নিজের অভিযোগ করা—তার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি যাব না।

রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্তকাল অবাক ধামিয়া বলিল, ছি—এখানে থাকতে নেই রমা, শীগগির বেরিয়ে যাও, বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া যতীনের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া এই দুটি ভাইবোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

ভের

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতের আসামীর সঙ্গে ভজুয়া হাজতে। সেদিন খানাতলাশিতে রমেশের বাড়িতে সম্বেদজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং ভৈরব আচার্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে-রাও ভজুয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়ের পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, তথ্যাপ তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই।

বেণী আসিয়া কহিল, রমা, অনেক চাল ভেবে তবে কাজ করতে হয় নির্দিষ্ট, নইলে কি পত্রকে সহজে জব্দ করা যায়! সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি হাতে করে বাড়ি চড়াও হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল, সে কথা যদি না ভুমি থানায় লিখিয়ে রাখতে আজ কি তা হলে ঐ ব্যাটাকে এমন কায়দায় পাওয়া যেত? অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি আরও দুকথা বাড়িয়ে-ওছিয়ে লিখিয়ে দিতিস বোন,—তাহাঃ তথ্যায় তখন তোরা ত কেউ কোন দিলিনে।

রমা এমনি স্বান হইয়া উঠিল যে বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল, না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না। আর তাই যদি হয় তাতেই কি! জমিদারি করতে গেলে কিছুতেই হটলে ত চলে না।

রমা কোন কথা কহিল না।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু তাকে ত সহজে ধরা চলে না! তবে সেও এবার কম চাল চালান না দিদি! এই যে নতুন একটা ইকুল করেছে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এমনিই তো মোছলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে তা হলে জমিদারি থাকা না-থাকা সমান হবে, তা এখন থেকে বলে রাখচি।

জমিদারির ভাল-মন্দ সব্বন্ধে রমা বরাবর বেণীর পরামর্শ মতই চলে : ইহাতে দুজনের কোন মতভেদ পর্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তর্ক করিল। কহিল, রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত এতে কম নয়!

বেণীর নিজেরও এ সব্বন্ধে খটকা অল্প ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্থির কারয়াছিল, তাহাই কহিল, কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়—আমরা দুজনে বন্দ হলেই ও খুশি। দেখচ না এসে পর্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? চারিদিকে ছোটলোকবাবু মথো ছোটবাবু, ছোটবাবু, একটা বর উঠে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ, আমরা দু-ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশি দিন এ চলবে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া করে দিয়েচ বোন, এতেই তাকে শেষ পর্যন্ত শেষ হতে হবে তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য হইয়াই লক্ষ্য করিল, সংবাদটা শুনাইয়া তাহার কাছে যেরূপ উৎসাহ ও উদ্বেজনা অশা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। রবন্ধ মনে হইল, সে হঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রসন্ন করিল, আমি লিঃ : : : : : যছিলাম রমেশদার জানতে পেরেছেন?

বেণী কহিল, ঠিক জানিনে। কিন্তু জানতে পারবেই। ভজু : : : : : মকদ্দমায় সব কথাই চলেবে।

রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে উঠিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সে-ই যে সকলের অগ্রণী, এই সংবাদটা আর রমেশের অগোচর রহিবে না। খানিক পনে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভজুকালা ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়দা?

বেণী কহিল, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, গুনচি ওর সেখাদেশি আরও পাঁচ-ছটা গ্রামে কুল করবার, রাত্তা তৈরি করবার আয়োজন হচ্ছে! আজকাল ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি করতে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা দুটো ইকুল আছে বলেই ওদের এত উত্ত্বি। রমেশ প্রচার করে দিয়েচে, বেখানে নতুন কুল হবে, সেইখানেই ও দু-শ' করে টাকা দেবে। ওর দাদামশাইয়ের যত টাকা পেয়েচে সমস্তই ও এইতে ব্যয় করবে। মোচলমানেরা ত ওকে একটা পীর পয়গম্বর বলে ঠিক ক'রে বসে আছে।

রমার নিজের বুকের ভিতর এই কথাটা একবার বিদ্যুতের মত আলো করিয়া ফেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরকণেই বিগুণ আখারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বেণী কহিতে লাগিল, কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না। সে যে আমাদের সমস্ত প্রজা এমনি করে বিগড়ে তুলবে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে মুখ বুজে দেখব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচাৰ্য্যি এবার ভজুরার হয়ে সাক্ষী দিয়ে কি করে তার মেয়ের বিয়ে দেয়, সে আমি একবার ভাল করে দেখব! আরও একটা ফন্দি আছে, দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে। তার পর দেশে ডাকাতি ত লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি, জেলেপুরতে পারি ত, তার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। সেই যে প্রথম দিনটিতেই ভূমি বলেছিলে রমা, শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না, সে যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে তা আমিও মনে করিনি।

রমা কোন কথাই কহিল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী এমন বর্ণে বর্ণে সত্য হওয়ার বার্তা পাইয়াও যে নারীর মুখ অহঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, বরঞ্চ নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে যে তাহার কি অবস্থা, সে কথা বুঝিবার শক্তি বেণীর নাই। তা না থাকুক, কিন্তু জিনিসটা এতই স্পষ্ট যে কাহারই দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা ছিল না—তাহারও এড়াইল না। মনে মনে একটু বিস্ময়াগ্নয় হইয়াই বেণী রান্নাঘরে বাইরা মানির সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, রমা হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আচ্ছা বড়দা, রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদের নিজেদের ভারি কলঙ্কের কথা নয়?

বেণী অধিকতর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

রমা কহিল, আমাদের আত্মীয়, আমরা যদি না বাঁচাই, সমস্ত লোক আমাদেরই ত ছি-ছি করবে।

বেণী ভবাব্ দিল, যে যেমন কাজ করবে সে তার ফল ভুগবে, আমাদের কি?

রমা ভেমন মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু রমেশদা সত্যিই ত আর চুরি-ডাকাতি করে বেড়ান না, বরং গাঁয়ের ভালর জন্যেই নিজের সর্বস্ব দিচ্ছেন, সে কথা ত কারো কাছে চাপা থাকবে না। তার পর আমাদের নিজেদেরও ত গাঁয়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে।

বেণী হি-হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল, তোর হ'ল কি বল ত বোন?

রমা এই লোকটার সঙ্গে রমেশের মুখখানা মনে মনে একবার দেখিয়া লইয়া আর যেন সোজা করিয়া মাথা তুলিতেই পারিল না। কহিল, গাঁয়ের লোক ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক, আড়ালে কলবেই; ভূমি বলবে, আড়ালে রাজার মাকেও ডান বলে, কিন্তু ভগবান ত আছেন! নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়াতে তিনি ত রেহাই দেবেন না।

বেণী কৃত্রিম কোভ প্রকাশ করিয়া কহিল, হা রে আমার কপাল! সে হৌড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে? শীতলাঠাকুরের ঘরটা পড়ে যাচ্ছে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে বলেছিল, বাবা তোমাদের পাঠিয়েচে তাদের বল গে, বাজে খরচ করবার টাকা আমার নেই। শোন কথা! এটা তার কাছে বাজে খরচ? আর কাজের খরচ হচ্ছে মোচলমানদের ইকুল করে দেওয়া। তা ছাড়া বামুনদের ছেলে—সঙ্কো-আহিক কিছু করে না। ওনি মোচলমানের হাতে জল পর্যন্ত খায়। দুপাতা ইরাত্তী পড়ে আর কি তার জাতজন্ম আছে দিদি—কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা, সমস্তই তোলা আছে। সে একদিন সবাই দেখতে পাবে।

রমা আর বাদনুবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল বটে, কিন্তু রমেশের অনাচার এবং ঠাকুর-দেবতার প্রতি অপ্রত্যাশিত কথার স্মরণ করিয়া মনটা তাহার আবার তাহার প্রতি বিমূৰ্ত্ত হইয়া উঠিল। বেণী

নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরে গিয়া মেঝের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেদিন তাহার একাদশী। খাবার হাঙ্গামা নাই মনে করিয়া আজ যেন সে স্বস্তি-বোধ করিল।

চৌদ্দ

বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়াভীতি বাঙ্গলার পন্নী জননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে ঢুকিছুকি মারিতে লাগিল, রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল ; কিন্তু এ বৎসর আর পারিল না। তিন দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও ভঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কি না। এই তিন দিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা হউক কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর, মাসের পর মাস মানুষকে এই রোগভোগ করিতে দেয়, ভগবান তাকে ক্ষমা করিবেন না। কয়েকদিন পূর্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে ; কিন্তু পরের ডোবা বুজাইয়া এবং জমির ভঙ্গল কাটিয়া কেহই ঘরের বাইরা বনের নহিব ডাড়াইয়া কেড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও ভঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে, এ-সকল তাহার নিজের কৃত নহে, বাপ-পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাকে আপত্তি নাই, কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা এবং উদাম ব্যয় করতে অপারগ। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে, অথচ আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু সুস্থ হইলেই এইরূপ একটা গ্রাম সে নিজের চোখে গিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিবে এবং তাহার পরে নিজের কর্তব্য স্থির করিবে। কারণ, তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল—এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জন-নিকাশের স্বভাবিক সুবিধা কিছু আছেই, যাহা এমনই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াও চেষ্টা করিয়া চোখে আসুল দিয়া দেখাইয়া দিলে লোক দেখিতে পাইবে। অন্ততঃ তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পিরপুরের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু!

অকস্মাৎ কান্নার সুরে আহান শুনিয়া রমেশ মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, চৈত্রি আচাৰ্য ঘরের মেঝের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া ক্রীলোকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কঁদিতেছে। তাহার সাত-আট বৎসরের একটি কন্যা সঙ্গে আসিয়াছিল ; বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক যে যেখানে ছিল, দোরগোড়ায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্বনাশ হইল, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে, কিছু যেন ঠাহর পাইল না। গোপাল সরকার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া টানিতেই ভৈরব উঠিয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া গোপালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভয়ানক আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এই লোকটা অতি অল্পতেই মেয়েদের মত কঁদিয়া ফেল শ্রবণ করিয়া রমেশ ক্রমশঃ যখন অধঃ হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় গোপালের বহুবিধ সাঙ্কানবাক্যে ভৈরব অবশেষে চোখ মুছিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল এবং এই মাহেশোকের ছেতু বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইল। ১৮বৎসর শুনিয়া রমেশ শুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এতবড় অভিযাত্রার কোথাও কোনকালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সে কল্পনা করিতেও পারিল না। ব্যাপারটা এই—ভৈরবের সাক্ষাৎ ভজুয়া নিশ্চয় পাইলে তাহাকে পুলিশের সন্দেহদৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু সাক্ষী

ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্তা পাইয়া ভৈরব কাল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্বে বেগীর খুড়-খতর রাখানগরের সনৎ মুখুয্যে ভৈরবের নামে সুমে-আসলে এগার-শ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং তাহার বাস্তবতা ফ্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। ইহা একরতফা ডিক্রি নহে। যথারীতি ভৈরবের নামে সুমে-আসলে এগার-শ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার যথারীতি সমন বাহির হইয়াছে ; কে তাহা ভৈরবের নাম দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং খার্বদিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেই কে তাহা ভৈরবের নাম করিয়া কবুল-জবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্বলের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে ; অথচ সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইনমত সমস্ত মিথ্যা ঋণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না করিয়া কথটি কহিবার জো নাই। মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কেহ তাহাতে কর্পণাত করিবে না। কিন্তু এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে, তাহা জমা দিয়া এই মহা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে! সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিলেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিঃশেষে মরিতে হইবে, অথচ সমস্তই যে বেগী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কাজ তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই এবং এই অত্যাচারের যত বড় দুর্গতি ভৈরবের অদৃষ্টে ঘটুক, গ্রামের সকলেই চুপি চুপি জল্পনা করিয়া ফিরিবে, কিন্তু একটি লোকও মাথা উঁচু করিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিবে না, কারণ তাহারা কাহারো সাতেও থাকে না পাঁচও থাকে না এবং পরের কথায় কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না। সে যাই হোক, রমেশ কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসহ্যে অত্যাচার করিবার সাহস ইহার কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং অর্থবল এবং কূটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহতি দেয়, মৃতসমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহাদের দুর্ভুতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই ইহার সহস্র অন্যায় করিয়াও সভ্যধর্মবিহীন মৃত পল্লী-সমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিরুপদ্রব এবং যথেষ্টাচারে বাস করে।

আজ তাহার জ্যাঠাইমার কথানুসারে বারবংগর মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন সেই যে তিনি মর্মান্তিক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, রমেশ, চুলোয় যাক গে তোদের জাতবিচারের ভাল-মন্দ কণ্ডাঝাটি ; বাবা, শুখু আলো ছেলে দে রে, শুখু আলো ছেলে দে ! গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে খেল ; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা ! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোনটা কালো, কোনটা ধলো। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যদি ফিরেই এসেছিল বাবা, তবে চলে আর যাসনে। তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস বলেই তোদের পল্লীজননীর এই দুর্দশা। সভ্যই ত ! সে চলিয়া গেলে ত ইহার প্রতিকারের লেশমাত্র উপায় থাকিত না।

রমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, হায় রে, এই আমাদের গর্বের ধন—বাঙলার শুদ্ধ, শাস্ত, ন্যায়নিষ্ঠ পল্লী-সমাজ ! একদিন হয়ত বখন ইহার প্রাণ ছিল, তখন দুটের শাসন করিয়া আশ্রিত নয়-নারীকে সংসারযাত্রার পথে নির্বিঘ্নে বহন করিয়া চলিবারও ইহার শক্তি ছিল।

কিন্তু আজ ইহা মৃত ; তথাপি অন্ধ পল্লীবাসীরা এই গুরুভার-বিকৃত শব্দসহটাকে পরিভ্যাগ না করিয়া মিথ্যা মমতায় রাত্রিদিন মাথায় বহিয়া বহিয়া এমন দিনের-পর-দিন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নিরীক হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে না। যে বস্তু আত্মকে রক্ষা করে না, শুধু বিপন্ন করে, তাহাকেই সমাজ বলিয়া কল্পনা করার মহাপাপ তাহাদিগকে নিয়ত রসাতলের পথেই টানিয়া নামাইতেছে।

রমেশ আরও কিছুক্ষণ হিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সহসা যেন ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল, আপনি সমস্ত বিষয় নিজে ভাল করে জেনে টাকাটা জমা দিলে সেবেন এবং যেমন করে হোক পুনর্বিচারের সমস্ত কলোবস্ত ঠিক করে আসবেন। ভয়ঙ্কর অত্যাচার করবার সাহস তাদের আর যেন কোন দিন না হয়। চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকার ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

রমেশ পুনর্বীর যখন নিজের বস্ত্রব্য ভাল করিয়া বুকাইয়া কহিল এবং সে যে তামাশা করিতেছে না তা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, তখন অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ন্যায় রমেশের দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া, চোঁচাইয়া, আশীর্বাদ করিয়া যেমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রমেশের অপেক্ষা অল্প বলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সেদিন একটা কঠিন কাজ হইত। কথটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সকলেই বুঝিল বেশী এবং গোবিন্দ এবার সহজে নিদ্রুতি পাইবে না। ছোটবাবু যে তাঁহার চিশক্কে হাতে পহিবায় জন্যই এত টাকা হাতছাড়া করিয়াছে, তাহা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা কাহারও কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না যে, দুর্বল ভৈরবের পরিবর্তে ভগবান তাহারই মাথার উপর এই গভীর দুঃখের গুরুভার তুলিয়া দিলেন সে তাহা স্বচ্ছন্দে বহিতে পারিবে।

তারপর মাসখানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রমেশ এই একটা মাস তাহার যত্নতত্ত্ব লইয়া এমনিই উৎসাহের সহিত নানাস্থানে মাপজোপ করিয়া ঘিরিতেছিল যে, আগামী কালই যে ভৈরবের মকদ্দমা তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। আত্ম সন্দ্বার প্রাকালে অকস্মাৎ সে-কথা মনে পড়িয়া গেল রোশনটোকির সানায়ের সুরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া রমেশ আশ্চর্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্যের দৌহিত্রের অগ্রশ্রাবণ। অথচ সে ত কিছুই জানে না। শুনিতে পাইল, ভৈরব আয়োজন মন্ড করে নাই। গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে : কিন্তু বমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কি না সে খবর বাড়িতে কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাই নয়, তাহার স্মরণ হইল, এত বড় একটা মামলা ভৈরবের মাথার উপর আসন্ন হইয়া থাকে সন্দেহও সে প্রায় দুই-দশ দিনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতে আসে নাই। বাপার কি? কিন্তু এমন কথা তাহার মনে উদয় হইয়াও হইল না যে, সংসারের সমস্ত লোকের মধ্যে ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারে। তাই নিজের এই অদ্ভুত আশঙ্কায় নিজেই লজ্জিত হইয়া রমেশ তখনই একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া একেবারে সোজা আচার্য-বাড়ির উদ্দেশ্যে নাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, বেড়ার ধারে দুই-তিনটা গ্রামের কুকুর জড় হইয়া এঁটো কলাপাত লইয়া বিবাদ করিতেছে এবং অনতিদূরে রোশনটোকি-ওয়ালারা আতুন জ্বালাইয়া তামাক খাইতেছে এবং বাদ্যভাণ্ড উত্তপ্ত করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল উঠানে শতছিন্নযুক্ত সামিয়ানা খাটানো এবং সমস্ত গ্রামের সম্বল পাঁচ-ছয়টা কোরোসিনের বহু পুরাতন ব্যতি মুখুজো ও ঘোষালবাটী হইতে চাহিয়া আনিয়া জ্বালানো হইয়াছে। তাহার স্বল্প-আলোক এবং অপর্ণাপ্ত ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ঝগড়ানো সমাধা হইয়া গিয়াছিল—বেশি লোক তখন ছিল না। পাড়ার মুকুন্দেরা তখন যাই-যাই করিতেছিলেন এবং ধর্মদাস হরিহর রায়কে আরও টুখানি বসিতে পীড়ানীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙ্গুলী একটুখানি সরিয়া বসিয়া কে একজন চাবার ছেলের সহিত নিরিবিলা আলোপে রত ছিলেন। এমনি সময়ে রমেশ দুঃখের মত একেবারে প্রাঙ্গণের বুকের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেন এক মুহূর্তে মসীবর্ণ হইয়া গেল, শত্রুপক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই বটিতেই এমন ভাবে ঘোণ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। খানিক পরে সে বটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে—বলি গোবিন্দদা, বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝখানে যেন ডুত দেখিতে পাইল এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া বটীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুক্রমুখে গিয়াছিল। ডাক শুনি, বাবা রমেশ।

ফিরিয়া দেখিল দীন হন হন করিয়া আসিতেছে। কাছে . সিয়া কহিল, চল বাবা, বাড়ি চল।

রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র।

চলিতে চলিতে দীন বলিতে লাগিল, তুমি ওর যে উপকার করেচ বাবা, সে ওর বাপ-মা করত না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু উপায় নাই। কাজাবাজা নিয়ে আমাদের সকলেরই ঘর করতে হয় ; তাই আমাদেরকে নেমস্তন্ন করতে গেলে—বুঝলে না বাবা—ভৈরবকেও নেহাত দোষ দেওয়া যায়

না—তোমরা সব আজকালকার শহরের ছেলে—জাতটাতে তেমন ত মানতে চাও না—তাহাতেই বুঝলে না বাবা—দুদিন পরে, ওর ছোটমেরোটিও গ্রাম বারো বছরের হ'ল ত—পার করতে হবে ত বাবা? আমাদের সমাজের কথা সবই জান বাবা—বুঝলে না বাবা—

রমেশ অধীরভাবে কহিল, আজ্ঞে হী, বুঝেছি।

রমেশের বাড়ির সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দীনু খুশি হইয়া কহিলেন, বুঝবে বৈ কি বাবা, তোমরা ত আর অবুঝ নও—ব্রাহ্মণকেই বা দোষ দেই কি করে—আমাদের বৃড়োমানুষের পরকালের চিন্তাটা—

আজ্ঞে হী, সে ত ঠিক কথা; বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোকে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। নিজের ঘরের মধ্যে আসিয়া ফোভে, অভিমানে তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। আজ এইটা তাহার সবচেয়ে বেশি বজিল যে, বেণী ও গোবিন্দকেই ভৈরব আজ সমাদরে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং গ্রামের লোক সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও ভৈরবের এই ব্যবহারটা শুধু মাপ করে নাই, সমাজের খাতিরে রমেশকে সে যে আহ্বান পর্বস্ব করে নাই, তাহার এই কাজটাকে প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছে।

হা ভগবান! সে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ কৃতঘ্ন জাতের, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান তুমিই ক্ষমা করতে পারবে?

পনের

এমনি একটা আশঙ্কা যে রমেশের মাথায় একেবারেই আসে নাই তাহা নহে। তথাপি পরদিন সন্ধ্যার সময়ে গোপাল সরকার সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্যসত্যই জানাইল যে, ভৈরব আচার্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিয়াছে অর্থাৎ সে মকদ্দমায় হাজির হয় নাই এবং তাহা এক-তরফা হইয়া ডিসমিস হইয়া গিয়া তাহাদের শ্রমস্ত জমা টাকটা বেণী প্রকৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন একমুহূর্তেই রমেশের ক্রোধের শিখা বিদ্যুৎবেগে তাহার পদতল হইতে প্রকারান্তর পর্বস্ব জ্বলিয়া উঠিল। সেদিন ইহাদের জাল ও জুরাচুরি দমন করিতে যে মিথ্যা কণ সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল মহাপাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার ঘারাই নিজের মাথা বাঁচাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই কৃতঘ্নতা কল্যাকার অপমানকেও বহু উর্ধ্বে ছাপাইয়া আজ রমেশের মাথার ভিতরে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রমেশ যেমন ছিল তেমনি খাড়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। আত্মসংবরণের কথাটা তাহার মনেও হইল না। প্রভুর রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি কোথাও যাচ্ছেন?

আসি, বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভৈরবের বহির্বিটিতে ঢুকিয়া দেখিল কেই নাই। ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আচার্যগৃহিণী সজ্জাদীপ-হাতে প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চমূলে আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ রমেশকে সুমুখে দেখিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া গেলেন। সে কখনও আসে না, আজ কেন আসিয়াছে তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাহার হৃৎপিণ্ড কঠোর কাছে ঠেলিয়া আসিল।

রমেশ তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল, আচাধ্যমশাই কই?

গৃহিণী অব্যক্তবরে বাহা বলিলেন তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু বুঝা গেল তিনি ঘরে নাই। রমেশের গায়ে একটা জামা অবধি ছিল না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তাহার মুখও ভাল দেখা যায়নি। এমন সময়ে ভৈরবের বড়মেয়ে লক্ষ্মী ছেলেকোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কে মা? তাহার জননী পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না।

লক্ষ্মী ভয় পাইয়া চৈতাইয়া ডাকিল, বাবা, কে একটা লোক উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে, কথা কয় না।

কে রে? বলিয়া সাড়া দিয়া তাহার পিতা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঁঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার স্নান ছায়াতেও সেই দীর্ঘ অজুয়েই চিনিতে তাহার বাকী রহিল না।

রমেশ কঠোরবরে ডাকিল—নেমে আসুন, বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বন্ধমুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিলে, কেন এমন কাজ করলেন?

ভৈরব কাদিয়া উঠিল, মেরে ফেললে রে লক্ষ্মী, বেশীবাবুকে খবর দে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িসূচক ছেলেময়ে চৈতাইয়া কাদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সম্ভার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বন্ধকঠের গগনভেদী কান্নার রোলে সমস্ত পাড়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড কীকানি দিয়া কহিল, চুপ! বলুন, কেন এ কাজ করলেন?

ভৈরব উত্তর দেবার চেষ্টামাত্র না করিয়া একভাবে চীৎকার করিয়া গলা ফাটিহিতে লাগিল এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা-হেঁচড়া করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-মানুষে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং তামাশা দেখিতে আরও বহু লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিতে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রোধান্বিত রমেশ সেদিকে লক্ষ্যই করিল না। শত চক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে উন্মত্তের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরিক্ত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই একবাড়ি লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল না যে, হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়! গোবিন্দ বাড়ি ঢুকিয়াই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। বেশী উকি মারিয়াই সরিতেছিল, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাদিয়া উঠিল—বড়বাবু—বড়বাবু—

বড়বাবু কিন্তু কর্ণপাতও করিল না, চোখের নিম্নে কোথায় নিলিয়া গেল।

সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল, পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। হই... হয়েচে—এবাব ছেড়ে দাও।

রমেশ প্রাঙ্গণপূর্ণ লোকের পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, বাড়ি যাও।

রমেশ দ্বিস্তম্ভ না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল। কিন্তু সে চলিয়া গেলে রমার প্রাণ তাহার এই নিরতিশয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি একরকম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এবং এমন জিনিসটার এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা পাড়ার লোকের কাহারই যেন মনঃপূত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙ্গুলী আত্মপ্রকাশ করিয়া আব্দুল তুলিয়া মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল, বাড়ি চড়াও হয়ে যে আধমরা করে দিয়ে গেল, এর কি করবে সেই পরামর্শ করে।

ভৈরব দুই-হাঁটু বুকের কাছে জড় করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল, নিরুপায়তা: বেশীর মুখপানে চাছিল। রমা তখনও যায় নাই। বেশীর অভিশ্রয় অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু এ পক্ষের লোকও ত কম নাই বড়দা? তা ছাড়া হয়েচেই বা কি যে এই নিরে হৈ-চৈ করতে হবে।

বেশী ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কি রমা!—ভৈরবের বড় মেয়ে তখনও একটা খুঁটি আঙ্গুর করিয়া দাঁড়াইয়া কাদিতেছিল। সে দলিতা ফণিনীর মত একেবারে গর্জিয়া উঠিল, তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি। তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে গেলে কি করতে বল ত?

তাহার গর্জনে রমা প্রথমটা চমকিয়া গেল। সে যে পিতার মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞ নয়—তা না হয় নাই হইল; কিন্তু তাহার তীব্রতার ভিতর হইতে এমন একটা কটু শ্রবের স্বাক্ষর আসিয়া রমার গায়ে লাগিল যে সে পরমুহূর্তেই ছলিয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল তোমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাত লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা করো না; কিন্তু আমি কারও হয়েই কোনও কথা বলিনি, ভালর জন্যেই বলেছিলাম।

লক্ষ্মী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কণ্ঠহার অশ্রুটি নহে। সে তাড়িয়া আসিয়া বলিল, বটে! ওর হয়ে কঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের মেয়ে বলে কেউ ভয়ে কথা কয় না—নাইলে কে না ওনেচে? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিত।

বেশী লক্ষ্মীকে একটা তাড়া দিয়া বলিল, তুই থাম না লক্ষ্মী! কাজ কি ও-সব কথায়?

লক্ষ্মী কহিল, কাজ নেই কেন? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হ'ল, তার হয়েই উনি কৌদল করবেন? বাবা যদি মারা যেতেন?

রমা নিমেষের জন্যে ভণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল মাত্র। বৈদীর কৃত্রিম ক্রোধের স্বর তাহাকে আবার প্রকলিত করিয়া দিল। সে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিল, লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা; আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারত।

লক্ষ্মী ও বলিয়া উঠিয়া কহিল, ওঃ তাহাতেই বুঝি তুমি মরেচ রমাদিদি?

রমা আর জবাব দিল না। তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বৈদীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কথটা কি তুমিই বল ত বড়দা? বলিয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া বৈদীর বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখিতে লাগিল।

বৈদী ক্ষুব্ধভাবে বলিল, কি করে জবাব দিব কোন। লোকে কত কথা বলে—তাতে কান দিলে ত চলে না।

লোকে কি বলে?

বৈদী পরম তাজিল্যভাবে কহিল, বললেই বা রমা, লোকের কথাত্তে ত আর গায়ে ফোঁড়া পড়ে না; বলুক না।

তাহার এই কপট সহানুভূতি রমা টের পাইল। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোঁড়া পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চামড়া নেই! কিন্তু লোককে একথা বলাচে কে? তুমি?

আমি?

রমা ভিতরের দুর্নিবার ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুঃখই ত তোমার বাকী নেই—চুরি, জুয়াচুরি, জাল, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকী থাকে কেন?—বৈদী হতবুদ্ধি হইয়া হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না।

রমা কহিল, মেরেমানুষের এর বড় সর্বনাশ যে আর নেই, সে বোঝবার তোমার সাধা নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?

বৈদী ভীত হইয়া বলিল, আমার লাভ কি হবে! লোকে যদি তোমাকে রমেশের বাড়ি থেকে ভোরবেলা বার হতে দেখে—আমি করব কি?

রমা সে কথাই কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, এত লোকের সামনে আমি আর বলতে চাইনে। কিন্তু তুমি মনে করো না বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাইনি! কিন্তু এ নিশ্চয় জেনো—আমি মরবার আগে তোমাকেও জ্বাঙ্গ রেখে যাব না।

আচার্যগৃহিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন; সরিয়া আসিয়া রমার একটা বাহু ধরিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, পাগল হয়েচ মা, এখানে তোমাকে না জানে কে? নিজের কন্যার উদ্দেশে বলিলেন, লক্ষ্মী, মেরেমানুষ হয়ে মেরেমানুষের নামে এ অপবাদ দিসনে রে, ধর্ম সইবেন না। আজ ইনি তোদের যে উপকার করেচেন, তোরা মানুষের মেয়ে হলে তা টের পেতিন, বলিয়া টানিয়া রমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। আচার্য-গৃহিণীর স্বামীর উদ্দেশে এই কঠোর শ্রেষ্ট এবং নিরপেক্ষ সত্যাবিভায উপস্থিত সকলেই যেন কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া পড়িল।

এই ঘটনার কার্য-কারণ বহু বড় এবং যাই হোক, নিজের কদাকার অসংযমে রমেশের লিঙ্কিত ভ্রম অস্ত্র-করণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এমনি সঙ্কুচিত হইয়া রহিল যে, সে বাটার বাহির হইতেই পারিল না। তথাপি এত লোকের মধ্যে হইতে রমা যে বেজায় তাহার লজ্জার অংশ লইতে আসিয়াছিল, এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত লজ্জার কালোমেঘের গায়ে দিগন্ত-স্পৃগু অতি ঈষৎ বিদ্যুৎস্করণের মত কপে কপে যেন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল! তাই তাহার প্রাণের মধ্যেও পরিতৃপ্তির আনন্দ ছিল। এই দুঃখ ও সুখের বেদনা লইয়া সে বন্ধন আরও কিছুদিন তাহার নির্জন গৃহের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিতেছিল, তখন তাহাকে উপলব্ধ করিয়া বাহিরে যে আর একজনের মাথার উপর নিরবচ্ছিন্ন লজ্জা ও অপমানের পাহাড় ভাসিয়া পড়িতেছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই!

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না। আজ বৈকালে পিরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পক্ষায়েতের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। ঐ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূর্বে করিয়া আসিয়াছিল। সেইমত তাহারা আজ একত্র ছোটবানর জনাই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে যাইবার জন্য উঠিতে হইল। কেন তাহা বলিতেছি।

রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ; অনেকেরই এককোঁটা জমি-ভাগয়া নাই ; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরাস্রের সংস্থান করে। দুমিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সজ্জিত ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে-কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অভাবের জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ মহাজনেরা প্রায় হিন্দু। রমেশ শহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া যাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া প্রথমটা একেবারে অতিভূত হইয়। পড়িল। গ্রামে অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়াছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া এই সকল দুর্ভাগাদের মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সে কোমর বাঁধিয়া লাগিল। কিন্তু দুই-একটা কাজ করিয়াই থাকা খাইয়া দেখিল যে, এই সকল দরিদ্রদিগকে সে যতটা অসহায় এবং কৃশপাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র, নিরুপায় এবং অল্পবুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু স্বক্কাতি-বুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয়। মিথ্যা বলিতে ইহারা অস্বাভাবিক যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়, সাধুও নয়। মিথ্যা বলিতে ইহারা অস্বাভাবিক হয় না এবং কীকি দিতে জানে। প্রতিবেশীরা ঠা-কন্যার সম্বন্ধে সৌন্দর্য-চর্চার লক্ষও মন্দ নাই। পুরুষের বিবাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার ; অথচ নানা বয়সের বিধবার প্রতি গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। তাই নৈতিক স্বাধীনতাও অতিশয় দুর্ভিত। সমাজ ইহাদিগের আছে—তাহার শাসনও কম নয়, কিন্তু পুলিশের সহিত চোখে যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ইহারা ঠিক সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে। অথচ সর্বসম্মত ইহারা এমন ঐড়িত, এত দুর্বল, এমন নিঃশেষ যে, বাণ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যা হয়, রমেশের অন্তরটা ঠিক তেমনি করিতেছিল বলিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় সে পিরপুরের নূতন ইস্কুলঘরে পক্ষায়েত আহ্বান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ হইল সন্ধান কালা বোর কাটিয়া গিয়া দশমীর জ্যোৎস্নায় জানালার বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের এদিক ওদিক ভরিয়া গিয়াছিল। সেই এমন সময়ে রমেশ আসিয়া তাহার দোরগোড়ায় দাঁড়াইল। সে স্থানটায় আলো ছিল না, রমেশ বাটীর দাসী মনে করিয়া কহিল, কি চাও ?

আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন ?

রমেশ চমকিয়া উঠিল—এ কি রম্য ? এমন সময় যে !

যে হেতু তাহাকে সন্ধ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য ; কিন্তু যে জন্য সে আসিয়াছিল, সে অনেক কথা। অথচ কি করিয়া যে আরও ঐরবে ভাবিয়া না পাইয়া রম্য ছিরি হইয়া রহিল। রমেশও কথা কহিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রম্য প্রশ্ন করিল, আপনার শরীর এখন কেমন আছে ?

ভাল নয়। আবার রোজ রাতেই জ্বর হচ্ছে।

তা হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ও ভাল হয়।

রমেশ হাসিয়া কহিল, ভাল ও হয় জানি, কিন্তু যাই কি করে ?

তাহার হাসি দেখিয়া রম্য বিরক্ত হইল। কহিল, আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ, কিন্তু

এমন কি কাজ আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?

রমেশ পূর্বের মতই হাসিয়া জবাব দিল, নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলিনে। কিন্তু এমন কাজ মানুষের আছে যা এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু সে ত তুমি বুঝবে না রমা।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকারমশাইকে বলে দিয়ে যান, আমি তাঁর কাজকর্ম দেখবো।

রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে? কিন্তু—

কিন্তু কি?

কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব কি?

রমা অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ কহিল, ইতরে পারে না, কিন্তু আপনি পারবেন।

তাহার দৃঢ় কঠোর এই অভাবনীয় উদ্ভিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কশেক মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, ভাববার সময় নেই, আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে না। না গেলে—বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাইলে বিপদ যে কি ঘটতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বম্বেশ ঠিকই অনুমান করিল; কিন্তু আশ্বাসংবরণ করিয়া কহিল, ভাল, তাই যদি যাই তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে সতর্ক করতে এসেচ! সে-সব কাণ্ড এত পুরানো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। বরং খুলে বল, আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চলে যেতে হয়ত রাজী হতেও পারি, বলিয়া সে যে-উদ্ভয়ের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহা পাইল না।

কত বড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, তাহাও জানা গেল না; রমেশের নিষ্ঠুর বিদ্বেষের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরণ বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্যগোচর হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলিয়া লইল। পরে কহিল, আচ্ছা খুলেই বলচি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া কহিল, এই? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?

রমা একটুখানি থামিয়া কহিল, না দিলে দুদিন পরে আমার মহামায়ার পূজোয় কেউ আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ থাকবে না—আমার বার-ব্রত—এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা স্বরণমাত্র রমা শিহরিয়া উঠিল।

রমেশের আর না তুলিলেও চলিত, কিন্তু থাকিতে পারিল না। কহিল, তার পরে?

রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল, তারও পরে? না তুমি যাও—আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট করো না; তুমি যাও—যাও এ দেশ থেকে।

কিছুক্ষণ পৰ্ব্বত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। ইতিপূর্বে যেখানে যে কোন অবস্থায় হোক রমাকে দেখিলেই রমেশের বৃকের রক্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে শত বৃত্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজের অন্তরকে সহস্র কটুক্তি করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। হৃদয়ের এই নীরব বিরুদ্ধতায় সে দুঃখ পাইত, লজ্জা অনুভব করিত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া আজ এইমাত্র নিজের গৃহের মধ্যে সেই রমাকে অকস্মাৎ একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়া কল্যাণকার কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয়-চাকলা একেবারে উদ্ভাস হইয়া উঠিয়াছিল। রমার শেষ কথায় এতদিন পরে আজ সেই হৃদয় স্থির হইল। রমার ভয়-ব্যাকুল নির্বন্ধতার অথও স্বাধীনতার চোহরা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, তাহার অন্ধ হৃদয়ের আজ চোখ খুলিয়া গেল।

রমেশ গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু আজ আর সময় নেই। কারণ, আমার পালাবার ছেতুটা বত বড়ই তোমার কাছে হোক, আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, আমাকে এখনই বার হতে হবে।

রমা আশ্বে আশ্বে বলিল, আজ কি কোনমতেই শাওয়া হতে পারে না?

না। তোমার দাসী গেল কোথায়?

কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি কথা! এখানে একা এলে কোন সাহসে? একজন দাসী পর্যন্ত সঙ্গে করে আসেনি।

রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল, তাতেই বা কি হ'ত? সেও ত আম'কে তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না।

তা না পারুক, লোকের মিথ্যা দুর্নাম থেকে ত বাঁচাতে পারত। রাত্রি কম হয়নি রাণী।

সেই বহুদিনের বিস্মৃত নাম! রমা সহসা বলিতে গেল, দুর্নামের বাকী নেই রমেশদা, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া শুধু কহিল, তাতেও ফল হ'ত না রমেশদা। অজ্ঞকার রাত্রি নয়—আমি বেশ যেতে পারব, বলিয়া আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

যোল

প্রতি বৎসর রমা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত। এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভূষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমন ছড়াছড়ি পড়িয়া যাইত যে, রাত্রি একপ্রহর পর্যন্ত ভাড়ে-পাতায় ঐটোতে-কাঁটাতে বাড়িতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, শিরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ঐটি করে নই। চতুর্থমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজসরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমীপূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন গড়িয়া তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে। আকাশে সপ্তমীর খণ্ডচন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু মুখ্যোবাড়ির মস্ত উঠান জনকয়েক ভহলোল্লু বাতীত একেবারে শূন্য ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। বাড়ির ভিতরে অগ্নের বিরাট স্তূপ ক্রমে জমট বীধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, বাহ্যনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়িতে পা দিল না।

ইস! এত আহার্য-পেয় নষ্ট করে দিচ্ছে দেশের ছোটলোকের দল? এত বড় স্পর্ধা! বেশী ইঁকা হাতে একবার ভিতরে, একবার বাহিরে হাঁকাহাঁকি লাগাদাগি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—বেঁটাঘের শেখাবো—চাল কেটে তুলে দেবো—এমন করবো, তেমন করবো, ইত্যাদি। গোবিন্দ, ধর্মদাস, হালদার প্রভৃতি এরা কষ্টমুখে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আঙ্গাজ করিতে লাগিল, কোন শালার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে! হিন্দু-মুসলমান একমত হইয়াছে, এও ত ব. অশ্চর্য! এদিকে অগ্নিরে মাসি ত একেবারে দুর্বার হইয়া উঠিয়াছেন। সেও এক মহামারী ব্যাপার। এই তুমুল হাঙ্গামার মধ্যে শুধু একজন নীরব হইয়া আছে—সে নিজে রমা। একটি কথাও সে কাহারো বিরুদ্ধে কহে নাই, কাহাকেও দোষ দেয় নাই, একটা আক্ষেপ বা অভিযোগের কথামাত্রও এখন পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। একি সেই রমা? সে যে অতিশয় পীড়িত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিজে স্বীকার করে না—হাসিয়া উড়াইয়া দেয় রোগে রূপ নষ্ট করে—সে যাক্। কিন্তু সে অভিমান নাই, সে রাগ নাই, সে জিদ নাই, রান চোখ দুটি যেন ব্যথার ও করুণায় ভরা। একটু লক্ষ্য করিলে মনে হয়, যেন ঐ দুটি সজল আবরণের নীচে রোদনের সমুদ্র ঢাণা দেওয়া আছে—মুক্তি পাইলে বিশ্ব-সংসার ভাসাইয়া দিতে পারে। চতুর্থমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া রমা প্রতিমা—আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবারাত্র শুভানুধ্যায়ীর দল একেবারে তারস্বরে ছোটলোকের চোদপুরুষের নাম ধরিয়া চোদপুরুষের নাম ধরিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল। রমা—একটু খানি হাসিল। বেঁটা হইতে টানিয়া ছিড়িলে মানুষের হাতের মধ্যে ফুল যেমন করিয়া হাসে—ঠিক তেমনি। তাহাতে রাগ-বেষ, আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দ কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি সার্থক, কি নিরর্থক তাহাই বা কে জানে!

বেণী রাগিয়া কহিল, না না, এ হাসির কথা নয়, এ বড় সর্বনেশে কথা। একবার যখন জানিব এর মূলে কে,—বলিয়া দুই হাতের নখ এক করিয়া কহিল, তখন এই এমনি করে ছিড়ে ফেলব।

রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল, হারামজাদা ব্যাটার এ বুধিস নে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্, সেই রমেশ নিজে যে জেলে খানি টানচে! তোদের মারতে কতটুকু সময়

লাগে?

রমা কোন কথা কহিল না।—যে কাজের জন্য আসিয়াছিল তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেড়-মাস হইল রমেশ অবৈধ প্রবেশ করিয়া, ভৈরবকে ছুরি মারার অপরাধে জেল খাটিতেছে। মোকদ্দমায় বাঙ্গীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই—নূতন ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব কি করিয়া পূর্বাঙ্কেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না সে বিষয়েও তাহার যথেষ্ট সংশয় আছে। ধানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরনের অপরাধ সে পূর্বেও করিয়াছে এবং আশুও অনেক প্রকার সম্ভবজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিশ যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সে কহিয়াছিল, রমেশ বাড়ি ঢুকিয়া আচার্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল, তাহা সে জানে। কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কি না জানে না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কি না, তাহাও স্মরণ হয় না।

কিন্তু এই কি সত্য? জেলার বিচারালয়ে হলফ করিয়া রমা এই সত্য বলিয়া আসিল; কিন্তু যে বিচারালয়ে হলফ করার প্রথা নাই, সেখানে সে কি জবাব দিবে। তাহার অপেক্ষা কে অধিক নিঃসংশয়ে জানিত, রমেশ ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার অস্ত্র থাকা ত দূরের কথা একটা ভূণ পর্যন্ত ছিল না। আদালতে ও—কথা ত কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা পর্বস্ত করিবে না—সে কি স্মরণ করিতে পারে এবং কি পারে না! কিন্তু এখানকার আদালতে সত্য বলিবার যে তাহার এতটুকু পথ ছিল না! বেণী প্রভৃতির হাত-ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই। সুতরাং সত্যের মূল্যে তাহাকে যে মিথ্যা অপবাদের গাড় কালি নিজের মুখময় মাখিয়া এই সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন ত অনেককেই হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তা ছাড়া এত বড় গুরুদণ্ডের কথা রমা বলিলেও কল্পনা করে নাই। বড় জোর দুশ'-একশ' জরিমানা হইবে ইহাই জানিত। বরঞ্চ বাণ বার সতর্ক করা সত্ত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হোক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক। কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্রিষ্ট পাচুব মুখের প্রতি চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একবারে ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সেই সময়ে রমা নিজে রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। পরের মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল এবং কিছুতেই তাহাকে জেরা করিতে দেয় নাই এবং জেলের হুকুম হইয়া গেলে গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া কহিয়াছিল, না। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সারাজীবন কারাবদ্ধ করবার হুকুম দিলেও আমি আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। বেশ করি, জেল এর চেয়ে ভাল।

ভালই ত। তাহাদের চিরানুগত ভৈরব আচার্য মিথ্যা নালিশ করিয়া যখন তাহার স্বর্ণ শোধ করিল এবং রমা সাক্ষ্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্মরণ করতে পারিল না তাহার হাতে ছুরি ছিল কি না, তখন আপিল করিয়া মুক্তি চাহিবে সে কিসের জন্য! তাহার সেই দুর্জয় অভিমান সে নড়াইয়া রাখিবার স্থান পাইতেছে না। সে কি গুরুভার! সে মিথ্যা বলিয়া আসে নাই, এ কৈফিয়ত তাহার অন্তর্ভাসী ত কোনমতেই মঞ্জুর করিল না! মিথ্যা বলে নাই বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশও করে নাই। সত্য-গোপালের অপরাধ যে এত বড়, সে যে এমন করিয়া তাহাকে অহরহ দণ্ড করিয়া ফেলিবে, এ যদি সে একবারও জানিতে পারিত। রহিয়া রহিয়া তাহার কেবলই মন পড়ে ভৈরবের যে অপরাধে রমেশ আত্মহারা হইয়াছিল, সে অপরাধ কত বড়! অথচ তাহার একটিমাত্র কথায় সে সমস্ত মার্জনা করিয়া, দ্বিভক্তি না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছাকে এমন করিয়া শিরোধার্য করিয়া কে কবে তাহাকে এত সম্মানিত করিয়াছিল! নিজের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া আজকাল একটা সত্যের সে যেন দেখা পাইতেছিল। যে সমাজের ভরে সে এত বড় গর্হিত কর্ম করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্রুর হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে?

গোবিন্দের এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা কে না জানে? বৌর সহিত তাহার সত্বেবের কথা গ্রামের মধ্যে কাহারও অবিস্মিত নাই। অথচ সমাজের আশ্রয়ে সে নিকটকে বসিয়া আছে এবং সেই বৌই সমাজপতি। তাহারই সামাজিক শৃঙ্খল সর্বদা শতপাকে জড়িয়া রাখাই চরম কার্যকর। ইহাই হিদুমনি! কিন্তু যে ভৈরব এত অনর্থের মূল, রমা নিজের দিকে চাহিয়া তাহার উপরেও আর রাগ করিতে পারিল না। মেয়ে তাহার বারো বছরের হইয়াছে—অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে না পারিলে একদম হইতে হইবে এবং বাড়িসুদ্ধ লোকের জাত বাইবে। এ প্রমাসের আশঙ্কামাত্রই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত-পা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সে নিজে তাহার এত সুখিা থাকা সত্ত্বেও যে সমাজের ভয় কাটাইতে পারে নাই—গরীব ভৈরব কাটাইবে কি করিয়া! বৌর বিরুদ্ধতা করা তাহার পক্ষে কি ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার এ কথা তা কোমতেই সে অস্বীকার করিতে পারে না।

বৃদ্ধ সনাতন হাজারা বাটার সমুখ দিয়া বাইতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকাডাকি, অনুনয়-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বৌবাবুর সামনে হাজির করিয়া দিল। বৌ গরম হইয়া কহিল, এত সোমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা করে মাথা গজিয়েচে রে সনাতন কহিল, দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু? আপনাদের থাকে না, ও আমাদের মত গরীবের!

কি বলিলি রে! বলিয়া হাঁক দিয়া বৌ ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেল; ইহারই সর্ব্বথ যেদিন বৌর হাতে বাঁধা ছিল, তখনই এই সনাতন দুকেলা আনিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া বাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা!—গোবিন্দ রসান দিয়া কহিল, তোদের বুদ্ধের পাটা শুধু দেখিচি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলিনি, বলি কেন বল ত রে?

বুড়ো একটুখানি হাসিয়া কহিল, আর বুদ্ধের পাটা! যা করবার সে ও আপনারা আমার করেচেন। সে যাক, কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন আর বাই বলুন, কোন কৈবর্তই আর বামনবাড়িতে পাণ্ড পাণ্ডবে না। এত পাপ যে মা বসুমতী কেমন করে সইচেন, তাই আমরা কেবল কলাবলি করি, বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, একটু সাবধানে থেকো দিল্লিঠাকরুন, পিরপুয়ের মোচলমান হোঁড়ারা একেবারে ক্লেপে রয়েছে। ছোটবাবু কিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে তা এ মা দুর্গাই জানেন। এর মধ্যেই দু-তিনবার তারা বড়বাবুর বাড়ির চারপাশে ঘুরে কিরে গেছে—সামনে পায়নি তাই রকে, বলিয়া সে বৌর দিকে চাহিল। চক্ষের নিম্নে বৌর ক্রুদ্ধ মুখ ভরে বিবর্ণ হইয়া গেল।

সনাতন কহিতে লাগিল, ঠাকুরের সমুখে মিথো কলচি নে বড়বাবু, একটু সামলে-স'-ল থাকবেন। রাত-বিরেতে বার হবেন না—কে কোথায় ওত পেতে বসে থাকবে কলা যায় না ত।

বৌ কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার মত ভীত লোক বোধ করি সংসারে ছিল না।—এতকনে রমা কথা কহিল। স্নেহাঙ্গ-করুণাকর্মে প্রস্থ করিল, সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুদ্ধি তোমাদের সব এত রাগ?

সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মিথো বলে আর নরকে যাব কেন দিল্লিঠাকরুন, তাই বটে। মোচলমানদের রাগটাই সবচেয়ে বেশি। তারা ছোটবাবুকে হিন্দুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন আপনারা—জাকর আলি, আজুল নিয়ে বার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের সিন তাদের ইচ্ছার জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেছে। ওনি মসজিদ তাঁর নাম করে নাকি নেমাজপড়া পবিত্র হয়।

রমার শুভ স্নান সুখপানি অব্যক্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুল করিয়া প্রদীপ তিন্মেঘ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বৌ অকস্মাৎ সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই তোকে দেবো, দু'বিষে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি, ঠাকুরের সামনে পাড়িয়ে দিবি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন বিস্মিতের মত কিছুকাল বৌর সুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আর ক'টা দিন বা বাঁচব বড়বাবু! লোভে পড়ে যদি এ কাজ করি, মরলে আমাকে তোলা চুলোর বাক, পা নিয়ে কেউ হোঁবে

না! সে দিনকাল আর নেই বড়বাবু, সে দিনকাল আর নেই! ছোট-বাবু সব উন্টে দিয়ে গেছেন। গোবিন্দ কহিল, বামুনের কথা তা হলে রাখবি নে বল?

সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল, না। বললে তুমি রাগ করবে গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু সেদিন শিরপুরের নতুন ইন্সুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছ-কতক সুতো খোলানো থাকলেই বামুন হয় না। আমি ত আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। যা করে তুমি বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি দিদিঠাকরুন, তুমিই বল দেখি?

রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল। সনাতন উৎসাহিত হইয়া মনের আক্কেশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল, বিশেষ করে ছোড়াদের দল। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে এই দুটো গাঁয়ের যত ছোকরা সঙ্কোর পর সবাই গিয়ে জোটে জাফর আলির বাড়িতে। তারা ত চারিদিক স্পষ্ট বলে বেড়াচ্ছে, জমিদার ত ছোটবাবু আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব—ভয় কারকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে অমরাও যা তারাও তাই।

বেণী আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া শুদ্ধমুখে প্রশ্ন করিল, সনাতন, আমার ওপরেই তাদের এত রাগ কেন বলতে পারিস?—সনাতন কহিল, রাগ ক'রো না বড়বাবু, কিন্তু আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকী নেই।

বেণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোটলোক সনাতনের মুখে এমন কথাটা শুনিয়াও সে রাগ করিল না, কারণ, রাগ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না—তাহার বুকের ভিতর টিপটিপ করিতেছিল।

গোবিন্দ কহিল, তা হলে জাফরের বাড়িতেই আড্ডা বল? সেখানে তারা কি করে বলতে পারিস?

সনাতন তাহার মুখপানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিল। শেষে কহিল, কি করে জানিনে, কিন্তু ভাল চাও ত সে মতলব ক'রো না ঠাকুর! তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই-সম্পর্ক পাতিয়েচে—এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চকমকি টুকে আশুন জ্বালতে যেও না ঠাকুর!

সনাতন চলিয়া গেল, বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও কথা কহিবার প্রবৃত্তি রহিল না। রমা উঠিয়া বাইবার উপক্রম করিতে বেণী বলিয়া উঠিল, ব্যাপার শুনেলে রমা?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না, হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল, কহিল, শালা ভৈরবের জন্যেই এত কাণ্ড। আর তুমি যদি না যাবে যেখানে, তা তাকে ছাড়িয়ে দেবে, এ সব কিছু হ'ত না। তুমি ত হাসবেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ির বার হতে ত হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা ফাটিয়ে দেয়? মেয়ে-মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয়, বলিয়া বেণী ভয়ে ক্রোধে জ্বালায় মুখখানা কি একরকম করিয়া বসিয়া রহিল।

রমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু এতবড় নির্লজ্জ অভিযোগ সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল। বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া গোটা দুই আলো এবং পাঁচ-ছয়জন লোক সঙ্গে করিয়া আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ব্রহ্ম ভীতপদে গ্রহণ করিল।

সত্তর

বিশ্বেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আজ কেমন আছিস মা রমা?

রমা তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী তার শিররে আসিয়া বসিলেন এবং মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আজ তিনবাসকাল রমা শয্যাগত। বুক জড়িয়া কাসি এবং ম্যালেরিয়ার বিষে সর্বাস সমাজের। গ্রামের গ্রামীণ কবিরাজ গ্রাণপণে ইহার বুখা চিকিৎসা করিয়া মরিতেছে। সে বুড়া ত জানে না কিসের অবিজ্ঞান অন্ধরূপ তাহার সমস্ত দায়শিরা অহনিশি পুড়িয়া থাক হইয়া বাহিতেছে। রমাকে তিনি কন্য়ার মতই রেহ করিতেন, সেখানে কোন কঁকি ছিল না; তাই সে অত্যন্ত রেহই রমার সম্মুখে তাহার সভ্যদৃষ্টিকে

অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছিল। অপরে যখন ভুল বুঝিয়া ভুল আশা করিয়া, ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাহার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিতেছিলেন রমার চোখ দুটি গভীর কোটিরপ্রবৃত্তি, কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র। যেন বহু দূরের কিছু-একটা অত্যন্ত কাছে করিয়া দেখিবার একান্ত বাসনায় এরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে ডাকিলেন, রমা?

কেন জ্যাঠাইমা?

আমি ত তোমার মায়ের মত রমা—

রমা বাধা দিয়া বলিল, মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমি ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুষন করিয়া বলিলেন, তবে সত্যি করে বল দেখি মা, তোমার কি হয়েছে?

অসুখ করেছে জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাস্তা হইয়া উঠিল।

তখন গভীর স্নেহে তাহার রক্ত চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, সে ত এই দুটা চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা! যা এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে এ সময় মায়ের কাছে লুকোস নে রমা! লুকোলে ত অসুখ সারবে না মা?

জানালার বাহিরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই এবং মৃদুমন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চূপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, বড়লা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, ভাল আছে। মাথার ঘা সারতে এখনও বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে পারবে।

রমার মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন, দুঃখ ক'রো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে, বলিয়া তিনি রমার মুখে বিশ্বাসের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন, ভাবচ, মা হয়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বলচি? কিন্তু তোমাকে সত্যি বলচি মা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েচি, কি আনন্দ বেশি পেয়েচি তা আমি বলতে পারিনে। কেন না, আমি জানি যারা অধর্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় তাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে, তা হলে সৎসার ছারখার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলসুর ছেলে বেকীর যে মঙ্গল করে দিয়ে গেল, পৃথিবীতেকোন আত্মীয়-বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। ক'ক ঘুরে তার রক্তবদলানো যায় না মা, তাকে আশুনে পোড়াতে হয়।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তখন কি কেউ ছিল না?

বিশ্বেশ্বরী কহিলেন, থাকবে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু সে ত খামকা ঘেরে বসেনি, নিজে জেলে যাবে বলে ঠিক করে তবে ভাল বেচেতে এসেছিল। তার নিজের রাগ একটুও ছিল না মা, তাই তার বাকের একঘায়েই বেকী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল—আর আঘাত করলে না। তা ছাড়া সে মারই তার শেষ মার নয়।

রমা আশ্বে আশ্বে বলিল, তার মানে আরও লোক পিছনে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ছোটলোকদের এত সাহস ত কোনদিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ তালা গেলে?

বিশ্বেশ্বরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে কি তুমি নিজে জানিস নে মা, কে দেশেও এত ছোটলোকদের বুক এমন করে ভরে দিয়ে গেছে? আশুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা! তাকে কোন করে নেবাগেও সে আপোপাশের জিনিস ভাঙিয়ে দিয়ে যায়। সে আমার কেরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুসি সেখানে থাক, বেকীর কথা মনে করে আমি কোনদিন দীর্ঘাশ ফেলব না। কিন্তু বলা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরী যে জোর করিয়াই একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, তাহা রমা টের পাইল। তাই তাহার হাতখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বরী পুনশ্চ কহিলেন, রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েরই জ্ঞানে। বেকীকে যখন তারা অচেতন অবস্থায় ধরাধরি করে পাখিতে ভুলে হাসপাতাল নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে

আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি কানকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পৰ্ব্বত পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি যা যে এক সম্ভাব্য হলে ধর্মের শাসন ত হারের মুখ চেয়ে চুপ করে থাকবে না।

রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তোমার সঙ্গে ভর্ত করচিনে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই বলি হয়, তবে রমেশদা কেন পাগে এ দুখে ভোগ করচেন? আমরা যা করে থাকে জেলে পূরে নিয়ে এসেছি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।

জ্যাঠাইমা বলিলেন, না মা, তা নেই। নেই বলসেই বেশী আজ হসপাতালে। আর তোমার—বলিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। যে কথা তাঁহার জিহ্বায়ে আসিয়া পড়িল, তাহা জোর করিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি জানিস মা, কোন কাজই কোনমিন ওখু ওখু খুন্সো মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি করে করে, তা সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলসেই আজ পৰ্ব্বত এ সমস্যার মীমাংসা হতে পারল না, কেন একজনকে পাগে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

রমা নিজের ব্যবহার স্বরণ করিয়া নীরবে নিঃশ্বাস ফেলিল। বিবেচনায় বলিতে লাগিলেন, এর থেকে আমারও চোখ ফুটেই রমা, ভাল করব বলসেই ভাল করা যায় না। গোড়ার অনেকগুলো ছোট-বড় সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার বৈধ থাকে চাই। একমিন রমেশ হস্তাশ্রয় হবার আমাকে বলতে এসেছিল, জ্যাঠাইমা, আমার কাজ নেই এসের ভাল করে, আমি যেখান থেকে চলে এসেছি সেইখানেই চলে যাই। তখন আমি বাধা দিয়ে বলছিলাম, না রমেশ, কাজ বলি শুক করেছিস বাবা, তবে ছেড়ে নিয়ে পালাস নে। আমার কথা সে ত কখনও ঠেলাতে পারে না; তাই বেশিন তার জেলের হুকুম ওনতে পেলাম, সেদিন মনে হ'ল ঠিক কেন আমিই তাকে ধরে-বঁধে এই শাস্তি নিলাম। কিন্তু তার পরে বেশীকে সেদিন হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেদিন প্রথম টের পেলাম—না না, তারও জেল বখিবার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া ত জানিনি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে বাওয়ার বিড়কনা এত—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিলাতে হয় সকলের সঙ্গে, ভালতে বন্ধতে এক না হতে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা ত মনে ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মন্ত জোর, মন্ত গ্রন্থ নিয়ে এতই উচুতে দাঁড়াল যে, শেষ পৰ্ব্বত কেউ তার নাপালই পেলে না। কিন্তু সে ত আবার চোখে পড়ল না মা; আমি তাকে যেতেও নিলাম না, রাখতেও পারলাম না।

রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিবেচনায় তাহা অনুমান করিয়া কহিলেন, না রমা, অনুশাণ আমি সেজ্ঞা করিনে। কিন্তু তুইও ওনে রাগ করিস নে মা, এইবার তাকে তোরা নাথিয়ে এসে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোমের অধর্ম বত বড়ই হোক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সভ্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড়-পলা করেই বলে যাইছি।

রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু এতে তিনি কেন নেবে বাকেন জ্যাঠাইমা? আমাদের অন্যায় অধর্মের কল বত বড় বাতনই তাকে ভোগ করতে হোক, আমাদের দৃষ্টি আমাদেরই নরকের অভ্যকূলে চেঁসে দেবে, তাঁকে স্পর্শ করবে কেন?

বিবেচনায় রানডাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, করবে বৈ কি মা। নইলে পাগ আর এত ভয়ভর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ বলি নাই করে, এমন কি উশেট অপকারই করে, তাহেই বা কি এসে যায় মা, বলি না তার কৃতদ্বতার দাতাকে নাথিয়ে আনে। তুই বলচিস মা, কিন্তু তোমের কুরাপুর রমেশকে কি আর ভেদনটি পাবে? সে ফিরে এসে তোরা স্পষ্ট দেখতে পাবি, সে যে হাত দিয়ে দান করে বেড়াতে, তৈরব তার সেই দান হাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে নিয়েচে।

ভয়পূর্ণ একটু থামিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু কে জানে। হরত ভালই হয়েছে। তার বলিত সমগ্র হৃদয়ের অপবর্ণাশু দান গ্রহণ করবার শক্তি বন্ধন গ্রাসের লোকের ছিল না, তখন এই ভাল হাতটাই বোধ করি এবার তোমের সত্যিকার কাজে লাগবে, বলিয়া তিনি গভীর একটা নিঃশ্বাস সোজন করিলেন।

তাঁহার হাতখানি রমা নীরবে কিছুকণ নাকচাড়া করিয়া ধীরে ধীরে বড় কানপকটে কহিল, আহা

জ্যাঠাইমা, মিথ্যে সাক্ষী নিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ডভোগ করানর শাস্তি কি?

বিক্রেখরী জালদার বাহিরে চাছিয়া রমার বিপর্যস্ত রূপ চুলের রানির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নির্মলিত দুই চোখের প্রান্ত বহিয়া অঙ্গ গড়াইয়া পড়িতেছে। সঙ্গেহে মুহূর্ত্তীয়া কহিলেন, কিন্তু তোমার ত হাত ছিল না মা। যেহেতু নুনের এত বড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে যে কাপুরুষেরা তোমার ওপর এই অত্যাচার করেছে, সমস্ত গুরুদণ্ডই তাদের। তোমাকে ত এর একটি কিছুই হইতে হবে না মা! বলিয়া তিনি তাহার চক্ষু মুহূর্ত্তীয়া নিলেন। তাহার একটীয়ার আশ্বাসেই রমার রক্তাঙ্গ এইবার প্রশ্বাসের ন্যায় করিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে সে কহিল, কিন্তু তাঁরা যে তাঁর শত্রু। তাঁরা বলেন, শত্রুকে যেমন করে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। কিন্তু আমার ত সে কৈফিয়ত নেই জ্যাঠাইমা।

তোমারই বা কেন নেই মা? প্রশ্ন করিয়া তিনি দৃষ্টি আনত করিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর যেন বিদ্যুৎ ফেলিয়া গেল। যে সংশয় মুখ ঢাকিয়া একলিন তাঁর মনের মধ্যে অকারণে জালগোলা করিয়া ফেড়াইত, সে যেন তাহার মুখের ফেলিয়া দিয়া একেবারে সোজা হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইল। আজ তাহাকে তিনিতে পারিয়া কলকালের জন্য বিক্রেখরী কেন্দ্রের বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রমার হুল্লরের ব্যথা আর তাহার অপোচর রহিল না।

রমা চোখ বুজিয়া ছিল, বিক্রেখরীর মুখের ভাব দেখিতে পাইল না। ডাকিল, জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা চকিত হইয়া তাহার মাথাটা একটুখানি নাড়িয়া দিয়া সাড়া দিলেন।

রমা কহিল, একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার করব জ্যাঠাইমা। পিরপুরের জাকর আলির বাড়িতে সন্ধ্যার পর গ্রামের ছেলেরা জড় হয়ে রক্তাক্তার কথাষসত সং আলোচনাই করত, বদমাইসের দল বলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মন্তলব চলছিল—আমি লোক গাঠিয়ে তাদের সাবধান করে নিয়েছি। কারণ পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে গেলে ত আর রক্ষা রাখত না।

তিনা বিক্রেখরী শিহরিয়া উঠিলেন—বলিস কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের এই উৎপাত বেশী মিছে করে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা কহিল, আমার মনে বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে শাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিক্রেখরী হেঁট হইয়া নীরবে রমার ললাট চূষন করিলেন। বলিলেন, তার মা হয়ে এ যদি না আমি শাপ করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্বাদ করি, এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার এই একটা সাধনা জ্যাঠাইমা, তিনি কিরে এসে দেখবেন তাঁর সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁঃ সেই দেশের চান্দাচান্দা এবার খুব-ভেসে উঠে বসেছে—তাকে চিনেছে, তাকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসার আনন্দে তিনি আমার অপরাধ কি ভুলতে পারবেন না জ্যাঠাইমা?

বিক্রেখরী কথা বলিতে পারিলেন না। শুধু তাহার চোখ হইতে এককোঁটা অঙ্গ গড়াইয়া রমার কপালের উপর পড়িল। তারপর কলক পর্বত উভয়েই শুভ হইয়া রহিলেন।

রমা ডাকিল, জ্যাঠাইমা?

বিক্রেখরী বলিলেন, কেন মা?

রমা কহিল, শুধু একটা জায়গাঃ আমরা দু'রে যেতে পারিনি। তোমাকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম।

বিক্রেখরী আবার নত হইয়া তাহার ললাট চূষন করিলেন।

রমা কহিল, সেই জোরে আমি একটা দাবি তোমার কাছে . . . য়ে দাবি। আমি যখন আর থাকব না, তখনও আমাকে যদি তিনি কমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার হয়ে তাঁকে বলে জ্যাঠাইমা, বস্তু মল বলে আমাকে তিনি জানতেন তত মল আমি ছিলাম না। আর বস্তু মুখে তাঁকে নিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমিও পেয়েছি—তোমার মুখের এই কথাটি হয়ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিক্রেখরী উপুড় হইয়া পড়িয়া বসু দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কানিয়া কেলিলেন। বলিলেন, চল

মা আমরা কোন তীর্থে গিয়ে থাকি। যেখানে বেশী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ ভুলতেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেখানেই যাই। আমি সব বুঝতে পেরেছি রমা। যদি যাবার দিন তোর এগিয়ে এসে থাকে মা, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলে পুড়ে সেখানে গেলে ত চলবে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হতে হবে।

রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া একটা উজ্জ্বল দীর্ঘশ্বাস আরম্ভ করিতে করিতে শুধু কহিল, আমিও তেমনি ক'রেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।

আঠার

কারা-প্রাচীরের বাহিরে যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান এমন করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, বোধ করি উন্নত বিকারেও ইহা রমেশের আশা করা সম্ভবপর ছিল না। ছয় মাস সস্ত্রম কারাবাসের পর মুক্তির লাভ করিয়া সে জেলের বাহিরে পা দিয়াই দেখিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। স্বয়ং বেশী ঘোষাল মাথায় চাদর জড়াইয়া সর্বাত্মে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে উভয়-বিদ্যালয়ের মাস্টার পণ্ডিত ও ছাত্রের দল, কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেশী সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া কাদ কাদ গলায় কহিল, রমেশ, ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান, এবার তা টের পেয়েছি। যদু যুবুয্যের মেয়ে যে আচাষি হারামজাদাকে হাত করে এমন শত্রুতা করবে, লক্ষ্মা-সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জানতে চাইনি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে ভালমতোই দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ, বাইরে এই ছটামাস আমি যে তুবের আওনে জ্বলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ কি করিবে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। হেডমাস্টার পাড়ুইমহাশয় একেবারে ভুলুটিত হইয়া রমেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। তাহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রশাম করিবার ঘটীর সমস্ত পথটা ঘেন চমিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশীর কান্না আর মানা মানিল না। অশ্রু-গদগদকণ্ঠে কহিল, দাদার ওপর অভিমান রাখিস নে ভাই, বাড়ি চল। মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন।

ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল; রমেশ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিল। বেশী সম্মুখের আসনে স্থান গ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া ফেলিলেন। যা শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন আত্মল্যমান। বেশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উল্টাইয়া কহিলেন, কাকে আর দোষ দেব ভাই, আমার নিজের কর্মকল—আমারই পাপের শাস্তি! কিন্তু সে আর ওনে কি হবে? বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাস ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল, কিছু একটা হইয়াছেই। ভাই সে কথা শুনিবার জন্য আর দাঁড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু বেশী যে জন্য এই ভূমিকাটি করিল, ভাস্করী করিয়া বাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে হটকট করিতে লাগিল। মিনিটটাই নিঃশেষে কাটার পরে, সে আবার একটা নিশ্বাসের দ্বারা রমেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমার এই একটা জন্মগত দোষ যে কিছুতেই মনে এক মুখে আর করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়, কিন্তু তবু ত আমার চৈতন্য হ'ল না।

রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বেশী কঠোর আরও যদু ও গভীর করিয়া কহিতে লাগিল, আমার সোথের মধ্যে সোঁদন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কীভাবে কীভাবে বলে ফেলছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, এই সর্বনাশ আমাদের করলি। জেল হইতেছে তবলে যে সা একেবারে প্রশ-বিসর্জন করবো। আমরা ভাবে ভাবে বিষয় নিয়ে কণ্ঠ্য করি—যা করি, কিন্তু তবু ত সে আমার ভাই। তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি স্নেহে মারলি। কিন্তু নির্দোষের ভগবান আছে। বলিয়া সে গাড়ির বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার কেন নাশিল জানাইল।

রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু মন দিয়া শুনিতে লাগিল। বেশী একটি খামিয়া

কহিল, রমেশ, রমার সে উগ্রমূর্তি মনে হলে এখনো হৃৎকম্প হয়, দাঁতে দাঁতে ঘবে বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যারনি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি? মেয়েমানুষের এত দৰ্প সহ্য হ'ল না রমেশ! আমিও রেশে বলে ফেললাম, আচ্ছা ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে!

এতকাল পর্যন্ত রমেশ বেকীর কথাগুলো মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা সে জানে না। কিন্তু ঠিক এই কথাটিই সে দেশে পা দিয়াই রমার মাসির মুখে শুনিয়াছিল, তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকীর্ণ হইয়া উঠিল।

বেকী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, খুন করা তার অভ্যাস আছে ত। আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি বাটেনি, বরঞ্চ তুমিই উশ্টে শিখিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমাকে স্বেচ্ছা ত? এই স্ত্রীজীবী—বলিয়া বেকী একটু চিন্তা করিয়া লইয়া দুটু কলুর ছেলের কবিত্ত বিবরণ নিজের অঙ্কুরের অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনাদি ভাষায় ধীরে ধীরে গ্রথিত করিয়া বিবৃত করিল।

রমেশ রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পর?

বেকী মনিলমুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল, তার পরে কি আর মনে আছে তাই! কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে, কিছুই জানিনে। দশ দিন পরে জ্ঞান হয়ে দেখলাম হাসপাতালে পড়ে আছি। এ-যাত্রা যে রকম পেয়েছি সে কেবল মায়ের পুষো—এমন ২০ কি ৩০ আছে রমেশ!

রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না, কাঠের মূর্তির মত শব্দ হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু কেবল তাহার দশ অঙ্গুলি জড় হইয়া বহু-কঠিন মূঠায় পরিশ্রুত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে ভীষণ বন্ধি স্থাপিত লাগিল, তাহার পরিমাণ করিবারও কাহার সাধা রহিল না। বেকী যে কত মন্দ তাহা সে জানিত। তাহার অসাধা যে কিছুই নাই ইহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সংসারে কোন মানুষই যে এত অসত্য এমন অসত্যোক্ত এরূপ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই রমার সমস্ত অপরাধই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামের যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাতি পর্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু রানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেবিতে দেবিতে তাহা উবিয়া গেল। তাহার অন্তঃকরণে গ্রামের মধ্যে যে খুব বড় একটা সামাজিক দ্রোহ ফিরিয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা ভাবিত গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেকীর প্রতিকূলতায় যে শক্তি পদে পদে প্রতিহত হইয়া কাজ করিতে পারিতেছিল না, অখট সজিত হইতেছিল, তাহাই এখন তাহার অনুকূলতায় দিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বেকীকে সে আজ আরও একটু ভাল করিয়া চিনিলা। এই লোকটাকে এরূপ অনিষ্টকারী জানিয়াও সমস্ত গ্রামের লোক যে তাহার কতদূর বাধ্য, তাহা আজ সে যেমন দেখিতে পাইল এমন কোন দিন নয়। ইহারই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রমেশ মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু তাই নয় রমেশের উপর অন্যান্য অত্যাচারের জন্য গ্রামের সকলেই মর্মাহত, সে কথা একে একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে, ইহাদের সমবেত সহানুভূতি লাভ করিয়া এবং বেকীকে সপক্ষে পাইয়া, আনন্দ উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্তারিত হইয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্বে যে-সকল কাজ আরম্ভ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, আবার পূর্ণাঙ্গ্যমে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সম্ভব করিয়া রমেশ কিছু দিনের জন্য, নিজের এই সকল আশ্রয়-আত্মদেয় গা ঢালিয়া দিয়া সর্বত্র যে-বড় সকল বাড়িতে সকলের কাছে সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সর্বপ্রথমে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতেছিল—তাহা রমার প্রসঙ্গ। সে পীড়িত তাহা পথে শুনিয়াছিল; কিন্তু সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাহার সমস্ত বদ্বন্দ্ব হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল, শুধু একা রমাই যে তাহার সমস্ত দুঃখের মূল তাহা সবাই জানে।

সুতরাং এইখানে বেশী যে মিথ্যা কথা কহে নাই তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। দিনপাঁচ-ছয় পরে বেশী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল। শিরপুরের একটা বড় বিবরের অংশ-বিভাগ লইয়া বহুদিন ইহাতে রমার সহিত তাহার প্রবন্ধ মনোবিবাহ ছিল, এই সুযোগে সেটা হস্তগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য।

বেশী বাহিরে যাই বলুক, সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত। এখন সে শব্দ্যাপত্ত, মামলা-মকদ্দমা করিতে পারিবে না ; উপরন্তু তাহাদের মুসলমান প্রজারাও রমেশের কথা চৈলিতে পারিবে না। পরে যাই হোক, আপাততঃ যে-সমল করিবার এমন অবসর মিলিবে না বলিয়া সে একেবারে ভিন্ন ধরিয়া বলিল। রমেশ আশ্চর্য হইয়া অধীকার করিতেই বেশী বহু প্রকারের বৃত্তি প্ররোণ করিয়া শেষে কহিল, হবে না কেন? বাগে পেয়ে সে কবে তোমাকে রেহাও করেচে যে, তার অসুখের কথা তুমি ভাবতে যাচ্ছে? তোমাকে যখন সে জেলে দিয়েছিল, তখন তোমার অসুখই বা কেন কম ছিল তাই!

কথাটা সভ্য। রমেশ অধীকার করিতে পারিল না। তবু কেন যে তাহার মন কিছুতেই তাহার বিপরীত করিতে চাহিল না—কৌরব সহস্র বড় উত্তেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায় নীড়িত অবস্থা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া বিম্ববৎ হইয়া গেল ; তাহার সুস্পষ্ট হেতু সে নিজেও বুঝিয়া পাইল না। রমেশ চূপ করিয়া রহিল। বেশী কাল ইহাতেই জানিলে ঘেঁষে ধরিতে জানে। সে তখনকার মত আর নীড়া-নীড়ি না করিয়া চলিয়া গেল।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিবেচনার কোন সিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা সে পূর্বেও জানিত, কিন্তু এবার কিরিয়া আসিয়া সেই অনাসক্তিটা কেন বিতৃষ্ণার পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে ইহঁতেছিল। কলাপার ইহঁতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কৌরব সমভিষাচারে যেদিন সে-পুছে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন বিবেচনী আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ বারংবার অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি কেন একটা তাহাতে ছিল, বাহ্যতে সে ব্যর্থই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথার কথার ওলিল বিবেচনী কাশী-বাস সত্তর করিয়া বাক্য করিতেছেন, আর কিরিয়েন না ; ওলিয়া সে চমকিয়া গেল। কে সে ত কিছুই জানে না! নানা কাজে পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু যেদিন ইহঁরাছিল সেদিন ত তিনি কেন কথা বলেন নাই! বলিচ সে জানিত, তিনি নিজে ইহঁতে আপন্যার বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোন সিন ভালবাসেন না, কিন্তু আজিকার সংবাদটার সহিত সেদিনের স্মৃতিটা পাশাপাশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে এই একান্ত বৈরাগ্যের অর্থ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যোতিষ্মা সভ্যই বিদায় লইতেছেন। এ যে কি, তাহার অবিস্ময়ান যে কি অভাব, মনে করিতেই তম্বর দুই চক্ষু অক্ষপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ-বৃত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোলা তখন নটা-কণ্টা ঘরে চুকিতে গিয়া দাসী জানাইল তিনি মুখযোবাড়ি পেয়েন।

রমেশ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এমন সময় যে?

এ দাসীও বহুদিনের পুরানো। সে মৃদু হাসিয়া কহিল, মার আবার সময়-অসময়। তা ছাড়া, আজ ঠাকুরের ছোটবাবুর পৈতে কিনা।

বড়ীনের উপনয়ন?

রমেশ আরও আশ্চর্য হইয়া কহিল, কে এ কথা ত কেউ জানে না?

দাসী কহিল, তাঁরা সবাইকে বলেন নি। কলসেও ত কেউ গিয়ে থাকে না—রহানিমিকে কর্তারা সব একত্রে করে রেখেছেন কিনা।

রমেশের বিষয়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চূপ করিয়া থাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই দাসী সমস্তে খাড়া হইয়া বসিল, কি জানি ছোটবাবু—রহানিমি কি সব বিদী অধ্যয়ন করিয়েচে কিনা—আমরা গণীত-মুখী মানুষ, সে সব জানিবে ছোটবাবু—বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুকাল চূপ করিয়া থাকিয়া রমেশ পুছে কিরিয়া আসিল। এ যে কৌরব বৃদ্ধ প্রতিপোষ তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল। কিন্তু জ্ঞেয় কি অন্য এবং কিসের প্রতি-হিংসা কামনা করিয়া সে

কেন বিশেষ কর্তব্য দ্বারা রমার অধ্যাতিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এ সকল ঠিকমত অনুমান করাও তাহার দ্বারা সম্ভবপর ছিল না।

উল্লিখ

সেইদিন অপরাহ্নে একটা অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নানিত এবং সেখ মন্ডলাল সাক্ষীসকল সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিশ্বাসের সহিত প্রশ্ন করিল, আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাবু?

বাসী-প্রতিবাসী উভয়েই জবাব দিল, মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন কম? আর হাকিম হস্তুর বা কিছু তা আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকেরই হইবে থাকেন! কাল যদি আপনি সরকারী চাকরি নিয়ে হাকিম হয়ে বসে বিচার করে দেন, সেই বিচারও আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে। তখন ত মানব না বললে চলবে না।

কথা শুনিয়া রমেশের মুখ গর্বে আনন্দে স্নীত হইয়া উঠিল। কৈলাস কহিল, আপনাকে আমরা দুজনেই দু'কথা বুঝিয়ে বলতে পারব; কিন্তু আদালতে সেটি হবে না। তা ছাড়া পাঁচের কড়ি মুঠো ভরে উকিলকে না দিতে পারলে সুবিধে কিছুতেই হয় না বাবু। এখানে একটি পরসাদ খরচ নেই, উকিলকে খোসামোদ করতে হবে না, পথ হাঁটাটাই করে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি বা কিছুম করবেন, ভাল হোক মন্দ হোক, আমরা তাতেই রাজী হয়ে আপনার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ভগবান সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দুজনে তাই আদালত থেকে কিয়ে এসে আপনার চরণেই শরণ লিলাম।

একটা ছোট নালী লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিল-পত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল রমেশের হাতে দিয়া কাল সকালে আসিবে বলিয়া উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর রমেশ স্থির হইয়া বলিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সুদূর ভবিষ্যতেও সে কখনো এত বড় আশা মনে ঠাই দেয় নাই। তাহার বীষায়া ইহার পরে গ্রহণ করুক না করুক, কিন্তু আজ যে ইহার সরকারী আদালতের বাহিরে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে পথ হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বৃক ভরিয়া আনন্দপ্রসূত ছুটাইয়া দিল। যদিও বেশি কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি ক্ষুদ্র বিবাদের কথা, কিন্তু এই দুই কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিত্তের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির জন্য ভবিষ্যতে সে কি স করিতে পারিবে তাহার কোথাও কোনো হিসাব-নিকাশ, কুল-কিনারা রহিল না। বাহিরে বসন্ত াথ্যের আকাশ ভাসিয়া বাইতেছিল, সেমিকে হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অন্য কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গে ই তাহার সর্বদা জ্বালা করিয়া উঠিত। কিন্তু আজ জ্বালা করা ত দূরের কথা, কোথাও সে এককিছু উজ্জ্বলের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমাকে এমন সার্থক করে তুলবেন, তোমার বিশ্ব আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হয়ে উঠবে, এ যদি তুমি জানতে রমা, বোধ করি কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না।—কে গা?

আমি মাথা, ছোটবাবু! রমাবিনী অতি অশিষ্ট করে একবার সেখ দিতে বলতেন।

রমা সাক্ষ্য করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে। রমেশ অবাক হইয়া রহিল। আজ এ কোন নটবুদ্ধি-দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাসৃষ্টি কৌতুক করিতেছে—

দাসী কহিল, একবার দয়া করে যদি ছোটবাবু—

কোথায় তিনি?

ঘরে গুয়ে আছেন। একটু থামিয়া কহিল, কাল ত আর সময় হয়ে উঠবে না; তাই এখন যদি একবার—

আজ্ঞা চল বই, বলিয়া রমেশ উঠিয়া পাড়িয়া।

ভাসিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিভ্রান্ত পড়িয়াছিল। দাসীর নির্দেশমত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া একটা টোকা গুলিয়া লইয়া বসিতেই সে সুন্দরম্নর যেন মনের জোরেই নিজেকে

টানিয়া আনিয়া রমেশের পদদ্বয়ে নিক্ষেপ করিল। ঘরের অস্পষ্ট আকারে রমার বস্তুটুকু দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার পারীক্ষিক অবস্থার কিছু জানিতে পারিল না। এইমাত্র পথে আসিতে আসিতে সে যে রকম সম্ভব মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্বন্ধে বসিয়া তাহার আগাণোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটুখানি চূপ করিয়া থাকিয়া সে কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছ রাণী?

রমা তাহার পায়ের গোড়া হইতে একটুখানি সরিয়া বসিয়া কহিল, আমাকে আপনি রমা বলেই ডাকবেন।

রমেশের পিঠে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। সে একমুহুর্তেই কঠিন হইয়া কহিল, বেশ তাই। শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে—এখন কেমন আছ তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। নইলে নাম যাই হোক, সে ধরে ডাকবার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।

রমা সমস্ত বুঝিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন আমি ভাল আছি।

তার পরে কহিল, আমি ডেকে পাঠিয়েছি বলে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েছেন, কিন্তু—

রমেশ কথার মাঝখানেই তীব্রভাবে বলিয়া উঠিল, না হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

কথাটা রমার বুকে যে কত বড় শেলাঘাত করিল তা রমেশ জানিতে পারিল না। সে যেরূপ নতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেছি। আর তোমার কাছে কত অপরাধ যে করেছি, সে ত আমি জানি। কিন্তু তবু আমি নিশ্চয়ই জানতাম, তুমি আসবে আর আমার এই শেষ অনুরোধও অস্বীকার করবে না।

অকস্মাতে সহসা তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে রমেশ টের পাইল এবং চক্ষের নিম্নে তাহার পূর্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এত আঘাত-প্রতিঘাতও সে স্নেহ যে আঁকিও মরে নাই, শুধু নির্জীব অচেতন্যের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়া সে নিজেও প্রাক্তন বিশ্রান্ত হইয়া গেল। কলকাল চূপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, কি তোমার অনুরোধ?

রমা চাকিতের মত মুখ তুলিয়াই আবার অবনত করিল। কহিল, যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্ছেন, সেটা আমার নিজের অর্থাৎ আমার পেনের আনা, তোমাদের এক আনা; সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ পুনর্বার উচ্চ হইয়া উঠিল। কহিল, তোমার ভয় নেই, আমি চুরি করতে পূর্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি করতেই চাও—তার জন্যে অন্য লোক আছে—আমি দান গ্রহণ করিনে।

পূর্বে হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, মুখ্যোদের দান গ্রহণ করার ঘোষালদের অপমান হয় না। আজ কিন্তু একথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল, আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিজেও যে তুমি নিজের জন্যে নেবে না সেও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। সোব করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেছি, এটা তারই জরিমানা বলে কেন গ্রহণ কর না।

রমেশ কলকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?

রমা কহিল, আমার বতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাতে তোমার মত করে মানুষ। ক'রো। বড় হয়ে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে বার্ষিক্যাগ করতে পারে।

রমেশের চিন্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল। রমা অঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, এ আমার চোখে দেখে বাবার সময় হবে না; কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি বতীনের দেহে তার পূর্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ করবার যে শক্তি তার অহিন্দ্রজ্ঞান মিশিয়ে আছে শেখালে হয় ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উচু করে দাঁড়াবে।

রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার কোন উত্তর দিল না—জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নাবিহীন আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরটা এমন একটা ব্যথার ভরিয়া উঠিতেছিল, তাহার সহিত কোনদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বহুকাল নিঃশব্দে কাটার পরে রমেশ মুখ ফিরাইয়া কহিল, দেখ, এ সকলের

মধ্যে আর আমাকে টেন না। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের পর একটুখনি আলোর শিখা ছালাতে পেরেছি; তাই আমার কেবল ভয় হয় পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা কহিল, আর ভয় সেই রমেশনা, তোমার এ আলো আর নিবেবে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূরে থেকে এসে বড় উঠতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধাবিল্লি পেয়েচ। আমরা নিজেরের দুঃখের ভাবে তোমাকে নাখিয়ে এসে এখন ঠিক জামগাটিতেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে পঁকিয়েচ বলেই তোমার ভয় হচ্ছে; আগে হলে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাই পেত না। তখন তুমি গ্রাম্যসমাজের অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার স্নান হবে না—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সহসা জ্যাঠাইমার নাচের রমেশ উল্লীত হইয়া উঠিল; কহিল, ঠিক জানো কি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?

রমা দুঃকণ্ঠে কহিল, ঠিক জানি। যিনি সব জানেন এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে আজ আশীর্বাদ করে আমাকে বিদায় দাও রমেশনা, আমি যেন নিশ্চিত হয়ে যেতে পারি।

বহুশ্রম মেঘের মত রমেশের বুকের ভিতরটা ফলে ফলে চমকিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সেমাথা হেঁট করিয়া শুক হইয়া বলিয়া রহিল। রমা কহিল, আমার এক একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে: বল রাখবে?—রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল, কি কথা?

রমা বলিল, আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন ঝগড়া করো না।

রমেশ কুণ্ঠিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে!

রমা কহিল, মানে যদি কখনও শুনেচ পাও, সেদিন শুধু এই কথাটি মনে করো, আমি কেমন করে নিশ্চিন্দে সত্য করে চলে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন, মা, মিথ্যাকে পঁটাখাঁটি করে জানিয়ে তুললেই তাব পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিবৃত্য তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অজই আছে; তাঁর এই উপদেশটি মনে রেখে আমি সকল দুঃখ-দুর্ভাগাই কাটিয়ে উঠেছি—এটি তুমিও কোনদিন ভুলো না রমেশনা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা কপেক পরে কহিল, আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না মনে করে দুঃখ করো না রমেশনা! আমি নিশ্চরই জাতি, আজ যা কঠিন বলে মনে হচ্ছে একদিন তাহি সোজা হয়ে যাবে, সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন দ্রোণ নেই। কাল আমি বাচি।

কাল! রমেশ বিস্মিত, হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে কাল?

রমা কহিল, জ্যাঠাইমা কোথানে নিয়ে যাবেন আমি সেইখানেই যাব।

রমেশ কহিল, কিন্তু তিনি ত আর কিরে আসবেন না শুনিচি।

রমা ধীরে ধীরে বলিল, আমিও না আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি।

এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আজ যাও। কিন্তু কেন বিদায় চাইচ সেও কি জানতে পারব না?

রমা মৌন হইয়া রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল, কেন যে তোমার সম?—তুমি লুকিয়ে রেখে চলে গেলে সে তুমিই জানো। কিন্তু আমিও কালমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্বাভ্যবসানেই ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে পারার যে আমার কি কথা, সে শুধু আমার অন্তর্ভাবমিই জানেন।

রমার দুই চোখ বহিয়া কঁকরু করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই অভ্যস্ত মৃদু আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিশ্চিন্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রশ্ন করিল এবং পক্ষকণ্ঠে রমেশ যার হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজকর্ম উৎসাহ যেন এক নিমেষে এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট ছায়ায়

হইয়া গেছে।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ বাড়িতে আসিয়া বন্ধন উপহিত হইল ভ্রমণ বিবেচনী দ্বারা করিয়া পাঠিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ তারের কাছে মুখ লইয়া অন্ধ-ভাষ্যস্বরূপে কহিল, কি অপরাধে আমারে এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে জ্যাঠাইমা?

বিবেচনীর ডান হাত বাড়িয়া রমেশের মাথার রক্তিয়া বলিলেন, অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা! তাকে কাজ নেই। তার পরে বলিলে, এখানে যদি ছবি রমেশ, বেশী আমার মুখে আভাস দেবে। সে হলে ত কোনমতেই ক্ষুধি পাব না। ইহকালটা ত স্থলে-স্থলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি স্থলে পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালটি রমেশ।

রমেশ বহুদূরতর দৃষ্টি ছাড়িত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথাই সে জ্যাঠাইমার মুকের ভিতরটার অনবীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল এমন আর কোনরূপ পার নাই। কিছুকাল স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, রজা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?

বিবেচনীর একটা প্রবল বাস্পোচ্ছ্বাস বেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংসারে তার যে স্থান নেই ববা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাকি। সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা-জীবন ধরে এই অজান্তে কতিন এমনই সীমালো করতে অনুস্রোহ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা গ্রাম নিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা কিনা গোবে এই দুঃখের বোঝা মাথার নিয়ে আমার সংসারের বাইরে কেলে দিলেন! এ কি অর্ধপূর্ব মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমারে খেয়ালের খেলা। ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই। বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

রমেশ ভক্ত হইয়া বলিয়া রহিল। বিবেচনীর একটু পরেই কহিলেন, কিন্তু তোর ওপর আমার এই আশ্রয় রইল রমেশ, তাকে তুই কেন তুল বুঝিল সে। দাবার সময় আমি কামে বিরুদ্ধে কোন নতিল ক'রে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই তুলেও কখনও অবিরাল করিল সে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী তোর আর কেউ নেই।

রমেশ বলিতে গেল, কিন্তু জ্যাঠাইমা—

জ্যাঠাইমা, তাড়াতাড়ি বাবা নিয়া বলিলেন, এর মধ্যে কোন কিছু নেই রমেশ। তুই বা তনেচিস সব মিথ্যে, বা তনেচিস সব তুল। কিন্তু এ অভিযোগের এইখানোই বেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ বেন সমস্ত অমায়, সমস্ত হিংসা-বিষহকে সম্পূর্ণ তুলছ ক'রে তিরসিক এমনি প্রবল হয়ে বয়ে যেতে পারে, এই তোর ওপর তার শেষ অনুস্রোহ। এইজন্যই সে মুখ মুখে সমস্ত সত্য বলে গেছে। গ্রন-বিত্তে বসেচে রে রমেশ, তবু কথা করনি।

পত্ন্যরো রমার নিজের মুখের দুই-একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্বল রোগনের বেশ কেন গুণ্ড পর্বত তৈলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া গ্রনপন শব্দেতে বলিয়া কেলিল, তাকে ব'লো জ্যাঠাইমা, তাই হবে। বলিরই হাত বাড়িয়া কোনমতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বহির হইয়া গেল।



চন্দ্রনাথ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের শিক-জাহাজের ঠিক পূর্বের দিন কি একটা কথা লইয়া তাহার বুড়া মশিনের মুখোপাখ্যারের সহিত তাহার মনোভার হইয়া গেল। তাহার ফল এই হইল যে, পরদিন মশিনের উপস্থিত থাকিয়া তাহার অগ্রজের পারসৌকিক সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন, কিন্তু একবিন্দু আহাৰ্য স্পর্শ করিলেন না, কিংবা নিজের বাটীর কাছাকাড় স্পর্শ করিতে দিলেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজনাভ্যে চন্দ্রনাথ করজোড়ে কহিল, কাকা, সোম করি, অপরাধ করি, আপনি আমার শিকতুল্য, আমি আপনার মেষের মতো—এবার হার্ননা কক্ষম।

শিকতুল্য মশিনের উত্তরে বলিলেন, বাবা, তোমারা কলকাতার থেকে বি. এ., এম. এ. পাশ কর রে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়েছো, আমরা কিন্তু সেকালের মূৰ্খ, আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিশ খাবে না। এই দেখ না কেন, পান্ডুকারেরাই বলেছেন, যেমন, গোড়া কেটে আগায় তল ঢালা।

পান্ডুর বচনটির সহিত আধুনিক পণ্ডিত ও সেকালের মূৰ্খের বনিতি সম্বন্ধ না থাকিলেও মশিনের যে নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, বুড়ার সহিত আর সে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। আর পিতার জীবদ্দশাতেও দুই সহোদরের মধ্যে ছন্দাতা ছিল না। কিন্তু আহাৰ্য-ব্যবহারটা ছিল। এখন সেইটা বন্ধ হইল। চন্দ্রনাথের পিতা যথেষ্ট ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাটীতে আত্মীয়-বন্ধন কেহ নাই, শুধু এক অপূত্রক মাতুল এবং দ্বিতীয় পক্ষের মাতুলানী।

সমস্ত বাড়িটা যখন বড় ঠাণ্ডা ঠেকিল, চন্দ্রনাথ তখন বাটীর গোমস্তাকে ডাকিয়া কহিল, সরকারমশায়, আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাব, আপনি বিষয়-সম্পত্তি যেমন দেখছিলেন, তেমন দেখবেন। আমার ফিরে আসতে বোধ করি বিলম্ব হবে।

মাতুল ব্রজকিশোর তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন তোমার খাও গিয়ে কাজ নেই; তোমার মন খারাপ হয়ে আছে, এ সময় বাটীতে থাকাই উচিত।

চন্দ্রনাথ তাহা ওনিল না। বিষয়-সম্পত্তির সমুদয় তার সরকার মহোদয়ের উপর দিয়া, এবং বসন্ত-বাটীর তার ব্রজকিশোরের উপর দিয়া অতি সামান্যভাবেই সে বিদেশ-যাত্রা করিল। যাইবার সময় একজন ডুডাকেও সঙ্গে লইল না।

ব্রজকিশোরকে নিভৃত ডাকিয়া তাহার স্ত্রী হরকালী বলিল, একটা কাজ করলে না?

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজ?

এই যে বিদেশে গেল, একটা কিছু লিখে নিলে না কেন? মানুষ কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। যদি বিদেশে ভালমন্দ হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, তখন তুমি পাঁড়াবে কোথায়?

ব্রজকিশোর কানে আঙুল দিয়া ভিত কাটিয়া কহিলেন, হি, হি, এমন কথা মুখে এনো না।

হরকালী রাগ করিল। কহিল, তুমি বোকা, তাই মুখে স্নানতে হইয়েছে; যদি পেটানো হ'ত, আমাকে মুখে আনতে হ'ত না।

কিন্তু কথাটা যে ঠিক, তাহা ব্রজকিশোর স্ত্রীর কৃপায় দুই-চারি দিনেই বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর চন্দ্রনাথ সন্না হানে একা জমণ করিয়া বেড়াইল। তাহার পর গরায় আসিয়া বঙ্গীর শিকড়ের সাংবাদেরিক শিওরান করিল, কিন্তু তাহার বাটী কিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না—মনে করিল, কিছুদিন কাশীতে অভিবাহিত করিয়া বাহা হয় করিবে। কাশীতে মুখোপাখ্যার বংশের পাভা

হরিদয়াল ঘোষাল। চন্দ্রনাথ একদিন দ্বিপ্রহরে একটি কাষিসের ব্যাগ হাতে লইয়া তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশী চন্দ্রনাথের অপরিচিত নহে, ইতিপূর্বে কয়েকবার সে পিতার সহিত এখানে আসিয়াছিল। হরিদয়ালও তাহাকে বিলম্ব চিনিতেন। অকস্মাৎ তাহার এরূপ আগমনে তিনি কিছু বিমিত্ত হইলেন। উপরের একটা ঘর চন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট হইল, এবং ইহাও স্থির হইল যে, চন্দ্রনাথের যতদিন ইচ্ছা তিনি এইখানেই থাকিবেন।

এ কক্ষের একটা জানালা দিয়া ভিতরের রন্ধনশালার কিয়দংশ দেখা যাইত। চন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত অনেক সময় এইদিকে চাহিয়া থাকিত। রন্ধন-সামগ্রীর উপরেই যে আগ্রহ তাহা নহে, তবে রন্ধনকারীগকে দেখিতে বড় ভাল লাগিত।

বিধবা সুন্দরী। কিন্তু মুখখানি যেন দুঃখের আওনে দগ্ধ হইয়া গেছে! যৌবন আছে কি গিয়াছে, সেও যেন আর চোখে পড়িতে হে না। তিনি আপন মনে আপনার কাজ করিয়া যান, নিকটে কেবল একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিতে থাকে। চন্দ্রনাথ অতৃপ্তনয়নে তাহাই দেখে।

কিছুদিন তিনি চন্দ্রনাথের সম্মুখে বাহির হইলেন না। আহার্য সামগ্রী ধরিয়া দিয়া সরিয়া যাইতেন। কিন্তু ক্রমশঃ বাহির হইতে লাগিলেন। এতে ত চন্দ্রনাথ বয়সে ছোট, তাহাতে এক স্থানে অধিক দিন ধরিয়া থাকিলে একটা আত্মীয়-ভাব আসিয়া পড়ে। ওখন তিনি চন্দ্রনাথকে বাওয়াইতে বসিতেন—জননীর মত কাছে বসিয়া যত্নপূর্বক আহার করাইতেন।

আপনার জননীর কথা চন্দ্রনাথের স্মরণ হয় না—চিরদিন মাতৃহীন চন্দ্রনাথ পিতার নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিল। পিতা সে স্থান কতক পূর্ণ রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এরূপ কোমল স্নেহ তথায় ছিল না।

পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রনাথের বৃকের যে অংশটা খালি পড়িয়াছিল, শুধু তাহাই পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, অভিনব মাতৃস্নেহ-রসে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

একদিন চন্দ্রনাথ হরিদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নিজের বলিতে কেহ ত নাই বলিয়াই জানি, কিন্তু ইনি কে?—হরিদয়াল কহিলেন, ইনি বামুন-ঠাকরুন।

কোন আত্মীয়?

না।

তবে এদের কোথায় পেলেন?

হরিদয়াল কহিলেন, সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে বলতে হ'লে, ইনি প্রায় তিন বৎসর হ'ল স্বামী এবং ওই মেয়েটিকে নিয়ে তীর্থ করতে আসেন। কাশীতে স্বামীর মৃত্যু হয়। দেশেও এমন কোন আত্মীয় নেই যে ফিরে যান। তার পর ত দেখেছ।

আপনি পেলেন কিরূপে?

মলিকর্ণিকার ঘাটের কাছে মেয়েটি ভিক্ষে করছিল?

চন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কোথায় বাড়ি জানেন কি?

ঠিক জানি না। নবদ্বীপের নিকট কোন একটা গ্রামে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিন-দুই পরে তাহারে দেখিয়া চন্দ্রনাথ বামুন-ঠাকরুনের মুখের পানে চাহিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোন শ্রেণী?

বামুন-ঠাকরুনের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। এ প্রশ্নের হেতু তিনি বুঝিলেন। কিন্তু যেন ওনিতে পান নাই, এই ভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাই দুখ আমি গে।

দুখের জন্য অত তাড়াতাড়ি ছিল না। ভাবিবার জন্য তিনি একেবারে রন্ধনশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কন্যা সরস্বতী হাতা করিয়া দুখ চালিতেছিল, জননীর বিবর্ণ-মুখ লক্ষ্য করিল না। জননী কন্যার মুখপানে একবার চাহিলেন, দুখের বাটি হাতে লইয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, হে দীন-দুঃখীর প্রতিপালক, হে অস্বর্গ্যমী, তুমি আমাকে মার্জনা করো।

ভাহার পর দুখের বাণী আনিয়া নিকটে রাখিয়া উপবেশন করিলে চন্দ্রনাথ পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। একটি-একটি করিয়া সমস্ত কথা জানিয়া লইয়া চন্দ্রনাথ অশেষে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়ি যান না কেন? সেখানে কি কেউ নেই?

খেতে দেয় এমন কেউ নেই।

চন্দ্রনাথ মুখ নীচ করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, আপনার একটি কন্যা আছে, তার বিবাহ কিরূপে সোবন?

বামুন-ঠাকরুন দীর্ঘনিশ্বাস চালিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবেচন্য জানেন।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, ভাল করি আপনার মেয়েটিকে কখন দেখিনি,—হরিন্দ্রিয়াল বলেন খুব শাও-শিষ্ট। দেখতে সুন্দরী কি?

বামুন-ঠাকরুন ঈর্ষ হসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, আমি মা, মায়ের চক্কে ত বিশ্বাস নেই বাবা; তবে সরযু বোধ হয় কুৎসিত নয়। কিন্তু মনে মনে বলিলেন, কাশীতে কত লোক আসে যায়, কিন্তু এত রূপ ও কারও দেখিনি।

ইহার তিন-চারি দিন পরে একদিন প্রভাতে চন্দ্রনাথ বেশ করিয়া সরযুকে দেখিয়া লইল। মনে হইল, এত রূপ আর জগতে নাই। রামায়ণে বসিয়া সরযু তরকারি কুটিতেছিল। সেখানে অপর কেহ ছিল না। জননী গম্ভীরভাবে গিয়াছিলেন, এবং হরিন্দ্রিয়াল যথানিয়মে যাত্রীর অধেষণে বাহির হইয়াছিলেন।—চন্দ্রনাথ নিকটে ঈর্ষাইল। ভাবিল, সরযু।

সরযু চমকিত হইল। জড়সড় হইয়া বলিল, আরো?

তুমি ঈর্ষাতে পড়ো?

সরযু মাথা নাড়িয়া কহিল, পারি।

কি কি ঈর্ষাতে লিপ্ত?

সরযু চুপ করিয়া রহিল। কেননা, পরিচয় দিতে হইলে অনেক কথা কহিতে হয়।

চন্দ্রনাথ মনের ভারটা দূরিতে পারিলেন তাই অন্য প্রশ্ন করিল, তোমার মা ও তুমি দুই জনেই এখানে কাজ কর? তা পান, আমি পাই নো আমি শুধু খেতে পাই।

খেতে পেলেই তুমি কাজ কর?

সরযু খাড়া নাড়িয়া বলিল, করি।

তুমি কত মাইনে পও?

সরযু চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, মনে কর, আমি যদি খেতে সিঁই, তা হ'লে আমারও কাজ কর?

সরযু ধীরে ধীরে বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করব।

তাই করো।

সেদিন চন্দ্রনাথ হরিন্দ্রিয়াল চাকরকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে সরকার মহাশয়কে এইরূপ পত্র লিখিল—

আমি কাশীতে আছি। এখানে এই মাসের মধ্যেই বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি। মাওল মহাশয়কে এ কথা বলিবেন এবং আপনি কিছু অর্থ, অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া শীঘ্র আসিবেন।

সেই মাসেই চন্দ্রনাথ সরযুকে বিবাহ করিল।

ভাহার পর বাড়ি যাইবার সময় আসিল। সমস্ত কাঁদিয়া বলিল, মার কি হবে?

আমাদের সঙ্গে যাবেন।

কথাটা বামুন-ঠাকরুনের কানে গেল। তিনি কন্যা সরযুকে নিভৃত ডাকিয়া বলিলেন, সরযু, সেখানে গিয়ে তুমি আমার কথা মাঝে মাঝে মনে করিস, কিন্তু আমার নাম কখনো মুখে আনিস না। যত দিন ঈর্ষা কাশী ছেড়ে কোথাও যাব না। তবে যদি কখনো তোমাদের এ অঞ্চলে আসা হয়, তা হ'লে আমার দেখা হ'তে পারে।

সরযু কানিতে লাগিল।

জননী তাহার মুখে অঞ্চল নিয়া কান্না নিবারণ করিলেন, এবং গভীর হইয়া কহিলেন, বাছা, সব জেনেওনে কি কীদতে আছে?

কন্যা জননীর কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ডাকিল, মা—

তা হোক। মায়ের জন্য যদি মাকে ভুলতে হয়, সেই ত মাতৃভক্তি মা!

চন্দ্রনাথ অনুরোধ করিলেও তিনি ইহাই বলিলেন। কান্দী ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইতে পারিবে না।

চন্দ্রনাথ বলিল, একান্ত যদি অন্যত্র না যাবেন, তবে অন্ততঃ স্বাধীনভাবে কান্দীতে বাস করুন।

বামুন-ঠাকরুন তাহাও অস্বীকার করিয়া বলিলেন, হরিদয়াল ঠাকুর আমাকে মেয়ের মত যত্ন করেন এবং নিত্যই দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমিও তাঁকে পিতার মত ভক্তি করি; তাঁকে কিছুতেই ত্যাগ করণে পারব না।

চন্দ্রনাথ বুঝিল, দুঃখিনীর আত্মসম্মত বোধ আছে, সাধ করিয়া তিনি কাহারও দয়ার পাত্রী হইবেন না। কাজেই তখন শুধু সরযুকে লইয়া চন্দ্রনাথ বাটা ফিরিয়া আসিল।

এখানে আসিয়া সরযু দেখিল, প্রকাণ্ড বাড়ি! কত গৃহসজ্জা, কত আসবাব—তাহার আর বিশ্বাসের অবধি রহিল না। সে মনে মনে ভাবিল, কি অনুগ্রহ! কত দয়া!

চন্দ্রনাথ বালিকা বধূকে আদর করিয়া কহিল, বাড়িঘর সব দেখলে? মনে ধরেছে ত?

সরযু অত্যন্ত কৃত্তিত হইয়া আঁচলে মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িল।

চন্দ্রনাথ স্ত্রীর মনের কথা বুঝিতে চাহে নাই; প্রত্যক্ষের কষ্টের গুণিতে চাহিয়াছিল, তাই দুই হাতে সরযুর মুখখনি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কি বল, মনে ধরেছে ত?

লজ্জায় সরযুর মুখ আরক্ত হইয়া গেল, কিন্তু স্বামীর পুনঃপুনঃ প্রশ্নে কোনরূপে সে বলিয়া ফেলিল, সব তোমার?

চন্দ্রনাথ হাসিয়া কথটা একটু ফিরাইয়া বলিল, হাঁ, সব তোমার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার পর কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সরযু বড় হইয়াছে। স্বামীকে সে কত যত্ন করিতে শিখিয়াছে। চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারে যে, সে কথা কহিবার পূর্বেই সরযু তাহার মনের কথা বুঝিয়া লয়। কিন্তু সে যদি শুধু দাসী হইত, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব বুজিয়াও চন্দ্রনাথ এমন আর একটি দাসী পাইত না, কিন্তু শুধু দাসীর জন্যই কেহ বিবাহ করে না—স্ত্রীর নিকট আরও কিছুই আশা রাখে। মনে হয়, দাসীর আচরণের সহিত স্ত্রীর আচরণটি সর্বতোভাবে মিলিয়া না গেলেই ভাল হয়। সরযুর ব্যবহার বড় নিরীহ, বড় মধুর, কিন্তু দাম্পত্যের সুনিবিড়-পরিপূর্ণ সুখ কিছুতেই যেন গড়িয়া তুলিতে পারিল না। তাই এমন মিলনে, এত যত্ন-আদরেও উভয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব, একটা অন্তরাল কিছুতেই স্রিতে চাহিল না। একদিন সে সরযুকে হঠাৎ বলিল, তুমি এত ভয়ে ভয়ে থাক কেন? আমি কি কোন দুর্ব্যবহার করি?

সরযু মনে মনে ভাবিল, এ কথার উত্তর কি তুমি নিজে জানো না? তাহার পর ভাবিল, তুমি দেবতা, কত উচ্চ, কত মহৎ—আর আমি? সে তুমি আজও জানো না। তুমি আমার প্রতিপালক, আমি শুধু তোমার অধিনীতা। তুমি দাতা, আমি ভিক্ষারিণী।

তাহার সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তাই ভালবাসা মাথা ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না,—অন্তঃসলিলা যক্ষুর মত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া বহিতে থাকে, উজ্জ্বল হইতে পার না—তেমনি অবিজ্ঞান বহিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহার সজ্ঞান পাইল না—অতি বড় দুর্ভাগ্যের বেমন জীবনের মাঝে ভগবানকে বুঝিয়া পার না। কিন্তু আজ অকস্মাৎ উজ্জ্বল দীপালোকে যখন সে দেখিতে পাইল, পঙ্কের মত ডাগের সরযুর চক্ষু দুটিতে অন্ধ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তখন কাতর হইয়া সহসা তাহাকে সে কাছে টানিয়া লইল। বুকের উপর মুখ লুটাইয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ কহিল, থাক, ওসব কথাই আর কাজ নেই—বলিয়া দুই হাতে স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিল, মুদিত চক্কের উপর সরযু

একটা তপ্ত-নিশ্বাস অনুভব করিল।

সরয্বর চোখের পাতা দুইটি আকুলভাবে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল, সে কিছুতেই চাইতে পারিল না।—কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রনাথ কহিল, তোমার বড় ভয়, তাই চাইতে পারলে না সরযু। কিন্তু পারলে ভাল হ'ত, না হয়, একটা কাজ করো, আমার শুমন্ত মুখ ভাল করো চেয়ে দেখো—এ মুখ ভয় করবার মত কিছু নেই। বৃকে গুয়ে আছে, ভিতরের কথাটা কি শুনতে পাও না? তাই বড় দুঃখ হয় সরযু—আমাকে তুমি বুঝতেই পারলে না।

তবু সরযু কথা কহিতে পারিল না, শুধু মনে মনে স্বামীর চরণে প্রশ্রয় করিয়া কহিল, আমি পদাশ্রিতা দাসী, দাসীকে চিরদিন দাসীর মতই থাকিতে দিয়ো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের মাতুলানী হরকালীর মনে আর তিলমাত্র সুখ রহিল না। ভগবান তাহাকে এ কি বিভ্রমনার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এ সংসারটা কাহারো নিকট কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মত বোধ হয়, তাহাদের চেষ্টা করিয়া এখানে একটা পথের সন্ধান করিতে হয়। কেহ পথ পায়, কেহ পায় না। অনেক দিন হইতে হরকালীও এই সংসার-কাননে একটা সংক্ষেপ-পথ খুঁজিতেছিল, চন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুতে একটা সুরাহাও হইয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক বিবাহ, নধু সবযু, চন্দ্রনাথের অতিরিক্ত পঙ্ক্যপ্রেম, তাহার এই পাণ্ডুয়া-পথের মুখটা একেবারে পাষাণ দিয়া যেন গাঁথিয়া দিল। হরকালীর একটি বছর পাঁচকের বোনঝি পিতৃ-দুঃখ বড় হইয়া অজ্ঞান বড়বোটি হইয়াছে। কিন্তু সে কথা যাক। নানা কারণে হরকালীর মনেব সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

অবশ্য আজও সে-ই গৃহিনী, তাহার স্বামী কর্তা—এ সমস্ত তেমনি আছে। আজ পর্যন্ত সবযু তাহাই মুখ চাহিয়া থাকে, কোন অসন্তোষ বা অভিমান প্রকাশ করে না। দেখিলে মনে হয়, সে এই পরিবারভূক্ত একটি সামান্য পরিজন মাত্র। হরকালীর স্বামী এইটুকু দেখিয়াই খুশী হইয়া যেই বলিতে যান—বৌমা আমার যেন—, হরকালী চোখ বাগ্না করিয়া ধমক দিয়া বলিয়া উঠে, চুপ কর, চুপ কর। যা বোধ না, তাতে কথা কয়ো না। তোমার হাতে দেওয়ার চেয়ে বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে ভাল ফেলে দিলে ছিল ভাল।

বুড়কিশোর মুখ কালি করিয়া উঠিয়া যান।

হরকালীর বয়স প্রায় ত্রিশ হইতে চলিল, কিন্তু সরযুর আজও পঞ্চদশ উত্তীর্ণ হয় নাই—তবু তাহার আসা অবধি দুই জনেব মনে মনে যুদ্ধ বাধিয়াছে। প্রশংসা করিয়াও হরকালী ভয়ী হইতে পারে না। এককোটা মেয়ের লজ্জা দেখিয়া হরকালী মনে মনে অস্বস্তি হয়। বাহিরের লোক এ কথা জানে না যে, এই অস্তব-যুদ্ধে সবযু ভিক্রি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা জারি করে নাই। নিজের ভিক্রি নিজে তামাদি করিয়া বিক্রিত অংশ তাহাকেই সে ফিবেইয়া দিয়াছে এবং এখানেই হরকালীর একেবারে হার হইয়াছে।

হরকালী বুঝিতে পারে, সরযু বোবা কিংবা হাবা নহে। অনেকগুলি শব্দ কথারও সে এমন নিরুত্তর অবনতমুখে উত্তর দিতে সমর্থ যে, হরকালী একেবারে ভুজ্বিত হইয়া যায়, কিন্তু না পারিল সে এই মেয়েটির সহিত সন্ধি করিতে, না পারিল তাহাকে জয় করিতে। সরযু যদি কলহ-প্রিয় মুখরা হইত, স্বার্থপর নির্মম হইত, তাহা হইলেও হরকালী হয়ত পথ খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু সরযু নিজ হইতে এতখানি ককণা তাহাকে দিয়া রাখিয়াছে যে, হরকালী অপরের ককণা ভিক্ষা কারবারে বাক্য বাক্য পায় না। সরযু অন্তরে সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারে যে, এ বাটীর সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী, হরকালী কেহ না, তাই বাহিরে সে কেহ না হইয়া হরকালীকেই সর্বময়ী করিয়াছে। ইহাতেই হরকালী আরও চরিত্র জুলিয়া পুড়িয়া মরে।

শুধু একটি স্থান সরযু একেবারে নিজের জন্য বাধিয়াছিল, এখানে হরকালী কিছুতেই প্রবেশ করিতে পায় না। স্বামীর চতুষ্পাশ্বে সে এমন একটি সুস্থ দাগ টানিয়া বাধিয়াছে যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে, আর কেহ চন্দ্রনাথের শরীরে আঁচড়টিও কাটিতে পারে না। এই দাগের বাহিরে হরকালী যাহা ইচ্ছা করুক, কিন্তু ভিতরে আসিবার অধিকার ছিল না। বুড়িমতী হরকালী বেশ

বুঝিতে পারে যে, এই একফোঁটা মেয়েটি কোন্ এক মায়ামন্ত্রে তাহার নখদন্তের সমস্ত বিষ হরণ করিয়া লইয়াছে। এমনি করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর গত হইল। সে এগারো বছর বয়স স্বামীর ঘর করিতে অসিয়াছিল, সতরোয় পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়সের সম্মান-জ্ঞানটা যেমন পুরুষের মধ্যে আছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তেমন নাই। পুরুষের মধ্যে অনেকগুলি পর্যায় আছে—যেমন দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট প্রভৃতি। ত্রিশবর্ষীয় একজন যুবা বিশ বছরের যুবাব প্রতি মুকুন্ডিয়ানার চোখে চাহিয়া দেখিতে পারে, কিন্তু মেয়েমহলে এটা খাটে না। তাহার বিবাহকালটা পর্যন্ত বড় ভাগিনী, ভ্রাতৃজায়া, জননী, পিসীমা অথবা ঠাকুরমাতার নিকট অল্পস্বল্প উৎসর্গ করি করে, নাই-জীবনে যাহা কিছু অল্পবিস্তর শিখিবার আছে, শিখিয়া লয়;— তাহার পরই একেবারে প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়া বসে। তখন যোল হইতে ছায়ায় পর্যন্ত তাহার সমবয়সী। স্নানভেদে হয়ত বা কোথাও এ নিয়মেব সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এমনি। অস্ত্রতঃ, চন্দ্রনাথের গ্রাম-সম্পর্কীয়া ঠানদিদি হরিবালার জীবনে এমনটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে পশ্চিমদিকের জানালা খুলিয়া দিয়া সরযু আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হরিবালা এক থালা মিষ্টান্ন এবং একগাছি মেটা ঘুইয়ের মালা হাতে নইয়া একেবারে সরযুর নিকট অসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালাগাছটি তাহাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, আজ থেকে তুমি আমার সই হ'লে। বল দেখি সই—

সরযু একটু বিপন্ন হইল। তথাপি অল্প হাসিয়া কহিল, বেশ।

বেশ ত নয় দিদি, সই ব'লে ডাকতে হবে।

ইহাকে আদরই বল, আর আবদারই বল, সবযুব ভীতনে ঠিক এমনটি ইতিপূর্বে ঘটিয়া উঠে নাই। তাই এই আকস্মিক আত্মীয়তাকে সে মনের মধ্যে মিলিয়া নইতে পারিল না। একদিকে একজন দিদিমার বয়সী লোকের গলা ধরিয়া 'সই' বলিয়া আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা কবিতো লাগিল, কিন্তু হরিবালা যে ছাড়েন না। ইহাতে অভিনবত্ব কিংবা অস্বাভাবিকতা যে কিছু থাকিতে পারে, হরিবালার তাহা ধারণায় নাই। তাই সরযুর মুখ হইতে প্রিয়-সম্বোধনটির বিনম্র দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইলে, একটু স্নান হইয়া তিনি কহিলেন, তবে আমার মালা ফিবিয়া দাও, আমি আর কোথাও যাই।

সরযু বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপ্রতিভ হয় নাই, ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সইয়ের সন্ধানে নাকি?

ঠানদিদি একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, বাঃ! এই যে বেশ কথা কও। তবে যে লোকে বলে, ওদের বৌ বোবা!

সরযু হাসিতে লাগিল।

ঠানদিদি বলিলেন, তা শোন। এ গায়ে তোমার একটিও সাথী নাই। বড়লোকের বাড়ি ব'লেও বটে, তোমার মায়ীর বচনের শৃংগেও বটে, কেউ তোমার কাছে আসে না, জানি। আমি তাই আসব। আমার কিন্তু একটা সম্পর্ক না হ'লে চলে না, তাই আজ 'সই' পাতালুম। আর বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু হরিবামের মালা নিয়েও সারা দিনটা কাটাতে পারি না। আমি রোজ আসব।

সরযু কহিল, রোজ আসবেন।

হরিবালা গজিয়া উঠিলেন, আসবেন কি লা? বল সই, তুমি রোজ এস। 'তুই' বলতে পারাব না, না?

সরযু হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, রক্ষা কর ঠানদিদি, গলায় ছুরি দিলেও তা পারব না।

ঠানদিদিও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, তা না হয় নাই বলিস। কিন্তু 'তুমি' বলতেই হবে। বল সই তুমি রোজ এস।

সরযু চোখ নীচু করিয়া সলজ্জহাস্যে কহিল, সই, তুমি রোজ এস।

হরিবালার যেন একটা দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, আসব।

পরদিন ইহতে হরিবালা প্রায়ই আসেন, শত-কর্ম থাকিলেও একবার হাজিরা দিয়া যান। ক্রমশঃ পাতালো সম্বন্ধ গাঢ় হইয়া আসিল। সময়ে সরযুও ভুলিল যে, হরিবালা তাহার সমবয়সী নহেন, কিংবা এই গলায় গলায় মেশামেশি সকলের কাছে তেমন সুন্দর দেখিতে হয় না।

এই অন্তরঙ্গতা হলকাপীর কেমন লাগিত বলিতে পারি না, কিন্তু চন্দ্রনাথের বেশ লাগিত। স্বীয় সহিত এ বিষয়ে প্রায়ই তাহার কথাবার্তা হইত। তানদিদির এই জদ্যতায় সে আমোদ বোধ করিত। আরও একটু কারণ ছিল। চন্দ্রনাথ ঠাঁয়ে বড় স্নেহ করিত; সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ভালবাসা না থাকিলেও স্নেহের অভাব ছিল না। সে মনে করিত, সকলের ভাগ্যেই একরূপ ঈর্ষা মিলে না। কাহানো বা স্ত্রী দাসী, কাহারো বা বন্ধু, কাহানো বা প্রভু। তাহার ভাগ্যে যদি একটি পূণ্যবতী, পবিত্রা, সাধনী এবং স্নেহময়ী দাসী মিলিয়াছে ত, সে অসুখা হইয়া কি লাভ করিবে? তাহার উপর একটা কথা প্রায়ই তাহার মনে হয়, সেটা সরযুর বিষয়। দিনের দুঃখের কাহিনী। শিশুকালটা তাহার বড় দুঃখেই অতিবাহিত হইয়াছে। দুঃখিনীর কন্যা হয়ত সারা-জীবনচঃ দুঃখেই কাটিত; হয়ত বা এতদিনে কোন দুর্ভাগ্য দুষ্টচরিত্রের হাতে পড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিত, না হয় দাসীবৃত্তি করিতে গিয়া শত মত্যাচার উৎপাতন সহ্য করিত; তা ছাড়া এত অধিক কাপ হৌবল লইয়া নববয়সের পথও দৃকই নাই।—তাহা হইল?

এই কথাটা মনে উঠিলেই চন্দ্রনাথ গভীর করুণায় সরযুর লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ভিজ্জাস করিত। আচ্ছা সরযু, আমি যদি তোমাকে না দেখতুম, যদি বিদে না করতুম, এতদিন তুমি কার কাছে থাকতে বল ত?

সরযু ভাবাবলত না। সে তবু সম্মুখ বৃক্কের কাছে সরিয়া আসিত। চন্দ্রনাথ সায়েতে তাহার মখের উপর হাত রাখিত। যেন সহস্র দিয়া মনে মনে বলিত, ভয় কি!

সরযু আরও কাছে সরিয়া আসিত—এসব কথাই সত্যি সে বড় ভয় পাইত। চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন তাহাকে বুকে ধরে টানিয়া লইয়া বলিত, ত' নয় সরযু, তা নয়। তুমি দুঃখের ঘরে গিয়ে কেন জমেছিলে, জান না? কিন্তু তুমি আমার ভদ্র-জন্মস্বরের পতিব্রতা হই! তুমি সংসারের যে-কোন ভয়গায় বাসে তান দিলে আমাকে যেতেই হইত। তোমার অকর্ষণেই যে আমি কাশী গিয়েছিলুম, সরযু!

এই সময় তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের স্রোত বহিয়া যাইত, সরযুর সমস্ত স্নেহ, প্রেম, যত্ন, ভক্তি এক কবিলেও বোধ করি তাহার ভুলনা হইত না। কিন্তু তৎসঙ্গেও দুঃখীকে দয়া করিয়া যে গর্ব, যে হৃপ্তি, বালিকা সরযুকে বিবাহ করিবার সময় একদিন দাস্যপ্রসাদের বিশেষ চন্দ্রনাথের নিভৃত-অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন শতচেষ্টাতেও চন্দ্রনাথ তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না। হৃদয়ের এক অজ্ঞাত অঙ্গকার কোণে আজও সে বাসা বঁধিয়া আছে। তাই, যখনই সেটা মখা তুলিয়া উঠিতে চায়, তখনই চন্দ্রনাথ সরযুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বাব বার বলিতে থাকে, আমি বড় আশ্চর্য হই সরযু, যাকে চিরদিন দেখে এসেচ, তাকে কেন আজও তোমার চিনতে বিলম্ব হচ্ছে! আমি তো তোমাকে কাশীতে দেখেই চিনেছিলুম, তুমি আমার! কত যুগ, কত কল্প, কত জন্ম-জন্ম ধরে আমার! কি জানি, কেন আলাদা হয়েছিলুম, আবার এক হয়ে মিলেছে এসেচি।

সরযু বুকের মধ্যে মুক লুকাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহে, কে বললে, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি?

উৎসাহের আতিশয্যে চন্দ্রনাথ সরযুর লজ্জিত মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলে, পেরেছ? তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে থাক? আমি ত কোন দুর্বাবহার করিনে—য আমার নিজের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি সরযু।

সরযু আবার স্বামীর বুকের মধ্যে মুক লুকাইয়া ফেলে। চন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করে, বল, কেন ভয় পাও সরযু? সরযু আর উত্তর দিতে পারে না। স্বামীকে স্পর্শ করিয়া সে মিথ্যা কথা কি করিয়া মুখে আনিবে? কি করিয়া বলবে যে, ভয় করে না? সত্যি যে তাহার বড় ভয়! সে যে কত সত্য, কত বড় ভয়, তাহা সে ছাড়া আর কে জানে?

তা ক'ণাটা কি বলিতেছিলাম? চন্দ্রনাথ হবিবালার আগমনে আমোদ বোধ করিত। সরযু একটি সম্বী পাইয়াছে, দুটা মনের কথা বলিবার লোক জুটিয়াছে—ইহাই চন্দ্রনাথের আনন্দের কারণ।

একদিন সরষু সমস্ত দুপুরটা হরিবালায় প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে মেঘ করিয়া টিপিটিনি বৃষ্টি পড়িতেছিল ; হরিবালা আসিলেন না। সরষু মনে করিল, জল পড়িতেছে, তাই আসিলেন না। এখন বেলা যায়-যায়, সমস্ত মিনিটা একা কাটিয়াছে, হরকাশীও আজ বাটী নাই। সরষু তখন সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পড়িবার ঘরে বসিয়া প্রবেশ করিল। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে এ ঘরটিতে কেহ প্রবেশ করিত না। সরষুও না। চন্দ্রনাথ বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, আজ বুঝি তোমার সই আসে নি ?

না।

তাই বুঝি আমাকে মনে পড়ছে ?

সরষু ঈষৎ হাসিল। ভাবটা এই যে, মনে সর্বদাই পড়ে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সরষু বলিল, জলের জন্য বোধ হয় আসতে পারেনি।

বোধ হয়, তা নয়। আজ কাকার ছোট্টমেয়ে নির্মলাকে আশীর্বাদ করতে এসেছে। শীঘ্রই বিয়ে হবে। তারই আয়োজনে ঠানদিদি বোধ হয় মেতেছেন।

সরষু বলিল, বোধ হয়।

তাহার পর চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দুঃখ হয় যে, আমরা একেবারে পর হয়ে গেছি—মামীমা কোথায় ?

তিনিও বোধ হয় সেইখানে।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

সরষু ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি ভাবচ, বল না।

চন্দ্রনাথ একবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া সরষুর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ঢানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বিশেষ-কিছু নয় সরষু। ভাবছিলাম, নির্মলার বিয়ে, ক...কিন্তু আমাকে একবার স্ববরটাও মিলেন না, অথচ মামীমাকেও ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা দু'জনেই শুধু পর!

তাহার স্বরে একটু কাতরতা ছিল, সরষু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমাকে পায়ে স্থান দিয়েই তুমি আরও পর হয়ে গেছ ; না হ'লে বোধ হয় এত দিনে মিল হ'তে পারত।

চন্দ্রনাথ হাসিল, কহিল, মিল হয়ে কাজ নেই। তোমার পরিবর্তে, কাকার সঙ্গে মিল কর যে আমার স্বপ্ন হ'ত, সে মনে হয় না। আমি বেশ আছি। যখন বিয়ে করেছিলুম, তখন যদি কাকার মত নিতে হ'ত, তা হ'লে এমন ত বোধ হয় না যে, তোমাকে কখনো পেড়ুম—একটা বাধা নিশ্চয় উঠত। হয় কুল নিয়ে, না হয় বংশ নিয়ে—যেমন করাই হোক, এ বিয়ে ভেঙ্গে যেত।

ভিতরে ভিতরে সরষু শিহরিয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘরের মধ্যে অন্ধকার করিয়াছিল, তাই তাহার মুখখানি দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু যে হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেই হাতখানি কাঁপিয়া উঠিয়া সরষুর সমস্ত মনের কথা চন্দ্রনাথের কাছে প্রকাশ করিয়া দিল। চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, এখন বুঝতে পেরেছ, মত না নিয়ে ভাল করেছি কি মন্দ করেছি ?

সরষু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কি জানি! আমার মত শত সহস্র দাসীরও ত তোমার অভাব হ'ত না!

চন্দ্রনাথ সরষুর কোমল হাতখানি সঙ্গেহে ঈষৎ পীড়ন করিয়া বলিল, তা জানিনে। আমার দাসী একটি, তার অভাবের কথাই ভাবতে পারি। শত সহস্রের ভাবনা ইচ্ছে হয় তুমি ভেবো।

পরদিন হরিবালা আসিলেন ; কিন্তু মুখের ভাবটা কিছু স্বতন্ত্র। ফস করিয়া গলা ধরিয়া সই-সই বলিয়া তিনি ব্যস্ত করিলেন না, কিংবা বিস্তি খেলিবার জন্য তাস আনিতেও পুনঃ পুনঃ সাধাসিবে পীড়াপীড়ি করিলেন না! মলিনমুখে মৌন হইয়া রহিলেন।

সরষু বলিল, সইয়ের কাল সেবা পাইনি।

হ্যাঁ দিদি—কাল বড় কাজ ছিল। ও-বাড়িতে নির্মলার বিয়ে।

তা শুনেছি। সব ঠিক হ'ল কি ?

হরিবালা সে কথার উত্তর না দিয়া সরষুর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, সই, একটা কথা—সন্তি

বলবি?

কি কথা?

যদি সত্য বলিস, তা হ'লেই জিজ্ঞাসা করি—না হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে কোন লাভ নেই।

সরযু চিঙ্কিত হইল। বলিল, সত্যি বলব না কেন?

মেঘিস দিলি—আমাকে বিশ্বাস করিস ত?

করি বৈ কি।

তবে বল দেখি, চন্দ্রনাথ তোকে কতখানি ভালবাসে?

সরযু একটু লজ্জিত হইল বলিল, খুব দয়া করেন।

দয়ার কথা নয়। খুব একেবারে বড় বেশী ভালবাসে কিনা?

সরযু হাসিল। বলিল, বড় বেশী কিনা—কেমন ক'রে জানব?

সত্যি জানিস নে?

না।

সত্যই সরযু ইহা জানিত না। হরিবালা যেন বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, শ্রী জানে না স্বামী তাকে কতখানি ভালবাসে! এইখানেই আমার বড় ভয় হয়।

হরিবালার মুখের ভাবে একটা গভীর শঙ্কা প্রচ্ছন্ন ছিল, সরযু তাহা বুঝিয়া নিজেও শঙ্কিত হইল। বলিল, ভয় কিসের?

আর একদিন ওনিস। তার পর তাহার চিবুকে হাত দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, এত রূপ, এত গুণ, এত বুদ্ধি নিয়ে সেই এত দিন কি ঘাস কাটছিলি?

সরযু হাসিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখনও কথাটা প্রকাশ পায় নাই। হরিদয়াল ঘোষালের সন্দেহের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। একজন ভদ্রলোকের মত দেখিতে অথচ বস্ত্রাদি জীর্ণ এবং ছিন্ন আজ দুই-তিন দিন হইতেই বামুন-ঠাকরুন সুলোচনা দেবীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া বাহিতেছিল। সুলোচনা ভাবিত, হরিদয়াল তাহা জানেন না; কিন্তু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন।

আজ বিপ্লবে দয়ালঠাকুর এবং কৈলাসখুড়া ঘরে বসিয়া সতরঞ্চ খেলিতেছি। এমন সময় অন্ধরের প্রাঙ্গণে একটা গোলযোগ উঠিল। কে যেন মৃদুকণ্ঠে সকাহরে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে, এবং অপরে কর্কশকণ্ঠে তীব্র-ভাবে তিরস্কার করিতেছে এবং ভয় দেখাইতেছে। একজন দ্রাবলোক, অপর পুরুষ। দয়ালঠাকুর কহিলেন, খুড়ো, বাড়িতে কিসের গোলমাল হয়?

কৈলাসখুড়া বলিলেন, কিন্তু! সমালাও দেখি বাবাজী!

আবার অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। ভিতরের গোলমাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া দয়ালঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খুড়ো, একটু ব'স, আমি দেখে আসি।

খুড়া তাঁহার কৌচার টিপ এক হাতে ধরিয়া কহিলেন, এবার যে দাবা চাপা গেল।

দয়ালঠাকুর পুনর্বার বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু গোলমাল কিছুতেই থামে না। তখন দয়ালঠাকুর অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, সুলোচনা দুই হাতে সেই লোকটার পা জড়াইয়া আছে এবং সে উত্তরোত্তর চাপা-কণ্ঠে কহিতেছে, আমার কথা শাখ, না হ'লে যা বলছি তাই করব! সুলোচনা কানিয়া বলিতেছে, আমার মার্জনা কর। তুমি একবার সর্বনাশ করেছে, যা-একটু বাকী আছে, সেটুকু আর নাশ করো না।

সে কহিতেছে, তোমার মেয়ে বড়লোকের ঘরে পড়েছে, দু'হাজার টাকা দিতে পারে না? আমি টাকা পেলেই চ'লে যাব।

সুলোচনা কহিল, তুমি মাতাল, অসফুরিত।—দু'হাজার টাকা তোমার কত দিন? তুমি আবার আসবে, আবার টাকা চাইবে,—আজ কিছুতেই তোমার টাকা দেব না।

আমি মদ ছেড়ে দেব। বাবসা কবব, আব কখনও তোমাব কাছে টাকা চাইতে আসব না।

সুলোচনা সে কথাব উত্তর না দিয়া ভূমিতলে মাথা খুঁড়িয়া যুক্ত-কবে কহিল, দয়া কব-টাকাব জন্য আমি সবযুকে অনুবোধ কবতে পারব না।

দয়ালঠাকুর যে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা কেহই দেখে নাই, তাই এসব কথা জোবে জোবেই হইতেছিল। দয়ালঠাকুর এইবাব কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা দুজনই চমকিত হইল। দয়ালঠাকুর এই অপবিচিত লোকটাব নিকটে আসিয়া কহিলেন, তুমি কাব অনুমতিতে বাড়িব ভিতবে ঢুকেছ?

লোকটা প্রথমে থম্মত খাইয়া দাঁড়াইয়া বহিল, তাহাব পৰ যখন বুঝিল, কাজটা ভেমন আইন সম্মত হয় নাই, তখন সবিয়া পড়িবাব উপক্রম কবিল। কঠিন মুষ্টিতে হবিদয়াল তাহাব গাত খাবিয়া উচ্চকণ্ঠে পুনৰাব কহিলেন কাব অনুমতিতে?

পলাইবাব উপায় নাই দেখিয়া সে সাহস সম্বয় কবিয়া বলিল সুলোচনাব কাছে এসেছি।

তাহাব মুখ দিয়া তীব্র সুবাব গন্ধ বাহিব হইতেছে, এবং সৰ্বাস্থে হীনতা এবং অত্যাচাবেব মলিন ছায়া পড়িয়াছে। দয়ালঠাকুর ঘৃণায় গুষ্ঠ কৃষ্ণকণ্ঠে কবিয়া সেইএকপ কৰ্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসা কবিলেন কিন্তু কাব হুকুমে?

হুকুম আবাব কি?

লোকটাব মুখে তাব পৰিবারিত হইল সহসা যেন শব্দানুশব্দ হইল প্রকটভাবে উপন্যাস জোব আছে এবং এ বাড়িব উপবেও কক্ষিৎ দাবী আছে।

দয়ালঠাকুর একপ উত্তরে হাস্তব চটিয়া উঠিলেন উচ্চস্ববে কহিলেন ব্যাটা মাপল, জান তোমাকে এখনি ভেলে দিতে পারি।

দয়ালঠাকুর প্রায় প্রহাব কবিতে উদাত্ত হইলেন, জান নৈ কি। চল লোকটা এখন পুলিষে দেব।

লোকটা ঈষৎ হাসিয়া একপ ভাল প্রকাশ কবিল যেন পুলিষেব নিকট যাইতে তাহাব বিশেষ আপত্তি নাই। কহিল, এখনই দেবে? দয়ালঠাকুর থাক্কা দিয়া বলিলেন, এখনি।

লোকটা থাক্কা সামলাইয়া স্থিৰ হইয়া গম্ভীৰভাবে বলিল, ঠাকুর, একেকানে অত বিক্রম প্রকাশ কৰে না, পুলিষে দেবে কি থানায় দেবে, একটু বিলম্ব কবে দিয়ো। আমি তোমাকে কাশী ছাড় কবোঁ পারি, জান?

দয়ালঠাকুর উন্মত্তেব মত চীৎকার কবিয়া উঠিলেন ব্যাটা পাঞ্জী, মাঝ আমাব চাম্ৰ বন্ধ কাশীবাস হ'ল, এখন তুমি কাশী-ছাড়া কববে?

তিনি ভাবিয়াছিলেন, লোকটা তাহাকে গুস্তাব ভয় দেখাইতেছে অনেকে এ কথায় হয়ত ভয় পাইত, কিন্তু এই দীৰ্ঘকালেব কাশীবাসে দয়ালঠাকুরেব এ ভয় ছিল না। বলিলেন, ব্যাটা, আমাব কাছে গুস্তাগিবি।

গুস্তাগিবি নয় ঠাকুর, গুস্তাগিবি নয়। পুলিষে নিয়ে চল। সেখানেই সব কথা প্রকাশ কবব। কোন্ কথা প্রকাশ কববে?

যা জানি। যাতে তুমি কাশী ছেড়ে পালিয়ে পথ পাবে না। যাতে সমস্ত দেশেব লোক শুনে যে তুমি জাতিচ্যুত অত্যাচারী।

আমি অত্যাচারী।

রাগ করো না, ঠাকুর। তুমি জাতিচ্যুত। শুধু তাই নয়। তোমাব কাছে যত ভদ্রসম্ভান বিশ্বাস করে এসেছে, এই তিন বৎসবেব মধ্যে যত লোককে তুমি অন্ন বেচেছ, সকলেবই জ্ঞাত গেছে। সকলকেই আমি সে কথা বলবো— দয়ালঠাকুর ভয় পাইলেন। ভবেব যথার্থ কারণ সমস্বয় হইবাব পূৰ্বেই উচ্চত কঠোর নরম হইয়া আসিল। তথাপি বলিলেন, আমি লোকেব জ্ঞাত মেবেছি?

তাই। আর প্রমাণ করবার ভারও আমার।

ঠাকুর নরম হইয়া কঠোর কিছু কম করিয়া বলিলেন, কথাতা কি, ভেঙ্গে বল দেখি বাপু?

লোকটা মৃদু হাসিয়া কহিল, একাই শুনবে, না, দু'-দশজন লোক ডাকবে। আমি বলি, দু'-চারজন লোক ডাক। দু'-চারজন পাড়াগড়শীর সামনে কথাটা শোনাবে ভাল।

দয়ালটাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, রাগ করো না বাপু, আমি হঠাৎ বড় অন্যায় কাত করছি। কিছু মনে করো না। এস, ঘরে চল।

দুই জনে একটা ঘরে আসিয়া বসিলে দয়ালটাকুর কহিলেন, তার পর?

সে কহিল, সুলোচনা—যার হাতে আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়, তাকে কোথায় পেলেন?

এইখানেই পেয়েছি। দুঃখীর কন্যা, তাই আশ্রয় দিয়েছি।

টাকাওয়ালা লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু সে কি জ্ঞাত, তার অনুসন্ধান করেছেন কি?—দয়ালটাকুরের সমস্ত মুখমণ্ডল একেবারে লিখন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা, বিধবা, শুদ্ধাচারিণী, তার হাতে খেতে শেষ কি?

ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং বিধবা, এ কথা সত্যি, কেউ যদি কুলভ্যাগ করে চলে যায়, তাকেও কি শুদ্ধাচারিণী বলা চলে? না, তাব হাতে খাওয়া যায়?

দয়ালটাকুর জিভ কাটিয়া বলিলেন, শিব! শিব! তা কি খাওয়া যায়!

তবে তাই! পনরো-ষোল বৎসর পূর্বে সুলোচনা তিন বছরের একটি মেয়ে নিয়ে গৃহত্যাগ করে, এবং তাকেই আশ্রয় দিয়ে আপনি নিজেও এবং আর পাঁচজনের সর্বনাশ করেছেন!

প্রমাণ?

প্রমাণ আছে বোকা! তাঁর জননী বরেন না। যার সঙ্গে কুলভ্যাগ করেন, সেই অসীম প্রেমাস্পদ রাখাল ভট্টাচার্য এখনো বেঁচে আছেন।

দয়াল লোকটার মুখে পড়িলে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন ইহারই নাম রাখাল বলিলেন, তুমি কি প্রমাণ?—লোকটা মলিন উভতির ভিতর হইতে অধিকতর মলিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া পসিয়া বলিল, না, না, গোয়াল।

দয়াল একটুখানি সরিয়া বসিয়া বলিলেন, প্রোমাকে দেখে তো চামার ব'লে মনে হয়েছিল। যা হোক, নমস্কার।—সে ব্যক্তি বাণ করিল না। বলিল, নমস্কার। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, আমাকে চামার বলাও চলে, মুসলমান খ্রীষ্টান বলাও চলে। আমি জ্ঞাত মানিনে—আমি পরমহংস।

তুমি অতি পাষণ্ড।

সে বলিল, সে কথা আমাকে স্বরণ করয়ে দেবার প্রয়োজন—খচি না, কেননা, ততপূর্বে অনেকেই অনুগ্রহ করে ও কথা বলেছেন। কি ছিলাম, কি হয়েচি, তা এখনো বুঝি। কিন্তু ও এই রাখালনাশ।

দয়ালের মুখখানি অপরিসীম ক্রোশে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কোনমতে মনের ভাব দমন করিয়া তিনি বলিলেন, এখন কি কবতে চাও? সুলোচনাকে নিয়ে যাবে?

আজ্ঞে না। তাতে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে, আমি অত নরাধম নই।

প্রাণের দায়ে দয়াল এ পরিহাসটাও পরিপাক করিলেন। তারপর বলিলেন, তবে কি চাও? আবার এসেচ কেন?

টাকা চাই। দারুণ অর্থভাব, তাই আপাততঃ এসেছি। হাজার-দুই পেনেই নিঃশব্দে চলে যাব, জানাতে এসেছি।

এত টাকা তোমায় কে দেবে?

যার গরজ। আপনি দেবেন—সুলোচনার জামাই দেবে—সে বড়লোক।

দয়াল তাহার স্পর্শা দেখিয়া মনে মনে গুজ্জিত হইয়া গেলেন। কিন্তু সে অতিশয় ধূর্ত এবং কৌশলী, তাহাও বুঝিলেন। বলিলেন, বাপু, আমি দরিদ্র, অত টাকা কখনও চোখে দেখিনি। তবে সুলোচনার জামাই দিতে পারে, সে কথা ঠিক। কিন্তু সে দেবে না। তাকে চেন না, ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে দু'হাজার তের দুয়ের কথা—দুটো পরসাদ আদায় করতে পারবে না। তুমি যে বুদ্ধিমান লোক তা টের পেয়েছি, কিন্তু সে আরও বুদ্ধিমান। এবং আর কোন ফন্দি দেখ—এ খাটবে না।

রাখাল দয়ালের মুখের দিকে চিত্তাকর্ষিত হইয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, সে ভাবনা

আমার। দেখা যাক, যত্নে কৃতে যদি—

দয়াল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক বাবা, দেবতাবাটাকে আর অপবিত্র করো না।

রাখাল সন্নতিভাবে বলিল, যে আছে। কিন্তু আর ত বসতে পারিনি—বলি তাঁর ঠিকানাটা কি?

দয়াল বলিলেন, সুলোচনাকেই জিজ্ঞাসা কর না বাপু।

রাখাল কহিল, সে কলবে না, কিন্তু আপনি বলবেন।

যদি না বলি?

রাখাল শান্তভাবে বলিল, নিশ্চয়ই বলবেন। আর না বললে কি করব, তা ত পূর্বেই বলেছি।

দয়ালের মুখ শুকনিল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার কিছুই ত করিনি বাপু।

রাখাল বলিল, না, কিছু করেন নি। তাই এখন কিছু করতে বলি। নাম-ধামটা ব'লে দিলে জামাইবাবুকেও দুটো আশীর্বাদ ক'রে আসি, মেয়েটাকেও একবার দেখে আসি। অনেক দিন দেখিনি।

দয়ালঠাকুর রীতিমত ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু মুখে সাহস দেখাইয়া কহিলেন, আমি তোমার সাহায্য করব না। তোমার যা ইচ্ছা কর। অন্ত্যে একটা পাপ করেছি, সে জন্য না হয় প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার আর ভয় কি?

ভয় কিছুই নেই, তবে পাণ্ডা-মহলে আজই একথা রাষ্ট্র হবে। তাব পর যেমন ক'রে পারি, অনুসন্ধান ক'রে সুলোচনার জামাইয়ের কাছে যাব, এবং সেখানেও এ কথা প্রকাশ করব! নমস্কার ঠাকুর, আমি চললাম।—সত্যিই সে চলিয়া যায় দেখিয়া দয়াল তাহার হাত ধরিয়া পুনর্বার বসাইয়া মুদুকটে বলিলেন, বাপু, তুমি যে অল্পে ছাড়বার পাত্র নও তা বুকেছি। রাগ করো না। আমার কথা শোন। এর মধ্যে তুমি এ কথা নিয়ে আর আন্দোলন করো না। হস্তাধানেক পরে এস, তখন যা হয় করব।

মনে রাখবেন, সেদিন এমন ক'রে ফেরালে চলবে না। দয়াল তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বাপু, তুমি কি সত্যিই বাবুনের ছেলে?—আজ্ঞে।—দয়াল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! আজ্ঞা, হস্তাধানের পরেই এস—এর মধ্যে আর আন্দোলন করো না, বুঝলে?

আজ্ঞে, বলিয়া রাখাল দুই-এক পা গিয়াই কিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভাল কথা। গোটা-দুই টাকা দিন তো। মাইরি, মনিবাগুটা কোথায় যে হারালাম, বলিয়া সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

দয়াল রাগে তাহার পানে আর চাহিতেও পারিলেন না। নিঃশেষে দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, সে তাহা ট্যাকে ভুজিয়া গুহান করিল।—সে চলিয়া গেল, কিন্তু সেইখানে দয়াল ভব্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার সর্বান যেন সহস্র বৃন্তিকের দংশনে ছলিয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিন্তু সুলোচনা কোথায়? আজ তিন দিন ধরিয়া হরিদয়াল আহার, নিদ্রা, পূজা-পাঠ, বাহীর অনুসন্ধান, সব বন্ধ রাখিয়া ভয় ভয় করিয়া সমস্ত কাশী বুজিয়াও যখন তাহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, তখন ঘরে কিষ্টিয়া আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, বিবেচন! এ কি দুর্ভেদ? অন্যথাকে গড়া করিতে গিয়া শেষে কি পাপ সঞ্চয় করিলাম!

পলির শেষে কৈলাসখুড়োর বাটী। হরিদয়াল সেখানে আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। ডাকিলেন, খুড়ো, বাড়ি আছে?

—কেহ সাড়া দিল না। দেখিয়া তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন, দেখিলেন, কৈলাস প্রদীপের আলোকে নিবিড়চিহ্নে সতসক সাজাইয়া একা বসিয়া আছে; বলিলেন, খুড়ো, একাই দাবা খেলচ?—খুড়ো চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এস বাবাজী, এই চালাটা বাঁচাও দেখি।

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া মনে মনে পালি পাড়িয়া কহিলেন, নিজের জাত বাঁচে না, ও বলে কিনা দাবার চালা বাঁচাও!

কৈলাসের কানে কথাগুলো অর্ধেক প্রবেশ করিল, অর্ধেক করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল বাবাজী?

বলি, সেদিনের ব্যাপারটা সব শুনেছিলে?

কি ব্যাপার?

সেই যে আমাদের ভিতরের সেমিনকার গোলযোগ!

কৈলাস কহিলেন, না বাবাজী, ভাল শুনতে পাইনি। গোলযোগ বোধ করি খুব আন্তে আন্তে হয়েছিল; কিন্তু সেমিন তোমার দাবাটা আচ্ছা চেপেছিলাম!

হরিদয়াল মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিয়া কহিলেন, তা ত চেপেছিলে, কিন্তু কথাগুলো কিছুই শোননি?

কৈলাস অশকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, না, কিছুই প্রায় শুনতে পাইনি। অত আন্তে আন্তে গোলমাল করলে কি করে শুনি বল? কিন্তু সেমিনকার খোলটা কি রকম জমেছিল, মনে আছে? মন্ত্রীটা তুমি কোনমতেই বাঁচাতে পারতে না—আচ্ছা, এই ত ছিল, কৈ বাঁচাও দেখি কেমন—

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মন্ত্রী চুলোয় যাক! জিজ্ঞেস করি, সেমিনকার কথাবার্তা কিছু শোননি?—খুড়া হরিদয়ালের বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া এইবার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কি জানি বাবাজী, স্মরণ ত কিছুই হয় না।—হরিদয়াল অশকাল স্থির থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, আচ্ছা সংসারের যেন কোন কাজই না করলে, কিন্তু পরকালটা মান ত?

মানি বৈ কি!

তবে! সেকালের একটা কাজও করেছ কি? একদিনের তরেও মন্দিরে গিয়েছিলে কি?

কৈলাস বিম্বিত হইয়া বলিলেন, এক বল দয়াল, মন্দিরে যাইনি! কত দিন গিয়েছি।

দয়াল তেমনি গম্ভীর হইয়াই বলিতে লাগিলেন, তুমি এই বিশ বৎসর কাশীবাসী হয়েছ, কিন্তু বোধ হয় বিশ দিনও ঠাকুর দর্শন করনি—পূজা-পাঠ ত দূরের কথা!

কৈলাস প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না দয়াল, বিশ দিনের বেশী হবে; তবে কি জান বাবাজী, সময় পাই না ব'লেই পূজোছুটোতলে হয়ে উঠে না। এই দেখ না, সকাল বেলাটা শব্দ মিশিরের সঙ্গে এক ঢাল বসতেই হয়—লোকটা খেলে ভাল। এ ব্যক্তি শেষ হ'তেই দুপুর বেজে যায়, তারপর আফ্রিক সেরে পাক করতে, আশ্রয় করতে বেলা শেষ হয়। তার পর বাবাজী, গঙ্গা পাড়ের—তা যাই বল, লোকটার খেলার বড় তারিফ—আমাকে ত সেমিন প্রায় মাত করেছিল। ঘোড়া আর গজ দু'টো দু'কোণ থেকে চেপে এসে—আমি বলি বৃষ্টি—

আঃ! থামো না খুড়ো—দুপুর বেলা কি কর, তাই বল।

দুপুর বেলা! গঙ্গা পাড়ের সঙ্গে—তার গজ দু'টো—এই কালই দেখ না—

দয়াল অভ্যস্ত বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, হয়েছে, হয়েছে—দুপুর বেলা গঙ্গা পাড়ে আর সজ্জার পর মুকুল ঘোষের বৈঠকখানা—আর তোমার সময় কোথায়?

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন—হরিদয়াল অধিকতর গম্ভীর হইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু খুড়ো, মিনও ত আর বেশী নৌ। পরকালের জন্যও প্রস্তুত হওয়া উচিত, আর সে কথা কিছু কিছু ডাখাও দরকার। দাবার পুটলিটা আর সঙ্গে নিতে পারবে না।

কৈলাস হঠাৎ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, না না দয়াল, দাবার পুটলিটা বোধ করি সঙ্গে নিতে পারব না। আর প্রস্তুত হ'বার কথা বলচ বাবাজী? প্রস্তুত আমি হ'বই নাহি। যেদিন ডাক আসবে, ঐটে কারো হাতে তুলে দিয়ে সোজা রওনা হয়ে পড়ব—সেজন্যে চিন্তার বিষয় আর কি আছে?

কিছুই নৌ? কোন শব্দ হয় না?

কিছু না, বাবাজী, কিছু না। যেদিন কমলা আমার চলে গেল, যেদিন কমলচরণ আমার মুখের পানেই চোখ রেখে চোখ বুজলে, সেদিন থেকেই শব্দ, ভয় প্রভৃতি উপদ্রবগুলো তাদের পিছনে পিছনেই চলে গেল—কেমন করে যে গেল, সে কথা একদিনের তরে জানতে পারলাম না বাবাজী—বলিতে বাধাতে বৃদ্ধের চোখ দু'টি ছলছল করিয়া আসিল।

দয়াল বাধা দিয়া বলিলেন, থা' সে-সব কথা। এখন আমার কথাটা শুনবে?

বল বাবাজী।

দয়াল তখন সেদিনের কাহিনী একে একে বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন, এখন উপায়? ওনিতে ওনিতে কৈলাসের সদাশ্রয় মুখশ্রী পাণ্ডবর্ণ হইল। কাতরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, এমন হয় না, হরিদয়াল! সুলোচনা সতী-সাবিত্রী ছিলেন।

দয়াল কহিলেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু ত্রীলোকে সকলই সম্ভব।

ছি, এমন কথা মুখে এনো না। মানুষ-মাত্রেরই পাপপুণ্য ক'রে থাকে—এতে ত্রী-পুরুষের কোন প্রভেদ দেখিনে। বাবাজী, তোমার জননীর কথা কি স্মরণ হয় না, সে স্মৃতি একেবারে ঘুচে ফেলেচ?

হরিদয়াল লজ্জিত হইলেন, অথচ বিরক্তও হইলেন, কিছুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু এখন যে জ্ঞাত যায়।—

কৈলাস বলিলেন, একটা প্রায়শ্চিত্ত কর। অজানা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই কি?

আছে, কিন্তু এখনকার লোকে আমাকে যে একঘরে করবে?

করলেই বা—

হরিদয়াল এবার বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, করলেই বা! কি বলছ! একটু বুকে বল খুড়ো।

বুঝেই বলছি, দয়াল! তোমার বয়সও কম হয়নি—বোধ করি পঞ্চাশ পার হ'ল। একটা বয়স জ্ঞাত ছিল, বাকী দু'চার বছর না হয় নাই বইল, বাবাজী, এতই কি ভাঙে কতি?

কতি নেই? জ্ঞাত যাবে, ধর্ম করে পরকালে জবাব দেবে কি?

কৈলাস কহিলেন, এই জবাব দেবে যে একজন অনাথকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

হরিদয়াল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা গুহার মনের সঙ্গে একেবারেই মিলিল না কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, তবে সুলোচনার জামায়ের ঠিকানা দেবে না।

কিছুতেই না। এক বাটা বদমায়েস—মাতাল—সে ভয় দেখিয়ে তোমার কাছে টাকা আদায় করবে, আর এক ভদ্র-সন্তানের কাছে টাকা আদায় করবে, আর তুমি তার সাহায্য করবে?

কিন্তু না করলে যে আমার সর্ব্ব্ব যায়! একজনও যজ্ঞমান আসবে না। আমি খাব কি ক'রে?

কৈলাস বলিলেন, সে ভয় করো না। আমি সরকার বাহাদুরের কল্যাণে বিশ টাকা পেন্সন পাই, খুড়োভাইপোর তাতেই চলে যাবে। আমরা খাব, আর দাবা খেলব, ঘর থেকে কোথাও বেরোব না।

বিরক্ত হইলেও এরূপ বালকের মত কথায় হরিদয়াল হাসিয়া বলিলেন, খুড়ো, আমার বোকা তুমিই বা কেন ঘাড় নেবে, আর আমিই বা কেন পথের হাজার মাথায় বয়ে ভাত-ধর্ম খোঁদাব? তার চেয়ে—

কৈলাস বলিলেন, ঠিক ত। তার চেয়ে তাদের নাম-ধাম ঠিকানা ব'লে দিয়ে একজন দরিদ্র বালিকাকে তার স্বামী, সংসার, সম্মান, সমস্ত হ'তে বঞ্চিত ক'রে এই বুড়ো হাড়-গোড়গুলো ভাগ্যভেদে শিয়াল-কুকুরের গ্রাস থেকে বাঁচতে হবে! বাঁচাও গে বাবাজী, কিন্তু আমাকে বলতে এসে ভাল করনি! তবে যখন মন্তলব নিতেই এসেছ, তখন আর একটা কথা ব'লে দিই। 'কাশীধাম, মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব। এখানে বাস ক'রে তাঁর সন্তী মেয়েদের পিছনে লেগে মোটের উপর বড় সুবিধা হবে না বাবা।

হরিদয়াল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, খুড়ো কি এবার সাপ-সম্পাত করচ।

না। তোমার কাশীর পাণ্ডা, স্বয়ং বাবার বাহন, আমাদের সাপ-সম্পাত তো আমাদের লাগবে না—সে ভয় তোমারা নেই, কিন্তু যে কাজে হাত দিতে যাচ্চ, বাবা, সে বড় নিরাপদ জিনিস নয়। সতী-সাবিত্রীকে যম ভয় করে। সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছি। অনেকদিন একসঙ্গে দাবা দেখছি—তোমাকে ভালও বাসি।—হরিদয়াল জবাব দিলেন না, মুখ কালি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কৈলাস বলিলেন, বাবাজী, কথাটা তাহ'লে রাখবে না?

হরিদয়াল বলিলেন, পাগলের কথা রাখতে গেলে পাগল হওয়া দরকার।

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন, হরিদয়াল বাহির হইয়া গেলেন।

কৈলাস দাবার পুঁচিলটা টানিয়া লইয়া গ্রহি বীধিতে বীধিতে মনে মনে ভাবিলেন, বোধ হয় ওর কথাই ঠিক। আমার পরামর্শ হয়ত সংসারে সত্যই চলে না। মানুষ মরিলে লোকাত্যাব হইলে কেহ

কেহ ডাকিতে আসে—সাহ করিতে হইবে। রোগ হইলে ডাকিতে আসে—শুশ্রূষা করিতে হইবে। আর সত্তরঞ্চ খেলিতে আসে। কৈ, এত বয়স হইল, কেহ ত কখন পরামর্শ করিতে আসে নাই!

কিন্তু অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাবিয়াও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, কেন, এই সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জিনিসটা লোক-গ্রাহ্য হয় না, কেন এই সহজ প্রাপ্ত ভাবটা সংসারের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সেই রায়েই হরিদয়াল অনেক চিন্তার পর মন স্থির করিয়া চন্দ্রনাথের খুড়ো, মণিশঙ্করকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, চন্দ্রনাথ স্বৈচ্ছ্য এক বেশ্যা-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছেন।

অন্তিম পরিচ্ছেদ

হরিদয়াল সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া মণিশঙ্করকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার সহজেই বিশ্বাস হইল, সংবাদটা অসত্য নহে। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, এতলে কর্তব্য কি? এ সংবাদটা তাঁহার পক্ষে সুখেরই হউক বা দুঃখেরই হউক, গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। এত ভার তাঁহার একা বহিতে ক্রেশ বোধ হইল, তাই স্বীকে নিরিবিলিতে পাইয়া মোটামুটি খবরটা জানাইয়া বলিলেন, আমার পরামর্শ নিলে কি এমন হ'ত? না এতবড় জুয়াচুরি ঘটতে দিতাম? যদি হউক, কথটা এখন প্রকাশ করো না, ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিতে সময় লাগে, দুই-চারি দিন অপেক্ষা করিতে হয়, ত্রীলোক এতটা পারে না, তাই হরিদয়ালের পত্নের মর্মান্থ দুই-চারি কান করিয়া ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মেয়ে দেখার দিন হরিবালা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই ভয়ে ভয়ে সেদিন জানিতে আসিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ সরযুকে কতখানি ভালবাসেন। সেদিন মেয়ে-মহলে অশ্রুট-কলকটে এ প্রস্তুত দু'ব উৎসাহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল কেননা, তাহারা প্রথমে বুঝিয়াছিল যে, শুধু ভালবাসার গভীরতার উপরেই সরযুর ভবিষ্যৎ নির্ভিত আছে।

সকলেই চাপা গলায় কথা কহে, সকলের মুখে চোখে প্রশংসা পায় যে, একটা পৈশাচিক আনন্দ-প্রবাহ এই কোমল বক্ষগুলির মধ্যে ছুটিয়া ফিরিতেছে। দুঃখপ্রকাশ এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত আছেই, কিন্তু সকলেরই যেন গোপন ইচ্ছা সরযুর ভাগ্যদেবতা যেদিকে মুখ ফিরাইলে তাহারা অত্যন্ত দুঃখের সহিত 'আহা' বলিবে, সেই পরম দুঃখের চিত্রটি যেন তাহারা দেখিতে পায়। আজ দুইদিন ধরিয়া উৎকণ্ঠায় তাহাদের নিদ্রা হয় না। ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। এই রাতদিন শুধু ধূয়া হইয়াছে, আগুন জ্বলে নাই—কথাটা শুধু মেয়েদের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মত পরিয়া ঘুরিয়া ফার্মাচ্ছে গিয়াছে, অথচ দু'কূল ভাসাইয়া বহিতে পারে নাই। পুরুষের দলেও একথা উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা স্ন সময়ের জন্য। তাহাদিগের চন্দ্রনাথের জাতি-মারা ভিন্ন আরও কাজ আছে, সংসারের ভার বহন করিতে হয়—একেবারে গা ছড়াইয়া দিয়া অনেককণের জন্য বসিবার সময় পায় না, তাই কথাটা মীমাংসা হইবার পূর্বেই দল ভাঙ্গিয়া যায়। তবে কথটা যদি ছোট হইত, চন্দ্রনাথ দরিদ্র হইত, তাহা হইলে বোধ করি যেমন তেমন মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এরূপ হলে কেহই প্রকাশ্যভাবে দলপতি সাক্ষিয়া চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিল না। যে পারিত, সে মণিশঙ্কর। কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তিনি একেবারেই কোন কথা উত্থাপন করেন না। এখন পাড়ার স্বীয়সী বিবো বা সখবার দল কর্তব্য-কমে মন দিলেন। তাহারা নিঃসরায় ব্রজকিশোর, তাহার পত্নী হরকালীর ধর্ম ও জাত বাঁচাইবার পবিত্র বাসনায়, নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইয়া দিয়া গেলেন যে, ইহা নিঃসরায় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, বধুমাতা সরযুর মা একজন কাশীবাসিনী বেশ্যা, সুতরাং তাঁহার কন্যার স্পর্শিত পান ভোজনাদি ব্যবহারে তাহাদের উভয় স্ত্রী-পুরুষেরই জাতি এবং ধর্মনাশ হইয়াছে।

প্রথমটা হরকালী বিহুলের মত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বলিলেন, কি হয়েছে?

রামময়ের বৃদ্ধা জননী ফোস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর কি হবে বড়গিন্নী, যা হবার তাই হয়েছে—সর্বনাশ হয়েছে। এই বলিয়া তিনি কাছিনীটা আর একবার কাগাগোড়া বিবৃত করিয়া গেলেন। বলিবার সময় অজস্র তুল প্রাপ্তি যাহা ঘটিল, তাহা আর পাঁচজন সংশোধন করিয়া দিল। এইরূপে হরকালী হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সত্যই সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা তাঁহার নিজের এবং

কতটা আর একজনের, সেই কথাটাই বেশ করিয়া অনুভব করিতে তিনি নিশ্চয়ই উদ্বিগ্না গিয়া নিজের ঘরের মধ্যে দ্বার বন্ধ করিলেন। বাঁহারা ভাল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাল করিলেন কি মন্দ করিলেন, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া চিন্তিত-বিমর্ষমুখে একে একে সরিয়া পড়িল। নিতৃত ঘরের মধ্যে আসিয়া হরকালীর আশঙ্কা হইল, তাঁহার মন্থ অদৃষ্টে এতবড় সুসংবাদ শেষ পর্যন্ত টিকিবে কি না! তিনি ভাবিলেন, যদি নাই টিকে, উপায় নাই। কিন্তু যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াই থাকে, যদি ভগবান এতদিন পরে সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনখিটি এখনও আছে— এখনো সে পরের হাতে গিয়া পড়ে নাই—এই তার সমস্ত। বাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত যে গ্রন্থপণ করিয়া দেখিতেই হইবে, তাহাতে আর তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। তিনি মুখ র্ত্তান করিয়া যেখানে চন্দ্রনাথ লেখাপড়া করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহার মুখের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া চন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মায়াবা।

হরকালী শিরে করাঘাত করিয়া কাদ-কাদ ইহুয়া বলিলেন, বাবা, চন্দ্রনাথ, দুঃখী বলে কি আমাদের শান্তি দিতে হয়।

চন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে কি করিয়াছে, তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

হরকালী বলিতে লাগিলেন, আর বাকী কি? একমুঠো ভাতের জন্যে জাত গেল, ধর্ম গেল। বাবা, খাবার থাকলে কি তুমি এমন করে আমাদের সর্বনাশ করতে পারতে।

চন্দ্রনাথ কশকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অনেকটা শান্তভাবে কহিল, হয়েছে কি?

হরকালী আঁচল দিয়া মিশ্রা চোখ মুছিয়া বলিলেন, পোড়া কপালে যা হ'বার তাই হয়েছে। আমার সেনার চাঁদ তুমি, তোমাকে ডাকিনীরা ছুলিয়ে এই কাণ্ড করেছে।

পায়ে পড়ি মায়াবা, বলে বল!

আর কি বলব? তোমাৎ বুড়োকে জিজ্ঞেস কর।

চন্দ্রনাথ এবার বিরক্ত হইল। বলিল, বুড়োকেই যদি জিজ্ঞাসা করব, তবে তুমি অমন করচ কেন? আমাদের সর্বনাশ হয়েছে, তাই এমন কতি বাবা,—আর কেন?

চন্দ্রনাথ মাড়ল ও মাড়লানীকে যথেষ্ট প্রহ্লা-ভক্তি করিত, কিন্তু ওরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত বিরক্ত হইতে হয়, সে বিরক্ত হইরাছিল, আরো বিরক্ত হইয়া বলিল, যদি সর্বনাশ হয়েই থাকে ত অন্য ঘরে যাও—আমার সামনে অমন করো না।

হরকালী তখন চন্দ্রনাথের মৃত-স্বনীর নামোচ্চারণ করিয়া উঠে-বেরে কালিয়া উঠিলেন—ওগো, তুমি আমাদের ডেকে এনেছিলে, আজ তোমার ছেলে তাড়িয়ে দিতে চায় গো।

চন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া মাটির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, বলে না বললে, কেনন করে কুন্ডব জালী, কিসে তোমাদের সর্বনাশ হ'ল। সর্বনাশ সর্বনাশই করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলতে পারলে না!—হরকালী আর একবার চোখ মুছিয়া বলিলেন, কিছুই জান না—বাবা?

না।

তোমার বুড়োকে কালী থেকে তোমাদের পাণ্ডা চিঠি লিখেছে।

কি লিখেছে?

হরকালী তখন ঢোক গিলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বাবা, কালীতে তোমাকে একা পেলে ডাকিনীরা ছুলিয়ে যে বেশার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।

চন্দ্রনাথ বিস্ময়িত চক্ষে প্রশ্ন করিল, কার গো?

শিরে করত্যাড়না করিয়া হরকালী বলিলেন, তোমার।—চন্দ্রনাথ কাছে সরিয়া আসিয়া বীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কার কেয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে? আমার?

হাঁ।

তার মানে, বিয়ের পূর্বে সরবু বৈশ্যাবৃত্তি করত? মায়াবা, ওকে যে দশ বছরেরটি ঘরে এনেছি, সে কথা কি তোমার মনে নাই?

তা ঠিক জানিনে চন্দ্রনাথ, কিন্তু ওর মায়ের কালীতে নাম আছে।

তবে সরস্বতী মা কেশ্যাবুত্তি করত। ও নিজে নয়?

হরকালী মনে মনে উষ্ম হইয়া বলিলেন, ও একই কথা বাবা, একই কথা।

চন্দ্রনাথ ধমক দিয়া উঠিল, কাকে কি বলচ মায়া? তুমি কি পাগল হয়েছ?

ধমক খাওয়া হরকালী কান-কান হইয়া বলিতে লাগিলেন, পাগল হবারই কথা যে বাবা! আমাদের দু'জনের প্রারম্ভিক ক'রে লাও—তারপর যেদিকে দু'চকু যায়, আমার চলে যাই। এর চেয়ে ভিক্ত ক'রে খাওয়া ভাল।—চন্দ্রনাথ রাগের মাখায় বলিল, সেই ভাল।

তবে চলে যাই?—চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, যাও।

তখন হরকালী আবার সশব্দে কপালে করাখাত করিলেন, হা পোড়াকপাল। শেষে এই অদ্ভুত ছিল চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া গভীর হইয়া বলিল, তবু পরিহার ক'রে বলবে না?

সব ত বলেছি।

কিছুই বলেনি—চিঠি কৈ?

তোমার কাকার কাছে।

তাতে কি লেখা আছে?

তাও ত বলেছি।

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। গভীর লজ্জায় ও ঘৃণায় তাহার পদতল হইতে কোলাহল পর্যন্ত বাহ-দুই শিহরিয়া উঠিয়া সমস্ত দেহ যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—হুঃ।

হরকালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভয় পাইলেন—এমন ভীষণ কঠোর ভাব কোন মৃত-মানুষের মুখেও কেহ কোন দিন দেখে নাই। তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ কহিল, কৈ চিঠি দেখি?—মণিশঙ্কর নিশ্চয়কে বাস্তব খুলিয়া একখানি পত্র তাহার হাতে দিলেন। চন্দ্রনাথ সমস্ত পত্রটা বার-দুই পড়িয়া শুদ্ধ-মুখে প্রস্থ করিল, প্রমাণ?

রাখালদাস নিজেই আসচে।

তার কথায় বিশ্বাস কি?

তা বলতে পারিনে। যা ভাল বিবেচনা হয়, তখন করো।

সে কি জন্য আসছে? এ কথা প্রমাণ ক'রে তার লাভ?

লাভের কথা ত চিঠিতেই লেখা আছে। দু'হাজার টাকা চায়।

চন্দ্রনাথ তাহার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সহজভাবে কহিল, এ কথা প্রকাশ না হ'লে সে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে পারত, কিন্তু সে আশায় তার ছাই পড়েচে। আপনি এক হিসাবে আমার উপকার করেছেন—এতগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মণিশঙ্কর লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল বলেন যে, তিনি এ কথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তথাপি স্বরণ হইল, তাহার দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। স্ত্রীকে না বালকে কে জানিতে পারিত? সুতরাং অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এ গ্রাম আমাদের। অথচ একজন ধীন, লম্পট ১০কুং আমাদের অপমান করবার জন্য আমার গ্রামে আমার বাড়িতে আসচে যে কি সাহস সে কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইনে, কিন্তু এই কথাটা আজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—একা, আমার মৃত্যু হলে কি আপনি সুখী হন?—মণিশঙ্কর ভিত্তি কাটিয়া কহিলেন, হি হি, অমন কথা মুখেও এনে না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ কহিল, আর কোনদিন আনবার আবশ্যক হবে না। আপনি আমার পুজনীয়, আজ যদি কোন অপরাধ করি মার্জনা করবেন। আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপনি নিন, নিয়ে আমার 'পরে' প্রসন্ন হোন। শুধু যেখানেই থাকি, কিছু কিছু মাসহারা দেবেন—ঈশ্বরের শপথ ক'রে বলচি, এর বেশী আর কিছু চাইব না। কিন্তু এ সর্ব-আমার করবেন না। তাহার কষ্ট রোধ হইয়া আসিল এবং অধর

দাঁত দিয়া চালিয়া ধরিয়া সে কোন-মতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন থামাইয়া ফেলিল।

মণিশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথের ডান-হাত চালিয়া ধরিয়া কানিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অগ্রজের তুমি একমাত্র বংশধর—আমি ভিক্ষা চাইচি বাবা, আর এ বৃদ্ধকে তিরস্কার করো না।—চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তিরস্কার করি না কাকা। কিন্তু এত বড় দুর্ভাগ্যের পর দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আর আমার অন্য পথ নেই, সেই কথাই আপনাকে বলছিলাম।

মণিশঙ্কর বিষ্ময়ের স্বরে কহিলেন, দেশ ত্যাগ করবে কেন? না জেনে এরূপ বিবাহ করেচ, তাতে বিশেষ লজ্জার কারণ নেই—শুধু একটা প্রায়শ্চিত্ত করা বোধ করি প্রয়োজন হবে। চন্দ্রনাথ মৌন হইয়া রহিল। মণিশঙ্কর উৎসাহিত হইয়া পুনরপি কহিলেন, উপায় যথেষ্ট আছে। বউমাকে পবিত্রাণ কর রে একটা গোপনে প্রায়শ্চিত্ত কর। আবার বিবাহ কব, সংসারী হও—সকল দিক রক্ষা হবে।

চন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল।

সংসারভিষ্মক মণিশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া স্থিৰ-দৃষ্টিতে তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ কহিল, কোন মতেই পবিত্রাণ করতে পারব না কাকা।

মণিশঙ্কর কহিলেন, পারবে চন্দ্রনাথ। অতি বিশ্রাম কর গে, কাল সূর্য্যোদয়ে ভেবে দেখো এ কাজ শক্ত নয়। বউমাকে কিছুতেই গৃহে স্থান দেওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু প্রমাণ না নিয়ে কিরূপে ত্যাগ করতে অনুমতি করেন?

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অধিক প্রমাণ যাও না হয় সে উপায় কবব। কিন্তু তোমাকেও আপাততঃ ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত কবলেই গোল মিটেবে।

কে মেটাবে?

আমি মেটাব।

কিন্তু কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করেই—

ইচ্ছা হয়, অনুসন্ধান পরে করবে। কিন্তু একথা যে মিথ্যা নয়, তা আমি তোমাকে নিশ্চয় বললাম।

চন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাটের উপর শুইয়া পড়িল। মণিশঙ্কর বলিয়াছেন, সরযুকে ত্যাগ করিতে হইবে। শয্যার উপর পড়িয়া শূন্য-দৃষ্টিতে উপবেশন দিকে চাহিয়া মানুষ ঘুমাইয়া যেমন করিয়া কথা কহে, ঠিক তেমনি করিয়া সে এ একটা কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল। সরযুকে ত্যাগ করিতে হইবে, সে বেশাব কন্যা। কথাটা সে অনেকবার অনেক বকম করিয়া নিজের মুখে উচ্চারণ করিল, নিজে কান পাতিয়া শুনিল, কিন্তু মনে বৃথিতে পারিল না। সে সরযুকে ত্যাগ করিয়াছে,—সরযু বাটীর মধ্যে নাই, ঘরের মধ্যে নাই, চোখের সূমুখে নাই, চোখের আড়ালে নাই, সে আর তাহার নাই। বস্তুটা যে ঠিক কি এবং কি তাহার সম্পূর্ণ আকৃতি, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিল না। অথচ মণিশঙ্কর বলিয়াছেন, কাজটা শক্ত নয়। কাজটা শক্ত কি সহজ, পারা যায় কি যায় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার মত শক্তি, মানুষের হৃদয়ে আছে কি না, তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না। সে নিজীবের মত পড়িয়া রহিল এবং এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া কত কি স্বপ্ন দেখিল—কোনটা স্পষ্ট, কোনটা স্বাপসা—ঘুমের ঘোরে কি একরমের অস্পষ্ট ব্যথা তাহার সর্বাত্মে যেন নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাও সে অনুভব করিল, তাহার পশ্চাদ্ধা যখন হয়-হয়, এমন সময় সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মানসিক অবস্থা তখন এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, মায়া-মমতার ঠাই নাই, রাগ করিবার, ঘৃণা করিবারও ক্ষমতা নাই। শুধু একটা অব্যক্ত অবোধ লজ্জার গুরুভারে তাহার সমস্ত দেহ-মন ধীরে ধীরে অবশ ও অবনত হইয়া একেবারে মাটির সহিত নিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

এমন সময়ে বাতি জ্বালিয়া আনিয়া ভূতা রুদ্ধ-দ্বারে যা দিতেই চন্দ্রনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কপাট খুলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চোখের উপর আলো লাগিয়া তাহার মোহের ঘোর আপনা আপনিই স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহারই ভিতর দিয়া এখন হঠাৎ সন্দেহ হইল, কথাটা সত্য কই?—সরযু নিজ জানে কি? জানিয়া গুনিয়া তাহার সরযু তাহারই এত

বড় সর্বনাশ করিবে, এ কথা চন্দ্রনাথ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া সরযুর শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া সরযু বসিয়া ছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সসন্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই, যেন একাকীতা রক্তও নাই। চন্দ্রনাথ একেবারেই বলিল, সব শুনেচ?—সরযু মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

সব সত্য?

সত্য।

চন্দ্রনাথ শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।—এতদিন বর্জন কেন?

মা বাগল কবিরাজিলেন, তুমিও ভিজ্ঞাসা করনি।

তোমার মায়ের উপকার করেছিলেন, তাই তোমরা এইরূপে শোধ দিলে।

সরযু অধোমুখে স্থির হইয়া দাঁড়িয়া বলিল।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এখন সেখানি কেন তুমি অত ভয় ভয়ে থাকতে, এখন বুঝি এত ভালবাসেও কেন সুখ পাটনি, পূর্বের সব কথাই এখন স্পষ্ট হয়েছে। এই জন্যই বুঝি তোমার মা কিছুতেই এখানে আসতে সীলার করেন নি—সরযু মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্রনাথ বিগত দিনের সমস্ত কথা স্মরণ করিল। সেই কাশীবাস, সেই চিরশুদ্ধ মূর্তি সরযুর বিলাস মাতা—সেই তাঁর কথায় সচল চক্ষু দুটি, শিথ শান্ত কথাগুলি। চন্দ্রনাথ সহসা আর হইয়া বলিল, সরযু, সব কথা আমাকে খুলে বলতে পার?

পারি। আমার মামার কতি নবদীপের কাছে। কাখাল ভট্টাচার্যের বাড়ি আমার মামার বাড়ির কাছেই ছিল। ছেলেবেলা থেকেই মা তাঁর ভালবাসতেন। নৃজনের একবার বিয়ের কথাও হয়, কিন্তু তাঁরা নীচ ঘর বংশে বিয়ে হতে পারনি। আমার বাবার কতি চল্লিশতর। আমার যখন তিন বৎসর বয়স, তখন বাবা মারা যান, মা আমাকে নিয়ে নবদীপে ফিরে আসেন। তাব পর আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় আমাকে নিয়ে মা—

চন্দ্রনাথ বলিল, তার পরে?

আমরা কিছুদিন মধুবায় থাকি, নবদীপে থাকি, তার পর কাশীতে আসি। সেই সময়ে কাখাল মদ খেতে শুরু করে। আমার কিছু অনজ্ঞার ছিল, এই নিয়ে বেড়া খেলা হত। তার পর একরাতে সমস্ত চূর্ণ করে পাল্পা। সে সময় আমার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। পাঁচ-ছয় দিন আ— ভিক্ষা করে কোনকালে থাকি, তারপরে মা ঘরেছিল, তুমি নিজেই জান।

চন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে সরযুর অনন্ত মুখের দিক তুর দৃষ্টিকোণ করিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি সরযু, তুমি এই তোমরা এই সমস্ত জেনে শুনে তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, কি মহাপাপক! তুমি—

সরযুর চোখ দিয়া উপটপ্ত করিয়া ওল করিয়া পড়তে লাগিল, সে নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়িয়া রহিল।—চন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। অধিকতর কষ্টের হইয়া বলিল, এখন উপায়?

সরযু চোখের জল মুছিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বাঁলে লাগে

তবে কাছে এস।

সরযু কাছে আসিলে চন্দ্রনাথ দুঃস্থিত হইতে তাহাব হাত ধরিয়া বলিল, লোকে তোমাকে তাগ করতে লাগে, কিন্তু আমার সে সাহস হয় না—তোমাকে বিশ্বাস হয় না—আমি সব বিশ্বাস হারিলাম।

মুহূর্তের মধ্যে সরযুর বিবর্ণ পাতুব মুখে এক কলক বড় ছুটিয়া আসিল, অশ্রুমলিন চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য চকচক করিয়া উঠিল, বলিল, আমাকে বিশ্বাস দেই?

কিছু না—কিছু না, তুমি সব পার।

সরযু স্বামীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া অবিলম্বে কহিল, তুমি যে আমার কি, তা তুমিও জান। একদিন তুমি আমাকে বলেছিলেন, তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখতে। আজ আমার মুখের পানে একবার চেয়ে দেখ। আজ আমি উপায় বাঁলে দেব, বল, শুনেবে?

শুনব। দাও ব'লে কি উপায়।

সরযু বলিল, আমি বিষ খেলে উপায় হয় কি?

চন্দ্রনাথের মুষ্টি আরও দৃঢ় হইল, যেন পলাইয়া না যাইতে পারে। কহিল, হয়। হয় সরযু, হয়। বিষ খেতে পারবে?

পারব।

খুব সাবধানে, খুব গোপনে।

তাই হবে।

আজই।

সরযু কহিল, আচ্ছা, আজই। চন্দ্রনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া সে স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা আশীর্বাদও করলে না?

চন্দ্রনাথ উপর দিকে চাহিয়া বলিল, এখন নয়। যখন চলে যাবে, যখন মৃতদেহ পুড়ে ছাই হবে, তখন আশীর্বাদ করব।—সরযু পা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তাই করো।

চন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতে উদাত্ত হইতেই সে আর একবার উঠিয়া গিয়া দ্বারে নিষ্ঠ দিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি বিষ খেলে কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না ত?

কিছু না।

কেউ কোন রকম সন্দেহ করবে না ত?

নিশ্চয় করবে। কিন্তু টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করব।

সরযু বলিল, বিছানার তলায় একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব, সেইখানা দেখিয়া।

চন্দ্রনাথ কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, তাই করো। বেশ ক'রে লিখে নীচে নিজের নাম স্পষ্ট ক'রে লিখে রেখো—কেউ যেন না বুঝতে পারে, আমি তোমাকে খুন করেছি। আর একটা কথা, ঘরের মোর-জানালা বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ো—একবিন্দু শব্দ যেন বাইরে না যায়। আমি যেন শুনতে না পাই—সরযু দ্বার ছাড়িয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আর একবার প্রশ্ন করিয়া পায়ে ধুলি মাথায় তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে যাও—বলিয়াই তাহার কি যেন সন্দেহ হইল—হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, রেসো, আর একটু দাঁড়াও। সে প্রদীপ কাছে আনিয়া স্বামীর ঘুঘুর দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রনাথের দুই চোখে একটা অমানুষিক তীব্র-দুষ্টি—কিপ্তের দৃষ্টির মত তাহা বকবক করিয়া উঠিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, চোখে কি দেখছ সরযু?

সরযু এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিছু না, আচ্ছা যাও।—চন্দ্রনাথ দ্বারে দ্বারে বাহিব হইয়া গেল—বিড়বিড় করিয়া বলিতে বলিতে গেল—সেই ভাল—সেই ভাল—আজই।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাতে সরযু নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কঁদিয়া মনে মনে কহিল, আমি বিষ খেতে কিছুতেই পারব না। একা হ'লে মরতে পারতাম কিন্তু আমি ত আর একা নই—আমি যে মা। মা হয়ে সন্তান বধ করব কেমন করি। তাই সে ঘরিতে পারিল না। কিন্তু তাহার সুখের দিন যে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাতেও তাহার স্নেহমাত্র সংশয় ছিল না।

পতীর রাতে চন্দ্রনাথ সহসা তাহার দ্বার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সমস্ত শুনিয়া উদ্ভট-আবেগে তাহাকে বকে তুলিয়া লইয়া দ্বির হইয়া রহিল। অশ্রুতে বারংবার কহিতে লাগিল, এমন কাজ কখনো করো না সরযু, কখনো না। কিন্তু ইহার অধিক সে ত আর কোন ভরসাই দিতে পারিল না। তাহার এই বৃহৎ ভবনে এই হতভাগিনীর জন্য এতটুকু কোণের সন্ধানও ত সে খুঁজিয়া পাইল না, যেখানে সরযু তাহার লজ্জাহত পাও মুখখানি লুকাইয়া রাখিতে পারে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে কোথাও একবিন্দু সমতাও সে কখনো করিতে পারিল না, যাহার আশ্রয়ে সে তপ্ত অক্লান্তির একটি কণাও মুহিতে পারে। কঁদিয়া কাটিয়া সে সাত দিনের সময় ভিত্তা করিয়া লইয়াছে। তার মাসের এই

শেষ সাতটি দিন সে স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া চিরদিনের মত নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিনী হইতে বাইবে। ভাত্র মাসে ঘরে কুকুর বিড়াল তাড়হিতে নাই,—গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, তাই সরযুর এই আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে।

একদিন সে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, আমার দুর্দশটুকু আমি ভোগ করব, সে জন্য তুমি দুঃখ করো না। আমার মত দুর্ভাগিনীকে ঘরে এনে অনেক সহ্য করেছে, আর করো না। বিদায় দিয়ে আমার সংসারী হও, আমার এমন সংসার যেন ভেসে ফেলো না।

চন্দ্রনাথ টেঁটমুখে নিরুত্তর হইয়া থাকে। ভালমন্দ কোন জবাবই খুঁজিয়া পায় না। তবে, এই কথাটা তাহার মনে হইতেছে, আজকাল সরযু যেন মুখরা হইয়াছে। বেশী কিছু কথা কহিতেছে। এতদিন তাহার মনের মধ্যে যে ভয়টা ছিল, এখন তাহা নাই। দু'দিন পূর্বেও সে মুখ ঢাকিয়া, মুখোশ পরিয়া এ সংসারে বাস করিতেছিল; এখন সামান্য ব্যতাসেও ভয় পাইত, পাছে তাহাব ছদ্ম আবরণ বসিয়া পড়ে, পাছে তাহার সত্য পবিচয় জনাজান হইয়া যায়। এখন তাহার সে ভয় গিয়াছে। তাই এখন নির্ভয়ে কথা কহিতেছে। এ ভীষনে তাহার যাত্রা-কিছু ছিল, সেই স্বামী, তাহার সর্ব্ব, সন্মাজের আদালত ডিক্রি জারি করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। এখন সে মুক্তমুখ, সর্ব্বস্বহীন, সম্মাসিনী তাই সে স্বামীর সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহে, বন্ধু মত, শিক্ষকের মত উপদেশ দিয়া নীতীক মতামত প্রকাশ করে। আর সেদিনের রাতে দুইজন দুইজনকে কমা করিয়াছে। চন্দ্রনাথ বিষ খাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহাব এ আশ্বাসানি সরযুর সব ভয় ঢাকিয়া দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে হরকালী এগুও কাগজে টিকিট আঁটিয়া স্বামীকে দিয়া মাথাগুণ্ড কত-কি লিখাইতেছিলেন।—ব্রজকিশোর একবার ভিজ্জেস করিলেন, এত লিখে কি হবে?

হরকালী ভাড়া দিয়া বলিলেন, তোমাব যদি একটুও বুদ্ধি থাকত, তাহলে ভিজ্জেস করতে না। একবার আমার কথা না শুনে এটি খতিয়ে, আর কোন বিষয়ে নিজের বুদ্ধি খাটিতে যেয়ো না।

হরকালী যাত্রা বলিলেন, সুবোধ শিশুর মত ব্রজকিশোর তাহ লিখিয়া নইলেন। শেষ হইলে হরকালী স্বয়ং তাহা আদ্যোপাধ্যায় করে দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ঠিক হইছে। নির্বোধ ব্রজকিশোর চুপ করিয়া বহিলেন। অলপকাল হরকালী কাগজখানি হাতে লইয়া সরযুর কাছে আসিয়া কহিলেন বউমা, এই কাগজখানিতে তোমাব নামটি লিখে দাও।

কাগজ হাতে লইয়া সরযু মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন স্বামীমা?

যা বলছি, তাই কব না বউমা।

কিসে নাম লিখে দেব, তাও কি শুনেও পার না?

হরকালী মুখখানা ভারী করিয়া কহিলেন, এটা বাছা তোমাবই ভালর জন্য। তুমি এখানে যখন থাকবে না, তখন কোথায় কিভাবে থাকবে, তাও কিছু আমরা আর সম্ভান নিতে যাব না। তা বাছা, যেমন করেই থাক না কেন, মাসে পাঁচ টাকা কবে খোঁচাকি পাবে। একি মন্দ?

ভাল-মন্দ সরযু গুণ্ডিত। এবং এই হিংস্রাচারকর্ণীর বুকের ভিতর যটুকু হিত প্রজ্ঞা ছিল, তাহাও গুণ্ডিল, কিন্তু যাহার প্রাসাদতুলা অট্টালিকা নদীপথে ভাসিয়া পড়িতেছে, সে আব বানকতক ইট বাঁচাইবার জন্য নদীর সহিত কলহ করিতে চাহে না। সরযু সেই কথা ভাবিল। তথাপি একবার হরকালীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। সেই দৃষ্টি। যে-দৃষ্টিকে হরকালী সর্ব্বাঙ্গ-কসল ঘৃণা করিতেন, ভয় করিতেন, আজিও তিনি এ চাহনি সহিতে পারিলেন না। চোখ নামাইয়া বাললেন, বউমা! হাঁ মীমা, লিখে লিখ। সরযু কলম লইয়া পরিচ্ছাব করিয়া নিভ্রেন নাম সেই করিয়া দিল।

আজই মোসরা আশ্বিন—সরযুর চলিয়া যাইবার দিন। প্রাতঃকাল হইতে বড় বৃষ্টি পড়িতেছিল, হরকালী চিন্তিত হইয়া পাড়লেন, পাছে যাওয়া না হয়।

সমস্ত দিন ধরিয়া সরযু ঘরের প্রাণ-সামগ্রী গুছাইয়া রাখিতেছিল। মূল্যবান বস্তুাদি একে একে আলমারিতে বন্ধ করিল। সমস্ত অলঙ্কার লৌহসিন্দুকে পুরিয়া ঢাবি দিল, তাহার পর স্বামীকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিয়া নিজে ভূমিতলে পড়িয়া অনেক কালী কামিল। গৃহত্যাগের সময় যত নিকটে আসিতেছে, ক্রেশ তত অসং। হইয়া উঠিতেছে। এই সাত দিন যেভাবে কাটিয়াছিল, আজ

সেভাবে কাটিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহার শব্দা হইল, পাছে এই শেষ দিনটিতে মৈথিচাঁচি ঘটে, যাইবার সময় পাছে নিতান্ত ভাড়িত ভিক্কুরের মত দেখিতে হয়। আত্মসম্মানটুকুকে সে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছিল; সেটুকুকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ আসিলে সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, এস, আজ আমার যাবার দিন। তখনও তাহার চক্ষুর পাতা আর্দ্র রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ আর-এক দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সরযু কাছে আসিয়া বলিল, এই চাবি নাও। যত দিন আর বিয়ে না কর, ততদিন অপর কাকেও দিও না। চন্দ্রনাথ রুদ্ধস্বরে কহিল, যেখানে হয় রেখে দাও।

সরযু হাত দিয়া টানিয়া চন্দ্রনাথের মুখ ফিরাইয়া ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কাদবার চেষ্টা করচ।

চন্দ্রনাথের মান হইল কথাটা বড় শক্ত বলা হইয়াছে। সরযু তখনই তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া বলিল, মনে ক'রে দেখ কোন দিন একটা পরিহাস করিনি, তাই যাবার দিনে আজ একটা তামাশা করলাম, রাগ করো না। তাহার পর কহিল, যা-কিছু ছিল, সমস্ত বন্ধ ক'রে আলমারিতে রেখে গেলাম, দেখো, মিছামিছি আমার একটি জিনিসও যেন নষ্ট না হয়।

চন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল, নিরাভরণ সরযুর হাতে শুধু চার-পাঁচ গাছি কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। সরযুর এ মূর্তি তাহার দুই চোখে শূল বিদ্ধ করিল, কিন্তু, কি বলিবে সে? আজ দু'খানা অলঙ্কার পরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া কি করিয়া সে এই দেবীর প্রতিমূর্তিটিকে অপমান করিবে? সরযু গলায় আঁচল দিয়া প্রশাম করিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, আমি যাঁচি ব'লে অনর্থক দুঃখ কবো না, এতে তোমার হাত নেই, আমি তা জানি।

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ পরন্তু সহ্য করিয়াছিল, আর পারিল না, ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ির সময় স্টেশনে যাইবে হইবে। বৃষ্টি আসিয়াছে, বাটাব বৃদ্ধ সরকার দুই-একখানি কাপড় গামছায় বাঁধিয়া কোচম্যানের কাছে গিয়া বসিল। সেই সীতা-দেবীর কথা বোধ করি তাগাব মনে পড়িয়াছিল, তাই চোখের জলও বড় শবল হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান, আমি ভূতা—তাই আজ আমার এই শাস্তি!

যাইবার সময় সরযু হরকালীর মনের ভাব বুঝিয়া ডাকিয়া প্রশাম করিল। পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, মামীমা, বাস্কাটা একবার দেখ।

হরকালী অপ্রতিভ হইলেন—না না না, থাক;—ততক্ষণে কিন্তু টিনের বাস্কা উন্মোচিত হইয়া হরকালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লোভ সংবরণ করা অসম্ভব; বক্রদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন, ভিতরে দুই-এক জোড়া সাধারণ বস্তু, দুই-তিনটা পুস্তক, কাগজে আবৃত দুইখানা ছবি, আরও দুই-একটা কি কি রহিয়াছে। সরযু কহিল, শুধু এই আছে।—হরকালী ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই সরযু গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া ফটক বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতলের জানালা খুলিয়া মণিশঙ্কর তাহা দেখিলেন। আজ তাহার হঠাৎ মনে হইল, বৃষ্টি কাজটা ভাল হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি মণিশঙ্কর ঘুমাইতে পারিলেন না। সারারাত্রি ধরিয়াই তাহার দুই কানের মধ্যে একটা ভারী গাড়ির গভীর অ'ওয়াজ শুমশুম শব্দ করিতে লাগিল। প্রভাতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, গেটের উপর একজন অপরিচিত লোক দীনবেশে অর্ধ-সুপ্তাবস্থায় বসিয়া আছে। কাছে যাইতেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি একজন পথিক। মণিশঙ্কর চলিয়া যাইতেছিলেন, সে পিছন হইতে ডাকিল, মণিশঙ্করবাবুর বাড়ি কি এই?

তিনি ফিরিয়া বলিলেন, এই।

তাঁহার সহিত কখন দেখা হ'তে পারে, ব'লে দিতে পারিন?

আমার নাম মণিশঙ্কর।

লোকটা সসন্ত্রমে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কাছেই এসেছি।

মণিশঙ্কর তাহার অপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, কাশী থেকে কি আসছ বাপু? আজে হাঁ।

দয়াল পাঠিয়েছে?

আজে হাঁ।—মণিশঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তবে আমার কাছে কেন? আমি টাকা দেব, তাই কি তুমি মনে করেচ?—লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। দয়ালঠাকুর বলে দিয়েছেন, আপনি টাকা পাবার সুবিধে করে দিতে পারবেন।

মণিশঙ্কর ভূ কৃষ্ণিত করিয়া বলিলেন, পারব। তবে ভেতরে এস।

দুইজনে নির্জন-কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। মণিশঙ্কর বলিলেন, সমস্ত তবে সত্য?

সমস্ত সত্য। এই বলিয়া সে কয়েকখানা পত্র বাহির করিয়া দিল। মণিশঙ্কর তাহা আগাগোড়া পাঠ করিয়া বলিলেন, তবে বউমার দোষ কি?

তার দোষ নেই, কিন্তু মায়ের দোষে মেয়েও দোষী হয়ে পড়েছে।

তবে যার নিজের দোষ নেই, তাহা কি জন্য বিপদগ্রস্ত করচ?

আমারও উপায় নেই। টাকার জন্য সব করতে হয়।

মণিশঙ্কর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, দেখ বাপু, এ দুর্নাম প্রকাশ পেলে আমারও অত্যন্ত লজ্জার কথা। চন্দ্রনাথ আমার প্রাতুষ্পুত্র।

রাখালদাস মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে কহিল, আমি নিরুপায়।

সে কথা তোমার দিকে থাকলেই তানা যায়। ধর, টাকা যদি আমি নিজেই দিই, তা হ'লে কি রকম হয়।—ভালই হয়। আর ক্রেতা স্বীকার করে চন্দ্রনাথবাবুর নিকট যেতে হয় না।

টাকা পোলেই তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, তাহা কোন কথা প্রকাশ করবে না, এ নিশ্চয়?

নিশ্চয়।

কত টাকা চাই?

অন্ততঃ দুই সহস্র।

মণিশঙ্কর বাহিরে গিয়া নায়ের লক্ষ্মীনাথায়ণকে ডাকিয়া দুই-তিনটি কথা বলিয়া দিলেন, তাহার পর ভিতরে আসিয়া একসহস্র করিয়া দুইখানি নোট বাঙ্ক খুলিয়া রাখালদাসের হাতে দিয়া বলিলেন, এখন থেকে দশ ক্রোশ দূরে সরকারী খাজনা ঘর, সেখানে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে, আর কোথাও ভাঙ্গান যাবে না। আর কখনো এ দিকে এসো না। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট নই, তাই আর যদি কখনো এ দিকে আসবার চেষ্টা কর, জীবিত ফিরতে পারবে না, তাও বলে দিলাম।

রাখালদাস চলিয়া গেল।

প্রাণপণে হাঁটিয়া অপরাহ্নে সে শহরে উপস্থিত হইল। তখন কাছারি বন্ধ হইয়াছে। কোন কাজ হইল না। পরদিন সময়ে রাখালদাস খাজাঞ্চীর নিকট দুইখানি হাজার টাকার নোট দিয়া কহিল, টাকা চাই।—খাজাঞ্চীবাবু নোট দুইখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, বসো, বলিয়া বাহিরে গিয়া একজন পুলিশের দারোগা সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাখালকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই নোট চুরি হয়েছে। জমিদার মণিশঙ্করবাবুর লোক বলচে, কাল সকালে ভিন্কার ছল করে তাঁর ঘরে ঢুকে এই দু'খানি নোট চুরি করেছে। নোটের নম্বর মিলচে।

রাখালদাস, কহিল, জমিদারবাবু নিজে দিয়েছেন।

খাজাঞ্চী কহিল, বেশ হাকিমের কাছে বলো।

যথাসময়ে হাকিমের কাছে রাখাল বলিল, যার টাকা, তাঁকে।—জায়া করলেই সমস্ত পরিষ্কার হবে। বিচারের দিন ডেপুটির আদালতে জমিদার মণিশঙ্কর উপস্থিত হইয়া হলফ লইয়া বলিলেন, তিনি লোকটাকে জীবনে কখনও দেখেন নাই। নোট তাঁহারই বাস্কে ছিল, কাহাকেও দেন নাই। রাখাল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অনেক কথা কহিতে চাহিল, হাকিম তাহা কতক কতক লিখিয়া লইলেন, কতক বা মণিশঙ্করের উকিল-মোক্তার গোলমাল করিয়া দিল। মোটের উপর, কথা কেহই বিশ্বাস করিল না, ডেপুটি তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিলেন।

ষাদশ পরিচ্ছেদ

হরিদয়ালের বাটিতে পুরাতন দাসীটি পর্যন্ত নাই। বায়ুন-ঠাকরুন ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধেশ। সরযু যখন প্রবেশ করিল, তখন বাটিতে কেহ নাই, শূন্য বাটি হাহা করিতেছে। বৃদ্ধ সরকার কাদিয়া কহিল, মা, আমি তবে যাই?

সরযু প্রশ্ন করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার কাদিতে কাদিতে প্রস্থান করিল—দয়ালঠাকুরের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না—ইচ্ছাও ছিল না।

সন্ধ্যার সময় দয়াল বাটি আসিলেন। সরযুকে দয়াল বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, কে?

সরযু প্রশ্ন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিয়া বলিল, আমি।

সরযু!—দয়াল বিস্মিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে দেখিলেন, সরযুর গাত্রে একখানিও অলঙ্কার নাই, পরিধেয় বস্ত্র সামান্য, দাসদাসী কেহ সঙ্গে আসে নাই, অদূরে একটা বাস্র মাত্র পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বিহ্বল করিয়া বলিলেন, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে। তাড়িয়ে দিয়েচে?—সরযু মৌন হইয়া রহিল।

দয়ালঠাকুর তখন অতিশয় কর্কশ-কণ্ঠে কহিলেন, এখানে তোমার স্থান হবে না। একবার আশ্রয় দিয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর নয়।

সরযু মাথা হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায়?

মাগী পালিয়েচে। আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে স'রে পড়েচে, যেমন চরিএ, সেইরূপ করেছে। রাগে তাহার সর্বাস্ত্র পড়িয়া যাইতেছিল, হঠাৎ বাস্র করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বলা যায় না—হয়ত কোথাও খুব সুখেই আছে।

সেইখানে সরযু বসিয়া পড়িল। সে যে অবশেষে তাহার মায়ের কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

দয়াল বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে স্থান দিয়ে জাত হারাতে চাইনে। যারা আদর করে নিয়ে গিয়েছিল, শেষকালে তারা কি তোমার মাথা রাখবার একটু কুঁড়োও বেঁধে দিতে পারেনি, তাই রেখে গেছে আমার কাছে? যাও এখন থেকে।

এবার সরযু কাদিয়া ফেলিল, বলিল, দাদামশাই, মা নেই, আমি যাব কোথায়?

হরিদয়ালের শরীরে আর মায়া-মমতা নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কাশীর মত স্থানে তোমাদের স্থানাভাব হয় না। সুবিধামত একটা খুঁজে নিয়ে। তিনি নাকি বড় জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন, তাই এমন কথাটাও কহিতে পারিলেন।

সরযুর স্বামী তাঁহাকে গৃহে স্থান দেয় নাই, হরিদয়াল দিবেন কেন? ইহাতে তাঁহাকে দোষ দিবার কিছু নাই, সরযু তাহা বুঝিল। কিন্তু তাহারও যে আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। স্বামীর গৃহে দু'দিনের আদর-যত্নে অতিথির মত গিয়াছিল—এখন বিদায় হইয়া আসিয়াছে। এ সংসারে, সেই যত্নপরায়ণ গৃহস্থ আর ফিরিয়া দেখিবে না, অতিথিটি কোথায় গেল! বড় যতনায় তাহার নীরব-অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল। এই তাহার সতরো বছর বয়স,—তাহার সব সাধ ফুরাইয়াছে! মাতা নাই, পিতা নাই, স্বামী পরিভ্যাগ করিয়াছেন। দাঁড়াইবার স্থান নাই, আছে শুধু কলঙ্ক, লজ্জা আর বিপুল রূপবৌবন। এ নিয়ে বাঁচা চলে, কিন্তু সরযুর চলে না। সে ভাবিতেছিল, তাহার কত আত্ম, আর কতদিন বাঁচিতে হইবে! যতদিন হউক, আজ শাহার নূতন জন্মদিন। যদিও দুঃখকষ্টের সহিত তাহার পূর্বেই পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু এরূপ তীব্র অপমান এবং লাঞ্ছনা কবে সে ভোগ করিয়াছে? দয়ালঠাকুর উত্তরোত্তর উত্তেজিত-কণ্ঠে কথা কহিতেছিলেন, এবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ব'সে রইলে যে?

সরযু আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাব?

আমি তার কি জানি?

সরযু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, দাদামশাই, আজ রাত্রি—

দূর দূর, একদণ্ডও না।

এবার সরযু উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিতে মনে একটু সাহস হইল, মনে করিল, যাহার কাছে শত

অপরোধেও ভিক্ষা চাহিবার অধিকার ছিল, তাহার কাছেই যখন চাহি নাই, তখন পরের কাছে চাহিব কি জন্য? মনে মনে বলিল, আর কিছু না থাকে কাশীর গঙ্গা ত এখনও শুকায় নাই, সে সমাজের ভয়ও করে না, তাহার জাতিও যায় না; এ দুঃখের দিনে একটি দুঃখী মেয়েকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইবে। আমার আর কোথাও আশ্রয় না থাকে, সেখানে থাকিবেই। সরযু চলিতে লাগিল, কিন্তু চলিতে পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল।

দয়ালঠাকুর ভাবিলেন, এমন বিপদে তিনি জন্মে পড়েন নাই। তাঁহার গলাটা শুকইয়া আসিতেছিল; পাছে অবশেষে দমিয়া পড়েন, এই ভয়ে চীৎকার করিয়া কহিলেন, অপমান না হ'লে বুঝি যাবে না? এই বেলা দূর হও—

এমন সময় সহসা বাহির হইতে ডাক আসিল, বাবাজী!

হরিদয়াল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ বুঝি খুড়ো আসচে। বলিতে বলিতেই কৈলাসচন্দ্র এক হাতে দাবার পুটলি, অপর হাতে ঠকা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে এইমাত্র আসিয়াছিলেন, তাহা নহে; গোলামাল ওনিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া হরিদয়ালের তিরস্কার ও গালিগালাজ শুনিতেছিলেন। তাই যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন হাতে দাবার পুটলি ও ঠকা ছিল, কিন্তু মুখে হাসি ছিল না। সোজা সরযুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সরযু যে! কখন এলে মা?

সরযু কৈলাসখুড়োকে চিনিত, প্রশ্নাম করিল।

তিনি আশীর্বাদ করিলেন, এস মা, এস। তোমাদের ছেলের বাড়িতে না গিয়ে এখানে কেন মা? তাহার পর ঠকা নামাইয়া গাখায়া সরযুর ঠিনের বাল্লটা একেবারে কক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, চল মা, সন্ধ্যা হয়। কথাগুলি তিনি একরূপভাবে কহিলেন, যেন তাহাকে লইবার জন্যই আসিয়াছিলেন! সরযু কোন কথাই পরিষ্কার বুঝিতে পারিল না, অশোমুখে বসিয়া রহিল।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইলেন, শহিলেন, তোর খুড়ো ভেলেব বাড়ি যেতে লজ্জা কি? সেখানে কেউ তোকে অপমানের কথা বলবে না, মা-বাটায়ে নিলে নতুন করে ঘাঁকরা করব, চল মা, দেরি করিস নে।

সরযু তথ্যনি উঠিতে পারিল না।

হরিদয়াল হাঁকিয়া বলিলেন, খুড়ো, কি করচো?

কিছু না বাবাজী। কিন্তু তখনই সরযুর খুব নিকটে আসিয়া হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিবার মত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিলেন, চল না মা, বাঁসে বাঁসে মছে কটু কথা। বচিস?

সরযু উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া হরিদয়াল কহিলেন, খুড়ো কি একে বাড়ি নিয়ে যাবে?

খুড়ো জবাব দিলেন, না বাবা, রাস্তায় বসিয়ে দিতে যাচ্ছি।

ব্যঙ্গোক্তি ওনিয়া হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কিন্তু খুড়ো, কাজটি ভাল হচ্ছে না। কাল কি হবে, ভেবে দেখো।

কৈলাস তাহার উত্তর দিলেন না, কিন্তু সবযুকে কহিলেন, শিগগির চল না মা, নইলে আবার হয়ত কি বলে ফেলবে।

সরযু দরজার বাহিরে আসিয়া পড়িল। কৈলাসচন্দ্রও ঘাড়ে বাস্ত্র লইয়া পশ্চাতে চলিলেন।

হরিদয়াল পিছন হইতে কহিলেন, খুড়ো, শেষে কি জাতটা দেবে?

কৈলাসচন্দ্র না ফিরিয়াই বলিলেন, বাবাজী, নাও ত দিতে পারি।

আমাদের সঙ্গে তবে আহাির বন্ধ হ'ল।

কৈলাসচন্দ্র এবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কবে কার ডিতে দয়াল, কৈলাসখুড়ো পাত পেতেছে?

তা না পাত, কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি।

কৈলাস ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কাশীবাসের মধ্যে আজ তাঁহার এই প্রথম ক্রোধ দেখা দিল। বলিল, হরিদয়াল, আমি কি কাশীর পাণ্ডা, না যজ্ঞমানের মন জুগিয়ে অগ্নের সংস্থান করি? আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমি যা গাল বুঝি, তাই চিরদিন করেচি, আজও তাই করব। সেজন্য

তোমার দুর্ভাবনার আবশ্যক নেই।

হরিদয়াল শুধু হইয়া কহিলেন, তোমার ভালর জন্য—

থাক বাবাজী! যদি এই নয়বট্টি বছর তোমার পরামর্শ না নিয়েই কাটিতে পেরে থাকি তখন বাকী দু'চার বছর পরামর্শ না নিলেও আমার কেটে যাবে। যাও বাবাজী, ঘরে যাও।

হরিদয়াল পিছাইয়া পড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র বাটিতে পৌছিয়া বাস্ক নামাইয়া সহজভাবে বলিলেন, এ ঘরবাড়ি সব তোমার মা, আমি তোমার ছেলে। বুড়োকে একটু-আধটু দেখো, আর তোমার নিজের ঘরকন্না চালিয়ে নিয়ো, আর কি বলব?—কৈলাসের আর কোন কথা কহিবার ছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সরযু বহুক্ষণ অবধি অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোন কথাই আর বলিবার নাই।

সরযু আশ্রয় পাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শরৎকালে প্রান্তঃসমীরণ যখন সিন্ধু-মধুর সঙ্করশে চন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিত, সারা রাত্রির দীর্ঘ জাগরণের পর চন্দ্রনাথ এই সময়টিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার পর তপ্ত সূর্যরশ্মি জানালা দিয়া তাহার মুখের উপর, চোখের উপর পড়িত, চন্দ্রনাথের আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু ঘুমের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চাহিত না, পাত্যায় পাত্যায় জড়াইয়া থাকিত, তথাপি সে জোর করিয়া বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত। সারাদিন কাজকর্ম নাই, আমোদ নাই, উৎসাহ নাই, দুঃখ-ক্লেশও প্রায় নাই, সুখের কামনা ত সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। শীগকায়ী নদীর উপর দিয়া সজ্জার দীর্ঘ ভাববাহী তরঙ্গী যেমন করিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া ঝাঁকিয়া চুরিয়া মছরগমনে খেঁজামত ভাসিয়া যায়, চন্দ্রনাথের ভাবী দিনগুলোও ঠিক তেমনি করিয়া এক সূর্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্যোদয় পর্যন্ত ভাসিয়া যাইতে থাকে। সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে, যে দিগন্ত-প্রসারিত কালোমেঘ তাহার মুখের সূর্যকে ভীবনের মধ্যাহ্নেই আচ্ছাদিত করিয়াছে, এই মেঘের আড়ালেই একদিন সে সূর্য অন্তঃগমন করিবে। ইহজীবনে আর সাক্ষাৎলাভ ঘটবে না। তাহার নীরব, নির্জন কক্ষে এই নিরাশায় কালো ছায়াই প্রতিদিন ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল এবং তাহারি মাঝখানে বসিয়া চন্দ্রনাথ অলস-নির্মীলিত চোখে দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল।

হরকালী বলেন, এই আগ্রহায়ণ মাসেই চন্দ্রনাথের আবার বিবাহ হইবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকে। এই চুপ করিয়া থাকা সম্মতি বা অসম্মতির লক্ষণ, তাহা নির্ণয় করিতে স্বামী'র সঙ্গে তাহার তর্ক-বিতর্ক হয়। মণিশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু কলা যায় না।

এবার কার্তিক মাসে দুর্গা-পূজা। মণিশঙ্করের ঠাকুর-দালান হইতে সানাইয়ের গান প্রান্তঃকাল হইতে গ্রামবাসীদের কানে কানে আগামী আনন্দের বার্তা ঘোষণা করিতেছে। চন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। নিমীলিতচক্ষে বিছানায় পড়িয়া শুনিতেছিল, একে একে কত কি সুর বাজিয়া যাইতেছে। কিন্তু একটা সুরও তাহার কাছে আনন্দের ভাষা বহিয়া আনিল না; বরঞ্চ ধীরে ধীরে হৃদয়-আকাশ গাঢ় কালোমেঘে ছাইয়া যাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, এখানে আর ত থাকা যায় না; একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নে, রাত্রির গাড়িতে এলাহাবাদ যাব।

এ কথা হরকালী শুনি'ন পছিয়া ছুটিয়া আসিলেন, ব্রজকিশোর আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, এমন কি মণিশঙ্কর নিজে আসিয়াও অনুরোধ করিলেন যে আজ বটীর দিনে কোথাও গিয়া কাজ নাই।

চন্দ্রনাথ কাহারও কথা শুনি'ল না।

দুপুরবেলা হরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরযু গিয়া অবধি এ বাটিতে তিনি আসেন নাই।

চন্দ্রনাথ তাঁহাকে সেখিয়া বলিল, হঠাৎ ঠানদিদি কি মনে করে।

ঠানদিদি জবাব না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, আজ বিশেষে যাচ্ছ?

চন্দ্রনাথ বলিল, বাচি।

পশ্চিমে যাবে?

যাবো।

হরিবালা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দাদা, আর কোথাও যাবে কি?

চন্দ্রনাথ হরিবালার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল, না। তাহার পর অনামনস্বভাবে এটা ওটা নাড়িতে লাগিল।

হরিবালা যে কত কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে তাঁহার লজ্জা করিতেছিল, সাহসও হইতেছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, দাদা, তার একটা উপায় করিলে না? দুইজনের দেখা হওয়া অবধি দুইজনেই মনে মনে তাহার কথাই ভাবিতেছিল,— তাই এই সামান্য কথাটিতে দুইজনের চক্ষেই জল আসিয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ সামলাইয়া লইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, উপায় আর কি করব যদি?

কাশীতে সে আছে কোথায়?

বোধ হয়, তার মায়ের কাছে আছে।

তা আছে, কিন্তু—

চন্দ্রনাথ মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কি?

ঠানদিদি ঋণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, রাগ করে' না' দাদা—

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

ঠানদিদি তেমন না মিনতির স্বরে বলিলেন, কিছু টাকাকড়ি দিয়ে দাদা—আজ যেন সে একলা আছে, কিন্তু দু'দিন পরে—

চন্দ্রনাথ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিল না, বলিল, কি দু'দিন পরে?

বড় বড় দু'মোটো চোখের জল হরিবালা চন্দ্রনাথের সম্মুখেই মুছিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তবে পেটে যা আছে, ভালয় ভালয়, তা যদি বেঁচে-বচে থাকে, তা হ'লে—

চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, ওড়াওড়ি সে বলিয়া উঠিল, ঠানদিদি আজ বৃষ্টি বর্ষা? হ্যাঁ, তাই।

আজ তা হ'লে—

যাবে না মনে কচ্ছ?

তাই ভাবছি।

তবে তাই করো। পূজোর পব যেখানে হয় যেমত, এ কটা দিন বাড়িতেই থাক।

কি জানি কি ভাবিয়া চন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত হইল।

বিজয়ার পর একদিন চন্দ্রনাথ গোমস্তাকে ডাকিয়া বলিল সরকারমশাই, কাশীতে তাকে বেধে আসবার সময় হরিদয়াল কি কিছু ব'লে দিয়েছিলেন?

সরকার কহিল, তাঁর সঙ্গে আমার ত দেখা হয় নি।

চন্দ্রনাথ ভয় পাইয়া কহিল, দেখা হয় নি? তবে কার কাছে দিয়ে এলেন? তার মায়ের সঙ্গে ত দেখা হয়েছিল?

সরকার মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছ না, বাড়িতে ত কেউ ছিল না।

কেউ ছিল না? সে বাড়িতে কেউ থাকে কি না, সে সংবাদ নিয়েছিলাম? হরিদয়াল আর কোথাও উঠে যেতেও ত পারেন!

সরকার কহিল, সে সংবাদ নিয়েছিলাম। দয়াল ঘোষাল সেই বাড়িতে থাকতেন।

চন্দ্রনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঋণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ পর্যন্ত কত টাকা পাঠিয়েছেন?

আজ্ঞে, টাকাকড়ি ত কিছু পাঠাই নি।

পাঠান নি! চন্দ্রনাথ বিষয়ে, বেদনায়, উৎকণ্ঠায় পাণ্ডবর্ণ হইয়া কহিল, কেন?

সরকার লজ্জায় ভিন্নমুখ হইয়া কহিল, মামাবাবু বলেন, পাঁচ টাকার হিসাবে কিছু পাঠালেই হবে।

জবাব শুনিয়া চন্দ্রনাথ অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল।

পাঁচ টাকার হিসাবে? কেন, টাকা কি মামাবাবুর? আপনি প্রতি মাসে কাশীর ঠিকানায় পাঁচ শ টাকা করে পাঠাবেন।

সরকার, যে আজে, বলিয়া স্তম্ভিত হইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

হরকালী এ কথা শুনিয়া চক্কু কপালে তুলিয়া বলিলেন, সে পাগল হয়েছে। সরকারকে তলব করিয়া অন্তরাল হইতে জোর করিয়া হাসিলেন। হাসির ছটা ও ঘট্টা বৃদ্ধ সরকার শুনিতেও পাইল, বুঝিতেও পারিল। হরকালী কহিলেন, সরকারমশায়, কত টাকা পাঠাতে বলেচে?

প্রতিমাসে পাঁচ শ টাকা।

ভিতর হইতে পুনর্বীর বিদ্রূপের হাসি শুনিয়া সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

হরকালী অনেক হাসিয়া পরিশেষে গভীর হইলেন। ভিতর হইতে বলিলেন, আহা, বাছার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না। সে গোড়া-কপালীর যেমন অদৃষ্ট! আমি পাঁচ টাকা ক'রে দিতে বলেচি, তাই রেগে উঠেচে। বলে, পাঁচ শ টাকা করে দিও। বুঝলেন সরকারমশায়, চন্দ্রনাথের ইচ্ছা নয় যে, এক পয়সাও দেওয়া হয়।

কথাটা কিন্তু সরকার মহাশয় প্রথমে তেমন বুঝিল না; কিন্তু মনে মনে যত হিসাব কবিল, তত বোধ হইতে লাগিল, হরকালীর কথাটাই সত্য। যাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাকে কি কেহ ইচ্ছাপূর্বক অত টাকা দেয়?

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, তা আপনি যা বলেন।

বলব আর কি! এই সামান্য কথাটা বুঝলেন না?

সরকার মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তাই হবে।

হ্যাঁ, তাই। আপনি কিন্তু পাঁচ টাকা হিসাবে পাঠাবেন। চন্দ্র না দেয়, আমার হিসেব থেকে পাঁচ টাকা পাঠাবেন।

হরকালী মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া নিজের হিসাবে হাতখরচ পাইতেন।

সরকার মহাশয় প্রশ্ন করিবার সময় বলিল, তাই পাঠাব।

চন্দ্রনাথ বাড়ি নাই। এলাহাবাদে গিয়াছে। সরকার মহাশয় তাহাকে পত্র লিখিয়া মতামত জ্ঞানিবাব ইচ্ছা করিল, কিন্তু পরে মনে হইল, এরূপ অসম্ভব কথা লইয়া অনর্থক তোলাপাড়া কবিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়া লাভ নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

উপরিউক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসরে আর কোন পরিবর্তন হউক বা না হউক, কৈলাসখুড়ার জীবনে বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যেদিন তাঁহার কমল চলিয়া গিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার কমলচরণ সর্বশেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করিয়া ইহজীবনের মত চক্কু মুদিয়াছিল, সেই দিন হইতে বিপুল কিঞ্চৎ কৈলাসচন্দ্রের পক্ষে চক্কু মুদিয়াছিল; কিন্তু সরযুর ওই ক্ষুদ্র শিঙাটি তাঁহাকে পুনর্বীর সেই বিদ্রূত-সংসারের স্নেহময় জটিল-পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সেদিন তাঁহার ক্ষুদ্র চক্কু-দু'টি কখনও পরে আর-একবার জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, চক্কু মুছিয়া বলিয়াছিলেন, আমার ঘরে বিবেকের এসেছেন।

তখনও সে ছোট ছিঁ; 'বিশ্ব' বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিতে পারিত না, শুধু চাহিয়া থাকিত। তখন সে সরযুর ক্রোড়ে, লম্বাঘার মার ক্রোড়ে এবং বিদ্যানার ওইয়া থাকিত; কিন্তু যেদিন হইতে সে তাহার চক্কল পা-দু'টি চৌকাঠের বাহিরে লইয়া যাইতে শিখিয়াছে, সেদিন হইতে সে বুঝিয়াছে, দুখের চেয়ে জল ভাল এবং বিধাশূন্য হইয়া পরিষ্কার অপরিষ্কার সর্বাধিক জলপাত্রেই মুখ ডুবাইয়া সরযুকে কীকি দিয়া আকর্ষণ খায় এবং যেদিন হইতে তাহার কিশাস জন্মিয়াছে যে, তাহার গুণকোমল উদর এবং দুখের উপর করুণা কিংবা ধূলার প্রলেপ দিতে পারিলেই মেহের শোভা বাড়ে, সেইদিন হইতে সে সরযুর কোল ছাড়িয়া মাটি এবং তথা হইতে কৈলাসচন্দ্রের ক্রোড়ে স্থান করিয়া লইয়াছে। সকালবেলা

কৈলাসচন্দ্র ডাকেন, 'বিশু', বিশু মুখ বাড়াইয়া বলে, 'দাদু', কৈলাসচন্দ্র বলেন, 'চল ত দাদা, শব্দ মিশিরকে এক বাজি দিয়ে আসি', সে অমনি দাবার পুটলিটা হাতে লইয়া 'তল' বলিয়া দুই বাজ প্রসারিত করিয়া বৃক্ষের গলা জড়াইয়া ধরে। কৈলাসচন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। সরযুকে ডাকিয়া বলেন, মা, বিশু আমার একদিন পাকা খেলোয়াড় হবে। সরযু মুখ টিপিয়া হাসে, বিশু দাবার পুটলি হাতে লইয়া বৃক্ষের কোলে বসিয়া দাবা খেলিতে বাহির হয়। পথে যাইতে যদি কেহ তামাশা করিয়া কহে, বুড়ো বুড়ো-বয়সে কি আরও দুটো হাত গজিয়েছে?

বৃক্ষ একগাল হাসিয়া বলেন, বাবাজী, এ হাত-দুটোতে আর জোর নেই, বড় শুকনো হয়ে গেছে; তাই দু'টো নতুন হাত বেরিয়েছে, যেন সংসারের গাছ থেকে পড়ে না যাউ।

তাহারা সরিয়া যায়—বুড়োর কাছে কথায় পারিবার জো নেই।

শব্দ মিশিরের বাটিতে সতরঞ্চ খেলার মধ্যে শ্রীমান বিশ্বেশ্বরেরও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। দাদামহাশয়ের জানুর উপর বসিয়া, লাল রঙের কৌচা ভুলাইয়া, গম্ভীরভাবে চাহিয়া থাকে, যেন দরকার হইলে সেও দুই-একটা চাল বসিয়া দিতে পারে।

হস্তীদন্তনির্ধিত বলগুলো যখন একটির পর একটি করিয়া তাহার দাদামহাশয়ের হস্তে নিহত হইতে থাকে, অতিশয় উৎসাহের সহিত বিশ্বেশ্বর সেগুলি দুই হাতে লইয়া পেটের উপর চাপিয়া ধরে। কিন্তু লাল রঙের মস্তিষ্কার উপরই তাহার কৌচা কিছু অধিক। সেটা যতক্ষণ হাতে না আসিয়া উপস্থিত হয়, ততক্ষণ সে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাগিদ দিয়া কহে, দাদু, ঐতে? কৈলাসচন্দ্র সেলাব কৌচকে এনাংক হইয়া কহেন, দাঁড়া দাদা—। কখনও হয়ত বা সে আশেপাশে সরিয়া যায়, কৈলাসচন্দ্রের মনটিও চঞ্চলভাবে একবার বিশু ও একবার সতরঞ্চের উপর আনাগোনা করিতে থাকে, গোলমালে হয়ত বা একটা বল মকা পড়ে—কৈলাসচন্দ্র অমনি ফিরিয়া ডাকেন, দাদু, হোর যাই যে—আয় আয়, ছুটে আয়। বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া তাহার পূর্বস্থান অধিকার করিয়া বসে, সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষেরও দ্বিগুণ উৎসাহ ফিরিয়া আসে। খেলা শেষ হইলে সে লাল মস্তিষ্কা হাতে লইয়া দাদামহাশয়ের কোলে উঠিয়া বাতী ফিরিয়া যায়।

কৈলাসচন্দ্রের এইরূপে নতুন ধরনের দিনগুলো কাটে। পুরাতন বাধা নিয়মে বিষম বাধা পড়িয়াছে। সাবেক দিনের মত দাবার পুটলি আর সব সময়ে তেমন যত্ন পায় না, হয়ত বা ঘরের কোণে একবেলা পড়িয়া থাকে; শব্দ মিশিরের সহিত বোজ সকালবেলা হয়ত বা দেখাশুনা করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। গল্পা পাড়ের ত্রিপ্রাভরিক খেলাটা ত একরূপ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। জ্ঞাব পব মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আর তেমন লোক ভ্রমে না,—মুকুন্দ ঘোষ ডাকিয়া ডাকিয়া, এ মানিয়াছে—কৈলাসচন্দ্রকে রাগে আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সে সময়টা তিনি প্রাণীপের আলোকে বসিয়া নতুন শিয়াটিকে খেলা শিখাইতে থাকেন, বলেন, বিশু ঘোড়া আড়াই পা চলে:

বিশু গম্ভীরভাবে বলে, ঘোষা—

হী ঘোড়া—

ঘোয়া চয়ে—ভাবটা এই যে, ঘোড়া চলে।

হী, ঘোড়া চলে, আড়াই পা চলে।

বিশ্বেশ্বরের মনে নতুন ভাবোদ; হয়, বলে গাফী চয়ে—

কৈলাসচন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, না দাদা, এ ঘোড়া গাড়ি টানে না, এ ঘোড়া আলাদা।

সরযু এ সময় নিকটে থাকিলে, পুত্রের বুদ্ধিব তীক্ষ্ণতা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসি, চলিয়া যায়।

বিশু আঙুল বাড়াইয়া বলে, ঐতে। অর্থাৎ সেই লাল রঙের মস্তিষ্কা এখন চাই। বৃক্ষ কিছুতেই বৃক্ষিয়া উঠিতেন না যে, এতগুলো প্রবা থাকিতে ঐ লাল মস্তিষ্কার উপরেই তাহার এত নজর কেন?

প্রার্থনা কিন্তু অগ্রাহ্য হইবার জো নাই। বৃক্ষ প্রথমে দুই-একটা 'বোর্ডে' হাতে দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বড় বিজ্ঞ, কিছুতেই ভুলিত না। তখন অনিচ্ছা-সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র হস্তে প্রার্থিত বস্তুটি তুলিয়া দিয়া বলিতেন, দেখিস দাদু, যেন হারায় না।

কেমন?

মন্ত্রী হারালে কি খেলা চলে?

চয়ে না?

কিছুতেই না।

বিশু গম্ভীর হইয়া বলিত, দাদু—মন্ত্রী!

হী দাদু—মন্ত্রী!

সেদিন ভোলানাথ চাটুয্যের বাটীতে কথা হইতেছিল, কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, বিশু, চল দাদু, কথা শুনে আসি।

বিশ্বেশ্বর তখন লাল কাপড় পরিয়া, জামা গায়ে দিয়া, টিপ পরিয়া, চুল আঁচড়াইয়া দাদুর কোলে চড়িয়া কথা শুনিতে গেল। কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন। কল্পকণ্ঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া সেই বনবাসী মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেমন করিয়া সেই সদাঃপ্রসূত মৃগ-শাবক কাতর-নয়নে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আহা, রাজা ভরত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সময় বিশু একটু সরিয়া বসিয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইলেন।

তাহার পর কথক গাহিলেন, সেই মৃগ-শিশু কেমন করিয়া পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে তাহার ছিন্ন স্নেহভোর আবার গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই শতভয় মায়াশৃঙ্খল তাহার চতুষ্পার্শ্বে জড়াইয়া দিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই মৃগ-শিশু নিভাকর্ম পূজাপাঠ, এমন কি, ঈশ্বর-চিন্তার মাঝে আসিয়াও অংশ লইয়া যাইত। ধ্যান করিবার সময়ে মনশ্চক্রে দেখিতে পাইতেন, সেই নিরাশ্রয় পশু-শাবকের সজলকরণ-দৃষ্টি তাহার পানে চাহিয়া আছে, তাহার পর সে বড় হইতে লাগিল। ক্রমে কুটীর ছাড়িয়া প্রান্তরে, প্রান্তর ছাড়িয়া পুষ্পকাননে, তাহার পর অরণ্যে, ক্রমে সুদূর অরণ্যপথে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ফিরিয়া আসিবার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে রাজা ভরত উৎকণ্ঠিত হইতেন। সঘনে ডাকিতেন, আয়, আয়, আয়! তাহার পর কবি নিজে কাদিলেন, সকলকে কাদাইয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া একদিন সে আকস্মিক মায়াবন্ধন নির্মিমে ছিন্ন করিয়া গেল,—বনের পশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা বুঝিল না। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্ববে ডাকিলেন, আয়, আয়, আয়! কেহ আসিল না, কেহ সে আকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন সমস্ত অরণ্য অবেশণ করিলেন, প্রতি কন্দরে কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাবিতানে কাদিয়া ডাকিলেন, আয়, আয়, আয়! কেহ আসিল না। প্রথমে তাহার আহ্বার-নিদ্রা বন্ধ হইল, পূজাপাঠ উঠিয়া গেল—তাঁহার ধ্যান, চিন্তা—সব সেই নিরুদ্দেশ স্নেহাস্পদের পিছে পিছে অনুদ্দেশ বনপথে ছুটিয়া গিরিতে লাগিল।

কবি গাহিলেন, মৃত্যুর কালোছায়া ভুলুষ্ঠিত ভরতের অঙ্গ অধিকার করিয়াছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, তথানি ভূবিত গুহ্য ধীরে ধীরে কাদিয়া উঠিতেছে। যেন এখনও ডাকিতেছেন, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়!

কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সবলে বকে চাপিয়া হাহা-রবে কাদিয়া উঠিলেন। অন্তরের অন্তর কাদিয়া কাদিয়া কাদিয়া উঠিল, আয়, আয়, আয়!

সভায় কেহই বুকের এ ক্রন্দন অব্যাহত মনে করিল না। কারণ, বয়সের সহিত সকলেরই কেহ না কেহ হারাইয়া গিয়াছে। সকলেরই হৃদয় কাদিয়া ডাকিতেছে—ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়! কৈলাসচন্দ্র চক্ষু মুছিয়া বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিলেন, চল দাদা, বাড়ি যাই—রাস্তার হয়েছে।

বিশু কোলে উঠিয়া বাড়ি চলিল। অনেকেই একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ঘুম পাইয়াছিল, পথিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাড়ি গিয়া কৈলাসচন্দ্র সন্ন্যাস নিকট তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, নে মা, তোর জিনিস তোর কাছে থাক।

সরযু দেখিল, বুড়োর চকু-দু'টি আজ বড় ভারী হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই দুই বৎসরের মধ্যে চন্দ্রনাথের সহিত তাহার বাটীর সম্বন্ধই ছিল না। শুধু অর্থের প্রয়োজন হইলে সরকারকে পত্র লিখিত, সরকার লিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়া দিত।

দুঃখ করিয়া হরকালী মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। ব্রজকিশোর ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি দিতেন। মণিশঙ্করও দুই-একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে, এ সময় একবার দেখিবার ইচ্ছা করে।

প্রথমে চন্দ্রনাথ সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিত না, কিন্তু, যেদিন হরিবালা লিখিলেন, তুমি সুবিধা পাইলে একবার আসিয়া, কিছু বলিবার আছে, সেই দিন চন্দ্রনাথ তল্লি বাঁধিয়া গাড়িতে উঠিল। হরিবালা যদি কিছু কহেন, যদি কোন পত্র, যদি কোন হস্তলিপি দেখাইতে পারেন, যদি সেই বিগত সূতের একটি আভাস তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইলে—কিছু নয়। তথাপি চন্দ্রনাথ বাটী অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু এতখনি পথ যে আশায় ভর করিয়া ছুটিয়া আসিল, বাটীতে আসিয়া তাহার কিছুই মিলিল না। হরিবালাও সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, ঠানদিদি, আর কিছু বলবে না?

না, আর কিছু না।

নিবারণ হইল?—না, কতিল, তবে কেন মিথ্যা ক্রেশ দিয়ে ফিরিয়ে আনলে?

বাড়ি না এলে কি ভাল দেখায়? তাহাও পদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, যা হবার হয়েছে—এখন তুমি সংসারী না হ'লে আমাদের দুঃখ বাত্বার স্থান থাকবে না।

চন্দ্রনাথ বিবস্ত্র হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, এ আমি কি কবব?

কিন্তু মণিশঙ্কর কিছুতেই ছাড়িলেন না। হাত ধরিয়া বলিলেন বাবা, আমাকে মাপ কর। সেই দিন থেকে যে জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি তা শুধু অস্ব্যমিতি ভানেন।

চন্দ্রনাথ বিপন্ন হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

মণিশঙ্কর পুনরাপি বলিতে লাগিলেন, আবার বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন কর। আমি তোমার মনোমত পাঠী অধেষণ করে রেখেছি, শুধু তোমার অভিপ্রায় জানবার অপেক্ষায় এখনও কথা দিইনি। বাবা, এক সংসার গত হ'লে লোকে কি দ্বিতীয় সংসার কবে না?

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল, এক সংসার গত হয়েছে—সে সংবাদ পেলে পাঁচ

দুর্গা—দুর্গা—এমন কথা বলতে নেই বাবা।

চন্দ্রনাথ চাপ করিয়া রহিল।

মণিশঙ্কর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমায় মনে হয়, আমিই তোমাকে সংসারত্যাগী করিয়েছি। এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না।

চন্দ্রনাথ বক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, কোথায় সম্বন্ধ স্থির করেচেন?

মণিশঙ্কর চকু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কলকাতায়; তুমি একবার নিজের দেখে এলেই হয়।—চন্দ্রনাথ কহিল, তবে কালই গাব।

মণিশঙ্কর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তাই করো। যদি পছন্দ হয় আমায় লিখো, আমি বাটীর সকলকে নিয়ে একেবারে কলকাতায় উপস্থিত হব। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, আমার আর বাঁচবার বেশী দিন নেই চন্দ্রনাথ, তোমাকে সংসারী এবং সুখী দেখতে যত্নসহে যেতে পারব।

পরদিন চন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিল। সঙ্গে মাতুল ব্রজকিশোরও আসিয়াছিলেন। কন্যা দেখা শেষ হইলে ব্রজকিশোর বলিলেন, কন্যাটি দেখতে মা-লক্ষ্মীর মত।

চন্দ্রনাথ মুখ কিরাইয়া রহিল, কোনও মতামত প্রকাশ করিল না।

সে-কন্যা আসিয়া টিকিট লইয়া দুইজনে গাড়িতে উঠিলে ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বাবাজী, পছন্দ হয়েছে ত?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন,—এমন মেয়ে, তবু পছন্দ হ'ল না?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি সরযুকে দেখেন নাই।

তাহার পর, নির্দিষ্ট স্টেশনে ট্রেন থামিলে ব্রজকিশোর নামিয়া পড়িলেন। চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট লইয়াছিল।—ব্রজকিশোর বলিলেন, তবে কতদিনে ফিরবে?

কাকাকে প্রশ্ন জ্ঞানিয়ে বলবেন, শীঘ্র ফেরবার ইচ্ছা নাই।

মণিশঙ্কর সে কথা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, যা হয় হবে। আমার সেইটা একটু ভাল হ'লেই নিজে গিয়ে বউমাকে ফিরিয়ে আনব। মিথ্যা সমাজের ভয় ক'রে চিরকাল নরকে পচতে পারব না—আর সমাজই বা কে? সে ত আমি নিজে।

হরকালী এ সংবাদ শুনিয়া দস্তে দস্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, মরবার আগে মিনসের বায়াবুরে ধরেচে! সরকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রনাথ কি বললে?

সরকার কহিল, আজ পর্যন্ত কত টাকা কাশীতে পাঠানো হয়েছে?

শুধু এই জিজ্ঞেস করেছিল—আর কিছু না?

না।

হরকালী মুখের ভাব অতি ভীষণ কবিয়া চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে অকস্মাৎ সমস্ত পরিবর্তন করিয়া কাশী আসিয়া উপস্থিত হইল।

সঙ্গে যে দুইজন ভূতা ছিল, তাহারা গাড়ি ঠিক করিয়া জিনিসপত্র তুলিল; কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহাতে উঠিল না; উহাদিগকে ডাকবাংলায় অপেক্ষা করিয়া থাকিবার হুকুম দিয়া পদব্রজে অন্য পথে চলিয়া গেল। পথে চলিতে তাহার ক্রেশ বোধ হইতেছিল। মুখ শুষ্ক, বিকর্ণ, নিজের প্রতি পদক্ষেপ নিজের বুকের উপরেই যেন পদাঘাতের মত বাজিতে লাগিল, তথাপি চন্দ্রনাথ চলিতে লাগিল, থামিতে পারিল না। ক্রমেই হরিদয়ালের বাটীর দূরত্ব কমিয়া আসিতেছে। এ সমস্তই যে তাহার বিশেষ পরিচিত পথ! গলির মোড়ের সেই ছোট চেনা দোকানটি—ঠিক তেমনি রহিয়াছে। দোকানের মালিক ঠিক তত বড় ভুঁড়িটি লইয়াই মোড়ার উপর বসিয়া ফুলুরি ভাজিতেছে। চন্দ্রনাথ একবার দাঁড়াইল, দোকানদার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সাহেবী পোশাক-পরা লোকটিকে সাহস করিয়া ফুলুরি কিনিতে অনুরোধ করিতে পারিল না, একবার চাহিয়াই সে নিজের কাজে মন দিল।

চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। এই মোড়ের শেষে—আর ত তাহার পা চলে না। সর্দীপ কাশীর পথে যেন কিছুমাত্র বাতাস নাই, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রেশ হইতেছে, দুই-এক পা গিয়া সে দাঁড়ায়—আবার চলে, আবার দাঁড়ায়, পথ আর ফুরায় না, তথাপি মনে হয়, এ পথ যেন না ফুরায়! পথের শেষে না জানি কিবা দেখিতে হয়! তারপর হরিদয়ালের বাটীর সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, ডাকিতে চাহিল, কিন্তু গলা শুকাইয়া গিয়াছে। বন্ধ-স্বর, ভগ্ন-শব্দ করিয়া ধামিয়া গেল। যদি পুলিশা দেখিল, নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন সাহস করিয়া ডাকিল, ঠাকুর, দয়ালঠাকুর! কেহ উত্তর দিল না। পথ দিয়া বাহারা চলিয়া বাহিতছিল, অনেকেরই চন্দ্রনাথের রীতিমত সাহেবী পোশাক দেখিয়া ফিরিয়া চাহিল। চন্দ্রনাথ আবার ডাকিল। দয়ালঠাকুর!

এবার ভিতর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে উত্তর আসিল, ঠাকুর বাড়ি নাই।

যে উত্তর দিল সে একজন বাঙ্গালী দাসী।

সে দ্বার পর্বত আসিয়া চন্দ্রনাথের পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখিয়া লুকাইয়া পড়িল, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া একেবারে ভয়ে অজিহ্বত হইয়া পলাইয়া গেল না। অন্তরাল হইতে বলিল, ঠাকুর বাড়ি নাই।

কখন আসবেন?

দুপুরবেলা।

চন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল। আনন্দ, লজ্জা ও লজ্জা তিনের সংমিশ্রণে বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে সরযু আছে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে আর কেউ নেই?

না।

তারা কোথা?

কারা?

একজন স্ত্রীলোক -

এই আমি চাড়া 'আব ত কেউ এখানে নাই।

একটা ছোট ছেলে।

না, কেউ না।

চন্দ্রনাথ পইঠার উপরে বসিয়া পড়িল, এক তবে গেল কোথায়?

দাসী নিব্রত হইয়া পড়িল। বলিল, না গো, এখানে কেউ থাকে না। আমি আর ঠাকুরমশাই থাকি। এক মাসের মধ্যে কোন যজ্ঞমানও আসেনি।

চন্দ্রনাথ দ্বক্কট হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মান যে-সব কথা উঠিতেছিল, তত্বে অন্তর্গামীই জানেন। বহুক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কতদিন এখানে আছ?

প্রায় দেড় বছর।

তবুও কাউকে দেখনি? একজন গৌরবর্ণ স্ত্রীলোক, আর একটি ছেলে, না হয় মেয়ে, না হয় শুধু এ স্ত্রীলোকটি, কেউ না, কাউকে দেখনি?

না, আমি কাউকে দেখিনি।

কারো মুখে কোন কথা শোননি?

না।

চন্দ্রনাথ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সেইখানে দয়ালঠাকুরের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সেই সদায় আব বীচিয়া নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল, তথাপি ওনিয়া যাওয়া উচিত, এই ভনাই বসিয়া রহিল। এক-একটি মিনিট এক-একটি বৎসর বলিয়া বোধ হইল।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলে হবিদয়াল ঠাকুর বাটী আসিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তিনি চমকিত হইলেন, পরে চিনিতে পারিয়া শুদ্ধতারে কহিলেন, তাইত, চন্দ্রনাথ? কখন এলেন?

চন্দ্রনাথ ভয়কণ্ঠে কহিল, অনেকক্ষণ, এক কোথায়?

হ্যাঁ এরা—তা এরা—

চন্দ্রনাথ চলিতে চলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রণয়ন-শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে শেষ হ'ল?

কি শেষ হল? চন্দ্রনাথ শুদ্ধ-ভয়কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, সরযু কবে মবেছে ঠাকুর? ঠাকুর এবার বুঝিয়া বলিলেন, মরবে কেন, ভালই আছে।

কোথায় আছে?

কৈলাসধুড়োর বাড়িতে।

সে কোথায়?

এই গলির শেষে, কাঁটালতলাব বাড়িতে।

কপাল টিপিয়া ধরিয়া চন্দ্রনাথ পুনর্বার বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর শাস্ত্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সে এখানে নেই কেন?

দয়ালঠাকুর ভাবিলেন, মন্থ নয়, এবং মিথ্যা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই ভাবিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, আপনি একে বাড়িতে জাযগা দিতে পারলেন না, আমি দেব কি বলে?

আমারো ত পাঁচজনকে নিয়েই কাজ?

চন্দ্রনাথ বুঝিল, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। একটু ভাবিয়া বলিল, কৈলাসখুড়ার বাড়িতে কেমন করি গেল?

তিনি নিজে নিয়ে গেছেন।

কে তিনি?

কাশীবাসী একজন দুঃখী ব্রাহ্মণ।

সরযু তাঁকে আগে থেকেই চিনত কি?

হ্যাঁ, খুব চিনত।

তাঁর বয়স কত?

বুড়া হরিদয়াল মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, তাঁর বয়স বোধ হয় ষাট-বাষট্টি হবে। সরযুকে মা বলে ডাকেন।

সেখানে আর কে আছে?

একজন দাসী, সরযু আর বিত্ত।

বিত্ত কে?

সরযুর ছেলে।

হরিদয়াল দাঁড়াইয়া বলিল, যাই।

হরিদয়াল গতিরোধ করিলেন না। চন্দ্রনাথ ঘীরে ঘীরে বাহির হইয়া গেল। গলির শেষে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, কৈলাসখুড়ার বাড়ি কোথায় জান? সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। চন্দ্রনাথ একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, শুধু সুন্দর হাটপুষ্টি-দেহ একটি শিশু ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া একথালি জল লইয়া সর্বাস্ত্রে মাখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে পরম পরিতোষের সহিত দেখিতেছিল, তাহার কচি মুখখানির কালো ছায়া কেমন করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার সহিত সহাস্যে পরিহাস করিতেছে। চন্দ্রনাথ তাহাকে একেবারে দৃষ্টে তুলিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশু বিস্ময় বা ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিল না। দেখিলে বোধ হয়, অপরিচিত লোকের ক্রোড়ে মাওয়া তাহার কাছে নূতন নহে। সে চন্দ্রনাথের নাকের উপর কচি হাতখানি রাখিয়া, মুখপানে চাহিয়া বলিল তুমি কে?

চন্দ্রনাথ গভীর-স্বরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, আমি বাবা।

বাবা?

হ্যাঁ বাবা, তুমি কে?

আমি বিত্ত!

চন্দ্রনাথ ঘড়ি-চেন বুক হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল, পকেট হইতে ছুরি, পেন্সিল, মনিবাগ যাহা পাইল, তাহাই পুত্রের হস্তে গুঁজিয়া দিল; হাতের কাছে আর কিছুই বুজিয়া পাইল না যাহা পুত্রহস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বিত্ত অনেকগুলি দ্রব্য হাতের মধ্যে পাইয়া পুলকিত হইয়া বলিল, বাবা!

চন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্টে তাহার ছোট মুখখানি নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বাবা!

এই সময় লম্বীয়ার মা বড় গোল করিল। সে হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল যে, একজন সাহেব ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিত্তকে কোলে লইয়া ধরিয়া বেড়াইতেছে। সে নিশ্চাস রুদ্ধ করিয়া একেবারে রান্নাঘরে ছুটিয়া গেল। বাটাতে আঙ্গ কৈলাসচন্দ্র নাই, অনেক দিনের পর তিনি বিচ্ছেদের পূজা দিতে গিয়াছিলেন; সরযু ও এই কিঙ্কর হইল মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া রক্তন করিতে বসিয়াছিল। লম্বীয়ার মা সেইখানে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাইজি!

কি রে!

ঘরের ভেতরে সাহেব ঢুকে বিত্তকে কোলে করি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সরযু আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে আবার কি? বলিয়া দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিতে চাহিল,

দেখিতে পাইল না।

লম্বীয়ার মা তাহার বন্ধু ধরিয়৷ টানিয়া বলিল, যেয়ো না—বাবাজী আসুন।

সরযু তাহা শুনিল না, তাহার বিশ্বাস হয় নাই। অগ্রসর হইল যাহা দেখিল, তাহাতে বোধ হইল, দাসীর কথা অসত্য নহে, একজন সাহেবের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অশ্রুতে বিশেষণের সহিত কথা কহিতেছে। সাহসে ভর করিয়া সে জানালার নিকটে গেল। যাহার ছায়া দেখিলে সে চিনিতে পারিত, তাহাকে চক্ষের নিমিষে চিনিতে পারিল—তাহার স্বামী—চন্দ্রনাথ!

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, গলায় আঁচল দিয়া, পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া, সরযু মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, সরযু!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তখন স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কর্তব্য হইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, বড় বেগা হয়েছে।

সরযু মুখপানে চাহিয়া অন্ন হাসিল, যেন বলিতে চাহে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি। তাহার পর চন্দ্রনাথ বিতকে লইয়া একটু অধিক পরিমাণ বাস্ত হইয়া পড়িল। সরযু তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া দিল, গায়ের কোট-শাট একে একে খুলিয়া লইল, পাখ লইয়া বাতাস করিল, গামছা ভিজাইয়া পা মুছাইয়া দিল। এ-সকল কাজ সে এমন নিয়মিত শৃঙ্খলয় করিল, যেন ইহা তাহার নিত্যকর্ম, প্রত্যহ এমন করিয়া থাকে। যাহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইবার আশামাত্র ছিল না, আজ অকস্মাৎ কতদিন পরে তিনি আসিয়াছেন, কত অশ্রু, দীর্ঘনিঃশ্বাসের চড়াছড়ি হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা কিছুই হইল না। সরযু এমন ভাবটি প্রকাশ করিল স্বামী তাহার নিত্য আসিয়া থাকেন, আজও আসিয়াছেন হয়ত একটু বিলম্ব হইয়াছে—একটু বেলা হইয়াছে।

কিন্তু চন্দ্রনাথের ব্যবহারটি অন্য বস্তুকে দেখাইতেছে : বিত্তের সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ যেন ঘরে আর কেহ নাই বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছে। ঘরে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিশেষের ভিন্ন আর কেহ ছিল না, থাকিলে বুদ্ধিতে পারিত যে, চন্দ্রনাথ নিজে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেইটুকু ঢাকিবার জন্যই প্রাণপনে মুখ ফিরাইয়া পুত্রকে লইয়া বাস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সরযু বলিল, খোকা, খেলা কর গো।

বিত্ত লম্বা হইতে নামিয়া পড়িতেছিল, চন্দ্রনাথ সময়ে তাহাকে নামাইয়া দি ইতিপূর্বে সে জননীকে প্রণাম করিতে দেখিয়াছিল, তাই নামিয়াই পিতার চরণপ্রান্তে টিপ করিয়া প্রণাম করিয়া ছুটিয়া পলাইল। চন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়া ধরিতে গেল, কিন্তু সে ততক্ষণে স্পর্শের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সরযু তাহার বুকের কাছে হাত দিয়া কহিল, লম্বীয়ে যে তোমাব কিছু নেই, অসুখ হয়েছিল?

না, অসুখ হয়নি।

তবে বড় বেশী ভাবতে বৃথি?

চন্দ্রনাথ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তোমাব কি মনে হয়?

সরযু সে কথার উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়িল—বেলা হয়েছে, স্নান করবে চল।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িব কতী কোথায়?

তিনি আজ মন্দিরে পূজা করতে গেছেন, বোধ কবি, সন্ধ্যার পরে আসবেন।

তুমি তাঁকে কি ব'লে ডাক?

বরাবর জ্যাঠাইমশায় ব'লে ডাকি, এখনও তাই বলি।

চন্দ্রনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

সরযু জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কাণা এসেছে?

হরি আর মধু এসেছে। তারা ডাকবাংলায় আছে।

এখানে আনতে বৃথি সাহস ল না?

চন্দ্রনাথ এ কথার উত্তর দিল না।

চন্দ্রনাথ আহারে বসিয়া সুমুখে একথোলা লুচি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। অপ্রসন্নভাবে তেলিয়া দিয়া বলিল, এ আবার কি? কুটুম্বিতে করচো, না তামাশা করচো?

সরযু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মলিন-মুখে বলিল, খাবে না?

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল সরযুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, দুপুরবেলা কি আমি লুচি খাই?

সরযু মনে মনে বিপদগ্রস্ত হইয়া মৌন হইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, আজ যে তুমি আমাকে প্রথম খেতে দিল তা নয়, আমি কি খাই, তাও বোধ করি ভুলে যাওনি।

সরযুর চোখে জল আসিতেছিল; ভাবিতেছিল, সেই দিন যে খুঁরাইয়া গিয়াছে,—কহিল, তাও খবে? কিন্তু—

কিন্তু কি? শুকিয়ে গেছে?

না, তা নয়,—আমি এখানে রাখি।

বাড়িতেও ত রাখতে?

সরযু একটু থামিয়া কহিল, আমার হাতে খাবে?

এইবার চন্দ্রনাথ মুখ নত করিল। এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই যে, সরযু পর হইয়া গিয়াছে, কিংবা তাহার স্পর্শিত অন্নবান্ধন আহার করা যায় না। কিন্তু সরযুর কথার ভিতর বড় জ্বাল ছিল। বৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, সরযু, দুপুরবেলা আমার চোখের জল না দেখলে কি তোমার তৃপ্তি হবে না? সরযু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল—যাই, তবে আনি গে। রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সে বড় কান্না কাঁদিল, তার পর চক্ষু মুছিল, জল দিয়া ধুইয়া ফেলিল, আবার অশ্রু আসে, আবার মুছিতে হয়, সরযু আর আপনাকে কিছুতে সামলাইতে পারে না। কিন্তু দ্বারী অদ্ভুত বসিয়া আছেন, তখন অরের থালা লইয়া উপস্থিত হইল। কাছে বসিয়া, বহুদিন পূর্বের মত যত্ন করিয়া আহার করাইয়া উদ্ভিষ্ট পাত্র হাতে লইয়া, আর একবার ভাল করিয়া কাঁদিবার জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

বেলা দুইটা-ত্রিভয়াছ। চন্দ্রনাথের ক্রোড়ের কাছে বিশেষর পরম আরামে ঘুমাইয়াছে। সরযু প্রবেশ করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, সমস্ত কাজকর্ম সাঁরা হ'ল?

কাজ কিছুই ছিল না। জ্যাঠামশাই এখনও আসেন নি। তাহার পর সরযু ঘরকন্নার কথা পাড়িল। বাড়ির প্রতি ঘর, প্রতি সামগ্রী, মাতুল-মাতুলানী, দাস-দাসী, সরকারমশায়, হবিবালা সই, পাড়া প্রতিবেশী, একে একে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই সময়টুকুর মধ্যে দু'জনের কাহারও মনে পড়িল না যে, সরযুর এ-সব জানিয়া লাভ নাই কিংবা এ-সকল সংবাদ দিবার সময় চন্দ্রনাথেরও ক্রেশ হওয়া উচিত—একটু লজ্জা, একটু বিমর্ষতা, একটু সঙ্কোচের আবশ্যক। একজন পরম আনন্দে প্রশ্ন করিতেছে, অপরে উৎসাহের সহিত উত্তর দিতেছে। নিতান্ত বন্ধুর মত দুইজনে যেন পৃথক হইয়াছিল, আবার মিলিয়াছে।

সহসা সরযু জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে করলে কোথায়?

এটা যেন নিতান্ত পবিহাসের কথা!

চন্দ্রনাথ বলিল, পশ্চিমে।

কেমন বৌ হ'ল?

তোমার মত।

এই সময় সরযু বৃক্কেব কাছে একটা ব্যথা অনুভব করিল, সামলাইতে পারিল না, বসিয়া ছিল, ওইয়া পড়িল। মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

ব্যস্ত হইয়া চন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া পড়িল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সরযু একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিল। তখন শিয়রে বসিয়া ক্রোড়ের উপর তাহার মাথাটা তুলিয়া কান-

কাঁদ হইয়া ডাকিল, সরযু!

সরযু চোখ বুজিল। তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল এবং অস্পষ্ট কি বলিল, বোঝা গেল না। চন্দ্রনাথ অভ্যস্ত ভয় পাইয়া জলের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। লম্বায়ার মা নিকটেই ছিল, জল লইয়া খরে ঢুকিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। বলিল, বাবু, এখন সেৱে যাবে, এমন মাঝে মাঝে হয়।

তাহার পর মুখে চোখে জল দেওয়া হইল, বাতাস করা হইল, বিশ্রাসিয়া বার-দুই চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিল, মা!

সরযুর চৈতন্য হইল, লজ্জিত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। লম্বায়ার মা আপনার কাজে চলিয়া গেল। ভয়ে চন্দ্রনাথের মুখ কালি হইয়া গিয়াছিল।

সরযু হাসিল। বড় ক্ষীণ, অথচ বড় মধুর হাসিয়া বলিল, ভয় পেয়েছিলে?

চন্দ্রনাথের দুই চোখে জল টলটল করিতেছিল, এইবারে গড়াইয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিল, বলিল, ভেবেছিলাম বৃষ্টি সব শেষ হয়ে গেল।

সরযু মনে মনে ভাবিল, তোমার কোলে মাথা ছিল—সে সূকৃতি কি এ হতভাগিনীর আদে? প্রকাশো কহিল, এমন দারু মাঝে মাঝে হয়।

তা দেখচি! তখন হ'ত না, এখন হয়, সেও বৃষ্টি। বলিয়া চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে মরিচা-খরা একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া সরযুর আঁচলের বুটে ঠাথিয়া দিয়া বলিল, এই তোমার চাবির রিং—আমার কাছে গচ্ছিত রেখে চলে এসেছিলে, আজ আবার ফির্পিয়ে দিলাম। চেয়ে দেখ, কখন কি ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হয়?

সরযু দেখিল, তাহার আঙ্গুরের চাবির রিং মরিচা ধরিয়া একেবারে ময়লা হইয়া গিয়াছে। হাতে লইয়া বলিল, তাকে লাওনি কেন?

চন্দ্রনাথের শুষ্ক স্নানমুখ অকস্মাৎ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল, দুই চোখে অসীম স্নেহ চকল হইয়া উঠিল, তৎপাশ্বে নিভেছে সংযত করিয়া বলিল, তাকেই ত দিলাম সরযু।

সরযু ঠিক বুঝিতে পারিল না। কখনকাল স্বামীর মুখের পানে সম্মিশ্র-দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমি নতুন সৌর কথা বলচি। তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী, তাকে লাওনি কেন?

চন্দ্রনাথ আর নিভেছে সামলাইতে পারিল না। সহসা দুই হাত বাড়িয়া সরযুর মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, তাকেই দিয়েছি সরযু, তাকেই দিয়েছি। স্ত্রী আমার নয়, একটি। কিন্তু সে পুরানো হয় না—চিরদিনই নতুন। প্রথম যেদিন তাকে এই কাশী থেকে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ ফুলটির মত বুকে ক'রে নিয়ে যাই সেদিনও যেমন নতুন, আজও আবার যখন সেই বিচ্ছেদের পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে নিতে এসেছি এখনও তেমনি নতুন।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া ছেলে কোলে লইয়া সরযু স্বামীর পায়ের নিকট বসিয়া বলিল, জ্যাঠামশায়েব সঙ্গে দেখা না ক'রে তোমার যাওয়া হবে না—আজ রাত্রির তোমাকে থাকতে হবে।

চন্দ্রনাথ বলিল, তাই ভাবচি, আজ বৃষ্টি আর যাওয়া হয় না।

সরযু অনেকক্ষণ অবধি একটা কথা কহিতে চাহিতেছিল, কিন্তু লজ্জা করিতেছিল, সময়ও পায় নাই। এখন তাহা বলিল, তোমার কাছে আর লজ্জা কি—?

চন্দ্রনাথ সরযুর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সরযু বলিল, ভেবেছিলাম, তোমাকে একখানা চিঠি লিখব।

লেখনি কেন, আমি ত বারণ করিনি।

সরযু একটুখানি ভালিয়া বলিল, ভয় হ'ত, পাছে তুমি রাগ কর। আবার কবে তুমি আসবে?

যখন আসতে বলাবে, তখন আসব।

সরযু একবার মনে করিল, সেই সময় বলিবে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিয়া দেখিল, মানুষের শরীরে বিশ্বাস নাই। এখন না বলিলে হয়ত বলাই হবে না। চন্দ্রনাথ হয় ত আবার আসিবে, কিন্তু সে হয়ত ততদিনে পুড়িয়া ছাই হইয়া কোথাও উড়িয়া যাইবে। তাই বিবেচনা করিয়া বলিল, তোমার কাছে

আমার কোন লজ্জা নেই।

সে কথা ত হয়ে গেল—আর কিছু বলবে?

সরযু কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, আমার বাচতে ইচ্ছে নেই,—এমন করি বেঁচে থাকা আর ভাল দেখাচ্ছে না।

চন্দ্রনাথ ভাবিল, ইহা পরিহাসের মত শুনাইতেছে না। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, সরযুর মুখ আবার বিবর্ণ হইয়াছে। সভয়ে কহিল, সরযু কোন শব্দ রোগ জন্মায় নি ত?

সরযু স্নান হাসিয়া কহিল, তা বলতে পারিনে! বুকের কাছে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা টের পাই।

চন্দ্রনাথ বলিল, আর ঐ মুছীটা?

সরযু হাসিল, ওটা কিছুই নয়।

চন্দ্রনাথ মনে মনে বলিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন সর্বস্বান্ত হইয়াও তোমাকে আরোগ্য করিব।

সরযু কহিল, তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে ত?

চাই কি?

সরযু কহিল, তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে ত?

চাই কি?

নিজের কিছু চাই না। তবে, আমার যখন মৃত্যু-সংবাদ পাবে, তখন—এই সময় সে খোঁকাকে চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল, তখন একবার এখানে এসে খোঁকাকে নিয়ে যেয়ো—

চন্দ্রনাথ বিপুল আবেগে বিশ্বেশ্বরকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচুশন করিল।

এই সময় বাহির হইতে কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, দাদা, বিদ্যু!

বিশ্বেশ্বর পিতার ক্রোড় হইতে ছটকট করিয়া নামিয়া পড়িল,—দাদু যাই।

সরযু উঠিয়া দাঁড়াইল,—এ এসেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে লইয়া প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথও বাহিরে আসিল। কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথকে কখনও দেখেন নাই—দেখিলেও চিনতেন না, চাহিয়া রহিলেন। খোঁকা পরিচয় করিয়া দিল। হাত বাড়াইয়া বলিল, ওতা বাবা।

চন্দ্রনাথ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কৈলাসচন্দ্র আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এস বাবা, এস।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, কাল এদের নিয়ে যাব, তখন কৈলাস-চন্দ্রের বক্ষ-পঙ্কজের মধ্যে এককালে শতাবধি কামান দাগার মত শব্দ করিয়া উঠিল! নিজে কি কহিলেন, নিজের কানে সে শব্দ পৌছিল না। কিন্তু চন্দ্রনাথ শুনিল, অশ্রুট ক্রন্দনের মত বহুদূর হইতে কে যেন কহিল, এমন সুখের কথা আর কি আছে!

সরযু এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না, তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর পদযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল, পায়ের ধুলো দিয়ে হস্ত-ভাগিনীকে এইখানেই বেখে যাও, আমাকে নিয়ে যেয়ো না।

চন্দ্রনাথ বলিল, কেন?

সরযু জবাব দিতে পারিল না—কঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের কাতর মুখখানি তাহার চোখের উপরে কেবলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমার স্বামী, আমি যদি নিয়ে যাই, তোমার অনিচ্ছায় কিছু হবে না। আমি বিদ্যুকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

সরযু দেখিল, তাহার কিছুই বলিবার নহি।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সেদিনের মত কোলে তুলিয়া লইলেন। দাবার পুটুলি হাতে করিয়া শব্দ মিশিরের বাড়ি আসিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরাঙ্গী! আজ আমার সুখের দিন—বিদ্যুদা আজ তার নিজের বাড়ি যাবে। বড় হয়েছে ভাই, কুঁড়েঘরে আর তাকে

ধ'রে রাখা যায় না।

মিশিরজী আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র সতরঞ্চ পাতিয়া বল সাধাইয়া বলিলেন, আজ আমাদের দিনে এস, তোমাকে দু' বাজি মাত ক'রে যাই।

খেলার প্রারম্ভেই কিন্তু কৈলাসচন্দ্র একে একে বল হারাইতে লাগিলেন। গজ চালিতে নৌকা, নৌকা চালিতে ঘোড়া, এমনি বড় গোলমাল হইতে লাগিল। মিশিরজী কহিল, বাবুজী, আজ তোমার মেজাজ চেন নাই, বহুত গলতি হোতা। ক্রমে এক বাজির পর আর এক বাজি কৈলাসচন্দ্র হারিয়া খেলা উঠাইয়া পুটলি ঝাঁধিতে বসিলেন, কিন্তু লাল মস্তীটা ঝাঁধিলেন না। বিস্তর হাতে দিয়া বলিলেন, দাদা, মস্তীটা তোমাকে দিলাম, আর কখনও চাব না। পথে আসিতে যাত্রার সহিত দেখা হইল, তাহাকেই এই সুখবরটা জানাইয়া দিলেন।

আজ সর্বকমেই বৃদ্ধের বড় উৎসাহ। কিন্তু কাজ করিতে কাঙ পিছাইয়া পড়িতেছে। দাবাখেলার মত বড় ভুলচুক হইয়া যাইতেছে। যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল ভুলচুক ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সরযু তাহা দেখিয়া গোপনে শতবার চক্ষু মুছিল। বৃদ্ধের কিন্তু মুখের উৎসাহ কমে নাই, এমনি কি সরযু যখন আড়ালে ডাকিয়া পদধূলি মাথায় লইয়া কাদিতে লাগিল, তখনও তিনি অশ্রুসংবরণ করিয়া হাসিয়া আশীর্বাদ করিলেন, মা আমার কাদিস নে। তোর বুড়ো জ্যাঠাব আশীর্বাদে তুই রাভদানী হবি। আবার যদি কখনো আসিস, তোদের এই কুঁড়েঘরটিকে ভুলে যেন আর কোথাও থাকিস নে।

সরযু আরও কাদিতে লাগিল, বৃকের মাঝে শুধু সেই দিনের কথা কাদিয়া কাদিয়া উঠিতে লাগিল, যেদিন সে নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিণী হইয়া কালীতে আসিয়াছিল। 'আব আজ।'

সরযু বলিল, জ্যাঠামশাই আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না যে—

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, তার ক'টা দিন মা? কিন্তু মনে মনে বলিলেন, এইবার ডাক পড়েছে, এতদিনে তপ্ত প্রাণটার জুড়োবাব উপায় হয়েছে।

সরযু চোখ মুছিতে মুছিতে আকুলভাবে বলিল, আমার মায়া-দয়া নেই—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, ছি মা, ও-কথা বলো না—আমি তোমাকে চিনেচি।

রাত্রি দশটার সময়ে সকলে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ির সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে।

বিশেষতঃ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লাল মস্তীটা তখনও বৃকের উপর চাপিয়া পড়া ছিল। বৃদ্ধ নাড়াচাড়া করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেন। সদা নিদ্রোথিত হইয়া প্রথমে সে কাদিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যখন তিনি মুখের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিলেন, 'বিশু, দাদা! তখন সে হাসিয়া উঠিল, দাদু।

দাদাভাই আমার, কোথায় যাচ্চ?

বিশু বলিল, দাতি। তাহার পর মস্তীটা দেখাইয়া কহিল, মনতী।

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, হ্যাঁ দাদা! মস্তী হারিয়ে না যেন।

এ গজদণ্ড-নির্মিত রক্ত-রঞ্জিত পথটী সন্মুখে কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে তাহাকে অনেকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সেও ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হারাবো না—মনতী!

ট্রেন আসিলে সরযু পুনরায় তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া গাড়িতে উঠিল। বৃদ্ধের আন্তরিক আশীর্বাদ ওষ্ঠাধরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভিতরেই রহিয়া গেল।

ট্রেন ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া কৈলাসচন্দ্র বিশেষতঃ চন্দ্রনাথের ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, দাদু!

দাদু!

মস্তী!

সে মস্তীটা দেখিয়া হাসিয়া 'ব' ন, দাদু—মনতী!

হারাস নে—

না।

এইবার বৃদ্ধের শুষ্কচক্রে জল আসিয়া পড়িল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তিনি সরযুর জানালার নিকট মুখ আনিয়া কহিলেন, মা, তবে যাই—আর একবার জোর করিয়া ডাকিলেন, ও দাদু—

গাড়ির শব্দে এবং লোকের কোলাহলে বিস্ময়ের সে আস্থান গুনিতে পাইল না। যতক্ষণ গাড়ির শেষ শব্দটুকু শুনা গেল, ততক্ষণ তিনি একপদও নড়িলেন না। তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ি পৌছিয়া চন্দ্রনাথের খেটুকু ভয় ছিল, খুড়ো মণিশঙ্করের কথায় তাহা উড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, চন্দ্রনাথ, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যে পাপ করেনি তার আবার প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন? বধুমাতার কোন পাপ নেই, অনর্থক প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলে তাঁর অবমাননা করো না। মণিশঙ্করের মুখে এরূপ কথা বড় নূতন শোনাইল। চন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তিনি আবার কহিলেন, বুড়ো হয়ে অনেক দেখেছি যে, দোষ-লজ্জা প্রতি সংসারে আছে। মনুষ্যের দীর্ঘ-জীবনে তাকে অনেক পা চলতে হয়, দীর্ঘ-পথটির কোথাও কাঙ্গা, কোথাও পিছল, কোথাও বা উচু-নীচ থাকে, তাই বাবা, লোকের পদস্থলন হয়; তারা কিন্তু সে কথা বলে না, শুধু পরের কথা বলে। পরের দোষ, পরের লজ্জার কথা চিন্তার ক'রে বলে, সে শুধু আপনার দোষটুকু গোপনে ঢেকে ফেলবার জন্যেই। তারা আশা করে, পরের গোলমালে নিজের লজ্জাটুকু চাপা পড়ে যাবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল। মণিশঙ্কর একটু থামিয়া পুনর্বার কহিলেন, আর একটা নূতন কথা শিখেছি—শিখেছি যে, পরকে আপনার করা যায়; কিন্তু যে আপনার, তাকে কে কবে পর করতে পেরেছে? এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু বিত্ত আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। তার পুণ্যে সব পবিত্র হয়েছে। আজ দ্বাদশী। পূর্ণিমা-ব দিন তোমার বাড়িতে গ্রামসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ করেছি। তখন দাদা ছিলেন, কাজকর্ম সবই তিনি করতেন। আমি কখনও কিছু করতে পাইনি—তাই মনে করছি, বিত্তের আবার নূতন ক'রে অন্নপ্রাশন দেব।

চন্দ্রনাথ চিন্তা করিল, কিন্তু সমাজ?

মণিশঙ্কর হাসিলেন, বলিলেন, সমাজ আমি, সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই, যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মারতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পার। সমাজের জন্য ভেব না। আর একটা কথা বলি—এতদিন তা বলিনি, বোধ হয় কখনও বলতাম না, কিন্তু ভাবছি, তোমার কাছে একথা প্রকাশ করলে কোন ক্ষতি হবে না। তোমার রাখাল ভট্টাচার্য্যের কথা মনে হয়?

হয়। হরদয়াল ঠাকুরের পত্রে পড়েছিলাম।

আমার পরিবারের যদি কিছু লজ্জার কথা থাকে, শুধু সেই প্রমাণ করতে পারত, কিন্তু সে আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, আমি তাকে জেলে দিয়েছি। কিছুদিন হল সে খালাস হয়ে কোথায় চলে গেছে, আর কখনও এ দেশে পা বাড়াবে না।

মণিশঙ্কর তখন আনুপূর্বিক সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। সে সকল কাহিনী শুনিয়া চন্দ্রনাথের দুই চকু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

তাহার পর পূর্ণিমার দি। খাওয়ানো-দাওয়ানো শেষ হইল। গ্রামের কেইই কোন কথা কহিল না। তাহারা মণিশঙ্করের ব্যবহার দেখিয়া বিশ্বাস করিল যে, একটা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইয়াছিল,—হয় ত সে একটা জমিদারী চাল মাত্র!

হরকালী আলাদা রীথিয়া খাইলেন,—তাঁহার এ গ্রামে আর বাস করিবেন না—বাড়ি যাইবেন। হরকালী বলিলেন, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, কিন্তু ধর্মটাকে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারিবেন না। ইহা সুবের কথাই হউক আর দুঃখের কথাই হউক, চন্দ্রনাথ তাঁহাদের পক্ষাশ টাকার পরিবর্তে মাসিক একশত টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে।

উৎসবের শেষে অনেক রাতে নাচ-গান বন্ধ হইলে ঘরে আসিয়া চন্দ্রনাথ দেখিল সর্ব-অলঙ্কার-ভূষিতা রাজরাজেশ্বরীর মত নিদ্রিত পুত্র কোড়ে লইয়া সরষু স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া নিশি জাগিয়া বসিয়া আছে।

আজ পূর্ণিমা।

চন্দ্রনাথ বলিল, ইস—

সরষু মৃদু হাসিয়া বলিল, সই আজ কিছুতেই ছাড়লেন না।

বিশেষ পরিচ্ছেদ

সে রাতে এক-পা এক-পা করিয়া বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। বাধান তুলসী-বেদীর উপর তখনও দীপটি জ্বলিতেছিল, তথাপি এ কি ভীষণ অন্ধকার! এইমাত্র সবাই ছিল, এখন আর কেহ নাই। শুষ্ক মাটির প্রদীপটি সেই অবধি জ্বলিতেছে; তাহারও আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, এইবার নিবিয়া যাইবে। সরষু এটি স্বহস্তে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল।

শয্যায় আসিয়া তিনি শয়ন করিলেন। অবসর চক্ষু দুইটি এত্নায় জুড়াইয়া আসিল। কিন্তু কানের কাছে সেই অবধি যেন কে মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে, দাদু! স্বপ্ন দেখিলেন, রাজা ভরত তাঁহার বৃকের মাঝখানটিতে মৃত্যুশয্যা পাতিয়া ক্ষীণ ওষ্ঠ কাপাইয়া বলিতেছে,—ফিরে আয়! ফিরে আয়!

সকাল বেলায় শয্যা উঠিয়া বসিলেন, বাহিরে আসিয়া অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, বিণ্ড। তাহার পর মনে পড়িল, বিণ্ড নাই, তাহার চলিয়া গিয়াছে।

দাবার পুটলি হাতে লইয়া শব্দ মিশিরের বাড়ি চলিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, বিণ্ড। তাহার মনে পড়িল, বিণ্ড নাই, তাহার চলিয়া গিয়াছে।

দাবার পুটলি হাতে লইয়া শব্দ মিশিরের বাড়ি চলিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী, দাদাভাই আমার চলে গেছে।—দাদাভাইকে সবাই ভালবাসিত। মিশিরজীও দুঃখিত হইল। দাবার বল সাজান হইলে মিশিরজী কহিল, বাবুজী, তোমাব উজীর কি হ'ল?

কৈলাসচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন,—তাই ত, মিশিরজী, সেটা নিয়ে গেছে। লাল উজীরটা সে বড় ভালবাসত। ছেলেমানুষ কিছুতেই ছাড়লে না।

তিনি যে স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় দাবা-জোড়াটি অঙ্গহীন করিয়া দিলেন, সে কথা বলিতে লজ্জা করিল।

—মিশিরজী কহিল, তবে অন্য জোড়া পাতি?

পাত।

খেলায় কৈলাসচন্দ্রের হার হইল। শব্দ মিশির তাঁহার সহিত দ্বিরকাল খেলিতেছে, কখনও হারাইতে পারে নাই। হারিবার কারণ সে সহজেই বুঝিল। বলিল, বাবুজী, খোকাবাবু তোমার বিকলুল ইলিম সাথে লে গিয়া বাবুজী!

বাবুজীর মুখে শুষ্ক-হাসির রেখা দিল। বলিলেন, এস, আর এক বালি দেখা য়াৎ।

বহুৎ আচ্ছা।

খেলার মাঝামাঝি অবস্থায় কৈলাসচন্দ্র কিস্তি দিয়া ভুলিয়া বলিলেন, বিণ্ড।

শব্দ মিশির হাসিয়া ফেলিল। কিস্তি কথাটা সে বুঝিত, বলিল, বাবুজী, কিস্তি, বিণ্ড নয়। দুইজন হ'লে উঠিলেন।

শব্দ মিশির কিস্তি দিয়া বলিল, বাবুজী, এইবার তোমার দো পেয়ালা গিয়া।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, দাদা, আয়, আয়, শিগগির আয়। পরে কিছুক্ষণ যেন তাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল যেন এইবার একটি ক্ষুদ্র-কোমল দেহ তাঁহার পিঠের উপর কাপাইয়া পড়িবে। শব্দ মিশির বিলম্ব দেখিয়া বলিল, বাবুজী, পেয়ালা নাহি বাঁচনে পারবে। বৃকের চমক ভাঙ্গিল, তাই ত, বোড়ে দু'টো মারা গেল!

তাহার পর খেলা শেষ হইল। মিশিরজী জয়ী হইল, কিন্তু আনন্দিত হইল না। বলগুলা সরাইয়া

দিয়া বলিল, বাবুজী, দোসরা দিন খেলা হবে। আজ আপনা তবিয়ে বহুৎ বে-দুরন্ত—মেজাজ একদম দিক্ আছে।

বাড়ি ফিরিয়া যাইতে দুই প্রহর হইল। মনে হইতেছিল, বিণ্ড ত নাই, তবে আর তাড়াতাড়ি কি? বাটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লম্বীয়ার মা একা রন্ধনশালায় বসিয়া পাকের যোগাড় করিতেছে। আজ তাঁহাকে নিজে বাঁধিতে হইবে, নিজে বাড়িয়া খাইতে হইবে—একা আহা করিতে হইবে। ইচ্ছামত আহা করিবেন, তাড়াতাড়ি নাই, পীড়াপীড়ি নাই—বিশেষের মৌরায়ের ভয় নাই। বড় স্বাধীন! কিন্তু এ যে ভাল লাগে না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, একমুঠো চাল, দুটা আলু, দুটা পটল ঝানিকটা ডালবাটা। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—মনে পড়িল, দুই বৎসর আগেকার কথা। তখন এমন নিজে বাঁধিতে হইত—এই লম্বীয়ার মা-ই আয়োজন করিয়া দিত। কিন্তু তখন বিণ্ডও আসে নাই, চলিয়াও যায় নাই।

কাঁটালতলায় তাহার ক্ষুদ্র খেলাঘর এখনও বাঁধা আছে। দুটো ভগ্ন-ঘট একটা ছিন্ন-হস্তপদ মাটির পুতুল, একটা দু পয়সা দামের ভাঙ্গা বাঁশী। ছেলেমানুষের মত বৃদ্ধ সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া আপনাব শোবার ঘরে রাখিয়া দিলেন।

দুপুরবেলা আবার গঙ্গা পাড়ের বাড়িতে দাবা পাতিয়া বসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আবার লোক জমিতে লাগিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বলিয়া কৈলাসচন্দ্র আর তেমন সম্মান নাই; তখন দ্বিধাজ্ঞী ছিলেন, এখন খেলামাত্র সার হইয়াছে। সেদিন যাহাকে হাতে ধরিয়া খেলা শিখাইয়াছিলেন, সে আজ চাল বলিয়া দেয়। যাহার সহিত তিনি দাবা রাখিয়াও খেলিতে পারেন, সে আজ মাথা উচু করিয়া বেছেয়া একখানা নৌকা মার দিয়া খেলা অবস্ত করি।

পূর্বের মত এখনও খেলিবার ঐক আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। দুই-একটা শক্ত চাল এখনও মনে পড়ে—কিন্তু সোজা খেলায় বড় ভুল হইয়া যায়। দাবাখেলায় গর্ব ছিল—আজ তাহা শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে। তবে শক্ত মিশির এখনও সম্মান করে; সে আব প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া খেলে না, প্রয়োজন হইলে দুই-একটা কঠিন সমস্যা পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়।

বাড়িতে আভ্যন্তরীণ তাহার বড় গোলযোগ বাধিতেছে। লম্বীয়ার মা দস্তুরমত কাণ কপিতেছে। দু একদিন তাহাকে চোখের জল মুছিতেও দেখা গিয়াছে। সে বলে, কাণ, খাওয়া-নাওয়া একেবারে কি ছেড়ে দিলে? আয়না দিয়া চেহারাটা দেখ গে!

কৈলাসচন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহেন, বেটী, বাঁধাবাড়া সব ভুলে গেছি—আর আঙুন-তাতো যেতে পারিনে।

সে বহুদিনের পুরানো দাসী, ছাড়ে না, বকা-ঝকা করিয়া এক-আধ মুঠা চাউল সিদ্ধ করাইয়া লয়। এমন করিয়া এক মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর তিন-চারদিন ধরিয়া কৈলাসখড়োকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। শক্ত মিশির এ কথা প্রথমে মনে করিল। সে দেখিতে আসিল। ডাকিল, বাবুজী!

লম্বীয়ার মা উত্তর দিল। কহিল, বাবুর বোখার হয়েছে।

মিশিরজী ককে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট আসিয়া বলিল, বাবুজী বোখার হ'ল কি?

কৈলাসচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, হ্যাঁ মিশিরজী, ডাক পড়েচে, তাই আস্তে আস্তে যাচ্ছি।

মিশিরজী কহিল, ছিয়া ছিয়া—রাম রাম! আরাম হো য়ায়েগ।

আর আরাম হবার বয়স নেই ঠাকুর—এইবার রওনা হ'তে হবে।

কবিরাজ বোলায় ছিলে?

কৈলাস আবার হাসিলেন, আটবট-বছর বয়সে কবিরাজ এসে আর কি করবে মিশিরজী?

আটবট বয়স

—বাবুজী! আউর আটবট আদমী জিতে পারে।

কৈলাসচন্দ্র সে কথায় উত্তর না দিয়া সহসা বলিলেন, ভাল কথা মিশিরজী! আমার দাদাভাই চিঠি

লিখেছে—ও লখীয়ার মা, জানালাটা খুলে দে ত, মিশিরজীকে পত্রখানা পড়ে শুনাই। বালিশের তলা হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বহুক্রমে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। হিন্দুস্থানী শব্দ মিশির কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না।—রাত্রে শব্দ মিশির কবিরাজ ডাকিয়া আনিল। কবিরাজ বাঙ্গালী—কৈলাসচন্দ্রের সহিত জানাওনা

ছিল। তাহার প্রয়ের দুই-একটা উত্তর দিয়া কহিলেন, কবিরাজমশাই, দাদাভাই চিঠি লিখেছে, এই পড়ি শুনুন।—দাদাভায়ের সহিত কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় ছিল না। তিনি বলিলেন, কার পত্র?

দাদু—বিশু—লখীয়ার মা, আলোটা একবার ধর ত বাছা—

প্রদীপের সাহায্যে তিনি সবটুকু পড়িয়া শুনাইলেন। কবিরাজ শুনিলেন কিনা কৈলাসচন্দ্রের তাহাতে বুঝেপও নাই। সরযুর হাতের লেখা বিশুর চিঠি, বৃদ্ধের ইহাই সাঙ্ঘনা, ইহাই সুখ। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিয়া প্রস্থান করিলে, কৈলাসচন্দ্র শব্দ মিশিরকে ডাকিয়া বিশেষ্বরের রূপ, গুণ, বুদ্ধি এসকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু ছুর কমিল না; বৃদ্ধ তখন একজন পাড়ার ছেলেকে ডাকিয়া বিশুকে পত্র লিখাইলেন—মোট কথা এই যে, তিনি ভাল আছেন, তবে সম্প্রতি শরীরটা কিছু মন্দ হইয়াছে, কিন্তু ডাবনার কোন কারণ নাই।

কৈলাসচন্দ্র প্রাণের আশা আর নাই শুনিয়া হরিদয়াল দেখিতে আসিলেন। দুই-একটা কথাবার্তার পর কৈলাসচন্দ্র তলা হইতে সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বাবাজী, পড়।—পত্রখানা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, দুই-এক জায়গায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ভাল পড়া যায় না। হরিদয়াল যাহা পারিলেন পড়িলেন। বলিলেন, সরযুর হাতের লেখা।

তার হাতের লেখা বটে, আমার দাদার চিঠি।

নীচে তার নাম আছে বটে!

বৃদ্ধ কথায় তেমন সম্মত হইলেন না। বলিলেন, তার নাম, তার চিঠি, সরযু কেবল লিখে দেয়েছে। সে যখন লিখতে শিখবে, তখন নিজের হাতেই লিখবে।

হরিদয়াল ঘাড় নাড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, পড়লে বাবাজী? বিশু আমার রাত্রিতে দাদু দাদু বলে কেঁদে ওঠে, সে ভুলতে পারে? এই সময় গণ্ড বাহিয়া দু' ফোঁটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িল।—লখীয়ার মা নিকটে ছিল, সে দয়ালঠাকুরকে ইশারা করিয়া বাহিরে ডাকিল। বলিল, ঠাকুর, যাও, তুমি থাকলে সারাদিন ঐ কথাই বলবে।

আর চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। অবস্থা নেহাত মন্দ হইয়াছে, শব্দ মিশির আজকাল রাত্রিদিন থাকে, মাঝে মাঝে কবিরাজ আসিয়া দেখিয়া যায়। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সংজ্ঞা ছিল না; সন্ধ্যার পর একটু জ্ঞান হইয়াছিল, তাহার পর অর্ধচেতনভাবে পড়িয়া ছিলেন। গভীর রাত্রে কথা কহিলেন, বিশু দাদা, আমার মস্তীটা! এবার দে, নইলে মাত হয়ে যাব! শব্দ মিশির কাছে আসিয়া বলিল, বাবাজী কি বলচে?

কৈলাসচন্দ্র তাহার পানে একবার চাহিলেন, ব্যস্তভাবে বালিশের তলায় একবার হাত দিলেন, যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে, প্রয়োজনের সময় হাত বাড়াইয়া পাইতেছেন। পর হতাশভাবে পাশ ফিরিয়া মৃদু বলিলেন, বিশু বিশেষ্বর, মস্তীটা একবার দে ভাই, মস্তী হারিয়ে আর কতক্ষণ খেলি বল?—এ বিশ্বের দাবাখেলায় কৈলাসচন্দ্রের মস্তী হারাইয়া গিয়াছে। বিশ্বপতির নিকট নাই যেন কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছে। শব্দ মিশির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। লখীয়ার মা প্রদীপ মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক কপালে উঠিয়াছে, শুধু গুঁতাধর তখনও যেন কাঁপিয়া কহিতেছে, বিশেষ্বর! মস্তী-হারা হয়ে আর কতক্ষণ খেলা যায়, দে ভাই, দে।

পদদ্বিগত দয়ালঠাকুর চন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, গতরাত্রে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠের উইল

এক

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মূদীর দোকান যখন অনেক প্রকার ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়াও টিকিয়া গেল, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ, কি করিয়া যে বৈকুণ্ঠ ভাল সামলাইল তাহা কেহই জানে না। সেই অবধি দোকানখানি ধীরে ধীরে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল।

আবার তেমন দুঃখ-কষ্ট আর যখন রহিল না, অথচ বৈকুণ্ঠ তাহার বড়ছেলে গোবুলকে ইকুল ছাড়াইয়া নিজের দোকানে ভর্তি করিয়া দিল, তখনও পাড়ার পাঁচজন কম আশ্চর্য বোধ করিল না। তাহারা বৈকুণ্ঠের আচরণ সম্বন্ধে কলাবলি করিতে লাগিল, দেখলে বুড়োর ব্যবহার! না হয় ছেলেটির তেমন ধার নাই—এক বছর না হয় কেলসে উঠতেই পারে নাই, তাই বলে এই কাজ! ওর মা বেঁচে থাকলে কি এরূপ করতে পারত! কৈ ছাড়িয়ে দিক দেখি ওর ছোটছেলে বিনোদকে! ছোটগিল্লী কেঁটিয়ে বিশ ঝেড়ে দেবে।

বস্তুতঃ গোবুল ছেলেটি মেধাবী ছিল না। ক্লাসে কোনদিনই প্রায় ভাল পড়া বলিতে পারিত না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, সে মুখখানি স্নান করিয়া তাহার বিমাতার কাছে আসিয়া কঁদিয়া ফেলিল। বিমাতা তাহাকে কোলে টানিয়া সঙ্গেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধভাবে কহিলেন, গোবুল, বেঁচে থাকতে গেলে এমন কতশত দুঃখ সইতে হয় বাবা! মনের কষ্ট যে ছেলে হাসিমুখে সহ্য করে আবার চোঁটা করে, সে-ই ত ছেলের মত ছেলে। কেঁদ না বাবা, আমার মন দিয়ে পড়, আস্তে বড়র পাশ হবে।

ছেটিছেলে বিনোদ লাক্ষাইতে লাক্ষাইতে বাড়ি আসিল। সে দাদার চেয়ে বছর-দুয়েক ছোট, তিন-চার ক্লাস নীচেও পড়ে; কিন্তু সে একেবারে প্রথম হইয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াছে! পুত্রের সুসংবাদ শুনিয়া মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন এবং পুলকিত চিত্তে অসংখ্য আলীর্বাদ করিলেন।

সন্ধ্যার পর বৈকুণ্ঠ দোকানের কাজ সারিয়া খাতা বগলে ধরে আসিয়া উভয় পুত্রের বিবরণ শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। ছেলেদের ভার তাহাদের মায়ের উপর দিয়াই তিনি নিশ্চিত ছিলেন। হাত-পা বুইয়া জল খইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরেসুস্থে নিত্যানিরমিত খাতা দেখিতে বসিয়া গেলেন।

দুই

আমার মা ভবানী কৈ গো? বলিয়া লাঠির গোটা-দুই চোঁকা দিয়া ইকুলের বট শিকল, জয়লাল বাঁড়ুয়ে সেইদিন সন্ধ্যাকালোঁ বৈকুণ্ঠ মজুমদারের বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের গোলদাগি দোকানে চাল-ডাল-ঘি-তেল বাবদে অনেক টাকা বাকী ফেলিয়া গৃহিণীকে মাড়সঘোঁধন করিয়াছিলেন।

ভবানী সন্ধ্যার কাজকর্ম সারিয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়াছিলেন; শশব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। বাঁড়ুয়েমশাই উপবেশন করিয়াই শুরু করিয়া দিলেন, হী, রত্নগর্ভা বটো মা তুমি! ছেলে পেটো ধরেছিলে বটো! এত ছোকরার মধ্যে তোমার বিনোদ একেবারে ফার্স্ট। একেবারে ডবল প্রমোশন। ওর নম্বর পাওয়া দেখে হেডমাস্টারমশাইয়ের পর্যন্ত তাক

লেগে গেছে। আজ তাঁকেও গালে হাত দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে! আমিও ত মা, এই ছেলে চরিয়েই বড়ো হলুম; কিন্তু তোমার এই বিনোদ ছেলেরটির মত ছেলে কখনও চোখে দেখলুম না! আমি এই বলে যাচ্ছি আজ, ও ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হবে—হবেই হবে।

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। বাঁড়ুয়ামশাই উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এই গোকুলো! কিসে আর কিসে! এ ছোঁড়া এতবড় গাখার সন্ধান মা, একজামিনের দিন আমিই ত ছিলুম এদের পাছায়—কত ছেলে টেবিলের নীচে দিবা বই খুলে কাপি করে দিলে—ওরই ডাইনে—বাঁয়ে মল্লিকের দুই ছেলে বই খুলে লিখতে লাগল—আমি দেখেও দেখলুম না—বরং হতভাগাটাকে চোখ টিপে একটা ইশারা পর্যন্ত করে দিলুম, কিন্তু সেই যে বোদা বলদের মত হাত গুটিয়ে বসে রইল, কোনদিকে চোখ পর্যন্ত ফেরালে না। নইলে আশ মল্লিকের ছেলে পাশ হয়, আর ও হতে পারে না! সতিা কিনা, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি মা। বলিয়া জয়লাল মাস্টার লাঠিটা তুলিয়া সহসা গোকুলের প্রতি একটা ষোঁটানোর ভঙ্গী করিয়াই আপাততঃ কোনমতে তাঁর অধি-মজাগত ছেলে-ঠ্যাঙানোর প্রবৃত্তিটা শাস্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু গোকুল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে ভবানী দুই বাহু বাড়াইয়া তাঁর এই সপত্নীপুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। গোকুলের মা নাই। মাকে তাহার মনেও পড়ে না। এই বিমাতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। আজই ইন্সুল হইতে ফিরিয়া কাদিতে কাদিতে যখন সে তাঁহার কাছে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর তাহাকে তিনি কাছছাড়া করেন নাই এবং এতক্ষণে ঠাণ্ডা চুপি চুপি এই সকল কথাই হইতেছিল। গোকুলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া স্নেহাঙ্গ মুদুকটে বলিলেন, হাঁ বাবা, আর সব ছেলেরা বই দেখেছিল, তুমি শুধু কোনদিকে তাকিয়ে দেখও নি?

গোকুল কিছুই বলিতে পারিল না। নিজের অক্ষমতার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করিয়া সে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়া গেল। কিন্তু কথটা ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠের কানে যাওয়ায় তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে কান খাড়া করিয়া রাহলেন।

ভবানী মুদু হাসিয়া কহিলেন, এ বছর খুব মন দিয়ে পড়লে আসচে বছর ও-ও ফার্স্ট হতে পারবে।

বিমাতার এই স্নেহের কঠর বাঁড়ুয়ামশাই চিনিতে পারিলেন না। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্রোহ তাঁহার কাছে এমনি স্বতঃসিদ্ধসত্য যে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত পারে, সে কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল না। ইহাকে একটা মৌখিক শিষ্টতামাত্র জ্ঞান করিয়া তিনি গোকুলকে আরও তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়ে দ্বিহার দ্বারা তালুতে একপ্রকা. ক উৎপাদন করিয়া বলিলেন, হায় হায়! গোকুলো হবে ফার্স্ট। পূর্বের সূখিা উঠবে পশ্চিমে। যে ফার্স্ট হবে মা সে ঐ তোমার বী-দিকে ওনচে। বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিনোদকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ একটুখানি কাঠহাসির রসান দিয়া বলিলেন, তাই কি ছোঁড়ার লজ্জাশরম আছে! উনটে ছেলেরের সঙ্গে কৌদল করছিল যে 'আমি পাশ ইহনি বটে, কিন্তু আমার ছোটভাই যে সকলের প্রথম হয়েছে! তোমের কটা ভাই এমন ডবল প্রমোশন পেয়েচে বল ত রে!' শোন একবার কথা মা! ছোটভাই ফার্স্ট হয়েছে—কোথায় ও লজ্জায় মরে যাবে, না, ওর দেমাক দেখ!

ভবানী আর থাকিতে পারিলেন না, জোর করিয়া গোকুলকেটানিয়া লইয়া তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গোকুল লজ্জায় মরিয়া গিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ফঁপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোকুল তাহার ছোটভাইটিকে যে কত ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

বাঁড়ুয়ামশাই আরও গুটিকয়েক বাছা বাছা কথা বলিয়া তাঁহান বিনোদকে এই সময় হইতেই যে বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পড়ান উচিত, ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এইসময়ে পাশের ঘরের এক খলক আলো মাতা-পুত্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়ায় তাহার মনে যেন একটু ঝটকা বাজিল। ভবানী যেমন করিয়া এই নির্বোধ সপত্নীপুত্রকে বুকে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাহা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটি নয় বলিয়াই তাহার সন্দেহ জন্মিল। সূতরাং এই তুণানামূলক সমালোচনা সম্প্রতি আর অধিক টেলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা, তাহা ঠিক ঠাছর করিতে না পারায় : হাকে অন্য কথা পাড়িতে হইল।

ভবানী এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই শুনিতেছিলেন। এখন বেশী কথা कहিলেন না। অবশেষে রাজি হইতেছে বলিয়া বাঁড়ুঘোমশাই বহুপ্রকার আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে বিনোদের জিজ্ঞাসিত-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বারংবার নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া বৈকুণ্ঠ ঠিক যেন এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখে আসিয়া কঠোরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে গোক্তা, সবাই বই দেখে লিখে পাশ করে গেল, তুমি লিখলি না কেন?

গোকুল ভয়ে কাঁটা হইয়া পূর্ববৎ লুকাইয়া রহিল। অনেক ধমক-টমকের পর সে যাহা कहিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, পূর্বাঙ্কেই হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া চুরি করিয়া দেখাদেখি করিয়া লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, কাল থেকে আর তোকে ইকুলে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে দোকানে যাবি। বলিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজে মন দিলেন। ইহা একটা মামুলি শাসনমাত্র মনে করিয়া ভবানী তখন কথা कहিলেন না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা বৈকুণ্ঠ যখন সভা সভাই গোকুলকে দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি আশ্চর্য হইয়া উঠিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, যে কথা নয়, সেই কথা! দুখেব ছেলে যাবে তোমার দোকান করতে? সে হবে না—আমি বেঁচে থাকতে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়তে দেব না। এমন রাগ ত দেখিনি! বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে ছেলেটি টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাসিয়া कहিলেন, কে রাগ করেছে ছোটবৌ?

গৃহিণী कहিলেন, তুমি। আবার কে?

আমাকে রাগ করতে কখনও দেখেছে?

এ তবে তোমার কি-রকম কথা শুনি? ছেলেবেলা পাশ-ফেল সবাই হয়। তাই বলে ইকুল ছাড়িয়ে দেবে?

বৈকুণ্ঠ তখন গোকুলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ছোটবৌ, রাগ আমি করিনি। তোমার বড়ছেলেকে আজ বড় আত্মদ করেই আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ছোট-ছেলে তোমার কখনও জিজ্ঞাসিত পাবে কিনা, বাঁড়ুঘোমশাইয়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না, কিন্তু আমার অবর্তমানে গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভরে ভর দিতে পারবে, সে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

স্বামীর অবদ্যমানতার কথার ভবানীর চোখের কোণ একমুহূর্তেই আশ্রয় হইয়া উঠিল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু গোকুল যে বড় সোজা মানুষ—ও কি তোমার ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচই বুঝতে পারবে? ওকে হয়ত সবাই ঠিকিয়ে নেবে।

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া कहিলেন, সবাই ঠকাবে না। তবে কেউ কেউ ঠিকিয়ে নেবে, সে কথা সত্য। তা নিক, কিন্তু ও ত কারকে ঠকাবে না? তা হলেই হবে। মা-লক্ষ্মী ওর হাতে আপনি এসে ধরা য়েবেন। বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠর নিজের চোখও সম্ভ্রল হইয়া উঠিল। তিনি নিজেও খাঁটি লোক, কিন্তু মূলধনের অভাবে অনেকদিন, অনেক কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এখন যদি বা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু সময়ও ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে শক্তি-সামর্থ্যও আর নাই। তাড়াতাড়ি চোখেব উপর হাতটা কুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, গিন্নী, এই বয়সে গোকুল যত বড় লোভ কাটিয়ে বেঁচেয়ে এসেছে, সে যে কত শক্ত, তা তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না। যে এ পারে, তার ত ব্যবসায় ঘোরপ্যাঁচ চৌদ্ধ আনা শেখা হয়ে গেছে। শুধু বাকী দুটো আনা আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

লোকের কথা ত জানিনে ছোটবৌ। আমি শুধু আমাদের কথাই জানি। আমি জানি, ওর হাতে তোমাদের সঙ্গে দিয়ে আমি নির্ভয়ে দু'চক্ক বুজতে পারব।

ভবানী নিজেও কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাঁর শেষ কথায় একটা আসন্ন নিপদের বার্তা অনুভব করিয়া কাদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আজ নিয়ে যাও। বলিয়া নিজে গিয়া গোকুলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। তাহার

মুখচুশন করিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে দোকানে যাও বাবা! তুমি মানুষ হলেই তবে আমরা দাঁড়াতে পারব।

গোকুল পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে বেচারা কাল রাত্রেই বিছানায় শুইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ বৎসর যেমন করিয়া হোক উত্তীর্ণ হইবেই। ইকুল ছাড়িয়া দোকান যাইতে কোন ছেলেই গৌরব বোধ করে না; কিন্তু কোনদিনই সে মায়ের অবস্থা নহে। সহপাঠীদের বিদ্রূপের খোঁচা তাহার মনে বাজিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন অপত্তি করিল না, নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিল।

ডিন

দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, জরাগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ নিজেও মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু গোকুলের সম্বন্ধে সে ভুল করে নাই, তাহা তাহার বাড়িটার পানে চাহিলেই বুঝা যায়। গল্পের ভিতর সে মূর্খার দোকান আর নাই। তাহার পরিবর্তে প্রকাণ্ড গোলাদারি দোকান। সেখানে লাখে টাকার কারবার চলিতেছে। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ. পড়ে। বৈকুণ্ঠ নাতি-নাতিয়ার মুখ দেখিয়া পরম সুখে মরিতে পারিত, কিন্তু কিছুদিন হইতে ছোট্ট ছেলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত জনশ্রুতিতে তাহার অবশিষ্ট দিনগুলো বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সকালে শকট জীবনের শেষ ডাক শুনিতে পাইলেন। সর্বদেহে কি একপ্রকার নূতন অস্বস্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া গৃহীণাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া স্নানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ছোট্টবোঁ, আমার ও সময় হয়েছে, তাই একটু এগিয়ে চললুম। তোমার যতদিন না আসা হয় ততদিন আমার ছেলে দুটিকে দেখো। তোমার হাতেই তাদের দিয়ে গেলুম।

স্বামীর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া ভবানী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেলে—আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোন মতেই বিয়ে করতুম না; কিন্তু যখন দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয়ত বাঁচাতে পারব না, তখনই শুধু বড় কষ্টে, বড় ভয়ে ভয়ে রাজী হয়েছিলুম। ভগবান আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন; তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোনদিন কোন দুঃখ পাইনি। শুধু বিনোদ যদি আমার শেষকালটায় এত দুঃখ না দিত, তা হলে কত সুখেই না আলাম যেতে পারতুম। বলিতে বলিতেই তাঁহার স্নান চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ভবানী আঁচল দাড়াইয়া মুছাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, আমি মরতেও পারচি নে ছোট্টবোঁ, আমার অবর্তমানে আমার এত কষ্টের দোকানটি বিনোদ হাতে পেয়ে দু'দিনে নষ্ট করে ফেলবে। এ শোক আমি পরকালে বসেও সহ্য করতে পারব না—সেখানেও আমার বুকে শেল বাজবে।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুধু কি তাই? তোমার দাঁড়বার স্থান থাকবে না—আমার গোকুলকেও হয়ত ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে, বলিতে বলিতেই বৈকুণ্ঠ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এরূপ দুর্ঘটনার কল্পনামাত্রই তাঁহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভবানী তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের উপর মুখ আনিয়া কাঁদয়া কহিলেন, ওগো, বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না। তোমার গায়ের রক্ত-জল-করা জিনিস আমি কারকে দেব না। দোকান, ঘর, ব্যাড, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও। তুমি শান্ত হও—নিশ্চিন্ত হও—আমি নিজে তার স্খী হয়ে থাকব।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ স্তব্ধ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এই কথাই আমি দিবারাত্রি ভাবচি ছোট্টবোঁ, আমি ভগবানকে পর্যন্ত মন দিয়ে ডাকতে পারচি নে! কিন্তু তুমি কি এতে মত দিতে পারবে? বলিয়া বৈকুণ্ঠ হতাশভাবে আর একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবানীর বুকে কাঁটিয়া গেল। তিনি মরণোন্মুখ স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, ওগো, আমি মত দিতে পারব। তোমাকে ছুঁয়ে বলচি পারব। আমি আর কিছুই চাইনে, শুধু

চাই, তুমি নিশ্চিত হও—সুস্থ হও। এ সময়ে তোমার মনে যেন কোন কোন্ড, কোন ক্লেশ না থাকতে পায়।

বৈকুণ্ঠ আবার কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু বিনোদ?

ভবানী নিমিষমাত্র দেরী না করিয়া কহিলেন, তার কথা তুমি ভেবো না। সে লেখাপড়া শিখচে—নিজের পথ সে নিজে করে নেবে। আর যত মন্দই হোক—গোকুল তাকে ফেলাতে পারবে না—ছোটভাইকে সে দেখবেই।

বৈকুণ্ঠ আর কথা কহিলেন না। একটা ভূপ্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া গইলেন। ভবানী সেইখানে একভাবে পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন, নিদারুণ অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া বরষার করিয়া অশ্রু করিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের সন্তানকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মন্দ বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রের ন্যায়া অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন, এ দুঃখ তাঁহার বকে যে কি শূলবিদ্ধ করিল, তাহা তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সে মন্দ হোক, বা হোক, তিনি ত মা? সে ত তাঁহাবই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকান-ভবিষ্যৎ চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় এইবার মাথা কুটিয়া কুটিয়া কীদিতে লাগিল। কিন্তু পিছাইয়া পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় কোনদিকে চাহিয়া চোখে পড়িল না। মুমূর্ষু স্বামীর ভূপ্তির জন্য সন্তানের সর্বনাশের পথ যখন নিজেই অঙ্গুলি-সংস্পর্শে দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া সে পথ যাচিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে আসিবে?

সেইদিনই অপরাহ্নকালে উকিল ডাকিয়া রীতিমত উইল লেখা হইয়া গেল। বৈকুণ্ঠ হাবন-অহাবন সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বড়ছেলেকে লিখিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া নাম লিখিতে গিয়া ভবানীর হাত কাঁপিয়া গেল। মাতৃস্নেহ কোথায় অলঙ্ঘ্য বসিয়া বারংবার তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিল না। স্বামীর পা দুইখানি অন্তরের মধ্যে দঢ়-স্থাপিত করিয়া তিনি আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিলেন। বিনোদ কোন কথাই জানিল না। সে তখন কলিকাতার এক অপবিত্র পন্নীতে, ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে মদ বাইয়া মাতাল হইয়া রহিল। বাটা হইতে যে দুইজন কর্মচারী তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পর্যন্ত তাহার বাসায় বৃথা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই এ সংবাদ বৈকুণ্ঠকে দিতে সাহস করিল না। তিনিও এ সবকিছু কাহাকেও কোন প্রায় করিলেন না। কিন্তু কিছুই তাঁহার কাছে চাপা রহিল না।

আরও দিন-দুই টালে-বোঁটালে কাটিয়া আজ সকাল হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্তদিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে তিনি চোখ মেলিলেন। ভবানী শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন, গোকুল পদতলে বসিয়া কীদিতেছিল। বৈকুণ্ঠ ইজিতে তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া অন্ত্যস্ত কীপকণ্ঠে কহিলেন, বিনোদ বৃষ্টি খবর পেলেন না গোকুল? নইলে সে নিশ্চয় আসত। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি বিনোদের নাম একটিবারও মুখে আনেন নাই। সহসা শেষ সময়ে ছেলের নাম স্বামীর মুখে শুনিয়া বিজ্ঞানের বেদনায় ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি তেমন নীববে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

গোকুল শিতার চোখ মুছাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, চোখে তাকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু তাকে বলিস আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, একদিন সে ভাল হবে। এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো এভাবে চিরকাল কাটাতে পারবে না। দেখিস বাবা, সেদিন তোর ছোটভাইকে যেন ফেলিস নে। আর এই তোমার মা রইলেন—অনেক উপসায় ভবে এমন মা মেলে গোকুল!

গোকুল শিশুর মত কীদিতে কীদিতে কহিল, বাবা, আমার মা আমারই বইলেন, কিন্তু বিনোদকে আপনি অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যান।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, না গোকুল, আমার অনেক দুঃখের সম্পত্তি—এ নষ্ট হতে দেখলে পরকালে বসেও আমার বুক পেল বাকবে। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। বলিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলের মুখের পানে চাহিয়া, বোধ করি বা মনে মনে তাঁহার শেষ আশীর্বাদ করিয়া চোখ বুজিলেন। গোকুল

পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া ওইয়া শুধু চুপ চুপ বলিলেন, ছেলেরা রইল ছোটবৌ, আমি এবার চললুম।

আর কথা কহিলেন না। এবং পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শ্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন অনেকেই অনেক কথা কহিল। বৈকুণ্ঠ পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত ধীন অবস্থা হইতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুমিত্র দুই তাঁর একটু বেশী পরিমাণে ছিল। মিত্রপক্ষের গুণগান অত্যুক্তিকে ছাড়িয়া গেল। তাহার শত্রুপক্ষেরা নিন্দা করিতেও ক্রটি করিল না। তাহার কৃপণ বলিয়া, চশমখোর বলিয়া, বৈকুণ্ঠ মুদীর স্বীকৃত অঙ্গলির সহিত কদলী-কাণ্ডের উপমা দিয়া বোধ করি বেশ একটু আশ্বাসাদ লাভ করিল। তবে এই একটা অতি তুচ্ছ গুণের কথা তাহারও অস্বীকার করিল না যে, আর যাই হোক লোকটা জোচোর বাটপাড় ছিল না। নিজের ন্যায্য পাওনার বেশী কাহাকেও কোনদিন একটি তামার পয়সাও ফাঁকি দেয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে এই বিদ্যাটিই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁর বড়ছেলেকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ বার বার বলিতেন, গোকুল, আমার এই কথাটি কোনদিন ভুলিস নে বাবা যে, ঠকিয়ে কখনো মহাজনকে মারা যায় না। তাতে শেষ পর্যন্ত নিজেই মরতে হয়।

নিজের পলিত মন্তকটি দেখাইয়া বলিতেন, এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখকষ্ট শেষেচি, কিন্তু এর জোরে কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করিনি। আমার এই মর্যাদাটুকু বজায় রাখিস বাবা!

চার

বিনোদ বিষয় পায় নাই, কথাটা প্রকাশ পাইবামাত্র পাড়ার দুই-চারিজন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া ষোঁজাশুকি গুরু করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। তাহার ফিরিয়া আসিয়া বিনোদের ব্যাপার নাম-ধাম পরিচয় দিয়া একেবারে প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অকৃতজ্ঞ গোকুল তাহাদের এই উপকার স্বীকার করিল না। সে রাগের মাধ্যম একেবারে ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, শালারা সব মিথ্যেবাদী। কেবল হিংসে করে এই সব রটাতো।

অতিবৃদ্ধ বাঁড়ুয়েমশাই লাঠি ঠকঠক করিয়া আসিয়াই একেবারে কাদিতে গুরু করিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে কান্না থামিলে বলিলেন, গোকুল রে, আমার হাবাগ তিনিদিন তিনরাতি খায়নি শোয়নি, কেবল কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। পঁচিশ-ত্রিশ দিন খরচ করে তুমি স্বান পেয়েছে, কোথায় সে হৌড়া থাকে। এ ঠিকানা বার করা আর কি কারো সাধা ছিল?

গোকুল ভিত্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত কাউকে টাকা খরচ করতে সাধিনি মশাই!

বাঁড়ুয়ে অবাচ হইয়া কহিলেন, সে কি গোকুল, আমরা যে তোমাদের আপনার লোক! আর সবাই চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি কে?

আচ্ছা, যান যান, আপনারা কাজে যান। বলিয়া গোকুল নিত্যন্ত অভদ্রভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল। একদিন দুইদিন করিয়া কাটিতে লাগিল, অতচ বিনোদ আসে না। শাস্ত্রপ্রকৃতি গোকুল একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল।

ভবানীকে দেখিলে যেন চেনা যা না, এই কয়দিনে তাঁহার এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নীরবে নতমুখে আগামী শ্রাঙ্কের কাজকর্ম করেন—ছেলের নাম মুখেও আনেন না।

এই একটা বৎসর বিনোদ যখন তখন নানা ছলে গোকুলের নিকট টাকা আদায় করিত তাহার ঋী মনোরমা ব্যাপারটা পূর্বেই অনুমান করিয়া স্বামীকে বারংবার সঙ্কর সন্তোষ সে কান দেয় নাই। এই উন্মেষ আজ সকালে করিবামাত্রই গোকুল আশুন হইয়া কহিল, বিনোদ যখন কারুর বাপের বাড়ির টাকা নষ্ট করবে, তখন যেন তার কথা কয়। বলিয়া দ্রুতপদে তাহার বিমাতার ঘরের সমুখে আসিয়া ডাককণ্ঠে কহিল, অতবড় রাবণ রাজা মেয়েমানুষের পরামর্শে সবংশে ধ্বংস হয়ে গেল, তা আমরা কেন ছাড়। কি বাবার কানে কানে ফুস ফুস করে উইল করার মন্তর দিলে মা, সবদিকে আমাকে মাটি করে দিলে।

ভাবানী আশ্চর্য হইয়া মুখ তুলিবামাত্রই সে হাত-পা নাড়িয়া একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া ফেলিল, তোমাকে ভালমানুষ বলেই জানতুম মা, তুমিও কম নয়! মেয়েমানুষের জাতটাই এমনি! বলিয়া, তাঁহাকে 'মড়ার উপর খাঁড়ার বা' দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমন করিয়া চলিয়া গেল। একে শোকানদার তাহাতে মূৰ্খ, গোকুলের কথাই এমনি সকলেই জানিত। বিশেষতঃ রাগিলে আর তাহার মুখে বাধা বীধন থাকিত না। ইহাও কাহারো অগোচর ছিল না। কিন্তু তাহার আত্মকালকার কথাবার্তাগুলো বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছে বলিয়া আশ্চর্য-পর সকলেরই মনে হইতে লাগিল।

অপরাক্বেলয় বাঁড়ুয়োমশাই দিবানিত্রা হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতেছিল—হঠাৎ গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অপমান করিলেও ত সে বড়লোক। সুতরাং তাহার আগমনে বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। গোকুল তিনখানি নোট ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া স্নানমুখে, বিনীতকণ্ঠে বলিল, মাস্টারমশাই, হারাণের সেদিনকার খরচটা দিতে এলুম।

থাক থাক, সেজন্যে আর ব্যস্ত কেন দাদা, তোমাদের কতই ত খাচ্ছি নিচ্ছি। বলিয়া বাঁড়ুয়োমশাই সে নোট তিনখানি তুলিয়া লইলেন। গোকুলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কৈ আজও ত বিনোদ এলো না মাস্টারমশাই! হারাণকে সঙ্গে করে আমি একবার আজ যাব!

বাঁড়ুয়োমশাই তীব্রভাবে সর্বাস্থ আশ্বলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না ভাই। সে স্থানে যাবে তুমি, আমার হারাণ থাকতে? না না, তা হবে না—আমি কালই তাকে পাঠয়ে দেব।

গোকুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না মাস্টারমশাই, আমি না গেলে হবে না। সে বড় প্রতিদানী— শুধু উইলের কথা শুনেই অভিমানে আসচে না। আমার মুখ থেকে না শুনে সে আর কারো কথাই বিশ্বাস করবে না। বাপ-মায়ে আমার কি সর্বনাশই করলে! বলিয়া গোকুল সহসা আঁতুপে কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁড়ুয়োমশাই তাহাকে অনেক প্রকার সাধনা দিয়া এবং তাহার এ-অবস্থায় কোনমতেই সে স্থানে যাওয়া হইতে পারে না বলিয়া, কালই হারাণের দ্বারা তাহাকে আনাইয়া দিবেন, দার দার প্রতিজ্ঞা করিলেন, গোকুল নিরুপায় হইয়া আর পাঁচখানি নোট হারাণের খরচের ব্যবদ ধরিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাটা ফিরিয়া গেল।

পাঁচ

জয়লাল মাস্টারকে গোকুল গোপনে আশী টাকা ঘুষ দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেকেই তাহার নিবুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছটফট করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভুল্ফের দ্বারাও গ্রাস্য করে না—এমনদ্বারা একটা আভাসও বাড়িসুদ্ধ সকলের চোখে-মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ির গাড়ি বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচড়া স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তজ্জিহ্ন্যভাবে কোচম্যানকে প্রশ্ন করিল, আর কি কলকাতার গাড়ি নেই যে তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা জিরো গে যা।

কোচম্যান বিনীতভাবে কহিল, আরো দুখানা আছে বটে, কিন্তু ঘোড়া দানাপানি পায় নাই বলেই চলে আসতে হ'লো।

গোকুল একমিনিটেই শপথম্বে চড়িয়া ধমকাইয়া উঠিল, ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আসতা হ্যায় কিনা, তাই ব্যাটারের নবাব ঘোড়া একসঙ্গে দানাপানি না পেলেই মরে যাবে! যাও, আভি লে যাও।

কোচম্যান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রসিক চক্রবর্তী বহুদিনের কর্মচারী। এ বটিতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল, ছোটবাবু এলে গাড়ি ভাড়া করেও আসতে পারবেন। সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন বড়বাবু?

রসিক যে নিকটেই ছিল, গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমি ব্যস্ত হব সে হতভাগার জন্যে? তুমি বল কি চকোভমশাই? বাড়িতে মেয়েরা এমন দিব্যরাত্রি কান্দাকাটি না করলে

আমি ত তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিইনে। গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুন্ডর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবদিত ছিল না। বাটার মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে একটি দিনের জন্যেও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কান দুটা তাহার গাড়ির চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহুদূরে একটা ভারী গাড়ির আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল, ওরে এগিয়ে দেখত রে, আমাদের গাড়ি কিনা! ঘোড়া দুটোকে হররান করে মারলে বলে রাগ গেল! গুণধর ভায়ের জন্য আবার গাড়ি পাঠাতে হবে! সংমার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দুটোকে ফেলা যায় না।

রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি গাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আন্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাণ্ডহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা, যা, বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্তি! কালপরও এলে যদি তাকে ফটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস—হ্যাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বৌকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না তা বলে দিছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চকোত্তমশাণ্ডি, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এসে কিছু পোত : এখন আর একটি পরসাদও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না। বলিয়া গোকুল ছনছন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাতাব উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল, তাহা বাটার মেয়েরা টের পাইল না। দাসী মুখ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। লোকান্নেব গোমস্তাব উপর অধ্যাপক বিদায়ের ফর্ম প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই গোকুল তড়াক করিয়া উঠিয়া কাচ-কথানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যাননি যে, রাজা-রাজভার মত পণ্ডিত-বিদায় কপতে হবে! যাও, যাও, ওসব আমিরী চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিলেন। সন্মুখে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোনরকম অসুখ হচ্ছে গোকুল?

গোকুল যেমন শুইয়া ছিল, তেমনিভাবে জবাব দিল, না।

ভবানী বলিলেন, না, তবে যে কিছু খেলিনে, হঠাৎ এমন সময়ে এসে যে শুয়ে পড়িল?

গোকুল কহিল, পড়লুম।

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্মটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণপত্র না পাঠালে আর সময় হবে না বাবা। গোকুল ঠিক তেমনি করিয়া জবাব দিল, না হয় নাই হবে।

ভবানী কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, হি গোকুল, এ সময়ে ও-রকম অধীর হলে ত হইবে না। কি হয়েছে আমাকে খুলে বল—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কবলের শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখ পাকানিয়া উঠিয়া বসিল। কান্ধার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সে কোনদিন শিক্ষা করে নাই। করুণ-কণ্ঠে কহিল, তোমার যে মতলব শোনে মা, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুনত বটে, কি আমিও শুনব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হব, কেন জীকজমক করব না। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্ত্বনুরে কহিলেন, হি বাবা, তিনি স্বর্ণে গেছেন—তার সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে! গো-গো-গো জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ রকম করলে লোকে কি বলবে বল দেখি বাছা! যাদের যের-সঙ্গতি, তাদের তেমনি কাজ করতে হয়, না করলেই অশ্রুতি

রটে।—গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক গে শালারা। আমি কারো ধার ধারিনি যে ভয়ে মরে যাব।—ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে ভীতি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না করলে তিনি সূখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। শিতাকে সে যে কি ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বলচে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আসচে। বিনোদ অভিমান করে উল্লাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব? বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিয়া উঠিল।

ভবানী নিজেকেও আর সামলাইতে পারিলেন না। কাদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁদলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েছে গোকুল?

গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, পেয়েচ বৈ কি মা।

কে তাকে খবর দিল?

কে যে তাহাকে বাড়ির এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাস্টারমশায়ের পুত্র হারামের সখ্যে তাহার নিজেরও সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-ওনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ি আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েছে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায়নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হাছা করে আঙুন ছপে যাচ্ছে না? সে সব জেনেছে মা, সব জেনেছে।

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই অশ্রুগদগদ কণ্ঠস্বর আর নাই। কিন্তু তাহাতে উদ্ভাপও ছিল না। সহজকণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস নে। মনে কর, আমাদের বংশে আর ছেলেলিপলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ-কাজ করতেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি ভাবাব দিবে, তাহা ভবিষ্য না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ভাবাব দিল তাহার হ্রী। সে ঘরের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই ওনিতেছিল। সেইখান হইতেই বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুকেই এমন একটা কাজ করে গেলেন? তিনি ছিলেন অস্বার্থমী। তিন-চারদিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেললেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পারবে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর, আর কেউ হলে—

টানটা অসমাপ্তই রহিল। আর কেহ কি কহিত তাহা খুলিয়া বলা এ ক্ষেত্রে বড়বৌ বাছল্য মনে করিল। কিন্তু ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতিপূর্বে খবর বর্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোনদিন বলে নাই, এমন কি শ্বাশুড়ীর সামনে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্যাপার মত চেঁচিয়া উঠিল, শোন মা, শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

• প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু আরও একটুখানি সরল-কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, দ্যাখো, যা বলবে আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আঙুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, বৌমা, তোমার কথা ক'বার দরকার কি মা! যাও, নিজের কাজে যাও।

বৌমা কহিল, কথা আমি কোনদিনই কইনে মা। দাসী-চাকরের মত খাটতে এসেছি, দিব্যরাত্রি খেটেই মরি। কিন্তু উনি যে খেতে শুতে বসতে—আমার চারটে পাশ-করা ভাই, আমার পাঁচটা পাশ-করা ভাই করে নাগিয়ে বেড়ান; কিন্তু ভাই ত বাড়ি এসে মুখ্য বলে একটা কথাও কোনদিন কয় না। ওঁর নিজের লজ্জা-শরম থাকলে কি আর কথা বলবার দরকার হয়? বলিয়া সে তিলাধ অপেক্ষা না করিয়া গুমগুম পায়ে অবস্থাটা জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আজ্ঞা এতদিন পরে ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার বড়বধুটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাহার দুঃখ, ক্লোড ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দার একপ্রান্ত হইতে—কাহারো গুনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বলিল, যখন-তখন শুধু রাশ রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। আমার মামাদেরও দু-পাঁচটা পাশ করে বেরুতে দেখছি ত। কিন্তু সাবধান করে দিতে গেলেই তখন বড় তেতো লাগত। তা বাবু, তেতোই লাগুক আর মিষ্টিই লাগুক, নিজের টাকা অমন করে অপব্যয় হতে থাকলে নিজের ছেলেপিলের মুখ চেয়ে আমি কিছু আর চিরকালটা মুখ বুজে থাকতে পারিনে। মুখ্য দাদা পেয়েচ, যত পেরেচে, তত ঠকিয়েচে। ঠকাক, আমার কি? ওঁর নিজের ছেলেমেয়েই পথে কসত।—নিশা বড়বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

গোকুল হাত-পা ছুড়িয়া লামফিয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্বীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

কি! আমি মুখ্য? কোন্ শালা বলে? এ-সব বিষয়-সম্পত্তি করলে কে? আমি, না বেকা? আমার চোখে ধূলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেকার বাপের সাধি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চারটে পাশ করে থাকে ত আমি দশটা পাশ করতে পারি তা জানিস? আমি মুখ্য? বাড়ি ঢুকলে দরওয়ান দিয়ে তাকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে।

এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত-কি সে অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতে লাগিল। ভবানী সেই যে নীরব হইয়াছিলেন, আর কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ পর্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া একসময়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

জয়

তখন ঋগড়া হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকী রহিল না, সে তাহার পরদিনের বাবহারেই বুঝা গেল। হঠাৎ সকাল হইতেই সে সমস্ত কাজকর্মে হাঁকডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং আগামী কর্মের দিনটি আসিয়া পড়িতে যে মাত্র তিনটি দিন বাকী রহিয়াছে, সে কথা বাড়িসুদ্ধ সকলকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া ফিরিতে লাগিল। বাহিরের যে-কেহ বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, নিজের বাপ যাকে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, তার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করবেন না। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যে ভাই ছিল সে মরে গেছে।

তাহার কথা শুনিয়া কেহ চোখ টিপিয়া আর একজনকে ইঙ্গিত করিল, কেহ তলস্কা ঘাড় নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিল। অর্থাৎ এই সোজা কথাটি কাহারো অবিস্মৃত রহিল না যে, বিনোদ এসেবারেই পথে বসিয়াছে এবং গোকুল যে-কোন কৌশলেই হোক বোল আনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, সে আসিয়া এই ভয়ানক জুয়াচুরির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতেও পারিবে—এক্সপ আডাসও কেহ কেহ দিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জললাল বাঁড়ুয়ে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে মানুষকে যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাহার চক্ষেই যে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষে যখন একবাক্যে গোকুলকে ন্যায্যনিষ্ঠ, স্রোতবৎ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে,

তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন আর মনে মনে বলিয়াছেন, আরে, সংসার ছেলে বৈমাত্র ভাই—তার ওপর এত টান! বেদে পুরাণে যা কল্পিনকালে কখনো ঘটেনি, তাই হবে এই যোৱ কলিকালে! সতরাং এতদিন তিনি মুখ বুজিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। আবশ্যক কি! বেশ জানিতেন, একদিন সমস্ত প্রকাশ পাইবেই।

এখন দেখ তোমরা—এই এত ভালো, অত ভালো, গোকুলের সম্বন্ধে যা আমি বরাবর ভেবে এসেছি, ঠিক তাই কিনা!

কিন্তু কি এতদিন তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও যখন জানা ছিল না, তখন সকলকেই নীরবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের আগুনের মত কথাটা মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল। অথচ গোকুল টের পাইল না যে, বাহিরের বিরুদ্ধ আন্দোলন তাহার বিপক্ষে এত সম্ভব এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল।

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কইতেন। তাহাকে কাল রাত্রি হইতে বাধার ভাবে তাঁহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা একসময়ে স্বামীকে নির্জনে ডাকিয়া এইদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মার ভাবগতিক দেখে?

গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, না। কি হয়েছে মার?

মনোরমা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, হবে আবার কি! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা ক'ন না। তোমার সঙ্গে কথা-টখা কইচেন ত? গোকুল স্তব্ধ হইয়া কহিল, না, আমার সঙ্গে না।

মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কষ্টবর আরও নীচু করিয়া বলিল, দেখলে মজা! যে টাকাগুলো ঠাকুরপো দু'হাতে উড়িয়ে দিলে, সেগুলো থাকলে ত আমাদেরই থাকত। ঠাকুর ত আমাদেরই সব লিখে দিয়ে গেছেন। আমাদের তিনি সর্বনাশ করবেন—আর সে-কথা একটু মুখ থেকে খসলেই রাগ করে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে হবে? এইটে কি ব্যবহার? তুমি ত 'মা' 'মা' করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে?

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কোন রকম জবাবই সে বুজিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, ঠাকুরপো যাই করুক আর যাই হোক, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীনপো বৈ নয়। তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়েমানুষের সহ্য হয়? না, না, আমার সব কথা অমন করে তোমার উড়িয়ে দিলে আর চলবে না। এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে, অমন 'মা' 'মা' করে গলে গেলে সবদিকে মাটি হতে হবে, বলে দিচ্ছি! বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।

গোকুলের বৃকের ভিতরটা অত্যন্তপূর্ব শঙ্কায় গুরুগুর করিয়া উঠিল। সে বিবর্ণমুখে ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী কহিল, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ তা পার না। আমার কথাটা শুনে। বলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে কপকপাল হ্রিদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কতটা কাজ হইয়াছে অনুমান করিয়া লইয়া বেশ-একটু জোর দিয়া বলিল, আর ঠাকুরপোর ত চিরদিন এমনখারা বয়াটেপানা করে বেড়ালে চলবে না। তাঁকে লেখাপড়া ত তুমি আর কম শেখাও নি। এখন যা হোক একটু চাকরি-বাকরি করে মাকে নিয়ে বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে তাঁকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখতে পারবেন না। তা ছাড়া, মাথা ওঁজো দাঁড়াবার বা হোক একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও যেমন ক্ষমতা সাহায্য করব—লোককে যেন না বলতে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখলে না। বৈমাত্র ভায়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? যারা বলে তারা বলুক, আমরা সে কথা বলতে পারব না। সে বংশ আমাদের নয়। বলিয়া সে স্বামীকে ভাবিবার অবকাশ দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া কি-সব যেন অদ্ভুত আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস! এবং শুধু সেইজন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে

ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন। তাহার মনে পড়িল তাহার স্ত্রী মিথ্যা বলে নাই। আজ সারাদিনের মধ্যে মায়ের সহিত তাহার একটা কথাও ত হয় নাই। কার্যোপলক্ষে তাহার সুমুখ দিয়া সে দু-তিনবার যাতায়াতও করিয়াছে, কিন্তু তিনি মুখ তুলিয়াও ত চাহেন নাই। মা চিরদিনই অত্যন্ত অজ্ঞাভাবিনী জানিয়া সে সময়টায় গোকুলের কিছুই মনে হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক যেন জলের মতই স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। অথচ এই সমস্ত চূপচাপ নীরব বিরুদ্ধতা সহ্য করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মার সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল, এমনধারা মুখভার করে কাজকর্মের বাড়িতে বসে থাকলে ত চলবে না মা!

ভবানী বিষয়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, তোমার বৌ ত আর মিছে বলেনি যে, বিনোদ রাশ রাশ টাকা নষ্ট করেছে! বাবা তার বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তার সঙ্গে যোগাপড়া কর গে, আমাদের উপর রাগ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি।

ভবানী মর্মান্বিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি কারো ওপরেই রাগ করিনি গোকুল, কারো সঙ্গে যোগাপড়া করতে চাইনে।

যদি চাও না ত ওরকম করে থাকলে চলবে না। বিনোদকে বলো সে যেন চাকরি-বাকরি করে। আমার বাড়িতে তার জায়গা হবে ন।

সে ত হবেই না গোকুল, এ আব বেনী কথা কি! বলিয়া ভবানী মুখ নীচ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঝগড়া করিতে না পাইয়া গোকুল নিরুপায় ক্রোধে বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। স্বীকে ডাকিয়া কহিল, আজ স্পষ্ট বলে দিলুম মাকে—বিনোদের এখানে আর থাকা হবে না—চাকরি-বাকরি করে যা ইচ্ছে করুক আমি কিছু জানিনে।

মনোরমা আত্মদে আগাইয়া আসিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন উনি?

গোকুল অস্বাভাবিক উদ্বেজনার সহিত জবাব দিল, বলবেন আবার কি! আমি বলাবলির কি ধার ধারি!

বড়বৌ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবু, তবু?

গোকুল তেমনি করিয়াই কহিল, তবু আর কি! তাঁকে স্বীকৃত করতে হ'লে, —না, বিনোদের এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

তাহার স্ত্রী গলা আরো খাটো করিয়া কহিল, এ বোল আনা রাগের কথা, তা বুঝেচ? মার মন পড়ে রয়েছে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তাঁর দুচক্ষের বালি।

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আর বুঝনি? আমার কাছে কি চালাকি চল? বাহিরে আসিয়াই রসিক চক্রবর্তীকে সুমুখে পাইয়া কহিল, বলি একটা নতুন খবর শুনেচ চক্ৰোত্তমশাহ? এতকাল এত করে এখন আমিই হয়েচি মার দু'চক্ষের বিষ। কথাবার্তা আর আমাদের সঙ্গে ক'ন না, সুমুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে বসেন।

চক্রবর্তী অকৃত্রিম বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিল, না না, বল কি বড়বাবু!

কি বলি? ওরে ও হাবুর মা, শোন শোন!

বাড়ির বুড়া ঝি কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, মনিবের ডাকাডাকিতে কাছে আসিবামাত্র গোকুল চক্রবর্তীর প্রতি চাহিয়া কহিল, একে জিজ্ঞেস করে দেখ।—বলিস হাবুর মা, মাকে আমার সঙ্গে কথা কহিতে আর দেখচিস? সুমুখে পড়লে বরং মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ত?

হাবুর মা কিছুই জানিত না। সে মুড়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘাড় নাড়িয়া মনিবের মন রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সাত্তে মিথ্যে শুনেলে ত? বলিয়া চক্রবর্তীর প্রতি একটা ইশারা করিয়া গোকুল অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেদিন পাড়ার যে-কেহ দেখাশুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া, পুনঃপুনঃ এই একটা কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আমি সতীনপো বৈ ত নয়! কাজেই

বাবা মরতে-না-মরতেই দু'চক্ষের বিষ হয়ে পীড়িয়েচি!

সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার এত দার পড়ে যায়নি যে, লোকজন পাঠিয়ে বর্ধমান থেকে ছোটপিসীমাদের আনতে যাব। এত পরজ নেই—আসতে হয় তিনি নিজে আসবেন।

ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল কাজ হবে গোকুল?

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভালোমন্দ জানিনে। দু'হাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধি নেই। তুমি এ নিয়ে আমাকে আর জেদ করনা। তা বলে দিচ্ছি।

ইহাদিককে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া হাতের কাজে মন দিলেন। তথাপি গোকুল সুমুখে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আনো বললেই ত আর আনতে পারিনে মা। ধারকর্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পারব না।

ভবানী অশ্রুট-স্বরে বলিলেন, বেশ ত গোকুল, ভাল বোঝো—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে।

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, এখন থেকে আমাকে বুঝতেই হবে যে! আমার কি আর আপনার মা আছে! আমি ম'লেই বা কার কি—কে আর আমার আছে! এখন নিজেকে নিজে সামলানো চাই। টাকাকড়ি বুঝেসুঝে খরচ করা দরকার। নিজের মা ত নেই। বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তিতে অকস্মাৎ এতবড় আসক্তি দেখিয়া ভবানী নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু গোকুল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি কি বুঝিনে? এটা তোমার রাগের কথা নয়? কাল নিজে তুমি বললে, গোকুল, তোর পিসীমাদের লোক পাঠিয়ে আনা, আর আজ বলচ, যা ভাল হয় তাই কর? আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে, আমাকে এমনি করে জ্ঞান করা! লোকে বলবে গোকুল বুঝি সত্যি সত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না!

তাহার এই একান্ত অবোধা অভিযোগে ভবানী বিমূঢ় হতবুদ্ধির মত একমুহূর্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলিনি বাবা।

গোকুল অকস্মাৎ দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল, তোমার কোন ধকুমটা শুনিবে মা, যে তুমি আমাকে এমনি করে বলচ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। দেখা লজ্জায়-ঘেরায় বাড়িছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দু'চক্ষু যায় চলে যাব। থাকো তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে। বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সাত

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাসিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে গুইত। সে ভোর হইতে-না হইতে চৌচাইতে চৌচাইতে আসিল, কাকা এসেচে মা, কাকা এসেচে।

পাশের ঘরে গোকুল গুইয়াছিল। সে ধড়কড় করিয়া কব্জলের শস্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিশ্বয়ের সহিত প্রসন্ন করিতেছে, কখন এল রে তোর কাকা?

মেয়ে কহিল, অনেক রাগিরে মা।

মা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি ক'রে?

মেয়ে কহিল, এখনও ঠাঠন নি। তিনি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর ঠাকুরমা তাকে কি বললে রে হিমু?

হিমু বাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে শু বাবা।

গোকুল তথাপি প্রশ্ন করিল, খুব বললে বুঝি রে?

হিমু অনিশ্চিতভাবে বার-দুই মাথা নাড়িয়া অবশেষে কি মনে করিয়া বলিল, ঐ।

গোকুল ব্যগ্র হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া আঙুলে কহিল, তোর ঠাকুরমা কি কি সব বললে—বল ত মা হিমু।

হিমু বিপদে পড়িল। কাকা যখন আসেন, তখন সে ঘুমাইতেছিল—কিছুই জানিত না। বলিল, জানিনে ত বাবা!

গোকুল বিশ্বাস করিল না। অগ্রসর হইয়া বলিল, এই যে বললি, জানিস। মা তোকে মানা করে দিয়েছে, না? আমি কাউকে বলব না রে, তুই বল না।

জেরায় পড়িয়া হিমু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া উৎসাহ দিয়া কহিল, বল ত মা, কি কি কথা হ'ল? মা বুঝি বললে, বেরিয়ে যা তুই বাড়ি থেকে? এই নে দুটো টাকা নে—পুতুল কিনিস। বলিয়া সে বালিশের তলা হইতে টাকা লইয়া মেয়ের হাতে ওজিয়া দিল।

হিমু শুধু হইয়া বলিল, ই বললে।

তার পর? তার পর?

হিমু কঁাদ-কঁাদ হইয়া বলিল, তার পরে ত জানিনে বাবা।

গোকুল পুনরায় তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, জানিস বৈ কি! তোর কাকা কি বললে?

কিছু বললে না।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত ও কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, একেবারে কিছুই বললে না? তা কি হয়?

পিতার ক্রুদ্ধ স্বর শ্রব লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানিনে ত।

ফের জানিস নে? হারামজাদা মেয়ে? বলিয়া সে চটাস করিয়া মেয়ের গালে চড়কসাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হ।

মেয়ে কাদিতে কাদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল দ্রুতপদে নীচে নামিয়া তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা বেশ করেচ! সে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই নানারকম করে নাগিয়েচ, ভাড়িয়েচ—আমার ওপর যাতে তার মন ভেঙ্গে যায়—এই ত? সে-সব কিছু আমার আর শুনতে বাকী নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সমুখে না পড়ে, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি। বলিয়াই তেমন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ভবানী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাহিরের নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, ও হ'বর মা, বলি, ভায়া সে বাড়ি এসেছেন, শুনেচিস?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ বাবু, খোর রান্তিরে ছোটবাবু বাড়ি এলেন।

গোকুল কহিল, সে ত জানি রে। তার পরে মায়ে-ব্যাটাং কি কি কথা হলো? আমার নামে বুঝি মা খুব করে লাগালে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার-টাবার কথা—

ঝি বাধা দিয়া কহিল, না বড়বাবু, মা ত ওঠেন নি। যদু তার ব্যাগটা নিয়ে এলে আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুকলেন আর ত বার হননি।

গোকুল অগ্রভায় করিয়া কহিল, কেন ঢাকচিস ঝি? আমি যে সব শুনেচি।

গোকুলের কথা শুনিয়া ঝি বিষয়ে কক্ষকাল চাহিয়া রহিল। তার পরে হাবুর দিবি করিয়া বলিল, অমন কথাটি ব'লো না বড়বাবু। আমি সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবাবুর সঙ্গ করছে দিলুম। তিনি মাকে ডাকতে নিবেদন করে বললেন, ঝি, আর আমার কিছু দরকার নেই। তুই শুধু আলোটা জ্বেলে দিয়ে শুগে যা। আহা! চোখ-মুখ বসে গিয়ে একেবারে কালিঙ্গ হয়ে গেছে।

গোকুলের চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, তা আর হবে না? তুই বলিস কি হাবুর মা, বাবা মারা গেলেন, তেঁঁড়া একবার চোখের দেখাটা দেখতে পেলেন না—একটা পয়সার বিষয়-আশয় পর্যন্ত পেলেন না—তার মনে মনে যা হচ্ছে, তা সেই জানে। বাবাকে সে কি ভালই বাসত, তা তোরা সব জানিস? কি বলিস হাবুর মা? বলিতে বলিতেই গোকুলের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

হাবুর মা অনেকদিনের দাসী। চোখের জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল আসিল। গাঢ়স্বরে কহিল,

তা আর বলতে বড়বাবু। তেনার বাবা-অন্ত গ্রাণ ছিল যে। তবে কিনা বড় বড় লেখাপড়া করতে করতে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বলিল। কহিল, তাই বল না হাবুর মা। মগজটা গরম হবে না? বিস্ফোটা কি সে কম শিখেচে! অন্যর গ্রাজুয়েট! বলি, এই হুগলি-চুচড়ো-বাবুগঞ্জে কটা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কৈ দেখিয়ে দে দেখি? লটিসাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেঁজিপেন্ডি মানুষ! তুই ত থি, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে কোন ভয়লোককে বল গে দেখি যে, তুই বিনোদবাবুদের বাড়ির দাসী! তাকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে হাজারটা খবর নেবে, তা জানিস? কিন্তু ঐ কথায় বলে গায়ের যুগী ডিঞ্চে পায় না! এখানকার কোন ব্যাটা কি তারে চিনিতে পারলে? মুখখানি একবারে শুকিয়ে গেছে দেখলি, না রে?

খি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মুখখানি দেখলে চোখে আর জল রাখা যায় না বড়বাবু!

গোকুলের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয় অঞ্চলে অক্ষ মুছিয়া কহিল, তুই তাকে মানুষ করেচিস হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিনতে পেরেচিস। আহা! চিরটা কাল তার হেসেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখাপড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ-সব হাল্লামা তাকে পোয়াতে হয়েছে, বল দেখি? আর উইল করে বিষয় দেব না বললেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন শালা আটকায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে? ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল দেখি ওনি? আইন-আদালত নেই? বিনোদ নালিশ কবলে আমাকে যে বাবা বলে অর্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুলচিরে ভাগ করে দিতে হবে তা জানিস।

খি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বৈ কি বাবু!

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উল্লীপ্ত করিয়া কহিল, তবে তাই বল না! আর এই মা-টি! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক না কেন? তুই কেন উইল করার মতলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হ'লো? ধর্ম নেই? তিনি দেখতেন না? নির্দোষকে কষ্ট দিলে—তার কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না? আর বিষয়! ভারী বিষয়—আজ বাদে কাল সে যখন হাইকোর্টের জজ হবে—সে ত আর কেউ তার আটকাতে পারবে না—তখন কি করে রাখবি বিষয়? এ-সব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে না? এখন স-মানে না দিলে, তখন অপমান হয়ে দিতে হবে যে!

হাবুর মা খুশী হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল-টুইল তাহার একেবারে ভালই লাগে নাই; কহিল, আজ্য বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোটবাবুকে ডেকে বল না যে, তোর বিষয়-আশয় ভাই তুই নে! তুমি দিলে ত আর কাকুর না বলবার জো নেই।

কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খটকা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাখি নেই। বাবার উইল ত রদ করতে পারিনে হাবুর মা। আমাদের বড়বাবু মামাত ভাই একজন মস্ত মোস্তার—সে নাকি তার বোনকে চিঠি লিখেচে, তা হলে জেল খাটতে হবে। তবে যদি মা রাজী হয়, বড়বাবু রাজী হয়, তখন বটে।

হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

গোকুল মুখ ফিরাইতেই দেখিল হিমু খেলা করিতে বাইতেছে। তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর কাকা উঠেচে রে?

হিমু বাড় কাত করিয়া কহিল, ঈ, উঠেই তার বসবার ঘরে চলে গেলেন—কাকু সঙ্গে কথা কইলেন না।

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত। ঘরখানি ইংরাজি ধরনে সাজানো ছিল—এইখানেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া কাছে গিয়া জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চোঁকিতে না বসিয়া নীচে মেঝের উপর ওদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরন দেখিয়াই গোকুলের দুটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে খাঁড়িয়া ছোট-কাঁইয়ের মুখখানি দেখিবার আশায় মিনিট-পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্তী কহিল, বড়বাবু, অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দা—

গোকুল সহসা যেন অজ্ঞকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, এ-সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়াও চক্কোস্তিমশাই। মা সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েছেন। কে কেমন পণ্ডিত, কার কত মান-মর্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন? আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না চক্কোস্তিমশাই।

চক্রবর্তী কহিল, কিন্তু ছোটবাবু ত এখনো ঘুম থেকে উঠেন নি।

গোকুল স্নানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, ঘুম থেকে! তার কি আহার-নিদ্রা আছে? ছোটবাবু মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে স্বচক্ষে দেখেছে। বলে, বড়বাবু, ছোটবাবুর মখের পানে চাইলে আর চোখের জল রাখা যায় না—এমনি চেহারা হয়েছে। ভেবে ভেবে সোনার বর্ণ যেন কলিমাড়া হয়ে গেছে। বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, গিয়ে দেখ গে—সে ঠাণ্ডা মাটির উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখলে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোস্তিমশাই!

চক্রবর্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অশ্রুটে কহিয়া ফর্দ লইয়া যাইতেছিল, গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিল, আচ্ছা, তুমি ত সমস্তই জানো—তাই জিজ্ঞাসা করি, আমি থাকতে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন? উপোস-তিরেশ কি গুর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে? হয়ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া গুর যেমন অভ্যাস তেমনি চলুক!

চক্রবর্তী নিরুৎসাহভাবে কহিল, না পারলে—

কথাটা গোকুল শেষ করিতেই ছিল না। বলিল, পারবে কি করে, তুমিই বল দেখি? আমাদের এ-সব কুল-মঞ্জুরের দেখে—এতে সব সয়। কিন্তু গুর ত তা নয়। পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার ঘনি হয়েচে, তার দেহতে আর আমার দেহতে তুমি তুলনা করে বসলে? কে আছিস রে ওখানে—ছুতো? যা ত একবার চট করে আমাদের ভটচ্যাখিমশাইকে ডেকে আন। না হয় যত টাকা লাগে—জাহ্নবীর সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা বলে ত মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেলতে পারব না। ওকে আমি আলোচালের হবিবি্য করিয়ে নিকেশ করতে পারব না, এতে তিনি যাই বলুন।

চক্রবর্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বলবে—

আরে লোকে কি বলবে বলে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেলব? তোমার এ-সব কি বুদ্ধি হ'লো, বল ত চক্কোস্তিমশাই? না না, ফর্দ-টর্দ নিয়ে তোমার পেন্সন তাকে ছালা:৩০ করার দরকার নেই। মুখে যা হোক একটু-কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক, বলিয়া গোকুল নিতান্ত একারণেই সে বিচার্যার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আট

চায়ের বাটিটা বিনোদ ব্রাক্ষণের হাত হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু সে বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকুর উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিত, সে শুধু অজ্ঞানিই দেখিলেন।

সমস্তদিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেই সহিত কিছু কিছু কথাবার্তা কহিল বটে, কিন্তু বড়ভাইয়ের ছায়া দেখিলেও সে সরিয়া যাইতে লাগিল। অথচ সে ছায়াও তাহাকে মুহূর্তে একবার দেখা দেয় না। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাজের ব্যস্তাটে হঠাৎ সেইদিকেই আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

অপরাহ্নবেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একা বসিয়া ছিল, একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল। অকারণে খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, কলিকাতার বাসা ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনেচ বোধ হয়—সে একটা ভাষা আর কি! বলিয়া গোকুল পুনরায় গুরুহাসির অভিনয় করিয়া কহিল, তা তোমার যেমন কাণ্ড, একটা শব্দ

পর্বত দেওয়া নেই ; তা যাক, সে-সব হবে এখন—কাজটা চুকে যাক—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝলে না বিনোদ—গোটা-কয়েক টাকা শুধু বাজে খরচ হয়ে যাবে—বুঝলে—না—আর শালায় লোক যা এখানকার—জানেনই ত সব—বুঝলে না ভাই—তা সে কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয়-আশয় তোমাদের দুই ভায়ের রইল, এ কটা শুধু বুঝলে—না—তা যাক—সেজন্য কিছুই আটকাবে না—আর আমার ত মেজাজের ঠিক নেই ভাই। এই লোহার সিঁদুরের চাবিটা তুমি রাখ। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েছে, কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পারবে না। কিন্তু আমার ত এমন ফুরসত নেই যে, দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করি। বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া অবশি এই কথাগুলিই সে মনে মনে মঞ্চ করিতেছিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলো ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না—এ-সব আমি ছেঁব না।

একমুহুর্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারাদিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, ছেঁবে না? কেন?

বিনোদ কহিল, আমার আবশ্যক কি? আমি বাইরের লোক, দু'দিনের জন্যে এসেছি—দু'দিন পরেই চলে যাব।

গোকুল কহিল, চলে যাবে?

বিনোদ বলিল, যেতেই ত হবে। তা ছাড়া এ-সব টাকাকড়ির ব্যাপার। আমি মীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয়ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোট দুটো একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তার পর হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। পিতৃশ্রদ্ধে জীকজমক করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর হইতে মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

অথচ আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চৌচামেটির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কবলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

তোমাব কি অসুখ করেছে?

গোকুল উদাসভাবে কহিল, না বেশ আছি।

তবে, অমন করে শূলে যে?

গোকুল জবাব দিল না। মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা-টথা কিছু হ'লো?

গোকুল কহিল, না।

তখন বড়বধু অদূরে মেঝের উপর বেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি বলে বেড়াচ্ছে তুনে?

গোকুল মৌন হইয়া রহিল। মনোরমা তখন আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, বলে, বাবার ব্যামো-স্যামো কিছুই জানিনে, হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি!

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, ফন্দি কেন? তুমি বিশ্বাস কর না?

মনোরমা বলিল, আমি? আমি ন্যাকা! এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও করিনে।

কথাটা গোকুলের অন্তস্তত্ত্ব বিস্তীর্ণ লাগিল। তাহার এই অসাধারণ চারটে পাল-করা কুল-শ্রীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার বুকজোড়া ব্যথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল। ঘরে শ্রীপ ছিল বটে, কিন্তু সে আলোক ভেদন উচ্ছল ছিল না—মনোরমা তাহার স্বামীর মুখের ভাবটা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না ; বলিয়া উঠিল, খুব সাবধান, খুব সাবধান! এখন অনেককরম ফন্দি-ফিকির হতে থাকবে—কিন্তু তে কান দিও না। বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে একটি কাজও করতে যোয়ো না যেন। কাল সকালে

গাড়িতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েছি। বাই বল, বাবা না এলে আমার কিছুতে ভয় ঘুচবে না।

গোকুল উঠিয়া বলিল, তোমার বাবা কি আসবেন?

আসবেন না? তিনি না এলে এ সময়ে সামলাবে কে? নিমন্তলার কুণ্ডুসের আড়তের বাবাই হলেন সর্বসর্বা। কিন্তু তা বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না!

গোকুল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মনোরমা অত্যন্ত খুশী এবং ততোধিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, তোমার দোকানপত্র যা-কিছু ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখতে হবে? শুধু বলবে, আমি জানিনে, বাবা জানেন। ব্যস! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কার সাধ্য হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝলে না? বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল। ম্লান আলোকে গোকুল তাহা দেখিতে পাইল কি না, বলা যায় না; কিন্তু সে হী-না কোন কথাই কহিল না। তাহার পরেও অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াও মনোরমা যখন আর স্বামীর নিকট হইতে কোন সাড়াই পাইল না, তখন বাতাসটা যে কোন-মুখে বহিতেছে, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া সে সে-রাত্রির মত স্তম্ভ দিল। সকালবেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভার ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, মা, লোহার সিন্দুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে?

ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, কৈ না।

চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অনেক মতলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিসটা বিনোদের হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু মায়ের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলেই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে আস্তে কহিল, কি জানি, সে-ই কোথায় রাখলে, না আমিই কোথায় ফেললুম!

ভবানী কোন কথাই কহিলেন না। এই ভিড়ের বাড়িতে সিন্দুকের চাবির উদ্দেশ্য পাওয়া যাইতেছে না, এ-সংবাদেও মা যখন কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না এবং এই তাহার একান্ত নির্লিপ্ততা গোকুলের বৃক্কে যে কি শূল বিধিল, তাহাও যখন তিনি চোখ তুলিয়া একবার দেখিলেন না, তখন সে যে কি বলিবে, কি করিয়া মাকে সংসার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, তাহার কোন কুলকিনারাই চোখে দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, শব্দ আর দরবারী পিসীমাদের যে আনতে গেল, কৈ তারাও ত এখনো এসে পড়ল না!

ভবানী মুদকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি, বলতে পারিনে ত!

গোকুল বলিল, ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে না! এখন না আঁা, তাঁদের ইচ্ছে। কিন্তু আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূর ভেবে কাজ কর মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাকলে আমাদের—

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুলের দীপ্তি প্রকাশ এমন কথাটাতেও তাহার গষ্ঠীর বিষম-মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্বস্ত সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশবাস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নতুন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া মুদকণ্ঠে কথাবার্তা কহিতেছে।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভ্রলোকদিগের কাছে ছোটভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছটফট করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে শব্দ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত কহিল, এটি আমার ছোটভাই বিনোদ—অনার গ্রাডুয়েট।

বিনোদ ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে বড়ভায়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল মুক্কেপও করিল না; কতাজানি হইয়া কহিল, আমার সাতপুরুষের ভাগা যে আপনি এসেছেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে

ইংরিজীতে আলাপ কর্ত্ত না কেন? ওঁরা হাকিম, হজুর; ওঁদের কি বাংলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে ওনলেই বা তোমাকে বলবে কি?

আশেপাশের ভদ্রলোকের মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটিবাবু সজ্জুত ও কুচিতি হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের সমস্ত চোখ-মুখ রাস্তা হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে ভালমতেই জানিত। সুতরাং নিরস্ত করিতে না পারিলে দাদা যে কোথায় গিয়া পঁড়াইবেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশই ছিল না।

একটা কথা শুনুন, বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আমাকে কি আপনি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এ-রকম করলে আমিও একদণ্ড টকতে পারিনে।

গোকুল ভীত হইয়া কহিল, কেন? কেন ভাই?

কর্ত্তদিন বলেচি 'খাপনার এ অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারিনে; তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ-করা লোক গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে! বলিয়া বিনোদ স্কোভে অভিমানে মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বহানে ফিরিয়া আসিল।

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বোধ করি বলিতে বলিতে গেল, এরূপ কর্ম্ম সে আর করবে না। অথচ আধ-ঘণ্টা পরে বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকের কানে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাঙ্ডয়েন্টের সোনার মেডেলটা যেন সকলে হাতে করিয়া, খাঁটাখাঁটি করিয়া, নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটিবাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া অনাদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন?

নয়

নিমতার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের খণ্ডর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গৌর, বেঁটে আঁটসাঁট গড়ন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের হৌড়ারা আড়ালে বলিত, বাক্তবুধু। প্রাক্কবীটাতে একমুহুর্ত্তেই তিনি কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং ঘণ্টা-বানের মধ্যেই পাড়াসুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। এই কর্ম্মদক্ষ হিসাবী খণ্ডরকে পাইয়া গোকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মীয়-বান্ধবেরা সবাই ওনিল, মেয়ে-ভ্রামহিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি বাবসা হাতে লইবার জন্য দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসন্ত্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। খণ্ডরমশাই—নিমাই রায়, বহুমূল্য কার্ণেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার খাঁচলটা অমনি একটু টানিয়া দিয়া সৎ-শাওড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি চুপি পিতৃসকালে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া পঁড়াইল।

খণ্ডরমশাই কীরের বাটিটা একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া, বাটির কানায় গৌরটা মুছিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। বলি হাতের ডিল আর মুখের কথা একবার কসকে গেলে কি আর ফেরানো যায়?

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, আছে না।

নিমাই কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু ব্রিঙ্ক-গটীর হাস্য করিয়া জামাতাকে কহিলেন, তবে?

এই 'তবে'র উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে লাগিলেন, কহিলেন, বাবাজী, তোমরা হেলেনামানুষ দুটিতে যে কল্লাসকাটি করে আমাকে এই দুফানে হাত ধরতে ডেকে আনলে—তা হাল আমি ধরতে পারি, ধরবও, কিন্তু তোমাদের ত ছটফট করলে চলবে না বাবা। যেখানে বসতে বলব, যেখানে পঁড়াতে বলব, ঠিক তেমনি করে থাকা চাই, তবেই ত এই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব। বিনোদ

বাবাজী হাজারীবাগে ছিলেন, এই যে-সব এলিমেন্টারি যাকে তাকে বলে বেড়াচ্চ এটা কি হচ্ছে ? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্ছে, সেটা কি বিবেচ্য করতে পারচ না ?

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আত্মদে গদগদ হইয়া ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, হচ্ছেই ত বাবা। তাহিতে ত তোমাকে আমার ডেকে এনেছি। আমরা কিছু জানিনে—তুমি যা বলবে, যা করবে, তাই হবে। আমরা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করব না, তুমি কি করচ না করচ।

পিতা খুশী হইয়া কহিলেন, এই ত আমি চাই মা! মামলা-মকদ্দমা অতি ভয়নক জিনিস। শোননি মা, লোকে গাল দেয়, 'তোর ঘরে মামলা চুকুক'। সেই মামলা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা, তাই সাহস করছি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যাব—এতে আমার নিজের যাই হোক। একটি একটি করে তাঁদের গলা টিপে বার করব, তবে আমার নাম বন্ধিপাড়ার নিমাই রায়। বলিয়া তিনি মুখের ভাবটা এমনধারাই করিলেন যে, ওয়ারটারলুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অতবড় গর্ব প্রকাশ পায় নাই। গলা বাড়াইয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মা মনু, এইখানেই আমার হাতে একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে ফেলি; আর বাইরে যাব না। আর অমনি একটু বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে-টেতে আছে কি না। বলা যায় না ত—এ হলো শত্রুর পুরী।

মনোরমা যথানির্দিষ্ট কর্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। গোকুল বিহুল বিবর্ণ-মুখে একবার স্ত্রীর প্রতি, একবার শত্রুর প্রতি চাহিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া পিতাপুত্রীতে যত কথা হইল, তাহার একটা বর্ণও বৃষ্টিতে পারিল না। এ কাহাদের কথা, কাহার ঘরে মামলা চুকিল, কাহাকে গলা টিপিয়া কে বাহির করিতে চায়, কাহার কি সর্বনাশ হইল—প্রভৃতি ইশারা-ইঙ্গিতের কিছুমাত্র তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

নিমাই কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী, একটু স্থির হয়ে বসো—দুটো কথাবার্তা হয়ে যাক।

গোকুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই তোমাদের সুসময়। যা করে নিতে পার বাবা, এইবেলা। কিন্তু একটা সর্বনেশে মকদ্দমা যে বাধবে, সেও চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছি। তা বাধুক, আমি তাতে ভয় খাইনে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোস্তার। বন্ধিপাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুনেলে বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার কৌসুলীর মুখ শুকিয়ে যায়—তা এ তো একফোঁটা ছোঁড়া—না হয় দু'পাত ইংরিজী পড়েছে।

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনি কার কথা বলছেন? কাদের মকদ্দমা?

এবার অবাক হইবার পালা—বন্ধিপাড়ার নিমাই রায়ের। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি ভীত-বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল, দেখলে বাবা, যা বলেছি তাহা। জিজ্ঞাসা করছেন কার মকদ্দমা! তোমার দিবা করে বলছি বাবা, এর মত সোজা মানুব আর ভু-ভারতে নেই। একে যে ঠাকুরপো ঠাকুরে সর্ব্ব নেবে সে কি বেশী কথা? তুমি এসেচ, এই যা ভরসা, নইলে সোম-বন্ধরের মধ্যে দেখতে পেতে বাবা, তোমার নতি-নাটকুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছে।

নিমাই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। তা যাক, আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েছি। কিন্তু তোমাদের আড়ন্তের ঐ-সব চণ্ডি-ফকোক্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্ছে—বরের মাসী কনের পিসী, বুঝলে না মা! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিবাহ দলে যোগ দেয় ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। লোকের ছায়া দেখলে তার মনের কথা বলতে পারি। বলিয়াই নিমাই একবার গোকুলের প্রতি, একবার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, লাগিলেন।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, এখুনি এখুনি! আমি আর জানিনে বাবা, সব জানি। কেনেতনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুশি রাখো, যাকে খুশি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।

এতক্ষণ গোকুল সমস্তটা বৃষ্টিতে পারিল। তাহার ছোটভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা

করিতে বড়যন্ত্র করিতেছে। অথচ ইহারা যখন তাহার সমস্ত অভিসন্ধিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সে শুধু নির্বোধের মত সেই ছোটভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহি যেন তাহার ব্রহ্মরক্ত ভেদ করিয়া ছুলিয়া উঠিল; কিন্তু এ একটি মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া, নিদারুণ অজ্ঞকারে তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি, তাহার চৈতন্যকে পর্যন্ত যেন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে। নিমাই কহিলেন, টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী, সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাঁদের ঘুবেই মক্কমা। বুঝলে না বাবাজী!

গোকুল মাথা ঝুঁকিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, বুঝিল কি না তাহার জবাব ছিল না। বোধ করি কথাটা তাহার ানেও যায় নাই।

কিন্তু তাহার কন্য়ার কানে গিয়াছিল। সে ঢালা হুকুমও দিল, অবশ্য কন্যা এবং জামাতা একই পদার্থ এবং অন্যান্য বিষয়ে তার কথাতেই কাজ চলিতে পারে বটে; কিন্তু এই সাক্ষীর বাবদে গোপনে টাকা খরচ করিবার অব্যবহিত হুকুমটা জামাতা বাবাজীর মুখ হইতে ঠিক না পাইয়া রায়মহাশয়ের উৎসাহের প্রার্থনা যেন টিমা পড়িয়া গেল। বলিলেন আজ্ঞা সে-সব পরামর্শ কাল-পরত একদিন বীরে সুখে হবে অখন। আজ যাও বাবাজী হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলটল খাও, সারাদিন—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই গোকুল হঠাৎ উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায়মহাশয় মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবাজী ত কথাই কইলে না! টাকা ছাড়া কি মামলা-মক্কমা করা যায়? বিপদের সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে নেওয়া কি শুধু-হাতে হয় রে বাপু! ভয় করলে চলেবে কেন?

নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের ভাব টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাহার কিছুমাত্র সময় লাগে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও তা তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুত্বার তাহার মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে? কাজেই নিজের যতই কেন কতি হোক না, এমন কি কুণ্ডলের আড়তের কাজটা গেলেও তাঁর পশ্চাদপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে ধুধু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি তাঁর বিপদদ্রষ্ট কন্যাকে সাধুনা দিতে লাগিলেন।

জল

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাগা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারারাত্রি জাগিয়া সকালবেলা যখন সে তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্মমূর্তি মেথিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়া কহিল, ওঃ—সৎমা যে কেমন তা জানা গেল।

একে ত এই কথাটা সে আজকাল পুনঃপুনঃ কহিতেছে; তাহাতে ও অন্যান্য নানা প্রকারে উদ্ভক্ত হইয়া ভবানীর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহিরের লোক, আত্মীয়-সুত্রেয়রা তখনও নাকি বাটীতে ছিল তাই তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, কি হয়েছে?

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, হবে কি? কি করতে পার তোমরা? কেনা নালিশ করে কিছু করতে পারবে না তা বলে দিয়ে যাচ্ছি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায়—বন্ধিপাড়ার নিমাই রায়, সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখো।

ভবানী ক্রোধ ছুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ নালিশ করবে, এ কথা তোমাকে কে বললে?

গোকুল কহিল, সবাই বললে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে?

ভবানী বলিলেন, কৈ আমি ত জানিনে।

আজ্ঞা, জানো কি না, সে আমরা দেখে নিচ্ছি! বলিয়া গোবুল সকলোঘে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শব্দের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়িতে রাখতে পারিনে!

কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূদ্রমূর্তি ভয়ে বিবর্ণ এতৎ ক্ষুদ্র হইয়া গেল। এবং ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সমুখ হইতে ভয়াত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া; ছুটিয়া পালায়, গোবুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। সে যে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে জানে, তাই সেদিন সমস্ত দিবায়াত্রির মধ্যে কোথাও তাহার সাড়াশব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কুটুম্ব-ভোজনের সময়েও সে উপস্থিত রহিল না। ভবানী প্রশ্ন করিয়া জনিলেন, বড়বাবু জরুরী ভাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছেন; কখন আসিবেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। নিমাই রায় কর্মকর্তা সাজিয়া আদর-আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ শুষ্ক হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সন্তোষে সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল। বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত ব্রত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন করিয়া আরও দুইদিন কাটিল। যাহারা স্নানোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসীমা তাঁহার ছেলেমেয়ে লইয়া বর্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই, সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কারারো সহিত বাক্যলাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্বাক হইয়া গিয়াছেন! গোবুল পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়—ভিতরে বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারদিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্রকন্যা ছাড়া এ বাড়িতে আর কোন মানুষ নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন সকালবেলা, বোধ করি বা কুণ্ডদের অকুল পাথারে ভাসিয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিও আসিয়াছিল। আগমনের হেতুটা যদিচ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু সে যে তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে শুধু দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আসে নাই, সেটুকু বুঝা গিয়াছিল। এ কয়দিন অতিপ্রান্ত্র শব্দের সকল উৎসাহন অভাবে গেলু—যরূপ স্রিয়মাপ হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত কথাই নাই। সকাল হইতে সমস্ত বাড়িটা সে যেন চব্বিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই ইহাদরে বৈঠক বসিল; এবং অল্পকালের বাদান্বাদেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। আজ চক্রবর্তী, তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্নতন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্ভ্রান্ত-চিত্তে সে বেচারী না পারে সব কথা জবাব দিতে, না পারে ঠিকমত হিসাব বুকাইতে। ক্রমাগতই সে ধমক খাইতেছিল এবং বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেই প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, আমি ছিলাম ন— তাই অনেক ঢাকাই তুমি আমার খেয়েচ, কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।

চক্রবর্তীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্তামশাই আমাকে জানতেন।

গোবুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায়মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ ঝিচাইয়া কহিল, তোমার কর্তামশায়ের মত কি বাবাকে গল্প পেয়েচ, হ্যাঁ? আর মামা বাড়িতে হবে না; সরে পড়।

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র ভিরঙ্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং কলকাতা মৌন থাকিয়া গোবুলকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, বাবু, আমার চার মাসের মাইনে—

গোবুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত আছেই চক্রান্তিমশাই, আরও যদি—

কথাটা শেষ হইল না। নিমাই এন হাত প্রসারিত করিয়া গোবুলকে থামাইয়া দিয়া জলদপতীর—

স্বরে কহিলেন, তুমি থাম না বাবাজী। চক্রবর্তীকে কহিলেন, বাবু উনি নয়, বাবু আমি। আমি যা করব, তাই হবে। মাইনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চিনে, এই তোমার বাপের ভাগি বলে মানো।

চক্রবর্তী দ্বিকাক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মানোরমা এতক্ষণ কথা কহিতে না পাইয়া ফুলিতেছিল। সে যাইবামাত্রই মুখখানা গভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর আবদার মাখাইয়া দিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরব, না হয় সবাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায় মুখে গর্বে গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ-আধ স্বরে কহিল, আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?

নিমাই বলিলেন, তাই ত ছোড়াটাকে সঙ্গে আনলুম মা। আমি ও আর বেশী দিন এখানে থাকতে পারব না; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কি আসবার জো ছিল মা, বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি। তিনি শ্রায় কাদকাদ হয়ে বললেন, রায়মশাই, তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে থাকবে। দিবারাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসেই আমার দিন যাবে। তাই মনে করচি মা, আমার নন্দলালকেই দেখিয়ে-ওনিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে যাব। আশা যাই হোক, ও আমারই ত ছেলে!

তাই করে যাও বাবা। আমি সেইজন্যেই ত—

হঠাৎ মনোরমা মাথার ঝাঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চূপ করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, বাবু, মা এসেছেন—

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল বাস্তব হইয়া উঠিল। আজ সাত-আট দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত নাই। কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ-কণ্ঠে ডাকিলেন, গোকুল!

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসন্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কেমন মা?

ভবানী অস্ত্রালাে থাকিয়াই তেমনই পরিষ্কার-কণ্ঠে কহিলেন, এ-সব পাগলামি করতে তোমাকে কে বললে? চক্রবর্তীমশাই অনেকদিনের লোক, তিনি যতদিন বাচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বাহাল রাখলুম। সিন্দূকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধকরি লোকে এত আশ্চর্য হইত না। ভবানী একমুহূর্ত চূপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর একটা কথা। বেয়াইমশাই দয়া করে এসেচেন—কুটুমের আদরে দু'দিন থাকুন; দেখুন-শুনুন; কিন্তু দোকানে আমার চুরি হচ্ছে কি না হচ্ছে, সে চিন্তা করবার তাঁর আবশ্যক নাই। চক্রবর্তীমশাই আপনি দেরি করবেন না, যান। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান। বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্থ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

জ্বলিত ভাবটা কাটিয়া গেলে, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, একেই বলে পরের ধনে গোদারি। হুকুম দেবার ঘটটা একবার দেখলে বাবাজী।

বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল তাঁহার নিজের পুত্রস্বটি। সে কহিল, এ ত জানা কথাই বাবা, তুমি থাকলে ত আর চুরি চলবে না! বলিহারি হুকুমকে!

পিতা সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই বটে! এবং চক্রবর্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাসাত, বিদায় হও না। আবার ডেকে আনা হয়েছে? নেমকহারাম। জেলে দিলুম না কিনা, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বাবুন বলে মনে করেছিলুম—যাক মরুক গে; যা করেছে তা করেছে; না হয় দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু আবার! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্তব্য ছিল আমার।

কিন্তু মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস করিল না। গোকুল সেই যে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক তেমনি করিয়া একভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্রবর্তী কাহারও কোন কথাই জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া নমস্বরে কহিল, তা হলে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চললুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।

গোকুল বিনাবাক্যবাহ্যে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্তীর পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্তী চাবি ট্যাকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া, হাসি চাপিয়া হেলিয়াদুলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার এই প্রস্থানের অর্থ যথেষ্ট শ্রাঙ্কল। সূতরাং কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই, বন্দিপাড়ার নিমাই রায়ের কালো মুখের উপর কে যেন সংসারের সমস্ত কালি ঢালিয়া দিয়া গেল।

অতঃপর এই মন্ত্রগাণ্ধের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সভ্যই অনির্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্তনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্বপ্রকার বিতীষিকা-প্রদর্শন, অনুন্নয়-বিনয় এবং পরিশেষে মর্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাহার মুখ হইতে পিতার রূপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল।

গোকুল লঙ্কায় কোভে কাদা-কাদ হইয়া বলিল, মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জানব?

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল। একটা মস্ত ঝঞ্জাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে শিবতুলা মনিব আমার কাদ-কাটা করচেন—আমার কি কোথাও থাকবার জো আছে। তা ছাড়া, দরকার কি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে! কিন্তু মা মনু, ছেলেপিলের হাত ধরে যদি পড়ে না—সে ত দাঁড়াতেই হবে, চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি—তখন কিন্তু আমাকে শেষ দিতে পারবে না যে, বাবা একবার ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা বলে যাচ্ছি—তা মেয়েই হও আর জামাতাই হও। বলিয়া তিনি জামাতার প্রতিই একটা তীব্র বক্র কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু সে কটাক্ষ ছেলে ছাড়া আর কাহারও কাজে লাগিল না। তিনি তখন আবার প্রদীপ্ত-কণ্ঠ বলিতে লাগিলেন, এখনো বৈকে বসনি বটে, কিন্তু বৈকলে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধা—তা তোমার দু'জনে একবার গোপনে ভেবে দেখো। বাবা নন্দলাল, আড়াইটে বেজেছে, সাড়ে-তিনটেব গাড়িতে আমি যাব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—জানো ত তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উলটে গেলেও হবার জো নেই। বলিয়া তিনি সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে-জামাইকে ভাবিবার একঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, অবিশ্রাম মান-অভিমান রাগারাগি এবং কটুক্তি করিয়াও গোকুলের মুখ হইতে কিছু কথা বাহির করা গেল না। শব্দরের এই অভ্যস্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও কোভের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে যে কি করিবে তাহা কোনদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়াই, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

এগার

নিমাই যখন দেখিল তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিশ্চল হইয়া গেল, তখন সে ভীষণ হইয়া উঠিল এবং স্পষ্ট শাস্পাইয়া দিতে বাধ্য হইল যে তাহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুন ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাঁড়ুযোমশাইকে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিল—নি আসিয়া গোকুলকে নির্বোধ বলিয়া, অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এমন একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমণ্য করিলে সে বিনোদকে ঠিক সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, কি করব মাস্টারমশাই, মা যে তাঁকে বাড়িতে রাখতেই চান না। চক্রবর্তীমশাইকে হুকুম দিয়েছেন দোকানে পর্যন্ত যেন তিনি না ঢোকে।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, কারবার, বিষয়-আশয় তোমার না তোমারে মায়ের, গোকুল? তা ছাড়া, তোমার বিমাতা এখন তোমার শরূপক্ষে, সে সংবাদ রেখে ত?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সাম্মান্য বলে বাঁড়ুযোমশাই খুশী হইয়া বলিলেন, তবে পাগলামি করো না

ভায়া ; রায়মশাইকে বিবয়-আশয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে, চূপটি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ। আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটি এ-তম্নাটে খুঁজলে পাবে না।

গোকুল কহিল, সে ত জানি মাস্টারমশাই ; কিন্তু মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা যে নিবেশ করে গেছেন।

বাঁড়ুয়োমশাই বিমূঢ় করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিবেশ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন? নিবেশ করলেই ত হ'লো না। নিবেশ শুনে গিয়ে কি বিষয়টি খোঁষাবে? তা বল? গোকুলের তরফে এ-সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না ; তাই সে ঘাড় গুজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায়মশাই নেপথ্যে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এবার সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই দুইজন মহারথীর সমবেদ জেরার মুখে গোকুল অকুলে ভাসিয়া গেল। তাহাকে অথোবদন এবং নিরুত্তর দেখিয়া উভয়েই শ্রীত হইলেন এবং তাহার এই সুবুদ্ধির জন্য তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিলেন।

বাঁড়ুয়োমশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সফল-মনোরথ রায়মশাই আজ্ঞা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনি সম্মুখে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, আমি অশীর্বাদ করচি গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথাসর্ব্ব্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত আমরা লাগতে দেব না। কি বল রায়মশাই?

রায়মশাই আনন্দে বিনয়ে গদগদ হইয়া কহিলেন, আপনার আশীর্বাদে সে দেশের পাঁচজন দেখতেই পাবে। কিন্তু শত্রুদের আর আমি এ-বাড়িতে একটি দিনও থাকতে দেব না, তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি বাঁড়ুয়োমশাই। তা তাঁরা আমার বাবজীর মা-ই হোন, আর ভাই-ই হোন। আর সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করব। কে আছিস রে ওখানে? বাটী বামুনকে ডেকে আন দোকান থেকে। বলিয়া রায়মশাই ইহার মধ্যে বোল আনা ছাপাইয়া সত্তর 'আনা' মত একটা হাজার ছাড়িলেন।

গোকুল সমুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদুরে কহিল, না না, এখন তাঁকে ডাকবার আবশ্যক নেই।

বাঁড়ুয়োমশাই দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, গোকুল, এ-সব চক্কুলজ্ঞার কাজ নয়। তাকে আমরা রাখতে পাবব না—কোনমতেই না। তার বড় আশ্রয়। আমরা তাকে চাইনে তা বলে দিচ্ছি।

প্রত্যুত্তরে গোকুল তেমনি বিনীত-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মা তাঁকে চান। তিনি যাকে বাহাল করছেন তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারুর নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যাননি। বলিয়া গোকুল পুনরায় মুখ হেঁট করিল। তাহার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত উত্তর, এই শব্দ অথচ দৃঢ় কঠোর শুনিয়া উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বাঁড়ুয়োমশাই কহিলেন, তা হলে সে থাকবে বল?

গোকুল কহিল, আজ্ঞে হাঁ। চক্কোত্তিমশায়ের উপর আমার আর কোন হাত নেই।

বাঁড়ুয়োমশাই ভয়ে বলিলেন, তা হলে রায়মশায়ের কি-রকম হবে?

গোকুল কহিল, উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখতে চান না। আর চাকরি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েছে, সে অংশ মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল, এতবড় অপমানের পর রায়মশাই আর তিলার্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট-দশদিন কাটিয়া গেল—এই মনে করার বিশেষ কোন মূল্য দেখা গেল না। বোধ করি বা কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃই তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না এবং সরেজমিনে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশ তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে একদিকে, গোকুল নিজ যেমন পীড়িত ও সংজ্ঞ হইয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও তেমনি প্রতি মুহূর্ত্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধু ও তাহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বাণ

খাইতে-ভুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্যে দিয়া অবিশ্রাম বৃকে বিধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়িতে থাকি?

বৌমা জবাব ইচ্ছা করিয়াই দিল না—মাথা হেঁট করিয়া নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল।

ভবানী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিলেন, বেশ, তুই যদি তার ইচ্ছে, সে নিজে এসে স্পষ্ট করে বলে না কেন? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, তোমার বাপকে দিয়ে আমাকে দিবারাত্রি অপমান করাচ্ছে কেন?

অথচ গোকুল যে ইহার বাস্পও না গণিতে পারে, এমন কি তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই যে এই ক্ষুদ্রাশ্রয়ে তাহাদের বিষমস্ত বাহিব করিয়া দংশন করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা ভবানীর একবার মনেও হইল না। কিন্তু বধু ত আর সে বধু নহি। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, অপমান কে কাকে করেছে, সে কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমার বাপ-ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাহে তোমার বৃকে শূল বেঁধে কেন মা? আর একজনের জন্যে আব-একজনের সর্বনাশ করাটাই কি ভালো? ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, আমি কার সর্বনাশ করিচ্ছি মা?

বধু কহিল, যাদের করেছ তারাই গাল দিচ্ছে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি? ইট মাঝলেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে বাগ কবলে ত চলে না মা। বলিয়া বধু চলিয়া গেল।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর জীবনশয্যে তাঁহার সেই গোকুল এবং সেই গোকুলের দ্বার কথা মনে করিয়া, অনেকদিন পর আত্ম-আবদার ইহার চোখ দিয়া জন পড়িতে লাগিল। আজ আর কোন মতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্বোধ তিনি শুধু নিজের পায়ের কুঠারাম্বাৎ করেন নাই, ছেলের পামেও কবিতাছেন। অমন কবিতা যাচিয়া সমস্ত গ্রন্থ গোকুলকে লিখিয়া না দিলে ত আত্ম-এ দর্শনা ঘটিল না। বিনোদ যত মনস্তৈ হোক, কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্বাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপাঙ্গনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহ জানিত না। সে আশ্রমে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া লইয়া এবং শহরের একপ্রান্তে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া কবিতা, সম্ভাব্য পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল বাবা, এ নূতন আমি আব সহিতে পারিবে। তুই যেমন করে রাখবি, আমি তেমন করে থাকব। কিন্তু এ বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে। বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তাব পর একটি একটি করিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। অন্যদিন এ অবস্থায় বিনোদ দূর হইতে পাশ কাটিয়া সরিয়া যাইত, আজ দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ কাছে আসিয়া কহিল, কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।

গোকুল অবাক হইয়া কহিল, নূতন বাসায়? আমাকে না জিজ্ঞাসা করেই বাসা কথা হয়েছে নাকি? বিনোদ কহিল, হাঁ।

এম. এ. পড়া তা হলে ছাড়লে বল? বিনোদ কহিল, হাঁ।

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ মর্মান্তিক আঘাত করিল, সম্ভা, অজ্ঞকারে বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোটভাইয়ের এই এম. এ. পাসের স্বপ্ন সে শিশুকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া হাজির হইত এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম. এ. পর্বীকটা শেষ হওয়ার জন্য নিজের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিস্তা প্রকাশ করিত। বাপারটা যাহা-বা জানিত, তাহার মুখ টিপিয়া হাসিত। যাহারা জানিত না, তাহারা উত্তেজিত হইয়া 'জিজ্ঞাসা' করিলেই 'আমার ছোটভাই বিনোদের অনার

গাড়্যেটের কথাটা উঠিয়া পড়িত। তখন কথায় কথায় অনামনক্ হইয়া বিনোদের সোনার মেডেলটোও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া যে মখমলের বাগ্গসুজ্ জিনিসটা গোকুলের পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হেতুই সে স্মরণ করিতে পারিত না। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেকরা ডাকাইয়া এই দুর্লভ বস্তুটি সে নিজের ঘড়ির চেনের সঙ্গে জুড়িয়া লয় এবং এতদিনে তাহা সমাধা হইয়াও যাইত— যদি না বিনোদ ভয় দেখাইত— একুণ পাগলামি করিলে সে সমস্ত টান মারিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে। গোকুল উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, এম. এ.-র মেডেলটো না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কিভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ-হেন এম. এ. পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া গোকুলের বৃকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রথমপে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা বেশ কিন্তু মাকে নুতন বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি শুনি?

সে দেখা যাবে। বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল। সে নিজেও মায়ের মত অল্পভাষী; যে-সকল কথা সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দাদার কাছে প্রকাশ করিল না।

গোকুল বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই, হাবুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সজ্জার সময়েও নির্জীবের মত শয্যায়া পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গোকুল, কাল সকালেই আমি এ বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

সে এইমাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল তোমার পায়ে ত আমরা কেউ দড়ি দিয়ে রাখিনি মা। যেখানে পুলিশ যাও, আমাদের সঙ্গে কি? গোলেই বাঁচি। বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চোঁচাইয়া কহিল, হাবুর মা আজ র্তা যাবেন হতে পারেন না, বলে দে।—হাবুর মা আশ্চর্য হইয়া ভিজ্ঞাসা করিল, কেন বড়বাবু?

গোকুল কহিল, আজ দশমী না? ছেলোপিলে নিয়ে ঘর কাঁপ, আজ গেলে গবেহুব অকলাগ হয়। আজ আমি কিছুতেই বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারব না, বলে দে। ইচ্ছা হয় কাল যাবেন—আমি গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছি। বলিয়া গোকুল দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোবশা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জন করিয়া কহিল, যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?

এ-কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ তেঙ্গাইয়া চোঁচাইয়া উঠিল, আটকালুম আমার পুলিশ। বাড়ির গিন্নী, অদিনে, অক্ষণে বাড়ি থেকে গেলে ছেলোপিলেগুলো পটপট করে মরে যাবে না? বলিয়া তেমনি দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

রকম দ্যাখো! বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ বিষ্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

বার

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি-নক্স গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটার পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, তুমি যার বাবে, তারই সর্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাছে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পারব না।

মনোরমা সেদিন ধকম খাইয়া অবধি নিজে কিছু বলিত না, আজ সে তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিল।—নিমাই আসিয়া কহিল, এটা ত ভাল কাজ হচ্ছে না বাবাজী!

গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল।

কহিল, কোনটা?

বেয়ামঠাকরুন তাঁর নিজের ছেলের বাসায় খবর হইয়ায় যেতে চাচ্ছেন, তখন আমাদের বাবা দেওয়া ত উচিত হয় না।

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, পাড়ার লোক শুনলে আমার অখ্যাতি করবে।

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখতে পাইনে।

গোকুল স্বপ্নরূপে এতদিন মানা করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, আপনাদেখবার ও কোন প্রয়োজন দেখিনে। আমার মাকে আমি কার কাছে পাঠাব না—বাস্, সাফ কথা! যে যা পারে আমার করুক।

গোকুলের এই সাফ কথাটা বিনোদের কানে গিয়া পৌছিতে বিন্দু হইল না। প্রত্যহ বাধা দিয়া গাড়ি ফেরত দেওয়ায় সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেনেন না।

গোকুল সংবাদপাঠে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, আজকে ত হতে পারবে না।

বিনোদ কহিল, খুব পাববে। আমি এখন নিয়ে যাচ্ছি।

এইবার ক্রুদ্ধ কষ্টের শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যাচ্ছি বললেই কি হবে? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে গেছেন—তোমাকে দেননি। আমি কোথাও পাঠাব না।

বিনোদ কহিল, সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ করিতে হইত না। মা, বেরিয়ে এসো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা গোকুল জানিত না। তাহাকে সোজা গিয়া গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ম্বর হইয়া স্থানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে পিছনে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা বলে দিচ্ছি মা।

ভবানী ভাব দিলেন না। বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ করিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মৎ কক্ষকক্ষে বলিয়া উঠিল, ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার চলে নয়? আমাকে কি তোমার মানুষ করতে হয়নি?

গাড়ির চাকার শব্দে সে কথা ভবানীর কানে গেল না। কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়িয়া দেখিল, গোকুল কোচাব খুঁজে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার এই ব্যবহারে অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া নিমাই কিছু উদ্ভ্রম হইতেছিলেন, কিন্তু স্থানিক পরে সে গম্বন দ্বার খুলিয়া বহির হইল এবং যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া দোকানে চলিয়া গেল, তখন তাহার চোখে-মুখে এবং চরণে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং নির্বিঘ্ন হইয়া তিনি এইবার নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ সাপ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদর কর্তব্য করে, তিক্ত তেমনি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা-আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষণও বেশ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যেদিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেইদিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগও করিত না, প্রতিবাদও করিত না। ইহাতে নিমাই যত পুলকিত হইত, তাহার কন্যা সুখী হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল, স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাস্যময় করিবে না, যাঁহাঁ - - - খাইয়া উঠিয়া যায়, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিসটাতেই গোকুলের ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষ শখ ছিল। গাইতে এবং খাওয়াইতে সে ভালবাসিত। প্রতি রবিবারেই সে - - - বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবারে তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল।

গোকুল উদাসভাবে জবাব দিল, সে-সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে, রেঁখে খাওয়াবে কে? মনোরমা অতিমানভাবে কহিল, রাখতে কি শুধু মা-ই শিখেছিলেন—আমরা শিখিনি? গোকুল কহিল, সে তোমার বাবা-ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।

মনোরমার মা কালীঘাটের - - - একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংশোধিত রাগ করিয়া

চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙ্গা সংসার শুছান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি দুই-চারিদিন থাকিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিকল সংসার মেরামত হইয়া আবার সুন্দর চলিতে লাগিল ; এবং কর্ণধার হইয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথটা লইয়া আশ্চর্যজনক করিল, কিন্তু কলিকালের স্বভাবে দুই-চারিদিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর মার ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথা কহিলেন না।

সেদিন আসিবার সময় সেই যে গোকুল গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া কঙ্ককটে বলিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধের এই শো, তখন নিজের অভিমানের কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু একমাসকাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ভাগ করিবে, ছোটভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে-কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে যাবের মধ্যে তাহার শব্দ-শাওড়ী-ব-দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার বাতাঁ পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তাব পরেই সে স্বরূপ প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তলুই প্রায় সে লইত না, বাহ্যে বাড়িতে থাকিত না ; সকালে যখন ঘরে আসিত, তখন দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরি করে। কিন্তু কি চাকরি, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাহার একমাত্র সাধনা ছিল যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন নাই, কারণ গোকুল স্বী-শব্দ-শাওড়ী-ব-প্রভাব তাহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুক, সে স্বামীর এত দুঃখের দোকানটি অশ্রুতঃ বজায় করিয়া থাকিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এমন করিয়াই দিন কাটিতেছিল।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। প্রতি বৎসর এইদিনে ঘটা করিয়া গ্রামের ভোজন করাইতেন। কিন্তু একবার নিজের কাছে টাংরা না থাকায় এক কথা-প্রসঙ্গে বিনোদকে বাব-দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ বৎসর ভবানী সে সম্বন্ধই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সতরাং অতি প্রত্যয়ে ত্যাকনক ডাকাডাকি হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল বাস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে ওতস্নে অনেক লোক, ঘি, ময়দা, বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, খুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনের নেমস্তম্ভ করে এসেছি— সে বীদরটার পিতাশে ও আব ফেলে রাখতে পারিনে। মা কই ? এখনো ওঠেন নি বুঝি ? যাই, কাজকর্ম করবার লোকজন গিয়ে পাঠিয়ে দিই গে। যেমন মা— তেমন ব্যাটা, কারো চাড়াই নেই, যেন আমারই বড় মাথাবাখা। মাকে খবর দি গে হাবুর মা, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি। বলিয়া গোকুল যেমন বাস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমন বাস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়াল দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্র অকস্মাৎ অন্ধর বন্যা আসিয়া তাহার দুই চোখ ভাসিয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। 'শনিবারের রাত্রি' করিয়া বন্যক বেলায় বিনোদ বাড়ি ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেল। হাবুর মার কাছে সমস্ত অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হতো। আমার যে এতে অপমান হয়। ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও মৌখিক না। কাজকর্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথাসময়ে গ্রামের ভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহারও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময় বাঁড়োমনাটি তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বাঁসা।

আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষপূর্বক আহার করিয়া সেদিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুমদারদের অনেক অল্পই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই রায়ের দরুন সেদিনের লাঞ্ছনাটা তাহাকেই বেশি বাজিয়াছিল। সর্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ্য করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, বলি ভায়া, দাদার আজকের চালটা টের পেয়েছ ত?

কথার ধরণে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বিনোদ সংক্ষেপে কহিল, না।

বাঁড়ুয়েমশাই মৃদু-গষ্ঠীর হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই দেখছি মকদ্দমা জিতেচ! বি. এ. এম. এ. পাশ করলে ভাই, আর এটা ঠাণ্ডার হ'লে না যে, মাকে হাত করাটাই হচ্ছে যে আজকের চাল। তাঁর ওপরই যে মকদ্দমা!

গোকুল চোখমুখ কালিবর্ণ করিয়া—কখখনো না মাস্টারমশাই, কখখনো না! বলিতে বলিতে বেগে প্রশ্ন করিল।

বাঁড়ুয়েমশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে ঢুকতে দিয়া না ভায়া, সর্বনাশ করে তোমার ছাড়বে। এ কথাটা শু গোকুলের কানে পৌঁছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। দাদাকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়। একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই বাঁড়ুয়ের কথাগুলো শুধু যে সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল তাহা নয়, এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত বিদিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া দেখিল—মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট মুখভাষার অভিনয় চলিতেছে। যখন রায়মশাই খাটের উপর বসিয়া মুখখানা অতি বিস্তীর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন এবং নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাহার কন্যা, হিমুকে বোঝে লইয়া, পিতৃ-মুখের অনুকরণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই রায়মশাই কহিলেন, বাবাজী, নিবোধেব মত তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল?

একে গোকুলের যাবতরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সারাদিনের পক্ষেই অতিশয় শ্রান্ত। অভিযোগের ধরনটায় তাহার সর্বাস জুলিয়া গেল।

মনোমত ফৌসফৌস করিয়া কাঁদিয়া কহিল, আর যদি কোনদিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায়মশাই অধিকতর গষ্ঠীরভাবে কহিলেন, সে মাগী কি সোজা—

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—চোপরাও বলচি। আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায়মশায় ও তাহার কন্যা বজ্রহতের ন্যায় পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল এ কি কহিল! পূজাপাদ স্বপ্নরমহাশয়কে এ কি ভয়ঙ্কর অপমান করিয়া বসিল!

তের

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল যাহারা প্রায় নিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ, হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। অনেকদিনের অনেক আমোদ-প্রমোদের খোরাক সংগ্রহ হয়। আবার মকদ্দমা যে করিতেই হইবে, তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছিল। যেহেতু বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোনে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া, ওতদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকিয়া দিয়া বলিয়াছিল, বয়াটে নজ্জার পাঞ্জিকে এক সিকি-পয়সার বিস্ম দেব না—যা পারে সে করুক।

কিন্তু এতবড় বিবয়ের জন্য মামলা রুজু করিতে একটি বেশী টাকার আবশ্যক। সেইটুকুর জন্যই বিনোদের কালবিলম্ব হইয়া যাইতেছিল।

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতেই কেমন সেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখেব সে আত ছবিটা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল—‘অন্য! অন্য! অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অভিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে কোনদিন এ পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্যা যুবকদিগের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি বিনোদের পক্ষে। সেদিন সকালে তাঁহার বাড়ির ঘরে বসিয়া মাস্টারমশাইকে ডাকিয়া আনিয়া অনেক বাদনুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূৰ্খ এবং অত্যন্ত নির্বোধ তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জরু করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল, আগামী রবিবার সকালবেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভহলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ঘেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাশা, কত বিদ্রূপ অনুপস্থিত হইত। গোকুলের মাথায় বসিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে একে তাহার মস্তক দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্য কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ্ঞে বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়াছিল, বেলো একটাব সময় হঠাৎ গোকুল—কে রে হাবুর মা, খাওয়া-দাওয়া চুকল? বলিয়া প্রশ্ন করিল।

হাবুর মা শব্দবাহু বড়বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, না বড়বাবু, এখনো শেষ হয়নি। হয়নি বলিয়া গোকুল নিজেই আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল। বসিয়া কহিল, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিক হাবুর মা। তাগাদায় বেরিয়ে এই রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একেদাবে হয়কল হয়ে গেছি। মা কে রে?

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন। কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না।

বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নই—গোকুল ইহাষ্ট জানিত। কহিল, সব মিথ্যা হাবুর মা, সব মিথ্যা। কলিকাল—আর কি ধর্ম-কর্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বললেন, বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা! আমি ভালোমানুষ—নইলে কেন্দার লাপের সাধি। কি, সে মাকে আমাকে জোর করে নিয়ে আসে? কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে পারিনে? বাবার এই হ'লো আসল উইল—তা জানিস হাবুর মা? শুধু দু'কলম লিখে দিলেই উইল হয় না।

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদ ঘরে আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় হঠাৎ লোকানের চক্রবর্তী আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, মা, বড়বাবু এখনো বাড়ি যাননি—এখান থেকে খেয়ে কখন গেলেন?

ভবানী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে ত এখানে যায়নি। তাগাদার পাখে শুধু এক গেলাস জল খেয়ে চলে গেল।

চক্রবর্তী কহিল, এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্মতিথি। বাড়ি থেকে খণ্ডা করে বলে এসেছে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্ছি। তা হলে সারাদিন খাওয়াই হয়নি দেখছি।

শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্তীর সাড়া পাইয়া কাজে আসিয়া নসিল। তামাশা করিয়া কহিল,

কি চক্রবর্তীমশাই, নিমাই রায়ের তাঁলে চাকরি হচ্ছে কেনম?

চক্রবর্তী অস্ফুট স্বরে কহিল, নিমাই রায়? রামঃ—সে কি দোকানে ঢুকতে পারে নাকি?

বিনোদ বলিল, শুনেতে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে?

চক্রবর্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, উনি বেঁচে থাকতে সেটি হবাব জো নেই ছোটবাবু। আমাকে তাঁড়িয়ে সর্বস্বন মালিক হতেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মায়ের একটা ঠকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছাঁচড়াই করে যা দু'পয়সা আদায় হয়, দোকানে হাত দেবার জো নেই। বলিয়া চক্রবর্তী সেদিনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, বড়বাবু একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কিনা, লোকের পাঁচ-সাঁচ ধবতে পারে না। কিন্তু তা হলে কি হয়, পিড়মাড়ভক্তি যে অচলা—সেই যে বললেন, মায়ের ঠকুম বদ কববার আমাব সাধা নেই—তা এত কাদাকাটি, ঝগড়াঝাটি—না, কিছুতে না। আমার বাপের ঠকুম—মায়ের ঠকুম। আমি যেমন কর্তা ছিলাম—তেমনি আছি ছোটবাবু।

বিনোদের দু'চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্তী কহিতে লাগিল, এমন বড়ভাই কি কাক হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আব বিনোদ। আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করেনি, আমাব বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখেনি, আমাব বিনোদের মত ভাই কাক জন্মায় নি। লোকে তোমার নামে কত অপবাদ দিয়েছে ছোটবাবু, আমার কাছে এসে হেসে বলেন, চক্কোত্তিমশাই! শালারা কেবল আমার ভায়েব হিংসে করে দুর্নাম রটায়। আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করব, আমাকে ঘরানি বোকাই ঠাউরেছে শালারা।

একটু থামিয়া কহিল, এই সেদিন কে এক কপাল পড়িত এসে তোমাব মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোনার তুলসীপাতাব দাম প্রায় পাঁচ শ টাকা বড়বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিবেদন করলুম, কিছুতেই শুনলেন না, বললেন, আমার বিনোদের যদি স্মৃতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম এ পাশ করে, ... যায় যাক আমার পাঁচ শ টাকা।

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, কত লোক যে আমাব নাম করে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেচি চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্তী গলা খাটো কবিয়া কহিল, এই জয়লাল বাঁড়ুয়েই কি কম টাকা মেরে নিয়েছে ছোটবাবু। ওই ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। বলিয়া সে কর্তাব মৃত্যুর পবে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই—ওধু তাঁবু, এই চোখে প্রাণে ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল; কিন্তু সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেন এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিল, পিতা তাহাকে একভাবে বঞ্চিত করিয়া গেলেন, দাদা তাহাকে কিছুই দিতে চাহিতেছে না, চক্রবর্তীর মুখে আজ সেই ইতিহাসে অবগত হইয়া সে ক্রমাগত ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকালবেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের অকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরিশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় থাকাইবে, কি করিবে, ক'বয়া পাইল না। বিনোদ নিঃশব্দে মলিনমুখে একধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হয় তাহাকে যেন বলি দিবার জন্যে ধরিয়া আনা হইয়াছে। বাঁ, যামশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে গোকুলের চোখ আরম্ভ হইয়া উঠিল। কহিল, ওঃ, তাই এত লোক! যান আপনারা নাগিল করুন গে, আমি এক সিঁকি-পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়!

আব সবুজ মৌন হইয়া রহিলেন। বাঁড়ুয়েমশাই ভঙ্গী করিয়া হাসিয়া বলিলেন বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর হকের বিষয় আঁপাং ক'ব? তুমি যে তোমার বাপের মরণকালে জোজুরি করে

উইল লিখে নাওনি তার প্রমাণ কি?

গোকুল আশুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, জুজুরি করেছি? আমি জোচ্চোর? কোন শালা বলে?

গিরিশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, গোকুলবাবু জুজুরি অমন উতলা করেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।

বাঁড়ুয়েমশাই পুরানো দিনের অনেক কথাই নাকি জানিতেন, তাই চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন, তা হলে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল।

তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাই। গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—কি, আমার মাকে দাঁড় করাতে আদালতে? সাক্ষীর কাঠগড়ায়? নি গে যা তোরা সব বিবয়-আশয়—নি গে যা—আমি চাইনে। আমি যাব না আদালতে; মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হবো।

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, আহা-হা, থাক না গোকুল। কর কি, কি সব বলচ?

গোকুল সে কথা কানেও তুলিল না। সকলের সম্মুখে ডান-পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেমনি চিৎকার কহিল, আয় হতভাগা এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি—ছুঁয়ে বল তোরা দাদা জোচ্চোর। সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের চেলে নই

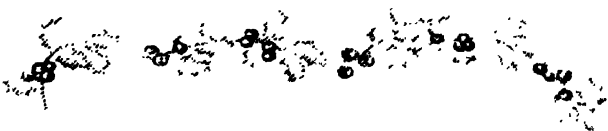
নিমাই ভয়ে শব্দবস্ত হইয়া উঠিল, আহা-হা, কব কি বাবাজী! ককক না ও বা নালিশ—বিচারে যা হয় তাই হবে—এ-সব দিবা-দিলেসো কেন? চল চল, বাড়ির ভেতরে চল। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানটান করিতে লাগিল।

কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একটা কথার জবাবও দিল না—একভাবে মৌবেবে বসিয়া রহিল।

গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না, আমি এক পা নড়ব না। উপর দিকে দুষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাবা শুনেচেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কিনা গোকুল, এই রইল তোমাদের দু'ভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিয়ো বাবা তা'ব যা-কিছু পাওনা। ওপল থেকে বাবা দেখছেন, সেই বিষয় আমি ফকের মত আগলে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমাব ঘরে ফিরে আসবে দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকচি—আর ও বলে আমি জোচ্চোর! আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এদের সামনে বলে যা, তোরা বড়ভাই চুরি করে তো'ব বিষয় নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক হইতে ঠেলিতে লাগিলেন, কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয়েমশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিলেন, বল না বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়ইয়া কহিল, না, এমন সুযোগ আর পাব না। বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, তোমার পা ছুঁতে বলছিলে দাদা, এই ছুঁয়েচি। আমি মদ খাই—আব যদি খাই দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই বলে পড়ে যাবে। সে আমি বলতে পারব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়েই দিবা কবে বলচি, মদ আব আমি ছৌব না। আশীর্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি। বলিয়া বিনোদ অগ্রসর সেই ফসারিত পায়ের ওপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।



অরক্ষণীয়া

এক

মেজমাসীমা, মা মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন—ধরো।

কে রে, অতুল? আয় বাবা আয়, বলিয়া দুর্গামণি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন। অতুল প্রশ্নাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

নীরোগ হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও। ওরে ও জ্ঞানদা, তোর অতুলদাদা ফিরে এসেছেন যে রে! একখানা আসন পেতে দিয়ে মহাপ্রসাদটা ঘরে তোল মা। কাল রাত্তিরে সাড়ে-নটা দশটার সময় সদররাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শুনে ভাবলুম, কে এলো। তখন যদি ভগ্নাতুল, দিদি এলেন—ছুটে গিয়ে পায়ের ধূলা নিতুম। এমন মানুষ কি আর জগতে হয়। তা' দিদি ভাল আছেন বাবা? এখন পুরী থেকে আসা হ'ল বুঝি? কি কচ্ছিস মা—তোর অতুলদা যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মায়ের আহ্বানে একটি বার-তের বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে হাতে একখানি আসন লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল; এবং যতদূর পারা যায়, ঘাড় হেঁট করিয়া দাওয়ার উপর আসনখানি পাতিয়া দিয়া, অতুলের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল; কথ্যও কহিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। প্রশ্নাম করিয়া উঠিয়া, মহাপ্রসাদের পাত্রখানি হাত হইতে লইয়া, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু একটু ভালো করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত, যাবার সময়ে মেয়েটির চোখমুখ দিয়া একটা চাপা হাসি যেন উচ্চলিয়া পড়িতেছিল।

আবার শুধু মেয়েটিই নয়। এদিকেও একটুখানি নজর করিলে চোখে পড়িতে পারিত, এই সূত্ৰী ছেলেটিবও মুখের উপরে দাঁপি খেলিয়া একটা অদৃশ্য তড়িৎপ্রহাৰ মৃদুতের মধ্যে মিলিয়া গেল।

অতুল আসনে বসিয়া তীর্থ-প্রবাসের গল্প বলিতে লাগিল। তাহার বাপ একজন সেকলে সদবআলা ছিলেন। অনেক টাকাকড়ি এবং বিষয়-সম্পত্তি করিয়া পেন্সন লইয়া ঘরে বসিয়াছিলেন; বছর-চারেক হইল, ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বি. এ. একজামিন দিয়া অতুল মাস-দুই পূর্বে মাকে লইয়া তীর্থপথটনে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি রামেশ্বর হইয়া, পুরী হইয়া কল ঘরে ফিরিয়াছে।

গল্প শুনিয়া দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর এমন মহাপাত আমি যে, আর কিছু না হোক, একবার কাশী গিয়ে বাবা বিশেষজ্ঞের চরণ দর্শন করে আসব, এ-সম্মে সে সাধটাও কখনও পূরল না।

অতুল বলিল, কাশীই বল, আর যাই বল মেজমাসীমা, একবার সব ছেড়েছুড়ে জোর ক'রে বেরিয়ে পড়তে না পারলে আর হয় না। আমি অমন জোর ক'রে না নিয়ে গেলে, আমার মায়েই কি যাওয়া হ'ত?

দুর্গামণি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, জানিস ত বাবা সব। জোর করব কি দিয়ে বল দেখি? তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লোকতা, কুটুম্বিতে করে, ডাক্তার-বদীর ওষুধের খচর যুগিয়ে কি থাকে বল দেখি? আর এই মেয়েটা দেখতে দেখতে তেরোয় পা দিলে। তোকে সত্যি বলচি, অতুল, ওর পানে চাইলেই যেন আমার বুকের রক্ত স্থবির করে শুকিয়ে যায়। উঃ! এতবড় শত্রুকেও পেটে ধরে মাকে লালন-পালন করতে হয়। বলিতে বলিতেই তাহার দুই কান সজল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অতুল এতবড় দৃষ্টিভ্রান্ত ও কাতরোক্তির সম্মুখেও ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল; কহিল, মাসীমার সব বাড়াবাড়ি! আচ্ছা, মেয়ে কি আর কার হয় না যে, তোমারই শুধু ওই একটা হয়েছে—আর রাজ্যের দুর্ভাবনা একা তোমার?

দুর্গামণি কহিলেন, আমার এটা ঠিক ভাবনা নয়, অতুল, এ আমাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা! সমাজ আমি

জানি ত! মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলেই জাত যাবে; কিন্তু দেব কি করে? টাকা চাই—কিন্তু পাব কোথায়? এই ভদ্রাসনের একাংশ ছাড়া আপনার বলতে ত আর কিছু নেই বাবা!

আধ-ঘণ্টা পূর্বে এই মেয়েটাকেই উপলক্ষ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে কলহ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী অর্ধভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া অফিসে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই বাথা দুর্গামণির মনে আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং টপটপ করিয়া দুইটো জোখের জল গাল বাহিয়া কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আর-জন্মে কত শ্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছিলুম অতুল, যে, এ-জন্মে মেয়ে পেটে ধরেচি।

নাঃ—মেজমাসীমা, আমি উঠলুম, নইলে তুমি থামবে না।

দুর্গামণি আর একবার চোখ মুছিয়া লইয়া কহিলেন, না বাবা, একটু বোস, দু'দণ্ড তোর কাছে কাদলেও বুকাটা হালকা হয়। তাই বলি, ভগবান! হতভাগীকে আমার কোলেই যদি পাঠালে, রংটা একটু ফরসা করেই পাঠালে না কেন? কালো বলে কেউ যে শুকে আশ্রয় দিতেই চায় না! সবাই যে চায় সুন্দরী মেয়ে। ওরে পোড়া সমাজ, তুই কুল, শীল, স্বভাব, চরিত্র কিছুই যদি দেখবি নে, মেয়ে শুধু কালো বলেই তাকে ঘরে ঠাই দিবিনে, তবে সে মেয়ের বিয়ে না হলেই বা বাপ-মাকে দণ্ড দিবি কেন?—অতুল কহিল, কালো মেয়ের কি বিয়ে হচ্ছে না? ভোমবাও কালো, কোকিলও কালো—তাদের কি আদর হয় না? এ-সব ত চিরকালের দৃষ্টান্ত—মেজমাসীমা।

দুর্গামণি কহিলেন, তাই দৃষ্টান্তই শুধু চীৎকারী হয়ে আছে বাবা, আর কিছু নেই। কিন্তু তাহে আর সাহসলাও পাইনে, জোরও পাইনে অতুল। গিরিশ ভট্টাচার্যির মেয়ের বিয়ে চোখের উপর দেখে হাত পা যেন পেটের ভেতর ঢুকে গেছে। ঠিক আমাদের মতই—না ছিল তার টাকাব বল, না ছিল মেয়েও রূপ—তাই পাঠের বয়সও গেল ঘাটের কাছাকাছি। তার মায়ের কান্নাটা আমি আজও যেন কানে গুনতে পাচ্ছি।

অতুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—ঘাটের কাছাকাছি? বল কি?

তা হবে বৈ কি বাবা! হরি চক্ৰোত্তির নাতজামাই হ'ল ওপাড়ার নিতাই চট্টোয়া। তারই একটা ঘাট দশ বছরের মেয়ে যে! হিসেব করে দেখ দেখি।

খবর শুনিয়া অতুল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দুর্গামণি বলিতে লাগিলেন, সে মেয়ে যদি মনের ঘোম্মায় বিষ খায়, কি গলায় দড়ি দেয়, কিংবা কুলে কালি দিয়ে চলে যায়—মা হয়ে তাকে বুকের ভেতর থেকে অভিশাপ দিই কেমন করে, বল দেখি বাবা?—অতুল চুপ করিয়া রহিল। দুর্গামণি হঠাৎ তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, বাবা অতুল, আজকাল সবাই বলে, তোদের ছেলের মতো দয়াধর্ম আছে। দেখিস নে বাবা, তোদের ইচ্ছা-কলোজের কোন ছেলে যদি নিতান্ত দয়া করেই মেয়েটাকে তার পায়ে একটুখানি ঠাই দেয়। তাহলে তোদের কাছে আমি মরণ পর্যন্ত কেনা হয়ে থাকব।

অতুল শব্দবস্ত্রে হাত ছাড়িয়া লইয়া তাহার পায়ের ধূলা মাখায় লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছে মেজমাসীমা? আমি কথা দিচ্ছি—

কিন্তু কথটা সে দিতে পারিল না। সহসা লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তা হইয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দুর্গামণি যদিচ ইহা লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু আর কেহ তথায় উপস্থিত থাকিলে হয়ত সংশয় করিত, কি এমন কথটা অতুল ষ্ট্রোকের উপর দিতে গিয়াও এমন করিয়া থামিয়া গেল।

অতুল নিজেকে সামলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহজভাবে কহিল, আজ্ঞা, খুব চেষ্টা করব।—কৈ রে জ্ঞানদা, একটু পান-টান দে না—বাড়ি যাই।—

দুর্গামণি রাগিয়া চীৎকার করিলেন, তোর অতুলদারে একটা পান দে না গেনি। মুখপোড়া মেয়েও না আছে রূপ, না আছে গুণ। বলি, এ-সব কথাও কি শেখাতে হবে? মহাপ্রসাদ নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলি, আর বেরলি নে। শিগিরির পান নিয়ে আয়।

আজ্ঞা, আমি নিজেই গিয়ে পান নিচ্ছি—কেন ঘরে রে জ্ঞানদা! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া অতুল গোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সম্মুখে পানের সজ্জা লইয়া মেয়েটি চূপ করিয়া বসিয়াছিল। অতুল ঘরে ঢুকিয়াই গম্ভীর হইয়া বলিল, মেজমাসীমা বলছেন, মুখপোড়া গেনির না আছে রূপ, না আছে গুণ। তাকে একটা বাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

জ্ঞানদা জবাব দিল না, অবনত মুখে বাটা হইতে গোটা-দুই পান লইয়া হাত উটু করিয়া ধরিল। অতুল পিছনে আসিয়া হাত হইতে পান লইয়া কহিল, কিন্তু পান সাজা ভাল হলে এবার মাপ করা হবে, যাটকে কমিয়ে না হয় কুড়ি-একুশে দাঁড় করান যাবে।

জ্ঞানদা লজ্জায় মাথাটা ঝুকাইয়া প্রায় বাটার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিল। অতুল গলা খাটো করিয়া বলিল, মাসীমার কাছে আর একটু হলে বলে ফেলেছিলুম আর কি! আচ্ছা, বেলা হ'ল চললুম।

জ্ঞানদা ইহারও প্রত্যুত্তর করিল না। সেই যে জড়সড় হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

কথা কওয়া হ'ল না? আচ্ছা—বলিয়া অতুল মেয়েটির ভিজা এলো চুলের একগোছা টানিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু আসচে হরি চক্কোস্তির মতন একটা বুড়ো—চললুম, বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু উঠানে পা দিয়াই চোঁচাইয়া উঠিল, মেজমাসীমা, জ্ঞানদাও জনো বোম্বাই থেকে মা একছোড়া চুড়ি কিনেছিলেন, বাইরে এসে দেখ—

শৈ, দেখে নাবা - বলিয়া দুর্গামণি পুনরায় বন্ধনশালা হইতে বাহির হইলেন। অতুল পকেট হইতে দু'গাছি চুড়ি বাহির করিয়া মেলিয়া ধরিল।

তাহার এং এবং কারুকার্য দেখিয়া দুর্গামণি অত্যন্ত পুলকিত-চিত্তে দাতার ভূয়োভূয়ঃ যশোগান কবিত্তে লাগিলেন। চুড়ি দু'গাছি কাঁচের বটে, কিন্তু সেকপ মূল্যবান বাহারে চুড়ি পাড়াগাঁয়ে কেন, কলিকাতাতেও তখনো আমদানি হয় নাই। বস্তুতঃ তাহার গঠন, চাকচিক্য এবং সৌন্দর্য দেখিয়া মায়ের নাম করিয়া অতুল নিজের ট কাতেই বোম্বাই হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল।

মায়ের ডাকডাকিতে জ্ঞানদা বাহির হইয়া আসিল এবং বিশেষক-নতমুখে স্নেহের এই প্রথম উপহার হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি কাঁপিয়া গেল। তার পরে দাতার পায়ের কাছে নমস্কার করিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। সে একটি কথাও কহে নাই—কিন্তু আজ তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানিলেন। শুধু পিছনে দাঁড়াইয়া এই দুটি মানুষ কণকালের জন্য সমস্ত-মুগ্ধ-নেত্র এই কিশোরীর অনিন্দ্য গঠন ও গতিভঙ্গী প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দুই

বড়ভাই গোলোকনাথ মারা গেলে, তাঁর বিধবা স্ত্রী স্বর্ণমঞ্জরী নির্বংশ পিতৃকুলের যৎসামান্য বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া হাতে কিছু নগদ পুঁজি করিয়া, কনিষ্ঠ দেবর অনাথনাথকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাহারই বিশ্বের অসহ্য জ্বালায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মেজভাই প্রিয়নাথ গত বৎসর ঠিক এমন দিনে ছোটভাই অনাথের সঙ্গে বিবাদ করিয়া উঠানের মাঝখানে একটা প্রাচীর ভুলিয়া দিয়া পৃথগ্ন হইয়াছিলেন এবং মাঝখানে একটা কপাট রাখার পর্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, তখন রঙ্গ দেখিয়া বিধাতাপুরুষ নিশ্চয়ই অলঙ্কো বসিয়া হাসিতেছিলেন। কারণ, একটা বৎসরও কাটিল না—প্রাচীরের সমস্ত উদ্দেশ্য নিশ্চল করিয়া, দিয়া, সেদিন প্রিয়নাথ সাতদিনের জ্বরে প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর আগের দিনটায়—মরণ সম্বন্ধে যখন আর কোথাও কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা ছিল না, এবং তাই দেখিতে সমস্ত গ্রামের লোক পিলপিল করিয়া বাড়ি ঢুকিয়া, রের দরজার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুট কলকল হা-জোশ করিতেছিল, তখনও প্রিয়নাথের একেবারে সংজ্ঞালোপ হয় নাই। অতুল গ্রামে ছিল না। কলিকাতার মেসে ওই দুঃসংবাদ পাইয়া আজ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভিড় ছেলিয়া যখন সে রোগীর ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল, কোথা হইতে জ্ঞানদা পাগলের মত আছাড় খাইয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ের উপর মাথা কুটিতে লাগিল। যাহারা তামাশা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই দৃশ্য একটা অভাবনীয় ফাউ পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে

বিতর্ক করিতে লাগিল ; কিন্তু অতুল এত লোকের সমক্ষে দুঃখে লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

কণ্ঠে পুরে যখন সে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, তখন জ্ঞানদা জোর করিয়া পায়ের উপর মুখ চাপিয়া কাদিতে কাদিতে কহিল, বাবার মরণকালে তুমি নিজের মুখে তাঁকে একটা সাত্বনা দিয়ে যাও—আমার অদৃষ্টে পরে যাই থাক—এ-সময় আমার মতন আমার ভাবনাটাকেও যেন তিনি এইখানেই ফেলে রেখে যেতে পারেন—আর তোমার কাছে আমি এখন কিছু চাইব না।—বলিয়া তেমনি করিয়াই মাথা খুঁড়িয়া কাদিতে লাগিল।

তাহার দৃষ্টিভ্রান্ত দূর্ভাগা পিতা অত্যন্ত অসময়ে অকালে মরিতেছে—আজ আর তাহার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না—এত লোকের সম্মুখে কি করিতেছে, কি বলিতেছে, কিছুই ভাবিয়া দেখিল না,—ক্রমাগত একভাবে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু অতুল সংযমী লোক। জ্ঞানদার এই ব্যবহারে অত্যন্তে সে যত ক্রেশই অনুভব করুক, বাহিরে এতগুলি কৌতূহলী চক্ষের উপর কঠিন হইয়া উঠিল। ভাব করিয়া পা ছাড়িয়া লইয়া মৃদু তিরস্কারের স্বরে কহিল, ছি, শান্ত হও, কান্নাকাটি করো না—আমার যা বলবার তা আমি বলব বৈ কি। বলিয়া মুমূর্ষুর শয্যার একাংশে গিয়া উপবেশন করিল। দর্শামণি স্বামীর শিয়রে বসিয়া ছিলেন, অতুলের মুখের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে কাদিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশী নীলকণ্ঠ চাটুয়া ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন ; অতুলের বিলম্ব দেখিয়া কহিলেন, শ্রিয়নাথের এখনো একটু জ্ঞান আছে বাবা, যা বলবে, এইবেলা বেশ চেষ্টা করুন—তা হলেই বৃদ্ধ হইয়া পাবেন। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধের এই প্রস্তাব আরও দুই-একজন তৎক্ষণাতঃ অনুমোদন করিল।

জনতা দেখিয়া অতুল প্রথমেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল ; তাহার উপর ইহাদের এই নিতান্ত অশেভন কৌতূহল সে মনে মনে আগুন হইয়া কহিল, আপনারা নিরর্থক ভিড় করে গেছে এ কোন উপকার করতে পারবেন না,—একটুখনি বাহিরে গিয়ে বসলেই আমার যা বলবার বলতে পারি। নীলকণ্ঠ চাটুয়া উঠিয়া বলিলেন, নিরর্থক কি হে ? প্রতিবেশীর বিপদে প্রতিবেশীই এসে থাকে। তুমি কোন সাধারণ উপকার করতে বিহ্বানায় গিয়ে বসেচ বাপু ? অতুল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি উপকার করি না কবি, আপনাদের এমন করে বাতাস আটকে অপকার করতে আমি দেব না। সবাই বাহিরে যান।

তাহার ভাব দেখিয়া নীলকণ্ঠ দু'পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সেদিনকার ছোকা—এতদিন ত বড় আশ্বর্ষ্য দেখি হে ! কে একজন তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, এল, এ, বি এ পাশ কবেচে কিনা ! একটা দশ-বার বছরের ছোঁড়া উঁকি মারিতেছিল। অতুল কাহারও কথাবল কোন ভাববদ না দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল। সে গিয়া আর একজনের গায়ে পড়িল। যাহার গায়ে পড়িল, সে অশ্রুটস্বরে সদরআগার ব্যাটা প্রকৃতি বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠ প্রকৃতি ভ্রষ্টলোক অতুলের কথাটা শুনিবার বিশেষ কোন আশা না দেখিয়া, মনে মনে শাসাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

যখন বাহিরের লোক আর কেহ রহিল না, তখন অতুল মুমূর্ষুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, মেসোমশাই ! শ্রিয়নাথ রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মুড়ের মত চাহিয়া রহিলেন। অতুল পুনরায় উচ্চকণ্ঠে কহিল, আমাকে চিনতে পাচ্ছেন কি ? শ্রিয়নাথ চক্ষু মুদ্রিয়া অশ্রুতে বলিলেন, অতুল।

এখন কেমন আছেন ?

শ্রিয়নাথ মাথা নাড়িয়া তেমনি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, ভাল না।

অতুলের দুই চক্ষু কলে ভরিয়া গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া পইয়া অশ্রুক্রুদ্ধ কণ্ঠ পরিভার করিয়া কহিল, মেসোমশাই, একটা কথা আপনাকে জানাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত হোন—আজ থেকে জ্ঞানদার ভার আমি নিলুম। শ্রিয়নাথ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, কৈ জ্ঞানদা ?

দুর্গামণি স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুবিকৃত রোদনের কণ্ঠে বলিলেন, একবার দেখবে জ্ঞানদাকে ? শ্রিয়নাথ প্রথমটা জবাব দিলেন না—শেষে বলিলেন, না।

দুর্গামণি কাদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অতুল কি বলছে, শুনেচ ? সে তোমার জ্ঞানদার ভার নিতে এসেছে। আর তুমি ভেবো না—হতভাগীকে অনেক গালমন্দ করেছে ; আজ একবার ডেকে আশীর্বাদ

করে যাও।—প্রিয়নাথ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুর্গামণি আবার সেই কথা আবৃত্তি করার পর, তাঁহার চোখ দিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। অক্ষম হাতখানি অনেক কষ্টে তুলিয়া, অতুলের কপালে একবার স্পর্শ করাইয়া পাশ দিগিরিয়া শুইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না বটে, কিন্তু এই আসন্নকালে তাঁহার হৃদয়ের একটা অতি গুরুভার নিঃসংশয়ে তুলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। অনুভব করিয়া অতুল অকস্মাৎ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিয়া ফেলিল। সাক্ষী রহিলেন—শুধু দুর্গামণি আর ভগবান।

পরদিন সায়াঙ্ককালে, শতকরা আশীজন ভদ্র-বাস্তালী যাহা করে, প্রিয়নাথও তাহাই করিলেন। অর্থাৎ, অফিসের ত্রিশ টাকা চাকরির মায়া কাটাইয়া, ছাব্বিশ বৎসরের বিধবা ও তের বৎসরের অনুঢ়া কন্যার বোঝা তুলপক্ষা কোন এক দুর্ভাগা আত্মীয়ের মাথায় তুলিয়া দিয়া, ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রায় বিনা চিকিৎসায় ডিয়ালী বৎসরের সমতুল্য একটা জীর্ণ কঙ্কালসার দেহ তুলসীবেনীমূলে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গানাথায়গন্ধ নাম গুণিতে গুণিতে বোধ করি বা হিন্দুর বিষ্ণুলোকেই গেলেন।

তিন

ছোটভাই অনাথনাথকে বাধা হইয়া প্রান্তরের প্রাচীরে একটা দ্বার ফুটাইতে হইল। অগ্রজের শ্রদ্ধা-শাস্তি হওয়া গেলে মনন-মোল দিন পরে একদিন তিনি অফিসে যাইবার মুখে চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পান চিরাৎ চিন্তিতে বলিলেন, আর না বললে ত নয় বোতান, বুঝতে ত সবই পার—খেতে তোমাকে একবেলা একমুঠো দিতে আমি কাতর নই—তা দান আমার সঙ্গে যতই কেন না কৃণ্যবহা করবে যান। কিন্তু এতবড় মেয়ের বিয়ের ভার ত আমি আর সত্যি সত্যি নিতে পারিনে। শুনেতেই আমার দেড়-শ টাকা মইনে, কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চা ত কম নয়? তা ছাড়া আমার নিজের মেয়েটাও বার বছরে পড়ল, লখতে পাচ্চ ত। তাই, আমি বলি কি, মেয়ে নিয়ে এ সময়ে তোমার একবার হবিপালে যাওয়া উচিত।

দুর্গামণি কান্নায়েরেব একটা খুঁজি আশ্রয় করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া ছিলেন : সভয়ে সসঙ্কোচে কহিলেন, দাদাব অবস্থা তুমি ত জান ঠাকুরপো। কিচ্ছু নেই তাঁর। এতবড় বিপদের কথা শুনে একবার দেখা পর্যন্ত দিতে এলেন না। তা ছাড়া, না নিয়ে গেলেই বা যাই কি করে?

বড়দেী স্বর্ণমঞ্জরী দেওরের পার্শ্বে প্রাচীরের আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, একটুখানি গলা বাড়াইয়া কহিলেন, দাদাব অবস্থা ভাল নয় জানি, কিন্তু তোমার দেওরটিই কেন লাটসাহেবের স্ববৌ? আর ঐ শুনেতেই দেড়-শো? কিন্তু যা করে আমি সংসার চালাই, তা আমি ত জানি! আর এও বলি—অত বড় ধুমসো মেয়ে তোমার ঘাড়ে—কে তোমাকে যেতে ঠাই দিতে যাবে বল দিকি? কিন্তু তা বলে মান-অভিমান করে বসে থাকলে ত চলে না!

দুর্গামণি ধীরে ধীরে বলিলেন, না দিদি, আমার আবার মান-অভিমান কি!

স্বর্ণ দেওরকে বা হাত দিয়া পিছনে ঠেলিয়া, নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, তোমাকে মঙ্গল কথা ত আমি বলিনি মেজবৌ, যে অমন করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলি বললে? তা, রাগই কর, আব কালই কর বাপু—তোমার ঐ ডানাকাটা পরীষ বিয়ে দিতে আমরা পারব না। মেয়ে ত ঐ ছোটবৌটাও পেটে ধরেচে। কেউ একবার বাছাদের মুখপানে চেয়ে দেখলে আবার নাকি সে চোখ ফিরিয়ে চলে যাবে! তা সত্যি কথা বলব মেজবৌ—যেমন তোমার মেয়ের মেয়ে, তেমনি গিয়ে বিপালে পোড়ে-হোড়ে থেকে যা-হোক একটা চাষা-ভূষো ধরে দাও গে—নাট্য চুকে যাক। ওনেচি নাকি—সেখানকার লোক সুচ্ছিরি-কুচ্ছিরি দেখে না—মেয়ে হতে হ'ল।

দুর্গামণি চুপ করিয়া রহিলেন। যে বিবের জালায় একদিন তাঁহার পৃথক হইয়াছিলেন, সেই বিষদন্ত পুনরায় উদাত্ত দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঠ হইয়া গেলেন। স্বর্ণ কহিলেন, যার যেমন! তোমাকে কেউ ত নিষেধ করতে পারবে না। হী, পারে বটে বলতে আমাকে। তিনটে পাশের কম যদি জামাই ঘরে আনি, দেশসুদ্ধ একটা টিচি পড়ে যাবে। সবাই বলবে—এটা করলে কি! এতবড় একটা জ্যাঠাই ঘরে থাকতে কিনা দুর্গাপ্রতিমে জলে ভাঙি? দিদি! সত্যি কিনা বল ঠাকুরপো? বলিয়া স্বর্ণ অনাথের প্রতি

কটাক করিলেন।—তা বৈ কি! বলিয়া অনাথ তাহার মহামান্য বড়ভাজের মর্যাদা রাখিয়া অফিসের বেলা হুণ্ডয়ার অছিলায় প্রস্থান করিল।

স্বর্ণ বলিলেন, তোমার ভাইকে ধরে-করে যা হোক একটা ধরে-পাকড়ে দাও গে। তাতে তোমার লজ্জা নেই মেজবৌ, কেউ নিষেধ করতে পারবে না। তিরিশটি টাকা ও সব মাইনে ছিল, কেই বা তাকে জানত, আব কেই বা চিনত। এঁদের ভাই বলেই যা লোকে জানে। আমি বলি কি—কাল দিনাটে ভাল আছে, কালই চলে যাও।

দুর্গামণি মনে মনে একবার অতুলের কথা ভাবিলেন, কিন্তু, ইহার সাক্ষাতে কোন কথা কহিলেন না। কারণ এই বড়জায়ের সম্বন্ধেই অতুলের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। স্বর্ণ অতুলের মায়ের মামাত বোন।

সেদিন কেমন করিয়া জ্ঞানদা অতুলের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদাকাটা করিয়াছিল, মা তাহা দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতবড় বিপদ মাথার উপর লইয়া ইহার বিশেষ কোন অর্থ ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দুঃখীর ঘরে ত একান্ত-মনে শোক করিবাবও অবসর নাই। তাই স্বামীর মৃত্যুর পরের দিন হইতেই এই কথাটা চিন্তা করিতেছিলেন। ঘরে গিয়া দেখিলেন, মেয়ে চুপ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার কাছে বসিয়া কহিলেন, দিদি যা বললেন, শুনেচিস ত?

মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। তার পরে যে তিনি কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। কিন্তু মেয়ে নিজেই তাহার সুবিধা করিয়া দিল। কহিল, কখনো ত বাপের বাড়ি যাওনি মা, এ সময় একবার কেন চল না?

মা বলিলেন, মা বেঁচে নেই, দাদা কোনদিন খোঁজা নিলেন না। এতবড় বিপদ শুনেও একটা চিঠি পর্যন্ত লিখলেন না। কেমন করে তাঁদের কাছে সেধে যাই, বল দেখি মা?

মেয়ে কহিল, দুঃখীর খোঁজ কেউ সেধে কখনো নেয় না মা। তাঁরা নেননি—এঁরাও ত নেন না। এঁরা বরং যেতেই বলতেন। আমাদের মান-অভিমান বাবার সঙ্গেই চলে গেছে, মা। চল, আমবা সেখানে গিয়েই থাকি গে—মায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেয়ে সম্বোধন মুছাইয়া দিয়া কহিল, আমি জানি, শুধু আমার জনেই তুমি কোথাও যেতে চাও না। নইলে, জ্যাঠাইমার কথা শুনে একটা দিনও তুমি এখানে থাকতে না। আমার জনো তোমাকে এতটুকু ভাবতে হবে না মা, চল, দিন-কতকের জনো আমরা আর কোথাও যাই। এখানে থাকলে তুমি হবে যাবে।

মা আর থাকিতে পারিলেন না, মেয়েকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া হুক করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মেয়ে বাধা দিল না, শান্ত করিবার চেষ্টা করিল না; শুধু নীরবে জননীর বুকের উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে দুর্গামণি নিজেই কঁচকা শান্ত হইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, তোকে সত্যি বলছি জ্ঞানদা, তুই না থাকলে আমি যেখানে দু'চক্ষু যায় সেইদিনই চলে যেতাম যেদিন তিনিও জন্মের মত চলে গেলেন। শুধু হোর জনেই পারিনি।

তা আমি জানি মা।

আচ্ছা, একটা কথা আমাকে সত্যি করে বল দেখি, বাচ্চা, সেদিন কেন অতুল ও কথা বললে? না জ্ঞানদা, অমন করে মুখ ঢেকে থাকিস নে মা, লজ্জা করবার সময় এ নয়। আমি জানি, মিছে কথা বলবার ছেলে সে নয়। তবে, সেই বা কেন তাঁর মরণকালে অমন ভরসা দিলে, আর তুই বা কেন তার পায়ে পড়ে অমন করে কাঁদলি?

জ্ঞানদা মায়ের বুকের "প" হইতে অশ্রুটুকু কহিল, সে আমি জানিনে, মা।

দুর্গামণি জোর করিয়া মেয়ের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া একবার দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে জোর করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। বিফলকাম হইয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আমার কখনো কিছু মনে হয়নি বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে ভেবে-ভেবে এখন যেন অনেক কথাই বুঝতে পারি। অতুলের মৃত্যুর কতদিনের কত ছোট-খোট কথাই না আজ আমার মনে হচ্ছে। বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ বাগ হইয়া কন্যার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি বল মা, আমি যা মনে করেছি, তা মিথ্যে নয়? আমি এ ক দিন শুধু মগন দেখিনি?

জ্ঞানদা তেমনি মুখ ঢাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, কি জানি মা, তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে।

দুর্গামণি আনন্দের আবেগে কাঁদিয়া কহিলেন, আমাকে সংশয়ে ফেলে রেখে আর বিধিস নে মা, একবার মুখ ফুটে বল—আমি তোর বাপের জন্যে একটিনার প্রাণ খুলে কাঁদি। আমার এ কান্না আজ তিনি শুনতে পাবেন।

মেয়ে চুপ চুপ কহিল, কাঁদো না মা—আমি ও তোমাকে কাঁদতে বাধন করিনে। বাবাকে জানাতে বলেছিলাম—তিনি নিজেই ত জানিয়েচেন। এখন তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে।

দুর্গামণি এবার আর বাধা মানিলেন না। জোর করিয়া মেয়ের আরও অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, তাহাকে অঙ্কন চুষন করিয়া, পুনরায় বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, নীরবে বহুকণ ধরিয়া অশ্রুপাত করিলেন। পরে চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই বটে মা, তাই বটে! অতুল আমার দীর্ঘজীবী হোক—তার বর্ম তাৎ কছেই বটে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের কার একদিনের ভরে মনে পড়েনি মা, তুই নিজেই যে তাকে মরা কাঁচিয়েছিলি। সে বছর, লোকে বললে—বেরিবার রোগ। ও সে যে রোগই হোক—ফুলে ফেটে, ঘা হয়ে,—আগে তার মা, তার পরে অতুল। অতুলের তো কোন আশাই ছিল না। পচা গন্ধে, ভয়ে, কেউ যখন তাদের ওদিক মাড়াত না, তখন এতটুকু মেয়ে হয়ে তুই যমের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই করে তাকে ফিরিয়ে এনেছিলি। সে ধর্ম সে কি না রেখে পারে? সাবিত্রীর মত যাকে যমের হাত থেকে তুই ফিরিয়ে এনেছিলি, তাকে কি ভগবান আর কার হাতে তুলে দিতে পারেন? এ ধর্ম যদি না থাকে, তবে চন্দ্র-সূর্য এখনও উঠছে কেন?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় পুলকিত-চিন্তে বলিতে লাগিলেন, এখন যেখানে আমাকে বাঁস সেখানেই যাব। কিন্তু তুই ও ত.এ মত না নিয়ে যেতে পারিস নে বাছা। তাই বটে! তাই বটে! এই বাবা আমার ঘিরে এসেই, সকাল হতে না হতে দু'গাছি চুড়ি দেবার ছল করে মাকে আমার দেখতে এসেছিল। ওগো, আর একটা বছর কেন ভূমি বেঁচে থেকে চোখে দেখে শেলে না! বলিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বস্তুগত দিশ বোধ করিলেন।

বলি মেজবো? দুর্গামণি ওঁতাওঁতি মেয়েকে বুক হইতে ঠেলিয়া দিয়া, চোখটা মুছিয়া লইয়া সাড়া দিলেন, কেন দিদি?

বড়বো একবার ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া কঠিন-ধরে বলিলেন, তোমাদের নাইয় শোকের শব্দবে ক্ষিপ্ত-ওস্তা নেই, কিন্তু বাড়ির আর সবাই ত উপোস করে থাকতে পারে না। বেরিয়ে একবার বেলায় দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

দুর্গামণি শব্দবাক্ত ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেলায় দিকে চাহিয়া—সন্ধ্যায় মেয়ের নাম করিয়া কি একটুখানি জগদীশ্বরি করিতেই, স্বর্ণমঞ্জরী তাঁক্ষভাবে বলিলেন, ওঁ ত। হৈসেলটা চুকিয়ে দিয়ে মেয়েকে কাছে বসিয়ে সারাদিন বোঝাও না—আমি কথাটিও কব না। কিন্তু আমার ছেলে মেয়েগুলো যে পিণ্ডি পড়ে মারা যায়। না বাপু, এমনধারা সব অনাচারি কাণ্ড আমি সইতে পারব না। বলিয়া নিঃসন্তান বড়বো, ছোটবধূর সন্তানদের প্রতি মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না কবিয়াই চলিয়া গেলেন।

অনাথের সংসারে পুনরায় প্রবেশ কবা অবধি দুর্গাকেই রান্নাঘরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহাতে বড়বো এবং ছোটবো উভয়েই সমস্তদিনব্যাপী ছুটি পাইয়া, একজন পাড়া বেড়াইয়া এবং খরচপত্র অত্যন্ত বেশী হইতেছে বলিয়া কোন্দল করিয়া, এবং আর একজন ঘুমাইয়া, নভেল পড়িয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন।

অনাথ সাড়ে-আটটার ডেলি প্যাসেঞ্জার। ভোরে উঠিয়া যথাসময়ে তাহার আহার্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, এ-বাটীতে একটা নিদারুণ অশান্তির ব্যাপার ছিল। এ, লইয়া বড় এবং ছোট জায়ে প্রায়ই কথা-কাটাকাটি এবং মন-কষাকষি চলিত। এ কয়দিন এই হাস্যমা হইতে নিস্তার পাইয়া, উভয়ের মধ্যে অনেক দিনের পর আবার একটা ভালবাসার গ্রন্থিবন্ধনের সূচনা হইতেছিল। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ সেই বীখনটা আর একবার জিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার কারণ এই যে, বেলা সাতটা বাজে, এবং ঐ আশ্রয় সন্ধানপ্রার্থিত ছোটবধূকে জানাইল যে, কয়লার উনানের আঁচ উঠিয়া গিয়াছে, একটু তৎপর হইয়া রান্না চাপাইয়া দেও অংশাক।

ছোটবৌ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, মেজদি কি করচে? বেলা সাতটা বাজে—আজ বুঝি তার সে ঝল নেই?

ঝি কহিল, ঝল কেন থাকবে না গা? ভোরে উঠে মায়ে ঝিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ বীধাছাঁদা করচে—এই আটটার গাড়িতে হরিপাল না কোথায় যাবে যে!

ছোটবৌর কালকার কথা মনে পড়িল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রসন্ন না হইয়া চেঁচাইয়া কহিল, যাবে বললেই যাবে নাকি? বাবুর ঝকুম নিয়েচে? দিদিকে জানিয়েচে?

ঝি কহিল, বাবুর কথা জানিনে ছোটবৌমা, কিন্তু বড়মা ত নিজেই তাদের আজ যেতে বলেছিল।

তবে, তাকেই বল গে সাড়ে-আটটার ভাত দিতে—আমি জানিনে, বলিয়া ছোটবৌ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া খানিকটা গুলগুড়ানো ঠোটের ভিতর পুরিয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া খিড়কির দিকে হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

ঝি বলিল, থাকলে ত বলব' তিনি গেছে গঙ্গাচ্চান করতে— বলিয়া সে নিজের কাছে চলিয়া গেল।

ছোটবৌকে ফিরিতে হইল, কারণ অফিসের সাহেব তাহার রাগের মর্যাদা বুঝিবে না। হয় যা-হোক দুটা সিদ্ধ করিয়া দিতেই হইবে, না হয় স্বামীকে ঠিক সময়ে অভ্যুত্থাইয়াইতে হইবে। দুটাব একটা অপরিহার্য। ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া দুর্গামণির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁত্বকণ্ঠে কহিল, যাবেই ত। কিন্তু এমন খোলোমি করে না গেলেই কি হত না মেজদি?

এই অভাবনীয় আক্রমণে দুর্গামণি অবাক হইয়া গেলেন।

ছোটবৌ কহিল, আমবা কেউ জানিনে, হোমরা সকালেই যাবে। তিনি গেছেন গঙ্গা' নাইতে। আমি ত এই উঠছি। টাইমের ভাত কি করে দিই বল দেখি?

প্রাতঃপোহাম হই মাসীমারা, বলিয়া অতুল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি হঠাৎ যে অতুল!

অতুল কলিকাতার মেসে থাকে। সেখানে চিঠি পাইয়া ছুটাছুটি করিয়া এইমাত্র আসিয়া জুটিয়াছে—এখনও বাড়ি যায় নাই। কহিল, মেজমাসীমা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করবেন, আর শেষ দেখাটা একবার দেখতে আসব না? হরিপাল! অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার ডিপো! তা এই আশ্বিনের শুরুতেই এমন সুবুড়িটা তোমাকে কে দিলে বল দেখি, মেজমাসীমা? বাঃ—বীধাছাঁদা একেবারে কর্মান্ত্র' যে! বলিয়া সে সহাসে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিষ্কেন্দ্র করিতেই একপ্রান্ত হইতে একজোড়া ভল্লভৎ! আনন্ড চকুর টেলিগ্রাফ পাইয়া স্বরু হইয়া থামিল।

ছোটবৌ প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি করে খবর পেলে অতুল?

আমি? বাঃ—, বলিয়া অতুল তাহার কৈফিয়ত শেষ করিল।

অকস্মাৎ প্রাঙ্গণের কোন একটা অনির্দিষ্ট স্থান হইতে স্বর্ণমঞ্জরীর কণ্ঠস্বর শব্দভেদী বাগের মত আসিয়া প্রত্যেকের কানে বিধিল। অর্থাৎ তিনি গঙ্গান্নানে শান্ত-শুচি হইয়া বাটিতে পা দিয়াই ঝি মুখে কয়লার উনুনের খবর পাইয়াছিলেন। সুতরাং মেজজায়ের সদা-বৈধবোর যথার্থ হেতুটা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন—চারপো পূর্ণ না হলে কি ভগবান কার এমন সর্বনাশ করেন? করেন না। এ তাঁর ধর্মের সসোর—এখানে অধর্ম হবার জো নেই। সোজা চলিয়া আসিয়া ঘরের চৌকাঠের ভিতরে একটা পা দিয়া কহিলেন, মতলবটা ত তোমার এই, মেজবৌ—না খেয়ে উপোস করে ছোটকর্তা অফিসে যাক, সন্ধ্যাবেলা পিণ্ডি পড়ে জ্বর হয়ে বাড়ি ফিরে আসুক। তারপর নিজের যেমন হয়েছে, তেমন সর্বনাশ আরো একজনের হোক।

দুর্গামণি মনে মনে শিহরিয়া কহিলেন, এ কপাল যার পুড়ে দিদি, সে অতিবড় শত্রুর জন্যেও এমন কামনা করে না। কিন্তু কি করেচি তোমার যে, এত কটু কথা আমাকে উঠতে বসতে শোনাচ্?

স্বর্ণ হাত নাড়িয়া, মুখ অতি বিকৃত করিয়া কহিলেন, কচি খুকী যে! আমাকে বলতে হবে—কি করেচ? সাড়ে-সাতটা বাজে—টাইমের ভাত বীধবে কে?

অতুল এতকণ অবাক হইয়া গুনিতেছিল। তাহার বড়মাসীকে সে ভাল করিয়াই চিনিতে; এইজন্য

কথাবার্তাও বড় একটা দাঁড়ই না। কিন্তু এখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেই প্রব্লেম জবাব দিয়া বসিল। কহিল, সত্যি কথা বললে তুমিই বাগ করবে মাসীমা; কিন্তু কপাল নেহাত না পুড়লে। আর কেউ তোমাদের ভাত খেতে আসে না, সে-কথা তোমরাও জান, পাড়ার আর পাঁচজনও জানে। কিন্তু আজ যাকার দিনটায় হতভাগীদের একটুখানি মাপ করলে তোমাদের মহাভারত অন্তত্ব হয়ে যেত না, মাসীমা।

হঠাৎ অতুলের কথাই খাড়ে দুই জায়গেই বিষয়ের অবধি রহিল না। মিনিট-খানেক কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাই পরে স্বর্ণ কর্তালেন, কোলকাটা থেকে তুই কি আমাদের সঙ্গে এগড়া করতে এসে হাজির হয়েচিস নাকি রে?

ছোটলো বালিল, এগড়া কবতে আসলে কেন দিদি? ওর মেজমাসীকে আমরা হরিপালে গঙ্গাবাত্রা কবচ্ছি, শু এই যে শেষ দেখাটা দেখতে এসেছে।

ওং, তাই বটে?

ছোটলো কহিল, তাই দিদি, তাই। তাই এখন থেকে ভারিচ, আমরা বাড়ির লোক কেউ জানলাম না, তোমার বোনপোটি কলকাতায় বাসে জানলে কি করে? তা হলে লোকে যা বলে, তা মিথ্যে নয় দেখচি। স্বর্ণ ক্রোধে দীর্ঘমুক-জ্ঞানশূন্য হইয়া চোঁচাইয়া বিমূঢ় করিয়া একটা কাশ করিয়া তুলিলেন। বলিতে লাগিলেন, বেশ ও বড়ো, এতই যদি দরদ জন্মে থাকে, তোমার শাপুড়ী-মাসীকে গঙ্গাবাত্রা করাবে কেন, ঘরেই কি? তাও না। গা-সুচ লোক বাহবা বাহবা করবে এখন।

তাহার বিবোধ জালয়ে অতুলেরও মাথা বেঁটিক হইয়া গেল। সেও বলিয়া বসিল, বেশ ও মাসীমা, তোমরা আপনাব লোক, কথোটি যদি দু'দিন আগেই ভেমে থাক, ভালই হত। উনি আমাব ঘরে গেলে, আমি মাথায় কবে নিয়ে যেতে বাজী আছি। তোমাদের গায়ের লোকগুলো তাতে বাহবা দেবে, কি ছি ছি কববে, আমি শুকপও কববো।

কপোটা বলিয়া ফেলিয়া অতুল নিজেরও যেমনি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গুরুজনেবাও তেমনি আসত। বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এ যেন অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু ছুটিয়া আসিয়া লজ্জা-শব্দ আড়াল-আড়াল সমস্তই চাক্ষুস পলকে ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া মস্ত একটা ফাকা মাঠের মধ্যে সবাইকে দাঙ কবাইয়া দিয়া গেল। কাহারও কাছ কাহারও আর গোপন কবিবাব, বাসিবাব-চাকিবাব জায়গা বহিল না।

অতুল নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। যদু বাগদি গরুর গাড়ি আনয়া কহিল, মা, ময় হয়েচে, জিনিসপত্রের কি দেবে দাও। এখন থেকে না বেরুলে ইস্টশনে গাড়ি ধরতে পারা যাবে না। বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া নির্দেশমত সুমুখের টিনের ত্রোবস্তের উপর বিছানাটা তুলিয়া নিয়া খাড়ে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বড়লো ছোটলো দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। দুর্গামণি 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া ঘরে তালা দিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। মেয়েটা মুর্ছিতের মত মায়ের কোলের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

চার

এগাব বৎসর পরে দুর্গামণি হরিপালে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হলেন। তখন শরতের সন্ধ্যা এমনই একটা অস্বাভাবিক আপসা ধূয়া লইয়া সমস্ত গ্রামখানার উপর ছমড়া ছাওয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই দুর্গামণির বুকের ভিতরটা খাঁৎ করিয়া উঠিল। বাড়ির বাপ-মা নাই— বড়ভাই আছেন। শব্দ চাটুয্যের সেদিন ছিল বৈকালিক পালাজ্বরের দিন। অতএব সূর্যাস্তের পরই তিনি প্রকৃত হইয়া ফোনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। খবর পাইয়া সুপ্রাচীন বালাপোশে মাথা এবং দু'কান ঢাকিয়া খড়ম পায়ে খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া চিনিতে পারিলেন।

কে, ও দুর্গা এলি নাকি? তা আয় আয়।

দুর্গা কাঁদতে কাঁদতে অগসর হইয়া দাদার পদমূলে প্রণাম করিলেন।

জানদা প্রণাম করলে, কহিলেন— এটি বুঝি মেয়ে? তা বিয়ে দিলি কোথায়?

মামি আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন, ভয় কি গো, ওরা যে দেবতা। কখনো কাকের অপকার করে না। আর সাপখোপেব কামড়ে কটা লোক মরে বাছ? বনফ, ভয় যা তা এই ম্যালেরিয়ার। একবার পরলে, আর ওতে বস্তু বেগে ছাড়ে না। এ বছর দিন-কুড়ি তল তোমার মামাকে পরেচে—এবই মনে। যেন শওর্জীর্ণ করে ফেলোচে আর দিনকতক পরে কে কার মুখে জল দেবে মা, এ-গায়ে তার ঠিক থাকবে না।

জানন্দা মনে মনে অতুলের শেষ কথাগুলো মিলতিয়া নইয়া নারবে পড়িয়া রহিল। সে-রাস্ত্রে সে একবারও ঘুমাইতে পারিল না। মায়ের বুকের কাছে মুখ রাখিয়া বাৎসব চমকিয়া উঠিতে লাগিল। এমন করিয়া প্রভাত হইল। নৃতন স্থানে নৃতন আলো চোখে পড়ায় বিন্দুমাএও তাহার আনন্দোদয় হইল না—বনফ সমস্ত আনন্দোত্তর, আলো, বাতাস যেন কালকের চোখেও বেশী করিয়া তাহাকে চাপিয়া দাঁবল।

এতদূর আইবুড়ো মেয়ে দেখিয়া প্রভাত লোক ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেল। আমাদের বাঙ্গালদেশে মেয়ের বয়স দিক করিয়া বলাব করিত নাই। সবাই জানে, বাপ-মাকে দু-এক বছর হাতে রাখিয়া বলিতও হয়। সুতরাং দুর্গা যখন বলিলেন, তের, তখন সবাই কুণ্ডিল পন্নর। তা ছাড়া একমাত্র সন্তান বলিয়া, নিতেন্দ্র না হইয়া মেয়েকে যাওয়াইয়াছিল, পরাইয়াছিল—সেই নিতেন্দ্র হাতাই এখন আরও ভাল হইল। জানন্দের যথার্থ বয়সের বিকল্পে ইহাই বেশী করিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল। দুই দিন না—কিন্তু শত্ৰু কথাসমূহ ভগিনীকে কহিলেন, মেয়েটার জন্য তা পড়ায় মুখ দেখানো ভাল হয়েচে। একটি ভাবি সুপাত্র হয়ে আছে, দিদি।

দুর্গা বলিলেন, জন্মই আমার স্থির হয়ে আছে—আমি কোথাও হতে পারব না। শত্ৰু বলিলেন, তা হলে ও কদম্বি নেই? কিন্তু এমন সুপাত্র বড় ভাগ্য মেয়ে, তা বলে দিচ্ছি। কুড়ি-পঁচিশ বিঘে ব্রহ্মত, পুতুল, বাগান, ধানের চৌকি—লেখাপড়ারও—

দুর্গা কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, না দাদা, আর কোথাও হবাব ভো নেই—এই বছরটা বাদে সবখানেই আমাকে মেয়ে দিতে হবে।

শত্ৰু বলিলেন, কিন্তু, আমার বিরচনায়—এই সামনের অয়্যানেই মেয়ে উচ্ছুড়া করা কর্তব্য হয়েচে। দুর্গা আপ নিবর্তক প্রতিবাদ না করিয়া—কাজ আছে, বলিয়া উঠিয়া গেলেন। ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, এই সুপাত্রটি শত্ৰুবই এ পক্ষে বড় শ্যালক। স্থাঁর মড়া ঘটায়, প্রায় চার মাস যাবৎ বেকার অবস্থায় আছেন—আর বেশদিন থাকে কেইই সম্ভব মনে করে না। বিশেষত ঘরে অনেকগুলি কাছা-বাচ্চা থাকায় একটি ডাগর মেয়ে নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সেইজনাই বোধ করি, দুর্গার বাৎসব অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এই সুপাত্রটি একদিন সহসা আবির্ভূত হইয়া সম্মুখেই জানন্দাকে দেখিতে পাইলেন, এবং বলা বাচ্চা যে পছন্দ করিয়াই ফিরিয়া গেলেন। অনতিকাল মধ্যেই ভগিনীর প্রতি শত্ৰুনাথের স্নেহের অনুরোধ কঠোর নির্যাতনের আকার ধরিয়া দাড়াইল। একদিন তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, শ্রিয়নাথের অবর্তমানে তিনিই এখন ভগিনেয়ীর যথার্থ অর্থাভাবক। সুতরাং আবশ্যক হইলে এই সামনের অয়্যানেই তিনি জোর করিয়া বিবাহ দিবেন।

দাদা সঙ্গে বাদিনুবাদ করিয়া পাশ ঘরে ঢাকয়া মেয়ের পানে চাইয়াই বাক্যে পারিলেন, সে সমস্ত শুনিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু ফুলিয়া রাস্তা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে বুকে টেনে নইয়া বলিলেন, আমি বেঁচে থাকতে ভয় কি মা! মুখে অভয় দিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে তাহার নিজের বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত শুকহিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এসব দেশে একপ জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া যে এতটা সচরাচর ঘটনা, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া মেয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিতে লাগিল। মা তাহার কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরে গা ফাটিয়া যাইতেছে। চোখ মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন জ্বর হল মা?

কিন্তু বাস্তব থেকে।

আমাকে জানাস নি কেন? শান্তকাল যে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার সময়। মেয়ে চূপ করিয়া রহিল, জবাব দিল না।

দাদার বৌয়ের সহিত দুর্গা এ পর্যন্ত কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেন নাই। শুধু যে তাহার বিকট চেহারা ও ততোধিক বিকট হাসি দেখিলেই তাহার গা জ্বলিয়া যাইত তাহা নহে, তাহার আত্ম করুণ কষ্টবশতও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়াগায়ের মেয়েরা স্বভাবতঃই একটু উচ্চকণ্ঠে কথা কহে; কিন্তু বৌয়ের কথাবার্তা একটু দূর হইতে শুনিলে ঝগড়া বলিয়া মনে হইত। তাহার উপর সে যেমন মুখেরা, তেমনই যুদ্ধবিশারদ। কিন্তু তাহার একটা গুণ দুর্গা টের পাইয়াছিলেন। সে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে চাহিল না। তার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া দিলে, সে কাহাকেও কিছু বলিত না—ছেলেপিলে খব সংসার লইয়াই থাকিত, পরের কথায় কান দিত না।

প্রথমে আসিয়াই দুর্গা একদিন তাহার রান্নাবান্নার সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল—তুমি দুদিনের জন্যে এসেচ ঠাকুরবি, তোমাকে কাজ করবে হলে না। আমি রান্নাঘর, তাঁড়ারঘর কউকে দিতে পারব না। সেই অশ্লীল দুর্গা এবিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

আজ বেলা দেখিয়া বৌ দোর-গোড়ায় স্বাভাবিক চীৎকারশব্দে প্রস্থ করিল, আজ খাওয়া-খাওয়া কি হবে না ঠাকুরবি? হেসেন নিয়ে বসে থাকব?

দুর্গা মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেয়েটার ভারী জ্বর হয়েছে বৌ; তোমরা খাও গে, আমরা আজ আর কেউ খাব না। বৌ কহিল, মেয়ের জ্বর, তা তোমার কি হ'ল গো? জ্বর আসার কারে না হয়? নাও, উঠে এসো। দুর্গা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, না বৌ, আমাকে খেতে বল না—মোয়ে যেনে আমি মুখে তাত তুলতে পারব না।

তোমাদের সব আদিবোতা, বলিয়া বৌ চলিয়া গেল। রান্নাঘর হইতে পুনরায় কহিল, জ্বর হয়েছে কবরের ডেকে পাঁচন সিদ্ধ করে দাও। ম্যালেরিয়ারী জ্বরে আক্রান্ত থায়া না কে? আমদের মেয়ে ওসব উপোস-তিরসের পাঠ নেই বাপু! বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অপরাহ্নকালে সে নিজেই একবাটি পাঁচন সিদ্ধ করিয়া আনিয়া কহিল, ওলা ও বৈশি, উচু পাঁচন খা! তাতে জল দিয়ে রেখেছি, চল, খাবি আয়।

স্বামীকে সে অত্যন্ত ভয় করিত। বিনাবাক্যে উঠিয়া স্বানিকটা হস্ত পাঁচন পরিষ্কার করে কদিন ফেলিয়া পুনরায় ওইয়া পড়িল। দুর্গা ঘরে ছিল না, বমির শব্দে ছুটিয়া আসিয়া বাপের ঘরফর নিঃশব্দে পাড়াইয়া রহিলেন। স্বামী রাগ করিয়া উঠানে গিয়া সমস্ত পাড়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, এসব বাবুদের নিয়ে আমাদের গরীব, দুঃখীর ঘরে আসা কেন বাপু?

সেই হইতেই জ্ঞানদার অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। তাহার ভামিনী মায়ী সেই যে প্রথম দিনেই বলিয়াছিল, বাছা! পল্লীগ্রাম সাপের কামড়ে আবে ক'টা লোক মরে, মরে যা তা ঐ ম্যালেরিয়ারীতে। একবার ধরলে আর রক্ষা নেই। তাহা কথটার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে বেশী বিলম্ব ঘটিল না, অনতিকালমধ্যেই জ্ঞানদাকে একবারে শয্যাগত করিয়া ফেলিল। সেদিন কাঠীকেও সংক্রান্তি; দুর্গা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, বৌ জ্ঞানদার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। একে ত সংসারের কাজ ছাড়িয়া এইসব বাড়ি কাজ করিবার তাহান অবসরই নাই, তাহাতে পরের মেয়ের প্রতি এই অযাচিত সেবাটা এমন একটা প্রকৃতি-বিকল বিস্ময়কাত বলিয়া দুর্গার মনে হইল যে, তিনি দাদার প্রত্যাশিত সেই বিবাহ-ব্যাপারটা স্বরণ করিয়া আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। ভামিনীর এই যত্নটা যে সেই জনাই, তাহাতে আর সংশয়মাত্র বহিল না। কারণ, সে যে নিজের দাদার সহিত জ্ঞানদার বিবাহ ঘটাইবার জন্য স্বামীকে নিয়োজিত করিয়াছে—এক ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করিতেছে, প্রথম হইতেই এই কথাটা দুর্গা স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিলেন। বৌ গলাটা আজ একটু খাটো করিয়াই কহিল, তারকেশ্বরে পাশ করা ডাক্তার আছে—তোমার দাদাকে স্নানতে পাঠিয়ে দিয়েচি, ঠাকুরবি। জ্বর যেন রোজ রোজ বেশীই হচ্ছে—এ তো ভালো না। দুর্গা অব্যক্তভাবে বাহা বলিলেন, তাহা শোনা গেল না, কারণ এই সুসংবাদ শুনিয়াও তিনি অন্তরের ভিতর হইতে প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।

বৌ সংসারের কাজে চলিয়া গেল। জ্ঞানদা শালিশের ওলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া

কছিল, জবাব দিয়েছেন।

কৈ দেখি, দেখি, বলিয়া মা সেখানি যেন কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অসহ্য আগ্রহ দমন করিয়া চিঠিখানি দুই মুঠার মধ্যে লইয়া চাপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একবার মনে করিলেন, খুলিয়া পড়ি। আবার ভাবিলেন, না, উচিত নয়। মেয়ে যেন হাতেই দিয়েছে, কিন্তু মা হইয়া তিনি পড়িবেন কি করিয়া! মুদুখরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখেছে অতুল?

জ্ঞানদা ইতিমধ্যে পাশ গিরিয়া শুইয়াছিল। সংক্ষেপে কছিল, আসা উচিত ছিল না—এই-সব। পত্রের এই দুটি কথা শুনিয়াই মায়ের দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, আসা উচিত ছিল না—এই-সব। অতুলের মুখখানি স্মরণ করিয়া, তাহাকে অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়া দুর্গা মাড়িয়েহে বিগলিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, না জানি, বাছার কতই না অভ্যমান, কতই না মর্মান্তিক ব্যাথা, এই দুটি কথার মধ্যে লুকান আছে। এখানে আসিয়া জ্ঞানদা জুরে পড়িয়াছে—তাহাতেই ত বাছা সেদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল—ইহাদের গঙ্গাত্মা দেখিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। সত্যিই ত!—আমি নিজে যাই করি এবং যেখানেই যাই, সে আলাদা কথা। কিন্তু মেয়ে লইয়া আমার যে কোনমতেই আশা উচিত ছিল না। যতই কষ্ট হোক, সব সহ্য করিয়াই ত সেখানে আমাদের পড়িয়া থাকা উচিত ছিল। কাগজখানি অপূর্ব মমতার সহিত মুঠার মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে কত কণ্ট তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যুশয্যায় অতুলের প্রতিজ্ঞা—সেই চড়ি দু'গাছি দিবার ছলে মহাপ্রসাদ লইয়া আসা, বিশেষ করিয়া আসিবার দিনটায় মাসীর সহিত তাহার কলহ। এ-কথা তাহার মা শুনিয়াছেন, পাড়ার লোক শুনিয়াছে—এতদিনে সবাই জানিয়াছে কেন সে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। আনন্দে গর্বে তাঁহার মাড়বন্ধ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন, কালো মেয়ে! আমার কালো মেয়ের গৌরব দেখুক সবাই! ওরে, কোর্কলও কালো, ভোরমাও কালো যে! ডাকিলেন,—জ্ঞানদা, এখন কেমন আছিস মা?

ভাল আছি মা।

ইংরেজি, আমার কথা অতুল কিছু লিখেছে?

পড়ে দেখ না।

কৌতুহল আর তিনি সামলইতে পারিলেন না। জানালার কাছে কাগজখানি তুলিয়া ধরিলেন। অতবড় কাগজের মধ্যে মাত্র দুইছত্র লেখা দেখিয়া প্রথমটা তাহার মনে হইল, মেয়ে কৈ দিতে, হয়ত কি দিয়াছে। পরক্ষণেই “শ্রীচরণেশু” পাঠ দোখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, তাইতেই পড়তে দিয়েছে—এ যে আমারই চিঠি। লেখা আছে—“সেই সময়েই বলিয়াছিলাম ও জাগয়া ম্যালেরিয়ার ডিপো। জ্ঞানদার জুর শুনিয়া দুঃখিত হইলাম—আশা করি, শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।” ইতি—

দুর্গার কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে একটু বাধিল, কিন্তু মায়ের প্রশ্ন—না জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকিতে পারিলেন না; কাছে বসিয়া মেয়ের রুদ্ধ চুলগুলি আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে আস্তে আস্তে বলিলেন, হী মা, তোমার চিঠিটার মধ্যে কতক অতুল রাগ করেছে? জ্ঞানদা বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কছিল, আমার চিঠি আবার কোথায় মা? তোমাকেই তো লিখেছেন। দুর্গা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমি দেখতে চাই না, শুধু লেই সুখী। রাগ করেছে, সে ত আমি বুঝতেই পারিচি—

না মা, আমাকে তিনি আলাদা চিঠিপত্র কিছুই লেখেন নি। এ লিখেছেন, তা ওই। বলিয়া মেয়ে পুনরায় পাশ ফিরিয়া পুইল।

সবে দুইছত্র? আর কোন কথা নেই? বলিয়া দুর্গা স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার যে আঙুলগুলো এতক্ষণ মেয়ের চুলের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র গতিতে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, সেগুলোও যেন হাড়ের মত গন্ধ হইয়া উঠিল; এইভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আবার দিন কাটিতে লাগিল

পাঁচ

প্রথম অগ্রহায়ণের শীতের বাতাস বহিতেছিল। দুর্গার এক ছেলেবেলার সাথী বাপের বাড়ি আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা মেয়েকে একটু ভাল দেখিয়া দুর্গা তাহার সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথে ডাক-পিয়নের সাক্ষাৎ পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ দাও, আমার নামের চিঠিপত্র পাচ্ছনে কেন?

দাও হাসিয়া কহিল, চিঠি না এলে কি করে পাবে, দিদিঠাককন?

দুর্গা সজ্জিব্বরে বলিলেন, আমার কিংবা আমার মেয়ে জ্ঞানদা দেবী—কাক নামেই কি চিঠি আসে না?

দাও কহিল, এ'লে ত আমিই দিয়ে যেতাম দিদিঠাককন?

দুর্গা বলিলেন, না দাও, তোমার বাগটা একটু ভাল করে দেখো—আসতেও পারে। তিন তিনখানা চিঠির জবাব দেবে না, —আমার অতুল ত তেমন ছেলে নয়।

দাও বৃথা পরিশ্রম না করিয়া কহিল, না দিদি, নেই—এলেই পাবে। বলিয়া যাইতে উদাত উঠিলেন, দুর্গা বাধা দিয়া বলিলেন, হাঁ দাও, এমনও ত হতে পারে—তোমার পোস্টাফিসেই পড়ে আছে পোস্টমাস্টার আমাদের নাম জানে না। হয়ত বা টেবিলের তলায় ঘোঁড়ে-ঘোঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে, তোমরা কেউ দেখতে পাওনি। আমাকে ত এখানে সবাই জানে, আমি নিজে গিয়ে কি একদাও খুঁজতে পারিনে?

ব্যাকুলতা দেখিয়া দাও সদয়চিত্তে কহিল, কেন পাববে না দিদিঠাককন—কিন্তু সে মিছে খোঁজ হবে। আচ্ছা, আমিই গিয়ে আজ একবার খুঁজে দেখব। যদি পাই দিয়ে যাবো? বলিয়া সে আর সমন নষ্ট না করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গা ঠাকুর-দেবতার চরণে বিশ্বের ঐশ্বর্য মানত করিতে কবিত্তে চলিলেন—‘হে ম' দুর্গা, হে ম' কালী, একখানি চিঠিও যেন খুঁজে পায়ো যায়। জ্ঞানদাও এত বড় অসুখ শুনিয়াও সে উত্তর লিখিলে না—এ কি কোনমতেই বিশ্বাস করা যায়। সে নিশ্চয় লিখিয়াছে, কিন্তু কোথাও পেন্সনমালা হইয়া গেছে।

হায় রে অনুষের আশা! শত কোটি সম্ভব-অসম্ভব ভজন-কল্পনার মধ্যে একখণ্ড একবারও দুর্গার মনে উদয় হইল না যে, ইতিমধ্যে অতুলের মনের গতি বদলাইয়া যাইতেও পারে। একবারও ভাবিলেন না—অতুলের যে কামনা একদিন একান্ত সন্তোষপনে সম্পূর্ণ আনন্দের অস্তরে, শুধু নির্বিকারেই পাড়িয়া উঠিতে পাইয়াছিল, তাহাকে এমন অসময়ে এতবড় অনাবৃত প্রকাশ্যতার মাঝখানে টানিয়া আনিবে, সে চক্ষের পলকে শুকাইয়া যাইতে পারে! এমন শত বিরুদ্ধ শক্তি সঙ্গাগ হইয়া এতদূরে মুহূর্তের মধ্যে চালিয়া মারিতে পারে! মানুষ এমনই অন্ধ!

দুর্গা একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া মেয়ের ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে জ্ঞানদা, দাও কোন চিঠিপত্র দিয়ে গেছে কি?

মেয়ে কুণ্ঠিত্বরে কহিল, না ম'।

আজ দুই মাস হইতে উপরূপরি তিনখানি পাত্রের জবাব আসিতেও ছে না। দুর্গা সংশয়স্বক্ক কণ্ঠে কহিলেন, তুই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলি। হোর সড়া না পেয়ে দাও হয়ত ফিরে গেছে। আমি বাড়িতে নেই—একদিন একটুখানি কি জেগে থাকতে পারিস নে বাজা? বলিয়া দুর্গা মুখ ভাব করিয়া চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদা চুপ করিয়া রহিল। সে ঘুমায় নাই, জাগিয়াছিল বলিয়া তর্ক করিল না। মায়ের কাছে প্রত্যহ একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে দিতে সে নিজের লজ্জায় নিজেই মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল।—দুর্গা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিলেন, কেন দাও যে আমাকে বললে, সে খুঁজে এনে দিয়ে যাবে? আজ কেমন করিয়া যেন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, অতুলের চিঠিপত্র আসিয়াছেই।

মেয়ে কথা কহিল না—একটা মলিন কাথার মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাড়িয়া রহিল। কিন্তু দুর্গা

এইখানেই খামিতে পারিলেন না। তিনি প্রাত্যহিক শোস্টিফিসে পাঠাইয়া খবর লইয়া জানিলেন, দাণ্ড আসে নাই।

পরের তিন-চার দিন তিনি পনের প্রত্যাশায় অহোরাত্র যেন কণ্টকশয্যায় বসিয়া কাটাইলেন—তথাপি কিছু আসিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া অতুলের জননীকে চিঠি লিখিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে জানাইলেন, অতুল ভাল আছে এবং কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পূর্ববৎ লেখাপড়া করিতেছে। তাঁহার চিঠির মধ্যে একটা ভাঙ্চিল্যের সুরই যেন দুর্গার মনে বাজিল। এমন করিয়া অস্থান গেল, লৌষ গেল, কিন্তু অতুলের চিঠি আসিল না। মাঘের মাঝামাঝি মেয়ে যদিবা একটু সাদিয়া উঠিল, মা অসুখে পড়িলেন। এতবড় নিবাশাব আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তা ছাড়া, বৈষ্ণব ব্রতী তাঁহার বিরুদ্ধে আর যেন অস্ত ছিল না। গ্রাহর উদ্বেগ করিতে হইলেই, ঘৃণাতরে কখনো বা 'পোড়া কাঠ' কখনো বা 'ত'ড়কা বলিতেন এবং যত দিন যাইতে লাগিল, ঘৃণা যেন অপরিসীম হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাব আরও একটা কারণ এই ছিল,—'পোড়া কাঠ' নিজের ধরনে জ্ঞানদাকে তাহাব স্বাভাবিক মামুষের জনাই বোধ করি ভালবাসিয়াছিল, যত্নও করিত। কিন্তু এই যত্নের মধ্যে একটা উৎকট স্বার্থের গন্ধ পাওয়া দুর্গা বিষের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন। বড় দুঃখের দেহ, তাই অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। মাঘের শেষে তিনি শয্যা আশ্রয় করিলেন। মেয়ে কান্দিয়া বসিল, আর না মা, এইবার বাড়ি চল। মা হাবদ সেইখানেই হোক।

দুর্গা রাঙা হইলেন। তাঁহার সম্মতিতে এখন আর কোন বিশেষ কোন কারণ ছিল না। শুধু এই 'পোড়া কাঠ' যত্ন ও 'আই'য়তা হইতে বঞ্চিত হইবার জনাই মনে যেন তাঁহার অন্তরত পালাই পালতি করিতে লাগিল।

মাঘের উদ্দেশ্য হইতেছে শুনিয়া শম্ভু বাকিয়া বসিলেন। তখন সকাল সাতটা-অটটা, শম্ভু সফা-আঁঠির সারিয়া বসিয়া শব্দে বহির্বে আসিয়া ডাকিলেন, দুর্গা!

দুর্গা দাওয়াব একমুহুরে খুঁটি তৈস দিয়া মুখ দূরিতেছিলেন। জ্ঞানদা কাছে বসিয়া সহবাস করিতেছিল। দাদার আহ্বানে দুর্গা সাড়া দিলেন।

শম্ভু কহিলেন, এখন ও তোমার যাওয়া হতে পারে না।

কেন দাদা?

কেন দাদা? আমি কি তোমার গুনো কথা দিয়ে মিথ্যাবাদী হব নাকি? সে জন্ম আমার নয়। কথাটা না জানিয়াও দুর্গার বুকের ভিতর হোলপাড় করিতে লাগিল। মৃদুস্বপ্ন জিহ্বা কবিলেন, কিসের কথা, দাদা?—শম্ভু কহিলেন, গেনির বিয়ের। আর ত আমি রাখতে পারিনে।—বাজেই আমদের নব্বোনের সঙ্গেই সামনের পাচুই ফাওনে কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে হ'ল। এদিকে গয়না-গাটিও মন্দ দেবে না বলছে। দেখতে শুনেতে সবদিকেই ভাল হবে, দেখলাম কিনা।

খবর শুনিয়া দুর্গার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাদ-কাদ হইয়া কহিলেন, আমাকে না বলে কেন কথা দিলে, দাদা? এ বিয়ে ত আমি শ্রাণ থাকতে দিতে পারব না।

শম্ভু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, পারব না বললেই হবে? আমি মামা—আমি যা বলব, তাই হবে। হোর জনো কথার নড়চড় করব, তেমন বাপে আমাকে জন্ম দেয়নি—তা জানিস?

এইবার দুর্গা সত্যি সত্যিই কঁদিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, না দাদা, মেয়ের বিয়ে এখনে আমি মরে গেলেও দেব না—আমার জনো তুমি এতটুকু ভেব না দাদা—কণ্ঠ কথটা তিনি শেষ করিতেই পারিলেন না।

শম্ভু এই কান্না দেখিয়া মহাবিরক্ত হইয়া দাঁত খিচাই কহিলেন, শুভকর্মে মিছে কাদিস নে জানানভান করে। যা হবার নয়, তা পারব না—

রক্তহলে 'পোড়া কাঠ' দেখা দিলেন। দুই হাতে গোবর-মাথা-বোধ করি, তখনো গোয়ালখরের ব্যবস্থাই করিতেছিলেন। উঠানের উপর আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ ভাঙ্গা-কাঁদির মত খাচাখান করিয়া বাকিয়া উঠিলেন—বলি সুপান্তরটি কে গা ঠাকুর? একবার শুনেতে পাইনে?

শম্ভু স্থির ভাবগতিক দেখিয়া নিচলতি হইলেন। কিন্তু মুখের সাহস বহুয় রাখিয়া কহিলেন, যেই

হো, তোর তাতে কি?

'পোড়া কাঠ' গোবর-মাথা হাত দু'খানা নাড়া দিয়া অর্ধেক উঠানটা যেন নাচিয়া আসিল। তেমনি সুমধুর-কণ্ঠে সমস্ত পাড়াটা সচকিত করিয়া কহিল, মামা! মামা! ফলাতে এসেছেন! নবীনের সঙ্গে নিয়ে দেব! তা হলে একশ' টাকা সুদে-আসলে শোধ যায়, না? তাই সে সুপাত্তর? বটে! আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে? তাড়ি-গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাস পেটের ওপর লাথি মেরে, মেরে ফেললে কিনা,—তাই অমন সুপাত্তর আর নেই? গলায় দেবার দড়ি জোটে না তোমার? হিক! হিক!

শব্দ ভগিনী ভাগিনেয়ীর সমক্ষে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পায়ের খড়ম হাতে লইয়া চীৎকার করিলেন, দূপ কর! বলচি, হারামজাদী!

'পোড়া কাঠ' এইবার ফেঁপিয়া উঠিল। সে এমন একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গী করিয়া টেঁচাইতে লাগিল যে, সে বস্তু চোখে না দেখিলে শুধু লেখা পড়িয়া বোঝা যায় না, কহিল, অ্যা আমাকে হারামজাদী? ফের মুখে আনলে পোড়া কাঠ যদি না মুখে গুঁজে দি ত, পাঁচ ঘোষালের মেয়ে নই আমি। ভোর করে বিয়ে দেবে? কেন, কে তুমি? ও এসেছে মেয়ে নিয়ে দু'দিন জুড়োতে, কেন তুমি ওকে বাতর্জন ভয় দেখাবে? আশ-বটিটা আমার দেখে রেখো। শালা-ভগ্নীপোতের একসঙ্গে নাক কান কেটে তরে ছাড়বে। আমার নাম ভামিনী, তা মনে রেখো।

সে মূর্তির সামনে শব্দ আর কথা কহিলেন না—ঘরে চলিয়া গেলেন।

'পোড়া কাঠ' তখন দুর্গার পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, ও কি সোজা চামা, ঠাকুরঝি! তোমার আসা পর্যন্ত মতলব আঁটছে,—কি কবে অমন সোনার প্রতিমা বীন্দ্রের হাতে দিয়ে দাব শোধ করবে ক্ষমি খালাস করে নেবে। আবার বলে—মামা আমি!

একটুখানি দম লইয়া কহিতে লাগিল, বললে তুমি মনে কষ্ট করবে, আমি বলতাম না, ঠাকুরঝি, বললাম, মেয়েটা জুরে মরে যায়, একটা ভাল ডাক্তার আনো। বললে, অত পয়স! নেই আমার! সম্বলের মধ্যে সম্বল, একগাছি রূপার গোট ছিল আমার, তাই দীর্ঘা দিয়ে আমি ডাক্তার ভেঁকে আনলাম—আর ও বলে কিনা যা খুশি করব—আমি মামা! মুখপোড়া। আমি বেঁচে থাকতে ভয় কি ঠাকুরঝি! আমি আজই বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি গিয়ে মেয়ের বিয়ে দাও তে। দিবে সম্বল খুশি আবার এসো।

দুর্গা খুঁটি হেসে দিয়া তেমনি বসিয়া বহিলেন—ঠাঠার দুই চক্ষু দিয়া কেবল কনকর কাঁপিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

'পোড়া কাঠ' কষ্টের কিঞ্চিত খাটো করিয়া অদৃশ্য স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, অন্যথ বলে ওর ওপর জুলুম করবে কেন, মাথার ওপর ভগবান নেই কি? আমি বলি, যা তোমার আছে, তাই নিয়ে নাড়ো-চাড়ো খাও-দাও। পরের নিয়ে নিজের পেট মোটা করব কি জন্যে? ভগবান কখনো তার ভাল করেন না।

সেই দিনেই দুপুরবেলা যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল।

পরর গাড়িতে উঠিতে গিয়া দুর্গা 'পোড়া কাঠ'র দু'পায়ের উপর মাথা পাতিয়া আঙ সত্য সত্যই তাহা অক্ষুণ্ণে ভিজাইয়া ফেলিলেন। কহিলেন, বৌ, বড় ভাজ তুমি, তোমাকে ত আশীর্বাদ করতে পারিনে—কিন্তু ভগবান তোমাকে যেন দেখেন। আমার জন্যে তুমি তোমার গোটছড়াটি পর্যন্ত নষ্ট করে ফেললে।

'পোড়া কাঠ' আদাস্ত মাড়ী বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল, ছাই গোটছড়া! এই বল ঠাকুরঝি, হাতে নোয়া নিয়ে স্বামী-পুত্রের, গো-ব্রাহ্মণের সেবা করে যেন যেতে পারি। নাও, বোণা শরীরে আর দাঁড়িয়ে থেকো না—গাড়িতে উঠে বসো। গেনি, মামা-মামীর ঘরে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছি মা? কিন্তু আবার আসি—ভুলিস নে যেন। বলিয়া তাহার হাতের মধ্যে জোর করিয়া দুটি টাকা গুজিয়া দিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিলে দুর্গা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, না বুকে অনেক অপবাহ তোমার চরণে কের গোলাম বৌ, সে-সব আমার মাপ করো।

• 'পোড়া কাঠ' আজ আর সমস্ত মাড়ী বিকশিত করিয়া হাসিল না, বরং চট করিয়া একফোটা চোখের জল মুছিয়া লইয়া কহিল, পোড়া কপাল! অপরাধ ত সব আমাদেরই হ'ল ঠাকুরঝি! ওলো, ও গেনি, মামা-মামীর ওপর রাগ টাগ করিস নে যেন। আসচে বছর আম-কাঠালের দিনে তোরে নেমস্তম্ভ রইল—জামাইকে সঙ্গে করে একবার আসিস মা। বলিয়া হাতের লিঠ দিয়া আর দু'ফোটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

ছয়

সংবাদ দিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই দুর্গা চিঠি না লিখিয়াই আসিয়াছিলেন। জ্ঞানদার চেহারা দেখিয়া জ্যাঠাইমা হাসিয়া খুন—ওলো ও গেনি, লাগদুটো তোরে চড়িয়ে ভেজে দিলে কে লো? ও মা, কি ঘেন্না! মাথায় টাক পড়ল কি করে লো? ও ছোটবৌ, লিগলিগর আয়, লিগলিগর আয়—আমাদের জ্ঞানদাসুন্দরীকে একলা দেখে যা। গায়ের ছামড়াটাও কি তোরে মামা-মামীরা ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়েছে নাকি লো? জ্ঞানদা নিরুন্তরে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বঠল। ছোটখুড়ী আসিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রশ্ন করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

ছোটবৌ লিভবিয়া উঠিল—ইস, ও কি হয়ে গেছিস মা?

জ্যাঠাইমা নিতান্ত অত্যাড়ি করিলেন না; কহিলেন, বাঁশবনের পেট্টী! অন্ধকারে দেখলে আঁকে উঠতে হয়। বলিয়া ঝপ্পন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আজ কিন্তু ছোটবৌ তাহাতে যোগ দিল না। সে আর যাই হউক, সন্তানের জননী ত? মেয়েটির এই কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মায়ের প্রাণ যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল।

কাছে বসিয়া, তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, একটি একটি করিয়া রোগের কথা শুনিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কেন তবে তখুনি চলে এলিনে মা? আমি ত এন্দের আসতে মানা করিনি। মেজদি কোথায়?

মার গাড়িতে জ্বর এসেছিল,—ঘরে শুইয়ে দিয়েছি।

স্বর্ণ কহিলেন, হবে না? আমি হাজার হই বড়জা ত! অত তেজ করে চলে গেলে কি সয়?

ছোটবৌ জ্ঞানদার হাত ধরিয়া তাহার মাকে দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড়জায়ের এই নিতান্ত গায়ে পড়া কটু কথাগুলো আজ তাহার এতই বিস্তী লাগিল যে, সে সহিতে পারিল না; কহিল, দিদি, বছর-দুই মধু-সংক্রান্তির ব্রত করো—আর-জন্মে মুখখানা যদি একটু ভাল হয়। স্বর্ণ এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে ক্রোধে বিষয়ে হঠাৎ অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরস্বরে গর্জিয়া উঠিলেন, তবু ভাল লো ছোটবৌ, তবু ভাল। এতকাল পরেও যা হোক মেজস্বাকে দেখে শোকটা উৎলে উঠে। মাইরি, কত চণ্ডই তুই জানিস।

ছোটবৌ জবাব দিল না। জ্ঞানদার হাত ধরিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু সে যাওযা জ্ঞানদার পক্ষে একেবারে মারাত্মক হইয়া উঠিল। কারণ তাহার ও তাহার মাতার বিরুদ্ধে স্বর্ণমঞ্জরীর এমনই ত বিদ্বেষের অবধি ছিল না; কিন্তু ছোটবৌয়ের ব্যবহারে আজিকার বিষেষ তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গেল।

হরিপালে থাকিতে দুর্গা জ্বর আসিলে শুইয়া পড়িতেন, ছাড়িলে উঠিয়া স্নান-কবিতেন। সাধো কুলাইলে স্নান-আফিক করিয়া একবেলা একমুঠা ভাতও খাইতেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আর একপ্রকার ঘটিল। পাড়ার মেয়েরা অহোরাত্র সহানুভূতি করিয়া দু-পাঁচদিনেই তাহাকে একেবারে শয্যাশায়িনী করিয়া দিল। মালকণ্ঠ মুখমোমশায়ের পরিবার মেজবৌকে দেখিতে আসিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলে। চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, এ কি করেচিস মেজবৌ, মেয়ের বিয়ে দিবি কেন? ওর পানে যে স্নান চাইতে পারা যায় না।

দুঃ! শ্রান্ত চোখ দুটি নিম্নীলিত করিয়া স্তম্ভিত কহিলেন, কি জানি পিসীমা, কবে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।

তা ত জানি মা। কিন্তু চেঁচা : তে হবে ত? ভগবান ত আব বর জুটিয়ে এনে দিয়ে যাবেন না!

দুর্গা আর জবাব দিলেন না।

একমিনিট প্রতীক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, বলি বাপেব বাড়ি গেলি, ভাই কিছু যোগাড় করে দিলে না? দেখে কি বলে?

ভগবান জানেন। বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিয়া গুইলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরেই আদরিণী বেড়াইতে আসিয়া চৌকাঠেব বাহিবে দাঁড়াইয়াই উঁকি মানিয়া কহিল, বলি এ-বেলাটায় কেমন আছ মেজবোঁ?

জ্ঞানদা শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া মায়েব পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; কহিল, জ্বর এখনো ছাড়েনি পিসীমা। দুর্গা মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, বাঁসো ঠাকুরাণি।

না বৌ, বেলা গেল, আর কসবো না। তা বলি কি মেজবোঁ, যাকে হোক ঘরে উচ্ছুতা করে দাও, আর খুঁতখুঁত ক'ণে না। বলতে নেই,—তখন তবুও মেয়েটার যা হোক একটা ছিদি ছিল, কিন্তু মালেরিয়া জ্বরে একেবারে যেন পোড়া কাঠটি হয়ে গেছে। হ্যাঁ না গেনি, সুমুখেব চুলগুলো বুঝ উঠে গেল?

জ্ঞানদা ঘাড় নাড়িয়া নীরবে নতমুখে বসিয়া বহিল। আদরিণী কষ্টম্বব মৃদু কবিতা কহিল, কল্যাণ নাকি ও-পাড়ার গোপাল ভট্টাচার্য্যি আবার বিয়ে করবে। একবার অন্যমনসকে পারিতো খবরটা কেন নিলে না মেজবোঁ?

আচ্ছা, বলব, বলিয়া দুর্গা নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কেমালের দিকে মুখ ফিরাইয়া গুইলেন।

এমনি করিয়া কত লোক যে কত হিংস্রোপদেশ দিয়া গেল, তাহার সম্বন্ধা বহিল না। কিন্তু যাহাঙ্গণে পথ চাহিয়া দুর্গা অনুক্ষণ কোন বাড়ী কবিতা বহিলেন, তাহার কথা দিল না। না অসিল অতুল না আসিল তাহার মা।

ছেউবোঁয়ের দেহে দয়ামায়া ছিল; কিন্তু সে ভাবী এমন, তাহাতে অশ্রুসেতু সূত্রের ধরা জ্ঞানদাকে ডাকিয়া যখন বলিলেন, বাছা, বেশ বলে ও আর চিবকল চলে না, তোমার মা যেন দরলুম পারে না, কিন্তু তুমি বাপু সোমত মেয়ে—সকালে কোকোব ভাত দুটি কি আর খেঁদে দিতে পার না? ঘরের ভিতর হইতে ছেউবোঁ কণ্ঠা; অনায়া বুঝিয়াও চুপ করিয়া বহিল। পরের দুঃখে সে বাধ্য অনুভব করিত; কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে পরিশ্রম দিয়া সে দুঃখ দূর করে তাহার পক্ষে অসম্ভব।

জ্ঞানদা তৎকলাৎ রাজী হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, অমিষ্ট দেব জ্যাঠাইমা।

যদিচ, এখনও প্রতিরাহেই তাহার জ্বর হইত, কিন্তু মাতার যত্নের কাউন্সিলের ভিত্তি এ কথা নিঃপ্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। যৌপর! নিজীব দেহটাকে সে সকলো কিছনে তইতে যেন উপন্যাস তুলিতেই পারিত না; তথাপি একবার ইতস্ততঃ করিল না। একটিকার মুখভাব করিল না।

দুঃখী পিতা-মাতার কন্যা হইলেও সে একমাত্র সন্তান, তাহাদের বড় আদরে যত্ন লভিলে পালিত হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই গুরুভানের আচ্ছা—নাথ্য-অনায়া যটি হউক, নির্ভীকতা মাথা পাতিয়া লইতে, সেবা করিতে, মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে, সংসারে বোম কনি আর তাহার ভূমি ছিল না। কিন্তু আজ সে যে কত বড় গুরুভার মাথায় করিয়া বহিল, তাহা আর কেহ না বুঝুক, ছেউবোঁ বুঝিল। সুতরাং বড়ভায়ের এই অত্যন্ত অনায়া আদেশে তাহাও অশ্রুত তুলিতে লাগিল, তথাপি মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহস হইল না। পাছে, বলিতে গেলেই পালার শত্রুও তাহাতে ভোরে উঠিয়া রীখিতে হয়।

পরদিন যথাসময়ে ক শাকে স্নানঘরে যাউতে দেখিয়া, জ্ঞানদা ভাতের থালটি, তাতে কবিতা দিতে যাইতেছিল,—কোথা হইতে জ্যাঠাইমা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কোথা যাস না? গেনি?—জ্ঞানদা থমমত বাইয়া বলিল, কাকা স্নান করে এলেন যে।

তাতে তোর কি? বলিয়া জ্যাঠাইমা চেঁচিয়া উঠিলেন। মানা করে লিয়েচি না ভাত বেড়ে নিয়ে যেতে? তোর হাতে পুরুষমানুষ খেতে পারে লা?

দুর্গা সেইমাত্র উঠিয়া ঘরের সুমুখে বসিয়াছিলেন—চেঁচামেচি শুনিয়া সভয়ে চাফিয়া বহিলেন ছেউবোঁ ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে দিদি?

মুখ কাঠারো প্রতি প্রক্ষেপ না করিয়া, সেই নির্বাক নিম্পন্দ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—তাতে করে থালা নিয়ে গেলে কাকা খুশী হয়। তোমাকে মাথায় করে নিয়ে নাচবে—রাজপুত্রের এমন বিয়ে দেবে, না? এই বয়সে কি মন যোগাতেই শিখেচিস মাইরি! বলিয়া থালাটা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

দুর্গা সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন; মেয়েকে উদ্দেশ্য করিয়া কাদিয়া কহিলেন, পোড়ারমুখী, গুরুজনের কথা শুনিব নৈ যদি, তাহা মরণ হয় না কেন!

জ্ঞানদা নীরবে রামাখরে চলিয়া গেল। একবার বলিল না, এ বিষয়ে এতাকে কেহই নিষেধ করিয়া দেয় নাই। মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিতে সে বোধ করি জানিতই না।

প্রতিবাদ যে করিতে পারিত, সে ছোটকৈ। কিন্তু সে বড়জাকে চিনিত বলিয়া কথা কহিল না। বড়জা যেমন মুখরা, তেমন আত্মমর্দাদজ্ঞানশূন্য। মুখের উপর তাহার সহস্র দোষ দেখাইয়া দিলেও লজ্জা পাইবে না; বরঞ্চ অধিকতর নিষ্ঠুর হইয়া যন্ত্রণা দিবে জানিয়াই, ছোটকৈ নীরবে জ্ঞানদার অনুসরণ করিয়া রামাখরে আসিয়া সম্মুখে সম্মুখে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল, দিদির কথাটা কেন শুনিস নি মা?

এতক্ষণের এত কঠোর লাঞ্ছন 'সে' সহিয়াছিল, কিন্তু সেই স্নেহের অনুযোগ সহিতে পারিল না। একদিনের মাত্র চোখ তুলিয়া ছোটখুড়ী মুখের পানে চাহিয়াই সে তাহাব পদতলে ভাসিয়া পড়িল—আমাকে কেউ নির্যাস করে দেখনি খুঁটামা, বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিয়া ফেলিল।

ছোটখুড়ী কাছে বসিয়া তাহা চোখ মুছাইয়া দিল, কিন্তু কি বলিয়া যে এই চোখেটাকে সাহস দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।—এমনি করিয়া এই জীবিতা হতভাগা অনুভূত কন্যার দিন কাটিতে লাগিল। ঘরে-বাইরে আত্মীয়-পদ সবাই মিলিয়া অনাক্ষণ কেবল লাঞ্ছনা দিতেই লাগিল। কিন্তু পরিতাপ করিবার কেহ চেষ্টামাত্রও করিল না।

সাত

আজকাল দরিদ্রা না তুলিলে দুর্গা প্রায় উঠিতেই পারিতেন না। মেয়ে ছাড়া তাহার কোন উপায়ই ছিল না। তাই সহস্র কন্মের মধ্যেও জ্ঞানদা যখন-তখন ঘরে ঢুকিয়া মায়ের কাছে বসিত। আজিকার সকালেও একটুখানি ফাক পাইয়া, কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে মায়ের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সহসা একটা অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠস্বরে তাহার বুকের ভিতর 'ক' করিয়া উঠিল।

দোলের দিন। ছুটির বন্ধে অতুল বাড়ি আসিয়াছিল। দুই-তিনজন পাড়ার সঙ্গী, ইয়া রঙ মাখিয়া পকেট ভরিয়া আতীর লইয়া 'সে' 'মাসীমা' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া বাড়ি ঢুকিল।

দুর্গা তন্ময় জাগরণে সারাদিন একপ্রকার আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিতেন। পাছে বচস্বরের কানে গেলে মা সজাগ হইয়া উঠেন, এই ভয়ে জ্ঞানদা ব্রত হইয়া উঠিল। নতুন মনে ইনি যে এই লোকটিরই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তাহা সে জানিত। অথচ, তাহার সেই স্বাভাবিক মৈত্রী, গাভীর, আত্মবিশ্বাস আর যেন ছিল না। বুদ্ধি-বিবেচনাও কেমন যেন দ্রুত বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার যে ভয়ানক কলহের ছাড়া দেখিলেও শঙ্কিত হইতেন, তিনি আজকাল ইহাতেও যেন বিশ্বাস নন—সে লক্ষ্য করিয়া দোঁহাতেছিল। সূত্রায়, উভয়ের দেহা হইলেই একটা অত্যন্ত অশোভন কলহ যে অনিবার্য, একথা তাহার অন্তর্যামী আজ বলিয়া দিলেন। কি করিলে যে এই বিপদ এড়াইবে, তাহা যায়, ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পা-টিপিয়া উঠিয়া সে কপাট রুদ্ধ করিতেছিল; মা বলিলেন, জ্ঞানদা, ও অতুল কথা কইলে না?

জ্ঞানদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি জানি মা, তিনি ন'ন বোধ হয়।

ঠা. সেই বৈ কি! উঠে একবার দেখ দিকি।

তর্ক করিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন—তাহা সে জানিত; তাই ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া ডাকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখা গেল না। শুধু বারান্দার ওধারে অনেকের মধ্যে তাহারও কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল। এইটুকু শুনিয়াই সে ফিরিতে পারিত; কিন্তু অন্তরাল হইতে একবার তাহার

মুখখানি দেখিয়া লইবার লোভ তাহাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া গেল।

সে নিঃশব্দে আগাইয়া আসিয়া একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল, তিনি বড়মাসীর পায়ের উপর মুঠা করিয়া আঁবীর দিয়া হাসিতেছেন। পাড়ার ছেলেরাও দেখাদেখি তাহাই করিতেছে।

ছোটবৌ ছিল না। একটা বাথার মত হওয়াতে আঙ্গ সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। ফিরিবে কিরিয়ে করিয়াও নিজের অজ্ঞাতসারে বোধ করি জ্ঞানদার একটু বিলম্ব ঘটয়াছিল, অকস্মাৎ বজ্রাহতপ্রায় হইয়া দেখিল, সে যে ভয় করিয়াছিল ঠিক তাই,— মা হেলিয়া-দুলিয়া সেইদিকে চলিয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, যেয়ো না মা, ফেরো।

দুর্গা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কেন?

কেন, জানিনে মা, তুমি ফেরো। তার ত কোন আশাই নেই মা—

আমাকে ছাড় হতভাগী—ছেড়ে দে! বলিয়া অমানুষিক বলে দুর্গা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। জ্ঞানদা কলের পুতুলের মত তাহাকে অনুসরণ করিয়া পিছনে গিয়া দাঁড়াইল সবাই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল—মেজবৌ।

তাহার সেই কঙ্কালসাব মুখমণ্ডলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টি ছিল। সে দুটা জ্বলন্ত চক্ষুর পানে চাহিয়া অতুল সভয়ে দৃষ্টি অবনত করিল।

দুর্গা বলিলেন, অতুল, আমরা তোমার কি করেছিলাম যে, এমন করে আমাদের সর্বনাশ করিলে? অতুল জবাব দিবে কি, অপরাধের ভারে ঘাড় তুলিতেই পারিল না।

সেই কক্ষটা করিলেন স্বর্ণ। হৃদয় বলিয়া তাহার ত কোন গলাই ছিল না। তাই যদি সহ্যেই মুখ তুলিয়া কহিলেন, কেন, কি সর্বনাশ করেছে ওনি?

দুর্গা বলিলেন, তোমাকে তার কি জবাব দেব, যদি? যাকে বলচি সেই জানে সে কি করেছে স্বর্ণ কহিলেন, আমরাও ঘাস খাইনে মেজবৌ, কিন্তু, ও কি তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে লেখাপড়া করে দিয়েছিল যে, এত লোকের মাঝখানে তেড়ে এসেচ? যাও, ঘরে যাও—পাল পাঠে আমোদ-অনুদের দিনে আমার বাড়িতে বসে অনাচ্ছিন্তি কাণ্ড করলে না?

অনাচ্ছিন্তি কাণ্ড আমি করতে আসিনি দিদি। বলিয়া অতুলের পানে চাহিয়া বলিলেন, যে করে আমাদের এই একটা বছর কেটেছে অতুল, সে তুমি জান না—কিন্তু ভগবান জানেন। কিন্তু, এই যদি তোমার মনে ছিল, কেন তাঁর মরণকালে আশা দিয়েছিল? কেন তুমি তর্কান জানালে না?

স্বর্ণ কথিয়া উঠিয়া কহিলেন, বাছাকে তুমি ভগবান দেখিয়ে না বলচি, মেজবৌ! ভাল হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে কথা দেবার কর্তা ও নয়।

এত লোকের সমক্ষে অতুল নিজেকে অপমানিত বোধ করিতেছিল, মাসীর জোর পাইয়া কহিল, আমি কি নিজে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছিলাম? আমার পা ছাড়ে না—পায়ের উপর পড়ে মাথা বুঁড়তে লাগল—বাবাকে নিজের মুখের কথা দাও। করি কি? এত লোকের সামনে আমি লজ্জায় বাঁচিনে—তাই পা ছাড়াবাব জনো যদি একটা কৌশল করে থাকি, তাকে কি কথা দেওয়া বলে?

স্বর্ণ খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিলেন, ওমা, কি ঘোমার কথা অতুল,—তুই বলিস কি রে? বুঁড় নিজে পায়ের ধরে বলে—আমার বিয়ে কর? বাঁ?

অতুল কহিল, সত্যি কি না, ঠিকই জিজ্ঞাসা কর না? মেজমাসীমা নিজেই বলুন না, আমার পায়ের উপর মাথা বুঁড়তে দেখেছিলেন কিনা। নইলে ঐ মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাব? আমার কি মরবার দড়ি-কলসী জোটে না?—অতুলের সঙ্গীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। দুর্গা উদ্ভাসের মত ঠাঁচিয়া উঠিলেন, ওরে নিষ্ঠুর! ওরে কৃতঘ্ন! দড়ি-কলসী আমি কিনে দেব রে, তুই মর গে! হোগ মরার উচিত। যে মেয়েকে তুই এত লোকের সম্মুখে এতবড় অপমান করলি, সেই মেয়েই যে তোকে বস্ত্রে মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল রে! সব ভুলে গেলি?

স্বর্ণের ওনিয়া ছোটবৌ বাথা তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, স্বর্ণ লাফাটিয়া উঠিয়াছে—তবে পো হতভাগী! বেরো আমার বাড়ি থেকে—বেবো বলচি।

জ্ঞানদা দাঁড়িয়া ছিল। কিন্তু সে অচেন পাতর হইয়া গিয়াছিল। লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান, অপমান, ভালমন্দ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিবেছিল না। এ সমস্তরই যেন সে একান্ত অতীত হইয়াই নীরবে ব্যালম্যাল করিয়া চাতিয়া দাঁড়িয়াছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব মূর্তির প্রতি চাহিয়া ছোটবৌ সত্যে একটা ঠোকা দিয়া ডাকিল, —জ্ঞানদা! সে ঘরের ভিতর হইতেই কলহের কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল।

জ্ঞানদা জ্ঞানব দিল, কোন খুড়ীমা!

আব কোন দাঁড়িয়ে মা, তোর মাকে ঘরে নিয়ে যা।

মা! চল, বলিয়া মায়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ঘরে লইয়া গেল।

স্বর্ণ কাঁটলেন, দেখলি ছোটবৌ, আস্পর্ধা! একেই বলে, বামন হয়ে চলে হাত।

অতুল হাসিবাব মত করিয়া দাঁত বাহির করিয়া কহিল, শুনলেন ছোটমাসীমা কাণ্ডটা? কি ভয়ানক গল্পটা!

স্বর্ণ খনখন করিয়া বলিলেন, একফোঁটা মেয়ে, —এ কি ঘোর কলি! ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া কহিল, —ঘোর কলি বলেই বাঁচিয়াছি। নইলে আর কোন কাল হলে, মা বসুন্ধরা এতক্ষণ লজ্জায় দুঃখের হয়ে যেতেন অতুল। বলিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

স্বর্ণ বিদ্রোহের তাৎপর্য না বুঝিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, সেই কথাই ত বলচি ছোটবৌ!

কিন্তু অতুলের মত কালো হইয়া উঠিল। ছোটবৌয়ের কথার তাৎপর্য স্বর্ণ না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল। তই স্বানিকঙ্কণ শুক হইয়া বাসিয়া থাকিয়া সে উঠিয়া গেল, তখন মনে হইল, এই ছোলির দিনে কে যেন তাহার জন্মায় কাপড়ে লাগি রঙ এবং মুখে গাঢ় কালি লেপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

আসল কথাটি এতদিন অপ্রকাশ ছিল বাটে, কিন্তু আর রহিল না। পাড়ার হিতকাজক্ষীদের কথায় অচিরেই দুঃখের কারণে গেল। এই প্রতিবেদিত অতুল আবদ্ধ হইয়াছে। ঘটকালি স্বর্ণ করিয়াছেন এবং মেয়ে দেখিয়া অতুলের ভাবী পছন্দ হইয়াছে।

আট

মাধুরী শিশুকাল হইতেই কলিকাতার মামার বাড়ি থাকে। মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত শিখিয়াছে। গাছিতে, বাজাইতে, কাপেট বুনিতে ও জানে; আবার শিব গড়িতে, স্তোত্র আওড়াইতেও পারে। দেখিতেও অতিশয় সুস্ট্রী। এইবার পূর্ণ বয়সে আসে। জনা বাতী আসিয়াছিল। সেই সময়েই কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। অতুলের মত দুর্ভাগ্য পাঠ্য করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় নাই, পাঠ আপনাই ধবা দিয়াছে। অবশ্য স্বর্ণ মাঝখানে ছিলেন।

ছোটবৌয়ের ভাইয়েরা অবস্থাপন্ন। মা বাঁচিয়া আছেন, আসন্ন-প্রসবা মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাঁহাবর জন্য লোক পাঠাইলেন, সঙ্গে মাধুরীও আসিল। মেজজ্যাঠাইকে সে অনেকদিন দেখে নাই, আসিয়াই প্রণাম করিতে আসিল।

মাধুরী হও মা! বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া দুগা নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। একে সে সুন্দরী, এতহাতে মামা সাজাইয়া-গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। মামী কলিকাতায় মেয়ে—কমন করিয়া সাজাইয়া দিতে হয় জানে। গায়ে গুটি বালক বাছা বাছা স্বর্ণলঙ্কার; পরনে কোচানো চণ্ডী লালপেড়ে পাড়ি; পিঠের উপর চুল এলো করা; কপালে টিপ। চাহিয়া চাহিয়া দুর্গার পাতা আর পড়ে না। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—আহা! মেয়ে ত নন্দ—স্বর্ণ-প্রতিমা। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পদতলে উপবিষ্টা নিজের ঐ ম. ন. শ্রীহীন মেয়েটার পানে চাহিয়া তাহার দুঃখ সহসা যেন জ্বলিয়া গেল। —পাশ ফিরিয়া কক্ষের কহিলেন, আর আমি মেয়ে গেটে গরুচি যেন কাল্পাচা!

মাধুরী ঘরে ঢুকিবামাত্রই তাহার রূপ এবং সাজসজ্জার পানে চাহিয়া জ্ঞানদা নিজেই ত হীনতার সঙ্কেতে মাটি। সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। মাধুরী কহিল, দিদি, চল না, একটু গল্প করি গে।

প্রভাতের জ্ঞানদা অবাক স্বরে কহিল, বোঝা গেল না। কিন্তু সেই শব্দটা মাত্র শুনিতে পাইয়াই দুর্গা ভিত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ও পোড়ামুখ লোকের সামনে আর বার করিস নে গিনি—বসে থাক।

জ্ঞানদা নীরবে বসিয়া রহিল।

মাধুরী চলিয়া গেলে, দুর্গা বোধ করি নিতান্তই মনের জ্বালায় বার-দুই আঃ উঃ করিলেন। জ্ঞানদা আস্তে আস্তে কহিল, কপালটা একটু টিপে দেব মা?

না।

ওষুধটা একবার—

ওলা, না, না, না। যা, আমার বিজ্ঞান থেকে উঠে যা, হাবামজাদী! তোর মুখ দেখলেও আমার সর্বাস্থ যেন জ্বলেপুড়ে যায়। বলিয়া পা দিয়া তিনি মেয়েকে সঙ্গেজেরে চৌলিয়া দিলেন।

জ্ঞানদা অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু লাথিটা সহ্য করিতে পারিল না। নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে মেঝের উপর উপড় হইয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দু'চক্ষের জলে মাটি ভিজিয়া গেল। দু'হাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,— ভগবান! আমি কার কাছে কি দোষ করিয়াছে যে সকলেরই চক্ষুশূল। আমার রূপ নাই, বসন-ভূষণ নাই, আমার বাপ নাই, সে কি আমার দোষ? আমার রোগগ্রস্ত এই কঙ্কালসার দেহ, এই জীর্ণ পাতুব মুখ যে একজনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে কি আমার ভ্রুটি? আমার বিবাহ দিতে কেহ নাই, তবুও আমার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে—সেও কি আমার অপরাধ? প্রভু! এতই যদি আমার দোষ, তবে আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও—তিনি আমাকে কখনও ফেলিতে পারিবেন না।

জ্ঞানদা! বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিলেন। মায়ের ডাকে সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। রোগা শরীর, ভিজ্র মাটির ওপর কেন মাংস বলিয়া দুর্গা উৎকণ্ঠায় নিজেই উঠিয়া বসিলেন। ওঃ, বকেচি বৃদ্ধি মা! বলিয়া চক্ষের পলকে দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আজ সন্ধ্যার পরে হঠাৎ অনাথ দুর্গামণির ঘরে ঢুকিয়া বিমর্ষমুখে কহিল, আজ কোনমতে মেজবোঁঠান? থাক থাক, আর উঠো না। তা—তা ওষুধপত্র কিছুই খেতে চাও না পুনর্নাম! এমন করলে ত আবাম হতে পারবে না।

কথটা সত্য। যদিচ ঔষধ যত্না দেওয়া হইতেছিল, তথা না দিলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু সেও তিনি একেবারে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহার বাঁচিবার আশঙ্ক ছিল না, উচ্চাও ছিল না। কল্পনাপ্রতিদিন গহুরে ঢুকিতেছিল—খুব কাছে না আসিলে আজকাল আর শুনিতেনই পাওয়া যায়ত না। দেবরের আকস্মিক আত্মীয়তায় দুর্গা কথায় বোঁঠান। বিধবা হয়ে আর বৈঠ লাভ কি,—কোন হিন্দুসন্তান এ কথার প্রতিবাদ করবে বল? তবে কিনা, আত্মহত্যাটা না করে কোনমতেই কটা দিন সংসারে থাকা! তোমার আবার যে-রকম দেহের অবস্থা, তাতে এসব কথা আমার না এলাই উচিত, কিন্তু না বললেও যে নয় কিনা, তাই বলি দি, নিজেও দেখতে পাচ্ছি—চেঁচাব আমি ক্রটি করছি নে, কিন্তু কি হতভাগা মেয়ে—কোনমতেই কি একটা গাঁথছে না। ছ-সাতটা সন্ধ্যা—সব কটাটা ভেসে গেল—মেয়ে দেবে আর কাকর পছন্দ হ'লো না।

দুর্গা কিছুই বলিলেন না। একটুখানি থামিয়া অনাথ পুনর্নাম কহিতে লাগিল, মেজদা মরে তুমি আবার আমার সংসারে এসেচ কিনা! গোল হচ্ছে ত তাই নিয়ো। নীলকণ্ঠ মুখ্য্যাকত ত চেনই—বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেশ ভালগোল পাকাচ্ছে—তোমার ছুতো করে আমাকে কি করে চোলেবে। আর, তাদের দোবই বা দিই কি করে, নিজেরাও ত মেয়েব বয়সটা স্পেতে পাচ্ছি। আবার 'তাও বর্গ, লহরে বাপু এত নেই—গোড়া পাড়াগায়েই আমাদের যত হাজামা, যত বিচার। বলিয়া জোর করিয়া একটা সীর্ষখাস ভ্যাগ করিল।

দেবর যে কিসের ভূমিকা করিতেছেন, কোনদিকে ইহার গতি—তাহা ধরিতে না পারিয়া দুর্গা তেমন নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু সীর্ণ মুখের উপর একটা অনিশ্চিত লজ্জার ছায়া পড়িল।

একবার কানিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনাথ এইবার আসল কথা প্রকাশ করিল; কহিল তোমার এ অবস্থায় সতিহি ত আর কোথাও যাওয়া-আসা চলে না—সে আমি বধানে; কিন্তু কি জান মেজবোঁঠান—নিজের মেয়েটাও ত বিবাহযোগ্য হ'ল,—ভাই আমি বলি কি জান,—সব দিক আমার

বাঁচিয়ে চলা তাই আদর্শক, — আমি বলি কি—গোঁদকে এ সময় আর কোথাও না পাঠালেই নয়। এ বাড়িতে আর ত তাকে রাখা যায় না। বড় ঠিক হচ্চে।

দুর্গার কীং কঠোর ওষ্ঠাধরের মধ্যেই যেন মিলিয়া গেল, কোথায় সে যাবে ঠাকুরপো? অনাথ কছিল, হরিপালেই যাক।

সেখানে কি করে যাবে? গিয়েই বা কি হবে ঠাকুরপো?

অনাথ এবার কষ্ট হটল, কঠিল, এ তোমার অন্যায়, মেজবোঁয়ান, কেবল নিজেবুটি দেখলেই চলে না, যাব সংসারে আচ্ছ! অসময়ে যে তোমাদের যাতে নিলে — তাব ভাল-মন্দও ত চেয়ে দেখা দিই।

দুর্গা জবাব দিতে পারিলেন না। শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। এ নিশ্বাসে এইটুকু কাজ হইল যে, অনাথ গলাটা একটু কোমল করিয়া কঠোরে লগিল, এ অবস্থায় তোমার একটা কষ্ট হবে বটে, তা বুঝতে পারিচি। কিন্তু উপায় কি? আর তোমার নিজের দেনও আছে, মেজবোঁয়ান। তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলাম— তিনিও খপটই লিখছেন। সেখানে বিয়ের সমস্ত যোগাড় হয়েছিল, তুমি শুধু একটা অসম্ভব আশ্বাস ভুলে, বাসাবারি করে মরে নিয়ে চলে এসে। তা না করলে তা আজ হচ্চেনে।

বড়লোক যে কি হট্ট! পারিচ, সেটা আর অন্য দুনিয়া বলিল না। কিন্তু দুর্গা বুলিলেন—তাহার দেন সে আজ জানদাকে বিদায় করিবার শ্রুতের লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিছুমাত্র ভাগ্য না পোহাইয়া, একটা পয়সা খরচ না করিয়া এই লব্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার যখন যখন তাহার মনিকায়, তখন এ লোভ ত্যাগ করিবে— সে লোভ অন্য নহে।

সে মিলিয়া গেল স্বানিক পথে কাৎকর্ম করিয়া জানদা যাবে দুনিয়া, মায়ের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে চকচকিয়া উঠিল। তাহার ক্ষণকাল স্থানান্তরিত হইয়া, চোখ দুটি আঁত দুনিয়া দগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েকে লিখিবামাত্রই তাহার কল্পনায় যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই হইয়া উঠিল। উপস্থিত কাছে ভাকিয়া মেয়ের পক্ষে মুখ বাকিয়া মা আঁত তুলিয়া উঠিল। মাতৃ হৃদয়ের মত স্নেহপূর্ণ স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে লগিলেন।

বড়লোক কায় যখন ঘামিল তখন মেয়ে তাহার আঁতেরেই তুমি ঢুলে না মায়ে, কেউ আমাকে তোমার কাছ-ছাড়া করিতে পারবে। এ এ কালের বাড়ি নহা মা। এ আমার বাবার বাড়ি। তিনি যেতে না দেন তখন এ আর লজ্জা থাকবে না। যা কারো হোক তখন তোমাকে আমি বাঁচা। এ পারব মা। বলিয়া মেয়ে আজ মা হইয়া মাকে মেয়ের মত ভাবন করিয়া বলিয়া গেল। স্বানিক পথে না শ্রান্তদের ঘুমটিয়া পড়িলেন। কিন্তু মেয়ে শ্রান্তের বর্ষি পথে ভাবনায় ঘাবটয়াও ছিব করিতে পারিল না, তাহাও এই মা তোমারি এখন কি হইয়া। সে দুমিটে এ যাবত যাবত পথটা সে কেমন করিয়া কোথা হইতে সংগঠ করিবে।

জানদাকে বিদায় করাব শ্রুতবুটি ছেঁচেরি শ্রুতবুটি পাইয়া ঘুমিকে নিজনে ভাকিয়া কহিল, তোমার কি ভীষবতি হয়েছে যে, ভাজের পরামর্শে এই অসময়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে দূর করবাব কথা বলে এলে? কসাই, — যাদের জবাই করেই বাসে। — তোমাদের চেয়ে দয়াময় আছে।

মাই হোক, কাজটা নাকি একেবারেই অসম্ভব, তাই অন্য উপায় করিয়া গেল। না হইলে এসকল ব্যাপারে সে গুঁর বাধা, এতবড় দোষাবোপ তাহাও অতিবর্ত শ্রুতবুটি তাহার প্রত কাতে পারিত না।

কিন্তু দুর্গা হয়ত এই আসন্নকালেও মেয়ে লইয়া আর এতদূর হইলপালে যাইতে পারিবে। কিন্তু সেখানে সেই যে পাত্র, যে নিজের পাঁচ ছয়টি সন্তানের জননীকে এতদূর অবস্থায় লখি মর্দিয়া হতা করিয়াছে, তাহার কথা মনে হইলেই তাহার মনোবল উপস্থিত হইত।

পর্বদিন অনাথকে নিজের শাখাপাশে ভাবটিয়া ফেলিয়া দুর্গা তাহার হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া কানিয়া কহিলেন, শাকবোলা, সম্প্রকে বড় না হলে, আজ তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষে চাইতাম তাই, তোমার যাকে ইচ্ছে হয় একে দাও, কিন্তু মেয়েকে এ সময়ে আমার কাছ ছাড়া কর না। বলিয়া জানদার হাতখানি তুলিয়া লইয়া তাহার কাঁধ হাতের উপর বসাইলেন।

অনাথ হাতটা টানিয়া লইয়া বিরক্ত হইয়া কহিল, পনের দশটা আমার জগৎ যাব। আমি কি তব

এটি করি কি মেজবোঁঠান? কিন্তু ঘাটের মড়াও যে এ শকুনিকে বিয়ে করতে চায় না। বলি, তোমার সেই বালাজোড়াটা যে ছিল, কি করলে?

সে ত তোমার দাদার আঁকের সময়েই গেছে ঠাকুরগোলা।

অনাথ হাতটা উলটাইয়া কহিল, তা হলে আর আমি কি করব? একটা পরস্যাও দেবে না, মেয়েও ছাড়বে না,—তার মানে, আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবতে চাও আর কি! বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দুর্গা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া, অকস্মাৎ মেয়ের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, বসে আছিস! ঘরে সজ্জা দিবিনে?

যে-সমস্ত আলোচনা এইমাত্র হইয়া গেল, তাহারই দহনে বোধ করি জ্ঞানদা একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ৬-বাব দিবার পূর্বেই মা নিরতিশয় কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মরণ আর কি! রাজকন্যার মত আবার অভিমান করে বসে আছেন! হাঁ লা গেনি, এত থিকারেও তোর ত প্রশ্ন বেরোয় না! যদু ঘোষের এক ছেলে সেদিন তিনদিনের জুরে ম'লো—আর এই একটা বছর পরে ভুই নিভি। জুরের সঙ্গে যুবছিস, কিন্তু তোকে ত যম নিতে পারলে না! ভুই বলে তাই এখনও মুখ দেখাস, আর কোন মেয়ে হলে মনের যেম্নায় এতদিন জলে ডুবে মগ্নত। যা যা, সুমুখ থেকে একটু নড়ে বা শুকুনি,—একদণ্ড হাঁফ ফেলে বাঁচি। দিবারাত্রি আমাকে যেন ভোঁকের মত কামড়ে পড়ে আছে। বলিয়া একটা ঠেলা দিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

বাস্তবিক মায়ের কথাটা সত্য যে, আর কোন মেয়ে হইলে সুদ্ধমাত্র মনের দুপাতেই আত্মহত্যা করিত,—এমন কত মেয়েই ত করিয়াছে,—কিন্তু এই মেয়েটিকে ভগবান যেন কোন নিগূঢ় কাৰণে মা বসুন্ধরার মতই সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়াছিলেন। সে নীরবে উঠিয়া গিয়া নিয়মিত গৃহকাৰ্য্যে বশু হইল। এতবড় নির্দয় লাঞ্ছনাতেও মুখের্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিল,—না মা, মর্দিতে আমিও জানি। শুধু ভূমি ব্যথা পাইবে বলিয়াই সব সহিয়া বাঁচিয়া আছি।

ঘরে প্রদীপ দিয়া পদ্মাজল ছড়া দিয়া ধুনা দিয়া সে আর একটি ক্ষুদ্র দীপ হাতে করিয়া ভুলসী-বেদীমূলে দিতে গেল। বাঙ্গালীর মেয়ে শিশুকাল হইতেই এই ছোট গাছটিকে দেবতা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। এইখানে আসিয়া আজ আর সে কিছুতেই সামলহিতে পারিল না। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া আর উঠিতে পারিল না। দুই হাত সুমুখে ছড়াইয়া দিয়া কাঁদিয়া সান্ত্বনে লুটাইয়া পড়িল।

ঠাকুর! দয়াময়! এইখানে ভূমি আমার গাবাকে লইয়াছ—এইবার আমার মাকে আর আমাকে কোলে লইয়া আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও ঠাকুর। আমরা আর সহিতে পারিতেছি না।

নয়

চৈত্রের শেষের কম্বটা দিন বলিয়া ছোটবোয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নাই। আসটা শেষ হইতেই তাহার ছোটভাই তাহাকে এবং মাধুরীকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

আজ ভাল দিন—বাওয়া-দাওয়ার পরেই যাত্রার সময়। অতুল বাড়ি আসিয়াছিল বলিয়া স্বর্ণ তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

দুপুরবেলা এই দুটি যুবক আহারে বসিল, স্বর্ণ কাছে আসিয়া বলিলেন। লম্ব করিয়া তিনি মাধুরীর উপর পরিকেশনের ভার দিয়াছিলেন। সকালবেলা আঁখ-রামাটা জ্ঞানদাকে দিয়াই রাখিয়া লওয়া হইত, কিন্তু তাহা গোপনে। বাহিরের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই স্বর্ণ অসম্বোদ্ধে কহিতেন, মা গো! সে কি কথা! ওকে যে আমরা রামাঘরেই ঢুকতে দিইনে; সুতরাং পরিবেশন করা তাহার পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া নিজের লজ্জাতেই সে কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইত না—যতদূর সাধ্য ঘরের বাহিরের সকলের দৃষ্টি এড়াইয়াই সে চলিত।

অতুলের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইবে। তাই, এই সুন্দরী মেয়েটি সর্বান্তে সাজসজ্জা এবং ব্রহ্মাণ্ডের লজ্জা জড়াইয়া লইয়া অর্পণ হস্তে যখন পরিবেশন করিতে গিয়া কেবলি ভুল করিতে লাগিল—এবং জ্যাঠাইমা সঙ্গের অনুযোগের স্বরে, কখনো বা 'পেঁড়ানুখী' বলিয়া, কখনো বা 'হতভাগী' বলিয়া,

হাসিয়া ভাষাশা করিয়া কাজ লিখাইতে লাগিলেন। এখন বিশ্বের পারে টোলা আর একটি মেয়ে
 হাজারি জন্ম রক্ষণাশায়া লিখিতে একান্তে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া সর্বপ্রকার আত্মা শুদ্ধিয়া দিতে
 লাগিল।—স্বর্ণ মাস্তুরের বিবাহের কথা ভুলিতেই সে ছুটিয়া বাসায় ফিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞান
 জ্ঞানাসা করিল, কি চাই তাই।

কিছু না দাঁড়ি : আমি আর পারি নে। বলিয়া প্রবেশ করি। আমার দুই কনিষ্ঠা ভ্রাতৃও নিম্নে
কনিষ্ঠা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। -- পরক্ষণেই স্বর্গ ছেঁচিয়া উঠিলেন। এবং "ন দিগ্ধি বা দৌগ্ধি বা" কিছু
নয় লইবার জন্য মাথুরী ফিরিয়া আসিল না। তিনি আমার উঠিলেন, যে-সে-প্রকার ছোটখাটো
বসে আছে। ওখানি কেত ফিরিল না। এবার তিনি বসে কনিষ্ঠা উঠিলেন বলিলেন, "কথা কি বার
কানে যায় না? এরা কি উঠে যাবে না?"

[illegible]

STATE OF NEW YORK

[illegible]

המחברת מודה כי היא לא יודעת להעריך את חשיבות המחקר הזה, אך היא מאמינה כי הוא חשוב.

1. 2010年12月31日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，其中：A公司应收账款200万元，B公司应收账款300万元。2011年1月1日，甲公司根据合同约定向A公司销售商品一批，售价为100万元，增值税税额为17万元，该批商品已经发出，款项尚未收到。假定甲公司应收账款坏账准备的计提比例为5%，2011年12月31日，甲公司应收账款科目余额为400万元。

2010年12月10日 星期五

[illegible][illegible]

সেই মতো কণ্ঠ এই একটা লোক, যে তার দু'হাত ছোঁয়া, পাতা ভেঙে, পিঠের পট্টা ফল
সেই লোক কি জানি, কতদিনের জন্য, হুনা-হুনা মাঝমাঝে, হুনা-হুনা মাঝমাঝে, হুনা-
কিছুক্ষণ হঠাৎ নয়। মাঝ মাঝে এরা মাঝ মাঝে কখনো কখনো হঠাৎ হঠাৎ হঠাৎ হঠাৎ
নয়। সকলে তাই পারে না, শুধু কেউকিউর মধ্যে চাননি তাই। লিখা, লিখিত একটা যে
মতোই সমস্ত প্রস্তর পথিপথ হইয়া গেল।

সংস্কৃত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আসিয়া পাড়াইলেন।

অনাথ ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েছে বৌঠান?

স্বর্ণ কহিলেন, তুমি করচ কি ঠাকুরপো; মেজবৌয়ের যে হয়ে এলো।

অনাথ হাতের হুঁকাটা ঠক করিয়া রাখিয়া দিয়া পংখ-মুখে কহিল, বল কি? কৈ আমি ত কিছু জানিনে!

স্বর্ণ বলিলেন, না না, তা নয়; আজই সে মরচে না; কিন্তু বেশীদিন আর নেই, তা বলে দিচ্ছি। বড় জোর দশ-পনের দিন। তার পরে ছ'মাস, একবছর ছুড়িটার বিয়ে দেবার জো থাকবে না—কিন্তু আমার মাধুরী-মায়ের বিয়ে আমি এই আশ্বাঢ়ের মধ্যেই দেব—তা কারু কথা শুনব না। এমন খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া দেবার-খোবার কামড় নেই। ছেলে নিজে পছন্দ করেছে,—মা মাগী যে বলবেন—এ নেব, তা নেব, সে না হলে চলবে না—তার জো নেই। এমন সুবিধে কি আমি শেষকালে দেবির কংগে গিয়ে নষ্ট করে ফেলব?

অনাথ সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, সে কি হতে পারে! তুমি হলে আমার সংসারের কর্তা গিল্লী সমস্তই। তোমার মেয়ের বিয়ে বোনপোর সঙ্গে দেবে—যেদিন খুশি দিয়ে, যা ইচ্ছে করো, আমি কখনো ত তাতে না বলব না, বৌঠান।

স্বর্ণ সগর্বে বলিলেন, তা ত বলবে না, জানি। কখনো বলোওনি—আমার সে দেওর তুমি নও। তাতেই ত বলচি, এখন যা বলি কর। আর গড়িমসি করো না, যাকে হোক ধরে-বেঁধে ওকে বিদায় কর। সে না করলে মাধুরীর বিয়ে কোনমতেই হতে পারবে না। এমনিই ত পাড়ার বাটা-বেটীরা নানা কথা কইছে, শুখন কি আবার একটা গোলমালে পড়ে যাব? মনে বেশ করে বুঝে দেখ, ও তোমারই ঘরের মড়া, ফেলবে ফালো, না হয় পচা গন্ধে মরো।

কথাটা অনাথ ভাবিতে ভাবিতে অফিসে গেল এবং পরদিন ইহাতেই ঘরের মড়া ফেলিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এমন দুই-চারিজন পাত্র ধরিয়া আনিতে লাগিল, যাহাদের পরিচয় নিজের মুখে দিতে গেলে বোধ করি স্বর্ণমঞ্জরীকেও দু'বার ঢোক গিলিতে হইত।

সেদিন দুপুরবেলা অনেক দিনের পর স্বর্ণ আসিয়া দুর্গার ঘরে ঢুকিলেন—বলি, আজ কেমন আছ মেজবৌ?

দুর্গা কষ্টে পাশ ফিরিয়া হাতটা একটু উলটাইয়া কহিলেন, আর থাকা-থাকি দিদি! আশীর্বাদ কর, আর যেন দু'বশী দিন ভুগতে না হয়।

স্বর্ণ সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, না না, ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে বৈ কি!

দুর্গা চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতিবাদ করিলেন না। স্বর্ণ তখন কাজের কথা পাড়িলেন। কহিলেন তা মেয়ে বড় কিনা, পান্ডুরটি নেহাত ছোঁড়া হলেও ত আর মানানে না মেজবৌ। বাপ-মা নেই, তাই নিজেই ওবেলা মগরা থেকে দেখতে আসবেন, বলে পাঠিয়েছেন—বলা বাহুল্য, বাপ-মা অমর না হইলে আর পান্ডুরটি ও-বয়সে তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকা চলে না। স্বর্ণ বলিতে লাগিলেন, এখন মা-কাকী করেন, মেয়ে দেখে তার পছন্দ হয়, তবেই ত ছোটঠাকুরপোর ছুটাছুটি ইটাইটি সার্থক হয়। তার পর আবার সেনা-পাওনার কথা—তা আমি বলি কি—

কথাটা শেষ না হইতেই দুর্গা আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া ছিলছিল চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ কর দিদি, এ সবছাড়া আর যেন ভেঙ্গে না যায়। আমি যেন সেখাে যেতে পারি, বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখ দিয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

স্বর্ণ বলিলেন, আশীর্বাদ করচি বৈ কি মেজবৌ, দিনরাত ঠাকুরকে জানাচ্চি,—ঠাকুর, যা হোক মেয়েটার একটা কিনারা করে দাও। তা দেখব বৈ কি মেজবৌ—আমি বলচি, তুমি জামাইয়ের মুখ দেখে ভাবে—

দুর্গা নীরবে খাঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন। স্বর্ণ একটা হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কান্ডাবাচ্চাদের বাপ—এ শুনতে দেড় শ মাইনে—নইলে কিছু নেই, সব জানি ত। নিজের মেয়েটার কি করে যে দু'হাত এক করবে তাই ভেবে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর আবার এটি। বুঝতে সবই ত পার মেজবৌ,—তাই ঠাকুরপো বলছিল কি—লজ্জার নিজেও তোমাকে বলতে পারে না—

বলছিল যে, তোমার অংশের বাড়িটা বীধা না দিলে ত আর খরচপত্রের যোগাড় হয়ে উঠবে না— তোমাকে নিজে কিছুই করতে হবে না, শুধু একটা ঢেরা-সই করে দেওয়া। শুধু হাতে কেউ ত আর ধার দিতে চায় না—পোড়া কলিকাল এমনি যে, তুমি মর আর বাঁচ, কেউ কারকে বিশ্বাস করবে না—

দুর্গা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি আর ক'দিন দিদি, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই করব। শুধু এইটুকু দেখো দিদি, ও আমার না একবারে অকূলে ভেসে যায়।

না না, ভেসে যাবে কেন মেজবো? বাপ-খুড়ো, মা-জ্যাঠাই কি ভিন্ন? তা যদি হবে আমরাই বা কেন ওর জন্যে ভেবে ভেবে আহার-নিদ্রা ভাগ করব বল? আমার জ্ঞানদাও যা, মাপুলীও সেই পদার্থ। দে না মা জ্ঞানদা, তোর মায়ের চোখ দুটো মুছিয়ে। মাথায় একটু পাখা কর না বসে। বলিয়া একাধারে আশা ও ভরসা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ বহুদিনের পর দুর্গার মৃত্যুখবলিন মুখের উপর একটা আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল। মেয়ের হাত হইতে পাখাটা টানিয়া লইয়া, নিজে শীর্ণ হাতখানি তাহার মাথায় মুখে বুলাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, এইখানে শুয়ে একটু ঘুমো দিকি মা! বলিয়া জোর করিয়া নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, এমন পোড়াকপালীর পেটে তুই জন্মেছিলি মা, যে এই বয়সেই খেটে খেটে, আর ভেবে ভেবে শরীর পাত করিলি। যদি জন্মই নিয়েছিলি, ছেলে হয়ে কেন জন্মাস নি মা!

অনেকদিন পর স্নানকারি আদর পাইয়া মেয়ের দুই চোখ দিয়া নীরবে অশ্রু করিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য উভয়টি বোধ করি একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ মায়ের ঠোলা খাইয়া জ্ঞানদা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল।

ও মা, ওঠ ওঠ; বেলা যে আর বেই। আমার টিনের বাস্‌টার মধ্যে বোধ করি একটুখানি সাবান আছে—যা দিকি মা, চট করে পুকুর থেকে মুখ হাত পা ধুয়ে আয়। না বাছা, এ তোর বড় দোষ— তুই কথা শুনেতে চাসনে। বলি, যা শিগগির।

মাতার নির্দেশমত জ্ঞানদা টিনের বাস্‌ট খুলিয়া বহুদিন পূর্বের একটুকরা সাবান বাহির করিয়া গামছা লইয়া স্নানমুখে পুকুরে চলিয়া গেল। মা বলিতে লাগিলেন, বেশ করে একটু রোগড়ে রোগড়ে ধুস মা, তাজিল্য করিস নে, চট করে আসিস মা—বেলা যায় না ত, কখন তাঁরা সব এসে পড়বেন।

পুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞানদা অবাক হইয়া গেল। মরণাপন্ন মা ইতিমধ্যে কখন বিছানা হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া কি জ্ঞানি তোরঙ্গের কাছে গিয়া, সেটা খুলিয়াছেন এবং নিজের একখানি ছোপান কাপড় এবং জামা বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। মেয়ে আসিতেই বলিলেন— ভুল হয়ে গেল রে, মাখাটা বেঁধে দিলাম না, গা ধুলে এলে—তা হোক, ব'স। চট করে বেঁধে দি'।

মেয়ে কাতর হইয়া বলিল, না মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি পারবে না মা, শোও, আমি আপনি বেঁধে নিচ্ছি। দোহাই মা তোমার।

মেয়ের কথা শুনিয়া আত্ম মা একটুখানি হাসিলেন; ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঁ! পারব না! জানিস গেনি, এই মেজবোয়ের হাতে চুল বাঁধবার জন্যে পাড়ার মেয়ে বেঁটিয়ে আসত। আমি পারব না চুল বাঁধতে? নে, আয় দেরি করিস নে। বলিয়া জোর করিয়া কাছে বসাইয়া সমস্ত সন্দেশে স্বহস্তে পরিপাটি করিয়া, বোধ করি এই তাহার শেষ সাজ সাজাইয়া দিলেন। পায়ে আলতা, কপালে খয়েরের টিপ, ঠোটে রঙটুকু পর্যন্ত দিতে ভুলিলেন না, মুখখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া একটা 'চুম' খাইয়া তাহার হঠাৎ মনে হইল,—কে বলে, মেয়ে আমার দেখতে ভাল নয়! একটু কালো কিন্তু কার মেয়ের এমন মুখ, এমন চোখ দুটি!

এটা তিনি খরিতে পারিলেন না যে, কার মেয়ে মাকে এমন ভালাসে? কার এমন মা-অন্ত প্রাণ? কেন মেয়ের হৃদয়ের এতবড় ভক্তি ও ভালবাসার দীপ্তি এমন করিয়া তাহার সমস্ত কুরুপ আবৃত করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠে? এ-সকল তিনি টের পাইলেন না বটে, কিন্তু মেয়ের গায়ে একখানি অলঙ্কারও পরাইতে পারেন নাই বলিয়া ইতিপূর্বে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, কেমন করিয়া কখন যেন তাহা মুছিয়া গেল। গহনার অভাব একটা ভারী অভাব বলিয়া আজ আর তাহার চোখে পড়িল না।

তখনও অনেক বেলা ছিল, কিন্তু কোনমতেই আর তিনি শুইতে চাহিলেন না। সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া মেয়েকে সম্মুখে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

গনিকে দেখিতে আসিবে শুনিয়া পাশের বাড়ির নীলকন্ঠের পরিবার আসিলেন, তরঙ্গিনী ঠাকুরঝি আসিলেন। যথাসময়ে মেয়ের ডাক পড়িল, তাঁহারা গিয়া পাশের ঘর হইতে উকিঝুকি মারিতে লাগিলেন।

দৃষ্টির অন্তরালে একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের অভাব কঠিন অন্ত-চিকিৎসা সম্পন্ন হইতে থাকিলে, তাহার মা যেমন করিয়া সময় কাটান, তেমনি করিয়া দুর্গা একাকী তাঁহার মলিন শয্যার উপর বসিয়া ছিলেন।

পাত্র এবং ঘটকঠাকুর জলযোগাদি সমাধা করিয়া বাহির হইলেন—তিনি টের পাইলেন। তাঁহাদের ঠিকাগাড়ি ছড়ছড় ঘড়ঘড় করিয়া চলিয়া গেল—তাঁহাও শুনিতে পাইলেন। তার পরে তরঙ্গিনী ঠাকুরঝি ঘরে ঢুকিয়া একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া জানাইলেন, নাঃ—মেয়ে পছন্দ হ'লো না।

দুর্গা চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন, একটি প্রশ্নও করিলেন না।

ঠাকুরঝি করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, ঐ হাড়গোড়-বার-করা মেয়ে কি কারো পছন্দ হয়? বলি মেজবো, গনিকে দু'দিন খাওয়াও-মাখাও, একটু তাড়িত কর। আমার ছেলে-বেলা থেকে দেখেছি ত, এই মেয়ে কি এমনই ছিল? জুরে জুরে বাছার হাড়-পাজরা বার করে ফেলেচে—একটা বছর সবুর করে যত্ন-আশি করে দেখ দিকি, ঐ মেয়ে আবার কেমন হয়! তখন পড়তে পারে না।

সে ত ঠিক কথা। কিন্তু কৈ সে সুযোগ? টাকা কৈ? একটা বৎসর অপেক্ষা করিয়া তাহাব অস্থিগুহর টাকা দিবার সময় কোথায়? মেয়ে যে পনরোয় পড়িল। পিতৃপুরুষেরা প্রতিদিন যে নরকে গভীরতর কূপে নিমগ্ন হইতেছেন! বড় কুলীনীর মেয়ে নয়, তাই গ্রামের লোক 'জাতি মারিব' বলিয়া যে অহিনিশি চোখ রাঙ্গাইয়া শাসাইতেছে। প্রতিজ্ঞা করিবার আর তিলান্বিত অবসর নাই, বিদায় কর, বিদায় কর। যেমন করিয়া হোক, যাহার হাতে হোক—কাল তাহার বৈধবা অনিবার্য জানিয়া হোক, অসহ্য দুঃখ ও চিরদরিদ্রতা ছোখের উপর জাজ্বল্যমান দেখিয়া হোক, তাহাকে সঁপিয়া দিয়া জাতি-ধর্ম এবং পিতৃপুরুষের পারলৌকিক প্রাণ রক্ষা কর।

তখনো ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বাল্য হয় নাই। সেই অন্ধকারে লুকাইয়া জ্ঞানদা তাহার লাঞ্চিত সাজসজ্জা খুলিয়া ফেলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। দুর্গা মড়ার মত পড়িয়া রহিলেন। খানিক পরে সে হতভাগ্য কঠিন অপরাধীর মতো নীরবে মায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া যখন বসল, জননী জানিতে পারিয়াও সাড়া দিলেন না। তার পরে তেমনি নিঃশব্দে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অতৃপ্ত পীড়িত কন্যা প্রান্তির ভারে সেইখানেই চলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সমস্ত অন্তর্বহ করিয়াও মায়ের প্রাণে আত্ম লেশমাত্র দয়ার সম্ভার হইল না।

দশ

দুর্গার এমন অবস্থা যে, কখন কি ঘটে বলা যায় না, তাহার উপর যখন তিনি পাড়ার সর্বস্বাস্থ্যকর্মী প্রবীণদের মুখে শুনিলেন, তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক অনূঢ়া কন্যা শুধু যে পিতৃ-পুরুষদিগেরই দিন দিন অযোগ্যতা করিতেছে তাহা নহে,—তাঁহার নিজেরও মরণকালে সে কোন কাজেই আসিবে না—তাঁহার হাতের জল এবং আঙুন উভয়ই অস্পৃশ্য—তখন শান্ত শুনিয়া এই আসন্ন পরলোকযাত্রীর পাণ্ডে মুখ কিছুক্ষণের জন্য একেবারে কাপজের মত সাদা হইয়া রহিল।

কবিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত ঘা খাইয়া খাইয়া তাঁহার রেহের স্থানটুকি একপ্রকার যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। যে মেয়ের প্রতি তাঁহার ভালবাসার অবধি ছিল না, সেই মেয়েকেই দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। আজ এই সংবাদ শোনার পর, তাঁহার পরলোকের কাঁটা এই মেয়েটার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত চিন্তা একেবারে পাষাণের মত কঠিন হইয়া গেল। মায়ী-মমতার আর লেশমাত্র তথায় অবশিষ্ট রহিল না।

অনাথকে ডাকহিরা আসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, শুনেচি নাকি ও-পাড়ার ঐ যে গোপাল

ভটচাষি, না কে, সে বুঝি আবার বিয়ে করবে। আমার মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে না ঠাকুরপো?

অনাথ কথটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিল, না না, গোপাল ভটচাষি আবার বিয়ে করবে কি! কে তোমার সঙ্গে তামাশা করেছে, বৌঠান?

দুর্গা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে আর তামাশা করবে কে, ঠাকুরপো? তিনি পুরুষমানুষ ব্যাটা ছেলে, তাঁদের আবার বয়সের খোঁজ কে করে? না না, ও-বয়সে অনেকে বিয়ে করে ঠাকুরপো! আমি মিনতি করচি, একবার গিয়ে তাঁর সন্ধান নাও। বৈঠে থেকে ত কিছুই পেলাম না, মরণের পরে একটা আশুনাও কি পাব না?

এখন ইহাই হইয়াছে তাহার সকল আশঙ্কার বড় আশঙ্কা। তাহার কেবলই মনে হইতেছে এই যে, মেয়ে গেটে ধরা, এত দুঃখে লালন-পালন করা, শেষ মুহূর্ত্তে সমস্তই কি একেবারে নিখিল হইয়া যাইবে? যাহার হাতের আশুনা পাইবার জো নাই, সে মেয়ে কেন জন্মিয়াছিল?

উদ্বেগে প্রায় উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, যেখানে হোক, যার হাতে হোক, আমি বৈঠে থাকতে ওকে সঙ্গে দাও। আমি বলচি, আমার এই শেষ আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে ঠাকুরপো।

ঠাকুরপোর নিজের গরজও এ বিষয়ে কম নয়। সে সেইদিনই গোপাল ভটচাষির খোঁজ লইতে গেল এবং কথটা সত্য শুনিয়া খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, শুধু সত্য বলিয়াই নয়—ইহারই মধ্যে খবর পাইয়া চার-পাঁচজন কন্যাভাবগ্রস্ত পিতৃ আসিয়া তাহাকে সাধাসাধি করিয়া গিয়াছে বলিয়া!

এত কষ্টের নিয়ে, ও-যে শুনি'ল গোপালকে কন্যা দান করা হইবে—সে-ই ছি ছি করিল। কিন্তু জননীর তাহাতে মন টলিল না। তিনি যে এখন পরলোকের যাত্রী; সে যাত্রার পাথের শাস্ত্র-নির্দেশমত যেমন করিয়া হোক তাহার সংগ্রহ হওয়া যে নিতান্তই চাই!

বাস্তালীর মেয়ে—কত কল্ম-জন্মাত্তর ধরিয়া যে শাস্ত্রের যুগকাণ্ডে কন্যা বলি দিয়া আসিয়াছে, তাত পিছাইয়া দাঁড়ইবে সে কি কল্মিয়া? আবার দুঃখের উপর দুঃখ, সেই গোপাল বলিয়া পাঠাইল, সে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিবে। এ পোড়া দেশে তাহারও শখ আছে এবং পাঁচটি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবার সুযোগও আছে।

গ্রাম্যের শুদ্ধ ভূগ একটা মেয়ের বারিপাতেই যেমন উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই একটুকুমাত্র আশার ইস্তিতে দুর্গার মরা-আশা চক্ষের পলকে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল। তিনি অন্যথের হাতটা ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, এইটুকু ছোটভাইয়ের কাজ কর তাই—হতভাগীর হা' দব আশুনটুকু যেন শেষ সময়ে পাই। সামনের পাঁচুইটা যেন আর কোনমতেই ফসকে না যায়। হু বলে এস তাই, আজকেই যেন মেয়ে দেখে কথাবার্তা পাকা করে যান।

বিয়ে না হইলে মায়ের শেষ কাজটা তাহাকে দিয়া করান হইবে না—শাস্ত্রে বিশেষ আছে—এ কথা শুনিয়া জ্ঞানদা নাওয়া-খাওয়া ভাগ করিল। সেও ত বাস্তালীর মেয়ে—তাহারও বুকের মধ্যে অবিশ্রাম যেন চিতার আশুনা জ্বলিতে লাগিল।

অপরাহ্নবেলায় একাকী রান্নাঘরে বসিয়া সে মায়ের জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল,—রূপের পরীক্ষা দিবার জন্য আর একবার তাহার ডাক পড়িল।—স্বর্ণ নিজে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ওলো গনি, ওটা নামিয়ে রেখে শিগগির শিগগির আয়, তারা দেখতে এসেছে। শুধু একখানা কাপড় পরে আয়, তারা এমনি দেখে যাবে। বলিয়া তিনি তেমনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

অনাথ তখনও অফিস হইতে ফিরে নাই, সুতরাং আদর-অভ্যর্থনা করিবার ভার তাঁরই উপরে। লেখিতে আসিয়াছিল পাত্র নিজে এবং তাহার এক দূর-সম্পর্ক ভাগিনেয়। ছেলে-ছোকরাদের পছন্দ আছে বলিয়া গোপাল বুদ্ধি করিয়া তাহার এই ভাগিনেয়টিকে সঙ্গে আনিয়াছিল। ইহারই পরামর্শ মত মেয়ে যেমন আছে তেমনি দেখাইবার আদেশ হইয়াছিল,—কারণ সাজাইয়া দেখানোর মধ্যে ঝঁকি চলিতে পারে।

হেল্পেট্টি হুয়টার ট্রেনে কলিকাতায় যাইবে—সে তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। স্বর্ণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া গলা চাপিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্ঞানদা আর আসে না। শুদ্ধমাত্র একখানা

কাপড় পরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহার অনেক বেশী বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বি গিয়া যখন তাহাকে টানিয়া অনিল, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই জ্যাঠাইমা ক্রোধে আশ্রয় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, খোল এ-সব, কে বললে, তোকে এমন করে সেজেগুজে আসতে? যা শিগগির খুলে আয়—

বাহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, হঠাৎ এই চৈচামেচি শুনিয়া তাহার আশ্চর্য হইয়া গলা বাড়িয়া দেখিলেন। ছেলেটি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, তবে এমনই নিয়ে আসুন, আমার আর দেরি করবার জো নেই।

বি যখন তাহাকে অনিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইল, তখন কন্নার অপরাধ সাজসজ্জা দেখিয়া ছেলেটি বহু ক্রোশে হাসি দমন কবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাল খবর দেব, বলিয়া মাতুলকে লইয়া প্রস্থান করিল। জলযোগের আয়োজন ছিল, কিন্তু ট্রেন মিস্ করিবার ভয়ে তাহা স্পর্শ করিবারও তাহাদের অবকাশ ঘটিল না।

কাল খবর মিবার অর্থ যে কি, তাহা সবাই বুঝিল। জ্যাঠাইমা চৈচাইয়া, গালি পাড়িয়া, চক্ষের পলকে সমস্ত পাড়াটা মাথায় তুলিয়া ফেলিলেন। মেজবোয়ের অবস্থা ভাল নয়, অনর্থ অশঙ্কা করিয়া পাশের বাড়ির দুই-চারিজন ছুটিয়া আসিয়া পড়িল, এবং ঠিক সময়েই অকস্মাৎ কোথা হইতে অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও হঠাৎ ট্রেনে কলিকাতায় যাইতেছিল এবং পথের মধ্যে চীৎকার শুনিয়া এই আশঙ্কা করিয়াই বাড়ি চুকিয়াছিল।

অতুলকে দেখিতে পাইয়া স্বর্ণের রোষ শতগুণ এবং ক্ষোভ সহস্রগুণ হইয়া উঠিল। শীর্ণ, সঙ্কুচিত, ভয়ে মৃতকল্প, দুর্ভাগা মেয়েটার ঘাড়টা জোর করিয়া অতুলের মুখের উপর তুলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, দ্যাখ অতুল, একবার চেয়ে দ্যাখ! হতভাগী, শতেকখাকী, বীদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ!

বাস্তবিক তাহার মুখের পানে চাহিলে হাসি সামলানো যায় না। তাহার চোঁটের রঙ গালে, গালের রঙ মাড়িতে, অন্ধকার কোণে স্বহস্তে টিপ পরিতে গিয়া সেটা কপালের মাঝখানে লাগিয়াছে। ক্লক চুল বোধ করি তাড়াতাড়ি এক শাবলা তেল দিয়া বীধিতে গিয়াছিল, তখনো দুই রং গড়াইয়া তেল বরিতেছে—দুই-একটা মেয়ে পাশ হইতে বিলবিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজনের কোলে ছেলে ছিল, সে কহিল, গিনি পিথি খণ্ড খেচ্ছেচে। পিতি, এমনি কোলে জিব বার করো।—বলিয়া সে হাঁ করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল। আর একবার সবাই বিলবিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মুখপোড়া ছেলে! বলিয়া তাহার মা-ও হাসিয়া ছেলের গালে একটা চোনা মারিলেন।

কিন্তু অতুলের বুকের ভিতরটা কে যেন ভগ্ন শেল দিয়া বিধিয়া দিল। অনেকদিন হইয়া গেছে, এমন দিবালোকে এত স্পষ্ট করিয়া সে জ্ঞানদার মুখের পানে চাহে নাই। শুধু পরের মুখে শুনিয়াছিল, রোগে নিজে যখন সে মরণাপন্ন, তখন এই মুখখানাকে সে ভালবাসিয়াছিল। আজ অকস্মাৎ যখন চোখে পড়িল, সেই মুখখানার উপরেই যম তাহার ভিক্রিয়ারি করিয়া শেষ নোটস আঁটিয়া মিয়া গেছেন, তখন মুহূর্তের জন্য সে আত্মবিস্মৃত হইল। কি একটা বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু স্বর্ণের উচ্চকণ্ঠে তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

খ্যা, খানকীর বেহন্দ করলি লা? একটা ঘাটের মড়া, তার মন ভুলোবার জন্যে এই সঙ্ক সেজে এলি? কিন্তু পারলি ভুলোতে? মুখে লাগি মেরে চলে গেল যে!

কে একজন প্রশ্ন করিল, কে এমন ভূত সাজিয়ে দিলে বড়বো? বুড়োর পছন্দ হ'ল না বুঝি?

স্বর্ণ তাহার প্রতি চাহিয়া, তর্জন করিয়া কহিলেন,—নিজে সেজেছেন—আবার কে সাজাবে? মা ত অজ্ঞান-অচেতন। বলে দিলাম, শুধু একখানি কাপড় পরে আয়। তা পছন্দ হ'ল না। ভাবলেন, সেজেগুজে না গেলে যদি বুড়োর মনে না ধরে? আর সাজের মধ্যে ত ঐ ছোপানো কাপড়খানি, আর অতুলের দেওয়া এই দু-গাছি চুড়ি। তা দিনের মধ্যে কখনো খুলে ফুলে রাখচে, কখনো হাতে পরচে। কালীমুখীর ও-চুড়ি হাতে দিয়ে বার হতে লজ্জাও করে না? বেরো সুমুখ থেকে—দূর হয়ে যা—

বেহারী মেয়েটার এই বিলম্ব চরিত্রের সবাই সমালোচনা করিয়া, হি হি করিয়া চলিয়া গেল।

ওধু বাহার কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, সেই অজ্ঞাতমীর চোখ দিয়া হয়ত বা একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তিনিই ওধু জন্মিলেন,—যে মেয়েটা আজন্মকাল লজ্জায় কখনো মুখ তুলিয়া কথা কহিতেই পারিত না, সে কেমন করিয়া, আজ সকল লজ্জায় পদাঘাত করিয়া নিজের ওই স্বাস্থ্য-স্বীহীন দেহটাকে বহুতে সাজাইয়া আনিয়া এই অতি-বৃদ্ধটার পনেই ঠকাইয়া বিক্রি করিতে গিয়াছিল। কিন্তু বিক্রি হইল না—কান্ধি ধরা পড়িল। আজ তাই সবাই ছি ছি করিয়া শিকার দিয়া গেল—কেহই ক্ষমা করিল না। কিন্তু অন্তরে বসিয়া যিনি সর্বকালে সর্বলোকের বিচারক, তিনি হয়ত দূর্ভাগা বালিকার এই অপরাধের ভার আপনার শ্রীহস্তেই গ্রহণ করিলেন।

জানদা উঠিয়া দাঁড়াইল। কখনো সে পরের সমক্ষে কান্দে নাই—আজ কিন্তু অতুলের সম্মুখে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অতঃ, একটা কথারও কৈফিয়ত দিল না, কাহারো পানে চাহিয়া দেখিল না—নীরবে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

কলিকাতা যাইবার আর গাড়ি ছিল না বলিয়া অতুল সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া গেল। পথে সব কথা ছাপাইয়া ছোটমাসীর সেই শেষ কথাটিই বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন বাপের বাড়ি যাইবার সময় অতুলকে নিভৃত্তে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, অতুল, হাঁরা ফেলে যে কাঁচ আঁচলে বাঁধে, তার মনস্তাপের আর অবধি থাকে না বাবা। সেদিন কথাটা ভাল বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আজ তাহার যেন নিঃসংশয়ে মনে হইল, কথাটা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। লজ্জাহীনা বলিয়া যাহাকে আজ সবাই লাঞ্ছনা করিয়া বিদায় দিল, তাহারই লজ্জা-শরমের সীমারেখাটা যে কোনখানে, আজ সে-কথাও তাহার স্মরণ হইল।

তখনো ভোর হয় নাই, অনাথ ডাকিতে আসিলেন,—মেজবৌকে দাখ করিতে হইবে।

চলুন যাই, বলিয়া অতুল বাহির হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, দেড় বৎসর পূর্বে তুলসীমূলে পিতার পা-দুটি কোলে করিয়া যেমন বসিয়াছিল, আজও তেমনি নিঃশব্দে মায়ের পদ-দুটি কোলে লইয়া জানদা বসিয়া আছে। ওধু একটাবার ছাড়া জীবনে কেহ কখনো তাস্তক চঞ্চল হইতে দেখে নাই—সেই যখন সে অতুলেরই পায়ের উপর পড়িয়া মাথা ঝুঁড়িয়াছিল। সুতরাং, তাহার এই নিবিড় নীরবতায় কেহ কিছুই মনে করিল না। সেদিকে কাহারও দৃষ্টিই ছিল না, সংকারের উদ্যোগ-আয়োজনেই পাড়ার লোক ব্যস্ত।

যথাসময়ে তাহারা মৃতসেহ লইয়া শ্মশানে যাত্রা করিল। সকলের পিছনে জানদাও গেল। দুঃখীর মেয়ে বলিয়া পাড়ার কোন মেয়েই তাহার সঙ্গে গেল না; যাবাব কথাও কাহাকেও মনে হইল না। বর্ষায় ভরা গঙ্গা শ্মশানের ঠিক নীচে দিয়াই খরবেগে বহিতেছিল। মায়ের শেষ কথা মনে নীরবে সাজ করিল। চিতা যখন ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে পুরুষের ভিড় হইতে সরিয়া নীচে নামিয়া একেবারে জলের ধারে গিয়া বসিল। কেহই নিষেধ করিল না; কারণ, নিষেধ করিবার কিছু ছিল না। বরঞ্চ এই গভীর শোকের দৃশ্যটাকে চোখের আড়াল করিতেই সে যে নামিয়া গেল, তাহা নিশ্চয় অনুভব করিয়া মুহূর্তের সমবেদনায় অনেকেই 'আহা' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিল।

এই চিরদিন শান্ত পরমসহিষ্ণু মেয়েটি উৎকট কিছু যে করিয়া বসিতে পারে, সে ভয় কাহারও ছিল না। অতুলেরও না। তথাপি তাহাকে খরস্রোতের একান্ত সন্নিহিতে গিয়া বসিতে দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটায় কেমন একরকম করিয়' উঠিল। একবার ভাবিল নিষেধ করে; একবার ভাবিল কাছে গিয়া ধাঁড়ায়; কিন্তু লজ্জায়, কুঠায় কোনটাই পারিল না।

অদ্ভুতরূপ বাঁচাইয়া সবাই গিয়া যেখানে বসিয়াছিল, অতুলও গিয়া সেখানে বসিল। সম্মুখে প্রস্থলিত চিত্তার পানে চাহিয়া সহসা তাহার মনের মধ্যে সেই চিত্রের পুরানো প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল—কাল যে ছিল, আজ সে নাই; আজও যে ছিল, তাহারও ঐ নখর সেইটা ধীরে ধীরে ডগ্‌সসং হইতেছে, আর তাহাকে চেনাই যায় না; অতঃ, ওই দেহটাকেই আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়, কত ভাবনাই না ছিল! কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে কি তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে?

সহসা তাহার নিজেরই বিগত জীবন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বছর-তিনেক পূর্বে সেও ত

মরিতে বসিয়াছিল, কিন্তু মরে নাই। অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের দৃষ্টি চিতার লিঙ্গল দূসর ঘূমের তরঙ্গিত যবনিকা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। মনে পড়িল, সেদিন যে মরিতে দেয় নাই—সে ওই, ওই যে জাহ্নবীর ঘোলা জলে অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া মূর্তিমতী শোকের মত বসিয়া আছে,—তথু রুক কেশ ও মলিন অঞ্চল যাহার বাতাসে দুলিতেছে!

তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, ছাই রূপ! রূপেরই যদি এত দাম, তবে তিন বৎসর পূর্বে রূপের হাটে সে নিজেই ত দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল। সেদিন পরমাখীয়েরাও ত ঘৃণায় তাহার পানে চাহিতে পারে নাই!

কেমন করিয়া যে সময় কাটিতেছিল, তাহার জ্ঞান ছিল না। কখন যে চিতা নিভিতেছিল, তাহাও সে দেখে নাই। সর্বরূপ তাহার সমস্ত দৃষ্টি শুধু ওই নিশ্চল মূর্তিটার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

অনাথ কহিলেন, আর বসে কেন বাবা? এসো, শেষ কাজটা শেষ করে দিই।

চলুন, বলিয়া অতুল অপরাহ্নবেলায় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তখন সূর্য চলিয়া পড়িতেছিল। সেই স্নান আলোকে দীপ্যমান ঘাটের উপরে নিপতিত দু'গাছি ভাঙ্গা চুড়ির উপরে দৃষ্টি পড়ায় সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এ সেই তাহারই দেওয়া অতি তুচ্ছ মহামূল্য অলঙ্কার। শত লাঞ্ছনা, সহস্র শিকারেও যে দু'গাছির মায়া জ্ঞানদা কাটিতে পারে নাই, আজ নিজেই হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার কৈফিয়ত দিয়াছে। অতুল দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সেই দু'গাছি সন্মুখে, সমস্তে কুড়াইয়া লইল। অথও অবস্থায় যাহার কোন মর্যাদাই সে দেয় নাই, আজ তাহা ভগ্ন তুচ্ছ কাঁচখণ্ড হইয়াও তাহার কাছে একেবারে অমূল্য হইয়া উঠিল।

পিছনে পদধ্বনি শুনিয়া জ্ঞানদা মুখ ফিরিয়া চাহিল। সে চাহনি অতুল সহ্য করিতে পারিল না। বোধ করি বা একবার সে যেন তাহার হাত ধরিতেও গেল, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—ভুল সকলেরই হয়, জ্ঞানদা, কিন্তু—, বলিয়া সে হাতের মুঠাটা ফেলিয়া ধরিতেই সায়াক্রেন আবৃত্ত আভাষ আর একবার সেই কাঁচখণ্ডগুলি কককক করিয়া ছলিয়া উঠিল। কহিল, আজ যাকে তুমি ভেঙ্গে ফেল দিবে এলে, আমি তাকেই আবার স্বপ্নান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কথাটা জ্ঞানদা বুঝিতে পারিল না, তাই সে তাহার নিবিড় শোকাচ্ছন্ন উদাস দৃষ্টি অতুলের মুখের প্রতি তুলিয়া আজ অনেক দিনের পরে আবার কথা কহিল, মুদকটে লিঙ্গাসা কবিল, কেন?

জবাব দিতে গিয়া অতুলের দু'চক্ষু সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সামলিয়ায় লইয়া বলিল, জানো, আজ মেঘমাসীয়ার চিতার আগুনের মধ্যে একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, যা ভাববার নয়, তাকে কিছুতেই জোর কবে ভাঙ্গা যায় না। জোর কবে কাঁচের চুড়িই ভাঙ্গা যায়, কিন্তু আমাদের সেই দেওয়া-নেওয়াটা আজও তেমনি অটুট হয়ে আছে—তাকে ভেঙ্গে ফেলি, এত জোর তোমার আমার কারও নেই। আমি যা পারিনি, তুমিও তা পারবে না নিশ্চয় জ্ঞানদা পেবেচি বলেই এই ভাঙ্গা চুড়ি বকে করে তুলে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। জ্ঞানদা হতচেতনের মত নির্নিমেষ চক্ষু চাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতুল অকস্মাৎ দুই হাত বাড়িয়া তাহার শীর্ণ ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল, কিন্তু জ্ঞানদা তেমনি পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়াই রহিল। অতুল স্কণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমার সমস্ত পাপের গুরুদণ্ড আর যেই দিক জানো, তুমি দেবার চেষ্টা করো না। আমি যত অপরাধই করে থাকি না কেন, আমাকে তোমার ফিরে নিতেই হবে। আমাকে ত্যাগ করে শাস্তি দেবে এ সম্বন্ধে তোমার কিছুতেই নেই।

এতক্ষণে জ্ঞানদা মাথা হেঁট করিল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কথা ফুটিল না—শুধু দুর্বল শীর্ণ হাতটি অতুলের হাতের মধ্যে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অতুল হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, বাড়ি চল, তাঁরা সবাই এগিয়ে গেছেন।



ত্রীকাণ্ড

প্রথম পর্ব

এক

আমার এই ‘ভবঘুরে’ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বড় হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা ‘ছি-ছি’ গুনিয়া গুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত ‘ছি-ছি-ছি’ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ‘ছি-ছি’র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই ‘ছি-ছি’টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত লগবান বাহাকে তাহার বিচিত্র-সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাড়ি-পাখী চড়িয়া বহু লোক-লভর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে ‘কাহিনী’ নাম দিয়া ছাপাইবার অভিকর্ষও দেন না! বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী-লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃতি তাহাদের এমনি অসঙ্গত, বাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়োড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুদীর্ঘ ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অন্যদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোকার খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপমায়ের বুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ি—সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিতেও বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। বাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে আর; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না! সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুখিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো গোড়া চোখ দিয়া আমি বা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না! আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। ঠাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুকু ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। তবে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। এতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া ‘ভবঘুরে’ হইয়া পড়িলাম, সে কথা বাতিল গেল, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক। তাহার নাম ইজনাখ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা ‘ফুটবল ম্যাচে’। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যুষে ঘড়বাড়ি, বিষয়-অশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিভাগ্য করিয়া সেই যে একবন্ধে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে! ইজুনের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ‘ফুটবল ম্যাচ’। সন্ধ্যা হয়-হয়। মধ্য হইয়া দেখিতেছি।

আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আত্ম ছাতির বাঁট পটাশ করিয়া ভাসিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্ভাত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে—পালাহিবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়ইল—সেই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বরষে কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে যেখানে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদূরভূত হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সভ্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দুটি সৈর্য্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্বন্ত পড়িত। ইহার পরম সুখি। এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কব্জিরকালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর ঐ আঙ্গাঙ্কের মুদ্রাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়। মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ যেখিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

ছুটিতে গুরু করিয়া কহিলাম, তুমি? সে কক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাথা কোথাকার! গাথাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়ইয়া বলিয়াছিলাম,—না।

ছেলেবেলা মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছি—ইতিপূর্বে এভাবে দল বঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আত্ম দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাসে নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, না—তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি না কি? ঐ, ওই দিক থেকে ওরা আসচে—আচ্ছা, তবে খুব ক'বে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌছান গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপালিটির কোরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটর কাছে দাঁড়ইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শব্দ আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য, সে এতটুকুও হীপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয়; এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি রে?

ঈ—ক—ত—

ঈকন্ত? আচ্ছা। বলিয়া সে তাহার আমার পকেট হইতে একমুঠা ওকনা পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেচি—চিবা। কি এ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি? এ আমি বাইনে?

সে ভৌতিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাসনে? কোথাকার গাথা রে। বেশ বেশা হবে—চিবা! চিবিরে গিলে ক্যাল।

সেই মিনিটের আশুর্ভ তখন ত আমার জমি নাই। তাই বাড় দাঁড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া পিঙ্গিয়া কেলিল।

আচ্ছা, তা হ'লে সিগারেট বা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগারেট ও সেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জোড়া করিয়া সেই সিগারেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ রে, সে কি টান। এক টানে সিগারেটের আগুন মাথা হইতে তলার নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রস্থ করিলাম, চুপুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফাড়ে।

ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া যত্নে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটো স্মরণ করিতে পারিতেছি না—এ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন স্কালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

তারপরে মাস খানেক পত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই ওইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্রে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীবর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামরসাদী সুর। কত ত ওনিয়াছি, কিন্তু বাঁশিতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না। বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কীটালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ যোজ্জখবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিশত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সৰু একটা পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাহার বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশি বাজায় কে—রায়েদের ইস্ত্র নাকি? বুঝিলাম ইহার সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা! ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর এ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গৌসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসচে না কি?

বড়দা বলিলেন, হাঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গৌসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও-জঙ্গলে এক রান্তিরে হৌড়াটা কেন?

বড়দা একটুখনি হাসিয়া বলিলেন, আরে কেন! ও-পাড়া থেকে এ পাড়ায় আসবে এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়ী নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা? ওর শিগা... আসা নিয়ে দরকার। তা, সে পথে নদী-নালাই থাক আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।

খনি ছেলে। বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশির সুর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইচ্ছানাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখনি জোর এবং এমনি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাতে যতক্ষণ না ধুমহিয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি জন্মনি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্ছে। তখন ইকুলেও সে আর পড়ে না। ওনিয়াছিলাম, হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় পাখার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মরীহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘূর্ণভাবে ইকুলের রেলিং ডিঙাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই অনেকদিন পরে তাহার মুখেই ওনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অভি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পতিভক্তীর ক্রান্তের মধ্যেই নিম্নাকর্ষণ হইত। এমনি এক সন্ধ্যা সে তাহার গ্রহিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কার্পণ, পতিভক্তী বাড়ি গিয়া তাহার নিজের শিখাটি নিজের গপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিল—কেঁদা যায় নাই। তথাপি কেন যে পতিভক্তের রাগ পড়ে নাই! এবং হেডমাস্টারের কাছে মারিল করিয়াছিল—সে কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বৃষিতে পারে নাই। সেটা পারে

নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, ইন্সুল হইতে রেলিঙ ডিম্বাশিয়া বাড়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আসী ছিল না। এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশজন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না! ইচ্ছা কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-প্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল; দশ-পনের দিন আর তাহার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া গেল না। এমন একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় বিহীন অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু বাহারা আমাদের জানে, তাহারা বলিবে, তোমার ত এ সাজে নাই বাপ! গম্বীরের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়িতে আসিয়াছিলে—তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক থাক, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ কথা আমাদের লক্ষ্য বার বলিয়াছে; নিজেকে নিজে আমি এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত মন-প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিশিবার জন্যই আমার মেহের প্রতি কণাটি পর্যন্ত উন্মুগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল বাহিয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য প্রথমত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেডির ডেলের সেজ জ্বলাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাইরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাশিশের বাটের উপর শুইয়া তাহার সাক্ষাতস্মৃতি উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য্য অফিস বাইরা, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, খেলাই ফঁকাই ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভাস করিতেছি। ছোড়না, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ স্রেণীতে পড়ি এবং গম্বীর-প্রকৃতি মেজদার বার-দুই একটাল ফেল করিবার পর গম্বীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহায়ে সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদার 'পাশের পড়া'র বিশ্ব না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে' কোনটাতে 'ধুখুফেলা', কোনটাতে 'নাক-ঝাড়া', কোনটাতে 'ভেঁটা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাক-ঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদার 'সমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা ভাষ্যেতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—ঈ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক বাড়িতে বাইতে পারে। দুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া বাইতেই ছোড়না 'ধুখুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়না বুঝ ভাবি করিয়া-মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া 'ভেঁটা পাওয়া' আর্জি দখল করিয়া দিলেন। এবার মজুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—ঈ—আটটা একচত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচত্রিশ মিনিট পর্যন্ত। পরগুনানা লইয়া ছোড়না হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দখল করিলেন। মেজদা বাড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট পদ দিয়া আটখা রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাহার হাতের কাছেই মজুত

থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কেফিয়াং তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সূক্ষ্মায়া আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাছারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে গুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদেরকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইকুলে ক্লাশের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদার দূর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগণা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদ্ভুতের অদ্ভুত কাচারা। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে;

সে রাত্রের ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্ত্রাভিকৃত সেই দুটো বৃদ্ধা; ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমার চারিটি শ্রাবী।

ছোড়না ফিরিয়া আসায় তুমুয়া আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কতই টিকিট বেশ করিয়া উৎসাহ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-খাটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তুমু পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরও কি পরিমাণে ভাল খাইয়াছিলাম।

প্রকৃত্যে আমার তিক পিঠের কাছে একটু 'হুম' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়না ও যতীনদার সমবেত হাইকটের গগনভেদী 'রে রে' চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে খেয়ে রে! কিসে ইহাদিককে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখবার পূর্ববধি, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া দিদুমবেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেধ উন্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষয়জ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদার ছিল ফিটেব বাহো! তিনি সেই যে 'জো-জো' করিয়া প্রদীপ উন্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর হাড় হইলেন না।

চোলাঠেল করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া গ্রাহদের অপেক্ষাও তেজে চোঁচাইয়া বাড়ি ফাটিয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-বাটার কে কতখানি হী কবিতো পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রাণ্ড টাংকরে হকুম দিতেছেন—আউব মারো—শালাকে মার ডালা হতাদি।

মুহর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজন উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোবকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল!—আরে, এ যে ভটচািয়ামশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার।

পাখার বাতাস ও জলের কাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিই হইয়া ফুঁপাইয়া কাদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রস্তুত করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটিছিলেন কেন? ভটচািয়ামশাই দিতে কাদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাক মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো। ছোড়না ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, এটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ ক'রে ন্যাক গুটিয়ে পাগোলের উপর বসছিল।

মেজদার চৈতন্য হইলে তিনি নির্দীলিতভাবে দীর্ঘবাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিলিই বা ফিরিলে, পেলিই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিরাছে, তখন সে একটা কিছু

বটেই!

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লঠম লইয়া ভয়চকিত নৈরে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উই বরঠা' বলিয়াই একলাকে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক চোলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কান্দারো মুহূর্ত বিলম্ব নয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই কোণের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্কের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উদ্বেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুসেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অন্তর্য্যাক্ষের উপর। 'লাও' ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহার বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারও নিম্ভক।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু কলকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লঠম তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গালাগালি ঝাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, ছারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই খাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুশাহি, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউলগণী। ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্যমশাই ষড়ম হাতে সর্বাত্মে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে ক্রম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও!

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাত্মে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনি। ভট্টাচার্য্যমশাই তাহার পিঠের উপর ষড়মের এক বা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্রাতকে বাস্তব আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোঁটা শালাব ব্যাটারা আমাকে যেন কিলারকে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতিবৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান গুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্টাচার্য্যমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রাণ উ-টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাখাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকুইয়াছিল। ভাবিয়াছিল একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাক্ষ দেখাইয়া বাইবে। কিন্তু কাপার উত্তরায়ের এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কলকুড়ি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্য ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও সেউকির ঐ বেউতলোকে। একটা ছোট ছেলের বা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই। পিসেমশাই কোন কথাই বলিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে সেব পক্ষাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে,

ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথাই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হিতে পারেন। কিন্তু শ্রীলোকের কথাই উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া ক্রকম্ব নিলেন, উহার লাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের লাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়িয়া দেওয়া হইল। নিমিয়া উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইহু আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি এই বাড়িতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ?

ইহু হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে-মাছ ধ'রে আনতে। যাবি?

আমি সত্যয়ে ভিত্তাস্য করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়াব?

সে আমার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাড়া অন্ধকার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাতার ভানিস?

খুব জানি।

তবে আর ভাটি। বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত শ্রোতে উজ্জ্বল বাহিতে পারিনে—একজন কডিতে বুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহাব হাত ধরিয়া নিঃশব্দে বাস্তব উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেই যেন বিশ্বাস হইল না—আমি সত্যিই এই রাতে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহুমে এই স্বক-নিবিড় নিশীথে এই বাড়ির সমস্ত কঠিন শাসনপাশ ভুঙ্ক করিয়া দিয়া, একাকী নহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধাই ছিল না। অনতিকাল পরে গোসাইবাগানে সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইহুকে অনুসরণ করিয়া কুপারিদিগের মত ভাড়া অতিশয় করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বড় প্রাচীন অশ্বখবৃক্ষ মূর্তমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাবই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সুদৃঢ়তা আশ্রয় তলে পবিত্র বর্ষার গভীর জনপ্রোণ হাওয়া খাইয়া আসে ও বসিয়া উঠিয়া হইয়া ছুটিয়াছে। সেখানেই ইহুর কুপ তরীখানি বাধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীর জলধারার মূখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিয়াছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীত ছিলাম না। কিন্তু ইহু যখন উপর হইতে নীচে একগা— জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'র পা তিলে তিলে নেবে যা, সাবধানে নাবিস, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন যথেষ্ট আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে, কিন্তু তুমি?

সে কহিল, তুমি নেবে গেলেই আমি দড়ি ধুলে দিগে নাবব। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় কুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি ডিঙিতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি ধুলিয়া দিয়া ইহু ধুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আরও আমি জানি না। ভয়ে বকের ভিতরটা এমন টিপটিপ করিতে লাগিল, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না। মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মস্তগর্জন ছাড়া কোনও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইহু হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাকাইয়া ছড়িয়া বসিল। কুপ তরী তীরে একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্তেই খন্দাকারে সঞ্চ এবং পলতাং লেলিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ

ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উচ্চ জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীল এই ক্ষুদ্র তরঙ্গীট এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অনরিমেয় গভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরহ কালীমূর্তি নিবিড় কালো চুলে দুলোক ও দুলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অঙ্ককার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিশ্ভবিস্মৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধরিয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকূর্ণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দূর্ভেদ্য অঙ্ককারের কোনখানে ঐ লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল, কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে? আমি বলিলাম, নাঃ—

ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে ওনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অঙ্ককার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা, এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এই ভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিসাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌছিয়াছে—এমনি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কোথ যেন তাহাদের কমেও না বাড়েও না, থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক-একবার যুগ্মস্বপ্ন শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়? সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাইত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যঃওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে পড়লে ডিঙি সুদ্ধ আমরা সব গুড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টানতে পারিস?

পারি।

তবে টান্।

আমি টানতে শুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো মত বাদিকে দেখা যায় ওটা চড়া। ওর মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আন্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘাড়ে মাথা ফাটিয়ে পাকো পুতে দেবে।

এ আবার কি কথা! সভরে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—স্বামরা যাব কি ক'রে? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে ম্যাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া সিঁছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্‌ফিস করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন? চল্‌ জোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ! তখন চৌক পার হইয়া পনরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? স্বপাং করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলেন। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আন্তে ভাই—বাটারা ভারী পাঙ্গী। আমি কাউবনের পাশ দিয়ে মকাকের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিরে যাব রে শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলোই বা কি? থরা কি মুখের কথা! ব্যাং শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—বাটারের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু কনি-কেনিস দিয়ে কেবলে ঝলে—আর পল্লাবার জো নেই, তখন বুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে

যতদূর প্যারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অঙ্ককারে আর দেখবার জোটি নাই, তারপর মজা করে সতুরার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাতরে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম গুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুরার চড়া ত যোলনালায় সমুদ্রে, সে ত অনেক দূর।

ইশ্রু ভাঙ্খিলাভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত কোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেঙে গেলে চিত হ'য়ে থাকলেই হ'ল—তা চাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আশ্বরকার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক-চিহ্নহীন অঙ্ককার নিশীথে আবর্তসম্বল গভীর তীর জলপ্রবাহে সাত কোশ ভাসিয়া গিয়া কোলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। ইহার মধ্যে আর এ দিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনের মত হাত উচু বালির পাড় মাথায় ভাসিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার তীর্থ ভাঙন ধরিয়া জনশ্রুতি অর্থবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কতটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীরহৃদয় সন্তুষ্ট হইয়া বিন্দুবে ইটমা গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ভিত্তির কি হবে?

ইশ্রু কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমন করেই পালিয়েছিলাম। তার পরদিন এসে ভিত্তি বেঁচে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘটি থেকে চুরি করে আর কেউ এগেছিল? হারু নাম।

তবে এসকল আর কখনো নয়—একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য। হারুকে ভিত্তি কাঁটান সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া কাঁটির মুখে বাধা আছে—মিটি মিটি করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী এই জলপ্রবাহটা ফাল্গুন মত হইয়া প্রস্রাব হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপব পায়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটায় জেলের বেগে অনেকগুলো মোহনার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনে কাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া বানিকট্য বাহিয়া গিয়াই অমরা ফাল্গুন মত পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো কোলের মত দেখাইতেছে, আরও বানিকট্য অমরা হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌছান গেল।

দীঘল প্রভুরা ফাল্গুন সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখা নষ্ট ইহাকে মায়াজাল বলে। ফালে যখন জল থাকে না তখন এখার হইতে ওখার পর্যন্ত উচু উচু পাড় বসিয়া পুঁতয়া দিয়া তাহারই বহির্ভিকে ভাল টাঙ্গাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় বড় কাৎলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং নড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনের, বিশ সেস কই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইশ্রু চক্কর নিয়েই নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাভবা এখন পুচ্ছভাঙনায় ক্ষুদ্র ভিত্তিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহাব লক্ষণ বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভেঁই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল। গিয়া সে ভাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া বহিলাম। এখন তেমনি গোপনে আবার সেই নৌকা বাহির হইতে হইবে। অনুকূল ঘোড়ে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটিয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা গমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ভিত্তিটি পালের ভুটা ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতিপরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি কি হ'ল?

ইশ্রু আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও বানিকট্য ভিতরে পাগাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালায়া টের পেয়েছে—চারখানা ভিত্তি খুলে দিয়েই এদিকে আসচে—এ মাছ।

তাই ত বটে। প্রকল জল-ছাড়নায় চলাচল লক্ষ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কক্ষকায় সৈন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে ভাল দিয়া বন্ধ, সমুখে ইহার।

পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভূটা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাম্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই কাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে? ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে গ্রহণ করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভূটা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর, কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নির্বিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দূর্তোঙ্গা জল, পাকে লগি পুতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর একহাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেরদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে বেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সময়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ভিত্তি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা পারলেই বড় গাঙে পড়ব।

ওনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানোনে পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। সময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাখীরা মাচার উপরে বসে বুনো গুয়ার তাড়াচ্ছে।

বুনো গুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তালিলাভরে কহিল, আমি কি, দেখতে পাচ্ছি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব ওনিয়া শুরু হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আত্মই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জললে যে বুনো গুয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক কাঁদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনের এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভূটাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সম্ভবিত হইয়া সেনিকে ইন্দ্রের মনোবোগ আকৃষ্ট করিলাম। বড় গুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অশ্রুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, টোড়া, বোড়া, গোখরো, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ভাঙ্গা নেই দেখচিস নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পারের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু যুক্তপন্থ্য করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওয়া নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার পা বেঁধে পালালো। এক-একটা নম্র বড়—সেওগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক শৌছিল

কতক পৌছিল না। আমি নির্বাক-নিষ্পন্দ কাঠের মত আড়ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাং করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিস্ময়সাংসারে আছে, সে কথা কি ও জামেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি ওই আমাদের মত সঙ্কচিত বিস্ময়াকারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আত্ম? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্নতন্ন করিয়া জানিয়া গুনিয়া নিঃশব্দে অকৃষ্টিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—‘শ্রীকান্ত, তুমি একবার নেমে যা’। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত! এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে! ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল—মরতে একদিন ত হবেই—এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, তাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি! কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আত্ম এই বার্ষিকো উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বৃন্দবৃন্দের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আত্ম মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিম্মল অভিমান হৃদয়ের তলদেশে আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় বাথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আত্ম বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান! টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি চের ও তোমার অক্ষুরন্ত ভাগ্যের হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আত্ম পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক্ সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর-কলকয়োল নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি বৈতেছিলাম, অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ যাহাকে আত্মক্রম করিয়া স্রীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, স্রলের বেগ বর্ধিত হইতেছে, এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির প্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটো হাতে করিয়া সম্মুখবর্তী উদ্গম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েছি। মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই, কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন লিটরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি কয় যেন চাঁদ উঠিতেছিল! কাল-বন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনঝাউ এবং ভুট্টা-জন্যের জড়া চান দি-রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

কিন

বড় ঘন পেরেছে ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই!

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত স্নেহাশ্রু কোমল স্বরে কথা কহিল। বলিল,

ঘম ত পাবার কথাই তাই! কি করব শ্রীকান্ত, আজ একটু দেরি হবেই—অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন? এখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি ওটিওটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। হিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। ঐ ডোবে, ঐ ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে। আর কানে আসিতে লাগিল—জলস্রোতের সেই একটানা হুঙ্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া? সে শু আমার তস্কর হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়! কিন্তু ঐ যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া ওনিয়া বলে যে, ওই বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! আসল যা কিছু, তা এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে য' দেখায়, বিস্তার হইয়া সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার ঊত্তর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া আমার নিজীব মনটা তখন বোধ করি এমন-কিছু একটা শান্ত ছবির অন্তরেই বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটু লম্বা ডুবসাঁতার দিয়া একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটা তুলিয়া দেখিলাম, নৌকা ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রথ্য করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে আর ছিল না; তাই তখন আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দুচক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্রোতের তক্তা। বোধ করি আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

ধস-স—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌছিয়াছি। কিন্তু এ কোন জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রথ্য করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইল্ল কহিল, একটু বোস শ্রীকান্ত; আমি এখুনি ফিরে আসব—তোরা কিছু ভয় নেই! এই পাড়ের ওধারেই জেলেরদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিশ্বয়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। এমনই ত সর্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জয়; কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি, শ্রীবন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ,—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল,—আবার কেহ বা কোন কথাই ওনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গতি মাড়াইয়া ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহার মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া, ঝুঁদিয়া, গান গাহিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুটির সহিত মিশি যায় নাই, তাহারও স্বীকার করিল, এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও ওনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল—সেই যে সবদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন—বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরাধ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে কৃত্রিম, মুক্তিফল যাহার তুলনায় ব্যস্তির কাছে বারিকিন্দুর মতই তুচ্ছ—তাহার কে কবে অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স। যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ব ও ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত ছান্দয়ে সজাগ হইয়াছে! তখন সঙ্গীর কাছে উল্ল বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অন্তঃস্ব

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ডয় করব আবার কিসের? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহু-দূরগত সেই অবিদ্যাস্ত তর্জন। আর সমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে—খবরদার বলে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়ে যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বলবি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে ভুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাসনে যেন, ঠিক আমি হলেও না,—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বলব—খবরদার কিন্তু—বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনই ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া ঝাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা দিয়া বরফ-গলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিত্যন্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই! আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোপ্পদের জল। কিন্তু তথাপি, এই নিশা অভিযানের ব্যাটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাবায় ব্যস্ত করা যায় না। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ঝাপটাত আসিয়াই প' দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক হইতে কে যেন শব্দ মারিয়া দেখিতেছে। যেমনি অভ্যুত্থাৎ চাই, অমনি সেও যেন মাথা নীচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাস্তুষ্ঠে শতপাক বেঁধেন করিয়া মুখ নীচু করিয়া উৎকণ্ঠ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবাতা বলিতে বলিতে এইদিকেই আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর অপর দুইজন হিন্দুস্থানী! কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ, এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—এ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক তবুও ছায়া! ভগতে আমার মত সেদিন কে? মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন ভূপ্তি পাইয়াছে! পাক আর নাই পাক, ইহাকেই যে বলে, ঐটির চরম আনন্দ, এ কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি! যাক! যাহারা আসিল তাহারা অসাধারণ কিপ্রভার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিণতিতে ইন্দের হাতে যাহা গুজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি তেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে যুগায় ও কি—এক-প্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চ'ন্দ্রালায় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর আনন্দে ছুটিয়া গিয়া ভড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

হী, তা মানুষের স্বভাবই ত এই! একটুখানি দেখ পাইলে পূর্ব-মুহূর্তেই সমস্তই নিঃশেষে তুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ! ছিঃ! এমন করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিল! এতক্ষণ এই মাছচুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেননা ছেলেবেলায় টাকাঝড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি; আর সব—অন্যায় বটে—কিন্তু কেমন করিয়া যেন সে সব ঠিক চুরি নয়—এমনিই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে। আমারও তাই ছিল। না হইলে, এই 'টুং' শব্দটি কানে যাইবামাত্র এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই

একমুহুর্তে এমন শুষ্ক তৃণের মত করিয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলো গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকাকড়ির সহিত ইহার সম্ভব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ত্রোণে বোধ করি তাহার মাথাটাই কাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার নাায়া প্রাণ্য পাইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ, ছিঃ! এ কি! এ কাজ ত জেলখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাসনি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না।

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ বসে থাকতে পারত না, তা জানিস? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আসব, তোকে শুধু ডেকে আনব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখের উপর সদা মেঘমুখ্ত যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের সব রাগ অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনো ঐ সব দেখেচো?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি—লোকে বলে, তাই ওনেচি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো? ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি রাম নাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে যাস, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হ'লেই তাবা টেব পাবে, এ শুধু চালাকি করছে—তারা সব অসুখ্যামী কিনা!

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্রোত যেন উন্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি ভুলিয়া বোটো হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাব। যাব আর আসব। কেমন?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, 'না বলিবার পথ' ত একপ্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নিভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে, এই মাত্র রামনামের অসাধারণ মহামন্ত্র শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাতে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না এবং তখন হইতেই গা ছমছম করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না, স্তরায় মৎস্যপ্রার্থীর শুভাগমন না হইতে পারে! কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের খাদ্য মটকহিয়া ইষদুষ্ক রক্তপান এবং মাংস-চর্চণের ইতিহাসও ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নার ডিঙ্কিখানি ভরভর করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবরঞ্চ বনঝাউ এবং কসাড়বন মাথা ভুলিয়া এই দুটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিষমরক্তভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরচালনে কি যেন নিবেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদেরই আশ্বীর্ষ-পরিজনেরা সু-উচ্চ কাকরের পাড় সমাজ করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সন্তোষ অমান্য করিতাম না। কিন্তু কণ্ঠায় যিনি তাঁহাদের কাছে বোধ করি 'রামনাম'ের জোর ইহাদের সমস্ত আকেন-নিবেদন একেবারেই কার্য হইয়া গেল। সে কোনদিকে লক্ষ্যপাই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিদ্যুতিকশক্তি এ জায়গাটা একটি ছোটখাটো হ্রদের মত

হইয়াছিল—ওখু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি বাবে কি করে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ, ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিন্তুকণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পড়েছে, ইন্দ্র! ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পড়ে। তারই অত গন্ধ। কোনখানে ফেলে দিয়ে যাই ভাই?

ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই দৃশ্যমান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চলে যায়,—আরে দূর! ভয় কি রে! ও শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করছে। আচ্ছা আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়ে স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে স্পর্শকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাস্তির একা একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে? তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটা সাড়া পাইলাম—অশ্রুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এশ্বিন কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটুবার যেতেই হবে! এই টাকা কটি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিন দিন আসতে পারিনি।

টাকা কাল দিয়ে না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি এলিস নে। আমার সঙ্গে তুইও চল—কিন্তু কারকে এ কথা বলিস নে যেন।

আমি অশ্রুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেমনি স্পর্শ করিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকনো কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়াচড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধাই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপর যে গাছপালা নাই, হুনিট রান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এইজন্য ইন্দ্র পূর্বাঙ্কেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না! গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ—ওখু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে দৃশ্যমানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিস্ত অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষত্যাড়নশব্দ, আর বহুব্রাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিলম্বিত হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া, এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের ছোটপুট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, ওখু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালের বোধ করি জল হইতে বালক—এইমাত্র তুলিতেছিল, ওখু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসৃচিকার নিদারুণ স্বাক্ষর দেয়া করিয়া সে বেচারী মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সজ্ঞপণে

তাহার সুকুমার নধর দেহটাকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-হুলে বিনাস্ত এমনভাবেই সেই ধুমস্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইস্তের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা করিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি!

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখও জল আসিতেছিল সভ্য; কিন্তু ছোয়াছুয়ির প্রভাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে বাথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে ভড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের বেশি কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে! একে ত এই পৃথিবীর সেরা স্নাতন হিন্দুর ধরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজা রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বাধাবান্ধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘট! তাহাতে এ কোন রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি ভাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই ভিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোবে? ইন্ত সারিয়া আসিয়া! একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটু শুদ্ধ ভূগৰ্ভেব মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে চেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে। অহা! মুখে এখনো এত ওষুধেব গন্ধ পর্যন্ত রয়েছে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি ওইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্ত কহিল, আরে এ যে মড়া! মড়ার আবার জাত কি? এট যেমন আমাদের ডিঙিটা—এব দি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ জামগাছ—বুঝিল না? ঐও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ও অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ণ সভ্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এমন খাটি কথা সে বলিতে পারিত। তাহি আমি অনেক সময়ে ভাবিয়াছি, ওই বয়সে কাহারো কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায়? এখন কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইস্তের মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিষ্টেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সভ্য কোন অধ্যাত নিয়মের দশে সেই কিম্বদন্তী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সভ্যের দেখা পাইয়া, অন্যায়সে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত! তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উদ্দেশ্যী না করিয়াই ঠিক ন্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক অরুপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব ও কিম্বদন্তীতে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বৃথিবার এবং বৃথাইক্সর ফলটা। সোনারকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা, বুঝানও মিথ্যা, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই বা কি আসে যায়। তোমরা যাহা ইচ্ছা বুঝ না, তাহার যা তাই ত থাকে। সোনা মনে করিয়া তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার সভ্যকার মূল্যবুদ্ধি হয় না, আর পিতল বলিয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেও তাহার দাম কমে না। সেদিনও সে পিতল, আজও সে পিতলই। তোমার মিথ্যার জন্য তুমি হাজার আয় কেহ লক্ষীও হয় না, ভ্রুক্ষেপও করে না। এই কিম্বদন্তীও সমস্তটাই পরিপূর্ণ সভ্য। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও

থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও না। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, কোন দিন হান দেয় নাই, তখন তাহার বিতণ্ড বৃদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত বিচিত্র নয়।

কিন্তু তাহার পক্ষে বিচিত্র না হইলেও কাহারও পক্ষেই যে বিচিত্র নয়, এমন কথা বলিতেছি না। ঠিক এই উপলক্ষে আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্নকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন—কোনমতেই তাঁহার সংকারেণ লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে, তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে যোগগ্রস্ত হইয়া এই শহরেই রেলগাড়ি হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাহার বাড়িতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই দুই-ত্রি-বাস করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ‘বিলাত-ফেরত’ এবং সে সময়ে ‘একঘরে’। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই ‘একঘরে’র বাড়িতে মরিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সংকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল প্রত্যেকেরই বাড়ির কবাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল গতরাত্রি এগারেটা পর্যন্ত হরিকেনলগঠন হাতে সমাজপতির বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়িয়াছেন, এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম (দাও) করার জন্য এই কুলাস্তারদমিকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, ‘ঘাট’ মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়; তাহার স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়িতেই বলিয়া দিয়াছেন যে ইহাতে তাহাদের কোনই হাত নাই; কারণ জীবিত থাকিতে তাহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙ্গালীর বাড়িতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাহারা এইরূপ নির্ণীতন করিতেছেন তাহাদের বাড়ির দেহ চোখের সম্মুখে বিনা চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে এই কথা তাহাদের গোচর করিল, জানি না। দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু ‘ঘাট’ মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায় পরদিন শ্রাতঃকালে শুনিলাম, ‘ঘাট’ মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া। তাহারো এমনই মার্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাহারো যে এই দৃষ্ট দেন ইহাদমিকে ক্রোধ দিয়াছেন সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাহার যে কথা সেই কাজ; অর্থাৎ কাহারও বাড়িতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এক একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। অস্বীকার করিয়া তাহারো কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই; কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হউক, আমি নিশ্চয় জানি—যাহারা ভানেন তাহারো এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটিই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষ্য পাইয়াছিলেন, অন্ত বড় বড় সমাজপতির অন্তটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই; এবং ডাক্তারবাবু সেদিন এমন করিয়া তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না করিয়া দিলে, কোনদিন এ ব্যাধি তাহাদের আরোগ্য হইত কি না। তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্থময় বনখাউয়ের অঙ্ককারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ণ মমতার সহিত রাখিয়া দিল তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই। কিছুকণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা কুঁকিয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন অশ্রুট

চক্ষুদ্বারা তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত স্নান এবং উৎকর্ষ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুদ্ধমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল। আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল। ইন্দ্র অনামনস্বভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক—আজ আর না।

আমি খুশি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যন্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হী রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে, তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্ণে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্ণে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্, আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া।

আমি কম্পিতকণ্ঠে কাদ কাদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বাটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর, মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই বসে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ ওজিয়া উপড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নহি। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নহি—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল, কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে বোস।

চার

পা আর চলে না—এমনি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক স্নানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এমনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

বতীনন্দা প্রায় আমার সমবয়সী। অত্যন্ত তাহার আনন্দটাই সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উদ্ভট চীৎকার শব্দ—এসেছে শ্রীকান্ত—এই এল, মেজদা! বলিয়া বাড়ি কাটাইয়া আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাগমে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানার পাগোলের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গম্ভীর মনোযোগের সহিত 'পালের পড়া' পড়িতেছিলেন। মুখ তুলিয়া একটীবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাহারও সেই ভাব। শান্তি মিবার এত বড় মাহেশ্বরোপ তাহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

মিনিটবানেক চুপচাপ। সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণধুগল ও উভয় গণ্ডের উপর যে সকল ঘটনা ঘটিবে তাহা আমি জানিতাম; কিন্তু আর বে দাঁড়হিতে পারি না! অথচ কস্মকর্তারও কুরসং নহি। তাহারও যে আবার 'পালের পড়া'!

আমাদের এই মেজদাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। সেই, বাহ্যিক কঠোর তত্ত্ববন্ধনে কল সম্ভাষণে আত্মরা পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম, এবং কলেক পরেই বাহ্যিক সুগম্ভীর 'ওঁ-ওঁ' রবে ও সেক উঠনোর চোটে গত রাত্রির সেই 'নি রয়েল বেঙ্গল কৈও লিপাহারা হইয়া একেবারে ভলিমন্তলার ছুটিয়া পালাহিতে হইয়াছিল—সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখে দেখি রে সতীশ, এ কোন্ আবার বেগুন খেতে আছে না কি; বলিতে বলিতে পালের দ্বার ঠেলিয়া শিসিয়া ধরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া পেলেন—কখন

এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধনি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমুতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইঞ্জের সঙ্গে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই। না বাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাসা—হুলহুল করছে, বলি ছুরটর হয়নি ত? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই। এই যে বেশ গা গরম হয়েছে। এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে তবে আমাব রাগ যায়। তোমাকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদেশে ক'রে তবে আমার আর কাজ। চল ঘরে গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া। বলিয়া তিনি বার্তাকু-ডাকপের প্রশ্ন বিন্ধুত হইয়া আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগ্ধীরকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়। মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চাঁৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—স্ববরদার! যাসনে বলচি শ্রীকান্ত।

পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন, সতে! পিসিমা অত্যন্ত রাগভারী লোক। বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আনন্দে পাকিত না।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; কখনও, কোন কারণেই তিনি চোঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ সতীশ, যখন তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারখোর করিস। আঙ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস আমি জানতে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব! বেহায়া নিজে ফি বছর ফেল হচ্ছে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে! কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারুক তুই জিজ্ঞেসা পর্যন্ত করতে পাবিনে—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারো নাই—সে কথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনয়া কাপড় ছাড় গা দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম জিলাপি আহাৰ করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মারলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট-পাঁচেক পরেই খট করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানায় উপড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আভিলাষে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি দম লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েছে জানিস? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই। তুই, আমি, যতে একঘরে পড়ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন! ওকে আমরা আর কেয়ার করব না। বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাসুত একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোটদাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া: ‘ম-ই’ এখানে আনিয়াছিল। এথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি! আমি! আমার জনোই হ'ল তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাটুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।

আজ্ঞা দিলুম। নিগে যা আমার ডের থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাটুটা বোখ করি সে ঘটনাক্রমে পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আন্দোলন। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্বল্যতা একবিশু কল্প নয়! মেজলা তাহার অগ্রজের অধিকারে বেচ্ছাচারে ছোটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই কিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়ল। তাহার প্রাণতুলা প্রিয়বস্তুটিকেও অসম্বোধে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ মেজলার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না; রবিবারে দুপুর রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাহার তাস খেলার বন্ধ ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাহার দিবানিত্যের সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত। শীতের রাতে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকিয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাহার বহির পাতা উন্টাইয়া দিতে হইত—এমনি সমস্ত অত্যাচার! অথচ ‘না’ বলিবার জো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পৰ্ব্বন্ত নাই। ঘৃণাকরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়েগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন যাও, একটা ভাল দেখে বাড়িরের ছড়ি ভেসে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে, ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হউক, অপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যক, কারণ স্কুলের সময় হইতেছে! আমার জ্বর—সূতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে সেই রাতেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত-আট দিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়েছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্ড্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। কিন্তু সেটা যে অনেক দিন পরে, একথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল কিরিয়াছি। গঙ্গার তখন জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটুখানি ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল, আমার ডানদিকে বোস। ভাল আছিস ত রে শ্রীকান্ত? বুকের দ্বিতরটা ধক করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহেব ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে যে যেখানে আছে এক মুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কঠরও আমার সেই দশা হইল! চক্কর পলকে সর্বাসের রক্ত চঞ্চল, উদ্দাম হইয়া বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিসটা ভাবায় ব্যস্ত করিয়া পরকে বুকানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন, তা নয়, বোধ করি বা অসম্ভব। কারণ বলিতে গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি—গোমন বুকের রক্ত তোলপাড় করা—উদ্দাম চঞ্চল হইয়া আছাড় খাওয়া—তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই সব ছাড়া ত আর পথ নাই! কিন্তু কতটুকু ইহাতে বৃথাহিল? যে জানে না, তাহার কাছে আমার মনেব কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল! আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব, এবং সেই না কি করিয়া তাহা জানিয়ে? যে নিজের জীবনে একটি দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিদিনান্ত স্বরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে এই ভয়েও অহরহ কীটা হইয়া আছি, সে এমনি অক্ষমাৎ, এতই অন্তাকর্ষীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আকিরা বসিতে অনুরোধ করিল! পাশে গিয়াও বসিলাম। কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে শ্রীকান্ত! আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়। আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই। ইন্দ্র বুশি হইয়া বলিল, কান্না। দেখ রে শ্রীকান্ত, তুই চলে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ভেবেছিলাম—যেন তোকে কেউ না রাগে। কালীঠাকুর বড় আগ্রহ দেখত। রে! মন নিয়ে ভাবলে কখনো কেউ মারতে পারে না। মা এসে তাঁদের এমনি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে পারে

না। বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বোধ করি ঠাকৈই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শিতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি? ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জ্বাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জ্বাফুল বড় ভালবাসেন। যে যা বলে দেয় তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস নে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি? ইন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার? আমার কথখনো অসুখ করে না। কখনো কিছু হয় না। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেব। যদি তুই দুবেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুরসেবতার নাম করিস—ঠাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতি পাবি। তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না—তুই আপনি টের পাবি। আমার মতন যেখানে খুশি যা, যা খুশি কর, কোন ভাবনা নেই। বৃষ্টি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হঁ। বঁড়শিতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?

কোথায়?

ওপারে মাছ ধরতে?

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে। তাহার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর এক দিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিবা দিয়ে—কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন পথমত গাইয়া চূপ করিয়া গেল।

উহার সম্বন্ধে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিধিয়াছে। কোন মতেই সেই সেদিনের মাছ-বিক্রিটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি বা চূপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিবা দিলে তাই? তোমার মা?

না, মা নয়। বলিয়া ইন্দ্র চূপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সুতাটা ধীরে ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়িতে বলে দিসনি?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে, কিন্তু তাহাও করিল না—চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে সর্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এমন তাহাও নাই, এবং কি-একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না, বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখনি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনারাও এ কথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন অস্ত্রদৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, অন্য কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তার অন্ধকারে রাস্তা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিদ্দিয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই?

তোর—তোর কাছে টাকা আছে?

ক' টাকা?

ক' টাকা? এই—ধনু, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে? বলিয়া আমি ভারি খুশি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলাম। এ কয়টি টাকাই

আমার ছিল। ইন্দ্রর কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সম্ভাবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কে খুশি হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি এক-রকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে? চক্কর নিমেবে আমার সে রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে? ইন্দ্র অনামনস্ক ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটীবার বেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে, এ টাকাও নেবে না; মনে করবে, আমি মায়ের বাগ্ন থেকে চুরি ক'রে এনেছি! যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না, দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত? আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়েসেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস, আমি নিয়ে যাব; আবার তখুনি ফিরিয়ে আনব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটা ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার 'না' বলিবার সাধা রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরের প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্বাস্থে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্বাগ্রে ইহাই মনে পড়িল আত্ম যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই আমার ভাল হইবে না। কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজলার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শাস্তি কামনা করিতে পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া। নাই বা কথা রাখিলাম; এমনই ব্য তাহাতে কি আসে যায়! যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শরবাড়ের নীচে সেই ছোট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে নৌকাটিতে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই! সেই দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে জিনিসটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারা জীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমনি করজনের ভাগ্যে ঘটে? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম? জীবনে এমন সব শুভ মুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার ভাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পাথের ঘাটে এত পানের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রর দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহার? শুকুও কেনন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ, যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সস্তীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জব্ব্য গোপনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পূণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কি না। থাকিলেও কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহার নির্দেশমত কখনো কোন সংবাদ লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে মনে তাঁর প্রশ্ন করিয়াছি, তাহা যিনি সব জানিতে পারেন, তিনিই জানেন।

আমাদের সেই সঙ্গীর্ণ বাড়ির পাশে খটকুমূলে ডিঙি বাঁধিয়া যখন দুজনে রওনা হইলাম, তখনও

অনেক বেলা ছিল। কিছু দূর গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মত ও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পৰ্ণকূটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সামান্যে তাহার বাঁধন খুলিয়া চেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছে এবং পাকড় গাছ সমস্ত ছায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগি এবং ছানাগুলো চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা দুই ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিম্নে অশ্রুট চীৎকারে মুরগিগুলোকে আরও ত্রস্ত ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পাঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া কাছে গিয়া তাহার পেটটা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পৰ্ণকূটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর হেঁড়া চাটাই ও হেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা-গোছের লোক শ্রবণ কাসির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড় মাল। গায়ের জামা এবং পরনের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং এক প্রকার হলুদে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সাহায্যে বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বটিতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহজী সযোজন করিল এবং সে আমাদের কাছে বসিতে ইচ্ছিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গায়ার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র বিরক্তি না করিয়া, আদেশ পালন করিতে লাগিল গেল এবং প্রস্তুত হইলে শাহজী সেই কাসির উপর ঠিক যেন মরি-বাঁচি পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা কাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, শিয়ো।

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না! শাহজী অতিমাত্রায় বিষ্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু উত্তরের জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপড় করিয়া রাখিল। তার পরে দুজনের মূদূকটে কথাবার্তা শুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহজী হিন্দিতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙ্গলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহজীর কঠোর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উদ্ভল চীৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তারপরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়, উঠিলাম, বলিলাম, বেলা যায়; তুমি সেখানে যাবে না?

কোথায় শ্রীকান্ত?

তোমার দিককে ঢাকা দিতে যাবে না?

দিদির জন্যই ত বাঁসে আছি। এই ত তাঁর বাড়ি।

এই তোমার দিদির বাড়ি! এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান! ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্ভল হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন স্তান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বলব। সাপ খেলাব দেখবি শ্রীকান্ত?

তাহার কথা শুনিয়া অবাচ হইয়া পলাম। তুমি সাপ খেলাবে কি? কামড়ার বধি? ইন্দ্র উঠিয়া

গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট কাঁপি এবং সাপুড়ের কাঁপি বাহির করিয়া আনিল ; এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধান আলগা করিয়া কাঁপিতে ঝুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখরো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আকস্মিক মনে করিল না, শুধু ইচ্ছিতে জানাইল যে, সে গোখরো সাপই খেলাইবে ; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কাঁপি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ গোখরো একহাত উচু হইয়া যশা বিস্তার করিয়া উঠিল ; এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রের হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া কাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ কাঁপির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটো একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কল্যাণ আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে? ও বেরিয়ে যদি শাহজীকে কামড়ায়? ইন্দ্রের লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের অগভূটা টেনে দিয়ে আসব? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে? আমি বললাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে। ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এমিক ওমিকে চাহিয়া বলিল, কামড়াক বাটাকে! বুনো সাপ ঘরে রাখে—গাঁভারো শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে দিদি! এসো না, এসো না ; এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রের দিককে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহি! যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাধ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটিবাধা কতকগুলো ওকনো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-সবজি। পরনে তিস্তুম্বারী মুসলমানীর মত জামাকাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপান, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দুগাছি গালার চুড়ি। সিথায় হিন্দু নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন। তিনি কাঠের বোকাটা নামাইয়া রাখিয়া আগভূটা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি? ইন্দ্র মহাবাস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেছে। তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাতলায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেছে, এ ত বড় আশ্চর্য! কি বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—কিন্তু কি করে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্র বলিল, কাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো-সাপ।

উনি ধূমোচ্ছন্ন বৃষি? ইন্দ্র রাগিয়া কহিল, গাঁভা খেয়ে একেবারে অস্ত্রান হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঠেঁচিয়ে মরে গেলেও উঠবে না। তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে, না? আচ্ছা এসো, আমি ধ'রে দিচ্ছি।

তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহজীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগলহিয়া দাঁড়ইল। তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য চোখ দুটি তাহার ছলছল করিয়া উঠিল, কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগল, অত পূর্ণা তোরা এই নির্মির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখনি ধ'রে দিচ্ছি ধাখ। বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কোরোসিনের ডিশা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া কাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র টিপ করিয়া তাহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা মাখায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে। তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন, এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুষন করিয়া মুখ ফিরাইয়া বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখদুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রের দিদি হঠাৎ বার-দুই এমনি শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রের সেনিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সমগ্রহে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন ছি দালা, এমন

কাজ আর কখনো করো না। এ সব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে তাই? ভাগ্য তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বলত?

আমি কি তেমনি বোকা দিদি? বলিয়া ইন্দ্র সম্রাতিত হাসিমুখে ফস্ করিয়া তাহার কৌচারণ কাপড়টা টানিয়া কোমরে সূতা-বাঁধা কি একটা শুকনা শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই দ্যাখো দিদি, আট-ঘাট বেঁধে রেখেছি কি না। এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত? শাহজীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে? এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না; আর তাই যদি বা কামড়াতে—তাতেই বা কি! শাহজীকে টেনে তুলে তক্ষুনি বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধ ঘণ্টা? একঘণ্টা? না অতক্ষণ লগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু ভেমনি নীরবে চাছিল। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, আজ দাও না দিদি, আমাকে একটি। তোমার দুটো-তিনটে রয়েছে—আর আমি কতদিন ধরে চাইছি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাএ না করিয়া ক্ষুদ্র অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল আমাকে তোমরা যা বল আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, নয় পরশু—যদি নাই দেবে তবে বলে দাও না কেন? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুপনি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়িতে শুধু সাপের মস্তুর আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস রে?

ইন্দ্র অসন্তোষে বলিয়া বসিল, তবে না ত কি! নিশ্চিত শাহজীকে একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্ছে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মস্তুরটুকু দিয়েছিল আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোশামোদ করিচ নে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্ত্র আদায় ক'রে নেবো। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, শাহজীকে উদ্দেশ্য করিয়া গভীর সন্ত্রনের সহিত কহিল, শাহজী গাভা-টাঁকা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসীমড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিত পারেন—এত বড় ওস্তাদ উনি! হাঁ দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল! সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্যন্ত কম লোকেকেই দেখিয়াছি। কিন্তু সে যেন নিবিড় মেঘডরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক দিয়াই গেল না। বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি করে তোমাকে সব বিদ্যো দিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাকব। তুমি কটা মড়া বাঁচিয়েচ দিদি।

দিদি কহিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মস্তুর শাহজী দেয়নি? দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, ইন্দ্র মিনিট-খানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যো কি কেউ শীগগির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কাকে কড়ি-চালা বলে, তাইত জানিনে ভা!

ইন্দ্র বিদ্বাস করিল না। বলিল, ইস! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মস্তুর প'ড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধরে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে ছাড়ির ক'রে দেয়। এমন মস্তুরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন ধুলো-পড়া এ সব জান

ত? আর যদি নাই জানবে ত অমন সাপটাকে ধ'রে দেবে কি করে? বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে নিদ্রিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ সব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস ভাই, তা হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেসে ব'লে আমার বুকখানা হাফা করে ফেলি। বল, তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তুঁতহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব—যা বলবে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বৈ কি ভাই! তোমরা যে ভ্রাতালোকের ছেলে। যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমি ত কখনও মিথ্যা কথা কইনে ভাই! বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া স্নানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাঙ্কা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অশ্রুট কিরণ-রেখা গাছের ঘনবিনাস্ত ডাল ও পাতার পাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব! কিন্তু ভেবে দেখছি, এখনও সে সময় আসেনি। আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস করো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যা আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ে না। আমরা তত্ত্বমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।

কি জানি কেন আমি এই অত্যন্ত কালের পরিচয়েই তাহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ত্রুঙ্ক হইয়া কহিল, যদি পাব না, তবে সাপ ধরলে কি করে?

দিদি বললেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মস্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দুজনে জোচ্চুরি করে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাৎ ভাবাব দিতে পারিলেন না; বোপ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ্ জোচ্চার সব—আজ্ঞা আমি দেখাছি তোমাদের মজা।

অমূরেই একটা কেরোসিনের ডিগা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। সভয়ে সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে—ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

স্ববসা বার করে দিচ্চি—চলবে শ্রীকান্ত, জোচ্চার শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটার। বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমাঃ হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া আমাঃ টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না, কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ছুমিসাং হইয়া গেল, কিন্তু আমার দুই চোখ যে নিদ্রিত সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিচ্চি না। দোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়িয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার ানে এনেছিলাম দিদি—এই নাও।

ইন্দ্র হোঃ ্রয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জোচ্চুরি করে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তুঁহ জানিস শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম করে এনেচি—
ওঃ—ভারী দিদি! বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহজীর নেশার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কেয়া ভয়া, কেয়া ভয়া? বলিয়া উঠিয়া বলিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা। দাস্তায় তোমাকে দেখতে পেলো চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া ভয়া? বদম্বাস ব্যাটা কিছু জানে না—
আর বলে বেড়ায় মস্তুরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এপার ভাল ক'রে বাঁচবে তোমাকে! বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শাহজী চমকাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর; তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড! সেই যে সাধুভাষায় বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া ডাকিল, শোন ইন্দ্রনাথ, কি হয়েছে বল ত? আমি তত্বকে এই প্রথম বাঙ্গলা বলিতে শুনিলাম।

ইন্দ্র গিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিলে এত দিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ এ শুদ্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে, তোর কানকড়ির বিদ্যে নাই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক চকাবাব। এঁট তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর।

শাহজীর চোখ দুটা ধক করিয়া জুলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহাৎ এলোমেলো ভাটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমুখে আসিয়া কহিল, বলচিস তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, বাড়ির হাছে—চল না। রাত্রি হইতেছে সভ্য, কিন্তু আমার পা যে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহজীর কষ্টস্বর আবার কান আসিল—কেন চলি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যন্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আর্তস্বর পিছনের আঁধার কুটার হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিধিল এবং চক্কর পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সমুখের একটা শিরাকুল গাছের মস্ত কাণ্ড ছিল; আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাস্থ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাঁধে : সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকাই : এমনি করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে যখন কোন মতে শাহজীর বাড়ির প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে দুই-শিমোর রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহজী লোকটি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অস্তিত্বও কত বেশি শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয় সে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিত্ত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রা শাহজীর সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তার টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজর পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড় জামা রঙে ভাসিয়া যাইতেছে।

ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেয়েচে—এই দাখ। জামার আত্মনি তুলিয়া দেখাইল, বাহতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাদিস নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বোঁধে দে—এই খবরদার। ঠিক অমুনি ব'সে থাকো। উঠলেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার করব—হারামজাদা গুয়ার। নে, তুই টেনে বাধ—দেখি করিস নে। বলিয়া সে চড়চড় করিয়া তাহার কৌচার খানিকটা টানিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহজী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিবাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন করতে পার। আমি তোমার হাত বাঁধব। বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছেপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নেমকহারাম শয়তান এই বাটা। বাবার কত টাকা যে চুরি করে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিবা দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বসল। শ্রীকান্ত নক্তর রাখ, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখেমুখে জলের কাপটা দিই।

জলের কাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, 'ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি ক'ব না,' সেই দিন থেকে ঐ শয়তান বাটা দিদিকে কত মার মেবেচে, তা'ব হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে খুঁটে বেচে বাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবুও কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ'লে দিদিকে ও খুন করে ফেলবে, ও খুন করতে পারে।

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষমাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এমন নিশ্চিন্দ হইতে দেখিয়াছিল। যে, আমি আত্মিও তাহার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আত্ম লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেন, পরন্তু উল্টু কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্তত করিবেন না। ওপাশে এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বন্দুবে অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর! তাহার বিহ্বল ভাবটা ঘূচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহজীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর ভাই, আর কখনো এ বাড়িতে আসিস্ নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্ নে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করিতে গিয়েছিল, সেটা কিছু নয়। আর আমি যে ওকে বোঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমরা দু'জন!—আর শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন। একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না

তাহা পরে যত বেশি বুঝিয়া থাকি না কেন তখন বুঝি নাই। তথাপি আমি অলঙ্ঘ্য নিঃশব্দে সেই টাকা পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্ড্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্ড্র প্রান্তরের বাহিরে আসিয়া ঠেঁচাইয়া বলিল, হিমুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্মকর্ম! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দু'জনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্ড্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

আশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনও চলিয়াছি, কিন্তু কেন জানি না, আজ আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমন বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাতে কেমন করিয়া বাড়ি ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষরাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্ড্র কহিল, বাড়ি যা শ্রীকান্ত! তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও আর আমার সামনে আসিস্ নে! যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে বাকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া বসিলাম।

ছয়

নিমন্তক গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্ড্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর নামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ির যে কঠিন শাসনপাল উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া অকর্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে-ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আঙনে দন্ড করিত, 'হার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত। ছেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা, জিম্নাস্টিক আখড়ার মাস্টার। তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ও তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে কেনই বা দুদিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্ড্রের উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প শুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে, কিংবা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব ১০০রাচর এমনই দাঁড়ায়। বোধ করি তৎপারস্য পরবর্তী জীবনে অনেক 'বড়' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া স্বকৃতের মূল্য ধার্য করিতে না যাই। গেলোই যে দেখিতে দেখিতে 'বন্ধু' প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধেঃ বন্ধুত্বপাশ দাসত্বের বেড়ি হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সভ্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন-চারিমাশ কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দশমের বাড়িতে কাঙ্গীপুঞ্জা উৎসব পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাধা হইতেছে।

‘মেঘনাদবধ’ হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগারে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নওয়া-খণ্ডয়াও নাই, বিজ্ঞানও নাই। স্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করিতে পারিয়া একবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভায়ী আশা করিয়াছিলাম, রাঙে ছেলেরা যখন কানাতের হেঁড়া দিয়া গ্রীনকমের মধ্যে উকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কুপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। দশটার পর ঘণ্টা গ্রীনকমের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা ‘বেল’ হইয়া গেলে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপাবটার উপরেই হস্তশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভ্যমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি স্নেহ! জীবনে অনেক স্নেহ দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাগ পলসাই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল খাড়ে করিয়া দাঁড় কড়িমড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ডুপসিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি নান্দুগই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমন সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উন্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা ভরির কোমরবন্ধটা পটাস করিয়া ছিড়িয়া পড়িল। একটা হেঁটে পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চোঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহাবও কোন কথা, বিচলিত হইলেন না। বা হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেটুলানের মুট চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধনা বীর! ধনা বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বা হাতেব অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে। অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আশ্রয়লাভ করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর একটা আঙ্গুরের চাপ পড়িল। মুগ্ধ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র। চুপচুপ কহিল, আর শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকলেন। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা ঝাড়া হইয়া উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়। বলিয়া চলিতে লাগিল।

গম্বার ঘাটে পৌছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দুজনে শাহজীর কুটারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি আর বেশি নাই।

একটা স্কোরোসিনের ডিপা জ্বলাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রেশডের উপর শাহজীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোবরো সাপ লম্বা হইয়া আছে।

দ্বিধি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন ‘আজ দুপুরবেলা কাহার বাড়িতে সাপ ধরিবার

বাঘনা ঘ্রাণে। সেখানে এই সাপটিকে ধরিয়া বাহ্য বকশি পায় তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাড়াল হইয়া সম্মার প্রকালে বাড়ি ফিরিয়া দিমির পুনঃপুনঃ নিশেষ সন্তোষ সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাজ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পরিবার সময় মদের ঠোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গলে, সেও আদর করিয়া শাহজীর গলার উপর তীব্র চুষন দিয়াছে।

দিদি তাহার মলিন অঞ্চল-শ্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তার চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশি নেই। বললেন, আর দুজনে একসঙ্গেই যাই, ব'লে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধ'রে দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে এ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তার পরে দুজনেরই খেলা সাজ হ'ল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অভ্যস্ত সন্তর্পণে শাহজীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল গুঠাধরে গুঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু শেষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই, তাই এই দিক্ষে করি, এ-একটি তোমরা উপায় ক'রে দিয়ে যাও। আসল দিয়া কুটারের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটি জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ, আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে থাকতে পাই! সকাল হ'লে সেই জায়গাটুকুতে একে শুয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ ক'রে গেছেন—তবু একটি শান্তি পাবেন। ইহু প্রমা করিল, শাহজী, ক কি কবর দিতে হবে? দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইহু পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হী, মুসলমান বৈ কি।

উত্তর শুনিয়া ইহু কেমন যেন সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম এ জনাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিল। এই বোধ করি, মনেস মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার কি বিশ্বাস হইল না। তাহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দু-কন্যা নহেন।

বাণী রাতটুকু কাটিয়া গেল, ইহু সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা পরাধরি করিয়া শাহজীর মৃতদেহটা সমাধিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় জায়গা ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্যলতার আচ্ছাদন। প্রিয়বস্তুর সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মুক্তিকাতলে চিরানন্দের অভিকৃত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তপনও সূর্যোধয় হয় নাই—নীচে মধ্যরাত্র্য ভাগীরথীর কুলকুল শব্দ কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশপাশে বনের পখিরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল আজ সে নাই। কাল প্রভাত ৫ কে ডাবিয়াছিল, আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে.এ.নিত, একজনের শেষমুহূর্ত্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণকণ্ঠে কাদিয়া উঠিলেন, মা গঙ্গা, আমাকেও পারে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। তাহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই। যেমন দুদিন পরে পারিয়াছিলাম। ইহু একবার আমার মুখের পানে চোখ ফুটিয়া, তার পরে উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত নারীর ভূ-সুচিত মাথাটি

নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্দ্র করে বলিয়া উঠিল, নিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে নিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

নিদি কথা কহিলেন না। মুর্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তার পরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গল্পান্বন করিলাম। নিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গাঙ্গার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মাটি মিয়া সিঁথির সিন্দূর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন, যে, শাহজী তাঁহার স্বামী ছিলেন। ইহা কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দ্বিদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে নিদি।

নিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইহা শ্রবণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া কহিল, জ্ঞাত দিলেন কেন?

নিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জ্ঞাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বৈ ত নয়। নইলে আমি নিজে হ'তে জ্ঞাতও সিঁহি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি।

ইহা গাঢ় করে কহিল, সে আমি দেখেছি নিদি—সেই জন্যই আমার যখন-তখন এই কথাই মনে হয়েছে,—আমাকে মাপ কোরো নিদি, তুমি কি ক'রে এর মধ্যে আহ—তোমার কেমন ক'রে এমন দুর্মতি হয়েছিল! কিন্তু এখন আমি আর কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে। এখন চল।

নিদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইচ্ছানাথ।

কেন পার না নিদি?

নিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইহা হঠাৎ ব্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে আমিও জানি! তাড়িয়ে দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা; কিন্তু তোমার তাতে কি? কার সাধ্য তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার।

অন্ত দুঃখও নিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটকি ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম। স্বামীর শ্রম যে আমার নিজেরই শ্রম। সে পাওনাধারকে তুমি কি ক'রে বাধা দেবে ভাই! তা হয় না, আজ তোমারা বাড়ি যাও—আমার অজ্ঞান বা কিছু আছে বিক্রি ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি। কাল-পরও একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, নিদি, আমার কাছে বাড়িতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব? কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই! তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দদা আমি মরণ পর্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর জন্য চোখের জল ফেলেন। বলিতে বলিতেই তাঁহার দুঃখ দিয়া করকর করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটী ফিরিতে উল্যত হইলে, সেমিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাখা পর্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইহের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইচ্ছানাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করণীয় বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মমুষের আশীর্বাদের

বাহিরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে-মনে আজ সঁপে দিলাম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রশাম করিল। কাদ-কাদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরে না। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হচ্ছে তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না। সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেমনি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দুজনেই মনে-মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটিব পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গোটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ভেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইশারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল, দিদি নৈ—কোথায় চলে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কাঁহল, কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে, বলিয়া একখানা ঠাক করা হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর-একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই নীড়িত, এতই শোকাভূত হইয়াছিল যে, কাঁহারও সঙ্গ বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া তাঁত খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া পরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদি মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আন্ত নয়, যতদিন ঈর্ষিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। কিন্তু আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিয়ো না। ইন্দ্রনাথ আমাকে বুজিয়া বেড়াইবে, সে জানি। কিন্তু তুমি আগেকের কথাইয়া-সুখাইয়া নিরস্ত করিয়ো। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে বলিয়া বসিতে পারিতাম। অথচ কেন যে বলি নাই—বলি-বলি করিয়াও কেমন চূপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটিই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। ভাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্রানি কবিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না। অথচ কেন জানি না, আমার এই অসুবিধীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোন মতেই বিচার লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির না। অমদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়িতেই ছিলেন—ইহাকেই হত্যা করিয়া দীর্ঘ নিকরেশ হন। এ দুঃখ কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি

ছেলেমানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়? এ লজ্জা কি মর্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আওন তিনি তাঁর স্বীর বুকের মধ্যে ছলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে ছালা আজও তোমার দিদির খামে নাই। যাক সে কথা। তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেলে তোমরা-তাকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেলে আমাদেরই বাটার সম্মুখে তিনি লাপ খেলাইতেছিলেন। তাকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ঠাঁক দিতে পারেন নাই। তর্নি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যেই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে, বিড়কির দ্বার খুলিয়া আমার স্বামীর জন্যেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম, তিনি কোন মতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ পল্ল এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সূতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা ছাড়া আমি আবার মুসলমানী।

এখানে স্বামীর ঋণ বাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দুটি সোনার মার্কড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি। তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই। আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর মে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিয়া না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার দিদি, যেখানেই থাকুক ভালই থাকিবে; কেননা দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর বাধা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব স্বস্তিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতীর যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি — অন্নদা

সাত

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মার্কড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু মার্কড়ি দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রি করিয়া লাহরীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ, মুখে মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে-পাঁচ আনা পরস্যা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পরস্যা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথ একাকী ব্যত্যা করিয়াছেন। পাছে তাহার সেই ব্রহ্মস্পদ বালক দুটি তাহাকে আশ্রয় দিবার বাধা হয়সে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিশ্চেষ্টে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কহাকেও জানিতে পর্বত মেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্বে কতদিন কত আত্মশুকসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার পুণ্য মিনাইয়া গেল। অতিমানে চোখ কাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য ব্রহ্মপদে চলিয়া গেলাম। ব্যর ব্যর বলিতে লাগিলাম, ইহের কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—বাইবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিরাছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব। সেই জলন্ত শিখায় যাহা আমি দিব, তাহাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া বাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা। ইহা আর আমি কি

এক ধাতুর প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব। তা ছাড়া ইহাও ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক সে কথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানি চিরদিন তেমনিই দেখিতে পাই। তাহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রশ্রয় করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মিণীকে অপরিচীত দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি। তাহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ভগবতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্তব্যের দ্রবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে,—সমাজ, সংসার, সমস্ত সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যার আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেণ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাহার এইসব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যেখানে যত দূরেই হউক, এ দেশের বাহিরে হইলেও হয়ত এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদ! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলভাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দৃষ্টির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি! পূর্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদির মনে পড়ে! যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, ভগবতের আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি মেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল কিন্তু বিশ্বাস করি। পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তার পরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙি কূলে ঝাঁপ। জলে ডিঙিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিনমাত্র অশ্রুরা উভয়ে সেই নৌকার চড়িয়াছিল। সেই শেষ। তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতলি যেন হুঁচের মত গায়ে বিধিতেছিল। আকাশ পূর্ণচন্দ্র। চারিদিকে জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল,—তে গিয়েটার হবে, যামি? থিয়েটারের নামে একেবারেই কাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শীগগির আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা রূপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহিরে হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ঐ যাইতে হয়। ভাবিলাম, তাহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিকংসা হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

বাক দীর্ঘ বীথিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বলিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দের নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌছিলেন। তাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভরদ্বার বাবু। সিক্কের স্নোজা, চক্চকে পাশ্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোট মোড়া, গলার গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুনি—পলিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অঙ্ক নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত ‘মার্কেডাই’ বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দের কাঁখে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে? ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দীর্ঘ বিচাইয়া বসিলেন, আবার শ্রী—কান্ত—। শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, ইকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক!

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজছি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দের মাস্তূও ভাই, কলকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল. এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপনা কি রে? রূপার? আহা, রূপারের কি শ্রী। তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুট্চে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দ্বিগ্ন নতুনদা। আমার শীত করচে না—এই নাও, বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গজা। অধিক প্রশস্ত নয়। আঘঘটার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা এ যে ভারি মুন্সিল হ'ল, হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক। কলিকাতাবাসী নতুনদাও অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র এবং মল্ল হোসিয়া কহিল, দাঁড়। কাকুর সাধিা নেই নতুনদা, এই রেস্তােলে উল্কােন বয়ে যায়। আমাদের কিরতে হবে।

প্রস্তাব গুনিয়া, নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন ক'রে হোক তোকে পৌছে দিতেই হবে। আমায় থিয়েটারে হারমেনিয়াম বাজাতেই হবে—তাঁরা বিশেষ ক'রে খরচে। ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমেনিয়াম! চল, যেমন ক'রে পারিস নিয়ে চল। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জুলিয়া গেল। ইহার বাজনা পরে গুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দের অবস্থা—সভট অনুভব করিয়া আমি আশ্বে আশ্বে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দীর্ঘমুখ ভ্যারাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে কবিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত বঁসে থাকা হচ্ছে কেন?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া কখনো না নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার বেঁধিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অখণ্ড বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা বহিষ্কৃত বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা বুসে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে

পারিষেন না। ইহু বলিতে গেলো, না খুলে—

হ্যাঁ, দামী দস্তানটা মাটি ক'রে ফেলি আর কি! নে—যা করছি ক'র।

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্রেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বসাসে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নাড়লে চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রাম চোঁচামেচি করিয়া ঝকুঝকিতে লাগিলেন।

আর বিপদ গজার কচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুণ্ণার উদ্বেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিস্মৃত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দুটো বাকিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্রিশ্রু হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইহু, এদিকে থোড়ামোড়াদের বস্ত্র-টুঙ্গি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইহু কহিল, সমানেই একটা বেশ বড় দাঁড়ি নতুনলা। সেইব ভিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ টান না একটু জোরে—ভাত খাসনে? ইহু বল না তোর ওই ওটাকে, একটু বেশ করে তৈরি নিয়ে চলুক।

ইহু কিংবা আমি কেহই তাঁহার কবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম, তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিলিয়াছিল। ভিত্তি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সজীব জলে ডুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হ্যাঁ পা একটু খেলোনা চাই। নাবা বরকার। অতএব ইহু তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া জানিল। তিনি জোৎস্নার আলোকে গজার গুপ্ত সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুণ্ণাশ্রিত উদ্বেগে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুমিয়াছিলাম, এ হাওয়ায় এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আত্মা সংগ্রহ করে সহজ ব্যাপার নয়। তথাপি চেষ্টা না করিয়াও এ নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইহু তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনলা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে ও ৩ বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ভিত্তি কেউ নেবে না—চল।

নতুনলা মুখখান বিকট করিয়া বলিলেন, ভয়! অম্বা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকে ভয় করিনে তা জানিনা? কিন্তু তা বলে ছোটলোকদের dirty পাত্রের মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটারে গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের দামে হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিবরু হইয়াছিলাম যে, ইহু আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই সোকাটোর সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না। ইহুর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, টুন-টুন পেয়ালা—

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি-সুরে সঙ্গীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইহু নিজেও তাঁহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও স্নেহ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে হাঁস, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, ঠ।

ইহু তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দ্রিষ্টে দ্রিষ্টে চলিল। তিনি অচিরেই বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আরো সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙ্গালী ডেপুটির মাঝে মাঝে

এত সূচ্যাত্তি শুনতে পাই কি করিয়া? তখন তাহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টার নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন, আর কোন কালে নয়। অথচ ঘণ্টাকয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানের তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্য এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রের জানা ছিল। সে গিয়া মুদীর দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অনুরোগী নিষ্কর্মা ভািন্দারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমহিতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আশুন না দিয়া, শুধুমাত্র চোঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগিয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যাবাদী অর্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথো-প্রতিজ্ঞা-পাপে দণ্ড হইয়া মরিতে হইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারত্বের চীৎকার করিয়া, এবং যত প্রকার ফলি মানুষের নাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আশ্বঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জি পাড়া'র চিকুমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দু'জনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুনদা, ও নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহান শুধু বায় ও দর্জিশের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা বাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনস্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'জড়ারের' জ্বালায় সময়ে সময়ে বাড়িবাড়ি হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথারই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্বপ্রকার কঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য। কিন্তু এতবড় অভিলাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বাসুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্চক করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সূ'র একপাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে ওইয়া পড়িল—শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার যখন মুদীরদোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার বার্থ প্রশাস পাইতেনিলাম, তখন এই দিকের কুকুরগুলোও যে সমবেত আতঁটাৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার বার্থপ্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেওলা এখনও চোঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব। আমি সত্যয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তুমি পাগল হইয়াছে! ভাই! ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে কিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে কেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ-হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক শ্রীকান্ত! আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস—আমি চললাম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আশ্বাসন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দস্ত মিথ্যায় মিলাইয়া বাইবে। আমি নিষ্কর জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা বাইবে না, সে বাইবেই। তব্বেই লিখিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কখন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব। যখন সে নিভাস্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও বাঁহােক-একটা হাতে করিয়া

অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তুই কেপেটিস্ শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যক্ষরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁটা টানিয়া লইয়া সৌকার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও মতুমদাকে আদতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।—কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরা ছিলাম না। এতএব বাঁটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, বালির ওপরে লৌড়ানো যায় না—খরবদার, সে চেষ্টা করিস নে—জলে গিয়ে পড়বি।

সমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শূগলও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা! নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অবাকুসরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি!

দু'জনে প্রাণপণে দৃষ্টিয়া গেলাম; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকর্ষণনিমজ্জিত মুহূর্তপ্রায় তাহার দক্ষিপাড়ার মাসতত্ব ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাহার একটা পায়ে বহুম্বলা পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া ‘চুন্-চুন্ পেয়লা’ ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অক্ষতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটার বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামানা ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আশ্চর্য্যের কোন উপায় বুজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন : এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকর্ষণ পাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের যোর কাটািয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাত্রে আমাদ্বন্দ্বের কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাক্তার উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একটা পাম্প?

সেটা ওখান পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ ক্রেশ বিন্শত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোভা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন : এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্বোধের মত সে সব তাহার গা হইতে ভাড়াভাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোঁটার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এসব কখনো চোখে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রান্ত বক্তিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বে একটা ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিন্শত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুপণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না অসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাতি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ডিঙিল। আমার যে ব্যাপারখানির বিকট গঞ্জে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মুহূর্ত হইতে ছিলেন সেখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিশ্চা করিতে করিতে—পা মুছিতেও ঘণা হয়, তাহা পুনঃপুনঃ শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্রর খনি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আশ্চর্য্য করিয়া বাটা গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাব্রকবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম।

এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁচমাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটা ফিরিয়া গেলাম।

আট

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়ই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ও তাহার একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু ত শিকল ছিড়িয়া যায় না! কে তবে নৃতন করিয়া এসব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিষয়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ও কেবল মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না! ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় করিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব বলিবার সময়ও ঠিক তাহা ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়াত আমি পাঠককে দিতে পারি না, শুধু যা ঘটে তাই, জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয় যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সঙ্গোপনে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি। সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ জিনিসটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্যন্ত, চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ গোড়াতেই যদি বলি—সে একটা প্রেমের ইতিহাস—মিথ্যাভাষণেব পাপ তাহাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার ভাষাটা হয়ত তাহাকেও ডিসাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বলা আবশ্যক।

সে বহুকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপসা হইয়া গেছে। যাঁর মুখখানি মনে করিলেই, কি জানি কেন প্রথম যৌবনের উজ্জ্বলতা আপনি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত, সে দিগিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাহার শিকার-পাটিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এর সঙ্গে অনেকদিন দুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কবিতা দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এন্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, ভাবি নাই। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরিক্ত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মগ্নিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। তবে কিনা, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা আপনার লোকের সূচ্যভিটা একটু বড়হিয়াই করে, না হইলে সত্যসত্যই যে অন্তর্ধানি বিদ্যা অমন বেশি পরিমাণে ওই বয়সটাতেও অর্জন করিতে পারিয়াছিলাম, সে অহঙ্কার করা আমার শোভা পায় না, অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল। কিন্তু যাক সে কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজা-রাজদার সাদর আহ্বান কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিঁদুর ছেলে, শাস্ত্র অমান্য করিতেও ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ-বারো ক্রোশ পথ গজপুটে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে। পেটী-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা ভৃত্যদের, একটায় খাবার বসোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা ভাগ করিয়া জন-দুই বাহিনী ও তাঁহাদের সাদা-পালদের আচ্ছাদ্য।

তখন সন্ধ্যা উজ্জ্বল হইয়াছে। রাজপুত্রের বাস-কামরায় অনেককণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সহাসরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন

কি আদরের আতিশয্যে পাঁড়াইবার আয়োজন করিয়া, তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা বিহুল কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু সেটা, তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমারে যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সূত্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিলেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পর সমযোচিত বাক্যলাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাঝা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যা-হোক একটু ঝাঙ্কা দেখি, আর সবাই হুঁচোর মত কান।

বাইজী প্রথম হইয়া উঠিলেন। পরস্পর লোভে অনেক কাভাই পারা যায় জানি। কিন্তু এই নিরোত্তর দরবারে বীণা-বাজনো গাওঁবিকটী এতক্ষণ ত্রাতার একটা সুকঠিন কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন দাঁড়িয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে যেন শুধুমাত্র আমার জন্যই, ত্রাতার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কল্পিত সমস্ত মাদুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্ব মদোদ্যমকতা ডুবাইয়া অবশেষে শুক হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়াসী। সে বাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি এমন আর সে এমনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—বেশ।

পিয়াসী মুখ নীচু করিয়া হাসিল। তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস বাহির হইতে শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ ওস্তাদিত্বভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য। নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন ত্রাতার দলদল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয্যে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে, তোমার গান দু-সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ শুনে পাব।

বাইজী প্রথমটা দমকিয়া দাঁড়তিল। পরক্ষণেই একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে পবিত্র বাক্যলাপ করিয়া কহিল, টাকা নিয়োছি, আমাকে ত গাহিতেই হইবে, কিন্তু আপনি এ পনর-ষোল দিন ধরে এই আস্তাসহরে কবরেন্দ্র যান, কালকেই বাড়ি চলে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম এবং কি ভাবাব দিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল। সকালে সোবগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদা-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্ধুক পনরটা, তার মধ্যে ছয়টা বাতিফল। দুই—একটা মাপদরজেন নীর উভয় তীর। এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমুলগাছ, ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনরটা বন্ধুক লইয়া শিকার করিতে হইবে। শিমুল গাছে-গাছে ঘুঘু গোটা-কয়েক দৌখলাম, মরা নীল বাকের কাছটায় দুটো চকচকি আসতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইলেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পবামর্শ করিতে করিতেই সবাই দু-এক পাত্র টনিয়া লইয়া মেহ ও মন ধীরে মত করিয়া লইলেন। আমি বন্ধক বাখিয়া দিলাম। একে কাফজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়া ছিল, তাহাকে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্বাস্ত জুলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে শ্রীকান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ওকি, বন্ধুক রেখে দিলে যে! আমি পাখি মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গৌর ওঠবার পর তেঁকে ১৭ ছব্বা দেওয়া বন্ধুক ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমারসাহেব হাসিরাই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যান্তে, সে কথা অবশ্য জানা না।

স্বপ্নের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ মলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লোকের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। কষ্ট হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুহু সরম হয়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না : সুতরাং জবাবা দিলাম, সবাইকার মেছি হয়, কিন্তু আমার হয়! যাক আমি ভাবতে ফিরিলাম—কুমারসাহেব, আমার শরীরটা ভাল নেই,—বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেষের তাঁবুতে কিরিয়া করাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর-এক পেয়ালা চা আশে করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি, বেয়ারা আসিয়া সসন্ত্রমে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটো আশাও করিতেছিলাম, আশ্চর্যও করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায় ?

তা' জানিনে।

তুমি কে?

ଆମି ବାହାଈର ବାନସାୟା ।

ਭੂਮਿ ਵਾਜ਼ਾਮੀ ?

ଆଜ୍ଞେ ହଁ—ମରାମାମିକ । ନାମ ରତନ ।

বইজী হিন্দু? রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী শ্রীতীক্ষ্ণ করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাতে শৈশোয়াজ ও গুডনায় টিক চিনিতে পারি নাই ; আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যেই হোক, ব্যঙ্গালীর মেয়ে বটে। একবৎ মূল্যবান কার্গেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো ; হাতের কাছে পানের সজসরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজ। আমাকে দেখিয়া গাত্ৰোত্থান করিয়া হসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। জোয়ার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়গুড়িটা নিয়ে যা। ওকি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না ?

রতন আনিয়া গুড়গুড়ি লইয়া গেল। বাইতী কহিল,—তুমি তামাক খাও তা জানি ; কিন্তু দেব কিসে ? অন্য জায়গার যা কর, তা কর। কিন্তু আমি জেনে শুনে আমার গুড়গুড়িটা ও আর ভোমাকে দিতে পারিনে। আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিছি—ওরে ও—

থাক থাক, চুকটে কাজ নেই ; আমার পকেটেই আছে।

আছে? বেশ তা হ'লে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোসো ; ঢের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা কেউ বলিতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে?

ହାଲ ନାମରେ ନା ।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা করে কি আয়োগ পায়, তা তারাই জানে। বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন?

মারা গেছেন! যা?

তিনি আগেই গেছেন?

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হস্ত আমার মনের ফুল। পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ফুল রহিল না যে, এই মুখা নারীর চটুল ও পরিহাস-লব্ধ কণ্ঠের সত্যসত্যই মৃদু ও আশ্রয় হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা হ'লে যতটুকু করবার আর কেউ নেই বল। শিখার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিরে হয়নি সে ত লেগতেই

পাচ্ছি। পড়াশুনা করচ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ করে দিয়েচ?

এতক্ষণ পর্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই শেষ কথাটি কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য ইহয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেছি বলেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইছই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল; কহিল, লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া, মমদা, ভালবাসাটা কি কিছু নয়? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু, আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, তখন ছেলেবেলায় ডাকনাম শুনেই কি আমাকে চিনতে পারবে? তা ছাড়া আমি তোমাদের—ও গ্রামের মেয়ে নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায় বল?

না, সে আমি বলব না।

তবে তোমার বাবার নাম কি বল?

বাইজী দ্বিভ কাটিয়া কহিল, তিনি স্বর্গে গেছেন। ছি-ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ করতে পারি?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা যদি না পারো, আমাকে চিনলে কি করে সে কথা বোধ হয় উচ্চারণ করতে দোষ হবে না?

পিয়ারী আমার মনের কথা লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, না, তাতে দোষ নাই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

বলেই দেখ না।

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুর্বুদ্ধির তাড়ায়—আর কিসে? তুমি যত চোখের জল আমার ফেলেছিলে, ভাণ্ডি সৃষ্টিদেব তা শুকিয়ে নিয়েছেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হয়ে থাকতো। বলি বিশ্বাস করতে পারো কি?

সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমারই ভুল। তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে, পিয়ারীর ঠোটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাসা করিয়া বলিতেছে, এবং মনে মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্যসত্যই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এতক্ষণে কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে ইহল, সে নিজেব সজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর, তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলাম, মি তানও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গি, তা তুমি ঠিক ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটায় অবিশ্বাস করতে পারেনি। তা এতই যদি বুদ্ধিমান, সোমসংহেবী বাবসটা ধরা হ'ল কেন? এই চাকরি ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না। যাও, চটপট স'রে পড়।

ক্রোধে সর্বাস জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম, চাকরি যতদিন হয়, ততদিনই ভাল। বসে না থাকি বেগার খাটি—জান ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয়ত বা কিছু মনে ক'রে বসবে।

পিয়ারী কহিল, করলে সে ত তোমার সৌভাগ্য ঠাকুর! এ কি আর একটা অপসোসের কথা?

উত্তর না দিয়া আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মৎ দ্বারি লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই চোখের জলের গম্ভটা যেন ভুলে যেয়ে না। বন্ধু-মহলে, বুধারসাহেবের দরবারে প্রকাশ করলে—চাই কি তোমার নসিব? ইয়ত ফিরে যেতে পারো।

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য পরিহাস আমার সর্বাস ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

বস্থানে আসিয়া এক পেয়লা চা খাইয়া চুকট ধরইয়া মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে এ? আমার পাঁচবছর বয়সের ঘটনা পর্যন্ত, আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত ভয় ভয় করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে

খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে। পিসিমার কথা পৰ্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিস্মৃত নহে। সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু কিসের জন্য। আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি? তখন কথায় কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসাটাসা কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রুপটাও আমাকে যেন অবিস্মৃত মর্মাস্তিক করিয়া বিধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম আটটা ঘুঘুপাখি মরিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই বহিলাম; এবং এইভাবেই অনেক দ্বিতীয় পর্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিন চারদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম— কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিলাষ ফলিল না কি, প্রাপ্তি হার প্রতী আর কাহাকেও কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ আমাদেরও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ কারণ ছিল তাহা নয়। কিন্তু এই লাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল, সে হাজির হইলেই আমাকে কিসে কোন মর্নিতে থাকিত। উঠিয়া গিয়া স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অস্তঃ আর কোনদিকে যুক ফিরাইয়া, কাহারও সহিত কথাবার্তা করিয়া, অনমনস্ক হইবাব চেষ্টা করিতাম। অথচ সে প্রতিমুহূর্তেই আমার সহিত চোখাচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টেব পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্বাক হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আব কোনমতেই থাকিতে পারি না। সাওদা-দাওয়ার পরেই বগলা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। 'প্রায় হইয়া' বাইজী গান থামাইয়াছে, ইতঃ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। মিনিমে যে যেখানে ছিল আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদগ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন অজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ প্রদান করিয়া যান। তিনি যে জানে যেমন লোকই হন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাতে অহঙ্কারণে সাওদা তাহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। অজিকার ঘোর রাতে এই ক্ষণভঙ্গী প্রেতযোনিতে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠের শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহাও সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি নিকটে বসিয়া গেলাম। তিনি প্রসন্ন কহিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যীরা চোখে দেখেন। শুধু যে আপনাতা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজি পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ত নাস্তিক—স্রেষ্ঠ। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম, দেখুন এ সম্বন্ধে আমি ভর্তুকি করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই স্রেষ্ঠই হই, ভূত মানিনে। যীরা চোখে দেখেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেন, নাহয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক ঝপ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাতে ক্ষণে

যেতে পারেন? আমি হসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক আশ্রানেই অনেক রাতে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপু সেখি মং করো বাবু। বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে দৃষ্টিত করিয়া, এই আশ্রানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ আশ্রান যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাআশ্রান, এখানে সহস্র নরমুণ গণিয়া লইতে পারা যায়, এ আশ্রানে মহাভৈরবী তাঁর সাজোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাতে নরমুণের গণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন, তাহাদের খল্‌খল্‌ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিখ্যাসী ইংরাজ, ভুজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও ক্রন্দস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চূপ পর্যন্ত ঝাড়া ইইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন একসময়ে কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাপ্রলাপ যেন সর্দঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাআশ্রানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা গর্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কোয়া বাবুসাহেব, আপু যায়েগা?

যায়েগা বৈকি!

যায়েগা! আচ্ছা, অপকা খুশি। প্রাণ যানেসে—

‘আমি হসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমি ও শুধু হাতে বাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।’

তখন আলোচনাটা শুনি, অতিমাত্রায় খর ইইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখি মারিতে পারি না কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি, বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না, তাহারা মুরগি খায়; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্যকাল ভাগিয়া যাব; তাহাঙ্গিকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁতকপাটি লাগে, এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজ-রাজতাদের আন্দোলন হয় এবং তাহাদের মতিভ্রমে অতিক্রম করিয়া যায় না—অর্থাৎ তাহারাও দুকথা কহিতে পারেন, সেই সব কথাবার্তা।

ইহাদের দলে একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল, সে শিকার করিতে জানে না; এবং কথটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ ইতিপূর্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে তাগ করিলে না। বলিয়া খুশি হইতে লাগিল। ভিজ্ঞাস করিলাম, তুমি কি ভূত মান না?

একবারে না।

কেন মান না?

মান না, নেই বলে, এই বলিয়া সে প্রচলিত তৎকালীয়া বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অত সহজে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না। কারণ বর্ষদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে মুর্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে সলকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, ভীকাত্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন, কিন্তু আমার হাতে লাঠি থাকতে হু-হু-হু আর প্রেতই বল, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাকবে ত?

ঠিক থাকবে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ—রাত্রি এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই। দেখিলাম, তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটি মনে মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি ইহাতে পারে। এ সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলেবেলার কথা মনে

পড়ে—সেই একটি রাতে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত মনে মনে রাম রাম কর! ছেলটি আমার পিছনে বসিয়া আছে—সেই দিনই শুধু ভয়ে চেতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আঙ্গিকার গল্পটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছমছম যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমার-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিকাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালীর সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত নিঃশব্দ শান্তবৃত্তাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আত্মীয় উচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়িল না। দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা খাটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সমস্ত সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অস্তিম-শয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘুণায় লক্ষ্যায়, নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাস-কাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্থলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাতে ইহকাল ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অশ্রুত বিবরণ যে-কোনো স্বাভাবিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।

আমার পিসিমা যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহাকে সাহায্য করিতেন, এ কথা আমি এবং বাটীর বুড়ী ঝি ছাড়া আর জগতে কেহই জানে না। পিসিমা একদিন দুপুরবেলা আমাকে নিভৃত ডাকিয়া বলিলেন, বাবা! শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে শোকে গিয়ে দেবিস; এই ছুড়ীটাকে এক-আধবার গিয়ে দেবিস না। সেই অবধি আমি মাঝে মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসিমার পরসায় এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম। তাঁর শেষকালে একা আমিই কাছে ছিলাম। মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই। বিশ্বাস না করিলেও সে ভয়ে গা ছমছম করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি।

সেদিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারেটার পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ; আমি খাটের অদূরে বস প্রাচীন অর্ধভগ্ন একটা ইকিচেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মুক্ত-কণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত তুলিয়া আমার কানটা তাঁর মুখের কাছে আনিয়া, কিস্ফিস্ করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তুই বাড়ি যা।

সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে?

তা হোক। প্রাণটা রোগে। ভাল বকিতেছেন ডাবিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাচ্ছি!—জলটা একটু থামুক। নিরুদিদি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, না, না, শ্রীকান্ত, তুই যা। যা ভাই যা—আর এতটুকু দেরি করিস নে—তুই পালা। এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে আমার বুকের ভিতরটার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম, আমাকে যেতে কলঙ্ক কেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, যাবিনি, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখচিস নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো কালো সেপাই এসেছে? তুই আছিস বলে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসছে?

তার পরে সেই যে গুরু করিলেন—ঐ খাটের ভল্লায়। ওই মাথার শিয়রে। ওই দ্বারতে আসছে।

ওই নিলে। ওই ধরলে! এ চীৎকার শুধু খামিল শেখরায়ে যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।
 ব্যাপারটা আজও আমার কুকের মধ্যে কাটিয়া বলিয়া আছে। সে রাতে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই!
 বোধ করি বা যেন কিসব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন
 অমাবস্যার যোর দুর্ধোগ তুচ্ছ করিয়াও, বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না এ কথা অসম্ভবে
 বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিকৃদিমির কালো কালো সেপাই-সাক্তীর ভিত্তের মধ্যে
 গিয়া পড়িব। অথচ এসব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম; মূর্খ যে কেবলমাত্র নিদারণ
 বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন। কি রে?

বাইজী একবার প্রশ্ন জানাচ্ছেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমন বিরক্ত হইলাম। এতরায়ে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত
 অপমানকর স্পর্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়; গত তিন-চারি দিনের উত্তরপক্ষের ব্যবহারওলা স্মরণ
 করিয়াও এই প্রশ্ন পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভূতের সম্মুখে কোনরূপ
 উদ্বেজনা পাছে প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিলাম, আজ আমার
 সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য; আদব-কায়দায় পাকা। সন্ত্রাসের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, বড় দরকার বাবু,
 এখনি একবার পায়ে দুগো দিতে হবে, নইলে বাইজীর আসবেন বললেন।—কি সর্বনাশ! এই তাবুতে
 এতরায়ে, এত লোকের সম্মুখে! বলিলাম, তুই বুঝিয়ে বলগে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা
 হবে। আজ আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা হ'লে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আসচি বাবু, বাইজীর
 কোনদিন এতটুকু কথার কখনো নড়চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অনায়াস অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ে নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম,
 আজ্ঞা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম বাল্লীর কপার জাগ্রত আর কেহ নাই।
 পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাবুতে দুই-চারি জন আগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুটটা
 পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল, হাতে লইয়া রতনের
 সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সমুখেই দাঁড়ানো ছিল। আমার
 আপানমন্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই ক্রুদ্ধরে বর্কি উঠিল, শ্রমশানে-
 টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম—কেন?

কেন আবার কি? ভূত-প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যার ভূমি বাবে শ্রমশানে? প্রশ্ন
 নিয়ে কি তা হ'লে আর কিরে আসতে হবে! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ স্বরভ্রষ্ট করিয়া কাদিয়া কেলিল।
 আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম
 না। ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য কি? বাহাকে চিনি না, জানি না সে বলি—উৎকট হিতকালভঙ্গর
 দুপুর রায়ে ডাকাইয়া আনিয়া সমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে?
 আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, ভূমি কি সত্যি সত্যি শান্ত সুবেধ হবে
 না? তেমনি একগুয়ে হয়ে চিরকালটা কাটিবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে, আমিও তা হ'লে
 সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ, চল। আমার এই প্রজ্ঞার বিশ্লেষণে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল,
 আজ! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না! বাবু শিকারে এসে একটা
 বাইউলি সঙ্গে করে দুপুর রায়ে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। বলি, বাড়িতে কি একেবারে আউট হয়ে
 গেছে নাকি? ঘোড়া-গিড়ি লম্বা-সরম আর কিছু দেহতে নেই, বলিতে বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ
 ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল; কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধ্যাপণে ভূমি যেতে পারো,

কেউ ত কোন দিন ভাবেনি। তাহার শেষ কথটার অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম, লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জান? তুমিই যে এত অধঃপথে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল?

মুহুর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উফর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ঐ মুহুর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে তীতবরে কহিল, আমার তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, তা আমি জানি—ভুলেই কি তুমি খুশি হবে? হ'লে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবে দেখো, অধ্যাক্রম্য করবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চললাম।

পিয়ারী বিদ্যুদ্গতিতে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেতে না দিই, জোন করে যেতে পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল, দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই, যে তুমি যাবে বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা বলে মিচি, বলিয়াই আমার বন্ধুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক-পা নিছাইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথাকারের ভূত আছে জানি। তারা সমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কীদে, পথ আগলায়—এমন অনেক কীর্তি করে, আবার দরকার হ'লে ছাড় মটকেও খায়। পিয়ারী মলিন হইয়া গেল : এবং কণকালের জন্য বোধ কবি বা কথা! খুজিয়াও পাইল না। তারপরে বলিল, আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্তি করে সত্যি, কিন্তু ছাড় মটকার জন্যেই পথ আগলায় না। তাদেরও আপনাব-পর বোধ আছে। আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, এ ত তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বই কি! যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত : এই ত তোমার বলবার কথা। একটুখানি খামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক মিথো হোক—নিজের মরণ আমি নিজে রটাই নি। মানাকে দিয়ে মা' বড়িয়েছিলেন। শুনবে সব কথা? তাহার মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণ আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পূর্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কলীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা আমি মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অপর চাঁপিয়া ধরিতেছিল। কখন, কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এমনি ধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল ; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিরা, আমি কণকালের জন্য বিষয়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সর্দার-পোড়ো, সেই সময়ে ইহার দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়িয়া দেয়। স্বামী-পরিভ্রাতা বা সুরলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর ; সুরলক্ষ্মীর বায়ো-ভৈরো। ইহার রঙটা বরাবরই কপা ; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও গ্রীহার পেটো ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলওলা-তামার শরীর মত—কতগুলি ডাফো শুনিয়া বলা বাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেটেরি বইটির বনে চুকিয়া প্রত্যহ একহুড়া পাকা বইটি ফলের মালা পিঁবিয়া আনিয়া আমাকে দিত।

সেটা কোনদিন ছোট হইলেই পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রশ্ন ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোট কামড়াইয়া গৌজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাখা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে বাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্রেশ বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাঙ্গীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। সৈবৎ জানা গেল, নিরীক্ষি দত্তের পাচকব্রাহ্মণ ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরীক্ষি দত্তের দ্বারা মামা ধম্মা দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবা-গোবা ভালেমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একাত্তো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সন্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না—তা জামাই খুজছেন। একশ-একটি টাকা দিন—একবার এ-পাঁড়িতে ব'সে আর একবার ও-পাঁড়িতে ব'সে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্ছি। দুটি ভাঙ্গীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—দুটো বাঁড় কেনার খরচাটাও দেবেন না? কথটা অসঙ্গত নয় তথাপি অনেক কমা-মাল্লা ও সহি-সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রম্ম হইয়া একরাশে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইদিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন-জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে মীলা ছুরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর-দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবহ লাভ করিল। এই ত পিয়ারী পাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, তুমি কি ভাবছ, বলব?

কি ভাবচি?

তুমি ভাবছ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েছি। কঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েছি, আর তার বদলে শুধু মারধর করেছি। মার খেয়ে চুপ করে কেবল কঁদেছে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি। আজ যদি একটা কথা বলতে ও গুনিই না! নাহয় নাই গোলাম শাসন। এই না? আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

পিয়ারীও হাসিয়া কহিল, হবেই ত। ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়? সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পাশা ঠেলে যেতে পার? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে? চল, একটু বসি গে, অনেক কথা আছে। রতন, বাবুর দু'খুলে দিয়ে যা রে। হাসচ যে?

হাসচি, কি করে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করো, তাই দেখে।

পিয়ারীও হাসিল : কহিল, তাই বৈ কি। পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়; কিন্তু জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত নিজেরই বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়? আচ্ছা, আচ্ছা নাহয় কথা কইচি; কিন্তু প্রত্যহ কাটাঘাত করতবিস্তৃত হয়ে যখন বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, তখন কটা কথা করেছিলুম গুনি? সে কি তোমার মারের ভয়ে না কি? মনেও ক'রো না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। দ্বিষ্ট ছি! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে—দখে চিনতেও পারোনি। বলিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতেই তাহার দুই কানের হীরাগুলি পর্যন্ত দুলিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলুম যে, ভুলে যাবো না? বরং আজ চিনতে পেরেচি দেখে, নিজেরই আশ্চর্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা ঘুঙ—চললুম।

পিয়ারীর হাসিমুখ এক নিমেষেই একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, ভূত-প্রেত না মানো, সাপ-খোপ, বাঘ-ভালুক, বুনো গুয়ার এগুলোকে ত বনে-জঙ্গলে অস্ত্রকার রাখে মানা চাই।

আমি বলিলাম, এগুলোকে আমি মেনে থাকি, এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি।

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে-ধাতের মানুষ তাতে, তোমাকে যে

আটকাতে পারব না সে ভয় আমার খুবই ছিল ; তবু ভেবেছিলাম, কান্নাকাটি করলে হাতে-পায়ে ধরলে শেষ পর্যন্ত হয়ত নাও বেতে পারো। কিন্তু আমার কান্নাই সার হ'ল। আমি জবাব দিলাম না মেথিয়া পুনরায় কহিল, আচ্ছা যাও—পেছ ডেকে আর অন্নদা করব না। কিন্তু একটা-কিছু হ'লে, এই বিশেষ কিছুয়ে রাজ-রাজত্ব বন্ধ-বন্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের ওপর ব'লে তুমি পৌকরী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত ? বিপদের সময় আমি ত আর মনেতে পারব না—এক চিনিমে ; বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কেলিল। আমি যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ফ্রেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না ? একলবার 'বাইজী' ব'লে যত অপমানই কর না কেন ? রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে মনে বোঝো না ? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভালো হ'তো। তোমাদের একটা শিক্ষা হ'তো। কিন্তু কি বিজী এই মেয়েমানুষ জাতটা, একবার যদি ভালোবেসেচে, ত মরেচে।

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভালো সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো ?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত খার নেই যে, আমাকে বেঁধো : এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি, তখনকার ; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম, বেশ কথা। আশা করি, আমার আত্ম একটা কিছু হবে। হ'লে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল, দুর্গা ! দুর্গা ! হিঃ ! এমন কথা ব'লো না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসো—এ সত্যি আর যাচাই করে কাজ নেই। আমার কি সেই কপাল যে, নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে সেবা কর, দুঃসময়ে তোমাকে সুখ, সকল করে তুলব ! তা হ'লে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ করে নিলুম। বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অক্ষ গোপন করিল, তাহা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ কর দেবেন, বলিয়া আমি আর দেরি না করিয়া, ঠাঁবুর-বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাশা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্তা বাহির হইয়া গেল, সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল ?

ঠাঁবুর ভিতর হইতে অজবিকৃত কঠোর দুর্গা ! দুর্গা ! নামের সত্যের ডাক কানে আসিয়া পৌছিল। আমি দ্রুতপদে ক্ষণাতের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ, অন্ধকার পথ পার হইয়া পেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁকের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতেই পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি—এ কি বিরাট অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পিলেরোগা স্নেহেটা তাহার খামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল, এবং বইটি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম তখন বিশ্বাসের আর অবধি রহিল না। বিশ্বাস সেখানেও নয়। নভেল নাটকেও বালাপ্রশয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, বাহ্যকে সে তাহাকে ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সর্বদা প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে একদিন তাহার এই দূষিত জীবনের নতকোটি মিথ্যা প্রশয়-অভিনয়ের মধ্যে কোনখানে জীবিত রাখিয়াছিল ? কোথা হইতে ইহাদের ব্যাধ সংগ্রহ করিত ? কোন পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত ?

কলু !

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, দুসর বাসুর বিকীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিকীর্ণ করিয়া দীর্ঘ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বঁকিয়া কোন সুদূরে অদ্বিষ্ট হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর বাসিন্দা এক-একটা কপালের জোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এতদো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই

ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাঙ্কার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকারে আন্তরঙ্গের উপর যে-যাহার আসন গ্রহণ করিয়া, নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে! মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতদুর্ক প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রির পাখিটা একবার 'বাপ' বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম। এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিলুগাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূরে আসিতেই তাহাদের কালো-কালো ডাল-পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের ঘরপাল! ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অশ্রুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আত্মদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে, তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কৃত্তকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কবি ছেলোটো কাদিয়া কাদিয়া শেষকালে নিজীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাদিতে লাগিল। যে এ ক্রম্মনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক-পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাকি রখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শব্দ-শিশু অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাদিতেছে—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, এ কথা ঠাहर করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো কুড়ির মত শিমুলের ডালে ডালে অসংখ্য শব্দ রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাদিতেই লাগিল; আমি নিচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরনৃপও গণিয়া লওয়া যায়—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে বসিত হইয়া আছে। গেতুয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখনও হাসিয়া ছুটিতে পারে নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দুটা নম্বর চক্ষে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন যোর অমাবস্যা। সূতরাং খেলা শুরু হইবার আর বেশি দেরি নাই আশা করিয়া, একটা বালুর চিপির উপর চাপিয়া বসিলাম। বন্ধু-কটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোন সাহায্য করিল না।

শিরারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর , তবে কর্ম-ভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে দৃত-প্রের্ত থাক বা না থাক, তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীষ্ম বাঙ্গালী কার্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙ্গালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ়-বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং এদি বা বাঁচে, যে-স্থানে তাহার পাখিবে দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিশীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটার লাখি মারিয়া মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও , উচিতও নয়—অস্বতঃ আমার পক্ষে শু নয়। তবে কিনা, মানুষের কচি ভিন্ন। যদিবা কাহারও হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রায়ে রাত্রি-ভাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিশ্চ, হইবে না। অথচ এমনি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ নাকিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ওৎকতলো ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই, আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ শু বাঙ্গালীর লেশমাত্র ছিল না। যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু-একটা অজানা গোছের থাকে—এ সংস্কার চন্দ্র-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে—

তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা বাতাসটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ছা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানে না যে মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশেপাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোকে যেন আমাকে খিরিয়া বসিয়া, অবিজ্ঞান হা-হুতাশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরেজীতে বাহাকে বলে ‘uncanny feeling’ ঠিক সেই ধরনের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকুনি দিয়া গেল। সেই ঝাঁকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশি করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ কানিত্যম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুত এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পরিত, সে ইন্দ্র—আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এইসব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু সেটা যে কত বড় ভ্রম এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুসরণ করিতে গিয়াছিলাম, এক মুহূর্তেই আঁক তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চণ্ডা বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই রাম নামের অভ্যাস কই? আমি ও ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেলুয়াখেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুকি ঝাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমন পাইলাম, এ নিশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, একফোঁটা রক্তের সংশয় পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। শুধু নিশীথ রাতি ঐ ঐ করিতে লাগিল। আশেপাশে হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা নিশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা নিয়মিত বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কালের মধ্যেও কিন্তু একথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিলে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য; দেখি, ডান পা-টা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এমন সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলো গলার সমবেত চীৎকার কানে পৌছিল—বাবুজী! কানুসাব! সর্বদা ঐটি দিয়া উঠিল। কাহার ডাকে? আবার চীৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন। শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা-দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রক্তনের গলার আভাস পাইলাম। খানিক পরেই টের পাইলাম, সেই বটে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া, চোঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না—আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যিই নাপিত, তাহাতে আর ভুল নাই।

উরাসে চোঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, কৃত-প্রেত যাবার সময় কিছু একটা ভালিয়া দিয়া যায়। সে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভালিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লঠন ও লাঠিসোটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছদ্মলাল—সে তবলা বাজায়; এবং আর একজন নিয়্যারির দারোয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, চলুন—তিনটে রাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল, বাবু, খনা আপনার

সাহস। আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেছি, তা বলতে পারি নে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই এক মাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু, আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে বসে কান্দছেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা; তোরা পিছনে যা। আমি এক-একমাসের মাইনে তোদের নকশিল দিচ্ছি। আমি বললুম, ছটুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি মা; কিন্তু পথ চিনি নে। এমন সময় টৌকিদার ঠাক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। টৌকিদার ছটাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি ছেলের কান্না শুনেতে পেয়েছেন? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া, আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল; কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামন মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাতারে ডুল ভাঙ্গিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছা, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন, বাবু?

আমি বলিলাম, না।

আমার এই সন্দেহ উত্তরে রতন ফুৎক হইয়া কহিল, আমরা যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেছেন বাবু? মার কায়া দেখতে কিন্তু—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উল্লসিত, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

ঐবুর কাছাকাছি আসিয়া টৌকিদার গ্রাহার কাছে চলিয়া গেল। গণেশ, ছটুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন যাবার সময় একতিবার দেখা দিয়ে যেতে।

৩২কিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখতে পাইলাম, পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর-আগ্রে, সতলচক্ষে বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত উৎসবাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয় ডাকিল, আসুন।

মুহূর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রকৃতিস্থ কেত নাই। সবাই অকস্মৎ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে! ছিঃ! এই মাতালের দৃষ্টিইয়া যাইব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতেই পারি না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আসুন? আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না, রতন, এখন নয়—আমি চললুম।

রতন ফুৎক হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে বসে আছেন—

পথ চেয়ে? তা হোক! তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে বোলো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়; আমার বড় ঘুম পেয়েছে রতন, আমি চললুম। বলিয়া বিস্মিত, ফুৎক রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

মানুষের অন্তর ভিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্ধর্মীর উপর দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিল না, সে কাজ আমি মরি, গেলেও করিতাম না—আমি ওনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার গুণ নিজের মনটাই নয়; পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলো পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোন মতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। কে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ! এই ত ক্রিটসিজম্। একেই ত

বলে চরিত্র-সমালোচনা! সভাই ত। অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ বা-তা লিখলেই কি চলিবে? এই দেখ বই-খানার যত ভুল-ভ্রান্তি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে। তা দিক। ক্রটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে গোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ড, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দত্ত-প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকাড়ির মূল্য নাই? তোমার কেটি-কেটি জন্মের কত অসংখ্য কেটি অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্ডে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভ্রমোদর্শন, তোমারে লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু একমুহুর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটি বারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আশ্চর্য আসন!

এই ত আমি অন্নদাদিকে যত্নে দেখিয়াছি। তাঁহার অন্নান দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই! দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কত গভীর স্বপ্ন রাখে চোখের জলে বলিষ্ঠ ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমণিকম্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে, কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাণ্ডোই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! দিদি, আর কাহাকেও এ-সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয়া যাইত, তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত, তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি করনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাত ঘড়া মোহর পাই ত অন্নদাদিকে একটা মস্ত সিংহাসনে বসাই, বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁর সিংহাসনের চতুর্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজ্রায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিশেষ লইয়া বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্ভট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা—সে সব মনে করিলেও এখন হাসি পায়; চোখে জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ় ছিল, আমাকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কি না, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এমনি মৃদু কথা, ঠোটে এমনি মধুর হাসি, ললাটে এমনি অপক্লপ আভা, চোখে এমনি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এমনি সতী, এমনি সাধবী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এমনি অনির্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে, এমনি করিয়া সেও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত ধর্মাদর্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম-ভান্ডার সঙ্গে সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বৃকের একান্তে একটুখানি বাথা বাজিল? আমার সম্মানসিঁদী মিসির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার কিছু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ, এমনিই বটে! ছয়টা দিন আগে, আমার অন্তর্বাসী আসিয়াও যদি এ কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অঃঃঃ! তোমার এই শুভকামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যিকতা নাই। আমার বৃকের কণ্ঠিপাথরে পাকা সোনার কব বসানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদার জুটিবে না।

কিন্তু তবুও খরিদার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অন্নদাদির আশীর্বাদে পাকা সোনার হুড়াহুড়ি তার মধ্যেও যে এক দূর্ভাগ্য পিতলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল—এ কি কব আশ্চর্যের কথা!

আমি বেশ খুশিতেছি, বারো বছর সমকালর তাঁরা আমার আশ্বকথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত বেশিরে কি বলতে চাও তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙিয়াই শিল্পীর সুখ মনে করিয়া তোমার কথা বাজিয়াছিল—এই ত? বাহ্যকে মনের দোরগোড়া

হইতে ঋণটিয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাকেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ—এই ত ? তা বেশ ! এ যদি সত্যি হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অন্নদা-দিদির নামটা আর তুলিয়ে না। কারণ তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানবচরিত্র বুঝি। জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সত্যী-সাক্ষীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কল্পিনকালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে এই ঋণটায় তোমাকে ভুলাইতে পারিত না।

তা বটে। তর্ক আর নয়। আমি টের পাইয়াছি মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিভ্রমনার সৃষ্টি করে ; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক। আমি ত নিজেকে জানি, আমি কোন নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা ‘প্রিচ’ করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুগতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হমবগ, হিপোক্রিট তখন আমাকে চুপ করিয়াই ওনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট আমি ছিলাম না ; হমবগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অশ্রুর মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিষয়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে ; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার ঠাই নাই ; কিন্তু পুনরুৎসাহে লদয়ের কানায় কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে ! লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ভাগ্য কারণে চাহে না।

বাবুসাব ! রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহুলোক আমার গতরাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রস্থ করিলাম, তাহা জানিলেন কিরূপে ? বেহারা কহিল, তাঁবুর দারোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বড় তাঁবুতে প্রবেশ করিবারাত্রই সকলে হৌঁহ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল।

উচ্ছসিত প্রশ্নভর শব্দ হইয়া আসিলে জবাব দিতে শুরু করিলাম। কুমারজী পহিলেন, ধন্য সাহস তোমার শ্রীকান্ত ! কত রাত্রি সেখানে পৌছুলে ?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে-এগারোটার পর অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিষময়সূচক ধ্বনি উখিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর ? কি দেখলে ?

আমি বলিলাম, বিস্তার হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, ওঃ কি ভয়ঙ্কর সাহস ! আশানের ভেতরে ঢুকলে, না বাইরে নাড়িয়ে ছিলে ? আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একটা বলির টিপিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর ? বসে কি দেখলে ?

ধু-ধু করছে বলির চর।

আর ?

কসাড় কোপ, আর শিমুলগাছ।

আর ?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ সব ত জানি হে ! বলি, সে সব কিছু—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে

দেখছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্নসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর কুহু নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, না। উত্তর শুনিয়া এক-তীব্র লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এয়াস কাভি হো নহি সক্তা। আশ্ গয়া নহি। তাহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম। কারণ, রাগ হইবারই কথা, কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিবা শ্রীকান্ত, কি দেখলে সত্যি বল।

সত্যিই বলছি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা-তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনেও কি পাওনি?

তা পেয়েছি।

এক মুহূর্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি, শুনিবার জন্য তাহার আরও একটু বেষ্টিয়া আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাখি বাণ্ বলিয়া উড়িয়া গেল; কেমন করিয়া শিশুকণ্ঠে শব্দশিশু শিমুলগাছের উপর গৌড়াইয়া-গৌড়াইয়া কাদিতে লাগিল, কেমন করিয়া হঠাৎ বড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলো দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিস্রাম তুবার শীতল নিশ্বাস আমার ডান কানের উপর ফেলিতে লাগিল। আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা শুক হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মসম্ভান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু আজ হইতে এই বড়ার শপথ রহিল বাবুজী, আর কখনো এমন দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটি-কোটি প্রণাম—এ শুধু তাঁদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। এই বলিয়া সে ঠোকের মাথায় ঝপ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিল।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা শুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু কখনো সঙ্কুচিত, কখনো প্রসারিত, কখনো নির্বাপিত, কখনো প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সে শব্দনির কথায় হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিশ্বাস ফেলার এমন সুস্বাদু-সুস্বাদু ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্যন্ত মাথার চুল কাঁটা-দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে বেষ্টিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেয় চোখে বস্তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। এবং তাহার নিজের দুটি নিকোজ্জ্বল গুত্তর উপর স্বর-অক্ষর ধারা দুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন কি জন্য যে চোখের ভল গড়াইয়াছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অক্ষরকল্লুহিত তদগত মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় জ্বলিয়া গেল। গল্প শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া, অনুমতি লইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকলেই আমাব বিদায় লইবার কথা ছিল কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজেরে তাবুতে ফিরিয়া আসিলাম; এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্যন্ত তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এমন শুদাসীন্য কখনও দেখি নাই, অথচ ব্যথার পরিবর্তে খুশিই হইলাম! কেন তাহা জানি। বদিত যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা-ধামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্বে এ কাজ কোমলিন করিতও নাই, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু জন্মময়ের যে অশ্বত ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুপনের অভিজ্ঞতার রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় ভাবপর্য

ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাম্বিলা মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইল না, বরং প্রশয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি, ইহারই গোপন ইশারায় আমার শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত করিলাম না যে, পিয়াসী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল; এবং সে নিজেও গল্প-শেষে তেমন নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটয়াছিল। যে কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত গ্রাহকে নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা। বিছানায় পড়িয়া মাঝে মাঝে তন্ত্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া-দিয়া তাহা ভাসিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়িয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল আমার কোন এক তন্ত্রার সাক্ষাতে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিহিত মনে কবিতা গির্বিয়া গেছে। মুখ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়াও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে যে অবসর আসিবে—একটা কিছু অনুবোধ—... এম, ... লেখা- যা হোক একটা, গোপনে হাতে দিয়া যাইতে, তাহাতে সংশয়গ্রস্ত নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটি কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে ঢোলের উপর ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত ভূমিদারের মস্ত কীর্তি! দাঁড়িয়া প্রায় আধ ক্রোশ দাঁড়। উত্তরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন ভাস্করে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দাঁড়িটি যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাস্কর ঘাট ছিল, তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া বৃন্দসভা গ্রাম ছিল, কবে নাকি ওলাউঠায় মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পর্বতের গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অন্তগামী সূর্যের তির্যক রশ্মিছটা দাঁবে দাঁবে নাখিয়া আসিয়া দাঁড়ির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তাবপরে ক্রমশঃ সূর্য ভূবিয়া দাঁড়ির কালে জল আরো কালো হইয়া উঠিল, ২ র বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত শূণ্যল ভয়ে ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উত্তিবার সময় হইয়াছে, যে সময়টুকু কাটিতে আসিয়াছিলেন তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না— এই ভাস্কর ঘাট যেন আমাকে ভোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহার স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহার কোথাকার কোন জলাশয়ে এই সমস্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীর্ণ ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহার এমনি সময়ে এখানে আসিয়া দাঁসত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারী-রূপে দেশ-... মস্ত গ্রাম ছিড়িয়া পহিয়া গেলেন, তখন কত মৃত্যু হইত তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছে। হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত আত্মা ও ... এইখানে ঘুরিয়া বে... যাহা চোখে দেখি না তাহাই যে নাই এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই শ্রবণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় শ্রেতাচারী যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ কুখা-তৃখা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিও না। এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্য-গঙ্গা, ভাস্কর-বেতাল সিঁচির গল্প, আর কত তাত্ত্বিক সাধু-সম্মাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন—যে সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে

পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিয়ে না, তোমাকে আর কখনো সেখানে ঘাইতে বলি না, কিন্তু যাহারা এ কাজ পারে তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিয়ে না।

তখন সকলবেলায় আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নিরর্থক হাসির উপাদান অনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই কথাগুলোই এই নির্জন গাওঁ অঙ্ককারের মধ্যে আর একপ্রকার চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতের প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলো যেন আতসবাজীর বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপানের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অঙ্ককার, কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা নয়! কাল ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলে গেছে, আঙ এলে যদি বা কানের উপর শুক করে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণে যে বসিয়া কটিয়াছি, এখন রাঁধে কত ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ও চলিয়াছি—এই সজীব পায়ে-চলা পথ আর শেষ হয় না। এতগুলো তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বীণাঝড় নয়, গোটা-কয়েক তেঁতুলগাছ জড়া-ভড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত করিয়া অঙ্ককার জমার বীণাঝড় দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নীচে দিয়া পথটা ঠাকিয়া-বাকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এমন অঙ্ককার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বৃকের ভিতরটা কেমন যেন গুরুর করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কান বন্ধিয়া কোনমতে সেই তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সম্মুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয়ত? বাঁধই ত বটে! পা-দুটা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল; তবুও টানিয়া টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান। আকাশ কাহার পদশব্দ সমুখ দিয়াই নীচে শ্রবণে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া টলিয়া সেই খুলা-বালুর উপরেই মৃতিতের মত ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার কেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙ্গা ঘাটের উপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার ভিত্তি মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচিভেদ্য অঙ্ককার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙ্গাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সমুখে মিলাইয়া গেল, এ সকল প্রশ্নের শীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি অধাধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া হেতুযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য নয়। কারণ নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বৃদ্ধ পাগল ছিল; সে দিনের বেলা বাড়ি বাড়ি ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কৌচ্যার কাপড়টা ভুলিয়া দিয়া, সেটা সমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ধুরিয়া বেড়াইত। সে চোহারে দেখিয়া অঙ্ককারে কত লোকের যে দীন্তকপাটি লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার

অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরপেক্ষ মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আশুন দিত ; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহুদূরশে খড়া বাঁধিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত ; গভীর বাত্মিত্তে ঘরের কানোচে বসিয়া খোলা গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই ; এবং দিনের বেলায় তাহার চালচলন, স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া ঘৃণাগ্রস্ত ও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায় ; এবং ভূতের দৌরাধ্যও ওখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেননি কিছু ছিল, হয়ত ছিল না কিছু যাগ গো!

বলিতেছিলাম যে সেই পুলা-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, ওখনই শুধু দুনি লম্বু পদধর্মনি স্থানোনের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন 'পষ্ট করিয়া' গানাইল—'ছিং ছিং ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য! আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়! এমন অশুচি অশুশ্লোকের মত প্রাসঙ্গের একপ্রান্তে বসিস না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস। কথাগুলো কানে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু 'বও যে চেতনা বহিল, তাহার কারণ—চেতনাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এমনি একরকম করিয়া বজায় থাকে, একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু-চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তস্তার চাহনি। সে ঘুমানও নয়, জাগাও নয়। গ্রাহ্যে নির্ভ্রের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদামও আসে না। ঐ এক রকম।

তথ্যটি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে, আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে ; এবং সে জন্য একবার অস্ত্র : চেষ্টা করিতাম কিন্তু মনে হইল সবই বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার বজ্জনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিদ্ধৃত পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলাকলিধার মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সাদেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে!

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোনপ্রকার গতি চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া বসিলাম, ওখন অকস্মাৎ যে ভিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তা—এ কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অস্ত্রহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষু ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শাস্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্ণ-মর্ত্য পরিল্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অভ্যন্তরে বাহিরে আঁধারের প্রাবন বহিয়া বাহিতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রসবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, ত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার ; সর্বলোকেশ্বর, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের শ্রাণশুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাব? যাহাতে বুঝি না, জানি না, বাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই ত অন্ধকার! মৃত্যু! তই মানুষের চোখে এও কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দস্তুর আঁধারে ময়। তাই রামায়ণ দৃষ্টি করিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও

ঘনশ্যাম! কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আত্ম হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বসিয়া কুৎসতি নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু-চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভাগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আধারে সর্বাস্ত ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাহার ওই নির্বাক আত্মান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন আত্মবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মাথামূলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন ঈশ ছিল না। ঈশ হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারো যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লষ্ঠনের আলোকও অংশপাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্বীর বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুইখান গরুর গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ জনকয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম কাহারো এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যিক। কারণ আগন্তুকদের দল যত বৃদ্ধিমান এবং সাহসী হোক, হঠাৎ এক অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর-কিছু না করুক, একটা বিসম হৈ-হৈ রে-রে চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম, এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দুইখান গো-শকট পাঁচ-ছয়জনদের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক দুটা আমার দিকে চাহিয়াই কণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মুদুর্তে কি যেন বলপদ্বলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল; এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের একটা ঝাঁকড়া গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশি বাকী নাই অনুভব করিয়া গিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—

সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

ক্রমপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোর কি বাড়ি যাচ্ছিস?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ি যাচ্ছি—মা গাড়িতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দারোগ্যানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি। গাড়িতে উঠে এসো কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া সিন্ধুসা করিলাম, কি কথা?

উঠে এসো বলচি!

না, তা পারব না, সময় নেই। ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌছতে হবে। পিয়ারী হাত বাড়াইয়া ঝপ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকরের সামনে আর ঢলাঢলি কোরো না—তোমার পায়ে পড়ি একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম; পিয়ারী গাড়ি হীকহীতে আদেশ দিয়া কহিল, আজ আমার এখানে তুমি কেন এলে?

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, জান না? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন? বলিলাম এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।

মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিম্বনের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্য। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাতুলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করিতে পারবে কি না জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাসিত্তে কহিল, না।

না কি রকম? এমনভাবে চলে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা ও তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দ্বায়ে প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কান্তদা, কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও—কিংবা যেখানে বৃশি যাও, কিন্তু ওখানে আর এক দণ্ডও না।

আমি বলিলাম, আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে।

পিয়ারী কহিল, থাক পড়ে। তাদের ইচ্ছা হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে, নাহয় থাক গে। তার দাম বেশি নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশি নয় সত্য; কিন্তু যে মিথ্যা খুন্সার রটনা হবে তার দাম ত কম নয়!—পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি এই সময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরট অগ্নিপিশু অঙ্ককার ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ করে রইলে যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জানো কান্তদা, যে কলম দিয়া সারাজীবন গুপ্ত জালখত তৈরি করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আভ আর দানপত্র লিখতে হাত সরতে না। যাবে? আচ্ছা যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না' বল?

না।

পিয়ারী হাতের অ.ঙটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আঙটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশি হাঁটতে হবে।

গো-খান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল,

আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহার দাঁড়াইয়া আছে কিংবা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করিতে পারিলাম, দুটি চক্ষের সজ্জল-করণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারংবার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়াসীর ভাঙ্গা-ঠাবুর নিকিপ্ত পরিভ্রান্ত জিনিসগুলো চোখে পড়িবামাত্র একটি নিম্মল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে ঠাবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পূর্বযোক্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হ'য়েছিলেন?

আমি হী-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগার

পিয়াসীর কাছে যে সভা করিয়াছিলাম, তাহা যে ব্যঙ্গও করিয়াছিলাম, বাটী ঘিবিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বারবার লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোন দিন পিয়াসী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করে নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্ৰণ পর্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা 'নিবেদন' ছিল, যাহা আমি আজও ভুলি নাই। সুশের দিনে না হোক, দুঃশের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়াসীর স্মৃতি ঝাপ্সা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিবির হইতে ঘিবিয়া আসিয়া আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রক্তেরন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা স্বচক্ষে করিয়া বোঝে।

এটা মনে পড়ে সে দিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবির্ভাব গুঁড়া সাদান দিয়া ঘনিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্রান্ত বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়া ছিলাম। পাশেই জানালটা 'খোল' ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বখ গাছের ফাঁক দিয়া আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা স্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম—তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের বেলা যখন সন্নিলাম সেটা 'বাড়' স্টেশন, এবং পাটনার আর দেরি নাই তখন হঠাৎ সেখানেই নামিয়া পড়িলাম। পরকালে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু-আনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুশি হইয়া দোকানের সন্ধানে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দই এবং শর্করা সংযোগে অত্যাবশ্যক ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্ধেক বায় হইয়া গেল। 'এ যাক। জীবনে অমন কত বায়—সে জন্যে ক্ষুধা হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টা-খানেক ঘুরিতে না ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দক্ষিণে চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভুরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তপস্কল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থান ত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমলাগাণের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, জলটা এখনকার বড় বদ।

বাং—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম। মস্ত ধূনির উপর লোটার চায়ের স্কল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্ধবৃদ্ধিত চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাহার আশেপাশে গাঁজার উপকরণ। একজন ব,জা-সন্ন্যাসী একটা ছানী দোহন করিতেছেন—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা-দুই উট, গোটা-দুই টাট্টা ঘোড়া

এবং সবৎসা, গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উঁকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাট ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারি করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আব্রুত হইয়া গেলাম ; এবং চাক্ষুর পলকে সাধু বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা ! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে। চলেয় যাক গে পিয়ারী,— এই মুক্তি-মাগের সিংহদ্বার ছাড়িয়া তিলাশ যদি অন্যত্র যাই, আমার গন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয় !

সাধুজী বললেন, কেঁও বেটা ?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী, মুক্তি-পাষেয়ী হতভাগ্য শিশু ; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মুখ হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণ-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, মাহভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ ভগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন ; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না ? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুশি হইয়া বলিলেন, বাও বেটা সাচ্চা হায়। আচ্চা বেটা রামজীক বুশি। যিনি দুহু দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তেরি করিয়া 'বাবা'কে দিলেন। তাহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ তৈয়ারি হইতেছিল সম্ভ্রান্ত জনে। তখনও বেলা ছিল, সূর্যবাস্তব অন্য প্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গল্পিকার কলিকাতা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন ; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আমি ঘণ্টা কাটিয়া গেলাম। সর্বদলী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার উপযুক্ত পাও।

আমি পরমানন্দে আর একবার বাবার পদধূলি মন্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে অত্যন্ত কিছুই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা একসুট গেকম্বা বস্ত্র, জোড়া-দশেক ছোট কদম্ব-মালা, এক-জোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায—সাজগোজ করিয়া, বানি—যিনি ধূনির ছাই মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, আয়না-টায়না হায় ? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ! দেখিলাম, তাহারও রস-বোধ আছে ; তথাপি একটুখানি গভীর হইয়া তাল্ছিয়াভরেই বলিলেন, হায় একটো।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার !

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ভেটি একটুখানি, টিনমোড়া আরাম। তা হোক, একটুখানি দেখিলাম, যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল 'রাজ-রাজদার' মকলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন ! তা যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরুমহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-আম ঠহুরো।

মনে মনে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিতে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায় কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুঃসাহসতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভণ্ড পাষাণেরা কি প্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে ইহলেই বা কি-কি আবশ্যক,

এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুভ বস্তুবিশেষের ধুম ঘন-ঘন মুখ-বিবর দ্বারা শোষণ করতে নাসারন্ধ্রস্থে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য উপকার, তাহা বুঝিয়া দিলেন, এবং এ বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাশ্রয় সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্ধন করিলেন। এইরূপে সে দিন মোক্ষপথের অনেক নিগূঢ় তাৎপৰ্য অবগত হইয়া গুরুমহারাজের তৃতীয় চেলোগিরিতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাতা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেমনি। চা, রুটি, ঘৃত, দধিদুগ্ধ, চূড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দু হইতেও চিত্ত বিক্লিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে আমার শুকনো কাঠে তেল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে হইা সর্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমার তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাধের কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সহজ ডিসাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতাই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং কঠিনের করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের দেশ। আমি ভাল-মন্দও কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি, বাঙ্গলা দেশের মত সেখানকার মেয়েরা 'হাতজোড়া'—আর একবাড়ি এগিয়ে দেখ' বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরি না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার ক্রিয়াক্ষেত্র তলব করত না। ধর্মী-দরিদ্রনির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না। এমনি দিন যায়। দিন পনের ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বাল্যই নাই, শুধু রাতে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক মোক্ষসাধন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর বাঁচি না! অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালী যত সেরাই হোক, এ বিষয়ে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী-চামড়া' যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশি অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেদিন প্রাতঃস্থান করিয়া সাত্ত্বিকভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরুমহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

‘ভরদ্বাজ মনি বসহি প্রয়াগা

যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—”

অর্থাৎ স্টাইক দি টেট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়। সন্ন্যাসীর যাত্রা কিনা! পা-বাঁধা টাট্টা খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই, দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কবিতা দিতে, গুরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পৌটলা-পুটুলি বাঁধিতে শুছাইতে একবেলা গেল। তার পরে রওনা হইয়া ক্রেশপ দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাকালে বিটৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা মেলা হইল। জায়গাটি মনোরম, গুরুমহারাজের দিবা পছন্দ হইল। তা ত হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মূর্খের আস্তানায় নৌচিহ্নে যে কয় মাস লাগবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিটৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিন জনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্তির জন্য চেষ্টাচরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড়া ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ির খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটা বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ স্পষ্টী তাঁতে-বোনা গুণচট্টের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গিটাই আমার কৌতুহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অব্যবহৃত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি! তাহার কারণ এই যে, মন্দ-এগার বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন উদাস চাহনি, আমি আর কখনও দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার চোটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বত্র দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙ্গলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠোঁটদুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটি লক্ষিত হইয়া পড়িলাম। কারণ সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রশ্নান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ি কি বর্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন? আমি কহিলাম, তোমার বাড়ি কি বর্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ি এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিছু জানিনে। ঐ যে অশ্বখ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এরা বলে, না—সে কলংয়া মরেছে।

আমি বিষয়ে হতবুদ্ধ হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখছি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাটি বাঙ্গালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়িতে এদের শ্বশুরবাড়িটিই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী শ্বশুর-শাওড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাব দিদি গলায় দড়ি দিল কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত, খেত না, স্তত না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শ্বশুর-শাওড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের বাবা মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিনরাত কাঁদি; কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না।

তোমাকে কি এরা মারধোর করে?

করে না? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাষ্পে, পিঠের উপর, গালের দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

তাহার কায়া দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রয়োস্তর বা ভিকার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বলবে ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে? আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বলবে ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে? নইলে আমি— আমি কোনমতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদির দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল, খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বলিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারী নামে একখান, প. প. লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্ভ্রান্তি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, এবং সেও মারধোর অভ্যাসের সহ্য করিতে

না পারিয়া সেই পথে ঘাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তিনি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে বলা যায় না। খুব সম্ভব, তোমার চিঠিপত্র ইলারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌছিয়াছিল কি না ; এবং পৌছাইলেও সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এমনি মুগ্ধিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে, এবং এই আদর্শ হিন্দু-সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল ; এই উপায়েই সনাতন হিন্দুজাতিটা যখন আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার প্রচণ্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই নাই। কে কোথায় দুটো হতভাগা মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বলিয়া ইহার কঠোর বন্ধন এক বিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগলামি। কিন্তু মেয়েটার কান্না যে-লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সাধা নাই, এ প্রশ্ন নিজেকে নিকট হইতে থামাইয়া রাখে যে—কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিকিয়া আছে। কুকিয়া আছে, কোল-ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক ছোটখাটো দ্বীপের অনেক ছোটখাটো জাতির মানুষ সৃষ্টির শুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে, তাহাদেরও এমন সকল বড় সামাজিক আইন-কানুন আছে, যে শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা যুরোপের অনেক জাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-বাবহারে শ্রেষ্ঠ এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা ঝাঁক ঝাঁকিয়া দেখা দেয় না। এমনই এক-আখটা কচিৎ, আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙ্গালী মেয়ে দুটির খোটোর ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি একপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারী এই দুরন্ত প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যুগকাঠে কন্যাদুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে-সমাজ এট দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও হান করিয়া দিতে পারে নাই, যে-সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পশু আড়ম্বর সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মন্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ-‘জাতিভেদ’ বলিয়া যে একটা বড় রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমস্ত ধরিয়া দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজও হয় নাই, এই রকম একটা কথা, কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি-হীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না—‘হয় নাই’, ‘হইবে না’, বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবল কঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া বাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেমনি কঠিন। যাক গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাস্ত্রে ফেলিয়া দিয়া যখন আশ্বানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যস্ত করিলেন। বলিলেন, এ গ্রামটা সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত হয় ; সেবাদের তেমন সম্ভোষণাও করে না ; সুতরাং কালাই এ হান ভোগ করিতে হইবে। যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে আর তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া এই সকল বেহারী পল্লীগুলিতে কোন রকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না। ইতিপূর্বে বাঙ্গালার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা, জলবায়ু—কোনটাই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু কেবল পলাই-পলাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-কবতাদের সঙ্গে কীৰ্তনের সুর কানে আসে না।

দেব-মন্দিরে আরতির কাসর-ঘণ্টাগুলোও সেরূপ গভীর মধুর শব্দ করে না। এ দেশের মেয়েরা শাঁখগুলোও কি ছাই তেমন মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না! এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এই সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোন দিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রা করা হইল, এবং সাধুবাবা যথালক্ষি ভরদ্বাজ মূনির আশ্রমের দিকে সদলে আগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হোক, কিংবা মূনি আমার মন বুঝিয়াই হোক পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা সে এখন থাক, পাপতাপ অনেক করিয়াছি, সাধুসঙ্গে দিন-কতক পবিত্র হইয়া আসি গে। একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোট বাঘিয়া। আরা স্টেশন হইতে ক্রোশ-আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাহার সদাশয়তার এইখানে একটি বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না-পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি-গোপনে তিনি যে-সকল সংকার্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে তিনি বিনয়ে সম্বুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। তাই এর তাঁর নাম রামবাবু। কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া যে ভূমিভূমি সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন, অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, এই ছোট বড় বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবচলিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সম্বন্ধ করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-ভাঁটটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার-চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। লেখ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি শূণ্যের কথাই বলিব। নিকট 'পেটের দায়ে সাধুজী' আশনারা ত অনেকই জানেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও এই দুটো দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টি—যে আমার খুব মোটা তাও নয়। স্থানলোক সম্বন্ধে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বভাবই বলুন—খুব বেশি; এবং প্রাণের ভয়টা ইহাদের নিতান্তই কম, 'যাবৎ জীবৎ সুখং জীবৎ' ত আছেই; কি করিলে অনেকদিন জীবৎ, এ খোয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধূনির ছাই এবং দু ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে-সকল বসন্ত হইয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী—কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সন্ধ্যা কাঁদিয়া আসিয়া পশিলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে এডুছেলের বসন্ত দেখা দিয়াছে, এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচেতন। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী হামি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গল্পের মধ্যে মাসখানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ, 'কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে দুটি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য থাকিবে না, তা পাঠকের তও এর দূরের কথা। তবে মাঝের একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন-পনের পরে রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, 'সন্ন্যাসীদাদা তুমি ও সতিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-ময়া আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চলে গেলে, তারা কখনো বাঁচবে না। কই, যাও দেখি, কেমন করে যাবে?

বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল। রামবাবুও দ্বীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সূতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, শ্রুত, তোমরা অগ্রসর হও ; আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সম্ভেদ নাই। শ্রুত ক্ষণেই হলেন। শেষে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অজ্ঞদিনের মধ্যেই আমি যে শ্রুতের সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং চিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী-সীলার অবসানে উদ্ভাষিকার-সূত্রে টাটু এবং উট দুটা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক, হাতেও লক্ষ্মী পায়ে চৈলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পালাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না। যে বাড়িতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত— শুধু মা তার পাঁড়িত সম্ভানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিগন্তে, শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ-ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমন একটা বিশ্রী আলসে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম রাতজাগা এবং পরিশ্রমের জন্যই একপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপটিপ করিতে লাগিল। নিতান্ত অকচিব উপর দুপবেলা বাহা কিছু খাইলাম, অপরাহবেলায় বমি হইয়া গেল। রাতি নটা-দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাতে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাব। কিন্তু তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু ভাষা দিতে হবে ভগিনী! উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ন্যাসীদাদা? গাড়ি ত দুটোর বেশী পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই দিদি! সকাল থেকেই বেশ জ্বর এসেছে।

জ্বর? বল কি গা? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নতুন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে, বাড়ির ভিতর ঘরে-ঘরে তালো বন্ধ—জনশ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম তাহার সুমুখ দিয়াই এই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অস্তিতঃ পাঁচ-ছয়খানা গরুর গাড়ি মৃত্যুভীত নবদাসী বোঝাই লইয়া স্টেশনে বাহিত। সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যুষেই স্টেশনের কাছে একটা গাছ তলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না, এইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড ছিল। পূর্বে এটি মোসাকিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনে গরু-বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোক স্টেশন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দরায়, জন-কয়েক কুলীর সাহায্যেই এই শেডখানি বধো নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না ; কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া

জানিলাম, বসন্ত রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং পনের টাকা বেতনে স্টেশনে চাকরি করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজেগ শতক্ৰীণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন, এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রীথিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন; দুপুরবেলা একনাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সূতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম আর বেশিঙ্গণ নয়। এমনি ভাবে যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে আর করাট হইবে না।

তা বটে, কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা বলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবিলাম গরীবের টেলিগ্রাফের পয়সাটি অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি!

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটিব ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার ঠাণ্ড আছে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা হোক, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি 'না না' বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সম্মাসী মানুস। আমার যথার্থ আপনার ভন কেউ নাই। তবে পাতনার পিয়াদী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেন, যে শ্রীকান্ত আর স্টেশনের বাইরে একটা টিনশেডের মধ্যে মরণাপন্ন হ'য়ে পড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শব্দবাহু হইয়া উঠিলেন। আমি এখন দিচ্ছি, চিঠি এবং টেলিগ্রাফ দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাণ্ড করিয়া টের পাইলাম, সেটা অহিস্ ব্যাথা। চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে শুইয়া আছি। সমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা দুই-তিন ঔষধের শিশি; এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর যে একজন লাল-চক রূপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুই স্বরণ করিতে পারিলাম না। তার পরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত-কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তেঁলা, মাথা নাড়া করিয়া শুশু খাওয়ানো—এমনি কত কি ব্যাপার।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম, ইনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশ নয়। তখন আমার শিরের নিকট হইতে মৃদুস্বরে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়াদী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বন্ধু বরফটা একবার কেন বদলে দিলেন বাবা!

ছেলেটি বলিল, দিচ্ছি, তুমি একটুখনি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন বাবা—মন বসন্ত নয়, তখন ত আর কোন ভয় নেই মা।

পিয়াদী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি তে—মানুষের ভয় যায়? তেঁাকে সে ভাবনা করতে হবে না বন্ধু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়—আর রাত জাগিস নে।

বন্ধু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম পিয়াদী!

পিয়াদী, ঘরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জনবিন্দুলা আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিনতে পারচ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি কারা?

হাঁ, আর। কাল আমরা বাড়ি যাব।

পাটনায়। আমার বাড়ি ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?

এই ছেলেকে কে রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো কিন্তু বন্ধু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা কয়ো না, ঘুমোও—কাল সব কথা বলব। বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বার

যাহাতে অচৈতন্য শয়্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তার-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা-কিছু গালভরা শব্দ নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে লইয়া জন-দুই ভূতা এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং শহরের ভালমন্দ নানাবিধ চিকিৎসক ভড়া করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে অন্য ক্ষতি না হোক, 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যের মহিমাটা সংসারে অবিস্মৃত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বন্ধু আর দেরি করিস নে বাবা, এই বেলা একখানা সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ করে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে সাহস করিনে।

বন্ধুর অতৃপ্ত নিভ্রা তখনও দু চক্ষু জড়াইয়া ছিল : সে মুগ্ধিত-নেত্রে অবাক-দ্বরে ভাবন দিল, তুমি খেপেচ না, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে মুখে জল দে দেখি, তার পরে নাড়ানাড়ির কথা বোকা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ।

বন্ধু অগত্যা শয়্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া স্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ঘরে ডাকিলাম, পিয়ারী! আমার শয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপর ক্রান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। শব্দমুদ্রা করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর কুঁকিয়া পড়িল। কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙ্গল?

আমি ত জেগেই আছি। পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন?

তা ত বরাবরই করচি পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'ল?

তেরো দিন, বলিয়া সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলিপিলেদের সামনে আর আমাকে ও বলে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী বলে ডেকেচো, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, আজ্ঞা। তারপরে বাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর, কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাইনে।

তবে কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চারদিনেই বোধ হয় একরকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই কটা দিন অপেক্ষা করে বাড়ি যাও।

তখন তুমি কি করবে তুমি?

সে যা হয় একটা হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তার পর সমুখে উঠিয়া আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে কণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল,

তিন-চার দিনে না হোক দশ-বারো দিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে, আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগ আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর-এরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। ভূমি জানো যে একমাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, ভূমি যাও। ওগো দয়াময়! আমার উপর যদি তোমার এতই দরদ তবে যাই হোক গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাস্যমাই বাধালে! এসে দেখি, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে অঘোর আঁচতনা! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েছে; সর্বাস্থে রুদ্রাক্ষি বাধা; হাতে দুগাছা পেতলের বাল। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে! বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টলটল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বন্ধু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, ভূই ছেলে, তোর কাছে সে কথা আর কি বলব বাবা! উঃ, কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে। মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালা দুজনের চার-চকুর দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা ভূমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভু-ভারতে কেউ কখনো দেয় নি—দেবে না! শহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েছে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তারবাবু অনেক প্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনায় পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌছিয়া বার-তেরোদিনের মধ্যেই একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্বে দেখি নাই, তাহা নয়। জিনিসগুলি ভালো এবং বেশি মূল্যের, তা বাট; কিন্তু এই মাড়োয়ারী-পাড়ার মধ্যে এই সকল ধনী ও অল্পশিক্ষিত শ্রেণির মানুষের সম্বন্ধে এত সামান্য জিনিসপত্রই এ সস্তিক্ত রহিল কি করিয়া? ইতিপূর্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরনের ঘরদ্বার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। সেখানে ঢুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া? ইহার ঝাড়, লঠন, ছবি, সেণ্ড্যালগিরি, আয়না, গ্লাসকেসের মধ্যে আনন্দের পরিবর্তে আশঙ্কা হয়—সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের অবকাশটুকুও বৃথা মিলিবে না। বহুলোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার উপহাররাশি এমনি ঠাসাঠাসি পাদগাদি-ভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিপাতমাত্রই মনে হয়, এই অচেতন জিনিসগুলার মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যেন এই বাড়ির মধ্যে এতটুকুখানি জায়গার না এমনি ভিড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেবারেখি ঠেলাঠেলি করিতেছে! কিন্তু এ বাড়ির কোন ঘরে আবশ্যকীয় এবার অতিরিক্ত একটা বস্তুও চোখে পড়িল না; এবং যাহা চোখে পড়িল, সেগুলি যে গৃহস্থানীর আপনার প্রয়োজনেই আহৃত হইয়াছে, এবং তাহার নিজের ইচ্ছা এবং অভিক্রটিকে অতিক্রম করিয়া আর কাহারও প্রলুব্ধ অভিলাষ যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝা গেল। আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটা নামজাদা বাইজীর গৃহে গান বাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই। এ-ঘর সে ঘর ঘুরিয়া দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার সূত্রে আসিয়া দাঁড়ইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহা ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম; কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ! তাহা বিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নাই। মেঝেটি সাদা পাথরের, দেয়ালগুলি দুয়ের মত সাদা স্বকৃষ্ণ কারতেছে। ঘরের একধার একটি ছোট তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতা, একটি কাঠের আলনায় খান-কয়েক বস্তু এবং তাহারই শিচ্ছে একটি লোহার আলমারি। আর কোথাও কিছু নাই। জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল—চৌকাঠের বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ করি ক্রান্তিবশতঃই তাহার শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হইলে ঘরে আর কিছু বসিবার জায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিতাম। সুস্থের খোলা জানালা ঢাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ; তাহারই ভিতর দিয়া খিরখির করিয়া বাতাস আসিতেছে। সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটু অনামন হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা মিস্ট শব্দ চমকিত হইয়া দেখিলাম, ওন্ট করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে

গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই। সোজা আলনার কাছে গিয়া শুকবস্ত্রে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, অ্যা—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? না, না, বোস বোস,—যেতে হবে না; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসছি, বলিয়া লঘু পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া, হাসিয়া কহিল, আমার ঘরে ত কিছুই নেই; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত? আমাকে নয় ত?

আমি বলিলাম আমাকে এমন অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি করবে? আমি অত লোভী নই।

পিয়ারীর মুখ স্নান হইয়া গেল। কথাটায় সে যে ব্যথা পাইতে পারে বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ দুই-একদিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সঙ্কল্প করিতেছিলাম; বেকাস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, নিজের ভিনিস বুঝি কেউ চুরি করতে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি?

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিন-মুখে কহিল, তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না—দয়া করে সে সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার ঢের।

তাহার শুদ্ধমত প্রফুল্ল-হাসি মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলাটাতেই স্নান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসিটুকুর মধ্যে কি যেন একটা মাদুর ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবামাত্র ক্ষতিটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাৎ অনুগ্রহ স্বরে বলিয়া উঠিলাম, লক্ষ্মী, তোমাব কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জান। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধূলোবালির উপরেই ম'রে থাকতে হ'ত, কেউ ততদূর গিয়ে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা পর্যন্তও করত না। সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে, সুখেব দিনে না হোক দুঃখেব দিনে যেন মনে করি—নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলেই কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো?

নিশ্চয়।

তা হ'লে আমার জন্যই প্রাণটা দিবে পেয়েছ বল?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা হ'লে ওটা দাবি করতে পারি বল?

তা পার। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, তবু ভাল যে নিজের দামটা এতদিনে টের পেয়েছ। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তামাশা থাক—অসুখ ত একরকম ভাল হ'ল, এখন যাবে কবে মনে করচ?

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, কোথাও যাবার ত আমার এখন তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব তাবছি।

পিয়ারী কহিল, কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসচে। বেশিদিন থাকলে সে হয়ত কিছু ভাবতে পারে।

আমি বললাম, তাবলেই বা। তাকে ত তোমার ভয় ক'রে চলতে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও আমি নড়ছি নে।

পিয়ারী বিরস-মুখে বলিল, তা কি হয়! বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকালবেলায় আমার ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বন্ধু, কি পড় তুমি?

ছেলেটি অতিশয় সাদাসিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এষ্টান্দ পাশ করেছি।

এখন তা হলে বাঁকপুর কলেজে পড়চ ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার ক'টি ভাই বোন?

ভাই আর নেই। চারটি বোন।

তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মা-ই বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি দেশের বাড়িতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো তোমাদের দেশের বাড়িতে গেছেন?

অনেকবার। এই ত পাঁচ-ছ'মাস হ'ল এসেছেন।

সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না?

বন্ধু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হলেই বা। আমাদের 'একঘরে' ক'রে রেখেচে ব'লে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ কবতে পারি নে। আর অমন মা-ই বা ক'জনের আছে!

মুখে আসিল সিন্ধুসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে? কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বন্ধু কহিতে লাগিল—আচ্ছা আপনি বলুন, গান-বাজনা কি কোন দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরদিনে পরচর্চা ও করেন না? বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই হাতি-দশতন ছেলের পড়া বরচ দেন, শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কঞ্চল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন?

আমি বলিলাম, না; এ ত খুব ভাল কাজ।

বন্ধু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত; আমাদের গায়ের মত পাঞ্জী গাঁ কি কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে বছর ইট পুড়িয়ে আমাদের কোঠা-বাড়ি তৈরি হ'ল। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখ মা আমার মাকে বললেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে এটি করে দিলেন, ঘাট বাধিয়ে দিলেন। কিন্তু গায়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না! অমন ভাল—কিন্তু কেউ হবে না, হোবে না—এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংস্রা সবাই মরে যায় যে আমাদের কোঠাবাড়ি তৈরি হ'ল! বলুন না?

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে! এই দরুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন ভাল ব্যবহার করবে না?

বন্ধু একটু হাসিয়া কহিল, তাই ত। কিন্তু সে কি বেশি দিন চলে? প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না, কিন্তু এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—বামুন-কায়তরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবু, পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট?

আমি কহিলাম, নিজের নাক কেটে পবের যাত্রা ভাঙ্গবার যে একটা কথা আছে, এ যে দেখি তাই।

বন্ধু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই। এমন গায়ে আলাদা, একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন? প্রত্যন্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। হ্যাঁ না স্পষ্ট কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বন্ধুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যিই ভালবাসে। অনুকূল শ্রোতা পাইয়া শক্তির আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাহার অজ্ঞান স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময়ে তাহার ঊর্ধ্ব হইল যে, এওক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রয়াস করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত? আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

কাল?

হ্যাঁ, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে ?

বলিলাম, সকাল পর্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে ; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেছে।

তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন ? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই, বলিয়া ছেলোট চিন্তিতমুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম, যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে, ছেলোট লজ্জা পাইল বটে ; এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল ; কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি ?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন। বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট করিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলাম, ছেলোট খুবই সরল বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে বলিয়াছিল, আর বেশি দিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে। কথাটার সহিত ছেলোটের ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্পণা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া বোধ হইল ; মাতৃদেহের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয় ; এবং সে যেন সংসারে সব দিক দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে, যে মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ দেখিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অর্মান সে নিজের দুটি পায়ে শত পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা উচ্ছ্বল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাউক, কিন্তু এ কথাও সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সম্মানের ভিত্তিত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসামণ্ড বসন্ত-দিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না ; কিন্তু এই নামটা পর্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্বরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া বাত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না; আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এত দিন চলুক না, যেরূপ যতই মাথায় ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। ইঠাৎ বন্ধুর মা অত্রভেদী হিমচালের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের মধ্যে লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা, যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে পাই নাই—হল করিয়া, একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, বাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ত হইয়া সেইখানেই বসিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার সময় ধূনুচিত্তে ধূপধনা দিয়া সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন, ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাক, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্ ভাল ?

না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা পরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা ত

সত্যি? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড়ি না। রতন কি করছে? সে কি একটু ওড়িকোলন মাথায় দিতে পারে না? এ বাড়ির চাকরগুলোর মত 'বাবু'-চাকর আর পৃথিবীতে নেই। বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন বাস্তব এবং লক্ষিত হইয়া ওড়িকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার ভুলের জন্য বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে লেশ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়ি শুদ্ধ লোকের লেশ দেখতে পাও।—কৌতুহলী হইয়াই প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন?

রতন কহিল, সে কি কারো জ্ঞানবার জো আছে? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু শুধু হয় আবার শুধু শুধু যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের শ্রাণ গেল! দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল, তখন তাদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে রতন? আর বড়লোকের বাড়িতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও যাসনে কেন?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, তোর কাজটা কি? এর মাথা ধরেছে—বন্ধুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আটটা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্। কাল থেকে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্—এখানে হবে না। বুঝিল?

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেল, রতন ওড়িকোলন ভুল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই নাকি বাড়ি যাবে? আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল ষাটে, কিন্তু গাড়ি ফিরবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই প্রহরটার আর-একরকম করিয়া জাবাব দিলাম হী, কাল সকালেই যাব।

সকাল কটার গাড়িতে যাবে?

সকালেই বেরিয়ে পড়ব— তাতে যে গাড়ি জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কাউকে নাইয় স্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দসাদা নীরব হইল : বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে, ত লাগিল, পিয়াসী বিরক্ত হইলে কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু-শুধু হয়। কথটা আর কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিয়াসীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অভ্যস্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি নাই থাক, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতি বড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারে কোন দিন কিছু ব্যস্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ও সে খালাসী কথা; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। এবং বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাতে হঠাৎ এক সময়ে তম্ভ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। শিখিলাম রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া, ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল, পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। শিঙতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে

আমার লজ্জা পাইবার আছে কি! তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের গাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্বন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির খারগুলো ভাল করিয়া গুজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্তুত হুইয়াই ঘুম ভাঙিল। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে, মাথা এত ভারি যে, শয্যাভ্যাগ করিতেও ক্রেশ বোধ হইল। তবু যাইতেই হইবে। এ বাটীতে নিজেকে আর এক দণ্ডও বিশ্বাস নাই, সে যে-কোন মুহূর্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। নিজের জন্যও তত্ত নয়। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাণীয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলে-মেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শ্রীতি ও ভক্তিব আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিব—এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবনে অধায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে?

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল এখন দেহটা কেমন আছে?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়। যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয়?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তা হলে বাড়ি পৌছেই একটা খবর দিয়ে। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবচলিত দৈর্ঘ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ওটীয়া বলিলাম, আজ্ঞা, আমি বাড়িতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব।

পিয়ারী বলিল, দিয়ে। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পালকিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের পরানক্ষা পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বৃক্কের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এমন গভীর, এমন স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার সেই দুটি করুণ চোখে দুটি আমি আজও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে তখন কত বড় একটা আসন্ন-বিস্ময়ের বাধা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনি ধারা একটা-কিছু ওই দুটি নির্দিষ্ট চোখে মথ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পালকিতে উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানেন না—ইহা দূরেও টেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধাও ছিল না—এই সুখস্বা-পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নাড়াইতে পারিত। দাহনের পালকি লইয়া স্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার স্বপ্ন হইজীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন ভূমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

শ্রীকান্ত

দ্বিতীয় পর্ব

এক

এই ছয়চাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক উঠন সত্যি পড়িল, তখন বুঝিলাম, বিস্ময় এবং সন্দেহ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য করিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করা চলিবে না।

তাই, আজ আবার এই দ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতছিন্ন গ্রন্থিগুলো আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ি ফিরিয়া আসার পরে আমার এই সুখে-দুঃখে-মেশানো জীবন-টাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার আশার আলো নষ্ট হইয়াছে। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে, যাহার নিত্য গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদলাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর-একবকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল,—কোথাও যেন আর ঘর-বার, আপনার-পর রহিল না। এমন একপ্রকার অনির্বচনীয় উন্মাদে অন্তর-বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে রোগ বলিয়া, বিপদকে বিপদ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনেই হইল না। সংসারের কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধা যেন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না।

এসব অনেক দিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। অথচ হারাইয়াছি বলিয়াও কোন দিন ক্ষোভ করি না। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে-শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর ইহাতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্ত্বর সংসারে, এত দ্রুত হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিবাক্ত শক্তি! আর মনে হয়, সেদিন আমারই মত আর দুটি অক্ষ-দুর্বল হাতের উপর এতবড় গুরু-ভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুটি হাতের উপরেই আমার সেদিনের সেই অক্ষ-দুর্বল বিশ্বাসের সমস্ত বোঝা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু যাক সে-কথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল অনেকদিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের একটাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাক্ত! এতদিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি!

আকাশকুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা শুষ্ক পাপড়ি বাতাসে ঘুরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদিবা দু-এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে, ত, হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলো আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এমনভাবে আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত

হইল। উপরে মেয়েলী কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঝুঁক করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার অক্ষর এবং নাম-সইর পানে চাহিয়া সহসা নিজের চোখ দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ বৎসর পূর্বে দেহভ্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এই যে, বছর বারো-তেরো পূর্বে এই 'গঙ্গাজল'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যার দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং দৃষ্টিভ্রান্তি জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী ও গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না ভেঙে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে। তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদিবা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে বটে। মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, প্রকারে কল্পনা করা যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বোধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান যাই।

সে যাই হোক, গঙ্গাজল যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাক দলিলটির উপর বরাট দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকভাবে সুপাত্র যখন তাহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনুচর কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই এই হতভাগ্য সুপাত্রের উপর তাহার একমাত্র ব্রহ্মাত্ম নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আত্ম তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন যে উচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাক দিয়াও যে তাঁর পায়ের তলায় সজোরে একটা টু মারিয়া গায়ে দালা মিটাইব, সে-পথও আমার বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে পারি না পারি, পরম কর্তব্যের জন্য একদিন রাত্রে টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারারাত্রি ট্রেনে কাটিয়া পরদিন তাহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ন। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসর পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া এবং দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সোপান-স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুছানুপুছরাপে পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি কি গহনা আছে, এবং ভাত্য কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং করিলে কত টাকা আদান্য রাখি। পছিতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল না। বলিলেন, তাঁর কোন-এক আত্মীয় বর্মানুস্মকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অভিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—ওধু কুড়িয়াই লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙ্গালীদের সাহেবেরা কাঁখে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ওধু তাহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মাত্র-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সমস্ত-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এই মোহ-ভ্রমের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্রেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। গঙ্গাজল-মায়ের বর্মানুস্মকের বিবরণ আমাকে তাঁর মত বিধি। 'লাল' হইবার আশায় নহে—আমার মধ্যে যে 'ভববুরে'টা কিছুদিন হইতে কিম্বাইডেছিল, সে তাহার ভ্রান্তি খাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সম্মুখে ইতি—পূর্বে ওধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত অজ্ঞান জলরাশি ভেস করিয়া বাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া

তুলিল। কোন মতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যতপ্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু রাতে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরন দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাতছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া শুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকাকড়ি, গরবাড়ি, বিদ্যা-সাধিা দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল; এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমন কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মুগ্ধ হইয়াও, সুদৃঢ়াত্ত্বী আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপরে দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও চক্ৰবৰ্ত্তী তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকে। আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না; এবং এজন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতুহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিবস্ত্র করা গেল না। কারণ যিনি সুদীর্ঘ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিলরূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না—সে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাণ্ডু আছে বটে, কিন্তু পাঁচ শত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার দৃষ্টি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রধান করিলাম। কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বীধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝিতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাহার এই প্রতিশ্রুতির কঁাস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এই উপায় ছিল, পিয়াসীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদও জানিতাম না। সেই পৌছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লেখে নাই। বোধ করি, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্ততঃ তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিজ্ঞার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটিতে প্রবেশ করিয়া নীচের বসিবার ঘরের বারান্দায় দেখিলাম, দুজন উর্দুপন্যাস দারোয়ান বসিয়া আছে। তাহার হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সজোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্বে পিয়াসীর সাবেক গুড়া দরওয়ানজীর পরিবর্তে কেন যে তাহার এমন দুজন বাহরে দরওয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রহায় করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব কি, সবিনয়ে ধন্যমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয় নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক হইয়া গেল, পরে পায়ের কাছে টিপ করিয়া একটা প্রশ্নাম করিয়া বলিল, কখন এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে? এইমাত্র আসচি রতন। খবর সব ভাল?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু! ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আসচি, এলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিব ঠাকরুন ওপরে আছেন?

আছেন, বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাস্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে শুভ্র জাজিম ধপধপ করিতেছে। তাকিয়াগুলায় অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরনে বাঙ্গালীর মত ধূতি-পিরান থাকিলেও, মাথার উপর কাজ-করা মসলিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। এক জোড়া বায়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবলচি এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম। পিয়ারীর গায়ে মুক্তার পোশাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজসজ্জারও অভাব ছিল না। বুবিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল! তার পরে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এ কি! শ্রীকান্তবাবু যে! কবে এলেন?

আজই।

আজই? কখন? কোথা উঠলেন?

ক্ষণকালের জন্য হয়ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, এখানকার সমস্ত লোককেই ত ভূমি চেন না, নাম শুনে চিনতে পারবে না।

যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি এ যজ্ঞের যজ্ঞমান তিনিই। বলিলেন, আইয়ে বাবুজী, বৈঠগে; বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা অসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নীচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম। বিচারের সময় বেশি ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোনমতেই প্রকাশ পাইলে চবিরে না। আমার মুখের কথা, আমার চোখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের স্ফোট বা অভিমানের একটি বিশৃঙ্খল বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলাম, বাইজীবাবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাঁকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনেব জোরটা তাঁর যাচাই করে নিতুম। বলি, করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!

প্রশংসা শুনিয়া কর্মকর্তা বাবুটি আনন্দে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক, দেখিলাম, তিনি বাঙ্গলা বলিতে না পারিলেও বেশ শুনেন। কিন্তু পিয়ারীর কান পর্যন্ত রাস্তা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়—রাগে, তাহাও বুঝিতে আমার গাফী রাহিল না। কিন্তু স্বক্লেপ করিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া তেমনি হাসিমুখে বাঙ্গলা করিয়া কহিলাম, আমার আসার জন্যে আপনাদের আমোদ-আহ্লাদের যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গান-বাঞ্ছনা চলুক।

বাবুটি এত খুশি হয়ে উঠিলেন যে আবেগে আমার পিঠের উপর একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, বন্ধ আজ্য বাবু!—পিয়ারীবাবি, একটো ভালো সঙ্গীত হোক।

সঙ্গার পরে হবে—আর এখন নয়, বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা ধরে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম

রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলার একজন জমিদার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারীবিবিকে তিনি সাত-আট বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়িতে তিন-চারবার মুজ্জা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন ; কখনও কখনও দশ-বারো দিন পর্যন্ত থাকেন—মাসে তিনেক পূর্বেও একবার আসিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—এইবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিলার পূর্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, বাইজীকেই জিজ্ঞেস করুন না, কেন এসেছি।

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি একটা তাঁঁত্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ শাস্ত স্বরে ; কহিল, উনি আমার দেশের লোক।

আমি হাসিয়া কহিলাম, বাবুজী, মধু থাকলেই মোমাছি এসে জোটে—তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না। কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যাটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন, এবং তাঁর চাকর আসিয়া যেই জানাইল, সন্ধ্যা-আহিকের ভায়াগা করা হইয়াছে, তিনি তখনই প্রস্থান করিলেন। তবলচী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাৎ কেন এমন বিকল হইয়া গেল তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস নে? যা এখান থেকে, বলিয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ির ভারকেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এখন হঠাৎ আসা হ'ল যে?

বলিলাম, দেশের লোক, অনেকদিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম বাইজী!

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমাব পরিহাসে যে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া বলিল, আঙুর এখানেই থাকবে ত?

থাকতে বল, থাকব।

আমার আর বলাবলি কি! তবে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে। যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে—বাবু শুচ্ছেন? বেশ! আমি নীচে শোবো, তোমার নীচের ঘরগুলোও ত চমৎকার।

নীচে শোবে? বল কি! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দু-দিনেই এতবড় পরামহংস হয়ে উঠলে কি করে?

মনে মনে বলিলাম, পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনেনি। মুখে বলিলাম, আমার তাতে মান অভিমান একবিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে কর ত সেটা একেবারে নিরর্থক। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খাবার-শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশী বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে বেলো, না থাকে দরকার নেই—আমার কঞ্চল সম্বল আছে।

পিয়ারী খাড় নাড়িয়া বলিল, তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে কোনরকম দুঃখ হবে না ও?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না। কাবণ স্টেশনে পড়ে থাকার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ গাছ-ফল পড়ে থাকতুম, এত অপমান সহ্য করতুম না।

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া পারিলাম না। সে যে কি কথা আমায় মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলাম, আমি এত নির্বোধ নই যে, মনে করব তুমি ইচ্ছে করে আমাকে নীচে শুতে ব'লে অপমান করচ। তোমার সাধা থাকলে তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কণ্ঠ কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে পাঠিয়ে দাও গে, আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কঞ্চল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পিয়ারী কহিল, তুমি জানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝবে না ত বুঝবে কে? যাক, বাচলুম! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা আসার সত্যি কারণটা ওনতে পাইনে কি?

বলিলাম, প্রথম কারণটা ওনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক বলৈ।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্মায় যাচ্ছি। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখতে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরী হয়েছে, আসুন!

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারী ধুম পাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা আছে, বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নীচের ঘরে না ক'বে এ ঘরে ক'বা হ'ল কেন? রতন আশ্চর্য হইয়া কহিল, নীচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই কথা ছিল!

সে অবাক হইয়া কক্ষকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে? আপনি কি যে তামাশা করেন বাবু! বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব শোবেন কোথায়?

রতন কহিল, বহুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়-হাত চওড়া তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গতি পাতিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর মস্ত পুরু গতি পাতিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজেব মতো বাঁও জুলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি ফলফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভূত্যের হাতে তৈরি হয় নই—যে বড় ভালবাসে, এসব তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া দিয়া গােছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্বন্ধে আমার অচিন্ত্যপূর্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্বিকার ওদাসীনে মনে মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা দীর্ঘার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে একতরফ খরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্রুদ্ধ আঘাতটিকেই শতশণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁতোর মত বিধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

স্রাতিবশতঃ হয়ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গানের উপর একটা হাড় রাখিয়া বহিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?

না, তা জানিনে।

কবে?

কিরন্তাই হবে, এমন শু কানো মাথার দিয়া নেই।

নেই? তুমি কি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো নাকি?

কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু সংসারের এই একটা ভারী আশ্চর্য যে মানুষের দুর্বলতা কখন কোন ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ খটিয়া গিয়াছে, আমি কোনদিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটি সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানিনে রাজলক্ষী, কিন্তু একজনের জানি। যদি কোনদিন ফিরে আসি ত শুধুই তোমার জন্যই আসব। তোমার মাথার দিবা আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাসিয়া উপড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট-দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে বস, এ অবস্থায় কেউ দেখলে সে ভারী আশ্চর্য হয়ে যাবে।

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্যন্ত দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানটানি করিতে, সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-নিমিতে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠব!

কি কথা বল?

আগে বলা ও কথাটা এখানে থাকতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো! তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন! সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞাস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বোলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে প'ড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করিনে। আর করলেও সংসারে ত হবার পথ কেউ কারো আঁটকে রাখতে পারে না।—পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হ'লে তুমিও আটকাতে পারবে না।

আমি জবাব দিবার পূর্বেই রতনের কাসির শব্দ হারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামনঠাকুর চলে চলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাইত, তাদের কারুর যে এখানে খাওয়া হয়নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজেই হাতেই লইয়া আসিত; তাহা রতনের জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।—আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, আমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েছি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখব। বলিয়া সম্মতির জন্যে অপেক্ষামাত্র না করিয়া আমার পায়ের বলিশটা টানিয়া লইয়া বা হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'তে পারে তা হ'লে? এমন কি রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া কিসের জন্য বর্মায় যেতে চাচ্চ ওনি?

চাকরি করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনার সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল ; কিন্তু আমাকে ঠকিও না। আমাকে ঠকালে তোমার হইকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো?

সেটা বিলক্ষণ জানি ; এবং কি করতে বল তুমি?

আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুশি হইল ; হাসিমুখে বলিল, মেয়েমানুষ চিরকাল যা বলে থাকে, আমিও তাই বলি। একটা বিয়ে কর রে সংসারী হও—সংসারধর্ম প্রতি-পালন কর।

প্রশ্ন করলাম, সত্যি খুশি হবে তাতে?

সে মাথা নাড়িয়া, কানের দুল দুলাইয়া সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়! একশ' বার। এতে আমি সুখী হব না ত সংসারে কে হবে শুনি?

বলিলাম, তা জানিনে, কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল! বাস্তবিক এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে বিয়ে না করে আমার আর উপায় নেই।

পিয়ারী আর একবার তাহার কানের স্বর্ণভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি ত তা হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব। কিন্তু মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করব, তা বলে দিচ্ছি। আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহস' তাহার হাসিমুখে একটা স্নান চায়া পড়িল, কহিল, বেশ ত! ভাইলত! স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ-দুঃখ জানিনে রাজলক্ষ্মী! যা স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্ছি।

পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও—চালাকি করতে হবে না—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যা নয় ; চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা মেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমানত দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হল?

পড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়িনে।

তা হ'লে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই!

আমি জানতেও চাইনে, বলিয়া সে বুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটা কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যেই রহিল। বহুকাল পর্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তারপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপেন সম্মুখে, মেজের উর সেই দুইখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলো বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তারপরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলেবেলা দেখেছি। আর চিঠি পড়লে?

হী, কিন্তু খুড়ীমার চিঠিতে এমন-কিছু লেখা নেই যে তোমাকে তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর থাক, ভাল, না থাক ভাল, এ মেয়ে আমি কোনমতেই ঘরে আনব না।

কিন্তু মেয়ে ঘরে আনতে চ্যও, শুনতে পাই কি?

সে আমি এখন কি করি বলব! বিবেচনা করে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হ'লে আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর একজন্মে এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক, যথাসময়ে তাই নাহয় বাখো, আমার ভাড়াভাড়া নেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার করে

দিয়ে। শ' পাঁচেক টাকা হ'লেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।—পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়ীমার কথা মিথ্যে হ'তে দেব না ; একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বলচি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে—
নইলে কি ?

নইলে আবার কি ! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার করে তবে কথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথ নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা করো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সে নাহয় নই পারব ; কিন্তু তুমি বর্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেনে ?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হসিলাম, কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে ?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তাঁৎক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, সাহস ! এ কি একটা শব্দ কথা ব'লে তুমি মনে কর ?

'আমি গাই করি, কিন্তু তোমাব এই সমস্ত বাড়িঘর, জিনিসপত্র বিষয়-আশয়—তার কি হবে ?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা তোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বন্ধুকে দিয়ে যাবো।

এ কথার ভাবনা শুনি পিয়ারী বলিল, 'শোলা ভাণ্ডারের বাহিরে অঙ্ককারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অতদূরে না গেলেই কি নয় ? এসব তোমাব কি কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না ?

বলিলাম, না, কোনদিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে ? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আশ্রয় তাহার হাতখানা রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ি হইতে একরকম জোর করিয়াই নিদ্রায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এতবড় দুর্বলতা, এই করুণ কঠোর সত্যের মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিলে বটে, কিন্তু যখন ডাকবে, 'নি ফিরে আসব'। যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী।

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে ?

হী, চিরদিন থাকব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল ?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না।—পিয়ারী অপলকচক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রু-ভরে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফোঁটা গাল বাহিয়া টপটপ করিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাড়াবুরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সম্মাসী হইয়া যাবে ?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সম্মাসী হয়ে থাকি। আমার লোকসান নয় ; যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস করো না।

পলকের জন্য দুইজনের চোখাচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বলিশের উপর মুখ গুজিয়া উপড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ব্রহ্মনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। শ' হু বাড়িটা গভীর সুবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই।

একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিভূক্তির সহিত দেখিতেছে।

দুই

এক-একটা কথা দেখিয়াছি, সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলো পর্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলোও তেমনি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বৎসর দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোনমতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। চাকর-বাকরদের সামনেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অর্থাহীন নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বলচি আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়। একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে সে এত বড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্ভাবনা জানেন। আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরোয়ান গাড়ির কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয়ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষা দেবে?

বলিলাম, দেব।—পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রা যে ধবংস, তাতে—আচ্ছা যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা করব না—খবর দেব, বলিয়া দাঁরে ধীরে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আমার পায়ের ধূলা লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার গুস্তাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অশ্রুত অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, নাই গেলে অন্ত দূরে? থাক গে, যেও না।

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সঙ্গসঙ্গ ও ঘড়ঘড় শব্দ অপরাহবেলা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কায়ই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

তিন

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিদ্যানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিতে না নামিতে, এক ঝাঁকি-কুর্তি-পর্য্যন্ত কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চাকের পলকে অন্তর্ধান হইয়া গেল, বুজিতে বুজিতে দৃষ্টিভ্রান্ত চোখ ফাটিয়া জল না আসা পর্যন্ত, আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়িতে গাড়িতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড় রাস্তার অন্তর্বর্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁচটে, গেরুয়া—একটু কুয়াশা করিয়াও ছিল—মনে হইল একপাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোট-ঘাট লইয়া দ্বী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারা-রাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যবে সর্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান অধিকার করিয়া লইবে বলিয়া। অন্তঃকরণে কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ায় যায়। অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, কাবুলের উস্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্যন্ত এই কয়লাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নীচে আর নাই), সূতরাং ইহাদিককে পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বলিবার জায়গা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্বাস হিম হইয়া গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সম্ভাবনাও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে ; সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোন্দ-পনর শ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকলে বসেছিল—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগদরি হোগা।

ডগদরি পদার্থটি কি বাপু?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগুকা ডকদরি।

জিনিচটা আরো দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি-না-বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমাবও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না বুজিতে বুজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সমুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙ্গালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসম্মোচে ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দর্জির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিলে বুঝাইয়া দিল যে, বর্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রভাব। গুনিয়াছি কসাইখানার যাত্রীদের পর্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুনযাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এতবড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল? ক্রমশঃ ‘পিলেগুকা ডগদরি’ আসন্ন হইয়া, ‘ঠিল,—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্তী অবস্থায় বেশি ঘাড় বাঁখাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না, তথাপি পুরোবর্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পছতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্ধ অনাবৃত করায় লীত হইবে, অবশ্য বাঙ্গালী ছাড়া ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্ধ অনাবৃত করায় লীত হইবে, অবশ্য বাঙ্গালী ছাড়া একরূপ কাপুরুষ সেখানে কে ছিল না : কিন্তু সম্মুখবর্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তারসাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার চিন্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রয়োগ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আরও এতদূর গিয়াছে তবু যা হোক একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল ; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাণ্টা সেদিন মুচড়াইয়া ভাসিয়া না গিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না। সে যাহা হোক, পাশ করা যখন অশেষ কর্তব্য, তখন আর উপায় কি? যথাসময়ে চোখ বুজিয়া সর্বাস সমুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পাশ হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণক্রিয়া যে কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা কঠোর অসাধ্য। তবে কলকারখানার দাঁতগুলো চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন সুমুখের টানে পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী,

পাজারী, মারোয়াড়ী, মাদ্রাজী, মারহাট্টী, বাঙ্গালী, চীনা, খেট্টা, উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী সূক্ষ্মমাত্র পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগে ডাঙ্গা হইতে জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল ; এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সম্বিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া এই দল স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোধ করিতে লাগিল ; আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া ঠাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেহ সম্মুখেই প্রকাশ করিলেও বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এককোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজীর মত চক্কের পলকে যে যাহার কথল বিছাইয়া বাস্তব পেটরার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমরা সেই নম্বর-অঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল ; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেচি : যদি বলেন, নীচে আনি।

বলিলাম, না ; বরঞ্চ আমাকেও কোন মতে উদ্ধার কর রে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া, তাহার সহিত হাতহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া, পা ফেলিতে পারি, এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কতর্কি করিয়া কথল ও সতরঞ্চির এক-আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিসপত্র দেখাইয়া দিয়া বকশিশ লইয়া প্রস্থান করিল। এখানেও সেই ন্যাপার—বিছানা পাতিবার জায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। স্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই-ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অজ্ঞই আছে! কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙ্গালী থাকে ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে অন্তন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালায় আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাতারতের যুগে বিরাট রাজ্যের যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুর হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্মা আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগা কমাটিং ঘটে ; এবং সঙ্গীতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিভকলা, তাহা সেইখানেই দাঁড়াইয়া সমস্তমুখে স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিষ্ময় এই যে এতগুলো সঙ্গীত-বিশারদ একসঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নীচে নামা উচিত হইবে কি না, সহসা স্থির করিতে পরিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকাবি সেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে মুগ্ধ না হয়, সে খুন করিতে পারে, না, এমন কি—একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি, তাহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কি না, জানি না ; না হইলে, কানুলিওয়ালা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! একপ্রান্তে এই অজুত কাণ্ড চলিতেছিল! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি ; হঠাৎ দেখি একব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক লোকের চোখরাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাড়জোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে

রেজুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগদ-ঘোবনা ছুলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়াভুরু আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুশায়, ইটি আমার পরি—

কথাটা শেষ না হইতেই স্ত্রীলোকটি ফোস করিয়া গর্জিয়া উঠিল—পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিথ্যারী, যার-তার কাছে মিছে করা বলে আমার বদনাম করে। না বলে দিচ্ছি। আমি ও বিষয়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বছর! পোড়া কপাল! জাত-বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবস্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হৈসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা ঘরও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, ওব জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে ভাতের গর্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ-দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায়, দেখলেন? এখনো এদের জাতে বদমাশ! দেখলেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

আমি কেন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাত-বোষ্টমের কথাগুলো মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ও একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং শহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত না হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অনায়াস হইতে যাহারা সুকুমার খাওয়া-ছোওয়া বাঁচাইয়াই পরিব্রাজ পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই।

আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্টাঙ্গ হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্রপাড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বেশ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি কবার দায়টা আমি একেবারেই এঁ হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকলেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কলাকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহার এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রশাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাতে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তরুণ কবিতা উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা... সি... শুই হয়ে গেল!

একটু উদ্ভিগ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া গেল। দুই ভুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন-কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাঙ্গা বিক্রী করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাঙ্গা বিক্রী করা দেখেছেন? টোকা মেরে ভাঙ্গা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুগুরি-বেঁসারি সব একাকার করে দেয়, সেবতার, পায় আমলা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ হ'ল যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহা পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের

জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর কিন্তু ভদ্রকের মত গর্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চূপ করিল। মূর্তিমান নোংরা একজোড়া কাবুলিয়ালা আপাদমস্তক সমস্ত পৃথিবীর অপরিস্ফুটতা লইয়া অত্যন্ত ভূপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল?—পরিবার কহিল, মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

বাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হ'লে—

নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিবা একইাড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্যন্ত বলচি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিস্ নে—নাঃ রেজুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেজুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুদ্র অভিমানে একতিবার মাএ আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগা কাবুলীকে চোখের দৃষ্টিতে দৃষ্ট করিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পারি নে। ওই দেখুন ভাসা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস; এর বেশি যদি কিছু জানতে চান ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কটমটকবিয়া চাহিয়া বহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, তা যাক, সঙ্গে টিডে আছে ত!

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুটলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখাও গো তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু কাবুলী জাহাজকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটিও অমনি বেঁধে দেয়! ফেলিস নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।—নন্দর এই পবিত্রাসে আমি ত হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বস্ত্র-কর্কশ-শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিয়া, টগর চীৎকার করিয়া উঠিল—

জাত তুলে ক'রো না বলচি মিস্ত্রী!—ভাল হবে না, তা বলচি—
চীৎকার শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিন্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালোমতোই চিনিত, একটা বেকাস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শাস্ত করিতে পারিলেই বাচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাশা করেচি বৈ ত নয়।—টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা ভুরু একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার সুর আরও এক পদা চড়াইয়া দিয়া বলিল, কিসের তামাশা! জাত তুলে আবার তামাশা কি! মোচলমানের রুটি দিয়ে মালসা ভোগ হবে? তোর কৈবস্তর মুখে আশুন—দরকাব থাকে, তুই তুলে রাখ্ গে—বাপের পিডি দিস্!

জা-মুস্ত ধনুর মত নন্দ খড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—হারামজাদি, তুই বাপ তুলিস্!

টগর কোমরে কাপড় চড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্! বলিয়াই আকর্ষণ মুখব্যাধান করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দর্শন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোটিমীর ময়যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা ছি-ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চোঁচামেচি করিতে লাগিল—সবসুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙ্গালী নয়নাভীর্ণ দ্বারা এক-জাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটির সাইত মিশিয়া বাহিতে লাগিলাম। কাছেই

একজন জেীনপুত্রী দরওয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাশা দেখিতেছিল ; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গালীন তো বহুত আছি লড়নেওয়ালী হ্যায়! ইটতি নহি!

আমি তাহার পানে চাইতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

চার

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন কোন শর্তাদি নির্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, শর্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ক্যাপ-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে জিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অপরের ব্যাঘ্র ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে ; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতাপুরুষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের অনাগোনার বিরাম ছিল না ; এখন অপরাহ্নের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘে দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলাফেরার মধ্যেও একপ্রকার বেহুশ ব লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ-গোড়েব খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হইবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইল কহিল, কোর্তা, নীচে বাও ; কাপ্তান কইচে ছাইক্রান হোর্তি পারে।

মিনিট পনের পরেই দৌখলাম কথাটা অমূলক নয়। উপরের এত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোব করিয়া খালাসীরা হোলডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেন্ড অফিসার নিক্তে হাসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিককে তুলিয়া দিয়া বিছানাপত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার ভোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল ; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে তত্ত্বাগোরা দশ টাকার বেশি ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিককে জাহাজের খোলরে মধ্যে পুরিয়া গর্তের নুং আটিয়া বন্ধ করাইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণেব ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্বে সাইক্রান বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি হইার কাজ, কেমন হইার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত অমন শ্রমের ইদুরের মত শিক্কারায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ডেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাগিয়া গিয়া, এক সময়ে টপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজ্যের জাহাজ যে অঙ্গ-পিছে লক্ষকোটি হাজার-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফোলতেও যে তাহাদের মূর্ত্ত বিলম্ব হয় না—এ সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতে ওড়িওড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল ; এমন হইয়া উঠিল যে পালাইয়া বেড়াইবার আর জো রছিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরেন ডেক জনশূন্য। মাঙ্গলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বৃড়ো কাপ্তান দূরবীন হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে

করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলো ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের বাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্রতরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই ছাইক্রোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোপন্দমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়সম কবিত্তে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বৃকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মস্তবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পলক্ষণের একটা বিকট শব্দ 'সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে ঝাঁপিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাতে ঠাকুরমার বৃকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা ভুলিয়া সাতশ' বাক্সসীর প্রাণ—সোনার ডোমরা হাতে পিথিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' বাক্সসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদ্মভদ্রে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি—একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে বাক্সসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্নত কোলাহলে এমিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। বাক্সসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করণ ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করণও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অতিকৃত করিয়া সূক্ষ্মমাত্র এমন একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া বহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চান্দব দিয়া নিজেই এতদূর সঙ্গ বোধিয়া ফেলিয়া ছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিড়িয়া ফেলিয়া আমাদের সাগরের মাঝখানে উড়িয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের শাক্যায় বজ্রবজ্ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আচ্ছ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ও কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় নিবটিকায় মহাতরঙ্গ মাথায রক্ততপ্ত কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিশ্বায় ভগ্নগত আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত জানও কতবার এই পথে যাত্রায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলেব ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধাও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ডেউ-সড়াট! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাত্রা হইবে সে ত আমি জানিই, কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ-মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে সেই অপরিস্রব গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অতিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রজলে থাকা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখার ইহঁর মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে

হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পহিঁতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর স্তম্ভেরের মূখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল : এবং ভয়াবহ খালাসীর দল আশ্রয় কর্তে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটিয়া সমস্তের চীৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড-গোছের গুলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গা-নাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ-সুদূর সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-সুদূর আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদেলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাটলাম, কেন কাপ্তেনসাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্তে পরিয়া চাপি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া বাহিতে লাগিল। আমার নোচ ভাঁস-মুরগিগুলো বার কতক ঝটপট করিয়া এবং ভেড়াগুলো কয়েকবার ম্যা ম্যা করিয়া ভবলীলা সাধ করিল। অগ্নি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিল। কিন্তু এখন আর-একপ্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছটি ছুঁতে মত গায়ে বিধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত কামাকাণ্ড ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি স্নাত করিতে লাগিল। যে, দাঁতে-দাঁতে ঠকঠক করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিঃশব্দ পাই, নিঃশব্দতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এইভাবে আরও কিছুকাল বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করলাম। সুতরাং যোমন করিয়া হোক, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন-কোথাও আশ্রয় নাইতে হইবে, যেখানে জলের ছটি বল্লভের ফলাব মত গায়ে বোঝে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার বাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু এইবার কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ও নিঃশব্দই যদি না মা মা করি, না-মা করিয়াও অন্তত হইলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পাশ-পরিধতনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ, পাওয়া যায় : অতএব এই সময়টুকু মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয়ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু বাঁচা হইতে প্রকটরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদিবা সেকণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমন করিয়া অতিক্রম করিয়া ফাস্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরাল ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া ওইয়া পড়িলাম। রাত্রি বারোটার মধ্যেই বড় বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের বাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া নতুনশায় সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল রাত্রে মিস্ট্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিলেন, মশায়, সাড়েবত্রিশভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম ; এইমাত্র যে-যার কোঠে পিঁরে এসেছি। আজকার মিশামিশি সাড়েবত্রিশভাজায় চলে কিনা, জানি না ; কিন্তু এখন পর্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোঠে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের আবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন-চারশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকে ত অনেক দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত হই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কলাকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ' লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাস-পেটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এখার হইতে ওদার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। খনি এবং অনুরূপ আর দুটা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তারবাবু জাহাজের মেখর ও খালসীদের লইয়া ইহাদের পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবু আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন। তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্ছে : বোধ করি একটা হ্যামক পেয়েছিলেন, না?

হ্যামক কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, ডাক্তারবাবু, অধমও এই নরক-কুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্বল বলিয়া এখনে ঢুকিতে পারি নাই। শুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকী রাত্রিটা ফাস্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছি কি বলেন, অনায়াস করিয়াছি কি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এমনি খুশি হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকী দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাগরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, শুধু ডেকচেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা, ক্ষুধার তাড়নে নিজীবের মত এই কেশরটার উপরে পড়িয়া, প্রস্রাবের খাদ্যবস্তুর চিত্র করিতেছি—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিলে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি। এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জীদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুনশায়, একটি ব্যঙ্গালী মেয়েলোক আপনাকে ডাক্তেচে।

মেয়েলোক? বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ট্রির সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে কিন্তু আমাকে কেন? Trial by ordeal ছাড়া বাহিরের লোকআসিয়া কোনদিন যে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, ঘন্টাখানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, না বাবুনশায়, বড় কাতর হয়ে ডাকতেচে—

কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষ মানুষটি কি করচে?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাকতেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেক দূরে এক কোণে কতকগুলো কাছি বিড়ার মত করিয়া রাখা ছিল, তাহারই আড়ালে একটি বাইশ-তেরিশ বছরের ব্যঙ্গালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাজেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপরে এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্লিণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে আস্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল, কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইলাম।

সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল ক্লীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি; কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কতটিং দেখিয়াছি। আমার অল্পদাঙ্গির কপালও বড় ছিল—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিঁদুর ডগ্‌ডগ্‌ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা—আর কোন অলঙ্কার নাই, পরেন একখানি নিতান্ত সামান্য রাস্তাপেড়ে শাড়ি।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনায়

সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েছে। তবে মনে হয় ডাক্তারবাবু লোক ভাল—কিন্তু, কি প্রয়োজন?

তিনি বলিলেন, ডাকলে যদি ভিজিট দিতে হয়, ত কাজ নেই, ইনি নাহয় কষ্ট করে উপরেই যাবেন। বলিয়া সেই কথ লোকটিকে মেঝেয় দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, ডাক্তারকে ডাকলে বোধ করি কিছু দিতে হয় না। কিন্তু সে যদি হোক, এর হয়েছে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটি এর স্বামী। কিন্তু ঠাণ্ডালোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর কৃত্রিম্য পড়িয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ি থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েছে। এখন দেখাচি জ্বর খুব বেশি, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উগ্রাঙ্গ ঘনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নাচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্তবাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক।

ডাক্তারবাবু লোকটির সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করে নতুন গল্প কহিলেন, ডাঃ স্বামি ত?

বলিলাম, হ্যাঁ।

বিশ্রুটি?

হ্যাঁ সঠিক।

আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুভাতে মুখেমুখি দুখান চোয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি করে?

বলিলাম, ঠাণ্ডালোকটি আমাকে তাকে শঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠ্যবরেই কথা। বিয়েটিয়ে করেছেন?

বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, হ্যাঁ জুটে পড়ুন নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটাও এই ত হারা! তাতে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্ছে যা হোক, বেশ দিন ঠিকবে না, তা ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিত্তে যায়।

অবাক হইয়া বলিলাম, আপনি এ সব কি বলছেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছোটভাটা বার করে আনতে, না শুকেই বার করে এনেচে, কি মনে হল বলুন ত শ্রীকান্তবাবু? খুব forward, না? দিবা কথাবার্তা কয়।

বলিলাম, এ রকম হারনা আপনাব মনে কি করে এল?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কিনা, একটা-না-একটা আছেই! গতবারেই ত বেলথোরের একজোড়া ছিল। একবার বন্ডায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখবেন! আমান কথাটা ঠিক কি না।

বন্ডার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পাবে দেখিবাম্বিনাম বটে; কিন্তু আপাতত সমস্ত মনটা বিভ্রমায় যেন তিত্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিত্রীর ঘর লইতে নীচে গেলাম। 'সপরিবার' মিত্রীমশাই তখন ফলাছারের আয়োজন করিতেছিল; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, এই মেয়েমানুষটি কে মশাই?

টগর শিরশীড়া বান্দে মাথায় একটা পাগড়ি বাধিতেছিল--ফোগ করিয়া গজহিয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি তিনি

মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশাই, মাগীর ছোট মন? কে বাঙ্গালী মেয়েটা রেজুনে যাচ্ছে—ধবরটা নিতেও দোষ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সেই দুটি গো-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিষ্টিরি, মানুষ হয়ে গেল—এখন ও আমার চোখে ধুলো দেবে? আরে, তুই ডাক্তার, না বদি যে, যেই একটু জ্বল আনতে গেছি, অমনি ছুটে দেখতে গেছিস? কেন, কে ও? ভাল হবে না বলে দিছি মিষ্টিরি! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাবে? আমার ইচ্ছা হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব—তুই যা পারিস, তা করিস। বলিয়া ফলারে মন দিল।

টগরও শুধু একটা 'আচ্ছা' বলিয়া তাহার পাগড়ি বঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এমনি করিয়া ইহার বিধ বৎসর কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠিকিতেই হইবে; হয়, অহিনিশি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখতে হইবে, নাহয়, যৌবনেও মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে বসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া টগরের এই বিবেচ, ডাক্তারবাবুর এমন কুৎসিত তীব্র কটাক্ষ—সে কে, এবং কি? টগর করিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে—তাহার চক্ষে ধুলি দিলে,—এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাক্তারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কাণ্ড নিত্যা দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যাদৃষ্টি আসিয়াছে, আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়ইয়া ফেলিতে বাকী আছেন।

এমনিই বটে। আপনাকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অস্তব্যাসী নয়, কিংবা তাহার ভ্রম-ভ্রমাদ কখনো হয়। সবাই করে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জরুরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজেব মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাধনান হইতেই হয়। সংসারে অল্পদদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে, ভালো ভাবিয়া নির্বোধ হওয়াতেই যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশিই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নরনারীর উপদেশ অগ্রান্ত বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, অগ্রান্ত forward, তা বটে। এই কথাটিই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া ঝোঁচ দিতে লাগিল। অনেক রাতে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম গুনিলাম, অভয়া। উত্তরগাটী কায়স্থ, বাড়ি বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ঊষ্মে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই ত্রীলোকটির সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুরু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব, তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্বে বর্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উল্লেখ নাই। দেশে আত্মীয়বন্ধন আর কেহ নাই। যা ছিলেন, তিনিও মাসখানেক পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করায় অভিভাবকহীন হইয়া বাপের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণীদাদাকে রাজী করিয়া বর্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না করে কোনমতে দেশের বাড়িতে পড়ে থাকলেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া এ বরসে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার কোন খোঁজ নেন না, কিছু জানেন?
না, কিছু জানিনে।

তার পূর্বে কোথায় ছিলেন তা জানেন?

জানি। রেস্‌কুর্নেই ছিলেন, বর্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন; কিন্তু কত চিঠি দিয়েছি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোনদিন আমার ঘিরে আসেনি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ায় স্বামী পাওয়াচ্ছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবতঃ হেতু এইমাত্র ডাক্তারাবাবুর কাছেই গুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙ্গালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রাহ্মবর্মণী লইয়া আবার নৃতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেক আছে, যাহারা সাবাজীবন আর কখনো দেখে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চূপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, এবং ঠিক তাই উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

খপ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল

আমি পুনরায় মৌন হইয়া বহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাবছেন, আমি কখন

জানেন?

জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে তাহাতে পারেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা হোক, আমি ভয় করিনে। আমি সঠিক নিয়ম খবর করতে পারব।

তৎপরি চূপ করিয়া বহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাবছেন আমি ঘর করতে রাজী হইলেই তা হ'ল না; আমার সঠিক কার্টা হবে কি না, এই তা

বাস্তবিক, অশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, বেশ তাই যদি হয় তা কি করবেন?

এইবার অভয়ায় ঢোহ দৃষ্টি ছলছল করিয়া উঠিল। আমার মুখেই প্রতি সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, সে বিশেষ আপনি একটা প্রমাণের সত্যতা, করবেন শ্রীকান্তবাবু। আমার লেহিগীলাদা বড় সাদাসিধে ভাল মানুষ, তাঁর ছাড়া ওহন তা কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাদা থাকলে নিশ্চয়ই করব; কিন্তু এসব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ তা প্রায় হয়ই না, এবং অকাজই বেঁচে যায়।

সে-কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চূপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পর্বদিন বেলা এগার বাজার মধ্যে জাহাজ রেস্‌কুর্নে পৌঁছিতে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখেচোখে একটা ভয় চাক্ষুসেব চিত্র দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অশুভ শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কোরেবিন্ট—কোরেবিন্ট। ঘরব লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine, তখন শ্রোণের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সতর্কান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাটাভারের বেড়া দিয়া স্থানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি বৃঁড়ে ঘর স্থাপন করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নিবাসিত্যে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে তাহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাছাবও কোন স্থানীয় শহরে থাকে, এবং সে Port Health Officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র জোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আশ্রয় পায়।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় করুন আপনার আসা উচিত ছিল না; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোকেরই অমর্যাদিক ব্যাপার। একে তা মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিস

নিজে কাঁধে করে একটু সুরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়—ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয় ; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে সিঁটে ফুটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবশিষ্ট থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতিকার নেই, ডাক্তারবাবু?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তবে ডাক্তারসাহেব জাহাজে উঠলে একবার আপনার জনা ব'লে দেখব, তাঁর কেরানীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজী—কিন্তু কথটা তাঁর ভাল করিয়া শেন না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দুইজনই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেন্ড অফিসার ও ৭ জন খালসীকে এলোপাণ্ডি লাথি মারিতেছে ; এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটি অত্যন্ত উদ্ভক্ত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সাহিত ইতিপূর্বে কোনদিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজও কলহ হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু ঞ্ছ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত—একদিন তোমাকে এ জনা দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এভাবে লাথি মারা তাঁর অন্যায্য।

লোকটা জবাব দিল, মার ছাড়া কাটল্ সিধা হয়?

ডাক্তারবাবু একটু স্বদেশী। তাই উত্তেজিত হইয়া বিনাশ্রে লাগিলেন, এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই কাম্বোজসাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং ভূমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।

হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, Doctor, they are your countrymen, you ought to be proud of them !

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিঙ্গাব আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলো দাঁত বাঁধি বারিষা হাসিতেছে এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাক্তারবাবুর মুখে উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধা আঙ্গুল দুটা নাড়িয়া দিয়া, ঔকিয়া-ঔকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জাহাজের গদ হাওয়ার সর্বাস দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল। ক্রতপদে অগ্রেস হইয়া বিরাট ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া বাটিরা, দাঁত বার করে হাসচিস যে।

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একত্রে গেল হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বলবাব কে? কারো কর্তৃক করে খায়ে হাসিতেছি মোরা? আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তিনি চৌকিব উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল।

বেলা এগারটার সময় Quarantine-এর কাছাকাছি একটা ছোট স্টোমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাবিক সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক ছানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমার ভাড়া ছিল না, কারণ ডাক্তার-বাবুর লোক এইমাএ জনাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিত হইয়া যাত্রী ও খালসীদের টোয়েন্টি দৌড়বীপ কতকটা অন্যান্যদের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ আপনি জিনিসপত্র শুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে শহরে গিয়েই নামব।

অভয়া কহিল, না—না, শিগগির শুছিয়ে নিন।

বলিলাম, আমার এখনও ঢের সময় আছে।

অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতে যেতে পারবেন না।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে না।

অভয়া বলিল, তা হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও-জায়গায় যাব না। ওখানকার সব কথা শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টলটল করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে ঠাঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন—এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনে। উঠুন, নাচে চলুন। আপনি না থাকলে ওই গোণা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা মেয়েমানুষ কি করব বলুন ত?

নিজের জিনিসপত্র লইয়া যখন ছোট স্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তারবাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চাৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন, ফিরুন—আপনার হৃদয় হয়েছে—আপনি—

আমিও হাত নাড়িয়া চৈতাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর একটা হৃদয়ে আমাকে যেতেই হচ্ছে।

সহসা বোধ করি তাহার দৃষ্টি অভয়া ও রেডিওর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?

তার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

না না, তার দরকার নেই, আমি জানতাম। Good bye, চললুম! বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সবিয়া গেলেন।

পাঁচ

কেরেণ্টিন কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য—ভদ্রলোকের জন্য নয় : এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে এবং কর্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জানেন, “সে কারাই জানেন,” শু শু অফিসিয়েলি তাহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি। আমি। সাহেবরা ইহাও জানেন যে, কুলির জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জাম এমন—কিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেণ্টিন যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, তাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই! এ সকলই সত্য, তথাপি আমবা তিনটে প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকাবাশির উপরে এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোটোটি সুমুখে লইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পরে মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দূরদৃষ্টি। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্বেই দিরাছি। তাহারা যে-যাহার লোটা-কম্বল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বোখাগুলি তাহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া, ... , ... গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিনীদাদা একটা বিছানার পুঁতুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। ছুর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি—এই ... সে এক করিয়া তাহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব—ওইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি বাঁচেন! অভয়া গ্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোঁচকা-বঁচকিগুলি। অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে! অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে : এক স্বল্পে ভর করিয়াছেন এক নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায় নারী, অপর স্বল্পে বুলিতেছেন তেমনি অপরিচিত এক বাধিগ্রস্ত পুরুষ। ... টাঘাটওয়ালা ত সব ফাউ। এই সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকর্ষ

পিপাসা লইয়া এক অজানা জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি কল্পনা করিয়া, 'পাঠক হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ হইতে পারে ; হয়ত কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন ; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সহস্র শিক্ষার দিয়া মন বলিতেছিল, এতবড় গাথা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে! কিন্তু পরমার্শ্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না ; তবে এক-জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাঙ্গিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটোও এইবার চোখে পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হইয়া গেলাম—এই পট্টাবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথায় লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় 'শটির সহিত মিশিয়া গিয়া; করুণা ভিক্ষা চাহিবে, না, হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেছেন—মনে করবেন না যেন। অন্যান্যসে যোগে পেরেও যে যান নি, তার নাম দান। এতবড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয়ত খুব কমই পাবেন, তা বলে রাখছি। কিন্তু সে কথা যাক। জিনিস-পত্র এইখানেই পড়ে থাক, চলুন, একে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়।

বৌচকা-বৃটিকির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি রোহিণীদাসকে লিখে করিয়া কেরেণ্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল। অন্যান্য জিনিসপত্র সেইখানেই পড়িয়া বহিল। অবশ্য সে সকল আমাদের 'খোয়া' যায় নহি, ঘন্টা দুই পরে তাহাদের আনহিয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাঙ্ক্ষনিক বিপদের চেয়ে ঢেঁদে সুসহ। প্রথম হইতেই ইহা স্মরণ থাকিলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়াইতে যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেণ্টিনের নির্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা হাত পয়সা ব্যয় করিতে পারিলে যথেষ্ট বাড়িতেও যখন বড়কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ ত মোটে কেরেণ্টিন। জাহাজের ডেকেবন্দ্যু বলিয়াছিলেন, স্ট্রীলোকটি বেশ forward ; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ট্রীলোকটি যে কতক বেশ forward হইতে পারে তাহা বোঝ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। বোহিলীদাসকে যখন পিঠে হইতে নামাইয়া দিয়াছ, তখন অভয়া কহিল, হয়েছে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না। স্ট্রীলোকটাকে এখানে আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার আমি করছি। বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা-দুটি শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ; তথাপি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি করেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কি কম রয়েছে? জিনিসগুলি আনতে হবে, একটা ভাগ ঘর যোগাড় করে আপনাদের দুজনের বিছানা তৈরি করে দিতে হবে, রান্না করে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে শু আমার ছুটি হবে, তবে শু একটু বসতে পাবে। না না, মাথা খান, উঠবেন না ; আমি এক্ষুনি সমস্ত ঠিকঠাক করে দিচ্ছি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবছেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এসে যোগাড় করব কি করে, না? তা বৈ কি! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে? সে আমি না আর কেউ? বলিয়া সে ছোট ব্যাগটি খুলিয়া গুটিকয়েক টাকা আঁচলে বীথিয়া লইয়া কেরেণ্টিনের অফিস-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পাইয়া বীচিয়া গেলাম। অধঃপটার মধ্যেই একজন চাপরাসী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিলীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব-ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিসপত্র আসিয়া পৌছিয়াছে, দুখানি খাটটার উপর দুজনের বিছানা পর্যন্ত তৈরি হইয়া গিয়াছে। একধারে নুডস হাঁড়ি, চালা, ডাল, আলু, দি, ময়লা, কাঠ সমস্তই মজুত। মাদ্রাজী ডাক্তারের সঙ্গে অভয়া ভাল হিন্দিতে কথাবার্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি সাধারণ দু' ঘণ্টা জল ঢেলে নিয়ে এবেলার মত চারটি ঢালে-ঢালে বিচুড়ি রৌখে নিই। তবোলা ভঞ্জন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন

দূর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগড়ি, কোথায় গেল হাতের ছিপটি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! শিয়াদা! শিয়াদা! চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল!

সবে বাঙ্গলা দেশে হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে ভদ্রঘরের অবলারাও যে একটা জোয়ান-মন্দ পুরুষমানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া লাঠি-পেটা করিতে পারে—ক্রমশঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে লাগিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিংবা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিংবা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব—কিন্তু আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিন্তা উদ্ভাস্ত হইয়া গেল।

ছয়

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসায় নূতন ঘরকন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেস্‌জনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে একেবারেই কোন গ্রানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু এই অপরিচিত চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশ সময় লাগে নাই। কারণ কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাতোয়ামাত্র একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় প্রাক্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল। এবং ভবিষ্যতেও জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং সুদ্ধমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙ্গালী বর্মা মনুষ্যকে পদার্পন করামাত্রই পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাঞ্চিত করিয়া, বিনা অপরাধে পানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং এখনকার মত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুঠের মাথায় এক ঝাঁক তরি-ভরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়াছিল—জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, ব'লে দিতে পারেন?

লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়িকে খুঁজছেন?

বলিলাম, সে ত জানিনে মশাই—কোন ঘরের তিনি! শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেস্‌জনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব'লে।

লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, ওঃ—মিস্ত্রী। এমন সবাই নিজেকে মিস্ত্রী কবলায় মশায়! মিস্ত্রী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বোলোঁছন, ভ্রূণপদ, তুমি ছাড়া মিস্ত্রী হবার লোক ত দেখতে পাইনে। তখন বড়সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি। আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম? কেটে যে গোড়া দিতে পারি। তবে কি জানেন মশাই—

দেখিলাম, অজ্ঞাতে লোকটার এমন জায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই ভাড়াভাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, তা হলে নন্দ ব'লে কোন লোককে আপনি জানেন না।

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেস্‌জনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্ত্রী বললেন? আসচেন কোথেকে? বাঙ্গলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজছেন?

বাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!

লোকটা কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি করে? আসুন আমার সঙ্গে। বরাতে করে যাচ্ছে মশাই, নাইলে নন্দ পাগড়ি নাকি আবার একটা মিত্তরী। নশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ গুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, সে দেবে আপনার চাকরি ক'রে? তা সাহেবকে ব'লে দিতেও পারে একটা যোগাড় ক'রে, কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন? তা হলে আঠারো আনা পাঁচসিকে বোজ ধরতেও পারে। এর বেশি নয়!

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উদ্দেশ্যেই যাইতেছি না, একটু মাসের যোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

গুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্রলোকদের মোসে যান না? কতিপায়, মেস কোথায়, সেও চিনি না।

সেও চিনি না - তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ও বেলা সম্মান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এত বেলায় নন্দকে সঙ্গে দেখা হইবে না - সে কাড়ো মোড়ে - টগব গিল দিয়ে ঘুমুচে। প্রাত্যহিক করে তার ঘুম ভাঙলে আর বড়ো ঘাবড়ে না যানষ্ট।

সেটা খুব জানি। সুতরাং পাগড়ি মাসে অমাসে উইল্ড হাউসে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নই গোলেন সেখানে। অমন এতটা নড়াচড়ের জোতিব রয়েছে। চান করে সেবা করে ঘুম দিয়ে বেলা পড়লে এখন দেখা যাবে। চলুন।

হরিপদের সঙ্গিত গল্প করিতে করিতে লোকটার হাট্টিলে হাসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন ছোটোলেব ডাইনিঙ কমে জন পনের লোক সঙ্গিতে বসিয়াছে।

ইংরাজীতে দুটো কথা আছে instinct and prejudice; কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সংস্কার। একটা যে আর একটা নয়, এহা বুঝা বসিন নয়। কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, যাওয়া-হোওয়া বস্তুটা যে instinct হিসাবে সংস্কার নয়। এহা লোকদের এই ছোটোলের সম্বন্ধে আজ প্রথম টের পাইলাম। এহা সংস্কার হইলেও ও ইহা বড় বড় সংস্কার, ইহাও ব'লে হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া এতলোকের চাকর্য হইয়া গেলম। আমাদের দেশে এই যে অসংখ্য ছোটোলেবের শৃঙ্খল - এহা লোকেরা পালক একতম করিয়া কিছুকাল কলার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কামনা বিদ্যমান, সে প্রত্যক্ষতা এখন আর, কিন্তু এ কথা আমি অসংখ্যে বলিতে পারি যে, যাহারা নিজেদের গোমটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিম্নপদ প্রাপ্তি ও করিনা ইহাও - পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া ছিদ করিয়া রাখিয়াছেন, এহা ইহাও লক্ষন পক্ষ ছিদ করিয়া লুকুচতা সঙ্গের যাহাদের লেগা - অবিশ্বাস নাই, এহাও একটা ভুল জিনিস জগৎনা বহিস্কারের বস্তুতঃ যে-কোন দেশে যাও - ছোঁয়ার বাছবিচার প্রচলিত নাই, যেমন দেশে পা দিওর মাইন বেশ দেখিবে পাওয়া যায় এই ছালাম পুরুষের যাওয়া-হোয়ার লোকের কি করিয়া না জানি নাহলেইই কমিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়। একটা মুখা কাবল, নিষিদ্ধ মাসে এহাও করিত হই। সে নিজেব দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহাও যায়। কাবল জাতি মাইনর মাইনকরা বলেন, সেও একই কথা—না খেলেও, সেও ই খাওয়াই ধরে নিতে হইবে। এহাও মিথ্যা বলেন না। বর্ম ত তিন-চার দিনের পথ, অথচ দেখি, পনের আনা বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী - বোধ হইবে দাম্ভনই বোধ হইবেন, কাব এ যুগে তাহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে - জাহাজের হাট্টিলে সমস্ত, পটী ভরিয়া এহাও করিয়া সমস্ত পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিতা পাতক সাক্ষররা কি করিয়া সভ্য করিওন, প্রশ্ন করা লাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহাও যে ইতিমধ্যে পাক করিয়া কলপাতায় লেখালিকে পরিবেশন করে। ই, এহা ভাটিপাড়ার ভাটিপাড়ার পুরুষ অনুমান করা বোধ করি বসিন নয়। আমি ও সহযাত্রী। যাহারা নিভাতই এই সকল খাইতে চাহেন না, তাহাও অন্ততঃ চা কটী, মলটী পাকডটাও ছাড়েন না। অথচ সেই একদম নিষিদ্ধ মাংস হইতেও ক'মান বস্তা পর্যন্ত সমস্তই একত্র গাদাগাদি করিয়া জাহাজের কোন্ড-কমে পাখা হইয়া পাকে, এবং তাহা কাছাবও অশেষর দাব্যর পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই। তবে আগাম এইটুকু যে, বর্ম প্রবর্তন জাতি মাইনর আইনটা বোধ করি কোন গতিতে শাস্ত্রকারের কোতিসিল - এওটায় গেছে। না হইলে হয়ত আবার একটা ছোটোলে

ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক, ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্যন্তই থাক। হোটেলের যাহারা সারি সারি পঙ্ক্তিবোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর, ওয়ার্কশপে কাজ করে। সাড়ে-দড়টায় ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। শহরের প্রান্তে মস্ত একটি মাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা, এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দাঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্মী আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতী বাঙ্গালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোটজাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করেন না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয় : যে জনা করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে। দাঠাকুর আসিয়া ত মাকে সহজে গ্রহণ করিলেন, একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘর থেকে আমার কাছে আহার করুন, চাকর-বাকর হ'লে পরে দাম চুকিয়ে দেবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেন না, একমাস থেকে এবং খেতে দাম না দিও ত চলে যেতে পারি?

দাঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই? বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দাঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাঙ্গীর্ষের সহিত কহিলেন, তবেই দেখুন! বরাও মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ, এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপ অকপটে বিশ্বাস করিতেছেন, তাহা হাতে-নাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পবে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকাকড়ি, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সাজোরে ঠুকিবার জন্য বর্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাই হোক, দাঠাকুরের কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙ্গালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া আমার খাবার জায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং রুমে বৎ লোকের আহ্বারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকেও সেখানে না দিয়ে এখানে দিচ্ছ কেন?

সে কহিল, তারা যে নোয়াকাটা, বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্কমেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কটিতে হবে, সে ত এখনও ঠিক হয়নি। যাই হোক, আজ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়া। ঝি কহিল, আপনি বামুনমানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন?

ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙ্গালী বটে, কিন্তু একজন ডোম আছে।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুইয়া ফেলিলে মান করা compulsory কি না, জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাণ্ডার; জাত; কায়ত আছে, কৈবর্ত আছে, সদগোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাতসমুদ্র-পারে এসে কি অত বামুনই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গাস্নান কর'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিস্তির করলেই হবে।

হয়ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারিজন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চলতি-মুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্নানটা হয়ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিস্তির কোনকালেই করে না।

বিদেশের আবহাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলের মাত্র দুটি টুকা আছে : একটি ব্রান্সনের, অপরটি যাহারা ব্রান্সন নয় তাহাদের। আহা! তাহাদের পর কৈবর্তের হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্মকার-মশাই স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া ঈঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন-দুই পরে এই কর্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া ভিজ্জাস করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের ভাত যায় না?

কর্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বৈ কি।

তবে?

ও কি আর প্রথমে ডোম বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, বলেছিল, কৈবর্ত। তার পর সব জানাজানি হয়ে গেল।

ওখন তোমরা কিছু বললে না?

কি আর বলব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায্য করেছে, সে বলতেই হবে। তবে লজ্জা পাবে, এই ভাবনা সবাই ভোনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হ'লে কি হ'ত?

লোকটা যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর ক'রও রকম ছিল? তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরিলে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। লইলে আর সবাই সমান : নবশাখই বলুন আব হাড়ি-ডোমই বলুন কিছুই কারো গায়ে লেখা থাকে না : সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিটে। তার যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ খায় না, গাঁজা খায় না—আচার-বাবহারে কান সাধি বলে ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে : আব এ লক্ষ্মণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিক একদা বাবহারটা? বাটা দু-দু'বার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে, আমবা সবাই না পাকলে এত দিন ওকে জেলে রাখরের ভাত খেতে হ'ত যে।

লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহাদের ডোমই গোপন করিয়া কত বড় অনায্য করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না : আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে-দেশে ভ্রমলোকেরা পর্যন্ত চর নাগাওয়া তাহাদের আত্ম প্রত্নবেশীর ছিন্ন অবেশণ করিয়া, তাহাদের পিতৃশ্রদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক ইয়াও ইহার একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর এতবড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে, এবং সুস্থ ভাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সেকথা উত্থাপন করিত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল। বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা মনের কত বড় ওদার্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই শিক্ষা এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পরীটিকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই। যান বর্ধসন পর্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার তা শত্রু-পরিচয় আছে এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্তে জানিয়াছে, আমি ভ্রমলোক, আমি ইংবাজ ভাষি, সেই মুহূর্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংবাজ-জানা শিক্ষিত ভ্রমলোকের কাছে ইহার আশ্রয়-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ ভিজ্জাস করে, তাহাও সত্য, কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনাদের লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশেব এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু এইজন্যই আমার কত সংস্কারই যে ইহাদের মধ্যে বিকল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবশিষ্ট নাই। কিন্তু সে কথাও আত্ম থাক। দেখিলাম বাঙ্গালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল, কিন্তু আজ তাহারা

আর একভাবে পরিবর্তিত হইয়া একেবারে খাটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে। পুরুষদের মনে মনে হয়ত আজও একটা সাবেক জাতের স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্ববও রাখে ন। তাহাদের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙ্গালী, অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী নই, বাঙ্গালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে, শুধু বাঙ্গালী হলেই যথেষ্ট এবং চট্টগ্রামী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই বাস। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজী হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহার ভাববাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লই—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; তাহারও বলে, আমরা বাঙ্গালী। আবার তাহাদের বিবাহের সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান—এবার কিন্তু আর একতিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহার অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহার যথার্থ-ই হিন্দু এবং দুর্গা-পূজা ইত্যেতে গুরু করিয়া, বস্তু-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

সাত

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলান, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল শহরের এক প্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনের-ষোল দিনের মধ্যে ওদিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ-শক্তি আব থাকে না যে, কোথাও বাহির হই। ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতোছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাকরি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইবার পদ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটি যে ঠিক তেমন প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহার পা বেড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকী রহিল শুধু সেটা রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বাঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন, অর্থাৎ মাস-মহিনায় পরের চাকরি করিয়া মরণ পর্যন্ত কোনমতে হাড়-মাংসগুলোকে একত্র বণ্ঠিয়া চল। রোহিণীবাবুরও যে সে-ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাঙ্কল। কিন্তু এই বেঙ্গলদেশে বাঙ্কলে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চলাইয়া লইবার মত চাকরি যোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবাগোবা-বেচারি-গোছের অভয়ার দাদাটির ঘেঁকি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্যন্ত যেন ভয় করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক, একবার গিয়া তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় প্রায় ফোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণীদাদা আদান-প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল নবজলধরমণ্ডিত আবাড়সা প্রথম দিবসের ন্যায় গুরুগম্ভীর; কাঁহিলেন, শ্রীকান্তবাবু যেন ভাল ও ? বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

যান, ভিতর গিয়ে বসুন।

সত্যে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ও ?

হঁ—ভেতরে যান না। তিনি স্বরেই আছেন।

তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন ?

না—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একটুকম খুন হবার জো হয়েছি, দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাদিকো যে মৃতকর হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায়া প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণীদাদার মখেও যে এতখানি গাভীর এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই দুরূহ। কিন্তু ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটি কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসি মুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিলাম, চলুন না রোহিণীদা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে। রোহিণীদা জবাব দিলেন, গল্প। এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা জানেন শ্রীকান্তবাবু? জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যন্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আত্মনে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একখারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই চোখে পড়িল—মোখের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও একদ্রাস জল। গলার নিকটপন করিয়া এ আয়োজন যে পূর্বসং ইহতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সূতরাং এক মুহূর্তেই বুদ্ধিতে পারিলাম। একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণীদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন—তাই তাঁহার মরণ হইলে তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভাল আছেন? এতদিন পরে বুদ্ধি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ কিছু না; আপনি কেমন আছেন বলুন।

কেমন আছি সে ত নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা চাকরীর যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। রোহিণীবাবু যে বলছিলেন—আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণীদা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পটপট শব্দে ঘরে ঢুকিয়া কাহারও প্রতি দৃকপাতমাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে অর্ধেকটা এবং বাকিটুকু দুই-তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া শূন্য-গেলাসটা কাঠের মেজের উপর ঠকাস করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—যাক, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে, কিধে পেলে খেতে দেবে।

আমি অবাক হইয়া অভয়ার প্রতি চাইয়া দেখিলাম, পলকের জন্য আমার মুখখানি রান্না হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, কিধে পেলে, কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে-কথা কানেও তুলিলেন না—বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু অধমিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সন্দেহিত করিয়া বলিলেন, সাবান্নি অক্সিমে খেটে খেটে কিধেয় গা-মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্তবাবু—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি—কিছু মনে কববেন না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে ভাত-চটুকু বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?

তাঁহার মুখে ভক্তিতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম। হিলাম, কিন্তু সেখানে ভাত মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী বললেন, দরকার কি? ক্রমের সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেখ কে?

আমি জিজ্ঞাসু-মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাইতেই সে ধীরে ধীরে বলিল, মাথা ধরে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি করতে আত একটু দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ?

অভয়া তেমনি শান্তভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

তুচ্ছ বৈ কি?

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হতে পারে, কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি করে!

রোহিণী কৌশল করিয়া গজিয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ—একথা আমি বলেছি?

অভয়া বলিল, বলবে কেন, হাজার রকমে দেখাচো।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্ছি! ওঃ—তোমার মনে মনে জিলিপির পাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলেন

অভয়া কহিল, তোমাকে ব'লে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করবে?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন! ওঁর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলাম—বাড়ি ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সজ্ঞেয়ে উত্তর দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, দুটো বেঁচে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটলে—বলিতে বলিতেই তাহার কান্নায় কণ্ঠ বোধ হইয়া গেল; তিনি কৌচাচর খুঁটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতপদে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখে হেঁট করিল—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না, কিন্তু আমি একেবারে কাঁচ হইয়া গেলাম। কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সেও চোখেই দেখিলাম। কিন্তু ইহাও নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও সে যে ক্ষুধা এবং যন্ত্রণার ভাবের ভ্রুটি হইতে বঞ্চিত দিয়া বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব দাটিল না। তবে কি কখনো দুইজনের পক্ষপাত

উঠিয়া দাঁড়াইল। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেদেরই কেমন কোন সঙ্কেত বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূর দৌড়ে হবে—এখন তা হলে আমি। অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আবার কবে আসবেন?

অনেক দূর—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া, অভয়া বাহির হইয়া গেল। আমিও পাঁচ ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুকরা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলাম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয় করবেন। আপনাকে এর বেশি আমি বলতে চাইনে। বলিয়া, আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভিজ্জাস করিল, আমানার ঠিকানাটা দিল।

প্রায়ের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট কাগজখানি মুঠোর মধ্যে গোপন করিয়া ঘরে ঘরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দার সেই মোড়টি এখন শূন্য—রোহিণীদান। কে আমাকে বলে কোথায় দেখিলাম না। বাসা পর্যন্ত কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অন্যতরুদেই পদাঙ্কপথে একখানি ছোট চাষের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, এবং একখানি চাষইয়া ল্যাম্পের আলোতে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত কৃতকর্ম। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাহার পূর্বকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে—আজ তাহা মনে করিয়া গেলেন, সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি যে কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বার বার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশি আশঙ্ক্য করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে কোন একটা

বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারংবার চোখেই দেখিয়াছি; কিন্তু তার পরে? এখন তাহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিংবা আর কোন বিপদ অবশ্যপ্রাপ্তী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটো-প্রভাস পর্বন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতডাওয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্তায় অনুমান হয়, যেতিহী কোন একটা অফিসে চাকরি যোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল, জানি না—তবে খাওয়া-পরাই দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই; লুচিও জোটে। তথাপি যে কি একম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাদের গুনটিয়া রাখিল, এবং গুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা ভয়ানক জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পঞ্চটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজেই মগ্ন হইয়া গেল যে, অভয়াব স্বামী লোকটি যেই ছোক, এবং যেখানে যে ভাবেই থাকুক, স্থান বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সম্মান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাদের সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উদ্দেশ্যেই লগিয়া গেলাম, কিন্তু সহঃ চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে কাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না।

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমস্তই গড়িয়া চলিতে লাগিল। একদিনে অদৃষ্টবানী দয়াকরেন প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহদের তবকদি প্রথমে পরিচয়, এবং পরে সংসার দিবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু চাকরি আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না, যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসদিককাল পরেও যিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। তাহার পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকর্ষিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু এখনও জানি, জানি না, চাকরি পাবার সম্বন্ধে প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন বেহিষ্কারবশত পথে যাই দেখি। তিনি বাজারে পথের ধারে হবিতরপূর্ণ কিনিতেছিলেন। আমি অন্যত্রদূরে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টান্তে লাগিলাম—যদিও তাহার গায়ের জামাকাপড় ভূতা ভীষণতর প্রায়, শব্দ সীমিত পৌঁছিয়াছে—তাহার বৌদ্ধে মাথায় একটা ছাতি পরাষ্ট নাই, কিন্তু অত্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডি তিনি বস্ত্রলোকের মতই ক্রয় করিতেছেন; সেদিকে তাহার যৌকায়ুজ ও মাচি-বাচিহীন অবস্থা নাই। ওসময় ও পরিভ্রম যাই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষুর পলকে সমস্ত বাপসবটা আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই সব কোনকটির ভিতর দিয়া তাহার পথ যাকুল হইবে কে জানে? গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সুখেই আসিলের মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই সকল লইয়া তাহার বড়ি পৌঁছান একাধুই চাই, কেন যে এই সকলের মূল্য দিয়াও জনা চাকরি তাহাকে পাইতেই হইবে—এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জ্ঞানবলের মধ্যে পথ বুঝিয়া পড়িয়াছে, এবং আমি পাই নাই।

এ যে লোক লোকটি বেঙ্গলের বাঙালি নহা একজন মোটা হাতে লইয়া, শত্রুহীন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আজকে খরিসা আমি তাহার পরিচুপ্ত মুখের পানে চাইয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃকপাত করিবার তাহা যেন অবসরমাত্র নহি। কদয় তাহার হাততে পরিপূর্ণ হইল। আছে, তাহাতে তাহার কণ্ঠ জামাকাপড়ের সৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গছে। আর আমিও বস্তুর সম্মান মলিনতা প্রতিপন্ন হইয়া যেন সম্বন্ধে ভ্রুসত হইয়া উঠিতেছি। পঞ্চাশী একান্ত অপরিসীত কোকোরও দুষ্টিপাত লক্ষ্য যেন মরিয়া যাউতেছি।

বেহিষ্কার চলিয়া গেলেন—আমি তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিলাম না, এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেন জানি না, এইবার অকস্মাত আমার দুকৃত্য বাপসা হইয়া গেল। ফলস্বরূপ খুঁটো মুচিতে মুচিতে পথের একমাত্র দিয়া দূরে দূরে বাসায় ফিরিলাম, এবং নিজের মনেই না—এক দলিতে লাগিলাম, এই ভাববাসনার মত এত বড় শান্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর

নাই। ইহা পারে না এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অল্প সংকোর আমার কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়—শেষ পর্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেওন কাঠের প্রকাশ ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি বস্ত্রটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি 'সাহেব' হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও দেখিলাম, বেশ বাঙ্গলা জানেন। কারণ কলিকাতার অফিস হইতে তিনি বদলি হইয়া বর্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাকরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর—মাহিনাও প্রায় আড়াই গুণ বেশি পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে এক লক্ষ আশীর্বাদ করিয়া হাড়-বাহির-করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাত-মোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়! আমাদের হোটেলের দাঠাকুর নেহাত মিথ্যা বলেন না।

গাড়ি ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণীদাস অফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুধিবৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক, আমার ত ছিল না। এতএব অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণীদাস জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুধাকণ্ঠে কহিল, তোমাকে বরাবর বলচি রোহিণীদাস, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম করো না, তুমি কি কিছুতেই শুনবে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশি টাকায়? দিন ত বেশ চলে যাচ্ছে।

রোহিণীদাস দুচক্ষু দিয়া দেখে যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে। একটা বামন পর্যন্ত রাখতে পারচি নে, খেটে খেটে দুবেলা আতন-ভাতে তোমার দেখে যে শুকিয়ে গেল। বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিখাস চাপিয়া ফেলিয়া, ধোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ও শ্রীকান্তবাবু, ঐর অন্যায়! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটনির পরে বাড়ি এসে কোথায় একটু জিরবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নাটা পর্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি অত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আমার একটা রীধুনি রাখার কি দরকার বলুন ও ওঁর সঙ্গে যেন বাড়াবাড়ি না? বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধা আমার ছিল না—আমার বিধাতাপুরুষেরও ছিল কি না সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েক দিন হইল, বর্মী কোম্পানীর অফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড়সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানীর চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহার অবগত নহেন।

উভয়েই কক্ষপ পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। এ চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা! আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলেন কিনা, তহি আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছে!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি? অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই। রোহিণীবাবু কি বলেন?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর গুমুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি ব্যাবহর আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জানব বলুন? তা ছাড়া, তিনি নিজেই বা জানবেন কি ক'রে? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই কহিল, একটা কথা। আমার জন্যে তিনি একবিশু দায়ী ন'ন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চাঁৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরি হবে?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিব্রাজকের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থই অকুল-পাথরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না সভ্য, কিন্তু নারীর প্রতরকর্মের উল্টাপাল্টা ব্যবস্থা আমি দেখিয়াছি যে, বাহির হইতে এই দৃটা চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কতবড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাঁচির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মুর্তির মত মাটিদিকে দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল : কিন্তু দশভাত না যাইতেই মনে পড়িল ছড়িতা ভুলিয়া আসিয়াছে। তাড়াহুড়ু গাড়ি থামিয়া ফিরিয়া বাড়ি চুকিতেই চোখে পড়িল—ঠিক দ্বারের সম্মুখেই অভয়া উপ্ত হইয়া পড়িয়া, শব্দবিদ্ধ পশুব মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় অচ্ছাড় খাইয়া যেন শ্রাব বিসর্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে প্রত্যেকে সাধুনা দিব, আমার বুদ্ধির অসীম। শুধু বহুভবের নায় শুকভাবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া অদ্বাদ তেমন নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতছিল, তেমন কাঁদিতই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না—তাহার এই নিশ্চত অপরিসীম বেদনার একজন নির্দোষ সাক্ষী ও চণ্ডিতে বিদ্যমান দখিল।

আট

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পূজার একস্থান চাঁচা গঠাইবার কথা, অসিয়া পবনই আমার মনে ছিল, কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চাঁচা লেখাকে আমি কারও চোখে কম মনে করি না। তার পরে, লিখিবই বা কি? হাজা কিন্তু অভয়া'র কান্না আমার বুকের মধ্যে এমন ভারি হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় বৌছিয়াই কাগজ-কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃস্বপ্ন অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা দুই-তিন পরে সাহিত্য-চর্চা সঙ্গ করিয়া দখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে : কিন্তু পাছে সকালবেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাইহিঁতে লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে থাকিতেই তাহা সেই বাহ্যেই ডাকবাঞ্জে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্র নারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন কমবীর কাছে প্রকাশ করা কঠিন। কি না, এ সম্বন্ধে আমার ছিল, কিন্তু অভয়ার এ পরম এবং চরম সঙ্কটের দলে যে-রাজলক্ষ্মী অবদান পিয়ায়ী বাইজীরও মর্মান্বিত কৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতেপদেশ দেয়, তাহা জানিবার প্রাকান্তজ্ঞা আমাকে একলাগে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু অশ্রুণ এই যে, প্রকৃতি উল্টাঙ্গিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়া'র স্বামীর উদ্দেশ্য না পাওয়ার সমস্যা'ই বার বার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু পাওয়াব মতো যে সমস্যা তটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একতিবারেও মনে উদ্ভব হইল

না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতাপুরুষ আমার উপরেই নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন চার-পাঁচ পরে আমার একজন বর্মা কেরানী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরে নীল পেলিলে বড়সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট কয়েক স্থবিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রথম অফিসের একজন কেরানীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ-চুরির অভিযোগে সসপেণ্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী। ইহারও চার-পাঁচপাতা-জোড়া কেফিয়ত ছিল। বর্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন গুরুতর অপরাধে চাকরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরানীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রথম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবে। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনাগসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্বাস্ত ঘূণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরনে হ্যাট-কোট—কিন্তু যেমন পুরনো, তেমনি নোংরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোক-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড়-ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে বা ছিটকাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা—তাহার ইংকাল-পরকাল; সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্তিমান ইতরটার পাশে অভয়কে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক, সে সুশ্রী এবং সে মার্জিতরূপিত ভদ্রমহিলা; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্মার কোন গভীর ঈঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা, যে-দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারবেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যন্তরে লোকটা মিনিট-দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দোষ; তবে সে থাকায় প্রথম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন। না বলিয়াই তাহার আকোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনাব লোক ভর্তি করাই তাহার অভিপ্রেতি; একবিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাকরি গেলেই বা আপনাব বিশেষ কি ক্ষতি? আপনাব মত কর্মদক্ষ লোকের বর্মা মূলকে কাজের ভাবনা কি? রেলওয়ের চাকরি গেলে কদিনই বা আপনাকে বসে থাকতে হয়েছিল?

লোকটা প্রথমে ধতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বলছেন তা নেতৃত্ব গ্রহণে বসন্তে পারবেন; কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলি-ম্যান, অনেকগুলি কাজ-বাচ্চা—

আপনি কি বর্মার মেয়ে বিয়ে করেছেন নাকি?

লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেব ব্যাটা রিপোর্টে লিখেছে বুঝি? এই থেকেই বুঝবেন শালার রাগ।—বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল আপনি বিশ্বাস করেন?—আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বলেছেন মশাই। আমি ও তাই সবটিকে বলি, যা করব, তা বোন্ডলি স্বীকার করব। আমার অমন ভেতরে এক, বাইরে আর নেই। আর পুরুষমানুষ—বুঝলেন না? যা বলব, তা স্পষ্ট বলব মশাই, আমার ঢাক-ঢাক নেই। আর দেশেও ও কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাকরি করে যেতে হবে—বুঝলেন না মশাই।

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাকে দেশে কি কেউ নেই?—লোকটা অস্মানমুখে কহিল, আছে না, কেউ কোথাও নেই—কাকসা পরিবেশনা—থাকলে কি এই সূর্য্যামার দেশে আসতে পারতাম? মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা দেশে থাকতে চাই নেই। আমারও একটা ভবিষ্যৎ। এখনো আমার দেশের বাড়িটার পানে চাইলে আপনাকে আশ্চর্য হইতে পারেন। কিন্তু অল্প বয়সেই সবাই মরেছে গেল,—বললাম, এর চোক খোঁচা, নিশা-আশা

ঘরবাড়ি কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুপ্তিসের বিলিয়ে দিয়ে বর্মায় চলে এলাম।

একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অন্তর্যাকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। কণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, 'আপনি তাকে জানালেন কি করে?

বলিলাম, এমন ত হতে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পানার জন্যে এ-অফিসে দরখাস্ত করেছে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রাণুপ্রকটে কহিল, ওঃ—তাঁই বলুন। তা স্বীকার করছি, একসময় সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—

এখন?

কেউ নয়। তাহা এতদূর এগিয়ে এসেছে।

তার অপরাধ?

লোকটা বিমর্ষতার ভাণ করিয়া বলিল, কি জানেন, স্যার্মিসি সিঙ্গেট বলা উচিত নয়। কিন্তু 'আপনি যখন আমার আত্মা'দের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্থানলোক। তাই 'ত মনের সেয়ায় সেগত্যায়া' এলাম। নইলে সাধ ক'বে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা দিয়ে মাড়ায়! আপনিত বলুন না—এ কি সোজা মনের সেয়া।

তাহার দিন কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেটা হইতেই এই ঘোর মিথ্যানবিত্তির একটা কথাও বিশ্বাস করি নষ্ট। কিন্তু এখন নিঃসংশয়ঃ বুঝিলাম এ যেমন নীচ, তেমনি নিষ্ঠুর। অভয়াব আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তদুত্তর বলিয়া বলিতে পারি। সে অপরাধ আমি হইয়া এই পাশও নিঃসন্দেহে দিন। পর হইয়াও আমি এত উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তাহা এই অপরাধের কথা আপনি আসবার সময় তা বলেন আসুন কি। একদিন এসেও কিছুদিন যখন চিঠিপত্র এবং উপকারিতা পরিচয়ছিলেন, তখনও ত নিজের জানান নি।

মহাপাপিষ্ঠ স্বরূপে এতদূর বিবর্তি হুল ওঠার সঙ্গে বিশ্বাসেরও পরিমাণ বলিল। এই মিন কথা। জানেন ত মশাই, আমার ভুললোক, শুধু চূর্ণচূর্ণি সহ্য করাই পারি।—ছোট-লোকের মত নিজের হ্রীদ কলহ ও আত্মতাকি পিঠি জ্বালা করিতে পারিলাম। তাকালে, সে সমস্ত দুঃখের কথা ভেঙে দিন মশাই—এ সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাশ হয়। তাহলে যেমত ত আপনিত তিস্পোক্ত করবেন। যাক, বীচা গেল, কিন্তু এও বলেন বাহ্যিক সমস্ত পরিসীমাকে আমি আমি ছাড়া হবে। বেশ এমন একটু দিয়ে নিতে হবে, বড়দান যাহা আমার কখনো আমার পেচনে না লাগেন। আমারও মুকুপির জোব আছে, এটা মনে তিনি মনে রাখেন। বুঝলেন না? আস্তা, আমি বলি, হারামজাদকে হেঁট অফিসে টেনে আসা যাক না?

আমি বলিলাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফেঁটলো। একটুখানি সম্মুখ এলিয়া দিয়া বলিল মিন তামাশা রাখুন। বড়সাহেব একেবারে আপনার মুখের মত। সে যাহা 'নি আমি না নিয়াই এসেছি ভাবেন? তা মক্ক গো, আর একবার আমার সঙ্গে লাগে কেন তিনি দেখেন। আস্তা, বড়সাহেবের অভ্যর্থনা আজই বার ক'বে আমার হাতে দিতে পারা যাক না? নইলে গাড়িতেই চলে যেতুম, রাঙিরটা কষ্ট পেতে হ'ত না, কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ কোশামোদ জিনিসটা আমি সে সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া বুঝিয়াও—কুর করিতে প্রশ্ন বোধ হয়। উল্টা কথাটা মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ বাধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে লজ্জা করিয়াই বা—, বলিলাম, বড়সাহেবের শুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখবেন।

এক মুহূর্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। ব. ক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিসমিস করবার মোটেই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহাও দুই ডাফ ছলছল করিতে লাগিল—হাত জোড় করিয়া কহিল, বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীকে মারবেন না বাবু, ছেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলো পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউমাউ করিয়া কাদিয়া উঠিল। কেরানী, দারোয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জনেই বর্মায় এসেচে। দূশচরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে, কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে—তার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন—আপনার চাকরি আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখব। না হ'লে আর আমার সঙ্গে দেখা করে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে।

এই নীচপ্রকৃতির লোকগুলো যে অত্যন্ত ভীক হয় তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল তেঁমনি সময়ে আসবেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া ঠাঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে? সে তেঁমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্ম—মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টেব পেয়েচ, তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়া মুখ তুলিতে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারল না। তার পরে বার বার ঠাঁচলে চোখ মুছিয়া কঁদুহবে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?

কথাটা শুনিয়া খুশি হইব, কি চোখের জল ফেলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু ঈর্ষ দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিবিবার সমস্ত পথটা এই একটা কথাটি পুনঃপুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনদিকে চাহিয়া কোন দিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা সে কাহার উপর জ্বলি না—একদিকে যেমন নিঃশব্দে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই এক নিরোদ্দেশ্য বর্মীর হস্তে নিঃশব্দে প্রহেল্যে বসিয়া, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। পরদিন অভয়ার ঠিকানার খানা যখন লোকটা সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্যন্ত পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া, অজ্ঞান সে বেশি কথা না কহিয়া শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীত ভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু এতাব পরের দিন আবার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলিয়া গেল। নমস্কার করিয়া অভয়ার একছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে ব'লে কি হবে—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করেন গো, বড়সাহেব এবার মাপ করেচেন।

সে হাসিমুখে কহিল, বড়সাহেবের ভাবনা আমি আর ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেছি। এই বলিয়া আবার সে বলিতে শুরু করিয়া দিল—তেমনি নির্জলা মিথ্যা এবং চাটুবালা, এবং মাঝে মাঝে ক্রমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার ধৈর্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনারদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট কব্জাটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীব নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা

একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল ; না হইলে অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই শ্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, শুধু বর্মাদের ভয়ে শ্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিন্তু সত্য থাকিতেও পারে)। কিন্তু আজ রাত্রেই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে-বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলেপুলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রী-চাঁদ, তেমন স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে পরতে দেবে, না মরলে এক গম্বুজ জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল, বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনরকমে নাহয় ছিলাম; কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমাদে জনেই এসেছে। একবার ভেবে দেখুন ঘোঁষে ব্যাপারটা!

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন?

আজ্ঞে না, এখন প্রোমের পোস্টমাস্টার মশায়ের ওখানেই রাখব। তাঁর দ্বার কাছে বেশ থাকবে। কিন্তু শুধু দুদিন—আব না। তার জনেই একটা বাসা ঠিক করে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।

অভয়াব স্বামী প্রধান করিলে, আমিও আমাদে দিনের কাজে মন দিবার জন্য সন্মুখের ফাইলটা টানিয়া পঠিলাম।

মোচট্ট অভয়ার লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল! তাব পরে কতবার যে সেই দু-ছত্র পড়িয়াছি এবং আবার কলবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনাব বাসায় কি আজ আগুণপত্র কিছু দিবে, আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন সন্মুখের ঘড়িতে সাড়ে-চাবিটা বাজিয়া গাড়ে এবং কেবলমাত্র দুই দিনের কর্ম সমাপন করিয়া যে তাহার বাড়ি প্রস্থান করিয়াছে।

নয়

আবার অভয়াব স্বামীর পত্র পঠিলাম। পূর্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার সে যে কি সম্বন্ধে পঠিয়াছে, তাইই সম্বন্ধে ও সসর্বস্বত্বের নিবেদন করিয়া আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধার অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে, এবং প্রত্যেক একদিকে সাধার অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে, এবং তাহার একদিকে তাহার বর্মী স্ত্রীপুত্রের আনিয়া, অন্যদিকে অভয়াকে আনিবার জন্য প্রত্যেক সাধাসাধনা করিতেছে; কিন্তু কোনমতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্মিণীর এই প্রকার অব্যবস্থায় সে অতিশয় মর্মসীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা যে শুধু কলিকালের ফল, এবং সত্যমুখে যে একপ ঘটিত না—বড় বড় মূনি-স্বমিবা পর্যন্ত যে—দুঃস্থ-সম্মত তাহার পুনঃপুনঃ উদ্বেষ করিয়া সে লিখিয়াছে, হায়! সে আশ-ললনা কৈ! সে সীতা-সার্বভৌম কোথায়! যে আশ্রয়ার্থী স্বামীর পদমুগল বন্ধে ধারণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে চিতায় শ্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্ণলাভ করিতেন, তাঁরা কোথায়? যে হিন্দু-মহিলা হাসাবদনে তাহার কৃষ্ণ-গলিত স্বামীদেবতাকে রুদ্ধে করিয়া বারান্দার গতে পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, কোথায় সেই পতিব্রত! রমণী কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ। আর কি আমরা—সকল চক্ষে দেখিবে না? আর কি আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুইপাতা-জোড়া বিলাপ। কিন্তু অভয়া পতিদেবতাকে এই পর্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্ধাঙ্গিনী এখনও পূর্বের ন্যায়ে বাস করিতেছে তাই নয়, সে আজ পরন বন্ধ পোস্টমাস্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে একটা গোঁহীন তাহার ক্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং তাঁকে পাসাইয়াছে; ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্যন্ত যে ইচ্ছা নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে বাগ কম হইল না।

আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে যেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক, না বুঝিয়া হোক আবার তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায় তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্মাদের মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সূখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি করা হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝগড়াট এখন হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত।

সেই পর্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা ক্রেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্বেই গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া দেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্বল, কত অপটু, কত অসহায় এই একটা কথাই ছুটে ছুটে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্মান্তিক বাথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরল-চিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না। নিজের সূখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে নানা কারণে এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দূঃসাহস আমার নাই; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্বস্বীণ সভাধর্মের একটা অপূরণ্য, দূঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্তরাদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অহংসা সৌন্দর্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে—আমার সে যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আমার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি সবাই অন্তরাদিদি নয়; সেই কল্পনাভীত নিষ্ঠুর দৈর্ঘ্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবেন মত মত বড় বুকও সকল নারীতে থাকে না, এবং যাহা নহি, তাহার জন্য অতঃপর কোন প্রকাশ করা গ্রন্থকারমাত্রেই একান্ত কর্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই, কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম; এবং সেই অশ্রুপূর্ণ পদযাত্রায় আমার রোহিণীটাকে বেশ করিয়া যে দুখটা শুনাইয়া আসিব, তাহাই মনে মনে আনুভূতি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, কপটি টেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে, কি হয় নাই। অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া বাটের আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা বাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে ও, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এড়াই আর কি, সে ও আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া লুণা বাহির হইতেছে। ডান দিকে একটু আগাইয়া গিয়া উকি মারিয়া দেখিলাম, উন্নত ছালিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বীট পাতিয়া একটা বেগুন দখানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই; কারণ, কণ্ঠশ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি এখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে পলিতে পাঠি; আরও একটা কথা—এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্মার্থ, সমস্ত পাপপুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দীর্ঘ দীর্ঘ চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া ব্যারান্দার মোড়ার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?

সাদা দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবুঃ ওঃ—বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দুজনই চুপচাপ। আমি প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণীদা, আর কেন এখানে! চলুন আমার সঙ্গে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন।

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্ছে, তাই।

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আব কি।

তা বটে। কিন্তু এসকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই না ভাববন্দে কবির কতই না সংপরাশ্রয় দিব। তাহাতে তাহাতে অসিয়াছিলাম, সব ভাবিয়া গেল। এত বড় ভাল-মন্দে অসম্মান করিতে পারি—মাতৃশাহের পুত্র আমি এত বেশি পতি নই। কোথায় গেল আমার জ্ঞান, কোথায় গেল আমার বিবেক। সমস্ত সাধুসন্তের যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া বহিল, তাহার উদ্দেশ্যও পাইলাম না।

রোহিণী কহিল, সে প্রতিভেট টিউশনিটা চাড়াগা দিয়াছে। কারও তাহাতে শরীর স্বাধীন করে। তাহার অফিসটাও ভাল নয়—বড় ছাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি।

চুপ করিয়া বহিলাম। কারও এই বেশিলাব মুখেই কিছুদিন পূর্বে ঠিক উন্টা কথা শুনিয়াছিলাম। সে স্বপ্নকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আর এই বাধা-বাড়া, অফিস থেকে দ্রুত হও। এসে এখানে বসিও। কি বলেন শ্রীকান্তবাবু।

বলিব আর কি। আশুন মিথিয়া গেল শুধু গলে যে ইচ্ছা চলে না, এ ও জানা কথা।

তাপাল সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাঁহতে বাজী হইল না, কারণ ত কেহ সীমান্তনির্দেশ করিয়া দিতে পারে না, সুতরাং সে কথা ধরি না। কিন্তু অসম্ভব আশা যে কোনভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কমটা কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবি। পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্মুখের অগোচর ছিল না। যে, যে হতভাগ্যের ঘরের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য ঘরের পুষ্টিভূত ও বেদনা যদি খাড়া রাখিতে না পারে, ত ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধা সংসারে আব কাহারও নাই।

বাসায় পৌছিতে একটি রাত্রি হইল। যদি ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে একজন অগাধগোত্র মুড়ি দিয়া পাড়িয়া আছে। দিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল—ব্রলোক।

ওই আমার ঘরে।

আহাবাদির পবে এই ভক্তলোকটির সন্তঃ আলোপ হইল। তাঁর শড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। বছর-চারেক পরে নিকার্কিট ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গ-এ মিলিয়া—তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মশাই, গল্পে শুনি, আগে কামকামের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের ভেড়া করে ঘরে রাখত। কি জানি, সেকালে তারা কি কবত; কিন্তু একালে বর্মামেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে একটিল কম নয়, সে আমি হাতে হাতে টের পেয়েছি।

আবও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোট্ট ভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাফল্য ভিক্ষা করিলেন। তাহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাধিয়া—কি কথা দিলাম। কেন, তাহা বলাই লজ্জা। পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোট্ট ভাইয়ের বর্ম-শ্বশুরবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বড় ওই আড়ালে ব্যস্তাব উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোট্ট ভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেল করিয়া প্রাণঃপ্রমণে নিষ্কান্ত হইয়াছিলেন। বাড়িতে শ্বশুর-শাওতী নাই, শুধু স্বী তাহার একটি ছোট্ট বোন লইয়া এবং জন-দুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের ভীতিকা বর্ম-চুকট হৈব করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপ্ত ছিল। আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহার ধর্মীর বন্ধু ভাবিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অভ্যস্ত পরিজয়ী; কিন্তু পুরুষবা প্রেমনি অলস; ঘরের কাজ-কর্ম হইতে গুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয়। কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনের অন্ন বাড়িতে ধ্বংস করিয়া বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে, লোকে আশ্চর্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি-ছি করিয়া, ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান করিয়া অভীষ্ট করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে।

মিনিট-দশেকের মধ্যে 'বাবুসাহেব' দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্বাস্থে ইংরাজি পোশাক, হাতে দু-তিনটা আঙটি, ঘড়ি-চেন—কাজকর্ম কিছুই করিতে হয় না—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ স্বচ্ছল। তাঁহার বর্মা-গৃহিণী হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু-টার এমন কি-একটা যেন হইবে। যাক্ গে, আমরা নাহয় তাঁকে শুধু বাবু বলিয়াই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি কে? বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, আপনি ও কলকেতিয়া, কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধু হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধু হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে ব্রাহ্মরত্নের দর্শনাভিলাষে উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটеле বাবুটির পদখুলি পড়িল, এবং উভয় দ্রাভায় বস্ত্রাঙ্গ কণ্ঠাবর্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি দাদা বলিয়া ডাকিয়া যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিসফিস মন্তব্য, আলাপ-আপ্যায়ন, বঃ-প্রঃ-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্নে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী, এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ কবি একদিনের জন্যেও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। তিন-চারেক পরে দাদাটি আমাকে একগাল হাসিয়া কানে কানে জানাইলেন যে, পরও সকালের জাহাজে তাহার বাড়ি যাইতেছেন। গুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত?

দাদা বলিলেন, আবার! রাম রাম ব'লে একবার জাহাজে চড়তে পারবে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

দাদা কহিলেন, বাপরে! তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে! বেটির যে যেখানে আছে, বন্ধুহীনের মত এসে হেঁকে ধরবে। বলিয়া চোখ দুটো মিটমিট করিয়া সহাস্য কহিলেন, ফ্রেন্স লিভ মশাই। ফ্রেন্স লিভ—এ আর বুঝলেন না?

অত্যন্ত ক্রেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি ত তা হলে ভারি কষ্ট পাবে?

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একেবারে হাসিয়াই আকুল। কোনমতে হাসি থামিলে, বলিতে লাগিলেন, শোন কণ একবার! বর্মা-বেটিদের আবার কষ্ট! এ শালার জেহের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এটোকাটার বিচার, না আছে একটা জাতজন্ম। বেটিয়া সব নেমী (এক প্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ভাপি' বলে) খায়, মশাই নেমী খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেট্টা পালায়। এ বাটা-বেটিদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোটজাত বাটারা—

থামুন মশাই, থামুন, আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধরে রাজার হালে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, আর কিছু না হোক, তারও ও একটা কৃতজ্ঞতা আছে!

দাদার মুখ গভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে অশ্রু করলেন মশাই!

পুরুষবাচ্চা বিশেষ-বিড়য়ে এসে বয়সের সোবে নাহয় একটা শখ ক'রেই কেলেচে। কোন মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত আর জানতে বাকী নেই, এর না-হয় একটু জানাজানি হ'য়েই পড়েচে— তাই বলে বুঝি চিরকালটা এমনি ক'রেই বেড়াতে হবে। ভাল হ'য়ে সংসার-ধর্ম ক'রে পাঁচজনের একজন হ'তে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে ঢুকে যে মুরগি পর্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না, করলে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্য। বলচি, না মিথ্যে বলচি!

বস্তুতঃই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া रहিলাম। অফিসেব বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু অফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভেবে দেখলাম, আপনাদে পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেখে একটা ফ্যাসাদ বাসানে না কি— বলে যাওয়াই ভালো। এ বেটারা আর পারে না কি? না আছে লজ্জাসরম, না আছে একটা ধর্মজ্ঞান! জানোয়ার বলতেই ত চলে! বলিলাম, ঠ্যা, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি একটা বড়যন্ত্র আছে। বড়যন্ত্র সত্যি ছিল। কিন্তু সে যে এত নাচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্রগ্রামের জাহাজ পবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি, তাই তাঁকে see of কনিষ্ঠ কান্ডাজনাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন ছোটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা বাহিবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে কে বা তাহার কথা শুনে— এমনি ব্যাপার। এদিকে ওদিকে চাহিতেই সেই বর্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একবারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়িয়া আছে। সারা বাহির কান্নায় তাহার চোখ দুটি ঠিক ভবানুলের মত রাসা। ছোটিবাবু মতা বাস্ত। তাহার দুচাকার গাড়ি লইয়া, তোরঙ্গ বিছানা লইয়া, আরও কত কি যে লট-বহর লইয়া কুলিদের সহিত নৌ-ধাপ করিয়া ফিরিতেছেন— তাহার মুহূর্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিসপত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সব ট্রলার্টেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সমুখের দিকে নোঙ্গর-তোলা চলিতে লাগিল—এইবার ছোটিবাবু তাহার দ্রব্য-সম্ভারবেব হেফাজত করিয়া, জায়গা দিক করিয়া তাহার বর্মা-স্ত্রীর কাছে বিনায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কেব অভিনয় করিতে গেলেন হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—সে অধিকার তাহার ছিল।

আমি অনেক সময় ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গা, পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে। সে মন্থ-পড়া স্বী নাই বা হইন, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা-ভগিনী-জননী-ভক্তি। তাহারই মাথায় সে ত এই সুদীর্ঘ কাল স্বামীর, সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে। তাহারই বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসেব লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এত বড় নির্দয় বিদূষ ও হাসিব পাঠ করিয়া ফেলিয়া গেল। লোকটা এক হাতে ক্রমাল দিয়া নিজের দৃষ্টান্ত মাঝে করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্মা-স্ত্রী-ব গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি-সব বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশেপাশে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহবা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলো বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্মা-ভাষায় এবং বাঙ্গলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙ্গলাটা কথকিত মাঝিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়, — একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আসিব, তা আমিই জানি। ওরে আমার বর্তনমণি! তাকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম যে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপবিচিত বাঙ্গালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু

মেয়েটি ত বাঙ্গলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সাঙ্ঘনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ' টাকা তামাক কিনতে দিল—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভরল না—অমনি তোর বাড়িটাও বিক্রি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম একটা দাঁও মারা গেল। এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না!

আশেপাশে লোকগুলা অবরুদ্ধ হাসে। ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে লইয়া, এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাস্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন! মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভারে ভাদিয়া পড়ে বা।

খালাসীরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, বাবু, সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক-কালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটি উপর হাত রাখিয়া কাদিতে কাদিতে কহিল, ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন ক'রে হোক দুশ-আড়াইশ' টাকা দাম হবে—এটিই বা ছাড়ি কেন!

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া শ্রিয়তমের আস্তুলে পরাইয়া দিল। যথা লাভ! বলিয়া লোকটা কাদিতে কাদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ ছোট ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দুই সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে! কেহ না বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে বলিতে গেল, কি মজাটাই করলে! হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল। এমন কত কি মস্তব্য। শুধু আমি কেবল সেই সকলের হাসি-তোমাগান পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে আস্তে কহিল, বাবুজী এসেছেন, দিদি, ওঠো!

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার ঝড় ভাঙ্গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আমার সাঙ্ঘনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না; তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাদিতে কাদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, বাবুজী, বাড়ি আমার আজ খালি ইহয়া গেছে। কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া ঢুকিব। একমাসের জন্য তামাক কিনিতে গেছেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব। বিদেশে না জাগি কত কষ্টই হবে, কেন আমি যাইতে দিলাম। বেঙ্গলের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন আমাদের চলিতেছিল;—কেন তবে বেশি লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে পাঠাইলাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে বাবুজী, আমি পরের মেনেই তাঁর কাছে চলিয়া যাইব। এমন কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিবে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়া-মায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।

একটু ধমিয়া আবার বার দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।

চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ির দরজা আটকাইয়া বলিল, না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়লা চা খাইয়া আসিবে চল।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ি চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ থমক করিল, আচ্ছা বাবুজী, রংপুর

কত দূর? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন জায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হী, মিলে য়ে কি।

সে একটা নিখাস ফেলিয়া বলিল, কয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে গ্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্যবশত? হোক বা চক্ষুসজ্জাতেই হোক, বা হস্তবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ দুজিয়া এতবড় অন্যান্য অনুভূতি হইতে দেখিলাম, কথটি কহিলাম না। ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে, ত মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার তোমের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিক্রীট বাহিয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটি তুচ্ছ ঘটনার বিবৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটার বহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশি নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—লাঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই সমস্ত গোলমাল যেন বিবের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি কবিতা? বর্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু একটা বীধাধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভ্রম অনুষ্ঠানও আছে, আবাব স্বামী-স্ত্রীর মত যে কোন নর-নারী তিন দিন একত্র বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে সিদ্ধ। সমাজ তাহাদের অধীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছেঁট করিয়া দেখা যায় না। আবাব বাবুটির দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়; এই স্বী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দুসমাজ তাহাদের গ্রহণ নাহয় নাই কবিল, কিন্তু আপামরসাধারণ যে ভূগার চক্ষে দেখিবে, সেও সারা জীবন সন্তা করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করা, নাহয়, এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ ধর্ম কথটার যদি কোন অর্থ থাকে ত— সে হিন্দুরই হোক, বা আব কোন জাতিবই হোক—এত বড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে সে ত আমার বুদ্ধির অর্ডীত। এই সকল কথা নাহয় সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিব; কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনামোহে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া তাহাকে মুখ ভাড়াচাহিয়া পলায়ন করিল, এই আক্কেলটাই আমাকে যেন দম্ব করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। কয়দিন পূবে একদিন অত্যন্ত পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি, আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব, আইয়ে।

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাঞ্চে তাহার আহ্বানের মর্দালা বাখিয়া ভিতবে ঢুকিয়া এক পেয়ালো চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বাব-দুই নড়া দিতেই কবটি খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সন্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ বাঙ্গা হইয়া উঠিল; এবং কোন ভাবের মাঝে মাঝে স চক্ষের নিম্নে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু লজ্জায় যে মুঠি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে শিঙ্কাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অতিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দুঃকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পার্ণিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্মা মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিবিয়া আসিয়া তাহাদের প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না।

নাই, নাই—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এসব অভ্যাস মত অনেক গুলিয়াছি, অনেক গুলিয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে গুলিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব ; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই।

দশ

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, জন্ম-জন্মস্তরের অঙ্গসংস্কারের খাফাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম শ্রীকান্তবাবু নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন বাঁলে। আজ দুজনই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে 'বাবু' বলিতে এই প্রথম গুলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরও। কি হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। বলিয়া সে নিজেব দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

যে-সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারািয়া ফেলে ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার শুদ্ধকঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্কর নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীর্থেরমের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় করিতে লাগিল, প্রামি যে স্ত্রী হ'য়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এত দূরে এসে তাঁর শাস্তি ভঙ্গ করেচি,—মেয়েমানুষের এত বড় স্পর্ধা পুরুষমানুষে সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই, তোমাকে বার বার চিঠি লিখে জবাব পাইনে।

তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বললেন, আজ তার জবাব দিচ্ছি। এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটা আর একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় শীন অমানুষ বর্বরটার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায় আলোড়িত হইয়া উঠিল ; কিন্তু যে অঙ্গ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল। আমিও ত তাহার অতীত নই। সুতরাং বেশ করিয়াছ, একথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ, এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক এ সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চল আসাটা যে অন্যায় একথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই কিছুটার বিচারই ত আপনার কাছে চাইছি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নাগিল কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন সুস্থমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাখে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দারিদ্র বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইছি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার মুখের প্রতিস্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার

হাড়া ত কর্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা। তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মস্তাই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রকাশের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতদূর বধা দিতে পারলে না। অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যার মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দারিদ্র্য রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ ব'লে আমার উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা কিন্তু পর্বত ব'লেই খেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে চ'লে আসাটা আমার অনায়াস হয়নি, কিন্তু,—এই কিন্তুটার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেছে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবনমুত হ'য়ে থাকবে তার নারী-জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটা কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অনায়াস, এত বড় নিষ্ঠুর অভ্যাসটার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, জ্ঞানন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্ণয়, মিথ্যাবাদী, কলাচ্যারী স্বামী বিনা সেবে তার স্ত্রীকে তড়িৎ দিয়ে বলোই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পলু হওয়া চাই? এই জন্যই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্মেরই এ অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু? আমাকে যৌন সেবিয়া অন্তর্য্য বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের ভন ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?

অভয়: কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না।

কহিলাম, তা হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে সেবে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চ'লে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারি মন খারাপ হ'য়ে আছে। আপনাদের চেয়ে ডের বেশি নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেছি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্মা-মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বলতে পারিনে।

কহিলাম, আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদা-দিদি, অপরটির নাম শিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এদের কান্নার স্থানই তাপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদাদিদির সমস্ত কথা আগাগোড় লিখা চাহিয়া দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তার পরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানিনে। এইবার শিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কিরকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি ব'লেই তুলনা দিতে পারলুম। তার পরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দুঃখনের সেবা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, শিয়ারী বাইজী। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, শিয়ারীর মধ্যে চিরদিনের জন্য অবস্থ হ'য়ে ছিল, সেইদিন তার প্রকাশ হ'য়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তার পরে?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, তার পরে এমন একদিন এসে পড়ল, যেদিন শিয়ারী তার প্রাথমিক প্রিয়তমকে নিঃশেষে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হ'ল জানেন?

জানি। তার পরে আর নেই।

অভয়া একটা নিখাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই—এমনি দূর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অন্তে চিরদিন ঘটে আসতে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলানদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বলতে পারেন?

না, তাও পারিনে। তা ছাড়া আজ আমার মন এমনি উদ্ভ্রান্ত হ'রে আছে যে, এই সব জটিল সমস্যার বীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর একদিন ভেবে দেখব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে-ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেরেছি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'রে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বলতে পারি। সে ভার অসহ্য হলেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভালোও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী। তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেছি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া চমকিয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম, তা না হ'লে সে এত স্বচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতেই চাইত।

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার জো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে; আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েছে ব'লে আমাকেও এখন তার দরকার নেই! দেখুন, আমি নিজের বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাইনি। তার থেকে এই বুঝিচি, দুঃখ জিনিসটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেককাল স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার কথা বুঝিচি শ্রীকান্তবাবু! অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সঞ্চল পেয়েছেন! কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেরেচি আমি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেছি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল, এঁদের সঙ্গে আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চলিয়ে তাদের সকল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে বিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফুলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিশ্চলতার দুঃখটাই সারা জীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রেহীশীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পজু ক'রে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণদুটা মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান বা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারা জীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা

ভালবাসা নিয়ন্ত্রণে, তিনি কি তাতেই খুশি হবেন? আমাকে আপনি বা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্ধানদের আপনারা বা খুশি বলে ভাববেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্ধানরা মানুষ হিসাবে জগতে ক্লান্ত হয়ে ছোট হয়ে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হস্তকিন্দুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ঝট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন কপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমনিই বটে! সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে; যেন তার ভিতরে শ্রাব আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর। মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।—অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বলিল; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু? আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুকণ ইতস্তত করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, অশ্রদ্ধামীর কাছে আপনারা হয়ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব করিবার চার সত্ত্ব নয়। প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উল্লসিত আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন?

ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সন্তানের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষা নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্তবাবু? প্রত্যন্তরে শুধু একটা শীর্ণখাস ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুকণ মৌন থাকার পরে কহিল, যাক, আপনারা জায়গা নাই দিন, আমার সন্তান এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, তারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথাটার একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ বলে মনে নিতে হবে?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্যি হয়, তাহলে কি তারা অন্যায়-টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে, আর আপনারা নায়-ধর্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখছি, মুসলমানেরা এ দেশটা ছেয়ে যাচ্ছে! তুনেচি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে একঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরি হয়নি। আমরা হয়ত চোখে দেখে যেতে পার না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্র আসবে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্মা দেশটাও একটা মুসলমান-প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজখাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম এবং সমাজের ভয়ে এই বড়খণ্ড, এই হীনতার, আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছাড়বার ক'রে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোনটাতে সত্যকার ধর্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু?

দ্বিতীয় প্রত্যন্তরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ্ঞা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জানলেন কি করে? আমার মনে হয় না, এত বড় প্রশ্নের হৃদয় আমাদের পুরুষমানুষের মধ্যেও

বেশি আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা বলে ডাকতে ত অস্বস্তি; আমি কোন মতেই পারবো না।—অত্যা মানমুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন নিক দিয়েই সমাজে কতি পৌঁছবে না?

একটু হির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই ঘেরিয়ে যাব না। সমস্ত অপবন, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়ে আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সম্ভাবনাকেও যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্বক হবে, এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতের বড়, এ আমাকে বাচাই করে দেখতে হবে।

এগার

মনোহর চাকরবন্দী, বলিয়া একটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। মাঠাকুরের ছোট্টো একটা হরি-সংকীর্ণনের দল ছিল; তিনি পুন্যসঙ্করের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিতেন; কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন, জানিতাম না। এই মাত্র শুনিয়াছিলাম—ভীর না কি অনেক টাকা, এবং সকল দিক দিয়াই অভ্যস্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরন্তর প্রশংসা হইয়া একদিন নিদ্রিতে কহিলেন, দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প,—জীবনে যদি উন্নতি লাভ করতে চান ত আপনাকে এমন গুটি-কয়েক সংপরামর্শ দিতে পারি, যার মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যার কাছে এই উপদেশ পেয়েছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন শুনে হরত অবাক হয়ে যাবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মহিলা পেতেন; কিন্তু মরবার সময় বাড়িম্বর, পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রেখে গিয়েছিলেন। বলুন ত, একি সোজা কথা! আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজের কথাটা এইখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মহিলাপত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল—বর্ষায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করছেন বলুন দেখি! ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়ে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। দেখতেই ত পান আমি কোন লোকের কথায় থাকি নী; কিন্তু আমার কথা মত, বেশি নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি; আমি বলছি আপনাকে, শেষে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্যন্ত করতে পারবেন।

এই সৌভাগ্যের জন্য অতঃপরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ তথ্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন জানি না; তবে কিনা, তিনি ভিতরে ভিতরে সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজ-মন্ত্রবরূপ সংপরামর্শের জন্য লুপ্ত হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দান-টান করার কথা ছেড়ে দিন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়—এক কোমর মাটি খুঁড়লেও একটা পরস্যা মেলে না। সে কথা বলি না—নিজের মুখে-রক্তউঠা কড়ি—আজকালকার, দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলেপুলে, পরিবারের জন্য রেখেথুয়ে তবে ত?—সে কথা ছেড়েই গিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন,—যার সংসারে দেখবেন টানটানি, কল্যাণ তেমন লোককে আমল দেবেন না। বেশি নয়, দু-চার দিন আসা-যাওয়া করাই নিজে হতেই নিজের সংসারে; কটোর কথা তুলে দুটাকা চেয়ে বসবে। দিলে ত গেলই, তা ছাড়া বাইরের স্বগড়া ঘরে টেনে আনা। দু-দুটাকার মায়া কিছু আর সত্যি কেউ ছাড়তে পারে না—তাগাদা করতেই হয়। তখন হট্টাইটি স্বগড়খ্যাটি—কেন, আমার তাতে আবশ্যক কি, বলুন দেখি?

আমি ষাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্রসন্ধান, তাই কথাটা চট্ করে বুঝলেন; কিন্তু এই ছোট্টো লোক—কটা ব্যাটারের বুঝাও দেখি। হারামজাদা ব্যাটারা সাতজন্মেও বুঝবে না। ব্যাটারের নিজের এক পরস্যা নাই, তবু পরের কাছে কর্তব্য করে আর একজনকে টাকা এনে দেবে—এই

ছোটলোক ব্যাটারা এমনি আহাশ্রুক।

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যিই কষ্ট ত দু ভরি সোনা এনে রেখে যাও না, দিচ্ছি দশ টাকা ধার। কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত।

তিনি বলিলেন, ঠিক নয় আবার! একশ বার ঠিক! আর দেখুন ঋগড়া-সিবাদের স্থানে কখনো যাবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয়ত দু-এক ঘা নিজের গায়েই লাগবে; তা ছাড়া একপক্ষ সাক্ষী মেনে বসবে। তখন কর ছুটাছুটি আদালতে। বরঞ্চ থেমে গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরে এসে দুটো ভালমন্দ পরামর্শ দাও, পাঁচজনের কাছে নাম হবে। কি বলেন?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ করিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না; তৎখনি বলে বসবে, দাদা মরি—এ বিপদে দুটাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। নাহয় ত বলবে, এসো রাত্রি জাগতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভূরে আমার কিছু-একটা—মা-শীতলা না করুন, এই নাক-কান মলচি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একদার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের দুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়ে আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমার দেখে কে?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু ধিয়ান পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের! তারা কখনো ওরূপ স্থানে যায় কি? কখনো না। নিজের একটা কর্ণ পাঠিয়ে দিয়ে বাস! হয়ে গেল। তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি। তার পরে ভাল হলে আবার যেমন মেলা-মেশা, সব তেমন। মশাই, কাকুর ঝুঞ্জাটের মধ্যে কখনো যেতে নাই।

অফিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাঞ্জের সাধু-পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশি মানসিক উন্নতি হওয়া আমার সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি মনের মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব পটীগামেও অনুভব করি নাই; এবং অপরাপর দুর্নাম তাহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন এ অপবাদও ওঠি নাই; এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ তা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবন-যাত্রার কার্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অকরে অকরে ইহা প্রতিলাপন করিয়া চলে তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন—বাঙ্গালী পিতামাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিশের সি. আই. ডির লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কত বড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইহারই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন!

সেই অবশি অভয়ার বাড়ির দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাও নিম্নলিখিয়া লইয়া আগাগোড়া জনিসটা জ্ঞানের দ্বারা একরকম করিয়া লিখিতে পাতিরাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নিতীক সত্যতা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সন্স্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে ইহত, আমার অল্পদামিদি ও কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাভনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাত্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাঁহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না! আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আশ্রয়পর করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্তব্যের যে

জানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়াব সূতীক বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে হেলোবেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুদ্ধিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ-ভোগ করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষ বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের মানদণ্ডে একদিকে যত বেশি দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর-একদিকে তত বড় সুখের বোঝা গালা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকু বেচ্ছায় বর্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছে, মনে করিয়া নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও চতুর্গুণ আহার্য সম্বিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্ধ সংশয় উদ্ভিত হয়। এই জন্যই সম্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকট জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখ-ভোগের কঠোরতা দেখিয়া দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না, তাহা নয়, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের স্বীকৃত হইয়া উঠে; এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধনা, এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে, এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথাই জীবন অতিবাহিত করিতেছে,—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিকার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ি যায়। শ্রীকান্তবাবু সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উণ্টাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক কতকগুলো দুঃখ-ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্বল্পে ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বিধবার আচরণ বলাই,—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিশুবিসর্গ সম্বন্ধ নাই। বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, তাহা আমি মানি না। বস্তুতঃ এটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সখা-বিধবা—যে-কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবাব চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ, না হয় ত নাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?—অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ও সব শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় অছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামেই ভুলেই ত সকল দেশে সকল যুগে বিধবার চালচলনটাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ভেবে এসেছে। ইহাই নিরর্থক ভাগ্যের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পণ্ড ব'লে দেবার এত বড় ছায়াবাঁজি আর নাই।

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুত, তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাশা করিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি ভারি forward; কিন্তু, তখন দুজনের কেহই ভাবি নাই—এই forward কথাটির অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত ভেঙ্গে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেঘিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা-কাটাকাটি করিত না—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত একরকম—কাজ আর-এরকম ছিল না। বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব বুজিয়া পাইতাম না—কেমন একরকম খতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল। বাই হোক, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের বিধা ঘুচে নাই, একথা ঠিক। যতই আপনাকে

আপনি প্রশ্ন করিতার—এ ছাড়া অভয়ার আর কি পতি ছিল,—ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে ব্যক্তিরা দাঁড়াইত। বতই নিজেকে বলিতার, তাহাকে অজ্ঞান করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অজ্ঞান বিতৃষ্ণার অস্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এমন একটা কঠিন অপ্রসন্ন মন লাইয়াই আমার দিন কাটিতেছিল বলিয়া, না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন শহরের মাঝখানে গ্রেগ আসিয়া তাহার ঘোড়াটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল! ছার রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ্য-কোটি বস্ত্র-ভবন, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতায় সতর্কতা—সমস্তই একমুহূর্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ শহরের চৌদ্দ আনা লোকই হয় চাকুরিজীবী, নাহয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পলাহিবারও জো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁতোবাঁকি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পৌটলা-পুটলি ঘাড়ে দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পৌটলা-পুটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে। 'ইদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্বেই লোকে ছুটিতে শুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলো যেন সব পাছের ফলের মত গ্রেগের আদেশওয়ার এক রাগেই পাকিয়া উঠিয়া পৌটার খুলিতেছে,—কাহার যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সে দিন ছিল শনিবার। কি-একটা সামান্য কাজের জন্য সকালে বাহির হইয়াছি। শহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রায় মনোহর চক্রবর্তী। হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দু-মিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের প্রত্যেক চলারফেরাটি পর্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা নহিলে, আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই। আত্ম সঙ্কালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাজে গিয়া বলিলাম, অনেক দিন ত আমাদের ও-দিকে যাননি—আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেছি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেম্বিতে ভূগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ার হ'ল গ্রেগ। কি ক'ি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেছেন।

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand বাটা ভরানক বন্ধাত। বলে কি না, চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আছা করে ধমকে।

একটু আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ যাহাদের জানা নাই যে, পরসার জন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাহারাই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজী কথাটার মানে ইহাতেই দূরে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে সারা চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উজ্জিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে বাইবার সময় কুত্যা বাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দুটাকা বেশি মাছিনা দিয়া তবেই ত্রিবেদী-চতুর্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বাবুদের Function একত্রে combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙ্গালী বাবুদের আজিও একাজে রাজী করা যায় নাই, গিরাছে শুধু ওই উহাদেরই। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পরসার পাঠলে কুসংস্কার বর্জন করিতে হিন্দুস্থানীর একমুহূর্ত বিলম্ব হয় না। (মুরগি

রাখিতে আরও চার আনা, আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মূল্যের হারাই সমস্ত পরিণত হয়, শালের এই বচস্বার্থের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাব্দবাক্যে অবচিহ্নিত আচ্ছাদিত আচ্ছাদিত পর্বত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুহানীরা—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর combined hand-কে আমি কেন ধমক দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধমক শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যাণ্ডটি মনোহরবাবুর নুতন। এককাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন—ওষু ডিসেম্বরের খাতিরে অল্পদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই, আপনি কি সহজ লোক! শহরসুজ লোক আপনার কথায় মরে বীচে, তা কি আর জানিবে ভাবচেন! বেশি নয়, একটা ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ওর চৌদ্দ বছর জেল হয়ে যাবে, সে কি আমি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ করে শাসিত করে।—কথা শুনিয়া আমি বেন দিশেহারা হইয়া পেলাম, যে লাটসাহেবের নামটা পর্বত শুনি নাই—তাঁহাকে, বেশি নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই, একটা লোকের চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা,—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুযোগ ও পীড়ানীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined hand-কে শাসন করিতে রামাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার।

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রচুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া এখন কাদ-কাদ হইয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়িতে ‘দেও’ আছে, এখানে সে কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের ‘ছায়া’ রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়িতে যান, ত সে অনায়াসে চাকরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে—

যে অন্ধকার ঘর তা ‘ছায়া’র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিস্তীর্ণ পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্বতই আমার নাকে লাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

combined hand কহিল, কেই চুহা-উহা সড়ল হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম। চুহা কি রে? এ ঘরে মরে নাকি?

সে হাতটা উল্টাইয়া তাল্ফিলাভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইদুর সে বাহিরের গলিতে ফেরিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিগো ছালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা ইদুরের সম্ভান পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছমছম করিতে লাগিল। এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ-বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ার শহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নাই; এমন ভদ্র বাড়িওয়ালাও আর নাই, এবং এলাপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী ক্রীটান মেস করিয়া বাস করে, তাহারা যেমন শিষ্ট-শাস্ত তেমন অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বাবুন-ব্যাটাকে ত্যাগাইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন? বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না; কিন্তু কি আশ্চর্য মশাই, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের কঁচকি ফুলে উঠেছে। সত্যি-মিথ্যা আমার গায়ে হাত দিলে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্বত হয়েছে।—শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কঁচকিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের রক্ত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাকতে পাঠান নি কেন, শীঘ্র পাঠান।—তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়। জানলেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তা ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন প্রায় দু টাকার খাড়া।

বলিলাম, তা হোক, ডাকতে পাঠান।

এ-ধরনের আশ্বাসের মনোহরবাব প্রায় আরও দশটা-দুই ছোটকট করিয়া ভাবে ঘুমাইলেন। বাক, বাঁচা

গেল!—কিন্তু তারাপটা এই যে, যিনি জ্ঞানাত্মা লোকের নীড়ার সংকাসে পাড়া মাড়িয়েছে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিরাছিলেন তাঁহারই মৃতদেহটা এবং গিনিপোয়া বাসরা পাহারা নিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকি রাষ্ট্রটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, শ্রবণ্ডিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, একথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক, মনোহর ত ঠেলাগাড়ি চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্ণেই রওনা হইয়া পড়িলেন,—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ন। বাসায় ফিরিয়া ঘনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাতি নিজেই টিপিয়া টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিংবা সত্যসত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্ণে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুখিয়া উঠিতে পরিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক, সম্ভ্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলিয্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। মেহেতু মনোহরের ন্যায় আইস-ব্যাগ লইয়া টানটানি করাটা সম্ভব নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে পেরি হইল না। কারণ, চাকের পলকে দেখিতে পাইলাম, এতবড় বিস্তী ব্যায়োর ডার কোন পুণ্যাত্মা সাধুলোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্তব্য নহে,—অশাস্ত্রীয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ সেই যে বেজুনের আর এক প্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাণিষ্ঠা পতিতা নারী আছে,—এতদিন বাহ্যকে ষ্ণা করিয়া আসিয়াছে,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক নীড়ার বিস্তী বোকাটা ষ্ণাভরে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয় সে মরুক। হয়ত তাহাতে কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ি আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

বার

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশি ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাণ্ডু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চললুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নাই। কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এতবড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরতে না অভয়া। এখনও গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনও জ্ঞান আছে—এখনও ভদ্রভাবে স্নেহ হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত করে বল, আজ্ঞা যাও।

অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম তা হলে নূতন ক'রে ঘর-সংসার পাতেত যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হল।

কিন্তু খুব সম্ভব, সে আমার স্নেহ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন-দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলের ফিরিতে দিল না।

অকস্মেৎ বহিঃ, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিদ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন অকস্মেৎ গিনির আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র; আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময়ে এই শর্তই সে আমাকে স্বীকার করিয়াই লইয়াছিল। পত্রের প্রথমে সে ইহারই উল্লেখ করিয়া

লিখিয়াছে, আমি মরিলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না, যাহা তোমার না জানিলেই নয়, কিন্তু আমার ত তা নয়! আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিশেষেই সায়ানিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পার নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয়, যে তুমি ভাল আছো।

আমি এই মাসের মধ্যেই বন্ধুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয় তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বন্ধুর সে ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো এসো, আমার মাথার দিবি রহিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া করিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই ঘর করিতে একটা পতকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়াই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সেদিন আমি এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধে একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহব কোটা নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বলসে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি সুদৃঢ়মাত্র তাঁর তেজের দ্বারা আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রশংসা! আজ আমার গুরুদেবের স্ত্রীমুখের কথাগুলি বার বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়িতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে, গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হইয়া কি ভাবিতেছেন, আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মস্তুর নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা নেবে না? বলিলাম, আমি মহাপাপিষ্ঠা। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, তা হলে ত আরও বেশি দয়াকর মা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্য পরিচয় দিইনি, দিলে এ-বাড়ির যে চৌকাঠও আপনি মাড়াতে চাইতেন না। গুরুদেব শ্রিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ি না হয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়িতে কেন আসবে না মা?

আমি চমকিয়া শুদ্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, কিন্তু আমার মায়েরওক যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিভ্রষ্ট হইবে; সে কথা কি সত্য নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা। কিন্তু সে ভয় যার নাই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নাই কেন?

তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, একবাড়ির মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর-একজনকে তা স্পর্শ করে না—কেন বলতে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয়ত করে, কিন্তু যে সবল সে কাটিয়ে উঠে, যে দুর্বল সেই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটা রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটি কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসং করে দেয়, সেই অপরাধই আব-একজন হয়ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত বর্ধিনিষেধই সকলকে এক দড়িতে বঁধিতে পারে না। সন্ধ্যার সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায, যা অধর্ম তা কি সবল-দুর্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায অধর্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা, বাইরে থেকে যেমনই দেখুক, তাদের ফল সমান নয়। তা হলে সংসারে সবলে-দুর্বলে কোন প্রভেদ থাকত না। যে বিব পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিব যদি একজন মিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত অন্ততঃ এইট ম্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আত্মন জ্বলছে, আর যাদের

ওখু ছাই জমা হয়ে আছে—তাদের কর্মের ওজন এক তুলানতে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।
 শ্রীকান্তদা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার পুরুষের সেই অন্তরের আশ্রয়ের কথাই মনে
 পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তার ভিতরে যে বহিঃস্থলিতেছে, তাহার
 শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইতেছি। তাঁর কর্মের বিচার একটু সাবধানে
 করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তাঁর পাণ-পুষ্টের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া
 দিয়া বসিয়ে না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত-সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে—
 এই নাও।—অভয়া দুই-তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর
 ছুড়িয়া কেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লক্ষিত,
 অপমানিত, তাহারই উপরে শতযোজন দূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজি অযাচিত সম্মানের
 পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি
 আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আশ্বিনটা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, শ্রীকান্তদাদা—
 বাখা দিয়া বলিলাম, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে।

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা বন্ধ করো না।

অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই সব মতলব খাঁটা হচ্ছে?

কেন, আমি কি মানুষ নই?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে। রোহিণীবাবু বেচারার অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন
 ভাল হ'য়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার ভারি ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি
 অসুখ ব'লে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম, আজ তা হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য নয় বটে।

অভয়া কখনকাল হির থাকিয়া বলিল, তুমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে একবার যাও শ্রীকান্তদাদা।
 আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে। কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা
 বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার বড় প্রয়োজন। পরদিনই অফিসে চিঠি লিখিয়া আরও একমাসের
 ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাবার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্তদাদা, একটা কথা দাও।

কি কথা দিদি?

সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে সীমাংসা করে দিতে পারে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি
 লিখে আমার মত নেবে বল?—স্বীকার করিয়া জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশে গাড়িতে গিয়া বসিলাম। অভয়া
 গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর একবার নমস্কার করিল; বলিল, রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই
 সেখানে টেলিগ্রাম করে দিই। কিন্তু জাহাজের ওপরে কটা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো,
 শ্রীকান্তদাদা, আর তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে।—আচ্ছা বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার
 দৃষ্টি চকু জলে ভাসিতেছে।

ভের

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বহু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া
 তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়িতে অপেক্ষা
 করছেন। আপনি নেবে যান, আমি জিনিসপত্র নিয়ে পরে যাচ্ছি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক
 গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একপাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্বাসে। আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ির কাছে
 অনিবার্য দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ি করে

পিছনে আসিস—দুটো বাজে, এখনও গুঁর নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আমরা বাসায় চললুম। পাড়োয়ানকে বেতে বলে সে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন যে-আজ্ঞে বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া পাড়োয়ানকে হুকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয়নি ত? না।

বড় অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ করেছিল বটে, বড় নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্ছে না! বাড়ি থেকে কবে এলে?

পরশু; অভয়াবর কাছে আসবার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আসতেই ত হ'তো—দুদিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল, এই হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশেষে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্বাণী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে লুকাইতে পারিলাম না। সে বিশ্মিতের মত কণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্ছে আমাকে, রোগা?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হী রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্বটন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিল—এমনি ক্লান্ত, এমনি পরিশ্রান্ত! নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, শ্রুতিও নাই। এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু জায়গা অবশ্যক করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ বললে না যে?

কহিলাম, নাই শুনলে।

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা কাঁকানি দিয়া কহিল, না বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিকী দেখতে হয়ে গেছি। সত্যি?

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমন অপ্রতিভ করে দাও যে—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখাদেখি ও সম্পর্ক নয় যে সেজন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই। কারণ, একে ত লোকে ও কথা বলে না, তা ছাড়া বললেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে মনে জানো —

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি অন্তর্বাণী কিনা, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েচো! আমি কখনো না ও কথা ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি করে বল ত। সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিল, তেমন কি এখনো দেখতে আছি না কি? তার চেয়ে কত কুজিত হয়ে গেছি।

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসি মুখখানি আমার মুখদৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুল করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ও দেশের আবহাওয়া কি সহ্য হচ্ছে না?

কহিলাম, না হলে ত উপায় নেই, যেমন ক' হোক সহ্য করিয়ে নিতেই হবে।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম, রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ, যে দেশের জল-বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কেন সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া লইবার আশার নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ বোর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ হইল না। সে কণকাল-মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল,

সে সত্যি। তা ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙ্গালী রয়েছেন। তাঁদের যখন সইতে, তখন তোমারই বা সইবে না কেন? কি বল?

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এই প্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আশ্চর্য করিল। তাই শুধু একটা ইমিডে শায় সিংহী নীরব হইয়া রহিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার স্নেহের কাহিনীটা কিভাবে রাজশশীর ঐতিহ্যগোচর করিব। সুদূর গ্রন্থাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সজ্জিহলে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনকার সহস্রপ্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের ভিতর কি ঝড় উঠবে, দুই চক্ষু প্রাবৃত করিয়া কিরূপ অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে, কত রঙে ভরিয়া যে, দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখন সেইটাই আমাকে সবচেয়ে লজ্জায় বিধিল। মনে হইল, ছি ছি—ভাগ্যে কেহ কাহারো মনের খবর পায় না। নইলে—কিন্তু থাক গে সে কথা। মনে মনে বলিলাম, আর যাছাই করি সেই মরণ-বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে বাঁধিব না।

বৌবাজারের বাসার আসিয়া পৌছিলাম। রাজশশী হাত দিয়া সেখানিয়া কহিল, এই সিঁড়ি—তোমার ঘর তেতলায়। একটু ওয়ে পড় গে। আমি যাচ্ছি। বলিয়া সে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জনোই বটে। পাটনার বাড়ি হইতে আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই। একখানি দামী সূর্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্যন্ত সে কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেমনি করিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিবিবার সাজসরঞ্জাম, আমার কাগড়, আমার সেই লাল মখমলের চটিজুতাটি পর্যন্ত ঠিক তেমনি সবসঙ্গে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরামটোকা আমি সর্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি সেইভাবে জানালার ধারে পাতা বহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহার উপরে গিয়া ঢোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাঁটার নদীতে আবাব জোয়ারেবের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।

রান্নাহার সারিয়া কান্তিবশতঃ দুপুরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ন-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী একহাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। কহিল, ঘামে বালিশ বিছানা ভিজ্ঞে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভাঙ্গি গরম। কাল দোডলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে দেব। বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আসব?

হাঁ, নিয়ে আয়। আর বন্ধু বাড়ি থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস।

আমি আবার চোখ বুজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে বন্ধু? একবার এদিকে আয় দিকি।

তাহার পায়ের শব্দে খুলিলাম, সে অভিশয় সঙ্কুচিভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেমনি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেলিল নিয়ে একটু বস। কি-কি আনতে হবে, একটা ফর্ম করে দারোগ্যান সঙ্গে করে একবার বাজারে যা বাবা। কিছুই নেই।

দেখিলাম এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্বে কেনসিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্যন্ত করে নাই; কিন্তু তা নাহয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বন্ধুর সম্মুখে অশ্লিষ দর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহুর অপরাধ সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করিয়া ফুলিল। আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বন্ধুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটা হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত আজিকার আচরণের কতই না প্রভেদ।

অনিসপত্রের কল করিয়া বন্ধু গ্রহণ করিল। রতনও চাও তামাক দিয়া নীচে চলিয়া গেল। পিয়ারী

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—আজ্ঞা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশি ভালবাসে বলতে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশি ভালবাসে।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জানলে?

বলিলাম, যেমন করেই জানি, সত্যি কি না বল ত?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা যে যাই হোক, বেশি ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই সংসারে এতবড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে এ ত তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিল না। অথচ সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থ-ত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েছে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। এবং সে হিসাবে যা-কিছুই ইহার কঠিন দুঃখ, যা-কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েছে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ—এ অশ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছে কেন?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলিনি। পুরুষমানুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। শব ফুরালে, কিংবা হালে পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্যগণ্য ভ্রম জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে—এই ত বলচ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। তার নিশ্চিত জীবন ঘরের কোণে গিরালার কাটাবার লে নই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে আসতে হবে, অবিচাঃ ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের চন্দনীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্যাদা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর? আবার সন্তানের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অন্যায়সে এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান বাধতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত কোন মেরেমানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।

কথটা এদিক হইতে কোনদিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাঙ্গসিধা চুপচাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহাব সেই শান্ত মুখের উপর অপরিণীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি বচস্কে দেখিয়াছিলাম, তাই চক্ষুর পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে কুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম, চিন্তিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশ্যেই পূর্ণাঙ্গুলি পাঠিয়েছিলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাঁর প্রাণ্য আজও ঠাকে দিই। কেননা আমার বিশ্বাস, যা-কিছু পাপ, যা-কিছু অপরাধ সে তাঁর অন্তরের ভেত্রে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ নির্মল করে দিয়েছে। তা নইলে ত আজ তিনি নিত্য সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

হীন কেন?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ! স্বামী-পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে নাকি? সে পাপ ধ্বংস করবার মত আশ্রয় তাঁর মধ্যে না থাকলে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আশ্রয়ের কথা থাক। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, পুরুষমানুষ চিরকালই উজ্জ্বল^{১০} চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী; কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটতে পারে না। মেরেমানুষকে সহ্য করতেই হয়। নইলে ত সংসার চলতে পারে না।

কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেরেমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংকল্প। একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ তা হলে তুমি আশ্রয়

আশুন কি বকছিলে?

রাজলক্ষ্মী সহসা মুখে কহিল, কি বকছিলুম ওনবে? আজই ঘণ্টা-দুই পূর্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভ্যার চিঠি পেয়েছি। আশুনটা কি জান? সেদিন স্নেহ ব'লে যখন তাঁর সবে-পাতা সুখের ঘরকম্বার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে নির্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বলছি তাঁর আশুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাঁতে ছিল না। কর্তব্য ব'লে বুঝলে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে, দ্বিধায় লিছুতে দেয় না, আমি তাকেই এতক্ষণ আশুন আশুন ব'লে বকে মরছিলুম। আশুনের এক নাম সর্বভুক জানো না? সে সুখ-সুখ দুই-ই টেনে নেয়—তার বাচবিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেছেন জানো? তিনি রোহিণীবাথুকে সার্থক করে তুলতে চান। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়েই শুধু সংসারের অপরের জীবনের সার্থকতা পৌছাতে পারে। আর বার্থ হতে শুধু একটা জীবন একাকীই বার্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানা দিক দিয়ে নিষ্ফল করে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না? বলিয়া সে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তার পরে দুজনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার মাথার মধ্যে আসুল দিয়া কক্ষ চুলগুলো নিরর্থক চিরিয়া চিরিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, তিনি খুব শিক্ষিতা, না? নইলে এত তেজ হয় না।

বলিলাম, হ্যাঁ, যথার্থ-ই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েছেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বরাবর চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম, এ লোভ তাঁর আছে নাকি? কৈ আমি ত শুনিনি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ, এ লোভ আবার কোন মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! ভূমি ত বেশ!

কহিলাম, তা হলে তোমারও আছে নাকি?

যাও—বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাস্তা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর কুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্ত্রোন্মুখ সূর্যরশ্মি পশ্চিমের খোলাজানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপকণ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল দুটিতে নানাবর্ণের দুটি ঝিকমিক করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আশ্বসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কেন, আমার কি ছেলে-মেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেছি—একটি দুটি নাতি-নাতনী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-সচ্ছন্দে থাকব—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রভাতের করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাতে রাজলক্ষ্মী কহিল, বন্ধুর বিয়ে ত এখনো দশ-বারদিন দেরি আছে, চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।

কহিলাম, তাও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি? রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। না হয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল থাকিয়া এই সময়টার চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন-তখন ব্যাঙের কন্টে এবং ব্যাগপাইপের বাঁশ বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের স্টেশন-যাত্রার পথেও এমনি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে, তাহলে ত গঙ্গীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না : তাহলে সৃষ্টি থাকে কি করে?

তাহার অসামান্য গাভীর দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরকার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দৃষ্টিভ্রমের আবশ্যক নেই। কারণ, আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। অন্ততঃ আমাদের এ দেশে ত নেই বললেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কিতারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্নার সাধ-আহ্বাদ নেই?

কহিলাম, সাধ-আহ্বাদ থাকলেই যে তাকে শ্রম দিতে হবে, তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই আমাকে বুঝিয়ে দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র নির্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থদের সম্বন্ধেই, তার কারণও তুমি জানো বলেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিহবায় ঘরে কহিল, তোমার ও মত ভাল।

আমারও কেমন জিদ চাপিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুল হলেও তোমার মুখে যে কথা শোভা পায় না। বন্ধুর বাপ যখন প্রেমাদের দু'বোনকে একসঙ্গে মৃত্যু বাহান্তরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সেদিন এখনো এও পুরানো স্বপ্ন যে তোমার মনে নেই। তবে নাকি সে লোকটার নেহাৎ পেশা বলেই রক্ষে; নইলে ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি-একটি ছেলেপুলে হতো—একবার ভেবে দেখ দেখি অশ্রুটি?

রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনহিয়া উঠিল, কহিল, ভগবান যাদের পাঠাতেন তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই, যা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এই জন্য?—এই সব ছেলে মানুষ করতে?

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না হয় তিনি নাই দেখতেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীত নই। আমি দোর দোর কিশে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হতো।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অগ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিকন্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ সরকারী এবং বেসরকারী অফিস কোয়ার্টার ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ অফিসে কেনালী ছুটি পাইয়া আড়ইটার ট্রেন ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না কিছু বাদ্যসামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ী, কাহারও কুমালে ঝাধা একটু পাঠার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগায়ের দুস্তাণা কিছু কিছু তরিতরকারী এবং ফলমূল। সাতদিনের পরে গৃহে পৌছিয়া উৎসুক ছেলেমেয়ের মুখে একটু ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেন ধরিবার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, কেন এরা সব এমনভাবে ইস্তিশানের দিকে ছুটেন? আজ কি?

আমি ফিরাইয়া চাহিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এরা সব অফিসের কেরানী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ি যাচেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু বাবার জিনিস নিয়ে যাচেন। পাড়াগায়ে ত এসব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ছেলে-মেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচেন, না? আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কন্ঠা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, আঃ—ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি শূর্তি—কেউ চাঁচামাচ করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রাস্তাঘরে দৌড়বে—বাড়িতে বাড়িতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আসি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ির জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফৌস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হী গা, এঁদের মাইনে কত ?

বলিলাম, কেরানীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিস-ত্রিশ-কুড়ি—এমনি।—রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়িতে ত এঁদের মা আছেন, ভাই-বোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম, লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলিকাতার বাসাখরচ আছে, অবিশ্বিয় রোগের খরচ—বাল্যলী কেরানী-জীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

রাজলক্ষ্মীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া, উঠিল, তুমি জান না। এঁদের বাড়িতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।

তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনা বোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এঁদের স্বরক্সার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি এঁদের চোন্দ-আনা লোকের কিছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, নাহয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এঁদের ছেলেমেয়েদের কথা গুনবে?—রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া চৈচাইয়া উঠিল, না-না, গুনব না, গুনব না—আমি চাইনে গুনতে।

সে যে প্রাণপণে অশ্রু সংবরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া শেষে নিজের কৌতুহলের কাছে পরাজয় মানিয়া, আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলেপুলের কথা। কিন্তু তোমর দুটি পায়ে পড়ি, মিছিমিছি বাড়িয়ে ব'লো না। পোহাই তোমার!

তাহার মিনতি করার ভঙ্গি দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলাম না; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাভীরের সহিত বলিলাম, বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা, তুমি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তোমাকে শোনাতাম না, যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষা করো ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে। অস্বীকার করলে নাস্তিক ব'লে হয়ত আবার আমাকে গালমন্দ করবে, কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব বাপ-মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই করো—আমি যা জানি তাই শুধু বলব। কেমন?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তার মায়ের উপরেই থাকে ব'লে আমার মনে হয়। ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই ভারটা নেবার উপায় আছে কি না—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ চালাকি করো না—সে আমি জানি।

জানো? বাক, তা হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের জননীর দুয়ের উৎস গুণিয়ে আসতে কোন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হলে কেন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহ্বারের সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যিক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা নাহয় মেনেই নাও।—রাজলক্ষ্মী স্নানমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা বুড়ে মলেও কোন পল্লীগাম্বে এককোটা দুধ পাবার আশা নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ! বলিলাম, বাক, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল যশোদী বাঁটি পানাপুঙ্কুরের জল, আর বিদেশী কোটাডরা বাঁটি বার্শির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগটার অদৃষ্টে হরত

এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্য জোটে, কিন্তু, সে সৌভাগ্য এ-সব ঘরে বেশিদিন থাকার আইন নেই। মাস-চারেকের মধ্যেই আর একটি নতুন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুঃখের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, হাঁ, হাঁ, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না! তুমি তারপরে বল।

কহিলাম, তারপর ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়া'জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির শুড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড় পড়ে—ঐ যে বললুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্তি হবার মূলভূমির ফুরসতে—ঐগুলো খাঁটি দেশী জলে শুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সৃত্তিকাগৃহের হাস্যামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে করে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন-রাতক চ্যাচানো।—রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাচানো কেন?

বলিলাম, ওটা মায়ের স্বভাব বলে। এমন কি কেরানীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, বখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলোটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন!

বাছা রে!

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্রেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধর্মীর মত ইহারও না হয় ভগবতের এই বিরাট দুঃখের দিকটা আগোচরেই থাকিত। বাঙ্গলার ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী প্রকাশ দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার যে শুধু খাদ্যাদ্যাদে ম্যালেরিয়া, ওলাওটা প্রভৃতি উপলব্ধ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশি ক্ষতি হইত! ঠিক এমন সময় রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক কেরানী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের ভাল। তুমি ত পাবাণ। তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখকষ্ট এমন আহ্বাদ করে বর্ণনা করচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে। বলিয়া সে অন্ধলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ তাহাতে লোভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ি পৌছিতে এঁদের আগ্রহটা ভেবে দেখবার বিষয়।

রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমিও ত তাই বলছি! আজ বাবা আসচে বলে ছেলেপুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? এঁদের মাইনে হয়ত কম, তেমনি বাবুয়ানিও নেই। কিন্তু, তাই বলে কি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, এত কম? ক'খনো নয়। অন্ততঃ—এক শ দেড় শ টাকা, আমি নিশ্চয় বলছি।

বলিলাম, হতেও পারে। আমি হয়ত ঠিক জানিনে।

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরানীর জন্যও মাসে দেড় শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই এঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপরিও কত পান?

কহিলাম, উপরিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল তোমাকে যতই দেখছি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্ছে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো ব'লেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বোঁধো।

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হৃৎস্পন্দটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যে একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ি আসিয়া স্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও বন্ধ কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্বাফেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবারে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বলিলাম : যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতরে গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেন পরে। এমন সময়ে একটি ঘোড়-গোছের দরিত্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরিতরকারির পুতুলি এবং অন্য হাতে পাঁড়সুন্ধ একটি মাটির পাখি লইয়া শুণ্ড প্রাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিবিদিকজ্ঞানশূন্য ভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া শুঁড়া হইয়া গেল। লোকটি হার হার করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুকার ছাড়িয়া একলক্ষ্যে তাহার খাড় চাপিয়া ধরিল এবং বন্ধু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কান ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শব্দবস্তুর রণস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার বার বলিতে লাগিল, দেখতে পাইনি। মা, আমার ভারি অনায়াস হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া বলিলাম, যা হবার হয়েছে, আপনি শীঘ্র যান, আপনার ট্রেন ছেড়ে দিল বলে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুকরা কয়টা কুড়াইবার জন্য বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া আসিয়া সে আর একদফা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙ্গা অংশগুলি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ইষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ—গেল সোমবারে বাড়ি থেকে আসবার সময় বলে দিলে, আমার জন্যে একটি পাখি-পুতুল কিনে এনো না! কিনতে গেলুম, বাটা গরজ বুঝে দর ইকলে কিনা—দু আনা—তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি করে আট-আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম, কিন্তু এমনি অদেউ দেখুন না যে, দোরগোড়ায় এনে ভেঙ্গে গেল! রোগা মেয়েটার হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেন্দ্র বলবে, বাবা আনলে না। যা হোক টুকরোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বলব, মা, এ মাসের মাইনেটা গেলে আগে তোব পুতুল কিনে তবে আমার জন্যে কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সমস্তে চাদরের বুটে বাঁধিয়া কহিল, আপনার দ্বীর্ঘ বোধ হয় বন্ধ লেগেচে—আমি দেখতে পাইনি। লোকসানকে লোকসানও হ'লো, গাড়িটাও পেলুম না—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আশ্বস্তা আগে গিয়ে দেখতে পেতুম। বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্রাটফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বন্ধু পাঁড়েজীকে লইয়া কি-একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। লব্ধ হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেচে না কি? কোথায় লাগল?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপিচুপি কহিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেচে—কিন্তু সে এমন জায়গায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও জো নেই, বোধহয় ও জো নেই।

চৌদ্দ

শ্রীমান বন্ধুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল, এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে ওনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল, সেকেও ক্লাশ ফার্স্ট ক্লাশে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত, তাও ত আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ি ছিল? কেন বেল কোম্পানীকে মিছে এতগুলো টাকা বেশি দেওয়া।

বন্ধুর বৈফিয়রের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠায় বিশেষ কোন সামঞ্জস্য লেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম; কিছুই বলিলাম না।

প্রাটফরমে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুস্থ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন?—লোকটি কহিলেন, বর্ধমান।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপিচুপি বলিল, তা হলে ও উনি অনায়াসে আমাদের

গাড়িতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম, ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ করিয়া বলিল, না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথা-বার্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।—বলিলাম, এক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বন্ধু এবং নিজের চাকরবাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একটা আলাদা গাড়িতে উঠার দৃষ্টিকটুত্বতা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আব্দুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাজিলের ভাবে কহিলাম, কাজ কি একটা বাডে লোককে গাড়িতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাদের জব্দ করবার এতবড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো। এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন স্টেশনে লাগতেই আমি তাহাকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়িতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহুল্য তাহাকে বাঁধী করাটতে বেশ পাইতে হইল না, অনুবোধমাত্রই তিনি তাহার পুটলি লইয়া আমাদের গাড়িতে আসিয়া অধিস্থিত হইলেন।

ট্রেন গোট্ট দশ স্টেশন পাপ না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাহার সহিত চমৎকার কথাবার্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা স্টেশন উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাহার ঘরের ববর, পাড়ার ববর, এমন কি; আশপাশের গ্রামগুলার ববর পর্যন্ত সে পুটিয়া ভানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর শুকদেব কানীতে সৌহৃদ্য—সৌহৃদ্য লইয়া বাস করেন, তাহাদের জন্য সে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্ধমানের কাছাকাছি আসিয়া তোমস বলিয়া সে তাহারই মধ্যে হইতে পাছিয়া একখানি সবুজ বস্ত্র বেষ্মেরে শাড়ি বাঁধি করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন। বস্ত্রলোক প্রথমে অবাক হইলেন। পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না, না, মা, সরলাকে আমি আসচে বাবে পুতুল কিনে দেব, আপনি কাপড় রেখে দিন। তা ছাড়া এ যে বড় দামী কাপড় মা।

রাজলক্ষ্মী বহুখানি তাহার পাশে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, বেশ দাম নয়। কপ-দাম যাই হোক, এখানি তার হাতে দিয়ে বলবেন, তাই মাসি তাকে ভাল হয়ে পরতে দিচ্ছে।

ভদ্রলোকের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। আধঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্তু উপহার দেওয়া জীবনে বোঝে করি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্বাদ করুন, সে ভাল হয়ে উঠুক। কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তাই মাসি যখন তাকে পবচে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত। বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলাব তাগা ভাল। আমাদের এমন একটা মাসি-পিসি থাকলে বেঁচে যেতুম মশাই। এইবার কিন্তু আপনার মনোটি চটপট সেরে উঠবে দেখবেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃষ্ণকণ্ঠ তখন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। 'সার আপনি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন।' আমার দুজনের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখদুঃখের কথা—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে 'কিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাখিলাম। এবং যে প্রহ্ন নিজেকে নিজে কবর ভিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনাবলী স্তব্ধ ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা দশ-বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নূতনও নয়। তাগাব দামী-চাকরদেরা হয়ত এ কথা লইয়া একটা চিন্তা পর্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিসটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়—সে আমিও জানি,

এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না ; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারটা যেমিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া !

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ । কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায় ।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম । তাহার শিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দাম আকোশ লইয়া প্রতি মুহূর্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম । আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জার মাটির সঙ্গে মিশিয়া বাহিতে থাকে । আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই ।

সর্বশ্রম দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নাই ; আজ সে শান্ত, স্থির । তাহার কামনা-বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মারিয়াছে যে, বাহির হইতে হতাশ সন্দেহ হয় তাহারা আছে, কি নাই । তাহারই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদানিদ্রোপ্তি কৃতকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায় ? তাহার নিজের সম্ভান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে ।

সেদিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আশুনকে হুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের ভুজা কিছুতেই মিটিতেছে না । তাই আজ একমাত্র বন্ধুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখ-দুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে ।

বর্ধমান ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল । আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কান্নাটা কার কল্যাণে হলো ? সরলা, না তার মায়ের ?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনেছিলে ?

বলিলাম, কাজে কাজেই । মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে । সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন । যাকি দেবার জো নেই । সে যাক, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল শুনতে পাইনে ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে, সে শুনে তোমার লাভ নেই ।

কহিলাম, লাভের আশা করিনে—ওখু লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি । সরলা কিংবা তাহার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার বাপের জন্যে ঝরাটা আমি পছন্দ করিনে ।

রাজলক্ষ্মী ওখু একটা 'ই' বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল ।

মনে করিয়াছিলাম, এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না, ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে । কিন্তু সে ত হইলাম না, বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ এইদিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা, শুনিয়া আর-এক দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল ।

কিন্তু বহুকণ মৌন ছিলাম, কথা কহিবার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল ; তাই বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম । বলিলাম, বর্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হ'তো ।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তরই দিল না, তেমনি চুপ করিয়া রহিল ।

বলিলাম, পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দৃষ্টিতে যে কান্না পড়ত না । এ বিলেপ-ফেরতের শিখরে কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, বিলেত-ফেরতের উপর যে তোমার ভারি ভক্তি দেখি! বলিলাম, হী, তাঁরা ভক্তির পাত্র যে!

কেন, তারা তোমাদের করলে কি?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু পাছে কিছু করে এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।

রাজলক্ষ্মী কলকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ তোমাদের অনায়াস। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে—সব দিক থেকেই বার করে দিয়েচ। তবু যদি তারা আমাদের জন্যে এতটুকুও করে, তাহেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কহিলাম, আমরা ঢের বেশি কৃতজ্ঞ হতুম যদি তারা সেই রাগে পুরাপুরি মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম সমাজকে নষ্ট করছে, যাহা হিন্দু বলে মনে করে, তারা হিন্দু সমাজকে ত্যক্ত করে মারছে। ওরা নিজেরা কি, যদি তাই আগে ঠিক করে নিয়ে পরের জন্যে কাঁদতে বসতো, তাতে হয়ত ওদের নিজেদেরও মঙ্গল হ'তো, যাদের জন্য কাঁদে তাদেরও হয়ত একটু উপকার হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু ত তা মনে হয় না!

বলিলাম, না হলেও তেমন ভক্তি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে, সে অন্য কথা। কই—তার ত কোন জবাব দাও না!

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো, সে জন্যে আটকাবে না। আগে তোমার ক্ষিদে পাক, তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা করে যে-কোনও স্টেশন থেকে যা মেলে খাবার কিনে গিলতে দেবে—এই ত? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখছি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি বানিক্‌কণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয়?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার উপর থাকবে না?

তা বটে! বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরের স্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের জায়গাটা চাহিয়া লইল এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া, থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল! দেখিলাম, এ-বিষয়ে একবিন্দু ভুলচুক কোথাও নাই; আমি যাহা কিন্তু ভালবাসি সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেষ্কের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটি ভোজন সমাধ, করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস খেগে যা—আর তাদের গাড়িতে অন্য কেউ যদি খায় দিস।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কই, তুমি খেলে না?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, আমার ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, আমার অনায়াস হ'বে গছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলচে। কত বলচি, যা ইস্তিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাডর দৃষ্টিকোণ স্থিরীকৃত যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই বাবি, না দাঁড়িয়ে তর্ক করবি?

রতন আর বিরক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ট্রেন ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিরের আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

জানি না, তাহা স্বীকার করিতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস

জানবার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাঞ্ঝা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশি, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি করে, তাকে মেনে চলেই বা কি করে।

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমিই বা এত বুঝবে কি করে? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখ-দুঃখ ভোগ করেনি; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা করে ভাবতে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে, সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পাশ্চাত্য খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেমনি ভুল হয়েছে।

বলিলাম, তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের অইনে হচ্ছে না, তবুও ভিজ্ঞাসা করি কি করে জানলে দেশের সমাজ আমার এর চেয়ে বেশি জ্ঞান নেই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি করে থাকলে? তোমার মত স্বর্ণপদ লোক আর সংসারে আছে নাকি? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জানবে কোথা থেকে! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশি নিন্দে করে বেড়ায় যারা সমাজের কোন খারি ধারে না। তোমাবা না জানো ভাল করে পরের সমাজ, না জানো ভালো করে নিজেদের সমাজ।

বলিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মনে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে বলে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি: নিজেদের একটু উচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গুরুত্ব থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী বাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাদের প্রশ্নাশা এতক, তা জানি। কিন্তু প্রশ্নাশা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ির গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়! অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরদের চেয়েও বেশি ব্যস্ত হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতো থাকতে সাও। কিন্তু অন্য দেশের রাণী করে হোলবার চেষ্টা করো না, আমি এই কথাটিই তোমাকে বলছি।

বলিলাম, গুরুশাস্ত্রের মাধ্যমে পা দিয়ে ভোদাবার ভো করে তুলেচ বটে, কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্চিনে, তা মানচি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিছু নেই।

বলিলাম, থাকলেও কেন শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু তোমার কথাটা একরকম বুঝতে পেরেচি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে জনোই হোক ছোট-বড় উচ্চ-নীচ সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না—চায়ও না। এতে যে কত অনিশ্চয় হয়েছে, সে আমিই টের পেয়েচি!

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলো কেমন করে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ও আমার এই দৃষ্টি। কিন্তু আগেকার কালে বেধে হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ উত্তিহাসটা ঠিক জানিনে।

সে কহিতে লাগিল, কখনো ছিল না। সেখানে কখনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্মভয় ছিল। আজ ও আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ শাচ্ছে? পথের ভিড়ক যে, সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি সত্যিই এত কষ্ট?
রাজলক্ষ্মী কক্ষকাল মৌন থাকিয়া আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, আমার কথা
আমার অন্তর্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ির গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট স্টেশনে
আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে শুরু করিলে বলিলাম, কি করলে তোমার বাকী জীবনটা
সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেছি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়,
কিছু না থাকে—একবারে নিরাশ্রয়, তা হলেই—

আবার দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে, সবাই বুঝিতে পারে,
আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা তোমার
কবে থেকে মনে হয়েছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেদিন অভয়ায় কথা শুনেছি, সেই দিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ
পেতে পারে, এ ত তুমি জানো না।

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে সত্যি ; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক, আমার মত দুঃখ যে
তারা কোন দিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

—আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে
পারি, কিন্তু সন্ত্রম ত্যাগ করি কি করে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বলছি? আর সন্ত্রমই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই
যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আনচো কেন? তোমাকে ও আমি কিছুই ত্যাগ
করতে বলিনি।

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সন্ত্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু
সেই সন্ত্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জন দিতে হবে
না। কিন্তু, তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সন্ত্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা
ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত-সহস্র মেয়ে-মানুষ যে এটাকে ধুলোর মত
ফেলে দিয়েছে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামহিয়া দিয়া বলিল, থাক, আর কথায়
কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা ভুল। তুমি ঘুমোও—এ সম্বন্ধে আর আমিও
কোনদিন কথা কইব না, তুমিও করো না। বলিয়া সে উঠিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌছিলাম এবং পিয়ারীর বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।
উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এরা সব আমার ভাড়টে।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, হাসলে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবাং হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায় আমাদেরই ষাওয়া-পরা দিয়ে
এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয় ; বেঁচে থাকলে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পারো না?

আমিও হাসিয়া বলিলাম, পারি বই কি। এমনিখারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে
তোমাকে নিঃশেষে অন্ন-বস্ত্র যোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি।

তা ছাড়া দু-একজন আমার কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু জানলে কি করে?

পিয়ারী একটুখানি শুদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই কানীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন অসময়ে বীরা আমার সদগতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ও গ্রাণ থাকতে ভোলা যায় না কিনা!

চূপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজরে রেখেছি, যাতে লোকের আর বেশি উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখতে ইচ্ছা করে রাজলক্ষ্মী!

মলে দেখা! আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরি হলে তোমাকে তুলব অখন। বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আঙ্গ যে বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাতে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম। গুরুদেব তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসতে চাই।

পিয়ারী বলিল, বন্ধুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেবী আছে, চল না, আমিও শ্রমাগে একবার স্নান করে আসি।

একটু মুস্থিলে পড়িলাম! আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক বৃদ্ধা সেখানে কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিম্নে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয়ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক দুর্নাম জিনিসটা এমনি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামের ভয় না করে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আড়াতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন-রাত কাটিল। ভাগ্যি সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলেনি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনাওনা বন্ধু-টুকু ছিল না।

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা, মানুষ হিসাবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলোই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবার একটা সীমা আছে—সেটা ডিসিয়ে খেও না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, কলঙ্কই বটে। কিন্তু অগ্নি হ'লে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার গ্রাণ দিয়েছ—কিন্তু অগ্নি যে অভ্যস্ত ছোটমানুষ রাজলক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে যে আমার ভুলনা হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তবরে কহিল, গ্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েছি, তোমার গরজে মিহিনি। সেজন্য তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না। কিন্তু ছোটমানুষ বলে যে তোমাকে ভাবতে পারিনি। তা হলে ত বাচতুম, পলার দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যাঙ্করের জন্য অপেক্ষা কর না করিয়া বর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্তা বন্ধ নাকি?

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, কিছু বলিবে?

বলিলাম, চল প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত, যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি?

চাও না?

না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না।—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া গুণ্ড একটা মস্ত নিশ্বাস বাহিয়া হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বার্তা হইল না।

দুপুরে সাধারণ সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে কি তুমি থাকতে পারো যে, এই অসাধা-সাধনের চেষ্টা করচ।

রাজলক্ষ্মী শান্ত-গভীর মুখে বলিল, সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।

তবে ইচ্ছেটা কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামলেই নয়। তুমিও একরকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও একরকম করে তা বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েছে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি। কিন্তু—

তাহাকে সহসা থামিতে দেখি, জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু কিছুই না। কি যে নির্বাক বাচালের মত যেতে যেতে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরীচ—, বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘূণায় ক্রুদ্ধত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাবচে, চাকরবাকরেরাই বা কি মনে করচে! ছিঃ ছিঃ, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার করে তুলেচি।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বুড়ো বয়সে এসব কি আমায় সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও। তবে পারো যদি, বর্মা যাবার আগে একবার দেখা করে যোগ্যে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধারও অন্তর্ধান হইল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এসব মাম-অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্যসত্যই কি একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকালবেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জলখাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য হইয়াই পিয়ারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ি নাই, সাজসজ্জা করিয়া, জুড়িগাড়ি চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। জুড়িগাড়িই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না—তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সংবাদে বিস্মাদ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল, ঘরে আলো জ্বলিল, রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদের কাঁখে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা ভয় করিতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সন্দোহ বিসর্জন দিয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কি না ভাবিলাম, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাশ ফিটন আমাদের বাড়ির সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্বাস্থের জড়োয়া অলঙ্কার কঙ্কণ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভ্রমলোক গাড়িতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙ্গালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাকর বাইরা জুড়ি ঘোড়া চক্কর পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

পন্নর

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাক্ষ্মীয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাশও রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিষ্টল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার!

রাজলক্ষ্মী শুদ্ধকণ্ঠে কহিল, তা হলে কি করিতে?—খুন?

হানিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অত বড় নবাবী শখ নেই। তা ছাড়া এই বিশেষ-শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর নরাধম কে আছে যে, সংসারের এই এত বড় একটা আনন্দে খনি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেবে? বরঞ্চ আশীর্বাদ করি, যে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তোমার রূপ ত্রিলোকজয়ী হোক, তোমার কণ্ঠ বীণানন্দিত এবং ঐ দুটি চরণকমলের নৃত্য উর্বশী তিলোত্তমার গর্ব স্বৰ্ণ করুক—আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করি—না হই!

পিয়ারী কহিল, এ সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থম। সে যাক আমি এট একটায় ট্রেনে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাসালীর পরম তীর্থ চাকরস্থান—অর্থৎ বন্দি। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা করি যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যিক মনে কর না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুটি পেরে কি তুমি একবারে চলে যাচ্ছো?

বলিলাম, পাশ-মুখে এখনও বলতে পারিনে। এ গোলকধাঁধা যদি পাব হতে পারি তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার ওপর যা ইচ্ছা তাই অত্যাচার করতে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছা? একেবারেই না। বরঞ্চ হঠাৎ-অস্বাভাবিক অত্যাচার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো করে থাকি, তা'র জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

তার মানে আজ বাহেই তুমি চলে যাবে।

হী।

আমাকে দিনা অপবাদে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই! আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ শুধাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, শুনেবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফর্সনিয়ায় সহসা গভীরা উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বান্দি নেই যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে! যাবে যাও—বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা ওস্তাদ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল। ঘটনাকালেই পরে সদর-দরজায় একটা গাড়ি থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া, পিছনে দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আম, একলা ফেলে রেখে চলে যাবে চাকর-বাকররাই বা কি ভাবে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোকাপড়া করো—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

তা নাহয় হইলো, কিন্তু ফিরে বন্ধুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কখনো বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

শিয়ারী কখনকাল যৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা করে থাকি, তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে করবে?

বলিলাম, শিয়ারী, এগুলো যে দাসীবাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ত মানাচ্ছে না।

এই বিমূগ্ধের কোন উত্তর শিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরক্তমুখে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহিরে ইহাতে গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার শিয়ারী ধপ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনি, তা জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজে হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিও না। আজ এমন করে তুমি চলে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বাসিয়া পড়িয়া কহিলাম, আজ্ঞা আজ তোমার-আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ করলুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেছি, দুজনের দোষ-সাক্ষাৎ হওয়া আর চলাবে না।

শিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কেন?

কহিলাম, অশ্রিয় সত্য সহ্য করতে পারবে?

শিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অশ্রুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সমস্ত ত্যাগ করিব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার আঙুরের ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকেই ওপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, প্রজ্ঞা করতে পারো, আমার জন্যে অল্পক দুঃখ সহিতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ এরকম কাজ আমি মাঝে মাঝে করবই?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু যৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙ্গে পড়বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

শিয়ারী বহুকক্ষ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, দেখিলাম, তাহার দৃঢ়তা বহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি।

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল; কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শাস্ত ও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নও, ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো করতে পারো না, অপরকেও করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালায় সেই রাজ-লক্ষ্মীটিকে চিনতে না, তারা চিনতে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ শিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হ'য়ে যাবে, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছে না? সে তুমি কেমন করে বাধা দেবে বল ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বাপ না।

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হতে পারে, কিন্তু সংসারের চক্রেও ত উপেক্ষা করবার কণ্ট নয় লক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু তাঁর চক্রেই ত সকলের আগে মানা উচিত।

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্বদা দেখা যায় না! যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায্য।

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ করে চলে যাবে?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, বর্মা যাবার পূর্বে আমি আর একবার দেখা করে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম, একথা আমি কখনো মানবো না। বলিয়া প্রলম্ববেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি বুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয়ত একটার ট্রেন ধরিতে পারি। নিশ্চক্ষে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

বকশিশের লোডে গাড়ি শ্রাণপলে ছুটিয়া স্টেশনে পৌছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই পশ্চিমের ট্রেন প্রাটফরম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। বরষ লইয়া জানিলাম, আশ্চর্য্য। পরেই একটা ট্রেন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাট—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

সূত্রায় পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বের টিকি কিনিয়াই আশ্চর্য্য। পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয় শব্দে উঠিয়া কান্না পড়িয়া গিয়া গেল।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্নবেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়িটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘরদুয়ার ভুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, চুঁচুটি রাশিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমনে ও বাস করিবার সম্বন্ধ শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ ত সুখের কথা, আহ্লাদেব কথা! এইবার একটি বিয়ে-ধা করে সংসার হইল শ্রীকান্ত! আমরা দেখে চক্ষু জুড়োই।

বলিলাম, সেই জনেই ত এসেছি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে শও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু ওই।

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামী-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাহিবেব ঘরেই নাহয় থাকব—ঘরে চুকিয়া দেখি এক-কোণে চুন এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, তাই ত। ওগুলো দেখেওনে কোথাও এখন সরাসরে হব দেখি। এ ঘরটা ও ছোট নয়—ততক্ষণ না হয় এই ঘরে একটা তক্তাপোশ পেতে—কি বলিস শ্রীকান্ত।

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত নাহয় তাই হোক।

বক্তব্যঃ এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু ওই—পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্ষায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে ভিতরে একটা রানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। এই সময়ের পর হইতে মাথাটা টিপটিপ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম না রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, ওটা গরম। ওত বেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।

স্বপ্নান্ত। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল—বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছুই না, ওটা ম্যালেরিয়া। ওতে ভাত খাওয়া চলে। কিন্তু আজ আর সার দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না, রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের

ম্যালোরারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয়ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দডাক্তার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ি টিপিয়া, জিব দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র 'কেনা দামটুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়িয়া গেল। বাবার মাতুল—আমার ঠাকুরদাশা আসিয়া বলিলেন, ভাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক—তোমার গিসিয়া অসুক। জ্বরটা কেমন যেন।

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুরদাশা একটু মুস্থিলে পড়িয়াছেন। এমনভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দডাক্তার আসিয়া যথার্থীতি ঔষধ দিয়া তিন দিনের বাকী কেনা দামটুকু প্রার্থনা করিলেন। শয্যা হইতে কোনমতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম—মানিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দডাক্তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, আছে না, যায়নি কিছুই।

কিন্তু তাঁহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। সন্ততির ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাটিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক, তুমি আমার পর নও, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিযো, চিকিৎসার ক্রটি হবে না। এই বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়াও পরমাশ্রীয়ে অধিক সাবধান দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, একথা কেউ যেন না শোনে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়া প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাশা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চায়, একথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না। সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলুম না। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলেই যাহা হয় করিব—সম্ভবতঃ অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যত্নের সূর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়াই হোক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেই এত শ্রীনা, এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এমনি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সেদিন কোনদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান-দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, ওখাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাক-পিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উদ্ভূত হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ তাহার আশা নাই, মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া ওইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে দূরে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল! দেখি, কোচমানেদের পাশে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া

দিতেই যাচ্ছা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।—রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। পাড়োয়ান কহিল, মা, দেরি হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?

একটু দাঁড়াও, বলিয়া সে অবচলিত ধীর পদক্ষেপেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রশাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাত দিয়া আমার কপালের, বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জ্বর নাই। ও-বেলায় সাতটার পাড়িতে যাওয়া চলবে কি? ঘোড়া খুলে দিতে বলব?

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, এই দুদিন জ্বরটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী বলিল, শাহয় আজ থাক। রাস্তির আর গিয়ে কাজ নেই, হিম লাগতে পারে, কাল সকালেই যাবে।

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন সাহসে? তুমি কি মনে কর তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না?

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, বেশ যা হোক। এইখানেই মানুষ হলাম, আর এখানে আমাকে চিনতে পারবে না? যে দেখবে সেই ত চিনবে।

তবে?

কি করব বল? আমার কপাল, নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?

এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই ত হ'তো।

তা কি কখনও হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই হির থাকতে পারি?

বলিলাম, তুমি নাহয় হির হলে, কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির করে তুললে। এখন সবাই এসে পড়বে, ওখন তুমিই বা মুখ দেখাবে কি করে, আর আমিই বা জবাব দেব কি!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং উদাসীনো নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে ঝেঁয়ে বসে আছে? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাথলো না?

রাজলক্ষ্মী তেমনি উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল, লজ্জা-সরম আমার যা কিছু, এখন সব তুমি।

ইহার পরে আবার বলিবেই বা কি! শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া বহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধুর বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

এখন কোথা থেকে আসচো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েছি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়?—পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হলে—তারপরে—

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেখানেই রেজিস্ট্রী করতে হবে। পণ্ডা সব একরকম করে রেখেই এসেছি বটে, কিন্তু তোমার তুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম, কি—দানপত্র কাকে কি দিবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি দুটো ত বন্ধুকেই দিয়েছি। শুধু কাশীর বাড়িটা গুরুদেবকে দেব ভেবেছি। আর কোম্পানীর কাগজ, গয়না-টয়নাগুলো ও আমার বুদ্ধি-বিবেচনামত একরকম ভাল করে এসেছি, এখন শুধু তুমি বললেই—

বিশ্বয়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, তা হলে তোমার নিজের রইল কি? বন্ধু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হলো, যদি সে শেষে তোমাকেই খেতে না দেয়?

আমি কি তাই চাইচি নাকি? নিজের সমস্ত দান করি কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো? তুমি ত বেশ!

অর্ধেক আর সংবরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া ক্রুদ্ধবরে বলিয়া উঠিলাম, হরিশচন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে? খাবে কি? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হতে যাবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমাকে এ বুদ্ধি যে দিয়েচে, সেই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাবে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম করো না—হির হয়ে শোও।

হির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্ত্রোন্মুখ সূর্যকর-রঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি অপরূপ শোভায় সৌন্দর্যে যেন বিশ্বভূবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা-ঘেব কোথাও যেন আর কিছু নেই।

এই নির্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল বোধ করি কেহই হিসাব করি নাই, সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনই চমকিয়া উঠিলাম। এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুরদাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরদা যখন দিবানিত্রা দিতেছিলেন, তখন খরবটা তাহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ি করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে জীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেই জনাই বোধ হয় এখন পর্যন্ত বাড়ির মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুরদা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্ছে একে কোথায় দেখেছি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমেষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্বভাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যেই এই দুঃখ বেচ্ছায় স্নাতায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্বদেহ কন্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে। কান্দ নাই, আঙ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটি চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী। ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবু এদের প্রশ্রয় কর।

পলকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রশ্রয় করিল।

॥ শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

শ্রীকান্ত

তৃতীয় পর্ব

এক

একদিন যে ভ্রমণকাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদ্ঘাটিত করিবার আর আমার প্রবৃত্তি ছিল না। আমার সেই পল্লীগ্রামের যিনি ঠাকুরদাদা তিনি যখন আমার সেই নাটকীয় উক্তির প্রত্যুত্তরে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন এবং রাজলক্ষ্মীর ভূমিষ্ঠ প্রশ্নামের প্রত্যুত্তরে শুধু যেভাবে শশব্যস্তে দুই পা হটিয়া গিয়া বলিলেন, তাই নাকি? আহা, বেশ বেশ—বৈঠকবর্তে থাকো! বলিয়া সকৌতুকে ডাক্তারটিকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন রাজলক্ষ্মীর মুখের যে ছবি দেখিয়াছিলাম সে তুলিবার বস্তু নয়, ভুলিও নাই; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম সে আমারই একান্ত আমার—বহিষ্কৃত তাহার যেন কোন প্রকাশ কোনদিনই না থাকে—কিন্তু এখন ভাবিতেছি, এ ভালই হইল যে, সেই বহুদিবসের বন্ধদুয়ার আবার আমাকে আসিয়াই খুলিতে হইল। যে অজানা রহস্যের উদ্দেশে বাহিরের ক্রুদ্ধ সংশয় অবিচারের রূপ ধরিয়া নিরন্তর থাকি দিতেছে—এ ভালই হইল যে, সেই অবরুদ্ধ দ্বার নিজের হাতেই অর্গলমুক্ত করিবার অবকাশ পাইলাম।

ঠাকুরদাদা চলিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী! ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া একটুখানি নিম্মল হাসির চেষ্টা করিয়া বসিল, পায়ের ধূলা নিতে গিয়ে আমি তাঁকে ছুয়ে ফেলতুম না; কিন্তু কেন তুমি ও কথা বলতে গেলে? তার ত কোন দরকার ছিল না! এ শুধু—

বাস্তবিক এ শুধুই কেবল আপনাদের আপনি অপমান করিলাম। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাজারের ব্যুইজী অপেক্ষা বিদ্যদা-বিবাহের পত্নী যে ইহাদের কাছে উচ্চ আসন পায় না—সুতরাং নীচেই নামিলাম, কাহাকেও এতটুকু তুলিতে পারিলাম না, এই কথাটাই বলিতে গিয়া রাজলক্ষ্মী আর শেষ করিতে পারিল না।

সমস্তই বৃথিলাম। আর এই অবমানিতার সম্মুখে বড় কথার আশ্ফালন করিয়া কথা বাড়াইতে প্রবৃত্তি হইল না। যেমন নিঃশব্দে পড়িয়াছিলাম, তেমনি নীরবেই পড়িয়া গেলাম।

রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর একটা কথাও কহিল না, ঠিক যেন আপনার ভাবনার মধ্যে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল, তার পরে সহসা অত্যন্ত কাছে কোথাও ডাক ওনিলা যেন চমক ভাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রতনকে ডাকিয়া কহিল, গাড়িটা শীগগির ঠিক করতে বলে দে রতন, নইলে সেই রাত্রি এগারটার ট্রেনে আবার যেতে হবে। কিন্তু সে হলে কিছুষ্টই চলবে না—ভারি হিম লাগবে।

মিনিট-দশেকের মধ্যেই রতন আমার ব্যাগটা লইয়া গাড়ির মাধ্যয় তুলিয়া দিল এবং আমার শোবার বিছানাটা বাঁধিয়া লইবার ইঙ্গিত জানাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে আর আমি একটা কথাও কহি নাই, এখনও কোন প্রশ্ন করিলাম না। কোথায় যাইতে ইইবে, কি করিতে ইইবে, কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে বসিয়া গেলিলাম।

দিনকয়েক পূর্বেই এমনি এক সঙ্ঘাবেলায় নিজের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আজ আবার তেমনি এক সাহস্ফবেলায় নীরবে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলাম। সেদিনও কেহ প্রদর করিয়া গ্রহণ করে নাই, আজও কেহ সন্দেশে বিদায় দিতে অগ্রসর হইয়া আসিল না। সেদিনও এমনিই ঘরে ঘরে তখন শীঘ্র বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমনিই বসুমন্দিরের গোপাল-মন্দির হইতে আরতির কীসর-ঘণ্টার রব অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। ওখাপি সেদিনের সঙ্গে আজিকার প্রভেদটা যে কত বড়, সে কেবল আকাশের দেবতারাই দেখিতে লাগিলেন।

বাস্তবতার এক নগণ্য পল্লীর জীর্ণ ভগ্ন গৃহের প্রতি মমতা আমার কোনকালেই ছিল না, ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়াকেও ইতিপূর্বে আমি কতকর বলিয়া কোনদিনই বিবেচনা করি নাই ; কিন্তু আজ যখন নিত্যন্ত অনাদরের মধ্য দিয়াই এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কোনদিন কোন ছলে ইহাতে আবার কখনো প্রবেশ করিব তাহার কল্পনা পর্যন্ত যখন মনে স্থান দিতে পারিলাম না, তখনই এই অব্যাহতকর সামান্য গ্রামখানি একেবারে সকল দিক দিয়া আমার চোখের উপর অসামান্য হইয়া দেখা দিল ; এবং যে গৃহ হইতে এইমাত্র নির্বাসিত হইয়া আসিলাম, আমার সেই পিতৃ-পিতামহের জীর্ণ মলিন আবাসখানির প্রতি আজ যেন আর লোভের অবধি রহিল না।

রাজলক্ষ্মী নীরবে প্রবেশ করিয়া আমার সম্মুখের আসনটি গ্রহণ করিল এবং বোধ হয় কদাচিৎ কোন পরিচিত পথিকের অশোভন কৌতূহল হইতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতেই গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রেলস্টেশনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যসেব বহুদূর অন্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথের দুই ধারে যদুচ্ছা-বর্ধিত বঁহিচি, শিয়াকুল এবং বেতবন সঙ্গীর্ণ পথটিকে সঙ্গীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সজ্জার আধার যেন দূর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া গাড়ি যখন অত্যন্ত সাবধানে অত্যন্ত মন্থর গমনে চলিতে লাগিল, আমি তখন দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন আমার পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথেই বরযাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে-পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহার স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই শ্রীতবেশীরা তাঁহাদের মৃতসেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধুবংশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলাবালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম। তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জন্মা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত চেলিয়া উঠে নাই।

দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধূলা নইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পাদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধূলাবালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার খনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহুকোটি অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায় তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরাইয়া আসিব কি না জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলে-ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী তেমনি স্থির হইয়া আছে। আধার কোণের মধ্যে তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অনুভব করিলাম সে চোখ মুদ্রিয়া যেন চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেছে। মনে মনে বলিলাম, তাই যাক। আজ হইতে নিজের চিন্তা-তরঙ্গীর হালখানা যখন তাহারই হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন এই অজানা নদীর কোথায় ঘূর্ণি, কোথায় চড়া, সে ই বুজিয়া বাতির ককর!

এ-জীবনে নিজের মনটাকে আমি নানা দিকে নানা অবস্থায় যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ধাতটা আমি চিনি। অত্যন্ত কিছুই ইহার সহ্যে না। অত্যন্ত সুখ, অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত ভাল থাকা ইহাকে চিরদিন গাঁড়িত করে। কেহ অত্যন্ত ভালবাসিতেছে জানিবামাত্রই যে মন অহরহ পালাই পালাই করে, সে মন যে আজ কত দুঃখে হাল ছাড়িয়াছে, তাহা এ মনের স্তম্ভিকর্তা ছাড়া আর কে জানিবে!

বাহিরের কালো আকাশের প্রতি একবার দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম, ভিতরের অদৃশ্যপ্রায় নিশ্চল প্রতিমার দিকেও একবার চক্ষু ফিরাইলাম, তাহার পরে জোড়হাতে তাবার যে কাছাকে নমস্কার

করিলাম জানি না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম, ইহার আকর্ষণের দুঃসহ বেগ আমার নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছে—বহবার বহ পথে পলাইয়াছি, কিন্তু গোলকধাঁধার মত সকল পথই যখন বারংবার আমাকে ইহারই হাতে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন আর আমি বিদ্রোহ করিব না—এইবার আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিলাম। এককাল জীবনটাকে নিজের হাতে রাখিয়াই বা কি পাইয়াছি? কতটুকু সার্থক করিয়াছি? তবে, আজ যদি সে এমন হাতেই পড়িয়া থাকে, যে নিজের জীবনটাকে এমন আকর্ষণময় পথ হইতে টানিয়া তুলিতে পারিয়াছে, সে কিছুতেই আর একটা জীবনকে তাহারই মধ্যে আবার ডুবাইয়া দিবে না।

কিন্তু এ সকল ত গেল আমার নিজের পক্ষ হইতে; কিন্তু অন্য পক্ষের আচরণ ঠিক আবার সেই পূর্বকার মত গুরু হইল। সমস্ত পথের মধ্যে একটাও কথা হইল না, এমন কি স্টেশনে পৌছিয়াও কেহ আমাকে কোন প্রশ্ন করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। অল্প সময়েই কলিকাতা যাইবার গাড়ির ঘণ্টা পড়িল, কিন্তু রতন টিকিট-ফেনার কাজ ফেলিয়া যাত্রীশালার কুদ্ব এককোণে আমার জন্য শয্যারচনায় প্রবৃত্ত হইল। এতএব বুঝা গেল এদিকে নয়, আমাদিগকে সেই ভোরের ট্রেনে পশ্চিমে রওনা হইতে হইবে। কিন্তু সেটা পটিনায় কিংবা কাশীতে কিংবা আর কোথাও, তাহা জানা না গেলেও এটা বেশ বুঝা গেল, এ-বিষয়ে আমার মতামত একেবারেই অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী অন্যত্র চাহিয়া অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল। রতন হাতের কাজ শেষ করিয়া কাছে আসিয়া কহিল, মা, খবর পেলাম একটু এগিয়ে গেল ভাল খাবার সব রকমই পাওয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী অকালের গ্রহি খুলিয়া কয়েকটা টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল, বেশ ত, তাই যা না। কিন্তু দুঃখ, ... নিস, বাসি-টাসি আনিস নে যেন।

রতন কহিল, মা, তোমার নিজের জন্যে কিছু—

না, আমার জন্যে চাইনে।

এই 'না' যে কিরূপ তাহা আমরা সবাই জানি, এবং সকলের চেয়ে বেশি জানে বোধ হয় রতন নিজে। তবুও সে আর-দুই পা ঘষিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কাল থেকেই ত এক-রকম—

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কহিল, তুই কি শুনতে পাসনে রতন? কালা হয়েচিস?

আর দ্বিকল্পিত না করিয়া রতন চলিয়া গেল। কারণ, ইহার পরেও তর্ক করিতে পারে, এমন শ্রবণ পক্ষ ত আমি কাহাকেও দেখি না। আব প্রয়োজনই বা কি? রাজলক্ষ্মী মুখে স্বীকার না করিলেও আমি জানি রেলগাড়িতে বা রেলের সম্পর্কিত কাহারও হাতে কিছু বাইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। নিরর্থক কঠোর উপবাস করিতে ইহার জোড়া কোথাও দেখি নাই বলিলেও ... করি অত্যাশ্চর্য হয় না। কতদিন কত জিনিস ইহার বাড়িতে আসিতে দেখিয়াছি, দাসী-চাকরে বাইয়, ... দরিদ্র প্রতিবেশীর ঘরে বিতরিত হইয়াছে, পচিয়া নষ্ট হইয়া ফেলা গিয়াছে; কিন্তু এ-সকল যাহার জন্য সে মুখেও দিত না। জিজ্ঞাসা করিলে, তামাশা করিলে, হাসিয়া বলিত, হাঁ আমার আবার আচার! আমার আবার বাওয়া-ছোয়ার বিচার! আমি ত সব খাই!

আচ্ছা, চোখের সামনে তার পরীক্ষা দাও?

পরীক্ষা? এখন? ওরে বাস রে! তা হলে আর বাঁচতে হবে! এই বলিয়া সে না-বাঁচিবার কোন কারণ না দেখাইয়াই অভ্যস্ত জরুরি গৃহকর্মের অছিলায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সে মাছ-মাংস দুধ-ঘি খায় না আমি ক্রমশঃ জানি ছিলাম, কিন্তু এই না-বাওয়াটাই তাহার পক্ষে এত অশোভন এত লজ্জার যে, ইহার উল্লেখই সে যে লজ্জায় কোথায় পলাইবে বুঝিয়া পাং ... তাই সহজে আর বাওয়া লইয়া অনুরোধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। রতন স্নানমুখে চলিয়া গেল, তখনও কথা কহিলাম না; খানিক পরে ঘটিতে গরম দুধ এবং ঠোঙ্গায় মিশ্রিত প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী আমার জন্য দুধ ও কিছু খাবার রাখিয়া রতনের হাতেই যখন সমস্তটা তুলিয়া দিল, তখনও কিছু বলিলাম না, এবং রতনের ককন চক্ষের নীরব স্নিগ্ধতা ও স্পষ্ট বুঝিয়া তেমনই নির্বাক রহিলাম।

আজ কারণে-অকারণে কথায় তাহার না-বাওয়াটাই আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। কিন্তু এতদিন ঠিক একরূপ ছিল না। তখন উপহাস পরিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন কটাক্ষও কম করি

নাই। কিন্তু যত দিন গিয়াছে, ইহার আর একটা নিকট ভাবিয়া দেখিবার বসন্ত অবকাশ পাইরাহি। রতন চলিয়া গেলে আমার সেই কথাগুলোই আবার মনে পড়িতে লাগিল।

কবে, এবং কি ভাবিয়া যে সে এই কষ্টসাধনার প্রবৃত্ত হইয়াছিল আমি জানি না। তখনও আমি ইহার জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়ি নাই। কিন্তু প্রথম যখন সে অপরাধী আহাৰ্য-বস্তুর মাকথানে বসিয়া বেজায় দিনের পর দিন গোপনে নিঃশেষে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছিল, সে কত কঠিন! কিরূপ দুঃসাধ্য! কলুষ ও সর্ববিধ অবিলম্বের কেন্দ্র হইতে আপনাকে এই তপস্যার পথে অগ্রসর করিতে কতই না সে নীরবে সহিয়াছে! আজ এ বস্তু তাহার পক্ষে এমন সহজ এমন স্বাভাবিক যে, আমাদের চক্ষে পর্যন্ত ইহার গুরুত্ব নাই, বিশেষত্ব নাই—ইহার মূল্য যে কি তাহাও ঠিক জানি না, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে, তাহার এই কঠিন সাধনার সবটুকুই কি একেবারে বিফল, একেবারে পণ্ডিত্য হইয়া গেছে? আপনাকে বঞ্চিত করিবার এই যে শিক্ষা, এই যে অভ্যাস, এই যে পাইয়া ত্যাগ করিবার শক্তি, এ যদি না জীবনের মধ্যে তাহার অলঙ্কার সঞ্চিত হইয়া উঠিতে পাইত, আজ কি এমনি স্বচ্ছন্দে, এমনি অবলীলাক্রমে সে আপনাকে সর্বপ্রকারে ভোগ হইতে বিচিন্ন করিয়া লইতে পারিত! কোথাও কি কোন বন্ধনেই টান ধরিত না? সে ভালবাসিয়াছে। এমন কত লোকেরই ত ভালবাসে, কিন্তু সর্বত্যাগের দ্বারা তাহাকে এমন নিষ্পাপ, এমন একান্ত করিয়া লওয়া কি সংসারে এতই সুলভ?

যাত্রীশালায় আর কোন লোক ছিল না, রতনও বোধ করি কোথাও একটু অন্তরাল খুঁজিয়া লইয়া গিয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম, একটা মিটমিটে আলোর নীচে রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিল; কহিল, তুমি ঘুমোও নি?

না, কিন্তু এই ধুলোবালির উপর একলাটি চুপচাপ না থেকে আমার বিছানায় গিয়ে বসবে চল। এই বলিয়া তাহাকে আগন্তিক করিবার অবসর না দিয়াই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলাম; কিন্তু নিজের কাছে আনিয়া আর কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল আন্তে আন্তে তাহার একটা হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এমনি গেল। আমার সম্বন্ধে যে অমূলক নয়, সে কেবল হঠাৎ তাহার চোখের কোণে হাত দিয়া অনুভব করিলাম। ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই রাজলক্ষ্মী আমার প্রসারিত পায়ের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চাপিয়া রহিল, কোনমতেই তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে পারিলাম না।

আবার তের্মনি নীরবে সময় কাটিতে লাগিল। সহসা একসময় বলিয়া উঠিলাম, একটা কথা এখনো তোমাকে জানানো হয়নি লক্ষ্মী!

সে চুপিচুপি কহিল, কি কথা?

ইহাই বলিতে গিয়া সংস্কারবশে প্রথমটা একটু বাধিল, কিন্তু থামিলাম না; কহিলাম, আজ থেকে নিজে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিলাম, এর ভাল-মন্দ আর এখন সম্পূর্ণ তোমার।

বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেই ভ্রমিত আলোকে সে আমার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। তার পরে একটুখনি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব? তুমি বাঁঝা-তবলা বাজাতে পারবে না, সারেস্বী বাজাতেও পারবে না। আর—

বলিলাম, আরটা কি? পান-তামাক যোগান? না, সেটা কিছুতেই গেরে উঠবে না।

কিন্তু আগের দূটো?

বলিলাম, ভরসা দিলে পারতেও পারি। বলিয়া নিজেও একটু হাসিলাম।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি পারো?

বলিলাম, আশা করতে ত দোষ নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। তার পরে নিঃশব্দ-বিশ্বয়ে কিছুক্ষণ নির্নিমেবে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, দ্যাখ, মাঝে মাঝে তাই যেন আমার মনে হ'ত; আবার ভাবতাম, যে মানুষ নিষ্ঠুরের মত বন্ধু নিয়ে কেবল জানোয়ারের মেরে বেড়াতেই ভালবাসে, সে এর কি দার ধারে? এর ভেতরের এতবড় বেনানাকে অনুভব করাই কি তার সাধ্য। বরক শিকার করার মত আদ্যন্ত নিতে

পারতেই যেন তার বড় আনন্দ। তোমার দেওয়া অনেক দুঃখই কেবল এই ভেবে আমি সহিতে পেরেছি।

এবার চূপ করিয়া থাকার পালা আমার। তাহার অভিযোগের মূলে বৃত্তি লইয়া বিচার চলিতেও পারিত, সাফাই দিবার নজিরেরও হয়ত অভাব হইত না, কিন্তু সমস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইল। তাহার সত্য-অনুভূতির কাছে মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল। কথটাকে সে ঠিকমত বলিতেও পারে নাই, কিন্তু সঙ্গীতের যে অন্তরতম মূর্তিটি কেবল ব্যথার ভিতর দিয়াই কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, সেই করুণায় অভিনিবিষ্ট সদাজাগ্রত চৈতন্যই যেন রাজলক্ষ্মীর ঐ দুটো কথার ইঙ্গিতে রূপ ধরিয়া দেখা দিল, এবং তাহার সংযম, তাহার ত্যাগ, তাহার হৃদয়ের গুচিতা আবার একবার যেন আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দিল।

তথাপি একটা কথা তাহাকে বলিতেও পারিতাম। বলিতে পারিতাম, মানুষের একান্ত বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলো যে কি করিয়া একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে সে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। না হইলে আমি স্বহস্তে জীবহত্যা করিতে পারি, এত বড় পরমাশ্চর্য নিষ্কের কাছে আর আমার কি আছে? যে একটা শিশীলিকার মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারে না, রক্তমাখা বৃপকাষ্ঠের চেহারা যাহার আহার-নিদ্রা কিছুদিনের মত ঘুচাইয়া দিতে পারে, যে পাড়ার অনাথ আশ্রয়হীন কুকুর-বেড়ালের জন্য ছেলেবেলায় কতদিন নিঃশব্দে উপবাস করিয়াছে—তাহার বনের পশু, গাছের পাখির প্রতি লক্ষ্য যে কি করিয়া হির হয়, এ ত কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। আর, এ কি শুধু কেবল আমিই এমনি? যে রাজলক্ষ্মীর অন্তর-বাহির আমায় কাছে আঁজ আলোর ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে, সে কেমন করিয়া এতদিন বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া পিয়াসীর জীবন যাপন করিতে পারিল!

এই কথাটাই মনে আনিয়াও মুখে আনিতে পারিলাম না। কেবল তাহাকে ব্যথা দিব না বলিয়াই নয়, ভাবিলাম কি হইবে বলিয়া? দেব ও মানবের অনুক্ষণ কাঁধ মিলাইয়া মানুষকে যে কোথায় কোন ঠিকানায় অবিশ্রাম বহিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কি আমি জানি? কি করিয়া যে ভোগী একদিনে ভোগী হইয়া বাহির হইয়া যায়, নির্মম নিষ্ঠুর একমুহূর্তে করুণায় গলিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এ রহস্যের কতটুকু সম্ভান পাই! কোন নির্ভৃত কন্দরে যে মানবাত্মার গোপন সাধনা অকস্মাৎ একদিন সিদ্ধিতে ফুটিয়া উঠে তাহার কি সংবাদ রাখি? কীর্ণ আলোকে রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া মনে মনে কহিলাম, এ যদি আমার ব্যথা দিবার শক্তিটাকেই কেবল দেখিতে পাইয়া থাকে এবং ব্যথা গ্রহণ কবিবার অক্ষমতাকে মোহের প্রস্রাবে এতদিন কমা করিয়াই চলিয়া থাকে ত অভিমানে করিবার আমার কি-ই বা আছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, চূপ করে বইলেয়ে?

বলিলাম, তবু এ নিষ্ঠুরের জন্যই সর্বত্যাগ করলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সর্বত্যাগ আব কই? নিজেকে ত তুমি নিঃস্বত্ব হয়েই আজ আমাকে দিয়ে দিলে, সে ত আর চাইনে বলে ত্যাগ কবতে পারলাম না।

বলিলাম, হী নিঃস্বত্ব হয়েই দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে ত তুমি আপনি দেখতে পাবে না—তাই, সে উদ্দেশ্য আমি করবো না।

দুই

বাক্সলার ম্যালেরিয়া আমাকে যে বেশ শক্ত করিয়াই ধরিয়াছিল তাহা পশ্চিমের শহরে প্রবেশ করিবার পূর্বেই বুঝা গেল। পাটনা স্টেশন হইতে বাক্সলক্ষ্মীর বাড়িতে আমি অনেকটা অচেতন অবস্থাতেই নীত হইলাম। ইহার পরের মাসটা আমাকে ছুর, ডাক্তার এবং রাজলক্ষ্মী প্রায় অনুক্ষণ ঘেরিয়া রহিল।

ছুর যখন ছাড়িল, তখন ডাক্তারবাবু বেশ স্পষ্ট করিয়াই গৃহস্থামিনীকে জানাইয়া দিলেন যে, যদিও এই শহরটা পশ্চিমেরই অন্তর্গত এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়াও খ্যাতি আছে, তথাপি তাহার পরামর্শ এই যে, রোগীকে অচিরে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক।

আবার একবার বাঁধা-ছাঁদা শুধু হইয়া গেল, কিন্তু এবার কিছু ঘটা করিয়া। রতনকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এবার কোথায় যাওয়া হবে রতন?

দেখিলাম, এই নব-অভিযানের সে একেবারেই বিরুদ্ধে। সে খোলা দরজার প্রতি নজর রাখিয়া আভাসে ইঙ্গিতে এবং ফিসফিস করিয়া তাহা কহিল তাহাতে আমি যেন দমিয়া গেলাম। রতন কহিল, বীরভূম জেলার এই ছোট গ্রামখানির নাম গঙ্গামাটি। ইহার পশ্চিম যখন কেনা হয় তখন সে একবার মাত্র মোস্তারজী কিষণলালের সহিত সেখানে গিয়াছিল। মা নিজে কখনও যান নাই—একবার গেলে পলাইয়া আসিতে পথ পাইবেন না। গ্রামে ভদ্রপরিবার নাই বলিলেই হয়,—কেবল ছোটজাতে ভরা,—তাদের না হোঁয়া যায়, না আসে তারা কোন কাজে।

রাজলক্ষ্মী কেন যে এইসব ছোটজাতির মধ্যে গিয়া বাস করিতে চাহিতেছে, তাহার হেতু যেন কতকটা বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গামাটি বীরভূমের কোথায়?

রতন জানাইল, সাঁইথিয়া নাকি এমনি একটা ইস্টিমান হইতে প্রায় দশ-বারো ক্রোশ গল্পর গাড়িতে যাইতে হয়। পথ যেমন দুর্গম, তেমনই ভয়ানক। চারিদিকে মাঠ আর মাঠ। তাতে না হয় ফসল, না আছে একফোঁটা জল। কাঁকুরে মাটি, কোথাও রাস্তা, আবার কোথাও যেন পুড়িয়া কালো হইয়া আছে। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আমাকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ কহিল, বাবু, মানুষে যে সেখানে কি সুখে থাকে আমি ভ ভেবে পাইনে। আর যারা এইসব সোনার জায়গা ছেড়ে সে দেশে যেতে চায় তাদের আর কি বলবো!

মনে মনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিলাম। এইসকল সোনার স্থান ত্যাগ করিয়া কেন যে সেই মরুভূমির মধ্যে নির্বাসিত ছোটলোকের দেশে রাজলক্ষ্মী আমাকে লইয়া চলিয়াছে, তাহা ইহাকে বলাও যায় না, বুঝানও চলে না।

শেষে বলিলাম, বোধ হয় আমার অসুখের জন্যই যেতে হচ্ছে রতন। এখানে থাকলে ভাল হবার আশা কম, এ ভয় সব ডাক্তারেই দেখাচ্ছেন।

রতন বলিল, কিন্তু অসুখ কি কারও হয় না বাবু? সারাবার জনো কি তাদের সব ঐ গঙ্গামাটিতেই যেতে হয়?

মনে মনে বলিলাম, জানি না তাহাদের সব কোন মাটিতে যাইতে হয়। হয়ত তাহাদের পাঁড়! সোজা, হয়ত তাহাদের সাধারণ মাটির উপরেই সারে। কিন্তু আমাদের ব্যাধি সহজও নয়, সাধারণও নয়, ইহার জন্য হয়ত ওই গঙ্গামাটিরই একান্ত প্রয়োজন।

রতন কহিতে লাগিল, মায়ের খরচের হিসেবপত্রও আমরা কেউ কোনদিন ভেবে পেলাম না। সেখানে না আছে ঘরদোর, না আছে কিছু। একজন গোমস্তা আছে, তার কাছে হাজার-দুই টাকা পাঠানো হয়েছে একটা মেটে বাড়ি তৈরি করবার জন্যে। দেখুন দাঁশ বাবু, এ কি সব অন্যচ্ছিত্তি কাণ্ডকারখানা! চাকর বলে যেন আর আমরা কেউ মানুষ নয়!

তাহার স্ফোট এবং বিরক্তি দেখিয়া বলিলাম, নাই গেলে রতন অমন জায়গায়! জোর করে ও তোমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারে না!

আমার কথায় রতন কোন সাধুনা লাভ করিল না। কহিল, মা পারেন। কি জানি বাবু কি জাদুমন্ত্র জানেন, যদি বলেন, তোমাদের সব যমের বাড়ি যেতে হবে, এতগুলো লোকের মধ্যে আমাদের এমন সাহস কারও নেই যে বলে, না। বলিয়া সে মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।

কথাটা রতন নিতান্তই রাগ করিয়া বলিয়া গেল, কিন্তু আমাকে সে যেন অকস্মাৎ একটা নূতন তথ্যের সংবাদ দিয়া গেল। কেবল আমিই নয়, সকলেরই ঐ এক দশা! ওই জাদুমন্ত্রের কথাটিই ভাবিতে লাগিলাম। মন্ত্র-তন্ত্রে যে সবাই বিশ্বাস করি তাহা নয়, কিন্তু এক-বাড়ি লোকের মধ্যে কাহারও যখন এতটুকু শক্তি নাই যে যমের বাড়ি যাইবার আদেশটাকে পর্যন্ত অগ্রহণ করে, তখন সে কল্পটি কি কি!

ইহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আমি কি না করিয়াছি! বিবাহ করিয়া বিদায় লইয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়া দেখিয়াছি, এমন কি দেশত্যাগ করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেছি—জীবনে

আর না দেখা হয় ; কিন্তু আমার সকল চেষ্টাই একটা গোল বস্তুর উপর সরলরেখা টানিবার মত বারংবার কেবল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আপনাকে সহস্র ধিকার দিয়া নিজের দুর্বলতার কাছেই পরাজিত হইলাম, এই কথাটা মনে করিয়া অবশেষে যখন আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন রতন আসিয়া আজ আমাকে এই খবরটা দিয়া গেল—রাজলক্ষ্মী জাদুমন্ত্র জানে !

তাই বটে! অথচ, এই রতনকেই জেরা করিলে জানা যাইবে, সে নিজেও ইহা বিশ্বাস করে না। হঠাৎ দেখি মন্ত্র একটা পাথরের বাটিতে কি কতকগুলো লইয়া এই পথেই রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া নীচে চলিয়াছে। ডাকিয়া কহিলাম, শোন, সবাই বলে তুমি নাকি জাদুমন্ত্র জান ?

সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দুই বৃ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কি জানি ?

বলিলাম, জাদুমন্ত্র !

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, হাঁ, জানি। বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ আমার গায়ের জামাটা ঠাণ্ড করিয়া দেখিয়া উদ্ভিষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ওটা কালকের সেই বাসি জামাটা না ? নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, হাঁ, সেইটাই বটে ; কিন্তু থাক, বেশ ফর্সা আছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ফর্সার কথা নয়, পরিষ্কারের কথা বলাছি। তার পরে একটুখানি হাসিয়া বলিল, বাইরের ওই দেখান ফর্সাটা নিয়েই চিরকাল গেলে। ওটা ত্যাগ করা করতলে আমি বলিনে, কিন্তু যে-ভেতরটা ঘামে-ঘামে নাংরা হয়ে ওঠে সেটা দেখতে শিখবে কবে ? বলিয়া সে রতনকে ডাক দিল। কেইই জবাব দিল না। কারণ কতীর এইপ্রকার উচ্চ মধুর আহ্বানের সাড়া দেওয়া এ বাড়ির বিধি নয় ; বরঞ্চ মিনিট পাঁচ-ছয় গা-ঢাকা দিয়া থাকাই নিয়ম।

রাজলক্ষ্মী ওখন হাতের পাত্রটা নামাইয়া রাখিয়া পাশের ঘর হইতে একটা কাচা জামা আনিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার মন্ত্রী রতনকে বোলো, যতক্ষণ সে জাদুমন্ত্র না শিখে ততক্ষণ যেন এই দরকারী কাজগুলো হাত দিয়েই করে। এই বলিয়া সে পাথরের বাটিটা তুলিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

জামাটা বদলাইতে গিয়া দেখিলাম তাহাও ভিতরটা যথাযথ মলিন হইয়া গেছে। হইবার কথা, এবং আমিও যে আর কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহাও নয়, কিন্তু আমার মনটা ছিল নাকি ভাবিবার দিকেই। তাই অতি তুচ্ছ খোসলটাব অন্তর-বাহিরের বৈসাদৃশ্যই আমাকে আবার নূতন আঘাত দিল।

রাজলক্ষ্মীর শুচিশায়গরুতা অনেক সময়েই আমাদের কাছে নিবর্থক, নীড়াদায়ক, এমন কি অত্যাচার বলিয়াও ঠেকিয়াছে, এবং এখনই যে তাহার সমস্তটাই এক মুহূর্তে মন হইতে ধুইয়া মুছিয়া গেল, তাহাও সত্য নয়, কিন্তু এই শেষ শ্রেয়টুকুর মধ্যে যে বস্তুটা প্রাণ-প্রতদিন মন দিয়া দেখি নাই তাহাই দেখিতে পাইলাম। যেখানে এই অদ্ভুত মানুষটির ব্যস্ত ও অব্যাহত জীবনের ধারা দুটা একান্ত প্রতিকূলে বহিয়া চলিয়াছে, ঠিক সেই স্থানটাতেই আজ গিয়া আমার চক্ষু পড়িল। একদিন অত্যন্ত অশুচ্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, শৈশবে রাজলক্ষ্মী যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকেই পিয়ারী তাহার উদ্ভাস যৌবনের কোন অতুল লালসার পঙ্ক হইতে এমন করিয়া অতি সহজে সহস্র দল-বিকশিত পত্রের মত চক্ষের নিমেষে বাহির করিয়া দিল ? আজ মনে হইল সে ত পিয়ারী নয়—সে রাজলক্ষ্মীই বটে! রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারী এই দুটি নামের মধ্যে যে তাহার নারী-জীবনের কত বড় ইঙ্গিত গোপন ছিল, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই বলিয়াই মাঝে মাঝে সংশয়ে ভাবিয়াছি, একের মধ্যে আর একজন এতকাল কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল! কিন্তু মানুষ যে এমনই! তাই ত সে সন্মুখ !

পিয়ারীর সমগ্র ইতিহাস আমি জানিও না, জানিতেও ইচ্ছা কার না। রাজলক্ষ্মীরই যে, সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি তাও নয় ; ওধু এইটুকুই জানি, দ'জনের মধ্যে ও কর্মে চিহ্নিত কোন মিল কোন সামঞ্জস্যই ছিল না, চিরদিনই উভয়ে পরস্পরের ওপটা ঘোড়ে বহিয়া গেছে। তাই একের নিষ্ঠুর সবসীতে যখন শুদ্ধ সুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অনুক্ষণ দলের পর দল মেলিয়াছে তখন অপরের দুর্দান্ত জীবনের ঘূর্ণিবায়ু সেখানে ব্যাঘাত করিবে কি, প্রবেশের পথই পায় নাই। তাই ত তাহার একটি পাপড়িও খসে নাই, এতটুকু ধূলাবালিও উড়িয়া গিয়া আজও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

শীতের সন্ধ্যা অচিরে গাড় হইয়া আসিল, আমি কিন্তু সেইখানে বসিয়া ভাবিতেই লাগিলাম। মনে

মনে বলিলাম, মানুষ ত কেবল তাহার দেহটাই নয়। পিয়ারী নাই, সে মরিয়াছে। কিন্তু একদিন যদি সে তার ওই দেহটার গারে কিছু কালি দিয়াই থাকে ত সেইটুকুই কি কেবল বড় করিয়া দেখিব, আর রাজলক্ষ্মী যে তাহার সহস্র-কোটি দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া আজ তাহার অকলঙ্ক ওদ্রতায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বিদায় দিব! মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তাহারই অন্যায়, তাহারই ভুলত্রুটি দিয়া মানুষের বিচার করিব; আর যে দেবতা সকল দুঃখ, সকল ব্যাথা, সকল অপমান নিঃশব্দে বহন করিয়াও আজ সম্মিত মুখে তাহারই মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে বসিতে দিবার কোথাও আসন পাতিয়া দিব না? সেই কি মানুষের সত্যকার বিচার হইবে? আমার মন যেন আজ তাহার সকল শক্তি দিয়া বলিতে লাগিল, না না, কখনই না, এ কখনই না! এমন যে হইতেই পারে না।

সে বেশিদিন নয়—নিজেকে দুর্বল, শ্রান্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীর হাতে একদিন আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন সেই পরাড়ুতের আত্মত্যাগের মধ্যে বড় একটা দীনতা ছিল। আমার মন যেন ইহা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু আজ আমার সেই মন যেন সহসা সবলে এই কথাটাই বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ও দান দানই নয়, ও ঐকি। যে পিয়ারীকে তুমি জানিতে না, সে তোমার জ্ঞানার বাহিরেই পড়িয়া থাক। কিন্তু যে রাজলক্ষ্মী একদিন তোমারই ছিল, আজ তাহাকে তুমি সকল চিন্তা দিয়া গ্রহণ কর, এবং বাঁহা হাত দিয়া সংসারের সকল সার্থকতা নিরন্তর খরিতেছে, ইহারও শেষ সার্থকতা তাঁহারই হাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।

নূতন চাকরটা আলো আনিতেছিল, তাহাকে বিদায় দিয়া অন্ধকারেই বসিয়া রহিলাম, এবং মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীর সকল ভাল সকল মন্দের সহিত আজ তাহাকে নিলাম। এইটুকুই আমি পারি, কেবল এইটুকুই আমার হাতে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত বাঁহা হাতে, সেই অতিরিক্তের বোঝা তাঁহাকেই দিলাম। বলিয়া সেই অন্ধকারেই ষাটের বাজুর উপর নীরবে মাথা রাখিলাম।

পূর্বের মত পরদিনও যথারীতি আয়োজন চলিল, এবং তাহার পরের দিনও সারাদিনব্যাপী উদ্যমের অবধি রহিল না। সেদিন দুপুরবেলায় প্রকাশ একটা সিদ্ধকে থালা-ঘটি-বাটি, গাড়ু-গেলাস বকনো-গিলসুজ অপরাপু ভরা হইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়া ও-সমস্ত দেখিতেছিলাম। একসময়ে ইশারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব হচ্ছে কি? তুমি কি আর ফিরে আসতে চাও না নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, ফিরে কোথায় আসব ওনি?

আমার মনে পড়িল, এ-বাড়ি সে বহুকে দান করিয়াছে। কহিলাম, কিন্তু ধর যদি সে-জায়গা তোমার বেশিদিন ভাল না লাগে?

রাজলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ করবার দরকার নেই। তোমার ভাল না লাগলে চলে এসো, আমি তাতে বাধা দেব না।

তাহার কথার ভসিতে আমি আঘাত পাইয়া চূর্ণ করিলাম। এটা আমি কববার দেখিয়াছি, সে আমার এই ধরনের কোন প্রশ্নই যেন সরলচিন্তে গ্রহণ করিতে পারে না। আমিও যে তাহাকে অকপটে ভালবাসিতে পারি, কিংবা তাহার সংস্বে ছিন্ন হইয়া বাস করিতে পারি, ইহা কিছুতেই যেন তাহার মনের সঙ্গে গাঁথিয়া এক হইয়া উঠিতে চাহে না। সংশয়ের আলোড়নে অবিশ্বাস এক মুহূর্তেই এমন উগ্র হইয়া বাহিরে আসে যে, তাহার জ্বালা বহুক্ষণ অবধি উভয়ের মনেই রি-রি করিয়া জ্বলিতে থাকে। এই অবিশ্বাসের আশ্রয় যে কবে নিবিবে এবং কেমন করিয়া নিবিবে, আমি তাহার কোন কিনারাই ভাবিয়া পাই না। সেও ইহারই সন্ধানে অবিশ্রাম খরিতেছে—এবং পসামাটি ও সমস্যার শেষ মীমাংসা করিয়া দিবে কি না, সে তথ্য বাঁহা হাতে তিনি অলঙ্ঘ্য চূর্ণ করিয়াই আছেন।

সবকিছ আয়োজনে আবৃত্তি মিন-চারেক কাটিল এবং আরও দিন-দুই গেল শুভকর্ষের প্রতীক্ষায়। তার পরে একদিন সকালে অপরিচিত পসামাটির উদ্দেশে আমরা সত্যসত্যই যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথটা আমার ভাল কাটিল না—মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। আর সকলের চেয়ে খারাপ কাটিল বোধ করি রতনের। সে মুখখানা অসম্ভব ভারী করিয়া গাড়ির এককোণে চূর্ণচাপ বসিয়া

রহিল ; স্টেশনের পর স্টেশন গেল, কোন কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না। কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। স্থানটা জানা কি অজানা, ভাল কি মন্দ, বাধ্যকর কিংবা ম্যাসেরিয়ান ভরা, সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না ; আমি ভাবিতেছিলাম, যদিচ জীবনটা আমার এতদিন নিরুপদ্রবে কাটে নাই, ইহার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুলচুক, অনেক দুঃখ-সৈন্যই গিয়াছে, তবুও সে-সব আমার অত্যন্ত পরিচিত। এই দীর্ঘ দিনে তাহাদের সহিত মোকাবিলা ত বটেই, বরঞ্চ এক প্রকারের স্নেহই জন্মিয়া গেছে। তাহাদের জন্য আমিও কাহাকে দোষ দিই না, আমাকেও আর বড় কেহ দোষ দিয়া সময় নষ্ট করে না। কিন্তু এই যে কোথায় কি-একটা নৃতনত্বের মধ্যে নিশ্চিত চলিয়াছি, এই নিশ্চয়তাই আমাকে বিকল করিয়াছে।

আজ নয় কাল বলিয়া আর দেরি করিবার রাস্তা নাই। অথচ ইহার না জানি ভাল, না জানি মন্দ। তাই ইহার ভাল মন্দ কোনটাই আজ আর কোনমতেই ভাল লাগে না। গাড়ি যতই দ্রুতবেগে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্তী হইতে চলিয়াছে ততই এই অজ্ঞাত রহস্যের বোঝা আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছে, কত কি যে মনে হইতে লাগিল তাহার অবধি নাই। মনে হইল, অচির ভবিষ্যতে হস্ত আমাকেই কেন্দ্র করিয়া একটা বিশ্রী দল গড়িয়া উঠিবে, তাহাদের না পারিব নইতে, না পারিব ফেলিতে। তখন কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না, ভাবিতেও সমস্ত মনটা যেন হিম হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী জানালার বাহিরে দৃঢ় মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। সহসা মনে হইল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকেই আমার ভালবাসিতেই হইবে ; কোথাও কোনদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এত বড় বিভ্রম না কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে! অথচ একটা দিন পূর্বেও এই দ্বিধায় খাতাকল হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। তখন মনে মনে সবলে বলিয়াছিলাম, তোমার সকল ভাল-মন্দের সঙ্গেই তোমাকে নিলাম লক্ষ্মী। অথচ আজ আমার মন এমন বিক্ষিপ্ত, এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! তাই ভাবি, সংসার করিব বলয়া এবং সত্যকার করায় কত বড়ই না ব্যবধান!

তিন

সাঁইথিয়া স্টেশনে আসিয়া যখন পৌছান গেল তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীর গোমস্তা কালীরাম স্বয়ং স্টেশনে আসিতে পারেন নাই—সেদিকের ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু জন-দুই লোক পাঠাইয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহার রোকার্য অবগত হওয়া গেল যে, ঈশ্বরেচ্ছায় ‘অত্র’ অর্থাৎ তিনি এবং তাঁহার গঙ্গামাটির সমস্ত কুশল। আদেশমত বাহিরে আসার একটা গো-বান অপেক্ষা করিতেছে—তাঁহার দুইখানি খোলা এবং দুইখানি ছই-দেওয়া। একখানি পুরু করিয়া ষড়, আর খেজুরপাতার চাটাই বিছান—সেখানি স্বয়ং কক্ৰীঠাকুরানীর। অপরখানিতে সামান্য কিছু ষড় আছে বটে, কিন্তু চাটাই নাই। সেখানি ভূতাদি অনুচরগণের জন্য। খোল, দুইখানিতে মালপত্র বোঝাই হইবে। এবং যদ্যপি স্থান সম্বলান না হয় ত পাইকদিকাকে ক্রম করিলে বাজার হইতে আরও একটা যোগাড় করিয়া আনিবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, আহালাদি সমাপনপূর্বক সম্ভার প্রাক্কালে যাত্রা করাই বিধেয়। কারণ অন্যথা কক্ৰীঠাকুরানীর সুনিম্নায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এবং এ বিষয়ে সর্বিশেষ জ্ঞাত করাইতেছেন যে, পথে ভয়াদি কিছু নাই—যজ্ঞম্বে নিশ্চ। যাইতে পারেন।

কক্ৰীঠাকুরানী রোকা পষ্ট করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র, এবং যে ইহা দিল তাহাকে ভরাদির কোন প্রশ্ন না করিয়া কেবল প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বাবা, কাছাকাছি এক ষড়-টুকুর আছে দেখিয়ে দিতে পার, একটা ডুবা দিয়ে আসি।

আছে বইকি মাঠান্। উই যে হোথাকে—

তা হলে চল ও বাবা দেখিয়ে দেবে ; বলিয়া সে তাহাকে এবং রতনকে সঙ্গে লইয়া কোথাকার কোন অজানা পুকুরে ব্রাহ্মিক করিতে চলিয়া গেল। অসুখ প্রকৃতির ভয় দেখান নিরর্থক বলিয়া আমি প্রতিবাদও করিলাম না। বিশেষতঃ ইহাতেই যদি বা সে কিছু ষায়, বাধা দিলে সেটাও তাহার আত্মিকার মত বন্ধ হইয়া যাইবে।

কিন্তু আজ সে মিনিট-মশেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই চলিতেছিল, সামান্য দুই-একটা বিছানা খুলিয়া গাড়িতে পাতা হইতেছে। আমাকে সে কহিল, তুমি কেন এইবেলা কিছু খেয়ে নাও না? সমস্তই ভাণা হয়েছে।

বলিলাম, দাও।

গাছতলায় আসন পাতিয়া একটা কলাপাতে সে সমস্ত গুছাইয়া দিতেছে, আমি নিশ্চয় চিন্তে কেবলমাত্র তাহার প্রতি চাহিয়া আছি, এমন সময়ে এক মূর্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, নারায়ণ!

রাজলক্ষ্মী তাহার ঝুঁটি-করা ভিজে চুলের উপর বা হাতের পিছন দিয়া আঁচলটা আর একটুখানি টানিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আসুন।

অকস্মাৎ এই নিঃসঙ্কেচ নিমন্ত্রণের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম এক সাধু দাঁড়াইয়া। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। তাহার বয়স বেশি নয়, বোধ হয় কুড়ি-একুশের মধ্যে, কিন্তু যেমন সুকুমার তেমনই সূত্রী। চেহারটা কৃপতার দিকেই—হয়ত একটু দীর্ঘকায় বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু রঙ তপ্তকালনের ন্যায়। চোখ, মুখ, হৃৎকপালের গঠন নিখুঁত বলিলেই হয়। বাস্তবিক, পুরুষের এত রূপ আর আমি কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তাহার পরিধানে গেরুয়া বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে ছিন্ন—গ্রহিবীধা। গায়ের গেরুয়া পাঞ্জাবীরও যেমন জীর্ণ দশা, গায়ের পাঞ্জাবী জুতাঝোড়াটিও প্রায় তদ্রূপ; হারাইলে দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই। রাজলক্ষ্মী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসন পাতিয়া দিল। মুখ তুলিয়া কহিল, আমি ততক্ষণ খাবার ঠিক করি, আপনাকে মুখ-হাত ধোবার জল দিক?

সাধু কহিলেন, তা দিক, কিন্তু আপনার কাছে আমি অন্য প্রয়োজনে এসেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আচ্ছা, আপনি খেতে বসুন, সে পরে হবে এখন। বাড়ি ফেরবার টিকিট চাই ত? সে আমি কিনে দেব। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

সাধুজী গভীরভাবে জবাব দিলেন, না, সে প্রয়োজন নেই। আমি খবর নিয়েছি আপনারা গঙ্গামাটি যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে একটা ভারি বাস্র আছে, সেটা যদি কতকটা পথ আপনাদের গাড়িতে তুলে নেন। আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আর বেশি কথা কি! কিন্তু আপনি নিজে?

আমি হেঁটেই যেতে পারব। বেশি দূর নয়, ক্রোশ ছয়-সাত হবে।

রাজলক্ষ্মী আর কিছু না বলিয়া রতনকে ডাকিয়া জল দিতে বলিল, এবং নিজে পারিপাটি করিয়া সাধুজীর খাবার সাজাইতে নিযুক্ত হইল। এই কাজটি রাজলক্ষ্মীর নিজের বস্ত্র, ইহাও তাহার জোড়া পাওয়া ভার।

সাধু ঋহিতে বসিলেন, আমিও বসিলাম। রাজলক্ষ্মী খাবারের হাঁড়ি লইয়া পাশেই রহিল। মিনিট-দুই পরে রাজলক্ষ্মী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুজী, আপনার নামটি?

সাধু ঋহিতে ঋহিতে কহিলেন ব্রজানন্দ। রাজলক্ষ্মী কহিল, বাপু রে বাপু ডাকনামটি?

তাহার কথার ধারণে চাহিয়া দেখিলাম তাহার সমস্ত মুখখানি চাপা হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হাসিল না, আমিও আহারে মন দিলাম। সাধুজী বলিলেন, সে নামের সঙ্গে আর ত কোন সম্বন্ধ নেই—নিজেরও না, পরেরও না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই সায় দিয়া কহিল, তা বটে! কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সাধুজী, আপনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন কত দিন?

প্রশ্নটি অত্যন্ত অভদ্র। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই বটে, কিন্তু যে পিয়াসীর মুখখানি আমি প্রায় তুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে আবার তাহাকেই মনে পড়িয়া গেল। সেই পুরানো দিনের সমস্ত সরসতা তাহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্থের যেন সজীব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

সাধু একটা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, আপনার এ কৌতূহল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী বেশমাত্র ক্ষুব্ধ হইল না, ভালমানুষটির মত মাথা নড়িয়া কহিল, তা সত্যি। তবে

একবার নাকি ভারি ভুগতে হয়েছে তাই,—এই বলিয়া সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, হাঁ গা, বল ত তোমার সেই উট আর টাটখোড়ার গল্পটি? সাধুজীকে একবার শুনিয়া দাও ত—আহা হা! বাট্ বাট্! কে বুঝি বাড়িতে নাম করছে।

সাধুজী বোধ হয় হাসি চাপিতে গিয়াই একটা বিষম বহিলেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই, কতীঠাকুরানীর আড়ালে কতকটা অনুচরে মতই ছিলাম। এখন সাধুজী বিষম সামলইয়া বধাসম্ভব গাভীরের সহিত আমাকে প্রণয় করিলেন, আপনি বুঝি তা হলে একবার সম্মানী—

আমার মুখে লুচি ছিল, বেশি কথাই জো ছিল না, তাই ডান হাতের চারটা আঙ্গুল তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম—উই ঞ—একবার নয়, একবার নয়—

এবার সাধুজীর গাভীর আর বজায় রহিল না, সে এবং রাজলক্ষ্মী দু'জনেই ঝিলঝিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সাধু কহিলেন, ফিরলেন কেন?

লুচির ডেলাটা শুখনও গিলিতে পারি নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিলাম।

রাজলক্ষ্মী তর্জন করিয়া উঠিল, বলিল, তাই বৈ কি! আচ্ছা, একবার নাই আমারি জন্যে—তাও ঠিক সত্য নয়—আসলে ভয়ানক অসুখে পড়েই—কিন্তু আর তিনবার?

কহিলাম, সেও প্রায় কাছাকাছি—মশার কামড়ে। ওটা কিছুতেই চামড়ায় সইল না। আচ্ছা—

সাধু হাসিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি প্রজ্ঞানন্দ বলেই ডাকবেন। আপনার নামটি—

আমার পূর্বের রাজলক্ষ্মী জবাব দিল। কহিল, ঐর নামে কি হবে? উনি বয়সে অনেক বড়, ঐকে দাদা বলেই ডাকবেন। আর আমাকেও বৌদিদি বলে ডাকলে রাগ করব না। আর আমি কোন না বয়সে তোমার চতুর পাঁচকের বড় হব!

সাধুজীব মুখ রাস্তা হইয়া উঠিল। আমিও প্রতীক্ষা করি নাই। বিষয়ে চাহিয়া দেখিলাম—এ সেই পিয়ায়ী। সেই স্বচ্ছ, সঘর্জ, মেহাতুরা আনন্দময়ী! সেই যে আমাকে কোনমতেই স্থানানো যাইতে দিতে চাহে নাই, এবং কিছুতেই রাজসংসর্গে টিকিতে দিল না—এ সেই। এই যে ছেলেটি তাহার কোথাকার মেহের বান্ধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে—সেখনকালের সমস্ত ‘সংজ্ঞা’ বৈদনা রাজলক্ষ্মীর বুক ভুড়িয়া টান ধরিয়াছে। কোনমতে ইহাকে সে আবার গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চায়।

সাধু বেচারা লজ্জার ধাক্কাটা সামলইয়া লইয়া কহিল, দেখুন, দাদা বলতে আমার তত আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের সম্মানীদের ওসব বলে ডাকতে নেই।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র অপ্রতিভ হইল না। কহিল, নেই কেন? দাদাব বৌকে সম্মানীসীরা কিছু মাসি বলেও ডাকে না, পিসি বলেও ডাকে না—ও ছাড়া হঠাৎকৈ তুমি আর কি বলে ডাকবে শুনি?

ছেলেটি নিরুপায় হইয়া শেষ সলজ্জ হাসিমুখে কহিল, আচ্ছা বেশ। ছ—এ ঘণ্টা আরও আছি আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে যদি দরকার হয় ত তাই বলেই ডাকব। রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হলে ডাক না একবার!

সাধু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দরকার হলে ডাকব বলেছি—মিছিমিছি ডাকাডাকি উচিত নয়।

রাজলক্ষ্মী তাহাব পাতে আরও গোটী চাপেও সম্মত ও বৈধি দিয়া কহিল, বেশ, তা হলেই আমার হবে। কিন্তু নিজের দরকারে যে কি বলে তোমাকে ডাকবো ঠাউরে পাচ্চিনে। আমাকে দেখাইয়া কহিল, ঐকে ত ডাকতুম সম্মানীঠাকুর বলে। সে আর হয় না, ঘুলিয়ে যাবে। তোমাকে নাইর ডাকব সাধুঠাকুরপো বলে, কি বল?

সাধুজী আর ভক্ত করিলেন না, অতিশয় গাভীরের সহিত কহিলেন, বেশ তাই ভাল।

তিনি এদিকে যাই হোন, দেখিলাম আহাঃ! তাহার দসবোধ আছে। পশ্চিমের উৎকৃষ্ট নিত্যের তিনি কদর বুঝেন এবং কোনটির কিছু মাত্র ও বর্ণন কবিলেন না। একজন সম্বন্ধে পরম মেহে একটির পর একটি দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আর একজন নিঃশব্দে নিঃশব্দোচ্চ গলাধঃকরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিলাম। মনে মনে বুঝিলাম সাধুজী পূর্বে যাহাই করুন, সম্ভ্রান্তি এলাপ উপদেশে ভোজ্য এত অপব্যয় পরিমানে সেবা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ত্রুটি একটা বেলার মধ্যে সংশোধন করিবার প্রয়াস করিতে দেখিলে

দর্শকের পক্ষে ঐযে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং রাজলক্ষ্মী আরও গোটা-কয়েক পৌড়া এবং বরফি সাধুজীর পাতে দিতেই অজ্ঞাতসারে আমার নাক এবং মুখ দিয়া একসঙ্গে এতবড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, রাজলক্ষ্মী এবং ভাহার নতুন কুটুণ দু'জনেই চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি রোগা মানুষ, তুমি উঠে হাত-মুখ ধোও গে না। আমাদের সঙ্গে বসে থাকবার দরকার কি?

সাধুজী একবার আমার প্রতি, একবার রাজলক্ষ্মীর প্রতি এবং ভাহার পরে হাড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বার কথাই বটে, কিছুই যে আর রইল না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আরও অনেক আছে। বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ঠিক এমন সময় রতন পিছনে আসিয়া বলিল, মা চিড়ে ত ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ কি দই কিছুই তোমার জন্যে পাওয়া গেল না।

সাধু বেচারী আতিশয় অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আপনাদের আতিথ্যের উপর ভয়ানক অত্যাচার করলুম, বলিয়া সহসা উঠিবার উপক্রম করিতেই রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো যদি ওঠো। মাইরি বলচি আমি সমস্ত ছড়িয়ে ফেলে দেব।

সাধু কক্ষকাল বিশ্রয়ে বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিলেন যে, এ কেমন স্ত্রীলোক যে এক-দণ্ডের পরিচয়েই এত বড় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর পিয়ারীর ইতিহাসটা না জানিলে বিশ্বাসের কথাই বটে। তার পরে তিনি একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমি সম্যাসী মানুষ, যেতে আমার কিছুই বাধে না, কিন্তু আপনাদের ও কিছু খাওয়া চাই। আমার মাথা ধেরে ও আর সতিসতি পেট ভরবে না।

রাজলক্ষ্মী জিত কাটিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, ছি ছি, অমনি কথা মেয়েমানুষকে বলতে নেই ভাই, আমি এ-সব খাইনে, আমার সহ্য হয় না। চাকরদের খাবার ঢের আছে। আজ রাতটা বৈতন্য, যা হোক একমুঠো চিড়ে-টিড়ে ধেরে একটু জল খেলেই আমার চলে যাবে। কিন্তু ক্ষিদে থাকতে তুমি যদি উঠে যাও, তা হলে তাও আমার খাওয়া হবে না ঠাকুরপো। বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞেস কর। বলিয়া সে আমাকে আপীল করিল।

কাজেই এতক্ষণে আমাকে কথা কহিতে হইল। বলিলাম, এ যে সত্যি সে আমি হলফ নিয়ে বলতে রাজী আছি সাধুজী। মিথ্যে তর্ক করে লাভ নেই ভায়া, পার হাড়িটা উপুড় না হওয়া পর্যন্ত সেবাটা যেমন চলচে চলুক, নইলে ও আর কোন কাজেই আসবে না। খাবারটা ট্রেনে এসেচে, সুতরাং অনাহারে মারা গেলও ওঁকে তার একবিন্দু খাওয়ান যাবে না। এটা ঠিক কথা।

সাধু কহিলেন, কিন্তু এ-সব খাবার ও গাড়িতে ছোঁয়া যায় না।

আমি বলিলাম, সে মীমাংসা আমি এতদিনে শেষ করে উঠতে পারিলাম না ভায়া, আর তুমি কি এক আসনেই নিষ্পত্তি করতে পারবে? তার চেয়ে বরঞ্চ কাজ সেরে উঠে পড়, নইলে সুখী ডুব দিলে হয়ত চিড়ে জলও গলা দিয়ে গলবার পথ পাবে না। বলি, ঘণ্টা-কয়েক আরও ও তুমি সঙ্গে আছ, শাস্ত্রের বিচার পার ত এখে যেতে যেতেই বুঝিয়ে, তাতে কাজ না হোক অন্ততঃ অকাজ বাড়বে না। এখন যা হচ্ছে তাই চলুক।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে সমস্ত দিনই উনি কিছুই খাননি?

বলিলাম, না। তা ছাড়া কালও কি নাকি একটা ছিল, তিনটি দুটো ফলমূল ছাড়া কালও আর কিছু ওঁর মুখে যায়নি।

রতন পিছনেই ছিল, ঘাড় নাড়িয়া কি যেন একটা বলিতে গিয়া—বোধ হয় মনিবের গোপন চোখের ইঙ্গিতে—হঠাৎ থামিয়া গেল।

সাধু রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এতে আপনাদের কষ্ট হয় না?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু হাসিল; কিন্তু আমি কহিলাম, সেটা প্রত্যাক এবং অনুমান কোনটাতেই জানা যাবে না। তবে চোখে যা দেখিচি তাতে আরও দু-একটা দিন বোধ হয় যোগ করা যেতে পারে।

রাজলক্ষ্মী প্রতিবাদ করিয়া কহিল, তুমি দেখেচ চোখে? কথনো না।

ইহুর আমিও জবাব দিলাম না, সাধুজীও আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। কেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া

নীরবে ভোজন শেষ করিয়া গাঢ়োখান করিলেন।

রতন এবং সন্দের দু'জনের আহার সমাধা হইতে বেলা গেল। রাজলক্ষ্মী নিজের ব্যবস্থা কি করিল সেই জানে।

আমরা গঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে যখন যাত্রা করিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অন্ধকারও কোথাও কিছু ছিল না। মালবোকাই গাড়ি দুইটা সকলের পিছনে, রাজলক্ষ্মীর গাড়ি মাঝখানে ও আমার গাড়িটা ভাল বলিয়া সকলের অগ্রে। সাধুজীকে ডাকিয়া কহিলাম, ভায়া, হাঁটার ত আর কমতি নেই, আজকের মত না হয় আমার এটাতেই পদার্পণ কর না?

সাধু কহিলেন, সঙ্গেই ত রইলেন, না পারলে না হয় উঠেই বসব—কিন্তু এখন একটু হাঁটি।

রাজলক্ষ্মী মুখ বাড়াইয়া বলিল, তা হলে আমার বডিগার্ড হয়ে চল ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে কইতে যাই। এই বলিয়া সে সাধুজীকে নিজের গাড়ির কাছে ডাকিয়া লইল।

সম্মুখেই আমি। মাঝে মাঝে গাড়ি, গরু ও গাড়োয়ানের সম্মিলিত উপদ্রবে তাহাদের আলাপের কিছু কিছু অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেও অধিকাংশই শুনিতে শুনিতে গেলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি তোমার এদিকে নয়, আমাদের দেশের দিকেই সে তোমর কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। কিন্তু আজ কোথায় চলেচ সতিা বল ত ভাই?

সাধু কহিলেন, গোপালপুরে।

রাজলক্ষ্মী ভিজ্ঞাসা করিল, আমাদের গঙ্গামাটি থেকে সেটা কতদূর?

সাধু ভাবা দিলেন, আপনার গঙ্গামাটিও জানিনে, আমার গোপালপুরও চিনি, তবে সম্ভবতঃ ও দুটো কাছাকাছিই হবে। অন্ততঃ তাই ত শুনলাম।

তা হলে একরায়ে গ্রামই বা কি করে ঠাওরাবে, যীর ওখানে যাচু তাঁর বাড়িই বা কি করে বুজে পাবে?

সাধুজী একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, গ্রামটা ঠাওরান শক্ত হবে না, কারণ পথের উপরেই নাকি একটা ওকনো পুকুর আছে তার দক্ষিণে দিয়ে ফ্রেন্স-খানেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে। আর বাড়ি খোঁজবার দৃষ্টি পোহাতে হবে না, কারণ সমস্তই অচেনা। তবে গাছতলা একটা পাওয়া বাবেই এ আশা আছে।

রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিল, এই শীতের রাতে গাছতলায়? ওই সামান্য কঞ্চলটা মাত্র অবলম্বন করে? সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না ঠাকুরপো।

তাহার উত্তরে আমাকে পর্যন্ত আঘাত করিল। সাধু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ৩ গু আঙুলে বলিলেন, কিন্তু আমাদের ত ঘরবাড়ি নেই, আমরা ত গাছতলাতেই থাকি দিদি।

এবার রাজলক্ষ্মীও কণকল মৌন থাকিয়া কহিল, সে দিমির চোখের সামনে নয়। রাতে ভাইকে আমরা নিরাশ্রয়ের মধ্যে পাঠাই নে। আজ আমার সঙ্গে চল, কাল তোমাকে আমি নিজে উদ্যোগ করে পাঠিয়ে দেব।

সাধু চুপ করিয়া রহিলেন। রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, তাহাকে না জানাইয়া যেন কোন জিনিস গাড়ি হইতে স্থানান্তরিত না করা হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাসীঠাকুরের বায়টা আজ রাত্রির মত আটক করা হইল।

আমি বলিলাম, তা হলে ঠাণ্ডার আর কষ্ট নাই করলে ভায়া, এসে। না আমার গাড়িতে। সাধু একটু তাবিয়া কহিলেন, থাক এখন। দিমির সঙ্গে একটু কথা কইতে কইতে যাই।

আমিও ডাকিলাম, বটে! নতুন সবছটা অস্বীকারের দিকে—সাধুজীর মনে মনে লড়াই চলিতেছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তবুও শেবরকা হইল না। হঠাৎ একসময়ে যখন তিনি অস্বীকার করিয়াই লইলেন, তখন অনেকবার মনে হইল একটু সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঠাকুর পালালেই কিন্তু ভাল করত—শেষে আমার লক্ষ্য না হয়। অথচ চুপ করিয়া রহিলাম।

দু'জনের কথাবার্তা অব্যবহিত চলিতে লাগিল। গরুর গাড়ির ঝাঁকনিতে এবং ভ্রমার হোঁকে মাঝে মাঝে তাহাদের আলাপের সূত্র চকচকে থাকিলেও কজন্যর সাহায্যে পূরণ করিয়া চলিতে চলিতে

আমারও সময়টা মন্দ কাটিল না।

বোধ করি একটু তন্দ্রামগ্নই হইয়াছিলাম, সহসা শুনিলাম—প্রশ্ন হইল, হাঁ আনন্দ, তোমার এই বাস্তবিকিতে কি আছে ভাই?

উত্তর আসিল, গোটা-কয়েক বই আর ওষুধপত্র আছে দিদি।

ওষুধ কেন? তুমি কি ডাক্তার।

আমি সন্ন্যাসী। আচ্ছা, আপনি কি শোনে ন দিদি, আপনাদের ওদিকে কি রকম কলেরা হচ্ছে?

কই না! সে কথা ত আমাদের গোমস্তা আমাকে জানান নি। আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কলেরা সারাতে পার?

সাদুজী একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, সারাবার মালিক ত আমরা নই দিদি, আমরা শুধু ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এও দরকার, এও তাঁরই হুকুম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ন্যাসীতেও ওষুধ দেয় বটে, কিন্তু ওষুধ দেবার জন্যেই ত সন্ন্যাসী হতে হয় না। আচ্ছা আনন্দ, তুমি কি কেবল এইজন্যেই সন্ন্যাসী হয়েছ ভাই? সাধু কহিলেন, সে ঠিক জানিনে দিদি। তবে দেশের সেবা করাও আমাদের একটা ব্রত বটে।

আমাদের? তবে বৃষ্টি তোমাদের একটা দল আছে ঠাকুরপো?

সাধু জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজলক্ষ্মী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু সেবা করার জন্য ত সন্ন্যাসী হবার দরকার হয় না ভাই। তোমাকে এ মত-বুদ্ধি কে দিলে বল ত?

সাধু এ প্রশ্নেরও বোধ হয় উত্তর দিলেন না, কারণ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই কাহারও শুনিতে পাইলাম না। মিনিট-দশেক পরে কানে গেল সাধু কহিতেছেন, দিদি, আমি ছোট সন্ন্যাসী, আমাকে ও-নাম না দিলেও চলে। কেবল নিজের কতকগুলো ভার ফেলে দিয়ে তার জায়গায় অপরের বোঝা তুলে নিয়েছি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল না। সাধু বলিতে লাগিলেন, আমি প্রথম থেকেই দেখতে পেয়েছি, আপনি আমাকে ক্রমাগত ঘরে ফেরাবার চেষ্টা করছেন। কেন জানিনে, বোধ হয় দিদি বলেই। কিন্তু যাদের ভার নিতে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, এরা যে কত দুর্বল, কত রুগ্ন, কিরূপ নিরুপায় এবং সংখ্যা কত, এ যদি একবার জানেন ত ও-কথা আর মনেও আনতে পারবেন না।

ইহারও রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না। কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে প্রশ্ন উঠিল এইবার উভয়ের মন এবং মতের মিল হইতে বিলম্ব হইবে না। সাধুজীও ঠিক জায়গাতেই আঘাত করিলেন। দেশের আভ্যন্তরিন অবস্থা, ইহার সুখ, ইহার দুঃখ ইহার অভাব আমি নিজেও নিতান্ত কম জানি না; কিন্তু এই সন্ন্যাসীটি যেই হোন, তিনি এই বয়সেই আমার চেয়ে ঢের বেশি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়াছেন এবং ঢের বড় হৃদয় দিয়া তাহাদিককে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শুনিতে শুনিতে চোখের ঘুম জলে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল এবং বুকের ভিতরটা ক্রোধে ক্রোধে দুঃখে ব্যথায় যেন মথিত হইয়া বাহিতে লাগিল। ও-গাড়ির অন্ধকার কোণে একাকী বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা প্রশ্নও করিল না, একটা কথাতেও কথা বোঝ করিল না। তাহার নীরবতায় সাধুজী কি ভাবিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু এই একান্ত জঙ্কতার পরিপূর্ণ অর্থ আমার কাছে গোপন রহিল না।

দেশ বলিতে যেখান দেশের চৌদ্দ আনা মর-নারী বাস করেন, সেই পটীগ্রামের কাহিনীই সাধু বিবৃত করিতে লাগিলেন। দেশে জল নাই, প্রাণ নাই, স্বাস্থ্য নাই—জন্মলের আবর্জনার যেখায় মুক্ত আলো ও বায়ুর পথ রুদ্ধ, যেখায় জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই। ধর্ম যেখায় বিকৃত, পথভ্রষ্ট, মৃতকল, জন্মভূমির সেই দুঃখের বিবরণ ছাপার অক্ষরেও পড়িয়াছি, নিজের চোখেও দেখিয়াছি; কিন্তু এই না-থাক যে কত বড় না-থাক, মনে হইল আজিকার পূর্বে তাহা যেন জানিতামই না। দেশের এই সৈন্য যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দীনতা, আজিকার পূর্বে তাহার ধারণাই যেন আমার ছিল না।

তত শূন্য বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। পথের ধূলা শিশিরে ভিজিয়া ভারি হইয়াছে; তাহারই উপর নিয়া গাড়ির ঢাল এবং গরুর শ্বরের শব্দ কলটিং শোনা যায়, আকাশে জ্যোৎস্না পাতুর

হইয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, ছড়িয়া পড়িয়াছে। ইহারই ভিতর দিয়া শীতের এই স্তব্ধ নিশীথে আমরা অজানার দিকে ধীর মনঃগতিতে অবিশ্রাম চলিয়াছি। অনুচরদিগের মধ্যে কে জাগিয়া, আর কে নাই, জানা গেল না,—সবাই শীতবস্ত্রে সর্বদা আবৃত করিয়া নীরব। কেবল একা সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গে লইয়াছে এবং পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝে তাহারই মুখ দিয়া কেবল দেশের অজ্ঞাত ভাই-ভগিনীর অসহ্য বেদনার ইতিহাস যেন ঝলকে ঝলকে জুলিয়া জুলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক, এমন রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া দেশের সমস্ত সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল, চোখের উপর ইহার জ্বলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।

সহসা সাধু রাজলক্ষ্মীকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, মনে হয় তোমাকে যেন আমি চিনতে পেরেছি দিদি। মনে হয় তোমাদের মত মেয়েদের নিয়ে গিয়ে একবার তোমাদেরই ভাই-বোনদের নিজের চোখে দেখাই।

রাজলক্ষ্মী প্রথমে কথা বলিতে পারিল না ; তার পরে ভাঙ্গা গলায় কহিল, আমার কি সে সুযোগ হতে পারে আনন্দ! আমি যে মেয়েমানুষ, এ কথা কি করে ভুলব ভাই!

সাধু কহিলেন, কেন হতে পারে না দিদি? আর তুমি মেয়েমানুষ, এই কথাটাই যদি ভোলো ত কষ্ট করে তোমাকে ওসব দেখিয়ে আমার কি লাভ হবে?

চার

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, গঙ্গামাটি কি তোমাদের জমিদারি দিদি ?

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, দেখচ কি ভাই, আমরা একটা মস্ত জমিদার।

এবার উত্তর দিতে গিয়া সাধুও একটুখানি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, মস্ত জমিদারি কিন্তু মস্ত সৌভাগ্য নয়, দিদি! তাহার কথায়, তাহার পার্শ্বব অবস্থা সব্বন্ধে আমার এক প্রকার সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে দিক দিয়া গেল না। সে সরলভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে কথা সত্যি আনন্দ। ওসব যত দূর হয়ে যায় ততই ভাল।

আচ্ছা দিদি, উনি ভাল হয়ে গেলেই তোমরা আবার শহরে ফিরে যাবে?

ফিরে যাবে? কিন্তু আজ সে ত অনেক দূরের কথা ভাই!

সাধু কহিলেন, পার ত আর ফিরো না দিদি। এই সব দরিদ্র দুর্ভাগ্যলো! তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ-কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। যখন কাছে ছিলে তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাও নি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্মম দুঃখ তাদের দিতে পারনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েচ, দুঃখের ভাগও তেমননি নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ-দৈন্য বোধ করি এমন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কানায় কানায় কলতে যে কি বোঝায় তোমাদের শহরবাসের সর্বপ্রকার আহার-বিহারের বোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে পার দিদি—

হী আনন্দ, বাড়ির জন্য মন তোমার কেমন করে না?

সাধু সংক্ষেপে কহিলেন, না। সে যেচারা বুঝিল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল, কেবল সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?

সাধু কহিলেন, কিন্তু বাড়ি ত এখন আর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী আশার অনেককক্ষ নীরবে থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আনন্দ, এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে কি তুমি শান্তি পেয়েচ?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাস রে! সন্ন্যাসীর অত লোভ! না দিদি, আমি কেবল পরের দুঃখের ভার নিতে একটু চেষ্টেছি, ভাই শুধু পেয়েছি।

রাজলক্ষ্মী আবার নীরব হইয়া রহিল। সাধু কহিলেন, উনি বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু এইবার একটু তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসি গে। আজ্ঞা মিলি, কখনো দু-চারদিন যদি তোমাদের অতিথি হই, উনি কি রাগ করবেন?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, উনিটি কে? তোমার দাদা?

সাধুজীও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আজ্ঞা, না হয় তাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আর আমি রাগ করব কি না জিজ্ঞেসা করলে না? আজ্ঞা চল ত একবার গঙ্গামাটিতে, তারপর তার বিচার হবে।

সাধুজী কি বলিলেন শুনিতে পাইলাম না, বোধ করি কিছুই বলিলেন না। ক্রমে পরে আমার গাড়িতে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, দাদা, আপনি কি জেগে আছেন?

আমি জাগিয়াছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। তখন আমারই পার্শ্বে সাধুজী একটুখানি স্থান করিয়া লইয়া তাঁহার হেঁড়া কবলখানি গায়ে দিয়া ওইয়া পড়িলেন। একবার ইচ্ছা হইল একটুখানি সরিয়া গিয়া; বেচারীকে আর একটু জায়গা দিই, কিন্তু পাছে নড়াচড়া করিতে গেলে তাঁহার সম্মুখে জন্মে আমি জাগিয়া আছি, কিংবা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে, এবং এই গভীর নিশীথে আর একদফা দেশের সুগভীর সমস্যা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই ভয়ে করুণা-প্রকাশের চেষ্টা মাত্র করিলাম না।

গঙ্গামাটিতে গাড়ি কখন প্রবেশ করিল আমি জানিতে পারি নাই, জানিলাম যখন গাড়ি আসিয়া থামিল আমাদের নূতন বাটীর দ্বারপ্রান্তে। তখন সকাল হইয়াছে। গোটা-চারেক গো-যানের বিবিধ এবং বিচিত্র কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বে ভিড় বড় কম জন্মে নাই। রতনের কল্যাণে পূর্বাহ্নেই শুনিয়াছিলাম এটা নাকি মূখ্যতঃ ছোটজাতির গ্রাম। দেখিলাম, রাগ করিয়া কথাটা সে নিতান্ত মিথ্যা কহে নাই। এই শীতের ভোরেও পঞ্চাশ-বাটী নানা বয়সের ছেলে-মেয়ে উলঙ্গ এবং অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বোধ করি এইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া তামাশা দেখিতে জমা হইয়াছে। পশ্চাতে বাপ-মায়ের দলও যথায়গোভাবে উকিঝুঁকি মারিতেছে। ইহাদের আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদে ইহাদের কৌলিন্য সম্বন্ধে আর যাহাব মনে যাহাই থাক, রতনের মনের মধ্যে বোধ হয় সংশয়ের বাষ্পও রহিল না। তাহার ঘুমভাঙ্গা মুখ এক নিমিষেই বিরক্তি ও ক্রোধে ভীমরূলের চাকের মতন ভীষণ হইয়া উঠিল। কব্জীকে দর্শন করিবার অতি-ব্যগ্রতায় গোটা-কয়েক ছেলেমেয়ে কিঞ্চিৎ আতঙ্কিত হইয়া যেমিয়া আসিয়াছিল, রতন এমন একটা বিকট ভঙ্গি করিয়া তাহাদের ভাড়া করিল যে, গাড়োয়ান দু'জন সুমুখে না থাকিলে সেইখানেই এখটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিল। রতন কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, যত সব ছোটজাতের মরণ! দেখছেন বাবু, ছোটলোক ব্যাটাদের আশ্পর্শ—যেন রথ-দোল দেখতে এসেছে! আমাদের মত সব ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারে বাবু! এখুনি সব হোঁয়ানুয়ি করে একাকার করে দেবে।

'হোঁয়ানুয়ি' কথাটা সর্বত্রই কানে গেল। রাজলক্ষ্মীর। তাহার মুখখানি যেন অগ্রসর হইয়া উঠিল।

সাধুজী নিজের বাস্তব নামাইতে ব্যস্ত ছিলেন। কাজটা সমাধা করিয়া তিনি একটা লোটা বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং কাছাকাছি যে ছোটটাকে পাইলেন অকস্মাৎ তাহারই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ওরে ছেলে, যা ত ভাই, এখানে কোথা ভাল পুকুর-টুকুর আছে—একখটি জল নিয়ে আয়—চা খেতে হবে। বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া, সম্মুখের একজন প্রৌঢ়-গোছের লোককে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, মোড়লের পো, কাছাকাছি কার গরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, একটুটুকু দুধ চেয়ে আনি। গাঁয়ের টাটকা বাঁটি জিনিস—চারের রঙটা যা দাঁড়াবে মিলি, বলিয়া তিনি একবার আমার ও একবার তাঁহার মিলির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মিলি কিন্তু এ-উৎসাহে কিছুমাত্র যোগ দিলেন না। অগ্রসরমুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, রতন, যা ত বাবা, খটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয়।

রতনের মেজাজের খবরটা ইতিপূর্বে দিয়াছি। তার উপর এই শীতের সকালে যখন কে-একটা অচেনা সাধুর জন্য কলথাকার একটা নিরুদ্দেশ জলাশয় উদ্দেশ্য করিয়া জল আনিবার ভায় পড়িল, তখন আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। একমুহূর্তেই তাহার সমস্ত শ্রোণ দিয়া পড়িল তাহার

চেয়েও ছোট, সেই হতভাগ্য বালকটার উপর। তাহাকে সে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিয়া উঠিল, নজ্জার পাঁজি বাটা! ষাট বুলি কেন তুই? চল হারামজালা, ষাট মেজে জলে ডুবিয়ে দিবি। বলিয়া সে কেবল চোখ-মুখের ভলিতেই ছেলটাকে যেন গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল।

তাহার কাণে দেখিয়া সাধু হাসিলেন, আমিও হাসিলাম। রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, গ্রামটা যে তোলপাড় করে তুললে আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোয়াতেই চা চাই! সাধু বলিলেন, গৃহীদের রাত পোহায় নি বলে বুঝি আমাদেরও পোহাবে না? বেশ ত! কিন্তু দুখের যোগাড় যে করা চাই। আচ্ছা, বাড়িটার মধ্যে ঢুকে দেখা যাক, কাঠ-কুটো উনুন-টুনুন আছে কি না। ওহে কঠা, চল না দাদা, কার ঘরে গরু আছে একটু দেখিয়ে দেবে। দিদি, কালকের সেই ইড়িটায় বরকি কিছু ছিল না? না, গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে তাকে শেব করেছেন? রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। পাড়ার যে দু-চারজন মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহারাও মুখ কিরাইল।

এমন সময় গোমস্তা কুশারীমহাশয় হস্তদস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাহার তিন-চারজন লোক, কাহারো মাথার কুড়িভরা শাক-সবজি ও তরিতরকারি, কাহারো হাতে ঘটিভরা দুধ, কাহারো হাতে দধির ভাণ্ড, কাহারো হাতে একটু বৃন্দায়তন রোহিত মংস্য। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রশ্ন করিল। তিনি আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সামান্য একটু বিলম্বের জন্য বহুবিধ কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন। লোকটিকে আমার ভাল বলিয়াই মনে হইল। বয়স পঞ্চাশের উপর গিয়াছে। কিছু কৃশ, দাড়ি-গৌক কামনো—রঙটি ফর্সা দিকেই। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন। কিন্তু সাধুজী এ সকল প্রচলিত ভদ্রতার ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তরকারির কুড়িটা বহুস্তে নাখাইয়া লইয়া তাহাদের পৃথানুপৃথরাণে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন; দুধ যে ষাটি সে বিষয়ে নিঃসংশয় মত দিলেন, এবং মংস্যটির ওজন কত তাহা অনুমান করিয়া ইহার আবাদ-সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই আশাষিত করিয়া তুলিলেন।

এই সাধুমহারাজের শুভাগমন সম্বন্ধে গোমস্তা মহাশয় পূর্বাহ্নে কোন সংবাদ পান নাই; তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিল, সন্ন্যাসী দেখে ভয় পাবেন না কুশারীমহাশয়, ওটি আমার ভাই। একটু হাসিয়া মুদুকটে কহিল, আর বার বার গেল্লা ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠে।

কথাটা সাধুজীর কানে গেল। কহিলেন, এ কাজটা তত সহজে হবে না দিদি। বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষ চাহিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন। ইহার অর্থ আমিও বুঝিলাম, রাজলক্ষ্মীও বুঝিল। সে কিন্তু হস্তান্তরে কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে দেখা যাবে।

বাটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কুশারীমহাশয় বন্দোবস্ত বড় মন করেন নাই। অভ্যস্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া তিনি নিজে সরিয়া গিয়া পুরাতন কাছারি-পুহটিকেই কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্তন করিয়া নিয়া বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ভিতরে রান্না এবং তাঁড়ারঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। ঘরগুলি মাটির, খড় দিয়া ছাওয়া, কিন্তু বেশ উঁচু এবং বড়। বাহিরে বসিবার ঘরখানিও চমৎকার পরিপাটি। প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, পরিষ্কার এবং মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা। একথারে একটি ছোট কূপ এবং তাহারই অদূরে গোটা দুই-তিন টগর ও শেফালি বৃক্ষ। আর একদিকে অনেকগুলি ছোট-বড় তুলসীগাছের সারি এবং গোটা-চারেক বৃহৎ ও মল্লিকা ফুলের বাড়। সবসমুদ্র জায়গাটা দেখিয়া যেন তৃপ্তিবোধ হইল।

সকলের চেয়ে উৎসাহ দেখা গেল সন্ন্যাসীভায়ায়। যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতেই উচ্চকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন এমন আর কখনও দেখেন নাই। আমি কলরব না তুলিলেও মনে মনে বুশিই হইয়াছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার ভাইয়ের জন্য রান্নাঘরে চা তৈরি করিতেছি, অতএব মুখের ভাব তাহার চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মনের ভাব তাহার কথারও কানে অবিনশিত ছিল না। কেবল দলে ভিড়িল না রতন। সে মুখখানা তেমনি ভারী করিয়াই একটা খুটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।—চা প্রস্তুত হইল। সাধুজী কল্যাকার অবশিষ্ট মিষ্টান্নযোগে পেরালা-দুই চা নিঃশব্দে পান করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে কহিলেন, চলুন না, গ্রামখানা একবার দেখে আসা যাক।

বাঁধটাও দূরে নয়, অমনি ছানটাও সেয়ে আসা যাবে। দিদি, আসুন না জমিদারি পরিদর্শন করে আসবেন। কোথ হর ভদ্রলোক বড় কেউ নেই—সজ্জা করবার বিশেষ আবশ্যিক হবে না। সম্পত্তিটি ভাল, সেখে লোভ হচ্ছে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, তা জানি। সন্ন্যাসীদের বড়াবই ওই।

আমাদের সঙ্গে পাঁচক ব্রাহ্মণ এবং আরও একজন চাকর আসিয়াছিল, তাহারা রক্তনের আয়োজন করিতেছিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, না রতনরাজ, অমন টাঙ্কি মাছের মুড়ো তোমাকে নিয়ে ভরসা হয় না, নেয়ে এসে রান্নটা আমিই চড়িয়ে দেব। এই বলিয়া সে আমাদের সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত রতন কোন কথাই বা কাজে যোগদান করেন নাই। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময়ে সে অত্যন্ত ধীর গম্বীরস্বরে কহিল, মা, ঐ যে বাঁধ না পুকুর কি একটা পোড়াদেশের লোকে বলে, ওতে যেন আপনি নামবেন না। ভয়ানক জৌক আছে, এক-একটা নাকি এক হাত করে।

মুহূর্তে রাজলক্ষ্মীর মুখ ভরে পাণ্ডুর হইয়া গেল—বলিস কি রতন, এদিকে কি বড় জৌক নাকি?

রতন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আছে হাঁ, তাইত ওনে এলুম।

সাধু তাড়া দিয়া উঠিলেন, আছে হাঁ, ওনে এলে বৈ কি! ব্যাটা নাগতে ভেবে ভেবে আচ্ছা যদি বার করেচে! ইহার মনের ভাব এবং জাতির পরিচয় সাধু পূর্বাঙ্কেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, দিদি, ওর কথা শুনবেন না, অসুন। জৌক আছে কি না, সে পরীক্ষা না হয় আমাদের দিয়েই হয়ে যাবে।

তাহার দিদি কিন্তু আর একপা অগ্রসর হইলেন না, জৌকের নামে একেবারে অচল হইয়া কহিলেন, আমি বলি আজ না হয় থাক আনন্দ। নতুন জায়গা, বেশ না জেনেওনো অমন দুঃসাহস করা ভাল হবে না। রতন তুই না হয় ওঠ বাবা, এইখানেই দু'ঘড়া জল কুরো থেকে তুলে দে। আমাকে আদেশ হইল—তুমি রোগমানুষ, তুমি যেন আর কোথাকার কোন জলে নেয়ে এস না। বাড়িতেই দু'ঘটি জল মাথার দিয়ে আঁজকের মত নিরস্ত হও।

সাধু হাসিয়া বলিলেন, আর আমিই কি এত অবহেলার দিদি, যে আমাকেই কেবল সেই জৌকের পুকুরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?

কথাটা বেশি কিছু না, কিন্তু এইটুকুতেই রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু যেন হঠাৎ হলহল করিয়া আসিল। সে কপকাল নীরবে রুদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে যেন অভিযুক্ত করিয়া কহিল, তুমি যে তাই মানুষের হাতের বাহিরে। যে বাপ-মায়ের কথা শোনেনি, সে কি একটা কোথাকার অজানা-অচেনা বোনেরই কথা রাখবে?

সাধু গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া সহসা একটু থামিয়া কহিলেন, এই অজানা-অচেনা কথাটি বলবেন না দিদি। আপনারদের সবাইকে চিনব বলিই ত হর ছেড়ে আসা, নইলে আমার কি দরকার ছিল বলুন ত? এই বলিয়া তিনি একটু ক্রমশেই বাহির হইয়া গেলেন, এবং আমিও নিছুনিছু তাহার সঙ্গ লইলাম।

দুইজনে এইবার বেশ করিয়া ঘুরিয়া কিরিয়া গ্রামখানিকে সেথিয়া লইলাম। গ্রামখানি ছোট এবং আমরা বাহ্যদের ছোটজাত বলি তাহাদেরই। বস্ত্রত, ঘর-দুই বারঙ্গীষী এবং এক ঘর কর্মকার ব্যতীত গলামাটিতে জলাচরণীর কেহ নাই। সমস্তই ডোম এবং বাউরিদের বাস। বাউরিরা বেতের কাজ এবং মজুরি করে এবং ডোমেরা কালারি, কুলা, চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। গ্রামের উত্তর দিকে যে জল নিকাশের বড় নালা আছে, তাহারই ওপারে পোড়ামাটি। শোনা গেল, ও-গ্রামখানা বড় এবং উহাতে অনেক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির বাস আছে। আমাদের কুলদ্বীপমণ্ডলের ব্যতীত ওই পোড়ামাটিতেই। কিন্তু পরের কথা পরে হইবে, আগন্তব্য নিজেদের গ্রামের যে অঙ্গাঙ্গী চোখে দেখা গেল তাহাতে দৃষ্টি জলে কাণা হইয়া আসিল। কোন্নীয়া ঘরগুলিকে প্রাপ্য পূজা দেওঁ করিতে কড়ি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র পৃথক বসতি বড় দিয়া হইবার মত বড় এই সেসকল বাড়িদায়ে তাহাদের ভাগে ছুটে নাই। একছোক জমিদারপা দ্বারা

কাহারও নাই, কেবলমাত্র ঢালারি চুপড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরে সংগৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। এমন করিয়াই এই অশুভি অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয়ত এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে কিন্তু কোনদিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুকুর যেমন জমিয়া গোটাকয়েক বৎসর যেমন-তেমনভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে একবিন্দু দাবিদাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের সৈন্য, ইহাদের সর্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনার কোথাও কাহারও মনে লজ্জার কণামাত্র নাই।

কিন্তু সাধু যে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন আমি জানিতাম না। তিনি হঠাৎ কহিলেন, দাদা, এই হচ্ছে দেশের সত্যিকার ছবি। কিন্তু মন খারাপ করবার দরকার নেই। আপনি ভাবছেন এসব বুদ্ধি এদের অহরহ দুঃখ দেয়, কিন্তু তা মোটেই নয়।

আমি ক্রুদ্ধ এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এটা কি-রকম কথা হ'ল সাধুজী?

সাধুজী বলিলেন, আমার মত যদি সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তাহলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটিই বলেছি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বলাই কি আমরা আর এদের রেখেছি? বহুদিনের আবিষ্কার চাপে একেবারে নিভুড়ে বার করে দিয়েছি। এর বেশি চাওয়াকে এখন নিজেরাই এরা অন্যান্য স্পর্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ-পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন! এই বলিয়া সাধু নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই হাঃ-হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিলাম না, এবং তাঁহার কথাটারও ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, জলের অভাবে হেমন্তের ধানটা প্রায় আট-আনা রকম শুকাইয়া গিয়া ইতিমধ্যেই অভাবের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। সাধু কহিলেন, দাদা, যে ছলেই হোক ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ এ বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন তা ভাবিনে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল, তাতে জমিদারি করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্কা হয়।

আমি মনে মনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম জমিদারি এবং প্রজা আমারই বটে! কিন্তু পূর্বেও যেমন জবাব দিই নাই, এবারও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। কুহু গ্রাম প্রকল্পিত করিয়া দ্বান সারিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা বারোটো বাজিয়া গেছে। ঐকল অপরাহ্নের মত আঁজও আমাদের উভয়কে বাহিতে দিয়া রাজলক্ষ্মী একপাশে বসিল। সমস্ত রাত্রা ... নিজে বাধিয়াছে, সুভরাং মাছের মুড়া ও দধির সর সাধুর পাতেই পড়িল। সাধুজী বৈরাগী মানুষ, কিন্তু সাম্প্রিক এবং অসাম্প্রিক, নিরাশ্রিত এবং আশ্রিত কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ দেখা গেল না, বরঞ্চ এরূপ উদ্ধাম অনুরাগের পরিচয় দিলেন বাহা ঘোর সাংসারিকের পক্ষেও দুর্লভ। রাত্রার ভাল-মন্দের সমঝদার ব্যক্তি বলিয়াও যেমন আমার খ্যাতি ছিল না, আমাকে বুঝাইবার দিকেও রাধুনীর কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না।

সাধুর তাড়া নাই, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে আহ্বার করিতে লাগিলেন। চর্ণ করিতে করিতে কহিলেন, দিদি, সম্পত্তিটি সত্যিই ভাল, ছেড়ে যেতে মায়ী হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছেড়ে যেতে ত তোমাকে আমরা সাধাতি ... ?

সাধু হাসিয়া কহিলেন, সন্ন্যাসী-ফকিরকে কখনো এত প্রশ্ন দেবেন না, দিদি, ঠকবেন। তা সে বাই হোক, গ্রামটি বেশ, কোথাও একখণ্ডি আশ্রয় বড় আছে—যেন কবিরের আশ্রয়।

আমাদের সহিত অস্পৃশ্য গৃহগুলির একবিন্দু দিয়া যে উৎকট সাদৃশ্য ছিল, সেই কথা মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী একটু কীপ হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল, ওনলুম সত্যিই নাকি এ গাঁয়ে কেবল ছোটজাতের বাস,—একখণ্ডি জলের প্রত্যাশাও করও কাছে নেই। বেশিদিন বেশি থাক চলেবে না।

সাধু একটু হাসিলেন, আমি কিন্তু নীরব হইয়া রহিলাম। কারণ, রাজলক্ষ্মীর মত করুণাময়ীও কোন সংস্কারের মধ্য দিয়া এতবড় লজ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারিল আমি তাহা জানিতাম। সাধুর হাসি আমাকে স্পর্শ করিল কিন্তু বিদ্ধ করিল না। তাই, কথা কহিলাম না সত্য, তথানি আমার মন ওই রাজলক্ষ্মীকেই উদ্দেশ্য করিয়া ভিতরে ভিতরে বলিতে লাগিল, লক্ষ্মী, মানুষের-কর্মই কেবল অস্পৃশ্য ও অন্তর্ভুক্ত হয়, মানুষ হয় না। না হইলে শিরারী কিছুতেই আজ আবার লক্ষ্মীর আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে পরিত না। আর সে কেবল সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, মানুষকে কেবলমাত্র মানুষের দেহ বলিয়া আমি কোনদিন ভুল করি নাই। সে পরীক্ষা আমার ছেলেবেলা হইতে কব্জার হইয়া গিয়াছে। অথচ, এ-সকল কথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিবারও জো নাই—বলিবার প্রবৃত্তিও আর আমার নাই।

উভয়ে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। রাজলক্ষ্মী আমাদের পান দিয়া বোধ করি নিজেও কিছু খাইতে গেল। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনাক্রমে পরে ফিরিয়া আসিয়া সে নিজেও যেমন সাধুজীকে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল, আমিও তেমনি বিস্মিত হইলাম। দেখি, ইতিমধ্যে কখন তিনি বাহিরে গিয়া একটি লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং ঔষধের সেই ভারী বাস্কা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিজেও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কাল এই কথাই ছিল বটে, কিন্তু আজ তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম। মনেও করি নাই, এই প্রবাসে রাজলক্ষ্মীর এত আদর-যত্ন উপেক্ষা করিয়া সাধুজী অনিশ্চয় অন্যত্রের জন্য এমন সম্ভব উন্মুখ হইয়া উঠিবেন। স্নেহের শৃঙ্খল এত সহজে কাটিবার নয়, রাজলক্ষ্মীর নিভৃত মনের মধ্যে বোধ হয় এই আশাই ছিল, সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি যাচ্ছ নাকি আনন্দ?

সাধু বলিলেন, হী দিদি, যাই। এখন না কেবলে পৌছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

সেখানে কোথায় থাকবে, কোথায় পোবে? আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই!

আগে ত গিয়ে পৌছই দিদি!

কবে ফিরবে?

সে ত এখন বলা যায় না। কাজের ভিড়ে যদি না এগিয়ে যাই ত একদিন ফিরতেও পারি।

রাজলক্ষ্মীর মূখবানি প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, তার পরে সে মাথার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন ফিরতেও পার? না, সে কিছুতেই হবে না।

কি হবে না তাহা বুঝা গেল,—তাই সাধু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি স্নান হাসিয়া কহিলেন, যাবার হেতু ত আপনাকে বলছি দিদি।

বলেচ? আচ্ছা, তবে যাও। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রায় কানিয়া ফেলিয়া সবেগে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। কলকালের নিম্নিত সাধুজী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তার পরে আমার প্রতি চাহিয়া লজ্জিতামুখে কহিলেন, আমার যাওয়া বড় দরকার।

আমি ছাড় নাড়িয়া কেবলমাত্র বলিলাম, জানি। ইহার অধিক আর কিছু বলিবার ছিল না। কারণ, আমি অনেক দেখিয়া জানিয়াছি স্নেহের গভীরতা কিছুতেই কালের বহুত্ব দিয়া মাথা যায় না; এবং এই বহুত্ব কাব্যের জন্য কবিতা কেবল শূন্য করানই করেন নাই—সংসারে ইহা বখাওই বটে। তাই, একের যাওয়ার প্রয়োজনও বতখানি সত্য, অপরের আকুল কণ্ঠের নিবেদনও ঠিক ততখানি সত্য কি না, এ লইয়া আমার মনের মধ্যে কিছু-পরিমাণও সংশয়ের উদয় হইল না। আমি অত্যন্ত সহজেই বুঝিলাম, এই লইয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত অনেক ব্যথাই ভোগ করিতে হইবে।

সাধুজী কহিলেন, আমি চলিলাম। ওদিকের কাজ যদি মেটে ত হয়ত আবার আসব, কিন্তু এখন একথা জানাবার আবশ্যক নেই।

আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাই হবে।

সাধুজী কি একটা বলিতে গিয়া ঘরের নিকে চাহিয়া হঠাৎ একটি নিশাস ফেলিয়া একটু হাসিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আশ্চর্য বেশ এই বাসলা দেশটা। এর পথে-ঘাটে মা-বোন, সাধু কি এদের এড়িয়ে যাই। এই বলিয়া তিনি আঙে আঙে বাহির হইয়া গেলেন।

কথাটা শুনিয়া আমারও দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মনে হইল, তাই বটে। দেশের সমস্ত মা-বোনের

বেদনা যাহাকে টান দিয়া বাহির করিয়াছে, তাহাকে একটি মাত্র ভগিনীর স্নেহ, দখির সর এবং মাছের মুড়ো দিয়া ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া?

পাঁচ

সাদুভূক্ত ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিরহব্যথাটা রতনের কিরণ বাজিল অকণ্য জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, সম্ভবতঃ মারাত্মক ভেমন কিছু হইবে না ; কিন্তু একজন ত সেবিলাম কাদিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি রহিলাম আমি। লোকটার সহিত পুরাপুরি চক্ষিণ ঘটাও ঘনিষ্ঠতা হইতে পায় নাই ; তথাপি আমারও মনে হইতে লাগিল, আমাদের এই অনারক সংসারের মাকখানে তিনি যেন মস্ত বড় একটা ছিন্ন করিয়া দিয়া গেলেন। এই অনিষ্টটি আপনা হইতেই সারিয়া উঠিবে কিংবা নিজেই তিনি আবার একদিন অকস্মাৎ তাঁহার প্রচণ্ড ঔষধের বাস্তব ঘাড় করিয়া ইহা মেরামত করিতে সশরীরে কিরিয়া আসিবেন, বিদায়কালে কিছুই বলিয়া গেলেন না। অথচ আমার নিজের খুব যে বেশি উদ্বেগ ছিল তাও নয়। নানা কারণে এবং বিশেষ করিয়া কিছুকাল হইতে জ্বরে ভুগিয়া দেহ ও মনের এমনই একটা নিস্তেজ নিরালঙ্কার ডাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র রাজলক্ষ্মীর হাতেই সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় ভাল-মন্দ লায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছিলাম। সুতরাং কিছুর জন্যই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার আমার আবশ্যকও ছিল না, শক্তিও ছিল না। তবুও মানুষের মনের চঞ্চলতার যেন বিরাম নাই। বাহিরের ঘরে একটা ভাকিয়া ঠেস দিয়া একাকী বসিয়া আছি, কণ্ড কি যে এলোমেলো ভাবনা আনাগোনা করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই, সম্মুখের প্রাঙ্গণতলে আলোর দীপ্তি ধীরে ধীরে স্নান হইয়া আসন্ন রাত্রির ইঙ্গিতে অনমনস্ক মনটাকে মাঝে মাঝে এক একটা চমক দিয়া যাইতেছে, মনে হইতেছে এ-কীবনে যত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে তাহাদের সহিত আভিকার এই অনাগত নিশার অপরিজ্ঞাত, মূর্তি যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব নারীর অবগুষ্ঠিতা মুখের মত রহস্যময়। অথচ, এই অপরিচিততার কেমন প্রকৃতি কেমন প্রথা কিছুই না জানিয়া একেবারে ইহার শেষ পর্যন্ত পৌছিতেই হইবে, মধ্যপথে আর ইহার কোন বিচারই চলিবে না। আবার পরকণ্ঠেই যেন অকস্ম চিন্তার সমস্ত শৃঙ্খলই এক নিমিষে ভাঙ্গিয়া বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে। এমনি যখন মনের অবস্থা, সেই সময়ে পাশের ঘারটা খুলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। তাহার চোখ দুটো সামান্য একটু রাঙ্গা, একটু যেন ফুলা-ফুলা। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কহিলাম, আশ্চর্য কি ! যে ডার, যে শ্রান্তি তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ, আর কেউ হলে ত ভেঙ্গেই পড়ত, আর আমি হলে ত দিনরাতের মধ্যে চোখ খুলতেই পারতুম না, কুন্তকর্ণে নিদ্রা দিতুম।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, কিন্তু কুন্তকর্ণের ম্যালেরিয়া ছিল না। যাই হোক তুমি ত দিনের বেলায় ঘুমোও নি ?

বলিলাম, না, কিন্তু এখন ঘুম পাড়ে, হয়ত একটু ঘুমোব। কারণ, কুন্তকর্ণের যে ম্যালেরিয়া ছিল না এমন কথাও বাস্তবিকি মুনি কোথাও লিখে যাননি।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, ঘুমোবে এই আবেলায় ! রকম কর তুমি, জ্বর কি তা হলে আর কোথাও থাকি থাকবে ? সে সব হবে না—আজ্ঞা, যাবার সময় অনন্দ কি আর কিছু তোমাকে বলে গেল ?

প্রশ্ন করিলাম, কি রকম কথা তুমি জ্ঞাপা কর ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, এই যেমন কোথায় কোথায় যাবে : কিংবা—

এই কিংবাটিই আসল প্রশ্ন। কহিলাম, কোথায় কোথায় যাবেন তাও একপ্রকার আভাস দিয়ে গেছেন, কিন্তু এই কিংবাটার সম্বন্ধে কিছুই বলে যাননি। আমি ত তাঁর কীরে আসার বিশেষ কোন সন্ধাননা দেখি।

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু আমি কৌতুহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ্ঞা এই লোকটিকে কি তুমি বাস্তবিক চিনেচ ? আমাকে যেমন একদিন চিনতে পেরেছিলে ?

সে আমার মুখের পানে কলকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, না।

কহিলাম, সত্যি বল, কখনো কোনদিন কি দেখনি?

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তোমার কাছে আমি সত্যি করতে পারব না। অনেক সময় আমার বড় ভুল হয়। তখন অপরিচিত লোককেই মনে হয় কোথায় যেন তাকে দেখেছি, তার মুখ যেন আমার অভ্যস্ত চেনা, কেবল কোথায় দেখেছি সেইটিই মনে করতে পারিনে। আনন্দকেও হয়ত কখনো দেখে থাকব।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আত্মে আত্মে বলিল, আজ আনন্দ চলে গেল বটে, কিন্তু যদি সে কখনো ফিরে আসে ত তার বাপ-মায়ের কাছে আবার একদিন তাকে ফিরিয়ে দেব এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

আমি বলিলাম, তাতে তোমার গরজ কি?

সে কহিল, অমন ছেলে চিরদিন ভেসে বেড়াবে একথা ভাবলেও যেন আমার বুকে শূল বেঁধে। আচ্ছা, তুমি নিজেও ত সংসার ছেড়েছিলে—সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে কি সত্যিকার আনন্দ কিছু আছে? কহিলাম, আমি সত্যিকার সন্ন্যাসী হইনি, তাই ওর ভেতরকার সত্যি খবরটি তোমাকে দিতে পারব না। যদি কোনদিন সে ফিরে আসে ও সংবাদ তাকেই জিজ্ঞাসা করো।

রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, বাড়িতে থেকে কি ধর্মলাভ হয় না? সংসার না ছাড়লে কি ভগবান পাওয়া যায় না?

প্রশ্ন শুনিয়া আমি করজোড়ে বলিলাম, এর কোনটার জন্যে আমি ব্যাকুল নই লক্ষ্মী, এ সব ঘোরতর প্রশ্ন আমাকে তুমি করো না, আবার আমার ছুর আসতে পারে।

রাজলক্ষ্মী হাসিল, তারপর করুণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু মনে মনে সংসারে আনন্দের ত সমস্তই আছে, তবু সে ধর্মের জন্য এই বয়সেই সব ছেড়ে দিয়ে এসেছে; কিন্তু তুমি ও তা পারনি? বলিলাম, না, এবং ভবিষ্যতেও পারব মনে হয় না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন মনে হয় না?

কহিলাম, তার প্রধান কারণ যাকে ছাড়তে হবে সেই সংসারটা যে আমার কোথায় এবং কি প্রকার তা আমার জানা নেই, এবং যার জন্যে ছাড়তে হবে সেই পরমাত্মার প্রতি আমার লেশমাত্র লোভ নেই। এতদিন তাঁর অভাবই কেটে গেছে এবং বাকি ষ'টা দিনও অচল হয়ে থাকবে না এই আমার ভরসা। অন্যপক্ষে তোমার ঐ আনন্দভায়াটিও গুরুত্ব সত্ত্বেও যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্যেই বেরিয়ে এসেছেন আমার তা বিশ্বাস নয়। তার কারণ, আমিও বার-কয়েক সাধু-সঙ্গ করেছি, তাঁদের কেউই অজ্ঞও ওষুধের বাস্ত্ব ঘাড়ে করে বেড়ানকে ভগবৎলাভের উপায় নির্দেশ করে দেননি। তা ছাড়া তাঁর বাওয়া-মাওয়ার ব্যাপারটা ত চোখে দেখলে।

রাজলক্ষ্মী মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তবে কি সে মিছামিছিই ঘরসংসার ছেড়ে এই কষ্ট করতে বার হয়েছে? সবাই কি তোমার মতই মনে কর?

বলিলাম, না, মস্ত প্রভেদ আছে। সে ভগবানের সন্ধানে বার না হলেও মনে হয়, বার জন্যে পথে বেরিয়েছে সে তাঁরই কাছাকাছি, অর্থাৎ আপনায় দেশ। তাই তার ঘরবাড়ি ছেড়ে আসাটা ঠিক সংসার ছেড়ে আসা নয়—সাধুজী কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটি সংসার ছেড়ে বড় সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারিল না, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, যাবার সময় সে কি তোমাকে কিছু বলে গেল?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না, তেমন কিছু নয়।

কেন যে একটুখানি সত্য গোপন করিলাম তাহা নিজেও জানি না। কিন্তু বিদায়কালে সাধুজীর শেষ কথাটি তখন পর্বত আমার কানে তেমনি বাজিতেছিল। যাবার সময় সেই যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, বিভিন্ন দেশ এই বাঙ্গলা দেশটা। এর পথে-বাটে মা-বোন—সাধ্য কি তাদের ঈর্ষা দ্বিগুণে বাই।

দানমুখে রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, আমারও মনের মধ্যে অনেক দিনের অনেক ভুলে-যাওয়া ঘটনা ধীরে ধীরে উকি মারিয়া বাহিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম, তাই বটে। তাই

বটে! সাধুজী, তুমি যেই হও, এই অল্প বয়সেই আমার এই কাঙাল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ। না হইলে ইহার যথার্থ রূপটির খবর আজ এমন সহজেই এই কয়টি কথায় দিতে পারিতে না। জানি, অনেক দিনের অনেক ক্রটি অনেক বিচ্যুতি আমার মাতৃভূমির সর্বত্র ব্যাপিয়া পঙ্ক লেপিয়াছে, তবুও, এ সত্য যাচাই করিবার যাহার সুযোগ মিলিয়াছে, সেই জানে ইহা কত বড় সত্য!

এইভাবে নীরবে মিনিট দশ-পনের কাটিয়া গেলো রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, এই-উদ্দেশ্যই যদি তার মনে থাকে, একদিন আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে আমি বলে দিচ্ছি। এদেশে নিছক পরের ভাল করতে যাওয়ার যে দুর্গতি হয়তো সে আজও জানে না। এর বাদ কতক আমি জানি। আমরাই মত একদিন যখন সংশয়ে, বাধায়, কষ্ট কথায় তার সমস্ত মন তিস্তরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন সে পালিয়ে আসার পথ পাবে না।

আমি সায় দিয়া কহিলাম, অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এসব দুঃখের কথা যেন সে বেশ জানে। রাজলক্ষ্মী বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, ক'খনো না, ক'খনো না। জানলে সে পথে কেউ যাবে না আমি বলছি।

একথার আর জবাব ছিল না। বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, একদিন ইহার অনেক সাধু সন্তান, অনেক পুণ্যকর্ম, তাহার খণ্ডরবাড়ির দেশে অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিল। সেই নিষ্ঠার পরোপকারের ব্যথা অনেকদিন ইহার মনে লাগিয়াছিল। যদিচ, আরও একটা দিক দেখিবার ছিল, কিন্তু সেই অবলুপ্ত বেদনার স্থানটা চিহ্নিত করিয়া তুলিতেও আর প্রবৃত্তি হইল না, তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ রাজলক্ষ্মী যাহা বলিতেছিল তাহা মিথ্যা নয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হয়? কেন একের ওভল্টেই অপরে এমন সম্বোধের চক্ষে দেখে? কেন এগুলি বিফল করিয়া দিয়া মানুষ সংসারের দুঃখের ভার লঘু করিতে দেয় না? মনে হইল সাধুজী যদি থাকিতেন, কিংবা যদি কখনো ফিরিয়া আসেন, এই জটিল সমস্যার সীমাংসার ভার তাঁকেই দিব।

সেদিন সকাল হইতে নিকটেই কোথা হইতে মাঝে মাঝে সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, এই সময়ে জনকয়েক লোক রতনকে অগ্রবর্তী করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। রতন সম্মুখে আসিয়া কহিল, মা, এরা আপনাকে রাজবরণ দিতে এসেছে—এসো না হে, দিয়ে যাও না। বলিয়া সে একজন ব্রৌট গোছের লোককে ইঙ্গিত করিল। লোকটির পরিধানে হরিদ্রারঙে ছোপান একটি কাপড়, গলায় নূতন কাঠের মালা। অত্যন্ত সজ্জার সহিত অগ্রসর হইয়া আসিয়া বারান্দার নীচে হইতেই নূতন শালপাতায় একটি ঢাকা ও একটি সুপারি রাজলক্ষ্মীর পদতল্লর উদ্দেশে রাখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রশাম করিল এবং কহিল, মাঠাকরুন, আজ আমার ঘরের বিয়ে।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং পুলকিতচিত্তে কহিল, মেয়ের বিয়েতে এ বৃদ্ধি দিতে হয়!

রতন কহিল, না মা, তা নয়, যার যেমন সাধা সে তেমন ভবিদারকে দেয়, এরা ছোটজাত ডোম, এর বেশী আর কোথায় কি পাবে বলুন, এই কত কষ্টে—

কিন্তু নিবেদন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ঢাকাটা ডোমের গুনিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, তবে থাক থাক এ-ও দিতে হবে না—তোমরা এমনিই মেয়ের বিয়ে দাও গে—

এই প্রত্য্যাহানে কন্মায় পিতা এবং ততোধিক রতন নিজে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠিল; সে নানা প্রকারে বুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, এই রাজবরণের সংস্কার গ্রহণ না করিলে কোনমতেই চলিবে না। রাজলক্ষ্মী কেন যে ঐ সুপারিওক্ত ঢাকাটা লইতে কিছুতেই চাহে না, ঘরের ভিতরে বসিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম এবং রতনই বা কি জন্য সনির্বিক অনুরোধ করিতেছিল তাহাও আমার অবিন্দিত ছিল না। খুব সম্ভব দেয় ঢাকাটা আরও বেশী, এবং গোমস্তা কুশারীমহাশয়ের হাত হইতে নিজের পাইবার জন্যই ইহারা এই কৌশল করিয়াছে; এবং রতন 'জুজুর' ইত্যাদি সম্ভাবণের পরিবর্তে তাহাদের মুখপাত্র হইয়া আর্জি পেশ করিতে আসিয়াছে। সে যে বহুশ্রী আশ্বাস দিয়াই আনিয়াছে, তাহাও সন্দেহমাত্র নাই। তাহার এই সঙ্কট অবশেষে আমিই মোচন করিলাম। উঠিয়া আসিয়া ঢাকাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, আমি নিলাম, তোমরা বাড়ি গিয়ে বিয়ের উদ্যোগ করো গে।

রতনের মুখ গর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং রাজলক্ষ্মী অস্পৃশ্যের প্রতিগ্রহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হাঁক ফেলিয়া বাঁচিল। খুশি হইয়া কহিল, এ ভালই হল যে, বীর মান্য তিনি বহুতে নিলেন, এই বলিয়া সে হাসিল।

মধু ভোম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, ঘব্বুর পহর রেতের মধ্যেই লগন, একবার যদি পারের ধুলো সেন। এই বলিয়া সে একবার আমার ও একবার রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি করুণ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি সম্মত হইলাম, রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু হাসিয়া সানাইয়ের শব্দটা আন্দাজ করিয়া বলিল, ওই বুঝি তোমার বাড়ি মধু? আচ্ছা যদি সময় পাই ত আমিও গিয়ে একবার দেখে আসব। রতনের প্রতি চাহিয়া কহিল, বড় তোরঙ্গটা খুলে দেখ ত রে, আমার নতুন শাড়িগুলো আনা হয়েছে কি না। যা মেয়েটিকে একখানা দিয়ে আর। মিষ্টি বুঝি এসেছে কিছু পাওয়া যায় না? বাতাসা মেলে? আচ্ছা, তাই বেশ। অমনি তাও কিছু কিনে দিয়ে আসিস রতন। হাঁ মধু তোমার মেয়ের বয়স কত? পাঙ্করের বাড়ি কোথায়? লোক কতগুলি থাকে? এ গাঁয়ে ক'ঘর তোমরা আছে?

জমিদারগৃহিণীর একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে মধু সসন্ত্রমে এবং সন্কিয়ে যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল তাহার কন্যার বয়স বছর-নয়েকের মধ্যেই, পাত্র যুবা-পুরুষ—খ্রিশ-চন্নিশের বেশি হইবে না—বাড়ি ক্রোশ-পাঁচেক উত্তরে কি একটা গ্রামে—সে একটা তাহাদের বড় সমাজ, সেখানে জাতীয় ব্যবসা কেহ করে না—সকলেরই চাষ-বাস পেশা—মেয়ে বেশ সুখেই থাকিবে, তবে ভয় শুধু এই রুট্রিটার জন্য। কারণ বরযাত্রীর সংখ্যা কত হইবে এবং তাহারা কোথায় কি ফ্যাসাদ বাধাইয়া দিবে, তাহা আজ প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত কোনমতেই অনুমান করিবার জো নাই। তাহারা সকলেই সমৃদ্ধ ব্যক্তি; কি করিয়া যে মান-মর্যাদা বজায় রাখিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন হইবে এই ভয়েই মধু কাঁটা হইয়া আছে। এই সকল সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সে পরিণেবে সকাহরে জানাইল যে, তাহার চিড়া গুড় এবং দধি সংগ্রহ হইয়াছে, এমন কি শেষকালে খান-মুই করিয়া বড় বাতাসাও পাতে দিতে পারিবে; কিন্তু তথাপি যদি কোন গোলযোগ হয় ত তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী সর্কৌতুকে ভরসা দিয়া কহিল, গোলযোগ কিছু হবে না মধু, তোমার মেয়ের বিয়ে নির্বিঘ্নে হবে, আমি আশীর্বাদ করচি! খাবার জিনিস এত জোগাড় করেচ, তোমার বেয়াইয়ের দল খেয়ে খুশি হয়ে বাড়ি যাবে।

মধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সঙ্গের লোক দুইটিকে লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আশীর্বাদের উপর বরাত দিয়া সে বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করিল না; আত্ম রাত্রির জন্য কন্যার পিতার মনের মধ্যে যথেষ্ট উষ্মগ জাগিয়া রহিল।

শুভকর্মে পারের ধূলা দিব বলিয়া মধুকে আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু সত্যসত্যই যাইতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা বোধ করি আমাদের কাহারও মনে ছিল না। সন্ধ্যার কিছু পরে প্রদীপের সন্মুখে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার আয়-ব্যয়ের একটা খসড়া পড়িয়া শুনাহিভেছিল আমি বিছানায় শুইয়া মুগ্ধিত নৈমিত্তিক বা শুনিভেছিলাম, কতক বা শুনিভেছিলাম না, কিন্তু অদূরে বিবাহ বাটীর কলরোল কিছুকাল হইতে যেন কিঞ্চিৎ অসাধারণ রকমের প্রখর হইয়া কানে বাজিতেছিল। সহসা রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া সহাস্যে কহিল, ডোমের বাড়ির বিয়ে, মারামারি এর একটা অঙ্গ নয় ত?

বলিলাম, উচ্ছ্বাসের নকল যদি করে থাকেত বিচিত্র নয়। সে-সব কথা তোমার মনে আছে ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ। তারপর ক্ষণকাল কান খাড়া করিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাস্তবিক, ও পোড়ামেলে বা ক'রে আমরা মেয়েদের বিলিয়ে দিই, তাতে ইতর-ভ্রত সবাই সমান। ওরা চলে গেলে আমি খোঁজ দিয়ে ওনলম ওই যে কাল সকালে এ ন'বছরের মেয়েটাকে কোন অপরিচিত সংসারে টেনে নিয়ে যাবে, আর কখনও হয়ত আসতে পর্যন্ত দেবে না। এদের নিরমই এই। কপ হ'লটা টাকার মেয়েটাকে অঙ্গ বিক্রি করে দেবে। 'একবার পাঠিয়ে দাও' এ কথা মুখে আনবারও জো থাকবে না। আচ্ছা! মেয়েটা সেখানে কতই না কাঁদবে—বিয়ের সে কি জানে বল?

এ সকল দুঃখিনী ত অজ্ঞকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, একরকম সহিয়াও পিয়াছে, আর ফেলত

প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষের কেবল মৌন ইহয়াই রহিলাম।

জবাব না পাইয়া সে কহিল, আমাদের দেশে ছোট-বড় সব জাতের মধ্যেই বিয়েটা কেবল বিয়েই নয়—এটা ধর্ম, তাই যা, নইলে—

ভাবিলাম বলি, একে যদি ধর্ম বলিয়াই বুঝিয়াছ ত এত নালিশ কিসের? আর যে ধর্ম-কর্মের মন প্রসন্ন না ইহয়া মানির ভায়ে অন্তর কালো ইহয়া উঠিতে থাকে তাহাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করাই যায় বা কিরাপে?

কিন্তু আমার বলিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী নিজেই পুনশ্চ কহিল, কিন্তু এসব বিধিব্যবস্থা করে গেছেন যারা তাঁরা ছিলেন ত্রিকালদশী স্ববি; শাস্ত্রবাক্য মিথ্যাও নয়, অমঙ্গলেরও নয়, আমরা কি-ই বা জানি, আর কতটুকুই বা বুঝি!

ব্যস! বাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না। এ-সংসারে বাহা কিছু ভাবিবার বস্তু ছিল, সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ স্ববির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের জন্য বহুপূর্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ায় নতুন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই। একথা রাজলক্ষ্মীর মুখে এই নতুন গুনিলাম না, আরও অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি এবং বরাবরই চুপ করিয়া গিয়াছি। আমি জানি ইহার জবাব দিতে গেলেই আলোচনাটা প্রথমে উচ্চ এবং পরক্ষণেই ব্যক্তিগত কলহে নিরতিশয় তিক্ত ইহয়া উঠে। ত্রিকালদশীদের আমি তাচ্ছিল্য করিতেছি না, রাজলক্ষ্মীর মত আমিও তাঁহাদের অতিশয় ভক্তি করি; শুধু এই কথাটাই ভাবি, তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেন্দ্রস্থ আমাদের এই ইংরেজি-আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয়ত সত্যসত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথাগুলো যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কেমন কবিতা পাঠিত জানি না, কিন্তু এখন এই অস্পষ্ট মীপালোকে আমার মুখের চেহারারটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, তবুও যেন আমার নিভৃত চিন্তার ঠিক ছায়াপ্রভেই আচ্ছাদিত করিল। কহিল, তুমি ভাবচ এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি—ভবিষ্যতের বিধিব্যবস্থা কেউ পূর্বাঙ্কেই নির্দেশ করে দিতে পারে না। কিন্তু আমি বলচি, পারে। আমাদের গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিচি, এ কাজ তাঁরা না পারলে সজীব মন্ত্রগুলোকেও কখনো দেখতে পেতেন না। বলি, এটা ত মানো, আমাদের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলির প্রাণ আছে? তারা জীবন্ত?

বলিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি না মানতে পার, কিন্তু তবুও এ সত্য। তা নইলে আমাদের দেশের এই পুতুল-খেলার বিয়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ-বন্ধন হতে পারত না। এ সমস্তই ত ওই সজীব মন্ত্রের জোরে! সেই স্ববিরের কৃপায়! অবশ্য, অনাচার আর পাপ কোথায় নেই, সে সর্বত্রই আছে। কিন্তু আমাদের এ দেশের মত সতীত্বই কি তুমি আর কোথাও দেখাতে পারো? বলিলাম, না। কারণ, এ তাহার বৃত্তি নয়—কিধাস।

ইতিহাসের প্রসঙ্গ হইলে তাহাকে দেখাইতে পারিতাম, এই পৃথিবীতে সজীব মন্ত্রহীন আরও দেশ আছে যেখান সতীত্বের আদর্শ আজও এমনই উচ্চ। অন্তর্যার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারিতাম, এই যদি, তবে তোমাদের জীবন্ত মন্ত্র নর-নারী উভয়কেই এক আদর্শে ঐক্যে পাবে না কেন? কিন্তু এ সকলের প্রয়োজন ছিল না। আমি জানিতাম তাহার চিত্তের ধারাটা কিছুদিন হইতেই কোন দিক দিয়া বহিতেছে।

দৃষ্টিভির বেদনা সে ভাল করিয়াই জানে। যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে কম্পবিশিত না করিয়া কেমন করিয়া যে সে এ-জীবন লাভ করিবে তাহার কিছুই সে ভাবিয়া পায় না। তাহার দুর্বল হৃদয় ও প্রবৃত্ত ধর্মবৃত্তি—এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন বন্দনে সম্মিলিত হইয়া এই দুইয়ের জীবনে তাহার তীর্থের মত সুশবির ইহয়া উঠিবে সে তাহার কোন কিনারাই দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি পাই। নিজেই নিঃশেষে দান করিয়া পর্বত অপরের গোপন

আক্ষেপ প্রতিনিয়তই আমার চোখে পড়ে। বেশ স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু ভবু যেন দেখিতে পাই তাহার যে দুর্মদ কামনা এতদিন অভূতগ্রহ নেশার মত সমস্ত মনটাকে উতলা-উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যেন আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার প্রাপ্তিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে। এই হিসাবের অঙ্কগুলায় কি আছে জানিনা, কিন্তু খুন্সী ছাড়া যদি আর কিছুই আজ আর সে না দেখিতে পায় ত, কেমন করিয়া কোথায় গিয়া যে আবার আমি নিজের এই শতছিন্ন জীবন-জালের গ্রহি বীথিতে বসিবে এ চিন্তা আমার মধ্যে বহুবার আনাগোনা করিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া কিছুই পাই নাই, কেবল এই কথাটাই নিশ্চয় জানিয়া আছি যে, চিরদিন যে পথে চলিয়াছি, প্রয়োজন হয় ত আবার সেই পথেই যাত্রা শুরু করিব। নিজের সুখ ও সুবিধা লইয়াই কাহারও সমস্যা জটিল করিয়া তুলিব না।

কিন্তু পরামর্শার্চ্য এই যে, যে-মন্ত্রের সজীবতার আলোচনায় আমাদের মধ্যে একমুহূর্তে বিপ্লব বহিয়া গেল, তাহার প্রসঙ্গ লইয়া পাশের বাড়িতেই যে তখন মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল, এ সংবাদ দু'জনের কেহই জানিতাম না।

অকস্মাৎ পাঁচ-সাতজন গোটা-দুই আলো লইয়া অত্যন্ত সোরগোল করিয়া একেবারে প্রাক্‌শের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিল হজুর! বাবুশায়!

আমি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম, রাজলক্ষ্মীও সবিনয়ে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নালিশটা তাহার সর্ব্বলোই একসঙ্গে এবং সমস্তের করিতে চায়। রতনের পুনঃপুনঃ বকুনি সন্তোষ শেষপর্যন্ত কেহই চূপ করিতে পারিল না। যাহা হউক, ব্যাপারটা বুঝা গেল। কন্যাসম্প্রদান বন্ধ হইয়া আছে, কারণ মন্ত্র ভুল হইতেছে বলিয়া বরপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতের ফুল-জল প্রভৃতি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং তাহার মুখ চপিয়া ধরিয়াছে। বাস্তবিক, এ কি অত্যাচার! পুরোহিত সম্প্রদায় অনেক কীর্তিই করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া জোর করিয়া আর একজন সম-ব্যবসায়ীর ফুল-জল প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া, এবং শারীরিক বলপ্রয়োগে তাহার মুখ চপিয়া স্বাধীন ও সজীব মস্তোচ্চারণে বাধা দেওয়া—এমন অত্যাচার ত কখনও শুনি নাই।

রাজলক্ষ্মী কি যে বলিব হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না; কিন্তু রতন ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া মন্ত একটা ধমক দিয়া কহিল, তোদের আবার পুরুত কি রে? এখানে, অর্থাৎ জমিদারিতে আসিয়া পর্যন্ত সে 'তুমি' বলিবার যোগ্য কাহাকেও পায় নাই, কহিল, ডোম-ডোকালির আবার বিয়ে, তাদের আবার পুরুত; এ কি আমাদের বায়ুন-কায়েত-নবশাক পেয়েচিস যে বিয়ে দিতে আসবে বায়ুনঠাকুর? এই বলিয়া সে বারবার আমার ও রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি সগর্বে চাহিতে লাগিল। এখানে মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে রতন জড়িতে নাপিত।

মধু ডোম নিজে আসিতে পারে নাই, কন্যা-সম্প্রদানে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি বাহ্য বলিতে লাগিল তাহাতে যদিচ বুঝা গেল ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরা নিজেদের পুরোহিত, তথাপি রাখাল পণ্ডিত তাহাদের ব্রাহ্মণেরই সামিল। কারণ, তাহার গলায় পৈতা আছে এবং সে তাহাদের দশকর্ম করায়। এমন কি, সে তাহাদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত খায় না। সুতরাং এত বড় সাহসিকতার পরেও আর প্রতিবাদ চলে না। অতএব, আসল ও বাঁটি ব্রাহ্মণের সহিত অন্তঃপর যদি কোন প্রভেদ থাকে ত সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

যে বাহ্য হউক, ইহাদের ব্যাকুলতায় ও অদূরে বিবাহ-বাটীর প্রবল চীৎকারশব্দে আমাকে যাইতে হইল। রাজলক্ষ্মীকে কহিলাম, তুমিও চল না, বাড়িতে একলা কি করবে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে মাথা নাড়িল, কিন্তু শেষে কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না। চল, বলিয়া আমার সঙ্গে লইল। আসিয়া দেখিলাম মধুর সম্বন্ধী অত্যাশ্চর্য্য করে নাই। বিবাদ তুমুল হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। একদিকে বরপক্ষীয় প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন দুর্বল ও ক্ষীণজীবী রাখাল পণ্ডিতের হাত চপিয়া ধরিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

আমরা সসন্মানে একটা মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করিয়া শিবু পণ্ডিতকে এই অন্তর্কিত আক্রমণের হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, হজুর, মন্ত্রের 'ম' জানে না এই বাটা, আবার নিজেকে বলে পণ্ডিত। বিবাহটাই আজ ভেঙে পড়িল।

ৰাখাল মুখ ভ্যাঙাইয়া প্ৰতিবাদ কৰিয়া বলিল, হাঁ দিত। পাঁচখানা গাঁৱে ছন্দ, বিয়ে নিতি দিছি, আৰু আমি জানিনে মন্তৱ।

মনে ভাবিলাম, এখানেও সেই মন্তৱ! কিন্তু বাটতে ৰাজলক্ষ্মীৰ কাছে না হয় মৌন থাকিয়াই তৰ্কের জবাব দিয়াছি, কিন্তু এখানে যদি যথার্থই মধ্যস্থতা কৰিতে হয় ত বিপদে পড়িতে হইবে। অবশেষে বহু বাধবিত্ত্যায় স্থির হইল যে, ৰাখালই মন্তৱ পাঠ কৰাইবে, কিন্তু ভুল যদি কোথাও হয় ত শিবুকে আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। ৰাখাল ৰাজী হইয়া পুৰোহিতের আসন গ্ৰহণ কৰিল এবং কন্যার পিতার হাতে কয়েকটা ফুল এবং বর-কন্যার দুই হাত একত্ৰ কৰিয়া দিয়া যে বৈদিক মন্ত্ৰপাঠ কৰিল তাহা আমার আজ্ঞাও মনে আছে। এগুলি সজীব কি না জানি না, এবং মন্ত্ৰ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ হয়, বেদে ঠিক এই কথাগুলিই স্বৰিণী সৃষ্টি কৰিয়া যান নাই।

ৰাখাল পণ্ডিত বরকে বলিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

বর আবৃত্তি কৰিল, মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ।

ৰাখাল কন্যাকে বলিলেন, বল, ভগবতী ডোমায় পুত্ৰায় নমঃ।

বালিকা কন্যার উচ্চারণে পাছে ক্ৰটি হয় এইজন্য মধু তাহার হইয়া উচ্চারণ কৰিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শিবু পণ্ডিত দু হাত তুলিয়া বহুগৰ্জনে সকলকে চমকিত কৰিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্ত্ৰই নয়। বিয়েই হ'ল না।

পিছনে একটা টান পাইয়া ফিৰিয়া দেখি ৰাজলক্ষ্মী মুখের মধ্যে আঁচল ওজিয়া প্ৰাণপণে হাসি চাপিবার চেষ্টা কৰিতেছে, এবং উপস্থিত সমস্ত লোকই একান্ত উদ্গ্ৰীব হইয়া উঠিয়াছে। ৰাখাল পণ্ডিত লজ্জিতমুখে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কথা কেই কানেই লইল না; সকলেই সম্বন্ধে শিবুকে অনুময় কৰিতে লাগিল, পণ্ডিতমশাই মন্ত্ৰৱটি আপনিই বলিয়ে দিন, নইলে এ বিয়েই হবে না—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সিকি দক্ষিণে ঠেকে দিয়ে আপনিই বারো আনা নেনবেন পণ্ডিতমশাই।

শিবু পণ্ডিত তখন শুদাৰ্ঘ দেখাইয়া কহিলেন, বাখালেন দোষ নেই, আসল মন্ত্ৰৰ আমি ছাড়া এ-অঞ্চলে আর কেউ জানেই না। বেশি দক্ষিণে আমি চাইনে; আমি এইখান থেকেই মন্ত্ৰপাঠ করচি, বাখাল ওদের পড়াক। এই বলিয়া সেই শাস্ত্ৰজ্ঞ পুৰোহিত মন্ত্ৰোচ্চারণ কৰিতে লাগিলেন এবং পৰাজিত ৰাখাল নিৰ্ৱাহ 'ভালমানুষটির মত বরকন্যাকে আবৃত্তি কৰাইতে লাগিল। শিবু কহিলেন, বল, মধু ডোমায় কন্যায় ভূজাপত্ৰং নমঃ।

বর আবৃত্তি কৰিল, মধু ডোমায় কন্যায় ভূজাপত্ৰং নমঃ।

শিবু কহিলেন, মধু, এবাৰ তুমি বল, ভগবতী ডোমায় পুত্ৰায় সম্প্ৰদানং নমঃ।

সকল্য মধু ইহাই আবৃত্তি কৰিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শাস্ত্ৰজ্ঞ বাস্তি ইতিপূৰ্বে এ অঞ্চলে পদাৰ্পণ করে নাই।

শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিলেন, বিপিন, তুমি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্ৰদানং স্বাহা।

বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে বহু সময়ে এই মন্ত্ৰ উচ্চারণ কৰিল।

শিবু কহিলেন, বর-কন্যা দু'জনেই বল, যুগল মিলনং নমঃ।

বর এবং কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি কৰিল। ইহাৰ পৰে বিৰাট হৰিধ্বনিবাহকৰে বর-কন্যাকে বাটীৰ মধ্যে বহন কৰিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমার চতুৰ্দ্দিশৰ্বে একটা ওজনৰোল উঠিল—সকলেই একবাক্যে স্বীকাৰ কৰিতে লাগিল যে, হাঁ, একজন শাস্ত্ৰজ্ঞ-জানা লোক বটে! মন্ত্ৰৰ পড়ালে বটে! ৰাখাল পণ্ডিত এতকাল আমাৰে কেবল ঠকিয়েই থাকিল।

সমস্তকণ আমি গাভীৰ হইয়াই হিলাম এবং শেষ পর্যন্ত এই অসীম গাভীৰ বজায় ৰাখিয়াই ৰাজলক্ষ্মীৰ হাত ধৰিয়া বাটা ফিৰিয়া আসিলাম। ওখানে কি কৰিয়া যে সে আপনাকে সংবরণ কৰিয়া বসিয়াছিল আমি জানি না, কিন্তু ঘরে আসিয়া হাসিৰ প্ৰবাহে তাহার খেঁচ দম বন্ধ হইবার জো হইল। বিহ্বলনয় লুকাইয়া পড়িয়া সে কেবলই বলিতে লাগিল, হাঁ, একজন মহামহোপাধ্যায় বটে! ৰাখাল এখনি এদের কেবল ঠকিয়েই থাকিল।

প্রথমটা আমিও হাসি রাবিত্তে পারিলাম না ; তাহার পরে কহিলাম, মহামহোপাধ্যায় দু'জনেই। অথচ, এমনি করেই ত এতকাল এদের মেয়ের মা এবং মেয়ের ঠাকুরমার বিয়ে হয়েছে। রাখালের যাই হোক, শিবু পণ্ডিতের মন্তব্যলোও ঠিক ঋষিক্রবাচ বলে মন হ'ল না, কিন্তু তবু ত এদের কোন মন্তাই বিফল হয়নি। এদের দেওয়া বিবাহ-বন্ধন ত আজও তেমনি দৃঢ় তেমনি অটুট আছে।

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং একদৃষ্টে চূপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল।

ছয়

সকালে উঠিয়া গুনিলাম কুশারীমহাশয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি একা নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, না, আমিও আছি।

যাবে?

যাব বৈ কি।

তাহার এই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খাওয়া বস্তুটা যে হিন্দু ধর্মের কি, এবং সমাজের কতখানি ইহার উপর নির্ভর করে, রাজলক্ষ্মী তাহা জানে—এবং কত বড় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে মানিয়া চলে আমিও তাহা জানি, অথচ এই তাহার জবাব। কুশারীমহাশয় সম্বন্ধে বেশি-কিছু জানি না, তবে বাহির হইতে তাহাকে যতটা দেখা গিয়াছে, মনে হইয়াছে তিনি আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ; এবং ইহাও নিশ্চিত যে, রাজলক্ষ্মীর ইতিহাস তিনি অবগত নহেন, কেবল মনিন বলিয়াই আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে আজ সেখানে গিয়া, কি করিয়া কি করিবে আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ, আমার প্রমটা বুদ্ধিয়াও সে যখন কিছুই কহিল না, তখন ইহারই নিহিত-কুঠা আমাকেও নির্বাক করিয়া রাখিল।

যথাসময়ে গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া।

কহিলাম, যাবে না?

সে কহিল, যাবার জন্যেই ত দাঁড়িয়ে আছি। এই বলিয়া সে গাড়ির ভিতরে গিয়া বসিল।

রতন সঙ্গে বাহিবে, সে আমার পিছনে ছিল। ঠাকুরানীর সাজসজ্জা দেখিয়া সে যে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমিও আশ্চর্য হইয়াছিলাম ; কিন্তু সেও যেমন প্রকাশ করিল না, আমিও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। বাড়িতে সে কোনকালেই বেশি গহনা পরে না, কিছুদিন হইতে তাহাও কমিতেছিল। কিন্তু আজ দেখা গেল, পায়ে তাহার কিছুই প্রায় নাই। যে-হারটা সচরাচর তাহার গলায় থাকে সেইটি এবং হাতে একজোড়া বালা। ঠিক মনে নাই, তবুও যেন মনে হইল কাল রাত্রি পর্যন্ত যে চুড়িকরগাছি দেখিয়াছিলাম সেগুলিও যেন সে আজ ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়াছে। পরনের কাপড়খানিও নিতান্ত সাধারণ, বোধ হয় সকালে নান করিয়া বাহা পরিয়াছিল তাহাই।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম, একে-একে যে সমস্তই ছাড়তে দেখছি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, এমন ত হতে পারে, এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়তি ছিল সেইগুলোই একে-একে করে যাবে। এই বলিয়া সে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল, রতন কাছাকাছি আছে কি না ; তার পরে গাড়োয়ানটোও না শুনিতে পার এমনি অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেশ ত, সে আশীর্বাদই কর না তুমি। তোমার বড় আর ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যার বদলে অনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্বাদই তুমি কর।

চূপ করিয়া রহিলাম। কথটা এমন একদিকে চলিয়া গেল বাহার জবাব লিবার কোন সাধাই

আমার ছিল না। সেও আর কিছু না বলিয়া যেসি বলিষ্ঠা টানিয়া লইয়া তটিন্দ্রিই হইয়া আমার পায়ের কাছে উইয়া পড়িল। আমাদের পদাঘাতি হইতে পোড়ামাটিতে বাহিয়ার একটা অত্যন্ত সোজা পথ আছে। সম্মুখের শুষ্ক-জল খালটির উপরে যে সর্পির্প বঁশের সঁালে আছে, তাহার উপর দিয়া গেলে মিনিট-মশেকের মধ্যেই মাওয়া যায়, কিন্তু পদার পাড়িতে অনেকখানি রাস্তা ঘুরিয়া ঘণ্টা-দুই বিলম্বে পৌছিতে হয়। এই দীর্ঘ পথটার দু'জনের মধ্যে আর কোন কথাই হইল না। সে কেবল আমার হাতখানা তাহার পদার কাছে টানিয়া লইয়া দুমানোর ছল করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

কুশারীমহাশয়ের দ্বারে আসিয়া যখন গো-মান থাকিল তখন বেলা দ্বিশ্রের উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অতিশয় সম্মানিত অতিথি বলিয়াই বোধ হয় সমরে না বসাইয়া একেবারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তা ছাড়া, অনতিবিলম্বেই বুকা গেল, শহর হইতে দূরবর্তী এইসকল সামান্য পল্লীঅঞ্চলে অবরোধের সেরূপ কঠোর শাসন প্রচলিত নাই। কারণ আমাদের শুভাগমন প্রচারিত হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের অনেকেই বাহারা খুড়ো, জ্যাঠা, মাসিমা ইত্যাদি ব্রীতি ও আত্মীয় সম্বোধনে কুশারী ও তাহার গৃহিণীকে আশ্বাসিত করিয়া একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে প্রবেশ করিয়া তামাশা দেখিতে লাগিলেন, তাহাদের সকলেই অবলা নহেন।

রাজলক্ষ্মীর ঘোমটা দিবার অভ্যাস ছিল না, সেও আমারই মত সম্মুখের বারান্দায় একখানি আসনের উপর বসিয়াছিল। এই অপরিচিত রমণীর সাক্ষাতেও এই অনাহুতের মল বিশেষ কোন সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। তবে সৌভাগ্য এইটুকু যে, আলাপ করিবার ঔৎসুক্যটা নিতান্তই তাহার প্রতি না হইয়া আমার প্রতিই প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কর্তা অতিশয় ব্যস্ত, তাহার ব্রাহ্মণীও তেমনি, কেবল বাড়ির বিধবা মেয়েটিই রাজলক্ষ্মীর পাশে স্থির হইয়া বসিয়া একটা তালপাখা লইয়া তাহাকে মৃদুস্রু বাতাস করিতে লাগিল। আর, আমি কেমন আছি, কি অসুখ, কতদিন থাকিব, জায়গাটা ভাল মনে হইতেছে কি না, জমিদারি নিজে না দেখিলে চুরি হয় কি না, ইহার নূতন কোন বন্ধবন্ধ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি কি না, ইত্যাদি অর্থ ও বার্থ নানাবিধ প্রশ্নোত্তরমালার ফাঁকে ফাঁকে কুশারীমহাশয়ের সাংসারিক অবস্থাটা একটু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বাড়িতে অনেকগুলি ঘর এবং সেগুলি মাটির ; তথাপি মনে হইল কানীনাখ কুশারীর অবস্থা স্বচ্ছল ত বটেই, বোধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ করিবার সমস্ত বাহিরে চতীমণ্ডপের একদ্বারে একটা ধানের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিরাছিলাম, ভিতরের প্রাঙ্গণেও দেখিলাম 'কমনি আরও গোটা-দুই রহিয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রাস্তাঘরই হইবে, তাহারই উক্ত: 'কটা চালার মধ্যে পাশাপাশি গোটা দুই টেকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্বেই যেন তাহার কল বন্ধ করা হইয়াছে। একটা বাতাবী-বৃক্ষতলে ধান সিঁক করিবার কয়েকটা চুন্নী নিকন-মুছন বরবর করিতেছে এবং সেই পরিষ্কৃত হানটুকুর উপরে ছত্রাভঙ্গে দুটি পরিপুষ্ট গো-বৎস খাড় কং করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে। তাহাদের মায়েরা লেখার বাঁধা আছে চোখে পড়িল না সত্য, কিন্তু এটা বুকা গেল কুশারী পরিবারের অগ্নের মত দুহেরও বিশেষ কোন অনতি নাই। দক্ষিণের বারান্দার দেয়াল খেঁচিয়া ছয়সাতটা বড় বড় মাটির কলসী বিড়ার উপর বসান আছে। হাত শুষ্ক আছে, কি কি আছে জানি না, কিন্তু বস্ত্র দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহারা কৃষপণ্ড কিংবা অবহেলার বস্ত্র। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম ঢেঁরা-সমেত পাট এবং শরের পোছা বাঁধা রহিয়াছে ; সুতরাং বাড়িতে যে বিস্তর দারিদ্র্য আক্যাক হর তাহা অনুমান করা অসম্ভবত জান করিলাম না।

কুশারীগৃহিণী খুব সম্ভব আমাদের অভ্যর্থনার কাজেই নিযুক্ত, কর্তাটিও একবারমাত্র লেখা দিয়াই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ; তিনি অকস্মৎ বস্ত্র-সমস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া অনুপস্থিতির কৈবিক্ত আর একপ্রকারে দিয়া কহিলেন, যা, এইবার বাই, আদিকটা সেয়ে এসে একেবারে বসি। বহর পদর-যোলার একটি সুন্দর সবলকায় ছেলে উঠানের একদ্বারে দাঁড়িয়া পল্লীর মনোযোগের সহিত আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল, কুশারীমহাশয়ের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িতেই হাসিয়া উঠিলেন, সব হরিণ, নারায়ণের জন্ম বোধ করি এককণে প্রস্তুত হ'ল, একবার

ভোগটি নিয়ে এসো গে বাবা! আহিকের বাকিটুকু শেষ করতে আর আমার দেয়ী হবে না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আজ মিছাই আপনাকে কষ্ট দিলাম—বড় দেয়ী হয়ে গেল। এই বলিয়া আমার প্রত্যন্তরের অপেক্ষার আর দেয়ী না করিয়া চক্কর পলকে নিজেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পরে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠাই করার খবর পৌছিল। বাঁচা গেল। কেবল অভিরিক্ত বেলার জন্যে নয়, এইবার আগন্তুকগণের প্রব্বাণে বিরতি অনুভব করিয়াই হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে ওনিয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমাকে অব্যাহতি দিয়া যে বাঁহাৰ বাড়ি চলিয়া গেলেন। কিন্তু খাইতে বসিলাম কেবল আমি একা। কুশারীমহাশয় সঙ্গে বসিলেন না, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। ছেড়টা তিনি সবিনয়ে এবং সঙ্গীরবে নিজেই ব্যস্ত করিলেন। উপবীত-ধারণের দিন ইহাতে ভোজনকালে সেই যে মৌনী হইয়াছিলেন, সে ব্রত আজও ভঙ্গ করেন নাই; সুতরাং একাকী নির্জন গৃহে এই কাজটা তিনি এখনও সম্পন্ন করেন। আপত্তি করিলাম না, আশ্চর্য হইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে যখন ওনিলাম, আজ তাহারও নাকি কি একটা ব্রত আছে—পরায় গ্রহণ করিবে না, তখনও আশ্চর্য হইলাম। এই ছলনায় মনে মনে দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিলাম এবং ইহার কি যে প্রয়োজন ছিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথা চক্কর পলকে বুঝিয়া লইয়া কহিল, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না, ভাল করে খাও। আমি যে আজ খাব না, এঁরা সবাই জানতেন।

বলিলাম, অথচ আমি জানতাম না। কিন্তু এই যদি, কষ্ট স্বীকার করে আসার কি আবশ্যক ছিল?

ইহার উত্তর রাজলক্ষ্মী দিল না, মিলেন কুশারীগৃহিণী। কহিলেন, এ কষ্ট আমিই স্বীকার করিয়েছি বাবা। মা যে এখানে থাকেন না তা জানতাম; তবু আমরা বাঁদের দয়ার দৃষ্টি অন্ন পাই, তাঁদের পায়েয় ধুলো বাড়িতে পড়বে এ লোভ সামলাতে পারলাম না। কি বল মা? এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিলেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এর জবাব আজ নয় মা, আর একদিন আপনাকে দেব। এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কুশারীগৃহিণীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলাম। পত্নীগ্রামে, বিশেষ এইরূপ সুদূর পট্টভেদে ঠিক এমনি সহজ সুন্দর কথাগুলি কেন কোন রমণীর মুখেই তনিবার কল্পনা করি নাই; কিন্তু এখনও যে এই পত্নী অক্সলেই আরও একটি ঢের বেশি আশ্চর্য নারীর পরিচয় পাইতে বাকী ছিল, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার পরিবেশনের ভার বিধবা কন্যার উপর অর্পণ করিয়া কুশারীগৃহিণী তালপাখা হাতে আমার সম্মুখে বসিয়াছিলেন। বোধ হয়, বরসে আমার অনেক বড় হইবেন বলিয়াই মাথার উপর অক্সলখানি ছাড়া মুখে কোন আবরণ ছিল না। তাহা সুন্দর কিংবা অসুন্দর মনেই হইল না। কেবল এইটুকুই মনে হইল, ইহা সাধারণ বাঙ্গালী মাতের মতই স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। হারের কাছে কতী বয়ঃ দাঁড়াইয়া ছিলেন; বাহির হইতে তাঁহার ঘেরে ডাকিয়া কহিল, বাবা, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। কেলা অনেক হইয়াছিল এবং এই খবরটুকুর জন্যই বোধ হয় তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তথাপি একবার বাহিরে ও একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখন একটু থাক মা, বাবুর খাওয়ারটা—

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, তুমি যাও, মিছো সময় নষ্ট কোরো না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হয় না আমি জানি।—কুশারী সজোচ বোধ করিতেছিলেন; কহিলেন, নষ্ট আর কি হবে, বাবুর খাওয়ারটা হয়েই থাক না।

গৃহিণী কহিলেন, আমি থাকতেও যদি খাওয়ার ক্রটি হয় ত তোমার দাঁড়িয়ে থাকলেও সারবে না। তুমি যাও—কি বল বাবা? এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, হয়ত বা ক্রটি বাড়বে। আপনি যান কুশারীমহাশয়, এমন অল্পস্বল্প ঢেরে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন পক্ষেই সুবিধে হবে না। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া দীরে দীরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনে হইল সম্মানিত অভিব্যক্তি আহ্বানের স্থানে উপস্থিত না থাকিবার সফোটা সঙ্গে লইয়াই গেলেন। কিন্তু এইটাই যে আমার মত ছুল হইয়াছিল তাহা কিছুকাল পরেই আর অবিস্মৃত রহিল না। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, নিরাশ্রিত আলো ঢালের ভাঙ খান; জুড়িয়ে গেলে আর খাওয়াই হয় না, তাই জোর

করে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাও বলি বাবা, যীরা অন্নদাতা তাঁদের পূর্বে নিজের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করাও কঠিন।

কথাটার মনে মনে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, বলিলাম অন্নদাতা আমি নই ; কিন্তু তাও যদি সত্যি হয়, সেটুকু এত কম যে, এটুকু বাদ গেলে বোধ করি আপনারা টেরও পেনেন না।

কুশারীগৃহিণী কণকাল চূপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানি ধীরে ধীরে যেন অভিশয় স্নান হইয়া উঠিল। তার পরে কহিলেন, তোমার কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয় বাবা, ভগবান আমাদের কিছু কম সেননি ; কিন্তু এখন মনে হয় এত যদি তিনি নাই দিতেন, হয়ত এর চেয়ে তাঁর বেশি দয়াই প্রকাশ পেত। বাড়িতে ওই ত কেবল একটা বিধবা মেয়ে—কি হবে আমাদের গোলাভরা ধানে, কড়াভরা দুধে, আর কলসী কলসী গুড় নিয়ে? এ-সব ভোগ করবার যারা ছিল তারা ত আমাদের ভাগ্য করেই চলে গেছে।

কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল এবং ওষ্ঠাধর ক্ষুরিত হইয়া উঠিল। বুলিলাম, অনেক গভীর বেদনাই এই করটি কথার মধ্যে নিহিত আছে। ভাবিলাম, হয়ত তাঁহার কোন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ওই যে ছেলটিকে ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া হতাশাস শিতামাতা আর কোন সান্নাই পাইতেছেন না। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, রাজলক্ষ্মীও কোন কথা না কহিয়া কেবল তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমারই মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমাদের ভুল ভাসিল তাঁহার পরের কথায়। তিনি আপনারা স্পাপনি সংবরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও ত তোমরাই অন্নদাতা। কর্তাকে বললাম, মনিবকে দুঃখের কথা জানাতে লজ্জা নেই, আমাদের মাঝে-বাবাকে নিমন্ত্রণের ছল করে একবার ধরে আন, আমি তাঁদের কাছে কেঁদে কেটে দিচ্ছি যদি তাঁরা এর কোন বিহতি করে দিতে পারেন। এই বলিয়া এইবার তিনি অঞ্চল তুলিয়া নিজের অশ্রুজল মোচন করিলেন। সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, সেও আমারই মত সংশয়ে পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্বের মত এখনও দুঃজনে মৌন হইয়া রহিলাম।

কুশারীগৃহিণী এইবার তাঁহাদের দুঃখের ইতিহাস ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত ওনিয়া বহুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা বাহির হইল না ; কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে, একথা বিবৃত করিয়া ঠিক এতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মী পরাম্ভ গ্রহণ করিবে না, ওনিয়াও এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ হইতে ওরু করিয়া কর্তাটিকে অন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত কিছুই বাদ দেওয়া চলিত না। কিন্তু সে যাই হোক কুশারীগৃহিণী তাঁহার চক্রে-ক্রে ও অশ্রুট বাক্যের ভিতর দিয়া ঠিক কতখানি যে ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানি না এবং ইহার কতখানি যে সত্য তাহাও একপক্ষ ওনিয়া নিশ্চয় করা কঠিন ; কিন্তু আমাদের মধ্যস্থতায় যে সমস্যা আজ তাঁহারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সনির্বন্ধ আবদন করিলেন, তাহা যেমন বিশ্বয়কর, তেমনি মধুর ও তেমনি কঠোর।

কুশারীগৃহিণী যে দুঃখের ইতিহাসটি বিবৃত করিলেন তাহার মোট কথাটা এই যে, গৃহে তাঁহাদের খাওয়া-পরায় যথেষ্ট সম্বলতা থাকা সত্ত্বেও শুধু যে কেবল সংসারটাই তাঁহাদের বিধ হইয়া পিয়াছে তাহা নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁহারা লজ্জার-মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না এবং সমস্ত দুঃখের মূল হইতেছে তাঁহার একমাত্র ছোট জা সুনন্দা ; এবং বনিত তাঁহার সেবর যদ্যুনাথ ন্যায়রত্নও তাঁহাদের কম শ্রমতা করেন নাই, কিন্তু আসল অভিযোগটা তাঁহার সেই সুনন্দার বিরুদ্ধে। এই বিরোধী সুনন্দা ও তাঁহার স্বামী যখন সম্মতি আমাদেরই প্রজা, তখন যেমন করিয়াই হোক ইহাদের বশ করিতে হইবে। ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরূপ। তাঁহার খণ্ডর-শাওড়ী যখন প্রগত হন তখন তিনি এ-বাড়ির বধু। যদু-কেবল ছয়-সাত বছরের বালক। এ বালককে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহারই উপরে পড়ে এবং সেদিন পর্যন্ত এ ভার তিনি বহন করিয়াই আসিয়াছেন। শৈশুক বিষয়ের মধ্যে একখানি মাটির ঘর, বিধা দুই-তিন ব্রহ্মোত্তর জমি এবং ঘর-কয়েক বজ্রমান। মাত্র এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার স্বামীকে সংসার-লব্ধে ভাসিতে হয়। আজ এই যে প্রাচুর্য, এই যে সম্বলতা, এ-সকল সমস্তই তাঁহার স্বকৃত উপার্জনের ফল। ঠাকুরপো কোন সাহায্যই করেন নাই, সাহায্য কখনও তাঁহার কাছে প্রার্থনাও

করা হয় নাই।

আমি কহিলাম, এখন বুঝি তিনি অনেক দাবি করছেন?

কুশারীগৃহিণী খাড় নাড়িয়া কহিলেন, দাবি কিসের বাবা, এ ত সমস্তই তার। সমস্তই সে নিত, সুনন্দা যদি না মাঝে পড়ে আমার সোনার সংসার ছারখার করে নিত।

আমি কথাটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আপনার এই ছেলেটি?

তিনিও প্রথমটা বুঝিতে পারিলেন না, পরে বুঝিয়া বলিলেন, ওই বিজয়ের কথা বলচ? ও ত আমাদের ছেলে নয় বাবা, ও একটি ছাত্র। ঠাকুরপোর টোলে পড়ত, এখনও তার কাছেই পড়ে, শুধু আমার কাছে থাকে। এই বলিয়াই তিনি বিজয় সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া কহিতে লাগিলেন, কত দুখে যে ঠাকুরপোকে মানুষ করি সে শুধু ভগবান জানেন এবং পাড়ার লোকেও কিছু কিছু জানে। কিন্তু নিজে সে আজ সমস্ত ভুলেছে, শুধু আমরাই ভুলতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সেসব যাক বাবা, সে অনেক কথা। আমি ঠাকুরপোর পৈতে দিলাম, কর্তা তাকে পড়ার জন্যে বিহিরপুরে শিবু তর্কালঙ্কারের টোলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা, ছেলেটাকে ছেড়ে থাকতে পারিনি বলে আমি নিজে কতদিন গিয়ে বিহিরপুরে বাস করে এসেছি, সেও আজ তার মনে পড়ে না। যাক—এমন করে কত বছরই না কেটে গেল। ঠাকুরপোর পড়া সাঙ্গ হ'ল, কর্তা তাকে সংসারী করবার জন্যে মেয়ে বুঝে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময়ে কলা নেই কথা নেই, হঠাৎ একদিন শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করে এনে উপস্থিত। আমাকে নাই বলুক বাবা, এমন দাদার পর্বত একটা মত নিলে না।

আমি আশ্বে আশ্বে জিজ্ঞাসা করিলাম, মত না নেওয়ার কি বিশেষ কারণ ছিল?

গৃহিণী কহিলেন, ছিল বৈ কি। ওরা আমাদের ঠিক স্ব-স্বরও নয়, কুলে-শীলে মানেও চের ছোট। কর্তা রাগ করলেন, দুখে লজ্জার বোধ করি এমন মাসখানেক কারও সঙ্গে কথাবার্তা পর্বত কইলেন না; কিন্তু আমি রাগ করিনি। সুনন্দার মুখখানি দেখে প্রথম থেকেই যেন গলে গেলাম। তার উপর যখন ওনতে পেলাম, তার মা মারা গেছে, বাপ ঠাকুরপোর হাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাসী হুজে বেরিয়ে গেছেন, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে পেয়ে আমার কি হ'ল তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সে যে একদিন তার এমন শোধ দেবে, একথা তখন কে ভেবেছিল। এই বলিয়া তিনি হঠাৎ করতল করিয়া কঁদিয়া ফেলিলেন।

বুঝিলাম, এইখানে ব্যাখ্যাটা অতিশয় তীব্র, কিন্তু নীরবে রহিলাম। রাজলক্ষ্মীও এককণ কোন কথা কহে নাই; সে আশ্বে আশ্বে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁরা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে তিনি খাড় নাড়িয়া বাহ্য ব্যক্ত করিলেন তাহাতে বুঝা গেল ইহারা আজও এই গ্রামেই আছেন। ইহার পরে অনেককাল পর্বত কথা কহিলেন না, তাঁহার সুখ হইতে একটু বেশি সময় গেল। কিন্তু আসল বক্তৃতা এখন পর্বত ভাল করিয়া বুঝাই গেল না। এনিকে বেশি সময় গেল। কিন্তু আসল বক্তৃতা এখন পর্বত ভাল করিয়া বুঝাই গেল না। এনিকে আমার খাতরা প্রায় শেষ হইয়া আনিয়াছিল, কারণ কল্যাণীটি সন্তোষ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু ঘটাই নাই। সহসা তিনি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং আমার থালার নিকে চাহিয়া অনুভূত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাক বাবা, সমস্ত দুখের কহিণী বলতে গেলে শেষও হবে না, তোমাদের মৈত্রী থাকবে না। আমার সোনার সংসার যারা চোখে দেখেছে, কেবল তারাই জানে, ছোটবৌ আমার কি সর্বনাশ করে গেছে। কেবল সেই লজ্জাকণ্ঠটাই তোমাদের সংক্ষেপে বলব।

যে সম্পত্তির উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর, সেটা এক সময়ে একজন উত্তরিয়া ছিল। বছর খানেক পূর্বে হঠাৎ একদিন সকালে তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেটিকে সঙ্গে করে ব্যক্তিগত এসে উপস্থিত। রাগ করে কত কি যে বলে গেল তার ঠিকানা নেই, হরত তার কিছুই সত্য নয়, হরত তার সমস্তই মিথ্যে। ছোটবৌ মান করে ব্যক্তিগত রাজ্যধারে, সে যেন সেই সব শুনে একেবারে পাথর হয়ে গেল। তারা চলে গেলেও তার সে ভাব আর ভুততে চাইল না। আমি তাকে কল্যাণ, সুনন্দা, নীকিয়ে রইনি,

কেলা হয়ে যাচ্ছে না? কিন্তু জবাবের জন্য তার মুখের পানে চেয়ে আমার ভয় হ'ল। তার চোখের চাহনিতে কিসের যেন একটা আলো ঠিকরে পড়ছে, কিন্তু শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে ক্যাকাশে—বিবর্ণ। তাঁতি-বোয়ের প্রত্যেক কথাটি যেন কিছু কিছু করে তার সর্বাঙ্গ থেকে সমস্ত রক্ত গুণে নিয়ে গেছে। সে তখনই আমার জবাব দিলে না, কিন্তু আন্তে আন্তে কাছে এসে বললে, দিদি, তাঁতিবোকে তার স্বামীর বিষয় তোমরা কিরিয়ে দেবে না। তার এটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্বস্ব বক্ষিত করে সারাজীবন পথের ডিয়ারী করে রাখবে?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, কোন কথা একবার। কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি সেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেলে ইনি কিসে নিয়েছেন। নিজের কেনা বিষয় কে কবে পরকে ছেড়ে দেয় ছোটবৌ?

ছোটবৌ বললে, কিন্তু ষটঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায়?

রাগ করে জবাব দিলাম, সে কথা জিজ্ঞেস কর গে যা তোর ষটঠাকুরকে—বিষয় যে কিনেছে। এই বলে আত্মিক করতে চলে গেলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, সত্যিই ত। যে বিষয় নীলাম হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে তা কিরিয়ে দিতেই বা ছোটবৌ বলে কি করে?

কুশারীপুত্ৰী কহিলেন, বল ত বাছা। কিন্তু একথা বলা সঙ্গেও তাঁহার মুখের উপর লজ্জার যেন একটা কালো ছায়া পড়িল। কহিলেন, তবে ঠিক নিলাম হয়েই ত বক্রি হয়নি কিনা তাই। আমরা হল্যাম তাদের পুরুষ-বংশ। কানাই বসাক মৃত্যুকালে এর উপরেই সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন ত আর ইনি জানতেন না, সেই সঙ্গে একরাশ সেনাও রেখে গিয়েছিল।

তাঁহার কণ্ঠ শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমি উভয়েই কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কি যেন একটা নোয়া জিনিস আমার মনের ভিতরটা একমুহুর্তেই একেবারে মলিন করিয়া দিয়া গেল। কুশারীপুত্ৰী বোধ করি ইহা লক্ষ্য করিলেন না। বলিলেন, জপ-আত্মিক সমস্ত সেরে ষটী-দুই পরে ফিরে এসে সেখি সুনন্দা সেইখানে ঠিক তেমনি হির হয়ে বসে আছে, কোথাও একটা পা পর্বন্ত বাড়ায় নি। কর্তা কহায়ির সেরে এখুনি এসে পড়বেন; ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে খামার দেখতে গেছে, তারও ফিরতে সেরি নেই। বিজয় নাহিতে গেছে, এখুনি এসে ঠাকুরপুজোর বসবে। রাগের পরিসীমা রইল না; বললাম, তুই কি রান্না-ঘরে আজ ঢুকবি নে? ওই বজ্জাত তাঁতি-বেটারি ছেঁড়া কথা নিয়েই সারাদিন বসে থাকবি?

সুনন্দা মুখ তুলে বললে, না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয়, সে যদি তোমরা কিরিয়ে না দাও ত আমি রান্নাঘরে ঢুকব না। ওই নাবালক ছেলের তার মুখের গ্রাস কেড়ে লিঃ আমার স্বামী-পুরুষকে খাওয়াতে পারব না, ঠাকুরের ভোগ রেখেও দিতে পারব না। এই বলে সে এর নিজের ঘরে চলে গেল। সুনন্দাকে আমি চিনতাম। সে যে মিথ্যা কথা বলে না, সে যে তার অখ্যাপক সন্ন্যাসী বাপের কাছে ছেলেবেলা থেকে অনেক শাস্ত্র পড়েছে, তাও জানতাম; কিন্তু সে যে সেরেমানুষ হয়েছে এমন পাবাপ-কটিন হতে পারবে তাই কেবল তখনো জানতাম না। আমি তাড়াহাড়ি ভাত রান্নাতে গোলাম। পুরুষেরা সব বাড়ি কিরে এলেন। কর্তার খাবার সময় সুনন্দা দরজার বাহিরে এসে দাঁড়াল। আমি দূর থেকে হাত জোড় করে বললাম, সুনন্দা, একটু কথা সে, ওঁর খাওয়াটা হয়ে যাক। সে এটুকু অনুরোধও রাখলে না। পত্ন্য করে খেতে কহছিলেন, জিজ্ঞেসা করলে, তাঁতিবের সম্পত্তি কি আপনি টাক দিলে নিয়েছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যাননি, এ ত আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেছি। তবে এত টাকা পেলেন কোথায়?

যে কখনো কথা কর না তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে কর্তা প্রথমে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পেলেন, তার পর বললেন, এসব কথাই রান্না এক বোম্বা?

সুনন্দা উত্তর দিলে, এর মানে কেউ জানে ত সে আপনি। আজ তাঁতিবৌ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল। তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার কাছে বাধ্য—কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় স্বয়ং ভাঙে যদি কিরিয়ে না দেন ত আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অঙ্গও আমার স্বামী-পুরুষকে খেতে দিতে পারব না।

আমার মনে হ'ল বাবা, তম আমি স্বপ্ন দেখছি, নাহয়, সুনন্দাকে ভুলে পেয়েছে। যে ডাঙরকে সে

দেবতার বেশি ভক্তি করে তাঁকেই এই কথা! উনিও খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মত বসে রইলেন; তার পরে জ্বলে উঠে বললেন, বিবয় পাপের হোক, পুণ্যের হোক, সে আমার—তোমার স্বামী-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায় তোমরা আর কোথাও যেতে পার। কিন্তু বোমা, তোমাকে আমি এককাল সর্বভগ্নময়ী বলেই জানতাম, কখনো এমন ভাবিনি। এই বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সেদিন সমস্তদিন আর কারও মুখে ভাত-জল গেল না। কেঁসে গিয়ে ঠাকুরপোর কাছে পড়লাম, বললাম, ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি কোলে করে মানুষ করেছি—তার এই প্রতিফল। ঠাকুরপোর চোখ দুটো জলে ভরে গেল, বললে, বৌঠান, তুমি আমার মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদের বড় যে, সে ধর্ম। আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। স্বতঃস্ফূর্ত সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কখনো ভুল করেনি।

হায়রে পোড়া কপাল! তাকেও যে পোড়ারমুখী ভেতরে ভেতরে এত বশ করে রেখেছিল, আজ আমার তায় চোখ খুলল। সেদিন ভাদ্রসংক্রান্তি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থেকে থেকে বরষা করে জল পড়ছে, কিন্তু হতভাগী একটা রাত্তিরের জন্যে আমাদের মুখ রাখলে না, ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমার স্বপ্নের কালের একঘর প্রজা মরে-ছেজে বছর-দুই হ'ল চলে গেছে, তাদেরই ভাসা ঘর একখানি তখনও কোনমতে দাঁড়িতে ছিল; শিয়াল-কুকুর-সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে তাতেই গিয়ে সেই দুর্দিনে আশ্রয় নিলে। উঠানের জল-কাদা মাটির ওপ লুটিয়ে পড়ে কেঁসে উঠলাম, সর্বনাশী, এই যদি তোর মনে ছিল, এ সংসারে ঢুকেছিলি কেন? বিনুকে পর্যন্ত যে নিয়ে চললি, তুই কি স্বপ্নরকুলের নামটা পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে দিবিবে প্রতিজ্ঞা করেচিস? কিন্তু কোন উত্তর দিলে না। বললাম, খাবি কি? জবাব দিলে, ঠাকুর যে তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর রেখে গেছেন, তার অর্ধেকটাও ত আমাদের। কথা শুনে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হ'ল। বললাম, হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চলবে না। তোরা নাহয় না খেয়ে মরতে পারিস, কিন্তু আমার বিনু? বললে, একবার কানাই বসাকের ছেলের কথা ভেবে দেখ দিদি। তার মত একবেলা এক সন্ধ্যা খেয়েও যদি বিনু বাঁচে, ত সেই ঢের।

তারা চলে গেল। সমস্ত বাড়িটা যেন হাহাকার করে কঁদতে লাগল। সে রাত্রিতে আলো জ্বলল না, হাঁড়ি চড়ল না। কর্তা অনেক রাত্রে ফিরে এসে সমস্ত রাত ওই খুঁটিটা ঠেস দিয়ে বসে কাটালেন। হয়ত বিনু আমার ঘুমোয় নি, হয়ত বাহা আমার কিসের জ্বালায় ছটফট করছে। ভোর না হতেই রাখালকে দিয়ে গরু-বাছুর পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু রাঙ্গুসী ফিরিয়ে দিয়ে তারই হাতে বলে পাঠালে, বিনুকে আমি দুখ খাওয়াতে চাইনে, দুখ না খেয়ে বেঁচে থাকবার শিক্ষা দিতে চাই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া কেবল একটা সুগভীর নিশ্বাস পড়িল; গৃহিণীর সেই দিনের সমস্ত বেদনা ও অপমানের স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাঁহার কর্ণরোধ করিয়া মিল, এবং আমার হাতের ডাল-ভাত ওকহিয়া একেবারে চামড়া হইয়া উঠিল।

কর্তার খড়মের শব্দ শুনা গেল, তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা হইয়াছে। আশা করি তাঁহার মৌনব্রত অব্যাহত—অটুট থাকিয়া তাঁহার সাত্ত্বিক আহ্বারের আজ্ঞা কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই, কিন্তু এদিকের ব্যাপারটা জানিভেন বলিয়াই বোধ করি আমার তত্ত্ব লইতে আর আসিলেন না। গৃহিণী চোখ মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, তার পর গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে মুখে কি দুর্নাম, কি কেলেকারী বাবা—সে আর তোমাদের কি বলব! কর্তা বললেন দুমিন বাক, দুঃখের জ্বালায় তারা আশ্রয় নিতে ফিরবে। আমি বললাম, তাকে চোনো না, সে ভাববে কিন্তু নুইবে না। আর তাই হ'ল। একটার পর একটা করে আজ আট মাস কেটে গেল, কিন্তু তাকে হেঁট করতে পারলেন না। কর্তা ভেবে ভেবে আর আড়ালে কেঁসে কেঁসে কেন কাঠ হয়ে উঠতে লাগলেন। ছেলোটো ছিল তাঁর প্রাণ, আর ঠাকুরপোকে ভালবাসতেন ছেলের চেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে না পেরে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁতিদের যাতে কষ্ট না হয় তিনি করবেন; কিন্তু সর্বনাশী জবাব দিলে, যা তাদের ন্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে দিলেই তবে খয়ে ফিরব—তার একছটাক কোথাও বাকি থাকতে যাব না। অর্থাৎ তার মানে, নিজের অর্থব্যয়িত মুখ্য।

আমি গেলাসের জলে হাতখানা একবার ডুবাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তাঁদের কি করে চলে?

কুশারীগৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, এর জবাব আর আমাকে দিতে ব'লো না বাবা। এ আলোচনা কেউ করতে এলে আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই—মনে হয় বুঝি আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আট মাস এ-বাড়িতে মাছ আসে না, দুধ-ঘির কড়া চড়ে না। সমস্ত বাড়িটার ওপর কে যেন এক মর্মান্তিক অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তিনজনেই আমরা স্তব্ধ হইয়া নিশেধে বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আবার যখন গাড়িতে গিয়া বসিলাম, কুশারীগৃহিণী সজল কণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর কানে কানে বলিলেন, মা, তারা তোমারই প্রজা। আমার স্বপ্তের দরুন যে জমিটুকুর ওপর তাদের নির্ভর সেটুকু তোমার গঙ্গামাটিতেই।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তিনি পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, মা, তোমার বাড়ি থেকেই চোখে পড়ে। নালার এ-দিকে যে ভাঙা পোড়ো ঘরটা দেখা যায়, সেইটে।

রাজলক্ষ্মী তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

গাড়ি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন কথাই কহিলাম না। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী অনামনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কহিলাম, লক্ষ্মী, যাব লোভ নেই—না, তাকে সহায়্য করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া অল্প একটুখানি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি। তোমার কাছে আমার আর কিছুই না হোক এ শিক্ষা হয়েছে।

সাত

আপনাকে আপান বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, যে কয়টি নারী-চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারীমহাশয়ের বিদ্রোহী স্নাতৃজায়া। এই সুদীর্ঘ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। মানুষকে এত শীঘ্র এবং এত সহজে রাজলক্ষ্মী আপনার করিয়া লইতে পারে যে, সুনন্দা যে একদিন আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। না হইলে এই আশ্চর্য মেয়েটিকে জানিবার সুযোগ আমার কখনও লটিত না। অধ্যাপক যদু তর্কালঙ্কারের ভাঙ্গাচোরা দু-তিনখানা ঘর আমাদের বাড়ির পশ্চিমে মা, ' এক প্রান্তে চাহিলেই সোজা চোখে পড়ে—এখানে আসিয়া পর্যন্তই পড়িয়াছে, কেবল এক বিদ্রোহিণী যে ওইখানে তার স্বামী-পুত্র লইয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহাই জানিতাম না। বাঁশের পুল পার হইয়া একটা কঠিন অনূর্বর মাঠের উপর দিয়া মিনিট-মশেকের পথ; মাঝখানে গাছপালা প্রায় কিছুই নাই, অনেকদূর পর্যন্ত বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া যখন ওই জীর্ণ শ্রীহীন ঘরগুলি চোখে পড়িল তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত একপ্রকার অতৃপ্তপূর্ব ব্যথা ও আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম; এবং যে বস্তু অনেকদিন অনেক উপলক্ষে দেখিয়াও বার বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংসারে কোন-কিছুরই কেবলমাত্র বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বসিবার জো নাই। কে বলিবে ওই পোড়ো বাড়িটা শিয়াল-কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে! কে অনুমান ওই কয়খানা ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শুকুলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে; হয়ত স্মৃতি ও ন্যায়ের মীমাংসা ও বিচার লইয়া ছাত্র-পরিবৃত্ত এক নবীন অধ্যাপক মগ্ন হইয়া থাকেন; স্ব জানিবে উহারই মধ্যে, এই বাঙ্গলাদেশের এক তরুণী নারী ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রাখিতে যেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে!

দক্ষিণের জানালা দিয়া বাটীর মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় মনে হইল উঠানের উপর কি যেন একটা হইতেছে—রতন আগন্তি করিতেছে এবং রাজলক্ষ্মী তাহা খণ্ডন করিতেছে, সূতরাং কঠোরতা তাহারই কিছু প্রবল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কিছু অগ্রভিত হইয়া গেল; কহিল, ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝি? যাবেই ত। রতন, তুই পলাটা একটু খাটো কর বাবা, নইলে আমি ত আর পারিনে।

এই প্রকার অনুযোগ এবং অভিযোগে কেবল রতনই একা নয়, বাড়িসুদ্ধ সকলেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। অতএব সেও চুপ করিয়া রহিল, আমিও তেমনি কথা কহিলাম না।

সেবিলাম একটা বড় চালারিতে চাল-ডাল-বি-তেল প্রভৃতি এবং আর-একটা ছোট পায়ে এতজ্ঞাতীর নানাবিধ ভোজ্যবস্তু সম্বিষ্ট হইয়াছে। মনে হইল, এইগুলির পরিমাণ ও তাহানিকে বহন করিবার শক্তিসামর্থ্য-প্রসঙ্গেই রতন প্রতিবাদ করিতেছিল। ঠিক তাই। রাজলক্ষ্মী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, শোন এর কথা। এই ক'টা চাল-ডাল বয়ে নিয়ে বেতে পারবে না। এ যে আমি নিয়ে যেতে পারি রতন। এই বলিয়া সে ছোট হইয়া বহুদূর বড় কুড়িটা তুলিয়া ধরিল।

বাস্তবিক ভার হিসাবে মানুষের পক্ষে, এমন কি রতনের পক্ষেও এগুলি বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু কঠিন ছিল আর একটা কাজ। ইহাতে তাহার মর্যাদাহানি হইবে। কিন্তু মনিবের কাছে লজ্জায় এই কথাটাই সে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজেই এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া কহিলাম, তোমার যথেষ্ট লোকজন আছে, প্রজারও অভাব নেই—তাদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, রতন না হয় খালি হাতে সঙ্গে যাক।

রতন আথোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী একবার আমার ও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হতভাগা আধমুণ্টা ধরে ঝগড়া করলে, তবু বললে না যে, ওসব ছোট কাজ রতনবাবুর নয়। যা, কাউকে ডেকে আন গে।

সে চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে উঠেই এসব যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মানুষের খাবার জিনিস সকালে পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোথায় পাঠান হচ্ছে? এবং তার হেতু?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হেতু মানুষে খাবে এবং যাচ্ছে বামুনবাড়িতে।

কহিলাম, বামুনটি কে?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে অশ্রুচূর্ণ করিয়া রহিল, বোধ হয় ভাবিল নামটা বলিবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, দিয়ে বলতে নেই, পুণি কমে যায়। বাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-ছেড়ে এস, তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দশটা, বাহিরের ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া কাজের অভাবে একখানা পুরানো সাপ্তাহিক কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম, একটা অচেনা কণ্ঠস্বরের সম্ভাবণে মুখ তুলিয়া দেখিলাম—আগন্তুক অপরিচিতই বটে। কহিলেন, নমস্কার বাবুমশায়। আমিও হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলাম, বসুন।

ব্রাহ্মণের অতিশয় দীন বেশ—পায়ে জুতা নাই, গারে জামা নাই, শুধু একখানি মলিন উত্তরীয়। পরিধানের বস্ত্রখানি তেমনি মলিন, উপরন্তু দু-তিন স্থানে গ্রহি বাঁধা। পল্লী-গ্রামের ভ্রম্যবস্তির আজাদনের দীনতা বিস্তারের বস্তুও নয়। কেবলমাত্র ইহার উপরেই তাঁহার সাসৈয়িক আবহা অনুমান করাও চলে না। তিনি সম্মুখে বাঁশের মোড়াতীর উপরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমি আপনায় একজন দরিদ্র প্রজা, ইতিপূর্বেই আমার আসা কর্তব্য ছিল, তারি ক্রটি হয়ে গেছে।

আমাকে ভূমিদার মনে করিয়া কেহ আলাপ করিতে আসিলে আমি মনে মনে যেমন লজ্জিত হইতাম, তেমনি বিরক্ত হইতাম; বিশেষতঃ ইহারা যে সকল নিবেদন ও আবেদন লইয়া উপহিত হইত এবং যে সকল বহুমূল উপপাত ও অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিত তাহাতে আমার কোন হাতই ছিল না। ইহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারিলাম না; কহিলাম, বিলম্বে আসার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ একেবারে না এসেও আমি ক্রটি নিতাম না—ও-রকম আমার বৃত্তাব নয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজন?—ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অসময়ে এসে আপনার কাছে হরত ব্যাঘাত করলাম, আমি আর একমিন আসব। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন?

আমার বিরক্তিটা তিনি অনায়াসে লক্ষ্য করিলেন। একই মৌন থাকিয়া শান্তভাবে বলিলেন, আমি

সামান্য ব্যক্তি, প্রয়োজনও যৎসামান্য। মাঠাকরন আমাকে স্মরণ করেছেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাকতে পারে—আমার কিছু নেই।

জবাবটা কঠোর কিন্তু সত্য, এবং আমার প্রশ্নের তুলনায় অসঙ্গতও নয়। কিন্তু এখানে আসিয়া পৰ্ব্বত নাকি এরূপ জবাব শুনাইবার লোক ছিল না, তাই ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে কেবল বিস্ময়ান্বিত নয়, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। অথচ মেজাজ আমার স্বভাবতঃ রক্ষণ নয়, অন্যত্র কোথাও এ কথায় কিছু মনেও হইত না; কিন্তু ঐশ্বৰ্যের ক্ষমতা জিনিসটা এতই বিস্তীর্ণ যে, সেটা পরের ধার করা হইলেও তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন মানুষে সহজে কাটাছিয়া উঠিতে পারে না। অতএব অপেক্ষাকৃত দ্রের বেশি রূঢ় উদ্ভরই হঠাৎ মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঝাঁজটা তার উৎক্লিপ্ত হইবার পূর্বেই দেখিলাম পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল এবং রাজলক্ষ্মী তাঁহার পূজার আসন হইতে অসমাপ্ত আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়াই উঠিয়া আসিল। দূর হইতে সসন্ত্রমে প্রণাম করিয়া কহিল, এরই মধ্যে উঠবেন না, আপনি বসুন। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মা, আপনি ত আমার সংসারের অনেকদিনের দৃষ্টান্ত দূর করে দিলেন, এতে প্রায় আমাদের পনের দিনের খাওয়া চলে যাবে। কিন্তু সম্প্রতি অকাল চলচে, ব্রত-নিয়ম কিছুই দিন নেই। ব্রাহ্মণী আশ্চর্য হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, আপনার ব্রাহ্মণী কেবল বারব্রতের দিনক্ষণগুলোই শিখে রেখেছেন, কিন্তু প্রতিবেশীর তত্ত্ব নেবার কালকাল বিচারটা আমার কাছে শিখে যেতে বলে দেবেন।

ব্রাহ্মণঃ, হিলেন, এত বড় সিঁথেটা কি হবে মা—

প্রশ্নটা তিনি শেষ করিতে পারিলেন না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিলেন না, কিন্তু আমি এই দান্তিক ব্রাহ্মণের অনুভূত বাক্যের মর্মটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু ভয় হইল আমারই মত না বুঝিয়া রাজলক্ষ্মী হয়ত একটা শব্দ কথা শুনিবে। লোকটির এক-দিকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত থাকিলেও আর একদিকের পরিচয় ইতিপূর্বেই পাইয়াছিলাম; সুতরাং এমন ইচ্ছা হইল না যে, আমারই সম্মুখে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু একটা সাহস এই ছিল যে, কেহ কোনদিন মুখোমুখি রাজলক্ষ্মীকে নিরস্তুর করিয়া দিতে পারিত না। ঠিক তাহাই হইল। এই বিস্তীর্ণ প্রশ্নটাকেও সে অত্যন্ত সহজে পাশ কাটাছিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, তর্কালঙ্কারমশাই, ওনেচি আপনার ব্রাহ্মণী ভারী রাগী মানুষ—বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে পড়লে হয়ত চটে যাবেন, নাহলে এ-কথার জবাব তাঁকেই দিয়ে আসতাম।

এতকালে বুঝিলাম ইনিই যদুনাথ কুশারী। আধ্যাপক মানুষ, প্রিতমঃ বজ্রাজের উদ্দেশে নিজের মেজাজ হারাইয়া ফেলিলেন; হাঃ-হাঃ করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া প্রসন্নঃ বলিলেন, না মা, রাগী হবে কেন, নিতান্তই সোজা মানুষ। আমরা দরিদ্র, আপনি গেলে ত তার উপযুক্ত সম্মান করতে পারব না, তিনিই আসবেন। একটু সময় পেলে আমিই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, তর্কালঙ্কারমশাই, আপনার ছাত্র ক'টি?

কুশারী বলিলেন, পাঁচটি। এদেশে বেশি ছাত্র ত পাবার জো নেই—অধ্যাপনা কেবল নামমাত্র। সব ক'টিকেই বেত-পরতে দিতে হয়?

না। বিজয় ত দাদার ওখানে থাকে, একটর বাড়ি গ্রামের মধ্যেই, কেবল তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে।—রাজলক্ষ্মী একটুখানি চূপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব সিন্ধুকণ্ঠে বলিল, এই দুঃসময়ে এ ত সহজ নয় তর্কালঙ্কারমশাই।

ঠিক এই কঠোরের প্রয়োজন ছিল। না হইলে অভিমাত্রী অধ্যাপকের উত্তর হইয়া উঠার কিছুমাত্র বাধা ছিল না। অথচ এবার তাঁহার মনটা একেবারে ও-; ১ দিয়াই গেল না! অতি সহজেই গৃহের দুঃখ-সৈন্য নীকার করিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, কি করে যে চলে সে কেবল আমরা দুটি প্রাণীই জানি। কিন্তু তবু ত ভগবানের উদয়ান্ত আটকে থাকে না মা! তা ছাড়া উপায়ই বা কি? অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্যদেবের কাছে বা পেরেচি, সে ত কেবল ন্যস্ত ধন—আর একদিন সে ত গিরিয়ে নিতেই হবে মা! একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, একদিন এই ভার ছিল দেশের ভূস্বামীর উপর, কিন্তু এখন মিন-কান্দ সমস্তই বদলে গেছে। সে অধিকারও তাঁদের নেই, সে দারিদ্র্যও গেছে।

প্রকার রক্তশোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই। তাঁদের ভূখাশী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ যদি কোন প্রাশস্তিত্ত করতে চায় তাতে যেন আবার বাধা দেবেন না।

কুশারী লজ্জা পাইয়া নিজেও হাসিলেন ; কহিলেন, বিমনা হয়ে আপনার কথাটা আমি মনেই করিনি। কিন্তু বাধা দেব কেন? সত্যিই ত এ আপনারাদেরই কর্তব্য।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমরা পূজা-আচ্ছা করি, কিন্তু একটা মন্তরও হয়ত শুদ্ধ আবৃত্তি করতে পারিনে—এও কিন্তু আপনার কর্তব্য, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

কুশারী হাসিয়া বলিলেন, তাই হবে মা। এই বলিয়া তিনি বেলার দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, যাইবার সময় আমিও কোনমতে একটা নমস্কার সারিয়া লইলাম।

তিনি চলিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী কহিল, আজ তোমাকে একটু সকাল সকাল নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে হবে।

কেন বল ত?

দুপুরবেলা একবার সুনন্দার বাড়িতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে কেন? তোমার বাহন রতন আছে ত?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, ও বাহনে আর কুলোবে না, তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আর কোথাও আমি একপাও নড়িচি নে।

বললাম, আচ্ছা, তাই হবে।

আট

পূর্বেরি বলিয়াছি, একদিন সুনন্দা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহাকে পরমাত্মীর মত কাছে পাইয়াছিলাম। ইহার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত করিয়া না বলিলেও কথাটাকে প্রত্যয় না করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটা বিশ্বাস করান শক্ত হইবে হয়ত। অনেকেই মনে করিলেন ইহা অদ্ভুত ; হয়ত, অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ-সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙ্গালী, বাঙ্গলাদেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের এমন হয় তাহা ত কখনো দেখি নাই! তা বটে। কিন্তু প্রত্যক্ষরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এ দেশেরই মানুষ এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তব্বাচ ইহা সত্য।

রাজলক্ষ্মী ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি তাহাদের ডাদা প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া কোন্ধ্যম একটু দ্বায়া আছে বোঝ করিতেছি, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা আসিয়া কহিল, আসুন, ভেতরে আসুন।

তর্কালঙ্কারমশাই কোথায়? বিজ্ঞান করছেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না, তিনি যাতে গেছেন। মা আছেন, আসুন। বলিয়া সে অগ্রবর্তী হইল, এবং যথেষ্ট বিধাভরেই আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। একদা কোনকালে হয়ত এ বাটীর সদর দরজা কোথাও ছিল, কিন্তু সম্ভ্রান্তি তাহার চিহ্ন পর্বত বিলুপ্ত। একএব দ্বতপূর্ব একটা টেকশালার পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করার নিশ্চয়ই ইহার মর্জনা লঙ্ঘন করি নাই। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সুনন্দাকে দেখিলাম। উল্লিখ-কৃষ্টি বস্ত্রের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই বাড়িটির মতই একেবারে আভরণবর্জিত। সম্মুখের অপরিসর ব্যাঙ্গাচার একধারে মুড়ি ডাকিতেছিল,—বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া,—আমাকে জীর্ণ একখানি কবলের আসন পাতিয়া নিম্না নমস্কার করিল। কহিল, কসুন। ছেলোটিকে বলিল, ভঁজর, উনুনে আঙন আছে, একটু তামাক সেজে লাও বাবা। রাজলক্ষ্মী বিনা আসনে পূর্বেরি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার দ্রুতি চাহিয়া ঈর্ষ সলজ্জ হাস্যে কহিল, আপনারকে কিন্তু পান নিজে পারব না, পান: আমাদের বাড়িতে নেই।

আমরা কে, অজয় বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে তাহার গুরুপতীর কথায় সহসা অভ্যস্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, নেই? তাহলে পান বুঝি আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে না?

সুনন্দা তাহার মুখের দিকে একমুহূর্ত মুখ টিপিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ওটা হঠাৎ আজ ফুরিয়ে গেছে, না কেবল হঠাৎ একদিনই ছিল অজয়? এই বলিয়া সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, ও-বিবাহের ছোট মোহন্তাঙ্কুরের আসবার কথায় এক পরসার পান কেনা হয়েছিল,—সে প্রায় দিন দেশের কথা। এই! এতেই আমার অজয় একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে, পান হঠাৎ ফুরাল কি করে? এই বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। অজয় মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, বাঃ—এই বুঝি! তা বেশ ত, হলই বা ফুরোলই বা—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে সদয়কণ্ঠে কহিল, তা সত্যিই ত ভাই, ত পুরুষমানুষ, ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে!

অজয় একজনকে তাহার অনুকূল পাইয়া কহিতে লাগিল, দেখুন ত! দেখুন ত! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা তেমনি সহাস্যে বলিল, ঠা, মা ভাবেন বৈ কি! না দিদি, আমার অজয়ই হ'ল বাড়ির গিন্নী—ও সব জানে। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে, মায় বাবুগিরি পর্যন্ত—এইটেই ও স্বীকার করতে পারে না।

কেন পারব না! বাঃ—বাবুগিরি কি ভাল! ও ত আমাদের—, বলিতে বলিতে কথাটা আর শেষ না করিয়াই সে বোধ করি আমার জন্য তামাক সাজিতেই বাহিরে প্রস্থান করিল।

সুনন্দা কহিল, বামুন-পাণ্ডের ঘরে হতুর্কীই যথেষ্ট, বুড়লে এক-আধটা সুপরিও হয়ত পাওয়া যেতে পারে—আচ্ছা, আমি দেখছি,—এই বলিয়া সেও যাইবার উদ্যোগ করিতেই রাজলক্ষ্মী সহসা তাহার আঁচল ধরিয়া কহিল, হতুর্কী আমার সইবে না ভাই, সুপরিতেও কাজ নেই। তুমি একটুখানি আমার কাছে স্থির হয়ে বোসো, দুটো কথা কই। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে পার্শ্বে বসাইল।

অতিথোর দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া কলকালের নিমিত্ত উভয়েই নীরব রহিল। এই অবকাশে আমি আর-একবার নতুন করিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া লইলাম। প্রথমেই মনে হইল, বস্তুতঃ এই দারিদ্র্য জিনিসটা সংসারে কতই না অর্থহীন, একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে। এই যে আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী-ঘরের সামান্য একটি মেয়ে, বাহির হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই—না আছে রূপ, না আছে বস্তু-অলঙ্কার; এই ভয়-গৃহের যেমিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অ-অনটনের ছায়া—কিন্তু তবুও সে যে ওই ছায়ামাত্রই, তার বেশি কিছু নয়, সেকথাও যেন সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকী থাকে না। অভাবের দুঃখটাকে এই মেয়েটি কেবলমাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিবেদন করিয়া দূরে রাখিয়াছে—জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এতবড় সাহস তাহার নাই। অথচ মাসকয়েক পূর্বেও ইহার সমস্তই ছিল—ঘরবাড়ি, লোকজন, আত্মীয়-বন্ধু—সচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিল না—ওধু একটা কঠোর অনায়েব ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে এক্ষণে জীবনব্যয় ত্যাগ করার মত—মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলাম সুনন্দার বুঝি বয়স হয়েছে। ও হরি! একেবারে ছেলেমানুষ!

অজয় বোধ হয় তাহার গুরুদেবের ঈকান্তেই আমাক সাজিয়া আনিতেছি,—, সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ছেলেমানুষ কিরকম! ওই অত বড় বড় ছেলে যার, তার বয়স বুঝি কম! এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। চমৎকার স্বচ্ছ সরল হাসি। অজয় নিজেই উনুন হইতে আগুন লইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় পরিহাস করিয়া কহিল, কি জানি কি জ্বাভের ছেলে বাবা তুমি, কাজ নেই তোমার উনুন জ্বুয়ে। আসল কথা, স্ফল্লেখ অজায় চুপী হইতে উঠানো শব্দ বলিয়া সে আপনি গিয়া আগুন তুলিয়া কলিকটের উপরে রাখিয়া দিয়া অজয়ের হাতে দিল, এবং হাসিমুখে কিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে

উপবেশন করিল। সাধারণ পতীরমণী-সুলভ হাসি-তামাশা হইতে আরম্ভ করিয়া কথার-বার্তার আচরণে কোনখানে কোন বিশেষত্ব ধরিবার জো নাই, অথচ, ইতিমধ্যে যে সামান্য পরিচর্যটুকু তাহার পাইয়াছি তাহা কতই না অসামান্য। এই অসাধারণতার হেতুটা পরকণ্ঠেই আমাদের দু'জনের কাছেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

অজয় আমার হাতে ইঁকাটা দিয়া বলিল, মা, ওটা তাহলে তুলে রেখে দি'?

সুনন্দা ইন্দিতে সার নেওয়ার তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, আমারই অদূরে একখণ্ড কাঠের সিঁড়ার উপর মস্ত মোটা একটা পুঁথি এলোমেলোভাবে খোলা পড়িয়া আছে। এতক্ষণ কেহই উহা দেখি নাই। অজয় তাহার পাতাগুলি ওছাইয়া তুলিতে তুলিতে ক্ষুরবরে কহিল, মা, 'উৎপত্তি-প্রকরণ'টা ও আজো শেষ হ'ল না, কবে আর হবে! ও আর হবেই না। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কিসের পুঁথি অজয়?

যোগবান্ধি।

তোমা? মা মুড়ি ভাজছিলেন আর তুমি শোনছিলেন?

না, আমি মার কাছে পড়ি।

অজয়ের এই সরল ও সংকিশ্ন উদ্ভূত সুনন্দা হঠাৎ যেন লজ্জায় রাসা হইয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি কহিল, পড়াবার মত বিদ্যা ওর মায়ের ছাই আছে। না দিদি, দুপুরবেলা একলা সংসারে কাজ করি; উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না, হেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায় তার বারো আনা আমি ওনতেই পাই নে। ওর কি, যা হোক একটা বলে দিলে।

অজয় তাহার যোগবান্ধি লইয়া প্রস্থান করিল। রাজলক্ষ্মী গভীরমুখে ছির হইয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্ত-কয়েক পরে সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাড়িটা আমার কাছাকাছি হ'লে আমিও তোমার চেলা হয়ে যেতুম ভাই। এতে ক জানিনে কিছুই, তাতে আর্থিক-পুঞ্জোর কথাগুলোও যদি ঠিকমত বলতে পারতুম!

মস্ত্রোচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ আক্ষেপ আমি অনেক ওনিয়াছি—ওটা আমার অভ্যাস ছিল; কিন্তু সুনন্দা এই প্রথমে ওনিয়াও কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র। কি জানি সে কি মনে করিল। হয়ত ভাবিল, যে তাৎপর্য বুঝে না, প্রয়োগ জানে না, শুধু অর্থহীন আবৃত্তির পরিতৃপ্ততার তার এত দৃষ্টি কেন? হয়ত বা ইহা তাহার কাছেও নূতন নয়,—আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মুখে এমনি সঙ্কল্প লোভ ও মোহের কথা সে অনেক ওনিয়াছে, ইহার উত্তর নেওয়া বা প্রতিবাদ করাও আর প্রয়োজন মনে করে না। অথবা এ সকল কিছু নাও হইতে পারে, কেবল স্বাভাবিক বিনয়বশেই মৌন হইয়া রহিল। তবুও এ কথাটা ত মনে না করিয়া পারিলাম না, সে যদি আজ তাহার এই অপরিচিত অতিথিকে নিতান্তই সাধারণ মেয়েদের সমান করিয়া, ছোট করিয়া দেখিয়া থাকে ত আমার একদিন তাহার অতিশয় অনুতাপের সহিত মত বদলাইবার প্রয়োজন হইবে।

রাজলক্ষ্মী চোখের পলকে আপনাকে সামলাইয়া লইল। আমি জানি কেহ হী করিলে সে তাহার মনের কথা বুকিতে পারে। আর সে মস্ত-তস্তের ধার দিয়াও গেল না। এবং একটু পরেই নিহক বরকরা ও গৃহস্থালীর কথা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের মৃদু-কঠোর সমস্ত আলোচনা আমার কানেও গেল না, কান দিবার চেষ্টাও করিলাম না। বরঞ্চ, তর্কালঙ্কারের খেলাে ইঁকার অজয়-সদৃশ শুক সূকঠোর তামাকু গ্রাণপণ করিয়া নিঃশেষ করিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই দৃষ্টি রমণী অস্পষ্ট-মৃদুবরে সংসারব্যথা সম্বন্ধে কোন জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে লাগিল, সে তাহারাই জানে; কিন্তু তাহাদেরই অদূরে ইঁকা হাতে নীরবে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, আজ সহসা একটা কঠিন প্রহের উত্তর পাইয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিকী অভিযোগ আছে, মেয়েদের আমরা হীন করিয়া রাখিয়াছি। এই শব্দ কাজটা যে কেমন করিয়া করিয়াছি এবং কোথায় উহার প্রতিফল, একথা অনেকের অনেক নিক দিয়া আমি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আজ সুনন্দাকে ঠিক এমন করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে বোধ করি সংশয় ভিন্নমত রহিয়াই বহিত।

মেয়ে ও বিশেষে রক্ষারি স্ত্রী-স্বাধীনতা কতই না দেখিয়াছি। ইহার যে নন্দা বর্মানুলুকে পা দিয়াই

চোখে পড়িয়াছিল তাহা ভুলিবার জো কি! জন-তিনেক ব্রহ্মসুন্দরী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া একটা বণ্ডামার্কী পুরুষকে আখপেটা করিতেছেন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত ও ঘর্মাক্ত-কলেবর হইয়া উঠিয়াছিলাম। অত্যা মুঞ্চচক্ষে নিরীক্শ করিয়া বলিয়াছিল, 'শ্রীকান্তবাবু, আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা যদি এমনি—'। আমার খুড়ামশাই একবার জন-দুই মারোয়াড়ী রমণীর নামে নাতিশ করিতে গিয়েছিলেন, তাহারা রেলগাড়িতে নাকি খুড়ার নাক ও কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল। ওনিয়া খুড়ীমা আমায় দৃংখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত! থাকিলে আমার খুড়ামশাই নিশ্চয় ঘোরতর আপত্তি করিতেন, বলা যায় না। ইহাই যে কোথায় এবং কিভাবে হয়, সুনন্দার ভগ্ন-গৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া আজ নিঃশেষে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম। কেবল একটা 'আসন' বলিয়া অভ্যর্থনা করা ছাড়া সে আমার সহিত দ্বিতীয় বাঙ্গাল্যাপ করে নাই, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও যে কোন বড় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও নয়, কিন্তু সেই যে অজয়ের মিথ্যা আড়ম্বরের প্রভৃঙ্করে হাসিমুখে জানাইয়াছিল, এ বাড়িতে পান নাই; কিনিবার মত সামর্থ্য নাই,—এখানে উহা দুর্লভ বস্তু! তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাটা যেন আমার কানে বাজিতেই ছিল। তাহার সন্মোচলেশহীন এইটুকু পরিহাসে দারিদ্র্যের সমস্ত লজ্জা কোথায় যে লজ্জায় মুখ লাকাইল, সারাক্ষণের মধ্যে আর তাহার দেখাই মিলিল না। এই মুহূর্তেই জানা গেল এই ভাঙ্গা বাড়ি, এই জীর্ণ গৃহসজ্জা, এই দুঃখ দৈন্য অনটন—এই নিরাভরণ মেয়েটি তাহাদের অনেক উপরে। অধ্যাপক পিতা দিবার মধ্যে তাহার কন্যাকে তাহার অশেষ যত্নে ধর্ম ও বিদ্যাদান করিয়া স্বত্বরকূলে পাঠাইয়াছিলেন, তৎপরে সে জুতা-মোজা পরিবে কি ঘোমটা খুলিয়া পথে বেড়াইবে, কিংবা অন্যান্যের প্রতিবাদ কারতে স্বামী-পুত্র লইয়া ভাঙ্গা বাড়িতে বাস করিবে, তথায় মুড়ি ভাজিবে, কি যোগবিশিষ্ট পড়াইবে, সে চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মেয়েদের আমরা হীন করিয়াছি কি না এ তর্ক নিস্ত্রয়োজ্ঞান, কিন্তু এই দিয়া যদি তাহাদের বঞ্চিত করিয়া থাকি ত সে কর্মের ফলভোগ অনিবার্য। অজয়ের 'উৎপত্তি প্রকরণ' উঠিয়া না পড়িলে সুনন্দার লেখাপড়ার কথা আমরা জানিতেও পারিতাম না। তাহার মুড়ি-ভাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া সরল ও সামান্য হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়া যোগবিশিষ্টের ঋজু কোথাও উঁকি মারে নাই। অথচ স্বামীর অবর্তমানে অপরিচিত অতিথির অভ্যর্থনা করিতেও তাহার কোনখানে বাধিল না। নির্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের সে এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে, শাসন ও সংশয়ের দড়ি-দড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কলনও বোধ করি কোনদিন তাহার স্বামীর মনে উঠে নাই। অশ্চ ইহারই গ্রহণ দিতে ঘরে ঘরে কত প্রহরীই না সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটে গিয়াছিলেন। তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এদিকে বেলাও পড়িয়া আসিতেছিল। এই দরিদ্র গৃহ-লক্ষ্মীর কত কাজই না পড়িয়া আছে মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল এবং বিদায় লইয়া কহিল, আজ চললুম, যদি বিরক্ত না হও ত আবার আসব।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমারও কথা কইবার লোক কেউ নেই, যদি অভয় দেন ত মাঝে মাঝে আসব।

সুনন্দা মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

পথে আসিতে আসিতে রাজলক্ষ্মী কহিল, মেয়েটি চমৎকার সোনার স্বামী তেমনি স্ত্রী। ভগবান এদের বেশ মিলিয়েছেন।

আমি কহিলাম, হী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এদের ও-বাড়ির কথাটা আজ আর তুললুম না। কুশারীমহাশয়কে আজও ভাল চিনতে পারিনি, কিন্তু এরা দুটি জাই বড় চমৎকার।

বলিলাম, খুব সম্ভব তাই; কিন্তু তোমার ত মানুষ বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, দেখ না চেষ্টা করে যদি এদের আবার মিল করে দিতে পার।

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তোমাকে বশ করাটা

তার প্রমাণ নয়। চেষ্টা করতে ওটা অনেকেই পারত।

বলিলাম, হতেও পারে। তবে চেষ্টার যখন সুযোগ ঘটেনি তখন তর্ক করার ফল হবে না।

রাজলক্ষ্মী ভেমনি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা গো আচ্ছা। দিন এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে ভেবে রেখে না।

আজ সারাদিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ন-সূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাস্তা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবতী একঝাড় বীণ ও গোটা-দুই তেঁতুলগাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাস্তিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায়, নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব মনে হইল। হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয়; হয়ত যে আলো আর এক নব্বীর কাছ হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপক্লপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আসুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল ত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডান দিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে। কহিলাম, বস্তু থাকলে ছায়া পড়ে—বোধ হয় ওটা আর নেই।

আগে ছিল?

লক্ষ্য করে দেখিনি, ঠিক মনে পড়ছে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আমার পড়ছে—ছিল না। এতটুকু বয়স থেকে ওটা দেখতে শিখেছিলাম। এই বলিয়া সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লেগেছে। মনে হচ্ছে এতদিন পরে একটা সঙ্গী পেলাম। এই বলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল। আমি কিছু কহিলাম না, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, সে ঠিক সত্য কথাটাই কহিয়াছে।

বাটা আসিয়া পৌছিলাম। কিন্তু ধূলা-পা ধূইবার অবকাশ মিলিল না, শান্তি ও তৃপ্তি দুই-ই একই সঙ্গে অভর্হিত হইল। দেখি, বাহিরের উঠান ভরিয়া জন দশ-পনের লোক বসিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সসন্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রতন বোধ হয় এতক্ষণ বকুতা করিতেছিল, তাহার মুখ উত্তেজনা ও নিগূঢ় আনন্দে চক্‌চক করিতেছে; কাছে আসিয়া কহিল, মা, বার বার যা বলেচি ঠিক তাই হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী অধীরভারে কহিল, কি বলেছিলি আমার মনে নেই, আর একবার বল।

রতন কহিল, নব্বুকে পুলিশের লোক হাতকড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেছে।

বেঁধে নিয়ে গেছে! কখন? কি করেছিল সে?

মালতীকে সে একেবারে খুন করে ফেলেছে।

বলিস কি রে! তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না না, মাঠাকুরন, একেবারে খুন করেনি। খুব মেরেছে বটে, কিন্তু মেরে ফেলেনি।

রতন চোখ রাস্তাইয়া কহিল, তোরা কি জানিস? তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথা? তোদের সুদ্ধ হাতে দড়ি পড়তে পারে জানিস?

ওনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ সরিবার চেষ্টাও করিল। রাজলক্ষ্মী রতনের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুই ওধারে দাঁড়া গে যা। যখন জিজ্ঞেস করব বলিস। ভিড়ের মধ্যে মালতীর বুড়া বাপ পাণ্ডুমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা সবাই তাহাকে চিনিভাম, ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি হয়েছে সত্যি বল ত বিন্দনাথ! লুকালে কিংবা মিছে কথা কইলে বিপদে পড়তে পার।

বিন্দনাথ বাহা কহিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কাল রাত্রি হইতে মালতী তাহার পিতার বাটিতে ছিল। আজ দুপুরবেলা সে পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্বামী নবীন কোথায় লুকাইয়া ছিল, একাকী পাইয়া বিষম প্রহার করিয়াছে—এমন কি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মালতী কাদিতে কাদিতে প্রথমে এখানে আসে, কিন্তু আমাদের দেখা না পাইয়া কুশারীমহাশয়ের সন্ধানে কাছারি বাটিতে যায়,

সেখানে তাঁহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া সোজা থানায় গিয়া সমস্ত মারধরের চিহ্ন দেখাইয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবীনকে ধরাইয়া দেয়। সে তখন ঘরেই ছিল, নিজের হাতে দুটো ঢাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে বসিতেছিল, সুতরাং পলাইবার সুযোগ পায় নাই। দারোগাবাবু লাথি মারিয়া ভাত ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। সে মালতীকে যেমন দেখিতে পারিত না, নবীনের প্রতিও তেমনি প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া আমার উপর। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একশ বার বলেছি, ছোটলোকদের এসব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে ডুবি যেয়ো না। যাও এখন সামলাও গে—আমি কিছু জানিনে। এই বলিয়া সে আর কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, নবনের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আর ও হারামজাদী যদি মরে থাকে ত আপদ গেছে।

কিছুকালের নিমিত্ত আমরা সবাই যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। বকুনি খাইয়া মনে হইতে লাগিল কাল এমনি সময়ে মধ্যাহ্ন হইয়া ইহাদের যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা ভাল হয় নাই। না করিলে এ দুখটনা হয়ত আজ ঘটিত না। কিন্তু আমার মতলব ভাল ছিল। ভাবিয়াছিলাম, প্রেমলীলার যে অদৃশ্য চাপা স্রোতটা অন্তরালে বহিয়া সমস্ত পাড়াটাকে নিরন্তর ঘুরাইয়া তুলিতেছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে হয়ত ভাল হইবে। দেখিতেছি ভুল করিয়াছি। কিন্তু তার পূর্বে সমস্ত ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা প্রয়োজন। মালতী নবীন ডোমের স্ত্রী বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া পর্যন্ত দেখিতেছি, সমস্ত ডোমপাড়ার মধ্যে সে একটা অগ্নিস্থলিঙ্গ বিশেষ। কখন কোন পরিবারের মাঝে সে যে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিবে, এ লইয়া কোন মেয়ের মনেই শাস্তি নাই। এই যুবকী মেয়েটা যেমন সূত্রী তেমনি চপল। সে কাঁচশোকার টিপ পরে, নেবুর ডেল মাখিয়া চুল বাঁধে, পরনে তার মিলের চণ্ডা কালোপেড়ে শাড়ি, তাহার মাথার ঘোমটা পথে-ঘাটে ঘাড়ে নামিয়া পড়িবার কোন বাধা নাই। এই মুখরা মেয়েটাকে মুখের সামনে বলিবার কাহারো সাহস নাই, কিন্তু অগোচরে তাহার নামের সঙ্গে যে বিশেষণ পাড়ার মেয়েরা যোগ করিয়া দেয়, তাহা লেখা চলে না। প্রথমে নাকি মালতী নবীনের ঘর কবিত্তে চাহে নাই, বাপের বাড়িতেই থাকিত। বলিত, ও আমাকে খাওয়াবে কি? এবং সেই থিকারেই নাকি নবীন দেশভাগী হইয়া কোথায় কোন শহরে গিয়া লিয়াদাগিরি চাকরি করিয়া বছর-খানেক হইল গ্রামে ফিরিয়াছে। আসিবার সময় মালতীর রূপার পৈচা, মিহি সুতার শাড়ি, রেশমের ফিতা, এক বোতল গোলাপজল এবং একটা টিনের তোরঙ্গ সঙ্গে আনিয়াছে এবং এইগুলির পরিবর্তে স্ত্রীকে শুধু ঘরে আনা নয়, তাহার হৃদয় পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু এ সকল আমার শোনা কথা। আবার কবে হইতে যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগিল, ঘাটে যাবার পথে আড়ি পাড়িয়া ফাঁস করিতে লাগিল, এবং অতঃপর যাহা শুরু হইয়া গেল, আমি ঠিক জানি না। আমরা ত আসিয়া অবধি দেখিতেছি, ইহাদের বাক-ও হাত-যুদ্ধ কোনদিন কামাই যায় না। মাথা ফাটাফাটি কেবল আজ নয়, আজও দিন-দুই হইয়া গেছে—বোধ করি এই জনাও আজ নবীন মোড়ল স্ত্রীর মাথা ভাঙ্গিয়া আসিয়াও নিশ্চিন্তচিত্তে আহায়ে বসিতেছিল, কল্পনাও করে নাই পুলিশ ডাকিয়া মালতী তাহাকে বাঁধিয়া চালান দিবে। কাল সকালে প্রভাতী রাগিনীর ন্যায় মালতীর তীব্রকণ্ঠে যখন গগন ভেদ করিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ঘরের কাছ ফেলিয়া কাছে আসিয়া কহিল, বাড়ির পাশে রোজ এ হাঙ্গামা সহ্য হয় না—নাহয় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে হতভাগীকে তুমি দূর করে দাও।

বলিলাম, নবীনটাও কম পাজি নয়। কাজকর্ম করবে না, কেবল টেরি কেটে আর মাছ ধরে বেড়াবে, আর হাতে পরসা পেলেই ভাড়ি খেয়ে মারপিট শুরু করবে। বলা বাহুল্য এ সকল সে শহরে শিখিয়া আসিয়াছিল।

দুই-ই সমান। বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, কাজকর্ম করবেই বা কখন? হারামজাদী তার সময় দিলে ত!

বক্তব্যঃ অহস্যা হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের গালিগালাজ ও মারামারির মকদ্দমা আরও বার-দুই করিয়াছি—কোন ফল হয় নাই। আজ ডাবিলাম খাওয়া-দাওয়ার পরে ডাকিইয়া আনিয়া এইবার শেষ

মীমাংসা করিয়া দিব। কিন্তু ডাকিতে হইল না, দুপুরবেলা পাড়ায় মেয়ে-পুরুষে বাড়ি ভরিয়া গেল। নবীন কহিল, বাবুশায়, ওকে আর আমি চাইনে—নষ্ট মেয়েমানুষ। ও আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাক। মুখরা মালতী ঘোমটার ভিতর হইতে কহিল ও আমার শাখা-নোয়া খুলে নিক। নবীন বলিল, তুই আমার রূপোর পৈচৈ ফিরিয়ে দে।

মালতী তৎক্ষণাৎ হাত হইতে সে-সুইগাছা টানিয়া খুলিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

নবীন কুড়াইয়া লইয়া কহিল, আমার টিনের তোয়ঙ্গ তুই নিতে পাবিনে।

মালতী কহিল, আমি চাইনে। এই বলিয়া সে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল।

নবীন তখন বীরদর্শে অগ্রসর হইয়া মালতীর শাখা পটপট করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল এবং নোয়াগাছটা টানিয়া খুলিয়া প্রাচীর ভিত্তিইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, যা, তোকে বিধবা করে দিলাম।

আমি ত আবাক লইয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন বুঝাইয়া বলিল যে, এক্সপ না হইলে মালতীর নীচা করা আর হইত না—সমস্তই ঠিকঠাক আছে।

কথায় কথায় ব্যাপারটা আরও বিশদ হইল। বিশেষত্বের বড়জামায়ের ভাই আছে ছয় মাস ধরিয়া ইটাইটি করিতেছে। তাহার অবস্থা ভাল, বিতকে সে কুড়ি টাকা নগদ দিবে, এবং মালতীকে পায়ে মল, হাতে রূপোর চুড়ি এবং নাকে সোনার নখ দিবে বলিয়াছে, এমন কি এগুলি সে বিত্তর কাছে জমা রাখিয়া পর্যন্ত দিয়াছে।

ওনিয়া সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ঠেকিল। কিছুদিন হইতে যে একটা কদম্ব বড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং না জানিয়া হয়ত আমি তাহার সাহায্যই করিলাম। নবীন কহিল, আমি তাই চাই। শহরে গিয়ে এবার মজা করে চাকরি করব—তোর মত অমন দশগুণা বিয়ে করব। রাষ্ট্রমন্দির হরি মোড়ল ত তার মেয়ের জন্য সাধাসাধি করছে, তার পায়ের নোখেও তুই লাগিস নে। এই বলিয়া সে তাহার রূপার পৈচা ও তোয়ঙ্গর চাবি ট্যাঁকে ওজিয়া চলিয়া গেল। এই আশ্চর্যজনক সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে, তাহার শহরের চাকরি কিংবা হরি মোড়লের মেয়ে কোনটার আশাই তাহার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

রতন আসিয়া কহিল, বাবু, মা বলছেন এসব নোংরা কাণ্ড বাড়ি থেকে বিদায় করুন।

আমাকে করিতে কিছু হইল না, বিশেষত্ব মোড়ল তাহার মেয়েকে লইয়া উঠিয়া ধাঁড়াইল; কিন্তু পাছে আমার পায়ের ধুলো লইতে আসে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, বাক, যা হইল ভালই হইল। মন যখন ভাঙ্গিয়াছে এবং উপায় যখন আছে, তখন ব্যর্থ আক্রোশে নিত্য-নিয়ত মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘর করার চেয়ে এ ভাল।

কিন্তু আজ সুনন্দার বাটা হইতে ফিরিয়া ওনিলাম, গত কল্যাকার নিষ্পত্তি অমন নিছক ভালই হয় নাই। সদ্যবিধবা মালতীর উপর নবীন স্বামিভের দাবি-দাওয়া সম্পূর্ণ পরিভাগ্য করিলেও মারপিটের অধিকার ছাড়ে নাই। সে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় গিয়া হয়ত সমস্ত সকলটা লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছে এবং এক সময়ে একাকী পাইয়া বিষম কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটাই বা গেল কোথায়?

সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিমে জানালা দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, খুব সম্ভব মালতী পুলিশের ভয়ে কোথায় লুকাইয়া আছে, কিন্তু নবীনকে সে যে ধরাইয়া দিয়াছে, ভালই করিয়াছে। হতভাগ্যর উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—মেয়েটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকিয়া কলকাল ঘমকিয়া ধাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। নীরবে বাহির হইয়া পাশের ঘরের চৌকাঠে পা দিয়াই কিন্তু কি একটা ভারী জিনিস পড়ায় শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অশ্রুট চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখি মস্ত একটা কাপড়ের পুটলি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা ধরিয়া তাহার উপর মাথা ঝুড়িতেছে, রাজলক্ষ্মীর হাতের প্রদীপটা পড়িয়া গেলোও জ্বলিতেছিল, তুলিয়া ধরিতেই সেই মিহি সূতার চওড়া কালাপেড়ে শাড়ি চোখে পড়িল।

বলিলাম, এ মালতী!

রাজলক্ষ্মী কহিল, হতভাগী, সন্ধ্যাবেলায় আমার ছুঁলি? ইস্! এ কি বল ত?

শ্রীপের আলোকে ঠাঠর করিয়া দেখিলাম, তাহার মাথার ক্ষত হইতে পুনরায় রক্ত ঝরিয়া অপরের পা দুখানি রাসা হইয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগিনীর কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িল ; কহিল, মা, আমাকে বাঁচাও—

রাজলক্ষ্মী কটুকণ্টে কহিল, কেন তোর আবার হ'ল কি?

সে কাঁদিয়া কহিল, দারোগা বলচে কাল সকালেই তাকে চালান দেবে—দিলেই পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে।

আমি কহিলাম, যেমন কর্ম তেমনি শাস্তি হওয়া ত চাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ'লই বা জেল, তাতে তোর কি?

মেয়েটার কান্না যেন দমকা ঝড়ের মত তাহার বুক ফাটিয়া উঠিল ; বলিল, বাবু বলেন বলুন, মা, ও-কথা তুমি ব'লো না—তার মুখের ভাত আমি খেতে দিইনি। বলিতে বলিতে সে আবার মাথা কুটিতে লাগিল ; কহিল, মা, আমাদের তুমি এইবারটি বাঁচিয়ে দাও, আমরা বিদেশে কোথাও চলে গিয়ে ভিক্ষে করে খাব। নইলে তোমারি পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে মরব।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল ; ধীরে ধীরে তাহার একরাশ এলো চুলের উপর হাত রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই চুপ কর—আমি দেখছি।

দেখিতেও হইল। রাজলক্ষ্মীর বাস্তব হইতে শ'-দুই টাকা সেই রাত্রেই কোথায় গিয়া অস্তহিত হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু নবীন মোড়ল কিংবা মালতী কাহাকেও সকাল হইতে গঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া গেল না।

নয়

তাহাদের সম্বন্ধে সবাই ভাবিল, যাক, বাঁচা গেল! রাজলক্ষ্মীর তুচ্ছ কথায় মন দিবার সময় ছিল না ; সে উহাদের দুই-চারদিনেই বিস্মৃত হইল ; মনে পড়িলেও কি যে মনে করিত সেই জ্ঞানে। তবে, পাড়া হইতে যে একটা পাপ বিদায় হইয়াছে তাহা অনেকেই ভাবিত। কেবল রতন খুশি হইল না। সে বুদ্ধিমান, সহজে মনের কথা ব্যক্ত করে না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইত জিনিসটা সে একেবারেই পছন্দ করে নাই। তাহার মধ্যস্থ হইবার, কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ গেল, ঘরের টাকা গেল—এত বড় একটা সমারোহ কাণ্ড রাতারাতি কোথা দিয়া কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন নিজেকেই অপমানিত, এমন কি আত্মজ্ঞান করিল। গপি সে চুপ করিয়াই রহিল। আর বাটার যিনি কর্ত্তা, তাহার ত কোনদিকে খেয়ালমাত্র নাই। যত দিন কাটিতে লাগিল সুনন্দা ও তাহার কাছ হইতে মন্ত্র-তন্ত্রের উচ্চারণ-গুঞ্জির লোভ তাহাকে যেন পাইয়া বসিতে লাগিল। কোনদিন ভাষা যাওয়ার তাহার বিরাম ছিল না। সেখানে সে কি পরিমাণে যে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতেছিল তাহা আমি জানিব কি করিয়া? আমি কেবল জানিতেছিলাম তাহার পরিবর্তন। তাহা যেমন দ্রুত, তেমনি অভাবিত। দিনের বেলায় আহারটা আমার চিরকার একটু বেলাতেই সাজ হইল। রাজলক্ষ্মী বরাবর আপত্তি করিয়াই আসিয়াছে, অনুমোদন কখনও করে নাই—সে ঠিক ; কিন্তু সে ক্রটি সংশোধনের জন্য কখনও আমাকে লেশমাত্র চেষ্টা করিতেও হয় নাই। কিন্তু আজকাল দৈবাৎ কোনদিন অধিক বেলা হইয়া গেলে মনে মনে লজ্জা বোধ করি। রাজলক্ষ্মী বলিত, তুমি রোগা-মানুষ তোমার এত দেরি করা কেন? নিজের শরীরের পানে না চাও, দাসী-চাকরদের মুখেব দিকে ত চাইতে হয়। তোমার কুঁড়েমিতে তারা যে মারা যায়। কথাওলে ঠিক সেই আগেকার, তুই ঠিক তা নয়। সেই সময়েই প্রজন্মের সুর যেন আর বাজে না—বাজে বিরাটর এমন একটা কুশাগ্র স্তম্ভ কটুতা, যাহা চাকর-দাসী কেন হয়ত আমি ছাড়া ভগবানের কানেও তাহার নিগূঢ় রেশটুকু ধরা পড়ে না। তাই কুশাগ্র উদ্বেক না হইলেও দাসী-চাকরদের মুখ চাহিয়া ডাড়াডাড়ি কোনমতে ব্রাহ্মণ্যের সারিয়া লইয়া তাহাদের ছুটি করিয়া দিতাম। কিন্তু এই অনুগ্রহের প্রতি চাকর-দাসী বাহারা, তাহাদের আগ্রহ ছিল কি উপেক্ষা ছিল, সে তাহারাই জানে ; কিন্তু রাজলক্ষ্মী দেখিতাম ইহার মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই বাড়ি

হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কোনদিন রতন, কোনদিন বা দারোয়ান সঙ্গে যাইত, কোনদিন বা দেখিতাম সে একাই চলিয়াছে, ইহাদের কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার সময় পর্যন্ত হয় নাই। প্রথমে দুই-চারি দিন আমাকে সঙ্গে যাইতে সাধিয়াছিল। কিন্তু ওই দুই-চারি দিনেই বুঝা গেল, কোন পক্ষ হইতেই তাহাতে সুবিধা হইবে না। হইলও না। অতএব আমি আমার নিরালা ঘরে পুরাতন আলস্যের মধ্যে এবং সে তাহার ধর্ম-কর্ম ও মন্ত্র-তন্ত্রের নবীন উদ্দীপনার মধ্যে নিমগ্ন থাকায় ক্রমশঃই উভয়ে যেন পৃথক হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইতাম, সে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের পথ দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। একাকী সমস্ত দুপুরবেলাটা যে আমার কি করিয়া কাটে, এদিকে খেয়াল করিবার সময় তাহার ছিল না—সে আমি বুঝিতাম। তবুও যতদূর পর্যন্ত তাহাকে চোখ দিয়া অনুসরণ করা যায়, না করিয়া পারিতাম না। পায়ে হাঁটা আঁকাবাঁকা পথের উপর তাহার বিলীয়মান দেহলতা ধীরে ধীরে দূরান্তরালে কোন এক সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত—অনেকদিন সেই সময়টুকুও যেন চোখে আমার ধরা পড়িত না; মনে হইত ওই একান্ত সুপরিচিত চলনখানি যেন তখনও শেষ হয় নাই—সে যেন চলিয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ চেতনা হইত। হয়ত চোখ মুছিয়া আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তার পরে বিছানায় শুইয়া পড়িতাম। কর্মহীনতার দুঃসহ ক্রান্তিবশতঃ হয়ত বা কোনদিন ঘুমাইয়া পড়িতাম—নয়ত নিম্নলিখিত চক্ষে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম। অদূরবর্তী কয়েকটা স্বর্বাঙ্গীতি ব্যবলাগাছে বসিয়া ঘুমু ডাকিত, এবং তাহার সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমদের কোন একটা বাঁশঝাড় এমন একটা একটানা বাখাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে, মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি-বা আমার নিজেব বৃক্কের ভিতর হইতেই উঠিতেছে। ভয় হইত, এমন বুঝি বা আপ বৈশিদিন সহিতে পারিব না। রতন বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে বলিত, বাবু, একবার তামাক দেব কি? এমন কতদিন হইয়াছে, জাগিয়াও সাড়া দিই নাই, ঘুমানোর ভান করিয়াছি। ভয় হইয়াছে, পাছে সে আমার মুখের উপর বেদনার ঘুণাগ আভাসও দেখিতে পায়। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুরবেলায় রাজলক্ষী সুনন্দার বাটিতে চলিয়া গেলে সহসা আমার বর্মাব কথা মনে পড়িয়া বক্তাকালের পবে অভয়াকে একস্থানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যে ফার্মে কাজ করিতাম, তাহার বড় সাহেবকেও একস্থানা পত্র লিখিয়া খবর লইব। কি খবর লইব, কেন লইব, নইয়া কি হইবে, এত কথা তখনও ভাবি নাই। সহসা মনে হইল জানলার সমুখ দিয়া যে রমণী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া দ্বারতপদে সরিয়া গেল, সে যেন চেনা—সে যেন মালতীর মত। উঠিয়া উঁকি মাঝিয়া দেখিবাব চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখা গেল না। সেই মুহূর্তেই তাহার আঁচলের বাস্মা পাড়টুকু আমাদের প্রাচীরের কোণটায় অঙ্কিত হইল।

মাসখানেকের ব্যবধানে ডোমদের সেই শয়তান মেয়েটাকে সবাই একপ্রকার ভুলিয়াছে, আমিই কেবল তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জানি না কেন, আমার মনের একটা কোণে ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটার সেই সন্ধ্যাবেলাকার চোখের জ্বলের এক ফোঁটা ভিজা দাগ তখনও পর্যন্তও মিলায় নাই। প্রায়ই মনে হইত, কি জানি কোথায় তাহারা আছে। জানিতে সাধ হইত, এই গল্পমাটির অসং প্রলোভন ও কুৎসিত যড়যন্ত্রের বেষ্টনের বাহিরে মেয়েটার স্বামীর কাছে থাকিয়া ক্রিভাবে দিন কাটিতেছে! ইচ্ছা করিতাম, এখানে তাহারা আর যেন শীঘ্র না আসে। ফিরিয়া গিয়া চিঠিটা শেষ করিতে বসিলাম। ছত্র-কয়েক লেখার পরেই পদশব্দে মুখ ভুলিয়া দেখিলাম, রতন। তাহার হাতে সাজা কলিকা, ওড়ণ্ডির মাথায় বসিয়া দিয়া নলটি আমার হাতে ভুলিয়া দিয়া কহিল, বাবু, তামাক খান।

আমি ছাড় = ডিয়া জানিইলাম, আচ্ছা।

রতন কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল না। নিঃশব্দে কক্ষকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরম গাভীরের সহিত কহিল, বাবু, এই রতন পারমাণিক যে কবে মরবে তাই কেবল সে জানে না!

তাহার ভূমিকার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল; রাজলক্ষী হইলে বলিত, জানলে লাভ ছিল, কিন্তু কি বলতে এসেচিস বল! আমি কিন্তু শুধু মুখ ভুলিয়া হাসিলাম। রতনের গাভীরের পরিমাপ তাহাতে বিন্দুমাত্র স্ক্র হইল না; কহিল, মাকে সেদিন বলেছিলাম কিনা ছোটগোলের কথা মজবেন না!

তাদের চোখের জলে ডুবে দু'দশ টাকা জলে দেবেন না ; বলুন, বলেছিলাম কি না! আমি জানি, সে বলে নাই। এ সদভিপ্রায় তাহার অন্তরে ছিল বিচিত্র নয়—কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা সে কেন, বোধ হয় আমারও সাহস হইত না। কহিলাম, ব্যাপার কি রতন?

রতন কহিল, ব্যাপার যা বরাবর জানি—তাই।

কহিলাম, কিন্তু আমি যখন এখনও জানিনে তখন একটু খুলেই বল।

রতন খুলিয়াই বলিল। সমস্ত শুনিয়াই মনের মধ্যে যে কি হইল বলা কঠিন। কেবল মনে আছে, ইহার নিষ্ঠুর কদর্যতা ও অপরিসীম বীভৎসতার ভারে সমস্ত চিন্তা একেবারে তিস্ত বিবশ হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল, রতন সবিস্তারে ইহার ইতিবৃত্ত এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যেটুকু সত্য সে ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছে, তাহা এই যে, নবীন মোড়ল সম্প্রতি জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভগিনীপতির সেই বড়লোক ছোটভাইকে স্যাঙা করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে গঙ্গামাটিতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে! মালতীকে একপ্রকার স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ করি বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে রাজলক্ষ্মীর টাকাগুলোর যথার্থই এইভাবে সদস্য হইয়াছে।

সেই রাত্রে আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী এ সংবাদ শুনিла। শুনিয়া কেবল আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রতন, সত্যি নাকি? ছুঁড়িটা সেদিন আচ্ছা তামাশা করলে ত! টাকাগুলো গেল—অবেলায় আমাকে নাইয়ে মারলে!—ও কি, তোমার পাওয়া হয়ে গেল নাকি, তবু চেয়ে শ্বেতে না বসলেই ত হয়?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোনদিনই আমি বৃথা চেষ্টা করি না—আজও চূপ করিয়া রহিলাম। তবে একটা বস্তু উপলব্ধি করিলাম। আজ নানা কারণে আমার একেবারে ক্ষুধা ছিল না, প্রায় কিছুই খাই নাই—তাই আজ সেটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ; কিন্তু কিছুকাল হইতে যে আমার খাওয়া দাওয়া দীর্ঘে দীর্ঘে কমিয়া আসিতেছিল, সে তাহার চোখে পড়ে নাই। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে তাহার নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, ইহার লেশমাত্র কম-বেশি লইয়া তাহার আশঙ্কা ও অভিযোগের অবধি থাকিব না—কিন্তু আজ যে কারণেই হোক একজনকে সেই শোনদৃষ্টি কম্পা হইয়া গেছে বলিয়াই যে অপবের গভীর বেদনাকেও দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া লইয়া নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিনগুলো একভাবেই আরম্ভ হয়, একভাবেই শেষ হয়। আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ কোন দুঃখ-কষ্টের নালিশও নাই। শরীর মোটের উপর ভালই আছে। পরদিন প্রভাত হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল, যথাসীতি মানাহার সমাপ্ত করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলাম, সুমুখের সেই খোলা জানালা এবং তেমনি বাধাহীন উন্মুক্ত শুষ্ক মাঠ। পাঁজি আজ বোধ হয় শেষ কোন উপবাসের বিধি ছিল ; রাজলক্ষ্মীর তাই আজ সেইটুকু সময় অপব্যয় করিতে হইল না—খাসময়ের কিছু পূর্বেই স সূর্য্যাস্তের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অভ্যাসগত বোধ করি বহুক্ষণ তেমনিই চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ স্বপ্নে হইল কালকার অসমাপ্ত চিঠি দুটা আজ শেষ করিয়া বেলা তিনটার পূর্বেই ডাকবাল্পে ফেলা চাই। অতএব আর মিথ্যা কালহরণ না করিয়া আবলম্বে তাহাতেই নিযুক্ত হইলাম। চিঠি দুখানা সম্পূর্ণ করিয়া যখন পড়িতে লাগিলাম, তখন কোথায় যেন বাধা বাজিতে লাগিল, কি যেন একটা না পড়িয়াও থরিতে পারিলাম না। একটা কথা আমার মনে আছে। অভয়াবর পরে রোহিণী-দাদাকে নমস্কার জানাইয়া শেষের দিকে লিখিয়াছি, তোমাদের অনেকদিন খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ, কেমন করিয়া তোমাদের দিন কাটিতেছে, কেবলমাত্র কল্পনা করিয়া ছাড়া জানিবার চেষ্টা করি নাই। হয়ত সুখেই আছ, হয়ত নাই, কিন্তু তোমাদের জীবনযাত্রার এই দিকটাকে সেই যে একদিন ভগবানের হাতে ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পর্দা টানিয়া দিয়াছিলাম, আজও সে তেমনি খুলানো আছে; তাহাকে কোনদিন তুলিবার ইচ্ছা পর্যন্তও করি নাই। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার দীর্ঘকালের নয়, কিন্তু যে অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া একদিন আমাদের পরিচয় আরম্ভ এবং আর একদিন সমাপ্ত হয়, তাহাকে সময়ের মাপ দিয়া মাপিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। যেদিন নিদারুণ রোগাক্রান্ত হই, সেদিন সেই আশ্রয়হীন সুদূর বিদেশে তুমি ছাড়া আমার যাইবার স্থান ছিল না। তখন একটা মুহূর্তের জন্যও তুমি বিধা কর নাই—সমস্ত হৃদয় দিয়া পীড়িতকে গ্রহণ করিয়াছিলে। অথচ তেমনি রোগে,

তেমনি সেবা করিয়া আর কখনো যে কেহ আমাকে বাঁচায় নাই, এ-কথা বলি না ; কিন্তু আজ অনেক দূরে বলিয়া উভয়ের প্রভেদটাও অনুভব করিতেছি। উভয়ের সেবার মধ্যে, নির্ভয়ের মধ্যে, অন্তরের অকপট শুভকামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় স্নেহের মধ্যে গভীর একা রহিয়াছে ; কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটি স্বার্থলেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা, এমন অনির্বচনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র সেবা করিয়াই আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়াছে। আমার আরোগ্যের মধ্যে এতটুকু চিহ্ন রাখিতে একটি পা-ও কখনো বাড়ায় নাই, তোমার এই কথাটাই আজ বারংবার মনে পড়িতেছে। হয়ত অত্যন্ত স্নেহ আমার সহে না বলিয়াই, হয়ত বা স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি, তাহারই জন্য সমস্ত চিন্তা উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ তোমাকে আর একবার মুখোমুখি না দেখা পর্যন্ত ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সাহেবের চিঠিখানাও শেষ করিয়া ফেলিলাম। একসময়ে তিনি আমার সত্যসত্যই বড় উপকার করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছি। প্রার্থনা কিছুই করি নাই, কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে সহসা গায়ে পড়িয়া এমন ধন্যবাদ দিবার ঘটা দেখিয়াও নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করিতে লাগিল। ঠিকানা লিখিয়া খামে বন্ধ করিতে গিয়া দেখি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, এত তাড়াতাড়ি করিয়াও ডাকে দেওয়া গেল না, কিন্তু মন তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিল। মনে হইল এ ভালই হইল যে, কাল আর একবার পড়িয়া দেখিবার সময় মিলিবে।

রতন আসিয়া জানাইল কুশারীগৃহিণী আসিয়াছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, তিনি ত বাড়ি নেই, ফিরে আসতে বোধ করি সন্ধ্যা হবে।

তা জানি, এই বলিয়া তিনি জানালার উপর হইতে একটা আসন টানিয়া লইয়া নিজেই মেঝের উপর পাতিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, কেবল সন্ধ্যা কেন, ফিরে আসতে ত প্রায় রাত হয়েই যায়।

লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিলাম, ধনী-গৃহিণী বলিয়া ইনি অতিশয় দান্তিকা। কাহাবও বাড়ি বড় একটা যান না। এ বাড়ির সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যবহার অনেকটা এইরূপ ; অন্ততঃ এতদিন ধনিকতা করিতে ঠেংসূকা প্রকাশ করেন নাই। ইতিপূর্বে মাত্র বার-দুই আসিয়াছেন। মনিববাড়ি বলিয়া একবার নিজেই আসিয়াছিলেন এবং আর একবার নিমন্ত্রণ রাখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে আজ অকস্মাৎ স্বচ্ছন্দ আগমন করিলেন এবং বাটাতে কেহ নাই জানিয়াও—আমি ভাবিয়া পাইলাম না।

আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আজকাল ছোটগিন্নীর সঙ্গে ত একেবারে এক-আত্মা।

না জানিয়া তিনি একটা ব্যথার স্থানেই আঘাত করিলেন ; তথাপি ধীরে ধীরে বলিলাম, হী, প্রায়ই ওখানে যান বটে। কুশারীগৃহিণী কহিলেন, প্রায় ? রোজ, রোজ ! প্রত্যহ ! কিন্তু ছোটগিন্নী কি কখনও আসে ? একটি দিনও না ! মনির মান রাখবে সুনন্দা সে মেয়েই নয় ! এই বলিয়া তিনি আমার মুখের প্রতি চাহিলেন। আমি একজনের নিত্য যাওয়ার কথাই কেবল ভাবিয়াছি, কিন্তু আর একজনের আসার কথা মনেও করি নাই ; সুতরাং তাঁহার কথায় হঠাৎ একটু যেন ধাক্কা লাগিল। কিন্তু ইহার উত্তর আর কি দিব ? শুধু মনে হইল ইহার আসার উদ্দেশ্যটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, এবং একবার এমনও মনে হইল যে, মিথ্যাসঙ্কোচ ও চঞ্চলজ্ঞা পরিভ্যাগ করিয়া বলি, আমি নিতান্তই নিরুপায়, অন্তঃকরণ এই অক্ষম ব্যক্তিটিকে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কোন লাভ নাই। বলিলে কি হইত জানি না, কিন্তু না বলার ফলে দেখিলাম সমস্ত উজ্জ্বল উত্তেজনা তাঁহার চক্ষের পলকে শব্দিত হইয়া উঠিল ; এবং কবে, কাহার ক্লি ঘটয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল, ইহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাঁহার স্বপ্তরকুলের বছর-দশেকের ইতিহাস প্রায় রোজনাট্যের আকারে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাঁহার গোটা-কয়েক কথার পরেই কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণও ছিল। মনে করিয়াছিলাম, একদিকে আত্মপক্ষের স্তুতিবাদ, দয়াদাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি যাহা কিছু শাস্ত্রোক্ত সদগুণাবলী মনুষ্যজন্মে সম্ভবপর সমস্তগুলিরই বিস্তৃত আলোচনা—এবং অন্যদিকে যত কিছু ইহারই

বিপরীত তাহারই বিশদ বিবরণ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া সন, তারিখ, মাস, প্রতিবেশী সাক্ষীদের নামধাম-সমতে আবৃত্তি করা ভিন্ন তাঁহার এই বলার মধ্যে আর কিছুই থাকিবে না। প্রথমটা ছিলও না—কিন্তু হঠাৎ একসময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কুশারীগৃহিণীর কষ্টবরের আকস্মিক পরিবর্তনে। একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে? তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তার পরে ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, হবার আর কি বাকী রইল বাবু? শুনলাম, কাল নাকি ঠাকুরপো গাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুন বেঁচেতেছিলেন।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইল না, এবং মন ভাল থাকিলে হয়ত হাসিয়াই ফেলিতাম। কহিলাম, অধ্যাপক মানুষ তিনি হঠাৎ বেগুনই বা পেলেন কোথায়, আর বেঁচেতেই বা গেলেন কেন? কুশারীগৃহিণী বলিলেন, ওই হতভাগীর জ্বালায়। বাড়ির মধ্যেই নাকি গোটাকয়েক গাছে বেগুন ফলেছিল, তাই পানিয়ে দিয়েছিল হাটে বেঁচেতে—এমন করে শত্রুতা করলে আমরা গায়ে বাস করি কি করে?

বলিলাম, কিন্তু একে শত্রুতা করা বলচেন কেন? তাঁরা ত আপনাদের কিছু মথ্যেই নেই। অভাব হয়েছে, নিজের জিনিস বিক্রি করতে গেছেন, তাতে আপনার নালিশ কি?

আমার জবাব শুনিয়া কুশারীগৃহিণী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, এই বিচারই যদি করেন, তাহলে আমার বলবার আর কিছু নেই, মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই—আমি উঠলাম।

শেবের দিকে তাঁহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল দেখিয়া, ধীরে ধীরে কহিলাম, দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ ভাল। মনিব-ঠাকুরকে জানাবেন, তিনি হয়ত সকল কথা বুঝতেও পারবেন, আপনার উপকার করতেও পারবেন।

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, আর আমি কাউকে বলতেও চাইনে, আমার উপকার করেও কারও কাজ নেই। এই বলিয়া তিনি সহসা অঙ্কলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আগে আগে কর্তা বলতেন, দু'মাস যাক, আপনিই ফিরে আসবে। তারপরে সাহস দিতেন, থাকো না আরও মাস-দুই চেপে, সব শুধরে যাবে—কিন্তু এমন করে মিথ্যা আশায় আশায় প্রায় বছর ঘুরে গেল। কিন্তু কাল যখন শুনলাম সে উঠানে দু'টো বেগুন পর্যন্ত বেঁচেতে পেরেচে, তখন কারও কথায় আর আমার কোন ভরসা নেই। হতভাগী সমস্ত সংসার ছারখার করে দেবে, কিন্তু ও-বাড়িতে আর পা দেবে না। বাবু, মেয়েমানুষ যে এমন শক্ত পাষণ হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তিনি কহিতে লাগিলেন, কর্তা ওকে কোনদিন চিনতে পারেন নি, আমি চিনেছিলাম। প্রথম প্রথম, এর-ওর-তার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিসপত্র পাঠাতো : উনি বলতেন, সুনন্দা জেনে শুনেই নেয়—কিন্তু অমন করলে তাদের চৈতন্য হবে না। আমিও ভাবতাম হবে ও বা! কিন্তু একদিন সব ভুল ভেঙ্গে গেল। কি করে সে জানতে পারে, যতদিন যা-কিছু দিয়েছি, একটা লোকের মাথায় সমস্ত টান মেরে আমাদের উঠানের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে কর্তার তবুও চৈতন্য হ'ল না—হ'ল আমার।

এতকালে আমি তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম। সদয়কণ্ঠে কহিলাম, এখন আপনি কি করতে চান? আচ্ছা, তাঁরা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোনপ্রকার শত্রুতা করবার চেষ্টা করেন?

কুশারীগৃহিণী আর একদফা কানিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, গোড়াকপাল। তা হলে ত একটা উপায় হ'ত। সে আমাদের এমনি ত্যাগ করেছে যে, কোনদিন যেন আমাদের চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি, এমনি কঠিন, এ...! পাষণ মেয়ে! আমাদের দু'জনকে সুনন্দা তার বাপ-মায়ের বেশি ভালবাসত; কিন্তু যেদিন থেকে শুনেচে তার ভাগ্যের বিষয় পাণের বিষয়, সেই দিন থেকে তার সমস্ত মন যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে। স্বামী-পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াঙ্কি ছোঁবে না। কিন্তু এতবড় সম্পত্তি কি আমরা ফেলে দিতে পারি বাবু? সে যেমন দয়ামায়ারহীন—ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতেও পারে, কিন্তু আমরা ত তা পারিনে।

কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু আস্তে আস্তে কহিলাম, আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কুশারীগৃহিণী নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সত্যি বলচি বাবু, এদের মাঝে পড়ে আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতে চায়। কিন্তু গুনতে পাই আজকাল সে মার নাকি বড় বাধা—কোন একটা উপায় হয় না? আমি যে আর সহিতে পারিনে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেন না—তেমনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

দশ

মানুষের পরকালের চিন্তার মধ্যে নাকি পরের চিন্তার ঠাই নাই, না হইলে আমার খাওয়া-পরাই চিন্তা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিতে পারে এত বড় বিষয় সংসারে আর কি আছে? এই গঙ্গামাটিতে আমরা কতদিনই বা আসিয়াছি, এই ক'টা দিনের মধ্যেই হঠাৎ সে কতদূরেই না সরিয়া গেল! আমার খাবার কণা জিজ্ঞেসা করিতে আসে এখন বামুন-ঠাকুর, আমাকে খাওয়াইতে বসে রতন। একপক্ষে বাঁচিয়াছি, সে দুর্লভ্য নীড়াপীড়ি আর নাই। রোগা শরীরে এগারোটোর মধ্যে না খাইলে এখন আর অসুখ করে না। এখন যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা খাই। শুধু রতনের পুনঃপুনঃ উদ্ভেজনা ও বামুনঠাকুরের সখেদ আশ্ব-ভৎসনায় স্বজ্ঞাহারের বড় সুযোগ পাই না—সে বেচারা ম্লানমুখে কেবল মনে করিতে থাকে, তাহারই রান্নাব দোষে আমার খাইয়া হইল না। কোনমতে ইহাদেশ সঙ্কট করিয়া বিছানায় গিয়া বসি। সম্মুখের সেই খোলা জানালা, আর সেই উষর প্রান্তরের তীব্র তপ্ত হাওয়া। মধ্যাহ্নের দীর্ঘ দিনমান কেবলমাত্র এই ছায়াহীন শুষ্কতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কাটিতে চাহিত না, তখন একটা প্রশ্ন সবচেয়ে আমার বেশি মনে পড়িত সে আমাদের সম্বন্ধের কথাটি। ভাল আমাকে সে আজও বাসে, ইহলোকে আমিই তার একান্ত আপন্য। কিন্তু লোকান্তরে তার কাছে আমি তত বড়ই পর। তাহার ধর্মজীবনের আমি যে সঙ্গী নই, সেখানে আমাকে দাবি করিবার যে তাহাও কোন দলিল নাই, হিন্দুঘরের মেয়ে হইয়া একথা সে ভুলে নাই। এই পৃথিবীটি শুধু নয়, ইহার অর্ধাৎ যে স্থানটা আছে, পাথের তাহার শুধু আমাকে কেবল ভালবাসিয়াই অর্জন করা যাইবে না, এ-সংশয় বোধ করি খুব বড় করিয়াই তাহার মনে উঠিয়াছে।

সে রহিল এই লইয়া, আর আমার দিনগুলো কাটিতে লাগিল এমনি করিয়া। কর্মহীন, উদ্বেগহীন জীবনের দিব্যরত্ন হয় শ্রান্তিতে, অবসান হয় অবসন্ন ম্লানিতে। নিজের আয়ুষ্কালটাকে নিজের হাত দিয়া প্রকৃতিনয়িত হত্যা করিয়া চলা ব্যতীত সংসারে আর যেন আমার কিছু করিবার নাই। বতন আসিয়া মাঝে মাঝে ভাতাক দিয়া যায়, সময় দইলে চা আনিয়া দেয়—কিছু বলে না। কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার বোধ হয়, সে পর্যন্ত আমাকে যেন কৃপার চক্ষে দেখিতে শুরু করিয়াছে। কখনো বা হঠাৎ আসিয়া বলে, বাবু, জানালাটা বন্ধ করে দিন, আঙনের ঝলক আসচে। আমি বলি, থাক। মনে হয়, কত লোকের গায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এই উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাকে এইমাত্র ছুঁিয়া আসিল। হয়ত, সে আমারই মত তাহার অনেকদিনের সুখ-দুঃখের শিশু সঙ্গীটিকে স্মরণ করিতেছে। আর আমাদের উভয়েরই সেই অল্পদাদিদি! ভাবিতাম, হয়ত এতদিনে তাহার সকল দুঃখের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কখনও মনে হয়, এই কোণেই ত বর্মান্দেব, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়াঙ্গর স্পর্শটুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছে না! অভয়াকে মনে পড়িলে সহজে সে আমার মন ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। রোহিণীদা এখন কাছে গিয়াছেন, আর তাহাদের ছোট্ট বাসা বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া অভয়া তাহার সেলাই লইয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলা আমরাই মত সে ঘুমাইতে পারে না, এতদিনে—হয়ত, কোন ছোট্ট শিশুর কাঁথা, কিংবা ছোট্ট বাগানের অড়, কিংবা এমনি কিছু তাহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র গৃহস্থীপনা!

বুকের মাঝখানে গিয়া যেন তীরের মত বিধে। যুগ-যুগান্তরের সঙ্কট সংসার, যুগ-যুগান্তরের ভাল-মন্দ বিচারের অভিমান আমারও ত রক্তের মধ্যে প্রবহমান। কেমন করিয়া অকপটে তাহাতে দীর্ঘায়ু

হও বলিয়া আশীর্বাদ করি! কিন্তু মন যে সরসে সঙ্কোচে একেবারে ছোট হইয়া আসিতে চায়।

কমনিরতা অভয়ার শান্ত প্রসঙ্গ মুখচ্ছবি আমি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। তাহারি পাশে নিম্নলিখ বৃক্ষ বালক। যেন সদ্যফোটা পখের মত শোভায় সম্পদে গন্ধে মধুতে টলটল করিতেছে। এতখানি অমৃত বস্তুর জগতে কি সত্যই প্রয়োজন ছিল না? মানব-সমাজে মানব-শিশুর মর্যাদা নাই, নিমন্ত্ৰণ নাই—স্থান নাই বলিয়া ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে ইহবে? কল্যাণের ধনকেই চির অকল্যাণের মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম আর নাই?

অভয়াকে আমি চিনি। এইটুকুকে পাইতে সে যে তাহার জীবনের কতখানি দিয়াছে তাহা আর কেহ না জানে আমি ত জানি। হৃদয়হীন-বর্বরতায় কেবলমাত্র অশ্রদ্ধা ও উপহাসের দ্বারাই সংসারে সকল প্রব্লেমের জবাব হয় না। ভোগ! অত্যন্ত মোটা রকমের লজ্জাকর দেহের ভোগ! তাই বটে! অভয়াকে দিকার দিবার কথাই বটে।

বাহিরের তপ্ত বাতাসে চোখের তপ্ত অশ্রু আমার নিম্নে শুকহিত। কর্ম হইতে চলিয়া আসার কথাটা মনে পড়িত। ঠিক সেই সময়টায় তখন রেঙ্গুনে মরণের ভয়ে ভাই বোনকে, ছেলে বাপ-মাকে ও ঠাই দিত না। মৃত্যু-উৎসবের উদ্দগ্ধ মৃত্যুলীলা শহরময় চলিয়াছে—তেমনি সময়ে যখন আমি মৃত্যু-দূতের কাঁধে চড়িয়া তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন নতুন-পাতা ঘরকন্নার মোহ ত তাহাকে একটা মুহূর্তও দ্বিধায় ফেলে নাই! সে-কথা ত শুধু আমার আখ্যায়িকার এই কয়টা লাইন পড়িয়াই বুঝা যাইব না, কিন্তু আমি ত জানি সে কি! আরও অনেক বেশি আমি জানি। আমি জানি কিছুই অভয়ার কাছে কঠিন নয়, মৃত্যু—সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা—এইসব প্রাচীন ও নবীন বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।

কাজের জন্য পুরানো মনিবের কাছে দরখাস্ত করিয়াছি, ভরসে আছে আবেদন না-মঞ্জুর হইবে না। সুতরাং আবার সাক্ষাৎ ঘটবে। ইতিমধ্যে দুই তরফেই অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। তাহার ভারও সামান্য নয়, কিন্তু সে-ভার সে জমা করিয়াছে আপনাত অসামান্য সরলতায় ও বেচ্ছায়, আব আমার জমিয়া উঠিয়াছে তেমনি অসাধারণ বলহীনতায় ও ইচ্ছাশক্তির অভাবে। কি জানি, ইহাদের রঙ ও চেহারা সেদিন মুখেমুখি কেমনতর দেখিতে ইহবে।

একাকী সমস্তদিন প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন বেলা গড়িলে একটুখানি বেড়াইতে বাহির হইতাম। দিন পাঁচ-সাত হইতে ইহা একপ্রকার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। ধূল্যায় যে পথটা দিয়া একদিন আমরা গঙ্গামাটিতে আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়া কোন কোন দিন অনেকদূর পর্যন্ত চলিয়া যাইতাম। অন্যমনে আঙুল তেমনি চলিয়াছিলাম, সহসা দেখিতে পাইলাম, গুঞ্জে ধূলার পাহাড় সৃষ্টি করিয়া কে-একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। সভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়সওয়ার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘোড়া থামাইল, ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার নাম শ্রীকান্তবাবু না? আমাকে চিনতে পারেন?

বলিলাম, নাম আমার তাই বটে, কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না।

লোকটি ঘোড়া হইতে নামিল। পরনে তাহার ছিন্ন ও মলিন সাহেবী পোশাক, মাথায় জরাজীর্ণ সোলার হ্যাট খুটিলা হাতে লইয়া কহিল, আমি সতীশ ভরদ্বাজ। থার্ড ক্লাস থেকে প্রমোশনে না পেয়ে সার্ভে-স্কুলে পড়তে যাই, তখন পড়ে না?

মনে পড়িল। খুশি হইয়া কহিলাম, তাই বল, তুমি আমাদের ... এখানে সাহেব সেজে যাচ্ছ কোথায়?

ব্যাঙ হাসিয়া কহিল, সাহেব কি আর সাথে সাজি ই, রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনে সাবওভারসিয়ারী চাকরি করি, কুলি তাড়াতেই জীবন যায়, হ্যাট-কোট না থাকলে কি আর রক্ষা ছিল? এতদিন তারাই আমাকে তাড়াত। সোপলপুরে একটা বরাত সেরে ফিরছি—মাইলটাক দূরে আমার তাঁবু, সেইখিয়া থেকে যে নতুন লাইন বসচে তাতেই কাজ। যাবে আমার ওখানে? চা খেয়ে আসবে?

অস্বীকার করিয়া কহিলাম, আজ নয়, কোনদিন সুযোগ হয় আসব।

ব্যাঙ তখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—শরীর কেমন, কোথায় থাকি, এখানে কি সূত্রে আসা, ছেলে-মেয়ে কয়টি, তাহারা কে কেমন আছে, ইত্যাদি।

জবাবে বলিলাম, শরীর ভাল নয়, থাকি গঙ্গামাটিতে, যে সূত্রে এখানে আসা তাহা অত্যন্ত গোলমালে। ছেলে-মেয়ে নাই, অতএব তাহারা কে কেমন আছে এ প্রশ্ন নিরর্থক।

ব্যাঙ সাদাসিধা গোছের লোক। আমার উত্তরগুলো ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অপরের ব্যাপার বুঝিতেই ইহঁবে এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তি সে নয়। সে নিজের কথাই বলিতে লাগিল। জায়গাটা স্বাভাবিক, তরিতরকারি মেলে, মাছ এবং দুধ চেষ্টা করিলে পাওয়া যায় ; তবে লোকজন নাই, সঙ্গীসাথীর অভাব, কিন্তু কষ্ট বিশেষ হয় না, কারণ সন্ধ্যার পরে একটু নেশা-ভাঙ করিলেই বেশ চলিয়া যায়। সাহেবরা হাজার হোক বাঙ্গালীর চেয়ে ঢের ভাল—টেম্পোরারি গোছের তাড়ির শেড একটা খোলা ইহঁয়াছে—যত ইচ্ছে খাও, তার নিজের ত একরকম পয়সা লাগে না বলিলেই হয়—সবই ভাল—কনষ্ট্রাকশনে দু'পয়সা আছেও বটে, এবং আমার জন্যে বড়সাহেবকে ধরিয়া চকরি একটা অনায়াসে করিয়া দিতে পারে—এ-নি সব তাহার সৌভাগ্যের ছোট-বড় কাহিনী। ব্যাঙ তাহার বেতো ঘোড়ার মুখ ধরিয়া অনেকদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে বকিতে চলিল ; বার বার জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি নাগাইদ তাহার ক্যাম্পে পায়ের ধুলা দিতে পারি, এবং ভরসা দিয়া জানাইল যে, পোড়ামাটিতে প্রায়ই তাহার কাজ থাকে, ফিরিবার পথে একদিন আমার গঙ্গামাটিতে সে নিশ্চয় গিয়া উপস্থিত ইহঁবে।

সেদিন বাড়িতে ফিরিতে আমার একটু রাগি হইল। পাচক আসিয়া জানাইল আহার প্রস্তুত। হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের কাছে বসিয়া পড়িল, হাসিমুখে কহিল, তুমি কিন্তু কিছুতেই অমত করতে পাবে না বলে রাখি।

কহিলাম, না, আমার অমত নেই।

কি তা না শুনেই? কহিলাম, আবশ্যক মনে হয় ব'লো একসময়।

রাজলক্ষ্মীর হাসিমুখ গম্ভীর হইল, কহিল, আচ্ছা—ইঠাং তাহার দৃষ্টি পড়িল, আমার থালাব উপরে। কহিল, ভাত খাচ্ যে বড়? তুমি জান রাঙে তোমার ভাত সহ্য হয় না—তুমি কি তোমার অসুখটা আমাকে সারাতে দেবে না ঠিক করেচ?

ভাত আমার ভালই সহ্য ইহঁতেছিল, কিন্তু সেকথা বলিয়া লাভ নাই। রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল, মহারাজ! পাচক ঘরের কাছে আসিতেই তাহাকে থালা দেখাইয়া ততোধিক তীব্রস্বরে কহিল, কি এ? তোমাকে বোধ হয় একহাজার বার বলেছি ভাত বাবুকে কিছুতেই রাঙে দেবে না—তোমাকে একমাসের মইনে আমি ভরিমানা করলুম। অবশ্য টাকার দিক দিয়া ভরিমানার কোন অর্থ নাই, তাহা সকল চাকরেই জানে, কিন্তু তিরস্কারের দিক দিয়া তাহার অর্থ আছে বৈ কি! মহারাজ রাগ করিয়া কহিল, যি নেই, আমি কি করব?

নেই কেন তাই শুনি?

সে জবাব দিল, দু-তিনদিন জানিয়েছি আপনাকে যি ফুরিয়েচে, লোক পাঠান। আপনি না পাঠালে আমার দোষ কি?

সংসার খরচের সাধারণ যি এইখানেই পাওয়া যাইত, কিন্তু আমার জন্যে আসিত সীইজিয়ার নিকটবর্তী কি একটা গ্রাম ইহঁতে। তাহা লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইতে ইহঁত। কথাটা রাজলক্ষ্মীর অন্যমনস্ক কর্ণরঞ্জে হয় গ্রহণ করে নাই, না হয় ত সে ভুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কবে থেকে নেই মহারাজ?

তা হবে পাঁচ-সাতদিন।

এই পাঁচ-সাতদিন তাঁকে ভাত খাওয়াচ্? রতনকে ডাকিয়া কহিল, আমিই যেন ভুলোঁছিলাম, কিন্তু তুই কি অনিয়মে দিতে পারতিস নে বাবা! এমনি করেই কি সবাই মিলে আমাকে জ্বল করতঃ হয়!

রতন মনে মনে তাহার ঠাকুরানীর উপর খুশি ছিল না। দিবারাত্রি বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র থাকার এবং বিশেষ করিয়া আমার প্রতি ঔদাসীন্যে তাহার বিরক্তির একশেষ ইহঁয়া ছিল, কতীর অনুযোগের

উত্তরে ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি জানি মা, তুমি গেরাখি করলে না সেখাে ভাবলুম ভাল দামী যি বোধ হয় আর চাইনে। নইলে পাঁচ-ছদিন ধরে রোগামানুষকে আমি ভাত খেতে নিই!

রাজলক্ষ্মীর বলিবার কিছুই ছিল না, তাই ভৃত্যের কাছে এতবড় খোঁচা খাইয়াও সে কিছুক্ষণ নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করিয়া বোধ করি সেইমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী হার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং আমার পায়ের কাছে আসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিশেধে বসিয়া থাকিয়া ডাকিল, তুমি কি ঘুমোলে? বলিলাম, না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তোমাকে পাবার জন্যে আমি যা করেছি, তার অর্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এতদিনে পেতুম। কিন্তু তোমাকে পেলুম না।

বলিলাম, হতে পারে মানুষকে পাওয়া আরও শক্ত।

মানুষকে পাওয়া? রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, যাই হোক, ভালবাসাটাও ত একরকমের বাঁধন, বোধ হয় এও তোমার সয় না—গায়ে লাগে।

এ অভিযোগের জবাব নাই, এ অভিযোগ শাশ্বত ও সনাতন। আদিম মানব-মানবী হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এ কলহের মীমাংসক কেহ নাই—এ বিবাদ যেদিন মিটিবে, সংসারের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য সেদিন তিস্ত বিধ হইয়া উঠিবে। তাই উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া নীরব হইয়া রহিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উত্তরের জন্য রাজলক্ষ্মী নীড়ানীড়ি করিল না। জীবনের এতবড় সর্বব্যাপী প্রস্তুতকণ্ঠ ২৫ বেন এক নিম্নিষে আপনা-আপনিই ভুলিয়া গেল। কহিল, ন্যায়রত্ন ঠাকুর বলছিলেন একটা ব্রতের কথা,—কিন্তু একটু কঠিন বলে সবাই নিতে পারে না, আর এত সুবিধাই বা ক' জনের ভাগ্যা জোটে?

অসমাপ্ত প্রস্তাবের মাঝখানে মৌন হইয়া রহিলাম; সে বলিতে লাগিল, তিনদিন একরকম উপোস করেই থাকতে হয়, সুনন্দারও ভারি হচ্ছে,—দু' জনের একসঙ্গেই তা হলে হয়ে যায়, কিন্তু—এই বলিয়া সে নিজেই একটু হাসিয়া বলিল, তোমার মত না হলে ত আর—

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মত না হলে কি হবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা হলে হবে না।

কহিলাম, তবে এ মতলব ত্যাগ কর, আমার মত নেই।

যাও—তামাশা করতে হবে না।

তামাশা নয়, সত্যি আমার মত নেই—আমি নিষেধ করছি।

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কখনকাল স্তম্ভভাবে থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমরা যে সমস্ত স্থির করে ফেলেছি। জিনিসপত্র কিনতে লোক গেছে,—কাল হবিষ্যি করে পরও থেকে যে—বাঃ! এখন বারণ করলে হবে কেন? সুনন্দার কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? ছোটঠাকুর—বাঃ! এ কেবল তোমার চালাকি। আমাকে মিছিমিছি রাগাবার জন্যে—না, সে হবে না, তুমি বল তোমার মত আছে।

বলিলাম, আছে। কিন্তু তুমি কোনদিনই ত আমার মতামতের অপেক্ষা কর না লক্ষ্মী, আজই বা হঠাৎ কেন তামাশা করতে গেল? আমার আদেশ মানতে হবে এ দাবি আমি ত কখনো তোমার কাছে করিনি।

রাজলক্ষ্মী আমার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল, আর কখনও হবে না, এইবারটি শুধু হ্রস্ব মনে আমাকে হুকুম দাও।

কহিলাম, আছে। কিন্তু ভোরেই তোমাকে হরত যেতে হবে, আর, রাত ক'রো না ওতে যাও।

রাজলক্ষ্মী গেল না, আন্তে আন্তে আমার পায়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কেবলি মনে হইতে লাগিল, সে স্নেহস্পর্শ আর নাই। সেও বৈশিষ্ট্যের কথা নয়, আরা রেলওয়ে স্টেশন হইতে আমাকে যেদিন সে কুড়াইয়া বাড়ি

আনিয়াছিল, সেদিন এমনি করিয়াই পায়ে হাত বুলাইয়া আমাকে সে ঘুম পাড়াহিতে ভালবাসিত। ঠিক এমনই নীরবে, কিন্তু মনে হইত তাহার দশ অঙ্গুলি যেন দশ ইঞ্জিয়ার সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়া নারীহৃদয়ের যাহা কিছু আছে, সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আমার এই পা দুটার উপরে উজ্জাড় করিয়া দিতেছে। অথচ, এ আমি চাহি নাই, এই লইয়াই যে কেমন করিয়া কি করিব সেও ভাবিয়া পাই নাই। বানের জলের মত—আসার দিনেও আমার মত চাহে নাই, হয়ত যাবার দিনেও তেমনি মুখ চাহিবে না। চোখ দিয়া আমার সহজে জল পড়ে না, ভালবাসার কাঙালবৃত্তি করিতেও আমি পারি না। জগতে কিছুই নাই, কাহারো কাছে কিছু পাই নাই, দাও দাও বলিয়া হাত বাড়াইয়া থাকিতে আমার লজ্জা করে। বইয়ে পড়িয়াছি এই লইয়া কত বিরোধ, কত জ্বালা, মান-অভিমানের কতই না প্রমত্ত আক্ষেপ-স্নেহের সূধা গরল হইয়া উঠার কত না বিস্কৃক কাহিনী! এ সকল মিথ্যা নয় জানি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে বৈরাগী তল্লাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া বলিতে লাগিল, ছি ছি ছি!

বক্ষণ পরে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী যখন সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, তখন জানিতেও পারিল না যে, নিদ্রাবিহীন নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া আমার অশ্রু করিয়া পড়িতেছে। অশ্রু পড়িতেই লাগিল, কিন্তু আজিকার আয়ত্নাতীত ধন একদিন আমারই ছিল বলিয়া বার্থ হাহাকারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

এগার

সকালে উঠিয়া শুনিলাম, অতি প্রত্যুষেই রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেছে। এবং তিনদিনের মধ্যে যে বাড়ি আসিতে পারিবে না, এ খবরও পাইলাম। হইলও তাহাই। সেখানে বিরাট কাণ্ড কিছু যে চলিতে লাগিল তাহা নয়, তবে দু-দশজন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের যে গতিবিধি হইতেছে, কিছু কিছু খাওয়া দাওয়ারও আয়োজন হইয়াছে, তাহার আভাস জানালায় বসিয়াই অনুভব করিতাম। কি ব্রত, কিরূপ তাহার অনুষ্ঠান, সম্পন্ন করিলে স্বর্গের পথ কতখানি সুগম হয়, ইহার কিছুই জানিতাম না, জানার কৌতুহলও ছিল না। রতন প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিত। বলিত, আপনি একবারও গেলেন না বাবু?

জিজ্ঞাসা করিতাম, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

রতন একটু মুস্থিলে পড়িত। সে এইভাবে জবাব দিত যে, আমার একেবারে না যাওয়াটা লোকের চোখে যেন কেমন কেমন ঠেকে। হয়ত বা কেউ মনে করে, এতে আমার অনিচ্ছা! বলা যায় না ত!

না, বলা কিছুই যায় না! প্রশ্ন করিতাম, তোমার মনিব কি বলেন?

রতন বলিত, তাঁর ইচ্ছে ত জানেন, আপনি না থাকলে কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু কি করবেন, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, রোগা শরীর, এতখানি হাঁটলে অসুখ করতে পারে। আর এসে হবেই বা কি!

বলিলাম, সে ত ঠিক। তা ছাড়া তুমি ত জান রতন, এইসব পূজা-অর্চনা, ধর্ম-কর্মের মাঝখানে আমি ভয়নক বেমানান হয়ে পড়ি। যাগযজ্ঞের ব্যাপারে আমার একটু গা-আড়াল দিয়ে থাকাই ভাল। ঠিক না?

রতন সায় দিয়া বলিত, সে ঠিক। কিন্তু আমি বুঝিতাম রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়া আমার উপস্থিতি তথায়—কিন্তু থাক সে।

হঠাৎ মস্ত একটা সুখবর পাইলাম। মনিবের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিবার অজুহাতে গোমস্তা কাশীনাথ কুশারীমহাশয় সতীক গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বলিস কি রতন, একেবারে সতীক?

আজ্ঞে হী। তাও আবার কিনা নেমস্তম্বে।

বুলিলাম, ভিতরে রাজলক্ষ্মীর কি একটা কৌশল আছে। সহসা এমনও মনে হইল, হয়ত এইজনাই সে নিজের বাটীতে না করিয়া অপরের গৃহে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছে।

রতন কহিতে লাগিল, বিনুকে কোলে নিয়ে বড়গিন্নীর সে কি কান্না! ছোট-মাঠাকরুন যহন্তে তার পা ধুইয়ে দিলেন, খেতে চাননি বলে আসন পেতে ঠাই করে ছোট মেয়ের মত তাঁকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিলেন। মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। ব্যাপার দেখে বড়ো কুশারীঠাকুরমশাই ও একেবারে ভেউভেউ করে কঁদে উঠলেন—আমার ত বোধ হয়, বাবু কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে ছোট-মাঠাকরুন এবার ওই ভান্সা কুঁড়েটার মায়া কাটিয়ে নিজেদের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। তা যদি হয় ত গাঁ-সুদ্ধ সবাই খুশি হবে। আর এ কীর্তি যে আমার মায়ের, সেও কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি বাবু।

সুনন্দাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এতখানি আশাবিহীন হইতে পারিলাম না, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর উপর হইতে আমার অনেকখানি অভিমান শরতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত দেখিতে দেখিতে সরিয়া গিয়া চোখের সূক্ষ্মতা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

এই দুটি ভাই ও জায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ যেখানে সত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, মনের মধ্যে এতটুকু চিড় না খাইয়াও বাহিরে যেখানে এতবড় ভাঙ্গন ধরিয়াছে—সেই ফাটল জোড়া দিবার মত হৃদয় ও কৌশল যাহার আছে তাহার মত শিল্পী আর আছে কোথায়? এই উদ্দেশ্যে কতদিন হইতেই না সে গোপনে উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে। একান্তমানে আশীর্বাদ করিলাম, এই সদিচ্ছা যেন তাহার পূর্ণ হয়। কিছুদিন হইতে আমার অন্তরের মধ্যে নিভৃত যে ভার সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অনেকখানি হাল্কা হইয়া গিয়া আজিকার দিনটা আমার বড় ভাল কাটিল। কোন শাস্ত্রীয় ব্রত রাজলক্ষ্মী নিয়াছে আমি জানি না, কিন্তু আজ তাহার তিনদিনের মিয়াদ পূর্ণ হইয়া কাল আবার দেখা হইবে, এই কথাটা মনে পড়ে পরের সন্ধ্যার যেন নতুন স্মরণ হইল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী আসিতে পারিল না, কিন্তু অনেক দুঃখ করিয়া রতনের মুখে খবর পাঠাইল যে, এমনি অদৃষ্ট একবার দেখা করিয়া যাইবারও সময় নাই—দিন-রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। নিকটে কোথায় বন্ধুসম্মেলন করিয়া তীর্থ আছে, সেখানে জাগৃত দেবতা এবং গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহাতে অবগাহন মান করিলে শুধু কেবল সেই-ই নয়, তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও স্বশরকুলের তিনকোটি ভ্রমের যে যেখানে আছে সবাই উদ্ধার হইয়া যাইবে। সঙ্গী জুটিয়াছে, দ্বারে গরুর গাড়ি প্রস্তুত, যাত্রাঙ্গণ প্রত্যাসন্নপ্রায়। দু-একটা অভাবশাকীয়া বস্তু দারোয়ানের হাত দিয়া রতন পাঠাইয়া দিল, সে যেহেতু উপব্রাহ্মণ ছুটিয়া দিতে গেল। শুনিলাম ফিরিয়া আসিতে পাঁচ-সাতদিন বিলম্ব হইবে আরও পাঁচ-সাতদিন! বোধ করি অভ্যাসবশতঃই হইবে, আজ তাহাকে দেখিবার জন্য মনে মনে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু রতনের মুখে অকস্মাৎ তাহার তীর্থযাত্রার সংবাদ—ইয়া অভিমান বা ক্রোধের পরিবর্তে বুকের মধ্যেটা আমার সহসা করুণা ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পিয়াসী সত্যসত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে এবং তাহারই কৃতকর্মের দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্বদেহমানে যে বেদনার আর্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সংবরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই যে অশ্রান্ত বিক্ষোভ, নিজেব জীবন হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার এই যে দিখিহীন ব্যাকুলতা, ইহার কি কোন শেষ নাই? খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মত কি সে দিনরাত্রি অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া মরিবে? আর সেই পিঞ্জরের লৌহশলাকার মত আমিহি কি চিরদিন তাহার মুক্তিপথের দ্বার আগলাইয়া থাকিব? সংসারে যাহাকে কোনকিছু দিয়া কোনদিন বাঁধিতে পারিল না, সেই আমার ভাগ্যই কি শেষে এত বড় দুর্ভোগ লিখিয়া দিয়াছেন? আমাকে সে সন্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে, আমার মোহ সে কাটাইতে পারে না। ইহারই পুরস্কার দিতে কি তাহার সকল ভবিষ্যৎ সুকৃতির গায়ে নিগড় হইয়া থাকিবে?

মনে মনে বলিলাম, আমি তাহাকে ছুটি দিব—সেবারের মত নয়, এবার, সন্তুষ্টচিত্তে, অন্তরের সমস্ত ওভাশীর্বাদ দিয়া চিরদিনের মত মুক্তি দিব, এবং যদি পারি, সে ফিরিয়া আসিবার পূর্বেরই আমি এদেশ ছাড়িয়া যাইব। কোন প্রয়োজনে, কোন অজুহাতে, সম্পদ ও বিপদের কোন আবর্তনেই আর তাহার সম্মুখীন হইব না। একদিন নিজের অদৃষ্টই আমাকে এ সমস্ত ছির রাখিতে দেয় নাই, কিন্তু আর তাহার কাছে আমি কিছুতেই পরাভব মানিব না।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্টই এটে! একদিন পাটনা হইতে যখন বিদায় লইয়াছিলাম, পিয়াসী চুপ

করিয়া তাহার বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তখন মুখে তাহার কথা ছিল না, কিন্তু সেই নিরুদ্ধ অন্তরের অক-পাট ফিরিবার ডাক কি সমস্ত পথটাই আমার কানে গিয়া পুনঃপুনঃ লৌছে নাই? কিন্তু ফিরি নাই? দেশ ছাড়িয়া সুদূর বিদেশে অহিনিশি গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যে রূপহীন, ভাষাহীন দুর্বীর আকর্ষণ আমাকে অহিনিশি টানিতে লাগিল, দেশ-বিদেশের ব্যবধান তাহার কাছে কতটুকু? আবার একদিন ফিরিয়া আসিলাম। বাহিরের লোক আমার পরাজয়ের গ্লানিটাই দেখিতে পাইল, আমার মাথার অগ্ন্যনুক্রান্তি জরমাল্য তাহাদের চোখে পড়িল না।

এমনিই হয়। আমি জানি, অচিরভবিষ্যতে আমার একদিন বিদায়ের কণ আসিয়া পড়িবে। সেদিনও হয়ত সে এমনি নীরব হইয়াই রহিবে, কিন্তু আমার শেষ বিদায়ের যাত্রাপথ ব্যাপিয়া সেই অশ্রুতপূর্ব নিবিড় আহ্বান হয়ত আর কানে পশিবে না।

মনে মনে বলিলাম, থাকার নিমন্ত্রণ শেষ হইয়া যখন যাওয়াটাই কেবল বাকী থাকে, সে কি ব্যথার বস্তু! অথচ এ ব্যথার অংশী নাই, শুধু আমারই হৃদয়ে গহ্বর খনিয়া এই নিমিত্ত বেদনাকে চিরদিন একাকী থাকিতে হইবে। রাজলক্ষ্মীকে ভালবাসিবার অধিকার সংসার আমাকে দেয় নাই; এই একাগ্র প্রেম, এই হাসিকান্না, য্নান-অভিমান, এই ত্যাগ, এই নিবিড় মিলন—সমস্তই লোকচক্ষে বেয়ন ব্যর্থ, এই আসন্ন বিচ্ছেদের অসহ অন্তর্দাহও বাহিরের দৃষ্টিতে আজ তেমনি অর্থহীন। আজ এই কথাটাই আমার সবচেয়ে বেশি বাজিতে লাগিল, একের মর্যাদিক দুঃখ যখন অপরের কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে বড় ট্রাজিডি পৃথিবীতে আর আছে কি! অথচ, এমনিই বটে। লোকের সখ্যেও বাস করিয়া যে-লোক লোকচাতার মানে নাই, বিদ্রোহ করিয়াছে, সে নাশিল করিবে গিয়া কাহার কাছে? এ সমস্যা শাস্ত ও পুরাতন। সৃষ্টির দিন হইতে আজি পর্যন্ত এই প্রশ্নই বারংবার আবর্তিত্ব চলিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের গর্ভে যতদূর দৃষ্টি যায় ইহার সমাধান চোখে পড়ে না। ইহা অনায়াস অব্যাহিত। তথাপি, এত বড় সম্পদ, এত বড় ঐশ্বর্যই কি মানুষের আর আছে? অবস্থা নরনারীর এই অব্যাহিত হৃদয়ব্যবের কত নিশ্চয় বেদনার ইতিহাসকেই না মাঝখানে রাখিয়া যুগে যুগে কত পুরাণ, কত কাহিনী, কত কাব্যেরই না অশ্রুভেদী সৌখ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আজ ইহা যদি থামিয়া যায়? মনে মনে বলিলাম, থাক। রাজলক্ষ্মীও ধর্ম মতি হোক, তাহার বক্তৃতাশ্রয়ের রাষ্ট্রা সুগম হোক, তাহার মস্তোচ্চারণ নির্ভুল হোক, আত্মবীর্ষ্য করি তাহার পুণ্যার্জনের পথ নিরন্তর নির্বিঘ্ন ও নিছকটক হোক, আমার দুঃখের ভার আমি একাই বহন করিব।

পরদিন ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনে হইল, পঙ্গমটির এই বাড়িঘর, পথঘাট, খোলা মাঠ, সকল বন্ধনই যেন আমার শিথিল হইয়া গেছে। রাজলক্ষ্মী কবে ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু মনে যেন আর একটা দণ্ডও এখানে থাকিতে চাহে না। রাতের জন্য রতন তাগিদ শুরু করিয়াছে। কারণ, বাহিবার সময় রাজলক্ষ্মী শুধু কড়া হুকুম দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, রতনকে তাহার পা ছুঁয়াইয়া শিখা করাইয়া লইয়াছে যে, তাহার অবর্তমানে আমার এতটুকু অময় বা অনিয়ম না হয়। খাবার সময় সকালে এগারোটো ও রাতে আটটার মধ্যে খাব হইয়াছে, রতনকে প্রত্যহ বঁড়ি দেখিয়া সময় শিখিয়া রাখিতে হইবে। কথা আছে, ফিরিয়া আসিয়া সে প্রত্যেককে একমাসের করিয়া মাছিনা ককশিল দিবে। রাত্রা শেষ করিয়া বামুনঠাকুর ঘর-বাহির করিতেছে, এবং চাকরের মাথায় তরিতরকারি, মাছ, দুধ প্রভৃতি লইয়া প্রভাত না হইতেই যে কুশারীমহাশয় ঘরং আসিয়া নৌছাইয়া দিয়া গেছেন, আমি তাহা বিছানার ওইয়া টের পাইয়াছিলাম। শুৎসূকা কিছুতেই আর ছিল না—বেশ, এগারোটো এবং আটটাই সহ। একমাসের উপরি মাছিনা হইতে আমার জন্য কেহ বঞ্চিত হইবে না তাহা নিশ্চিত।

কাল রাতে অভিশপ্ত নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটয়াছিল, আজ নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই স্নানাহার শেষ করিয়া বিছানার ওইতে না ওইতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিল চারিটার কাছাকাছি। কয়েকদিন হইতেই নিয়মিত বেড়হিতে বাহির হইতেছিলাম, আজও হাতমুখ ধুইয়া চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ঘরের বাহিরে একজন লোক বসিয়াছিল, সে হাতে একখানা চিঠি মিল। সতীশ ভরদ্বাজের চিঠি, কে একজন অনেক কষ্টে একছুর শিখিয়া জানাইয়াছে যে, সে অত্যন্ত পীড়িত। আমি না গেলে সে

মরিয়া যাইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে তাহার? লোকটা বলিল, কলেরা।

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। খুশি তাহার কলেরার জন্য নয়। গৃহের সর্বত্র হইতেই কিছুকণের জন্যও যে দূরে যাইবার সুযোগ মিলিল ইহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

একবার ডাবিলাম রতনকে ডাকিয়া একটা খবর দিয়া যাই, কিন্তু সময়ের অভাবে ঘটিয়া উঠিল না। যেমন ছিলাম, তেমনই বাহির হইয়া গেলাম, এ বাড়ির কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

প্রায় ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটিয়া শেষ-বেলায় গিয়া সতীশের ক্যাম্পে পৌছিলাম। ধারণা ছিল, রেলওয়ে কনষ্ট্রাকশনের ইনচার্জ এস. সি. বর্দাজের অনেক কিছু ঐশ্বর্য দেখিতে পাইব, কিন্তু গিয়া দেখিলাম হিংসা করিবার মত কিছু নয়। ছোট একটা ছোলদারি তাঁবুতে সে থাকে, পাশেই তাহার লতাপাতা খড়কুটা দিয়া তৈরী কুটারে রান্না হয়। একটি হস্তপুট বাউরী মেয়ে আশুন জ্বালিয়া কি একটা সিদ্ধ করিতেছিল, আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। এ সতীশের প্রশয়িনী।

ইতিমধ্যে রামপুরহাট হইতে একজন ছোকরা গোছের পাঞ্জাবী ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে সতীশের বাল্যবন্ধু জানিয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। রোগীর সম্বন্ধে জানাইলেন যে কেস সিরিয়াস নয়, প্রাণের আশঙ্কা নাই। তাঁহার টলি প্রস্তুত, এখন বাহির হইতে না পারিলে হেড কোয়ার্টার্সে পৌছিতে অতিশয় রাশি হইয়া যাইবে—ক্রেশের অবধি থাকিবে না। আমার কি হইবে সে তাঁহার ভবিষ্যৎ বস্তু নয়। কখন কি করিতে হইবে রীতিমত উপদেশ দিলেন, এবং ঠেলাগাড়িতে রওনা হইবার মুখে শি... তাঁহার ব্যাং খুলিয়া গোটা দুই-তিন কৌটা ও শিশি আমার হাতে দিয়া কহিলেন, কলেরা কতকটা ছোঁয়াচে রোগের মত। এ ডোবার জলটা ব্যবহার করতে মানা করে দেবেন, এই বলিয়া তিনি মাটিভোলা খাদ্য হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আর যদি খবর পান কুলিদের মধ্যে কারও হয়েছে—হতে পারে—এই ঔষধগুলো ব্যবহার করবেন। এই বলিয়া তিনি রোগের কি অবস্থায় কোনটা দিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

মানুষটি মন্দ নয়, মায়াদয়া আছে। আমার বাল্যবন্ধু কেমন থাকেন কাল যেন তিনি খবর পান, এবং কুলিদের উপরও যেন দৃষ্টি রাখিতে ভুল না হয়, আমাকে বার বার সাবধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ হইল ভাল। রাজলক্ষ্মী গিয়াছে বক্রেশ্বর দেখিতে, আর রাগ করিয়া আমি বাহির হইয়াছি পথে। পথেই এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ। বাল্যকালের পরিচয়, অতএব বাল্যবন্ধু... বটেই। তবে বহর-পনর খবরাখবর ছিল না, হঠাৎ চিনিতে পারি নাই। কিন্তু দিন-দুয়ের মধ্যেই... কন্স... এ কি ঘোরতর মাঝামাঝি! তাঁহার কলেরায় চিকিৎসার ভার, গুরুত্বের ভার, মায় তাঁর শ-দেড়েক মাটিকাটা কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল আমার উপর! বাকি রহিল শুধু তাঁহার... সোলার হ্যাট এবং টাট্টি ঘোড়াটি। আর বোধ হয় যেন ওই কুলি মেয়েটিও তাহার মানভূমের অনিবচনীয় বাউরী ভাবার অধিকাংশই ঠেকিতে লাগিল, কেবল এটুকু ঠেকিল না যে, মিনিট দশ-পনর মধ্যেই সে আমাকে পাইয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছে। যাই, আর ক্রটি রাখি কেন, যেড়াটিকে একবার দেখিয়া আসি গে।

ডাবিলাম, আমার অদৃষ্টই এমন। না হইলে রাজলক্ষ্মীই বা আসিত কিরূপে, অভয়াই বা আমাকে দিয়া তাহার দুঃখের বোঝা... হইত কেমন করিয়া? আর এই ব্যাঙ এবং তাহার কুলি গ্যাঙ। কোন ব্যক্তির পক্ষেই ত এসকল ঝাড়িয়া ফেলিতে একমুহূর্তের অধিক... গিত না। আর আমিই বা সারাজীবন বহিয়া বেড়াই কিসের জন্য?

টাবুটা রেল কোম্পানির। সতীশের নিজস্ব সম্পদ, একটা তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিয়া পইলাম। কয়েকটা এনামেলের বানন, একটা স্টোভ, একটা লোহার তোরঙ্গ, একটা কেরোসিন তেলের বাস, এবং তাহার শয়ন করিবার কাছিশের খাট, বহু-ব্যবহারে ডোক্তার আকর ধারণ করিয়াছে। সতীশ চালাক লোক, এ খাটে বিছানার প্রয়োজন হয় না, একখানা যা-তা হইলেই চলিয়া যায়, তাই দোরাকাটা একখানা শতরকি ছাড়া আর কিছুই সে কেনে নাই। ভবিষ্যতে কলেরা হওয়ার কোন ব্যবস্থা তাহার ছিল না। কাছিশের খাটে গুরুত্ব করার অত্যন্ত অসুবিধা এবং একমাত্র সন্তরকি

অতিশয় নোংরা হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাহাকে নীচে শোয়ানো ছাড়া উপায় নাই।

আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। মেয়েটির নাম কালীদাসী ; জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী, কারও দু-একখানা বিছানা পাওয়া যাবে?

কালী কহিল, না।

কহিলাম, দুটি খড়-টড় যোগাড় করে আনতে পারে?

কালী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, এখানে কি গরু আছে?

কহিলাম, বাবুকে তা হলে শোয়াই কোথায়?

কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল, হেথাকে। উ কি বাঁচবেক!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, এমন নির্বিকল্প প্রেম জগতে সুদূরলভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র। তোমার কথাগুলি শুনে আর শঙ্করের মোহমুদগর-পাঠের আবশ্যকতা থাকে না ; কিন্তু আমার সেরূপ বিজ্ঞানময় অবস্থা নয়, লোকটা এখনও বাঁচিয়া ; কিছু একটা পাওয়া চাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুর পরনের একখানা কাপড়চোপড়ও কি নেই?

কালী ঘাড় নাড়িল। তাহার মধ্যে দ্বিধা-সন্দেহ ছিল না। সে 'বোধ হয়' বলে না। কহিল, কাপড় নেই, পেটুলুন আছে।

পেটুলুন সাহেবী জিনিস, মূল্যবান বস্তু, কিন্তু তাহার দ্বারা শয্যারচনার কাজ চলে কি না ভাবিয়া পাইলাম না। সহসা মনে পড়িল, আসিবার সময় অদূরে একটা ছিন্ন জীর্ণ ত্রিপল দেখিয়াছিলাম। কহিলাম, চল না যাই, দু'জনে ধরাধরি করে সেটা নিয়ে আসি। পেটুলুন পাতার চেয়ে সে ভাল হবে।

কালী রাজী হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তখনও তাহা পড়িয়া ছিল, আনিয়া তাহাতেই সতীশ ভরদ্বাজকে শোয়াইয়া দিলাম। তাহারই একধায়ে কালী অভ্যস্ত সবিনয়ে স্থান লইল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ধারণা ছিল, মেয়েদের নাক ডাকে না। কালী তাহাও অপ্রমাণ করিয়া দিল।

আমি একাকী সেই কেরোসিনের বাস্ত্রের উপর বসিয়া। এদিকে সতীশের গাতে পায়ঃ ঘন ঘন শিল ধরিতেছে, সে-ক-তাপের প্রয়োজন, বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া কালীকে তুলিলাম, সে পাশ ঘিষিয়া শুইয়া জ্ঞানহীন, কাঠকুটা নাই, সে আগুন জ্বালিবে কি দিয়া? নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিলাম, কিন্তু আলোর মধ্যে সম্বল এই হারিকেন লষ্ঠনটি। তথাপি একবার তাহার রামায়ণের গিয়া ঝোঁক করিয়া দেখিলাম, কালী মিথ্যা বলে নাই; এই কুটীরটা ছাড়া অগ্নিসংযোগ করিতে পারি এরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই। কিন্তু সাহস হইল না, পাছে প্রাণ বাহির হইবার পূর্বেই সতীশের সংকার করিয়া ফেলি! ক্যাম্প খটি এবং কেরোসিনের বাস্ত্র বাহিরে আনিয়া দেশলাই জ্বালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইলাম, নিজের জামা খুলিয়া পুটিলির মত করিয়া কিছু কিছু সেক দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিজেকে সাবধন দেওয়া ছাড়া রোগীর কোন উপকারই তাহাতে হইল না।

রাত্রি দুটাই হইবে কি তিনটাই হইবে, খবর আসিল জন-দুই কুলির ভেদ-বর্ম হইতেছে। তাহারা আমাকে ডাকারবাবু বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহাদেরই আলোর সাহায্যে ঔষধপত্র লইয়া কুলি লাইনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মালগাড়িতে তাহারা থাকে। ছাদবিহীন খোলা ট্রাকের সারি লাইনের উপর দাঁড়াইয়া আছে, মাটি কাটার প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিন জুড়িয়া দিয়া তাহাদের গম্যস্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

বীশের মই দিয়া ট্রাকের উপরে উঠিলাম। একধারে একজন বুড়াগোছের লোক শুইয়া আছে, তাহার মুখের পরে আলো পড়িতেই বুঝা গেল রোগ সহজ নয়, ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গেছে। অন্যধারে জনপাঁচ-সাত লোক, ত্রী-পুরুষ দুই-ই আছে, কেহ বা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারও বা তখন পর্বস্ত সূনিপ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

ইহাদের জমাগার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ বাজালা বলিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একজন রোগী কি?

সে অন্ধকারে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আর-একখানা ট্রাক দেখাইয়া কহিল, উখানে। পুনরায় মই দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এবার একজন স্ত্রীলোক। বয়স পঁচিশ-ত্রিশের অধিক নয়, গুটি-দুই ছোট ছেলেমেয়ে তাহার পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। স্বামী নাই, সে গত বৎসর আড়কাঠির পান্নায় পড়িয়া অপর একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামে চা-বাগানে কাজ করিতে গিয়াছে।

এ গাড়িতেও আরও জনপাঁচ-ছয় স্ত্রী-পুরুষ ছিল, তাহারা একবাক্যে উহার পাশে স্বামীর নিন্দা কবা ছাড়া আমার বা রোগিণীর কোন সাহায্যই করিল না। পাঞ্জাবী ডাক্তারের শিক্ষামত উভয়কেই ঔষধ দিলাম, শিশুদুটাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও তাহাদের ভার লইতে স্বীকার করাইতে পারিলাম না।

সকাল নাগাদ আর-একটি ছেলের ভেদ-বমি শুরু হইল, ওদিকে সতীশ ভরদ্বাজের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইয়াই আসিতেছে। বড় সাধাসাধনায় একজনকে পাঠাইলাম সাঁইথিয়া স্টেশনে পাঞ্জাবী ডাক্তারকে খবর দিতে। সে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তিনি আর কোথায় গিয়াছেন রোগী দেখিতে।

আমার সবচেয়ে মুগ্ধিল হইয়াছিল সঙ্গে টাকা ছিল না। নিজে ত কাল হইতে উপবাসে আছি। মিছা নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে না হয় হইল, কিন্তু জল না খাইয়া বাঁচি কিরূপে? সুমুখের বাদে জল ব্যবহার করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়া দিলাম, কিন্তু কেহই কথা শুনিল না। মেয়েরা মৃদুহাস্যে জানাইল, এ কাল জল আর আছে কোথায় ডাক্তার? কিছুদূরে গ্রামের মধ্যে জল ছিল, কিন্তু যায় কে? তাহারা মরিতে পারে, কিন্তু বিনা পয়সায় এই ব্যর্থ কাজ করিতে রাণী নয়।

এমনি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রাকের উপরেই আমাকে দুইদিন তিনরাত্রি বাস করিতে হইল। রোগীদেরও ঔষধিভেদে পারিলাম না, সব কয়টাই মরিল, কিন্তু মরাটাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপার নয়। মানুষ কুমাইতেই মরে, কেহ দুদিন আগে, কেহ দুদিন পরে—এ আমি সহজে এবং অত্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারি। বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাই না, এই মোটা কথটা বুঝিবার জন্য এত শাস্ত্রালাচনা, এত বৈরাগ্যসাধনা, এত প্রকারের তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন হয় মানুষের কিসের জন্য? সুতরাং মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মানুষদের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না। পবদিন সকালে ভরদ্বাজের দেহত্যাগ হইল। লোকভাবে দাহ করা গেল না, মা দরিদ্রী তাহাকে কোলে স্থান দিলেন।

ওদিকের কাজ মিটিয়া ট্রাকে ফিরিয়া আসিলাম। না আসিলেই ছিল ভ কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। জনারগোর মাঝখানে রোগীদের লইয়া আমি নিছক একাকী। সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সাবা-জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রথর সূর্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নীচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্যন্ত কেহ নাই। সরকারী কাজ, মাটি-কাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হস্তার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি গিনিবে। অথচ তাহাদেরই স্বজাতি, তাহাদেরই ত ছেলে। গামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমনখারা নয়। কিন্তু এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে, সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকলোকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটি-কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রাকের উপর জমা করা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু নী নাই! শুধু মাটি-কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।

ভরদ্বাজ গিয়াছে, কিন্তু তাহার অমর কীর্তি ভাড়ির দোকান অক্ষয় হইয়া আছে। সন্ধ্যাবেলায় নন্দারী-নির্বিশেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল, দুপুরবেলার বাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে, এ হাজিমাটায় এ বেলায় মেয়েদের নাই। তাহার পরে কে বা কাহার কথা শুনে।

জমাদারের গাড়ি হইতে ঢোল ও করতাল সহযোগে প্রবল সঙ্গীতচর্চা হইতে লাগিল, সে যে কখন থামিবে ভাবিয়া পাইলাম না। কাহারও জন্য তাহাদের মাথাব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের ট্রাকেই কে একটা মেয়ের বোধ হয় জন-দুই প্রশয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নাই। এদিকে ট্রাকে এক ব্যাটা কিছু অধিক ভাড়ি খাইয়াছে ; সে এমন উচ্চ কলরোলে স্ত্রীর কাছে প্রশয় ভিক্ষা করিতে লাগিল যে, আমার লজ্জার সীমা রহিল না। দূরের একটা গাড়ি হইতে কে একজন স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে বিলাপ করিতেছিল, তাহার মা ঔষধ চাহিতে আসায় খবর পাইলাম কামিনীর সম্ভান-সম্ভাবনা হইয়াছে। লজ্জা নাই, সরম নাই, গোপনীয় কোথাও কিছু নাই—সমস্ত খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবনযাত্রার অব্যাহত গতি বীভৎস প্রকাশ্যতায় অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে। শুধু আমিই কেবল দল-ছাড়া। আসন্ন মৃত্যুলোকযাত্রী মা ও তাহার ছেলেকে লইয়া গভীর আঁধার রায়ে একাকী বসিয়া আছি।

ছেলেটা বলিল, জল—

মুখের উপর ঝুকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক।

ছেলেটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তারপর চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে রহিল।

তৃষ্ণার জল না থাক, কিন্তু আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। হায় রে হায়! শুধু কেবল মানবের সুকুমার হৃদয়বৃত্তি নয়, নিজের সুদুঃসহ যাতনার প্রতিও কি অপরিসীম ঔদাসীনা! এই ত পশু! এ ধৈর্যশক্তি নয়, জড়তা। এ সহিষ্ণুতা মানবতার ঢের নীচের স্তরের বস্তু।

আমাদের ট্রাকের অন্য লোকগুলা অকাতরে ঘুমাইতেছে। কালি-পড়া হ্যারিকেনের অত্যন্ত মলিন আলোকেও আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, মা ও ছেলে উভয়েরই সর্বাস্ত্র ব্যাপিয়া খিল ধরিয়াছে। কিন্তু কি-ই বা আমার করিবার ছিল!

সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া সম্পর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, সেদিকে চাহিয়া আমি বেদনায়, ক্রোড়ে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বার বার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর! কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা, তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।

বার

সকালে খবর পৌছিল আব দুই জন পীড়িত হইয়াছে। ঔষধ দিলাম, জমাদার সাঁইথিয়ায় সংবাদ পাঠাইয়া দিল। আশা করিলাম, এবার কর্তৃপক্ষের আসন টলিবে।

বেলা নয়টা আশ্চর্য ছেলেটা মরিল। ভালই হইল। এই ত ইহাদের জীবন!

সম্মুখের মাঠের পথ দিয়া দুই জন ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়াছিলেন ; কাজে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে গ্রাম কত দূরে?

যিনি বৃদ্ধ, তিনি মুখটা ঈষৎ উচু করিয়া বলিলেন, ঐ যে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, খাবার জিনিস কিছু মেলে?

অন্যজন বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মেলে না কি রকম! ভদ্রলোকের গ্রাম—চাল, ডাল, ঘি, তেল, তরি-তরকারি যা খুশি আপনায়। আসছেন কোথা থেকে? নিবাস? মশায়, আপনায়?

সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া সতীশ ভরদ্বাজের নাম করিতে উভয়ে রুট হইয়া উঠিলেন ; বৃদ্ধ বলিলেন, মাতাল, বদমাইস, জোচ্চোর! ইনি কোন-একটা হাইস্কুলের হেডমাষ্টার। তাহার সঙ্গী কহিলেন, রেলের লোক আর কত ভাল হবে! কাঁচা পয়সাটা বেশ হাতে ছিল কিনা!

প্রত্যুত্তরে সতীশের টাটকা কবরের টিপিটা আমি হাত দিয়া দেখাইয়া জানাইলাম, এখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। কাল সে মরিয়াছে, লোকান্তাবে দাহ করিতে পারা যায় নাই, এখানে মাটি দিতে হইয়াছে।

বলেন কি! বামুনের ছেলেকে—

কিন্তু উপায় কি ?

শুনিয়া উভয়েই কুৎসিত হইয়া জানাইলেন যে, ভদ্রলোকের গ্রাম, একটুখানি খবর পাইলে যা হোক একটা উপায় নিশ্চয় হইয়া যাইত। একজন প্রশ্ন করিলেন, আপনি তাঁর কে ?

বলিলাম, কেউ না। সামান্য পরিচয় ছিল মাত্র। এই বলিয়া কি করিয়া এখানে জুটিলাম সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ দিলাম। দুইদিন খাওয়া হয় নাই, অথচ, কুলিদের মধ্যে কলেরা শুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না।

খাওয়া হয় নাই শুনিয়া তাহার অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং সঙ্গে যাইবার জন্য বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং, এই ভয়ানক ব্যাধির মধ্যে খালি পেটে থাকা যে মারাত্মক ব্যাপার তাহাও একজন জানাইয়া দিলেন।

বেশি বলিতে হইল না—বলার প্রয়োজনই ছিল না, ক্ষুৎপিপাসায় মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছিলাম—তাঁহাদের সঙ্গে লইলাম। পথে এই বিষয়েই আলাপ হইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের লোক, শহরের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু মজা এই যে, ইংরাজ রাজত্বের খাঁটি পলিটিজিয়ান তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নয়। এ যেন দেশের লোকে দেশের মাটি হইতে, জল হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে অস্থি-মজ্জা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

উভয়েই কহিলেন, সতীশ ভরদ্বাজের দোষ নেই মশায় আমরা হলেও ঠিক অমনি হয়ে উঠতাম। কোম্পানি বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি ঐদের ছোঁয়াচের গুণ!

ক্ষুধার্ত ও একান্ত ক্লান্ত দেহে অধিক কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেলের লাইন পাঁচবার? কোন লোকে কি তা' চায়? চায় না। কিন্তু তবু চাই। দাঁড়ি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও এককোঁটা খাম্বার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বান্দুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়—কোথাও একটু ভাল খাবার জল থাকলে কি সতীশবাবুই মারা যেতেন? কথখনো না। ম্যালেরিয়া, কলেরা হর-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকসা পরিবেশনা! কর্তারা অছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘবে কি শসা ভস্মেছে শুধে চালান করে নিয়ে যেতে। কি বলেন মশাই? ঠিক নয়?

আলোচনা করিবার মত গলায় জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায়া দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই, এই, এই! কেবলমাত্র এইজন্যই তো! কোটি নরনারীর কষ্ট চাপিয়া বিদেশীয় শাসনতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুকুমার এই হেতুই ভাঙতের দিকে দিকে রক্তে রক্তে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীরা ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল—তাঁহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য তা কাতারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার জো নাই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার এই চিন্তাভেঁই যেন বাক্যযোজনা রাখিয়া কহিলেন, মশাই, ছেলেবেলায় মামার বাড়িতে মানুষ আমি, আগে বিশ ক্রোশের মধ্যে রেলগাড়ি ছিল না, তখন কি সস্তা, আর কি প্রচুর জিনিসপত্রই না সেখানে ছিল। তখন কারও কিছু জন্মালে পাড়-পলি-শ্মী সবাই তার একটু ভাগ পেত, এখন খোড়, মোচা, উঠানের দু-আঁটি শাক পর্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায় না, বলে, থাক, সাড়ে-আটটার গাড়িতে পাইকেরের হাতে তুলে দিলে দ'পয়সা আসবে। এখন সে-টার নাম হয়েছে অপব্যয়—মশাই, দুঃখের কথা বলতে কি, পয়সা-করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে।

আর আপনানারাই কি প্রাণভরে ভোগ করতে পায়? পায় না। শুধু তা আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পাওয়াটাই হয়েছে যেন তাদের একটিমাত্র পরমার্থ।

এই সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্ছে এই রেলগাড়ি। শিরার মত দেশের রক্তে রক্তে রেলের রাস্তা যদি

না ঢুকতে পেত, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকত, আর সেই লোভে মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত, এত দুর্দশা দেশের হতো না।

রেলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও কম নহে। বস্তুতঃ যে বাবুস্বায় মানুষের জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার প্রতিদিন অপহৃত হইয়া শৌখিন আবর্জনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা না জন্মিয়াই পারে না। বিশেষতঃ দরিদ্র মানবের যে দুঃখ ও যে হীনতা এইমাত্র চোখে দেখিয়া আসিলাম, কোন যুক্তিতর্ক দিয়াই তাহার উত্তর মিলে না; তথাপি কহিলাম, আবশ্যকের অতিরিক্ত জিনিসগুলো অপচয় না করে যদি বিক্রি হয়ো অর্থ আসে সে কি নিতান্তই মন্দ?

ভদ্রলোক লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হ্যাঁ নিতান্তই মন্দ, নিছক অকপ্যাপ।

ইহার ক্রোধ ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা ঢের বেশি প্রচণ্ড। বলিলেন, এই অপচয়ের ধাবণা আপনাদের বিলাতের আমদানী, ধর্মস্থান ভারতবর্ষের মাটিতে এর জন্ম হয়নি, জন্ম হতেই পারে না। মশাই, মাত্র নিজের প্রয়োজনটুকুই কি একমাত্র সত্য? যার নেই তার প্রয়োজন মিটানোর কি কোন মূল্যই পৃথিবীতে নেই? সেটুকু বাইরে চালান দিয়ে অর্থ সঞ্চয় না করাই হ'ল অপচয়, হ'ল অপরাধ? এই নির্মম, নিষ্ঠুর উক্তি আমাদের মুখ দিয়ে বার হয়নি, বার হয়েছে তাদের যারা বিদেশ থেকে এসে দুর্বলের গ্রাস কেড়ে নেবার দেশব্যাপী জালে ফাঁসের পর ফাঁস যোজনা করে চলেছে।

বলিলাম, দেখুন, দেশের অন্ন বিদেশে বার করে নিয়ে যাবার আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু একের উদ্ভূত অল্পে অপরের চিরদিন ক্ষতিবৃদ্ধি হতে থাকবে, এইটাই কি মঙ্গলের? তা ছাড়া, বাস্তবিক, বিদেশ থেকে এসে ত তারা জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় না? অর্থ দিয়ে কিনে নিয়েই ত যায়?

ভদ্রলোক তিস্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কিনেই বটে। বৈদেশিতে টোপ গোঁথে জলে ফেলা যেমন মাছের সাদর নিমন্ত্রণ!

এই বাস্তবতার আর উত্তর দিলাম না। কারণ, একে ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রান্তিতে বাদানুবাদের শক্তি ছিল না, অপিচ তাহার বক্তব্যের সহিত মূলতঃ আমার বিশেষ মতভেদও ছিল না।

কিন্তু আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ ভ্রাম্যক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকেই প্রতিপক্ষ স্থানে অগ্রসৃত উদ্ভার সহিত বলিতে লাগিলেন, মশাই, ওদের উদ্ভাম বলিবুদ্ধির তত্ত্বকথাটুকুই সার সত্য বলে বুঝে আছেন, কিন্তু আসলে এতবড় অসৎ বস্তু পৃথিবীতে আর নেই। ওরা জানে শুধু বোল-আনার পরিবর্তে চৌষটি পয়সা গুনে নিজে-ওরা বোঝে কেবল মেনা খাদ্য পাওনা, ওরা শিখেছে শুধু ভোগটাকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকার করিতে। তাই ত ওদের পৃথিবী-জোড়া সংগ্রহ ও সম্পদের ব্যসন জগতের সমস্ত কল্যাণ আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মশাই, এই বেল, এই কল, এই লোহা-বীধানো রাস্তা—এই ত হ'ল পবিত্র vested interest—এই শুকভারেই ত সংসারে কোথাও গরীবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই।

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি বলছিলেন একের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুটুকু চালান দেবার সুযোগ না থাকলে হয় নষ্ট হ'ত, নাহয় অভাবগ্রস্তেরা বিনামূল্যে খেত। একেই অপচয় বলছিলেন, না?

কহিলাম, হ্যাঁ, তার দিক দিয়ে অপচয় বৈ কি।

বৃদ্ধ প্রত্যন্তরে অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এসব বিলাসি বুলি অবাচীন অধার্মিকের অজুহাত। কারণ, আর একটু যখন বেশি চিন্তা করতে শিখবেন, তখন আপনারই সম্ভেদ হবে বাস্তবিক এইটাই অপচয়, না দেশের শস্য বিদেশে রপ্তানি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমানোটাই বেশি অপচয়। দেখুন মশাই, চিরদিনই আমাদের গ্রামে গ্রামে জনকতক উদামহীন, উপার্জন-বিমুখ উদাসীন প্রকৃতির লোক থাকত, তাদের মুদি-ময়রার দোকানে দাবা-পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বড়লোকের আড্ডায় গান-বাজনা করে, বারোয়ারীতলায় মোড়লি করে, আরও—এমনি সব অকাজেই দিন কাটত। তাদের সকলেরই যে ঘরের মধ্যে অন্নসংস্থান থাকত তা নয়, তবুও অনেকের উদ্ভূত অংশেই তাদের সুখে-দুখে মিন চলে যেত। আপনারদের অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিতদের যত আকোশ তাদের পরেই

ত? যাক, চিন্তার হেতু নেই, এইসব অলস, অকেজো, পরাশ্রিত মানুষগুলো এখন লোপ পেয়েছে। কারণ, উদ্বৃত্ত বলে ত আর কোথাও কিছু নেই, সুতরাং, হয় অম্মাভাব মরছে, না হয় কোথাও গিয়ে কোন ছোট দাস্যবৃত্তিতে ভর্তি হয়ে জীবনযতভাবে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে। মেহমতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু অম্মাভাব মত যাদের বেশি বয়স হয়েছে তারাই জানে কি গেছে। জীবন-সংগ্রাম তাদের বিলুপ্ত করেছে—কিন্তু সমস্ত গ্রামের আনন্দটুকুও যেন তাদেরই সঙ্গে সহমরণে গেছে।

এই শেষ কথাটিই চকিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলাম। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাকে অল্পশিক্ষিত, সাধারণ গ্রাম্য ভদ্রলোক ব্যতীত কিছুই বেশি মনে হইল না— অথচ বাক্য যেন তাঁহার অসম্মাৎ আপনাকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া গেল।

তাঁহার সকল কথাকেই যে অভ্যস্ত বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিলাম তাহা নয়, কিন্তু অস্বীকার করিতেও বেদনা বোধ করিলাম। কেনন যেন সংশয় জন্মিল, এ সকল বাক্য তাঁহার নিজের নয়, এ যেন অলক্ষিত আর কাহারও জ্বালি।

অতিশয় সন্দোহের সহিত প্রশ্ন করিলাম, কিছু যদি মনে না করেন—

না না, মনে করব কেন? বলুন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এ-সকল কি আপনার নিজেরই অভিজ্ঞতা, নিজেরই চিত্তাব মত? ভদ্রলোক রাগ করিলেন। বলিলেন, কেন, এসব মিথ্যা নাকি? একটি অক্ষরও মিথ্যা নয় জানবেন।

না না, মিথ্যা নয় বলিনি, কণু—

তবু আবার কি? আমাদের স্বামীজী কখনো মিথ্যা উচ্চারণ করেন না। তাঁর মত জ্ঞানী কেউ আছে নাকি?

প্রশ্ন করিলাম, স্বামীজী কে?

ভদ্রলোকের সঙ্গীরা তাঁহার উত্তর দিলেন। কহিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ। বয়স কম হলে কি হয়, অগাধ পাণ্ডিত্য, অগাধ—

তাঁকে আপনারা চেনেন নাকি?

চিনিই? বেশ। তিনি আমাদের আপনার লোক বলেই যে হয়! এর বাড়িতেই যে তাঁর প্রধান আড্ডা! এই বলিয়া তিনি সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া কহিলেন, আড্ডা বলা না করেন। এটা অশ্রম। মশাই, আমি গঙ্গার, যা পারি তাঁর সেবা করি। কিন্তু এ যেন বিদূরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ এ য, মানুষের আকৃতিতে দেবতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সম্ভ্রুতি কতদিন আছেন আপনারাদের গ্রামে?

নব্বেন কহিলেন, প্রায় মাস-দুই হবে। এ অঞ্চলে না আছে একটা ডাক্তার-বন্দি, না আছে একটা ইক্ষুল। এর জন্যই তাঁর যত পরিশ্রম। আবার নিজেরও একজন মন্ত ডাক্তার।

এতক্ষণে বাপারটা বেশ স্পষ্ট হইল। ইনিই সেই আনন্দ। সাঁইথিয়া স্টেশনে আহালাদি করাইয়া রাজলক্ষ্মী যাহাকে পদম সমাদরে গঙ্গামাটিতে অনিয়াছিল। সেই বিদ্যায়ের ক্ষণটি মনে পড়িল। রাজলক্ষ্মীর সে কি কল্যাণ। পণ্ডিত্য ত মাত্র দুদিনের, কিন্তু কত বড় স্নেহের বস্তুরেই যেন চোখের আড়ালে কোন ভয়ানক বিপদের মুখে পাঠাইয়া দিতেছে এমন ভাব। ফিরিয়া আসিবাব সে কি ব্যাকুল অনুনয়! কিন্তু আনন্দ সম্মাসী। তাহার মমতাও নাই, মোহও নাই। নারী হৃদয়ের বেদনার রহসা তাহার কাছে মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। তাই এত এত কাছে থাকিয়াও অপ্রয়োজন দেখা দিবার প্রয়োজন সে পলকের জন্যও অনুভব করে নাই, এবং ভবিষ্যতেও হয়ত কখনো এই প্রয়োজনের হেতু আসিবে না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ কথা শুনিলে যে কত বড় আঘাত পাইবে, সে শুধু আমিই জানি।

নিজের কথা মনে পড়িল। আমারও বিদ্যায়ের মুহূর্ত আসন্ন হইয়া আসিতেছে—যাইতেই ইহাও তাহা! পতিনিয়তই উপলব্ধি করিতেছি—আমার প্রয়োজন রাজলক্ষ্মীর সমাপ্ত হইয়া আসিতেছে, কেবল

ইহাই ভাবিয়া পাই না, সেদিনের দিনাডুটা রাজলক্ষ্মীর কোথা দিয়া কেমন করিয়া অবসান হইবে। গ্রামে পৌছিলাম। নাম মামুদপুর। বৃদ্ধ যাদব চক্রবর্তী তাহারই উল্লেখ করিয়া সগর্বে কহিলেন, নাম শুনে চমকাবেন না মশাই, আমাদের চতুসীমানার মধ্যে মুসলমানের ছায়াটুকু পর্যন্ত মাড়াতে হয় না। যেদিকে তাকান ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর সংজাত। অনাচরণীয় জাতের বসতি পর্যন্ত নেই। কি বল নরেন, আছে?

নরেন সানন্দে সায় দিয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিল, একটিও না, একটিও না। তেমন গাঁয়ে আমরা বাস করিনে।

ইহাতে পারে সত্য, কিন্তু এত খুশি হইবারই বা কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

চক্রবর্তী-গৃহে বজ্রানন্দের সাক্ষাৎ মিলিল। হাঁ তিনিই বটে। আমাকে দেখিয়া তাঁর যেমন বিস্ময়, তেমন আনন্দ।

দাদা যে! হঠাৎ এখানে? এই বলিয়া আনন্দ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। এই নরদেহধারী দেবতা ৭ সসন্মানে অভিবাদন করিতে দেখিয়া চক্রবর্তী বিগলিত হইয়া গেলেন। আশেপাশে আরও অনেকগুলি ভক্ত ছিলেন, তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি যেই হই, সামান্য ব্যক্তি যে নয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় রহিল না।

আনন্দ কহিলেন, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে দাদা?

উত্তর দিলেন চক্রবর্তী। আমার যে দিন-দুই আহার-নিদ্রা ছিল না, এবং বহু পুণ্যফলেই শুধু বাঁচিয়া আসিয়াছি ইহাই ব্যক্ত করিয়া কুলিদের মধ্যে মড়কের বিবরণ এমন সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন যে, আমার পর্যন্ত তাক লাগিয়া গেল।

আনন্দ বিশেষ কোন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া, অপরের কান বাঁচিয়া কহিলেন, এতটা দু'দিনের উপবাসে হয় না দাদা, একটু দীর্ঘকালের দবকার। কি হয়েছিল? জ্বর?

বলিলাম, আশ্চর্য নয়। ম্যালেরিয়া ত আছেই।

চক্রবর্তী আতিথ্যের ত্রুটি করিলেন মা, খাওয়াটা আঙ্গ ভালরকমই হইল।

আহারান্তে প্রস্থানের আয়োজন কবিত্তে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি হঠাৎ কুলিদের মধ্যে জুটেছিলেন কি করে?

বলিলাম, দৈবের চক্রান্তে।

আনন্দ সহাস্যে কহিলেন, চক্রান্তই বটে। রাগের মাথায় বাড়িতে বোধ হয় খবরও দেননি?

বলিলাম, না, কিন্তু সে রাগ করে নয়। দেওয়া বাঙ্লা বলেই দিহিনি। তা ছাড়া লোকই বা পেতাম কোথায়?

আনন্দ বলিলেন, সে একটা কথা। কিন্তু আপনার ভাল-মন্দ দিদির কাছে বাঙ্লা হয়ে উঠলো কবে থেকে? তিনি হয়ত ভয়ে ভাবনায় আধমরা হয়ে গেছেন।

কথা বাড়িয়া লাভ নাই—এ প্রश्নের আর জবাব দিলাম না। আনন্দ স্থির করিলেন জেরায় আমাকে একেবারে জ্বল করিয়া দিয়াছেন। তাই শিষ্ক-মৃদুহাস্যে ক্ষণকাল আঙ্গপ্রসাদ উপভোগ করিয়া কহিলেন, আপনার রথ প্রস্তুত, বোধ করি সন্ধ্যার পূর্বেই গিয়ে বাড়ি পৌছিতে পারবেন। আসুন, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি।

বলিলাম, কিন্তু বাড়ি যাবার পূর্বে কুলিদের একটু খবর নিয়ে যেতে হবে।

আনন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তার মানে রাগ এখনো পড়েনি। কিন্তু আমি বলি, দৈবের বড়যন্ত্রে দুর্ভোগ যা কপালে ছিল তা ফলেচে। আপনি ডাক্তারও নয়, সাধুবাণও নয়, গৃহী লোক। এখন খবর নেবার যদি কিছু থাকে ত সে ভার আমাকে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে বাড়ি যান। কিন্তু গিয়ে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, তাঁর আনন্দ ভাল আছে।

দ্বারে গরুর গাড়ি তৈরি ছিল। গৃহস্থানী চক্রবর্তী আসিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন, এদিকে আর যদি কখনো আসা হয় এ বাড়িতে যেন পদধূলি দিয়া যান। তাঁহার আন্তরিক আতিথ্যের জন্য সহস্র ধনব্যাধ দিলাম, কিন্তু দুর্লভ পদধূলির আশা দিতে পারিলাম না। বাজাসেঁশ আমাকে অচিরে

ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কথা মনের মধ্যে অনুভব করিতেছিলাম, সুতরাং কোনদিন কোন কারণেই এ প্রদেশে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা আমার পক্ষে সুদূরপর্যন্ত।

গাড়িতে উঠিয়া বসিলে আনন্দ ছইয়ের মধ্যে মাথা গলিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, দাদা, এদিকের জল-বাতাস আপনার সইছে না। আমার হয়ে দিকিকে বলবেন, পশ্চিম-মুলুকের মানুষ আপনি, যেন তিনি সে দেশেই নিয়ে যান।

বলিলাম, এ দেশে কি মানুষ বাঁচে না আনন্দ?

প্রত্যুত্তরে আনন্দ লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিলেন, না। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করে কি হবে দাদা, শুধু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধটা তাঁকে জানানো। বললেন, আনন্দ-সন্ন্যাসীর চোখ নিয়ে না দেখলে এর সত্যতা বোঝা যাবে না।

মৌন হইয়া রহিলাম। কারণ রাজলক্ষ্মীকে এ অনুরোধ জানানো যে আমার পক্ষে কত কঠিন, আনন্দ তাহার কি জানে?

গাড়ি ছাড়িলে তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কই, আমাকে ত একবারও যাবার নিমন্ত্রণ করলেন না দাদা?

মুখে বলিলাম, তোমার কত কাজ, তোমাকে নিমন্ত্রণ করা কি সৌজা ভাই! কিন্তু মনে মনে আশঙ্কা ছিল ইতিমধ্যে পাছে কোনদিন তিনি নিজেই গিয়া উপস্থিত হন। এই তীক্ষ্ণাধী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি হইতে তখন কিছুই আর আড়ালে রাখিবার জো থাকিবে না। একদিন তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, মনে মনে হাসিয়া বলিতাম, আনন্দ, এ জীবনের অনেক কিছুই বিসর্জন দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব না, কিন্তু অশ্রু-স্রবসানের সেই সহজ হিসাবটাই শুধু দেখিতে পাইলে; কিন্তু তোমার দেখার বাহিরে যে আমার সঞ্চয়ের অঙ্কটা একেবারে সংখ্যাতীত হইয়া রহিল! মৃত্যু-পারের সে পাথর যদি আমার জমা থাকে এদিকের কোন ক্ষতিকেই আমি গণনা করিব না। কিন্তু, আজ? বলিবার কথা কি ছিল? তাই নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া চক্ষের পলকে মনে হইল ঐশ্বর্যের সেই অপরিমেয় গৌরব যদি সত্যি আজ মিথ্যা মরীচিকায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে ত এই গলগ্রহ ভয়ঙ্কর অবাক্তিত গৃহস্থায়ী ভাগ্যে অতিথি আহান করিবার বিড়ম্বনা যেন না আর ঘটে।

আমাকে নীরব দেখিয়া আনন্দ তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, আচ্ছা, নূতন করে না-ই যেতে বললেন, আমার সাবেক নিমন্ত্রণ পুঞ্জি আছে, আমি সেই দাবিতেই হাজির হতে পারব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কাজটা কি নাগাদ হতে পারবে?

আনন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই দাদা, আপনাদব রাগ পড়বার চরিত্রে গিয়ে উত্থাপ্ত করব না—তার পরেই যাব।

গুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রাগ করিয়া যে আসি নাই তাহা বলিতেও ইচ্ছা হইল না।

পথ কম নহে, গাড়োয়ান ব্যস্ত হইতেছিল, গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তিনি আর-একবার নমস্কার করিয়া মুখ সরাইয়া লইলেন।

এ অঞ্চলে যানবাহনের প্রচলন নাই, সে উদ্দেশ্যে পথ তৈরি করিয়াও কেহ রাখে নাই; গো-শকট মাঠ ভান্সিয়া উচুনিচু খানাপ্রদ অন্তিম করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে লাগিল। ভিতরে অর্ধশায়িতভাবে পড়িয়া আনন্দ সন্ন্যাসীর কথার সুরটাই আমার কানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাগ করিয়া আসি নাই, ও বস্তুটা লাভের নয়—লোভেরও নয়, কিন্তু কেবলি মনে হইতে লাগিল, এও যদি সত্য হইত। কিন্তু সত্য নয়, সত্য হইবার পথ নাই। মনে মনে বলিতে লাগিল, না, রাগ করিব কাহার উপরে? কিসের জন্য? কি তাহার অপরাধ? ঝরনার জলধারার অধিকার লইয়াই বিবাদ করা চলে, কিন্তু উৎসমুখে জলই যদি শেষ হইয়া থাকে ত শুষ্ক খাদে, বরুণে মাথা খুঁড়িয়া মারব কোন ছলনায়?

এমনি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়াছিল ষ্পর্শ করি নাই। হঠাৎ খালের মধ্যে গাড়ি গড়াইয়া পড়ায় ঐকানি খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। সুমুখের চটের পর্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা হয়-হয়। গাড়ির চালকটি ছেলেমানুষ, বোধ করি বছর পনের বেশি হইবে না। বলিলাম, ওরে, এত জাগয়া থাকতে খানায় নামলি কেন?

ছেলেটি তাহার রাড়দেশের ভাষায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, নামবো কিসের তরে? বলদ আপনি নেমে গেল।

নেমে গেল কি রে? তুই কি গরু সামলাতে পারিস নে?

না। বলদ নতুন যে।

খুব ভাল। কিন্তু এদিকে যে অঙ্কার হয়ে এল, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

তার কি জানি! গঙ্গামাটি কখনো আসচি নাকি?

বলিলাম, কখনো যদি আসনি বাবা, তবে আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন হলে কেন? কাউকে জিজ্ঞেস কর না রে, গঙ্গামাটি আর কতদূরে?

উত্তরে সে কহিল, এদিকে লোক আছে নাকি? নেই।

ছেলেটার আর যাই দেখে থাক, জবাবগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি প্রাঞ্জল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই গঙ্গামাটির পথ চিনিস ত?

তেমনি সুস্পষ্ট উত্তর। কহিল, না।

তবে এলি কেন রে?

মামা বললে, বাবুকে নিয়ে যা। এই সোজা দক্ষিণে গিয়ে পূবে বাঁক ধরলেই গঙ্গামাটি। যাবি আর আসবি।

সম্মুখে অঙ্কার রাত্রি, আর বেশি বিলম্বও নাই। এতক্ষণ ত চোখ বুজিয়া নিজেই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম, ছেলেটার কথায় এবার ভয় পাইয়া বলিলাম, এই সোজা দক্ষিণের বদলে উত্তরে গিয়ে পশ্চিমে বাঁক ধরিস নি ত রে? ছেলেটা কহিল, তার কি জানি!

বলিলাম, জানিস নে ত চল দুজনে অঙ্কারে যমের বাড়ি যাই। হতভাগা, পথ চিনিস নে ত এলি কেন? তোর বাপ মা আছে?

না, মরে গেছে।

আপদ গেছে। চল, তা হলে আজ রাতে তাদের কাছেই যাওয়া যাক! হোব মামাব শুশু বুজি বিবেচনা নয়, দয়ামায়া আছে।

আর ঝানকটা অগ্রসর হওয়ার পরে ছেলেটা কাদিতে লাগিল, জানাইল যে আব সে যাটতে পারবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, থাকবি কোথায়?

সে জবাব দিল যে, সে ঘরে ফিরিয়া উপায়?

কিন্তু এই অবেলা সন্ধ্যাবেলায় আমার যাইবে?

পূর্বে বলিয়াছি ছেলেটি স্পষ্টবাদী। কহিল, তুমি বাবু নেবে যাও। মামা বলে গেছে ভাড়া পাঁচ সিকে। কম দিলে আমাকে মারবে।

কহিলাম, আমার জন্যে তুমি মার খাবে সে কেমন কথা! একবার ভাবিলাম, এই গাড়িতেই যথাস্থানে ফিরিয়া যাই। কিন্তু কেমন যেন প্রবৃত্তি হইল না। রাত্রি আসন্ন, স্থান অপরিচিত, লোকালয় যে কোথায় এবং কতদূরে বুঝিবার জো নাই; কেবল সম্মুখে একটা বড় আম-কাঠালের লগান দেখিয়া অনুমান করিলাম গ্রাম বোধ হয় খুব বেশি দূরে হইবে না। আশ্রয় হয়ত একটা মিলিলে। আর যদি নাই-ই মিলে তাহাতে-বা কি? নাহয়, এমনি করিয়াই এবার যাত্রা শুরু হইবে।

নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। দেখিলাম, ছেলেটির শুশু কথাই নয়, কাজের শাখাও চমৎকার স্পষ্ট। নিমেষে গাড়ির মুখ ফিরাইয়া লটল, কৃষ্যুগল গৃহ প্রত্যাগমনের ইচ্ছিতমাত্র চোখের পলকে চোখের অদৃশ্য হইয়া গেল।

তের

সন্ধ্যা শেষ হইল বলিয়া, কিন্তু রাত্রির অঙ্কার গাড়ির হইয়া উঠিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে যেমন করিয়া হউক আশ্রয় বুজিয়া বাহির করিতে হইবে। এ কাজ আমার পক্ষে

নৃতনও নহে, কঠিন বলিয়াও কোনদিন ভয় হয় নাই। কিন্তু আজ সেই আমবাগানের পাশ দিয়া পায়ে-চলা পথের রেখা ধরিয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন কেমন যেন উদ্ভিন্ন লঙ্কার মনের ভিতরটা ভরিয়া আসিতে লাগিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন যে পথে চলিয়াছি সে যে বাঙ্গলার রাঢ় দেশ। ইহার সখক্ষে ত কোন অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু একথা স্মরণ হইল না যে, সে সকল দেশের সখক্ষেও একদিন এমনি অনভিজ্ঞই ছিলাম, জ্ঞান যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা এমনি করিয়াই আপনাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, অপরে করিয়া দেয় নাই।

আসল কথা, কিসের জন্য যে সেদিন দ্বার আমার সর্বত্রই মুক্ত ছিল এবং আজ সন্ধ্যো ৬ দ্বিধায় তাহা অবরুদ্ধপ্রায়, সেই কথাটাই ভাবিয়া দেখিলাম না। সেদিনের সে-যাওয়ার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না, কিন্তু আজ যাহা করিতেছি সে শুধু সেদিনের নকল মাত্র। সেদিন বাহিরের অপরিচিতই ছিল আমার পরমাশ্রমী, তাদের পরে নিজের ভারাপণ করিতে তখন বাধে নাই, কিন্তু সেই ভার আজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি একান্তভাবে ন্যস্ত হইয়া সমস্ত ভারকেদ্রুটাই অন্যত্র অপসারিত হইয়া গেছে। তাই আজ অজানা-অচেনার মধ্যে চলিবার পা দুটা আমার প্রতিপদেই ভার হইয়া আসিতেছে। সেদিনের সেইসব সুখ-দুঃখের ধারণায় আজ কতই না প্রভেদ! তথ্যপি চলিতে লাগিলাম। এই বনের মধ্যে প্রতি যাপনের সাহসও নাই, শক্তিও গেছে—আজিকার মত, কিছু একটা পাইতেই যে হইবে।

ভাগ্য ভাল, খুব বেশি দূর হাঁটিতে হইল না। পত্রঘন কি একটা গাছের ফাঁক দিয়া অট্টালিকার মত দেখা গেল। সেই পথটুকু ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অট্টালিকাট বটে, কিন্তু মনে হইল স্তনহীন। সমুখে লোহার গেট, কিন্তু ভাঙ্গা। শিকড়লার অধিকাংশই ভেঙে গিয়া লইয়া গিয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। খোলা ব্যবাস্কা, বড় বড় দুটো ঘর, একটা বন্ধ এবং যেটা খোলা তাহার দ্বারে আসিবামাত্র একজন কঙ্কালসার মানুষ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, ঘরে চার কোণে চারিটা লোহার খাট—একদিন গদি পাতা ছিল, কিন্তু কালক্রমে চটগুলো লুপ্ত হইয়াছে, আছে শুধু ছোবড়ার কিছু কিছু তখনও অবশিষ্ট। একটা তেপাই, গোটা-কয়েক টিন ও এনামেলের পাত্র, তাহাদের স্ত্রী ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনাতীত। অনুমান যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই বটে। বাড়িটি হাসপাতাল। এই লোকটি বিদেশী, চাকরি করিতে আসিয়া পীড়িত হইয়া নিঃশব্দ হইল ইনভেন্ট পেশেন্ট হইয়া আছে। লোকটির সহিত প্রথম আলাপ এইরূপ ঘটিল—

বাবুশায়, গোটা-চারেক পয়সা দেবেন?

কেন বল ত? কিদেয় মবি বাবু, মুড়িটুড়ি দুটো কিনে খাব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি রোগী-মানুষ, যা তা খাওয়া তোমার বারণ নহে?

আজ্ঞে, না।

এখানে তোমাকে খেতে দেয় না?

লোকটি জানাইল যে, সকালে একবাটি সাণ্ড দিয়াছিল তাহা সে কেন্দ্রকালে খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন হইতে সে গেটের কাছে বসিয়া থাকে, ভিক্ষা পায় ত আর একবেলা খাওয়া চলে, না হয় ত উপবাসে কাটে। ভাতার একজন আছেন, বোধ হয় যৎসামান্য হাতখরচা মাত্র বন্দোবস্ত আছে, সকালবেলায় একবার করিয়া তাহার দেখা পাওয়া যায়। আর একটি লোক নিমুক্ত আছে, তাহাকে কম্পাউন্ডার হইতে শুরু করিয়া লঠনের তেল দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই করিতে হয়। পূর্বে একজন চাকর ছিল বটে, কিন্তু মাস-দুয়েক হইল মাছিনা না পাওয়ায় বাণ করিয়া চলিয়, গেছে, এখনও নৃতন কেহ ভর্তি হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, খাটপাট কে দেয়?

লোকটি বলিল, আজকাল আমিহি দি। আমি চলে গেলে আবার যে নৃতন রোগী আসবে সেই দেবে।

কহিলাম, বেশ ব্যবস্থা। হাসপাতালটি কার জ্ঞান?

লোকটি আমাকে ওদিকের বারান্দায় লইয়া গেল। কড়ি হইতে একটি টিনের লঠন ধুলিতেছে। হাসপাতালবাবু বেলাবেলি সেটি জ্বলিয়া দিয়া কাজ সারিয়া ঘরে চলিয়া গেছেন। মেয়ালের গায়ে

আঁটা মস্ত একটি মর্মর প্রস্তর-ফলক। সোনার জল দিয়া ইংরাজী অক্ষরে আগাগোড়া খোদাই-করা সন-তারিখ-সংবলিত শিলালিপি। জেলার যে সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেট দয়া করিয়া ইহার উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম-খাম সর্বাগ্রে, নীচে প্রশস্তি-পাঠ। কে একজন রায়বাহাদুর তাঁহার রত্নগর্ভা মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে জননী-জন্মভূমিতে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর শুধু মাতা-পুত্রই নয়, উৎকর্ষতন তিনচারি পুরুষের বিবরণ। বোধ করি ছোটখাটো কুলকারিকা বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না। লোকটি যে রাজসরকারে রায়বাহাদুরির যোগ্য তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ টাকা নষ্ট করার দিক দিয়া ক্রটি ছিল না। ইট ও কাঠ এবং বিলাতের আমদানি লোহার কড়ি-বরগার বিল মিটাইয়া অবশিষ্ট যদি বা কিছু থাকিয়া থাকে সাহেব শিল্পীর হাতে বংশগৌরব লিখাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। ডাক্তার ও রোগীর ঔষধ-পথ্যাদির ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবার হয়ত টাকাও ছিল না, ফুরসতও ছিল না। প্রশ্ন করিলাম, রায়বাহাদুরের বাড়ি কোথায়?

সে কহিল, বেশি দূরে নয়, কাছেই।

এখন গেলে দেখা হবে?

আজ্ঞে না, বাড়িতে তালাবন্ধ, তাঁরা সব কলকাতায় থাকেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে আসেন জান?

লোকটি বিদেশী, সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না, তবে কহিল যে, বছর-তিনেক পূর্বে একবার আসিয়াছিলেন একথা সে ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছে। সর্বত্র একই দশা, অভাব দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু ছিল না।

এদিকে অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেছিল, সূতরাং রায়বাহাদুরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করার চেয়ে জরুরি কাজ বাকি ছিল। লোকটিকে কিছু পয়সা দিয়া জানিয়া লইলাম যে, নিকটেই একঘর চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের বাটা। তাঁহারা অতিশয় দয়ালু, এবং রাত্রিটার মত আশ্রয় মিলিবেই। সে নিজেই রাজী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কহিল, তাহাকে ত মূর্খীর লোকানে যাইতেই হইবে, একটুখানি ঘুরপথ, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না।

চলিতে চলিতে, তাহার কথায়-বার্তায় বুঝিলাম, এই দয়ালু ব্রাহ্মণ পরিবার হইতে সে পথ্যপথ্য অনেক রাত্রিই গোপনে সংগ্রহ করিয়া খাইয়াছে।

মিনিট-দশেক হাঁটিয়া চক্রবর্তীর বহির্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার পথপ্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই ঘরে আছেন?

কোন সাড়া আসিল না। ভাবিয়াছিলাম কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বাটিতে আতিথ্য লইতে চলিয়াছি, কিন্তু ঘরদ্বারের শ্রী দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। এদিকে সাড়া নাই, এদিকে আমার সঙ্গীর অথাবসায়ও অপরাধজয়। তাহা না হইলে এই গ্রাম ও হাসপাতালে বহুদিন পূর্বেই তাহার কণ-আত্মা স্বর্গীয় হইয়া তবে ছাড়িত। সে ডাকের উপর ডাক দিতেই লাগিল।

হঠাৎ ভাবাব আসিল, যা যা, আজ যা। যা বলচি।

লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, প্রত্যুত্তরে কহিল, কে এসেছে বার হয়ে দেখুন না।

কিন্তু বিচলিত হইয়া উঠিলাম আমি। যেন, চক্রবর্তীর পরমপূজ্য গুরুদেব গৃহ পবিত্র করিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছি।

নেপথ্যে কঠোর মুহূর্তে মোলায়েম হইয়া উঠিল—কে রে ভীম? বলিতে বলিতে গৃহস্থায়ী দ্বারপথে দেখা দিলেন। পরনের বস্ত্রখানি মলিন এবং অতিশয় ক্ষুদ্র, অঙ্ককারে তাঁহার বয়স অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু খুব বেশি বলিয়াও মনে হইল না। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে ভীম?

বুঝিলাম, আমার সঙ্গীর নাম ভীম। ভীম বলিল, ডাক্তারলোক, বামন। পথ ভুলে হাসপাতালে গিয়ে হাজির। আমি বললাম, ভয় কি, চলুন না ঠাকুরমশায়ের বাড়িতে রেখে আসি, গুরু আদরে থাকবেন।

বক্তৃত্ত: ভীম অতিশয়োক্তি করে নাই, চক্রবর্তী আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। স্বহস্তে মাদুর পাতিয়া বসিতে দিলেন এবং তামাক ইচ্ছা করি কি না জানিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া আনিলেন।

বলিলেন, চাকরগুলো সব জ্বরে পড়ে রয়েছে—করি কি!

ওনিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, এক চক্রবর্তীর গৃহ ছাড়িয়া আর এক চক্রবর্তীর গৃহে আসিয়া পড়িলাম। কে জানে অতিথিটা এখানে কিরূপ দাঁড়াইবে। তথাপি ঈঁকাটা হাতে পাইয়া টানিবার উপক্রম করিয়াছি, সহসা অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, হ্যাঁ গা, কে মানুষটি এলো?

অনুমান করিলাম, ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্রবর্তীরই শুধু গলা কাঁপিল না, আমারও যেন হৃৎকম্প হইল।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, মস্ত লোক গো মস্ত লোক। অতিথি, ব্রাহ্মণ—নারায়ণ! পথ ভুলে এসে পড়েছেন—শুধু রাত্রিটা—ভোর না হতেই আবার সন্কালেই চলে যাবেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, হাঁ সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল—খেতে দেবে কি উনুনের পাঁশ?

আমার হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। চক্রবর্তী কহিলেন, আহা, কি যে বল তুমি! আমার ঘরে আবার চাল-ডালের অভাব। চল চল, ভেতরে চল, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চক্রবর্তীগৃহিণী ভিতরে যাইবার জন্য বাহিরে আসেন নাই। বলিলেন, কি ঠিক করে দেবে শুনি? আছে ত খালি মুঠোখানেক চাল, ছেলেমেয়ে দুটোকে রান্নার মত সেক্ষ করে দেবো। বাছাদের উপসী রেখে ওকে দেব গিলতে? মনেও ক'রো না।

মা ধরিব্রি, দ্বিধা হও! না না করিয়া কি একটা বলিতে গেলাম, কিন্তু চক্রবর্তীর বিপুল ক্রোধে তাহা আসিয়া গেল। তিনি তুমি ছাড়িয়া তখন তুই ধরিলেন, এবং অতিথি-সংকার লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে যে আলাপ শুরু হইল তাহার ভাষাও যেমন, গভীরতাও তেমনি। আমি টাকা লইয়া বাহির হই নাই, পকেটে সামান্য তাহা কিছু ছিল তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছিল। শুধু গলায় সোনার বোতাম ছিল, কিন্তু কে বা কাহার কথা শোনে। ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে চক্রবর্তী সজোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, অতিথি নারায়ণ। বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।

গৃহিণী কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করিয়া কহিলেন, তা হলে ত বাঁচি। ভিক্ষে-সিক্ষে করে বাছাদের খাওয়াই।

এদিকে আমার ত প্রায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল; হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, চক্রবর্তীমশাই, সে নাহয় একদিন ভেবেচিন্তে ধীরে-সুস্থে করবেন—করাই ভাল—কিন্তু সম্প্রতি আমাকে হয় ছাড়ুন, না হয় একগাছা দড়ি দিন, কুলে পড়ে আমার আতিথ্যের দায় থেকে মুক্ত হই।

চক্রবর্তী অন্তঃপূব লক্ষ্য করিয়া ইঁকিয়া বলিলেন, আক্কেল হ'ল? বলি শিখলি কিছু?

পান্টা জবাব আসিল, হ্যাঁ। মুহূর্তকয়েক পরে ভিতর হইতে শুধু একখানি হাত বাহির হইয়া, দুম করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বসাইয়া দিয়া আদেশ হইল, যাও, শ্রীমন্তর দোকানে এটা রেখে চাল ডাল তেন নুন নিয়ে এসো গো। দেখো যেন মিন্সে হাতে পেয়ে সব কেটে না নেয়।

চক্রবর্তী খুশি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আরে, না না, একি ছেলের হাতের নাড়ু?

চট করিয়া ঈঁকাটা তুলিয়া লইয়া বার-কয়েক টান দিয়া কহিলেন, আশুনটা নিবে গেছে। গিন্নী, নাও দিকি কলকেটা পান্টে একবার খেয়েই যাই। যাব আর আসব। এই বলিয়া তিনি কলিকাটা হাতে লইয়া অন্তরের দিকে বাড়িয়া দিলেন।

ব্যস, স্বামী-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। গৃহিণী তামাক সাজিয়া দিলেন, কর্তা প্রাণ ভরিয়া ধূম পান করিলেন। প্রসন্নচিত্তে ঈঁকাটি আমার হাতে দিয়া ঘ- হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চাল আসিল, ডাল আসিল, তেল আসিল, নুন আসিল, যথাসময়ে রন্ধনশালায় আমার ডাক পড়িল। আহা! বিম্বুমাত্র রুচি ছিল না, তথাপি নিঃশব্দে গেলাম। কারণ, আপত্তি করা শুধু নিষ্ফল নয়, না বলিতে আমার আতঙ্ক হইল। এ জীবনে বন্ধুর বন্ধুত্বই আমাকে অযাচিত অতিথি গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সর্বত্রই সমাদৃত হইয়াছি বলিলে অসত্য বলা হইবে, কিন্তু এমন সংবর্ধনাও কখনো

ভাগ্যে জুটে নাই ; কিন্তু শিকার তখনও বাকি ছিল। গিয়া দেখিলাম, উনুন জ্বলিতেছে, এবং অগ্নের পরিবর্তে কলাপাতায় চাল ডাল আলু ও একটা পিতলের হাঁড়ি।

চক্রবর্তী উৎসাহভরে कहিলেন, দিন হাঁড়িটা চড়িয়ে, চটপট হয়ে যাবে। খাঁড়ি-মুসুরের খিচুড়ি, আলুভাতে, তোফা লাগবে খেতে। ঘি আছে, গরম গরম—

চক্রবর্তীর রসনা সরস হইয়া উঠিল কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে আমার কোন কথায় বা কাজে আবার একটা প্রলয়-কাত্ত বাধিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার নির্দেশমত হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম, চক্রবর্তীগৃহিণী আড়ালে ছিলেন, স্ত্রীলোকের চক্ষে আমার অপটু হস্ত গোপন রহিল। না, এবার তিনি আমাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কথা कहিলেন। তাঁহার আর যা মোষই থাক, সন্দেশ বা চক্ষুলজ্জা বলিয়া যে শব্দগুলো অভিধানে আছে তাহাদের অতিবাহিত্য দোষ যে ইহার ছিল না একথা বোধ করি অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকার না করিয়া পারিবে না। তিনি कहিলেন, তুমি ত বাছা রান্নার কিছুই জান না।

আমি তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া বলিলাম, আজ্ঞে না।

তিনি বলিলেন, কর্তা বলছিলেন বিদেশী লোক, কে বা জানবে, কে বা গুনবে। আমি বললাম, তা হতে পারে না। একটা রান্নিরের জন্যে একমুঠো ভাত দিয়ে আমি মানুষের জাত ম'রতে পারব না। আমরা বাবা অগ্রদানী বামন।

আমার যে আপত্তি নাই, এবং ইহাপেক্ষাও গুরুতর পাপ ইতিপূর্বে করিয়াছি—একথা বলিতেও কিন্তু আমার সাহস হইল না, পাছে স্বীকার করিলেও কোন বিজ্ঞাত ঘটে। মনের মধ্যে শুধু একটিমাত্র চিন্তা ছিল কেমন করিয়া রান্নি কাটিবে এবং এই বাড়ির নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। সুতরাং নির্দেশমত খিচুড়িও রাঁধিলাম, এবং পিণ্ড পাকাইয়া গরম ঘি দিয়া তোফা গিলিবার চেষ্টাও করিলাম। এ অসাধ্য যে কি করিয়া সম্পন্ন করিলাম আজও বিদিত নই, কেবলই মনে হইতে লাগিল চাল-ডালের তোফা পিণ্ড পেটের মধ্যে গিয়া পাথরের পিণ্ড পাকাইতেছে।

অধ্যবসায়ে অনেক কিছুই হয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। হাতমুখ ধুইবারও অবসর মিলিল না, সমস্ত বাহির হইয়া গেল। ভয়ে শীর্ণ হইয়া উঠিলাম, কারণ এগুলো যে আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে শক্তি আব ছিল না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল, কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম, কোথাও আমাকে একটু শোবার জায়গা দিন, মিনিট-পাঁচেক সামলে নিরেই আমি সমস্ত পরিষ্কার করে দেব। ভাবিয়াছিলাম প্রত্যন্তরে কি যে গুনিব জানি না, কিন্তু আশ্চর্য এই চক্রবর্তীগৃহিণীর ভয়ানক কঠোর অকস্মাৎ কোমল হইয়া উঠিল। একতক্ষণ তিনি অজ্ঞকার হইতে আমার সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন, তুমি কেন বাবা পরিষ্কার করতে যাবে, আমিই সব সাফ কবে ফেলচি। বাইরের বিছানাটা এখনও করে উঠতে পারিনি, ততক্ষণ এসো তুমি আমার ঘরে গিয়া শোবে।

না বলিবার সামর্থ্যও নাই, নীরবে অনুসরণ করিয়া তাঁহারই শতজিহ্বা শয্যা আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মাথা তুলিবারও শক্তি ছিল না, এমনই ছর। সহজে চোখ দিয়া আমার জল পড়ে না, কিন্তু এত বড় অপরাধের যে এখন কেমন করিয়া কি জবাবদিহি করিব এই কথা ভাবিয়া নিছক ও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কেই আমার দুই চক্ষু অন্ধ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল কব্জার নিরুদ্ধেশ যাত্রাতেই বাহির হইয়াছি, কিন্তু এতখানি বিড়ম্বনা ভগবানীর আর কখনও অদৃষ্টে লিখেন নাই। আর একবার প্রাণপণে উঠিয়া বসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু কোনমতেই মাথা সোজা করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আজ চক্রবর্তীগৃহিণীর সহিত মুখোমুখি আলাপ হইল। বোধ হয় অত্যন্ত দৃষের মধ্যে দিয়াই নীরবে সত্যকার গভীর পরিচয়টুকু লাভ করা যায়। তাঁহাকে চিনিয়া লইবার এমন কষ্টিপাথরও আর নাই, তাঁহার হৃদয় জয় করিবার এত বড় অস্ত্রও পুরুষের হাতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, ঘুম ভেঙেছে বাবা?

চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি—কিন্তু বেশি হইতেও পারে। রঙটি

কালো, কিন্তু চোখমুখ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থঘরের মেয়েদের মতই। রুক্ষতার কোথাও কিছু নাই, আছে শুধু সর্বাস্ত্র ব্যাপ্ত করিয়া গভীর দারিদ্র্য ও অনশনের চিহ্ন আঁকা—চোখ মেলিয়া চাহিলেই তাহা পড়ে। কহিলেন, কাল আঁধারে দেখতে পাইনি বাবা, কিন্তু আমার বড়ছেলে বেঁচে থাকলে তার তোমার বয়সই হ'ত।

ইহার আর উত্তর কি। তিনি হঠাৎ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, জ্বরটা এখনও খুব রয়েছে। আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিলাম, কেউ একটুখানি সাহায্য করলে বোধ হয় হাসপাতালে যেতে পারব—সে ত আর বেশি দূর নয়।

তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার কথায় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভরিয়া গেল। বলিলেন, দুঃখের জ্বালায় কাল কি একটা বলেচি বলেই বাবা, রাগ করে ওই যমপুরীতে চলে যাবে। আর যাবে বললেই আমি যেতে দেব? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, আতুরের নিয়ম নেই বাবা। এই যে লোকে হাসপাতালে গিয়ে থাকে সেখানে কাদের ছৌঁড়িয়া খেতে হয় বল ত? কিন্তু তাতে কি জাত যায়? আমি সাণ্ড বার্লি তৈরি করে দিলে কি তুমি খাবে না?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে, বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই এবং শুধু পীড়িত বলিয়া নয়, অত্যন্ত নীরোগ শরীরেও আমার হইতে বাধা হয় না।

অতএব রহিয়া গেলাম। বোধ হয় সর্বসম্মত দিন-চারেক ছিলাম। তথাপি সেই চারিদিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। জ্বর একদিনেই গেল, কিন্তু বাকী দিন-কয়টা দুর্বল বলিয়া তাঁহারা নড়িঃ দিলেন না। কি ভয়ানক দরিদ্রের মধ্যে দিয়াই এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দিন কাটিতেছে এবং দুর্গতির সঙ্কট সঙ্কটের মধ্যেও এতটুকুও গ্রবসর পাইলে আমার কাছে আসিয়া বসিতেন। মাথায়, কপালে হাত বুলিয়া দিবার কি ঐকান্তিক চেষ্টাই না তাঁহার দেখিতে পাইতাম। পূর্বে অবস্থা সচ্ছল ছিল, জমিভ্রমাও মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁহার নির্বোধ স্বামীকে লোকে প্রতারণা করিয়াই এই দুঃখে ফেলিয়াছে। তাহারা আসিয়া ঋণ চাহিত, বলিত, দেশে বড়লোক ঢের আছে, কিন্তু এত বড় বৃকের পাটা কয়জনের আছে? অতএব এই বৃকের পাটা সপ্রমাণ করিতে তিনি ঋণ করিয়া ঋণ দিতেন। প্রথমে হ্যাওনোট কাটিয়া এবং পরে ষ্ট্রীকে গোপন করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিয়া। ইহার ফল অধিকাংশ স্থলেই যাহা হয় একাধারে তাহাই হইয়াছে।

এ কুকার্য যে চক্রবর্তীর বাধা নয় তাহা একটা রাত্রির অভিজ্ঞতা হইতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম। বৃদ্ধির দোষে বিহঃ সম্পত্তি অনেকেরই যায় এবং তাহার পরিণামও অত্যন্ত দুঃখের হয়, কিন্তু এই দুঃখ যে সমাজের অনাবশ্যক, অল্প নিষ্ঠুরতায় কতখানি বাড়িতে। ব তাহা চক্রবর্তীগৃহিনীর প্রতি কথায় অস্থি-মহঃ অনুভব করিলাম। তাঁহাদের দুইটি মাত্র শোবার ঘর, একটিতে ছেলেমেয়েরা থাকে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বাহিরের লোক হইয়াও আমি অধিকার করিয়া আছি। ইহাতে আমার সম্বোধের অবধি ছিল না। বলিলাম, আজ ত আমার জ্বর ছেড়েছে এবং আপনাদেরও ভারি কষ্ট হচ্ছে। যদি বাহিরের ঘরে একটা বিছানা করে দেন ত আমি ভারি তৃপ্তি পাই।

গৃহিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা, আকাশে মেঘ করে আছে, বৃষ্টি যদি হয় ত ও ঘরে এমন ঠাই নেই যে মাথাটুকু রাখা যায়। তুমি রোগা মানুষ, এ দরসা ত করতে পারিনে বাবা।

তাঁহাদের প্রাজ্ঞতার একধারে কিছু খড় সজ্জিত ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাই ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সময়ে মেঝামত করে নেননি কেন? তাহা ত দিন এসে পড়েছে।

ইহার প্রত্যুত্তরে জানিলাম যে, তাহা সহজে হইবার নয়। পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া এ অঞ্চলের চাষীরা তাঁহাদের কাজ করে না। গ্রামান্তরে মুসলমান ধর্ম আছে, তাহারাই ঘর ছাড়া দেয়। যে-কোন কারণে হোক, এ বৎসর তাহারা আসিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি সহসা কাদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বাবা, আমাদের দুঃখের কি সীমা আছে? সে বছর আমার সাত-আট বছরের মেয়েটা হঠাৎ কলেরায় মারা গেল; পূজার সময় আমার ভাইয়েরা গিয়েছিল কাশী বেড়াতে, তাই আর লোক পাওয়া গেল না, ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে একা একেই ঝাশানে নিয়ে যেতে হ'ল। তাও কি সংকার করা গেল?

কাঠকুটো কেউ কেটে দিলে না, বাপ হয়ে গর্ত খুঁড়ে বাছাকে পুতে রেখে ইনি ঘরে ফিরে এলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার পুরাতন শোক একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার মোট অভিযোগ এই যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষের কোনকালে কে শ্রদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ত অপরাধ? অথচ, শ্রাদ্ধ হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য এবং কেহ-না-কেহ দান গ্রহণ না করিলে সে শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। তবে দোষটা কোথায়? আর দোষই যদি থাকে ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করান কিসের জন্য?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন কঠিন, পূর্ব-পিতামহগণের কোন দুঃখতির শাস্তিস্বরূপ তাঁহাদের বংশধরগণ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন তাহা এতকাল পরে আবিষ্কার করাও তেমনি দুঃসাধ্য। শ্রদ্ধের দান লওয়া ভাল কি মন্দ জানি না। মন্দ হইলেও একথা সত্য, যে, ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ তাঁহারা করেন না, অতএব নিরপরাধ। অথচ প্রতিবেশী হইয়া আর একজন প্রতিবেশীর জীবনযাত্রার পথ বিনা দোষে মানুষে এতখানি দুঃখ ও দুঃখময় করিয়া দিতে পারে, এমন হৃদয়হীন নির্দয় ববঃতার উদাহরণ জগতে বোধ করি এক হিন্দু সমাজ ব্যতীত আর কোথাও নাই।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, এ গ্রামে লোক বেশি নেই, জ্বর আর ওলাউয়া অর্ধেক মরে গেছে। এখন আছে শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর রাজপুত। আমাদের যে কোন উপায় নেই বাবা, নইলে ইচ্ছে হয়, কোন মুসলমানের গ্রামে গিয়ে বাস করি।

বলিলাম, কিন্তু সেখানে ত জ্ঞাত যেতে পারে।

চক্রবর্তীগৃহিণী এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলেন না, কহিলেন, আমার সম্পর্কে একজন বড়শ্বশুর আছেন, তিনি দুমকায় চাকরি করতে গিয়ে ব্রীষ্টান হয়েছেন। তাঁর ও আর কোন কষ্টই নেই।

চূপ করিয়া রহিলাম। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্মাত্মর গ্রহণে মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্রেশবোধ হয়, কিন্তু সাধুনাই বা দিব কি বলিয়া? এতদিন জানিতাম অস্পৃশ্য, পাঁচ জাতি যাহারা আছে তাহারাই শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যে নির্ধাতন ভোগ করে, কিন্তু আজ জানিলাম কেহই বাস যায় না। অর্থহীন অবिवেচনায় পরস্পরের জীবন দুর্ভর করিয়া তোলাই যেন এ সমাজের মজ্জাগত সংস্কার। পরে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেকেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অনায়াস, ইহা গর্হিত, তথাপি নিরাকরণেরও কোন পন্থাই তাহারা নির্দেশ করিতে পারেন না। এই অনায়েবই মধ্য দিয়া তাহারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত চলিতে সম্মত আছেন, কিন্তু প্রতিকারের প্রবৃত্তি বা সাহস কোনটাই তাহাদের নাই। জানিলা বুঝিয়াও অবিচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহাদের এমন কহিয়া তিরোহিত হইয়াছে, সে জাতি যে দীর্ঘকাল বাঁচিবে কি করিয়া ভাবিয়া পাওয়া শক্ত।

দিন-তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, মা, আজ আমাকে বিদায় দিন। চক্রবর্তীগৃহিণীর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল : বলিলেন, দুঃখীর ঘরে অনেক দুঃখ পেলে বাবা, তোমাকে কটু কথাও কম বলিনি।

এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। না না, সে কিছুই না—আমি মহাসুখে ছিলাম, আমার কৃতজ্ঞতা—ইত্যাদি যামূলি ভঙ্গ বাক্য উচ্চারণ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইল। বজ্রানন্দের কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, ঘর ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে। এই বাঙ্গলাদেশের গৃহে গৃহে মা বোন, সাধ্য কি তাহাদের স্নেহের আকর্ষণ এড়াইয়া যাই। কথাটা কত বড়ই না সত্য।

নিরতিশয় দারিদ্র্য ও নির্বেধ স্বামীর অবিবেচনার আভিশ্য এই গৃহস্থচরের গৃহিণীকে প্রায় পাগল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্তেই তিনি অনুভব করিলেন আমি পীড়িত, আমি নিরুপায়—আর তাহার ভাবিবার কিছু রপিল না। মাতৃস্নেহের সীমাহীন স্নেহে আমার রোগ ও পরগৃহ-বাসের সমস্ত দুঃখ যেন দুই হাত দিয়া মুছিয়া লইলেন।

চক্রবর্তী চেষ্টা করিয়া একখানি গো-যান সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, গৃহিণীর ভারি ইচ্ছা ছিল আমি স্নানাহার করিয়া যাই, কিন্তু রৌদ্র বাড়িবার আশঙ্কায় পাঁড়াপাঁড়ি করিলেন না। শুধু যাত্রাকালে দেবদেবীর নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিয়া কহিলেন, বাবা, যদি কখনও এদিকে এস আর একবার দেখা দিয়ে যেয়ো।

এদিকে আসাও কখনও হয় নাই, দেখা দিতেও আর পারি নাই, শুধু বছরদিন পরে শুনিয়াছিলাম, রাজলক্ষ্মী কুশারীমহাশয়ের হাত দিয়া তাঁহাদের অনেকখানি ঋণের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

চৌদ্দ

গঙ্গামাটির বাটীতে আসিয়া যখন পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দ্বারের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট বসান। উপরে আশ্রপল্লবের মালা দোলানো। বাহিরে অনেকগুলি লোক বসিয়া জটলা করিয়া তামাক খাইতেছে। গরুর গাড়ির শব্দে তাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল। বোধ হয় ইহারই মধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আর একজন যিনি অকস্মাৎ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখি তিনি স্বয়ং প্রজানন্দ। তাঁহার উল্লসিত কলরব উদাম হইয়া উঠিল, এবং কে একজন ছুটিয়া ভিতরে খবর দিতেও গেল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন যে, তিনি আসিয়া সকল বিবরণ জানানো পর্যন্ত চারিদিকে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টারও যেমন বিরাম নাই, বাড়িসুদ্ধ সকলের দৃষ্টিস্তারও তেমন অবধি নাই। ব্যাপার কি? অকস্মাৎ কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন ত? গাড়োয়ান ছোটটি ও গিয়ে বললে আপনাকে গঙ্গামাটির পথে নামিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেছে।

রাজলক্ষ্মী কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রশ্ন করিল, বলিল, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে কি শাস্তিই হুঁমি দিলে! ব্রজানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু দেখ আনন্দ, আমার মন জানতে পেরেছিল যে আজ উনি আসবেনই।

হাসিয়া বলিলাম, দোবে কলাগাছ আর ঘটস্থাপনা দেখেই আমি বুঝি যে, আমার আসার খবরটি হুঁমি পেয়েচ।

কবীটের হাডালে বসন আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে সেজন্যে নয়। আজ বাড়িতে প্রাক্ষণ ভোজন হবে কি না। বক্তৃৎসর দেখে এসে যা—

রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়া প্রত্যেকে থামাইয়া দিল, তাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না রতন, নিজের কাজে যা।

প্রহার অবশ্য মুখের প্রতি চ্যুতিয়া ব্রজানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কি জানেন দাদা, কোন একটা কাজে লেগে না থাকলে মানসিক উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সহ্য যায় না। ভোক্তের আয়োজনটা কেবল এইজন্যই। না দিদি?

রাজলক্ষ্মী ভাবাব দিল না, বাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্রজানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, ভয়ানক রোগা দেখাচ্ছে দাদা, ইতিমধ্যে কাণটা কি ঘটেছিল এখন ত? বাড়ি না? ক হঠাৎ গা-ঢাকা দিলেন কেন?

গা-ঢাকা দিবার হেতু সর্বিজ্ঞারে বলনা কবিলাম। শুনিয়া আনন্দ কহিল, ভবিষ্যতে এরকম করে আর পালাবেন না। কিভাবে যে ওঁর দিনগুলো কেটেছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তাঁহা জানিতাম। সূতরাং চোখে না দেখিয়াও আমি বিশ্বাস করিলাম। রতন চাও তামাক দিয়া গেল। আনন্দ কহিল, আমিও বাইরে ফিঁদ দাদা। এখন আপনার কাছে বসে থাকলে আর একজন হয়ত ইহজন্মে আমার মুখ দেখবে না। এই বলিয়া সে হাসিয়া প্রস্থান কবিল।

খানিক পরে রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও ঘবে গরম জল গামছা কাপড় সমস্ত রেখে এলাম, শুধু গা-মাথা মুছে কাপড় ছেঁড়ে ফেলুন। কালী ওপর খবরদার যেন মাথায় জল ঢেলে না বলচি।

কহিলাম, কিন্তু স্বামীজী তোমাকে ভাল বলেন? জ্বর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না-ই থাক, কিন্তু হতে কতক্ষণ?

কহিলাম, সে খবর তোমাকে সঠিক দিতে পারব না, কিন্তু গরমে আমার সর্বাস জ্বলে যাচ্ছে, ব্রান করা দরকার।

রাজলক্ষ্মী কহিল, দরকার নাকি? তাহ'লে একা হয়ত পেরে উঠবে না, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাবি। এই বলিয়া সে নিজেই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আড়ি করে আমাকেও কষ্ট দেবে, নিজের

কষ্ট পাবে? এত অবেলায় নেয়া না, লক্ষ্মীটি।

এই ধরনের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্বক্ষে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে স্নেহের মাধুর্যরসে এমনই ভরিয়া দিতে পারিত যে, সে জ্বিলের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সম্বন্ধই মাথা তুলিতে পারিত না। এ ব্যাপারটা তুচ্ছ, মান না করিলেও আমার চলিয়া যাইবে, কিন্তু চলিয়া যায় না এমন ব্যাপারও বহুবার দেখিয়াছি। তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অভিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু কেবল আমিই পাই নাই তাহা নয়, কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই। আমাকে তুলিয়া দিয়া সে খাবার আনিতে গেল।

বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালটা আগে শেষ হোক না!

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল, রন্ধে কর তুমি, সে পালটা শেষ হতে যে সঙ্গে হয়ে যাবে।

গেলই বা।

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, তাহা বটে। ব্রাহ্মণ-ভোজন আমার মাথায় থাক, তার জন্যে তোমাকে উপোস করালে আমার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের বদলে একেবারে পাতালে মুখ করে দাঁড়াবে। এই বলিয়া সে আহাৰ্য আনিতে প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে কাছে বসিয়া আজ সে আমাকে যাহা খাওয়াইতে বসিল তাহা রোগীর পথা। কর্মবাটীর যাবতীয় গুরুপাক বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না; বুঝা গেল, আমার আশার পরেই সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে। তথাপি আসা পর্যন্ত তাহার আচরণে, তাহার কথা কহার ধরনে এমনই কি একটা অনুভব করিতেছিলাম যাহা শুধুই অপরিচিত নয়, অত্যন্ত নূতন। ইহাই খাওয়ানোর সময়ে একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অথচ কিসে এবং কেনন করিয়া যে সুস্পষ্ট হইল, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি অস্পষ্ট করিয়াও বুঝাইতে পারিতাম না। হয়ত এই কথাটাই প্রত্যক্ষের বলিতাম যে, মানুষের অত্যন্ত ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও অবিদ্যুত হয় নাই। রাজলক্ষ্মী খাওয়াইতে বসিল, কিন্তু খাওয়া-না-খাওয়া লইয়া তাহার আগেকার দিনের সেই অত্যন্ত জ্বরবদন্তি ছিল না, ছিল ব্যাকুল অনুনয়। জোর নয়, ভিক্ষা। বাহিরের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে না, পড়ে শুধু মানুষের নিকৃত হৃদয়ের অগলক চোখ-দুটির দৃষ্টিতে।

খাওয়া শেষ হইল। রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি এখন যাই?

অতিথি-সম্বন্ধ বাহিরে সমবেত হইতেছিলেন, বলিলাম, যাও।

আমার উচ্ছিন্ন পাড়গুলি হাতে লইয়া সে যখন ঘীরে ঘীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন বহুক্ষণ পর্যন্ত আমি অনামনে সেইদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া বহিলাম। মনে হইতে লাগিল, রাজলক্ষ্মীকে যেমনটি রাখিয়া গিয়াছিলাম এই কটা দিন পরে তেমনটি ত আব ফিরিয়া পাইলাম না। আনন্দ বলিয়াছিল, কাল হইতেই দিদির একপ্রকার অনাহারে কাটিয়াছে, আজ জলস্পর্শ করেন নাই, এবং কাল রাত বেলায় যে তাহার উপবাস ভাঙ্গিবে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অসম্ভব নয়! চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি, ধর্মপিপাসু চিন্ত তাহার কোনদিন কোন কষ্ট সাধনেই পরাস্ত হয়! এখানে আসিয়া অবধি সুনন্দার সাহচর্যে সেই অবিচলিত নিষ্ঠা তাহার নিরন্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। আজ তাহাকে অল্পক্ষণমাত্রই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছি, কিন্তু যে দুর্জয়ের সহস্রায় পথে সে এই অবিদ্রাষ্ট প্রত্যবেশে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, মনে হইল, তাহার নিশ্চিত জীবনের সন্ধিত কালিমা যত বড়ই হোক আর তাহার নাগাল পাইবে না। কিন্তু আমি? আমি যে তাহাও পথের মাথখানে উদ্ভুল গিরিজেশ্বরের মত সমস্ত অবরোধ করিয়া আছি!

কাজকর্ম সারিয়া, নিঃশব্দপদে রাজলক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আলো কমাইয়া, অত্যন্ত সাবধান আমার মশারি ফেলিয়া দিয়া সে নিজের শয্যায়া গিয়া শুইতে যাইতেছিল, আমি কথা কহিলাম। বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালটা সম্ভার পূর্বেই শেষ হয়েছে, এত রাত হ'ল যে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে চমকিত হইল, পরে হাসিয়া কহিল, আ আমার কপাল! আমি ভয়ে ভয়ে আসছি পাছে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিই। এখনো জেগে আছ, ঘুমোও নি যে বড়? তোমার আশাতেই জেগে

আছি।

আমার আশায়? তবে ডেকে পাঠাও নি কেন? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া মশারির একটা খায় তুলিয়া দিয়া আমার শয্যার শিয়ারে আসিয়া বসিল। বরাবরের অভ্যাসমত আমার চুলের মধ্যে তাহার দুই হাতের দশ আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, ডেকে পাঠাও নি কেন?

ডেকে পাঠালেই কি তুমি আসতে? তোমার কত কাজ।

হোক কাজ। তুমি ডাকলে না বলতে পারি এমন সাধি আছে আমার?

ইহার উত্তর ছিল না। জানি, আমার আহ্বান সভ্যই উপেক্ষা করিবার সাধ্য তাহার নাই। কিন্তু আজ এই সভ্যকেই সভ্য বলিয়া মানিয়া লইবার সাধ্য আমার কই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

ভাবচি।

ভাবচো? কি ভাবচো? এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে আমার কপালের উপরে তাহার মাথাটি ন্যস্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার উপর রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলে যে বড়?

রাগ করে গিয়েছিলাম তুমি জানলে কি করে?

রাজলক্ষ্মী মাথা তুলিল না, আস্তে আস্তে বলিল, আমি রাগ করে গেলে তুমি জানতে পার না? কহিলাম, বোধ হয় পারি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি বোধ হয় পার, কিন্তু আমি নিশ্চয় পারি, আর তোমার পারার চেয়েও ঢের বেশি পারি।

হাসিয়া কহিলাম, তাই হোক। এ নিয়ে বিবাদ করে জয়ী হতে আমি চাইনে লক্ষ্মী, নিজে হারার চেয়ে তুমি হেরে গেলেই আমার ঢের বেশি লোকসান।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যদি জান তবে বল কেন?

কহিলাম, বিনে ত আর! কিন্তু বলা যে অনেকদিন বন্ধ করেচি সেই খবরটাই তুমি জান না।

রাজলক্ষ্মী নীরবে হইয়া রহিল। পূর্বে হইলে সে আমাকে সহজে অব্যাহতি দিত না, লক্ষ কোটি প্রশ্ন করিয়া ইহাব কৈফিয়াত আদায় করিয়া ছাড়িত, কিন্তু এখন সে মৌনমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাকি এর মধ্যে জ্বর হয়েছিল? কোথায় ছিলে? বাড়িতে আমাকে খবর পাঠালে না কেন?

খবর না পাঠাইবাব হেতু বলিলাম। একে ত খবর আনিবার লোক ছিল না, দ্বিতীয়তঃ যাহার কাছে খবর পাঠাইব, তিনি যে কোথায় জানিতাম না। কিন্তু কোথায় এবং কি হবে ছিলাম তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। চক্রবর্তীগৃহিণীর নিকট আজই সকালে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। সেই দীনদীন গৃহস্থ পরিবারে যেভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম এবং যেমন করিয়া অপরিসীম দৈন্যের মধ্যেও গৃহকর্ত্তী অজ্ঞাতকুলশীল রোগগ্রস্ত অতিথিকে পুত্রাধিক স্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া কৃতজ্ঞতা ও বেদনায় আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া কহিল, যাতে তাঁরা ঋণমুক্ত হন, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও না কেন?

বলিলাম, থাকলে দিতাম, কিন্তু টাকা ত আমার নেই।

আমার এই সকল কথায় রাজলক্ষ্মী মর্মান্তিক দুঃখিত হইল। সে মনে মনে তেমনই দুঃখ পাইল, কিন্তু তাহার টাকা যে আমারও টাকা এ কথা সজ্ঞারে প্রতিপন্ন করিতে আগেকার দিনের মত আর কলহে প্রবৃত্ত হইল না, চুপ করিয়া রহিল।

এই জিনিসটা তাহার নূতন দেখিলাম। আমার এই কথার উপরে ঠিক এমনি শাস্ত নিকন্তরে বসিয়া থাকা আমাকেও বিধিল। কিছুক্ষণ পরে সে নিশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল, যেন দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়া সে তাহার চারিদিকে ঘনায়মান বাষ্পাচ্ছন্ন মোহের আবরণটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। ঘরের মন্দ আলোকে তাহার মুখের চেহারা ভাল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু যখন সে কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিল, বর্মা থেকে গোমার চিঠির জবাব

এসেচে। অফিসের বড় খাম, হয়ত জরুরী কিছু আছে ভেবে আনন্দকে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম।

তার পরে ?

বড়সাহেব তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেচেন। জানিয়েছেন, তুমি গেলেই তোমার সাবেক চাকরি আবার ফিরে পাবে।

বটে!

হাঁ। আনবো চিঠিখানা? না থাক। কাল সকালে দেখবো।

আবার দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। কি যে বলিব, কেমন করিয়া যে এই নীরবতা ভাঙ্গিব ভাবিয়া না পাইয়া মনের ভিতরটায় কেবল তোলপাড় করিতে লাগিল। হঠাৎ একফোঁটা চোখের জল টপ করিয়া আমার কপালের উপরে আসিয়া পড়িল। আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে, এ ত খারাপ সংবাদ নয়। কিন্তু তুমি কীদলে কেন?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি বিদেশে চাকরি নিয়ে আবার চলে যাবার চেষ্টা করচ, আমাকে এ কথা জানাও নি কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি বাধা দেব?

কহিলাম, না। বরঞ্চ জানালে তুমি উৎসাহই দিতে। কিন্তু সেজন্য নয়—বোধ হয় ভেবেছিলাম এসব তুচ্ছ ব্যাপার শোনবার তোমার সময় হবে না।

রাজলক্ষ্মী নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টাও আমার কাছে গোপন রহিল না। কিন্তু ক্ষণকাল মাত্র। ক্ষণেক পরেই সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, এ কথার জবাব দিয়ে আর আমার অপরাধের বোঝা বাড়াব না। তুমি যাও, তোমাকে আমি কিছুতেই বাধণ করব না। এই বলিয়া সে পুনরায় মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিল, এখানে না এলে বোধ হয় আমি কোনদিন বুঝতে পারতাম না, তোমাকে কত বড় দুর্গতির মধ্যে টেনে এনেছি। এই গঙ্গামাটির অঙ্ককূপে মেয়েমানুষের চলে, কিন্তু পুরুষের চলে না। এখানকার এই কমহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন ও তোমার আত্মহত্যার সমান। এ আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেউ কি তোমায় দেখিয়ে দিয়েছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। আমি নিজেই দেখেছি। তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখতে পাইনি। তার বদলে কেবল তোমার লক্ষ্যহারা বিরস মুখই দিনরাত্রি চোখে পড়েছে। আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আর না।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে একটা জ্বালার ভাবই ছিল : কিন্তু তাহার কঠোরের অনির্বচনীয় কল্পণায় বিভোর হইয়া গেলাম। বলিলাম, তোমাকেই কি কম ছাড়তে হয়েছে লক্ষ্মী? গঙ্গামাটি ও তোমারও যোগ্য স্থান নয় : কিন্তু কথটা বলিয়া ফেলিয়াই সন্ধ্যাতে মরিয়া গেলাম। কারণ, অনবধানভাবশতঃ যে গর্হিত বাক্য আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এই রমণীর কাছে তাহা গোপন রহিল না। কিন্তু আমাকে আজ সে ক্ষমা করিল। বোধ হয় কথার ভাস-মন্দ লইয়া মান-অভিমানের জাল বুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় আর তাহার ছিল না। বলিল, বরঞ্চ আমিই গঙ্গামাটির যোগ্য নই। সকলে এ কথা বুঝবে না, কিন্তু তোমার বোঝা উচিত সে সত্যই আমাকে কিছু ছাড়তে হয়নি। পাষাণের মত যে ভার একদিন লোকে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল, কেবল তাই আর একদিন আমার ঘুচেছে। আর শুধু কি তাই! আজীবন তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমাকে পেয়ে ছাড়ার অসংখ্য গুণ যে ফিরে পেয়েছি, সে কি তুমিই জান না?

জবাব দিতে পারিলাম না। অন্তরের অজানা অভ্যন্তর হইতে কে যেন এই কথাই আমাকে বলিতে লাগিল, ভুল হইয়াছে, তোমার মস্ত ভুল হইয়াছে। না বুঝিয়া তাহাকে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছি। রাজলক্ষ্মী ঠিক এই ভাবেই আঘাত করিল, বলিল, ভেবেছিলাম তোমার জন্যেই এ কথা কখনো তোমাকে জানাব না, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারলুম না। এই কষ্টটাই আমার সবচেয়ে বেশি লেগেছে যে, তুমি অনায়াসে ভাবতে পেরেচ যে পুণ্যের লোভে আমি এমন উন্মাদ হয়ে গেছি যে, তোমাকেও অবহেলা করতে শুরু করেছি। রাগ করে চলে যাবার আগে এ কথা তোমার একবারও মনে হয়নি যে, ইহকালে পরকালে রাজলক্ষ্মীর তোমার চেয়ে লোভের বন্ধ আর কি আছে। বলিতে

বলিতেই তাহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া আমার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

কথা বলিয়া সাব্বনা দিবার ভাষা মনে পড়িল না, শুধু মাথার উপর হইতে তাহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। রাজলক্ষ্মী ঐ হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছিয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; তাহার পরে কহিল, প্রজাদের সব খাওয়া শেষ হ'ল কিনা আমি দেখে আসি গে। তুমি ঘুমোও। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাকে ধরিয়া রাখিলে হয়ত রাখিতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলাম না। সেও আর ফিরিয়া আসিল না—আমারও যতক্ষণ না ঘুম আসিল শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম, জোর করিয়া রাখিয়া লাভ হইত কি? আমার পক্ষ হইতে ত কোনদিন কোন জোরই ছিল না, সমস্ত জোরই আসিয়াছিল তাহার দিক দিয়া। আজ সে-ই যদি ঐদন খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চায় ত আমি ঠেকাইব কোন পথে?

সকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রথমই ওদিকের খাটের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী ঘরে নাই। পাশে সে আসিয়াছিল, কিংবা অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়া গেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি, সেখানে একটা কোলাহল উঠিয়াছে। রতন কেটলি হইতে গরম চা পাশে ঢালিয়াছে এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা স্টোভে করিয়া সিঙ্গড়া কিংবা কচুরি ভাজিয়া তুলিতেছে, এবং বজ্রানন্দ তাহার সম্মাসীর নিষ্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়া এই সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আমাকে চুকিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার ভিজা চুলের উপর আঁচল টানিয়া দিল এবং বজ্রানন্দ কলবর করিয়া উঠিল, এই যে দাদা! আপনার দেরি দেখে ভাবছিলাম বুঝি বা সমস্ত জুড়িয়ে জল হ'বে নানা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, হাঁ, তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে জুড়িয়ে জল হ'ত।

আনন্দ কহিল, দিদি, সম্মাসী ফকিরকে খাতির করতে শিখুন। ওরকম কড়া কথা বলবেন না। আমাকে বলিল, বই, তেমন ভাল দেখাচ্ছে না ত; হাতটা একবার দেখব নাকি?

রাজলক্ষ্মী বাস্তব হইয়া উঠিল, রক্ষ কর আনন্দ, শেম্মার আর ডাক্তারিতে কাজ নেই, উনি বলেন আছেন।

আনন্দ বলিল, সেইটাই নিশ্চয় কববার ভনে হাতটা একবার—

রাজলক্ষ্মী কহিল না, তোমাকে হাত দেখতে হবে না। এখুনি হয়ত সাগুর বাবস্থা করে দেবে। আমি বলিলাম, সাগু আমি ঢের খেয়েছি, সাংরাং ও বাবস্থা করে দিলেও আর শুনব না। শুনেও তোমার কাজ নেই। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী ফ্রোট কমিশ্যন কনফারেন্সে গল্প কচুরি ও সিঙ্গড়া আমার দিকে বাড়িয়া দিল। বতনকে কহিল, তোর বাবুকে চা দা।

বজ্রানন্দ সম্মাসী হইবার পূর্বে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিল, অতএব সহজে হার মানিবার পাত্র নয়; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে গেল, কিন্তু দিদি, এট'র দায়িত্ব আপনার—

রাজলক্ষ্মী তাহার কথার মাঝখানেই থামাইয়া দিল, শোন কথা। ওর দায়িত্ব আমার নয় ত কি তোমার? আজ পর্যন্ত যত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওঁকে খাড়া রাখতে হয়েছে সে যদি শুনতে ও দিনবি কাছে আর ডাক্তারি কবতে যেতে না। এই বলিয়া সে বাকী সমস্ত খাবার একটা খালয় টানিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সথাসো কহিল, এখন খাও এগুলো, কথা বলা হোক।

আনন্দ হাঁ হাঁ করিয়া ঠিল, তবে এও খাওয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, যায় না ও সম্মাসী হতে গিয়েছিলে বলা, ও পাঁচজন ভদ্রলোকের মত গেরস্ত থাকলেই ত হ'ত!

আনন্দের দুই চক্ষু সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কহিল, আপনার মত দাঁদিব দল এই বাঙ্গলা মূলকে আছে বলেই ত, নইলে দাঁদিব করে বনচি, আঙঠি এই গেরুয়াটেক্যাঙলো অজয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যেতাম। কিন্তু আমার অনুরোধ আছে দিদি। পরন্তু থেকেই একরকম উপোস করে আছেন, আজ আর্থিক-টাইকগলো একটু সকাল সকাল সেবে নি। এগুলোতে এখনও অংশদেব ঘটেনি, বলেন ত না হয়—, এই বলিয়া সে সম্মুখের ভোজ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বল কি আনন্দ, কাল আমার সমস্ত ব্রাহ্মণ এসে উঠতে পারেন নি!

আমি বলিলাম, আগে তাঁরা এসে উঠুন। তার পরে—

আনন্দ কহিল, তাহলে, আমাকেই উঠতে হ'ল। তাদের নাম ও ঠিকানা দিন, পাষণ্ডদের গলায় গামছা দিয়ে এনে ভোজন করিয়ে ছাড়ব। এই বলিয়া সে উঠার পরিবর্তে থালা টানিয়া লইয়া নিজেই ভোজনে মন দিল।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, সন্ন্যাসী কিনা, দেব-দ্বিজে অতিশয় ভক্তি।

এইরূপে আমাদের সকালের চা-খাওয়ার পালাটা যখন সাজ হইল তখন বেলা আটটা। বাহিরে আসিয়া বসিলাম। শরীরেও শ্রানি ছিল না, হাসি-তামাশায় মনও যেন স্বচ্ছ, প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর বিগত রাত্রির কথাগুলার সহিত তাহার আজিকার কথা ও আচরণের কোন ঐক্যই ছিল না। সে যে অভিমান ও বেদনায় ব্যথিত হইয়াই ওরূপ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রাত্রির শুদ্ধ আধার আবরণের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাকে বৃহৎ ও কঠোর কল্পনা করিয়া যে দুঃখ ও দৃষ্টিভ্রান্ত ভোগ করিয়াছি, আজ দিনের আলোকে তাহা স্বরণ করিয়া মনে মনে লজ্জাও পাইলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

কল্যাকার মত আজ উৎসবের ঘটা ছিল না, তথাপি মাঝে মাঝে আহুত ও অনাযতের ভোজনালীলা সমস্ত দিনমান ব্যাপিয়াই অব্যাহত রহিল। বেলা গেল। আর একবার আমরা চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া ঘরের মেঝেতে আসন করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কাজকর্ম কতকটা সারিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্য আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বজ্রানন্দ কহিল, দিদি, স্বাগত! রাজলক্ষ্মী তাহার প্রতি হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, সন্ন্যাসীর বুঝি দেবসেবা শুরু হ'ল, তাই এত আনন্দ?

আনন্দ কহিল, মিথো বলেন নি দিদি। সংসারে যাবতীয় আনন্দ আছে তার মধ্যে ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দই শ্রেষ্ঠ এবং শাস্ত্রে বলেছেন, ত্যাগীর পক্ষে দ্বিতীয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ, সে তোমার মত ত্যাগীর পক্ষে।

আনন্দ উত্তর দিল, এও মিথো নয় দিদি। আপনি গৃহিণী বলেই এর মর্মগ্রহণ করতে পারেন নি। নইলে আমরা ত্যাগীর দল যখন আনন্দে মসৃণ হয়ে আছি, আপনি তখন তিনদিন ধরে কেবল পবন খাওয়াচ্ছেন, আর নিজে মরছেন উপবাস করে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মরচি আর কই ভাই? দিনের পর দিন ত দেখচি এ দেহটাও কেবল শ্রীবৃদ্ধি হয়েই চলে।

আনন্দ কহিল, তার কারণ, হতে বাধ্য। সেবারেও আপনাকে দেখে গিয়েছিলেন, এবারেও এসে দেখচি। আপনার পানে চাইলে মনে হয় না যে পৃথিবীর জিনিস দেখচি, এ যেন দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছু।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে হাসিয়া কহিলাম, তোমার আনন্দের যুক্তি প্রণালীটা দেখসে?

তিনিয়া আনন্দও হাসিল, কহিল, এ ও যুক্তি নয়, স্তম্ভি। দাদা, সে দৃষ্টি থাকলে কি আর বলাই যেতেন চাকরির দরখাস্ত করতে? আচ্ছা দিদি, কোন দৃষ্টবুদ্ধি দেবতাটি দিয়েছিলেন এই অল্প মানুষটিকে আপনার খাড়ে চাপিয়ে? তা'র কি আর কাজ ছিল না?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, দেবতাব দোষ নেই ভাই, দোষ এই ললাটের। আর ও'র দোষ ত অতিবড় শত্রুত্বও দিতে পারবে না। এই বলিয়া সে আমাদের দেখাইয়া কহিল, পাঠশালাে উনি ছিলেন সর্দার প'ড়ে, যত না দিতেন পড়া বলে তার চেয়ে বেশি দিতেন বেত। তখন পড়ি ত সবে গোমোদ্য, বইয়ের গোপ ত বুঝি হ'ল, গোপ হ'ল আর একরকমের। ছেলেমানুষ, ফুল পাব কোথায়, বনের বঁইচফলের মালা গোখে ওঁকে করলাম বরণ। এখন ভাবি, তা'র সঙ্গে তার কাটাগুলোও যদি গোখে দিতাম! বলিতে বলিতে তাহার কুপিত কণ্ঠস্বর চাপাহাসির আভাষ অপরূপ হইয়া উঠিল।

আনন্দ কহিল, উঃ—কি ভয়ানক রাগ!

রাজলক্ষ্মী বলিল, রাগ নয়ত কি? কাঁটা তুলে দেবার আর কেউ থাকলে নিশ্চয় দিতাম। এখনো পাই ও দি। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আনন্দ ডাকিয়া কহিল, 'দেখেন যে বড়?

কেন, আর কাজ নেই নাকি? চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ওঁর কৌদল করবার সময় আছে, কিন্তু আমার নেই।

আনন্দ বলিল, দিদি আমি আপনার অনুগত ভক্ত। কিন্তু এ অভিযোগে সায় দিতে আমারও লজ্জা করচে। উনি একটা কথাও কইলে না হয় পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু একদম বোঝা মানুষকে ফাঁদে ফেলা যায় কি করে? করলেও ধর্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঐ ত হয়েছে আমার জ্বালা। বেশ, ধর্মে যা সয়, তাই নাইয় কর। চায়ের বাটিগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—আমি ততক্ষণ রামায়ণটো একবার ঘুরে আসি গে। বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, দাদার কি বর্মা যাবার সম্ভব এখনও আছে নাকি? কিন্তু দিদি কতখন্দে সঙ্গে যাবেন না তা আমাকে বলেছেন।

সে আমি জানি।

তবে?

তবে একলাই যেতে হবে।

বজ্রানন্দ কহিল, এই দেখুন আপনার অনায়াস। অর্ধোপার্জনীর আবশ্যক আপনাদের নেই, তবে কিসের জন্যে যাবেন পরের গোলামি করতে?

বলিলাম, অন্ততঃ অতঃসটা বজায় রাখতে।

এটা বাগের কথা দাদা।

কিন্তু বাগ ছাড়া কি মানুষের আর কোন হেতু থাকতে নেই আনন্দ?

আনন্দ কহিল, থাকলেও অপরের পক্ষে বোঝা কঠিন।

ইচ্ছা হইল বলি, এ কঠিন কাজ অপরের করিবারই বা প্রয়োজন কি, কিন্তু বাদানুবাদে জিনিসটা পাছে তিক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় চূপ করিয়া গেলাম।

এমনি সময়ে রাজলক্ষ্মী বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া একদল ভালমানুষের মত আনন্দের পাশ্বে গিয়া স্থির হইয়া বসিল। আনন্দ আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, দিদি, উনি বলছিলেন, অন্ততঃ গোলামির অভ্যাস বহাল রাখবার জন্যেও ওঁর 'দেশ যাওয়া চাই; আমি বলছিলাম, তাই যদি চাই, আসুন না, আমার কাজে যোগ দেবেন। ' দেশে না গিয়ে দেশের গোলামিতেই দুই ভাট্টিয়ে জীবন কাটিয়ে দেব। রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু উনি ত ভক্তারি জানেন না আনন্দ?

আনন্দ কহিল, আমি কি শুধু ভক্তারিই করি? ইস্কুল করে, পাঠশালা করি, তাদের দুর্দশা যে কত দিক দিয়ে কত বড় ওঁর অশ্রম বোধাবার চেষ্টা করি।

তারা বোঝে?

আনন্দ কহিল, সহজে। 'বোঝে না। কিন্তু মানুষের শুভ ইচ্ছা যখন বুক থেকে সত্য হয়ে বার হয়, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় না দিদি।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। বোধ হয় সে বিশ্বাস করিল না, বোধ হয় সে আমার জন্যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, পাছে তা'ও সায় দিয়া বসি, পাছে আমিও

আনন্দ শ্রম করিল, মাথা নাড়লেন যে বড়?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে মিশ্র মধুরকণ্ঠে কহিল, দেশের দুর্দশা যে এত বড় তা আমিও জানি আনন্দ। কিন্তু তোমার একলার চেষ্টায় আর কি হবে ভাই? আমাকে

দেখাওয়া কহিল, আবার উনি যাবেন সাহায্য করতে? তবেই হয়েছে। তাহলে আমার মত ঠর সেবাতেই তোমার দিন কাটবে, আর কারও কিছু করতে হবে না। এই বলিয়া সে হাসিল।

তাহার হাসি দেখিয়া আনন্দ নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ নেই দিদি ঠকে নিয়ে, থাকুন উনি চিরকাল আপনার চোখের মনি হয়ে। কিন্তু একলা-দোকলার কথা এ নয়! একলা মানুষেরও আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি এত বড় যে, তার পরিমাণ হয় না। ঠিক বামনদেবের পায়ে মত। বাইরে থেকে সে দেখতে ছোট, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পদতলটুকু প্রসারিত হলে বিশ্ব আচ্ছন্ন করে দেয়।

চাহিয়া দেখিলাম, বামনদের উপমায় রাজলক্ষ্মীর চিত্র কোমল হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে কিছুই কহিল না।

আনন্দ বলিতে লাগিল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক, বিশেষ কিছু করতে আমি পারিনে। কিন্তু একটা কাজ করি। সাধামত দুঃখীর দুঃখের অংশ আমি নিই দিদি।

রাজলক্ষ্মী অধিকতর আশ্রয় হইয়া বলিল, সে আমি জানি আনন্দ। তোমাকে দেখে প্রথম দিনই আমি তা বুঝেছিলাম।

আনন্দ বোধ হয় একথায় কান দিল না, সে নিজের কথাব সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, আপনাদের মত আমারও অভাব কিছুই ছিল না। বাবার যা আছে, বিপুল সুখে দিন কাটাবার পক্ষেও সে বেশি। আমার কিন্তু তাতে প্রয়োজন নেই। এই দুঃখীর দেশে সুখভোগেব লালসটিও যদি ও জীবনে ঠেকিয়ে রাখতে পারি সেই আমার ঢের।

রতন আসিয়া জানাইল, পাচক বলিতেছে খাবার প্রস্তুত।

রাজলক্ষ্মী তাকে ঠাই করিবার আদেশ দিয়া আমাদের কঠিন, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল সেরে নাও আনন্দ, আমি বড় ক্লান্ত।

সে যে ক্লান্ত তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু ক্লান্তিও তাহাতে কখনও দাঁকি নাহি। উভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িলাম। রঙ্গ-বহসো আজিকার প্রভাত প্রাপ্ত হইয়াছিল আমাদের ভারী একটা প্রসন্নতার মধ্য দিয়া, সারাহের সভাও জন্মিয়াছিল হাস্য পরিবাসে উজ্জ্বল হইয়া। কিন্তু ভাসিল যেন নিরানন্দেব মলিন অবসাদে। আহাদের জন্য দুজনে যখন বামাধারের দিকে অগ্রসর হইলাম তখন কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না।

পরদিন সকালে বজ্রানন্দ প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। কাহারও কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই রাজলক্ষ্মী চিরদিন আঁপত্তি করে। দিনক্ষণেব অজুহাতে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া এতাদৃশ বাধা দেয়। কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিল না। শুধু বিদায় লইয়া যখন সে প্রস্তুত হইল, তখন কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আনন্দ, আমার কবে আসবে ভাই?

আমি নিকটেই ছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সন্ন্যাসীর চোখের দীপ্তি কান্দা হইয়া আসিল, কিন্তু সে মুহূর্তে আশ্বসংবরণ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আসবে বৈ কি দিদি! যদি বেঁচে থাকি, মাঝে মাঝে উৎপাত করতে হাজির হবই।

ঠিক ত?

নিশ্চয়।

কিন্তু আমরা ত শীঘ্রই চলে যাব। যেখানে থাকব যাবে সেখানে?

আদেশ করলে যাব বৈ কি দিদি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেয়ো। তোমার ঠিকানা আমাদের লিখে দাও আমি তোমাকে চিঠি লিখব।

আনন্দ পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া হাতে দিল। সন্ন্যাসী হইয়াও আমাদের উভয়কে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল এবং রতন আসিয়া তাহাও পদদলি রাখা করিলে আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গুহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

পনর

সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ তাহার ঔষধের ব্যাগ ও ক্যাথিসের ব্যাগ লইয়া যেদিন বাহির হইয়া গেল সেদিন

শুধু যে সে এ বাড়ির সমস্ত আনন্দটুকুই ছাঁকিয়া লইয়া গেল তাই নয়, আমার মনে হইল যেন সে সেই শূন্য স্থানটুকু ছিদ্ৰহীন নিরানন্দ দিয়া ভরিয়া দিয়া গেল। ঘন শৈবাল-পরিব্যাপ্ত জলাশয়ের যে জলটুকু তাহার অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্যের অভিঘাতে আবর্জনামুক্ত ছিল, সে যেন তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লেপিয়া একাকার হইতে চলিল। তবুও ছয়-সাতদিন কাটিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী প্রায় সারাদিনই বাড়ি থাকে না। কোথায় যায়, কি করে জানি না, জিজ্ঞাসাও করি না। দিনান্তে একবার যখন দেখা হয় তখন হয় সে অনামনস্ক, না হয় বড় কুশারীঠাকুর সঙ্গে থাকেন, কাজের কথা চলে। একলা ঘরের মধ্যে যে আনন্দ আমার কেহ নয়, তাইকেই বার বার মনে পড়ে। মনে হয় হঠাৎ যদি সে আবার আসিয়া পড়ে! শুধু কেবল আমিই খুশি হই তাই নয়, ওই যে বাজলক্ষ্মী বারান্দার ওধারে বসিয়া শ্রীদীপের আলোকে কি একটা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি জানি, সেও তেমনি খুশি হইয়া উঠে। এমনিই বটে। একদিন যথাদেহ উন্মুখ যুগ্মহৃদয় বাহিরের সর্ববিধ সংস্রব পরিহার করিয়া একান্ত সম্মিলনের আকাজক্ষায় ব্যাকুল হইয়া থাকিত, আজ ভাস্করের দিনে সেই বাহিরটাকেই আমাদের কত বড়ই না প্রয়োজন! মনে হয়, যে কেহ হোক, একবার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলে যেন হাঁফ ফেলিয়া বঁচি।

এমনি করিয়া দিন যখন আর কাটিতে চাহে না, তখন হঠাৎ একসময়ে রতন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখের হাসি সে আব চাপিতে পারে না। রাজলক্ষ্মী গুতে ছিল না, অতএব তাহার ভীত হইবারও আবশ্যক ছিল না, তথাপি সে সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, শোনেন নি বুঝি?

কহিলাম, না।

রতন বলিল, "দুর্গা কল্যাণের এই মতিটি যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। আমরা যে দু-চারদিনেই যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছি।

রতন আর একবার দ্বারের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, সে খবরটা সঠিক এখনো পাঠনি। হয় পাঠিনো না হয় কাশীতে না হয়—কিন্তু এ ছাড়া আর বাড়ি ত আর কোথাও নেই!

চপ করিয়া কহিলাম, আমার এত বড় ব্যাপারেও নিকৎসুকতা লক্ষ্য করিয়া বেশ হয় সে ভাবিল আমি তোহা কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাই সে চাপা গলায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি বলছি এ সত্য। গাওবা আমাদের হবেই। আঃ—বাঁচা যাক তাহলে, না? বলিলাম, হাঁ।

রতন অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিল, কষ্ট করে আর দু-চারদিন সবুর করুন, বাস্। বড়জোর প্রয়োজনে, তার বেশি নয়। গঙ্গামাটির সমস্ত ব্যবস্থা আ কুশারীমশায়ের হস্তে শেষ করে ফেলেছেন, এখন বেগেছেদে নিয়ে একবার দুর্গা দুর্গা বলে পা বাড়াতে পারলে হয়। অঃ—ইলুম সব শহরের মানুষ, এখানে কি কখনো মন বসে? এই বলিয়া সে খুশির আবেগে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রতনের অভ্যাস কিছুই নাই। তাহাধেই মত আমিও যে একজন রাজলক্ষ্মীর অনুচরের মধ্যে, এবং ইহার অধিক কিছু নয় একথা সে জানে। সে জানে, কাহারও কোন মতামতই মূল্য নাই, সকলের সমস্ত ভাল লাগা না-লাগা কষ্টের ইচ্ছা ও অভিরুচির পবেই নির্ভর করে।

যে আভাসটুকু রতন দিয়া গেল সে নিজে তাহার মন বুকে না, কিন্তু তাহা বাক্যের সেই নিহিত অর্থ দেখিতে দেখিতে আমি চিত্তপটে সর্বদিক দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবশিষ্ট নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেই হেলা করিয়া চলিয়াছে। একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রাণ আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধা আমার ছিল না, হেঁট হইয়া আসিয়া, লাম। আমাকে সে বড় করিয়া আনে নাই। নারীবোম, আমার জন্য সে অনেক স্বাথ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু আজ চোখে পড়িল ঠিক তাহাই নয়! রাজলক্ষ্মীর স্বার্থের প্রেক্ষিতা এতদাল দেখি নাই বলিয়াই একপা ভবিয়া আসিয়াছি। কিন্তু, অর্থ, ব্রহ্ম্য—অনেক কিছুই সে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে কি আমারই জন্য? আবর্জনাস্তূপের মত সে সকল কি তাহার নিজের প্রয়োজনেই পথ রোধ করে নাই? আমি এবং আমাকে লাভ করার মধ্যে যে

রাজলক্ষ্মীর কতবড় প্রভেদ ছিল সেই সত্য আজ আমার কাছে প্রতিভাত হইল। আজ তাহার চিহ্ন ইহলোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব অন্যান্য আবর্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের একদারে অন্যদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই। অস্বীকার কবিত্ত না কখনও।

পরদিন সকালেই জানিতে পারিলাম, ধূর্ত রতন তথ্য যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ভ্রান্ত নহে। গঙ্গামাটি-সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর নিজের মুখেই তাহা অবগত হইলাম। প্রভাতে নিয়মিত পূজা-আহ্নিক সমাধা করিয়া সে অপরাপর দিনের মত বাহির হইল না। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, পরশু এমনি সময়ে যদি খাওয়া দাওয়া শেষ করি আমার বার হয়ে যেতে পারি ত সীইথিয়ায় পশ্চিমের গাড়ি অনায়াসে ধরতে পারব, কি-বল।

বা-লালম, পারবে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এখনকার বিলি-ব্যবস্থা ত একরকম শেষ করে ফেললাম। কুশালীমাশাউ যোমন দেখছিলেন শুনছিলেন, তেমনই করবেন।

কহিলাম, ভালই হ'ল।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। বোধ হয় প্রস্তুতি ঠিকমত আরম্ভ করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই শেষে কহিল, বন্ধুকে চিঠি লিখে দিয়েছি, সে একখানা গাড়ি বিভাজিত করে সেটাতেই উপস্থিত থাকবে। কিন্তু থাকে তবেই ত।

বলিলাম, নিশ্চয় থাকবে। সে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, সাধামত করবে না। এতদ্ব্যতীত, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যোগে পারবে না?

কোথায় যাইতে হইবে এ প্রশ্ন কবিত্তে পারিলাম না। মুখে বসিল। কেবল বলিলাম যদি যাবার প্রয়োজন মনে কর ত যেতে পারি।

ইহাব প্রত্যুত্তরে রাজলক্ষ্মীও কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তখন একসময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কই, তোমার চা এখনো ত আনিবে না?

কহিলাম, না, বোধ হয় কাজে ব্যস্ত আছে।

বস্ত্তঃ চা আনিবার সময় বক্ষণ উদ্বীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্বের দিনে ভ্রাতৃদের হস্তে তখন সে কিছুতেই মার্জনা করিতে পারিত না, বকিয়া বকিয়া তুলে কাঙ করিয়া তুলিত, কিন্তু এখন কি একপ্রকারের লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল এবং একটা কথাও না কহিয়া ভ্রাতৃদের হস্তে হস্ত হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্বাহ্নে সকল প্রজাতির আসিয়াই ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ভোমের মাল মেয়েটিকে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ গ্রাম ভাগ করিয়া তাহার অন্যত্র গিয়া সমস্ত পাতিয়াছিল, দেখা হইল না। স্বর পাইলাম, সেখানে আমি লইয়া সে সুস্থ আছে। কুশালীমাশাউ যুগল রাত্রি থাকিতেই সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদের সম্পর্ক ঘটিত বিরোধের সুমীমাংসা হওয়ায় তাহারা আবার এক হইয়াছিলেন। কি করিয়া যে রাজলক্ষ্মী কি কবিল, সপরিবারে জানিবার কৌতুহলও ছিল না, জানিও না। কেবল এইটুকু তাহাদের মুখে প্রতি চাহিয়া জ্ঞানিতে পারিলাম যে, কলহের অবসান হইয়াছে, এবং পূর্বসন্ধিত বিরোধের মাল কোন লঙ্ঘন মনেই হইবে বিদ্যমান নাই সুনন্দা আসিয়া তাহার ছেলেকে লইয়া আমাকে প্রণাম করিল, কহিল, আমাদের যে আপনি শীঘ্র ভুলে যাবেন না সে আমি জানি। এ বাচ্চা প্রার্থনা আপনাব কাছে আমি করব না।

সহাস্য কহিলাম, আমার কাছে আবার কি কাজের প্রার্থনা করবে দিদি?

আমার ছেলেকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

কহিলাম, এই ত বাচ্চা প্রার্থনা, সুনন্দা। তোমার মত মায়ের ছেলেকে যে কোন আশীর্বাদ করা যায় সে ও আমিই জানি।

রাজলক্ষ্মী কি একটা প্রয়োজনে এই দিক দিয়া যাইতেছিল, কথটা তাহার কানে যাইতেই ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দার হইয়া ভাবাব দিয়া কহিল, ওর ছেলেকে তুমি এই আশীর্বাদ করে যাও যেন বড় হয়ে ও তোমার মত মন পায়।

হাসিয়া কহিলাম, বেশ আশীর্বাদ! তোমার ছেলেকে বৃষি লক্ষ্মী তামাশা করতে চায়, সুন্দা।

কথা আমার শেষ না হইতেই রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, কি, তামাশা করতে চাই নিজের ছেলের সঙ্গে? এই যাবার সময়ে? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত শুক থাকিয়া কহিল, আমিও ত ওর মায়ের মত আমি প্রার্থনা করি ভগবান যেন ওকে এই বদই দেন। গর চেয়ে বড় ও আমি কিছুই জানিনে।

সহসা চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু ওলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথাও না কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর সবাই মিলিয়া গঙ্গামাটি - - - চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এমন কি রতন পর্যন্ত পুনঃপুনঃ চোখ মুচিড়ে লাগিল। যাহা-বা বহিল তাহাদের সন্নিবন্ধ অনুরোধে সকলেই আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, শুধু দিতে পারিলাম না আমি। আমিই কেবল নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলাম এ জীবনে এখানে ফিরিয়া আসিবার আমার সম্ভাবনা নাই। তাই যাবার পথে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রতি বার বার ফিরিয়া চাহিয়া কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যেন অপরিমেয় মাধুর্য ও বেদনায় পরিপূর্ণ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের এইমাত্র যবনিকা পড়িল; নাট্যশালার দীপ নিভিল—এইবার মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ সংসারের সহস্রবিধ ভীড়ের মধ্যে আমাকে রাস্তায় বাহির হইতে হইবে। কিন্তু জনতার মাঝখানে সে মনের অত্যন্ত সতর্কতায় পদক্ষেপ করিবার কথা, আমার সেই . . . যেন নেশার ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পরে আমরা সেইখানায় আসিয়া পৌছিলাম। রাজলক্ষ্মীর আদেশ ও উপদেশের কোনটাই বন্ধ অবস্থায় করে নাই। সে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজে আসিয়া স্টেশনের প্রাটফর্মে উপস্থিত ছিল, যথাসময়ে ট্রেন আসিলে মালপত্র যোঝাই দিয়া রতনকে চাকরদের কামরায় তুলিয়া দিয়া বিমোহনে লইয়া গাভিতে উঠিল। কিন্তু আমার সহিত সে বিশেষ কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিল না, কারণ, এখন তাহার দর বাড়িয়াছে, ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি লইয়া এখন সংসারে সে মানুষের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বন্ধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি। সকল অবস্থাকেই মনিয়া লইয়া চলিতে গেল। এক দিন্দা তাহার অঙ্গিত হইয়াছে পৃথিবীতে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয় না।

গাভি ডাড়াতে হইল ও মিনিট পাঁচেক লোক হইল, কিন্তু আমার কলিক . . . যাইবার ট্রেন আসিবে প্রায় শেষ দাড়ে। একদারে দ্বির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাজলক্ষ্মী তখন . . . জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হঠাৎ উপাশায় আমাকে আহ্বান করিল। নিকটে যাইতেই কহিল, এ . . . ভিতরে এস। ভিতরে আসিতে সে হাত ধরিয়া আমাকে পাশে বসাইয়া কহিল, তুমি কি খুব শীঘ্রই বর্ম্মা চলে যাবে? যাবার আগে আর একটীকর দেখা দিয়া যাবে না?

কহিলাম, যদি প্রয়োজন মনে কর যোতে পারি।

রাজলক্ষ্মী চুপিচুপি উত্তর দিল, সংসারে যাকে প্রয়োজন বলে সে নেই। শুধু আর একবার দেখতে চাই। অসম্ভব।

অসম্ভব।

অসম্ভব? কেন? চাইলে চাইলে?

সব।

বাহিরে গাভি ডাড়াবার শেষ মল্লতা বাড়িয়া উঠিল, এবং গাভসাহেব ও তাহার সবুজ আলো বার বার নীতয়া এই আবেশিত কার্যে মগ্ন হইলেন। রাজলক্ষ্মী যেট হইয়া আমার পায়ে ধরিয়া লইয়া আমার হাত চাপিয়া দিল। আমি মনিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেই গাভি চলিতে শুরু করিল। অজ্ঞকার গাভি, ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল স্টেশনপ্রাটফর্মের গোটাগুলো, কেরোসিনের আলো মূর্ত্তব গাভিশীল গাভিও সেই আলো জানালার একটি অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির উপরে বারকয়েক আলোকপাত করিল।

কলিকাতায় আসিয়া চিঠি দিলাম এবং জবাবও পাইলাম। এখানে কাজ বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহা দিন পনের মধ্যে শেষ হইল। এইবার বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে প্রতিশ্রুতিমত আর একবার রাজলক্ষ্মীকে দেখা দিতে হইবে। আরও সপ্তাহ-দুই এমনিই কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল, এতদিনে কি জানি কি তাহার মতলব হইবে, হয়ত সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, হয়ত অত দূরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর-আপত্তি তুলিয়া জিদ করিতে থাকিবে—কিছুই অসম্ভব নয়। এখন সে কাশীতে। তাহার বাসার ঠিকানাও জানি, ইতিমধ্যে দুই-তিনখানা পত্রও পাইয়াছি, এবং ইহাও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার প্রতিশ্রুতির বিষয় কোথাও সে ইস্তিতে স্মরণ করাইবার প্রয়াস করে নাই। না করিবারই কথা! মনে মনে বলিলাম, আপনাকে এতখানি ছোট করিয়া আমিও বোধ করি মুখ ফুটিয়া লিখিতে পারিতাম না, তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাও। অকস্মাৎ দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিলাম। এ জীবনে সে যে এতখানি জড়িয়াছিল তাহা কেমন করিয়া যে এতদিন তুলিয়া ছিলাম ভাবিয়া আশ্চর্য হইলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখনও সময় আছে, তখনও গাড়ি ধরিতে পারি। বাসায় সমস্ত পড়িয়া রহিল, বাহির হইয়া পড়িলাম। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলার প্রতি চাহিয়া মনে হইল, থাক এ সকল পড়িয়া। আমার প্রয়োজনের কথা যে আমার চেয়েও বেশি করিয়া জানে তাহারই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া আর প্রয়োজনের বোঝা বহিব না। রাঙে ট্রেনের মধ্যে কিছুতেই ঘুম আসিল না, অলস তন্ময় বৌকে মুদিত দুই চক্ষুর পাতার উপরে কত খেয়াল, কত কল্পনাই যে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার আদি-অন্ত নাই। হয়ত, অধিকাংশই এলোমেলো, কিন্তু সবটুকু যেন একেবারে মধু দিয়া ভরা। ক্রমশঃ সকাল হইল, বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকজনের ওঠা নামা, হাঁকাহাঁকি, দৌড়াপেব অবধি রহিল না, খর রৌদ্রতাপে চতুষ্পার্শ্বের কোথাও কোন কুহেলিকার চিন্মাত্র নাই, কিন্তু আমার চক্ষে সমস্তই একেবারে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পথে ট্রেনের বিলম্ব হওয়ায় রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাটীতে গিয়া যখন পৌছিলাম তখন বেলা অধিক হইয়াছে। বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে একজন বৃদ্ধগোছের গ্রাম্য বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চান?

কি চাই সহসা বলিতে পারিলাম না। তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কারো খুজছেন? কাহাকে খুঁজতেছি ইহাও সহসা বলা কঠিন। একটু থামিয়া কহিলাম, নতুন আছে। না, সে বাজারে গেছে।

ব্রাহ্মণ সজ্জন ব্যক্তি। আমার খুলিধূসর মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বোধ হয় অনুমান করিলেন যে, আমি দূর হইতে আসিতেছি। সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আপনি বসুন, সে শীঘ্রই ফিরবে। আপনাকে তাহাকেই শুধু দরকার?

নিকটে একটা টেবিলে বসিয়া পড়িলাম। তাহার প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে বন্ধুবাবু আছেন?

আছে বৈ কি। এই বলিয়া তিনি একজন নতুন চাকরকে ডাকিয়া বন্ধুকে ডাকিয়া দিতে কহিলেন। বন্ধু আসিয়া আমাকে দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, পরে তাহার নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া কহিল, আমরা ভেবেছিলাম আপনি বৃষ্টি বর্ষা চলে গেছেন।

এই আমরা যে কে কে, এ প্রশ্ন আমি আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বন্ধু কহিল, আপনাকে জিনিসপত্র বৃষ্টি এখনো গাড়িতেই—

না, জিনিসপত্র আমি কিছুই সঙ্গে আনিনি।

আনেন নি? রাত্রে গাড়িতেই ফিরবেন বৃষ্টি?

কহিলাম, সম্ভব হলে তাই ফিরব ভেবেছি।

বন্ধু কহিল, তাহলে একটা বেলায় জনো আর দরকারই বা কি?

ভৃত্য আসিয়া খুঁটি-গামছা হাতমুখ ধোবার জল প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্তই দিয়া গেল, কিন্তু আর কেহ আমার কাছে আসিল না।

খাবার ডাক পড়িল, গিয়া দেখিলাম, আমার ও বন্ধুর ঠাই পাশাপাশি হইয়াছে। দক্ষিণের দরজা ঠেলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল। গোড়ায় বোধ হয় তাহাকে চিনিতে পারি নাই। যখন পারিলাম প্রথমটা চোখের সম্মুখে যেন সমস্ত কালো হইয়া উঠিল। এখানে কি আছে এবং কে আছে মনে পড়িল না। পরক্ষণেই মনে হইল নিজের মর্গাদা রাখিয়া, হাস্যকর কিছু একটা না করিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া এ বাড়ি হইতে আবার সহজ মানুষের মত বাহির হইতে পারিব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়িতে কষ্ট হয়নি ত ?

এ ছাড়া সে আর কি বলিতে পারে! ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িয়া ক্ষণকাল তৃষ্ণ হইয়া রহিলাম, বোধ হয় মুহূর্ত-কয়েকের বেশি নয়, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিলাম, না, কষ্ট হয়নি।

এইবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যে শুধু খানকাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত পিঠজোড়া সুদীর্ঘ চুলের বাশিও আর নাই। মাথার পরে ললাটের প্রান্ত পর্যন্ত আঁচলটানা, তথাপি তাহারই ফাঁক দিয়া কাটা-চুলের দুই চারিগোছা অলক কণ্ঠের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপবাস ও কঠোর আশ্রয়গ্রহণের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা মুখের পরে ফুটিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ভাতের গ্রাস আমার গলায় বাধিতেছিল, তবু জোর করিয়া গিলিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতে লগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি। এবং আজ শুধু একটা দিনের জন্যও সে যেন আমার খাওয়াব স্বভাব লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়।

আথাগের শেষে বাঙলক্ষ্মী কহিল, বন্ধ বলছিল তুমি নাকি আজ রাত্রের গাড়িতেই ফিরে যেতে চাও :

বলিলাম, হ্যাঁ।

ইস! আজ, কিন্তু তোমার জাহাজ চাউরে ত সেই রবিবারে।

তাহার এই কথা শুনিয়া আমার বিস্ময় হইয়া মুখের প্রতি চাহিতেই সে হঠাৎ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। পরক্ষণে তাৎক্ষণিক সমালোচনা লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তাব ত এখনও তিনদিন দেরি।

বলিলাম, হ্যাঁ, আরও কতক দেরি।

পুনরায় বাঙলক্ষ্মী কি একটা বিনোদন প্রদান করিয়া রহিল, সে বিষয় আমার শ্রদ্ধা বা অসুস্থ হওয়ায় সম্ভাবনার কথা মনে আসিল না, বসিলাম মৌন, কথ্য কহিল, আমার গুরুদেব এসেছেন।

বলিলাম বাহিরে যাওয়া উচিত, তবু মনে পড়িল এইমত কথা 'তিনিই' ইহাকেই দেখাইবার জন্য সে আমাকে একবার এই কাছাকাছি আসিয়া আসনটোল সমস্ত বস্তু তাহার সহিত আলাপ হইল। আমার গাড়ি ছাড়িলে বাহিরের পথে যখনও যে সমস্ত মানুষ আসি সেই ভাল। স্বপ্নের অবলম্বিত নিষ্ঠাও আছে, উদারতাবও অভাব নাই। এতগুলি সমস্ত কথাই ভাবিয়া কখনও কখনও একবার বাঙলক্ষ্মী গোপন কিছুই করে নাই। অনেক কথাই ভাবিয়া, গুরুদেব উপস্থিত ও কম ভাবনা না, কিন্তু গ্রহা উগ্রও নয়, আশাওও করে না। সমস্ত কথা মনে নাই। হঠাৎ মনে আসিল যখন সেই, তার একটি স্বপ্ন আছে যে, একদিন বাঙলক্ষ্মীর যে একসপ্তকালের দ্বিতীয় দিন এই ভাবনাও, এই দীক্ষার সম্বন্ধও তিনি প্রচলিত ঐতিহ্য মনে নাই। তাহার বিশ্বাস, তাহার পক্ষি-বিশ্বাস, সমস্ত প্রয়োজন তাহারই সঙ্গীপেক্ষা অধিক।

ইহার বিজ্ঞে আর বলিবার কি আছে? তিনি আর একবার শিখার ভক্তি, নীচ ও ধর্মশীলতার অগ্রহ প্রশংসা করিলেন, কহিলেন, এমন ভাল কথা নাই। বস্তুত, ইহাও সমস্ত এবং গ্রহা কাহারও অপেক্ষা আমি নিজেও কম জানি না। কিন্তু, তুমি করিয়া বসিলাম।

সময় হইয়া আসিল, ঘোড়ার গাড়ি ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, গুরুদেবের নিকট বিদায় লইয়া

আমি গাড়িতে গিয়া বসিলাম। রাজলক্ষ্মী পথে আসিয়া গাড়ির ভিতরে হাত বাড়িয়া বার বার করিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় নিল, কিন্তু কথা কহিল না। বোধ হয় সে শক্তি তাহার ছিল না। ভালই হইল যে, অন্ধকারে সে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। আমি শুদ্ধ হইয়া রহিলাম, কি যে বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। শেষ বিদায়ের পালাটা নিঃশব্দেই সাদ্ধ হইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে দুই চোখ দিয়া আমার ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সর্বাঙ্গকরণে কহিলাম, তুমি সুখী হও, শান্ত হও, তোমার লক্ষ্য গ্রহ হোক, তোমাকে হিংসা করি না, কিন্তু যে দুর্ভাগা সমস্ত বিসর্জন দিয়া একই সাথে একদিন তরুনী ভাসাইয়াছিল এ জীবনে তাহার আর কুল মিলিবে না। ঘরঘর ঝরঝর করিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল, গঙ্গামাটির সকল স্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেদিন বিদায়ের ক্ষণে যে সকল কথা মনে আসিয়াছিল, আবার তাহাই জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, এই যে এক জীবন-নাট্যের অত্যন্ত মূল এবং সাধু-উপসংহার হইল ইহার খ্যাতির আর অন্ত নাই। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিলে ইহার অল্পান দীপ্তি কোনদিন নিবিবে না, সম্রাট বিশ্বয়ে মাথা নত করিবার মত পাঠকেরও কোনদিন সংসারে অভাব ঘটিবে না—কিন্তু আমার নিজের কথা কাহাকেও বলিব নহে—আমি চলিলাম অন্যত্র। আমারই মত যে কলুষের পাশে মগ্ন হইয়া আছে, ভাল হইবার আর পথ নাই, সেই অভয়ার আশ্রয়ে। মনে মনে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম—আমার পূণ্যজীবন উন্নত হইতে উন্নততর হোক, তোমার মধ্য দিয়া ধর্মের মহিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হোক, আমি আর ক্ষোভ করিব না। অভয়ার চিঠি পাইয়াছি। মেহে, প্রেমে, করুণায় অটল অভয়া, ভগিনীর অধিক বিদ্রোহী অভয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্ৰণ করিয়াছে। বর্মা হইতে আসিবার কালে ক্ষুদ্র দ্বারপ্রান্তে তাহার সজল চক্ষু মনে পড়িল, মনে পড়িল তাহার সমস্ত অতীত ও বর্তমান ইতিহাস। চিওর শুচিতায়, বুদ্ধির নির্ভয়তায় ও আত্মার স্বাধীনতায় সে যেন আমার সমস্ত দুঃখ এক নিমিষে আবৃত করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সহসা গাড়ি থামিতে চকিত হইয়া দেখিলাম স্টেশনে পৌঁছিয়াছি। নামিয়া দাঁড়াইতে আব এক ব্যক্তি কোচবাক্স হইতে তাড়াহাড়ি নামিয়া আমার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

কে রে, বতন যে!

বাবু, বিদেশে চাকরের যদি অভাব হয় ত আমাকে একটু খবর দেবেন। যতদিন বাঁচব আপনাদের সেবার ক্রটি হবে না।

গাড়ির লষ্ঠনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুমি কীদরিস কেন বল ত?

রতন ভাবাব দিল না, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া পায়ের কাছে আব একবার টিপ করিয়া নমস্কার করিয়াই দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আশ্চর্য, এই সেই রতন!

॥ শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

শ্রীকান্ত

চতুর্থ পর্ব

এক

এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরত-ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বার বার করিয়া এই কথাটি ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগেই বা পুনঃপুনঃ এমন ঘটে কেন? আমারণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না? এমনি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর ইহাতে যৌবনে অগাইয়া, কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকাডাকিতেও সেই বিদায় দেওয়া মনের সাদা মিলে না, যদিবা কোন ক্ষীণকণ্ঠের অনুরণন কদাচিৎ কানে আসিয়া লাগে, আপন বলিয়া নিঃসংশয়ে চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে ভয় পাই।

এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার জীবনে আজ মৃত, বিসর্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত নদীতীরে ঠাণ্ডাইয়া স্বচ্ছ দেখিয়া ফিরিয়াছি—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠেকাইবার কোথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। শুদিকটা নিঃশেষ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু এই শেষ যে কতখানি শেষ, তাহা বলিই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন?

কিন্তু এই ত সেদিন। কুমারসাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—দৈবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই, তথাপি হারানোটাকেই আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার বিশ্ব জুড়িয়া রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্মায় পৌছিব। কিন্তু এ যেন সর্বস্ব খোয়টিয়া জুয়াড়ীর ঘরে ফেরা। ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত—পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের চলতি যেন আর না ফুরায়।

ম্যাঃ একি শ্রীকান্ত যে!

এ যে একটা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে সে খোয়ালও করি নাই। দেখি, আমার দেশের ঠাকুরদা ও বাঙালিদি ও একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে ঘাড়ো মাথায় ও কাঁধে একরাশ মোটঘাট লইয়া প্লাটফর্ম ছুটাছুটি করিয়া অকস্মাৎ আমার জানালার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন।

ঠাকুরদা বলিলেন, উঃ কি ভিড়! একটা ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই, এই ত তিন-তিনটে মানুষ। তোমার গাড়িটি ত দিবা স্বলি,—উঠবো?

উঠুন, বলিয়া দলজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন-তিনটে মানস হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া যাবতীয় বস্তু নামাইয়া রাখিলেন। ঠাকুরদা কহিলেন, এ বৃন্দ বেশি ভাড়ার গাড়ি, আমার দণ্ড লাগবে না ত?

বলিলাম, না, আমি গার্ডসাহেবকে ধরে দিয়া আসছি।

গার্ডকে বলিয়া যথাকর্তব্য সমাপন করিয়া দল খুলিয়া আসিলাম, তখন তাঁহারা আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন। গাড়ি ছাড়িলে বাঙালিদি আমার দিকে নজর দিলেন, চমকাইয়া বলিলেন, তোর এ কি ছবি হয়েছে শ্রীকান্ত! এ যে মুখ শুকনো একেবারে দড়ি হয়ে গেছে! কোথায় ছিল এতদিন? ভালো ছেলে যা হোক! সেই যে গোল একটা চিঠিও কি দিতে নেই? বাড়িসুদ্ধ সবাই ভেবে মরি।

এ সকল প্রণয়ের কেহ জবাব প্রত্যাশা করে না, না পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে না।

ঠাকুরদা জানাইলেন, তিনি সঙ্গীক গয়াধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই মেয়েটি তাঁর বড় শ্যালিকার নাতনী—বাপ হাজার টাকা গুণে দিতে চায়, তবু এত দিনে মনোমত একটি পাত্র জুটলো না। ছাড়লে না, তাই সঙ্গে করে আনতে হ'ল। পুটু, প্যাড়ার হাঁড়টা খোল ত। গিল্লী, বলি দইয়ের কড়াটা ফেলে আসা হয়নি ত? দাও, শালপাতায় করে শুছিয়ে দাও দিকি—গোটা-দুই প্যাড়া একথাবা দই—এমন দই কখনো মুখে দাওনি ভায়া, তা দিবি করে বলতে পারি। না না—না—ঘটির জলে হাতটা আগে ধুয়ে ফেলো পুটু—যাকে তাকে ত নয়—এসব মানুষকে কি করে দিতে-থুতে হয় শেখো।

পুটু যথা আদেশ সম্বন্ধে কর্তব্য প্রতিপালন করিল। অতএব, অসময়ে ট্রেনের মধ্যে অযাচিত প্যাড়া ও দধি জুটিল। খাইতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাগ্যে যত অঘটন ঘটে। এইবার পুটুর জন্য হাজার টাকা দামের পাত্র না মনোনীত হইয়া উঠি। বর্ষায় ভালো চাকরি করি এ খবরটা তাঁহারা আগের বারেই পাইয়াছিলেন।

রাঙাদিদি অতিশয় মেহ করিতে লাগিলেন, এবং আত্মীয়জ্ঞানে পুটু খুঁটাখানেকের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণ, আমি ও আর পর নই!

বেশ মেয়েটি। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের, ফর্সা না হোক, দেখিতে ভালোই। ঠাকুরদা তাহার গুণের বিবরণ দিয়া শেষ করিতে পারেন না এমনি অবস্থা ঘটিল। লেখাপড়ার কথায় রাঙাদিদি বলিলেন, ও এমনি শুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে যে, ভোদের আজকালকার নটকনভেল হার মানে। ও বাড়ির নন্দরাণীকে এমনি একখানি চিঠি লিখে দিয়েছিল যে, সাতদিনের দিন জামাই পনের দিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ কেহ ইঙ্গিতেও করিলেন না। সেক্ষণ ব্যাপার যে একটা ঘটিয়াছিল তাহা কাহারও মনেই নাই।

পরদিন দেশের স্টেশনে গাড়ি থামিলে আমাকে নামিতেই হইল। তখন বেলা বোধ করি দশটার কাছাকাছি। সময়ে রানাহার না করিলে পিঙ্গু পড়িবার অশঙ্কায় দু'ভনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আনিয়া আদর-যত্নের আর অবধি রহিল না। পুটুর বর যে আমিই পাঁচ-সাতদিনের এ সম্বন্ধে গ্রামের মধ্যে আর কাহাবো সন্দেহ রহিল না। এমন কি পুটুরও না।

ঠাকুরদার ইচ্ছা আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম সমাধা হইয়া যায়। পুটুব যে যেখানে আছে আনিয়া ফেলিবারও একটা কথা উঠিল। রাঙাদিদি পুলকিতচিত্তে কাইলেন, মন্ডা দেখেচ, কে যে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেচে, আগে থাকতে কারও বলবার জো নাই।

আমি প্রথমটা উদাসীন, পরে চিন্তিত, তারপরে ভীত হইয়া উঠিলাম। সার্য দিয়াছি কি দিই নাই—ক্রমশঃ নিজেরই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। ব্যাপার এমনি দাঁড়াইল যে, না বলিতে সাহস হয় না, পাছে বিবাহী কিছু-একটা ঘটে। পুটুর মা এখনেই ছিলেন, একটা রবিবারে হঠাৎ বাপও দেখা দিয়া গেলেন। আমাকে কেহ যাইতেও দেয় না, আমোদ-আহ্লাদ ঠাট্টা-ভামাসাও চলে—পুটু যে ঘাড়ে চাপিবেই, শুধু দিন-কণের অপেক্ষা—উত্তরোত্তর এমনি লক্ষণই চারিদিক বাহির হইতেও পারি না। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিল। ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন কোষ্ঠী আছে কি না। সেটা ও দরকার?

জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা কি পুটুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া সত্যিই স্থির করেন?

ঠাকুরদা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, সত্যিই? শোন কথা একবার!

কিন্তু আমি ত এখনো স্থির করিনি?

করোনি? তা হলে করো। মেয়ের বয়েস বারো-তেরোই বলি, আর যাই করি, আসলে ওর বয়েস হ'ল সত্তেরো-আঠারো। এর পরে ও মেয়ে নিয়ে দেবো আমরা কেমন করে?

কিন্তু সে দোষ ত আমার নয়।

দোষ তবে কার? আমার বোধ হয়?

ইহার পরে মেয়ের মা ও রাভাদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী মেয়েরা পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। কান্নাকাটি, অনুযোগ অভিযোগের আর অন্ত রহিল না। পাড়ার পুরুষেরা কহিল, এত বড় শয়তান আর দেখা যায় না, উহার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া এক কথা, মেয়ের বিবাহ দেওয়া আর-এক কথা। সুতরাং ঠাকুরদা চাপিয়া গেলেন। তারপরে শুরু হইল অনুনয়-বিনয়ের পালা। পুটুকে আর দেখি না, সে বেচার লজ্জায় বোধ করি কোথাও মুখ লুকাইয়া আছে। ক্রেশবোধ হইতে লাগিল। কি দুর্ভাগ্য লইয়াই উহার আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে! শুনিতে পাইলাম ঠিক এই কথাই উহার মা বলিতেছে,—ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্রের পর্যন্ত শুকিয়ে যায়,—পোড়া শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবে না ও হবে কার?

কলিকাতায় যাইবার পূর্বে ঠাকুরদাকে ডাকিয়া বাসার ঠিকানা দিলাম, বলিলাম, আমার একজনের মত নেওয়া দরকার, তিনি বললেই আমি সম্মত হবো।

ঠাকুরদা গদগদকণ্ঠে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, দেখো ভাই, মেয়েটাকে মেরো না। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন অমত না করেন।

বলিলাম, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না, বরঞ্চ পুশি হয়েই সম্মতি দেবেন।

ঠাকুরদা আশীর্বাদ করিলেন,—কবে তোমার বাসায় যাব দাদা?

পাঁচ-ছ দিন পরেই যাবেন।

সেই রাভাদিদি রাভা পর্যন্ত আসিয়া চোখের জলের সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! কিন্তু এ ভালোই হইল যে, একপ্রকার কথা দিয়া আসিলাম। রাজলক্ষ্মী এ বিবাহে যে লেশমাএ আপত্তি করিবে না এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

দুই

স্টেশনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল : পরেরটা আসিতে ঘণ্টা-দুই দেরি। সময় কাটাইবার পট্টা খুঁজিতেছি,—বন্ধু ছুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্ত-কয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?

হাঁ।

আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহ্বর! এই বলিয়া সে সন্তোষ আমার হাত মলিয়া দিল, সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, আমাদের বাড়ি। কোথা যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না,—চল।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বটসে বছর-চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। তাহার জ্বরদস্তি পূর্বেও এড়াইবার জো ছিল না, সুতরাং আজ বাহিরে মত সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহুল্য, তাহার উদ্ভাস ও আত্মীয়তার সহিত পান্না দিয়া চলিবার মত শক্তি আজ আমার নাই। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। আমার বাগটা সে নিজেই তুলিয়া লইল, কুলি ডাকিয়া বিছানাটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া আমাকে বহিল, ওঠ।

পরিগ্রাণ নাই,—ওকঁ করা বিফল।

বলিয়াছি গহ্বর আমার পাঠশালার বন্ধু, আমাদের গ্রাম হইতে তাহার বাড়ি এক ক্রোশ দূরে, একই নদীর তীরে। বাল্যকালে তাহারই কাছে বন্ধু ছুটিতে শিখি। তাহার বাবার একটা সেকলে গান্ধাবন্ধু ছিল, সেই লইয়া নদীর ধায়ে, আমবাগানে, কোপঝাড়ে দু'জনে পাখি মারিয়া বেড়াইতাম, ছেলেবেলা কতদিন তাহাদের বাড়িতে ব্যাট কাটিয়াছি—তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া আমার ফলারের যোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমিভূমি চাষ-আবাদ অনেক ছিল।

গাড়িতে বসিয়া গহ্বর প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলি, শ্রীকান্ত?

যেখানে যেখানে ছিলাম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি করো গহর?

কিছুই না।

তোমার মা ভালো আছেন?

মা বাবা দু'জনেই মারা গেছেন—বাড়িতে আমি একলা আছি।

বিয়ে করানি?

সেও মারা গেছে।

মনে মনে অনুমান করিলাম এইজন্যই যাহাকে হোক ধরিয়া লইয়া যাইতে তাহার এত আগ্রহ। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সেই গাদাবন্দুকটা আছে?

গহর হাসিয়া কহিল, তোর মনে আছে দেখছি। সেটা আছে, আর একটা ভালো বন্দুক কিনেছিলাম, তুই শিকারে যেতে চাস ত সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি আর পাখি মারিনে—বড় দুঃখ লাগে।

সে কি গহর, তখন যে এই নিয়ে দিনরাত থাকতে?

তা সত্যি, কিন্তু এখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

গহরের আর একটা পরিচয় আছে—সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত, যে-কোন সময়ে, যে-কোন বিষয়ে অনেকটা পাঁচালীর ধরনে। ছন্দ, মাত্রা, ধ্বনি ইত্যাদি কাব্য-শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিত কিনা সে জ্ঞান আমার তখনও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধ, টিকেন্ডজিভের বীরত্বের কাহিনী তাহার মুখে ছড়ায় শুনিয়া আমরা সকলে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। এ আমার মনে আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর, তোমার যে একদিন কৃতিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ণ রচনার শখ ছিল, সে সম্বন্ধ আছে, না গেছে?

গেছে! গহর মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সে কি যাবার রে! ঐ নিয়েই ত বেঁচে আছি। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন ঐ নিয়েই থাকব। কত লিখেছি, চল না আঙুল থেকে সমস্ত বাত্রি শোনাব, তবু ফুরাবে না।

বল কি গহর!

নয়ত কি তোরে মিথ্যা বলছি?

প্রসিদ্ধ কবি-প্রভিভায় তাহার চোখমুখ ঝকঝক করিতে লাগিল। সম্ভেদ করি নাই, শুধু বিষয়্য প্রকাশ করিয়াছিলাম মাত্র, তথাপি, পাছে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়, আমাদের ধরিয়া বসাইয়া সে সারারাত্রি ব্যাপিয়া কাব্যচর্চা করে, এই ভয়ে শঙ্কার সীমা রহিল না। প্রসন্ন করিতে বলিলাম, না গহর, তা বলিনি, তোমার অদ্বুত শক্তি আমরা সবাই স্বীকার করি, তবে ছেলেবেলার কথা মনে আছে কিনা তাই শুধু বলছিলাম। তা বেশ বেশ—এ একটা বাঙ্গালাদেশের কীর্তি হয়ে থাকবে।

কীর্তি? নিজের মুখে কি আর বলব তাই, আগে শোন, তারপরে হবে কথা।

কোনদিক দিয়াই নিস্তার নাই। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বলিলাম, সকাল থেকেই শরীরটা এমন বিস্ত্রী ঠেকচে যে মনে হচ্ছে ঘুমোতে গেলে—

গহর কানও দিল না, বলিল, পুষ্পক-রথে সীতা যেখানে কান্দতে কান্দতে গয়না ফেলে দিচ্ছেন, সে জায়গাটা যারা যারা শুনেচে চোখের জল রাখতে পারেনি, শ্রীকান্ত।

চোখের জল যে আমিই রাখিতে পারিব সে সম্ভাবনা কম। বলিলাম, কিন্তু—

গহর কহিল, আমাদের সেই বুড়ো নয়নচাঁদ চক্রবর্তীকে তোর মনে আছে? তার জ্বালায় আমি আর পারিনে। যখন-তখন এসে বলবে, গহর, সেইখানটা একবার পড় দেখি, শুনি। বলে, বাবা, তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস—তোর গায়ে আসল ব্রহ্মরশ্মি ষড়ঙ্কে দেখতে পাচ্ছি।

নয়নচাঁদ নামটা খুব সচরাচর মেলে না, তাই মনে পড়িল। বাড়ি গহরদের গ্রামেই। জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই চক্কাভি বুড়ো? যার সঙ্গে তোমার বাবার লাঠাল্যাঠি মালি মোকদ্দমা চলছিল?

গহর বলিল, কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন—তার জমি, বাগান, পুকুর, মায়া বাগ্‌সমমত বাবা দেনার দায়ে নিলেম করে নিয়েছিল; আমি কিন্তু তার পুকুর আর ভিটেটা ফিরিয়ে দিয়েছি। ভারী

গরীব—দিনরাত চোখের জল ফেলত, সে কি আর ভাল শ্রীকান্ত।

ভাল ত নয়ই। চক্রবর্তীর কাব্য-শ্রীতিতে এমন কিছু একটা আন্দাজ করিতেছিলাম, বলিলাম, এখন চোখের জল ফেলা থেমেচে ত?

গহর কহিল, লোকটি কিন্তু সত্যিই ভালোমানুষ। দেনার জ্বালায় একসময়ে যা করেছিল অমন অনেকেই করে। ওর বাড়ির পাশেই বিঘে-দেড়েকের একটা আমবাগান আছে, তার প্রত্যেক গাছটাই চক্কোস্তির নিছের হাতে পোঁতা। নাতি-নাতনী অনেকগুলি, কিনে খাবার পয়সা নেই—তা ছাড়া আমার কেই-বা আছে, কেই-বা থাকে।

সে ঠিক। ওটাও ফিরিয়ে দাও গে।

দেওয়াই উচিত শ্রীকান্ত। চোখের সামনে আম পাকে, ছেলেপুলেগুলোর নিঃশ্বাস পড়ে—আমার ভারি দুঃখ হয় ভাই। আমার সময় আমার বাগানগুলো ত সব ব্যাপারীদের জমা করেই দিই—ও বাগানটা আর বিক্রি করিনে, বলি, চক্কোস্তিমশাই, তোমার নাতির। যেন পেড়ে খায়। কি বলিস রে, ভালো না?

নিশ্চয়ই ভালো। মনে মনে বলিলাম, বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি যৎকিঞ্চিৎ ওছাইয়া লইতে পারে হানি কি? তাছাড়া গহর কবি। কবি-মানুষের অত বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগ্রাহী রসিক সৃজনদের ভোগেই না লাগে?

চৈত্রেয় প্রায় মাঝামাঝি। গাড়ির কপাটটা গহর অকস্মাৎ শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, দক্ষিণে ব্যতাসটা টের পাচ্ছিস শ্রীকান্ত?

পাচ্ছি।

গহর কহিল, বসন্তকে ডাক দিয়ে কবি বলেচেন, “আজ দখিন দুয়ার খোলা—”

কাঁচা মেঠো রাস্তা, এক কাপটা মলয়ানিল রাস্তার ওকনো ধূলা আর রাস্তায় রাখিল না, সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি বসন্তকে ডাকেন নি, তিনি বলেচেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ-দোর খোলা—সূতবাং গাড়ির দরজা বন্ধ না করলে হয়ত সে-ই এসে হাজির হবে।

গহর হাসিয়া কহিল, গিয়ে একবার দেখবি চল্। দুটো বাতাবি লেবুর গাছে ফুল ফুটেচে, আথক্লেশ থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সুমুখের জামগাছটা মাধবী ফুলে ভরে গেছে, তার একটা ডালে মালতীর লতা, ফুল এখনো ফোটেনি, কিন্তু থোপা থোপা কুঁড়ি। আমাদের চারিদিকেই ত আমার বাগান, এবার মৌলে মৌলে গাছ ছেয়ে গেছে, কাল সকালে দৈবিস মৌমাছির মেলা। কত দোয়েল, কত বুলবুলি, আর কত কোকিলের গান। এখন জ্যোৎস্না রাত কিনা, তাই রাত্রিতে কাকিলদের ডাকাডাকি থাকে না। বাইরের ঘরের দক্ষিণের জানালাটা যদি খুলে রাখিস তোর দু'চোখে আর পলক পড়বে না। এবার কিন্তু সহজে ছেড়ে দিচ্চিনে ভাই। তা আগে থেকে বলে রাখছি। তা ছাড়া খাবার ভাবনাও নেই, চক্কোস্তিমশাই একবার খবর পেলে হয়, তোরে ওরুর আদর করবে।

তাহার আমদুগ্ধের অকপট আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলাম। কতকাল পরে দেখা কিন্তু ঠিক সেদিনের সে গহর—এওটুকু বদলায় নাই—ওহেমনি ছেলেমানুষ—ওহেমনি বন্ধু-সম্মিলনে তাহার অকৃত্রিম উন্মাদের ঘটা।

গহররা মুসলমান কীর-সম্প্রদায়ের লোক। গুনিয়াছি তাহাৎ পিতামহ বাউল, রাম-প্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। তাহার একটা পোষা পক্ষির অলৌকিক সঙ্গীত-পারদর্শিতার কাহিনী শুখনকার দিনে এদিকে প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভেজারতি ও পাটের ব্যবসারে অর্থোপার্জন করিয়া ছেলের জন্য সাদৃশ্য খরিদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, অথচ ছেলে পাইল না বাপের বিষয়বৃত্তি, পাইয়াছে ঠাকুরদার কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ। সূতরাং, পিতার বংশমর্যাদা ও জমিজমা চাষ-আবাদের শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহা শঙ্কা ও সন্দেহের বিষয়।

সে ষাই হোক, বাড়িটা তাহাদের দেখিয়াছিলাম ছেলেবেলায়। ভালো মনে নাই। এখন হয়ত তাহা

রূপান্তরিত হইয়াছে কবির বাণী-সাধনার তপোবনে। আর একবার চোখে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল।

তাহাদের গ্রামের পথ আমাদের পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে পড়ে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে-পড়ার সঙ্গে আজকের চোখে-দেখার একে-বারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজবন্ধু—অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এদিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ-অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই-রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু ‘পথকর’ যোগাইতে হয়, কিন্তু সে-পথ যে কোথায় এবং কহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহ্যল।

সেই পথের বহুকাল-বঞ্চিত স্থপীকৃত ধূলাবালির বাধা ঠেলিয়া গাড়ি আমাদের কেবলমাঞ চাবুকের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল, এমনি সময়ে গহর অকস্মাৎ উচ্চ-কোলাহলে ডাক দিয়া উঠিল, গাড়াঙ্গান, আর না, আর না—থামো, থামো—একদম রোকো।

সে এমন করিয়া উঠিল, যেন এ পাজার-মেলের ব্যাপার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম ব্রেক চাকের নিমিষে কসিতে না পারিলে সর্বনাশের সম্ভাবনা।

গাড়ি থামিল। বাঁ-হাতি পথটা তাহাদের গ্রামে ঢুকিবার। নামিয়া পড়িয়া গহর কহিল, নেমে আয় শ্রীকান্ত। আমি ব্যাগটা নিচ্ছি, তুই নে বিছানাটা,—চল।

গাড়ি বুকি আর যাবে না?

না। দেখছিস্ নে পথ নেই!

তা বটে। দক্ষিণে ও বামে শিয়াকুল ও বেতসকুঞ্জের ঘন-সম্মিলিত শাখা-প্রশাখায় পক্ষীবাধিকা অতিশয় সঙ্গীর্ণ। গাড়ি ঢোকার প্রবলই অবৈধ, মানুষেও একটু সাবধানে কাও হইয়া না ঢুকিলে কাঁটায় জামা-কাপড়ের অপঘাত অনিবার্য। অতএব কবির মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য। সে ব্যাগটা ঠাঁয়ে করিল, আমি বিছানাটা বগলে চাপিয়া গোধূলিবেলায় গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম।

কবিগৃহে আসিয়া যখন পৌছান গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুমান করিলাম আকাশে বসন্ত-রাত্রির চাঁদও উঠিয়াছে। তিথিটা ছিল বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি, অতএব আশা করিয়া রহিলাম, গভীর নিশীথে চন্দ্রদেব মাথার উপরে আসিলে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে। গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণুবন, খুব সম্ভব তাহার কেঁকিল, দেয়েল ও বুলবুলির দল এত মধোই থাকে এবং অহর্নিশ শিস দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ক অসংখ্য বেণুপত্ররাশি করিয়া বরিয়া উঠান আগ্নিবা পরিব্যাণ্ড করিয়াছে, দৃষ্টিমাত্রই বরাপাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্তে গর্জন করিয়া উঠে। চাকর আসিয়া বাহিরের ঘর ধুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, গহর তত্ত্বপোশটা দেখাইয়া কহিল, তুই এই ঘরেই থাকবি। দেখিস কিরকম হাওয়া।

অসম্ভব নয়। দেখিলাম, দক্ষিণা-বায়ে রাজ্যের শুকনা মতাপাতা গবাক্ষপথে ভিতরে ঢুকিয়া ঘর ভরিয়াছে, তত্ত্বপোশ ভরিয়াছে, মেঝেতে পা ফেলিতে গা ছমছম করে। বাটের পায়ার কাছে ইদুরে গর্ত খুঁড়িয়া একরাশ মাটি তুলিয়াছে, দেখাইয়া বলিলাম, গহর, এ ঘবে কি তোমরা ঢোকে না?

গহর বলিল, না দরকারই হয় না। আমি ভেতরেই থাকি। কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।

তা যেন দিলে, কিন্তু গর্তটায় সাপ থাকতে পারে ত?

চাকরটা বলিল, দুটো ছিল, আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বার হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে জানলে মিং?

গহর হাসিয়া কহিল, ও মিঞা নয়, ও আমাদের নবীন। বাবার আমলের লোক। গরুবাছুর চাষবাস দেখে, বাড়ি আগলায়। আমাদের কোথায় কি আছে না আছে সব জানে।

নবীন হিন্দু বাঙ্গালীও বটে, পৈতৃক কালের লোকও বটে। এই পরিবারের গরুবাছুর চাষবাস হইতে বাড়িঘর দোরের অনেক কিছু জানাও তাহার অসম্ভব নয়, তথ্যটি সাপের সম্বন্ধে ইহার মুখের কথায় নিশ্চিত হইতে পারিলাম না। ইহাদের বাড়িসুদ্ধ সকলকে দেখি না হাওয়ায় পাইয়া বসিয়াছে। ভাবিলাম, হাওয়ার লোভে সর্পধুগলের বহির্গমন আশ্চর্য নয় মানি, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ?

গহর বুঝিল, আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই, কহিল, তুই ত থাকবি খাটে, তোর ভয়টা কিসের? তা ছাড়া ওঁরা থাকেন না আর কোথায়? কপালে লেখা থাকলে রাজা পরীক্ষিতও নিস্তার পান না—আমরা ত তুচ্ছ। নবীন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে খালের মুখে একটা ইট চাপা দিয়ে দিস্। ভুলিস নে। কিন্তু কি খাবি বলত শ্রীকান্ত?

বলিলাম, যা জোটে।

নবীন কহিল, দুধ মুড়ি আর ভালো আখের গুড় আছে। আধকের মত যোগাড়—

বলিলাম, খুব খুব, এ বাড়িতে ও জিনিসের আমার অভ্যাস আছে। আর কিছু যোগাড়ের দরকার নেই বাবা, তুমি বরঞ্চ আন্তো দেখে একখানা ইট যোগাড় করে আনো। গর্তটা একটু মজবুত করে চাপা দাও—দখিনে বাতাসে ভরপুর হয়ে ওঁরা যখন ঘরে ফিরবেন তখন ইটায় না ঢুকে পড়তে পারেন।

নবীন আলো দিয়া চৌকির ওলায় কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল, নাঃ—হবে না।

কি হবে না হে?

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হবে না। খালের মুখ কি একটা বাবু? এক পাঞ্জা ইট চাই যে। ইদুরে মেঝেটা একেবারে ঝাঁঝবা করে রেখেছে।

গহর বিশেষ বিচলিত হইল না, শুধু লোক লাগাইয়া কাল নিশ্চয় ঠিক করিয়া ফেলিতে ধকুম করিয়া দিল।

নবীন হাত-পা ধুইবার জল দিয়া ফলারের আয়োজনে ভিতরে চলিয়া গেলো জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি সন্দের গহর?

আমি? আমার এক বুড়ো মাসী আছেন তিনিই রান্না করেন। সে যাক, স্বাণ্ডা-দাওয়া চুকলে লেখাগুলো তোর পড়ে শোনাব।

সে আপন কাপের অনুষ্যানেই মগ্ন ছিল, অতিথির সুখ-সুবিধার কথা হয়ত চিন্তাও করে নাই, কহিল, বিজ্ঞানটি পেতে ফেলি, কি বল? ব্যস্তিরে দু'হাতে একসঙ্গেই থাকে, কেমন?

এ আর এক বিপদ। বলিলাম, না ভাই গহর, তুমি তোমার ঘরে শোও গে, আজ আমি বড় স্নেহ, বই তোমার কান সকায়ে শুনব।

কাল সকালে? তখন কি সময় হবে?

নিশ্চয় হবে।

গহর চুপ করিয়া একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, কিংবা একটা কাজ করলে হয় না শ্রীকান্ত? আমি পড়ে যাঁই, তুমি শুয়ে শুয়ে শোনে। ঘুমিয়ে পড়লেই আমি উঠে যাবো। 'লো' এই বেশ মতলব—না?—আমি মিনতি করি না বলিলাম, না ভাই গহর, তাতে তোমার বয়সের মর্যাদা নষ্ট হবে। কাল আমি সমস্ত মন দিয়ে শুনব।

গহর ক্ষুণ্ণমুখে বিদায় লইল। কিছু বিদায় করিয়া নিজের মনটাও প্রসন্ন হইল না।

এই এক পাগল। ইতিপূর্বে ইশাবায় ইঙ্গিতে বুকিয়াছিলুম তাহার কাব্যগ্রন্থ সে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে চায়। মনে আশা, সমসংগে একটা নতুন সাড়া পড়বে। সে লেখাপড়া বেশি করে নাই, পাঠশালায় ও স্কুলে সামান্য একটু বাজলা ও ইংলিজ শিখিয়াছিল মাত্র। মনও ছিল না, বোধ হয় সময়ও পায় নাই। তবে কোন শৈশবে সে কবিতা ভালোবাসিয়ায়, হয়ত এ মুগ্ধতা তাহার শিরার রক্তে প্রবহমান, ভারপূর্ণ ভগবতের বানী সব কিছুই তাহার চক্ষে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিজের অনেক বচনাই তাহার মুখস্থ, গীতের বসনও উলটন করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিত ও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বৃন্দাবন তাহার দর্পণে—একটি পার্শ্ব খসাইয়াও এই অক্ষম ভক্তটিকে কোনদিন পুরস্কার দিবে না। কিন্তু অল্পাত্ত আরাধনাব্যবসায় প্রবৃত্তি আত্মনিবেদনে এ বেচারার বিদ্রাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিজ্ঞানায় ওঁইয়া ভাবিতো লাগিলাম, বায়ো বেসব পবে এই দেখা। এই ছাদশ-বস ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল দ্বায়ে ওলাপুলা দিয়া কথার পরে কথা গাঁথিয়া ফোকে পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এসব কোন কাজে লাগবে? কাজেও লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্বরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গঙ্গাহীন কত

ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।

অতি প্রত্যাষেই ডাকাডাকি করিয়া গহর আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল; তখন হয়ত সবে সাতটা বাজিয়াছে, কিংবা বাজেও নাই। তাহার ইচ্ছা বসন্তদিনের বসের নিভৃত পল্লীর অপরূপ শোভা-সৌন্দর্য স্বচক্ষে দেখিয়া থনা হই। তাহার ভাবটা এমনি, যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্যাপার মত, অনুরোধ এড়াইবার জো নাই, অতএব হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। ঐকীরের গায়ে আধমরা একটা জাম-গাছের অর্ধেকটায় মাধুরী ও অর্ধেকটায় মালতী লতা—কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অত্যন্ত নিক্কীব চেহারা—তথাপি একটায় গোটাকয়েক ফুল ফুটিয়াছে, অপরটায় সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে। তাহার ইচ্ছা গোটাকয়েক ফুল আমাকে উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাঠপিপড়া যে ছোঁবার জো নাই। সে এই বলিয়া আমাকে সাবুনা দিল যে, আর একটু বেলা হইলে আঁকশি দিয়া অনায়াসে পাড়াইয়, দিতে পারিবে। আচ্ছা, চলো।

নবীন প্রাতঃক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ সুনির্বাহের উদ্যোগপর্বে দম ভরিয়া তামাক টানিয়া প্রবলবেগে কাশিতেছিল, থুথু ফেলিয়া ঢোক গিলিয়া অনেকটা সামলাইয়া নইয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, বনে-বাদাড়ে মেলাই যাবেন না বলে দিচ্ছি।

গহর বিরক্তি হইয়া উঠিল—কেন রে?

নবীন জবাব দিল, গোটা দুস্তিন শিয়াল স্কেপেচে—গরু-মনিয়া একসাই কামড়ে বেড়াচ্ছে।

আমি সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলাম। কোথায় হে নবীন?

কোথায় সে কি দেখে রেখেচি? আছেই কোন্ ঠাই স্কেপেঝাড়ে। যান ও একটু চোখ রেখে চলবেন।

তাহলে কাজ নেই ভাই গহর।

বাঃ রে! এই সময়টায় শিয়াল-কুকুর একটু স্কেপেই, তা বলে লোকজন রাস্তায় চলবে না নাকি? বেশ ত!

এও দখিনা হাওয়ার ব্যাপার। অতএব, প্রকৃতির শোভা দেখিতে সঙ্গে যাইতেই হইল, পথেব দু'ধারে আমবাগান। কাছে আসিতেই অগণিত ছোট ছোট পোকা চতুর্ভুজ পটপট শব্দে আশ্রমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধু করিয়া চিচিটে আঠার মত হইয়াছে, সেগুলো ভূতার তলায় জুড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত যেটুগাছের কুঞ্জ, মুকুলিত বিকলিত পুষ্পসম্মানে একান্ত নিবিড়—মনে পড়িয়া গেল নবীনীর সতর্কবাণী। গহরের মতে কালটা স্কেপিবার উপযোগী। সুতরাং যেটুফুলের শোভা সময়মত আর একদিন না হয় উপভোগ করা যাইবে, আর গহর ও আমি, অর্থাৎ নবীনীর 'গরু মনিয়া' একটু দ্রুতপদেই স্থানত্যাগ করিলাম।

বলিয়াছি আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদেরও গ্রামপ্রান্তে প্রবাহিত। বর্ষাব পরিমণ্ডিত জলধাণ বসন্তসমাগমে একান্ত শীর্ণ, সেদিনের স্রোতশ্যালিত অপরিস্রব পান্য ও শৈবাল অঙ্গ শুষ্ক ও তৃষ্ণাক্রান্ত পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে নবককুল করিয়া তুলিয়াছে। পরপারে দূরে কয়েকটা শিমুলগাছে অজস্র রাসা ফুল ফুটিয়া আছে চোখে পড়িল, কিন্তু তাহান প্রতি দু'টি আকর্ষণ করাটা কবির কাছেও এখন যেন বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠিকিল। বলিল, চল, ঘরে ফিরি।

তাই চলো।

আমি ভেবেছিলাম তোর এসব ভালো লাগবে।

বলিলাম, লাগবে ভাই লাগবে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এসব তুমি কাঁকাতায় লিখো, পড়ে আমি খুশি হবো।

তাই বোধ হয় গাঁয়ের লোক ফিরেও চায় না।

না। দেখে দেখে তাদের অকুচি ধরে গেছে। চোখের কচি আর কানের কচি এক নয় ভাই। শারা মনে করে কবির কর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে মোহিত হয়ে যায়, তারা জানে না। দুনিয়ার সকল

ব্যাপারই তাই। চোখে যা সাধারণ ঘটনা, হয়ত-বা সামান্য সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন সৃষ্টি। তুমি দেখতে পাও সেও সত্যি, আমি যে দেখতে পেলাম না সেও সত্যি। এর জন্যে তুমি দুঃখ করো না গহর।

তবুও ফিরবার পথে সে কত কি যে আমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিল তাহার সংখ্যা নাই। পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতাশুশুম পর্যন্ত যেন তাহার চেনা। কি একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধ হয় ঔষধের প্রয়োজনে চাচিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনও আঁতা করিতেছে, গহর হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল—অন্তরে সে যে কি বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। চক্রবর্তী যে তাহার সন্মুখ হারানো বিষয় ফিরিয়া পাইতেছিল, সে কেবল কৌশল বিস্তার করিয়া নয়—তাহার হেঁচু ছিল গহরের নিজেরই স্বভাবের মধ্যে। ব্রাহ্মণের প্রতি অনেকখানি ক্রোধ আমার আপনাই পড়িয়া গেল। চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না, কারণ শোনা গেল, তাহার গৃহে গুটি-দুই নাতির ‘মায়ের অনুগ্রহ’ দেখা গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে গুলাবিবি এখনো দেখা দেন নাই—পচা পুকুরের জল আব-একটু শুকাইবাব অপেক্ষায় আছেন।

সে যাই হোক, বাড়িতে ফিরিয়া গহর তাহার পুথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেও তাহা অত্যন্ত বিপদ। বলিল, না! পড়া হলে কিছু ছাড়া পাবে না, শ্রীকান্ত। সত্যি করে তোমাকে মত দিতে হবে।

এ আশঙ্কা কি? স্পষ্ট করিয়া রাজী হইতে পারি এ সাহস ছিল না, তথাপি দিনের পর দিন করিয়া কবির বাটতে কাল-খালোচনায় এ যাওয়া আমার সাতদিন কাটিল। কালোবর কথা থাক কিন্তু নির্বিড় সাহচর্য মানুষটির যে পরিচয় পাইলাম তাহা এমন সুন্দর, যেমন বিস্ময়কর।

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্মায় গিয়ে। আমাদের দুজনেরই আপনার বসন্তে কেউ নেই, আমি না বুঝায় এখানেই একসঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

হাসিয়া বলিলাম, আমি ও তোমার মত করে নই ভাই, গাছপালা ভাঙি বুঝি, তাদের সঙ্গে কথা কইতেও পারিনে, পাবব কেন এই বনের মধ্যে বাস করতে? দুদিনেই ইঙ্গিত্যে উঠবো যে!

গহর গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, আমি কিন্তু সত্যিই তাদের ভাঙা বুঝি, ওরা সত্যিই কথা কয়—তোরা পারিস নে বিশ্বাস করতে।

বলিলাম, বিশ্বাস করা যে শক্ত তুমিও ত বেগমো!

গহর সহজেই স্বীকার করিয়া লইল : কহিল, হ্যাঁ তুমি বুদ্ধ।

একদিন সকালে তাহার কামায়ণের অশোকবনের অধ্যায়টা কিছুক্ষণ পড়া; পরে সে হঠাৎ বই মুড়িয়া আমাব মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা শ্রীকান্ত, তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলি?

কাল অনেক বাঁধি ভাগিয়া বাজলক্ষ্মীকে হয়ত আমার এই শেষ চিঠিই লিখিয়াছিলাম। ঠাকুরদার কথা, পুষ্টি কথা, তাহার দুর্ভাগ্যের বিবরণ সমস্তই তাহাতে ছিল। তাহাঙ্গিকে কথা দিয়াছিলাম একজনের অনুরাগিতা চাহিয়া লইব—সে ভিক্ষাও তাহাতে ছিল। পাসন হয় নাই চিঠিটা তখনও আমার পকেটে পড়িয়া। গহরের প্রশ্নের উত্তরে হাঁসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালোবাসিস, যদি কখনো সেদিন তুমি আমাকে জনস শ্রীকান্ত!

জেনে তোমার কি হবে!

কিছুই না। তখন শুধু তাদের মধ্যে গিয়ে দিনকট কাটিয়ে আসব।

আচ্ছা!

আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে বলব দিস। বাবা অনেক টাকা বেছে গেছে, সে আমার কাজে লাগল না—কিন্তু তাদের হয়ত কাজে লেগে যাবে।

তাঁহার বলার ধবনটা এমনি যে, শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পাড়িতে চায়। বলিলাম, আচ্ছা, তাও জানাব। কিন্তু আশীর্বাদ করো সে প্রয়োজন যেন না হয়।

আমার যাবার দিনে গহর পুনরায় আমার ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইল। প্রয়োজন ছিল না, নবীন ত লজ্জায় প্রায় আধমরা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কানও দিল না। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া সে মেয়েমানুষের মত কাদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার মাথার দিবি রইল শ্রীকান্ত, চলে যাবার আগে আবার একদিন এসো, যেন আর একবার দেখা হয়।

আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কথা দিলাম দেখা করিতে আবার আসিব।

কলকাতায় পৌঁছে কুশল সংবাদ দেবে বলো?

এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। যেন কত দূরেই না চলিয়াছি।

কলিকাতার বাসায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। চৌকাঠে পা দিয়াই যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল সে আর কেহ নহে, স্বয়ং রতন।

এ কি রে, তুই যে?

হ্যাঁ, আমিই। কাল থেকে বসে আসি—একখানা চিঠি আছে।

বুঝিলাম সেই প্রার্থনার উত্তর। কহিলাম, চিঠি ডাকে দিলেও ত আসত?

রতন বলিল, সে ব্যবস্থা চাষাভুষো মুটেমজুর গেরস্ত লোকদের জন্য। মার চিঠি একটা লোক না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে পাচ শ মাইল ছুটে হাতে করে না আনলে খোয়া যায়। জানেনও সব, কেন মিছে জিজ্ঞাসা করছেন।

পরে শুনিয়াছিলাম রতনের এ অভিযোগ মিথ্যা। কারণ সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া এ চিঠি হাতে করিয়া আনিয়াছে। এখন মনে হইল গাড়ির ভিড়ে ও আহারাদির অব্যবস্থায় তাহার মেজাজ বিগড়িয়াছে। হাসিয়া কহিলাম, উপরে আয়। চিঠি পরে হবে, চল তোর খাবার জোগাড়টা আগে করে দিই গে।

রতন পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, চলুন।

তিন

সশব্দ উদ্গারে চমকিত করিয়া রতন দেখা দিল।

কি রতন, পেট ভরলো?

আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি যাই বলুন বাবু, আমাদের কলকাতায় বাঙ্গালী বামুনঠাকুর ছাড়া রান্না-কেউ কিছু ছানে না। ওদের ঐসব মেডুয়া মহারাষ্ট্রলোকে ত জানোয়ার বলসেই হয়।

উভয় প্রদেশের রান্নার ভালমন্দ, অথবা পাচকের শিক্তনৈপুণ্য লইয়া রতনের সঙ্গে কখনো তর্ক করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। কিন্তু রতনকে যতদূর জানি তাহাতে বুঝিলাম সুপ্রচুর ভোজনে সে পরিভুষ্ট হইয়াছে। না হইলে পশ্চিমা পাচকদের সম্বন্ধে এমন নিরপেক্ষ সুবিচার করিতে পারিত না। কহিল, গাড়ির ধকলটা ত সামান্য নয়, একটু আভ্যমোড়া ভেঙ্গে গাড়িয়ে না নিলে—

বেশ ত রতন, ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, একটা বিছানা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে। কাল সব কথা হবে।

কি জানি কেন, চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা ছিল না। মনে হইতেছিল, সে যাহা লিখিয়াছে তাহা ও জানিই।

রতন ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। আগাগোড়া গালা দিয়া শিলমোহর করা। বলিল, বারান্দার ঐ দক্ষিণের জানালার দ্বারে বিছানাটা পেতে ফেল, মশারি খাটাবার হাস্যামা নেই,—কলকাতা ছাড়া এমন সুখ কি আর কোথাও আছে! যাই—

কিন্তু স্ববর সব ভাল ত রতন?

রতন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, তাই ত দেখায়। শুকদেবের কৃপায় বাড়ির বাইরেটা তুলজাব, ভেতরে দাসদাসী, বন্ধুগণ, নতুন সৌমা এসে ঘরদোর আলো করেছেন, আর সবার ওপরে স্বয়ং মা আছেন যে বাড়ির গম্ভীর—এমন সংসারকে নিশ্চয় করবে কে? আমি কিন্তু অনেক কালের চাকর, জ্ঞাতে নাপতে—রন্ধাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই ও সেদিন ইস্টিশানে চোখের জল

সামলাতে পারিনি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি, আপনারা সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্ম পতিত হবেন না।

কিছুই বুঝিলাম না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, বন্ধুবান্ধব বয়সও হ'ল, যা হোক একটা বিদেশিসিদে শিখে মানুষও হয়েছেন। ভাবচেন বোধ হয় কিসের জন্য আর পরবশে থাকা? দানপত্রের জোরে মেরে ত সব নিয়েছেন। মোটামুটি যে বেশ কিছু মেরেচেন তা মানি, কিন্তু সে কতক্ষণ বাবু?

স্পষ্ট এখনও হইল না, কিন্তু একটা আবছায়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, স্বচক্ষেই ত দেখেছেন মাসে অশুভঃ দুবার করে আমার চাকরি যায়। অবস্থা মন্দ নয়, রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাইনে কেন? পারিনি। এটুকু জানি, বীর দয়ায় হয়েছে তাঁর একটা নিম্মাসেই আশ্বিনের মেঘের মত সমস্ত উবে যাবে, চোখের পাতা ফেলবার সময় দেবে না। ও তো মায়ের রাগ নয়, ও আমার দেবতার আশীর্বাদ।

এখানে পাঠককে একটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, রতন ছেলেবেলায় কিছুকাল প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যালোভ করিয়াছিল।

একটা পামিয়া কহিল, মায়ের বারণ তাই কখনো বলিনে। ঘরে যা-কিছু ছিল খুড়োর ঠিকিয়ে নিলে, একঘর যজ্ঞমান পর্বস্ত্র দিলে না। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বাপ হলো, কিন্তু পূর্বজন্মের তপস্যা ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরি জুটে গেল। সমস্ত দুখই শুনলেন, কিন্তু কিছুই তখন বললেন না। বহুব্যয়ানক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলেমেয়ে দু'টিতে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিন-কয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আমার আশ্রম তুমি যাবার দিনে হাতে একটা পুটুলি খুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঋণভাণ্ডারী করিস নে বাবা, যা তুমি পেছো এই দিবে ফিরিয়ে নি গে যা। খুলে দেখি পাঁচ শ' টাকা। প্রথমে মিছেব চোখ দুটোতেই নিশ্বাস হল না, ওহ ত'ল বুনি-বা জেগেজেগেই স্বপন দেখছি। আমার সেই মাকেই বন্ধুবান্ধব বয়সে বাক-সাদা কথা বসে, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজগজ করে। ভাবি, এর আর বেশি দিন না, মা লক্ষ্মী উললেন বলে।

মামি এ আশঙ্কা করি নাই, নিকটরে শুনিতে লাগিলাম।

মনে হইল বোন কিছুদিন হঠাৎই হ্রোষে ও ক্ষোভে ফুলিতেছে। কহিল, মা যখন দেন দু'হাতে তলে দেন। বন্ধুকেও দিয়েছেন। তবু ও ভেবেছে নেওড়ানো মৌচাকের আব দাম কি, বড়জোর এখন জ্বালানোই চলে। তবু ওর এত অমৃত্য। মুখ্য ভাগে না রে, আজও মায়ে একখানা গয়না বিক্রি করলে এমন পাঁচখানা পাঁচ তৈরি হয়।

মামিও জানিতাম না। হাঁসিয়া বলিলাম, হই নাকি? কিন্তু সেসব আছে কোথায়?

রতন হাসিল, কহিল, আছে তাঁরই কাছে। মা হাত লোকা নন। এক আপনার পায়েই সমস্ত উজোড় করে দিয়ে তিনি ভিখারী হতে পারেন, কিন্তু আর কাবও ভনো নয়। বন্ধু জানে না যে, আপনি বেঁচে থাকতে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর বোন বেঁচে থাকতে তাঁর চাকরের ভাবনা হবে না। সেদিন কান্ধা থেকে আপনার অর্মান করে চলে আসা যে মার বুক কি শেল বিধেছে, বন্ধুবান্ধব তার কি খবর রাখে? শুধু তাকুই বা তার সন্ধান পাবে কোথায়? কিন্তু আমাকে যে তিনি শিজেই বিদায় করেছেন এ খবর ত ভূমি জানি রতন? তখন ভিড কাড়িয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এটা বিনয় কখনো তাহার পূর্বে দেখি নাই। বলিল, আমরা চাকরবাকব বাবু, এসব কথা আমাদের কানে গুনতে নাই। ও মিথো।

রতন আড়মোড়া ভাসিয়া একটা গজহিয়া নইতে প্রস্থান করিল। বোধ করি কাল আটটার পূর্বে আর তার দেহটা 'ঘাতে' আসিবে না।

দুটো বড় খবর পাওয়া গেল। একটা এই যে, বন্ধু বড় হইয়াছে। পটনায় যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন বয়স তাহার ষোল-সাতেরো। এখন একশ বৎসরের যুবক। উপরন্তু এই পাঁচছয় বৎসরের ব্যবধানে সে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সুওরাং লৈশবের এই সন্তুষ্টি মেই যদি আজ যৌকনব আশ্বাসমানবোষ সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে, বিশ্বয়ের কি আছে?

দ্বিতীয় সংবাদ—না বন্ধু, না গুরুদেব, রাজলক্ষ্মীর গভীরতম বেদনার কোনও সন্ধান আজও তাঁহাদের জানা নাই।

মনের মধ্যে এই কথা দুটাই বহুক্ষণ ধরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সবুজ-অঙ্কিত শিলমোহরের গালায় ছাপাশলা দেখিয়া লইয়া চিঠি খুলিলাম।

তাহার হাতের লেখা বেশি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু স্বরণ হইল হস্তাক্ষর দুপাঠ্য না হইলেও ভাল নয়। কিন্তু এই পত্রখানি সে অত্যন্ত সাবধানে লিখিয়াছে, বোধ হয় তাহার ভয়, বিরক্ত হইয়া আমি না ফেলিয়া রাখি। যেন আগাগোড়া সবটুকুই সহজে পড়িতে পারি।

আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে যুগের মানুষ। প্রশয়-নিবেদন অতিশয়া ত দূরের কথা, 'ভালবাসি' এমন কথাও কখনো সুমুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে লিখিয়াছে চিঠি—আমার প্রার্থনার অনুকূলে অনুমতি দিয়া। তবু কি-জানি কি আছে, পড়িতে কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সেদিন তাহার পড়াশুনা সাক্ষ হইয়াছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পরবর্তীকালে ঘরে বসিয়া হয়ত সামান্য কিছু বিদ্যাচর্চা করিয়া থাকিবে। অতএব, ভাষার ইন্দ্রজাল, শব্দের ঝঙ্কার, পদবিন্যাসের মাদুরী তাহার পত্রের মধ্যে আশা করা অনায়াস। সর্বদা প্রচলিত সামান্য গোটাকয়েক কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর সে কি করিবে? একটা অনুমতি দিয়া মামুলি শুভকামনা করিয়া দু ছত্র লেখা—এই ত? কিন্তু খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের কিছুই আর মনে রহিল না। পত্র দীর্ঘ নয়, কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গি যত সহজ ও সরল ভাবিয়াছিলাম তাহাও নয়। আমার আবেদনের উত্তর সে এইরূপ দিয়াছে—

প্রণামান্তে সেবিকার নিবেদন—

কাশীধাম

তোমার চিঠিখানা এইবার নিয়ে এক শ বার পড়লুম। তবু ভেবে পেলুম না তুমি ক্ষেপেচ না আমি ক্ষেপেচি। ভেবেচো বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলুম অনেক উপসায়, অনেক আরাধনায়। হঠাৎ, বিদায় দেবার কঠা তুমি নও, আমাকে তাগত করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নেই।

ফুলের বদলে বন থেকে বঁটীচির মালা গেছে কোন শৈশবে তোমাকে বরণ করেছিলুম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত করে পড়তো, রাজ্যমাল্যব সে ব্যঙ্গ্যং তুমি চিনতে পারনি। বালিকার পূজার অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায় তোমার বুকের পরে রক্তরেখায় যে লেখা একে দিত সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাব চোখে সংসারেব কিছুই বাদ পড়ে না আমার সে নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌছেছিল।

তার পরে এলো দুর্যোগের রাত, কালো মেঘে দিনে আমার আকাশের জোৎস্না ঢেকে। কিন্তু সে সত্যিই আমি না আর কেউ, এ তাঁরনে যথার্থই ও সব ঘটেছিল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। ভাবতে গিয়ে অনেক সময়ে ভয় হয় বুঝি-না আমি পাগল হয়ে যাব। তখন সমস্ত ভুলে যাক যান করবে বসি তাঁর নাম বলা চলে না। কাউকে বলতেও নেই। তাই জমাই আমার জগদীশ্বরের ক্ষমা। এতে ভুল নেই, সন্দেহ নেই, এখানে আমি নির্ভর।

হী, বলছিলুম, তার পরে, এলো আমার দুর্দিনের বাহি, কলঙ্কে দিলে দু'চোখের সকল আলো নিবিয়ে। কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অশুভ মানির নিবন্ধকাল আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকী নেই?

আছে। অব্যাহত অপরাধের মাঝে মাঝে তাকে আমি বার বার দেখতে পেয়েছি। তাই যদি না হ'তো, বিগত দিমের রাক্ষসটা যদি আমার অনাগতর সমস্ত মঙ্গলকে নিঃশেষে গিলে খেতো, তবে তোমাকে ফিরে পেতুম কি করে? আমার হাতে এনে আবার তোমাকে দিবে যেতো কে?

আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায় আমাকে তা সাজে না। ব্যঙ্গ্যলী-ঘরের মধ্যে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে আচ্ছ বৌবনের দাবি আর করবো না। আমাকে আমি ভুল বুঝো না—সত্য অথমই হই, শুকথা যদি ঘৃণাক্ষরেও তোমার মনে আসে তার বাঁচা লজ্জা আমার নেই। বন্ধু বেঁচে থাক, সে বড় হয়েছে, তার বৌ এসেছে—তোমার বিয়ের পরে তাদের

সুখে বার হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসন্মান সহিব কি করে?

যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে—পুটি? আর আমি ফিরে আসব তোমার বাড়ির বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তার পরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?

হয়ত প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাবে? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার। তবে নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না,—কিন্তু খনটা অস্বীকার করো না যেন।

তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছ শুধু ভার বোঝা। এমনিই অন্ধ তোমরা।

জিজ্ঞেস করি, তোমাকে ত ফিরে পেরেছিলুম আমার ভেতীশ বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায়? তুমি এত ভাবতে পার, আর এটা ভাবতে পারো না?

আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ কেন জানো? স্বর্গের জন্যে নয়, সে আমি চাইনে। আমার কামনা, মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো তার মানে কি?

ভেবেছিলুম ভালের ধাবা গেছে গাঙ্গায় ফুলিয়ে,—তাকে নির্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ও থাকলো আমার জপতপ পূজা-অর্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব।

যেচ্ছা মরণ আমি চাইনে। কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি করে থাকো, সে বুদ্ধি ত্যাগ করো। তুমি কি মনে দিচ্ছ আমি নেবে, কিন্তু ও নিতে পারবে না। আমাকে জানো বলেই জানিয়ে দিলুম যে সূর্য অস্ত যাবে তার পুনরুদয়ের অপেক্ষায় বাসে থাকার আমার আর সময় হবে না। ইতি—

রাজলক্ষ্মী

বাঁচা গেল। সুনিশ্চিত কর্তব্য অনুশাসনের চরম-লিপি পাঠিয়া একটা দিকে আমাকে সে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। এ উপায় ও-সাপার লইয়া ভাবিবার আর কিছু রহিল না। কিন্তু কি বলিতে পারিব না তাহাই নিঃসংশয়ে জানিলাম, কিন্তু অতঃপর কি আমাকে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে গাঙলক্ষ্মী একেবারে নিশ্চিন্ত। এত উপদেশ দিয়া আর একদিন চিঠি লিখিবে, কিংবা আমাকেই সশরীরে তলব করিয়া পাঠাইবে, কিন্তু অতঃপর ব্যবস্থা যাহা হইল তাহা অত্যন্ত চমৎকার। এদিকে ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ কাল সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন; তরস দিয়া আসিয়াছি চিন্তার হেতু নাই, অনুমতি পাওয়ায় বিদ্যুৎ ঘটিলে না। কিন্তু যাহা আসিয়া পৌছিল তাহা নির্বিঘ্ন অনুমতিই বটে! এখন নাপিতের হাতে সে যে ঢালি এবং টোপের পাত্রে নাই এই তের।

ও পক্ষে দেশের বাড়িতে বিবাহের আয়োজন নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে। পুটির আত্মীয়-স্বজনও কেত কেত হয়ত আসিয়া হাজির হইতেছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী মেয়েটা হয়ত এতদিনে লাঞ্ছনা ও গাঞ্জনার পরিবর্তে একটুখানি সম্মানবোধ মুখ দেখিতে পাইয়াছে। ঠাকুর কে কি বলিব জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সেই কপটা বিন্দু ইয়া ভাবিয়া পাইলাম না। তাহাও নির্মল ভাগাদা ও লজ্জাহীন যুক্তি ও শুকালতি মনে মনে আলোচনা করিয়া অস্তবটা একদিকে যেমন তিক্ত ইয়া উঠিল, তাহার ব্যর্থ প্রত্যাশওতো নিরাশায় তিক্ত পরিভ্রমণের এই দুঃখের মেয়েটাকে অধিকতর উৎসীড়নের কথা মনে করিয়াও ছাড়য়। এমনি বাকি ইয়া আসিল। কিন্তু উপায় কি? বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া বহিলাম। পুটির কথা ভুলিতে বিনম্র হইল না, কিন্তু নিবৃত্তি পড়িতে লাগিল গঙ্গামাটির কথা। জর্নাবল সেই ক্ষুদ্র পল্লীস্থিত কোনজন মুখিবার নয়। এ জীবনের গঙ্গা-যমুনাধারা একদিন এইখানেই বিযুক্ত হইয়াছে। একএবারের সেই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি শ্রদ্ধায় গভীর, অহে মধুর, আনন্দে উজ্জ্বল, আবার তাদের মতো নিঃশব্দ বেদনায় নিরতিশয় শুষ্ক। বিচ্ছেদের দিনেও আমরা প্রবন্ধনার পরিবাদে কেহ কাহাকেও কলঙ্ক নিষ্পত্তি করি নাই, নাও ক্ষতির নিম্নল বাদপ্রতিবাদে গঙ্গামাটির শাস্ত গৃহস্থানিকে আমরা ধুমাত্তম করিয়া আসি নাই। সেবারের সবাই জানে আবার একদিন আমরা ফিরিয়া অশ্রুধর, আবার শুক হইবে আমোদ-আহ্লাদ, শুক হইবে কৃষামিনীৰ দীনদরিত্রের সেবা ও সৎকার। কিন্তু

সে সম্ভাবনা যে শেষ হইয়াছে, প্রভাতের বিকশিত মল্লিকা দিনান্তের শাসন মানিয়া লইয়া নীরব হইয়াছে, এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না।

চোখে ঘুম নাই, বিনিদ্র রজনী ভোরের দিকে যতই গড়াইয়া আসিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ রাত্রি যেন না পোহায়। এই একটিমাত্র চিন্তাই এমনি করিয়া যেন আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বিগত কাহিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে, বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ কুটীরখানি মনের উপর ভূতের মত চাপিয়া বসে, অনুক্ষণ গৃহকর্মে নিযুক্তা রাজলক্ষ্মীর মিশ্র হাত দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ জীবনে পরিতৃপ্তির আশ্বাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই। কিন্তু আজ ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কোথায়। সে জানে আমি সুস্থ নয়, যে কোন দিন অসুখে পড়িতে পারি, তখন কোথাকার কে এক গুটি আমাকে ঘিরিয়া শয্যা জুড়িয়া বসিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর কোনো কর্তৃত্বই নাই, এতবড় দুখটানা মনের মধ্যে সে ঠাই দিতে পারে না। সংসারের সবকিছু হইতেই নিজেকে সে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু এ বস্তু অসম্ভব,—এ তাহার অসাধ্য। মরণ তুচ্ছ এর কাছে, রহিল তাহার গুরুদেব, রহিল তাহার জপতপ-ব্রত-উপবাস। সে মিথ্যা ভয় আমাকে চিঠির মধ্যে দেখায় নাই।

ভোরের সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, রতনের ডাকে যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা হইয়াছে। সে কহিল, কে একটি বুড়ো ভহলোক ঘোড়ার গাড়ি কবে এইমা এলেন।

এ ঠাকুরদাঁ। কিন্তু গাড়ি ভাড়া করিয়া? সন্দেহ জন্মিল।

রতন কহিল, সঙ্গে একটি সন্তেরা আঠাবো বছরের মেয়ে আছে।

এ পুটি। এই নির্লজ্জ মানুষটা তাহাকে কলিকাতার বাসায় পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। সকালের আলো তিস্তায় স্থান হইয়া উঠিল। বলিলাম, তাঁদের এই ঘরে এনে বসতে বতন, আমি মুখহাত ধুয়ে আসছি, এই বলিয়া নীচে স্নানের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিতে ঠাকুরদাঁ আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, যেন আমিই অতিথি, এসো দাদা, এসো। শরীরটা বেশ ভালো ত?

আমি প্রশ্ন করিলাম। ঠাকুরদাঁ হাঁকিলেন, পুটি গেল কোথায়?

পুটি ভানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল।

ঠাকুরদাঁ কহিলেন, ওর পিসিমা নিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়। পিসেমশাই হাকিম পাঁচ শ' টাকা মাইনে। ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হয়ে এসেছে— ঘর-সংসার মেলে পিসির বাবু হবার চো নেই, তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম, বললুম, পরের হাতে তুলে দেবার আগে ওকে একবার দেখিয়ে আনি গে। ওর দিদিমা আশীর্বাদ করে বললে, পুটি এমনি অদৃষ্ট যেন হোবও হয়।

আমি কিছু বলিবার পূর্বে নিজেই বলিলেন, আমি কিন্তু সহজে ছাড়চিনে ভায়া। হাকিমই হোন, আর যেই হোন, আখীর ত—দাঁড়িয়ে থেকে কাজটি সমাধা করে দিতে হবে— তবে তাঁর ছুটি। জানেনই তো দাদা, শুভকর্মে বহু বিদ্যু—শাস্ত্রে কি যে বলে—শ্রেয়াংসি বহু বিদ্যার্নি,—অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকলে কারুর টু-শব্দ করার ভরসা হবে না। আমাদের পাড়াগায়ের লোককে ত বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে। কিন্তু হাকিম কিনা, ওদের রাশি ভালোদা।

পুটির পিসেমশাই হাকিম। খবরটা অবাস্তব নয়—তাৎপর্য আছে।

নতুন ঝাঁক কিনিয়া আনিয়া রতন সযত্নে তামাক সাড়িয়া দিয়া গেল, ঠাকুরদাঁ ক্ষণকাল ঠাঁহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না?

রতন তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে হাঁ, দেখেছেন বৈ কি। দেশের বাড়িতে বাবুর অসুখের সময়ে।

ওঃ—তাই ত বলি। চেনা মুখ।

আজ্ঞে হাঁ। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

ঠাকুরদাঁর মুখ ভয়ঙ্কর গভীর হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত লোক, পোষ ভয় সমস্ত কথাই তাহার স্মরণ হইল। নীরবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেলবার সময়ে দিনটা দেখিয়ে এসেছিলাম,

বেশ ভালো দিন, আমার ইচ্ছে আশীর্বাদের কাজটা অমন সেরে রেখে যাই। নতুন বাজারে সমস্ত কিনতে পাওয়া যায়, চাকটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না? কি বলো?

কিছুতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কোনমতে শুধু বলিয়া ফেলিলাম, না।

না? না কেন? বেলা বারটা পর্যন্ত দিনটা ত বেশ ভাল। পাঁজি আছে?

বলিলাম, পঁজির দরকার নেই। নিবাহ আমি করতে পারব না।

ঠাকুর্দা ঠুকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। মুখ দেখিয়া বুকিলাম যুদ্ধের জ্ঞান তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। গলাটা বেশ শাস্ত ও গভীর করিয়া কহিলেন, উয়ু'ণ-আয়োজন একরকম সম্পূর্ণ বললেই হয়। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, ঠাট্টা-ভামাশার ব্যাপার ত নয়—কথা দিয়ে এসে এখন না বললে চলবে কেন?

পুষ্টি পিচন ফিরিয়া জানালাদ বাঁহিরে চাহিয়া আছে এবং দ্বারের আড়ালে রতন কান পাতিয়া বাঁহিয়াছে (বশ জানি)।

বলিলাম, কথা দিয়ে যে আমি। ও আমিও জানি, আপনিও জানেন। বলিছিলাম একজনের
মনমার্তিও পেলে বাজী হতে পারি।

ଅନୁଭାବି ମାତ୍ରାନ୍ତି ।

29

[illegible]

१७०. १७१. १७२. १७३. १७४. १७५. १७६. १७७. १७८. १७९. १८०.

॥६॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

200

490 : 1981 0225 : 222. 0007 :

1999

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

কিন্তু এটি কখনো কখনো হইতে পারে যে, কোন দেশে, রাজ্যে বা কিছু নৈই। গোয়েন্দা মোর
কিন্তু এটি কখনো কখনো হইতে পারে যে, কোন দেশে, রাজ্যে বা কিছু নৈই। গোয়েন্দা মোর

বতন উত্তর নদীয়া জলিয়া বস্ত্র উৎসব আদিত দুই পাশে বসেছিল ফুটি দিতে যিরিয়া আদিত
 হুলাসী হোয়াব ওয়েং দিয়া জলিয়া বস্ত্র উৎসব আদিত দুই পাশে বসেছিল ফুটি দিতে যিরিয়া আদিত
 দীপাও ও বাপু পদাফনানী একবার জলিয়া বস্ত্র উৎসব আদিত দুই পাশে বসেছিল ফুটি দিতে যিরিয়া আদিত
 বসিত ও বসিত বসতেন আদিত দুই পাশে বসেছিল ফুটি দিতে যিরিয়া আদিত

পুষ্টি মুখ ফিৰিয়া চাইলেন, ক'লেন। মদ্যমুখ্যতঃ কখন অর্পণ দিষ্কা কৰিবেন না। বাবা হাজাৰ টকা কোথাপি পাবেন যে দেবেন। এমনি কৰে পৰৱৰ্ত্তমান জয় দিদিৰ বিয়ে,—এখন তারা দিনিকে আব নোয় না। তাৰা বলে, ডোলেৰ অৰব বিয়ে দেবে।

এই মেয়েটি এর কথা আমার সঙ্গে পূর্বে করে নাই : কিছু অশ্রুৎ হওয়া জিজ্ঞাসা করিনাম।
 প্রোমথ লাবা স্ত্রীটি কি হাজি বউতা নিচে পায়নে না।

পুষ্টি ঘাট নাড়িয়া বালিন, কথবনে না। বাবা বলেন চাঁদ্রশ তাক, মেটে মাইনে পান, আমার ছোটভাইয়ের ঈশ্বরের মাইনের জন্যে আর পড়ই হ'ল না। সে কত কাঁদে। বলি : বলিতে তাহার দ্যাক দটি ছলছল করিয়া আসিল।

କ୍ରମା କବିଳୟ, ଡୋମାର କି ଏହି ଡାକ୍ତର ଚକ୍ରପାଣି ସିଂହ ହେଉ ନା?

পুটি কহিল, হ্যাঁ, তাই ত। আমাদের গায়েব অমূল্যবোধ সঙ্গে বাবা সম্বন্ধ করেছিলেন। তার ময়েরকই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরণে গিয়েছিটেন বলেই ও সে বিয়ে বন্ধ হল। এদের বাবা বোধ হয় আর কাক কথা শুনবেন না। সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন। বলিলাম, পুটি

আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

পুটু সলজ্জে মুখ নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।

কিন্তু আমিও ত তোমার চেয়ে চোন্দ-পনের বছরের বড়?

পুটু এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি আর কোথাও কখনো সখস্ব হয়নি?

পুটু মুখ তুলিয়া খুশি হইয়া বলিল, হয়েছেছিল ত। আপনাদের গ্রামের কালিদাসবাবুকে জ্ঞানেন?

তার ছোট ছেলে। বি. এ. পাস করেছে, বয়সে আমার চেয়ে কেবল একটুখানি বড়ো। তার নাম শশধর।

তোমার তাকে পছন্দ হয়?

পুটু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিলাম, কিন্তু শশধর তোমাকে যদি পছন্দ না করে?

পুটু সলিল, তাই বৈ কি! আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেবল আনাগোনা করত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা করে বলতেন, সে শুধু আমার জ্ঞানেন।

কিন্তু এ বিয়ে হ'ল না কেন?

পুটুর মুখখানি স্নান হইয়া গেল, কহিল, তার বাবা হাজার টাকার গয়না আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। আর কোন না পাঁচ শ' টাকা খরচ হবে বলুন? এ ত জমিদারদের ঘরের মেয়ের জ্ঞানেনই হয়। সত্যি নয়? ওরা বড়লোক, অনেক টাকা ওদের, আমার মা তাদের বাড়ি গিয়ে কত হাতে পায়ে ধরলে, কিন্তু কিছুতে শুনলে না।

শশধর কিছু বললে না?

না, কিছু না। কিন্তু সেও তো বেশি বড় নয়—তাব বাপ-মা বেঁচে আছে কিনা।

তা বটে, শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে?

পুটু বাগ্র হইয়া কহিল, না এখনো হয়নি। শুনচি নাকি শীগগির হবে।

আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হলে তারা যদি তোমাকে ভালো না বাসে?

আমাকে? কেন ভালবাসবে না? আমি যে দাঁধাবাড়ী, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জ্ঞানি।

আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেব।

এর বেশি বাঙ্গালী-ঘরের মেয়ে কি-ই বা জানে। কারিক পরিশ্রম দিয়াই সে সমস্ত অন্নাদ প্রণ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তাদের সব কাজ নিশ্চয় করবে তো?

হী, নিশ্চয় করব।

তা হলে তোমার মাকে গিয়ে বলো, শ্রীকান্তদাদা আড়াই হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আপনি দেবেন? তাহলে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন?

হী, তাও যাব।

দ্বারপ্রান্তে ঠাকুরদার সাড়া পাওয়া গেল। কৌচায় মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি প্রবেশ করিলেন তোফা পায়খানাটি ভায়া! ওয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। বসন্ত গেল কোথায়, আর এক কলকে আমার দিক না।

চার

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে, মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো ফলপ্রসূ হয় না। সংপরাশ্রম কিছুতেই কেহ শুনেন না। কিন্তু সত্য বলিয়াই দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সেই ঘটনাটি বলিব।

ঠাকুরদা দাঁত বাহির করিয়া আত্মবোধ করিয়া অতি হুটুচুটে প্রস্থান করিলেন, পুটু বিস্তার পায়ে ধূলা গ্রহণ করিয়া আদেশ পালন করিল, কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলে আমার পরিতাপের অব্যবহিতকাল না। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া কেবলি ভিরঝির করিতে লাগিল যে, কে ইহারা যে বিদেশে চাকরি করিয়া কত দুঃখে যাত্রা-কিন্তু সত্য করিয়াছি তাহাই দিয়া দিব? ঠোকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই

দাতাকর্ণগিরি করিতেই হইবে, তাহার অর্থ কি? কোথাকার কে এই মেয়েটা গাড়িতে অবাচিত প্যাড়া এবং দই খাওয়াইয়া আমাকে ত আচ্ছা ফাঁদে ফেলিয়াছে! একটা ফাঁস কাটিতে আর একটা ফাঁসে জড়াইয়া পড়িলাম। পরিব্রাজকের উপায় চিন্তা করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল এবং এই নিরীহ মেয়েটার প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। আর ঐ শয়তান ঠাকুরদাঁ। ইচ্ছা করিতে লাগিল লোকটা যেন না আর বাড়ি পৌছায়, রাস্তাতেই সদিগম্মি হইয়া মারা যায়। কিন্তু সে আশা ভিত্তিহীন, নিশ্চয় জানি, লোকটা কিছুতেই মরিবে না এবং একবার যখন আমার বাসার ঠিকানা জানিয়াছে তখন আবার আসিবে এবং যেমন করিয়া পারে টাকা আদায় করিবে। হয়ত এবার সেই হাকিম পিসেমশায়কে সঙ্গে করিয়া আনিবে। এক উপায়—যং পলায়তি। টিকিট কিনিতে গেলাম, কিন্তু জাহাজে স্থানভাব—সমস্ত টিকিট পূর্ণাঙ্কেই বিক্রী হইয়া গেছে, সুতরাং পরের মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সে ছয়-সাত দিনের ব্যাপার।

আর-এক পদ্মা বাসা বদল করা। ঠাকুরদাঁ না খুঁজিয়া পায়। কিন্তু এমন একটি ভাল জায়গা এত শীঘ্র পাওয়াই বা যায় কোথায়? কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়াছে যে, ভালমন্দের প্রমই অবাস্তব—যথার্থগ্যং তথা গৃহম—শিকারীর হাত হইতে প্রাণ বাঁচানর দায়।

ভয় ছিল আমার গোপন উদ্দেশ্যটা পাছে রতনের চোখে পড়ে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে তাহার নড়িবার গা নাই। কানীর চোখে কলিকাতা তাহার বেশি মনে পরিবার্ছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠির জবাব নিয়ে কি তুমি কোনই চেষ্টা চেষ্টা করতন?

রতন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আজ দুপুরে মাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম, আমার দু' পাচলিন চোঁর মনে মনে সোসাইটি, হাত সোসাইটি না দেখে আর ফিরি নে। আবার করে কোনকালে আসা হবে তার তো কোন ঠিক নেই।

কহিলাম, কিন্তু তিনি তো উদ্ভিষ্ট হয়ে পাবেন।

আজ্ঞে, না। প্রতিবৎসরকটা প্রবলো করিয়ে উঠতে পারিনি। সেকথা লিখে দিয়েছি।

কিছু চিঠির জবাবটা

আজ্ঞে, দিন না। কোনই বেজেন্দু বার পারিবে সেবেগন। সে-বাড়িতে মার চিঠি যমে বলতেও সন্তস করবে না।

চুপ করিয়া কহিয়া বহিলাম। নার্পিত বাতীর কাছে কোন কন্দিই খাটিল না। সব প্রস্তাবই নাকচ করিলে দিল।

বাকার সমস্ত ঠাকুরদাঁ টাকার কণ্ঠটা প্রচণ্ডে কলিকাতা গেছেন। তাহলে তার উদ্যম অথবা সারল্যের প্রাচুর্য এ ভাবে মনে কেব না করেন তিনি সঙ্কী রাখিয়া গেছেন।

রতন ঠিক সেই কথাই পাতিল, বলিল, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি বাবু! এক কথা রতন?

রতন একটু দ্বিধা করিয়া বলিল, আড়াই হাজার টাকা তে' নিতান্ত তুচ্ছ নয় বাবু—ওরা কে যে ওদের মেয়ের বিয়েতে এতটা টাকা আপনি ব্যয়কা দান করবেন বললেন। তা ছাড়া, ঠাকুরদাঁ হোক, আর যাই হোক, বুড়োটা লোক ভাল নয়। ওকে বলানি ভাল হয়নি বাবু।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া সেমন অনিবচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, মনেব মধ্যে তেমনি জোর পাইলাম—ইহাই চাহিতোহলাম!

এখানি বক্তৃতাে কিঞ্চিৎ সম্মেলের অভ্যাস দিয়া কাহলাম, বলাই ভাল হয়নি, না রতন?

রতন বলিল, নিশ্চয় ভাল হয়নি বাবু। টাকটা তো কম নয়। তা ছাড়া, নি' সের জন্য বলুন তো?

ঠিক ত। কহিলাম, তাহলে না দিলেই হবে।

রতন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সে ছাড়াবে কেন?

কহিলাম, না ছেড়ে কববে কি? লেখাপড়া করে তে' দিইনি। আর, তখন আমি এখানে থাকব কি বরায় চলে যাব, তাই বা কে জানে।

রতন একমুহুর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া একটা হাসিল, বলিল, বুড়োকে আপনি চিনতে পারেন নি

বাবু, ওদের লজ্জা-সরম মান-অপমান নেই। কেঁদেকেটে ভিক্ষে করেই হোক, আর ভয় দেখিয়ে জুলুম করেই হোক, টাকা ও নেবেই। আপনারা দেখা না পেলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ও কাশী গিয়ে মার কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বে। মা বড় লজ্জা পাবেন বাবু ও মতলবে কাজ নেই।

গুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। রতন আমার চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। অর্থহীন আকস্মিক করুণার হঠকারিতার জরিমানা আমাকে দিতেই হইবে। নিস্তার নাই।

রতন পাড়াগাঁয়ের ঠাকুরদাকে যে চিনিতে ভুল করে নাই, বুঝা গেল যখন চতুর্থ দিবসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আশা করিয়াছিলাম এবার নিশ্চয় হাকিম পিসেমশাই সঙ্গে আসিবেন— কিন্তু একাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, দশখানা গ্রামের মধ্যে ধনা ধনা পড়ে গেছে দাদা, সবাই বলচে, কলিকালে এমন কখনো শোনা যায় না। গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাধায় এভাবে উদ্ধার করে দিতে কেউ কখনো চোখে দেখেনি। আশীর্বাদ করি চিরজীবী হও।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে কবে?

এই মা-সর পঁচিশে স্থির হয়েচে, মধ্যে কেবল দশটা দিন বাকী। কাল পাকাদেশা, আশীর্বাদ— বেলা তিনটের পরে বারবেলা, এর ভেতরেই শুভকর্ম সমাধা করে নিতে হবে। কিন্তু তুমি না গেলে বরঞ্চ সব বন্ধ থাকবে, তবু কিছুই হতে পারবে না। এই নাও তোমার পুঁটির চিঠি— সে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছে। কিন্তু তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি খেঁচায় হারালে তার জোড়া কখনো পাবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁজ-করা একশও হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে দিলেন।

- কৌতুহলবশতঃ চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঠাকুরদা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কালিদাসের পয়সা থাকলে হবে কি, একেবারে ছোটলোক— চামার। চোখের চামড়া বলে তার কোন বালাই নেই। কালই টাকাকড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে, গহনাপত্র নিজের সেকরা দিয়ে গড়িয়ে নেবে—ওর কাউকে বিশ্বাস নেই—এমন কি, আমাকে পর্যন্ত না। লোকটাব মত দেখে! ঠাকুরদাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না—আশ্চর্য।

পুঁটি স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছে। একপাত্র দু'পাত্র নয়, চার-পাতাজোড়া ঠাস পূর্ণনি। চার পাতাই সকাতির মিনতি। ট্রেনে রাঙাদিদি বলিয়াছিলেন, আজকালকার নাটক নভেল হার মানে। কেবল আজকালকার নয়, সর্বকালের নাটক-নভেল হার মানে তবু; অস্বীকার করিব না। এই লেখার ভেতরে নন্দরাণীর স্বামীর চৌদ্দ দিনের ছুটি লইয়া সাওতালদের দিন আসিয়া হাজির হইয়াছিল কথাতা বিশ্বাস হইল।

অতএব, আমিও পরদিন সকালেই যাত্রা করিলাম। টাকটা সত্যি সঙ্গে নইয়াছি এবং ভাতচূন করিয়া প্রভাষণ করিতেছি না—ঠাকুরদা নিজের চক্ষে তাহা যাচাই করিয়া লইলেন, বলিলেন, পদ্ম চলবে জেনে, টাকা নেবে শুণে। আমরা দেবতা নই তো রে ভাই, মানুষ—ভুল হতে কতক্ষণ।

সত্যি ত! রতন কাল রাতেই কাশী রওনা হইয়া গেল। তাহার হাতে চিঠির ভাবের দিয়াছি, লিখিয়া দিয়াছি—তথাস্তু। ঠিকানা দিতে পারি নাই ঠিক নাই বলিয়া। এ ক্রটি যেন সে নিজস্বগে ক্ষমা করে, এ প্রার্থনাও জানাইয়াছি।

যথাসময়ে গ্রামে পৌছিলাম, বাড়িসুদ্ধ লোকের সৃষ্টিস্থা ঘুচিল। যত্ন ও সমাদর যাহা পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অভিব্যক্তি নাই।

পাকাদেশা আশীর্বাদ করায় উপলক্ষে কালিদাসবাবুর সহিত পরিচয় হইল। লোকটা যেমন কক্ষ মেজাজের, তেমন দান্তিক। তাহার অনেক টাকা এই কথটা সবলকে সর্বক্ষণ স্মরণ করানো ছাড়া। জগতে তাহার যে আর কোন কর্তব্য আছে মনে হয় না। সমস্ত স্বোপার্জিত। সমস্তে বলিলেন, মশাই, বরাত আমি মনিনে, যা করব তা নিজের বাস্তবসে। দেব-দেবতার অনুগ্রহ আমি ভিক্ষে করিনে। আমি বলি দেবোর পোহাই দেয় কাপুরুষে।

বড়লোক বলিয়া এবং ছোটখাটো ভালুকদার বলিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং অধিকাংশেরই বোশ করি তিনি মহাজ্ঞান, এবং দুর্দান্ত মহাজ্ঞান—অতএব সকলেই একবাক্যে তাহার কথাগুলো স্বীকার করিয়া লইলেন। তর্করত্ন মহাশয় কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং

আলপাশ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটা পুরাতন কাহিনীরও সূত্রপাত হইল।

অপরিচিত ও সামান্য ব্যক্তি অনুমানে তিনি অবহেলাভরে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। টাকার শোকে আমার অন্তরটা তখন পড়িতেছিল, দৃষ্টিটা সচ্য হইল না, ইঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, বাছবল আপনার কি পরিমাণ আছে জানিনে, কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা আমিও স্বীকার করি।

তার মানে?

বলিলাম, আমি আমি নিজেই। বরকেও চিনি, ক. নকেও না, অথচ টাকা যাচ্ছে আমার এবং সে টুকছে গিয়ে আপনার সিঁদুরকে। একে বরাত বলে না ও বলে কাকে? এই বললেন, আপনি দেব-দেবতারও অনুগ্রহ নেন না, কিন্তু আপনার জেলের হাতের আঙটি থেকে বোয়ের গলার হার পর্যন্ত তৈরি হবে যে আমারই অনুগ্রহের দান। হয়ত-বা বৌ ভাতের খাওয়ানোটা পর্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হইলেও বোধ করি সকলে এত বিচলিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। ঠাকুর্দা কি-সব বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই সুস্পষ্ট বা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল না। কালিদাসবাবু ক্রোধে ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি টাকা দিচ্ছেন, তা আমি জানব কি করে? এবং দিচ্ছেনই বা কেন?

বলিলাম, কেন দিচ্ছি সে আপনি বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও চাইনে। কিন্তু দেশসুদ্ধ সকলে শুনবে, আমি টাকা দিচ্ছি, কেবল আপনিই শোবেন নিঃশব্দে। মেয়ের মা আপনাদের বাড়িসুদ্ধ সকলের হাতে-পায়ে ধরেছে, কিন্তু আপনি বি. এ. পাস-করা জেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম করতে পার্জী হননি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই। এটা ভেবে দেবেন নি আপনাদের জেল কেনবার অর্থাৎ টাকা ইঠাৎ তারা পায় কোথায়? মাই হোক, জেল বেচা টাকা অনেকটাই নেই, আপনি নিজেও দেখে নেই, কিন্তু এর পরে গায়ের লোককে বাড়িতে ভেঙে টাকার অঙ্কুর অব করবেন না এবং একজন বাইরের লোকের ভিক্ষেব দানে জেলের বিরুদ্ধে দিচ্ছেন এ কথাটাও মনে রাখবেন।

উদ্বেগ ও ভয় সমস্তের মুখ কালিদাস হইয়া উঠিল। বেশ হয় সবাই ভাবিলেন, এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিবে এবং হঠাৎ এম্ কালিদাস সকলকে লক্ষ্যপেটা না করিয়া কালিদাসবাবু আর কাহাকেও ঘরে ফিরাতে দিবেন না।

কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ মৌন থাকে বসিয়া থাকে, দুই তুলিয়া বলি, টাকা আমি নেব না।

বলিলাম, তার মানে জেলের বিরুদ্ধে আপনি এখনে দিবেন না?

কালিদাসবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নয়, আমি কথা দিয়েছি বিবাহ দেবো—তার নড়চড় হবে না। কালিদাস মুখের কমন্বয় পাল্প করে না। আপনার নমস্টি কি?

ঠাকুর্দা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, দিচ্ছি।

কালিদাসবাবু চিনিতে পারিয়া কহিলেন, ও — এই বটে। এর ব্যপেক সঙ্গেই না একবার আমার ভয়ানক হেইজদারী মামলা দাঁড়াবে।

ঠাকুর্দা বলিলেন, অজ্ঞে এ — কিছুই আপনি বিশ্বস্ত হন না। এ তাইই ছেলে বটে, সম্পর্কে আমারও নাস্তি হয়।

কালিদাসবাবু প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, তা হোক। আমার বড়জেল বেঁচে থাকলে এমনি বয়সই হ'ত। শশধরের বিরোধে এসে পাকা আমার পক্ষ পক্ষ সেদিন তেঁমার নিমন্ত্রণ রইল।

শশধর উপস্থিত ছিল, সে শুধু সঙ্কটের চক্ষে আমার প্রতি একটিবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় মুখখানি আনত করিল।

আমি উঠিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম, বলিলাম, যেখানেই থাকি, অস্তিত্ব বোভাতের দিন এসে নববধুর হাতে অন্ন খেয়ে যাব। কিন্তু অনেক কাণ্ড কথা বলেচি, আমাকে আপনি কমা করবেন। কালিদাসবাবু বলিলেন, কাণ্ড কথা যে বলেচি তা সত্যি, কিন্তু আমি কমাও করেছি। কিন্তু উঠলে

চলবে না শ্রীকান্ত, শুভকর্ম উপলক্ষে সামান্য কিছু খাবার আয়োজন করে রেখেছি, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

যে আছে, তাই হবে, বলিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

সেদিন পাত্রকে আশীর্বাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভা হু অভ্যাগতগণের খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কার্যই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সদূপদেশ সম্বন্ধে যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুটুর বিবাহটা তাহারই একটা ব্যক্তিক্রমের উদাহরণ। জগতে এই একটিমাত্রই নিজের চোখে দেখিয়াছি। কারণ নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত হতভাগা মেয়ের বাপের কান মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয় সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া হাতজোড় করিয়া বাঘের গ্রাস হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর নির্দয় বলিয়া গালিগালাজ করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া ক্ষোভ কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে, কিন্তু প্রতিকার মিলে না। কারণ, প্রতিকার বরের বাপের হাতে নাই, সে আছে মেয়ের বাপেরই নিজের হাতে।

পাঁচ

গহরের বোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুদ্ধ ; বলিল, দেখুন গে এ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে তো ঘরে আসাই হয়নি।

সে কি কথা নবীন! বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে?

একটা? একপাল এসে জুটেছে।

কোথা থাকে তারা?

এ ত মুরারিপুত্রের আশ্রয়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মধুরোদাস বাবাজী ম'লো, তার জায়গায় এসে জটল এক ছোকরা বৈরিগী, তার গণ্ডা চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরিগীর সঙ্গে আমাদের বাবু খুব ভাব, সেখানেই ত প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব বৈরাগীরা তাদের আশ্রয় ওকে থাকতে দেবে কেন?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, এসব আউলে-বাউলেগুলোর মধ্যস্থল জ্ঞান আছে নাকি? ওরা জ্ঞান জন্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, যা বিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন আমাদের এখানে ছ সাত দিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলেনি?

নবীন বলিল, বললে যে কমলিনতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। সে-কয়দিন বাবু আশ্রয়ভাণ্ড কাছেও যায়নি। আর যেই আপনি চলে গেলেন, বাবুও অমনি খাতা-কাগজ-কলম নিয়ে আশ্রয় গিয়ে ঢুকলেন।

শ্রম করিয়া করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাউল গান বসিমেতে, ছড়া রচনা কবিত্তে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই আশ্রয়ভাণ্ডেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাছে ভালো, তাহার কথা শুনিতে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়! বৈষ্ণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আশ্রয়ভাণ্ডার সাবেক প্রাচীর ভীর্ণ হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

হেলেবেলায় এই আশ্রয়ভাণ্ডার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাশ্রদ্ধা ভোক্তা এক ভক্ত শিবা এই আশ্রয়ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদনন্তর শিষ্যপবম্পরায় বৈষ্ণবনবা ইত্যাদি বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। বলিলাম, নবীন, আশ্রয়টা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে?

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল, আমার অনেক কাজ। আর আপনিও ত এই দেশের

মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ-কোশের বেশি নয়, ঐ সমুখের রাজ্য দিয়ে সিধে উত্তরমুখো চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সামনের পীথির পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলচে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে—ভাবতে হবে না।

আমার যাওয়ার প্রজ্ঞাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে—কীর্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিনরাত। খুগ্ননি-কর্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই, গহরকে ধরে আনি গে।

এবার নবীনও হাসিল, বলিল, হাঁ যান; কিন্তু দেখবেন কমললতার কেন্দ্র শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি, কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশে অপরাহ্নবেলায় যাত্রা করিলাম।

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধ করি উল্টীর্ণ হইয়াছে, দূর হইতে কীর্তন বা খোল-করতালের শব্দমাত্র পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুল-বৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল, নীচে ভাসাচোরা বেদী একটা আছে, কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পখের রেখা আকিয়া-বাকিয়া প্রাচীরের ধার ঘেষিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম হয়ত ওদিকে কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেদিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই, শীর্ণ সঙ্গীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন নদীর তীরে একশত পরিদৃষ্ট গায়ত্রীলিপ্ত টুকরা ভূমি উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি—আন্দাজ করিলাম, ইনিই বৈরাগী দ্বারিকানন্দ— আখড়ার বর্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাইলাম। লোকটিকে ভদ্র ও উচ্চজাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, কোণে বলিয়া কিছু দীর্ঘকায় বলিয়া চোখে ঠেকে; মাথায় চুল চূড়ার মত করিয়া সমুখে বাঁধা, দাড়ি-গোঁফ প্রচুর নয়—সামান্যই, চোখেরমুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঞ্চাশ-ষট্টিশের বেশি হইবে বলিয়া বোধ করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না, দু'জনেই নদীর পরপারে পশ্চিম দিশে চাহিয়া দৃষ্ট হইয়া অস্বে। সেখানে নান্ন রঙ ও নান্ন আকারের টুকরা মেঘের মাঝে ক্ষীণ পান্থর তৃতীয়াব চাঁদ এবং পিক যেন তাহারই কমললতার মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা। বহু নিম্নে দেখা যায় দূর গ্রামাণ্ডের নীল বৃক্ষবর্জিত—তাহার যেন কোণও আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, সাদা, পাঁচটি নানা বর্ণের ছেঁতালবঁটা মেঘের গায় তখনও সূর্য্য সূর্যের শেষ-দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন দুই ছেলের হাতে রঙের তুলি পড়ি। ছবির আদ্যাত্ম চলিতেছে। তাহার ক্ষণকালের অনন্দ—চিহ্নকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

ফলতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিদৃষ্ট করিয়াছে, সমুখের সেই স্বচ্ছ কালো অল্পপরিমিত জলটুকুর উপরে ছোট ছোট বৈষ্ণব চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া ত্রিকম্বক করিতেছে—যেন কতিপাথরে ঘষিয়া সেকবা সোনার দাম ফাটাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজ্ঞত কণ্ঠমল্লিক, ফুটিয়াছে, তাহারই শব্দ সমস্ত বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং নিকটে কোন গাছ অসংখ্য বকের বাসা হইতে শব্দকলসের একটান কুমকুম শব্দ বিচিত্র মাথুণে অবিরাম কানে আসিয়া পলিতেছে। এসবই ভালো এবং যে দুটা লোক ওলাটচিহ্নে জড়ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কঁবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে এই ভঙ্গলে সন্ধ্যাকার আসি নাই। নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্টমী আছে, এবং সকলের সেবা বোষ্টমী কমললতা আছে। তাহার কোথায়?

ডাকিলাম, গহর! গহর ধ্যান ভাঙ্গিয়া হস্তপুষ্কির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা সোঁদা দিয়া বলিল, গোসাই, তোমার শ্রীকান্ত, না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বামপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ ধামিতে চাহে

না এমনি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, বাবাজী, আমাকে হঠাৎ চিনলেন কি করে?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গৌসাই, ক্রিয়াপথে শেষের ঐ সত্ত্বমের 'দণ্ড্যন'টি বাদ দিতে হবে। তবে ত রস জন্মবে।

বলিলাম, তা যেন দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিনলে কি করে?

বাবাজী কহিলেন, হঠাৎ চিনব কেন! তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গৌসাই, তোমার চোখ দুটি যে রসের সমুদ্র—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে। যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা এতদিন ছিল কোথা? কমল এসে সেই সেই যে আপনার হ'ল তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গৌসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম কমললতা দেখব বলেই ত এসেচি গৌসাই, কই সে?

বাবাজী ভারী খুশি হইলেন, কহিলেন, দেখবে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গৌসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচো। হয়ত ভুলে গেছ, কিন্তু দেখলেই চিনবে, সেই কমললতা। গৌসাই, ডাকো না একবার তারে। এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহার কাছে সবাই গৌসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেচে তোমাকে দেখতে।

গহর চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গৌসাই, আমার কথা খুশি তোমাকে গহর সমস্ত বলেচে? বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ সমস্ত বলেচে। তারে জিজ্ঞাসা করলাম, গৌসাই, ৬-সাতদিন আসনি কেন? সে বললে, শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমি যে শীঘ্রই আমার আসবে তাও বলেচে। তুমি বর্মাদেশে যাবে তাও জানি।

ওনিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম, রক্ষা হোক, ভয় হইয়ছিল সত্যই বাইনি কোন অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক, এক্ষেত্রে আমার সমস্তে তাঁহার অঙ্গাঙ্গতা যে বৈঠক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভাল বলিয়াই চৈকিল, অস্তিত্বঃ অসামু-প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। নিঃজানি, কেন ইহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে—অর্থাৎ যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন, একটু ক্ষাপাটে গোছের,—হয়ত কবিতা ও বৈষ্ণব-বসচর্য্য কিঞ্চিৎ বিব্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহরগৌসাইয়ের সঙ্গে কমললতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, অঁটিসটি ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চূড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর বুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে ধর্মির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই, কিংবা হয়ত সকালের দিকে ছিল, এ বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গেছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সর্বস্বয়্যে মনে হইল এই চোখমুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরনটাও যেন পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবী কথা কহিল। সে যে নীচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। সে কিছুমাত্র কৃত্রিমিকারিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গৌসাই, চিনতে পার?

বলিলাম, না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখে বৃন্দাবনে। বড়গৌসাইজীর কাছে স্ববরটা শোননি এখনো?

বলিলাম, তা শুনেছি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখন জন্মেও যাইনি!

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছে বৈ কি। অনেককালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোট চাপিয়া মুখ মুখ হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম তামাশা করিতেছে, কিন্তু আমাকে না বড়গৌসাইজীকে, ঠিক তাহার করিতে পরিলাম না। কহিল, রাত হয়ে আসচে, আর জলদে বসে কেন? ভেতরে চলে।

বক্সিলাম, জমলের পথে আমাদেরও অনেকটা বেতে হবে। বরক কল আমার জামর।

বৈকুণ্ঠী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সন্ধান দিলে কে? নবীন?

হী, সেই। কমলিতার খবর বলোনি?

হী, তাও বলেচে।

মোটমীর ভাল হিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া বার না, তোমাকে সাবধান করে দেয়নি?

সহাস্যে কহিলাম, হী, তাও নিয়েচে।

বৈকুণ্ঠী হাসিয়া কহিল, কহিল, নবীন হিন্দিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল করোনি।

কেমন হলো ত?

বৈকুণ্ঠী ইহার জবাব দিল না, গহরকে সেখায়া কহিল, গোসাই বলে, তুমি বিশেষে ব্যস্ত চাকরি করতে। তোমার ত কেউ নেই, চাকরি করবে কেন?

তবে কি করবো?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ ত আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তা জানি। কিন্তু বৈরাগীগিরি আমার মতুন নয়।

বৈকুণ্ঠী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেছি, ধাত্তে সর না বুঝি?

না, বেশিদিন সর না।

বৈকুণ্ঠী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেছি। কিন্তু অঙ্ককারে কিরকি কি করে?

বৈকুণ্ঠী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অঙ্ককারে কিরতেই বা আমরা দেব কেন? অঙ্ককার কটিবে গো কটিবে। তখন যোয়ো। এসো।

চলো।

বৈকুণ্ঠী কহিল, গৌর! গৌর!

গৌর গৌর, বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

ছয়

বসিত ধর্মচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু বাহ্যের আছে তাহাদেরও বিয় খটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি, ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন অভিসন্ধি আমি কোন কংন বুঝিয়া পাইব না। তথাপি ধার্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজী ও স্বখ্যাত সাধুজী—কাহ কেও ছোট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধুবর্ণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিপুট রহস্য বৈকুণ্ঠসত্যসঙ্গেই সুতন্ত্র আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙ্গলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসী-সাধুসকল কিছু কিছু করিয়াছি—কল্যাণতের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি মৈবাং খাঁটি বস্ত্র কমলালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না, সজ্ঞ করিলাম। পুঁটির বোভাভের নিমন্ত্রণ আমাকে রাবিতোই হইবে, অন্ততঃ সে-কয়টা দিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের পরিবর্তে বৈকুণ্ঠী-আখড়ার আপেক্ষায় কেবাও কটিহিতে পারিলে আর বাহি হোক জীবনের সঙ্করে বিশেষ লোকসান ঘটবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমলিতার কথা মিথ্যা নয়, সেখান কমলের বনই বটে, কিন্তু দলিত-কিনীত। মস্তভিক্রুদের সাধাৎ মিলিল না, কিন্তু বহু পার্শ্বিক বিদ্যমান। বৈকুণ্ঠীরা নানা বয়সের ও নানা চেহেরার এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুখ ছাল পেতেছে, কেহ জ্বর তৈরি করিতেছে, কেহ মলু পাকহিতেছে, কেহ মরলা মাঝিতেছে, কেহ কলমুল বানাইতেছে—এসকল ঠাকুরের স্নানের ভোগের ব্যাপার। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বৈকুণ্ঠী একমনে কসিয়া ফুলের মালা পাঁজিতেছে এবং অন্যরই কয়েক বসিয়া আর একজন নানা রঙের ছাপানো ছোট ছোট বস্ত্রও সমস্তে কুচিত করিয়া ততাইল দুকিতিতেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রীতীসোমিখ জীউ কল মানাতে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই,

তাহাদের কাজের আশ্রয় ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষমাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওঁহাদের সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে নামজপ চলিতেছে। এনিকে বেলা শেষ হইয়া দুই-একটা করিয়া এদীশ জ্বলিতে শুরু করিয়াছে ; কমললতা কহিল, চণ্ডো ঠাকুর, নমস্কার করে আসবে। কিন্তু আচ্ছা—তোমাকে কি খেলে ডাকব বল ত? নতুনগৌসাই বলে ডাকলে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাকে এখানে গহর পর্যন্ত বখন গহরগৌসাই হয়েছে তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে। কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গৌসাই জুড়ে দাও না।

কমললতা মুখ তিগিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও নামটা আমার ধরতে নেই—অপরাধ হয়, এসো।

তা বাচ্চি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

কিসের তা তোমার ওনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত।

বে বৈকণ্ঠীটা মালা গাঁথিতেছিল সে কি করিয়া হাসিয়া কেলিয়াই মুখ নীচু করিল।

ঠাকুরঘরে কালোপাথর ও পিতলের রাখাকৃক সুগলমূর্তি। একটি নয়, অনেকগুলি। এখানেও জনপীচ-হর বৈবস্বতী কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিশ্বাস কেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিতরে বখারীতি প্রশাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির, কিন্তু সবুজ-পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই পারা যায় না, তথাপি কমললতা পূর্বের ব্যাঙ্গ্যার একধারে আসন পাতিয়া মিল, কহিল, বসো, তোমার থাকবার ঘরটা একটু তছিরে দিবে আমি।

আমাকে এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি?

কেন, ভর কি? আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।

বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ করবে যে।

বৈকণ্ঠী কহিল, সে ভাব আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

এককী বলিয়া অনন্য বৈকণ্ঠীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই তাহাদের সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার নিকে কেহ কিরিয়াও চাহিল না। মিনিট মশেক পরে কমললতা বখন কিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমিই মঠের কতী নাকি?

কমললতা জিত কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী—কেউ ছোট বড় নেই। এক-একজনের এক-একটা ভার, আমার ওপর প্রভু এই ভার নিরেছেন। এই বলিয়া সে বন্ধিরের উদ্দেশে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

বলিলাম, তাই হবে। আচ্ছা, বড়গৌসাই গহরগৌসাই এদের খেঁচি নে কেন?

বৈকণ্ঠী কহিল, তাঁরা এলেন বলে, নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই স্নানে? আর ঐ নদীতে? বৈকণ্ঠী বলিল, হী।

কহেও?

হী, গহরগৌসাইও।

কিন্তু আমাকেই-বা স্নান করানো না কেন?

বৈকণ্ঠী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকে স্নান করাই নে, তারা আপনি করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সৌন্দর্য্য স্নান করলেও ভুলবে না।

বলিলাম, গহর ভাগ্যবান, কিন্তু আমার ত টাক নেই, আমি পরীব দোক—আমার প্রতি হরত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈকণ্ঠী ইমিঙটা খেঁচ হর মুকিল এক রাগ করিয়া কি-বেব একটা বলিতে গেল, কিন্তু বলিল

না। তারপরে কহিল, গহরগোসাই বাই হোন কিন্তু তুমিও গরীব নয়। অনেক টাকা নিয়ে যে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করে ঠাকুর তাকে গরীব ভাবে না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য নয়।

বলিলাম, তাহলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা লেখা আছে ঘটবে, কটিকান কাঁবে না—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি শেলে কোথায়?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়িতে তিকে করতে হয়, আমরা সব খবরই শুনেতে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাওনি যে, টাকা নিয়ে দায় উদ্ধার করতে আমার হয়নি?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল; কহিল, না এ খবর পাইনি। কিন্তু হ'ল কি, বিয়ে ভেঙ্গে গেল?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাসেনি কিন্তু ভেসেছেন কালিদাসবাবু—বরের বাপ নিজে। পরের ডিকের দানে ছেলে-বেচা-পণের কড়ি হাত পেতে নিতে লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘটল!

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহরগোসাইজীই অন্ধকারে পচা নদীর জলে ডুব মারবে, আর সংসারের কোথাও কোন অঘটন ঘটবে না? তার মীলাই বা প্রকাশ পাবে কি করে বল ত? বলিরাই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বলিলাম কথটা আমার ভালো হয় নাই—মারা ছাড়াইয়া গেছে।

বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল, যেন অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিল।

সমুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মন্ত একথালি লুচি লইয়া ঠাকুরঘরের দিকে গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ কোন পর্বদিন,—না?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্বদিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ার অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা। কিন্তু আরোজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশি করে করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দলা করে যদি দুদিন থাকে নিজেই সব দেখতে পাবে। দাসীর দাসী আমরা, ঠর সেবা করা ছাড়া সংসারে আর ত আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া সে মন্দিরের দিকে হাতজোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটা, দধ ছাল-দেওয়া, তাল-গাঁথা, কাগড় রঙ-করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই করো?

বৈষ্ণবী কহিল, হাঁ, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এসব ত কেবল ঘরগৃহস্থালীর কাজ সব মেরেরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন কর কখন? বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধা-বাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাগড়-ছোপান—একেই বলে সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাসদাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজ্জল চোখ দুটি যেন অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিসীম বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা তোমার বাড়ি কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছতলা ত আর চিরকাল ছিল না?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইট-কাঠের তৈরি কোন একটা বাড়ির ছোট একটি ঘর। কিন্তু সে গর করার ত এখন সময় নেই, গোসাই। এল ত আমার সঙ্গে, তোমার নতুন ঘরটি দেখিয়ে দিই।

চমৎকার ঘরখানি। বাঁশের আলনার একটি পরিষ্কার তসরের ঝগড় দেখিয়া দিয়া কহিল, এটি পড়ে ঠাকুরঘরে এস। মেরি ক'রো না যেন। এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একথায় যেটুকু একটি ভক্তগোষ্ঠে পাতা বিছানা। নিকটেই জলটাকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রহ ও একখানা বৃন্দাবন ; এইমাত্র কীলিঙ্গ জালিয়া কেহ কেহ হয় ধূপধূনা দিয়া গেছে, তাহার পথ ও বৌদায় খরটি ভরনও পূর্ণ হইয়া আছে—ভারী ভাল লাগিল। সান্নাঙ্গিনের রাত্রি ত হিন্দী, ঠাকুর-সেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং ওদিকের আকর্ষণ ছিল না,—কখনও ছাড়িয়া ধূপ করিয়া নিয়মের ভইরা পড়িলাম। কি জানি এ বছর খর, কাহার শয্যা, অজ্ঞাত বৈকলী একটা রাত্রির জন্য আমাকে খার দিয়া গেল—কিঞ্চিৎ হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এসকল চিন্তার মন আমার স্বভাবতই ভারী সফট বোধ করে, অথচ আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনায় অনেক কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় একটু ভ্রমাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কে যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুনগোসাই, মন্দিরে যাও না? ওরা ভোমাকে ডাকছেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা-সহযোগে কীর্তনগান কানে গেল, বহুদোকের সমবেত কোলাহল নর গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকর্ষ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসংশয়ে অনুমান করিলাম, এ কমললতা। নবীরে বিখাস এই মিষ্টবরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল—অসম্ভব নয় এবং অসম্ভবতঃ অসম্ভবও নয়।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশেষে একথারে দিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলেরই দৃষ্টিই রাখাক্ষের ধূপমুর্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্তন করিতেছে—মদন-গোপাল জয় জয় বনোদা-মুলাল কি, বনোদা-মুলাল জয় জয় নন্দমুলাল কি, নন্দমুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি—

এই সহজ ও সাধারণ গুটিকয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বন্ধনস্থল মহিত করিয়া কি সুখ ভরসিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন ; কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপহিত কাহারও চকুই শুক নয়। গারিকার দুই চকু প্রাবিত করিয়া দরদর ধারে অক্ষর বসিতেছে এবং তাবের ওরুভারে তাহার কটবর মাঝে মাঝে যেন ভাসিয়া পড়িল বসিয়া। এইসকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমনখারা করিয়া উঠিল। বাবাজী হারিকাদাস মুদ্রিতনেত্র একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না এবং শুধু কেবল কমলাল পূর্বেই নিঃসংশয়পরিহাস-চকল কমললতাই নয়, সাধারণ গৃহকর্মে নিযুক্তা যেসকল বৈকলীদের এইমাত্র সামান্য ভুল ছুঁয়া মনে হইয়াছিল, তাহারও যেন এই ধূপ ও ধূনার ধূমাজ্বর গুহে অনুভবল দীপালোকে আমার চক্রে মুহূর্তকালের জন্য অপরাণ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল, অদূরবর্তী ঐ পাথরের মূর্তি সভাই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্তনের সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিতেছে।

তাবের এই বিহ্বল মুহূর্তকে আমি অত্যন্ত ভর করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম—কেহ লক্ষ্যও করিল না। সেখি প্রস্থানের একথারে বসিয়া গহর। কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদশব্দে তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল না, কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও মড়িতে পারিলাম না, সেইখানে শুদ্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, শুধু আমাকেই একাকী বেশিরা রাখিয়া এ ব্যক্তির সকলসই যেন আর এক ঘেঁষে চলিয়া গেছে—সেখানের পথ আমি চিনি না। ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া ভইরা পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জানি কিয়া ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলের বড়, তথাকি কিসের ব্যখার জানি না, মনের ভিতরটা কীমিতে লাগিল এবং তেমনি অজানা কারণে চোখের কোশ বাহিয়া বড় বড় কৌটি গড়াইয়া পড়িল।

কতকল ধূপদীপদীপান জানি না, কানে গেল,—ওগো নতুনগোসাই।

জানিয়া উঠিয়া বসিলাম, কে?

আমি গো—ভোমার কয়েককালের বড়। এত ঘুমোতেও পার।

অন্ধকার ঘরে চৌকালের কাছে দাঁড়াইয়া কমললতা বৈকলী। বসিলাম, জোপে খেঁচে লাগ হ'ত কি? শুধু সমস্তটার একটু সমস্তবদ্য হ'ল।

তা জানি। কিন্তু ঠাকুরের প্রসন্ন পায়ে না?

পাৰ।

তবে ঘুমোচ্ছে বে বড়?

জানি বিয় খটবে না, প্রসাদ পাৰ্বই। আমার সছোবেলোকায় বন্ধু রাও পৰিত্যাপ করবে না।

বৈষ্ণবী সহাস্য কহিল, সে দাবী বৈষ্ণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতকাল। তুমি গহরকে পৰ্বত গোসাই বানিয়েচ, আর আমিই কি এত অবহেলায়? হুকুম করলে বোষ্টমের দাসানুদাস হতেও রাজী।

কমললতার কঠোর একটুখানি গভীর হইল, কহিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাশা করতে নেই গোসাই, অপরাধ হয়। গহরগোসাইজীকেও তুমি ভুল বুঝেছো। তার আপন লোকেরাও তাকে কাকের বলে, কিন্তু তারা জানে না সে খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্মবিশ্বাস সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার ডাব সেখে ত তাঁ মনে হয় না।

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, এসো। একটু ভাবিয়া কহিল, কিবা প্রসাদ নাহয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই—কি বল?

বলিলাম, আপত্তি নেই। কিন্তু গহর কোথায়? সে থাকে ত দু'জনকে একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে খাবে?

বলিলাম, চিরকালই ত খাই। ছেলোবেলার ওর মা আমাকে অনেক ফলার মেখে দিয়েছে, তোমাদের প্রসাদের চেয়ে সে তখন কম মিষ্টি হ'ত না। তা ছাড়া গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই—অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিখাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে কহিল, গহর-গোসাইজী নেই, কখন চলে গেছে আমরা জানতে পারিনি।—কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠানে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাও না। বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ আমি দেখেছি। কমললতা, আমার তামাশাতে তুমি রাগ করলে, কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাশা করচো না। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা নয়।—বৈষ্ণবী এর অনুযোগের আর জবাব দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পায়ে লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল, অতিথিসেবার ক্রটি হবে নতুনগোসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই গো সন্ধ্যার বন্ধু, বোষ্টম না হয়েও তোমার নতুনগোসাইজীর রসবোধ আছে, আতিথ্যের ক্রটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করে না। রাখো কি আছে—ফিরে এসে দেখবে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অমনি করেই ত খেতে হয়। এই বলিয়া কমললতা নীচে ঠাই করিয়া সমুদয় খাদ্যসামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রভাতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কাঁসর-ঘন্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্যভাও-সহযোগে মঙ্গল আরতি শুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্তনের পদ—কানু-গলে বনমালা বিরাজে, গাই-গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে মঞ্জীর-রঞ্জিত বজ্রন গঞ্জন লাজে। তারপরে সারাদিন ধরিয়া চলিল ঠাকুরসেবা। পূজা, পাঠ, কীর্তন, নাওয়ানো-খাওয়ানো, গা-মোছানো, চন্দন-মাখানো, মলা-পধানো—ইহার আর বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল পাথরের দেবতারই এই অষ্টপ্রহরব্যাপী অফুরন্ত সেবা সখে, আর কিছু হইলে এতবড় ধকলে ক'ন কইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।—কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা সাধন-ভজন কর কখন? সে উত্তরে বলিয়াছিল—এই ত সাধন-ভজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাখা-মাড়া, ফুল তোলা, মালা-গাথা, দুধ ছালা-দেওয়া, একেই বলা সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখন জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হ্যাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা—আমাদের অঙ্গর কোন সাধনভজন নেই।

আজ সমস্তদিনের কাণ্ড দেখিয়া বুলিলাম কথাও তাহার বর্ণে বর্ণে সত্য। অতিরঞ্জন অত্যাধিক কোথাও নাই। দুপুরবেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম, কমললতা, আমি জানি তুমি অন্য সকলের মত নও; সত্যি বল ত ডগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্তি—

বৈকুণ্ঠী হাত ছুঁয়া আমাকে ধামাইয়া নিল, কহিল, প্রভীক কি গো—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান। এমন কথা আর কখনো মুখেও এলো না নতুনগোসাই—

আমার কথার সেই মেনে লজ্জা পাইল বেশি। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, ভবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি ত জানিমে, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি সভাই ভাবো এ পাখরের মূর্তির মতোই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে বাবো কিসের জন্যে গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংসারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো রক্ত-মাংসের মেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও থাকবার জো নেই। কিন্তু তা কেন? আর এও বলি, শক্তি আর চৈতন্যের হিন্স কি তোমারই সবখানি পেয়ে বসে আছে যে, বলবে পাখরের মধ্যে তাঁর জায়গা হবে না? হয় গো হয়, ভগবানের কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে বাবো কেন বলো তা?

যুক্তি-হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এ ত তা নয়, এ তাহার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকণ্ট উত্তির কাছে হঠাৎ কেমনখারা গভীরত বহিয়া গেলাম, তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সভাই ত, পাখরই হোক আর বাই হোক, এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের পর বৎসর নিদান্ডব্যানী এই অবিলম্বে সেবার জোর পাইত ইহার। কি করিরা? এমন সোজা হইয়া নিশ্চিত নির্ভরে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহার। শিও ত নয়, ছেলেবেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে বিধাগ্রস্ত মন যে শ্রান্তির অবসানে দুদিনেই এলাইয়া পড়িত। কিন্তু সে ত হয় নাই, বরঞ্চ ভক্তি ও প্রীতির অথও একাগ্রতার আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জীবনে পাওয়ার মিক দিয়া সে কি তবে সবই ভুয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকান?

বৈকুণ্ঠী কহিল, কি গোসাই, কথা কও না যে?

বলিলাম, ভাবচি।

কাকে ভাবত?

ভাবচি তোমাকেই?

ইন্! বড় সৌভাগ্য যে : তার। একটু পরে কহিল, ভবুও থাকতে চাও না, কোথায় কেন বর্ষাসের দোস্তে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার ত মঠের জমিদারীও নেই, মুখ ভাঙের দলও নেই—খাবো কি?

ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুঃশা। কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও ত মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে বাবে কেন?—বৈকুণ্ঠী কহিল, বাই তিনি সেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে। নইলে নিজেদের পরজ নেই, থাকলে বেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।

কমললতা, তোমার বেশ কোথায়?

কলকেই ত বলেছি গোসাই, বর আমার পাহতলার, বেশ আমার পথে পথে।

তাঁহলে পাহতলার আর পথে পথে না থেকে মঠে থাকে কিসের জন্যে?

অনেকদিন পথে-পথেই ছিলুম গোসাই, সঙ্গী পাই ও আমার একবার পথই সফল করি।

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ-কথা ত বিশ্বাস হয় না, কমললতা। কাকে ডাকবে সেই যে রাজী হবে। বৈকুণ্ঠী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুনগোসাই—রাজী হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হী রাজী। নান্যাক অবস্থার যে-লোক যাহার কলকে ভর করেনি, সাক্ষাৎ ভগবানের তার খেতিয়কে ভর কি!

আমার দলও ছিল না কি?

হী।

তা হলে ত গান গাইতেও পারো।

না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে সেরেনি, তার আগেই জবাব দিয়েছিল। ছুটি অধিকারী হলে কি হ'ত বলা যায় না।—বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতুম। সে যাক, এখন আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে যাবে। এসেছে যেমন-তেমন করেও ঠাকুরের নাম নিতে পারলে ভিক্টর অভাব হয় না। চলো না গৌসাই, বেরিয়ে পড়া যাক। বলেছিলে শ্রীকৃষ্ণনাম ধাম কখনো দেখিনি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটল, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুনগৌসাই?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারী বিষন্ন জন্মিল; কহিলাম, পরিচয় তো এখনো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আমাদের এতটা বিশ্বাস হ'ল কি করে?

বৈষ্ণবী কহিল, চব্বিশ ঘণ্টা ত কেবল একপক্ষেই নয় গৌসাই, ওটা দু'পক্ষেই। আমার বিশ্বাস, পথে-প্রবাসে আমাদেরও তোমার অবিশ্বাস হবে না। কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারী শুভদিন,—চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ ত রইলই—ভাল না লাগে কিরে এসো, আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল—ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়ে আসা হয়েছে।

কমললতা বলিল, চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি গে।

আমার ঘর? তাই ভাল।

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে, সে পরিত্রাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহারও নিশ্চিত, কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে—তাহার এক মুহূর্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিয়া খাইতে বসিলাম। অতি পরিপাটি প্রসাদ। পলায়নের বড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে একজন অত্যন্ত ঈর্ষারী কাজে কমললতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং একাকী মুখ বুজিয়াই সেবা সমাপ্ত করিতে ইহল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না, বাবাজী ঘরিকদাসই বা গেলেন কোথায়? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরাঘুরি করিতেছে—কাল সন্ধ্যার ঠাকুরঘরে ঘোঁসার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অগুরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ দিনের বেলায় বড় আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যবোধটা তেমন আঁট রহিল না, গা-টা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেই শৈবালচ্ছন্ন শীর্ণকায় মন্দস্রোতা সুপরিচিত স্রোতবর্তী এবং সেই লতাশ্যামকটকাকীর্ণ ভটভূমি এবং সেই সর্পসঙ্কুল সুদৃঢ় বেতসকুঞ্জ ও সুবিদ্ধ বনবন। দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশতঃ গা ছমছম করিতে লাগিল। অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথায় একটি লোক আড়ালে বসিয়া ছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষ থাকে! লোকটির বয়স হয়ত আমাদেরই মত—আবার বছর দশেকের বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। স্বর্বাঙ্গিত রোগা গড়ন, গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের দু দুটাও তেমন অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ-প্রস্থে বিস্তীর্ণ। বস্ত্রতঃ এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয় ইতিপূর্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না, দূর হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেলালে একজোড়া মোটা গোঁফ চোখের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলাজোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোশাক-পরিচ্ছদও অনেক বৈষ্ণবদের মত, কিন্তু যেমন ময়লা তেমন জীর্ণ।

মশাই।

ধমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

আপনি এখানে কবে এসেছেন শুনতে পারি কি?

পারেন। এসেছি কাল বৈকালে।

রাত্রিতে আখড়াতে ছিলেন বৃষ্টি?

হ্যাঁ, হিলাম।

ওঃ।

কি নিখোঁদে মীয়ে বলিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লোকটা বলিল, আপনি ত যেমন নর, ততলোক—আমাদের মধ্যে আপনাকে থাকতে নিলে যে?

বলিলাম, সে খবর উঠাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ওঃ কমলিনতা থাকতে কলসে দুকি?

হী।

ওঃ জানেন ওর আসল নাম কি? উবাদিনী। যদি সিনেট, কিন্তু সেখান কেন ও কমলতার সেরেবাসুখ। আমার যদিও সিনেটে। পীরের নাম মামুনপুর। ওরকম ওর স্বভাব-চরিত্র?

বলিলাম, না। কিন্তু লোকটার ভাবগতিক সেবিরা এবার সভাই বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এর করিলাম, কমলতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

আছে না?

কি সেটা?

লোকটা কপকল ইত্যদ্যন্ত করিয়া হঠাৎ পর্জন করিয়া উঠিল, তেন, যিখে নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কঠিবল করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত?

আমরা হাদশ-তিল।

আর কমলতার?

প্রত্যুত্তরে লোকটা তাহার সেই সেটা হু-জোড়া দ্বার কুকিত করিয়া বলিল, ওরা শূঁড়ী, ওদের জলে আমরা পা হুইনে। একবার ডেকে নিতে পারেন?

না। আশ্চর্য সবাই যেতে পারে, ইচ্ছা হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাব মশাই, যাব। দারোগাকে দু পয়সা খইরে রেখেছি, পেয়ালা সঙ্গে করে একেবারে হুঁটি করে টেনে বার করে আনব। বাবাজীর বাবাও রাগতে পারবে না। শালা রাঙেল কোথাকার।

আর বাস্তব্য না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে কর্কশকণ্ঠে কহিল, তাতে আপনার কি হ'ল? গিরে একবার ডেকে নিলে কি শরীর করে যেত নাকি? ওঃ—তদরলোক!

আর বিরীতা চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলহিতে না পারি এবং এই অতি দুর্বল লোকটার পারে হৃত বিরা কেলি এই ভয়ে একই ব্রহ্মপদেই গ্রহান করিলাম। মনে হইতে লাগিল বৈকুণ্ঠের পলাইবার হেতুটা বোধ হয় এইখানেই কোথার জড়িত।

মনটা বিপড়িয়াছিল, ঠাকুরঘরে নিজেও পেলাম না, কেহ ডাকিতেও আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলটোকার উপরে ওড়িরকর বৈকুণ্ঠ গ্রন্থাবলী সমস্তে সাজানো ছিল, তাহার একখানা হাতে করিয়া ঈশীপাট শিরের কাছে আসিয়া বিজ্ঞানর ওইরা পড়িলাম। বৈকুণ্ঠ-গ্রন্থাঙ্ক অধ্যয়নের জন্য নয়, শুধু সময় কাটাইবার জন্য। কোন্‌র সহিত একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, কমলিনতা সেই যে শিরেই আর আসে নাই। ঠাকুরের সম্মানভি বখারীতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার আসিতে লাগিল এবং ঘুরিয়া বিরীতা কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল কমলিনতা সেই অখনি কোন তরুই আমার নয় নাই। আর সেই হু-ওরালা লোকটা। কেন সভাই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই?

আরও একটা কথা। গরুর কৈ? সেও ত আজ আমার বৌদ লইল না। ভাবিয়াছিলাম নিমকরক একটাই কাটাইব,—পূর বিখ্যাত মিনটি পর্বত—কিন্তু সে আর হয় না। হারত কলসি কমলিনতার রক্তমা হইল পড়িব।

ব্রহ্মপদ আরম্ভ ও বীর্যম সমস্ত হইল। কল্যাকার সেই বৈকুণ্ঠী আসিয়া আতও বহ বস্ত্রে গ্রন্থ-রক্ষিয়া শেল, কিন্তু কেবল পব ভাবিয়াছিলাম তাহার শেল মিলিল না। যাহিরে লোকসমূহের কথক-আলোচনার পরের মধ্যে ব্রহ্মপদ শব্দ হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা আর নাই

জানিয়া আহার করিয়া হাতমুখ ধুইয়া শীত লিখিয়া গুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল, নতুনগোসাই?

আগিয়া উঠিয়া বলিলাম। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমললতা; আছে আছে বলিল, আসিনি বলে মনে মনে বোধ হয় অনেক দুঃখ করেছে—না গোসাই?

বলিলাম, হী, করেচি।—বৈকুণ্ঠী সুদূরকাল নীরব হইয়া রহিল, তার পরে বলিল, বনের মধ্যে ও লোকটা তোমাকে কি বলছিল?

তুমি দেখেছিলে নাকি?

হী।

বলছিল সে তোমার স্বামী—অর্থাৎ তোমাদের সারাজিক আচারমতে তুমি তার কঠিবদল-করা পরিবার।

তুমি বিশ্বাস করেছে?

না, করিনি।

বৈকুণ্ঠী আবার কলকাল শ্রোণ থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বাব-চরিত্রের ইঙ্গিত করেনি?

করেছে।

আমার জাভ?

হী, তাৎ।—বৈকুণ্ঠী একটুখানি থামিয়া বলিল, ওনবে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস? কিন্তু হয়ত তোমার ঘণা হ'বে।

বলিলাম, তবে থাক, ও আমি শুনতে চাইনে।

কেন?

বলিলাম, তাতে লাভ কি কমললতা? তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে। কিন্তু কাল চলে যাবো, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না। নিরর্থক আমার সেই ভালোলাগটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে এলো ত?—বৈকুণ্ঠী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে ভাবিয়া গাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবচ?

ভাবচি, কাল তোমাকে যেতে দেব না।

তবে, কবে যেতে দেবে?—যেতে কোনদিনই দেব না। কিন্তু অনেক রাত হ'লো ঘুমোও। মশারিটা ভাল করে গৌজা আছে ত?

কি জানি, আছে বোধ হয়।

বৈকুণ্ঠী হাসিয়া কহিল, আছে বোধ হয়? বাঃ—বেশ ত! এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা-টিপিয়া বাহির হইয়া গেল এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সাত

আজ আমাকে বৈকুণ্ঠী বার বার করিয়া শপথ করাইয়া লইল তাহার পূর্ব-বিবরণ শুনিয়া আমি ঘৃণা করিব কি না।

বলিলাম, শুনতে আমি চাইনে, কিন্তু শুনলেও ঘৃণা করব না।

বৈকুণ্ঠী প্রশ্ন করিল, কিন্তু করবে না কেন? সে শুনলে মেয়েপুত্রবে সবাই ত ঘৃণা করে।

বলিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানিনে কিন্তু তবুও আন্দাজ করতে পারি। সে শুনলে মেয়েরাই যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে সে জানি এবং তার এরশ জানি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমি চাইনে। পুরুষেরাও করে, কিন্তু অনেক সময়ে সে ছলনা, অনেক সময়ে আত্মবিক্রম। তুমি বা বলবে তার চেয়েও অনেক কুখী কথা আমি তোমাদের নিজের মুখেও শুনেছি, দেখেও দেখেছি। কিন্তু তবুও ঘৃণা হয় না।

কেন হয় না?

বোধ হয় আমার বক্তব্য। কিন্তু কালি ত বসেছিল তোমাকে, তার দরকার নেই। ওনাকে আরি একটুও উৎসুক নই। তা ছাড়া, কোথাকার কে—সে সব কাহিনী নাই বা আমাকে বললে।

বৈকুণ্ঠী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তার পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আমায় গোঁসাই, তুমি পূর্বজন্ম পরজন্ম এসব বিশ্বাস করো?

না।

না কেন? একি সত্যিই নেই তুমি ভাবো?

আমার ভাবনার জন্য অন্য জিনিস আছে, এসব ভাবনার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠিলে।

বৈকুণ্ঠী আবার কণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলবো, বিশ্বাস করবে? ঠাকুরের দিকে মুখ করে বলি, তোমাকে যিথেষ্ট বলবো না।

হাসিয়া বলিলাম, কোরব গো কমললতা, কোরব। ঠাকুরের দিঘি না কশে বললেও তোমাকে বিশ্বাস কোঁবব।

বৈকুণ্ঠী কহিল, তবে বলি। একদিন গহরগোঁসাইয়ের ঘুখে ওনলাম হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধ এসেছিলেন বাড়িতে; ভাবলুম, যে লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না সে রইলো কেন? ছেলেকলার বন্ধকে নিয়ে যেতে ছ-সাত দিন। আবার ভাবলুম, এ কেমনধারা বামুন বন্ধ যে অনায়াসে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না। তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞাসা করতে গহরগোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। বললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে বললুম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই? নাম শুনে যেন চমকে গেলুম। জানো ত গোঁসাই, ও-নামটা আমার কবতে নেই!

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈকুণ্ঠী কহিল, জিজ্ঞাসা করলুম, বন্ধ দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত-কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভেতরটায় টিপটিপ করতে লাগল। তুমি ভাববে এমন মানুষ ত দেখিনি—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেরেমানুষ পাগল হয় গোঁসাই,—এ সত্যি?

বলিলাম, তারপর?

বৈকুণ্ঠী বলিল, তারপর নিজেও হাসতে লাগলুম, কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজকর্মই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আসবে। তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাব কবে। ভনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈকুণ্ঠী বলিল, সব কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চোরে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালোবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে।

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসেনি, থাকবেও না। বস্তু প্রার্থনাই জানি নে কেন, দু-একদিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাব তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অকসে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এক অক্ষকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয়নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্বে কখনো শ্রুতকো পড়ি নাই, স্যোকে মুখেও শুনি নাই। এবং ইহা শুনিয়া যে নর তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়হীন দুর্বল নর, তাহার কথার-স্বার্থের, তাহার পানে, তাহার দৃষ্টি ও অতিথিসেবার আনন্দিকতার তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে এবং সেই ভালো লাগি। একটু ও রসিকতার অত্যাধিক্যে কলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কণপতা করি নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিশ্রুতি যে এমন যোগাযোগ ইহা উদ্ভবে, বৈকুণ্ঠীর আবেগনে, অক্ষরভাষনে ও মনুষ্যের অসুখিত আনন্দকালে সমস্ত মন যে এমন ভিত্ততার পরিপূর্ণ ইহা বাইবে, অক্ষরভাষা পূর্বেও তাহার কি অসুখিত! কেন হৃদয়ই ইহা গেলো। কেবল কমললতাই যে সর্বদা

কটকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি, বস্তুি বহিল না। জানি না, কোন অন্তত সন্ধ্যা কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ যে এক পুঁটির জাল কাটিয়া আর-এক পুঁটির ফাঁদে গিয়া ঘাড়মোড় ঠুজিয়া পড়িলাম। এদিকে বরষা শু বৌবনের সীমানা ডিম্ব হিতেছে, এই সময়ে অযাচিত নারীধেমের বন্যা নামিল না কি ; কোথায় পলাইয়া যে আশ্রয়লা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচির হইতে পারে তাহা ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বহুমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবে না, এ মীমাংসা চুকিয়াছে। কিন্তু এখানে আর না। সাধুসঙ্গ মাথায় থাক, হির করিলাম কলই এখানে ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই বাঃ! তোমার জন্যে যে চা আনিয়াছি গোঁসাই।

বলো কি? পেলো কোথায়?

শহরে লোক পাঠিয়েছিলুম। বাই, তৈরি করে আনি গে। কোথাও পালিয়ে না যেন।

না। কিন্তু তৈরি করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেইদিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা-পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত নিষেধই আছে, তবু ও-জিনিসটা যে আমি ভালবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং শহরে সোহাগা সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানি না, বর্তমানেরও না, কেবল আভাসে এইটুকুই ওনিয়াছি তাহা ভাল নয়, তাহা নির্দ্বন্দ্ব, ওনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি আমার কাছে সে-কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, শুধু আমিই ওনিতে রাজী হই নাই। আমার কৌতূহল নাই—কারণ প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

ওনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমললতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানি না কে তাহার এই পরমপূজ্য গুরুজন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। দেবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ কবি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত-জনমের স্বপ্নসাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতার জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিশ্বয়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকর্ষিত মগ্ন থাকি, ৩ তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত বসের তন্তু পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতুষ্ট প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহে হয়ত আজ ক্রান্ত,—বিধায় পীড়িত। সেই তাহার শব্দজন্ত বিভ্রান্ত মনে আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বায়ে বায়ে তাহার বিগত-জনমের রুদ্ধদ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সাক্ষ্য মাগিতেছে। তাহার কথা ওনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথের করিয়া আজ সে খেলা ভাসাইতে চায়!—বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল ; সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্তিত হয়,—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, তোমরা কি খুঁড়ি?

কমললতা হাসিয়া বলিল, না, সোনারবেনে। কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই, ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই 'ক' কেন, সবই এক হ'লেও কতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাই ত মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও বেয়েছো।

বলিলাম, ঠাকে তুমি জানো না। গহর বাপের মত হয়নি, তার মায়ের স্বভাব গেয়েছে—এমন শান্ত, আত্মভোলা মিষ্টি মানুষ আর কখনও দেখেছো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার মেসেকোয়ার গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর বগড়ার কথা আমার মনে আছে। কাকে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাক দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধল। গহরের বাপ ছিল বদরাসী লোক, আমরা ত ভয়ে পেলাম পালিয়ে।

বটুকরেক পরে দুটি দুটি করে এসে সেবি পথের মাছুপ করে বসে। পথের বাপের কথা ভিজালা করলে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের দুখের পাশে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে কেঁটিলমত জল গড়িয়ে পড়লো। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈকণী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হ'লো?

বলিলাম, আমরাও ত তাই ভাবলাম। কিন্তু হাসি খামলে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বললেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু! ও নিখি নেয়ে-খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে, আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেখে ছলেপুড়ে মরছি। কি দরকার বলো ত। আর কলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ অভিমান ধুয়েধুয়ে নির্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কত বড় গুণ তা ভুততোপী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈকণী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুততোপী নাকি গৌসাই?

একটু বিব্রত হইলাম। প্রমাণ তাহাকে ছাড়িরা যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, সবই কি নিজে ফুলতে হয় কমললতা, পনের দেখেও শেখা যায়। ঐ ভুরুওয়াল লোকটাঃ কাছে তুমি কি কিছু শেখানি?—বৈকণী বলিল, কিন্তু ও ত আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না—একবারে নিমন্ত হইরা রহিলাম। তোমাকে মিনতি করি গৌসাই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—

বেশ, বলো।

কিন্তু বলিতে গিয়া সেবিল কলা সহজ নয়। আমারি মত নতমুখে তাহাকেও বহুকাল পৰ্বন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু সে হার মানিল না, অন্তর্বিগ্রহে জরী হইয়া একসময়ে বখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আমারও মনে হইল তাহার স্বভাবতঃ সূত্রী মুখের পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে। বলিল, অহঙ্কার যে মরেও মরে না গৌসাই। আমাদের বড়গৌসাই বলে, ও যেন তুষের আড়ন, নিবেও নেবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে বিকিধিকি জ্বলচে। কিন্তু তাই বলে হুঁ দিয়েও ত বাড়তে পারব না। আমার এ পথে আসাই যে তা হলে মিথো হয়ে বাবে। শোন। কিন্তু মেয়েমানুষ ত—হরত, সব কথা বলে বলতেও পারব না।

আমার কৃষ্ঠার অবধি রহিল না। শেববারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম, মেয়েদের পদস্থলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই, ও গুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগে না কমললতা। তোমাদের বৈকণ-সাধনার অহঙ্কার বিনাশের কোন্ পন্থা মহাজনেরা নির্দেশ করে দেয়েছেন আমি জানিনে, কিন্তু নিজের গোপন পাণ অনাবৃত করার স্পর্ষিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়, এসব কাহিনী বাসের কাছে অত্যন্ত রুচিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ তুমি পাবে কমললতা, আমাকে কহা কর। এছাড়া বোধ হয় কলিই আমি চলে যাবো—জীবনে হরত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।

বৈকণী কহিল, তোমাকে ত আপনাই বলছি গৌসাই, প্রয়োজন তোমার নয়, আমার। কিন্তু কলকের পরে আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি সত্যিই বলতে চাও? না কখনো তা নয়, আমার মন বলে আবার দেখা হবে—আমি সেই আশা নিয়েই থাকবো। কিন্তু বথাবধি কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কথাই জানতে হচ্ছে করে না? চিরকাল শুধু একটা সঙ্গেই আর অনুমান নিয়েই থাকবে?

প্রশ্ন করিলাম, আজ বনের মধ্যে যে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, থাকে তুমি আমাদের হুকতে যাও না, বার দৌরায়ে তুমি পালাতে চাও, সে কি তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

বিলম্ব করে পালাতি তুমি বুঝেছো গৌসাই?

হী, এই ত মনে হয়। কিন্তু ক'র ও?

কে ও? ও আমার ইহ-পরজন্মের নরক-বন্দনা। তাই ত অহরহ ঠাকুরকে ভৈসে বসি, প্রভু, আমি তোমার পদী—মানুষের উপর থেকে এত বড় শূণ্য আমার মন থেকে মুছে নাও—আমি আবার সহজ হিঁকস ফেলি বড়ি। আমার সকল সাধনা যে কার্য হয়ে বায়।

অতঃপর প্রবোধ দৃষ্টিতে কেন অহঙ্কারি দুটিয়া উঠিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈকুণ্ঠী কহিল, অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—জগতে অত ভালো বোধ করি কেউ কড়িকে বাসেনি।

তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বয়ের সীমা রহিল না এবং এই সুযোগে রমণীর তুলনার সেই ভালবাসার পার্শ্বটির কুণ্ঠসিত কলকায় মূর্তি স্মরণ করিয়া মনও ভারী হোত হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী বৈকুণ্ঠী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুঝিল, কহিল, গৌসাই, এ ত ওখু ওর বাইরেটা—ওর ভিতরের পরিচয়টা শোন।

বলো।

বৈকুণ্ঠী বলিতে লাগিল, আমার আরও দু'টি ছোটভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র মেয়ে। বাড়ি আমাদের গ্রীহষ্টে, কিন্তু বাবা কারবারী লোক, তাঁর ব্যাসা কলকাতার বলে মেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ—মা সন্সার নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকেন, আমি পূজার সময় যদি কখনো দেশে যেতুম মাসখানেকের বেশি থাকতে পারতুম না। আমার ভালোও লাগত না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই, তাঁর নামের জন্যেই গৌসাই, তোমার নামটা গহরগৌসাইয়ের মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। এইজন্যেই নতুনগৌসাই বলে ডাকি, তোমার ও নামটা মুখে আনতে পারিনে। বলিলাম, সে আমি বুঝেছি, তারপর?

বৈকুণ্ঠী কহিল, বার সঙ্গে তোমার আজ দেখা তার নাম মন্থর, ও ছিল আমাদের সরকার। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়স যখন একশ বছর তখন আমার সন্তান-সন্তান হ'লো—

বৈকুণ্ঠী বলিতে লাগিল, মন্থরর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসার থাকত, বাবা তাকে কল্যাণে পড়াতে। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালবাসত তার সীমা ছিল না। তাকে ডেকে বললুম, যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি ভাই, আমার এ বিশেষ শেখবারের মত আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে এক টাকার বিব কিনে এনে দাও।

কথাটা প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝলে মুখখানা তার মড়ার মত কালকশে হয়ে গেল। বললুম, মেরি করলে হবে না ভাই, তোমাকে এখনি কিনে এনে দিতে হবে। এছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

ওনে যতীনের সে কি কারা! সে ভাবত আমাকে সেবতা, ডাকত আমাকে মিনি বলে। কি আশাত, কি বাধাই সে যে পেলে, তার চোখের জল আর শেষ হতেই চায় না। বলল, উবাদিনি, আমায়ত্ন আর মত মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাণ্ডে আর একটা তার বড় অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ বুঝে পেতে চাও? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি হির করে থাকো মিনি, আমি কখনো সাহায্য করব না। এছাড়া তুমি আর যা প্রস্তাব করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন করব।

তার জন্যেই আমার মরা হ'লো না।

ক্রমশঃ কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান বৈকুণ্ঠ, তেমননি শান্ত নিরীহবৃত্তির মানুষ। আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায়, দুঃতিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। তার পরে গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নব্বীশে এলেন। কথা হ'লো মন্থর এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈকুণ্ঠ হবো, তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালাবদল করে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যে শিশু গর্ভে এসেছে মা হয়ে থাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই বেন সর্ব্বক বেদনা মুখে গেল। উদ্বেগে আরোজন চললো, দীক্ষাও হলো আর ভেবেই হলো, তাও আমাদের সাজ হ'লো, আমার নতুন নামকরণ হ'লো কমললতা। কিন্তু তখনো জানিনে যে, বাবা দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্থরকে দীক্ষা করিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ, কি কারণে জানিনে বিয়ের দিনটা দিনকয়েক পেছিয়ে গেল। বোধ হয় সন্তানসংক্রান্ত হবে। মন্থরকে বড় একটা দেখিনে, নব্বীশের বাসার আমি একলাই থাকি। এখনিই ক'দিন বার, তার পরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হ'লো। মান করে, গুটি হয়ে, শান্তমনে তাঁরুয়ের

প্রদীপী মালা: হাতে প্রদীপী করে রইলুম।

বাবা বিষয়যুগে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈকালের বেগে মন্থর স্বপন দেখা মিলল, হঠাৎ সমস্ত মনের ভেতরটা যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে আনন্দের কি ব্যাখ্যার ঠিক জানিনে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হ'লো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথার নিচে আনি, কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠল না।—আমাদের কলকাতার পুরোনো দাসী কিসব জিনিসপত্র নিয়ে এলো—সে আমাদের মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছোবার কারণ গুনতে পেলাম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারী হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বৈকালী মুখ কিরাইয়া অশ্রু মুহিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বললে সে?

বৈকালী কহিল, বললে, মন্থর হঠাৎ দশ হাজারের বদলে বিশ হাজার টাকা দাবী করে বলল। আমি কিছুই জানিচুম না, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্থর কি টাকার বদলে রাণী হয়েছে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন? দাসী বললে, উপায় কি নিমিষনি? ব্যাপারটা ত সহজ নয়, প্রকাশ হয়ে পড়লে যে সমাজ-জাতি-স্বল-মান সব যাবে।

মন্থর আসল কথাটা শেবকালে প্রকাশ করে দিলে, বললে, দাসী ত সে নয়, দাসী তার ভাইপো বতীন। সূতরাং কিনা মোটে যদি তাকে জাত দিতেই হয় ত বিশ হাজারের কমে পাববে না। তা ছাড়া, পরের ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া—এ কি কম কঠিন!

বতীন তার ঘরে বসে পড়ছিল, তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো হ'লো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর বললে, মিছে কথা।

শিষ্টব্য মন্থর গর্জন করে উঠল—পাজি নজ্বর নেমকহারাম। যে লোক তোকে ভাতকপড় দিয়ে কলসজে পড়িয়ে মানুষ করতে তুই তারই করলি সর্বনাশ! কি কলসাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম! ভেবেছিলাম বাপ-মা-মরা ছেলে মানুষ হবে। হি হি। এই না বলে সে বুক কপালে পটাঁপট করাঘাত করতে লাগল, বললে, একথা উবা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে, আর তুই বলিস, না!

বতীন চমকে উঠে বললে, উবাগিণি নিজে বলেছেন আমার নামে? কিন্তু তিনি ত কখনো মিথ্যে বলেন না—এত বড় মিথ্যে অপবাদ তাঁর মুখ থেকে ত কিছুতেই বার হতে পারে না।

মন্থর আর একবার গর্জন করে উঠল—ফের! তবু অস্বীকার করনি পাজি হতভাগা শরতান! জিজ্ঞাসা কর্ ভবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন্!

কর্ণা স্নায় নিয়ে বললেন, হাঁ।

বতীন বললে, মিনি নিজে করেছেন আমার নাম?

কর্ণা আবার মাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

কারণকে সে সেবতা বলে জানত, এর পরে আর প্রতিবাদ করলে না, শুদ্ধ ঘরে কিছুকাল দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কি ভাবলে সেই জানে।

রাত্রি কেউ তার খোঁজ করলে না। সকালে কে এসে তার খবর দিলে, সবাই ছুটে গিয়ে সেখানে আমাদের ভালা আত্মবলের একমেলো বতীন গলায় দড়ি নিয়ে বুলুটে।

বৈকালী কহিল, শান্তে ভাইপোর আত্মহত্যার খুড়োর অশৌচ বিধি আছে কি না জানিনে গৌসাই, হয়ত নেই, হয়ত দু'ব মিরে শুদ্ধ হয়—সে খাই হোক, শুভদিন দিন-কয়েক মাত্র পেছিয়ে গেল—তার পরে গলায়সে শুদ্ধ-ওটি হয়ে মন্থরগৌসাই, মালাভিলক ধারণ করে অধিনীর পাণ-বিষোচনের শুভসংকল্প নিয়ে নৈবীপ্তে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একদমুর্ভ মৌন থাকিয়া বৈকালী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রদীপী মালা ঠাকুরের পাদপদ্মে বিসিয়ে দিয়ে এসুম। মন্থর সশৌচ গেল কিন্তু পাগিটা উবার অশৌচ ইহকাল্যে আর খুলল না নকুলসংসারই।

কল্পিত, তার পরে—বৈকালী মুখ কিরাইয়াছিল, জবাব দিল না। কুলিলাম, একবার তাহার স্তন্যকোষের সমস্ত স্রাবিবে। মন্থরকল পর্বত ঠাকুরেই স্রাবিবে বলিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটুকু শুনিবার আগ্রহ প্রবল ইহয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত কি না তাবিতেছিলাম, বৈকুণ্ঠী আশ্রয় মদুর্কণ্ঠে নিজেই বলিল, দ্যাখো গৌসাই, পাপ জিনিসটা সংসারে এমন ভয়ঙ্কর কেন জানো?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাসমত জানি একরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুত্তরে কহিল, জানিনে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মত করে বুঝে রেখেছি গৌসাই। স্পর্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে, কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছুই আমাদের হয়নি। হলে একে এত ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না। কিন্তু তা ত নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যা, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বলো ত গৌসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনই হয়, এমনি কোরেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষ করেন।

এ নিয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপপুণ্যের উপলব্ধি অর্জন করিয়া সাধনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, এর পরে কি হ'লো?

তিনিয়া সহসা সে ব্যাকুল ইহয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বল গৌসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার ওনতে ইচ্ছে করে?

সত্যিই বলচি, করে।

বৈকুণ্ঠী বলিল, আমার ভাগ্য যে এজন্মে আবার তোমার দেখা পেলুম। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিনচারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ট হ'লো, তাকে গঙ্গায় তীরে বিসর্জন দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে এলুম। বাবা কেঁদে বললেন, আমি ত আর থাকতে পারিনে মা। বললুম, না বাবা, তুমি আর থেকে না, তুমি বাড়ি যাও। অনেক দুঃখ মিলুম, আর তুমি আমার জন্যে ভেবো না।

বাবা বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি ত মা?

বললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা করো না।

কিন্তু তোমার মা যে এখনো বেঁচে রয়েছে উবা?

বললুম, আমি মরব না বাবা, কিন্তু আমার সতীলক্ষ্মী মা, তাঁকে ব'লো উবা মরেছে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে ওনলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ পাবেন।

চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া रहিলাম। কমললতা বলিতে লাগিল, হাতে টাক ছিল, বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী ছুটে গেল—তারা যাচ্ছিল শ্রীবৃন্দাবনথামে—আমিও সঙ্গ নিলুম।

বৈকুণ্ঠী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছভাঙ্গা কতদিন কেটে গেল।

বলিলাম, তা জানি, কিন্তু কত শত বাবাছীর কত শতসহস্র চোখের দৃষ্টির বিবরণ ত তুমি বললে না কমললতা?

বৈকুণ্ঠী হাসিয়া কেলিল, কহিল, বাবাছীদের দৃষ্টি অভিশয় নির্মল, তাঁদের সম্বন্ধে অপ্রজ্ঞার কথা বলতে নেই গৌসাই।

বলিলাম, না না, অপ্রজ্ঞা নয়, অভিশয় প্রজ্ঞার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী ওনতে চাইচি কমললতা।

এবার সে হাসিল না বটে, কিন্তু চাপাহাসি গোপন করিতেও পারিল না, কহিল, যে বাবাছী ভাসোখাসে তাকে কখনো কথা বলে বলতে নেই, আমাদের বাউমের শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বহিলাস, ভবে থাক। সব কথার কাজ নেই, কিন্তু একটা বল, গৌসাইদী হারিকলাসকে বোপাক করলে কোথায়?

কমললতা সম্মুখে দাঁড় কাটরা কপালে হাত ঢেকাইল, বলিল, ঠাট্টা করতে নেই, উনি যে আমার প্রভুকে পোনাই।

ভালমেব! তুমি ওর কাছেই দীক্ষা নিলেহ?

না, দীক্ষা নিিনি কটে, কিন্তু উনি তার মতই পূজনীয়।

কিন্তু এই যে একতলি বৈকুণ্ঠী—সেবাসী না কি যে বলে—

কমললতা পুনশ্চ দাঁড় কাটরা বলিল, ওরা আমার মতই ওর বিদ্যা। ওদেরও তিনি উদ্ধার করেছেন।

বহিলাস, নিতরই করেছেন, কিন্তু পরবীরা সাধনা, না কি এমনি একটা সাধনপদ্ধতি তোমাদের আছে—তাকে ত দেখে নেই—

বৈকুণ্ঠী অম্মাকে ধামাইয়া নিয়া বলিল, তোমরা দূর থেকে আমাদের কেবল ঠাট্টাভাষাই করলে, কাছে এসে কখনো ত কিছু দেখলে না, তাই সহজেই বিভ্রূণ করতে পার। আমাদের বড়পৌসাইদী সন্ন্যাসী, ওকে উপহাস করলে অপরাধ হয় নতুনপৌসাই, এমন কথা আর কখনো মুখে এলো না।

তাহার কথা ও পাঠারবে একই অর্থভিত্তি হইলোম। বৈকুণ্ঠী ভাষা লক্ষ্য করিয়া নিতমুখে বলিল, হু'নি থাকে না পৌসাই আমাদের কাছে? কেবল বড়পৌসাইদীর জন্যেই কলি নে, আমাদের ত তুমি ভালোবাসো, আর কখনো বনি দেখা না-ও হয়, তবু ত মেখে বাবে কমললতা সত্যিই কি নিয়ে সংসারে থাকে। বতীনকে আমি আনো ছু'লিনি—হু'নি থাকে—আমি কলি তোমাকে, তুমি বখাওই হু'নি হবে।

চুপ করিয়া রহিলোম। ইহাদের সবচে একেবারেই যে কিছু জানি না তাহা নয়, আত-বোটমের মেয়ে টমরের কথাটাও মনে পড়িল, কিন্তু রহস্য করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। বতীনের প্রারম্ভভের ঘটনা সকল মাঝখানে রহিয়া রহিয়া আমাদেরও যেন উদ্ভব করিয়া দিতেছিল।

বৈকুণ্ঠী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হী পৌসাই, এ বরসে সত্যিই কাউকে কখনো কি ভালোবাসো নি? তোমার কি মনে হয় কমললতা?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হ'ল আসলে বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মত। বীথন তুমি কখনো কোন কালে নেবে না।

বহিলাস বলিলোম, প্রজাপতির উপমা ত ভাল হ'ল না কমললতা, ওটা যে অনেকটা পালাপালি ব মত ওনতে। আমার ভালোবাসার মানুষ কেবলও বনি সত্যিই কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ কখনো।

বৈকুণ্ঠীও হাসিল, কহিল, ভর নেই পৌসাই, সত্যিই যদি ওই থাকে আমার কথার সে বিশ্বাসও করবে না, তোমার মন্থাখানো কীকিও সে সরাসরীভাবে ধরতে পারবে না।

বহিলাস, ভবে ভর দূর কিসের? হেঁচ না কীকি, কিন্তু তার কাছে ত সেই সত্যি হয়ে রইল।

বৈকুণ্ঠী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না পৌসাই, বিশেষ কখনো সত্যির জারগা নিয়ে থাকতে পারে না। ভর্য মুড়কে না পারুক, করুক! ভর্যের কাছে সুশ্রুতি না হেঁচ, তবু অজ্ঞানতা ভর্যের নিরন্তর অজস্রমুখী হয়েই থাকে। বিশেষর বল দেখি ত। এমনি করে এ পথে কত লোকই এসো, এ পথ ছাড়ায় সত্যি নয়, ভর্যের ধাক্কাধে কখনো বলির মত সমস্ত সাধনাই ভর্যের ভিন্নমনি আলগা হয়ে রইল, কখনো জন্মটি বীথতে পারলে না।

একই খবর! সে যেন হঠাৎ নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, ভায়া রসের বরষ ত পার না, তাই প্রবন্ধিন নির্ভীক পুরুষের নিরাক্ষর সেনার প্রশ ভর্যের হু'নিতে হু'নিতে ওঠে, ভর্যে এ কেন মোহের মেয়ে নিজের সিন্দুর ঝিকিয়ে বসি। এদের দেখেই আমাদের ভোমরা উপহাস করতে শেখো—কিন্তু এ কি সত্যি-করম বকে ভর্যই পৌসাই, এদের আদ্যোপ প্রকাশের ছু'নি ত একটা কথাও বুঝবে না। কিন্তু এমন বসি কেই প্রকাশ্যে প্রকাশ, ছু'নি তাকে ছু'নবে, কিন্তু সে ভোমাকে প্রকাশে ছু'নবে, না

তাকে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

বীকার করিলাম যে, তাহার বক্তব্যের প্রথম অংশটা বৃষ্টি নাই, কিন্তু শেষের দিকটার প্রতিবাদে কহিলাম, তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা যে, আমাকে ভালোবাসার নামই হ'লো দুঃখ পাওয়া?

দুঃখ ত বলিনি গোসাই, বলছি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈকল্পী কহিল, না গোসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের। মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে?

কিন্তুই যদি না বৃষ্টি আমাকে বলাই না কেন?

না বলেও যে থাকতে পারিলে গো। শ্রমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়ই করতে থাকো তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা। তোমাদের ও আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা, তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। জানো গোসাই, ভালোবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মন্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থাকে না।

কি-একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে গ্রাসাই করিল না, ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, ও আমাদের সতিও নয়, আমাদের আপনও নয়। ওর ছুটোছুটির চঞ্চলতা যেদিন থাকে সেইদিনেই কেবল আমরা নিশ্চয় ফেলে পড়ি। শূণ্যে নতুনগোসাই, নির্ভর হতে পারব চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই, কিন্তু ঐ জিনিসটাই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, পাবে না নিশ্চয় জানো?

বৈকল্পী বলিল, নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়ই আমার নয় না।

আশ্চর্য হইলাম। বলিলাম, বড়ই ত তোমার কাছে কখনো করিনি কমললতা?

সে কহিল, জেনে কবেনি, কিন্তু তোমার ঐ উপসর্গ বৈরাগী মন—ওর চেয়ে বড় অহঙ্কারী জগতে আর কিছু আছে না কি।

কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি করে?

জানলুম তোমাকে ভালবেসেছি বলে।

ওনিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার দুঃখ আর চোখের জলের প্রভেদটা এতটা বুঝতে পেরেছি কমললতা। অবিশ্রাম ভাবের পূজো করে বসেই আরামনার বোধ করি এমন গুণ গাই ঘটে।

প্রশ্ন করিয়া, ভালোবেসেছো এ কি সতি কমললতা?

হী সতি।

কিন্তু তোমার জপ-তপ, তোমার কীর্তন, তোমার বাহ্যিকদিনের ঠাকুরসেবা এসবের কি হবে বল ত?—বৈকল্পী কহিল, এরা আমার আরও সতি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চল না গোসাই, সব ফেলে দু'জনে পথে পথে বেঁচিয়ে পড়ি?

বাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে হচ্ছে করে।

বৈকল্পী নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা? না, সে শুনে তোমার ৩-৬ নেই। কিন্তু সতিই কি কাল বাবে?

হী, সতিই কাল বাব।

বৈকল্পী মুহূর্তকাল জ্বল থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ আশ্রমে আবাব তুমি আসবে, তখন কিন্তু কমললতাকে আর খুঁজে পাবে না গোসাই।

আট

এখানে আর একদণ্ড থাকা উচিত নয় এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তখন কে যেন আড়ালে দাঁড়িয়া চোখ চিনিয়া ইশারাও নিষেধ করে, বলে, বাবে কেন? ছ-সাতদিন থাকবে বলেই ত

শব্দ(প্রথম বক্তা)—৩২

এসেছিলে—থাক না। কষ্ট ত কিছু নেই।

রাতে বিছানার ওইয়া ভাবিতেছিলাম, কে ইহার একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উ-টা মতলব দেয়। কাহার কথা বেশি সত্য? কে বেশি আপনায়? বিবেক, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি—এমনি কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আঁকও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল? যাহাকে ভাল বলিয়া মনে করি, ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাড়াইতে বাধা দেয় কেন? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কেন? মন বলিতেছে আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ, চলিয়া যাওয়াই কল্যাণের, তবে পরক্ষণে সেই মনের দু'চোখ ভরিয়া জল দেখা দেয় কিসের জন্য? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন—এইসব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সাধনা?

তথাপি যাইতেই ইহবে, পিছাইলে চলিবে না। এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায়বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়, কারণ প্রদর্শন নয়, প্রয়োজনের, কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়,— শুধু, আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই, এই সত্য ঘটনাটা অবিকারের ভাৱ বাহ্যদের রহিল তাহাদের পরে নিঃশব্দে অর্পণ করা।

ছির করিলাম, ঘুমোনা ইহবে না, ঠাকুরের মঙ্গল আরতি শুরু ইহার পূর্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুন্ডিল, পুটুর পনের টাকাটা ছোট ব্যাগ-সমেত কমললতার কাছে আছে, কিন্তু সে থাক। হয় কলিকাতা, নয় বর্মা ইহতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই ইহবে যে, আমাকে প্রত্যাৰ্পণ না করা পর্যন্ত কমললতাকে বাধ্য ইয়া এখানেই থাকিতে ইহবে, পথে-বিপথে বাহির ইহার সুযোগ পাইবে না। এদিকে যে কয়টা টাকা আমার জামার পকেটে পড়িয়া আছে কলিকাতায় পৌছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এমনি করিয়াই কাটিল এবং ঘুমাইব না বলিয়া বার বার সম্বন্ধ করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ মনে ইল বৃষ্টি স্বপ্নে গান গুনিতোহি। একবার ভাবিলাম রাত্রির ব্যাপার হয়ত এখনো সমাপ্ত হয় নাই; আবার মনে ইল প্রত্যুষের মঙ্গল-আরতি বৃষ্টি শুরু ইয়াছে, কিন্তু কীসার-ঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়াও ভাসে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারি না, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধুকণ্ঠের আদরের অনুচ্চ আহ্বান—‘রাই জাগো, রাই জাগো, শুক-শারী বলে, কত নিদ্রা যাও লো কালো-মানিকের কোলে’। গোসাইজী! আর কত ঘুমোবে গো—ওঠ!

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পূর্বের জানালা খোলা—সমুদ্রের অপ্রশাখার পুষ্টিও লবঙ্গ-মঞ্জরীর কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্যন্ত বুলিয়া আছে, তাহারি ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা জায়গায় ফিকে-রাসার আভাস দিয়াছে,—অন্ধকার রাতে সুদূর গ্রামান্তে আঙুন লাগার মত—মনের কোথায় কেন একটুখানি ব্যথিত ইয়া উঠে। গোটাকরেক বানুড় বোধ করি উড়িয়া বাসার ফিরিতেছিল, তাহাদের পক্ষ-তাড়নার অশ্রুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল, বুঝা গেল আর যাই হোক রাত্রিটা শেষ ইহতেছে। এটা সোয়েল, বুলবুল ও শ্যামাপাখির সেশ। হয়ত বা উহাদের রাজধানী,—কলিকাতা শহর। আর ঐ বিরাট বকুলগাছটা তাহাদের লেনদেন কাজকরাবারের বড়বাজার—দিনের বেলায় ডিড় দেখিলে অথাক ইহতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রঙ-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদের অতি বিভিন্ন সমাবেশ। আর রাতে আনন্দের চকুটিকের আলোয় ডালে ডালে তাহাদের অগণিত আচ্ছা! ঘুম-ভাসার সাড়ানখ কিছু কিছু পাওয়া গেল—তাবে বোধ ইল চোখেমুখে জল দিয়া তৈরি ইয়া লইতেছে, এইবার সমস্ত নিকসক্যাপী নাচগানের মোহেব শুরু ইহবে! সবাই এয়া লট্টোয়ের ওস্তাদ—ক্রান্তও হয় না, কদরং খায় না। ডিডরে বৈকল্যদের কীর্তনের পালা বসিবা কস্যাচিং বন্ধ হয় বাহিরে সে কলাই নাই। এখানে ট্রেইনফ, ডালোমঙ্গর বাহবিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক না থাক পান তোমাকে গুনিতোই ইহবে। এদেরই বোধ করি এইরাপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল কল সমস্ত দুপুর পিছনের বীশবনে গোট-খুই হয়-গৌরী পাখির চড়াপলার শিরা-শিরা-শিরা ডাকের অবিস্মৃত প্রতিবেশিতার আমার নিকনিদ্রার কয়েক বিয়

ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আমারি ন্যায় বিধ্বস্ত কোন একটা ডাঙ্ক নদীর কলম্বীদলের উপরে বসিয়া ততোধিক কঠিনকণ্ঠে ইহাদের বার বার ভিন্নস্বার করিয়াও স্বপ্ন করিতে পারে নাই। ভাগ্য ভাল যে এসেশে ময়ূর মিলে না, নহিলে উৎসবের গানের আসরে তাহারা আসিয়া যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়ত আর একটু নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ হইল গভরাত্রির সঙ্কল্পের কথা। কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও জো নাই—প্রহরীর সতর্কতায় মতলব ফাঁসিয়া গেল। রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই, আমার বিছানায় শ্যামও নেই—দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গানোর কি দরকার ছিল বল ত?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়িতে কলকাতা যাবার কথা। মুখহাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরি করে আনি গে। কিন্তু স্নান করো না যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়িতে যখন হোক আমি যাবো, কিন্তু তোমার এত উৎসাহ কেন বলো ত?

সে কহিল, আর কেউ ওঠার আগে আমি যে তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসতে চাই গোসাই!

স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া ঘরের এই অত্যন্ত আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা—স্নান সারিয়া বৈষ্ণবী প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পৌছে দিও! আশ্রমেই আবার ফিরে আসবে ত?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো, টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, তার পরে বলিলাম, কমললতা, তোমার মিছে এ পথে আসা। একদিন নাম ছিল তোমার উষা, আজো সেই উষাই আজ—একটুও বদলাতে পারিনি।

কেন বল ত?

তুমি বল ত কেন বললে আমাকে টাকা গুণে নিতে? গুণে নিতে পারি বলে কি সত্যই মনে করো? যারা ভাবে একরকম, বলে অন্য রকম, তাদের বলে ভণ্ড। যাবার আগে বড়গোসাইজীকে আমি নালিশ জানিয়ে যাব আশুড়ার খাতা থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টমদের কলঙ্ক।

সে চুপ করিয়া রহিল।

আমিও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ সকালে আমার যাবার ইচ্ছা নেই।

নেই? তা হলে আর একটু ঘুমাও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন?

কিন্তু এখন তুমি করবে কি?

আমার কাজ আছে ফুল তুলতে যাব।

এই অঙ্ককারে? ভয় করবে না?

না, ভয় কিসের? ভোরের পূজোর ফুল আমিই তুলে আনি। নইলে ওদের বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটা দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য কবিত্তেছিলাম যে, সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহা কর্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের 'পরেই। কিন্তু দেখে, সৌজন্যে ও সর্বোপরি সবিনয় কর্মকুশলতায় এই কর্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে, কোথাও স্বর্বা, বিদ্বেষের এতকি আবের্জনাও জমিতে পার না। এই আশ্রমলক্ষ্যটি আজ উৎকর্ষ-ব্যাকুলতায় যাই যাই করিতেছে। এ যে কত বড় দুর্ঘটনা, কত বড় নিরুপায় দুর্গতিতে এতগুলি নিশ্চিন্ত নরনারী হলিত হইয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া আমারও ক্রেশবোধ হইল। এই মঠে মাত্র দুটি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি—ইহার আত্মরিক ওভাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই যেন পারি না এমনি মনোভাব। তাবিলাম, লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম—এখানে সবাই সমান। কিন্তু একের অভাবে যে কেন্দ্রবিন্দু

উপগ্রহের মত সমস্ত আয়তনই দিবিদিক বিজিন্ন বিকল্প হইয়া পড়িতে পারে তাহা চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম, আর শোব না কমললতা, চল তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনি গে।

বৈক্যবী কহিল, তুমি জ্ঞান করোনি, কাপড় ছাড়োনি, তোমার হোঁয়া ফুলে পুজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।

বৈক্যবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ, আমি নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করতেও পারব ত? তাতেও তোমার ক্ষম লবু হবে।

এবার বৈক্যবী হাসিল, কহিল, হঠাৎ বড় দরদ যে গোসাই,—আজ্ঞা চলো। আমি সাজিটা আনি গে, তুমি ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘনছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রশ্মিকৃত শুকনা পাতায় পথের রেখা বিলুপ্ত। বৈক্যবী আগে, আমি পিছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে পা নিই! বলিলাম, কমললতা, পথ ভুলবে না ত?

বৈক্যবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জনোও আজ পথ চিনে আমাকে চলতে হবে!

কমললতা, একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ?

এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়ো না।

গেলে তোমার লোকসান কি? জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈক্যবী বলিল, মুরারিঠাকুরের একটি গান আছে,—“সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও, জীয়েন্তে মরিয়া যে আপনা খইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও”। গোসাই, বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশি বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না,—না? বলিলাম, কি জানি আগে সকালবেলাটা ত কাটুক।

বৈক্যবী জবাব দিল না, একটু পরে গুনগুন করিয়া গাইতে লাগিল,—

“কহে চণ্ডীদাস গুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাই।”

থামিলে বলিলাম, তারপরে?

তারপরে আর জানিবে না।

বলিলাম তবে আর একটা কিছু গাও—

বৈক্যবী তেমনি মৃদুকণ্ঠে গাহিল,—

“চণ্ডীদাস বাণী গুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,

পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।”

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে,

বৈক্যবী কহিল, তারপরে আর নেই, এখানেই শেষ।

শেষই বটে! দু’জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারী ইচ্ছা করিতে লাগিল ব্রহ্মপদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া চলি। জানি সে রাগ করিবে না, বাধা দিবে না, কিন্তু কিছুতেই পাও চলিল না, মুখেও একটা কথা আসিল না, যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ধীরে ধীরে নীরবে বনের বাহিরে আসিয়া পৌছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়ে ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান, ঠাকুরের নিত্যপূজার যোগান দেয়। খোলা জায়গায় অন্ধকার আর নাই, কিন্তু ফসাঁও ভেমন হয় নাই। তথালি দেখা গেল অজস্র কুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা ঘন সাপা হইয়া আছে। সামনের পাতালখরা ন্যাদা চাপাগাছটার ফুল নাই, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাফুলের রজনীগন্ধার বধূর পক্ষে সে কষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানহিয়াছে মল্লিকানটার। নিশান্তের এই কালা আলোতেও ঢেঁসা যার শাখার-

পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় ফুলপুষ্পের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকলিত সহস্র আরক্ত আঁধি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যুবে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিশ্চেষ্ট মহিমায় সকল আকাশ শাস্ত হইয়া আছে, আর এ লতায়-পাতায় শোভার-সৌরভে ফুলে-ফুলে পরিবাস্তু সমুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুস্রব্দ ভাষা।

কল্পনায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্কর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈকুণ্ঠী সাজিটা চাপাডালে বুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল—ইত্যাং তোমার হ'লো কি গৌসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময়-প্রশ্নে মনে মনে ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টাও ঠিক সফল হইল না, শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈকুণ্ঠী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গৌসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েছি, কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদুগঞ্জে গাহিতে লাগিল—“কালো মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—”

থামাইতে হইল। বলিলাম, যদুনাথ দাস থাক, ওদিকে কাঁসরের বাদি গুনতে পাচ্চো কি? ফিরবে না।

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ কহিল, “ধরম করম বাউক তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—” আচ্ছা নতুনগৌসাই। জানো মেয়েদেব মুখের গান অনেক ভালো লোকে গুনতে চায় না, তাদের ভারী খারাপ লাগে?

বলিলাম, জানি। কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্বর নই।

তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন?

ওদিকে হয়ত আরতি শুরু হয়েছে—তুমি না থাকলে যে তার অঙ্গহানি হবে।

এটি মিথ্যা ছিলনা গৌসাই।

ছিলনা হবে কেন?

কেন তা তুমিই জানো। কিন্তু এ কথা তোমাকে বললে কে? আমার অভাবে ঠাকুরের সেবার সতি্যই অঙ্গহানি হতে পারে এ কি তুমি বিশ্বাস করো?

করি। আমাকে কেউ বলেনি কমললতা—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সে আর কিছু বলিল না, কি একরকম অনামনস্কের মত ক্ষণকাল ' ' মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েছে—আর ন'।

ফুলপুষ্প তুললে না?

না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চল এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ—এদিকে বড় কেহ আসে না। তখনো পথ ছিল জনহীন, এখনো তেমনি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, তুমি কি এখন থেকে সতি্যই চলে যাবে?

বার বার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গৌসাই?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যি কেন বার বার এ কথা জানতে চাই,—জানিয়া আমার লাভ কি!

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই আগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মজল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙ্গানোর বাধ্য। এ তাঁদেরই সময়।

দু'জনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতূহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সেই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচ করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁখে। ডালটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমললতা সরেই কৌতুকে তর্জন করিয়া বলিল, হাসলি যে গোড়ামুখি?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিল না। কমললতা ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

রানাহার যথারীতি এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের পাড়িতে আমার স্বাবার কথা। বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুরঘরে, ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিলামাত্র কহিল, নতুনগৌসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করো না ভাই। পদ্মা মাথা-ঘরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনেই হঠাৎ জ্বরে পড়েচে—কি যে হবে জানিনে। এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দু'খানি কুঁচিয়ে দাও না গৌসাই।

অতএব, ঠাকুরের কাপড় কুঁচাইতে বসিয়া গেলাম, যাওয়া ঘটিল না। পরের দিনও না এবং তার পরের দিনও না। বৈষ্ণবীর প্রত্যুষের ফুল তুলিবার সঙ্গী আমি। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে একটা না একটা কিছু কিছু কাজ আমাকে দিয়া সে করাইয়া লয়। এমনি করিয়া মিনগুলি যেন স্বপ্নে কাটে। সেবার, সহৃদয়তায়, আনন্দে, আরাধনায়, ফুলে, গন্ধে, কীর্তনে, পাখির গানে কোথাও আর ফাঁক নাই। অথচ সন্দ্বিধ মন মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া ভ্রমসা করিয়া উঠে, এ কি ছেলেখেলা? বাহিরের সকল সংস্রব রুদ্ধ করিয়া গুটিকয়েক নিজীব পুতুল লইয়া এ কি মাতামাতি? এত বড় আত্মবঞ্চনায় মানুষ বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু তবু ভালো লাগে, যাই-যাই করিয়াও পা বাড়াইতে পারি না। এ মিকটায় ম্যালেরিয়া কম, তথাপি অনেকেই এই সময়টার জ্বরে পড়িতেছিল। গহর একটি দিন মাত্র আসিয়াছিল, আর আসে নাই; তাহারও বোঁজ লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারি না,—এ আমার হইয়াছে ভালো!

সহসা মনের ভিতরটা ভয় ও থিকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল—এ আমি করিতেছি কি! সমসোবে এই সবই কি সত্য বলিয়া একদিন বিশ্বাসে দাঁড়াইবে না কি? হির করিলাম, আর না—যাই কেননা ঘটুক এই জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পলাইতেই হইবে।

প্রত্যহ রাত্রিশেষে বৈষ্ণবী আসিয়া আমাকে আগায়। ভোরের সূরে বৈষ্ণবকবিরের ঘুম-ভাঙ্গানোর গান। ভক্তি ও ভালোবাসার সে কি সঙ্কল্প আবেশন! হঠাৎ সাফা মিঁই না, কান পাতিয়া শুনি। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িতে চায়। মগার তুলিয়া সে সের-জানালা খুলিয়া দেয়—রাগ করিয়া উঠিয়া বসি এবং মুখহাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গে চলি।

দিনকয়েকের অভ্যাসে অংশনি আজ ঘুম ভাঙ্গিল। ঘর অন্ধকার। একবার মনে হইল রাত্রি এখনো পোহায় নাই, কিন্তু স্পন্দে ভঙ্গিল। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম—দেখি রাত কেতখান, সকাল হইয়াছে। কে একজন খবর দিতে কমললতা আসিয়া দাঁড়াইল, এমন অস্বস্ত, অপ্রস্তুত চেহারা তাহার পূর্বে দেখি নাই।

সত্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমারও অসুখ না কি?

সে জান হাসিয়া কহিল, আজ তুমি জিতোছো গৌসাই।

কিসে হলো ত?

শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই, সময়ে উঠতে পারিনি।

আজ তবে ফুল তুলতে গেল কে?

উঠানের ধারে আখমরা একটা উপরগাছ সামান্য কয়েকটা ফুল ছিল, তাহাই দেখাইয়া কহিল, এ

কেলা যা করে হোক ওতেই চলে যাবে।

কিন্তু ঠাকুরের গলার মালা?

মালা আজ তাঁদের পরাতে পারবে না।

ওনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল সেই নিজীব পুতুলগুলার জন্যেই ; বলিলাম, স্নান করে আমি তুলে এনে দিই?

তা যাও, কিন্তু এত ভোরে নাইতে পাবে না। অসুখ করবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোসাইজীকে দেখিচি নে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তিনি ত এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

কবে ফিরবেন? সে ত জানিনে গোসাই!

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী ঘরিকদাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই—কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষ্ণবীর মুখে ওনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি। এ লোকটির মধ্যে কণ্ঠতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাস্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জন ঘরের মধ্যে কাটে। ইহার ধর্মমতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই যাদুঘটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গি এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার অহরনিশি এমন ভরপুর হইয়া আছে যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুধু সন্মোচন নয়, দুঃখবোধ হয়। আপননিই বুঝা যায় এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্ফল। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসিমুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে, কুঠায় আমার মূণ্ডে আর কথা রহিল না। তারপর হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছি, তবে একটা কৌতূহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিন্তের শাস্তি ও দেহের নির্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার রহস্য, ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কিন্তু সে সুযোগ এ যাত্রায় বোধ করি আর মিলিল না। মনে মনে বলিলাম, আবার যদি কখনো আসা হয় ত তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিশ্রহমূর্তি সচরাচর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এ আশ্রমে সে বিধি ছিল না। ঠাকুরের বৈষ্ণব পূজারী একজন বাহিরে থাকে, সে আসিয়া যথারীতি আজও পূজা করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার 'পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিত্ত হইয়া উঠে। এ কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি আজও যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধ হয়, এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, এতদিন এখানে আছি, এ বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে? সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও ত একটা কথা আছে!

আরও দুইদিন কাটিল। কিন্তু আর না। কমললতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্মা ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। ঘরিকাদাস পত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম।

গোসাইজী কহিলেন, আজ যাবে গোসাই? আবার কবে আসবে?

সে ত জানিনে গোসাই।

কমললতা কিন্তু কৈসে কৈসে সারা হয়ে যাবে।

আমাদের কথাটা এর কানেও গেছে জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কহিলাম, সে কীদেহে যাবে কিসের জন্যে?

গোসাইজী একটু হাসিয়া কহিলেন, ভূমি জানো না বুঝি?

না।

ওর স্বভাবই এমন। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়।

কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম, যার স্বভাব শোক করা সে করবেই, আমি তাকে থামাব কি নিজে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া ঘাড় ফিরিয়া দেখিলাম আমার পিছনে পড়িয়া কমললতা।

হারিকাদাস কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, ওর ওপর রাগ করো না গৌসাই, শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারেনি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক খাটিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার কাছে কাল ও নিজেই বড় দুঃখ করছিল। আর বোষ্টম-বৈরিগীর আদর-যত্ন করবার কিই বা আছে। কিন্তু আবার যদি কখনো তোমার এনিকে আসা হয় ভিখিরীদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত গৌসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমললতা সেখানেই তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অকস্মাৎ একি হইয়া গেল! বিদায়-গ্রহণের প্রাকালে কত কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিত্তের দুর্বলতার গ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু উতাত্ত্ব অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন রূপতায় যে নিজের মর্যাদা খর্ব করিয়া বসিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই!

নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গহরের খোঁজে আসিয়াছে। কাল হইতে এখনও সে গৃহে ফিরে নাই। আশ্চর্য হইয়া গেলাম,—সে কি নবীন, সে ত এখানেও আর আসে না!

নবীন বিশেষ বিচলিত হইল না, বলিল, তবে বোধ হয় কোন্ বনেবাদাড়ে ঘুরচে—নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করেছে—এইবার কখন সাপে কামড়ানোর খবরটা পেলেই নিশ্চিন্দি হওয়া যায়। তার সন্ধান করা ত দরকার নবীন?

দরকার ত জানি, কিন্তু খুঁজব কোথায়? বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রাণটা ত আর দিতে পারিনে বাবু, কিন্তু তিনি কোথায়? একবার জিজ্ঞেসা করে যেতে চাই যে?

তিনিটা কে?

ঐ যে কমললতা।

কিন্তু সে জানবে কি করে নবীন?

সে জানে না? সব জানে।

আর বিতর্ক না করিয়া উত্তেজিত নবীনকে মঠের বাহিরে লইয়া আসিলাম, বলিলাম, সত্যিই কমললতা কিছুই জানে না নবীন। নিজে অসুখে পড়ে তিন-চার দিন সে আখড়ার বাইরেও যায়নি।

নবীন বিশ্বাস করিল না। রাগ করিয়া বলিল, জানে না? ও সব জানে। বোষ্টমী কি মস্তুর জানে—ও পারে না কি? কিন্তু পড়তো একবার নব্বনের পান্নায়, ওর চোখমুখ ঘুরিয়ে কেমন করা বার করে দিতুম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া যেন ভেলকিতে উড়িয়ে দিলে!

তাহাকে শাস্ত করার জন্য কহিলাম, কমললতা টাকা নিয়ে কি করবে নবীন? বোষ্টম মানুষ, মঠে থাকে, গান গেয়ে দুটো ভিক্ষে করে ঠাকুর-দেবতার সেবা করে, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া, বৈ ত নয়—ওকে টাকার কান্দাল বলে ত আমার বোধ হয় না নবীন।

নবীন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, ওর নিজের জন্যে নয় তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্রবৎসরের মেয়ে বলে মনে হয়। তেমনি চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। বড়বাবাজীটাও লোভী নয়, কিন্তু একপাল পৃথি রয়েছে যে। ঠাকুরসেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা দি-মুখ নিত্যা চাই। নয়ন চকোস্তির মুখে কানাদুয়ার ওনচি অখড়ার নামে বিশ্বে জমি নাকি খরিস হয়ে গেছে। কিছুই থাকবে না বাবু, যা আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুকবে।

বলিলাম, হয়ত শুদ্ধব সত্যি নয়। কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চকোস্তিও ত কম নয় নবীন।

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিটলে বামুন মস্ত বড়িবাঙ্গ। কিন্তু বিশ্বাস না করি কি করে বলুন। সেদিন খাম্বকা আমার ছেলের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্র করে দিলে। অনেক মানা করলুম, জ্বললে না। বাপ কহত রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠাকুরে নিতে পারবে না? শুনুন কথা!

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ করিলাম, আমি কিসের জন্যে যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি এ কথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম, কাল কলিদাসবাবুর ছেলের খটা

করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিল না।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে একটা সন্দেহ জাগিল—বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়। সেই ভুরুগুয়ালা কলার লোকটার কতিবদল-করা স্বামিস্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর। এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষ্ণবী সেদিন কৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবে না গোসাই। রাগ করবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসে না? হয়ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই। টাকাকাড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাড়ে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিন্তাহ হইতে এই শান্ত আশ্রিতোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়।

নবীন চলিয়া গেছে, বকুলতলার সেই ভাসা বেদীটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম পাঁচটার গাড়ি ধরিতে গেলে দেরি করা আর চলে না। কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটাই এমনি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে, ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পুটুর বৌভাতে অন্নগ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরুদ্ধিষ্ট গহরের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান তখন মনা করিবার কেহ নাই। দেখি পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাকচে গোসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাসঙ্গে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পৌছিতে তোমার রাত হবে নতুনগোসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহরে মতই সম্বন্ধ আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়। উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুনগোসাই, আবার আসবে ত? তুমি থাকবে ত?

তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?

তুমিও বলো কতদিনে আসতে হবে?

না, সে তোমাকে আমি বলব না।

না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে, বলো?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না সেও তোমাকে আমি বলব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় তাবো গে গোসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই কমললতা, কাল বাবো কিন্তু কিছুতেই এ কথা বলা গেল না।

চললাম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমললতার দেখাদেখি সেও হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

বৈষ্ণবী তাহাকে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কি রে পোড়ারমুখী, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রশম কর।

কথাটায় যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের আশ্রম ছাড়িয়া ১০- বাহির হইয়া আসিলাম।

১০

আজ অবৈলয় কলিকাতার বাসরে উদ্দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি! তার পরে এর চেয়েও দুঃখময় বর্ষার নির্বাসন। ফিরিয়া আসিবার হয়ত আর সময়ও হইবে না, প্রয়োজনও ঘটবে না। হয়ত এই যাওয়াই শেষের যাওয়া। গিয়া দেখিলাম আজ দশদিন। দশটা দিন জীবনের কড়তুঁকুই বা। তথাপি মনেও মধ্যে সন্দেহ নাই দশদিন পূর্বে যে-আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং যে-আমি বিদায় লইয়া

আজ চলিয়াছি, তাহার। এক নয়।

অনেককেই সময়ে বলিতে শুনিয়াছি, অনুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছে। অর্থাৎ অনুকের জীবনটা যেন সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের মত তাহার অনুমানের পাকিতে লোম্বা নির্ভুল হিচাব। পরশিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁক-কবার বাহিরে দুনিয়ার আর কিছু নাই। জানেও না সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়, একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয় তাহাদের নিরূপণ বুঝিতে যাওয়া কৃথা। এখানে একটা নিষেধও তীব্রতায় তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বনবাগাড়ের মধ্য দিয়া এপথ-ওপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্টেশন চলিয়াছিল। অনেকটা ছেলেবেলার পাঠশালাে স্বাভাবিক মত। ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—ওধু জানি ওখানে পৌছিলে বন্ধন হটুক গাড়ি একটা ছুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলোই যেন চেনা। যেন কতদিন এপথে কতবার জানাগোনা করিয়াছি। ওধু আগে ছিল সেগুলো বড়, এখন কি করিয়া যেন সঙ্গীর্ণ এবং ছোট হইয়া গেছে; কিন্তু এ না বায়েনের গলায়-দড়ের বাগান। তাই ত বটে! এ যে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার শেখশ্রীষা দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শুলের ব্যথায় এ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মত এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলার চোখে পড়িলে গারে কীটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই একসৌড়ে হানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনিই আছে। তখন মনে হইত এই অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মত, স্নাতা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুলগাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে রাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরমস্নেহে একবার তাহার গারে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সন্ন্যাসের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিলম্ব লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে সৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।

সারি সারি অনেকগুলো বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হরত এটুকু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় পরিচিত ভারী একটা রিট গন্ধে চক্ষু লাগিল—এদিক-ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল—বাঃ! এ যে আমাদের সেই যশোলা বৈকুণ্ঠীর আউশফুলের গছ! ছেলেবেলার ইহার জন্য যশোদার কত উন্মেষারিই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এমিকে মিলে না, কি জানি সে কোথা হইতে আনিয়া তাহাদের আশিনার একধারে পুতিয়াছিল। টাঙ্গা-বীকা পাঁচ-ভরা বুড়া মানুষের মত তাহার চক্কর—সেদিনের মত আড়ৎ তাহার সেই এককিয়ার সঙ্গীত থাথা এবং উর্ধ্ব ওষ্ঠকরক স্নগ্ধ গাড়ার স্নগ্ধ ভেমনি ওষ্ঠকরক স্নায় স্নায় ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার বাবীর সমাধি। বেটীরাচক্করকে ভাঙরা দেনি নাই, আরোহের জন্মের পূর্বেই তিনি শোণোকে লওনা হইয়াছিলেন। তাহারই ছোট স্নায়াকী সোফারটি তখন থিবা চালাইত। সোফার ত নয়, একটা ডালার ভরিয়া যশোলা মালা-দুপ্টি, আঁর্শি-চিকনি, আলতা, ভেলের রশ্মা, কাঁচের পুতুল, টিনের বীশি প্রভৃতি লইয়া স্নায়বেলার বাড়ি বাড়ি বিক্রি করিত। আর ছিল তাহদের বাহু পরিবার স্নায়-স্নায়ের। বড় ব্যাপার নয়, দু-এক পরস্না স্নায়ের ডোরকীটা। এই বিনিকে বন্ধন-তখন তাহাকে ঘরে দিয়া আররা উৎপাত করিতাম। এই আউশগাছের একটা শুকনো ডালের উপর রক্তা দিয়া জায়গা করিয়া যশোলা স্নায়বেলার প্রাণ নিত। ফুলের জন্য আররা উপহাস করিলে সে সন্ন্যাসিটি দেখাইয়া বলিত, না কখনোচক্কর, ও আররার দেবতার ফুল, ফুলে তিনি রাগ করেন।

বৈকুণ্ঠী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানি না—হরত, খুব বেশিদিন নয়। চোখ পড়িল গাছের

একথারে আর একটি ছোট মাটির টিন, বোধ হয় বশোদারই হইবে। খুব সম্ভব, সুদীর্ঘ প্রতীকার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু হান করিয়া লইয়াছে। ঘুপের ঠোঁড়া-মাটি অধিকতর উর্বর হইয়া কিছুটা ও বনচাঁড়ালের গাছে গাছে সমাজ্য হইয়াছে—যত করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই বৈশবের পরিচিত বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখি, সন্ধ্যা-সেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া এবং তাহার উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও ফেরনি তেলে তেলে কালো হইয়া।

বশোদার ছোট্ট ঘরটি এখনো সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই—সহস্র ছিন্নময় শতজীর্ণ খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হাড়ি বাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণপণে আগলিয়া আছে।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। কাকির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুহানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে। কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করণ বস্তু তখনও দেখার বাকী ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্যে হইতে ভাল্লা চালের নীচে দিয়া শুড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার-প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়। কিন্তু কষ্ট এত কীর্ণ যে, সে তাহার মুখেই বাখিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করিনি ত?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না, এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস ?

হত্যা করে সে শুধু মলিন চোখ দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাকে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাজা পাড়েন সেলাইকরা বগলস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটীরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও ঐচ্ছিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পান্ডার ঢুকিয়া কাড়িয়া বুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিকও এ পায় নাই—অনপনে অর্থাপনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারী বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত তাবে কোথাও না কোথাও পিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি এমনি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

বাঁহবার পূর্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটার একবার দৃষ্টি দিয়া লাইলানঃ অন্ধকারে দেখা কিছুই
গেল না, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা-রানী ইহাতে আরঃ করিয়া নানা জাতীয়
দেবদেবতার প্রতিমূর্তি নূতন কাপড়ের গাঁট ইহাতে সংগ্রহ করিয়া বশোদা ছবির শব্দ মিটিত। মনে
পড়িল হেলেকেলার মুখ ঢকে এতলি বহবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেয়ালের কাদা মাখিয়া
এতলি আজও কোনমতে টিকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে ডেমনি দুর্দশার পড়িয়া সেই রঙ-করা হাড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার বাতিল, সেখানারই সেকথা আমার মনে পড়িল। আরও কি কি যেন এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে অন্ধকারে ঠাঠর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে শ্রাবণে কিসের যেন ইমিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ির এক কোণে এ যেন মৃতশব্দও পরিভাষ্য খেলাঘর। গৃহস্থালীর নানা ভাষাচোরা জিনিস দিয়া বস্তুর রচিত তাহার এই কুৎসব্দসোঁটকে সে ফেলিয়া গেছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার কাড়ামোড় করিবার জাগিল গেছে কুরাইরা—পড়িয়া ৬ শুণ্ড কেবল জঙ্গলতলা কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।—সেই কুরুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থাকিল। বতকশ শোঁ গেল যেনিলাম সে-বেচারি এইসকল একদুটে চাহিয়া পড়িয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আও বাড়িয়া বিসার দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কেন? বহুদীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে কিরীষে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙা ঘরে। এ সবসোঁটে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই

কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বৃকের ভিতরটা হঠাৎ হ-হ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমন দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম, কেন এমন হয়? আর কোন একটা দিনে এসব সেবিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, কিন্তু আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাক্রান্ত, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারাজ্ঞ অজ্ঞবথারায় কাটিয়া পড়িতে চায়।

স্টেশনে পৌঁছিয়া। ডাণ্ডা সুপ্রসন্ন, তখনি গাড়ি মিলিল। কলিকাতার বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে না। টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশি বাজাইয়া সে যাত্রা শুরু করিল। স্টেশনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজলচক্ষে বার বার কিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয় না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল—দশটামিন মানুষের জীবনের কতটুকু, অথচ কতই না বড়! কাল প্রভাতে কমললতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তার পরে চলিবে তাহার সারাদিনের ঠাকুরসেবা। কি জানি, মিনশপেকের সাথী নতুনগোসাইকে তুলিতে তাহার ক'টা দিন লাগিবে।

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুবেই আছি গোসাই। বার পাদপায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি, দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

তাই হোক। তাই যেন হয়।

হেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষণও নাই, জোর করিয়া কোন-কিছু কামনা করিতেও জানি না—সুখ-দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র। তথাপি এতটাকাল কাটিল শুধু পরের দেখাদেখি পরের বিশ্বাসে ও পরের হুকুম তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে মিয়া সুনির্বাচিত হয় না। বিধায় দুর্বল সকল সত্ত্বর সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠাকুর খাইয়া পথের মধ্যে ভাসিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ওই অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অঙ্গরবাসী অপরিচিত বহু অশ্রুত ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়ে গেছেন! বার বার রাগ করিয়া মুখ কিরাইলাম, বার বার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈরাগী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিত্ত্বের অক্ষরগুলোর গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক মিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই সেওয়া স্বীকৃতির সূত্র—মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে বাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল, চলোনা গোসাই এখানে থেকে যাই, গান গেয়ে পথে পথে দু'জনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই, কিন্তু আমার বাধিল। আমার নাম দিল সে নতুনগোসাই। বলিল, ও নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোসাই। তাহার বিশ্বাস আমি তাহার পত জীবনের বড়। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে সাধনায় তাহার বিশ্বাসটিবে না। বৈরাগী হারিকন্দাসের শিষ্য সে, কি জানি কোন সাধনার সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন!

অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহ ও স্বার্থে বিশ্রামিণি সেই কঠিন লিপি। ভবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচ্ছেদে সে আমার শেষ হইয়াছে। হস্ত এ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া নিতে কি কোথায় কেহ আছে? জানালায় বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে কত কথা কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শিকারের আয়োজনে কুমার সাহেবের সেই ঐর্ষ্য, সেই দলবল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন, দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিশ্ববিশুদ্ধ দৃষ্টি। যে মরিয়াছে বলিয়া জানিতাম তাহাকে চিনিতে পারি নাই—সেমিন ক্ষণপন্থে তাহার সে কি স্বপ্ন-ব্যাঙ্কল মিনতি। শেষে কৃত্ত হতম্বালে সে কি তীব্র অভিমান! পথরোধ করিয়া কহিল, বাবে কলসেই তোমাকে যেতে দেব নাকি? কই যাও ত সেবি। এই বিশেষে বিশদ ঘটনায় দেখবে কে? ওরা, না আমি?

এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার

বুটিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল না।

আরায় পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া গুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়িতে আসিয়া ছুরে পড়িলাম। এখানে সে আসিতে পারে না—এখানে সে মৃত—এর বাড়ি লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম সে গুই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তারপরেও বাঁচিতে বলা নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানি না বলিয়া নয়—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণে এই প্রশ্নর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ ব্রিঙ্ক সুকোমল আশ্রমবাসী কমললতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ। ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া? কি হইবে আমার চাকরিতে? নতুন ত নয়—সেদিনই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হইবে? কেবল কমললতাই ত বলে নাই, ছারিকাগৌসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বন্ধনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়? কি এ আশ্রমে কোন সত্যই নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি, বলিয়াছি সব ভুয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস ও উপহাসকেই মূলধন করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে কবে লাভ করিয়াছে?

গাড়ি আসিয়া হাণ্ডা স্টেশনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায় থাকিয়া জিনিসপত্র বা-কিছু আছে, দেনা-পাওনা যা-কিছু বাকী, সমস্তই চুকাইয়া দিয়া শালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। রহিল আমার চাকরি, রহিল আমার বর্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম—রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটো ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে সুপরচিত কঠোর ডাক আসিল, বাবু এসেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাইলাম—রতন, কখন এলি?

এসেছি সজ্জাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া—আলিসিতে একটুখানো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বেশ করেছিলে। খাওয়া হয়নি ত?

আজ্ঞে না।

ভবেই দেখি মুক্তি ফেললি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন বেশি হইয়া কহিল, তবে ত ভালই হয়েছে। আপনার প্রসাদ পেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারব।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাগতে বিনয়ের অবতার। কিছুতেই এড়াতে হয় না। মুখে বলিলাম, তা হলে কাছাকাছি কোন দোকান খুঁজে দাখ যদি প্রসাদের যোগাড় করে আনতে পারিস, কিন্তু ওভাগমন হ'লে কিসের জন্যে? আবার চিঠি আছে নাকি।

রতন কহিল, আজ্ঞে না। চিঠি লেখালেখিতে অনেক ভজকটো। বা বলবার তিনি মুখেই বলবেন।

তার মানে আবার আমাকে যেতে হবে নাকি?

আজ্ঞে, না। না নিজেই এসেছেন।

ওনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই রাতে কোথায় রাখি, কি বন্দোবস্ত করি ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু কিছু ত একটা কাজ চাই; জিজ্ঞাসা করিলাম, এসে পর্যন্ত কি ঘোড়ার গাড়িতেই বসে আসেন

নাকি?—রতন হাসিয়া কহিল, মা সেই মানুষই বটে। না বাবু, আমরা চারদিন হ'লো এসেছি—এই চারটে দিনই আপনাকে নিম্নরাত পাছারা নিচি চলুন।

কোথায়? কতদূরে?

দূরে একটু বটে, কিন্তু আমার গাড়ি ভাড়া করা আছে, কষ্ট হবে না।

অতএব, আর একলক্ষা জামা-কাপড় পরিয়া দরজার তাল খুলিয়া যাত্রা করিতে হইল। শ্যামবাজারের কোন একটা গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ি, সুমুখে ঐটিরঘেরা একটুখানি ফুলের বাগান। রাজলক্ষীর বুড়া দরোয়ান দ্বার খুলিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল; তাহার আনন্দের সীমা নাই—ঘাড় নাড়িয়া মস্ত নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবুজী?

বলিলাম, হী তুলসীদাস, ভালো আছি। তুমি ভালো আছ?

প্রত্যুত্তরে সে তেমনি আর একটা নমস্কার করিল। তুলসী মুন্সের জেলার লোক, জাতিতে কুমী, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে সে বরাবর বাঙ্গলা রীতিতে পা ছুঁইয়া শ্রদ্ধা করে।

আর একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদের শব্দ-সাড়ার বোধ করি সেইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, রতনের দ্রুত তাড়ায় সে বেচারি উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অকারণে অপরকে ধমক দিয়া রতন এ বাড়িতে আপন মর্যাদা বহাল রাখে। বলিল, এসে পর্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রুটি সঁটিচো বাবা, তামাকটুকু পর্যন্ত সেজে রাখতে পারনি? যাও জলদি—

এ লোকটি নূতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে ফুল-কাটা জালিম ও গোটা-দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহুব্যবহৃত অভ্যস্ত শ্রিয় গুড়গুড়িটি এবং ইহারই অনূরে সমস্ত রাখা আমার জরির কাজ করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষীর নিজের হাতে বোনা, হরিহরসহলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটিও খোলা এ-ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতর দিয়া উকি দিয়া দেখিলাম একধারে নূতন-কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেমনি নূতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়-জামা। গঙ্গামাটিতে যাইবার পূর্বে একগুলি তৈরি হইয়াছিল। মনেও ছিল না, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা!

বাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া শ্রদ্ধা করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট মিলুম।

কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থদেহে ওঁকে যে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেছি এই আমার ঢের। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষীকে নূতন চোখে দেখিলাম। সেহে রূপ ধরে না। সেদিনের নিয়্যাতীকে মনে পড়িল, শুধু করেকটা বছরের দুঃখ-শোকের বড়জলে স্নান করিয়া যেন সে নবকলমের ধরিয়া আসিয়াছে। এই মিনচায়েকের নূতন বাড়িটার বিলি ব্যবস্থায় বিস্তৃত হই নাই, কারণ তাহার একটা কোনার গাছতলায় বাসাও সুশৃঙ্খলায় সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু রাজলক্ষী আপনাকে আপনি যেন এই ক'দিনেই ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে সমস্ত খুলিয়া ফেলিল—যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে—গোটা কয়েকমাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেতলা অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরনের কাপড়খানা ধাশী নয়—সাধারণ মিলের শাড়ি—অট্টপোরে, ঘরে পরিবার। যাত্রার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল পালের আশেপাশে কুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহার শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষী বলিল, কি অত দেখচ?

দেখছি তোমাকে।

নতুন নাকি?

তাই ত মনে হচ্ছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

না।

মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। নিলে কি করবে বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া উঠিল, কহিল, হুঁড়ে ফেলে দেবে না ত?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, দিয়েই দেখ না। কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচ না কি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, রতন আগে যাক, তারপরে তোমাকে দেখাচ্ছি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি। কিন্তু বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার-পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুটুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে? জানো, রাতদিন আমার কি করে কেটেছে?

হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানব কি করে?

হী গো হী, হঠাৎ বৈ কি! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক নিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাব। ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেব? রাত বারোটো হয়ে গেল।

বারোটো শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি নিজে যাচ্ছি। ভুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা করে দে।

খাঁততে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেবের দিনগুলার কথা মনে পড়িল। তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন রাজলক্ষ্মীর বৌজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না—রান্নাঘরে তাহার নিজেব যাওয়া চাই। কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, গুটা ছিল বিকৃতি। কারণ যাহাই হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাজ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুটুর বিয়ে কেমন হ'লো?

বলিলাম, চোখে দেখিনি, কানে শুনেছি ভালোই হয়েছে।

চোখে দেখনি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

বিবাহের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম, শুনিয়া সে কক্ষকাল গালে হাত দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক করলে। আসবার আগে পুটুকে কিছু একটা যৌতুক দিয়েও এলে ন

সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেরেটাকে কিছু পাঠিয়ে দেব কিন্তু ছিলে কোথায় বললে না?

বলিলাম, মুরারিপুরে বাবাজীদের আশড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বৈ কি। বোহুদীর। ওখান থেকেই ত পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসত। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

সেইখানেই ছিলাম।

শুনিয়া কেন রাজলক্ষ্মীর পায়ে কাঁটা নিল—সেই বোহুদরের কথা? মা গো মা—বল কি গো? তাদের যে ওনেচি সব ভয়ভয় ইমুতে কাও! কিন্তু বলিয়াই সহসা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল, তা তোমার অসখি আজ নেই। আরায় যে মূর্তি দেখেচি! মাথার জট পাকানো, গা-ময় রুম্মাকির মালা, হাতে পেতলের বালা—সে অপরাধ—

কথা শেষ করিতে পারিল না, হাসিয়া জুটাইয়া পড়িল। রাগ করিয়া তুলিয়া বসাইয়া নিলাম। অবশেষে বিবাহ খাইয়া মুখে কাপড় পুজিয়া অনেক কষ্টে হাসি ধামিলে বলিল, বোহুদীর কি বললে তোমার? নাক-ঝাঁক উকিপর অনেকগুলো সেখানে থাকে যে গো।

আর একটা ভেঁমনি প্রবল হাসির ঝাঁক আসিতেছিল, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, এবার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেব। কাল চক্করদের সামনে মুখ বার করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, মুখে বসিল, সে তোমার মত বীরপুরুষের কাজ নয়। নিজেই লজ্জায় বেরুতে পারবে না। সংসারে তোমার মত ভীতু মানুষ আর আছে নাকি?

বলিলাম, কিছুই জানো না লক্ষ্মী। তুমি অবজ্ঞা করলে, ভীতু বলে, কিন্তু সেখানে একজন বৈকুণ্ঠী বলত আমাকে অহঙ্কারী—দান্তিক।

কেন তার কি করেছিলে?

কিছুই না। সে আমার নাম দিয়েছিল নতুনগৌসাই। বলতো, গৌসাই, তোমার মত উদাসীন বৈরাগী-মনের চেয়ে দান্তিক মন পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

রাজলক্ষ্মীর হাসি খামিল, কহিল, কি বললে সে?

বললে, এরকম উদাসীন, বৈরাগী-মনের মানুষের চেয়ে দান্তিক ব্যক্তি দুনিয়ায় আর খুঁজে মেলে না। অর্থাৎ কি না আমি দুর্ধর্ষ বীর। ভীতু মোটেই নই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল। পরিহাসে কানও দিল না, কহিল, তোমার উদাসীনতার খবর সে মাগী পেলে কি করে?

বলিলাম, বৈকুণ্ঠীদের প্রতি ওরূপ অশিষ্ট ভাষা অতিশয় আগন্তিকের।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা জানি। কিন্তু তিনি তোমার নাম শুনে নতুনগৌসাই—তার নামটি কি? কমললতা। কেউ কেউ রাগ করে কমললতাও বলে। বলে, ও জাদু জানে। বলে ওর কীর্তনগানে মানুষ পাগল হয়। সে যা চায় তাই দেয়।

তুমি শুনেচো।

শুনেছি। চমৎকার।

ওর বয়েস কত?

বোধ হয় তোমার মতই হবে। একটু বেশি হতেও পারে।

দেখতে কেমন?

ভালো। অন্ততঃ মন্দ বলা চলে না। নাক-ঝাঁদা, উজ্জ্বল পুরা যাদের তুমি দেখেচ তাদের দলের নয়। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেছি। যে ক'দিন ছিলে তোমাকে যত্ন করত ত? বলিলাম, হাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা করুক। যে সাধি-সাধনায় তোমাকে পেতে হয় তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টম-বৈরাগীর কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাব কোথাকার কে এক কমললতাকে? হি! এই বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিশ্বাস পড়িল। বোধ হয় একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে ঝাঁপ হইল। মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিত্ত হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতোছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ছায়াটা তার মস্তবড় বীভৎস জন্তুর মত কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও কত গুলেই না কায়টাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ডর দিয়া বুকিয়া বসিল। হাত দিয়া সেবিলাম তাহার কপালের চুলগুলো ভিজা। বোধ হয় এইমাত্র চোখেমুখে জল দিয়া আসিল। প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এরকম কলকাতায় চলে এসে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চকিবিশ ঘণ্টাই এমন মন কেমন করতে লাগল যে কিছুতেই-কিভাবে পারলুম না, ভয় হ'লো বৃষ্টি হার্টফেল করবো—এজন্মে আর চোখে দেখতে পাব না, এই বলিয়া সে গুড়গুড়ির নলটা আমার মুখ হইতে সরিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। বলিল, একটু থামো। ঝুঁঝোর জ্বালায় মুখ পর্বত দেখতে পাইনে এমনি অজ্ঞকার করে তুলেচো।

গুড়গুড়ির নল গেল, কিন্তু পরিবর্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠোর মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু স্নান হাসিয়া কহিল, বোমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা বলে তাই।

তার বেশি কিছু নয়?

কিছু নয় তা বলিলে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পারো শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি দুঃখ কখনো তোমাকে দিয়েছি লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুড়িয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্যন্ত কত দুঃখই না দিলুম। নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের ওপর তোমার অসম্মান হতে দিলুম—তার শাস্তি এখন তাই দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে চলছে। দেখতে পাচ্ছ ত?

হাসিয়া বলিলাম, কই না!

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাহলে মস্তুর পড়ে কেউ দু'চোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ করেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মত কারো কখনো দেখেছো? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো না, কোথা থেকে এসে ছুটল ধর্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে তেলে দিলুম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হ'লো না, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলুম।

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া মুছাইয়া দিলে বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুতে এঁধবার তাতে ফল, ধরল। খেতে পারিলে, শুতে পারিলে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয় তার মাথামুণ্ড নেই—গুরুদেব তখনো বাড়িতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা, সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশ হাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলুম কই? মনের মধ্যে ঠ-ঠ কবে, পুজোয় বসলেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ শশা পড়ল।

কে ধরলে—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

হী গো দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

তাই দিও, তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দু'দিন কাটল। কোথা দিয়ে যে কাটল জানিনে। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলুম। গঙ্গামান করে অমূল্য মন্দিরে দাঁড়িয়ে বললুম, মা, চিঠিখানা সময় থাকতে যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আশ্বহত্যা না মরতে হয়।

আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন বলো ত?

সহসা এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারিনে, বুঝতেও পারিনে।

স্বীকার করো?

করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় একমুহূর্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই বিশ্বাস করো? এ আমাদেরই সম্ভব, পুরুষে সত্যিই পারে না!

কিন্তু কখন পর্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মনে... থেকে বেরিয়ে বেশি আমাদের পাটনার লছমন সাউ। আমাকে সে বারাগসী কাপড় বিক্রী করত। বুড়ো আমাকে বুড়ো ভালোবাসত, আমাকে বেটা বলে ডাকত। আশ্চর্য হয়ে বল, বেটা, আপ ইহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতুম, বললুম, সাউজী, আমি কলকাতায় যাব, আমাকে একটি বাড়ি ঠিক করেদিতে পার?

সে বললে, পারি। বাঙ্গালীপাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ি ছিল, সত্যায় কিনেছিল; বললে, চাও ত লড়িটা আমি সেই টাকাতাই তোমাকে দিতে পারি।

সাউজী ধর্মভীর লোক, তার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজী হয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে

টাকা নিলুম, সে হাট্টিল লিখে দিলে। তারই লোকজন এসব জিনিসপত্র কিনে নিয়েচে। হু-সাতদিন পরেই রতনকে ফেরা নিয়ে এখানে চলে এলুম, মনে মনে বললুম, যা আরপূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করো, নইলে দুঃখের কথাই বীত না। দেখা তাঁর আমি পাবই। এই ত দেখা পেলুম।

বলিলাম, কিন্তু আমাকে যে শীঘ্রই বর্মী বেতে হবে লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ ত চল না। সেখানে অন্তরা আছে, দেশের বুদ্ধদের বড় বড় মনির আছে—এসব দেখতে পাব।

কহিলাম, কিন্তু সে যে বড় নোংরা দেশ লক্ষ্মী, গুচিবাসুপ্রভদের বিচার-আচার থাকে না—সে দেশে তুমি যাবে কি করে?

রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর সুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি একটা কথা বলিল, ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চোঁচিয়ে বলো ওনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপর অসাড়ে মত তেমনিভাবেই পড়িয়া রহিল। ওখু তাহার উক ঘন নিবাস আমার গলার উপরে, গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

দল

ওগো, ওঠো! কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হ'লো—কত ঘুমোবে?

পাশ কিরিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই ত সব ওঠেছি।

কানে গেল টেবিলের উপর চাবের বাটো রতন ঠক করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লক্ষ্যের পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হি-হি, কি বেহায়া তুমি! মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো। নিজে সারারাত কৃতকর্মের মত ঘুমোলে, বরঞ্চ আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে পরমে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার আমাকেই এই কথা! ওঠো বলচি, নইলে পায়ে জল ঢেলে দেব।

উঠিয়া বলিলাম। বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা। সকালের সেই ব্রিঙ্ক আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরাধ সূঁচিই চোখে পড়িল। তাহার রান, পূজা-আঙ্গিক সমাপ্ত হইয়াছে, গলার ঘাটে উড়ে-পাওয়ার দেওয়া খেত ও রক্ত-চক্ষনের তিলক তাহার ললাটে, পরশে নূতন রাসা বরাণসী শাড়ি, পূর্বের জানালা দিয়া একটুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপাহাসি তাহার চোঁচের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আবৃত্তিকৃত দু-মুটির নীচে চঞ্চল চোখের দুটি কেন উজ্জ্বল আবেশে ঝলমল করিতেছে—চাহিয়া আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অত দেখচো বলো ত?

কহিলাম, তুমিই বলো ত কি অত দেখচি?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচো এর চেয়ে পুঁটু দেখতে ভালো কিনা, কমলালতা দেখতে ভালো কিনা—না?

বলিলাম, না। রূপের নিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছে লাগে না সে এমনিই বলা যায়। অত করে দেখতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে যাক পে। কিন্তু ওসে?

ওসে? সে বিষয়ে অকণ্ঠ মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা বানভেই হবে।

ওদের মধ্যে ত ওনজুম কেন্দ্র করতে পারে।

হী, চমৎকার।

চমৎকার—তা তুমি বুঝলে কি করে?

যা—তা আর বুঝিনে? বিত্তহীন ডাল, লর, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে?

বলিলাম, তাল তাকে বলে ছেলেবেলায় যা তোমার পিঠে পড়ত। মনে নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে। কাল খামকা তোমায় ভীতু বলে অপবাদ দিয়েছি বৈ ত নয়, কিন্তু কমললতা শুধু তোমার উদাসীমনের খবরটাই পেলে, তোমার বীরত্বের কাহিনীটা শোনেনি বুঝি?

না, আশ্চর্যসংস্রা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো। কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে? সেই যে পাঠশালার ছুটি হলে তুমি গাইতে, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্বোধন রে—এ—এ—এ—হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বড় ভাবের গান। তোমার মুখে শুনে গোন্ধ-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়ত—মানুষ ত কোন ছার।

রতনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আবার চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি মা, তৈরি হতে দেরি হবে না। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চায়ের বাটিটা হাতে তুলিয়া লইল।—রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিল, আর দেরি করো না, ওঠো। এবার চা ফেলা গেলে রতন খেপে যাবে! ওর অপব্যয় সহ্য হয় না। কি বলিস রতন?

রতন জাবাব দিতে জানে। কহিল, আপনার না সইতে পারে মা, কিন্তু বাবুর জন্যে আমার সব সয়। এই বলিয়া সে বাটিটা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইলে রাজলক্ষ্মীকে সে ‘আপনি’ বলিত, না হইলে ‘তুমি’ বলিয়া ডাকিত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, রতন তোমাকে সত্যি বড় ভালোবাসে।

বলিলাম, আমারও ‘ঠাই মনে হয়।

হাঁ। কাশী থেকে তুমি চলে এলে ও খগড়া করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। রাগ করে বললুম, আমি যে তোর এত করলুম রতন, তার কি এই প্রতিফল? ও বললে, রতন নেমকহারাম নয় মা। আমিও চললুম বর্মায়, তোমার স্বগ আমি বাবুর সেবা করে শোধ দেব। তখন হাতে ধরে, খাট মেনে তবে ওকে শাস্ত করি।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে তোমার বিয়ের নেমডঙ্ক পত্র এলো।

বাধা দিয়া বলিলাম, মিছে কথা বলো না। তোমার মতামত জানার জে—

এবার সেও আমাকে বাধা দিল, কহিল, হাঁগো হাঁ, জানি। রাগ করে যদি লিখতুম করো গে—করতে ত?

না।

না, বৈ কি। তোমরা সব পার।

না, সবাই সব কাজ পারে না।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে মনে কি বুজবে, কেবলি দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দু’চোখ ছলছল করে আসে। তারপরে, তার হাতে যখন চিঠির জবাব নিলুম তাকে ফেলতে, সে বললে, না, এ চিঠি ডাকে ফেলতে পারব না—আমি নিজে নিজে যাব হাতে করে। বললুম, মিথ্যা কতগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি বাবা? রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েছে আমি জানিনে মা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হ— যেন পদ্মাতীরের তলা করে গেছে—গাছপালা, বাড়িঘর নিয়ে কখন যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! তোমার দয়ার আমারও আর অভাব নেই মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারব না, কিন্তু বিশ্বনাথ মুখ তুলে বদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিযো, সে বর্ডে যাবে। বলিলাম, স্বাস্থ্য নাপড়ে কি সেয়ানা!

ওনিয়া রাজলক্ষী মুখ টিপিয়া শুধু একই হাসিল। বলিল, কিন্তু আর বেশি ক'রো না দাও।
দুপুরবেলা আমাদের সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল পরনে ছিল আটশোরে কাপড়, আজ
সকাল থেকে বারান্দা শাড়ির সমারোহ কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন?

আমি জানিনে।

নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

তা পারি। বর্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষী বলিল, সেদিন আমি ডেবে রেখেছিলুম জীবনের সবচেয়ে বড় মিনটিতে এটি পরব—

তা ছাড়া কখনো পরব না।

তাই পরছ আজ?

হী, তাই পরেছি আজ।

হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু সে ত হয়েছে, এখন ছাড়ো গে!

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখনি নাকি কালীঘাটে যাবে।

রাজলক্ষী অশ্চর্য হইয়া কহিল, এখনি? সে কি করে হবে? তোমাকে বাইরে-দাইরে ঘুম পাড়িয়ে
রেখে তবে ত ছুটি পাব।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বলছিল তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু
কাল দুটিখানি খেয়েছিলে, আবার আজ থেকে শুরু হয়েছে উপবাস। আমি কি স্থির করেছি জানো?
এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখব, যা খুশি তাই আর করতে পাবে না।

রাজলক্ষী হাসিমুখে বলিল, তা হলে ত বাঁচি গো মশাই! বাইদাই থাকি, কোন কষ্টটি পোহাতে
হয় না। কহিলাম, সেইজন্যেই আজ তুমি কালীঘাট যেতে পাবে না।

রাজলক্ষী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, শুধু আজকের দিনটি আমাদের ভিকে
দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব-বাদশাহের যেমন কেনা-বাঁধী থাকত তার বেশি তোমার কাছে
চাইব না।

এত বিনয় কেন বলো ত?

বিনয় ত নয়, সন্ততি। আপনার ওজন বুঝে চলিনি, তোমাকে মানিনি তাই অপরাধের পরে অপরাধ
করে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই লক্ষীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই—
নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের দিনটির জন্য কিছু দাও,
আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে।

বলিলাম, না হয় কাল যেরো। নিজেই বললে সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেছে—আজ
তুমি বড় শ্রান্ত।

রাজলক্ষী বলিল, না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই যেখনি রাতের
পর রাত জেগেও তোমার সেবার আমার কষ্ট হয় না। কিসে আমার সমস্ত অবসাদ যেন মুছে নিয়ে
যায়। কতদিন হ'লো ঠাকুর-সেবতা তুলে ছিলুম, কিছুতে যেন নিতে পারিনি—লক্ষীটি, আজ আমাদের
মানা ক'রো না—যাবার কিছু দাও।

তবে চলো, দু'জনে একসঙ্গে বাই।

রাজলক্ষীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, তাই চলো। কিন্তু মনে মনে ঠাকুর-
সেবতাকে ভাবিয়া করবে মা ত?

বলিলাম, শপথ করতে পারব না, বরঞ্চ তোমার পথ চেয়ে আমি যন্ত্রের দোরে লীড়িয়ে থাকব।
আমার হয়ে সেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিয়ো।

কি বর চাইব বলো।

অন্নের গ্রাস মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কামনাই বুঝিয়া পাইলাম না। সেকথা

বীকার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, তুমি বলো ত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইব আয়, চাইব বাস্তু, আর চাইব আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হতে পার, প্রব্রু দিয়ে আর যেন না আমার তুমি সর্বনাশ করো। কর্তেই ত বসেছিলে।

লক্ষ্মী, এ হ'লো তোমার অভিমানের কথা।

অভিমান ত আছেই। তোমার সে চিঠি কখনো কি ভুলতে পারব!

অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম।

সে হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তা বলে এও আমার সয় না। কিন্তু কঠোর হতে ত তুমি পারবে না, সে তোমার স্বভাব নয়, কিন্তু একাজ আমাকে এখন থেকে নিজেই করতে হবে, অবহেলা করলে চলবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কাজটা কি? আরও বাড়া উপোস?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, উপোসে আমার শাস্তি হয় না, বরং অহঙ্কার বাড়ে। ও আমার পথ নয়।

তবে পথটা কি ঠাওরালে?

ঠাওরাতে পারিনি, বুজে বেড়াচ্ছি।

আচ্ছা, সত্যিই আমি কখনো কঠিন হতে পারি এ তোমার বিশ্বাস হয়?

হয় গো হয়—খুব হয়।

কখনো হয় না—এ তোমার মিছে কথা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথাই ত। কিন্তু সেই হয়েছে আমার বিপদ গোসাই। কিন্তু বেশ নামটি বার করেছে তোমার কমললতা। কেবল ওগো হ্যাঁগো করে প্রাণ যায়, এখন থেকে আমিও ডাকব নতুনগোসাইজী বলে।

বল্লে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তবু হয়ত আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে—তাতেও স্বস্তি পাবে। বলো, ঠিক না?

হাসিলাম, লক্ষ্মী, স্বভাব কখনো মলেও যায় না। বাদশাহী আমলের কেনা-বাঁদীদের মত কথাই হচ্ছে বটে। এতকণে তারা তোমাকে জন্মদের হাতে সঁপে দিত।

ওনিয়া রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জন্মদের হাতে নিজেই ত সঁপে দিয়েছি!

বলিলাম, চিরকাল তুমি এত দুষ্ট যে, কোন জন্মদের সাধ্য নেই তোমাকে শাসন করে।

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গিয়াই তড়িৎস্পন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি! খাওয়া হয়ে এলো যে! দুধ কই? মাথা খাও, উঠে পড়ো না যেন। বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, এ, আর সেই কমললতা!

মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা-হাতে সে বাতাস করিতে বলিল, বলিল, এতকাল মনে হ'ত, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বসল না, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে চুল কেটে গরনা খুলে একেবারে তপস্যা জুড়ে দিলাম। ডাবলুম, আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরি হ'লো বলে। এক আপদ তুমি—সে ত বিদায় হ'লো। কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতে থামে না। ইটমাত্র গেলুম ভুলে, ঠাকুর-দেবতা করলে অন্তর্ধান, কুক উঠিল ওকিরে, ভয় হ'লো এই যদি ধর্মের সাধনা তবে এসব হচ্ছে কি! শেষে পাগল হবো নাকি!

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গোড়াতে দেন্তারা সব ভয় দেখান! টিকে থাকলে তবে সিঁছিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সিঁছিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েচি।

কোথায় গেলে?

এখানে। এই বাড়িতে।

অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দিতে যাব তোমার কাছে। আমার বয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রীতদাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করে না।

দ্যাখো, রাগিও না বলচি। একশবার ক্রীতদাসী-ক্রীতদাসী করো ত ভালো হবে না।

আচ্ছা, খালাস দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বসিল, স্বাধীন যে কত, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। হাত দিয়ে ঘামে তোমার কপাল ভিজ্ঞে—জাঁচলে হুছিরে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটিমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল করে, তোমার খুমত মুখের পানে চেয়ে চোখ আর ফিকতে পারলুম না। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কনা হয়ে ছিলুম কি? ভাবলুম, এ যদি পাপ তবে পুণ্য আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম তবে থাক গে আমার ধর্মচর্চা—জীবনে এই যদি হয় মিথো তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কল কথার? ও কি, খাচ্চো না যে? সব দুখই পড়ে রইল যে।

আর পারিনে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

না, তাও না।

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে।

যদি হয়েও থাকি সে অনেক দিনের অবস্থে। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাব।

বেশনায় মুখ তাহার পাংগু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবে না। যে শাস্তি পেলুম সে আর ভুলব না। এই আমার মস্ত লাভ। কলকাল যৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুন্তকর্ণের নিন্দা অল্পে ভাসে না, নইলে লোডের বশে তোমাকে ভাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! তারপর দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গলা নইতে পেলুম—যা কেন সব তাপ ঘূষে গিয়েন। বাড়ি এসে আফিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র। এসেছেন আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার জীবনের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কিন্তু সে আমার বৃক্কের রক্ত-নেড়ড়ানো অক্ষ নয়, আমার আনন্দের উপচে-ওঠ। বরনার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে, বয়ে গেল। আমি পে দুটো ফল। বীট নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমার খেতে সিইনি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমার আবার নিশ্বাস পড়িল। এ, আর সেই কমললতা!

কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী নাম মিরানিল!

দু'জনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি নয়টা। রাজলক্ষ্মী শ্রান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া সহজ-মনুকের মত কাছে আসিয়া বসিল।

বসিলাম, রাজপোশাক গেছে—বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী হাড় নাড়িয়া বসিল, ও আমার রাজপোশাকই বটে। কিন্তু রাজার দেওয়া যে! যখন মরব, ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে ব'লো।

তাই হবে। কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি তুমি ওখু বস্ত্র দেখেই কাটাবে, এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে সিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার নিয়ে যাক।

এইখানে? বেশ যা. যেক। তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন? কখনো দেখেচো খেতে? সেখিনি, কিন্তু দেখলে মোষ কি?

তা কি হয়। মেয়েদের রান্ধুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা দেখো কেন?

ও কলি আজ খটিবে না লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেখো না।

না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা ক'বো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাবো না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতছে। এ আমার সইবে না।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, ফল-মূল-মিষ্টান্ন। সে নামমাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েছে আমি খাইনে, কিন্তু কি ক'রে খাব বলো ত? কলকাতার এসেছিলুম হারা-মকদ্দমার আশিল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন কিরে আসত, আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না পাছে সে বলে, দেখা হয়েছে, কিন্তু বাবু এলেন না। যে দুর্ব্যবহার করেছি আমার বলবার ত কিছুই নেই।

বলবার দরকার ত নেই। তখন বাসার স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

কে তেলাপোকা—তুমি?

তাই ত জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

এটি পরিহাস। কিন্তু হেতু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী আবার কলকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি শ্রম। মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা লোকসেখানে শিষ্টাচার। সংসারে কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বললে তোমাকে ফেরাব কি দিয়ে?

বলিলাম, একটু ভুল হ'লো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল এখানে 'না' বলতে বাধে। ওর কদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারে, শ্রীকান্তের এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারনি।

হাতটা ধরে আসি গে, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্বাধিক কাজকর্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল, কহিল, কমললতার গল্প শুনবো, বলো।

যতটা জানি সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বাদ দিলাম, কারণ, ভুল ভুলিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই শুকে সবচেয়ে বেজেছে। ওর সোবেই সে মারা গেল।

ওর সোব কিসে?

সোব বৈ কি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই ত কমললতা ডেকেছিল সকলের আগে আত্মহত্যার সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে তার ঐ পথটাই সকলের আগে চোখে পড়ে গেল। এমনিই হয়, তাই পাণের সহায় হতে কখনো বন্ধুকে ডাকতে নেই—তাতে একের প্রায়শ্চিত্ত পড়ে অপরের ছাড়ে। ও নিজে বাঁচল, কিন্তু ম'লো তার মেহের ধন।

যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না লক্ষ্মী।

তুমি বুঝবে কি করে? বুঝছে কমললতা, বুঝে, তোমার রাজলক্ষ্মী।

ওঃ—এই?

এই বৈ কি! আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে?

কিন্তু কালই যে বললে তোমার মনের সব কালি মুছে গেছে—আর কোন গ্লানি নেই—সে কি ভাব মিছে?

মিছেই ত। কলি মুহূৰ্বে ম'লে—তার আগে নয়। মরতেও চেরেটি, কিন্তু পারিনে কেবল তোমারই জন্যে!

তা জানি। কিন্তু এ নিয়ে বার বার যদি ব্যথা দাও, আমি এমন নিরুদ্দেশ হবো, কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী সত্যে আমার হাতটা ধরিতা কেলিয়া একেবারে বুকের কাছে বেঁধিয়া বলিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না। তুমি সব পারো, তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও ব্যথা মানে না।

এমন কথা আর বলবে না বলো?

না।

ভাববে না বলো?

তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না?

আমি ত কখনো যাইনে লক্ষ্মী, যখনি দূরে গেছি—তুমি শুধু চাওনি বলেই।

সে তোমার লক্ষ্মী নয়—সে আর কেউ।

সেই আর কেউকেই আজও ভয় করি যে।

না, তাকে আর ভয় ক'রো না, সে রাক্ষসী মরেছে। এই বলিয়া সে আমার সেই হাতটাই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চূপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল, তুমি কি সত্যিই বরষা যাবে?

সত্যিই যাবো।

কি করবে গিয়ে—চাকরি? কিন্তু আমরা ত দু'জন—কতটুকুতেই বা আমাদের দরকার?

কিন্তু সেটুকুও ত চাই।

সে ভগবান দিয়ে দেবেন। কিন্তু চাকরি করতে তুমি পারবে না, ও তোমার খাতে পোষাবে না।

না পোষালে চলে আসব।

আসবেই জানি। শুধু আড়ি ক'রে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাও।

কষ্ট না করলেই পার।

রাজলক্ষ্মী কুন্ড কটাক করিয়া বলিল, যাও চালাকি ক'রো না।

বলিলাম, চালাকি করিনি, গেলে তোমার সত্যিই কষ্ট হবে। রাধাবাড়া, বাসনমাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা—

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবে কি-চাকররা করবে কি?

কোথায় কি-চাকর? তার টাকা কৈ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাই থাক। কিন্তু যতই ভয় দেখাও আমি যাবই।

চলো। শুধু তুমি আর আমি। কাজের তাড়ায় না পাবে ঝগড়া করবার অবসর, না পাবে পূজো-আহ্নিক-উপোস করার কুরসং।

তা হোক সে। কাজকে আমি কি ভয় করি নাকি?

করো না সত্যি, কিন্তু পেরেও উঠবে না। দু'দিন বাদেই কেন্দ্রার তাড়া লাগাবে।

তাতেই বা ভয় কিসের? সঙ্গে করে নিয়ে যাব, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনব। রেখে আসতে হবে না ত। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, সেই ভালো। দাস-দাসী লোকজন কেউ নেই, একটি ছোট বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি—যা খেতে দেব। তাই যাবে, যা পরতে দেব তাই পরবে—না, তুমি দেখো, আমি হরত আর আসতেই চাইব না।

সহসা আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া ওইরা পড়িল এবং বহুকাল পৰ্বত চোখ বুজিয়া শুভ হইয়া রহিল।

কি ভাব?

রাজলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া একটু হাসিল, আমরা কবে যাব?

বলিলাম, এই বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে নাও, তারপরে যেদিন ইচ্ছে চল যাত্রা করি।

সে বাড়ি নাড়িয়া সার দিয়া আবার চোখ বুজিল।

আবার কি ভাবচ?

রাজলক্ষ্মী চাহিয়া বলিল, ভাবচি একবার মুরারিপুরে যাবে না?

বলিলাম, বিদেশে যাবার পূর্বে একবার দেখা দিয়ে আসব তাঁদের কথা দিয়েছিলাম।

তবে চল কালই দু'জনে যাই।

তুমি যাবে?

কেন ভয় কিসের? তোমাকে ভালবাসে কল্ললতা, আর তাকে ভালোবাসে আমাদের গহরদাদা।

এ হয়েছে ভালো।

এসব কে তোমাকে বললে?

তুমিই বলেছ।

না, আমি বলিনি।

হাঁ, তুমিই বলেছ, শুধু জানো না কখন বলেছ।

ওনিয়া সন্ধ্যাে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

কেন নয়?

না, বেচারাকে ঠাট্টা করে, তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী শু কুণ্ঠিত করিল, কুণ্ঠিত-কণ্ঠে কহিল, এককালে আমার এই পরিচয় পেয়েছ তুমি? তোমাকে সে ভালোবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাবো আমি? তোমাকে ভালোবাসাটা কি অপরাধ? আমিও ত মেয়েমানুষ। হয়ত বা তাকে আমিও ভালোবাসে আসব।

কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চল যাই।

হাঁ চল, কাল সকালের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ব দু'জনে—তোমার কোন ভাবনা নেই—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করব না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চকু নিম্নলিখিত, শ্বাসপ্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, ও কি?

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না—কিছু ত নয়।

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমনথারা লাগিল।

এপার

পরদিন আমার অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটয়া উঠিল না। কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না, মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলে না, কিন্তু রাজাঘরের দাসী লালুর মাও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিসপত্র লইয়া রতন ডোরের গাড়িতে ওওনা হইয়া গিয়াছে, সেখানকার স্টেশনে নামিয়া সে খান-দুই ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গেও মোটিবাট বাহ্য বাধা হইয়াছে তাহাও কম নয়।

এক বলিলাম, সেখানে বসবাস করতে চললে না কি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু'একদিন থাকব না? দেশের ২-৩ মাস, নদীনালা মাঠঘাট তুমিই একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-সেখানের মেয়ে নই? আমার সেখাতে সাথ যার না?

তা যায় মানি, কিন্তু এখ জিনিসপত্র, এত রকমের খাবার-দাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধুহাতে যেতে বলা? আর তোমাকে ত বইতে হবে না, তোমার ভাবনা কিসের?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে? আর এই ভয়টাই বেশি ছিল যে, বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে মহাশয় মাথার তুলিবে, কিন্তু ঘুমে তুলিবে না। কি জানি সেখানে গিয়া কোন একটা ছলে উপবাস শুরু করিবে, না রীতিতে বসিবে বলা করিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যকার ভয় মন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও বাধা দিতে পারে না। হরিবা এসব কিছু করে, হাসিমুখে রহস্য-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবহার বাহ্যিকতার কোনকালেই নাই, তাহাতে সবেম ও উপবাসে সেই দেহটাকে কেন লম্বুতর একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার আজিকার সাজসজ্জাটি ইহাতেই বিচিত্র। প্রত্যবে স্নান করিয়া আসিয়াছে, গলার খাট উড়ে-পাতার সবুজ-রচিত অলক-ভিলক তাহার ললাটে, পরনে তেমনি নানা কুল-কুলে লতায়-পাতায় বিচিত্র খয়ের রঙের কৃন্দাবনী শাড়ি, গায়ে সেই করটি অলঙ্কার, মুখের পরে ব্রিখ-প্রসন্নতা—আপন মনে কাজে ব্যাপ্ত। কাল পেটালুই লম্বা আরনা-লাপানো আলমারি কিনিয়া আনিয়াছে, আজ বহিবার পূর্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কি-সব তাহাতে সে শুইয়া তুলিতেছিল। কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাসরের চোখ দুটা মাঝে মাঝে জুলিয়া উঠিতেছে, হীরা ও পদ্মাবসানো গলার হারের বিভিন্ন বর্ণছটা পাড়ের বঁক নিয়া কলকিয়া উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি কেন একটা নীলাভ দ্রুতি, টেবিলে চা বহিতে বসিয়া আমি একসুটে সেইদিক চাহিয়া ছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল বাড়িতে সে জামা অথবা সেমজি পারিত না। তাই কত ও বছর অনেকখানি হরত অসভ্য দুর্ভৃত অনাবৃত ইহা পড়িত, অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অত পারিনে বাপু। পাড়াগাঁয়ের মেরে, মিনরাত্ত বিবিরানা আর সর না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের বেশি বাধাবোধি শুচিবাহুগ্রন্থদের অভ্যন্ত অধিকার।

আলমারির পায়া বন্ধ করিয়া হঠাৎ আরনার ডাকের চোখ পড়িল আমার 'পরে'। তাড়াতাড়ি গায়ে কাপড় সামলাইয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রসিয়া বলিল, আবার চেয়ে আছে? এভাবে ব্যরে ব্যরে কি আমাকে এত দেখ বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল—আমি হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম বিখাতকে ক্রমশঃ দিগে না জানি কে তোমাকে পাড়িয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দ আর কার? আমার পাঁচ-ছ'বছর আগে এসেচো, আসবার সময় তাঁকে বারনা দিগে এসেছিগে—মনে নেই বুঝি?

না, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

চালান সেবার সময় কানে কানে তিনি বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু হ'লো চা খাওয়া? মেরি করলে যে আজও খাওয়া হবে না।

নাই বা হ'লো।

কেন বলো ত?

সেখানে ভিড়ের মধ্যে হরত তোমাকে বুঁজে পাব না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমাকে পাবে। আমিই তোমাকে বুঁজে পেলে বঁচি।

বলিলাম, সেও ত ভয়লো নয়।—সে হাসিয়া কহিল, না, সে হবে না। লক্ষ্মীটি চল। তুর্নৈচি নতুনগৌসাইয়ের সেখানে একটা আলনা বস আছে, আমি গিরেই তার বিলটি ভেঙ্গে রেখে দেব। ভয় নেই, বুঁজতে হবে না—দাঁতকে একই পাবে।

ভবে চলো।

আমরা মরু গিয়া বসন উপহিত হইলাম তখন ঠাকুরের মহাশয়সঙ্গী পূজা সেইমত সমাপ্ত হইয়াছে। বিদা আহ্বানে, বিদা সংবাদে একতলি প্রাণী অকস্মাৎ গিয়া হাজির, তখানি কি যে তাহারা বুশি হইল বলিতে পারি না। নতুনগৌসাই আমায় নাই, গুরুদেবকে সর্কিতে আবার নব্বীপে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তখনই বৈরাগী আসিয়া আমায়ই করে আদানো পাড়িয়াছে।

কমলালতা, পদ্ম, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং আরও অনেকে আসিয়া মহাশয়সঙ্গের অভ্যর্থনা করিল। কমলালতা পাড়বয়ে কহিল, নতুনগৌসাই, তুমি যে এত শীঘ্র এসে আবার আমায়ের সেবা দেবে এ

আশা করিনি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল, যেন কতকালের চেনা। বলিল, কমললতাদিদি, এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই শুঁত মুখে, আরও আগে আসতে চেরেছিলেন, কেবল আমার জন্যেই ঘটে গঠেনি। ওটা আমারই সোবে।—কমললতার মুখ কণকালের জন্য রাসা হইয়া উঠিল, পদ্মা ফিক করিয়া হাসিয়া চোখ ফিরিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীর বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া সে যে সম্ভ্রান্তবরের মেয়ে তাহা সবাই বুঝিয়াছে, শুধু আমার সঙ্গে যে তাহার কি সম্বন্ধ ইহাই তাহারা নিঃসন্দেহে ধরিতে পারে নাই। পরিচয়ের জন্য সবাই উদগ্রীব হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর চোখে কিছুই এড়ায় না, বলিল, কমললতাদিদি, আমাকে চিনতে পারচো না? কমললতা মাথা নাড়িয়া বলিল না।

বৃন্দাবনে দেখনি কখনো?

কমললতাও নির্বোধ নয়, পরিহাসটা সে বুঝিল, হাসিয়া বলিল, মনে ত পড়চে না ভাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না পড়াই ভালো দিদি। আমি এসেশেরই মেয়ে, কখনো বৃন্দাবনের ধারেও যাইনি, বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী-সরস্বতী ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে আমাকে দেখাইয়া কহিল, আমরা দু'জনে এক গায়ে এক গুরুশ্রমের পাঠশালায় পড়তুম—দুটিতে যেন ভাইবোন এমন ছিল ভাব। পাড়ার সুবাসে দাদা বলে ডাকতুম—বোনের মত আমাকে কি ভালোই বাসতেন। গায়ে কখনো হাতটি পর্যন্ত দেননি।—আমার পানে চাহিয়া কহিল, হী গা, বলচি সব সত্যি নয়?

পদ্মা খুশি হইয়া বলিল, তাই তোমাদের ঠিক এক রকম দেখতে। দু'জনেই লম্বা ছিপছিপে—শুধু তুমি ফর্সা, আর নতুনগোসাই কালো, তোমাদের দেখলেই বোঝা যায়।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, যাবেই ত ভাই। আমাদের ঠিক এক রকম না হয়ে কি কোন উপায় আছে পদ্মা।

ও মা! তুমি আমারও নাম জানো যে দেখচি। নতুনগোসাই বলেছে বুঝি?

বলেছে বলেই ত তোমাদের দেখতে এলুম, বললুম, সেখানে একলা যাবে কেন, আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার কাছে ত আমার ভয় নেই—একসঙ্গে দেখলে কেউ কলঙ্কও রটাতে না। আর রটালেই বা কি, নীলকণ্ঠের গলাতেই বিব লেগে থাকবে, উদরস্থ হবে না।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, স্নেহের সঙ্গে এ যে কি রকম ঠাট্টা সে তারাই জানে। রাগিয়া বলিলাম, কেন ছেলেমানুষের সঙ্গে মিথ্যে ভাষা কোরচ বলে ত?

রাজলক্ষ্মী ভালোমানুষের মত বলিল, সত্যি তামাশাটা কি তুমিই না? বলে দাও! বা জ্বনি সরল মনে বলচি, তোমার রাগ কেন?—তাহার গাভীর দেখিয়া রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম,—সরল মনে বলিচ! কমললতা, এত বড় শরতান ফাজিল তুমি সংসারে দুটি খুঁজে পাবে না। এর কি একটা মতলব আছে, কখনো এর কথায় সহজে বিশ্বাস ক'রো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন নিষেধ কর গোসাই! তা হ'লে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমার মনেই কোন মতলব আছে?

আছেই ত?

কিন্তু আমার নেই। আমি নিষ্পাপ, নিঃশঙ্ক।

হী, বৃথিতর!

কমললতাও হাসিল, কিন্তু সে উহার বলার ভঙ্গিতে। বোধ হয়, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল না, শুধু গোলামালে পড়িল। কারণ সেদিনও আমি ত কোন রমণীর সম্বন্ধেই নিজের কোন আভাস মিই নাই। আর মিথি বা কি করিয়া। মিথার সেদিন ছিল, বা কি!

কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই তোমার নামটা কি?

আমার নাম রাজলক্ষ্মী। উনি গোড়ার কথাটা ছেড়ে দিয়ে বলেন শুধু লক্ষ্মী। আমি বলি, ওপো, হীপো। আজকাল বলছেন নতুনগোসাই বলে ডাকতে। বলেন, তবু স্বীকৃত পাবে। পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল—আমি বুঝেচি।

কমললতা তাহাকে ধমক দিল—পোড়ারমুখীর ভারী বুদ্ধি! কি বুকেচিস্ বন্ ত?

নিশ্চয় বুকেচি। বলব?

বলতে হবে না, বা। বলিয়াই সে সন্দেশে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া কহিল, কিন্তু কথায় কথায় বেলা বাড়ছে ভাই, রোক্তরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেছে। খেয়ে কিছু আসোনি জানি—চল, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর প্রসাদ পাব। তুমিও এসো গোসাই। এই বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইবার মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের আনন্দ। খাওয়া-ছোওয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে, এ সম্বন্ধে সন্তোষভর প্রেরণা অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়—এ তাহার স্বভাব। এছাড়া সে বাঁচে না। জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সমীচীনতা কতদিন কত সন্ধ্যা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে সে-কথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে বলিবে না—জানিয়াও লাভ নাই। আমি শুধু জানি, যে রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল পাওয়ার বড়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

তাহার বতকিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ অপরের প্রতি জুলুম ছিল না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অত কষ্ট করার! একালে অত বাহুতে গেলে মানুষের গ্রাণ বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানিনা সে জানে। শুধু তাহার চোখের উপর ভরষার একটা-কিছু না ঘটিলেই সে খুশি। আমার পরোক্ষ অনাচারের কাহিনীতে কখনো বা সে দুই কল চাপা দিয়া আশ্বরক্ষা করে, কখনো বা গালে হাত দিয়া অবাধ হইয়া বলে, আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হ'লে। তোমাকে নিয়ে আমার যে সব গেল!

কিন্তু আত্মিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জন মঠে যে কয়টি গ্রামী শান্তিতে বাস করে তাহার দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। ইহাদের আতিথেয় নাই, পূর্বাঙ্গমের কথা ইহারা কেহ মনেও কবে না। তাই, অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসঙ্কোচ-প্রজ্ঞায় বিতরণ করে এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও আজো কেহ ইহাদের অপমানিত করে নাই। কিন্তু এই অপ্রীতিকর কার্যই আজ যদি অনাহৃত আসিয়া আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় ত পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি, কমললতা মুখে কিছুই বলিবে না, তাহাকে বলিতেও দিবে না—হয়ত বা সুদৃম্যে একটিবার আমার প্রতি চাহিয়াই রাখা নীচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। এই নির্বাক অভিযোগের জবাব যে কি, এইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম।

এমনি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুনগোসাই, দিদিরা তোমাকে ডাকচে। হাতমুখ ধুয়েছো?

না।

তবে এস আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে।

প্রসাদটা কি হ'লো আজ?

আজ হ'লো ঠাকুরের অন্নভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে ত সংবাদ আরও ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসাদ কোথায় দিলে?

পদ্মা বলিল, ঠাকুরবরের বারান্দার। বাবাজীমশায়ের সঙ্গে তুমি বসবে, আমরা মেয়েরা খাব পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীমনি নিজে।

সে বাবে না?

না। সে শু শু আমাদের মত বোটিম নয়—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোট্টা খেলে তার পাণ হয়।

তোমার কমললতামনি রাগ করলে না?

রাগ করবে কেন, বরঞ্চ হাসতে লাগল। রাজলক্ষ্মীমনিকে বললে, পরজন্মে আমরা দু'বোনে গিয়ে জন্মাব এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাব আগে, আর তুমি আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু'বোন একপাতার বসে খাব। তখন কিন্তু জাত বাবে বললে বা তোমার কল মতো দেবে।

তিনিও খুশি হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কখনো কখনো তাহার সমকক পায়

নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মীদিদিও ওনে হাসতে লাগল, বললে, মা কেন দিদি, তখন বড় বোন হয়ে তুমিই দেবে আমার কান মলে, ছোটর আশ্বর্ষ্য কিছুতেই সহিবে না।

প্রত্যুত্তর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত অর্থ কমললতা কেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে, কমললতা সে-কথায় কান দেয় নাই। বরঞ্চ এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দু'জনের ভারি একটি মিল হইয়া গেছে।

বিকালের গাড়িতে বড়গোসাঁই ছারিকাদাস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল আরও জনকয়েক বাবাজী। সর্বাসের ছাপছোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইহারাও অবহেলার নয়। আমাকে দেখিয়া বড়গোসাঁই খুশি হইলেন, কিন্তু পার্শ্বদগ্ধ গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ ওনা গেল, ইহাদের একজন নামজাদা কীর্তনীয়া এবং আর একজন মৃদসের ওস্তাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও সেই বনবাগাড়। বেশ ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে—গায়ের চামড়া বাঁচান দায়। আসন্ন সূর্যাস্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচ্ছাত্রীয় আধার-মানিক ফুল ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংসপচা গন্ধে ভিত্তিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কবির ফুল এত ভালবাসেন, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপহার দিয়া আসে না কেন?

সন্ধ্যার প্রাকালে প্রত্যাবর্তন করিলাম, গিয়া দেখি সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজান হইতেছে, আরতির পরে কীর্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুনগোসাঁই, কীর্তন শুনেতে তুমি ভালোবাস, আজ মনোহর দাস বাবাজীর গান শুনেলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কি চমৎকার!

বস্তুতঃ বৈষ্ণবকবির পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু'চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্তন হবে শুনেলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি না-বুঝি তবু শেষ পর্যন্ত বসে থাকতাম। কমললতা, তুমি গাইবে না আজ?

কমললতা বলিল, না গোসাঁই, আজ না। আমার ত তেমন শিক্ষা নেই, ওদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তা ছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনই ধরে আছে, এ-এ-এ সারেনি।

বলিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুনেতেই এসেচে। ও ভাবে আমি বুঝি বাড়িয়ে বলেছি।

কমললতা সলজ্জ কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেছে গোসাঁই। তার পরে স্মিতহাস্যে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে করো না ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাব।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্নমুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার বেনিন হচ্ছে হবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, আমি নিজে এসে তোমার গান শুনে যাব। আমাকে বলিল, তুমি কীর্তন শুনেতে এত ভালোবাসো, কই আমাকে ত সে-কথা কখনো বলেনি?

উত্তর দিলাম, কেন বোলব তোমাকে? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত, দুপুরবেলাটা কাটত শুকনো খুন্সি মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা কাটতে পারিত না—

রাজলক্ষ্মী চট্ করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর যদি বলো পায়ে মাখা খুঁড়ে মরব। তারপর নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরিয়া বলিল, কমললতাদিদি, এলে এসো ত ভাই তোমার বড়গোসাঁইজীকে, আজ বাবাজীমশায়ের কীর্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাব।

কমললতা সশিষ্টকণ্ঠে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুশখুশে ভাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক পে, ভগবানের নাম ত হবে। বিগ্রহমূর্তিগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া হুসিয়া বলিল, ওঁরা হয়ন্ত খুশি হবেন, বাবাজীদের জন্যেও তত ভাবিনে দিদি, কিন্তু আমার এই দুর্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হ'লে বাঁচি।

বলিলাম, হ'লে কিন্তু বকশিশ পাবে।—

রাজলক্ষ্মী সন্তোষে বলিল, রকে করো গৌসাই, সকলের সম্মুখে যেন বকশিশ দিতে এসো না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

ওনিয়া বৈকবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুশি হইলেই হাততালি দেয়, বলিল, আ—মি—বু—কে—চি।

কমললতা তাহার প্রতি সম্মুখে চাহিয়া সহাস্যে কহিল—দূর হ গোড়ামুখী—চুপ কর। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাৎ কি একটা বলে বসবে।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্তনের আসর বলিল। আজ আলো জ্বলিল অনেকগুলো। মুরারিপুর আখড়া বৈকবসমাজে নিত্যন্ত অখ্যাত নয়, নানা স্থান হইতে কীর্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে এরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই মজুত আছে, সেখিলাম সেগুলো হাজির করা হইয়াছে। একদিকে বসিয়া বৈকবীগণ—সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট অজ্ঞাতকুলশীল অনেকগুলি বৈরাগী মূর্তি—নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহর দাস ও তাঁহার মৃদঙ্গবাদক। আমার ঘরের অধুনা দম্বলীকার একজন ছোকরা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়ামে সুর। এটা প্রচার হইয়াছে যে কে একজন সম্ভ্রান্তগৃহের মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তিনিই গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিভূষালিনী। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে দাস-দাসী, আসিয়াছে বহুবিধ খাদ্যসজ্জার, আর আসিয়াছে কে এক নতুনগৌসাই—সে নাকি এই দেশেরই এক ভবঘুরে।—মনোহর দাসের কীর্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি একসময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমললতার কাছে বলিল। হঠাৎ বাবাজীমশায়ের গলাটা একটু কপিয়াই সামলাইয়া গেল এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতাই একটা সৈবাতের দীলা। শুধু হারিকদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনই রহিলেন, কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানা নীলাশ্বরী শাড়ি, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীল রঙের জামা। আর সব তেমনি আছে। কেবল সকালের উড়েপাতার পরিকল্পিত কপালের ছাপছোপ একলা অনেকখানি মুছিয়াছে—অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আধিনের হেঁড়াখোঁড়া মেঘ, নীল আকাশে কখন মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্টাশ্রয় মানুষ, আমার প্রতি কটাক্ষেও চাহিল না—যেন ভ্রমণেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল সে সেই জানে। কিংবা আমারও ভুল হইতে পারে—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজীমশায়ের গান জমিল না। কিন্তু সে তাঁর সোবে নয়, লোকগুলোর অধীরতায়।

হারিকদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিকেন করে শোনও, শুনে আশ্রয়ও দ্য্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া কিরিয়া বলিল। হারিকদাস খোলটার প্রতি অনুলিপির্শে করিয়া বলিলেন, ওটার কোন বাধা জন্মাবে না ত ?—রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

ওনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহর দাসও মনে মনে কিছু বিশ্বর বোধ করিলেন। কারণ, সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাহার আশা করেন না।

গান শুরু হইল। সন্ধ্যারের জড়িমা, অজ্ঞাতের বিধা লোখাও নাই—সংস্কারের কঠ অব্যাহত মনোহর দাস বুজিয়া চলিল। এ কিয়দর সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু বাঙ্গালার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈকব-কবিকৃষের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কঠই তাহা কে জানিত! শুধু সুরে ভালো লগে নয়, বাক্যের বিকল্পভাষ্য, উচ্চারণের স্পষ্টতা এবং প্রকাশভঙ্গীর মধুরতা এই সন্ধ্যার সে যে বিশেষর সৃষ্টি করিল তাহা অত্যাশ্চর্য। পাথরের ঠাকুর তাহার সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর দুর্বাসা—কহাকে বেশি প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই অপ্রাধিকার বলা কঠিন। গলাঘাটের অপরাধের এতটুকু স্বপ্নও যদি ইহাতে হয়, কি জানি একথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কি না।

সে গাছিতেছিল—

“একে পদ-পঙ্কজ, পক্ষে বিভূষিত, কটকে জরজর ডেল,
তুয়া দরশন-আশে কহু নাহি জানলু চিরদুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব ধবশে ধবশল ছোড়ল গৃহ-সুখ আল,
পঙ্ক দুখ তুর্গ করি না গগন, কহঁতহি গোবিন্দলাস।”

বড়গৌসাইজীর চোখে ধারা বহিতেছিল ; তিনি আবেশ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মন্দিরকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয় ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি চুপি বলিল, এ মালা তোলা রইল, বকশিশের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিবে দিখুম। বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অঙ্ককারে একটু জাড়ায়ে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবে। রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়িতে প'রে ফেললে আর ধুলতে পারবে না এই বুঝি ভয়? না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা দান করতাম। উঃ—কি দাতা। সে, ত তোমারি থাকত গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেন বলো ত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অবাচিত পেয়েছি, সসোরে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতার লজ্জা পাই লক্ষ্মী, তোমার কাছে সত্যি আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যি আমি রাগ করব।

তা ক'রো। ভাবি এ ঐশ্বর্য আমি রাখব কোথায়?

কেন, চুরি বাবার ভয় নাকি?

না, সে মানুষ ত চোখে দেখতে পাইনে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধনে রাখবার মত বড় জায়গাই বা সে বেচোরা পাবে কোথায়?—রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল না, হাতটা আমার টা' রা কমকাল বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল। তারপরে বলিল, এমন করে মুখোমুখি অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে হাসবে যে! কিন্তু ভাবচি, রাগে তোমাকে গুতে দিই কোথায়—জায়গা ত নেই।

না থাক, যেখানে হোক গুয়ে রাখিটা কটবেই।

তা কটবে, কিন্তু শরীর ত ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে!

তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী ভিত্তার সুরে বলিল, দেখচি ত সব, ব্যবস্থা কি করবে জানিনে ; কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। বা হোক দুটি খেয়ে গুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক লোকের ভিড়ে শোবার স্থান ছিল না। সে-রাগে কোমলমতে একটা খোলা বানান্দার মশারি টাঙ্গাইয়া আমার শরনের ব্যবস্থা হইল। রাজলক্ষ্মী খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, হয়ত বা রাগে মাঝে মাঝে আসিয়া সেবিয়া গেল, কিন্তু আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিল না।

পরদিন শব্দা ত্যাগ করিয়া দেহিতে পাইলাম রাশীকৃত কুল তুলিয়া উত্তরে ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবারে কমললতা আজ রাজলক্ষ্মীকেই সঙ্গী করিয়াছিল। সেখানে নির্জনে তাহাদের কি কথা হইরাছে জানি না, কিন্তু আজ তাহাদের মুখ সেবিয়া আমি ভারী তৃপ্তি লাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু-সুজন—তাহারা কতকালের আত্মীয়। কাল উত্তরে একদে এক শব্দার শরন করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে থার না এই লইয়া কমললতা আমার

কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবে না গোসাই, সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আস্তে করে আমি বড় ঘোম হরে জন্মে ওর দুটি কান ভাল করে মলে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা শর্ত করিয়ে নিরেছি গোসাই। যদি মরি, ওঁকে কোটমিনিরি ইন্ডাক্স নিয়ে তোমার সেবার নিযুক্ত হতে হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাব না সে খুব জানি, তখন ছুত হয়ে নিশির আড়ে ঢাপব—সেই সিদ্ধবাসের সৈন্তের মত—কাঁধে বলে সব কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়ব।—কমললতা সহাস্যে কহিল, তোমার মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারব না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমললতা আসিয়া বলিল, বেশি দেরি ক'রো না গোসাই, আর থাকেও সঙ্গে এনো। এদিকে একজন বামুন ধরে এনেটি আজ ঠাকুরের ভোগ রাখতে। যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে। রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তার সাহায্য করতে। বলিলাম, ভালো করোনি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু তোমার ঠাকুর থাকবে উপবাসী।

কমললতা সভয়ে ভিত কাটিয়া বলিল, এমন কথা বলো না গোসাই, সে কানে ওনলে এখানে আর জলগ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চব্বিশ বটাও কাটেনি কমললতা, কিন্তু তাকে তুমি চিনেছো।

সেও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোসাই চিনেছি, শত-লকেও এমন মানুষ তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমি ভাগ্যবান।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাড়ি নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো ভগিনী থাকে সুনাম গ্রামে; নবীন জানাইল সেদেশে কি এক নতুন ব্যাধি আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলেপুলে লইয়া বিশদে পড়িয়াছে, তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সংবাদ নাই—নবীন ভয়ে সারা হইয়াছে—কিন্তু কেন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউ-হাউ করিয়া কানিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। যথু চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বার হইনি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয় জানিনে, নইলে ধরসংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়ি বসে। চক্কাভিন্নশাহিকে মিনরাত সাধতি, ঠাকুর দয়া করো। তোমাকে জমি বেচে আমি একশ' টাকা দেব, আমাকে একবার নিয়ে চলো, কিন্তু বিটলে বামুন নড়লে না। কিন্তু এও বলে রাখতি বাবু, আমার মনিব যদি যায় মারা, চক্কাভিকে ধরে আতন নিয়ে আমি পোড়াব, তারপর সেই আতনে নিজে মরব আত্মহত্যা করে। অত বড় নেমকহারামকে আমি জ্যাড রাখব না।

ভাছাকে সাধুনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন?

নবীন কহিল, কেবল ওনেটি গাঁথানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ একটরে, ইস্টিশান থেকে অনেকদূর যেতে হয় গরুর গাড়িতে। বলিল, চক্কাভি জানে, কিন্তু বামুন ভাও কলতে চার না।

নবীন পুরাতন চিঠির পর সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে-সকল হইতে কেন হিনসি মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে, মাস-দুই পূর্বেও বিধবা মেয়ের বিয়ে বাবু চক্রবর্তী শ'দুই টাকা গহরের কাছে আদার করিয়াছে।—বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অকম দরিরেরা ঠকাইবেই, এ লইয়া কোন্ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শরতানিও সচরাচর চোখে পড়ে না।

নবীন বলিল, বাবু ম'লেই ওর ভালো,—একেবারে নির্ভর্য্য হইয়া বাচে। একপরমাণু আর ধার শোধ করতে হয় না।

অসম্ভব নয়। শোলাম দু'জনে চক্রবর্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী পরদূষকতর ভদ্রব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্থিতিশক্তি উন্নতর এক বীণ হইয়াছে যে কিছুই তাহার মনে পড়িল না, এমনকি জেলার নাম পূর্বত না। কব চৌধুর একটা টাইম ট্রেনল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সমস্ত রেল স্টেশন একে একে পড়িয়া শোলাম, কিন্তু স্টেশনের আত্মকর পূর্বত ভিত্তি মরণ করিতে পারিলাম না। হৃদয় করিয়া বলিলাম, লোকে কত কি জিনিস-পত্র টাকাকড়ি ধার করে ঢেরে দিয়ে যায় বাবা, মনে করতে পারিনে, আদারও হয় না। মনে মনে বলি মাঝার ওপর ধর্ম আছেন,

তিনিই এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না, গর্জন করিয়া উঠিল, হী, তিনিই তোমার বিচার করবেন, না করেন করব আমি।—চক্রবর্তী রেহা-মধুরকণ্ঠে বলিলেন, নবীন, মিছে রাগ করিস্ কেন দাদা, তিনকল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, পারলে কি আর এটুকু করিনে? গহর কি আমার পর? সে যে আমার ছেলের মত রে।

নবীন কহিল, সেসব আমি জানিনে, তোমাকে শেববারের মত বলচি, বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ত চল, নইলে যেদিন তাঁর মন্দ খবর পাব সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্রবর্তী প্রত্যুত্তরে ললাটে করাঘাত করিয়া শুধু বলিলেন, কপাল নবীন, কপাল। নইলে তুমি আমাকে এমন কথা বলিল।

এতএব, পুনরায় দু'জনে ফিরিয়া আসিলাম, বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি কপকল আশা করিলাম অনুত্তপ্ত চক্রবর্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, যারের স্বাক্ষর দিয়া উকি মারিয়া দেখিলাম চক্রবর্তী পোড়া কলিকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক সাজিতে বসিয়াছে।—গহরের সংবাদ পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে আশ্চর্য্য ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌছিয়াম তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুরঘরের বায়ান্দায় মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে; বাবাণীরা কেহ নাই, সম্ভবতঃ সুপ্রভুর প্রসাদসেবার পরিশ্রমে নির্জীব হইয়া কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রিকালে আর এককল লড়িতে হইবে তাহার বলসকরের প্রয়োজন।

উকি মারিয়া দেখিলাম ভিড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক; পাঁজি, পুঁথি, খড়ি, পেলেট, পেন্সিল প্রভৃতি পন্থার ব্যবহার উপকরণ তাঁহার কাছে। আমার প্রতি সর্বাগ্রে চোখ পড়িল পন্থার, সে চৈতন্য উঠিল, নতুনগোসাই এয়েছে।

কমললতা বলিল, তখন জানি গহরগোসাই তোমাকে অমনি ছেড়ে দেবে না, কি খেলে সে—
রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—থাক দিদি, ও অংক জিজ্ঞাসা করো না।

কমললতা তাহার হাত সরিয়া দিয়া বলিল, রোদ্দুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের খুলোবাগি উঠেচে মাথার—ব্রানটান হয়েচে ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল হৌন না, হলেও ত বোকা যাঁবে না দিদি।

অব্যয় সর্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অসম্মত অভূতই ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছে আমি রাজলক্ষ্মী হবো।

কি দিলে? পদ্মা বলিয়া দিল—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মীদামির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বলতে পারতাম।

গণক উকিয়া ব্রাকশ, বেশ বাজনা বলিতে পারে—বাসালী বলিলেই হয়—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত আমি আর দেখিনি। দেখবেন, আমার হাতদেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম কখন।

বলিলাম, শিমুলফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুলফুলই সই! আমি এর থেকেই বলে দেব আপনি কি চান? এই বলিয়া সে খড়ি দিয়া মিনিট-দুই আঁক কবিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

কি খবর?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মামলা-মকদ্দমা নয়; আপনি কোন লোকের খবর পেতে চান।

খবরটা কলিতে পারি ঠাকুর?

পারি। খবর ভালো, দু-একদিনই জানতে পারবেন।

পারহ (প্রথম খণ্ড)—৩৪

তুমিরা মনে মনে একটু বিমিত্র হইলাম এবং আমার মুখ সেবিয়া সকলোই তাহা অনুমান করিল। রাজলক্ষ্মী বুনি হইয়া বলিল, দেখলে ত। আমি বলিছি ইনি খুব ভালো গোনেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না—হেসে উড়িয়ে দাও।

কমললতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের? নতুনগোসাই, দেখাও ত ভাই তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করভল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গশক নিজের হাতে লইয়া মিনিট দুই তিন সবয়ে পর্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়, আপনার ত দেখি মস্ত কাঁড়া—

কাঁড়া? কবে?

খুব শীঘ্র। মরণ-বাচনের কথা।

চাহিয়া সেবিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে।

গশক আমার হাতটা ছাড়িয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা আর একবার—

না। আমার আর হাত দেখতে হবে না—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গশক তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি ত দর্পণ মাত্র মা, ছায়া বা পড়বে তাই আমার মুখে ফুটবে—কিন্তু রুট গ্রহকেও শাস্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে—সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে যেতে পার?

কেন পারব না মা, নিজে গেলেই পারি।

আজ্ঞা।

সেবিলাম তাহার গ্রহের কোণের প্রতি পুরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমললতা বলিল, চল গোসাই তোমার চা তৈরি করে দিই গে—খাবার সময় হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরি করে আনছি মিনি, তুমি ষাঁচ বসবার জায়গাটা একটু ঠিক করে দাও গে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার জো নেই।

অন্যান্য সকলে গশককে লইয়া কলরব করিতে লাগিল, আমরা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দার আমার দড়ির খাট, রতন বাড়িয়া-ঝুড়িয়া দিল, তামাক দিল, মুখহাত দ্রোবার জল আনিয়া দিল—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটনির বিরাম নাই, অথচ কষ্টী বলিলেন তাহার ছায়া পর্বন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। কাঁড়া আমার আসন্ন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই বলিত, আছে না, কাঁড়া আপনার নয়—আমার।

কমললতা নীচে বারান্দার বসিয়া গহরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভাবী, সমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া কহিল, দাখো, তোমাকে একশোবার বলেছি বনেজসলে ঘুরে বেড়িয়ে না—বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? তোমাকে গলার কাপড় দিয়ে হাতজোড় করছি, কথটা আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরি করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল। 'খুব শীঘ্র' অর্থে আর কি হইতে পারে?

কমললতা আশ্চর্য হইয়া কহিল, বনেজসলে গোসাই আবার কখন গেল?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি সেখাে রেখেছি মিনি? আমার কি সংসারে আর কাজ নেই?

আমি বলিলাম, ও সেজেই, ওর অনুমান। গশকবাটা আজ্ঞা বিপদ ঘটিলে গেল। তুমিরা রতন আর একটিকে খুব কিরইয়া একটু রক্তপসেই গ্রহণ করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গশকের সোবটা কি? সে বা দেখবে তাই ত বলবে? পৃথিবীতে কাঁড়া বলে কি কথা নেই? বিপদ কারও কখনো ঘটে না নাকি?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যস্তা বুঝা। কমললতাও রাজলক্ষ্মীকে ডিঙ্গিয়াছে, সেও ছুপ করিয়া

রহিল।

চায়ের বাটিটা আমি হাতে করামাত্র রাজলক্ষ্মী কহিল, অমনি দুটো ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসি গে? বলিলাম, না।

না কেন? না ছাড়া হাঁ বলতে কি ভগবান তোমাকে দেননি? কিন্তু আমার মুখের নিকে চাহিয়া সহসা অধিকন্তর উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার চোখ দুটো অত রান্না দেখাচ্ছে কেন? পচা নদীর জলে নেয়ে আসেনি ত?

না, রান্না আজ করিনি।

কি খেলে সেখানে?

খাইনি কিছুই, ইচ্ছেও হয়নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল, তারপরে আমার ভিতরে আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিশ্ত করাইয়া দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। কমলমিদি, দেখ ত এর গা-টা গরম বোধ হচ্ছে না?

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল, হ'লোই বা একটু গরম রাজু—ভয় কি?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নূতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর বে মিদি।

কমললতা কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোমরা জলে এসে ত পড়োনি? এসেছ আমাদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করব ভাই, তোমার কিছু চিন্তা নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শাস্তকণ্ঠ রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল। সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো মিদি। একে এখানে ডাক্তার-বন্দ্য নেই, তাতে বার বার দেখেচি ওঁর কিছু একটা হ'লে সহজে সারে না—ভারী ভোগার। আবার কোথা থেকে এসে এ গোপকার পোড়ারমুখো ভয় দেখিয়ে দিলে—

দেখালেই বা।

না ভাই মিদি, আমি দেখেচি কিনা ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমললতা স্মিতহাস্যে কহিল ভয় নেই রাজু, এক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল থেকে গৌসাই রোদ্দুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, তাতে সময়ে রান্নাহার হয়নি, তাই হয়ত গা একটু তপ্ত হয়েছে—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর মা আসিয়া কহিল, মা, রান্নাঘরে বামুনঠাকুর এমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমললতার প্রতি একটা সঙ্কতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার রোগের সম্বন্ধে কমললতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই গেল না বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের ভিতরের কথাটা কমললতা টের পাইল এবং আরও একজন বোধ হয় পাইলেন তিনি বড়গৌসাইজী নিজে।

বাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, গৌসাই, তোমাদের বিশ্বের বছরটি মনে আছে ভাই?

নিকটেই দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন—জানি আমি।

কমললতা হাসিমুখে কহিল, এ কি রকম কথা যে একজনের মনে রইল, আর একজনের রইল না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা—তাই। ওঁর ৬ নো ভালো জ্ঞান হয়নি।

কিন্তু উনিই যে বয়সে বড় রে রাজু।

ইং ভারি বড়ো! মোটে পাঁচ-ছয় বছরের। আমার বয়স তখন আট-ন' বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হ'লে আমার বর। বর। বর। এই বলিয়া আমাদের ইচ্ছিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু ও-রাক্স তখন আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেকে

কেলসে।

কমললতা আতর্ভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কুলের মালা খেঁচে কেলসে কি করে?

আমি বলিলাম, কুলের মালা নয়, পালা বইটিকুলের মালা। সে বাকে সেবে সেই খেঁচে কেলসে।

কমললতা হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই খেঁচে গুরু হ'লো—আমার দুগুটি।
ওঁকে কোলসে হারিয়ে, তার পরের কথা আর জানতে চেষ্টা না নিলি—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না—তারা কত কিই না ভাবে। তার পরে অনেকদিন কেঁসে কেঁসে হাতড়ে বেড়াসাম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া হ'লো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমন অকস্মাৎ আর একদিন হাতে হাতে কিরিয়ে নিয়ে গেলেন। এই বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কমললতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড়গোসাঁই নিয়েছেন পাঠিয়ে, আজ-কিরে বাবার দিনে তোমরা দু'জনকে দু'জনে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ ক'রো না। আমার মেলাফেরার সে রাসা মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর পলার দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই মালাই চিরদিন থাক নিলি।

বলিলাম, কিন্তু সে মালা ত খেঁচে কেলেহিলাব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁগো রাকস—এইবার আমাকে সুছ বাও। এই বলিয়া সে হাসিয়া চন্দনের বাটিতে সব করটি আলু ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ মারিয়া দিল।

সকলে ঘরিকদাসের ঘরে গোলাম দেখা করিতে। তিনি কি একটা গ্রহপাঠে মিস্ত্র ছিলেন, আমার করিয়া বলিলেন, এসো ভাই, ব'সো।

রাজলক্ষ্মী মেজতে বলিয়া বলিল, বসবার যে আর সময় সেই গোসাঁই। অনেক উপদ্রব করেছে, বাবার আর্থেই তাই নবদ্বার জানিয়ে তোমার কমা-ডিকে করতে এলুম।

গোসাঁই বলিলেন, আমরা বৈরাগী মানুষ, ডিকে নিতেই পারি, নিতে পারব না ভাই। কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বল ত নিলি? আশ্রমটি যে আজ অন্ধকার হয়ে বাবে।

কমললতা বলিল, সত্যি কথা গোসাঁই—সত্যিই মনে হবে বুঝি আজ কোথাও আলো ছিলেনি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়গোসাঁই বলিলেন, পানে, আনন্দে, হাসিতে, কৌতুকে এ করদিন মনে হইছিল যেন চারিধিকে আবার বিদ্যুতের আলো জ্বলচে—এমন আর কখনো দেখিনি। আমাকে বলিলেন, কমললতা নাম নিয়েছে নতুনগোসাঁই, আর আমি নাম লিলাম আজ আনন্দবরী—

এইবার তাঁহার উচ্চাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়গোসাঁই, বিদ্যুতের আলোটাই তোমাদের চোখে লাগল, কিন্তু তার কড়কড় ধনি ঘাসের বিঘারায় কর্পরকে পশে ডাসের একটু জিজ্ঞাস্য ক'রো। আনন্দবরীর সবচে, অন্ততঃ রতনের মতামতটা—

রতন শিল্পে দাঁড়াইয়াছিল, পলারন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনো না গোসাঁই, ওরা সিনরাত আমার হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসব এই রোপা-পটল অরলিক লোকটিকে ঘরে তালাবদ্ধ করে আসব—ওর জ্বালায় কোথাও গিয়ে বসি আমার বসি আছে।

বড়গোসাঁই বলিলেন, পারবে না আনন্দবরী—পারবে না। কেলে আসতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারব। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোসাঁই, যেন আমি শীগগির মরি।

বড়গোসাঁই বলিলেন, এ ইচ্ছা ত কখনো একদিন তাঁর মুখেও প্রকাশ পেরেছে ভাই, কিন্তু পারেন নি। হী, আনন্দবরী কথাটি তোমার কি মনে নেই? সবি। করে নিয়ে যাব, তারা কনুসেবার কিবা জানে—

বসিতে বসিতে তিনি যেন আনন্দবরী হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সভা ঘেঁষের কতটুকুই বা জানি অরুণা? কেলা হলদার নিমেষের জেলাই বৈ ত নয়। কিন্তু তুমি আমাকে পেরেছ ভাই। ভাই বলি,

তুমি বেশি এ প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে আনন্দরসী—

ওনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, বাস্তব হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্বাদ করো না গোঁসাই, এ যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ আশীর্বাদ করো এমনি হেসে-খেসেই একদিন যেন ঠেকে রেখে মরতে পারি।

কমললতা কথটা সামলাইয়া লইতে বলিল, বড়গোঁসাই তোমার ভালবাসার কথাটিই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমিও বুঝিয়াছিলাম অনুকম্পা অন্য ভাবের ভাবুক বারিকাদাস—তাঁহার চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুদ্ধমুখে বহিল, একে ত এই শরীর, তাতে একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে—একপুঁয়ে লোক, কারও কথা শুনতে চান না—আমি দিনরাত কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাব কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উষ্ম হইয়া উঠিলাম, যাবার সময়ে কথায় কথায় কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি, আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে মর্মান্তিক আত্মপ্রাণি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে, সর্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতে মুচিতেছে না। সেইটা শাস্ত করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি বতই কেননা লোকের কাছে আমার রোগদেহের নিষ্পেক্ষ লক্ষ্মী, 'ও মুখ বিনাশ নেই' আগে তুমি না মরলে আমি মরচিনে এ নিশ্চয়—

কথটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্প করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তুমি তিনসত্বি করো। বলা এ কথা কখনো মিথ্যা হবে না। বলিতে বলিতেই উৎকণ্ঠিত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপচাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক হইয়া বাহল। তখন লজ্জায় হাতটা আমার সে ত্রাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ গোড়ারমুখো গোপকাকারটা মিছিমিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফাঁটা-দুই চোখের জল তাহার গালেব উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে একে বিদায় লওয়া হইল। বড়গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন এবং পদ্মা কখনো শূন্য দেখে নাই, সেও সঙ্গে যাইবে।

স্টেশনে পৌছাইয়া সর্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই 'গোড়ারমুখো গোপকাকার' লোকটাকে। প্রটিকর্মের কন্ডল পাতিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশেপাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আর একদিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল সেও সঙ্গে যাইবে।

বলিলাম, না, ও যাবে না।

কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ ত হবে না! আসুক না সঙ্গে।

বলিলাম, না, ভালোমন্দ যাই হোক ও আসবে না। শুকে যা দেবার দিলাম, এখন থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রন্থশাস্তি করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহা বোঁকাইতে পাঠাইল। তাহাকে কি দিল জানি না, কিন্তু সে অনেকবার মাথা নাড়িয়া ও অনেক আশীর্বাদ করিয়া সহানুভূতি বিদায় গ্রহণ করিল।

অনতিবিলম্বে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও যাত্রা করিলাম।

রাজলক্ষ্মীর ঘরের উত্তরে আমার অর্ধাঙ্গের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমারদের বর্জ-অধিনের একজন বড়শরের সাথেব ছোড়দৌড়ের খেলার সর্ব্ব্ব হারাইয়া আমার অঙ্গনে টান ধর লইয়াছিলেন। নিজেই শর্ত করিয়াছিলেন, শুধু সুন নয়, সুনিম বসি আসে মুদাকার অর্ধেক দিবে। এবার কলিকাতায় আসিয়া টান চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্ত্তের চতুর্পূর্ণ কিনাইয়া দিরাছেন। এই আমার সকল।

সেটা কত?

আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

কত শুনি?

সাত-আট হাজার।

এ আমাকে দিতে হবে।

সত্যে কহিলাম, সে কি কথা! লক্ষ্মী মানই করেন, তিনি হাতও পাড়েন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহস্রো কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যার সর না। তিনি সন্ন্যাসী কবিরকে বিশ্বাস করেন না—
তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

কি করবে?

করব আমার অরব্বের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

কিন্তু এটুকু মূলধনে চলেবে কেন? তোমার একপাল দাসী-চাকরের পনর দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবে না। এর ওপর আছে গুরু-পুরুত, আছে তেত্রিশ কোটি মেঘ-মেঘতা, আছে বহু বিধবার ভরণ-পোষণ—তাদের উপায় হবে কি?

তাদের জন্য ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবে না। আমার নিজের ভরণ-পোষণের কথাই ভাবচি কুলে?

বলিলাম, বুঝিচি। এখন থেকে কোন একটা ছলনার আপনাকে তুলিয়ে রাখতে চাও—এই ত? রাজলক্ষ্মী বলিল, না তা নয়। সে-সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে, কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেব এখন থেকে সেই হবে আমার ভবিষ্যতের নুঁজি। কুলোয় খাব, না হয় উপোস করব।

তা হলে তোমার অণুটে তাই আছে।

কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচ সামান্য, কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় করে তুলতে হয় সে বিদ্যা আমি জানি। একদিন বুকেব আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সম্বোধ কর তা সত্যি নয়।

এ কথা এতদিন বলোনি কেন?

বলিনি বিশ্বাস করবে না বলে। আমার টাকা তুমি খুশার হেঁও না, কিন্তু তোমার বিতুকায় আমার কুক কেটে যায়।

ব্যবিত্ত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এসব কথা আজ কেন বলচ লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে কক্ষকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আজ হঠাৎ ঠেকেবে, কিন্তু এ যে আমার স্মৃতিদিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্ম্মপথের উপার্জন নিয়ে আমি ঠিকুর-মেঘতার সেবা করি? সে অর্ধের এককলা তোমার চিকিৎসার খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচতে পারতুম? ভগবান আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই এ কথা সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস কর কই?

বিশ্বাস করি ড।

না, করো না।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্ষ্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল, কমলকান্তার সঙ্গে পরিচয় তোমার দুদিনের, শুধু তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন নিয়ে শুনে, তোমার কাছে তার সকল কথা খুড়সো—
সে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে কখনো ভিজালো করলে না কোন কথা, কখনো বললে না, লক্ষ্মী তোমার সব ঘটনা আমাকে খুঁসে বল। কেন ভিজালো করনি? করনি ভয়ে। তুমি বিশ্বাস কর না

আমাকে, তুমি বিশ্বাস করতে পারো না আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞাসা করিনি, জানতেও চাইনি। নিজে সে জোর করে ওসিয়েচে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত শুনেচ। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনেচে চাওনি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বলবে নাকি?

না, তা বলব না। কিন্তু তুমি কি কমললতার চেলা? সে যা করচে তোমাকেও তাই করতে হবে?

ও-কথায় আমি ভুলব না। আমার সব কথা তোমাকে শুনেতে হবে।

এ ত বড় মুক্ছিল! আমি চাইনে শুনেতে, তবু শুনেতেই হবে?

হী, হবে। তোমার ভাবনা, শুনেলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না, হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না, সে হবে না—তোমাকে শুনেতেই হবে। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মনে এটুকু জোর নেই যে উচিত মনে হলে, আমাকে দূর করে দিতে পার?

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কবুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে-সকল জোরালো পুরুষদের উদ্দেশ্য করে আমাকে অপদস্থ কোরচ লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ—নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায় দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারব না, হয়ত তখন কিরিয়ে আনতে দৌড়াব এবং তুমি 'না' বলে বসলে আমার দুর্গতির অবধি থাকবে না। অতএব, এ সকল ভয়াবহ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ কর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো ছেলেবেলায় মা আমাকে এক মৈথিলী রাজপুত্রের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিলেন?

হী, আর এক রাজপুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেককাল পরে। সে ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল হী, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ করে বিদায় করে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এ খবর শু শুনেছিলে?

হী, শুনেছিলাম।

শুনে তুমি কি ভাবলে? ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী মরে গেল!

এই? আর কিছু না?

আরও ভাবলাম কানীতে মরে তবু যা হোক একটা সদগতি হ'লো। আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল,—যাও—মিথ্যে আহা! আহা! করে তোমাকে দুঃখ জানাতে হবে না। তুমি একটা 'আহা'ও বলোনি আমি দিব্য করে বলতে পারি। কই, 'আহা' কে ছুঁয়ে বল ত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম বলেই যেন মনে পড়চে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক কষ্ট করে অতদিনের পুরানো কথা আর মনে করে কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া থাকিয়া বলিল, আর আমি? কেঁদে কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম, ভগবান আমার অদৃষ্টে এ তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে বীর গলায় মালা দিয়েছিলাম এ জীবনে তাঁর দেখা কি কখনো পাব না? এমনি অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহার মুখের প্রাতি চাহিয়। ক্রেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিবেশ শুনিবে না বুঝিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে অন্তরে কতদিন কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারকোষ মন নীরবে কত মর্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে, তবু প্রকাশ পাইতে ভরসা পাই নাই পাছে কি করিতে কি ইহিয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জন করিয়া আসিয়াছে সে কমললতার কাছে। বৈকল্যী আপন প্রাণের কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যে মর্যাদার শিকল ছিড়িয়া তাহার মত সহজ ইহিয়া দাঁড়াইতে চায়, অদৃষ্টে তাহার যাহাই কেননা ঘটুক। এ বিদ্যা নিঃসংশয় তাহাকে কমললতা। সংসারে একটিমাত্র মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট ইহিয়া

আপন দুখের সমাধান চিন্তা করিরাহে এই কথা শ্রবণেই অসুস্থ করিয়া মনের দ্বারা একটি ভূক্তি বোধ করিলাম।

উভয়েই কিছুকাল নিঃশব্দ থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল, রাজপুত্র হঠাৎ সন্ধ্যা পেলে, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করলেন আমাকে বিক্রি করার—

এবার ক'র ক'রে? অপর একটি রাজপুত্র—তোমার সেই বন্ধু-মহাতি—বীর সঙ্গে শিলার করতে গিয়ে—কি হ'লো মনে নেই?

বলিলাম, নেই বোধ হয়। অনেকদিনের কথা কি। কিন্তু তার পরে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ মড়কযন্ত্র খাটিলো না। বললুম, মা তুমি থাকি যাও। মা বললেন, হাজার টাকা নিয়েছি যে। বললুম, সে টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও, দালালির টাকা বেহন করে পারি আমি শোধ দেব। বললুম, আজ রাত্রির পাড়িতেই যদি বিদার না হও মা, কাল সকালেই দেব আমি আপনাকে আপনি বিক্রি করে মা-পদার জলে। জানোত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্ছি নে। মা বিদার হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সংবাদ পেয়ে তুমি দুঃখ করে বসেছিলে—আহ! মরে গেল! এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল, সত্যি হলে তোমার দুখের সেই 'আহ'টুকুই আমার ঢের। কিন্তু এবার যেদিন সত্যিসত্যিই মরব সেদিন কিন্তু দু'কোঁটা চোখের জল কেটো। ব'লো, পৃথিবীতে অনেক বর-বধু অনেক মালা-বদল করেছে, তাদের প্রেমে অগ্ন পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বয়টিকে একমনে বত ভালবেসেছে এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসেনি। আমার কানে কানে তখন কলবে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও তনতে পাব।

একি, তুমি কীদচো যে!

সে চোখের জল ঝাঁচলে সুহিয়া ফেলিয়া বলিল, নিরুপায় ছেলোমানুবের ওপর তার আত্মীয়স্বজন বত অভ্যাচার করেছে অন্তর্বাশী ভগবান কি তা দেখতে পাননি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন, না, চোখ বুজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো, আমার মত পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোনকালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা! কিন্তু পরকণ্ঠেই গভীর হইয়া কহিল, আজ্য, লোকে যে বলে দ্বী-পুরুষের ধর্ম এক না হলে চলে না, কিন্তু ধর্মকর্মে তোমার আমার ত সাপে-নেউলে সম্পর্ক। আমাদের ভেদে চলে কি করে?

চলে সাপে-নেউলের মতই। একালে গ্রামে বখ করার হাঙ্গামা আছে, তাই একজন আর একজনকে বখ করে না, নির্মম হয়ে বিদায় করে দেয়, যখন আশঙ্কা হয় তার ধর্মসাধনার বিঘ্ন ঘটবে।

তার পরে কি হয়?

হুসিয়া বলিলাম, তার পরে সে নিজেই কীদতে কীদতে ফিরে আসে। নাকথত নিয়ে বলে আমার অনেক শিকার হয়েছে, এ জীবনে এত ভুল আর করব না, রইল আমার অপভ্রংশ, গুরু-পুরুত—আমাকে কমা কর।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল, কমা পায় ত?

পায়। কিন্তু তোমার পড়ের কি হ'লো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বলি। কলকাল নিম্পলকটকে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলে। আমাকে একজন বুড়ো ওস্তাদ পান-বাঁজনা শেখাতেন, লোকটি বাঙ্গালী, এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা নিয়ে আবার সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল দুলালদাস স্ত্রী, তিনি বৈষ্ণব, আমাকে আমাকে নাচ! তাঁকে বলতুম আমি দামাশাই—আমাকে সত্যিই বড় দামাশাইকরতেন। কেঁদে বলতুম, দামাশাই, আমাকে তুমি রকে কর, এসব আর আমি পারব না। তিনি পরিত্রা পেতেন, হঠাৎ সাহস করতেন না। আমি বলতুম, আমার যে টাকা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে। তারপর কলকালে বা আছে হুখে, এখন কিন্তু পালাই চলে। তারপরে তাঁদের সমস্ত বস্তু আর পান

দুরলভ—এলাহাবাদ, লাহৌর, দিল্লী, আগরা, অরঙ্গাবাদ, মথুরা—শেষে আজ্ঞার সিদ্ধির একে পরিণয়। অর্বেক টাকাল জম্মা দিল্লুর এক মহাজনের পণীতে, আর অর্বেক টাকাল নিয়ে তখনে খুল্লুর একটা মনোহারী আর একটা কপড়ের দোকান। বাড়ি বিশেষ খোঁজ করে বন্ধুকে আনিয়া দিয়ে দিল্লুর ভরত ইকুলে ভর্তি করে, আজ জীবিকার জন্যে যা করতুম সে ত তুমি নিজের চোখেই দেখেছ।

তাহার কাছিনী ওনিয়া কিছুকাল শুদ্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম, তুমি বলেই অবিশ্বাস হয় না—আর কেউ হলে মনে হ'তো মিথ্যে বানানো একটা গল্প ওনটি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মিথ্যে বলতে বুঝি আমি পারিনে?

বলিলাম, পার হইত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলোনি বলেই আমার বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস কেন?

কেন! তোমার ভয় মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রুষ্ট হন। তোমাকে শান্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন।

আমার মনের কথাই বা তুমি জানলে কি করে?

আমার মনের কথাই বা তুমি জানতে পারো কি করে?

আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা নয়।

হলে খুশি হও?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হইনে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশি ভাববে না এই আমি চাই।

উত্তরে বলিলাম, সেই সে-যুগের মানুষ তুমি—সেই হাজার বছরের পুরানো সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হ'তে পারি। এমনই যেন চিরদিন থাকি। এই বলিয়া সে কলকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ যুগের মেয়েদের আমি দেখিনি তুমি ভাবচো? অনেক দেখেছি। বরঞ্চ তুমিই দেখনি, কিংবা দেখেচো কেবল বাইরে থেকে। এদের কারুর সঙ্গে আমাকে বদল করো ত দেখি কেমন থাকতে পার? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাক্ষত্ব দিয়েছি বলে, তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাকে খত।

কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয় তখন বগড়া করে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বলতে পারি, এদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করেছ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি কবেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করিনি তা বলতে পারি। ওগো গোসাঁই, আমিও যে অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি। ওনিয়া যেখানে অন্ধ, খাতেও যে আমাদের দশজোড়া চোখ খোলা।

কিন্তু সে দেখেচো রঙীন চশমা দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচো। দশজোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বোলব আমার হাত-পা বাঁধা—নইলে এমন জন্ম করতুম যে অন্ধ ভুলতে না। কিন্তু সে থাক গে, আমি সে-যুগের মত তোমার দাসী হ'রই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেব না। সংসারে তোমার অনেক কাজ—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্যে তোমার অনেক সময় এবং আরও অনেক কিছু গেছে—আর নষ্ট করতে আমি দেব না।

বলিলাম, এই জনেই ত আমি বস্তু নীত্য় পারি সেই সাবেক চাকরিত্ব নিয়ে ভর্তি হতে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরি করতে তোমাকে ত দিতে পারব না।

কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি শেরে উঠব না।

কেন শেরে উঠবে না?

প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকী কিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান ত উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালটি না বাধলে বাঁচি।

তবে একটা কপড়ের দোকান কর?

তার চেয়ে একটা জ্যোত বাঘ-ভালুকের লোকান করে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিরা ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা করে কি শেষে ভগবান এমনি একটা অকর্ম্য মানুষ আমাকে দিলেন, যাকে নিয়ে সসোরে এতটুকু কাজ চলে না।

বলিলাম, আরাধনার ক্রটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে, এখনো কর্মঠ লোক তোমার মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্ট নীরোগ বেঁটেখাটো জোয়ান, যাকে কেউ হারাতে কেউ ঠকাতে পারবে না, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে টাকাকড়ি দিয়ে নির্ভর, যাকে খবরদারি করতে হবে না, ভিড়ের মধ্যে যাকে হারিয়ে ফেলবার উৎকণ্ঠা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে আনন্দ—হী ছাড়া যে না বলতে জানে না—

রাজলক্ষ্মী নির্বাকমুখে আমার প্রতি চাহিয়াছিল, অকস্মাৎ সর্বাস্থে তাহার কাঁটা নিয়া উঠিল।

বলিলাম, ও কি ও?

না, কিছু না।

তবে শিউরে উঠলে যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে মুখে যে ছবি তুমি আঁকলে তার অর্ধেক সত্যি হলেও বোধ হয় আমি ভয়ে মরে যাই।

কিন্তু আমার মত এমন অকর্ম্য লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করবো আর কি! ভগবানকে অভিসম্পাত করবো, আর চিরকাল জ্বলেপুড়ে মরবো। এ-জন্মে আর ত কিছু চোখে দেখিনে।

এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুরে আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

তাদের ফুল তুলে দেব। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাকব, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলভলার সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন সন্ধ্যায় নিয়ে যাবে গ্রীষ্ম প্লেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সে সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনোদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে, কোনোদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত যদি কেউ কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, এখানে থাকে আমাদের নতুনগোঁসাই। এ যে একটু উঁচু—এ যেখানটার ওকনো মল্লিকা-কুন্দ-করবীর সঙ্গে মিশে বরা-বকুল সব ছেয়ে আছে—এখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া অসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানিনে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হ'লো না। সে বকুললতা ছেড়ে আর যাবে না। পাছের ডালে ডালে করবে পাবিরা কলরব, গহিবে পান, করবে লড়াই—কত করিয়ে ফেলবে ওকনো পাতা, ওকনো ডাল, সে-সব সুভ করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রায়ে সবাই ঘুমোলে শোনাবে ঠাকুর বৈষ্ণব-কবিরের পান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতামিদি, আমাদের এক করে দিও সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আল্লা বললে চেনা না যায়। আর এই নাও টাক, দিও মন্দির গড়িয়ে, ক'রো রাখাবুকের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু মিথো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কেই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হ'লো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এত কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি। তবুও যে এখানে! আমি পারব, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আল কথার ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে। কি করে জানলে?

জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশি জানি। এ ত আমার পূজো, এ ত আমার ধ্যান। আহিক শেষ করে কার পারে নিই জলাঞ্জলি? কার পারে নিই ফুল? সে ত তোমারই।

নীচে হইতে মহাৰাজের ডাক আসিল, মা, রতন নেই, চায়ের জল তৈরি হয়ে গেছে।

বই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখন উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে রাবিয়া দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এত ভালোবাসো, এখন থেকে তাই কেন করো না?

তাতে টাকা ত আসবে না?

কি হবে টাকা? টাকা ত আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর। আনন্দ ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলব আমার মনের মত করে। ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্যপাশে হবে আমার ঠাকুরঘর। এ জন্মে রইল আমার ব্রিডুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর? আনন্দ সন্ন্যাসী-মানুষ, ওখানে চোখ না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না, কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি কবে? কবে আসবে সে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েছেন কুশারীমশাই—আনন্দ আসবে বলেছে খুব শীঘ্র, তারপরে সকলে মিলে যাব গঙ্গামাটিতে—থাকব সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে এবার তোমার লজ্জা করবে না?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিতহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা ত কেউ জানে না কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে এও সেজেছিলাম? চুল আমাব অনেকটা বেড়েছে, আর নাক গেছে বেমালাম জুড়ে—দাগটুকু পর্যন্ত নেই। আর তুমি যে আছ সঙ্গে, আমার সব অনায়াস সব লজ্জা মুছে দিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পয়েছি সেই হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে, সঙ্গে এনেছে তার স্বামীকে। আমি তারে দেব একটা হার গাড়িয়ে।

বলিলাম, তা দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে যদি সুনন্দার পান্নায় পড়

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না গো না, সে ভয় নেই, তার মোহ আমার কেটেছে। বাপারে বাপ : এমনি ধর্মবুদ্ধি দিলে যে দিনেবাতে না পারি চোখের জল থামাতে, না পারি ষেতে ওতে। পাগল হয়ে যে যাইনি এই ঢের। এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তোমার লক্ষ্মী আর বাই-হোক, অস্থির মনেব লোক নয়। সে সত্যি ব'লে একবার যখন বুঝবে তাকে আর কেউই টলাতে পারবে না। একটুখানি নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, আমার সমস্ত মনটি যেন এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয় এ জীবনের সমস্ত পেয়েছি আর আমার কিছু চাইনে যদি না ভগবানের নির্দেশ হয় ত আর কি হবে বল ত? প্রতিদিন পূজো করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করিনে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়। এইত আনন্দ-ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছি তার কাছে এখন থেকে কিছু কিছু সাহায্য কনবো বলে।

বলিলাম, ক'রো!—রাজলক্ষ্মী নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল, সহসা বলিয়া উঠিল, দ্যাখো, এই সুনন্দা মেয়েটির মত এমন সৎ, এমন নির্লোভ, এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখিনি, কিন্তু ওর বিদ্যের বাঁজ যতদিন না মরবে ততদিন ও-বিদ্যো কাজে লাগবে না।

কিন্তু সুনন্দার বিদ্যো দর্প ত নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, ইতরের মত নেই—আর সে-কথাও : : বলিনি। ও কত মোক, কত শান্ন-কথা কত-গল্প-উপাখ্যান জানে, ওর মুখে শুনে শুনে আমার ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নই, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে—আর তাই ত বিশ্বাস : : তে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে খাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। তবেই দ্যাখো ওর বিদ্যের মধ্যে কোথায় মস্ত ভুল আছে। তাই দেখি ও কাউকেও সুখী করতে পারে না, সবাইকে শুধু দুঃখ দেয় : : কিন্তু ওর বড় জা ওর চেয়ে অনেক বড়। সাদামাটা মানুষ, লেখাপড়া জানে না, কিন্তু মনের তেজস্বী দয়া-মায়ার ভরা। কত দুখী দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে—কেউ জানতে পার না। এ যে ভীতীনের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হ'ল সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হ'তো? তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে

কতরাতেই হয়েছে ভাবো? কখনো না। সে করেছে ওর বড় জা কেঁসেকেটে ঘাসির পায়ে ধরে। সুন্দরী সমস্ত সঙ্গারের কাছে ওর গুরুজন ভাতরকে চোর বটে। ছোট করে নিলে—এইটাই কি শাস্ত্রানুসার বড় কথা? ওর পুত্রের বিয়ে করতিনি না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাণ-পুষ্ট, লোভ-মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিজে পারবে ভতরনি ওর বইয়ে-পড়া কর্তব্যজ্ঞানের বল মানুষকে অবস্থা বিধবে, অভ্যাসের করবে, সঙ্গারে কাউকে কল্যাণ দেবে না তোমাকে বলে নিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব তুমি শিশুরে কার কাছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে। হয়ত তোমার কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা ও কেবল শেখা নয়, সত্যি করে পাওরা। হঠাৎ একদিন আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয় এসব এলো কোথা থেকে। সে যাকগে, এবার গিরে কিন্তু বড় কুশারীগিরীর সঙ্গে ভাব করবো, সেবার তাঁকে অবহেলা করে যে ভুল করেছি, এবার তার সংশোধন হবে। যাবে পরামর্শটিতে?

কিন্তু বর্মা? আমার চাকরি?

আবার চাকরি? এই যে বললুম, চাকরি তোমাকে আমি করতে দেব না।

লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বল না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারও ওপর—বাঁটি বৈকল্য-ভিত্তিকার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

তাই বলে যার যা খেরাল তাতেই সার নিতে হবে? সঙ্গারে আর কাবও সুখ-দুঃখ নেই নাকি? তুমি নিজেই সব!

ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া! সে স্নেহের ভরও করেনি, সে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আচ্ছ! হয়ত আমাকে তুমি পেতে না। আচ্ছ তাদের কি হলো এ কথা একবার ভাববে না?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতার বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো, আনন্দ ঠাকুরগোকে নিয়ে আমি বাই, বর্মার গিরে তাঁদের ধরে আনিগে। কোন একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমাত্রী, আমি না গেলে হয়ত আসবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেচ তাদের নিতে। সেখো আমার কথা ভুল হবে না। কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে ত?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা হুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কষ্টে ধীরে ধীরে বলিল, সেই-ই আমার ভর। হয়ত পারব না; কিন্তু তার আগে চল না গিরে দিনকন্তক থাকি গে পরামর্শটিতে।

সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে একটু। কুশারীশর্শই খবর পেয়েছেন পাশের পোড়ামাটি গাঁ-টা তারা বিক্রি করবে। ওটা ভাবটি কিনব। সে বাড়িটাও ভালো করে তৈরি করাব, যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবারে সেখটি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হ'তো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হ'তো না, কষ্ট হ'তো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথা কান দিল না, বলিল, আমি সেখটি সেখানে তোমার বাহ্য ভালো থাকে—বেশিদিন শহরে রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয় না, তাই ত তাড়াতাড়ি গিরে নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এই ভরুর সেক্টাকে ধীরে বসি অনুগ্রহ তুমি এত বিব্রত থাকো, যেন শান্তি পাবে না লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ উপদেশ বুঝ কাজের, কিন্তু আমাকে না গিরে নিজে যদি একটু সাবধানে থাকে হয়ত সত্যিই শান্তি একটু পেতে পারি।

তুমি হুপ করিয়া রহিল। কারণ এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রীতিকর। তাহার বিচারে প্রায় অসম, কিন্তু সে প্রীতিভর্য বাহ্যের নহি, বিনামূল্যেও যে তাহার অনুগ্রহ করিতে পারে এ কথা সে কিছুমাত্র ভুলিবে না।

বলিলাম, শহরে যদি কেদারবাসই থাকতে চাইনে। সেদিন পরামর্শটি আমার ভালোই লাগেছিল, কিন্তু তাহার ফলক অসিদ্ধি—এ কথা আমার তুমি ভালো পেরে লক্ষ্মী।

না গো না, তুলিনি। সারাজীবনে তুলব না—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। হাসিল, সেবারে তোমার মনে হ'তো যেন কোন অচেনা জায়গায় এসে পড়েচো, কিন্তু এবারে গিরে দেখেও তার আকৃতি-প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে, তাকে আপনার বলে বুঝতে একটুও গোল হবে না। আর কেবল ঘরবাড়ি থাকবার জায়গাই নয়, এবার গিরে আমি বদলাব নিজেকে, আর সবচেয়ে কলসে জ্বলন্ত গড়ে তুলব নতুন করে তোমাকে—আমার নতুন-গোঁসাইজীকে। কমললতানি আর যেন না দাবি করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে। বলিলাম, এইসব বুঝি ভেবে ভেবে হির করেছো? রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিদ্যামূল্যে অমনি অমনিই নেব—তার কণ পরিশোধ করবো না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাব না? এমনিই নিষ্কলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেব না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—সংসারে নিত্য নিরন্তর ঘটিয়া চলিয়াছে, বিবাহ নাই, বিশেষত্ব নাই; আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তিবিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিভিন্ন বিষয় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিভূত করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বহু কি করবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে ত আমাকে আর চায় না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

কিন্তু সে যে তোমার নিকট-আত্মীয়—তাকে যে ছেলেবেলার মানুষ করে তুলেচো!

সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মানব না। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

কেন নয়? অস্বীকার করবে কি করে?

অস্বীকার কবাব ইচ্ছে আমারও ছিল না, এই বলিয়া সে কণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা তুমিও জানো না। আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে?

শুনছিলাম লোকের মুখে; কিন্তু ভখন ত আমি দেখেছিলাম না।

না ছিলে না। এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় কোথাও হয়নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যাননি, আমিও কখনো তাঁকে দেখিনি। আমার দু'বোনো আমার বাড়িতেই মানুষ। ছেলেবেলা জ্বরে জ্বরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত?

আছে।

তবে শোন। বিনাদোষে শাস্তির পরিমাণ শুনেলে তোমার মত নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হবে। জ্বরে ভুগি, কিন্তু মরণ হয় না। মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত, হঠাৎ খবর জুটলো দত্তদের বামুনঠাকুর আমাদের ঘর, মামার মতই স্বভাব-কুলীন। বয়স বাটের কাছে। আমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে তাব হাতে দেওয়া হবে। সবাই বললে এ সুযোগ হারালে অহিবুড়ো নাম আর ওদের বশাবে না। সে চাইলে এক-শ', মামা পাইকিরি দর হাঁকলে পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে একসঙ্গে—মেহন্নত কম। সে নাহলো পঁচাত্তরে; বললে, মশাই, দু'সুটো ভাগনিকে কুলীনে পার করবেন, একজোড়া রামছাগলের দাম দেবেন না? ভোর-রাতে লগ্ন, দিদি নাকি জেগে ছিল, কিন্তু আমাকে পুঁচলি বেঁবে এনে উদ্ভূত করে দিলে। সকাল হতে বাকি পঁচিশ টাকার জন্যে কণড়া গুজ হ'লো। মামা বললেন, খারে কুশটিকে হেঁক, সে বললে, সে অত হায্য নয়, এসব কারবারে খরখোর চলবে না। সে গা-ডাক দিলে বোধ হয় ভাবলে মামা খুঁজেপেটে এনে তাকে টাকা দিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন বার, দু'দিন বার, মা কাঁদাকাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিরে দত্তদের কাছে নালিশ করেন, কিন্তু বর আর এলো না। তাদের গাঁয়ে বোঁহ নেওয়া হ'লো, সেখানে সে যারনি। আমাদের দেখিয়ে কেউ কল আধকপালী, কেউ বলে পোড়াকপালী—দিদি লজ্জায় ঘরের বার হয় না—সেই বর থেকে হ'মস পদে বার করা হ'লো একেবারে স্থানান্তরে। আরও হ'মস পরে কলকাতার কোন একটা হোটেল থেকে বরও এল বরও সেখানে রাখতে রাখতে জ্বরে মরচে। বিয়ে আর পুরো হ'লো না। বলিলাম, পঁচিশ

টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐরকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত সে আমার ভাগে পচিশ টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি? শুধু একছড়া বইটির মালা—তাও কিনতে হয়নি—বন থেকে সংগ্রহ হয়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অনুলা বলে। আর একটা মানুষ দেখাও ত যে আমার মত অনুলা বন পেয়েছে?

তুমি বলো ত এ কি তোমার মনের সত্যি কথা?

টের পাও না?

না গো না, পাই নে সত্যি পাইনে—কিন্তু বলিতে বলিডেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ছুমো—তোমার মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু সে-কথা যাক। আমাদের দু'বোনের মত শান্তিভোগ এদেশে কত শত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দৃষ্টি করতে মানুষের বুক বাজে। এই বলিয়া সে কক্ষকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয়ত তুমি ভাবচো আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর কটা মেলে? এর উত্তরে যদি বলতুম একটা হ'লেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক; তাতেও আমার জবাব হ'তো কিন্তু সে আমি বলবো না। আমি বলবো, অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই সব বিধবাদের কাছে, বাদের আমি অজস্র সাহায্য করি? তারা সবাই সাক্ষ্য দেবেন, তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে আশ্রয়বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মার?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হ'তো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দু'খটা দেখতে। এখন থেকে একটি একটি করে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাব।

আমি দেখব না, চোখ বুজে থাকব।

পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাব আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবে না। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ নিজের পূর্বকথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই ত এমনি অভ্যাচার। যে-দেশে মেয়ের বিয়ে না হলে ধর্ম যায়, জাতি যায়, লজ্জার সমাজে মুখ দেখাতে পারে না—হযা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই—সেখানে একটাকে ধাঁক দিয়ে লোকে অন্যটাকেই রাখে, এ ছাড়া সে-দেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই মিলে আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না পিত, মিদি হয়ত মরত না, আর আমি—এজন্মে এমন করে তোমাকে হয়ত পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর, তাই বা কেন? আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিনে হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ নীচে হইতে বালক-কণ্ঠে ডাক আসিল, মাসিমা?

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

ও-বাড়ির মেজবোয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইস্তিতে পাশের বাড়িটা দেখাইয়া সাড়া দিল কিস্তীশ, ওপরে এসো বাবা!

পরক্ষণেই একটি ঘোল-সভেরো বছরের সূতী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকে সেখিয়া প্রথমটা সন্তুষ্ট হইল, পরে নমস্কার করিয়া তাহার মাসিমা-কেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু ব্যরো টকল চাঁদা পড়েছে মাসিমা।

তা পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবখানে সীতার কেটো, কোনো দৃষ্টিনা না হয়।

না—কেন ওর নেই মাসিমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া তাহার হাতে টাকা দিল, ছোটটি দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ পাড়াইয়া কহিল, যা বলে দিলেন ছোটবাবা পরও সকালে এসে সমস্ত এন্টিসেট করে দেবেন। বলিয়াই উৎসর্গাসে প্রস্থান করিল।

প্রস্থ করিলাম, এন্টিসেট কিসের?

বাড়িটা সেরানত করিতে হবে না? ভেকলার খরটা আখবান্য করে তায়া কলে রেখেচে, পুরো

করতে হবে না?

তা হবে, কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি করে?

বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ির লোক; কিন্তু আর না, যাই—তোমার খাবার তৈরির সময় ছুঁবে গেল। এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

তের

এক সকালে স্বামীজী আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে রতন জানিত না, বিষয়মুখে আসিয়া আমাকে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েছে। বলিহারি তাকে, খুঁজে খুঁজে বাঁর করেছে ত!—রতন সর্বপ্রকার সাধুসম্মানকেই সম্মানের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, সেখুন, এ আবার মাকে কি মতলব দেয়। টাকা বার করে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্মিক ব্যাটার! জানে।

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ বড়লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাশ করেছে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

হঃ—বড়লোকের ছেলে! টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এপথে যায়। এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ বার করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বহুমান্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর ভালো ত? দিদি কই?

বোধ হয় পুজোয় বসেচেন, সংবাদ পাননি নিশ্চয়ই।

তবে সংবাদটা নিজে দিই গে। পুজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পুজোর ঘরটা কোন্ দিকে দাদা? নাপতে ব্যাটা গেল কোথায়—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পুজার ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশ্যে একটা হুকুর ছাড়িয়া সেইদিকে প্রস্থান করিল।—মিনিট-দুই পরে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি, গোটা-পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসি গে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে আনন্দ, অত দূরে যেতে হবে কেন? আর তুমিই বা যাবে কিসের জন্যে, রতন যাক না।

কে, রত্না? ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেছি বলেই হয়ত ও বেছে বেছে পচা মাছ কিনে আনবে—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া; কিন্তু কাটিয়া বলিল, রতন লোব নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও-পাড়ায় গেছ—ডেকে সাড়া পাইনি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। রতন কিন্তু ব্রূক্ষেণ করিল না, গভীর মুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্ছি মা, কিষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে।—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দের বুঝি বনে না?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারি নে দিদি। ও আপনার হিতৈষী—বাজে লোকজন বেঁচেতে দিতে চায় না; কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়টা ভালো হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারন্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোচাকরেক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে একটা রুইমাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মুখহাত ধুয়ে এসো পে ভাই, আমি চা তৈরি করে আনছি। এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল। আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ মতলব হ'লো কেন?

সে কৈফিয়ত কি আমার দেবার, আনন্দ?

আনন্দ সহাস্যে কহিল, দাদার দেখছি এখনো সেই ভাব—রাগ পড়েনি। আবার পা-ঢাকা দেবার মতলব নেই ত? দেবার গঙ্গামাটিতে কি হাজামাতেই ফেলেছিলেন। এদিকে দেশ-সুখ লোকের

সেহস্ত, ওনিকে বাড়ির কঠী নিরুদ্দেশ। মাঝখানে আমি—নতুন লোক—এনিকে ছুটি, ওনিকে ছুটি, মিনি পা ছড়িয়ে কীলতে বসলেন, রতন স্নেহক ভাড়াবার উদ্যোগ করলে—সে কি বিদ্রোহ! আচ্ছা মানুষ আপনি।

আমিও হাসিরা কেলিলাম, বলিলাম, রাগ এবারের পড়ে গেছে, ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভয়সেও নেই। আপনাদের মত নিসঙ্গ, একাকী লোকদের আমি ভয় করি। কেন যে নিজেকে সংসারে জড়তে দিলেন তাই আমি অনেক সময়ে ভাবি।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট। মুখে বলিলাম, আমাকে লেখি তা হলে ভোলোনি, মাঝে মাঝে মনে করতে?—আনন্দ বলিল, না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, খোঁজাও শক্ত, মারা কটানো আরও শক্ত। বিশ্বাস না হয় বলুন, মিনিকে ডেকে সাক্ষী মানি। আপনার সঙ্গে পরিচয় শু্যাম দু-তিনদিনের, কিন্তু সেদিন যে মিনির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও কীলতে বসিনি—সেটা নিতান্তই সন্ধ্যাপী-ধর্মের বিরুদ্ধ বলে।

বলিলাম, সেটা বোধ হয় মিনির বাড়িরে। তাঁর অনুরোধেই ত এতদূরে এলে।

আনন্দ বলিল, সেহস্ত মিথ্যে নয় দাদা। তাঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয়, যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে শুরু করে। রক্ত হয়েই তো আমার নিই, কিন্তু ঠিক এমনটি আর দেখিনি। আপনিও ত শুনেছি অনেক ঘুরেছেন, কোথাও দেখেছেন এর মত ২২ একটি?

বলিলাম, অনেক—অনেক।

রাজলক্ষ্মী ধবোশ করিল। ঘরে ঢুকিরাই সে আমার কথাটা ওনিতে পাইরাছিল, চারের বাটিটা আনন্দের কাছে রাবিরা নিরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক পা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিশপন্ন হইরা পড়িল, আমি বলিলাম, তোমার ওপের কথা। উনি সবেহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই আমি সঙ্গেসঙ্গে তার প্রতিবাদ করিলাম।

আনন্দ চারের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল, হাসির ভাড়ার বানিকটা চা মাটিতে পড়িরা গেল। রাজলক্ষ্মীও হাসিরা কেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপহিত বুদ্ধিটা অদ্ভুত। ঠিক উণ্টোটি চক্কের পলকে মাথায় এলো কি করে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশ্চর্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর পর বানিয়ে বলতে বলতে এ বিস্তার উনি একেবারে মহামহোপাখ্যার হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তা হলে ভূমি বিশ্বাস করো না?

একটুও না।

আনন্দ হাসিরা কহিল, বানিয়ে বলার বিস্তার আপনিও কম নয় মিনি। তৎকথাং জবাব দিলেন—একটুও না।

রাজলক্ষ্মীও হাসিরা কেলিল, বলিল, জলেপুড়ে শিখতে হয়েছে তাই। ভূমি কিন্তু আর সেরি ক'রো না, তা খেয়ে রান করে নাও, কল পাকিতে তোমার যে খাওয়া হয়নি তা বেশ জানি। তাঁর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনেতে পেলে তোমার সমস্ত দিনে কুলোবে না। এই বলিরা সে চলিরা গেল।

আনন্দ বলিল, আপনাদের মত এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশ্চর্য মিল করে আপনাদের দুনিয়ার পরিচয়করিলেন।

আমি নতুন সেখানে ছি?

নতুন সেই প্রথম দিনে রাইবিরা স্টেশনে পাহতলাতেই সেবেছিলুম। তারপরে আর একটিও কখনো মেল পড়ল না।

আচ্ছা! কথাগুলো বহির্ভূত সমসেই বলতে আনন্দ।

আনন্দ বলিলে লোক, কইয়ের উদ্যম ও শক্তি ভাঙার বিপুল। তাহলে কহে পাইরা রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। নিজস্বের শক্তির অয়োজন ও এর ভয়ের সেক্ষেত্র নিজ প্রকৃতি। অবিস্ময় দুহস্তের বক্ত পলাইরাই যে হয় তারপর সবচেয়ে আমি না, শুধু কখনে আপনিয়ে যে,

গলামাটিতে একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের ইয়ুল খোলা হইবে। ওখানে বিস্তার গরীব এবং ছোটজাতের লোকের বাস, উপলক্ষ বোধ করি তাহারাই ; ওনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও চলিবে। এই-সকল বিষয়ে কোনদিন আমার কিছুমাত্র পটুতা নাই। পরোপকারের বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের নূতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গেছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িয়ে না আনন্দ, তোমার সমস্ত সম্বল পণ্ড হয়ে যাবে।

ওনিতে প্রতিবাদ করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে আমার অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে।— রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েছে গোসাই, এমন কথা আর কখনো মুখে আনব না।

তবে কি কোনদিন কিছুই করব না?

কেন করবে না? কেবল অসুখ-বিসুখ করে আমাকে ভয়ে আধমরা করে তুলো না, তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আনন্দ কহিল, দিদি সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো করে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবে না, ভাই, যে-বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন—কোথাও ত্রুটি রাখেন নি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোপক্কার পোড়ামুখো এমন ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, উনি বাড়ির বাঁর হলে আমার বুক চিপচিপ করে—যতক্ষণ না ফেরেন কিছুতে মন দিতে পারিনে।

এর মধ্যে আবার গোপক্কার ভুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাতে দেখে সে বললে, মস্ত ফাঁড়া—জীবন-মরণের সমস্যা।

দিদি, এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হ্যাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন, ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটে না?

আনন্দ হাসিয়া কহিল ঘঠতে পারে, কিন্তু হাত শুণে বলবে কি করে দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানিনে ভাই, শুধু আমার ভলস আমার মত ভা... ভী যে, তাকে কখনো ভগবান এত বড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ স্তম্ভমুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ির লেখাপড়া, বিলি-ব্যবহার কাজ চলিতে লাগিল, রাশাকৃত ইট-কাঠ, চুন-চুরকি, দরজা-জানালা, আসিয়া পড়িল—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা, চলুন একটু ঘুরে আসি গে।

ইদানিং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল, ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হবে—যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবে না?

আনন্দ বলিল, গরমে লোকে সারা হচ্ছে। ঠাণ্ডা কোথায়?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালো ছিল না, বলিলাম, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ উঠতেও ভেতন ইচ্ছে হচ্ছে না আনন্দ।—আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সন্ধ্যোটা ঘরে বসে থাকলে অনিচ্ছে আরো চেপে ধরবে—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে একটা কাজ করিনে আনন্দ? ক্রিডীল পরন্তু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়াম কিনে দিয়ে গেছে, এখনো সেটা দেখবার সময় পাইনি। আমি দুটো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা দুজনে বসে শোনো—সন্ধ্যোটা কেটে যাবে। এই বলিয়া সে

রতনকে ডাকিয়া বাজটা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিশ্বয়ের কণ্ঠে গ্রন্থ করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি দিদি?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

দিদির কি সে বিষয়েও আছে নাকি?

সামান্য একটুখানি! তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলেবেলায় ঐর কাছেরি হাতেখড়ি।

আনন্দ খুশি হইয়া বলিল, দাদাটি দেখিচি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরল মনে তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ আনন্দ বুঝিবে না কিছুই, আমার আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয়-বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুরশোকাভূর ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়াম আসিলে শ্রবণে, সচর।চর প্রচলিত দুই-একটা 'ঠাকুরদের' গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুখচিহ্নে কহিল, এ কি সমস্তই ঐর কাছে শেখা দিদি।

সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ?

সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করিতে হবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

শরীরের জন্য আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না?

রাখবার জো নেই হে, শরীর বড় খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল, দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন?

আমি বলিলাম, যীরা অর্থের পরিবর্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে। আমার কাছে নয় হে, দাদা! কখনো এ বিদ্যার ধার দিয়েও চলেন নি!

আনন্দ ঋণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশি শেষবার সময় পাইনি। সুযোগ যদি হ'লো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করব। কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ ত সময় নেই ভাই, তোমাদের খাবার তৈরি করতে হবে যে।

আনন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর, সময় তাঁদের কম। কিন্তু বরসে আমি ছোট, আপনার ছোটভাই, আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করব।

রাজলক্ষ্মী সেহে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাচ্ছন্দ্য দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি বতটুকু জানি তোমাকে আদর করে দেখাব।

কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি? রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

আনন্দ আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, দাদার মত ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ? ভগবান তাহের হাল ধরবার মজবুত লোক সেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায়—কোন কালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এমন করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় ভায়া, কথাটা মিলিয়ে দেখো, গ্রহণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল—তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিন কয়েকের মধ্যেই বাড়ির কাজ শুরু হইল; রাজলক্ষ্মী জিনিসপত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া তাহার যাত্রার আরোজন করিতে লাগিল; বাড়ির ভার রহিল বুড়া ভুলসীদাসের 'পয়ে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চারপাড়া জোড়া

চিঠির এই জবাব এল—পড়ে দেখ। বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলী অক্ষরে গুটিদুই-তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে, সুখেই আছি বোন। যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার দায় যে তাঁদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়োগোসাইজী তাঁহার আনন্দময়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপ্রিতা—কমললতা

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই। কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম একফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই! কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্রতপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মী—কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি—কমললতার—অপরিস্ফুট, অজানা—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিল, বলিল, স্বানের সময় হয়েছে বাবু, মা বলে দিলেন। স্বানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার জো নাই।

আবার একদিন সকলে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবারে আনন্দ ছিল অনাহুত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়িতে ভিড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয়-অনাত্মীয় কত লোকই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল শ্রবণ।

রাজলক্ষ্মী স্নানার্থী গৃহিণীকে শ্রদ্ধা করিল; সুন্দর রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটা ভাল দেখাচ্ছে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমি ত পারলুম না, এবার তোমরা যদি পার এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেললুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিন্নীর বোধ হয় মনে পড়িল, স্নেহপ্রকটে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এদেশের জল-হাওয়ায় উনি দুদিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না, কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা!

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে শুরু হইল। পোড়ামাটি ক্রয় করার কথাবার্তা দামদস্তুর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানাঙ্কষণ প্রভৃতি কিছুতেই কাহারো আলস্য রহিল না।

ওধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত এ আমার ভাব, হয়ত বা ইহা আর কিছু একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ওদাসো কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসম্ভব। আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন আছি কখন নাই। অথচ কোন অসুখ নাই, খাই-দাই থাকি। আনন্দ তাহার ডাক্তারিবিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়াচাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই। রাজলক্ষ্মী স্নেহে অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওঁকে টানাটানি করে কাঁচ নেই ভাই, কি হতে কি হবে। তখন আমাদেরই ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে ব্যবস্থা করছেন ভোগার মাত্র এতে বাড়বে বৈ কমবে না দিদি। এ আপনাকে সাবধান করে দিছি।

রাজলক্ষ্মী সহজেই স্বীকার হইয়া বলে, সে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্ত গলে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না।

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিত যে কর্মের প্রেরণা আমাদের নাই, লড়াই করিয়া হটে-পুটে করিয়া সংসারের দশজনের খাড়ে চড়িয়া বসার সাধাও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই

তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়িঘর টাকাকড়ি বিবর-আশয় মানসস্ত্রম এ-সকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদিবা কখনো কর্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই অচিরকাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছে—শত ঠেলাঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি একটা বিবরে তন্ত্রাত্তর মন কলরবে ভরলিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুত্রের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে গুনতে পাই বৈকুণ্ঠী কমললতার সঙ্গের অনুরোধ—নতুনগোসাঁই এইটি করে দাও না ভাই! ঐ যাঃ—সব নষ্ট করে দিলে? আমার খাট হয়েছে গো, তোমার কাজ করতে বলে—নাও ওঠো। পদ্মা পোড়ারমুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক না, চা খাবার যে তোমার সময় হয়েছে গোসাঁই।

সেদিন চায়ের পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিত পাছে ভাসে। আজ তাহাদের গ্রয়োজন গেছে ফুরাইয়া, তথাপি কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কিনা। জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুত্র আজন্ম দিন তাহার প্রতিদিন সংকিশ্ন হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌছবে। নিরাশ্রয়, নিঃস্বপ্ন, পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সাধনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্বাস কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ আঙ্গুল দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুগ্রস্র মুখে শক্তি ও পরিতৃপ্তির স্খিৎ ছায়া; করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্বব্যাপী মহিমায় আমার চিন্তালোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত, তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদূষী সুনন্দার দুর্নিবার্য প্রভাব স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সম্মুখে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো, কম নও। তোমার চলে যাবার পথ বেয়ে সর্বথ য়ে আমার চোখের পলকে ছুটে পালাবে এ কে জানত বলে? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিনগুলো আমার কেটেছিল কি করে? দম বন্ধ হয়ে মরে যাইনি এই আশ্চর্য। আমি উত্তর দিতে পারি না শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্মুখে আর তাহার ক্রটি ধরিবার জো নাই। শতকর্মের মধ্যেও শতবার অলস্বে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাৎ আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুজে একটুখানি ওস্ত পড়ো ত, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই? অত পড়লে চোখ বাথা করবে যে!

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে—আসতে পারি কি? রাজলক্ষ্মী বলে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ? আনন্দ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, এই অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্ছেন নাকি? রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হ'লো কি? না ঘুমোলেও ত তোমার পাঠশালার বাছুরের পাল চরাতে যাবেন না?

দিদি দেখিচি ওঁকে মাটি করবেন।

নইলে নিজে যে মাটি। নির্ভাবনায় কাজকর্ম করতে পারিনে।

আপনারা দু'জনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইন্ডুল তৈরির কাজে আনন্দের নিশ্বাস ফেলিবার ক্রয়সত নাই। সম্পত্তি ধরনের হাজামায় রাজলক্ষ্মী পলদ্বন্দ্ব, এমনি সময়ে কলিকাতার বাড়ি ঘুরিয়া বহু ডাকঘরের ছাপছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের পাংখাতিক চিঠি আসিয়া পৌছিল—গহর মৃত্যুশয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে। খবরটা আমাকে যেন শূন্য দিয়া বিধিল। ডাকিনীর কাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে জানি না। সে যে এতদূর পীড়িত তাহাও শুনি নাই—ওনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সংবাদ। দিন-ছয়েক পূর্বের চিঠি, এখনো বাঁচিয়া আছে কি না তাই বা কে জানে? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এদেশেও নাই, সে-দেশেও নাই। ও চিন্তা কৃথা।

চিঠি পাইয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল—তোমাকে যেতে হবে ত!

হাঁ।

চলো আমিও সঙ্গে যাই।

সে কি হয়? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথায়!

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুত্র আখড়ার কথা আর সে মুখে অনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর, সঙ্গে যাবে কে? আনন্দকে বলব?

না। আমার তল্লি বইবার লোক সে নয়।

তবে কিষণ সঙ্গে যাক।

তা যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলাও?

সময় পেলে দেব।

না, সে শুনব না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাব, তুমি যতই রাগ করো।

অগত্যা রাজী হইতে হইল এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেছে, সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মত সাবধান করিয়া কহিল, শরীরের অবহেলা করবে না বলাও।

না গো, না।

ফিরতে এ দশ দিনও বেশি দেরি করবে না বলাও?

না, তাও করব না। অবশেষে গরুর গাড়ি রেল-স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করিল।

আখড়ার এক অপরাহ্নবেলায় গহরদের বাটীর সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের প্রবল কঠোর এই বুকফাটা কান্নায় শোকের একটা নূতন মূর্তি চোখে দেখিতে পাইলাম। সে যেমন গভীর তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা নাই, ভগিনী নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রুজলের মালা পরাইয়া এই সজ্জিহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহাকে সজ্জিহীন, ভ্রূষণহীন কাণ্ডালবেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকাঙ্করের যাত্রাপথে শেষ পাথের নবীন একাকী দু'হাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুকাল পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা যান নবীন?

পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

মাটি কোথায় দিলে?

নদীর তীরে, আমবাগানে। তিনিই বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো-বোনের বাড়ি থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, সে জ্বর আর সারল না।

চিকিৎসা হয়েছিল?

এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল—কিছুতেই কিছু হ'লো না। বাবু জিনেই সব জানতে, পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আখড়াব বড়গোসাইজী আসতেন?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নব্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেছেন, তাই রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বিতে লাগিল, তবু সফোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ আসত না নবীন?

নবীন বলিল, হাঁ, কমললতা।

তিনি কবে এসেছিলেন?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিনদিন তিনি খাননি, শোননি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একটিবার উঠেন নি। আর প্রশ্ন করিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন—আখড়ায়?

হী।

একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাস্র বাহির করিয়া আনিয়া আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি বলে গিয়েছেন।

কি আছে এতে নবীন?

খুলে দেখুন, বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি দিয়া বাঁধা তাহার কবিতার খাতাগুলি। উপরে লিখিয়াছে, শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ করার সময় হ'ল না। বড়গৌসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন, নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুটুলি। খুলিয়া দেখিলাম নানা মূল্যের একতড়া নোট এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে—ভাই শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচব না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানিনে। যদি না হয় নবীনের হাতে বাস্রটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম, কমললতার যদি কাছে লাগে দিও। না নিলে যা ইচ্ছে করো। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।—গহর।

দানের গর্ব নাই, কাকুতি-মিনতিও নাই। শুশু মৃত্যু। আসন্ন জানিয়া এই গুটিকয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভকামনা করিয়া তাহার শেষ নিবেদন রাখিয়া গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত চোখের জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু আর তাহার নিষেধ মানিল না, বড় বড় কঁটায় চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আহাটের দীর্ঘ দিনমান এখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিকস্থ ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তব উঠিছে উপরে, তাহারই কোন একটা সঙ্গীর্ণ ছিন্নপথে অত্যাশুখ সূর্যরশ্মি রাস্তা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর-সংলগ্ন সেই শুষ্কপ্রায় ভ্রামগাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাথারী ও মালতীলতার কুঞ্জ। সেদিন শুশু কুড়ি খরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাপিসিগড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ তাহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, কত খরিয়াছে তলায়, কত বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশেপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়িয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষদান মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি গে।

বলিলাম, নবীন, বাইরের ঘরটা একবার খুলে দাও না দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি ভক্তপোশের একধারে গুটানো, একটি ছোট পেলিল, কয়েক টুকরো হেঁড়া কাগজ—এই ঘরে গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা—বন্দিনী সীতার দুঃখের কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি, কতদিন বহিয়াছি, শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া গেছি, সেদিন হাসিমুখে যাহারা সহিয়াছিল আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া দ্বিবার ইহা আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম এমন একটি একটি ছোট নোটের পুটুলি তাহার ছেলের হাতেও গহর দিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বিষয়-সম্পর্কিত যাহা রহিল পাইবে তাহার মামাতোভাইবোনরা এবং তাহার পিতার নির্মিত একটি মসজিদের রক্ষাবেক্ষণের জন্য। আজন্মে পৌছিয়া দেখিলাম মস্ত ভিড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেক সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ ভাঁকিয়া বসিয়াছে এবং হাবভাবে তাহাদের শ্রীধ বিদায় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈকবসেবাধি বিধিমেতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন যেন একটা বিহত উদ্ভ্রান্ত ভাব—পূর্বে কখনো দেখি নাই। আল্লাহ খরিলাম হয়ত এতদিন খরিয়া এতগুলি বৈকব-পরিচর্যা তিনি ক্লান্ত, বিপর্বন্ত, নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্মা-আসিল, আজ তাহার মুখেও হাসি নাই। যেন সঙ্কুচিত—পলাইতে পারিলে বাঁচে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতাদিদি এখন বড় ব্যস্ত, না পদ্মা?

না, ডেকে দেব নিমিকে?—বলিয়াই চলিয়া গেল। এ-সমস্তই আজ এমন অপ্রত্যাশিত আপহাড়া যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমললতা আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এস

গৌসাই, আমার ঘরে বসবে চল।

আমার বিছানা শ্রদ্ধতি স্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমললতার ঘরে আসিয়া সেগুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায় অনেকগুলো টাকা আছে।

কমললতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা-খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

না। কখন এলে?

বিকেলবেলা।

যাই, তৈরি করে আনিগে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখহাও খোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

আবার মনে হইল ব্যাপার কি!

খানিক পরে কমললতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও-বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বক্ষণ অভ্যস্ত—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ আসিয়া পৌছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ! তোমার! তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ, মানে বারণ গৌসাই। অর্থাৎ ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রুচি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে?

বড়গৌসাইজী? গুরুদেব। আর তাঁর সঙ্গে এসেচেন যারা—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অগুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হন।

অগুচি তুমি, বিদ্যুৎধেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

হী ভাই।

কিছুই জানি না, তবুও অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে—এ ভবন্তব!

অসম্ভব কেন গৌসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মত—পথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্ধামী, তাঁর কাছে ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম গৌসাই।

সংসারের এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দু'জনেই স্বস্তি হইয়া রহিলাম। একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গৌসাইজী কি বলেন?

কমললতা কহিল, তাঁর ৩ কোন উপায় নেই। নইলে কোন সৈন্য যে এ মঠে আর আসবে না। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবে না, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি করে যেতে হবে তা ভাবিনি গৌসাই। কেবল কষ্ট হ্রস্ব পদ্মার কথা মনে করে ছেলেমানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড়গৌসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, গ্রামে নবদ্বীপে, দিদি চলে গেলে সে বড় কাদবে। যদি পার তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায় আমার নাম করে তাকে রাজুকে দিয়ে দিও—ওর যা ভাল সে তা করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে? নেবে না?

না, আমি ভিখিরি, টাকা নিয়ে আমি কি করবো বলা ত?

তবু যদি কখনো কাজে লাগে—

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, নতুন গৌসাইয়ের জন্যে প্রসাদ কি এ-ঘরেই আনব নিদি?

হী, এখানেই নিয়ে এস। চাকরটিকে দিলে?

হী, দিয়েছি।

তবু পদ্মা যায় না, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবে না নিদি?

খাবো রে পোড়ারমুখী, খাবো। তুই যখন আহিস তখন না খেয়ে কি দিমির নিজ্জার আছে? পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমললতাকে দেখিতে পাইলাম না, পদ্মার মুখে ওনিলাম সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানে না। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, রাত্রেই কখনো স্বপ্ন করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়গৌসাইজীর ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের সামান্য। তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।—হারিকাদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, তাই হবে নতুনগৌসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটি তুলে রাখব।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমললতার অপবাদ তুমি বিশ্বাস কর গৌসাই? হারিকাদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখনো না।

তবু ত তাকে চলে যেতে হচ্চে?

আমাকেও যেতে হবে গৌসাই। নির্দোষীকে দূর করে নিজে থাকি, তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

তবে কেহই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্তা ত তুমি—তুমি ত তাকে রাখতে পার?

ওহু! ওহু! ওহু! বলিয়া হারিকাদাস অথোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুকিলাম ওরুর আদেশ—ইহার অন্যথা নাই।

আজ আমি চলে যাকি গৌসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন; দেখি চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতিশ্রুত করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্নবেলা সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উজ্জ্বল হইয়া রাত্রি আসিল, কিন্তু কমললতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত, আমাকে স্টেশনে পৌছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিংবদন্তি করিতেছে—সময় আর নাই—কিন্তু কমললতা ফিরিল না। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই আসিবে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে ক্রমশঃ প্রত্যয়ে পীড়িত—সে আসিবে না। শেখবিনায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাস্থ হইয়া সে পূর্বাচ্ছেই পলায়ন করিয়াছে, দ্বিতীয় বস্ট্রিকুও সঙ্গে লয় নাই, কল আশ্রয়িত্রয় লিয়াছিল ভিক্টর বৈরাগিনী বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অকুর রাখিল।

যাবার সময় পদ্মা কানিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, নিদি বলো যে আমাকে চিঠি লিখতে—তোমার বা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখি জানিও পদ্মা।

কিন্তু আমি ত ভালো লিখতে জানিনে, গৌসাই।

তুমি বা লিখবে আমি তাই পড়ে নেব।

দিমির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি কই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

চৌক

সমস্ত পথ চোখ বাহুকে অন্ধকারেও বুজিতেছিল, ডাক্তার সেবা পাইলাম রেলওয়ে স্টেশনে। লোকের ভিড় হইতে দূরে পাড়িয়া আছে, আমাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, একবারি টিকিট কিনে নিতে হবে গৌসাই—

সত্যিই কি তবে সকলকে ছেড়ে চললে?

এ-ছাড়া ত আর উপায় নেই।

কষ্ট হয় না কমললতা?

এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করো গৌসাই, জানো ত সব।

কোথায় যাবে?

যাব বৃন্দাবনে। কিন্তু অত দূরের টিকিট চাইনে—তুমি কাছাকাছি কোন-একটা জায়গার কিনে দাও।

অর্থাৎ আমার ঋণ যত কম হয়। তার পরে শুরু হবে পরের কাছে ভিক্ষে, যতদিন না পথ শেষ হয়। এই ত?

ভিক্ষে কি এই প্রথম শুরু হবে গৌসাই? আর কি কখনো করিনি?

চূপ করিয়া রহিলাম। সে আমার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, দাও বৃন্দাবনেরই টিকিট কিনে।

তবে চল এক সঙ্গে যাই।

তোমারো কি ঐ এক পথ নাকি?

বলিলাম না, এক নয়, তবু যতটুকু এক করে নিতে পারি।

গাড়ি আসিলে দু'জনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার বিছানা করিয়া দিলাম।

কমললতা! বাস্তব হইয়া উঠিল—ও কি করচ গৌসাই?

করচি যা কখনো কারো জন্যে করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে।

সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?

সত্যিই মনে রাখতে চাই কমললতা। তুমি ছাড়া যে-কথা আর কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গৌসাই।

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে ব'সো।

কমললতা বসিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচের সহিত। গাড়ি চলিতে লাগিল কত গ্রাম, কত নগর, কত গ্রামের পার হইয়া—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পক্ষে বেড়ানর কথা, তাহার মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্ধন, রাখাকুণ্ডবাসের কথা, কত তীর্থভ্রমণের গল্প, শেষে দ্বারিকাদাসের আশ্রমে মুরারিপুত্র আশ্রমে আসা। আমার মনে ঝড়িয়া গেল ঐ লোকটির বিদায়কালের কথাগুলি; বলিলাম, জানো কমললতা, বড়গৌসাই তোমার পক্ষে বিশ্বাস করেন না। করেন না?

একেবারে না। আমার আসবার সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগল, বললেন, নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি নতুনগৌসাই, মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ-পথে আসা। মঠে তিনিও থাকবেন না কমললতা, এমন নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে।

না, যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন।

যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে, ফিরে যাবে সেখানে?

না।

তাঁরা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান?

তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাব যদি তুমি সত্যে বল। আর কারো কথায় না।

কিন্তু কোথায় তোমার সেবা পাব?

এ প্রশ্নের সে উত্তর দিল না, চূপ করিয়া রহিল। বহুকাল নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমললতা? সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে, সারানিদের স্রাব্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। হঠাৎ একসময়ে কানে গেল—নতুনগৌসাই?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত নিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠ, তোমার সাঁইথায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, পাশের কামরায় কিষ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখানায় তাহার লখা রচনা করিয়া দিয়াছিল। সে তাহা ইতিপূর্বেই তাঁজ করিয়া আমার বেকের একখারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে?—নিলে না?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোঝা বইবে কে?

বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনোনি—সেও কি বোঝা? দেব দু-একটা বা'র করে?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিবিরীর গায়ে মানাবে কেন?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না, কিন্তু ভিবারীকেও খেতে হয়। পৌছতে আরও দু'দিন লাগবে, গাড়িতে বাবে কি? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাব—তুমি ছোঁবে না? কমললতা এবার ছাতিয়া বলিল, ইস্ রাগ দ্যাখো। ওগো, ছোঁব গো ছোঁব, থাক ওসব, তুমি চলে গেলে আমি পেটভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও গোসাই; কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধূলা লইল। প্র্যাকটর্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো শোহায় নাই। নীচে ও উপরে অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি শুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর স্তীর্ণ শীর্ণ শশী, অপর প্রান্তে উষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমন সময় তোহার সাথী হইয়াছিল। আর আজ?

বাশি বাজাইয়া সবুজ আলোর লঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝিব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি—আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ রাখব, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কষ্ট আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভর হও। আমার জন্যে ভেবে আর তুমি মন ব্যাথাপাও না গোসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ি ছাড়িয়া গিল। তাহার সেই হাতটা হৃৎকের মধ্যে লইয়া করেক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই নিলাম কমললতা, তিনিই তোমার তার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার ব'লে আর তোমাকে আমি অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া নিলাম, গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিল, গবাকপথে তাহার অনন্ত মুখের 'পবে টেনশনের সারি সারি আলো করেকবার আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

বিশ্বদুর ছেলে

এক

যাদব মুখুয্যে ও মাধব মুখুয্যে যে সহোদর ছিলেন না, সে কথা নিজেরা ত ভুলিয়াই ছিলেন, বাহিরের লোকও ভুলিয়াছিল। দরিদ্র যাদব অনেক কষ্টে ছোটভাই মাধবকে আইন পাশ করাইয়াছিলেন এবং বহু চেষ্টায় ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্তান বিশ্ববাসিনীকে ভ্রাতৃবধুরূপে ঘরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিশ্ববাসিনী অসামান্য রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিন বড়বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাক্ষর বহিয়াছিল। বাড়িতে শাওড়ী-নন্দ ছিল না, তিনিই ছিলেন গৃহিণী। ছোটবধুর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রতিবাসিনীদের কাছে সগর্বে বলিয়াছিলেন, ঘরে বৌ আনতে হয় ত এমন। একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। কিন্তু দুদিনেই তাঁহার এ ভুল ভাঙ্গিল। দুদিনেই টের পাইলেন, ছোটবৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার-অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে।

একদিন বড়বৌ স্বামীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ গা, রূপ আর টাকার গুঁটিল সেখে ঘরে বৌ আনলে, কিন্তু এ যে কেউটে সাপ!

যাদব কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। মাথা চুলকাইয়া বার-দুই 'তাই ত', 'তাই ত', করিয়া কাছারি চলিয়া গেলেন।

যাদব অতিশয় শাস্ত-প্রকৃতির লোক। জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবি এবং ঘরে আসিয়া পূজা-অর্চনা করিতেন। মাধব নাদার চেয়ে দশ-বারো বছরের ছোট, উকিল হইয়া সম্ভ্রান্তি ব্যবসা শুরু করিয়াছিল। সে আসিয়া কহিল, বৌঠান, টাকাটাই কি দাদার বেশী হ'ল? দুদিন সবুর করলে আমিও ত রোজগার করে দিতে পারতাম। অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া রহিলেন।

এ ছাড়া আরও একটা বিপদ এই হইয়াছিল, ছোটবৌকে শাসন করিবার জো ছিল না। তাহার এমনি ভয়ঙ্কর ফিটের ব্যামো ছিল যে, সেদিকে চাহিয়া দেখিলেও বাড়িসুদ্ধ লোকের মাথা কিম্বিকিম করিতে থাকিত এবং ডাক্তার না ডাকিলে আর উপায় হইত না। সুতরাং সন্দের বিবাহটা যে ভুল হইয়া গিয়াছে, এই ধারণাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। শুধু যাদব হাল ভাড়িলেন না। তিনি সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, না গো না, তোমরা পরে দেখো। মায়ের আমার এমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, সে কি একেবারে নিষ্ফল বাবে? এ হুতই পারে না।

একদিন কি একটা কথার পরে ছোটবৌ মুখ অহঙ্কার করিয়া হির হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া ভয়ে অন্নপূর্ণার প্রাণ উড়িয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল, ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার দেড়-বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যচরণকে টানিয়া আনিয়া বিশ্বুর কোলের উপর নিক্ষেপ করিয়াই তিনি পলাইয়া গেলেন।

অমূল্য কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিশ্ব প্রাপণ-বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া মূর্ছার কবল হইতে আতঙ্কিত করিয়া ছেলে বকে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিলেন এবং ফিটের ব্যামোর এই অমোঘ সৈব-ঔষধ আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইলেন।

সংসারের সমস্ত ভার অন্নপূর্ণার মাথায় ছিল বলিয়া তিনি ছেলে মানুষ করিতে পারিতেন না। বিশেষ, সমস্তদিনের কাজকর্মের পর রাতে ঘুমাইতে না পাইলে তাঁহার বড় অসুখ করিত; তাই এই ভারটা ছোটবৌ লইয়াছিল।

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা সে ছেলে কোলে লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, অমূল্যখনের দুধ কে?

অন্নপূর্ণা ভাড়াভাড়ি হাতের কাঁচটা কেলিয়া রাখিয়া ভরে ভরে বলিলেন, এক মিনিট সবুর কর বোন, এখনি ছাল দিয়ে দিচ্ছি।

বিনু ঘরে ঢুকিয়াই তাহা দেখিয়া রাগিয়া গিয়াছিল, তীব্রকণ্ঠে বলিল, কালও তোমাকে বলেছি, আমার আঁটার আগ ধুখ চাই, তা সে ত নাটা বাজে। কাঁচটা তোমার যদি এতই ভারী ঠেক দিদি, পষ্ট করে বললেই ত পার, আমি অন্য উপায় দেখি। হী বামুনমেয়ে, তোমারও কি একটু ঝাঁ থাকতে নেই গা, বাড়িসুজ লোকের শিঙি-রান্না না হয় দু'মিনিট পরেই হ'ত।

বামুনঠাকরুন চূপ করিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, ভোর মত শুধু ছেলেকে টিপ পরানো আর কাজল দেওয়া নিয়ে থাকলে আমায়েরও ঝাঁ থাকত। এক মিনিট আর দেরি সর না, ছোটবোঁ?

ছোটবোঁ তাহার উত্তরে বলিল, তোমার অতি বড় শিথি রইল, দিদি, যদি কোনদিন আর অমূল্যের দুধে ছাত দাও ; আমারও শিথি রইল, আর কোনদিন যদি তোমাকে বলি।

এই বলিয়া সে মেঝের উপর অমূল্যকে ধুন্ করিয়া বসিয়া গিয়া, দুধের কড়া তুলিয়া আনিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই, বিনু তাহার গাল টিপিয়া গিয়া বলিল, চূপ কর হারামজাদা, চূপ কর, ঠেচালে একেবারে মেয়ে ফেলব। বিনুর ব্যাপারে বাড়ির দাসী কলম ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে কোলে লইতে গেলে বিনু তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল, দূর হ, সামনে থেকে দূর হ!

সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনু আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া রোক্তদ্যমান শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া দুধ ছাল দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে বিনু দুধ লইয়া চলিয়া গেলে তিনি পাচিকাকে সন্বেদন করিয়া বলিলেন, ওনলে মেয়ে, ওর কথা? সেই যে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলুম, অমূল্যকে তুই নে। ছোটবোঁ সেই জোরে আজ আমাকেও শিথি দিয়ে গেল।

যাহা হউক, এমন করিয়া অন্নপূর্ণার ছেলে বিনুবাসিনীর কোলে মানুষ হইতে লাগিল এবং তাহার কল হইল এই যে, অমূল্য খুড়ীকে মা এবং মাকে দিদি বলিতে শিখিল।

দুধ

ইহার বছর-চারেক পরে যেদিন খুব খটা করিয়া অমূল্যের হাতেখড়ি হইয়া গেল, তাহার পরদিন সকালে অন্নপূর্ণা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাহির হইতে বিনুবাসিনী ডাকিয়া কহিল, দিদি, অমূল্যখন প্রণাম করতে এসেচে, একবারটি বাইরে এস।

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া অমূল্যর সাজপোজ দেখিয়া অবাক হইয়া পেলেন। তাহার চোখে কাজল, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, মাথার উপর ঝুটি করিয়া ঢুল বাঁধা, পরনে একখানি হলদে রঙের ছোপান কাপড়, একহাতে দড়ি-বাঁধা মাটির দেয়াত, বগলে ক্ষুদ্র একখানি মাদুর-জড়ানো গুটিকয়েক ভালপাতা।

বিনু বলিল, দিদিকে প্রণাম কর ত বাবা!

অমূল্য জননীকে প্রণাম করিল।

তাহার পায়ে জুতা নাই, মোজা নাই, পরনে নানাবিধ বিলাতী পোশাক নাই,—অন্নপূর্ণা এই অপরাধ সাজ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, এতও ভোর আসে ছোটবোঁ! ছেলে বুঝি পড়তে বাচে?

বিনু হাসিমুখে বলিল, হী, পলাপড়িডের পাঠশালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আশীর্বাদ কর দিদি, আজকের দিন খেন ওর জীবনে সার্বক হয়।

চাকরের নিকে করিয়া ঢহিয়া বলিল, ভৈরব, পতিতমশাহিকে আমার নাম করে বিশেষ করে বলে

দিস, ছেলেকে আমার যেন কেউ মারধর না করে।

দিদি, এই পাঁচটা টাকা ধর, বেশ করে একখানি সিনে সাজিয়ে টাকা-ক’টি দিয়ে কলমের হাতে পাঠশালা পাঠিয়ে দাও। বলিয়া সে গভীর স্নেহে চুমা খাইয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণার দুই চোখে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি বামুনটাকরুনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ছেলে নিয়েই বাড়িব্যস্ত। তবু পেটে ধরেনি—তা হলে না জানি ও কি করত।

পাটিকা কহিল, সেজন্যই ভগবান বোধ করি দিলেন না, আঠার-উনিশ বছর বয়স হ’ল—কথাটা শেষ হইতে পাইল না। ছোটবৌ একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বঠাকুরুকে বলে আমাদের বাড়ির সামনে একটা পাঠশালা করে দেওয়া যায় না? আমি সমস্ত খরচ দেব।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, এখনো সে দু-পা যায়নি ছোটবৌ, এর মধ্যেই তোর মতলব ঘুরে গেল? না হয়, তুইও যা না পাঠশালা গিয়ে বসে থাকবি।

বিন্দু অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া বলিল, মতলব ঘোরেনি, দিদি। কিন্তু ভাবটি আড়ালে থাকা এক, আর চোখের সামনে এক। পোড়োয়া সব দুষ্ট ছেলে, ওকে ছোটটি পেয়ে যদি মারধর করে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, করলেই বা। ছেলেরা মারামারি করেই। তা ছাড়া সকলের ছেলেই সমান ছোটবৌ, তাদের বাপ-মা প্রাণ ধরে যদি পাঠশালা দিতে পেরে থাকে, তুই পারবি নে কেন?

পরের সঙ্গে তুলনা করাটা বিন্দু একেবারে পছন্দ করিত না। তাই বোধ করি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—তোমার এক কথা দিদি! ধর, কেউ যদি ওর চোখে কলমের বোঁচাই দিয়ে দেয়—তা হলে?

অন্নপূর্ণা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, তা হলে ডাক্তার দেখাবি। কিন্তু সত্যি বলছি তোকে, আমি ত সাত দিন সাত রাত বসে ভাবলেও বোঁচাখুঁটির কথা মনে করতে পারতুম না। এত ছেলে পড়ে, কে কার চোখে কলমের বোঁচা দেয় তাও ত ওনিনি।

বিন্দু কহিল, তুমি শোননি বলেই কি এমন কাণ্ড হ’ত পারে না? দৈবাতের কথাকে বলতে পারে? আচ্ছা, বেশ ত তুমি একবার বলেই দেখ না, তারপর যা হয় হবে।

অন্নপূর্ণা গভীর হইয়া বলিলেন, যা হবে, তা দেখতেই পাচ্ছি। তুই একবার যখন ধরেচিস তখন কি আর না করে ছাড়বি? কিন্তু আমি অমন অনাঙ্কিষ্ট কথা মুখে অনতে পারব না। আর তুইও ত কথা ক’স—নিজেই বল গে না।

এবার বিন্দু রাগ করিল, বলিল, বলবই ত। এ’ত দূরে রোজ রোজ যামি ছেলে পাঠাতে পারব না—এতে, কাকুর ভাল লাগুক, আর না লাগুক, আর এতে ওর বিদে, হোক আর নাই হোক। হী কদম, তোকে না বললুম সিনে দিয়ে আসতে? হী করে দাঁড়িয়ে আছিস বে?

তাহার ক্রুদ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সিনে দিচ্ছি। একেবারে এত উত্তলা হোসনে ছোটবৌ! আচ্ছা, ছেলে কি তোর বড় হবে না? তুই কি চিরকাল তাকে আঁচল-চাপা দিয়ে রাখতে পারবি? এটা ভাবিস না কেন?

ছোটবৌ সে কথার অব্যব না দিয়া বলিল, কদম, সিনে দিয়ে গুরুমশায়ের পারের খুলো একটু ভার মাথায় দিয়ে, ছেলে ফিরিয়ে আন গে। তাঁকেও একবার বিকেলবেলা আসতে বলিল।—যে বুঝবে না, তাকে আর বোঝাব কি করে? বলছি ছোটটি পেয়ে যদি কেউ মারধর করে,—না, চিরকাল কি তুই আঁচল-চাপা দিয়ে রাখতে পারবি? কি পারব, না পারব, সে প্রশ্নই ত নিতে আসিনি। বলিয়া সে উজ্জ্বলের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ফনফন করিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কদম বলিল, আর দাঁড়িয়ে থেকো না মা, হয়ত এখনি আবার এসে পড়বেন। উনি যা ধরেছেন, বিধাতা-পুরুষেরও সাধি নেই যে তা রদ করেন।

সেইদিন সন্ধ্যার পর বড়কর্তা আফিং খাইয়া শয্যার উপর কাত হইয়া শুইয়া গুড়গুড়ি নল মুখে িয়া নেশার পৃষ্ঠে চাবুক দিতেছিলেন, এমন সময় দরজার শিকলটা কনকন করিয়া নড়িয়া উঠিল।

যাদব কটে চোখ খুলিয়া বলিলেন, কে ও?

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ কি বলতে এসেছে, শোন।

যাদব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ছোটমা? কেন মা?

ছোটবৌকে তিনি অভ্যস্ত ভালবাসিতেন। ছোটবৌ কথা কহিল না, তাহার হইয়া অন্নপূর্ণাই বলিয়া দিলেন,—ওর ছেলের চোখে পোড়োরা কলমের খোঁচা মারবে, তাই বাড়ির মধ্যে একটা পাঠশালা করে দিতে হবে।

যাদব হাতের নলটা ফেলিয়া দিয়া শব্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কে চোখে খোঁচা মারলে? কে দেখি, কি-রকম হ'ল?

অন্নপূর্ণা তাহার হাতের নলটা তুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন, এখনো কেউ মারেনি—যদির কথা হচ্ছে।

যাদব সুস্থির হইয়া বলিলেন, ওঃ, যদির কথা! আমি বলি বৃষ্টি—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, দিদি, এই না তুমি বললে অনাছিষ্টি কথা মুখে আনতে পারবে না—আবার বলতে এলে কেন?

অন্নপূর্ণা নিজেও বুঝিয়াছিলেন, তাহার কথা বলিবার ধরনটা ভাল হয় নাই এবং ইহার ফলও মধুর হইবে না। এখন এই চাপা গলার নিগূঢ় অর্থ স্পষ্ট অনুভব করিয়া তিনি ব্যর্থই ভীত হইয়া উঠিলেন। তাহার রাগটা পড়িল নিরীহ স্বামীর উপর; এবং তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আশিংএর নেশায় মানুষের চোখই বুজে যায়, কানও কি বুজে যায়? বললুম কি, আর ও শুনলে কি! 'কৈ দেখি কি-রকম হ'ল!' আমি কি বলেছি তোমাকে, অমূল্যর চোখ কানা করে দিয়েছে? আমার হয়েছে যেন সবদিকে জ্বালা!

নির্বিরোধী যাদবের আকিং-এর যৌক্ত ছুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল; তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন, কেন, কি হ'ল গো?

অন্নপূর্ণা রাগিয়া বলিলেন, যা হ'ল তা ভালই। এমন মানুষের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া বকমারি—অর্থের ভোগ। বলিয়া সরোষে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যাদব বলিলেন, কি হয়েছে মা, খুলে বল ত?

বিন্দু ঘরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বাইরে গোলার ধারে একটা পাঠশালা হলে—

যাদব বলিলেন, এ আর বেশী কথা কি মা! কিন্তু পড়বে কে?

বিন্দু কহিল, পণ্ডিতমশাই এসেছিলেন, তিনি মাসে দশ টাকা করে গেলে পাঠশালা তুলে আনবেন। আমি বলি, আমার সুদের জমা টাকা থেকে যেন সব খরচ দেওয়া হয়।

যাদব সম্ভ্রান্ত হইয়া বলিলেন, বেশ ত মা, কালই আমি লোক লাগিয়ে দেব, গঙ্গারাম এইখানেই যদি তার পাঠশালা তুলে আনে, সে ভাল কথাই।

ভাতরের ক্ষম পাইয়া বিন্দুর রাগ পড়িয়া গেল। সে হাসিমুখে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন এবং কাছে বসিয়া কদম হাতমুখ নাড়িয়া কি যেন ব্যাখ্যা করিতেছে। বিন্দুকে চুক্ষিতে দেখিয়াই সে পাণ্ডমুখে 'ওমা এই যে'—বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিয়া ফেলিল। বিন্দু বুকিল তাহার কথাই হইতেছিল, সামনে আসিয়া বলিল, ও মা কি, তাই বল না?

ভয়ে কদমের পলা কষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সে ঢোক গিলিয়া বলিল, না দিদি, এই কি না—বড়মা বললেন কি না—এই ধর না, কেন—

বিন্দু রুদ্ধস্বরে বলিল, ধরেচি—তুই কাজ কর গে যা।

কদম ঝিকুড়ি না করিয়া উঠিয়া গিয়া বাঁচিল।

তখন বিন্দু অন্নপূর্ণাকে কহিল, বড়গিন্নীর পরামর্শদাতাওতলি বেশ! বঠঠাকুরকে বলে ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

বিন্দু কুশী খামিলে অন্নপূর্ণাকে লিপি বলিত, রাগিলে বড়গিন্নী বলিত।

অন্নপূর্ণা ছালিয়া উঠিয়া বলিলেন, যা না বল সে না—বইঠাকুর আমার মাথাটা কেটে নেবে। আর বইঠাকুরও তেমনি! সে তবুশি শুরু করবে, কি মা! কি বলচ মা, ঠিক কথা মা! ঢের ঢের বরাত সেখিটি ছোটবৌ, কিন্তু তোর মত সেবিনি। কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলি, মাইরি, বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন ভয়ে ছাড়সড়।

বিন্দুর রাগ হইয়াছিল বটে, অন্নপূর্ণার কথার ভঙ্গীতে সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কৈ, তুমি ভ ভয় কর না!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, করিনে আবার! তোমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখলে যার বুকের রক্ত জল হয়ে না যায় সে এখনো মায়ের পেটে আছে! কিন্তু অত রাগ ভাল নয় ছোটবৌ! এখনো কি ছোটটি আছিল? ছেলে হলে যে এতদিন চার-পাঁচ ছেলের মা হতিস। আর তোকেই বা দোষ দেব কি, ঐ বুড়ো মিনসেই আদর দিয়ে তোর মাথাটা খেলে।

বিন্দু বলিল, কপাল নিয়ে যে জন্মেছিলুম দিদি, সে কথা তোমার মানি; ধন-দৌলত, আদর-আহ্লাদ অনেকেই পায়, সেটা বেশী কথা নয়, কিন্তু এমন দেবতার মত ভাগুর পেতে অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই। আমার অদ্ভুত দিদি, তুমি হিঁসে করে কি করবে? কিন্তু আদর দিয়ে তিনি ও মাথা খাননি, আদর দিয়ে যদি কেউ মাথা খেয়ে থাকে ত, সে তুমি।

অন্নপূর্ণা হাত নাড়িয়া বলিলেন, আমি? সে কথা কারো বলবার জো নেই। আমার শাসন বড় কড়া শাসন—কিন্তু কি করব, আমার কপাল মন্দ। কেউ আমাকে ভয় করে না—দাসী-চাকরগুলো পর্যন্ত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে ঝগড়া করে, যেন তারাই মনিব, আর আমি দাসী-বাসী! আমি তাই সরে থাকব, অন্য কেউ মলে—

তাহার এই উলটা-পালটা কথায় বিন্দু ঝিলঝিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, দিদি, তুমি সভ্যযুগের মানুষ। কেন মরতে একালে এসে জন্মেছিলে? কৈ, আমার সঙ্গে ত কেউ ঝগড়া করে না? বলিয়া সহসা সুমুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া অন্নপূর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা গল্প বল না, দিদি!

অন্নপূর্ণা রাগিয়া বলিলেন, যা, সরে যা।

কদম ছুটিয়া আসিা বলিল, দিদি, অমূল্যধন জাঁতিতে হাত কেটে ফেলে কাঁদচে।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জাঁতি পেলে কোথায়? তোরা কি কচ্ছিলি?

আমি ও-ঘরে বিছানা করছিলুম দিদি, জানিও না কখন ও বড়মার ঢুকবে—

আচ্ছা হয়েছে—হয়েছে—যা, বলিয়া বিন্দু ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্যের আঙুলের ডগায় ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া কোলে করিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দিদি, কতদিন বলেছি তোমাকে, ছেলেপুলের ঘরে জাঁতি-টাতিগুলো একটু সাবধান করে রেখো—তা—

অন্নপূর্ণা আরো রাগিয়া গিয়া বলিলেন, কি কথা যে তুই বলিস ছোটবৌ, তার মাথামুণ্ড নেই। কখন তোর ছেলে ঘরে ঢুকে হাত কাটবে বলে কি জাঁতি নোয়ার সিন্দুকে বদ্ধ করে রাখবো?

বিন্দু বলিল, না, কাল ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবো, তা হলে আর ঢুকবে না, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, শুনবি, কদম, ওর জবরদস্তির কথাগুলো! জাঁতি কি মানুষ সিন্দুকে তুলে রাখে!

কদম কি একটা বলিতে গিয়া হী করিয়া থামিয়া গেল।

বিন্দু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ফের যদি তুমি দাসী-চাকরকে মধ্যস্থ মানাবে ত, সত্যি বলচি তোমাকে, ছেলে নিয়ে আমি বাগের বাড়ি চলে যাব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যা না যা। কিন্তু মাথা খুঁড়ে মলেও আর ফিরিয়ে আনবার নামটি করবো না। সে কথা মনে রাখিস।

আমি আসতেও চাইনে, বলিয়া বিন্দু মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

বলটা-দুই পরে অন্নপূর্ণা দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া ছোটবৌয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরের

একধারে একটি ছোট টেবিলের উপর মাধবচন্দ্র রকমদার কাগজপত্র সেবিতেছিলেন এবং বিন্দু অমূল্যকে লইয়া খাটের উপর শুইয়া আঙে আঙে গল্প বলিতেছিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, খাবি আর। বিন্দু বলিল, আমার ক্ষিদে নেই।

অমূল্য তাড়াতাড়ি খুড়ির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ছোটমা খাবে না, তুমি যাও।

অন্নপূর্ণা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই চুপ কর। এই ছেলেটিই হচ্ছে সকল নষ্টের গোড়া। কি আদুরে ছেলেই কতিস ছোটবৌ! শেষে টের পাবি। তখন কাঁদবি আর বলবি, হ্যাঁ, দিদি বলেছিল যটে।

বিন্দু ফিসফিস করিয়া অমূল্যকে শিখাইয়া দিল, অমূল্য চোঁচাইয়া বলিল, তুমি যাও না দিদি— ছোটমা রূপকথা বলচে।

অন্নপূর্ণা ধমকাইয়া বলিলেন, ভাল চাস ত উঠে আর, ছোটবৌ। না হলে কাল তোদের দু'জনকে না বিদেয় করি ত আমার নামই অন্নপূর্ণা নয়, বলিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মাধব জিজ্ঞাসা করিল, আজ আবার তোমাদের হ'ল কি?

বিন্দু বলিল, দিদি রাগলে যা হয় তাই। আজ অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম, ছেলেপুলের ঘর, জাঁতি-টাতিগুলো একটু সাবধান করে রেখো—তাই এত কাণ্ড হচ্ছে।

মাধব বলিল, আর গোলমাল ক'রো না, যাও। বৌঠান যেমন করে পা ফেলে বেড়াচ্ছেন, দাদা এখনি উঠে পড়বেন।

বিন্দু অমূল্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া হাসিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

তিন

এক মায়ের দুই ছেলে জননীকে আশ্রয় করিয়া যেমন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে, এই দুইটি মাতা তেমনি একটিমাত্র সন্তানকে আশ্রয় করিয়া আরো ছয় বৎসর কাটাইয়া দিলেন। অমূল্য এখন বড় হইয়াছে, সে এন্টাল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ঘরে মাস্টার নিযুক্ত আছেন, তিনি সকালবেলা পড়াইয়া যাইবার পর অমূল্য খেলা করিতে বাহির হইয়াছিল। আজ রবিবার, স্কুল ছিল না।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ছোটবৌ, কি করি বল ত?

বিন্দু তাহার ঘরের মেঝের উপর আলমারি উজাড় করিয়া অমূল্যের পোশাক বাহিতেছিল, সে কাকার সহিত কোন বড়লোক মজেলের বাড়ি নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে যাইবে। বিন্দু মুখ না তুলিয়াই বলিল, কিসের দিদি?

তাহার মেজাজটা কিছু অপ্রসন্ন। অন্নপূর্ণা রকমারি পোশাকের বাহুর সেবিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তাহার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিলেন না; কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি সমস্তই অমূল্যের পোশাক নাকি?

বিন্দু বলিল, হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কত টাকাই না তুই অপব্যয় করিস। এর একটার দামে গরীবের ছেলের সারা বছরের কাপড়-চোপড় হতে পারে।

বিন্দু বিরক্ত হইল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, তা পারে। কিন্তু গরীবের বড়লোকে একটু তফাত থাকেই; সেজন্য দুঃখ করে কি হবে দিদি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তা হোক বড়লোক, কিন্তু তোর সব কাজেই একটু বাড়াবাড়ি আছে।

বিন্দু মুখ তুলিয়া বলিল, কি বলতে এসেছ তাই বল না দিদি, এখন আমার সময় নেই।

তোমার সময় আর কখন থাকে ছোটবৌ। বলিয়া তিনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তৈরব অমূল্যকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিল। সে ঘণ্টা-খানেক পরে খুঁজিয়া আনিল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কোথা ছিলি এতক্ষণ?

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল।

তৈরব বলিল, ও-পাড়ার চাষাদের ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলছিল।

এই খেলাটায় বিন্দুর বড় ভয় ছিল, তাই নিষেধ করিয়া দিয়াছিল; বলিল, ডাংগুলি খেলতে তোকে মানা করিচি না?

অমূল্য ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া বলিল, আমি দাঁড়িয়েছিলুম, তারা জোর করে আমাকে—

জোর করে তোমাকে? আচ্ছা, এখন যাচ্ যাও, তার পর হবে। বলিয়া তাহাকে পোশাক পরাইতে লাগিল।

মাস-দুই পূর্বে অমূল্যর পৈতা হইয়াছিল; সে নেড়া মাথায় জরির টুপি পরিতে ভয়ঙ্কর আপত্তি করিল। কিন্তু বিন্দু ছাড়িবার লোক নয়, সে জোর করিয়া পরাইয়া দিল। অমূল্য নেড়া-মাথায় জরির টুপি পরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধব ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, আর ওর কত দেরি হবে গো?

পরক্ষণেই অমূল্যর দিকে দৃষ্টি পড়িলে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বাঃ—এই যে মথুরার কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হয়েছেন।

অমূল্য লজ্জায় টুপিটা ফেলিয়া দিয়া খাটের উপর গিয়া উপড় হইয়া পড়িল।

বিন্দু রাগিয়া উঠিল। বলিল, একে ছেলেমানুষ কাঁদচে, তার উপর তুমি—

মাধব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাঁদিস নে অমূল্য ওঠ, লোকে পাগল বলে ত আমাকেই বলবে, তুই আয়।

ঠিক এই কথাটাই ইতিপূর্বে আর একদিন হইয়া গিয়াছিল এবং বিন্দু তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে উপাশ্রয় পুনরাবৃত্তিতে সে হাড়ে হাড়ে জুলিয়া গিয়া বলিল, আমি সব কাজ পাগলের মত করি, না? বলিয়া উঠিয়া গিয়া অমূল্যকে তুলিয়া আনিয়া পাখার বাটের বাড়ি ঘা-কতক দিয়া দামী মখমলের পোশাক টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

মাধব ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়া গিয়া অন্নপূর্ণাকে সংবাদ দিলেন, মাধায় ভূত চেপেচে বৌঠান, একবার যাও।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, বিন্দু সমস্ত পোশাক খুলিয়া লইয়া একটা সাধারণ বস্ত্র পরাইয়া দিতেছে, অমূল্য ভয়ে বিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বেশ ত হয়েছিল ছোটবৌ, খুললি কেন?

বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমাদের পায়ে পড়ি বড়গিন্নী, সামনে থেকে একটু যাও। তোমাদের পাঁচজনের মধ্যস্থতার জন্য ওর প্রাণটাই মার খেয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা বাকশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু অমূল্যর একটা কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরের এক কোণে শাঁড় করাইয়া দিয়া বলিল, যেমন বজ্জাত ছেলে তুমি, তেমনি তোমার শাস্তি হওয়া চাই। সমস্তদিন ঘরে বন্ধ থাক। দিদি, বাইরে এস। আমি দোর বন্ধ করব। বলিয়া বাহিরে আসিয়া শিকল তুলিয়া দিল।

বেলা তখন প্রায় একটা বাজে, অন্নপূর্ণা আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, হাঁ ছোটবৌ, সত্যি আজ তুই অমূল্যকে খেতে দিবে? তার জন্য কি বাড়িসুদ্ধ লোক উপোস করে থাকবে?

বিন্দু জবাব দিল, বাড়িসুদ্ধ লোকের ইচ্ছে!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, এ তোয় কি-রকম কথা ছোটবৌ, বাড়ির মধ্যে ১২ কাটি ছেলে, সে উপোস করে থাকলে, ডোর আমার কথা ছেড়ে দে, দাসী-চাকরই বা মুখে ভাত তোলে কি করে বল দেখি!

বিন্দু জিদ করিয়া বলিল, তা আমি জানিনে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, তর্ক করিয়া আর লাভ হইবে না, বলিলেন, আমি বলচি, বড়বোনের কথাটা রাখ। আজ তাকে মাফ কর। তা ছাড়া শিশু পড়ে অসুখ হলে তোকেই ভুগতে হবে।

বেলার দিকে চাহিয়া বিন্দু নিজেই নরম হইয়া আসিয়াছিল, কদমকে ডাকিয়া বলিল, যা নিয়ে আয় ডাক। কিন্তু তোমাদেরও বলে রাখচি দিদি, ভবিষ্যতে আমার কথায় কথা কইলে ভাল হবে না।

গোলযোগটা এইখানেই সেদিনের মত থামিয়া গেল।

ছোটভাইয়ের ওকালতিতে পসার হওয়ার পর হইতে যাদব চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের বিষয়-আশয় দেখিতেছিলেন। ছোটবখুর দরুন হাতে যে দশ হাজার টাকা ছিল, তাহাও সুদে খাটাইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া এবং মাধবের উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া তিনি গত বৎসর হইতে গ্রাম পোয়াটাক পথ দূরে একখানি বড় রকমের বাড়ি ফাঁদিয়াছিলেন। দিন-দশেক হইল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কথা ছিল, দুর্গাপূজার পরে ভাল দিন দেখিয়া সকলেই তথায় উঠিয়া যাইবেন। তাই একদিন যাদব আহারে বসিয়া ছোটবোকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি ত তৈরী হ'ল মা, এখন একদিন গিয়ে দেখে এস, আর কিছু বাকী রয়ে গেল কিনা।

বিন্দুর একটা অভ্যাস ছিল, সে সহস্র কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও ভাতুরের খাবার সময় দরজার আড়ালে বসিয়া থাকত। ভাতুরকে সে দেবতার মতই ভক্তি করিত—সকলেই করিত। বলিল, আর কিছু বাকী নেই।

যাদব হাসিয়া বলিলেন, না দেখেই রায় দিলে মা! আচ্ছা, ভাল কথা। তবে, আরো একটি কথা আছে। আমার ইচ্ছে হয়, আত্মীয়-স্বজন আমাদের যে যেখানে আছেন, সকলকেই এক করে একটি সুদিন দেখে উঠে যাই, গিয়ে গৃহদেবতার পূজা দিই, কি বল মা?

বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল, দিদিকে বলি, তিনি যা বলবেন তাই হবে।

যাদব বলিলেন, তা বল। কিন্তু তুমিই আমার সংসারের লক্ষ্মী, মা! তোমার ইচ্ছাতেই কাজ হবে। অন্নপূর্ণা অদূরেই বসিয়াছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, তবু তোমার মা লক্ষ্মীটি যদি একটু শান্ত হতেন! যাদব বলিলেন, শান্ত আবার কি বড়বৌ? মা আমার জগদ্ধাত্রী! বরও দেন, আবশ্যক হলে খাঁড়াও ধরেন। ওই ত আমি চাই। মাকে এনে অবধি সংসারে আমার এতটুকু দুঃখকষ্ট নেই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে কথা তোমার সত্যি। ও আসবার আগের দিনগুলো এখন মনে করলেও ভয় হয়।

বিন্দু লজ্জা পাইয়া সে কথা চাপা দিয়া বলিল, আপনি সকলকে আনান। আমাদের ও-বাড়ি বেশ বড়, কারো কোন কষ্ট হবে না। ইচ্ছে করলে তাঁরা দু'মাস ছ'মাস থাকতেও পারবেন।

যাদব বলিলেন, তাই হবে মা, কালই আমি আনবার বন্দোবস্ত করব।

চার

ইহাদের পিসতুতো বোন এলোকেশীর অবস্থা ভাল ছিল না। যাদব তাঁহাকে প্রায়ই অর্থসাহায্য করিয়া পাঠাইতেন। কিছুদিন হইতে তিনি তাঁহার পুত্র নরেনকে এইখানে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার ইচ্ছা জানাইয়া চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন, এই সময়ে তিনি ছেলে লইয়া উত্তরপাড়া হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বামী প্রিয়নাথ সেখানে কি করিতেন, তাহা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না, দিন-দুয়ের মধ্যে তিনিও আসিয়া পড়িলেন। নরেনের বয়স ষোল-সতের। সে চণ্ডা পাড়ের কাপড় ফের দিয়া পরিত এবং দিনের মধ্যে আট-দশবার চুল আঁচড়াইত। টেরিটা তাহার বাস্তবিকই একটা দেখিবার বস্তু ছিল।

আজ সন্ধ্যার পর রাসাঘরের বারান্দায় সকলে একত্রে বসিয়াছিলেন এবং এলোকেশী তাঁহার পুত্রের অসাধারণ রূপ-গুণের পরিচয় দিতেছিলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, নরেন, কোন ক্লাসে পড় তুমি?

নরেন বলিল, কোর্স ক্লাস। রয়েল রিডার, গ্রামার, জিওগ্রাফি, এরিথমেটিক, আরো কত কি ডেসিমেল্ টেসিমেল্—ও-সব তুমি বুঝবে না মাঝী।

এলোকেশী সপর্বে পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বিন্দুকে বলিলেন, সে কি এক-আখখানা বই, ছোটবৌ? বইয়ের পাহাড়; কল বইগুলো বাস খেকে বার করে তোমার মাঝীদের একবার দেখিও ত বাবা!

নরেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা দেখাব।

বিন্দু বলিল, পাস করতে এখনো ত মেরি আছে।

এলোকেশী বলিলেন, দেরি কি থাকত ছোটবৌ, দেরি থাকত না। এতদিনে একটা কেন, চারটে পাস করে ফেলতো। শুধু মুখপোড়া মাস্টারের জন্যই হচ্ছে না। তার সর্বনাশ হোক, বাছাকে সে যে কি বিষ-নজরেই দেখেচে, তা সেই জানে। ওকে কি তুলে দিচ্ছে? দিচ্ছে না। হিংসে করে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেচে।

বিন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, কে, এ-রকম ত হয় না!

এলোকেশী বলিলেন, হচ্ছে, আবার হয় না! মাস্টারগুলো সব একজোট হয়ে ঘুষ চায়; আমি গরীব মানুষ, ঘুষের টাকা কোথা থেকে যোগাই বল ত?

বিন্দু চূপ করিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা আন্তরিক দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এমন করে কি কখন মানুষের পিছনে লাগতে আছে? সেটা কি ভাল কাজ? কিন্তু আমাদের এখানে ও-সব নেই। আমাদের অমূল্য ত ফি বছর ভাল ভাল বই প্রাইজ ঘরে আনে, কিন্তু কখন ঘুষটুখ দিতে হয় না।

এই সময় অমূল্য কোথা হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে তাহার ছোটমার কোলে গিয়া বসিল। বসিয়াই গলা ধরিয়া কানে কানে বলিল, কাল রবিবার, ছোটমা, আজ মাস্টারমশায়কে যেতে বলে দাও না।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, এই যে ছেলেটি দেখচ ঠাকুরঝি, এটি গল্প পোলে আর উঠবে না—কদম মাস্টারমশায়কে যেতে বলে দে, অমূল্য আজ আর পড়বে না।

নরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল, ও কি রে অমূল্য, অত বড় ছেলে, এখনও মেয়েমানুষের কোলে গিয়ে বসি—

বিন্দু হাসিয়া বলিল, শুধু এই বুঝি? এখনও রাস্তারে—

অমূল্য ব্যাকুল হইয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, ব'লো না ছোট মা, ব'লো না।

বিন্দু বলিল না, কিন্তু অন্নপূর্ণা বলিয়া দিলেন। বলিলেন, এখনো ও রাস্তার ছোটমার কাছে শোয়।

বিন্দু বলিল, শুধু শোয়া দিদি, এখনো সমস্ত রাস্তার শাদুড়ের মত আঁকড়ে ধরে ঘুমোয়।

অমূল্য লজ্জায় তাহার ছোটমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল।

নরেন কহিল, ছি ছি, তুই কি রে! তুই ইংরাজী পড়িস?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, পড়ে বৈ কি। ইঙ্কলে ও ত ইংরাজীই পড়ে।

নরেন বলিল, ইস, ইংরাজী পড়ে। কৈ, ইন্জিন বানান করুক ত দেখি? তা আর পারতে হয় না।

এলোকেশী বলিলেন, ও-সব শব্দ শব্দ কথা, ও কি ছেলেমানুষে পারে..

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কৈ অমূল্য বানান কর ন?

অমূল্য কিন্তু কিছুতেই মুখ তুলিল না।

বিন্দু তাহার মাথাটা একবার বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তোমরা সবাই মিলে ওকে লজ্জা দিলে ও আর কি করে বানান করে?

তারপর এলোকেশীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও আমার আসচে বছর পাস দেবে! আমাদের মাস্টারমশাই বলেছেন, ও কুড়ি টাকা জলপানি পাবে। ও সেই টাকা দিয়ে ওর নাকার মত এক জোড়া ঘোড়া কিনবে।

কথাটা সত্য হইলেও পরিহাস-ছলে সবাই হাসিতে লাগিলেন।

এলোকেশী বিন্দুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমার নরেননাথ শুধু কি লেখা পড়াতেই ভাল, ও এমনি থিয়েটারে অ্যাক্ট করে যে, লোকে শুনে আ চাখে জল রাখতে পারে না। সেই সীতা সেজে কি-রকমটি করে বলেছিলে, একবার মামীদের গুনিয়ে দাও ত বাবা!

নরেন তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া, উচ্চ নাকিসুরে সুর করিয়া আরম্ভ করিয়া দিল, প্রাণেশ্বর! কি কৃপণে দাসী তব—

বিন্দু ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—ওরে থাম থাম, চূপ কর, বঠঠাকুর ওপরে আছেন। নরেন চমকিয়া চূপ করিল।

অন্নপূর্ণা ঐটুকু শুনিয়াই মুখ হইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, শুনলেই বা ঠাকুরদেবতার কথা, এ ত ভাল কথা ছোটবৌ।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে শোন তুমি ঠাকুর-দেবতার কথা, আমরা উঠে বাই।

নরেন বলিল, আচ্ছা, তবে থাক, আমি সাবিত্রীর পার্ট করি।

বিন্দু বলিল, না।

এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া এতকশে অন্নপূর্ণার চৈতন্য হইল যে ব্যাপারটা অনেক দূরে গিয়াছে এবং এইখানেই তাহার শেষ হইবে না। এলোকেশী নূতন লোক, তিনি ভিতরের কথা বুঝিলেন না, বলিলেন, আচ্ছা এখন থাক। পুরুষেরা বেরিয়ে গেলে সে একদিন দুপুরবেলা হতে পারবে। আহা গান-বাজনাই কি ও কম শিখেচে? দময়ন্তীর সেই কৈদে কৈদে গানটি একবার বলিস ত বাবা, তোর মামীরা শুনলে আর ছাড়তে চাইবে না।

নরেন বলিল, এখনি বলব?

রাগে বিন্দুর সর্বাস জ্বালা করিতেছিল, সে কথা কহিল না।

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, গান-টান এখন কাজ নেই।

নরেন বলিল, আচ্ছা, গানটা আমি অমূল্যকে শিখিয়ে দেব। আমি বাজাতেও জানি। ব্রেকটে তাক বাজনা বড় শক্ত মামী, আচ্ছা, ঐ পেতলের হাঁড়িটা একবার দাও ত, দেখিয়ে দিই।

বিন্দু অমূল্যকে উঠিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিল, যা অমূল্য, ঘরে গয়ি পড় গে।

অমূল্য মুখ হইয়া শুনিতেছিল, তাহার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, চুপি চুপি বলিল, আরো একটু বোস না ছোটমা।

বিন্দু কোন কথা না বলিয়া তাহাকে তুলিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। সহসা সে কেন যে অমন করিয়া গেল, অন্নপূর্ণা তাহা বুঝিলেন এবং পাছে সঙ্গদোষে অমূল্য বিগড়িয়া যায়, এই ভয়ে নরেনের এইখানে থাকিয়া লেখাপড়াও যে সে পছন্দ করিবে না, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিয়া তিনি উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাবা নরেন, তোমার ছোটমামীর সামনে ঐ অ্যাক্টো-ট্যাক্টোওলা আর ক'রো না। ও রাগী মানুষ, ও-সব ভালবাসে না।

এলোকেশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছোটবৌ ও-সব ভালবাসে না বুঝি? তাই অমন কবে উঠে গেল বটে।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, হতেও পারে। আরো একটা কথা বাবা, তুমি নিজের খাবে-দাবে পড়াশুনা করবে—যাতে মায়ের দুঃখ ঘোচে, সেই চেষ্টা করবে, তুমি অমূল্যর সঙ্গে বেশী মিশো না বাবা। ও ছেলেমানুষ, তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

কথাটা এলোকেশীর ভাল লাগিল না। বলিলেন, সে ত ঠিক কথা, ও গরীবের ছেলে, ওর পণীবের মত থাকিই উচিত। তবে যদি বললে ত বলি, বড়বৌ, অমূল্যটিই তোমার কচি খোকা, আর আমার নরেনই কি বুড়ো? এক-আধ বছরের ছোট-বড়াকে আর বড় বলে না। আর ও-কি কখনও বড়লোকের ছেলে চোখে দেখেনি গা, এইখানে এসে দেখচে? ওদের থিয়েটারের দলে কত রাজা-রাকড়ার ছেলে রয়েছে যে!

অন্নপূর্ণা অগ্রভিত্ত হইয়া বলিলেন, না ঠাকুরবি, সে কথা বলিনি, আমি বলচি—

আবার কি করে বলবে বড়বৌ? আমরা বোকা বলে কি এতই বোকা, যে এ কথাটাও বুঝিনে! তবে দাদা নাকি বললেন, নরেন এইখানেই লেখাপড়া করবে, তাই আসা, নইলে আমাদেরও কি দিন চলছিল না!

অন্নপূর্ণা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ভগবান জানেন ঠাকুরবি, আমি সে কথা বলিনি, আমি বলচি কি, এই যাতে মায়ের দুঃখ-কষ্ট ঘোচে, যাতে—

এলোকেশী বলিলেন, আচ্ছা, তাই, তাই। যা নরেন, তুই বাইরে গিয়ে বস গে, বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশিস নে। বলিয়া হেসেহেসে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া নিজের চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা বড়ের মত বিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া কীদ-কীদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হী লা তোর জনো কি

কুটুম-কুটুমিতেও বন্ধ করতে হবে? কি করে চলে এলি বল ত?

বিন্দু অত্যন্ত সহজভাবে জবাব দিল, কেন বন্ধ করতে হবে দিদি, আত্মীয়-কুটুম নিয়ে তুমি মনের সুখে ঘর কর, আমি ছেলে নিয়ে পালাই, এই!

পালাবি কোথায় গুনি?

বিন্দু কহিল, যাবার দিন তোমায় ঠিকানা বলে যাব, ভেবো না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সে আমি জানি। যাতে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না, সে কি তুই না করেই ছাড়বি? চিরকালটা এই বৌ নিয়ে আমার হাড়মাস জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল। বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, মাধবকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিলেন, না ঠাকুরপো, তোমারা আর কোথাও গিয়ে থাক গে, না হয়, ঐ বৌটিকে বিদেয় কর, আমি আর রাখতে পারব না, আজ তা পষ্ট বলে গেলুম, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মাধব আশ্চর্য হইয়া ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

বিন্দু বলিল, জানিনে, বড়গিল্লী বলেচে, দাও আমাদের বিদেয় করে।

মাধব আর কিছু বলিল না। টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

ঠাকুরবি দেখিতে বোকার মতন ছিলেন, কিন্তু সেটা ভুল। তিনি যেই দেখিলেন নিঃসন্তান ছোটবৌর অনেক টাকা, তিনি ৩ খনি সেই দিকে চলিলেন এবং প্রতি রাত্রে স্বামী শ্রিয়নাথকে একবার করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, তোমার জন্যই আমার সব গেল। তোমার কাছে মিছিমিছি পড়ে না থেকে এখানে থাকলে আজ আমি রাজার মা। আমার এমন সোনার চাঁদ ফেলে কি আর ঐ কাল ভূতের মত ছেলোটাক ছোটবৌ—, বলিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের ঝারা ঐ কাল ভূতের সমস্ত পরমায়ুটা নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়া ‘গরীবের ভগবান আছেন’ বলিয়া উপসংহার করিয়া চুপ করিয়া গুইতেন। শ্রিয়নাথও মনে মনে নিজের বোকামির জন্য অনুতাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমন করিয়া এই দম্পতিটির দিন কাটিতেছিল এবং ছোটবৌর প্রতি ঠাকুরবির স্নেহ-প্রীতি বন্য়ায় মত ঈপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

আজ দুপুরবেলা তিনি বলিতেছিলেন, অমন মেঘের মত চুল ছোটবে, কিন্তু কোনদিন বাঁধতে দেখলুম না। আজ জমিদারের বাড়ির মেয়েরা বেড়াতে আসতে, এস, মা, টা বেঁধে দিই।

বিন্দু বলিল, না ঠাকুরবি, আমি মাথায় কাপড় রাখতে পারিনে, ছেলে বড় হয়েছে—দেখতে পাবে।

ঠাকুরবি অবাক হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা ছোটবৌ? ছেলে বড় বলে এ’ত্নী মানুষ চুল বাঁধবে না? আমার নরেন্দ্রনাথ ও শঙ্করের মুখে ছাই দিয়ে আরো ছ’মাস বছরেরকের বড়, তাই বলে কি আমি মাথা-বাঁধা ছেড়ে দেব!

বিন্দু বলিল, তুমি ছাড়বে কেন ঠাকুরবি, নরেন বরাবর দেখে আসচে, ওর কথা আলাদা। কিন্তু অমূল্য হঠাৎ আজ আমার মাথায় খোঁপা দেখলে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। হয়ত টেচামেচি করবে, না কি করবে—হি হি, সে ভারী লজ্জার কথা হবে!

অন্নপূর্ণা হঠাৎ সৌহৃদিক দিগা যাইতেছিলেন, বিন্দুর দিকে চাহিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, তোর চোখ হলহল করছে কেন রে ছোটবৌ? আয় ত, গা দেখি!

বিন্দু এলেক্ট্রিকীর সামনে ভারী লজ্জা পাইয়া বলিল, কি রোজ রোজ গা দেখবে! আমি কি কচি খুকি, অসুখ করলে টের পাব না?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না, তুই বুড়ি। কাছে আয়, ভাদ্রের আখিন মাস, দিনকাল বড় খারাপ।

বিন্দু বলিল, কক্ষ যাব না। বলচি কিছু হয়নি, বেশ আছি তবু কাছে আয়!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, দেখিস, ঠাণ্ডাস নে যেন! বলিয়া সন্ধি-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া

এলোকেশী বলিল, বড়বৌর যেন একটু বায়ের ছিট আছে, না?

বিন্দু একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ঐ-রকম ছিট যেন সকলের থাকে ঠাকুরঝি!

এলোকেশী চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা কি একটা হাতে লইয়া সে পথেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন, বিন্দু ডাকিয়া বলিল, দিদি, শোন শোন, খোঁপা বাঁধবে?

অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া এলোকেশীকে বলিলেন, আমি কত বলেছি ঠাকুরঝি, ওকে বলা মিছে। অত চুল তা বাঁধবে না, অত কাপড় গয়না তা পরবে না, অত রূপ তা একবার চেয়ে দেখবে না। ওর সব ছিটিছাড়া মতিবুদ্ধি। ছেলেও হচ্ছে তেমনি। সেদিন অমূল্য আমাকে কি বললে জানিস ছোটবৌ! বলে, কাপড় জামা পরে কি হয়? ছোটমারও অত আছে, পরে কি?

বিন্দু সর্গর্বে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল, তবে দেখ দিদি, ছেলেকে দেশের একজন করে তুলতে হলে মায়ের এইরকম ছিটিছাড়া মতিবুদ্ধির দরকার কি না! যদি ততদিন বেঁচে থাক দিদি, তা হলে দেখতে পাবে, দেশের লোকে দেখিয়ে বলবে, ঐ অমূল্যর মা। বলিতে বলিতেই তাহার চোখদুটি সজল হইয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণা তাহা দেখিতে পাইয়া সন্নেহে বলিলেন, সেইজন্যই ত তোর ছেলের সম্বন্ধে কোন কথা আমরা কইনে। ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, কিন্তু ঐ ছেলে বড় হবে, দেশের একজন হবে, অত আশা আমরা মনে ঠাই দিইনে।

বিন্দু আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, কিন্তু ঐ একটি আশা নিয়ে আমি বেঁচে আছি দিদি। বাপের! সহসা তাহার সর্বাস কাঁটা দিয়া উঠিল। সে লজ্জিত হইয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, ও আশায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে ত আমি পাগল হয়ে যাব।

অন্নপূর্ণা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি ছোটজায়ের মনের কথাটা যে জানিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার এমন উগ্র প্রতিচ্ছবি কোনদিন নিজের মধ্যে এমন স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করেন নাই। আজ তাহার চৈতন্য হইল, কেন বিন্দু অমূল্য সম্বন্ধে এমন যত্নের মত সজাগ, এমন প্রেতের মত সতর্ক! নিজের পুত্রের এই সর্বমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনীর মুখের দিকে চাহিয়া অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার মাধুর্যে তাহার মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি উদগত অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।

ঠাকুরঝি বলিলেন, তা হোক ছোটবৌ, আজকে তোমার—

বিন্দু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, হাঁ ঠাকুরঝি, আজ দিঘির মাথাটা বেঁধে দাও—এ-বাড়িতে ঢুকে পর্বস্ত কখন দেখিনি। বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা বাটীর পুরাতন নাপিত যাদবের ক্ষৌরকর্ম করিয়া উপর হইতে নামিয়া যাইতেছিল, অমূল্য আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, কৈলাসদা, নরেন্দ্রার মত চুল ছাঁটতে পার?

নাপিত আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি-রকম দাদাবাবু!

অমূল্য নিজের মাথার নানাছান্দে নির্দেশ করিয়া বলিল, দেখ, এইখানে বারো আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা, আর এই খাড়ের কাছে একেবারে ছোট ছোট। পারবে ছাঁটতে?

নাপিত হাসিয়া বলিল, না দাদা, ও আমার বাবা এলেও পারবে না।

অমূল্য ছাড়িল না। সাহস দিয়া কহিল, ও শস্ত নয় কৌলাসদা, এইখানে বারো আনা, এইখানে ছ আনা—নাপিত নিবুড়ি-লাভের উপায় করিয়া বলিল, কিন্তু আজ কি বার? তোমার ছোটমা কখন না দিলে ত ছাঁটতে পারিবে দাদা!

অমূল্য বলিল, আজ্য দাঁড়াও, আমি জেনে আসি। বলিয়া এক পা গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ্য, তোমার ছটিটা একবার দাও, না হলে ভূমি পালিয়ে যাবে। বলিয়া জোর করিয়া সে ছটিটা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। কড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছোটমা, শিগগির একবার এস ত?

ছোটমা সবমাত্র ন্নান সারিয়া আঁহিকে বসিতেছিল, ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওরে হুঁসনে, হুঁসনে, আঁহিক কচি।

আঁহিক পরে ক'রো ছোটমা, একবারটি বাইরে এসে হুকুম দিয়ে যাও, নইলে চুল ছোট দেয় না, সে দাঁড়িয়ে আছে।—বিন্দু কিছু আশ্চর্য হইল, তাহার চুল ছোটাইবার জন্য চিরদিন মারামারি করিতে হয়, আজ সে কেন খেজায় চুল ছোটিতে চাহিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া সে বাহিরে আসিতেই নাপিত কহিল, বড় শক্ত ফরমাস হয়েছে মা, নরেনবাবুর মত বারো আনা, ছ আনা, তিন আনা, দু আনা, এক আনা, এমনি করে ছোটতে হবে, ও কি আমি পারব!

অমূল্য বলিল, খুব পারবে। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নরেনদাকে ডেকে আনি, বলিয়া ছোটমা চলিয়া গেল। নরেন বাড়ি ছিল না, খানিক খোজাখুঁজি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে নেই, আচ্ছা নাই থাকল, ছোটমা, তুমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দাও—বেশ করে দেখো—এইখানে বারো আনা, এইখানে ছ আনা, এইখানে দু আনা আর এইখানে খুব ছোট।

তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিন্দু হাসিয়া বলিল, আমি এখন আঁহিক করব যে রে!

আঁহিক পরে করো, নইলে ছুঁয়ে দেব।

বিন্দুকে অগত্যা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

নাপিত চুল কাটিতে লাগিল। বিন্দু চোখ টিপিয়া দিল। সে সমস্ত চুল সমান করিয়া কাটিয়া দিল। অমূল্য মাথায় হাত বুলাইয়া খুশী হইয়া বলিল, এই ঠিক হয়েছে। বলিয়া লাকহিতে লাকহিতে চলিয়া গেল।—নাপিত ছাতি বগলে করিয়া বলিল, কিছু মা, কাল এ-বাড়ি ঢোকা আমার শক্ত হবে।

বামুনদার ডাক দিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল; বিন্দু রান্নাঘরের একধারে বসিয়া বাটিতে দুধ সাজাইতে সাজাইতে গুনিতে পাইল, অমূল্য বাড়িময় কাকার চুল আঁচড়াইবার বুরুশ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। খানিক পরেই সে কাঁদিয়া আসিয়া বিন্দুর পিঠের উপর কুঁকিয়া পড়িল—কিছু হয়নি ছোটমা! সব খারাপ করে দিয়েছে—কাল তাকে আমি মেরে ফেলব।

বিন্দু আর হাসি চাপিতে পারিল না। অমূল্য পিঠ ছাড়িয়া দিয়া রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি কি কানা? চোখে দেখতে পাও না?

অন্নপূর্ণা কান্নাকাটি গুনিয়া ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত গুনিয়া বলিলেন, তার আর কি, কাল ঠিক করে কেটে দিতে বলব।

অমূল্য আরো রাগিয়া গিয়া বলিল, কাল কি করে বারো আনা হবে? এখানে চুল কৈ?

অন্নপূর্ণা শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, বারো আনা না হোক, আট আনা দশ আনা হতে পারবে।

হাই হবে। আট আনা দশ আনা কি ফ্যাশন? নরেনদাকে জিজ্ঞেস কর, 'রো আনা চাই।

সেদিন অমূল্য ভাল করিয়া ভাত খাইল না, ফেলিয়া ছড়াইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, ভোর ছেলের টেরি বাগাবার শখ হ'ল কবে থেকে রে?

বিন্দু হাসিল, কিন্তু পরক্ষণেই গভীর হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দিদি, তুচ্ছ কথা, তাই হাসি বটে, কিন্তু ভরে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে—সব জিনিসের শুরু এমনি করেই হয়।

অন্নপূর্ণা আর কথা কহিতে পারিলেন না।—দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। ও-পাড়ার জমিদারদের বাড়ি আমোদ-আহ্লাদের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। দুইদিন পূর্ব হইতেই নরেন তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল। সপ্তমীর রাতে অমূল্য আসিয়া ধরিল, ছোটমা, যাত্রা হচ্ছে দেখতে যাব?

ছোটমা বলিলেন, হচ্ছে, না হবে রে?—অমূল্য বলিল, নরেনদা বসন্তে তিনটে থেকে শুরু হবে।

এখন থেকে সমস্ত রাস্তির হিমে পড়ে থাকবি? সে হবে না। কাল সকালে ভোর কাকার সঙ্গে যাস, খুব ভাল জায়গা পাবি।—অমূল্য কাঁদ-কাঁদ হইয়া শ্মিল, না, পাঠিয়ে দাও। ব'ল! হয়ত যাবেন না, নয়ত কত বেলায় যাবেন।

বিন্দু বলিল, তিনটে-চারটের সময় যাত্রা শুরু হলে চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দেব, এখন শো।

অমূল্য রাগ করিয়া শয্যার এক প্রান্তে গিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল।

বিন্দু টানিতে গেল, সে হাত সরাইয়া দিয়া শক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। তার পর কিছুক্ষণের নিমিত্ত

সকলেই বোধ করি একই ঘুমইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের বড় ঘড়ির শব্দে অমূল্যের উষ্ম-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সে উৎকর্ষ হইয়া গণিতে লাগিল, একটা—দুটো—তিনটে—চারটে—থড়ফড় করিয়া সে উঠিয়া বসিয়া বিন্দুকে সঙ্গে লইয়া নাড়া দিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, ওঠ ওঠ ছোটমা, তিনটে চারটে বেজে গেলো—বাহিরের ঘড়িতে বাজিতে লাগিল—পাঁচটা—ছটা—সাতটা—আটটা—অমূল্য কাদিয়া ফেলিয়া বলিল, সাতটা আটটা বেজে গেল, কখন যাব? বাহিরের ঘড়িতে তখনও বাজিতে লাগিল—নটা—দশটা—এগারটা—বারটা; বাজিয়া থামিল। অমূল্য নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল। ঘরের ও-থারের খাটের উপর মাথব শয়ন করিতেন, চেঁচামেচিতে তাঁহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

উচ্ছ্বাস করিয়া তিনি বলিলেন, অমূল্য, কি হ'ল রে!

অমূল্য লজ্জায় সাড়া দিল না। বিন্দু হাসিয়া বলিল, ও যে করে আমাকে তুলেছে, ঘরে-দোরে আশুন ধরে গেলেও মানুষ অমন করে তোলে না। অমূল্য নিস্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তাহার দয়া হইল; সে বলিল, আচ্ছা যা, কিন্তু কারো সঙ্গে ঝগড়াখাটি করিস নে।

তার পর ভৈরবকে ডাকিয়া আলো দিয়া পাঠাইয়া দিল। পরদিন বেলা দশটার সময় যাত্রা ওনিয়া হাটটিতে অমূল্য ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাকাকে দেখিয়াই বলিল, কৈ গেলেন না আপনি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কেমন দেখলি রি?

বেশ যাত্রা, ছোটমা। কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার চমৎকার খেমটার নাচ হবে। কলকাতা থেকে দু'জন এসেছে নরেন্দ্রা তাদের দেখেছে, ঠিক ছোটমার মত—খুব ভাল দেখতে—তারা নাচবে, বাবাকেও বলেচি।

বেশ করেচ, বলিয়া মাথব হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাগে বিন্দুর সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—তোমার গুণধর ভায়ের কথা শোন।

অমূল্যকে কহিল, তুই একবারও আর ওখানে যাবি না—হারামজাদা বজ্জাত! কে বললে আমার মত, নরেন?

অমূল্য ভয়ে ভয়ে বলিল, হাঁ, সে দেখেছে যে।

কৈ নরেন? আচ্ছা, আসুক সে।

মাথব হাসি দমন করিয়া বলিলেন পাগল তুমি! দাদা ওনেছেন, আর গোলমাল করো না। কাজেই বিন্দু কথাটা নিজের মধ্যে পরিপাক করিয়া রাগে পুড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাকালে অমূল্য আসিয়া অন্নপূর্ণাকে ধরিয়া বসিল, দিদি, পূজা-বাড়িতে নাচ দেখতে যাব। দেখে, এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বলিলেন, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর গে!

অমূল্য জিদ করিতে লাগিল, না দিদি, এখনি ফিরে আসব, তুমি বল, যাই।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, না রে না, সে রাগী মানুষ, তাকে বলে যা।

অমূল্য কাদিতে লাগিল, কাপড় ধরিয়া টানটানি করিতে লাগিল—তুমি ছোটমাকে বলো না। আমি নরেন্দ্রার সঙ্গে যাই—এখনি ফিরে আসব।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, নরেনের সঙ্গে যদি যাস ত—

অমূল্য কথাটা শেষ করিবারও সময় দিল না, এক দৌড়ে বাহির হইয়া গেল।

ঘন্টা-খানেক পরে অন্নপূর্ণার কানে গেল, বিন্দু বোঁজ করিতেছে। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। বোঁজাখুঁজি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কি নাচ হবে, নরেনের সঙ্গে তাই দেখতে গেছে—এখনি ফিরে আসবে, তোর কোন ভয় নেই।

বিন্দু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে যেতে বলেছে, তুমি?

অমূল্য যে সম্ভ্রান্ত ন্ন লইয়াই গিয়াছে, এ কথা অন্নপূর্ণা ভয়ে স্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, এখনি আসবে।

বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল। খানিক পরে অমূল্য বাড়ি ঢুকিয়া যে ওনিলা ছোটমা

ডকিতেছে, সে গিয়া তাহার পিতার শয্যার একধারে শুইয়া পড়িল।

প্রদীপের আলোকে বসিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া যাদব ভাগবত পড়িতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি রে অমূল্য?

অমূল্য সাড়া দিল না।

কদম আসিয়া বলিল, ছোটমা ডাকছেন এস।

অমূল্য তাহার পিতার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা, তুমি দিয়ে আসবে চল না।

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমি দিয়ে আসব? কি হয়েছে কদম?

কদম বুঝিয়া বলিল।

যাদব বুঝিলেন, এই লইয়া একটা কলহ অবশ্যম্ভাবী। একজন নিষেধ করিয়াছে, একজন হুকুম দিয়াছে। তাই অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ছোটবধুর ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিলেন, এইবারটি মাপ কর মা, ও বলচে আর করবে না।

সেই রাতে দুই জায়ে আহারে বসিলে বিন্দু বলিল, আমি তোমার উপর রাগ কর্জিনে দিদি, কিন্তু এখানে আমার আর থাকা চলবে না—অমূল্য তা হলে একেবারে বিগড়ে যাবে। আমি যদি মানা না করতুম, তা হলেও একটা কথা ছিল; কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও, এত বড় সাহস ওর হল কি করে, তখন থেকে আমি শুধু এই কথাই ভাবচি। তারওপর বজ্জাতি বুদ্ধি দেখ! আমার কাছে যায়নি, এসেছে তোমার কাছে; বাড়ি ফিরে যেই শুনেচে আমি ডাকচি, অমনি গিয়ে বঠাকুরকে সঙ্গে করে এনেচে। না দিদি, এতদিন এ-সব ছিল না—আমি বরং কলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকব সেও ভাল, কিন্তু এক ছেলে—যে যাবে, তাকে নিয়ে সারা জীবন আমি চোখের জলে ভাসতে পারব না।

অন্নপূর্ণা উষ্মি হইয়া বলিলেন, তোরা চলে গেলে আমিই বা কি করে একলা থাকি বল।

বিন্দু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে তুমি জান। আমি যা করব, তোমাকে বলে দিলাম। বড় মন্দ ছেলে ঐ নরেন।

কেন, কি করলে নরেন? আর মনে কর, ওরা যদি দুটি ভাই হ'ত, তা হলে কি কপ্তিস?

বিন্দু বলিল, আজ তা হলে চাকর দিয়ে হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিতুম। তা ছাড়া, 'যদি' নিয়ে কাজ হয় না, দিদি—ওদের তুমি ছাড়।

অন্নপূর্ণা মনে মনে বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, ছাড়া না ছাড়া কি আমার হাতে ছোটবৌ? যে ওদের এনেচে, তাকে বল গে। আমাকে মিথো গল্পনা দিসনে।

এ-সব কথা বঠাকুরকে বলব কি করে?

যেমন করে সব কথা বলিস—তেমনি করে বল গে।

বিন্দু ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ন্যাকা বুঝিয়ে না দিদি, আমরা সাতাশ-আটশ বছর বয়স, হতে চলল। এ বাড়ির দাসী-চাকর নিয়ে কথা নয়, কথা আত্মীয়-বন্ধন নিয়ে—তুমি বেঁচে থাকতে এ-সব কথায় কথা বলতে গেলে বঠাকুর রাগ করবেন না?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, রাগ নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু আমি বললে আমার আর মুখ দেখবেন না। হাজার হই আমরা পর, ওরা ভাই-বোন—সেটা দেখিস না কেন? তা ছাড়া, আমি বুড়ো মামী, এই তুচ্ছ কথা নিয়ে নেচে বেড়ালে লোকে পাগল বলবে না?

বিন্দু ভাতের থালাটা হাত দিয়া আরো খানিকটা ঠেলিয়া দিয়া শুম হইয়া বসিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, সে কেবল ভাতের ভূয়ে চুপ করিয়া গেল। বিন্দু হাত তুলে বসে রইলি—ভাতের থালাটা কি অপরাধ করলে?—বিন্দু হঠাৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

অন্নপূর্ণা তাহার ভাব দেখিয়া আর জিন করিতে পারেন করিলেন না।

ওইতে গিয়া বিন্দু বিছানায় অমূল্যকে দেখিতে না পাইয়া কিরিয়া আসিয়া বলিল, সে গেল কোথায়?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আজ দেখছি আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে—যাই, তুলে দিই গে।

না না, থাক, বলিয়া বিন্দু মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেল।

অর্ধেক রাতে, বিদ্যুৎ সতর্ক নিম্না অন্নপূর্ণার ডাকে ডাকিয়া গেল।

কি দিদি?

অন্নপূর্ণা বাহির হইতে বলিলেন, সোর খুলে তোর ছেলে নে। এত বজ্জাতি আমার বাবা এলেও সইতে পারবে না।

বিদ্যুৎ সোর খুলিয়া দিতেই তিনি অমূল্যকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, ঢের হারামজাদা ছেলে দেখেচি ছোট্টবো, এমনটি দেখিনি। রাত্তির দুটো বাজে, একবার চোখে পাতার কন্ঠে দিলে না। এই বলে ষিমে গেলেচে, এই বলে মশা কামড়াচে, এই বলে জল খাব, এই বলে বাতাস কর—না ছোট্টবো, আমি সমস্তদিন খাটিখুটি, রাত্তিতে একটু ঘুমোতে না পেলে ত বাঁচিনে।

বিদ্যুৎ হাসিয়া হাত বাড়াইতেই অমূল্য তাহার ফ্রোডের ভিতর গিয়া ঢুকিল এবং বুকের উপর মুখ রাখিয়া এক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

মাথব ওদিকে বিছানা হইতে পরিহাস করিয়া কহিলেন, শখ মিটল বৌঠান?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আমি শখ করিনি তাই, উনিই নিজে মারের ভয়ে ওখানে গিয়ে ঢুকেছিলেন। তবে আমারও শিকা হ'ল বটে। আর কি ঘেমার কথা ঠাকুরপো, আমাকে বলে কিনা তোমার কাছে শুতে লজ্জা করে।

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, আর না, যাই একটু ঘুমোই গে, বলিয়া চলিয়া গেলেন।—দিন-দশেক পরে বিদ্যুৎ বাপ-মা তীর্থযাত্রার সজ্জা করিয়া মেয়েকে একবার দেখিবার জন্য পালকি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যুৎ বড় জায়ের অনুমতি লইয়া দু-তিন দিনের জন্য অমূল্যকে লুকাইয়া বাপের বাড়ি যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় বই বগলে করিয়া ইন্সুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অনতিপূর্বে সে বাহিরে পথের ধারে একটা পালকি দেখিয়া আসিয়াছিল; এখন হঠাৎ পায়ের দিকে নজর পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, পায়ে আলতা পরেচ কেন ছোট্টমা?

অন্নপূর্ণা উপস্থিত ছিলেন, হাসিয়া ফেলিলেন।

বিদ্যুৎ বলিল, আজ পরতে হয়।

অমূল্য বার বার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, গায়ে এত গয়না কেন?

অন্নপূর্ণা মুখে আঁচল দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎ হাসি চাপিয়া বলিল, কবে তোর বৌ এসে পরবে বলে আমাদের কাউকে কিছু পরতে নৌ রে। যা, ইন্সুলে যা।

অমূল্য সে কথা কানে না তুলিয়া বলিল, দিদি অত হাসচে কেন? আমি ত আর ইন্সুলে যাব না—তুমি কোথায় যাবে।

বিদ্যুৎ বলিল, তাই যদি বাই, তোর বুকু নিতে হবে নাকি?

আমিও যাব, বলিয়া সে বই লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ও যে অত সহজে ইন্সুলে যাবে, মনে করিনি। কিন্তু কি সেমানা সেবেচিস, বলে জালতা পরেচ কেন? গায়ে অত হয়না কেন? কিন্তু আমি বলি নিয়ে যা—নইলে কিরে এসে ডাকে দেখতে না পেলে ভারী হাল্লামা করবে।

বিদ্যুৎ বলিল, তুমি কি মনে করেচ দিদি, সে ইন্সুলে গেছে? ককপো না। কোথায় লুকিয়ে বসে আছে, সেখা, ঠিক সময়ে হাজির হবে।

ঠিক তাহাই হইল। সে লুকাইয়া ছিল, বিদ্যুৎ অন্নপূর্ণার পায়ের খুঁচা লইয়া পালকিতে উত্তিবার সময় কোথা হইতে বাহির হইয়া তাহার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। দুই জায়েই হাসিয়া উঠিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, মাঝার সময় আর মাঝখর করিস্ নে, নিয়ে যা।

বিদ্যুৎ বলিল, তা যেন গেলুম দিদি, কিন্তু কোথাও যে আমার এক-পা নড়বার জো নাই, এ ত বড় বিপদের কথা!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, যেমন করেচিস, তেমনি হবে ত। অমূল্য, থাক না তুই দু'দিন আমার কাছে।

অমূল্য মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, তোমার কাছে থাকতে পারব না। বলিয়া আগেই সে পালকিতে গিয়া বলিল।

হুস

বিন্দু বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিবার দিন-দশেক পরে একদিন মধ্যাহ্নে অন্নপূর্ণা তাহার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, ছোটবৌ?

ছোটবৌ একরাশ ময়লা কাপড়-জামার সুমুখে শুক হইয়া বসিয়া ছিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, খোপা এসেছে?

ছোটবৌ কথা কহিল না। অন্নপূর্ণা এইবার তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া ভয় পাইলেন। উদ্ভিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে রে?

বিন্দু আঙুল দিয়া ছোট ছোট দুই টুকরো পোড়া সিগারেট দেখাইয়া দিয়া বলিল, অমূল্যর জামার পকেট থেকে বেরুল।

অন্নপূর্ণা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিন্দু সহসা কাদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি, ওদের বিদেয় কর, না হয়, আমাদের কোথাও পাঠিয়ে দাও।

অন্নপূর্ণা ভ্রাব দিতে পারিলেন না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে অমূল্য ইস্কুল হইতে ফিরিয়া খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। বিন্দু একটি কথাও বলিল না। ১৩০৭ চাকর নালিশ করিতে আসিল, নরেনবাবু বিনা দোষে তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে।

বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, দিদিকে বল গে।

আলালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাথব কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কি একটা কুন্দ পরিহাস করিতে গিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিল। অদৃশ্যে যে কতবড় বড় ঘনাইয়া উঠিতেছে, বাড়ির মধ্যে তাহা কেবল অন্নপূর্ণাই টের পাইলেন। উৎকণ্ঠায় সমস্ত সন্ধ্যাটা ছটফট করিয়া, এক সময়ে নির্ভনে পাইয়া তিনি ছোটবৌয়ের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন, হাজার হোক, সে তোরই ছেলে, এইবারটি মাপ কর। বরং আড়ালে ডেকে ধমকে দে।

বিন্দু বলিল, আমার ছেলে নয়, সে কথা আমিও জানি, তুমিও জান। মিছামিছি কতকগুলো কথা বাড়িয়ে দরকার কি, দিদি?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, আমি নয়, তুই তার মা—আমি কোকেই ত দিয়েছি

যখন ছোট ছিল, খাইয়েছি পরিয়েছি। এখন বড় হয়েছে, তোমাদের ছেলে না—মরা নাও—আমাকে রেহাই দাও, বলিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

রায়ে কাদ-কাদ মুখে অমূল্য অন্নপূর্ণার কাছে গুইতে আসিল।

অন্নপূর্ণা ব্যাপার বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এখানে কেন? যা এখান থেকে—যা বলি।

অমূল্য ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা ঘুমাইতেছেন, সে কোন কথাটি না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সকালবেলা কদম রাস্তাঘরে এঁটো বাসন তুলিতে আসিয়া দেখিল, পারান্দার এক কোণে কতকগুলো কাঠ-খুঁটের উপর সমুদ্রা পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে ছুটিয়া গিয়া বিন্দুকে তুলিয়া আনিল। অন্নপূর্ণাও ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিন্দু তাঁকুড়াবে বলিল, রায়ে বড়গিল্লী বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছিলে? ও থাকলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, না?

ছেলের অবস্থা দেখিয়া কোডে দুখে তাঁহার নিজের চোখেও জল আসিতেছিল, কিন্তু বিন্দুর নিষ্ঠুর তিরস্কারে জুলিয়া উঠিয়া বলিলেন, নিজের দোষ তুই পরের ঘাড়ে তুলে দিতে পারলেই বাঁচিস।

বিন্দু ছেলেকে তুলিতে গিয়ে দেখিল, তাহার পা গরম—জ্বর হইয়াছে। কহিল, সারারাত, কার্তিক মাসের হিমে—জ্বর হবেই ত। এখন ভাল হলে বাঁচি।

অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া কুকিয়া পড়িয়া বলিলেন, ছুর হরেচে— কৈ দেখি।

বিন্দু সজোরে তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, থাক, আর দেখে কাজ নেই। বলিয়া ঘুমন্ত হেলেকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইয়া অন্নপূর্ণার প্রতি একবার বিব-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ-ছয় দিনেই অমূল্য আরোগ্য হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু বড়জায়ের অপরাধটা বিন্দু মার্জনা করিল না। সেইদিন হইতে সে ভাল করিয়া কথা পর্বত বলিত না।

অন্নপূর্ণা মনে মনে সমস্তই বুঝিলেন, অথচ তিনিও মৌন হইয়া রহিলেন। সকলের সম্মুখে সমস্ত অপরাধ বিন্দু যে তাহার উপর তুলিয়া দিয়াছে, এ অন্যায় তিনিও তুলিতে পারিলেন না। এইটিই একমিন কি একটা কথার পর তিনি এলোকেশীর কাছে বলিয়া ফেলিলেন, ওর ছুর ত ছোটবোয়ের জন্যেই। ও যে মরেনি, এই ওর ভাগ্য।

কথাটা এলোকেশী বিন্দুর গোচর করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিলেন না। বিন্দু মন দিয়া শুনিল, কিন্তু কথা কহিল না। সে যে শুনিয়াছে, তাহাও এলোকেশী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। বিন্দু বড়জায়ের সহিত একেবারে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিল।

কয়েকদিন হইতে নূতন বাটীতে জিনিস-পত্র সরানো হইতেছিল, কাল সকালেই উঠিয়া যাইতে হইবে। যাদব ছেলের লইয়া সে বাড়িতে ছিলেন, মাধব মকদ্দমা উপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন ; তিনিও ছিলেন না। ইতিমধ্যে এ-বাড়িতে এক বিবম কাণ্ড ঘটিল। সন্ধ্যার সময় মাস্টার পড়াইতে আসিয়াছিল, কি মনে করিয়া বিন্দু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। বলিল, কাল থেকে ও-বাড়িতে গিয়ে পড়াবেন।

মাস্টার যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বিন্দু প্রশ্ন করিল, আপনার ছাত্রটি আজকাল পড়ে কেমন ?

মাস্টার বলিল, লেখাপড়ায় সে বরাবরই ভাল, প্রতিবারেই ত প্রথম হয়।

বিন্দু কহিল, তা হয়। কিন্তু আজকাল চুরুট খেতে শিখেচে যে!

মাস্টার বিস্মিত হইয়া বলিল, চুরুট খেতে শিখেচে ?

পরক্ষণে নিজেই বলিল, আশ্চর্য নয়, ছেলেরা সমস্তই দেখাদেখি শেখে।

কর দেখে শিখে ?

মাস্টার চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু বলিল, ওর বাবাকে এ-কথা জানাবেন।

মাস্টার মাথা নাড়িয়া বলি, এই দেখুন না, আজ পাঁচ-সাতদিনের কথা, ইকুলের পথে এক উড়ে মালীর বাগানে ঢুকে তার অসময়ের আম পেড়ে, পাছ ভেঙ্গে, তাকে মারধর করে এক কাণ্ড করেছে।

বিন্দু রুদ্ধ-নিশ্বাসে বলিল, তারপর ?

উড়ে হেডমাস্টারকে বলে দেয়, তিনি দশ টাকা জরিমানা করিয়ে তাকে তা দিয়ে শাস্ত করেছেন।

বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আমার অমূল্য ছিল ? সে টাকা পাবে কোথায় ?

মাস্টার কহিল, তা জানি না, কিন্তু সেও ছিল। এ-বাড়ির নরেনবাবুও ছিল, আরও তিন-চারজন ইকুলের কন্যাস ছেলে ছিল। এই কথা আমি হেডমাস্টার মশায়ের কাছে শুনেচি।

বিন্দু বলিল, টাকাও আদায় হয়ে গেছে ?

আজ্ঞে হী, তাও শুনেচি।

আজ্ঞা—আপনি যান। বলিয়া বিন্দু সেইখানেই বসিয়া রহিল। তার মুখ দিয়া শুধু অশ্রুতে বাহির হইল, আমাকে না জানিয়ে টাকা নিলে, এত সাহস এ বাড়িতে কার ? একে তাহার মন খারাপ, তাহাতে দিলির সহিত কথাবার্তা বন্ধ, তাহার উপর এই সংবাদ বিন্দুকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল।

সে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। অন্নপূর্ণা রান্নার জন্য তরকারি কুটিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া ছোটবোয়ের সেবাঙ্গর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

বিন্দু কহিল, দিদি, এর মধ্যে অমূল্যকে টাকা নিজে ?

অন্নপূর্ণা ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন, তবে তাহার গলা কাঠ হইয়া গলে ; মৃদুস্বরে বলিলেন,

কে বললে?

বিন্দু বলিল, সেটা দরকারী কথা নয়—দরকারী কথা, সেই বা কি বলে নিলে, আর তুমিই বা কি বলে দিলে?

অন্নপূর্ণা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বিন্দু বলিল, তুমি চাও না যে, আমি তাকে শাসন করি, সেইজন্যই আমাকে লুকিয়েচ। অমূল্য আর যাই করুক, মিথ্যা কথা গুরুজনের কাছে বলবে না, তুমি জেনেওনে দিয়েচ, সত্যি কি না?

অন্নপূর্ণা আস্তে আস্তে বলিলেন, সত্যি, কিন্তু এইবারটি তাকে মাপ কর বোন, আমি মাপ চাচ্ছি। বিন্দুর বৃকের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছিল, বলিল, একটবার! আজ থেকে চিরকালের জন্যই মাপ করলুম। আর বলব না। আর কথা ক'ব না। সে যে এমন করে চোখের সামনে একটু একটু করে উচ্ছন্ন যাবে, তা সইতে পারব না—তার চেয়ে একেবারে যাক। কিন্তু তোমার কি আশ্পর্ষা!

শেষ-কথাটা অন্নপূর্ণাকে তীক্ষ্ণভাবে বিমল, তথাপি তিনি নিরুত্তরে বলিয়া রহিলেন। কিন্তু বিন্দু যত বকিতেছিল, তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর ততই বাড়িতেছিল। সে পুনরায় চৈতহিয়া বলিল, সব কথায় তুমি ন্যাকা সেজে বল, এইবারটি মাপ কর, কিন্তু দোষ তার তত নয়, যত তোমার। তোমাকে আমি মাপ করব না।

বাটার দাসী-চাকরেরাও আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল।

অন্নপূর্ণার আর সহ্য হইল না, তিনি বলিলেন, কি করবি—ফাঁস দিবি?

বিন্দু পড়িল, বিন্দু বারুদের মত ছুলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

নিজের ছেলেকে দুটো টাকা দিয়েছি, এই ত অপরাধ?

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল, বিন্দু আসল কথা ভুলিয়া বলিয়া বসিল, তাই বা দেবে কেন?

নষ্ট করবার টাকা আসে কোথা থেকে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন, টাকা তুই নষ্ট করিস নে?

আমি করি আমার টাকা, তুমি নষ্ট কর কার টাকা শুনি?

অন্নপূর্ণা এবার ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিঃশব্দ ঘরের মেয়ে ছিলেন। মনে করিলেন, বিন্দু সেই ইস্ততই করিয়াছে। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই না হয় মস্ত বড় লোকের মেয়ে, কিন্তু তাই বলে আর কেউ যে দুটো টাকাও দিতে পারে না, সে অহঙ্কার করিস নে।

বিন্দু বলিল, সে অহঙ্কার আমি করিনে, কিন্তু তুমিও ভেবে দেখো একটা পয়সাও দিতে গেলে তুমি কার পয়সা দাও।

অন্নপূর্ণা চৈতহিয়া উঠিলেন, কার পয়সা দিই? তোর যা মুখে আসে তাই বলিস? যা, দূর হয়ে যা সামনে থেকে।

বিন্দু বলিল, দূর—আমি রাত পোহালেই হব, কিন্তু কার পয়সা খরচ কর, সেটা দেখতে পাও না? কার রোজগারে খাচ্-পরচ, সেটা জান না?

হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বিন্দু তড়ক হইয়া ধামিল।

অন্নপূর্ণার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল। তিনি কলকাল নির্নিমেব-চোখে ছোটবোয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তোমার স্বামীর রোজগারে খাচ্-পরচি। আমি তোমার দাসী-বঁদী, উনি তোমার চাকর-বাকর। এই না তোর মনের কথা? তা এতদিন বলিস নি কেন?

তাঁহার ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিয়া এক-মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, কোথা ছিলি ছোটবোঁ যখন ছোটভাই-ব পড়াবার জন্যে ও দু'খানি কাপড় একসঙ্গে কিনে পরেনি। কোথা ছিলি তুই, যখন ঘর পুড়ে গেলে গাছ-তলায় একবেলা রেখে খেয়ে ও পৈতৃক ভিট্টটুকু বাড়া করেছিল?

বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল করিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া মুছিয়া লেগিয়া বলিলেন, ও যদি জানত তোদের মনের কথা, কখনো এমন আকিৎ খেয়ে চোখ বুজে স্বাক্ষর নল মুখে দিয়ে আরামে মিন কাটাতে পারত না—সে লোক ও নয়। ওকে জানে তোর স্বামী, ওকে

জানে স্বর্গের দেবতারা। আজ আমার ছুতো করে তুই তাঁকে অপমান করলি?

বামী-অভিমনে অন্নপূর্ণার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বলিলেন, ভালই হল, জানিয়ে দিলি। সতী আত্মহত্যা করেছিল, আমিও দিবি কচ্চি, বরং পরের বাড়ি রেখে খাব, তবুও তোদের ভাত আর খাব না। তুই কি করলি—ওঁকে অপমান করলি!

ঠিক এই সময়ে যাদব শ্রাস্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, বড়বৌ!

বামীর কণ্ঠস্বরে তাহার অভিমান ঝটিকা-স্কন্ধ সাগরের মত উদ্ভাল হইয়া উঠিল, ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ছি ছি, যে লোক নিজের মাগ-ছেলেকে খেতে দিতে পারে না—তার গলায় দেবার দড়ি জোটে না কেন?

যাদব হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিলেন, কি হ'ল গো?

কি হ'ল? কিছু না। ছোটবৌ আজ স্পষ্ট করে বলে দিলে, আমি তার দাসী, তুমি তার চাকর। ঘরের ভিতর বিন্দু জিভ কাটিয়া কানে আঙুল দিল।

অন্নপূর্ণা কাদিতে কাদিতে বলিলেন, আমার একটা পয়সা কাউকে হাত তুলে দেবার অধিকার নেই—তুমি বেঁচে থাকতেও আজ আমাকে এ কথা শুনতে হ'ল। আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই শপথ কচ্চি, ওদের ভাত খাবার আগে যেন আমাকে ব্যাটার মাথা খেতে হয়।

বিন্দুর অবরুদ্ধ কর্ণরঞ্জে এ কথা অস্পষ্ট হইয়া শ্রবণ করিল; সে অশ্রুতে 'কি করলে দিদি' বলিয়া সেইখানেই ঘাড় গুঁজিয়া আজ দ্বাদশ বর্ষ পরে অকস্মাৎ মুর্ছিত হইয়া পড়িল।

সাত

নতুন বাড়িতে যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য ব্যতীত আর সকলেই আসিয়াছিল। বাহির হইতে বিন্দুর পিসী, পিসীর মেয়ে, নাতি-নাতিনী, বাপের বাড়ি হইতে তাহার বাপ-মা, তাহাদের দাস-দাসী প্রভৃতিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এখানে আসিবার দিনটাতেই শুধু বিন্দুকে কিছু বিমনা দেখাইয়াছিল, কিন্তু পরদিন হইতেই সে ভাব কাটিয়া গেল। রাগ পড়িলেই অন্নপূর্ণা আসিবে, ইহাতে বিন্দুর লেশমাত্র সংশয় ছিল না। এখানে পূজা দিয়া লোকজন খাওয়াইতে হইবে, সে তাহারই উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বিন্দুর বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোর ছেলেকে দেখছি নে যে?

বিন্দু সংক্ষেপে কহিল, সে ও-বাড়িতে আছে।

মা প্রশ্ন করিলেন, তোর জা বুঝি আসতে পারলেন না?

বিন্দু কহিল, না।

তিনি নিজেই তখন বলিলেন, সবাই এলে ও-বাড়িতেই বা থাকে কে? পৈতৃক ভিটে বন্ধ করেছে ত রাখা চলে না।

বিন্দু চুপ করিয়া কাজে চলিয়া গেল।

যাদব একদিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন, কথাবার্তা বলিয়া সংবাদ লইয়া ফিরিয়া বাইতেন, কিন্তু ভিতরে ঢুকিতেন না। গৃহ পূজার পূর্বের রাতে তিনি ভিতরে ঢুকিয়া এলোকেশীকে ডাকিয়া তত্ত্ব লইতেছিলেন, বিন্দু জানিতে পারিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। পিতার অধিক এই ভাতরের কাছে ছেলেবেলা হইতে সেদিন পর্যন্ত সে কত আদর পাইয়াছে, কত স্নেহের ডাক শুনিয়াছে, যাদব 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, কোনদিন 'বৌমা' পর্যন্ত বলেন নাই, এই ভাতরের কাছে জ্বালের সহিত কলহ করিয়া কত নাশিষ করিয়াছে, কোনটি তাহার কোনদিন উপেক্ষিত হয় নাই, আজ তাহার কাছে অপরিণীম লজ্জায় বিন্দুর কণ্ঠস্বরে হইয়া গেছে। যাদব চলিয়া গেলেন। সে নিভুতে ঘরের মধ্যে মুখে আঁচল গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতে লাগিল—চারিদিকে লোক, পাছে কেহ শুনিতে পায়।

পরদিন সকালবেলা বিন্দু বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, বেলা হচ্ছে, পুরুত বসে আছেন—বৃষ্টাকুর এখনো শু এলেন না।

মাধব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেন?

বিন্দু ভাতোষিক বিস্মিত হইয়া বলিল, তিনি কেন? তিনি ছাড়া এ-সব করবে কে?

মাধব বলিল, হয় আমি, না হয় ভগ্নীপতি শ্রিয়বাবু করবেন। দাদা আসতে পারবেন না।

বিন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আসতে পারবেন না বললেই হ'ল? তিনি থাকতে কি কারো অধিকার আছে? না না, সে হবে না—তিনি ছাড়া আমি কাউকে কিছু করতে দেব না।

মাধব বলিল, তবে বন্ধ থাক। তিনি বাড়ি নেই, কাজে গেছেন।

এ-সমস্ত বড়গিন্নীর মতলব! তা হলে সেও আসবে না দেখছি। বলিয়া বিন্দু কাদ-কাদ হইয়া চলিয়া গেল। তাহার কাছে পূজা-অর্চনা, উৎসব-আয়োজন, খাওয়ান-দাওয়ান, সমস্তই একমুহূর্তে একেবারে মিথ্যা হইয়া গেল। তিনদিন ধরিয়া অনুক্ষণ সে এই চিন্তাই করিয়াছে, আজ বঠাকুর আসিবেন, বিদি আসিবেন, অমূল্য আসিবে। আজিকার সমস্তদিনব্যাপী কাজকর্মের উপর সে যে মনে মনে তাহার কতখানি নির্ভর করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া ছিল, সে কথা সে ছাড়া আর কেহই জানিত না। স্বামীর একটা কথায় সে-সমস্ত মরীচিকার মত অন্তর্ধান হইয়া যাইবামাত্রই উৎসবের বিরাট পণ্ড্রম পাবাণের মত তাহার বুকের উপর চালিয়া বলিল।

এলোকেশী আসিয়া বলিলেন, ভাঁড়ারের চাষিটা একবার দাও ছোটবৌ, ময়রা সন্দেশ নিয়ে এসেচে।

বিন্দু ক্রান্তভাবে বলিল, এখানে কোথাও এখন রাখ ঠাকুরঝি, পরে হবে।

কোথায় রাখব বৌ, কাকে-টাকে মুখ দেবে যে!

তবে ফেলে দাও গে, বালয়া বিন্দু অন্যত্র চলিয়া গেল।

পিসীমা আসিয়া বলিলেন, হী বিন্দু, এ-বেলা কতখানি ময়দা মাখবে, একবার যদি দেখিয়ে দিতিস।

বিন্দু মুখ ভার করিয়া বলিল, কতখানি মাখবে তার আমি কি জানি? তোমরা গিন্নী-বান্নী, তোমরা জান না?

পিসীমা অবাক হইয়া বলিলেন, শোন কথা! কত লোক তাদের এ-বেলা খাবে, আমি তার কি জানি?

বিন্দু রাগিয়া বলিল, তবে বল গে ওঁকে। সে ছিল বিদি; অমূল্যধনের পৈতের সময় তিনদিন ধরে শহরের সমস্ত লোক খেলে, তা একবার বলেনি, ছোটবৌ, ওটা ক' গে, সেটা দেখ গে! তার একটা হাড়ের যা যোগ্যতা, এ বাড়ির সমস্ত লোকের ও নেই। বলিয়া আ' একটা ঘরে চলিয়া গেল।

কদম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিদি, জামাইবাবু বলচেন পূজোর কাণ্ড-চোপড়গুলো—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই বিন্দু চোঁচাইয়া উঠিল, খেয়ে ফ্যাল্ আমাকে, তোরা খেয়ে ফ্যাল্! যা দূর হ সামনে থেকে।

কদম লশবাস্তে পলায়ন করিল।

খানিক পরে মাধব আসিয়া কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া বলিল, ওগো স্নততে পাছ?

বিন্দু কাছে সরিয়া আসিয়া বন্ধার দিয়া বলিয়া উঠিল, পাছি না। আমি পারব না। পারব না। পারব না! হ'ল? মাধব অতাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, কি করবে? আমার গলায় কীসি দেবে? না হয় ও'ই এ, বলিয়া কীদিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

বিন্দু বিনা কাজে ছটফট করিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া কেবলি লোকের দোষ ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে ডাড়াডাড়ি পথের উপর কতকগুলো বাসন রাখিয়া গিয়াছিল, বিন্দু টান মারিয়া সেগুলো উঠানের উপর ফেলিয়া দিয়া, কি করিয়া কাজ করিতে হয় শিখাইয়া দিল; কার ভিজা কাপড় ওকাইতেছিল, উড়িয়া তাহার গায়ে লাগিবামাত্র টানিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়া, কি করিয়া কাপড় ওকাইতে হয়, বুঝাইয়া দিল। যে কেহ তাহার সামনে পড়িল, সে-ই সভয়ে পাশ কাটিয়া

দাঁড়াইল।

পুরোহিত-বেচারিা নিজে ভিতরে আসিয়া বলিলেন, তাই ত! বেলা বাড়তে লাগল—কোন বিলি-ব্যবস্থাই দেখেনে—

বিন্দু আড়ালে দাঁড়াইয়া কড়া করিয়া জবাব দিল, কাজকর্মের বাড়িতে বেলা একটু হয়ই। বলিয়া আর একটা বাসন পা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আর একটা ঘরের মেঝের উপর নির্জীবের মত বসিয়া রহিল। মিনিট-দশেক পরে হঠাৎ তাহার কানে একটা পরিচিত কণ্ঠের শব্দ বাহিবামাত্রই সে খড়খড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা আসিয়া গ্রাসণে দাঁড়াইলেন।

বিন্দু দুহুখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া সশব্দে সুমুখে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, বেলা দশটা-এগারটা বাজে, আর কত শত্রুতা করবে দিদি? আমি বিব খেলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ত তাই না হয় বাড়ি গিয়ে এক বাটি পাঠিয়ে দাও। বলিয়া চাবির গোছটা কনাক করিয়া তাহার পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা নিঃশব্দে চাবির গোছা তুলিয়া লইয়া দোর খুলিয়া ভাঁড়ারে গিয়া ঢুকিলেন।

অপরূহে লোকজনের যাতায়াত, ষাওয়ানো-দাওয়ানোর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল; তবুও বিন্দু কিসের জন্য কেবলি অস্থির হইয়া ঘর-বার করিতে লাগিল।

ভৈরব আসিয়া বলিল, অমূল্যাবাবু ইচ্ছুক নেই।

বিন্দু তাহার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, হতভাগা! ছেলেরা রাতি পর্যন্ত ইচ্ছুক থাকে; নূতন লোক তুমি? ও-বাড়িতে গিয়ে একবার দেখতে পারনি?

ভৈরব বলিল, সে-বাড়িতেও তিনি নেই।

বিন্দু চোঁচাইয়া বলিল, কোথায় কোন ছোটলোকদের ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলচে। আর কি তার গ্রাসে ভয়-ডর আছে, এইবার একটা চোখ কানা হলেই বড়গিল্লীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়! তা হলে দশ হাত বার করে ঝা—যা, যেখানে পাস বুঁজে আন।

অন্নপূর্ণা ভাঁড়ারের দোরে বসিয়া আর পাঁচজন বয়ীসীর সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। ছোটবৌর তীক্ষ্ণকণ্ঠ ওনিতে পাইলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরে ভৈরব আসিয়া জানাইল, অমূল্যাবাবু ঘরে আছে, এল না। বিন্দু বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এল না কি রে? আমি ডাকটি বলেছিলাম?

ভৈরব মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, তবু এল না।

বিন্দু একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তার দোষ কি? যেমন মা, তেমনি ছেলে হবে ত! আমরা কেঁটু দিবা রইল যে, এমন মা-ব্যাটার মুখ দর্শন করব না।

অনেক রাতে অন্নপূর্ণা বাঁটি ফিরিতে উদ্যত হইলে, নৌছাইয়া দিবার জন্য মাথব নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিন্দু দ্রুতপদে অদূরে আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া ভীষণ-কণ্ঠে বলিল, নৌছে দিতে ত যাচ্ছ, উনি জলস্পর্শ করেন নি, তা জান?

মাথব বলিল, সে তোমার জানবার কথা—আমার নয়। সমস্ত নষ্ট হয় দেখে, নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিলাম, এখন নিজে গৌছে দিতে যাচ্ছি।

বিন্দু বলিল, বেশ ভাল কথা। তা হলে দেখি তুমিও ঐদিকে।

মাথব জবাব না দিয়া বলিল, চল বৌঠান, আর দেখি ক'রো না।

চল ঠাকুরপো; বলিয়া অন্নপূর্ণা পা বাড়াইতেই বিন্দু গর্জন করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, সেইজী শত্রু। নিজের বা মুখে এগো, দশটা মিথো সাজিয়ে বললে—কটকট করে দিবা করলে, চার দিন চার রাত ছেলের মুখ দেখতে দিলে না—ভগবান এর বিচার করবেন।

বলিয়া মুখে আঁচল পুঁজিয়া কান্না রোখ করিয়া রাসাঘরের বারান্দার আসিরাই উপড় হইয়া দুহিত হইয়া পড়িল। একটা গোলমাল উঠিল; মাথব অন্নপূর্ণা দুইজনেই ওনিতে পাইলেন। অন্নপূর্ণা ফিরিয়া

দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি হ'ল দেখি!

মাধব কহিল, দেখতে হবে না, চল।

কলহের কথাটা এ-কয়দিন গোপন ছিল, আর রহিল না। পরদিন বাড়ির মেয়েরা এক জায়গায় বসিলে, এলোকেশী বলিয়া উঠিলেন, জায়ে জায়ে ঝগড়া হয়েচে, ছেলের কি হ'ল, সে একবার আসতে পারলে না? ছোটবৌ বড় মিথ্যা বলেনি—যেমন মা, তেমন ছেলে হবে ত! ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন নেমকহারাম কখন দেখিনি।

বিন্দু ক্রান্তদৃষ্টিতে একটি বার তাহার দিকে চাহিয়া লজ্জায় ঘুণায় চোখ নীচ করিল।

এলোকেশী পুনরায় কহিলেন, তুমি ছেলে ভালবাস ছোটবৌ, আমার নরেন্দ্রনাথকে নাও—ওকে তোমায় দিলুম। মেরে ফেল, কেটে ফেল, কোনদিন কথাটি বলবার ছেলে ও নয়—তেমন সন্তান আমরা পেটে ধরিনে।

বিন্দু শিশুশব্দে বসিয়া রহিল। বিন্দুর মা জবাব দিলেন। তাহার বয়স হইয়াছে, জমিদারের মেয়ে, জমিদারের গৃহিণী, তিনি পাকা লোক। হাসিয়া বলিলেন, ও কি একটা কথা গা! অমূল্য গুর হাড়ের মাসে জড়িয়ে আছে—না, না, ওকে তোমরা অমন করে উতলা করে দিও না। বিন্দু তাদের ঝগড়া দু'দিনের মা, তাই বলে ছেলে কি তোর পর হয়ে যাবে?

বিন্দু ছলছল চোখে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় সে কদমকে ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা কদম, তুই ত ছিলি, তুই বল, আমার এত কি দোষ হয়েছিল যে, উনি অতবড় দিবা করে স্পন্দলেন?

বিন্দু তাহাকে এ আলোচনা করিতে আহ্বান করিয়াছে, সহসা কদম তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া মৌন হইয়া রহিল।

তথাপি বিন্দু বলিল, না না, হাজার হোক তোরা বয়সে বড়, তাদের দুটো কথা আমাকে ওনতেই হয়, তুই বল না, এত দোষ আমার কি হয়েছিল?

কদম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদি, দোষ আর কি?

বিন্দু কহিল, তবে যা না একবার ও-বাড়িতে দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আয় না—তোর আর ভয় কি?

কদম সাহস পইয়া বলিল, ভয় কিছুই নয় দিদি, কিন্তু, কাজ কি আর ঝগড়া-বিবাদ করে? যা হবার তা হয়ে গেছে।

বিন্দু কহিল, না না, কদম, তুই বুঝিল নে—সত্যি কথা বলা ভাল। ন; 'ল. ও মনে করবে, আমারি যেন সব দোষ, তার কিছুই নেই। বার করে দেব, দূর করে দেব, এসব কথা বলেনি ও? আমি কোনদিন তাতে রাগ করেচি? কেন ও লুকিয়ে টাকা দিলে? কেন একবার জানালে না?

কদম বলিল, আচ্ছা কাল যাব, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বিন্দু অগ্রসর হইয়া বলিল, সন্ধ্যা আবার কোথায় কদম,—তুই বড় কথা কাটিস্! শীতকালের বেলা বলেই অমন দেখাচ্ছে, না হয় কাউকে সঙ্গে নে না—ওরে, ও ভৈরব শোন, হেবোকে ডেকে দে ত, কদমের সঙ্গে যাক।

ভৈরব বলিল, হেবোকে দিয়ে বাবু বাড়ি পরিষ্কার করান্ধেন।

বিন্দু চোখ তুলিয়া বলিল, ফের মুখের সামনে জবাব করে!

ভৈরব সে চাহনির সূক্ষ্ম হইতে ছুটিয়া পলাইল। কদমকে পাঠাইয়া দিয়া বিন্দু বার-দুই এ-ঘর ও-ঘর করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিল। বামুনঠাকরুন একা বসিয়া রীতিতেছিল। বিন্দু একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা মেয়ে, তোমাকেই সাক্ষী মানচি—সত্যি কথা বল মেয়ে, কার দোষ বেশী?

পাচিকা বুঝিতে পারিল না, বলিল, কিসের মা?

বিন্দু বলিল, সেদিনের কথা গো! কি বলেছিলুম আমি? শুধু বলেছিলুম, দিদি, অমূল্যকে এর মধ্যে টাকা দিয়েচ? কে না জানে ছেলের হাতে টাকাকড়ি দিতে নেই। বলেছি ত হ'ত, অমূল্য কান্নাকাটি করেছে, দিয়েচি, চুকে যেত। এতে, এত কথাই বা ওঠে কেন, আর এমন দিবা-দিলেসাই বা হয়

কেন? পাঁচটা ঘটিবাটি একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে, এ ত মানুষ। তাই বলে এত বড় দিবি! এ একটি বংশধর—তার নাম করে দিবি? আমি বলছি মেয়ে তোমাকে, ইহজন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না। শত্রুর দিকে ফিরে চাইব, ত, ওর দিকে চোখ ফেরাব না।

বামুনমেয়ে স্বভাবতঃ অল্পভাবিনী, সে কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বিন্দুর দুই চোখ অক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া ভাসা গলায় পুনরায় বলিল, রাগের মাথায় কে দিবি না করে মেয়ে? তাই বলে জলস্পর্শ করলে না। ছেলোটাকে পর্ব্ব আসতে দিলে না। এইগুলো কি বড়র মত কাজ? হাজার হোক, আমি ছোট, বুদ্ধি কম, যদি তার পেটের মেয়েই হতুম, কি করতে তা হলে? আমিও ভেমনি ওর নাম কখন মুখে আনব না, তা তোমরা দেখো।

বামুনঠাকরুন তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

বিন্দু বলিয়া উঠিল, আর ও-ই দিবি দিতে জানে, আমি জানিনে? কাল যদি ও-বাড়িতে গিয়ে বলে আসি, এক বাটি বিব পাঠিয়ে না দাও ত তোমারো ওই দিবি রইল, কি হয় তা হলে? আমি দু'দিন চুপ করে আছি, তার পরে হয় গিয়ে ঐ দিবি দিয়ে আসব, না হয়, নিজেই একবাটি বিব খেয়ে বলে যাব, দিদি পাঠিয়ে দিয়েচে। দেখি, পাঁচজনে ওকে ছি ছি করে কি না! ও জ্বল হয় কি না!

বামুনঠাকরুন ভয় পাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, ছি মা, ও-সব মতলব করতে নেই—খগড়া-বিবাদ চিরস্থায়ী হয় না—উনিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না, অমূল্যধনও পারবে না। এ ক'দিন সে যে কেমন করে আছে, আমরা তাই কেবল ভাবি!

বিন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, তাই বল মেয়ে। নিশ্চয় তাকেও মারধর করে ভয় দেখিয়ে রেখেচে। যে একটা রাত আমাকে না হলে ঘুমুতে পারে না, আজ পাঁচ দিন চার রাত কেটে গেল! ও-মাগীর কি আর মুখ দেখতে আছে! ঐ যে বললুম, শত্রুর দিকে ফিরে চাইব ত ওর দিকে ইহজন্মে আর না।

বামুনঠাকরুন নিজের কবজির কাছে একটা কাল দাগ দেখাইয়া কহিল, এই দেখ মা, এখনো কালশিরে পড়ে আছে। সে রাতে তোমার মুর্ছা হয়েছিল, এ-সব কথা জান না। অমূল্যধন কোথা থেকে ছুটে এসে তোমার বুকের উপর পড়ে সে কি কান্না! সে ও আর কখন দেখিনি, বলে, ছোটমা মরে গেল। না দেয় তোমার চোখেমুখে জল দিতে, না দেয় বাতাস করতে—আমি টানতে গেলুম, আমাকে কামড়ে দিলে; বড়মা টানতে গেলেন, তাঁকে আঁচড়ে-কামড়ে কাপড় ছিড়ে এক করে দিলে। লোকে রুগীর সেবা করবে-কি মা, তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। শেষে চার-পাঁচজন মিলে টেনে নিয়ে যায়।

বিন্দু নির্নিমেব-চোখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কথগুলো যেন গিলিতে লাগিল; তারপর অতি দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া ওইল।

দিন-চারেক পরে বিন্দুর পিতা, মাতা, পিসী প্রভৃতির ফিরিবার পূর্ব্বের দিন মূর্ছার পরে বিন্দু চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল। কদম বাতাস করিতেছিল, আর কেহ ছিল না। বিন্দু ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে ডাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, কদম, দিদি এসেছেন রে?

কদম বলিল, না দিদি, আমরা এত লোক আছি, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন?

বিন্দু কল্পকাল হির থাকিয়া বলিল, এই তোদের দোষ কদম। সব কাজেই নিজেরদের বুদ্ধি খাটাতে বাস। এমনি করেই একদিন আমাকে মেরে ফেলবি দেখছি। পূজোর দিনেও ত তোরা একবাড়ি লোক ছিলি, কি করতে পেরেছিলি, বতকল না সেই এককোঁটা লোকটি এসে বাড়িতে পা দিলে?—ওরে, তোরা আর সে? তার কড়ে আঙুলের ক্ষমতাও তোদের বাড়িসুদ্ধ লোকের নেই।

বিন্দুর হা ঘরে ঢুকিয়া বসিলেন, জামাইয়ের মত আছে বিন্দু, তুইও দিন-কতক আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসবি চল্।

বিন্দু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমার যাওয়া না-যাওয়া কি তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করে মা, যে তিনি বললেই যাব? আমার শত্রুর হুকুম না পেলে বাই কি করে?

মা কথটা বুঝিয়া বসিলেন, তোর জায়ের কথা বলচিস? তাঁর আর হুকুম নিতে হবে না। যখন আলাদা হয়ে তোরা চলে এসেছিলি, তখন উনি বললেই হ'ল।

বিন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, মা, তা হয় না। বতকল বেঁচে আছে বতকল বেথানোই থাক, সেই

সব। আর যাই করি মা, তাকে না বলে বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না—বঠাকুর তা হলে রাগ করবেন।

এলোকেশী এইমাত্র উপস্থিত হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, আমি বলছি, তুমি যাও।

বিন্দু সে কথার জবাবও দিল না।

মা বলিলেন, বেশ ত, না হয়, লোক পাঠিয়ে তাঁর মত নে না বিন্দু!

বিন্দু আশ্চর্য হইয়া বলিল, লোক পাঠিয়ে? সে ত আরও মন্দ হবে মা! আমি তার মন জানি, মুখে বলবে 'থাক', কিন্তু ভেতরে রেগে থাকবে, হয়ত বঠাকুরকে পাঁচটা বানিয়ে বলবে—না মা, তোমরা যাও, আমার যাওয়া হবে না।

মা আর জিদ করিলেন না, চলিয়া গেলেন। এইবার ফাঁকা বাড়ি প্রতি মুহূর্তে তাহাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিতে লাগিল। নীচের একটি ঘরে এলোকেশীরা থাকেন, দোতলার একটি ঘর তাহার নিজের, আর সমস্তই খালি খাঁখাঁ করিতে লাগিল। সে শূন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে তেতলার একটি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কোন সুদূর ভবিষ্যতে পুত্র-পুত্রবধূর নাম করিয়া এই ঘরখানি সে তৈরি করাইয়াছিল। এইখানে ঢুকিয়া সে কিছুতেই চোখের জল রাখিতে পারিল না। নীচে নামিয়া আসিতেছিল, পথে স্বামীর সহিত দেখা হইবামাত্রই সে বলিয়া উঠিল, হাঁ গা, কি-রকম হবে তবে?

মাধব বৃথিতে না পারিয়া বলিলেন, কিসের?

বিন্দু আর জবাব দিতে পারিল না। হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না না, তুমি যাও—ও কিছু না।

পরদিন সকালবেলা মাধব বাহিরের ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ বিন্দু ঘরে ঢুকিয়াই কান্না চাপিয়া বাজল, উনি চাবুর করছেন নাকি?

মাধব চোখ না তুলিয়াই বলিলেন, হুঁ।

হঁ কি? এই কি তাঁর চাকরির বয়স?

মাধব পূর্বের মত কাগজে চোখ রাখিয়া বলিলেন, চাকরি কি মানুষ বয়সের জন্য করে, চাকরি করে অভাবে!

তাঁর অভাবই বা হবে কেন? আমরা পর, ঋণাড়া করেছি, কিন্তু তুমি ত তাঁর ভাই?

মাধব বলিলেন, বৈমাত্রের ভাই—জ্ঞাতি।

বিন্দু স্তম্ভিত হইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি বেঁচে থেকে তাঁকে কাজ করতে দেবে?

মাধব এবার মুখ তুলিয়া দ্বীপ দিকে চাহিলেন, তার পর সহজ শাস্তকণ্ঠে বলিলেন, কেন দেব না? সংসারে যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, তেমনি ভোগ করে, গ্রাম জীবন্ত সাক্ষ্য গমি নিজে। কবে বাপ-মা মরেচেন, জানিও নে; বড়বোঁঠানের মুখে শুনি আমরা বড় গরীব, কিন্তু কানোদিন দুঃখ-কষ্টের বাপ্পও টের পেলাম না। কোথা থেকে চিরকাল পরিষ্কার ধপধপে কাপড়জামা এসেচে, কোথা থেকে ইন্সুল-কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম, বাসাখবচ এসেচে, তা আজও বলতে পারিনি। তার পরে উকিল হয়ে মন্দ টাকা পাইনি। ইতিমধ্যে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একরাশ টাকা নিয়ে ঘরে এলে,—এমন অট্টালিকাও তৈরি হ'ল—অথচ, দাদাকে দেখ, চিরকালটা নিঃশেষে হাড়ভাঙ্গা ষাটুনি খেটেছেন, ছেঁড়া সেলাই-করা কাপড় পরেচেন—শীতের দিনেও তাঁর গায়ে কখন জামা দেখিনি—একবেলা একমুঠো খেয়ে কেবল আমাদের জন্যে—সব কথা আমার মনেও পড়ে না, পড়বার দরকারও দেখিনে—শুধু দিন-কতক আরাম করছিলেন, তা ভগবান সুদৃষ্টি আদায় করে নিচ্ছেন। বলিয়া সহসা সে মুখ ফিরাইয়া একটা দরকারী কাগজ খুঁজিতে লাগিল।

বিন্দু নির্বাক, স্তব্ধ। স্বামীর কত বড় তিরস্কার যে এট অতীত দিনের সহজ কান্দিণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে কথা বিন্দুর প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত অনুভব করতে লাগিল, সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মাধব কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিলেন, চাকরি বলে চাকরি! রাখাপুরের কাছারিতে যেতে আসতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ-ভোর চারটের বেরিয়ে সমস্তদিন অনাহারে থেকে রাতে ফিরে এসে দুটি খাওয়া, মাইনে বার টাকা।

বিন্দু শিছরিয়া উঠিল—সমস্ত দিন অনাহারে! মোটে বারো টাকা!

হী, বারো টাকা। বয়স হয়েছে, তাতে আকিঞ্চের মানুষ, একটু-আধটু দুবটুকুও পান না; ভগবান দেখি, এতদিন পরে দয়া করে দাদার ভবযন্ত্রণা মোচন করে দেবার উপায় করে দিয়েছেন।

বিন্দুর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল এবং যাহা কোনদিন করে নাই, আজ তাহাও করিল। হেঁট হইয়া বামীর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কানিতে কানিতে বলিল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, একটি উপায় করে দাও, রোগা মানুষ এমন করে দুটো দিনও বাঁচবেন না।

মাধব নিজের চোখের জল কোন গতিকে মুছিয়া লইয়া কহিল, আমি কি উপায় করব? বৌঠান আমাদের এক কণা চাল পর্যন্ত নেবেন না; কিছু না করলে তাঁদের সংসারই বা চলবে কি করে?

বিন্দু রুদ্ধস্বরে বলিল, তা আমি জানিনে। ওগো, তুমি আমার দেখতা, তিনি তোমার চেয়েও বড় যে! হি হি, যে কথা মনে আনাও যায় না, সেই কথা কিনা—বিন্দু আর বলিতে পারিল না।

মাধব বলিল, বেশ ত, অন্ততঃ যাও বৌঠানের কাছে। যাতে তাঁর রাগ পড়ে, তিনি প্রসন্ন হন, তাই কর। আমার পা ধরে সমস্ত দিন বসে থাকলেও উপায় হবে না।

বিন্দু তৎক্ষণাৎ পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, পায়ে-ধরা অভ্যাগাস আমার নয়। এখন দেখি, কেন সে-রাহে তিনি জলস্পর্শ করেন নি, অথচ তুমি সমস্ত জেনেওনে শরীর মত চূপ করে রইলে! আমার অপরাধ বেড়ে গেল, তুমি কথা কইলে না!

মাধব কাগজপড়ে মনোনিবেশ করিয়া কহিল, না। ও বিলো আমার দাদার কাছে শেখা। ঈশ্বর করুন, যেন অমনি চূপ করে থেকেই একদিন যেতে পারি।

বিন্দু আর কথা কহিল না। উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে পের দিয়া পড়িয়া রহিল।

মাধব তখন উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, বিন্দু আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই চোখ রক্তা। মাধবের দয়া হইল, বলিল, যাও একবার তাঁর কাছে। জান ত তাঁকে, একটি বার গিয়ে শুধু দাঁড়াও, তাহলেই সব হবে।

বিন্দু অত্যন্ত ক্লেশ-কষ্টে বলিল, তুমি যাও—ওগো, আমি ছেলের দিবা কচ্চি—

মাধব তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কিছু উক হইয়াই জবাব দিল, হাজার দিবা করিলেও আমি দাদাকে বলতে পারব না। তিনি নিজে জিজ্ঞাসা না করলে গিয়ে বলব, এত সাহস আমার গলা কেটে ফেললেও হবে না।

বিন্দু তথাপি নড়িল না।

মাধব কহিল, পারবে না যেতে?

বিন্দু জবাব দিল না, হেঁট মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আট

বাড়ির সুদূর দিয়া ইছুল বাহিবার পথ। প্রথম করেকদিন অমূল্য ছাতি আড়াল দিয়া এই পথেই গিয়াছিল, আজ দু'দিন ধরিয়া সেই লাল রঙের ছাতিটি আর পথের একধার বাহিয়া গেল না। চাহিয়া চাহিয়া বিন্দুর চোখ কাটিয়া জল পাকিতে লাগিল। তবুও সে চিলের ছাদের আড়ালে বসিয়া তেমনি একদৃষ্টে পথের পাশে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সকালে নটা-দশটার সময় কত রকমের ছাতি মাথায় দিয়া কত ছেলে হাঁটিয়া গেল; ইছুলে ছুটির পর কত ছেলে সেই পথে আবার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু সেই চলন, সেই ছাতি, বিন্দুর চোখে পড়িল না। সে সন্ধ্যার সময় চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া আসিয়া নরেনকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হী নরেন, এই ত ইছুলে যাবার সোজা পথ, তবে কেন সে এমিক দিগ্ধে আর যায় না?

নরেন চূপ কহিয়া রহিল।

বিন্দু বলিল, বেশ ত রে, তোরা দুটি ভই পর করতে করতে যাবি-আসবি—সেই ত ভাল।

নরেন তাহার নিজের ধরনে অমূল্যকে ভালবাসিয়াছিল, চুপি চুপি বলিল, সে লজ্জায় আর যায় না মায়া, ঐ হোখা দিয়ে ঘুরে যায়।

বিন্দু কষ্টে হাসিয়া বলিল, তার আবার লজ্জা কিসের রে? না না, ভুই বলিস তাকে, সে যেন

এই পথেই যায়।

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, কক্ষণ যাবে না মামী! কেন যাবে না জন?

বিশ্ব উৎসুক হইয়া বলিল, কেন?

নরেন বলিল, তুমি রাগ করবে না?

না।

তাদের বাড়িতে বলে পাঠাবে না?

না।

আমার মাকেও বলে দেবে না?

বিশ্ব অধীর হইয়া বলিল, না রে না, বল—আমি কাউকে কিছু বলব না।

নরেন ফিসফিস করিয়া বলিল—খার্দমাস্টার অমূল্যর আচ্ছা করে কান মলে দিয়েছিল।

একমুহুর্তে বিশ্ব আশ্রয়ের মত জুলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন দিলে? গায়ে হাত তুলতে আমি মানা করে দিয়েছি না?

নরেন হাত নাড়িয়া বলিল, তার দোষ কি মামী, সে নূতন লোক। আমাদের চাকর এই হেবো শালাই বজ্জাত, সে এসে মাকে বলেচে। আমার মা-টিও কম বজ্জাত নয়, মামী; সে মাস্টারকে বলে দিতে বলে দিয়েচে, খার্দমাস্টার অমনি আচ্ছা করে কান মলেচে—কি রকম করে জান মামী—এই রকম করে ধরে—

বিশ্ব তাহাকে তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিয়া বলিল, হেবো কি বলে দিয়েচে?

নরেন বসি, কি জান মামী হেবো টিকিনের সময় আবার খাবার নিয়ে যায় ত, সে ছুটে এসে বলে, কি খাবার দেখি নরেন? মা শুনে বলে, অমূল্য নজর দেয়।

অমূল্যর কেউ খাবার নিয়ে যায় না?

নরেন কপালে একবার হাত ঠেকাইয়া বলিল, কোথা পাবে মামী, তারা গবীর মানুষ, সে পকেটে করে দুটি ছোলা-ভাজা নিয়ে যায়, তাই টিকিনের সময় ওদিকের গাছতলায় নুকিয়ে বসে খায়।

বিশ্বর চোখের উপর ঘরবাড়ি সমস্ত সংসার দুলিতে লাগিল; সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, নরেন তুই যা।

সেখানে অনেক ডাকাডাকির পর বিশ্ব খাইতে বসিয়া কোনমতেই হাত মুখে তুলিতে পারিল না, শেষে অসুখ করিতেছে বলিয়া উঠিয়া গেল। পরদিনও প্রায় উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিল, অথচ কাহাকেও কোন কথা বলিতেও পারিল না, একটা উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। তাহার কেবলি ভয় করিতে লাগিল, পাছে কথা কহিলেই তাহার নিজের অপরাধ আরও বাড়িয় য়। অপরাহ্নে স্বামীর আহ্বারের সময় অভ্যাসমত কাছে গিয়া বসিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কোনরূপ ভোজ্য পদার্থের দিকে কাল হইতে সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না।

ঘরে বাতি জ্বলিতেছে, মাধব নিম্নলিখিত চোখে চুপ করিয়া পড়িয়া ছিলেন, বিশ্ব আসিয়া পায়ের কাছে বসিল। মাধব চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, কি?

বিশ্ব নতমুখে স্বামীর পায়ের একটা আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

মাধব স্বীর মনের কথাটা অনুমান করিয়া লইয়া আশ্রয় হইয়া বলিলেন,—আমি সমস্তই বুঝি বিশ্ব, কিন্তু আমার কাছে কীদলে কি হবে? তাঁর কাছে যাও।

বিশ্ব সভ্যই কীদিতেছিল—বলিল, তুমি যাও।

আমি গিয়ে তোমার কথা বলব, দাদা শুনেতে পাবেন না?

বিশ্ব সে কথার জবাব না দিয়া বলিল—আমি শুনি আমার দোষ হয়েছে—আমি ঘটি মানচি, তুমি তাঁদের বল গে।

আমি পারব না, বলিয়া মাধব পাশ ফিরিয়া গেলেন।

বিশ্ব আরও কতক্ষণ আশা করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু মাধব কোন কথাই আর বলেন বলিলেন না, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল; স্বামীর ব্যবহারে তাহার বুকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

পৰ্বত একটা প্রস্তর-কঠিন বিকার যোজন-ব্যাপী পৰ্বতের মত এক-নিমেষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহাকে সবাই ত্যাগ করিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই যাদব ছোটবধূর বহিবার অনুমতি দিয়া একখানি পর পাঠাইয়া দিলেন। বিন্দুর শিতা পীড়িত, সে যেন অবিলম্বে যাত্রা করে। বিন্দু সজ্জ-চোখে গাড়িতে গিয়া উঠিল।

বামুনঠাকরুন গাড়ির কাছে আসিয়া বলিলেন, বাপকে ভাল দেখে শিগগির ফিরে এসো মা।

বিন্দু নামিয়া আসিয়া তাহার পদধূলি লইতেই তিনি অভ্যস্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

বিন্দুকে এমন নত, এমন নম্র হইতে কেহ কোনদিন দেখে নাই। পায়ের ধূলা মাথায় ঢুলিয়া লইয়া বিন্দু কহিল,—না মেয়ে, যাই হোক, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বয়সে বড়—আশীর্বাদ কর, যেন আর ফিরতে না হয়, এই যাওয়াই যেন আমার শেষ যাওয়া হয়।

বামুনমেয়ে তদুত্তরে কিছুই বলিতে পারিলেন না—বিন্দুর শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখখানির পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এলোকেশী উপস্থিত ছিলেন, খনখন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি কথা ছোটবৌ? আর কারো বাপ-মায়ের কি অসুখ হয় না?

বিন্দু জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল,—তোমাকেও নমস্কার করি ঠাকুরঝি—চললুম আমি।

ঠাকুরঝি বলিলেন, যাও দিদি, যাও। আমি ঘরে রইলুম, সমস্তই দেখতে শুনেতে পারব।

বিন্দু আর কথা কহিল না, কোচম্যান গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

অন্নপূর্ণা বামুনঠাকরুনের মুখে এ কথা শুনিয়া চূপ করিয়া রহিলেন। ইতিপূর্বে কোন দিন বিন্দু অমূল্যকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ি যায় নাই—অজ্ঞ এক মাসের উপর হইল, সে একবার তাহাকে চোখের দেখা দেখিতে পায় নাই—তাহার দুঃখ অন্নপূর্ণা বুঝিলেন।

রাত্রে অমূল্য বাপের কাছে গিয়া আত্ম আশ্বস্তে গজ করিতেছিল।

নীচে প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অন্নপূর্ণা সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, বাট! বাট! যাবার সময় বলে গেল কিনা এই যাওয়াই যেন শেষ যাওয়া হয়! মা দুর্গা করুন, বাছা আমার ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

কথাটা শুনিতে পাইয়া যাদব উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আগাগোড়াই কাজটা ভাল করনি বড়বৌ। আমার মাকে তোমরা কেউ চিনলে না!

অন্নপূর্ণা বলিলেন, সেও ত একবার দিদি বলে এল না! তার চেসেকেও ত সে জোর করে নিয়ে যেতে পারত, তাও ত করলে না! সেদিন সমস্তদিন খাটুনির পর ঘরে ফিরে এলুম—উলটে কতকগুলো শক্ত কথা শুনিতে দিলে!

যাদব বলিলেন, আমার মায়ের কথা শুধু আমি বুঝি। কিন্তু বড়বৌ, এই যদি না মাপ করতে পারো, বড় হয়েছিলে কেন? তুমিও যেমন, মাধুও তেমন, তোমরা ধরে-বৈধে বুঝি আমার মায়ের প্রাণ বধ করলে!

অন্নপূর্ণার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অমূল্য বলিল, বাবা, ছোটমা কেন আসবে না বলেচে?

অন্নপূর্ণা চোখ মুছিয়া বলিলেন, বাবি তোর ছোটমার কাছে?

অমূল্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

না কেন রে? ছোটমা তোর দাদামশায়ের বাড়ি গেছে, তুইও কাল যা!

অমূল্য চূপ করিয়া রহিল। যাদব বলিলেন, বাবি অমূল্য?

অমূল্য বলিলে মুখ লুকাইয়া পূর্বের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না।

কতকটা রাগি থাকিতেই যাদব কর্মস্থানে বহিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। দিন পাঁচ-ছয় পরে এমন এক শেষরাতে তিনি প্রস্তুত হইয়া অন্যান্যদের মত তামাক টানিতেছিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, কোলা হয়ে যাচ্ছে—যাদব ব্যস্ত হইয়া দুঁকাটা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া

বলিলেন,—আজ মনটা বড় ব্যাধি বড়বো, কাল রাতে আমার মা যেন ঐ দেরের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্গা! দুর্গা! বলিয়া তিনি স্বহস্তে হইয়া পড়িলেন।

সকালবেলা অন্নপূর্ণা ক্রান্তভাবে রান্নাঘরে কাজ করিতেছিলেন, ও-বাড়ির চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু কাল রাতে ফরাসডাসায় চলে গেছেন—মা'র নাকি বড় ব্যামো। স্বামীর কথাটা শ্রবণ করিয়া অন্নপূর্ণার বুক কাঁদিয়া উঠিল—কি ব্যামো রে?—চাকর বলিল, তা জানিনে মা, শুনলুম কি-রকম অজান-টজান হয়ে কি-রকম শব্দ অসুখ হয়ে দাঁড়িয়েচে।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া যাদব খবর শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কত সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম বড়বো, জলে ভাসিয়ে দিলে? আমি এখনি যাব।

দৃষ্টে আশ্বস্তানিতে অন্নপূর্ণার বুক ফাটিতেছিল; অমূল্যর চেয়েও বোধ করি তিনি ছোটবোকে ভালবাসিতেন। নিজের চোখ মুছিয়া, তিনি স্বামীর পা ধুইয়া দিয়া জোর করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া দিয়া, অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরেই বাহিরে মাধবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অন্নপূর্ণা প্রাণপণে বুক চাপিয়া ধরিয়া, দুই কানে আঙুল দিয়া শব্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মাধব রান্নাঘরে অন্ধকার দেখিয়া, এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকারে অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া শুকনু হয়ে বলিল, বৌঠান, শুনেচ বোধ হয়?

অন্নপূর্ণা মুখ তুলিতে পারিল না।

মাধব কহিল, অমূল্যর যাওয়া একবার দরকার, বোধ করি শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে।

অন্নপূর্ণা উপড় হইয়া পড়িয়া ফুকারিয়া উঠিলেন। যাদব ও-ঘর হইতে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—হয় না মাধু! আমি বলছি হয় না! আমি জানে অজ্ঞানে কাউকে দুষ্ট দিইনি, ভগবান আমাকে এ-বয়সে কখনো এমন শাস্তি দেবেন না।

মাধব চুপ করিয়া রহিল।—যাদব বলিলেন, আমাকে সব কথা খুলে বল—আমি গিয়ে মাকে ফিরিয়ে আনবো—তুই উতলা হসনে মাধু—গাড়ি সঙ্গে আছে?

মাধব বলিল, আমি উতলা হইনি দাদা, আপনি নিজে কি-রকম কচেন?

কিছুই করিনি। ওঠ বড়বো, আয় অমূল্য—

মাধব বাধা দিয়া বলিল, রাত্রিটা যাক না দাদা।

না না, সে হবে না—তুই অস্থির হ'সনে মাধু—গাড়ি ডাক, নইলে আমি হেঁটে যাব।

মাধব আর কিছু না বলিয়া গাড়ি আনিতে চারজনাই উঠিয়া বসিলেন। যাদব বলিলেন, তার পরে?

মাধব কহিল, আমি ত ছিলাম না—ঠিক জানিনে। শুনলুম, দিন-চাবেহ আগে খুব জ্বরের ওপর ঘন ঘন মুঠা হয়, তার পরে এখন পর্যন্ত কেউ ওষুধ এক এক কোঁটা দুধ খি খাওয়াতে পারেনি। ঠিক বলতে পারিনে কি হয়েছে, কিন্তু আশা আর নেই।

যাদব জোর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, খুব আছে, এক শ'বার আছে। মা আমার বেঁচে আছেন। মাধু, ভগবানআমার মুখ দিয়ে এই শেষ বয়সে মিথ্যে কথা বার করবেন না—আমি আজ পর্যন্ত মিথ্যে বলিনি।—মাধব তৎক্ষণাৎ অবনত হইয়া অগ্রজের পদধূলি মাখায় লইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

নব

কতদিন হইতে যে বিশ্ব অনাহারে নিজেতে ক্ষয় করিয়া আনিতেছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। বাগের বাড়ি আসিয়া স্বপ্ন হইল। দ্বিতীয় দিন দুই-তিনবার মূর্চ্চা হইল—তাহার শেষ মুঠা আর ভাসিতে চাইল না। অনেক চেষ্টায় অনেক পরে যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন দুর্বল নাড়ী একেবারে বসিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া মাধব অস্থির হইলেন। সে স্বামীর পায়ে ঢালা মাখায় লইল, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া রহিল, শব্দ অনুন্নেও একফোটা দুধ পর্যন্ত গিলিল না।

মাধব হতঃপ্র হইয়া বলিলেন, আশ্বস্তাত্মক ক'চ কেন?

বিশ্বর নির্মীলিত চোখের কোণ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার সমস্ত অমূল্য। শুধু হাজার-দুই টাকা নরেনকে দিয়া, আর তাকে পড়িয়া, সে আমার

অমূল্যকে ভালবাসে।

মাথব দাঁত দিয়া জোর করিয়া নিজের ঠোট চাপিয়া কান্না থামাইলেন।

বিন্দু ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে আরও কাছে অনিয়া চুপি চুপি বলিল, সে ছাড়া আর কেউ যেন আমাকে আশুন না দেয়।

মাথব সে খাণ্ডাও সামলইয়া লইয়া কানে কানে বলিলেন, দেখবে কাউকে?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না থাক।

বিন্দুর মা আর একবার ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন, বিন্দু তেমনি দৃঢ়ভাবে দাঁত চাপিয়া রহিল।

মাথব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, সে হবে না। বিন্দু। আমাদের কথা শুনলে না, কিন্তু যাঁর কথা ঠেলতে পারবে না, আমি তাঁকে আনতে চললাম। শুধু এই কথাটি আমার রেখো, যেন কিরে এসে দেখতে পাই। বলিয়া মাথব বাহিরে আসিয়া চোখ মুছিলেন। সে-রাত্রে বিন্দু শান্ত হইয়া ঘুমিল।

তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইতেছিল; মাথব ঘরে ঢুকিয়া দীপ নিবাইয়া জানালা খুলিয়া দিতেই বিন্দু চোখ চাহিয়া সুমুখেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে স্বামীর মুখ দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কখন এলে? এই আসচি। দাদা পাগলের মত ভয়ানক কান্নাকাটি কচ্ছেন।

বিন্দু আঙুলে বলিল, তা জানি। তাঁর একটু পায়ের ধূলো এনেচ?

মাথব বলিলেন, তিনি বাইরে বসে তামাক খাচ্ছেন। বৌঠান হাত-পা ধুচ্ছেন, অমূল্য পাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওপরে ওইয়ে দিয়েচি, তুলে আনব?

বিন্দু কিছুক্ষণ হির হইয়া থাকিয়া 'না, ঘুমোক' বলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া ওইল।

অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া তাহার শিরের কাছে বসিয়া মাতঙ্গ হাত দিতেই সে চমকিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা মিনিট-খানেক নিজকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন, ওষুধ খাসনি কেন রে ছোটো, মরবি বলে?

বিন্দু জবাব দিল না। অন্নপূর্ণা তাহার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, আমার বুক কেটে যাচ্ছে, তা দূরতে পাচ্চিস?

বিন্দু তেমনি চুপি চুপি উত্তর দিল, পাচ্চি দিদি।

তবে মুখ ফেরা। তোর বউঠানুর বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে নিজে এসেচেন। তোর ছেলে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েচে। কথা শোন, মুখ ফেরা।

বিন্দু তথাসি মুখ ফিরাইল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, না দিদি, আগে বল—

অন্নপূর্ণা বলিলেন, বলচি রে ছোটো, বলচি, শুধু তুই একবার বাড়ি ফিরে আয়।

এই সময় বাদব ছাত্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই অন্নপূর্ণা বিন্দুর মাথার উপর চালন টানিয়া দিলেন। বাদব একমুহূর্ত আপাদমস্তকে বস্ত্রাবৃত্তা তাঁহার অপেক্ষা স্নেহেব পাড়ি ছোটবন্ধুর পানে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মৎ বিরোধ করিয়া বলিলেন, বাড়ি চল মা, আমি নিতে এসেছি।

তাঁহার শুষ্ক শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া উপহিত সকলের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। বাদব হ্রাস একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিলেন, আর একদিন যখন এতটুকুটি ছিলে মা, তখন আমিই এসে আমার সংসারের মা-সস্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার আসতে হবে ভাবিনি, তা মা শোন, যখন এসেচি, তখন হয় সঙ্গে করে নিয়ে যাব, না হয়, ও-মুখো আর হব না। জান শু মা, আমি মিথ্যে কথা বলিনে।

বাদব বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাঁও দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে ওইয়ে নিয়ে তোমরা সবাই বাহিরে গিয়ে বিদ্রাম কর গে। আর তর নেই—আমি মরব না।



রামের স্মৃতি

এক

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুইবুদ্বি কম ছিল না। গ্রামের লোক তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন দিক দিয়া কিতাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শাস্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু, সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারিতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, খানজমি, সুশস্য ঘর বাগদী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন,— সে আজ তের বছরের কথা—সেই বছরে রামের বিধবা জননী মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বৎসরের শিশু রাম এবং এই মন্ত সংসারটা তাহার তেরো বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণী ও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা-পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের একটাকা ভিজিট দু'টাকার চড়িয়া গেল এবং ডাক্তার দুইদিনের পুরিয়া আয়ারস্ট ও মরদা সহযোগে সুখান হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিকিৎসা হইয়া উঠিলেন।

বাড়ির দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, কিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আসতে পারবে না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে, না গ্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আন গে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া কীপন্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, কেন তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ? ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষতি হবে?

রামলাল উঠানের একধারে পিরারা ভলার বসিয়া পাখির কাঁচা তৈরি করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক নেভা, আমি যাচ্ছি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উষ্মেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, আমকে মানা কর। ও বাম, মাথা খাস আমার, যাসনে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, স্বগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাতও করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ব্রাহ্মপুত্র তখনও কাঠিঙলা ধরিয়া বসিয়া ছিল, কহিল, খাঁচা বুনবে না কাকা?

বুনবো অখন, বলিয়া রাম চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাদ-কাদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে? দেখ, কি কাণ্ড বা করে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুনে না, আমার মানা শুনেবে?

হাত ধরলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার একমণ্ডও যদি বাঁচতে ইচ্ছা ন্যরে। ও নেভা লক্ষ্মী মা আমার, দাঁড়িয়ে থাকিস নে—ভোলাকে পাঠি: 'ও গে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিংয়ে আনুক— সে হয়ত এখনো গরু নিয়ে মাঠে যায়নি।

নেভাকালী ভোলায় সন্মানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিসপেনসারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিশ্চিন্তে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন।

চারি-পাঁচজন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়চোখে চাহিয়া নিজের কাছে মন মিলেন।

রাম মিনিট-খানের চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিকিতে চক্কু নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ মিছি—

হাই মিছি। পচা ময়দার গুড়োতে অসুখ ভালো হয়।

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন, নিকি সব তুলিয়া চোখ রাখা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত বড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্শা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জনিভেন না।

কশেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুড়ো, তবে নিতে আসিস কেন রে? জোর দাদা পায়ে ধরে ডাকতে পাটায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে আর ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না।

লোকগুলা ভক্তিত হইয়া ওনিতেছিল, তাহাবিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বীর বলিল,—তুমি ছোট ভাত, বাবুদের মান-সর্বদা জান না, তাই বলে ফেললে,—পায়ে ধরে ডাকতে পাঠায়। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদি মাথার মিথি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সদাই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখন এস, দেবি ক'রো, না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আম-বাগান করেচ, বৌদী বড় হয়নি ত,—ও কুড়ুলের এক-এক ঘায়েই কত হবে—ওর একটিও আজ রক্তিরে থাকবে না। কাল এসে এই শিশিবোতলগুলো গুড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিকি ধরিয়া আড়ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব ক'রো না। ভাল ওষুধ লুকানো-টুকানো যা আছে, তাই নিয়ে যাও। ও রামঠাকুর—যা বলে গেছে তা ফলাবে, তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিকি রাখিয়া বলিলেন, আমি থানার দারোগার কাছে যাব, তোমরা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন পেয়ে কান ভাঁড়ো করতেছে—রামঠাকুর কি যে বলে গেল, তা গুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখতে ছোট, কিন্তু ওনার বাগদী ছোকরার মলটি ছোট নয়। ঘরে আশুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোকে দেখতে আসবে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার করবে। ও-সব আমরা পারব না—ওনাকে সবাই ডরায়। তার চেয়ে যা বলে গেছে, তাই কর গে। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি—আজ দুখানা রুটি-টুটি খাব নাকি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে মাউদাট করিয়া ছলিয়া উঠিলেন, সাক্ষী নিবিনে তোরা? তবে দু'হ' এখন থেকে। আমি কল্লর হাত দেখতে পারব না—ঘরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেবি, তোমের কি পতি হয়।

বৃদ্ধ লাঠিটি হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল—দেব কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় শরতান। ঠাকুরকে খবরটা একবার নিজেও দেখে হবে, না হলে, হরত বা মনে করবে, থানার মাঝার মতলব আমরাই নিয়েছি। বিবেচক বেতন-সারা লাগিয়েছি—কেন জগদর হরত উঠেছে—হরত আজ রক্তিরেই সমস্ত উপড়ে রেখে যাবে। কপদী ছোটগুলো ত রক্তিরে ঘুসোর না। বাবু, থানার না হয় আর একদিন যেরো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওনারে ঠাণ্ডা করে এলো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর বাহারা ছিল, তাহদেরও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস বেশিয়া, মানবকীর্তনের পেম অভিভূত—সংসারের সর্বোত্তম জ্ঞানের বাবুটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ির ভিতর পেলেন—দুনিয়ার কোন শালার ভাল করতে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালার চোখ রাখিয়া হটকট করিতেছিলেন। রাম বাড়ি ফিরিয়া আনিয়া ডাকিল—দেবিল, বাঁচা বয়সি আর।

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, একজান এদিকে আর।

রাম ককির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।
নারায়ণী ধমক দিয়া বলিলেন, আয় বলচি শিগগির।—রাম কাঠিগুলো নামাইয়া রাখিয়া বৌদির
ঘরে গিয়া তত্তপোশের একধারে পায়ের কাছে গিয়া বলিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ'ল?

হী।

কি বললি তাঁকে?

আসতে বললুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—ওধু আসতে বললি—আর কিছু বলিস নি?—রাম চুপ করিয়া
রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল না, কি বলেছিস তাঁকে?

বলব না।—নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তারবাবু আসছেন।

নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল।
অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া,
পরিশেষে নারায়ণীকে সোধোন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না-সারা কি ডাক্তারের হাতে?
তোমার দেওরটি ত আমাকে দু'টি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে ত আমার
ঘর-দোরে আশুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ-রকম কথা, আপনি কোন ভয় করবেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটা দল আছে। তাদের যে-কথা, সেই কাজ। তাতেই বড়
শঙ্কা হয়, মা! আমরা ওষুধই দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।

নারায়ণী চুপ করিয়া রহিলেন।

—শ্যামলাল রুষ্টি হইয়া বলিলেন, ও ছোড়া একদিন জেলে যাবে তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে
আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিঁদুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ অনিয়াছিলেন,
তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে, তিনি জিহ্ব কাটিয়া
বলিলেন, সর্বনাশ! আমার ভিজিট ত এক টাকা। তার বেশী আমি কোনমতেই নিতে পারব না—
ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দুদিনের, কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের।

দুই দিন পূর্বে এইখানেই যে এক টাকার অধিক আদায় করিয়া গিয়াছিলেন, আজ সে কথাও
তিনি বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। হ. হউক, নারায়ণী আরোগ্য
হইয়া উঠিলেন, এবং সংসার আবার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

দুই

মাস-দুই পরে একদিন তিনি নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণকলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেতা,
সে বীদরটা কোথায়?

বীদরটা যে কে, তাহা বাটীর সকলেই জানিত।

নেতা বলিল, ছোটবাক এই ত ছিল—ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরী কচে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয় হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর ছালায় কি আমি
গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

রামলাল আখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি টানি বুটাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে
আসিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের এক মাচা শলাগাছ কেটে দিয়ে এসেছিল কেন?

তারা আমাকে কাটেতে দেখেছে?

তারা দেখেনি, আমি দেখছি। কেন কেটেছিস বল?

আমাকে বড়ী মাণী অপমান করলে কেন?

নারায়ণী ছলিয়া উঠিয়া বলিলেন, অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরি করছিলি কেন, তাই আগে বল—রামলাল রীতিমত বিনিমিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চুরি করিলুম? কখন না! এতটুকু একটু শশা নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নারায়ণী আরো ছলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হাঁ বাদর! এক শ'বার হয়। বুড়ো-খাড়ী, কাকে চুরি করা বলে, এ কতি ছেলেরা জানে। দাঁড়িয়ে থাক্ এক-পায়ে, পাঞ্জী, দাঁড়া বলচি।

এ বাড়িতে কতি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চবিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মত এতক্ষণ সে বৃড়ি ধরিয়া ছিল, গোলামাল গুলিয়া পেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট করিয়া বলিল, কাকা, দাঁড়াও এক-পায়ে—এমন করে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া দাঁড়াইবার প্রশাঙ্গীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড়ু কবাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক-পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসি চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে ভেমনই করিয়া এক-পায়ে দাঁড়াইয়া, কৌচাচর খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে—নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা, হরোছে। আর এমন করিস নে।

রাম সে কথা গুলিল না। রাগ করিয়া ভেমনভাবে এক-পায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে গেলেন, সে শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবলবেগে কাড়া দিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিল; তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই সে পূর্বের মত সবেগে কাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে বাহিরে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় পা কুলাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইকুলের সময় হয়নি ছোটবাবু? মা ডাকছেন।

রাম জবাব দিল না। যেন গুলিতেই পায় নাই, এইভাবেই বসিয়া রহিল।

নৃত্য সামনে আসিয়া বলিল, মা চান করে খেতে নিতে কলচেন।

রাম চোখ রান্নাইয়া গর্জিয়া উঠিল, তুই দূর হ।

কিন্তু মা কি কলচেন গুনতে পেরেচ?

না, পাইনি। আমি মাঝ না, বাব না—কিছু করব না—তুই যা।

আমি নিয়ে কলচি তাঁকে, বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—ওরে ও ভূত! ও কি করলি? ও ডোবাটার ভয়ে কেউ পা ধোর না, তুই বজ্জবে ডুব দিয়ে এলি?

তিনি জাঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আনিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়ী-ভাড়ের সুখখে পৌঁছ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার মনের ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথার হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, এ-বেলা তুই আপনি যা, রাতিরে তখন আমি বাইরে দেব। চেয়ে দেখ এখনো আমার রান্না শেষ হয়নি—লক্ষ্মীটি খাও।—রাম তখন ভাত বাইয়া জামা পরিয়া ইকুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, ভোমার জনাই ওর সব-রকম কল অভ্যাস হচে মা! জন্ত বড় ছেলেকে কোলে বসিয়ে বাইরে দেওরা কি! একটু রাগ করলেই বাইতে নিতে হবে—ও আবার কি কথা!

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, না হলে খার না যে। রাতিরের লোভ না দেখালে ও এখানে একবেলা বাড়ি গুঁয়ে বসে থাকতো—খেত না।

নৃত্যকালী বলিল, না, খেত না! কিসে গেলে আপনি খেত। জন্ত বড় ছেলে—

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ভোমার ওর বরসই দেখিস। বড় হলে, বুড়ি হলে ওর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বসতে চাইবে, না, বাইরে নিতে কলবে?

নৃত্যকালী কুঙ্গ হইয়া বলিল, ভালর জন্যই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি? বোল-সতর বছর বয়সে যদি ওর জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়, তবে হবে কবে?

নারায়ণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না নেতা। কারো বা দু'বছর আগে, কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক ভাল, না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?—নেতা বলিল, ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি-রকম দুটু হয়ে উঠেছে তা ত নিজেও দেখতে পাচ্ছ। পাড়ার লোক বলে, তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী রুদ্ধস্বরে বলিলেন, পাড়ার লোকে আদরটাই সেবে, শাসনটা সেবে না। কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স, সমস্ত সকালবেলাটা যে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে, পচা পুকুরে ডুব গিয়ে এল, ভগবান জানেন, জ্বর হবে, না কি হবে, তার পরে কি বলিস উপোস করিয়ে ইকুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না, নেতা। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

এই কথা লইয়া কাল রাতে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা নেতা জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলিনি। লোকে বলে, তাই একটু সাবধান করে দেওয়া।

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, সকল মানুষকে ভগবান একরকম গড়েন না। ও একটু দুটু বলেই আমি যার তার কথা চূপ করে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি বলে? তারা কি চায়?—কিন্তু আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হলেই বোধ করি, তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলিয়া কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নেতাকালী এতটুকু হইয়া গিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, জানি না বাপু! সব বিষয়ে যে-মানুষের এত বুদ্ধি, এত ঘৈর্য, সে কেন এইটুকু কথা বুঝতে পারে না? আর শাসন ত ভারী! ছেলে এক মিনিট এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কৈদ্দে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে!

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাতে ইচ্ছা করিয়াই নারায়ণী দুই ভাইয়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়াছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল। যাও, আমি খাব না—কিছুতেই খাব না।

নারায়ণী বলিলেন, তবে শুনে যা।

তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রাসের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু, সে খটখট বসিল না—চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে-সুস্থে ঝুঁকিতে বসিয়া বলিলেন, রেমো খেলে না হে?

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, ও আমার সঙ্গে খাবে।

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্রই রাম একমুঠা ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কাউকে খেতে দেব না—সকলের পাতে ছাই দিয়ে দেব—সিঁই?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, দিয়ে একবার মজা দেখ না!

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া সুর বদলাইয়া বলিল, ভারী মজা, সকালবেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে এখন মজা দেখ না!

তুই খেলি কেন?

তুমি যে বললে রাঙিয়ে—

বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে তোর লজ্জা করে না?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, পরের হাতে কোথায়! তুমি যে বললে!

নারায়ণী আর তর্ক না করিয়া বলিলেন, আজ্ঞা, যা—ছাই ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আর। কিন্তু আর কোনদিন খেতে চাস!

খাওয়ানো তখনো শেষ হয় নাই, নৃত্যকালী বিনা প্রয়োজনে একবার দরজার সম্মুখ দিয়া ভিতরে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও-বিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেখিয়া বলিলেন, রাম, কখনও কি একটু শান্ত হবিনে ভাই! ভগবান কোনদিন কি তোরা একটু সুমতি দেবেন না? লোকের কথা যে আমি আর সহ্য করতে পারিনে।

রাম মুখের ভাত গিলিয়া লইয়া বলিল, কে লোক তার নাম বল।

নারায়ণী নিখাস ফেলিয়া বলিলেন,—বাস্! কে লোক, ওকে তার নাম বলে দাও।

কিন্তু মাস-কয়েক পরে সতাই নারায়ণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধনীকে লইয়া এতদিন কোনমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইটির মৃত্যু হওয়ার তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করিয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিধেবনের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকালবেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বখ-চারার আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণবরে বলিলেন, ওটা কি হচ্ছে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বখ-গাছটা বড় হলে বেশ ছায়া হবে গো! মাস্টারমশাই বলেছে, অশ্বখের ছায়া খুব ভাল। গোবিন্দ, যা, ঘটি করে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে একটা বাঁশ কেটে আন—বেড়া দিতে হবে। নইলে গরুবাছুরে খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বখ-গাছ! এমন ছিটিছাড়! কাণ্ড কখনও বাপের বয়সে দেখিনি বাবা!

রাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটি করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম তাহার হাত হইত ঘটিট লইয়া সঙ্গেহে হাসিয়া বলিল, এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড় এইখানে, আমি জল আনি গে।

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাপা করিয়া, রাম যখন গাছ-পোতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে রান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ টুকের আওনে দহ হইতেছিলেন, কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্ নারায়ণী, চেয়ে দেখ্! তোরা দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্। উঠানের মাঝখানে অশ্বখ-গাছ পুঁতি বলে কিনা ছায়া হবে। আবার ওদিকে চেয়ে দেখ্ হারামজাদা ভোলার কাণ্ড। একটা আশ্রয় বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুকছে—বেড়া দেওয়া হবে।

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সতাই একরাস বাঁশ ও ককি টানিয়া আনিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের দ্বারা সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামি, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বখ-গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি হবে কি বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া হবে বল ত, আর এই যে ছোট ডালগাি দেখচ, উটি বড় হলে,—এই গোবিন্দ, আসল দেখাস নে—বড় হলে গোবিন্দর জন্যে একটা দোলা টাঙ্গিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু করে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে; সে কাটারিখানা, আমার হাতে সে, তুই পারবি নে। ঝটখট ঠকঠক করিয়া বাঁশ কাটা শুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসিতে হাসিতে কক্কহিত পূর্ণকলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রামে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই যে কিছু বলদি নে! এখানে ওবে অশ্বখ-গাছ হোক!

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা, ব্যস্ত হ'ল কেন, অত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকড় আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাললেই বাঁচবে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শাস্ত না ইইয়া বলিলেন, শুকবে না ছাই হবে, ভাল চাস ত উপড়ে ফেলে দে গে।

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপরে! তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাকবে না।

দিগম্বরী বলিলেন, কেন, বাড়ি কি ওর একলার যে মনে করলেই উঠানের মাঝখানে এক অশ্বখ-গাছ পুতে দেবে। তোরা কি কেউ ন'স? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মা গো, অশ্বখ-গাছের উপরে এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা করবে, হাড়গোড় ফেলে নোঙরা করবে—আমি ত নারানি, তা হলে থাকতে পারব না! ওকে তোদের এত ভয়টা কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ি হ'ত, নারানি, তা হলে দেশতুম, ও কতবড় বজ্রাত। একদিনে সোজা করে দিতুম।

নারায়ণী মায়ের বৃকের ভিতরটা যেন মর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন বুদ্ধি কি মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ির উঠানে অশ্বখ-গাছ শোঁতে? দু'দিন থাক, তার পরে ও আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে। ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও-কাজ করো না, তোমাকে বলচি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর বড়াইও ছুঁতে সাহস করবে না মা! আজকার দিনটা যাক।

দিগম্বরী বিবস্ত্র হইয়া বলিলেন, আচ্ছা অচ্ছা, তুই কাপড় ছাড় গে যা।

দুপুরবেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন, নেতা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা, সর্বনাশ হয়েছে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে। সে ইকুল থেকে এসে কাউকে বাঁচতে দেবে না! নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছটি নাই। বলিলেন, মা, বামের গাছ কি হ'ল?

দিগম্বরী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই।

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেটি শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাসিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইকুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই-খাতা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল বৌদি, আমার গাছ?

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বলচি, এদিকে গাছ।

না, যাব না। কৈ আমার গাছ?

এদিকে আয় না, বলচি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া, মাথা মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বখ-গাছ পুতে আছে রে?

রাম শাস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয়?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হলে বাড়ির বড়বৌ মরে যায় যে।

রাম একমুহূর্তে স্নান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা।

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে, মিছে কথা নয়, পাঁজিরে পাঁজি আছে।

কৈ, পাঁজি দেখি?

নারায়ণী মনে মনে বিপদগ্রস্ত হইয়া আকস্মাৎ গর্ভ বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুই কি ছেলে রে! মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতেও নেই—তুই দেখবি কি রে? এ কথা যে ভোলাও জানে! আচ্ছা, ডাক তাকে।—এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে ভৎসনাৎ অগ্রতিত হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড় বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বৃকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমিও জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বৃকের মধ্যে ঢাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাহার চোখ

দুটি জলে ডিকিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হী রে রাম, আমি মরে গেলে তুই কি করিস?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যাঃ—বলতে নেই।

নারায়ণী অলঙ্কে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম, মরব না রে!

এবারে রাম পরিহাস বুদ্ধিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বৃদ্ধি? একটি দাঁতও পড়েনি, একটি চুলও পাকেনি।—নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাকতেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মরব। নাইতে যাব, আর ফিরে আসব না।

কেন বৌদি?

তোর জ্বলার। আমার মাকে তুই দেখতে পারিস নে, দিনরাত ঝগড়া করিস, সেইদিন তোরা টের পাবি, যেদিন আমি আর ফিরব না।

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি আর কিছু বলব না, কিন্তু ও কেন আমাকে অমন করে বলে?

বললেই বা। উনি আমার মা, তোরাও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস, ঠেকেও তেমনি ভালবাসবি। বল্ বাসবি?

রাম আবার বৌদিদির বৃকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া, সে এই দীর্ঘ ভেরো বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া সে এত বড় মিথ্যা কথা মুখে আনিবে! এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য!—নারায়ণী আত্মকণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে, বল্?

ঠিক এই সময়ে দিগ্বরী দেখা দিলেন। কঠোর মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কাঙ্ক্ষকর্ম নেই নারায়ণ! দেওরকে নিয়ে সোহাগ হচ্ছে, নিজের ছেলেরা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটা হিংস্র স্বাপনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বৃকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, ছেলেরা সারা হয়ে গেল কিসে?

কিসে? বেশ! বলিয়াই দিগ্বরী প্রস্থান করিলেন।

বানাইয়া বলিবার মত একটা মিথ্যাকাথাও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, ও ডাইনির আমি গলা টিপে দেব।

নারায়ণী তাহার মুখে হাত ঢাপা দিয়া বলিলেন, চুপ কর্ পাঞ্জী, মা হয় যে!

দিন-চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের খালটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নীচিতে লাগিল—ঐ ডাইনী-বুড়ীর রান্না আমি খাব না, কখনো খাব না, ঝালে মুখ জ্বলে গেল, বৌদি—ও—বৌদি—

চীৎকার-শব্দে নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

কি হ'ল রে?

রাম রাগে কঁদিয়া ফেলিল—আমি কখনো খাব না, কখনো খাব না—ওকে দূর করে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, মা, বার বার বলি, তরকারিতে এত কাল দিও না, অত কাল খাওয়া এ বাড়ির কারো অভ্যাস নেই।

দিগ্বরী অস্মিত্তি হইয়া বলিলেন, কাল আবার কোথায়? দুটি লক্ষ্য শুধু গুলে দিয়েছি, এতেই এত কাণ্ড!

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা দুটো লক্ষ্য। কেউ যখন খায় না, তখন—

চুপ কর্ নারায়ণী, চুপ কর্। রান্না শিখোতে আসিস নে আমাকে, চুপ পাকালুম এই করে এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে। থিক্ আমাকে!

নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া নুতন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন।

দিগ্বরী দুরারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাখাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কঁদিয়া উঠিলেন, ভাই

রে। কোথায় আছিস, একবার ডেকে নে। আর সহ্য হয় না। বা মুখে আসে, আমাকে তাই বলে গাল দেয় রে। আমি বুড়ী! আমি ডাইনী! আমাকে দূর করে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামায়ের ভাত খেতে এসেছি—আমার গলায় দেবার দড়ি জোটে না! এর চেয়ে পথ ভিক্কে করা শতগুণে ভাল। সুরো, আর মা, আমরা বাই, এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করব না।

সুরধুনী কীদ-কীদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাঁহিতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বাঁট কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগম্বরী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, না, অটকাস্ নে আমাদের নারায়ণী, যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলায় মরব সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।

নারায়ণী হাতজোড় করিয়া কহিলেন, কার ওপর রাগ করে যাচ্ছ মা? আমরা কি কোন অপরাধ করেছি?

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিসুরে বলিলেন, আমি কচি খুকি নই, নারায়ণী, সব বুঝি। তোর ইশারা না থাকলে কি ওর কখন অত সাহস হয়? আমি ডাইনী! অ্যাঁ, আমাকে দূর করে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ-বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড়্ বলচি।

নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মা, আজকের মত মাপ কর। আচ্ছা, উনি আসুন, তার পরে যা ইচ্ছে হয় করো। তাহার পর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া লইয়া একটা গিড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোধান্ত তাহার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু দুপুরবেলা শ্যামলাল আহায়ে বসিতেই তিনি কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাদিয়া উঠিলেন। প্রথমটা শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্থভূক্ত অন্ন ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন।

নারায়ণী বুঝিলেন এ রাগ কাহার উপরে। নৃত্যকালী সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ির মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী, চট করিয়া বলিয়া বলিল, দিদিমা, জেতেওনে ইচ্ছে করে বাবাকে খেতে দিলে না! চোখের জল ত তোমার গুঁকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয় দু'মিনিট পরেই বার করতে!

দিগম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন।

দুপুরবেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া তাহার বৌদিগির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া ওইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথালি আস্তে আস্তে বলিল, কিদে পায় যে!—বৌদিগি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর করিয়া বলিল, কি খাব?

নারায়ণী ওইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানিনে, যা এখন থেকে।

না, খাব না—আমার কিদে পায় না বুঝি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুগ্নভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাওন করিস নে রাম, নেতা আছে, তাকে বল গে।

রাম আর কিছু না বলিয়া বাইরে আসিয়া নেতাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, খেতে দে নেতা। নেতা বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল; এক বাটি দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারকেলের নাড়ু আনিয়া দিল। রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই বুঝি?

নেতা বলিল, হেঁটবাবু, ভাল চাও ত আজ আর হাস্যমা করো না। বাবু না খেয়ে কাছারি চলে গেছে, যা উপোস করে গোবিন্দকে নিয়ে ওয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে—তোমার অঙ্গেতে দুঃখ আছে তা বলে দিচ্ছি।

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর বিরক্তি না করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁড়ে ঢালিয়া লইয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। তাহার আহারে প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল। বৌদি উপোস করিয়া আছে। সে অন্যমনস্ক হইয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল, তাহার খুনি-পক্ষিরের মত কোন একটা মন্ত্র জানা থাকিলে এইখানে বসিয়াই সে বৌদির পেট ভরাইয়া দিত।

কিন্তু, হয় না জানি কি উপায়ে যে কি করা যায়, ইহা সে কোনমতে হির করিতে পারিল না। কিরিয়ানিরা তাঁহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে তাহার সম্মতি করিতেকৈ পারিল। তা' হইয়া দান্য সে করিল। অনুসোধ করিতেই যে কি হইবে? সে কৌতুহ হইতে মুক্তি প্রকৃতি জলের উপর হুকিয়া বেলিয়া নিয়া দুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, বৌদি উপোস করিয়া আছে। কথটা সে মনে মনে যত রকম করিয়াই জাম্ভি করিল, ভক্তবারই তাহার মনের মধ্যে ছুঁত ফুটিল।

রাত্রে শ্যামলাল দাবীকে বলিলেন, আমার আর সধ্য হয় না। ওকে নিয়ে আর বাস করা চলে না।—নারায়ণী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কান কথা বলত?

রাসের কথা। তোমার মা আমাকে চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত বলছেন, রাস ওঁকে নাহক অপমান করতে। আমি পাঁচজন ভয়লোক ডেকে বিবর-আশয় সন্তুষ্ট তান করে ওঁকে আলাদা করে দেব। আমি আর পারিনে।—নারায়ণী ভুক্তিত হইয়া কখনকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রাসকে আলাদা করে দেবে? ও কথা মুখেও এনো না। ও দুধের ছেলে, বিবর-আশয় নিয়ে কি করবে তনি?

শ্যামলাল বিমূণ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিবর-সম্পত্তি নিয়ে ও কি করবে, সেও ও-ই জানে।

নারায়ণী ভুক্তিত হইয়া কখনকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রাসকে আলাদা করে দেবে? ও-কথা মুখেও এনো না। ও দুধের ছেলে, বিবর-আশয় নিয়ে কি করবে তনি?

শ্যামলাল বিমূণ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিবর-সম্পত্তি নিয়ে ও কি করবে, সে ও-ই জানে।

নারায়ণী বলিলেন, ও জানে না, আমি জানি। কিন্তু মা বৃষ্টি তোমাকে চার-পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত ওই কথা বলে বেড়াচ্ছেন?

শ্যামলাল একটা অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না, উনি কিছুই বলেন না, লোকেরও ত চোখ আছে গো! আমি নিজে কি কিছুই দেখতে পাইনে, তাই তুমি মনে কর?

নারায়ণী বলিলেন, না, আমি তা মনে করিনে। কিন্তু ওর কে আছে, কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে? মা আছে, না বোন আছে, না একটা মাসী-বিসী আছে? ওকে রেখে যাওয়াবে কে?

শ্যামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি ও-সব জানিনে। মুখে বলিলেন বটে 'জানি না', কিন্তু অন্তরে জানিতেহিলেন। এত বড় সভ্যতা না জানিয়া পথ কোথায়? নারায়ণী কি কথা বলিতে পেলেন, কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধর কঁপিয়া উঠিল। তাই কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভারী পলায় বলিলেন, দেখ, ডেরো বছর কসরে মেয়েয়া বখন পুতুল খেলে বেড়ায়, তখন মা আমার মাথায় এই বস্ত সসোরটা ফেলে রেখে স্বচ্ছন্দে ঘর্মে চলে গেলেন। তিনি দেখছেন, এ ভার আমি বইতে পেরেছি কিনা। রেঁখেচি-বেড়েচি, ছেলে মানুষ করেচি, লোক-লোকতা, কুটুখ, সসোর সমস্তই এই একটা মাথায় বয়ে বয়ে আজ ছাবিশ বছরের আধ-বুড়ো মাসী হঠাৎ চি। এখন আমার ঘরকন্নার মধ্যে যদি ছাত লিতে এস, সত্যি বলচি তোমাকে, আমি নদীতে ডুব নিয়ে মরব। তখন আর একটা বিয়ে করে রাসকে আলাদা করে নিয়ে যেমন ইচ্ছে ডেমনি করে সসোর ক'রো, আমি দেখতেও যাব না, বলতেও যাব না। কিন্তু, এখন নয়।

শ্যামলাল মনে মনে ক্রীকে ভর করিতেন, আর কথা কহিলেন না। কথটা এইখানেই সে রাতে বন্ধ হইয়া রহিল। পরদিন নারায়ণী রাসকে কয়েকসাইয়া পতীর স্নেহে পায়ে হাত কুলাইয়া বলিলেন রাস, তোর এখানে আর থেকে কাজ নেই তাই। তুই আলাদা কোথাও আলাদা থাক গে যা—পারবি নে থাকতে?—রাস তৎকালং সমস্ত হইয়া একপাল হাসিয়া বলিল, পারব বৌদি। তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা, কবে যাওয়া হবে বৌদি?

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহার পরে কি বলিবেন তিনি। কিন্তু, রাস কথটা থাকিতে দিল না। সে উপেক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, কবে যাবে বৌদি?

তিনি সে কথার উত্তর তাহার খুঁটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর বৌদিকে ছেড়ে একলা থাকতে পারবি নে?

রাম মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আর বৌদি যদি মরে যায়?

যাঃ—

যা নয়। এখন বৌদির কথা শুনিস নে—তখন দেখতে পাবি।

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখন তোমার কথা শুনিবে?

নারায়ণী বলিলেন, কখন শুনিস তাই বল। কতদিন বলেছি, আমার মাকে তুই অপমান করিস নে, তবু তুই তাঁকে অপমান করতে ছাড়বি নে। কালও করেছিস। এইবার আমি যেখানে দু'চোখ যায়, চলে যাব।

আমিও সঙ্গে যাব।

তুই কি টের পাবি কখন যাব! আমি লুকিয়ে চলে যাব।

আর গোবিন্দ?

সে তোর কাছে থাকবে, তুই মানুষ করবি।

না, আমি পারব না বৌদি।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তোকে পারতেই হবে।—তখন রাম সমস্ত কথাটা অবিশ্বাস করিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া বলিল, সব মিছে কথা। তুমি কোথাও যাবে না।

মিছে নয়—সত্যি। দেখিস, আমি চলে যাব।

রাম অন্ততপ্ত হইয়া বলিল, আর যদি তোমার সব কথা শুনি, তা হলে?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হলে যাব না। তোকেও আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম খুশী হইয়া বলিল, আচ্ছা, আজ থেকে তুমি দেখো।

দিন

আট-দশ দিন বেগ নিরুপদ্রবে কাটিল। দিগন্তরী যে কটাক্ষ করিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু রাম রাগ করিত না। বৌদিদির সেদিনকার কথা ঠিক বিশ্বাস না করিলেও, তাহার ভয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভগবান বিরূপ, আবার দুর্ঘটনা ঘটিল। আজ দিগন্তরী তাহার পিতৃসেবের উদ্দেশে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পিতার প্রত্যাশা এতদিন ছেলের বাড়িতে চূপ করিয়া ছিল, এখন নাত-জামাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল, অবশ্য স্বয়ং—তবু তাহাকে সঙ্কট করা চাই ত।

সকালবেলা রাম আঁক কবিতোঁছিল। ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর শুন গেল, দাঠাকুর, ভগা বাগদী তোমার কেন্দ্রিক-গণেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেছে, দেখবে এতে।

একটু বুঝাইয়া বলি। বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের রুইমাছ ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে-দুটো আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্তিক গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না যে-ব্যক্তি কার্তিক-গণেশের অসাধারণ রূপগুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই, এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে তাহাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত, এবং কে কার্তিক, কে গণেশ, শুধু সে-ই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

নারায়ণী হাসিয়া বলিতেন, রামের কার্তিক-গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে স্নেহের ঝুঁকি বুঝিয়া পড়িয়া বলিল, একবার চেপে মজা দেখুক না—জাল ছিড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।—ভোলা কহিল, না দাঠাকুর, আমাদের জাল নয়। ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে নেন—সে ছিড়বে না।

রাম স্নেহে রাখিয়া বলিল, চল ত দেখি।

পুকুরথারে আসিয়া দেখিল, তাহার কার্তিক-গণেশের বিরুদ্ধে সভ্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলো মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উন্মত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা থাকা মারিয়া বলিল, হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকত।

ভগা কাদ-কাদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়ে গিয়েছেন। অন্য মাহ আর পাওয়া গেল না মাঠাকুর।—রাম ভাঙ্কর হাত হইতে জাল হিন্দিয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, ঘুর হ। ভগা জাল তুলিয়া লইয়া আত্মে আত্মে চলিয়া গেল।

রাম কিরিয়া আসিয়া পুনর্বীর স্ট্রেট-পেন্সিল লইয়া বলিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিশবরী আজ সকাল সকাল আহিক সারিয়া লইতেছিলেন। সেডা আসিয়া খবর দিল, মাহ পাওয়া গেল না বিনিমা। ছোটবাবু ভগা বাগদীকে মেরেথরে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাহ দুইটার উপর দিশবরীর লুক দৃষ্টি ছিল। বড় রুইমাহের মুড়ার সব্বদে বিধবার মনের ভাব অনুমান করিতে নাই। সুতরাং লোভ তাঁহার ঠিক নিজের জন্য নয় বটে, কিন্তু নিজের কোন একটা কাজে, বহুতে রীতিয়া সদ্ব্যবহারের পাতে নিয়া পুণ্য ও খ্যাতি অর্জন করিবার বাসনা অনেক দিন হইতে তিনি মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। কাল জামাইয়ের মত লইয়া, প্রজা ভগা বাগদীকে চার আনা বকশিশ কবুল করিয়া সমস্ত আরোজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ সকালেও সে দুইটা প্রাণীকে ঘাটের কাছে ঘুরিতে কিরিতে দেখিয়া আসিয়া নিশ্চিত হইচিটে জপে বসিয়াছিলেন। এমন সময় এরূপ দুঃসংবাদ তাঁহাকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। তাঁহার দাঁত কিড়মিড় করা অভ্যাস ছিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, গলার মালাটা উচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে, কি শব্দুর আমার। কবে হোড়া মরবে যে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে। বাসীমুখে এখনো জল নিহিনি ঠাকুর! যদি সত্যির হও, যেন তে-রাস্তির না পোহায়।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারি কুটিতেছিলেন। তিনি বিদ্যুদ্ববেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টেচিয়া উঠিলেন, ‘মা’! ওনিয়াছি সন্তানের মুখে মাতৃ-সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনের আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। এ এক-অক্ষরের ডাকে দিশবরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল। কিন্তু নারায়ণীও আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া টপটপ করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল। কপেক পরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরি করিতেছিল, সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর-বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগদীকে মেরেথরে হাঁকিয়ে দিয়েছিস?

রাম চমকিয়া স্ট্রেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্ত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র স্ট্রেট না করিয়া ওলিকের দরজা দিয়া উর্ধ্বাঙ্গে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলে না, কিরিয়া আসিয়া ভগা বাগদীকে ডাকিয়া আনিলেন এবং মাহ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।—হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই হাড়ে করিয়া ধড়াস করিয়া উঠানের মাকখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মাহ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন। শক্তি হইয়া কহিলেন, ওরে, একে ঘাটে ধরিস নি ত? এ রাসের কর্তিক-গণেশ নয় ত?

ভগা এত শীঘ্র এত বড় মাহ আনিতে পারিয়া বাহাদুরি করিয়া বলিল, এজো হী মাঠাকরন, এ যেটো রুই—বড় জবর রুই!

দিশবরীকে আত্মল নিরা দেখাইয়া বলিল, ও মাঠাকরন এনায়েই খন্ডে বলে দেখল।

নারায়ণী ভক্তি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নৃত্যকাণী বলিও রাসের উপর খুব সম্মন নহে, তবুও মাহ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিশবরীকে বলিল, আজ্য বিনিমা, পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কর্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি বলে এ মাহ ধরতে বলে দিলে? দু’তিনটে পুকুরে কি আর মাহ ছিল না? কপটা লোক থাকে, তা একটা আধমনি মাহই বা কি হবে? লুকিয়ে ফেলা একে, কোথায় গেছে তিনি, এখনি এসে পড়বে।

দিশবরী মুখ ভারী করিয়া বলিলেন, জানি না বাপু অত শব্দ। একটা মাহ ধরতে ত সাততটি মিলে করতে কি দেখ না! একে লুকিয়ে ফেলবি, বামুন থাকে না?

সেডা বলিল, তোমার বামুন থাকে দুটো-আড়াইটার সময়, চের সময় আছে। ছোটবাবু আপে

ইকুলে যাক, না হলে আজ আর কেউ বাঁচবে না। ও মা! ভোলা এই যে দাঁড়িয়েছিল, সে গেল কোথায়? সে বুঝি তবে খবর দিতে ছুটেছে! যা হয় কর মা, আর দাঁড়িয়ে থেকে না।

ভগা চার আনা পরসার লোভে জাল চাহিয়া অনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া নগদ আদারের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রয়োজন হইলে, কখন কেন্ হানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের গিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা কুলাইয়া গিয়ারা চিবাঁইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখবে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কাড়িককে মেরেছে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ—

সত্যি দাঠাকুর। মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েছে, এখনো উঠনে পড়ে আছে; দেখবে চল।

রাম কুপ করিয়া লাকহিয়া পড়িয়া সোড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে! বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মত সে পা ছুড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দম, সে বিষয়ে লিঙ্গবীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।

তাহাকে পাওয়াইবার জন্য রাগে নারায়ণী টানাটানি করিতে লাগিলেন, রাম তাহার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সমস্ত দিন উপবাসের পর গোটা পাঁচ-ছয় ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া গেল।

লিঙ্গবীরী আড়ালে দাঁড়াইয়া জামাইকে বলিলেন, তুমি একবার বল, না হলে নারায়ণী খাবে না, সে সারাদিন উপোস করে আছে।

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, উপোস কেন?

লিঙ্গবীরী কন্নার অভাবে কষ্টবর করণ করিয়া বলিলেন, আমার এক শ' বাট হয়েছে বাবা! কিন্তু কেমন করে জানব বল, পুকুর থেকে বামুন-ভোজনের জন্যে একটা মাছ ধরলে মহাভারত অণ্ড ছ হয়ে যায়!—শ্যামলাল বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলেন, নেতা, কি হয়েছে রে?

নেতা আড়াল হইতে বলিল, সেটা ছোটবাবুর গণেশ।

শ্যামলাল চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, রেমোর কার্তিক-গণেশের একটা নাকি?

নেতা বলিল, হ্যাঁ।

আর বলিতে হইল না। তিনি আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন—রাম খায়নি বুঝি?

নেতা বলিল, না।

শ্যামলাল বলিলেন, তবে আর খেতে বলে কি হবে? সে খায়নি, ও খাবে কি!

লিঙ্গবীরী বলিতে লাগিলেন, এমন কাণ্ড হবে জানলে বামুন খাওয়াবার কথাও ভুলতাম না বাবা! ও নিজে কেনই বা হুকুম দিয়ে মাছ ধরালে, কেনই বা এমন ধারা করছে, তা সে ও-ই জানে। আমি ত চুপ করেই ছিলাম। তবু সব পোষ কেন আমারই। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিরে দাও বাবা, এখানে একদণ্ডও থাকতে আর ভরসা হয় না।

একটুখানি চুপ করিয়া রীতিমত কন্নার সুরে পুনরায় শুরু করিলেন, কপাল আমার এমন করে বসি না—ই পুড়বে, তবে, অমন ভাই বা মরবে কেন, আমাকেই বা লাখি-কাটা থাকতে হবে কেন? বাবা, আমরা নিতান্ত নিরুপায়, তাই হাতজোড় করে বলছি, আমাদের একটা-কিছু উপায় তোমাকে করে দিতে হবেই।

শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু, হ্যাঁ না, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণী আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজের মায়ের এই নির্লজ্জ ঠাকানোর লজ্জার মরমে মরিয়া বাইতে লাগিলেন। তিনি কিরিয়া আসিয়া রাসের রুদ্ধ দরজায় যা দিয়া ডাকিলেন, লক্ষ্মী মানিক আমার! সোরটা একবার খুলে দে।

রাম আসিয়া ছিল, সাড়া দিল না।

নারায়ণী আবার ডাকিলেন, ওঠ, মোর খোল্।

এবারে চোঁটাইয়া বলিল, না খুলব না, তুমি বাও। তোমরা সবাই আমার শত্রুর।

আচ্ছা তাই, তুই মোর খোল্।

না, না, না,—আমি খুলব না। সম্ভাই সে রায়ে কপাট খুলিল না। শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত গুনিতে পাইতেছিলেন, নারায়ণী ঘরে আসিতেই বলিলেন, হয় একটা উপায় কর, না হয় বেখানে ইচ্ছে, আমি চলে যাব। এত হাস্যাত্মক আমার বরদাস্ত হয় না।

নারায়ণী নিরন্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর দু-তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন রামের রাগ পড়িতে চাহিল না, তখন নারায়ণী ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ সন্ধ্যা হয় তবুও সে ইচ্ছা হইতে বিরলি না দেখিয়া নারায়ণী উৎকণ্ঠিত ক্রোধে অধীত হইয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় দিগম্বরী নদী হইতে পা ধুইয়া, সংসারের সংবাদ লইয়া, রামের মঙ্গল কামনা করিয়া, বড় মেয়ের সৃষ্টিছাড়া মডি-বুড়ির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রতিবাসিনীদের কাছে বোষণা করিয়া শোকে-তাগে অসময়ে অল্পবয়সে নিজের মাথার চুল পাকিবার কারণ দর্শাইয়া, নিজকে বড় মেয়ে নারায়ণীর প্রায় সমবয়সী বলিয়া প্রচার করিয়া, ভাইয়ের সংসারে কিরূপ সর্বময়ী ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলিয়া, ধীরে-সুখে বাড়ি ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চিমখে এক কাণ্ড গুনিয়া তিনি যেন বাতাসে উড়িতে উড়িতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন। উঠানে পা দিয়াই উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তোর গুণধর দেওরের কাণ্ড গুনেচিস নারায়ণী?—নারায়ণী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিলেন, কি কাণ্ড?

দিগম্বরী বলিলেন, তারা থানার গেছে। যাবেই ত। যে বজ্জাত ছেলে বাবা, এমনটি সাত-জন্মে দেখিনি! এখন জেলে যান!

তাহার মুখে-চোখে আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। নারায়ণী সে কথা শুনিয়া জবাব না দিয়া ডাকিলেন, নেতা, রাম এখনো এলো না কেন, একবার ভোলাকে পাঠিয়ে দে,—খুঁজে আনুক।

দিগম্বরী বলিলেন, আমি যে সমস্তই গুনে এলাম।

নেতা গুনিবার আগ্রহে হী করিয়া দাঁড়াইল, নারায়ণী তাড়া দিয়া উঠিলেন, দাঁড়িয়ে থাকলি যে? কথা কানে গেল না বুঝি!

নেতা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, দিগম্বরী কণ্ঠবরে উষেগ টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি হয়েছে জানিস নারায়ণী—

তুমি ভিজে কাপড় ছাড় সে মা, তার পরেই না হয় ব'লো, বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দিগম্বরী অবাধ হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাস্ রে! মেয়ের রাগ দেখ! এমন একটা কাণ্ড আনুপূর্বিক বলিতে না পাইয়া তাহার পেট ফুলিতে লাগিল।

সে কাণ্ডটা সংক্ষেপে এই,—গ্রামের ফুলে জমিদারদের একটি ছেলে পড়িত। আজ টিকিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাধিল। বিবরটা জটিল, তাই ব্রীমাংসে না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারদের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্রম্যানকালী রক্ষকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত। কেননা, শ্রম্যানকালীর জিত বড়!

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, শ্রম্যানকালীর জিত একটু চওড়া হ'লে, কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাজও নয়। কিছুদিন পূর্বে পাড়ার টালা করিয়া রক্ষকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল! জমিদারদের ছেলে রামের কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া, বলিল, রক্ষকালীর জিত ত এতটুকু!

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কি, অতটুকু? কখনো না। এই এত বড়! অতটুকু জিত হলে কি কখনও পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষা করে কলোই ত রক্ষকালী নাম।

তার পর আর দুই-একটা কথা, এক তার পরই বুঝাবুঝি। জমিদারদের ছেলের গায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং আর সে-ই বেশী খাইল। নাক নিরাও বেঁটা-দুই রক্ত বাহির হইল। এই ক্রুদ্ধ ফুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্বে হ'ত নাই। যে জমিদারের ফুল, তাড়ানই পুরের নাকে রক্ত! অতএব

হেডমাষ্টার নিজে ভুল বন্ধ করিয়া ছেলোটিকে লইয়া দরবার করিতে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য, রামলাল বহু পূর্বেই অন্তর্ধান হইয়াছিল।

তোলা কিরিয়া আসিয়া বলিল, দাঠাকুরকে পাওয়া গেল না। অনতিকাল পরে শ্যামলাল মুখ কালি করিয়া বাড়ি আসিলেন। উঠানে দাঁড়িয়া বলিলেন, ওগো ওনচে ? এ গ্রাম থেকে বাস উঠাতে হ'ল মেখটি। চাকরি করে দু'পরয়া ঘরে আনছিলুম, তাও বোধ করি এবার ফুটল। নারায়ণী ঊড়ার হইতে বাহির হইয়া একটা চৌকাঠে ভর দিয়া গুড়কটে জিহ্বাসা করিলেন, তাঁরা থানায় গেছেন, না ?

শ্যামলাল বাড়ি বাড়ি বলিলেন, বাবু শিবভুল্য লোক, তাই মাপ করেচেন, কিন্তু আরো পাঁচজন আছে ত ? মিন মিন একটা নুতন ফ্যাসাদ তৈরি হলে কি করে গ্রামে বাস করি, বল। রাম কৈ ?

নারায়ণী বলিলেন, সে এখনো আসেনি। বোধ করি, ভয়ে পালিয়েছে।

শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালালেও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, না পালালেও নেই। সে সংসার ছেলে, লোকে নিন্দা করবে, তাই এতদিন কোনমতে সহ্য করেছিলুম, কিন্তু আর নয়। এখন নিজের শ্রাণ বাঁচাতে হবে।

দিগম্বরী রাসাঘরের বারান্দা হইতে বলিলেন, নিজের ছেলোটার পানেও ত চাইতে হবে।

শ্যামলাল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, হবে না, মা, নিশ্চয় হবে। তাই কাল পাড়ার পাঁচজন ভয়লোক ডেকে বিবর-সম্পত্তি আলাদা করে ফেলব। আর তোমাকেও বলে রাখলুম, এ নিয়ে ওকে বকাখকা করবার দরকার নেই। ও যা ভাল বোঝে, তাই করে। ভাল বুঝে, মনিবের ছেলের গায়ে হাত তুলেচে।

দিগম্বরী মনে মনে পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, নারাণি কেন যে ওকে শাসন করতে যায়—আমার ত মেখে ভয়ে বুক কাঁপে। যে গোরার ছেলে, ও আমাকেই যখন অপমান করে, তখন ওকে অপমান করে ফেলবে, এ কি বেশী কথা! আমি বলি, মন! নিজের মান নিজের ঠাই,—রাসের কথায় থেকে না।—শ্যামলাল খজ্ঞার এ কথাটার আর সায় দিতে পারিলেন না, বোধ করি, চকুলজ্জা হইল। বলিলেন, যাই হোক, ওকে শাসন করবার দরকার নেই।

নারায়ণী পাথরের মূর্তির মত নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া সমস্ত ওনিলেন, একটা কথাও জবাব দিলেন না। তার পর ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা-খানেক পর নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ঊটকাবু ঘরে এসেছে।

নারায়ণী নিশ্চল উঠিয়া গিয়া, রাসের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঊটকা বন্ধ করিলেন। রাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া মুখ তুঁ' রা দেবিল, বৌলিদি দ্বার বন্ধ করিয়া নিরাসেন এবং ঘরের কোণে তাহারই একগাছ পাখলা বেতের হাড়ি ছিল, তাহাই তুলিয়া লইতেছিল। সে উৎকলাং লাফাইয়া খাটের ওধারে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী জবিলেন, এনিঞ্চে আর।

রাম হাড়িরেড় করিয়া বলিল, আর করব না বৌদি! এইময়টি হেঁকে দাও।

নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, এলে কম মারব, কিন্তু না এলে এই বেত তোমার নিঠে ডাঙব। রাম তথানি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়িয়া মিনতি করিতে লাগিল, তিন সত্যি করছি বৌদি, আর কোন দিন করব না, কান মলছি বৌদি—

নারায়ণী খাটের উপর ঊঁকিয়া পড়িয়া সপাং করিয়া করিয়া এক বা বেত তাহার হাড়ের উপর ফলাইয়া দিলেন; তাহার পর বেতের উপর বেত পড়িতে লাগিল। ঊটকাটা সে ওনিকের ঘোর খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, তার পর ঘরঘর ছুটাহুটি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, শেষে পারের তলার পড়িয়া চোঁচাইতে লাগিল। নেত্য শেহনে আসিয়া জা 'দার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল, কানিয়া বলিল, মা, ছেড়ে দাও মা। আমি ষাট মানচি—

দিগম্বরী খিচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ছুই সব কাজে কথা কইতে আসিস কেন বলত ?

শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, কি হচ্ছে ও—সন্ন্যাসত চোঁজবে নাকি ?

নারায়ণী ঊঁকত কেলিয়া বলিলেন, মলে থাকে ফেন।

চার

রাম ভাত খাইতে বসিয়াছিল। নিগছরী আড়ালে বসিয়া সুর তুলিয়া বলিলেন, অত বড় ছেলেকে অমন করে মারা কেন? ওর বড়ভাই কোনদিন গায়ে হাত তোলে না।

নেতা কাজ করিতে করিতে বলিল, তুমি কম নও, মিথিয়া! তুমিই ত ও-সব কথা মাকে এসে লাগাও।

সে রাগে অত মার তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই; রাম ওনিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, ডাইনী বুড়ী আমাদের সব খেতে এসেছে।

নিগছরী চেঁচিয়া উঠিলেন, নারানি, ওনে বা তোর দেওরের কথা।

নারায়ণী মান করিতে বাইতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ক্রান্তভাবে বলিলেন, পারিনে মা, আর কথা শুনেতে; সত্যি বলছি নেতা, মরণ হলে আমার হাড় ছুঁড়ায়—আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে ও বান্দর, এখনো তোর পিঠের লাগ মিলেয় নি, এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি!

রাম জবাব দিল না, ভাত খাইতে লাগিল। নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া মান করিতে চলিয়া গেলেন। উঠানের উপরেই একটা পিয়ারাগাছ ছিল, ভাত খাইয়া রাম তাহার উপর উঠিল এবং নির্বিচারে কাঁচা-পাকা পিয়ারা চর্বণ করিতে লাগিল। কোনটার কতকটা খাইল, কোনটার একটু কামড়াইয়াই ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কাঁচাওলা নিরর্থক ছিড়িয়া এদিকে-ওদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। সেখিয়া নিগছরীর গা ছালা করিতে লাগিল। নারায়ণী বাড়িতে নাই, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, তোমার জন্য ত বাছ, পাকা পিয়ারা দীতে কাটবার জো নেই, কাঁচাওলা নষ্ট করে কি হচ্ছে?

রাম কোনদিনই তাহার কথা সহিতে পারিত না। বিশেষ, এইমাত্র নেতার কাছে মার খাইবার করণ জানিতে পারিয়া, রাগে ফুলিতেছিল, গাছের উপর হইতে চেঁচিয়া বলিল, বেশ করচি—বুড়ী!

এই বিশেষণটা নিগছরী সবচেয়ে অপছন্দ করিতেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বুড়ী! বেশ কত? আচ্ছ, আসুক সে। যেমন কুকুর, তেমনি মূণ্ডর হওয়া চাই ত! কি বেছারা ছেলে বাবা!—মার খেয়ে পিঠের চামড়া উঠে গেল, তবু লজ্জা হ'ল না!

রাম উপর হইতে বলিল, ডাইনী বুড়ী!

ডাইনী বুড়ী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! পাখী হারামজাদা, নাব বলচি।

রাম বলিল, নাবব কেন? তোমার বাবার গাছ?

নিগছরী কেপিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, অ্যা—বাপ তুলসি? ওনলি নেতা, ওনলি!

ঠিক এই সময় নারায়ণী ঘটি হইতে আসিয়া পড়িলেন। গাছের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, ভাত খেয়ে ইত্থলে গেলিনে? গাছে চড়েছিস যে!

রাম ভাবিয়া রাবিয়াছিল, গাছের উপর হইতে ঘুরে বৌদিকে আসিতে দেখিয়াই সে নামিয়া পলাইবে? কিন্তু ঝগড়ার ব্যস্ত থাকার পথের দিকে নজর করে নাই। বৌদিনি একবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে ভরে বলিল, পিয়ারা খাচ্চি।

তা ত খাচ্চিস—ইত্থলে গেলিনে?

আমার পেট কামড়াতে যে!

নারায়ণী তুলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তাই ভাত খেয়ে উঠে কাঁচা পিয়ারা চিবোত?

নিগছরী মেরে গলা ওনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—হারামজাদা হেঁড়া আমার বাপ তোলে! বলে, নাবব কেন—তোমার কপের গাছ?

নারায়ণী চোখ তুলিয়া বলিলেন, বলেছিস?

রাম চোখ-মুখ ককিত করিয়া বলিল, না বৌদি, বলিনি।

নিগছরী চেঁচিয়া উঠিলেন, বলিস নি হারামজাদা! নেতা সাখী আছে। তারপর মুখ বিকৃত করিয়া, সানুনাসিক সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেনিন যখন খেতের উপর বেত পড়েছিল, তখন—আর

করব না বৌদি—পায়ে পড়ি বৌদি—মরে গেলুম বৌদি,—চেপে ধরলে টিটি কর, আর ছেড়ে দিলে লাফ মার, হারামজাদা!

রাম আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পিয়ারা ছিল—ঐ করিয়া ছুড়িয়া মারিয়া দিল। সেটা দিশম্বরীকে স্পর্শ করিল না, নারায়ণীর ডান ব্রুর উপরে গিয়া সঙ্গেসঙ্গে আঘাত করিল। এক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। দিশম্বরী ভয়ঙ্কর চোচামেচি করিয়া উঠিলেন, নেতা কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, রাম পাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উর্ধ্বাশ্বাসে দৌড় মারিল।

দুপুরবেলা শ্যামলাল স্নানাহার করিতে আসিয়া দেখিলেন বিষম কাণ্ড। নারায়ণী নিজীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার ডান চোখ ফুলিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার উপর ভিজা ন্যাকড়ার পাট বঁধিয়া নেতা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। দিশম্বরী আজ আর আড়ালে গেলেন না, সামনেই চীৎকার করিয়া কাদিয়া বলিলেন, রাম মেয়ে ফেলচে নারায়ণীকে।

শ্যামলাল চমকাইয়া উঠিলেন। কাছে আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কঠিনভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, আজ তোমাকে আমি দিবি দিচ্ছি—যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোনদিন কথা কও—যদি কোন কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর, চুপ কর—ও-কথা মুখে এনো না।

শ্যামলাল বলিলেন, আমার এত বড় দিবি যদি না মানো, সেই দিনে যেন তোমাকে আমার মরা-মুখ দেখতে হয়। বলিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসহ্যব কল্পনা করিয়া রাম সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিল। দেখিল, উঠানের মাঝামাঝি ছাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়িটিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। নাড়া দিয়া দেখিল, বেশ শক্ত, ভাঙ্গা যায় না। রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি চুপি মুখ বাড়িয়া দেখিল, সেখানেও ওই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরে কেহ নাই, শুধু একরাশ নিতল-কাঁসার বাসন মেজের উপর পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। তখন কিরিয়া গিয়া সে চুপ করিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া বাটীর অপর খণ্ডের গতিবিধি শব্দসাদা শুনিতে লাগিল। ইতিপূর্বে তাহার যে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছিল, এখন সে কথাও ভুলিয়া গেল। রাত্রি তখন বোধ করি নয়টা, সে ঘুরিয়া গিয়া বিভ্রম-দরজায় যা নিতেই নেতা কপাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাম জিজ্ঞাসা করিল, বৌদি কোথায় নেতা?

ঘরে ওয়ে আছেন।

রাম ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বৌদি খাটের উপর শুইয়া আছেন, এবং নীচে মাদুর পাতিয়া দিশম্বরী ছোট মেয়েটিকে লইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দ খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে বলিয়া দিল, কাকা, তোমার বাড়ি ওদিকে, এদিকে আমাদের বাড়ি। বাবা বলেছে, তুমি এ-ঘরে ঢুকলে পা ভেঙ্গে দেবে।

রাম খাটের উপর নারায়ণীর পায়ের কাছে গিয়া বসিতেই তিনি পা সারাওয়া লইলেন। রাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিশম্বরী তাহার ছোট মেয়েকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, সুরো, বল না তোর দাদাবাবু কি বলেছে ওকে।

সুরধুনী মুখস্থর মত গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল—দাদাবাবু বলেছে, তুমি এখানে এসো না। কাল সকালে সব—কি মা?

দিশম্বরী বলিলেন, বিষয়-সম্পত্তি।

সুরধুনী বলিল, বিষয়-সম্পত্তি কাল ভাগ-বাটরা করে দেবে।

দিশম্বরী বলিলেন, দিবি দেবার কথাটা বল না—ন্যাকা মেয়ে!

সুরধুনী বলিল, দাদাবাবু দিবি দিয়েছেন দিকিকে,—খেতেও দেবে না, কথাও বলবে না—বলে দাদাবাবু—। নারায়ণী বিছানার উপর হইতে ধমক দিয়া উঠিলেন, আজ্ঞা, হয়েচে হয়েচে, তুই চুপ কর।

হবে না—চোখ বুজে সেক্ষ হবে। কৈ রাঁধুক দিকি আমার সঙ্গে! লোকে খেয়ে কারটা ভাল বলে দেখি।
নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রাহিলেন।

নেত্যা কাছে ছিল, সে বলিল, দিদিমার এক কথা। ও কি কোনদিন এক ঘটি জল গাড়িয়ে খেয়েছে
যে, আজ রেখে থাকে?

সে অনেক দিনের দাসী, এ-সব ব্যাপার তাহার ভাল লাগিতেন না।

মায়ের দেখানো সুরধুনীও মাঝে মাঝে গিয়া বেড়ার ঠাঁক দিয়া দেখিতেন। ঘটা-খানেক পরে
ছুটিয়া আসিয়া দিমির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—ও দিদি, দেখবে এস—রামদাদা—মা
গো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো শুধু খাচ্ছে। কিছু নেই দিদি—একেবারে শুধু ভাত, আচ্ছা দিদি, কাঁচা
ভাতে পেট কামড়াবে না?

নারায়ণী তাহার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে যে
কত দুখে, কত বড় ক্ষুধার তাড়নে এইগুলো খাইতে বসিয়াছে, সে কথা তাহার অগোচরে রহিল না।
দুপুরবেলা শ্যামলারের খাওয়া হইয়া গেলে, দিগম্বরী ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, যা পারিব,
দুটি খেয়ে নে নারানি! ওর তাড়সে ছুরের মত হয়েছে,—ওতে খাওয়া চলে। আমি বলছি, কেতি হবে
না।—নারায়ণী মোটা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া বলিলেন, আমাকে বিরক্ত
ক'র না মা, তোমরা খাও গে।

দিগম্বরী বলিলেন, ভাত না খাস, দু'খানা রুটি করে দি—না হয়—

নারায়ণী: হহিলেন, না, কিছু না।

দিগম্বরী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা? কাল থেকে উপোস করে আছিস, আজ
দুটি না খেলে হবে কেন?

নারায়ণী জবাব দিলেন না। নেত্যা আসিয়া বলিল, তুমি মিথ্যে বলে ময়চ দিদিমা। এখানে পড়িয়ে
একবেলা চৌচালেও ওঁকে খাওয়াতে পারবে না। ছুর হায়ছে, একটু ঘুমোতে দাও।

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন, বলিতে বলিতে গেলেন, জানিনে বাপু, নাগালে-টাংলে একটু ছুরভাব
হয়, তাই বলে কি মানুষ উপোস করে পড়ে থাকে? আমরা ত পারি।

বৈকালে নারায়ণী আবার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, এবং বতবার নেতয়ার চোখে
চোখে হইল, ভতবারই কি কথা বলিতে গিয়া যেন চলিয়া গেলেন।

রাম স্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া দোকান হইতে বুদ্ধি-বুদ্ধি কিনিয়া আনিল।
খাইতে খাইতে গলা বড় করিয়া বলিল, কি আর কেতি হ'ল আমার? ও : খেয়ে ইকুলে গেলুম,
আবার ফিরে এসে কেমন খাচ্ছি।

বেড়ার ওদিকে সকলেই রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সকালের মত এখনও কেহ জবাব দেয়
না দেখিয়া সে আরও অস্থির হইয়া উঠিল। চৌচায়া বলিল, এই দিকটা আমার সীমানা। কোনদিন
নেত্যা কি কেউ যদি আমার সীমানায় আসে, তখন পা ভেঙ্গে দেব।

এই পা-ভাঙ্গার ভয় সে ইতিপূর্বেও দেখাইয়াছিল, সেবারেও যেমন ফল হয় নাই, এবারেও হইল
না। কেহ ভয় পাইয়াছে কিনা বোকা গেল না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বলিয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবার
চৌচামেটি করিতে লাগিল, আমার কাঠ কৈ, আমি রাঁধব কি দিয়ে? আমার শিলনোড়া কৈ, আমি
বাটনা বাটব কিসে? ও-ঘর হইতে নেত্যা বলিল, মা বলছেন, কাশ শিলনোড়া কিনে দেবেন।

না, আমি কেনা শিলনোড়া চাইনে। বলিয়া সে কাঁদিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমার শিলকে ধরালে? কেন, আমাকে খোনা খোনা
করে ও বুদ্ধি ভেঙালে, বেশ করেটি গাল দিয়েটি—ও মরে আর জন্মে পেত্নী হবে।

দিগম্বরী চোখ কটমট করিয়া বলিলেন, ওমলি নারানি, ওমলি! এ-সমস্ত পায়ে পা তুলে দিয়ে
ক'গড়া করা নয়?

নারায়ণী চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

পরদিন সকাল হইতেই রাসের কথাবার্তা বদলাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে,

বৌদিদি ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এ-রকম সে তাহার জানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উলটা-পালটা জবাবদিহি করিল। একবার বলিল, বেড়াল মারিতে পিয়ারা ছুড়িয়াছিল; একবার বলিল, হাত কসকাইয়া পড়িয়া গিয়া বৌদির কপালে লাগিয়াছিল; একবার বলিল, কাঁচা পিয়ারা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তার পর একবার বলিল, কাছাকেও সে গাল দেয় নাই; একবার বলিল, গোবিন্দকে দিয়াছিল; একবার বলিল, ডোলাকে দিয়াছিল। কিন্তু কোন কৈফিয়তেই কাজ হইল না। ও-ঘরের কেহ জবাব দিল না, প্রতিবাদ করিল না, হাঁ, না একটা কথাও বলিল না। একবার বহু কষ্টে লম্বা-সম্বোধ ত্যাগ করিয়া কাদিতে লাগিল। কি উপায়ে কি দিয়া কেমন সে বৌদিকে প্রসন্ন করিবে? বৌদিরা তাহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, তবে কোথায় সে খাইবে? কাহার কাছে কেমন করিয়া সে থাকিবে? কোন দিকেই আজ সে কুল-কিনারা দেখিতে পাইল না। আজ সে রাঁধিবার চেষ্টাও করিল না, পড়িতে গেল না, ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল।

গোপনে কাদিয়া কাদিয়াই বোধ করি, গত রাত্রে নারায়ণীর ছুর আসিয়াছিল। দুপুরবেলা নিগম্বরী এক বাটি দুধ আনিয়া বলিলেন, খেতেই হবে। না খেয়ে কি মরবি? নারায়ণী প্রতিবাদ না করিয়া দুধের বাটি হাতে লইয়া কতকটা খাইয়া বাটিটা নামাইয়া রাধিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাহার ‘না, না’ করিয়া কথা কাটাকাটি করিতে ঘৃণা বোধ হইল।

রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন নেত্রে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবুর ত কোন সাড়াশব্দ পাইনে—রাত ত ঢের হ’ল!

নারায়ণী উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাদিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার, দেখে আয়, সে ঘরে আছে কিনা।

নেতোর চোখ ভিজিয়া উঠিল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার যেতে সাহস হয় না মা! বলিয়া বাহিরে গিয়া ডোলাকে সে ডাকিয়া আনিল। ডোলা সংবাদ দিল—দাঠাকুর ঘরে আছে, ঘুমুচ্ছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া চাদের মুড়ি দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাত না হইতেই তিনি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া মিলেন।

রান্না যখন প্রায় অর্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, তখন নিগম্বরী গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোর না ছুর নারায়ণী? তুই না তিন দিন খাসনি? ভোরবেলা উঠে চান করে এসে এ-সব কি হচ্ছে, জিজ্ঞেস করি?

নারায়ণী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বললেন, রাঁধিচি, দেখতে ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি, কিন্তু কেন? কেন শুনি? তুই কি আমার হাতে খাবিনি?

নারায়ণী জবাব মিলেন না, কাজ করিতে লাগিলেন।

কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই একটা কথা ভাবিতেছিল,—বৌদিদির না জানি কত লাগিয়াছে! একটা কাঁচা পিয়ারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের ওরফত উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন কোথাও চলিয়া গেলে বৌদি খুশী হইবে। তাহার মামার বাড়ি তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায়, সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া বুজিয়া লইবে সম্বন্ধ করিয়া সে একটি ছোট পুঁচুলি বাঁধিয়া লইয়া প্রত্যাহার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী কিরিয়া ডোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কি রে ডোলা?

এ করটা দিন সে বাহিরে গল্পের সেবা করিত বটে, কিন্তু রামের ভয়ে ভিতরে আসিত না। ডোলা আছে আছে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে, মা।

নারায়ণী কাছে আসিতেই ডোলা কিসকিস করিয়া বলিল, তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও।

নারায়ণী বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি হয় রে? কাকে টাকা দিতে হবে?

ভোলা একটুখানি আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চলে যেতে বলেছিলে না। তিনি যেতে রাজী আছেন—আচ্ছা, দুটো না দাও, একটি টাকা দাও।

নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজী আছে রে? কোথায় সে?

ভোলা বলিল, বাহিরে গছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার থানের ওদিকে কোথায় ডেনার মামার বাড়ি আছে যে।—যা ভোলা, শিগগির ডেকে আন—বল, আমি ডাকচি।

ভোলা ছুটিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়িয়া রহিলেন। অনতিকাল পরেই রাম একটি ছোট পুঁচিল হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়িতেই নারায়ণী নিশেপে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে ঢলিয়া লইয়া গেলেন।

দূর হইতে দিশ্বরী রামকে রামাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সাজানো থালার সমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম বৃকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথার উপর, পিঠের উপর, আর একজনের অঙ্গ বৃষ্টির ধারার মত করিয়া পড়িতেছে। অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, ওঃ—তাই এত রান্না! খাওয়ান হবে বৃষ্টি! আমার জামাই যে এত বড় দিবিটা দিলেন, সেটা ভেসে গেল বৃষ্টি?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভেসে যাবে কেন মা, তাঁর কথা আমি অমান্য করিনি, তিনি দিন খাইনি, খেতেও দিইনি।

দিশ্বরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই বৃষ্টি? অমান্য করিস নি, তবে একি হচ্ছে? যে দিবি দিয়েচে তার বৃষ্টি কতটাও একবার নিতে হবে না?

নারায়ণী কি যেন একটা কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, আমার হুকুম নেওয়া হয়েছে।—দিশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি কচি খুকি নই নারানি। হুকুম নিলি, আর আমি জানতেও পারলুম না?

এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, আমি কচি খুকি নই নারানি। হুকুম নিলি, আর আমি জানতেও পারলুম না?

এবার নারায়ণীর আর সহ্য হইল না। তিনিও কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জানবে মা, কার কাছে কখন আমি হুকুম পেয়েছি? মা, যার মুখ আছে, সেই দিবি দিতে পারে, কিন্তু—বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বৃকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বৃকে করে এতটুকুকে বড় করে তুলতে হয়—সেই জানে, হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে। তোমাকে ভাবতে হবে না মা; এখন একটু সামনে বসে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। ও আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের জল আবার করিয়া পড়িতে লাগিল।—দিশ্বরী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, এখানে তবে আর আমার কি করে থাকা হবে? এ বাড়িতে আর থাকতে পারব না, তা তোকে আজ স্পষ্ট বললুম।

নারায়ণী বলিলেন, আমিও এই কথাটিই তোমাকে মুখ কুটে বলতে পারছিলাম না, মা, সত্যিই তোমার এখানে থাকা হবে না। তোমার চোখে চোখে আমার এত বড় ছেলেকে ঘেনে আশ্রয়ানা হয়ে গেছে। ও দুটো হোক যা হোক, আমার বাড়িতে আমার চোখের সামনে ওকে স্পষ্ট দিতে আমি কাউকে দেব না। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ি য়ো। তোমার খরচপত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

দিশ্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বৃকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি গেল হয়েছি, আমার স্মৃতি হয়েছে—আর একটুবার তুমি দেখ।—নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুমি এখন ভাত খা।



পথ-নির্দেশ

এক

মাঝারি গৃহহ-ঘরে বাড়ির কর্তা বন্ধন বন্ধারোগে মারা যান, তখন তিনি পরিবারটিকেও আত্মমরা করিয়া যান। সুলোচনার স্বামী পতিভ্রষ্টাবন ঠিক তাহাই করিয়া গেলেন। বর্ষাধিককাল রোগে ভুগিয়া একদিন বর্ষার দুর্নির্নে গভীর রাত্রে তিনি দেহভ্যাগ করিলেন। সুলোচনা কাল স্বামীর শেষ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দিয়া পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন, আর উঠেন নাই। স্বামী নিঃশবে প্রাণভ্যাগ করিলেন, সুলোচনা তেমনি নিঃশবে বসিয়া রহিলেন, চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিলেন না। শ্রমোদ্গববীয়া অনুচা কন্যা হেমলিনী কিছুক্ষণ পূর্বে অদূরে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকেও জাগাইলেন না। সে ঘুমহিতে লাগিল, পিতার মৃত্যুর কথা জানিতেও পারিল না। বাড়িতে একটি ভৃত্য নাই, দাসী নাই, দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় পর্যন্ত নাই। পাড়ার লোকেও ক্রমশঃ ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষ অপরাহ্ন হইতেই বৃষ্টি চানিয়া আসিয়াছিল বলিয়া, দয়া করিয়া আজ আব কেহ রাত্রি জাগিবার নাম করিয়া ঘুমহিতে আসে নাই।

বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ভিতরে মৃত স্বামীকে চোখের সামনে লইয়া সুলোচনা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরদিন সংবাদ পাইয়া সকলেই আসিলেন, পূক্বেষা মড়া বাহির করিয়া দল্লানে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা গোবর-জল ছড়া দিয়া কীর্মেতে বসিয়া গেলেন।

সুলোচনার থাকিবার মধ্যে শুধু একখানি ছোট আম-কাঁঠালের বাগান অবশিষ্ট ছিল। পাড়া-লোকের সাহায্যে সেইটি একশত টাকায় বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে স্বামীর শেষ কাজ সমাধা করিয়া চূপ করিয়া ঘরে বসিলেন। মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হবে মা এবার?

মা জবাব দিলেন, ভয় কি মা? ভগবান আছেন।

প্রাঙ্ক-শেষে বাহা বাঁচিয়াছিল, তাহাতে একমাস কোনমতে কাটিয়া গেল। তার পর একদিন আকাশ মেঘমুক্ত দেখিয়া, প্রভাত না হইতেই তিনি ঘরে-দোরে চাবি দিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়িলেন।

মেয়ে প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবে মা?

মা বলিলেন, কলকাতায়, তোর দাদার বাড়িতে।

আমার আবার দাদা কে? কোনদিন শু তাঁর কথা বলনি?

মা একটু চূপ করিয়া বলিলেন, এতদিন আমার মনে পড়েনি মা।

হেম অতিশয় কুঙ্কিমতী, সে ধমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাজ নেই মা কাজ বাড়ি গিয়ে। দেশ থেকে দুখ করলে আমাদের দুটো পেটের ভাত জুটবে—আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সুলোচনা উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াস নে হেম, সকাল হয়ে যাবে।

চলিতে চলিতে বলিলেন, তিনি তোকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছেন—সে-সমস্ত জলে ফেলিস নে। তুই আমাকে কি বলবি হেম! আমি জানি, ঘরে বসে মায়ে-ঝিয়ে দুখ করলে পেটের ভাতটা জুটবে, কিন্তু তোব বিয়ে দেব কি করে বল্ দেখি মা?

হেম বলিল, !বয়ে নাই দিলে?

জাত যাবে যে রে।

হেম বলিল, গেলেই বা মা। আমরা দুটি মায়ে-ঝিয়ে থাকব-দুখ করে খাব, আমাদের জাত থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! পৃথিবীতে আরো অনেক জাত আছে, মেয়ের বিয়ে না দিলে তাদের জাত যায় না। আমরা না হর তাদের মত হয়ে থাকব।

মেয়ের কথা শুনিয়া সুলোচনা এত দুখের মাঝেও একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, তা হলেও

পী ছাড়তে হবে। আর গেলে কেউ উঠান বীড়ি দিতেও ভাববে না।

‘হেম আর অর্থাৎ দিল না। বিত্তর অধিকার পুঁতি হইয়া পশ্চাতে উল্লসিত হইয়াছিল, সেইওলা লম্বা করিয়া লইয়া সে চূপ করিয়া পথ চাহিতে লাগিল।—বে পথটা গলার পাশ দিয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া খুরিয়া খুরিয়া শ্রীরামপুর স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার সেই পথ ধরিয়া গ্রাম কোশ-থানেক আসিয়া পথিপাশে সিঁকেবরীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গলার আঁচল দিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিয়া হেম বলিল না, মা, সকাল হইবে গেছে, আমার পথ চলতে লজ্জা হচ্ছে।

সুলোচনার নিজেরও লজ্জা করিতেছিল। নীচে এক বৃদ্ধা প্রত্যহনে আসিতেছিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, শ্রীরামপুর ইস্টিশানের এই পথ না?

বৃদ্ধা কপকপ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কোথা থেকে আসচ মা?

সুলোচনা সে কথা বলিব না দিয়া বলিলেন, ইস্টিশানে যাবার আর কোন পথ নেই মা?

দেবালয়ের বিপরীত দিকে একটি ছোট গলি বরাবর রেলওয়ে লাইনের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধা সেই পথটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই গলিটা বামুনদের বাড়ির পাশ দিয়ে বরাবর রেলের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। এই পথ দিয়ে যাও। রেলের রাস্তা ধরে সোজা বাঁ-দিকে গেলে হিরামপুর ইস্টিশানে পৌঁছুবে—যাও মা, ভয় নেই, কেউ কিছু বলবে না।

সুলোচনা কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া মেরের হাত ধরিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

দুই

আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর গুলেশ্বরের প্রকাণ্ড বাড়ি প্রায় খালি পড়িয়া ছিল। ভেতলার একটা ঘরে সে শয়ন করিত, আর একটায় লেখাপড়া করিত। বাকী, ঘরওলা এবং সমস্ত দ্বিতলটা শূন্য পড়িয়া ছিল। নীচেব তলায় এক পাচক, দুই ভূতা ও এক দারোয়ান এক-একটা ঘর দখল করিয়া থাকিত, ভদ্র সমস্ত ঘবই ভগ্নাবস্থ।

গুলেশ্বরের পিতা লোহার ব্যবসা করিয়া মৃত্যুকালে এত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহার এক সন্তান না থাকিয়া দশ সন্তান থাকিলেও কাহারো উপার্জন করিবার প্রয়োজন হইত না; সেই টাকা এবং পিতার লোহার কারবার বিক্রয় করিয়া কেলিয়া সমস্ত টাকা গুলেশ্বর ব্যাঙ্কে জমা দিয়া নিশ্চিত হইয়া আদালতে ওকালতি করিতে বাহির হইয়াছিল।

বেলা দশটা বাজে, ভখনো সে কি-একখানা বই পড়িতেছিল, ভূতা আসিয়া বলিল, বাবু, আপনার চানব সময় হয়েছে। যাচ্ছি, বলিয়া গুলেশ্বর পড়িতেই লাগিল।

ভূতাটা খানিক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দুটি মেরেমানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। গুলেশ্বর বিস্মিত হইয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে?

হী বাবু, আপনার সঙ্গে। আপনার—

তাহার কথা শেষ না হইতেই সুলোচনা ঘরে প্রবেশ করিলেন। গুলেশ্বর বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—সুলোচনা চাকরটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুই নিজের কাজে যা।

ভূতা চলিয়া গেলে বলিলেন, ওগি, তোমার বাবা কোথায়, বাবু?

গুলেশ্বর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না।

সুলোচনা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে চিনতে যা না বাবা! গ্রাম বারো বছর আগে তোমাদেরই ওই পাশের বাড়িতে আমরা ছিলাম। সেই বছর তোমার পৈতে শয়, আমরাও বাড়ি চলে যাই। তোমার বাবা কি দোকানে গেছেন?

গুলেশ্বর বলিল, না, বছর-তিনেক হ'ল তিনি মারা গেছেন।

মারা গেছেন? তোমার পিসীমা?

তিনিও নেই? তিনি বাবার পুঁবেই গেছেন।—

সুলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দেখছি শুধু আমিই আছি। তোমার মা যখন মারা যান, তখন তুমি সাত বছরেরটি। তার পরে পৈতে না হওয়া পর্বত আমার কাছেই তুমি মানুষ হয়েছিল।

হী, শুনি, তোর সইমাকে মনে পড়ে না রে?

গুপ্তেন্দ্র ভৎসনাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রশ্নম করিয়া পারের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পাঁড়িয়া বলিয়া উঠিল,—হী, মা! তুমি?

সুলোচনা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলির দ্বারা ভাগ চূষন করিয়া বলিলেন, হী বাবা, আমিই।

গুপ্তেন্দ্র একথানা চোঁকি কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, ব'সো মা।

সুলোচনা হাসিয়া বলিলেন, যখন তোর আঁখিতে এসেছি তখন বসব বৈ কি! হা রে, তুই এখনো বিয়ে করিস নি? এবার গুপ্তেন্দ্র হাসিয়া বলিল, এখনো ত সময় হয়ে ওঠেনি।

সুলোচনা বলিলেন, এইবারে হবে। বাড়িতে কি কেউ মেয়েমানুষ নেই?

না।

বাঁধে কে?

একজন বামুন আছে।—সুলোচনা বলিলেন, বামুনের আর দরকার নেই, এখন থেকে আমি রীধব। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। আমার আরো দু-চারটে কথা আছে, সেইগুলো বলে নি। আমার স্বামীর এখনকার কাজ যাবার পরে আমরা বাড়ি চলে যাই। হাতে কিছু টাকা তখন ছিল, দেশেও কিছু জমি-জমা ছিল। এতেই একরকম স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল। তার পর গত বৎসর তাঁকে যন্ত্রারোগে ধরে। চিকিৎসার খরচে, হাওয়া বদলানোর খরচে, একেবারে সর্বস্বান্ত করে তিনি মাস-দুই পূর্বে স্বর্গে গেছেন। এখন অনাথাকে দুটি খেতে দিবি, এই প্রার্থনা।

তার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল করিয়া পড়িতে লাগিল। গুপ্তেন্দ্রের চোখও ছলছল করিয়া উঠিল। সে কাতর হইয়া বলিল, মাকে মানুষে খেতে দেয় না, তুমি কি এই কথা মনে ভেবে এখনো এসেছ মা?

সুলোচনা আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, না বাবা, সে কথা মনে ভেবে আসিনি। তা হলে এত দুঃখেও বোধ করি আসতাম না। তোকে ছোটটি দেখে গেছি, আজ বারো বছর পনে দুঃখের দিনে যখন মনে পড়েছে, কোন শব্দ না করেই চলে এসেছি। তা ছাড়া আরো একটি কথা আছে। আমার মেয়ে হেমলিনী—সে তোরই বোন—সে আবার আমার চেয়েও অনাথা। বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু বিয়ে দিতে পারিনি। তার উপায় তোকেই করে দিতে হবে। গুপ্তেন্দ্র বলিল, তাকে কেন সঙ্গে আননি মা?—সুলোচনা বলিলেন, এনেছি। কিন্তু সে বড় অভিমানিনী। পাছে এ-সব কথা শুনেত পায়, তাই তাকে নীচে বসিয়ে রেখে আমি একলাই ওপরে এসেছি।

গুপ্তেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া চাকরটাকে চাৎকার করিয়া ডাক দিয়া বলিল, ও নন্দা, নীচে হেম বসে আছে, যা শিগগির ডেকে নিয়ে আয়।

সুলোচনা বলিলেন, তাকে উদ্ধার করতে তোর খরচ হবে—সে স্বপ্ন আমি কোনদিন—

গুপ্তেন্দ্র বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তবে মা, আমি বাইরে যাই, তোমার যা মুখে আসে বল। কিন্তু আমার মা মরে যাবার পর তুমি যা করেছিলে, সে-সব কপের কথা যদি আমি তুলি, তা হলে বলে রাখছি মা, তোমাকেও লজ্জার বাইরে গিয়ে পাঁড়াতে হবে। তার চেয়ে কাজ নেই—তুমিও চুপ কর, আমিও করি।

সুলোচনা হাসিয়া বলিলেন, তাই ভাল। তবে মেয়েটা আসচে, তার সামনে আর কথা হবে না— তাই এইবেলা অব একটা কথা বলে রাখি। মনে করিস নি শুণী, আমি মায়ের চোখ নিয়ে এ কথা বলছি, কিন্তু ছেয় এলে দেখতে পারি, তোর বোন রূপে ওশে কোন মানুষেরই আযোগ্য হবে না। তার বাপ তাকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছেন—শেষ কয়েক বছর এইটাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল। আমি বলছি, ও মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ঘরই আলো হবে। ও হেম, এই নিকে আয় মা, ইনি তোর শুণীদাদা—প্রণাম কর।

হেম ঘরে ঢুকিয়া গুপ্তেন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নতমুখে পাঁড়িল। তাহার পথদ্বয়ে দ্বার মুখের নিকে চাহিয়া গুপ্তেন্দ্র বিশ্বস্তে হতবুদ্ধি হইয়া পাঁড়িয়া রহিল। সুলোচনা বোধ করি সে ভাব লক্ষ্য

করিয়াই বলিলেন, শুনী, হেমকে তোর হাতেই দিতাম, যদি না দেশাচারে নিষেধ থাকত। আমি ম'লে হেমের দশ দিন অশৌচ হবে, তোকেও তিন দিন অশৌচ মানতে হবে, তাই ধর্মতঃ ও তোর বোন হয়।

গুণেন্দ্র এবার নিজেই সংবরণ করিয়া লইয়া হেমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, হেম, শুনলে ত— আমাদের একই মা। মায়ের বাড়িতে আমিও যেমন, তুমিও তেমন। চল, তোমাদের খাবার যোগাড় করে দি।

সুলোচনা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, শুনী, তেঁবে গলায় পৈতে দেখছি না যে!

গুণেন্দ্র খালিগায়ে ছিল, সে নিজের গলার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা গ্রামী।

রাশ্কে! তি বাবা, কাঁড়টা ভাল করনি। যাই হোক, প্রায়শ্চিত্ত করে পৈতে নাও।

গুণেন্দ্র বলিল, কাঁড়টা যদিও ঠিক আম'ব কাটা নয়, বাবা নিজেই করে গেছেন, কিন্তু, প্রায়শ্চিত্ত করারও কোন আশঙ্ক্য নেই। রাশ্কে মতটা মন্দ বলে মনে কবি না।

সুলোচনা মনে মনে যেন শব্দ অর্থাৎ পতিয়া বলিয়া পড়িলেন। খানিক পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমিও কেন ম'লসেব ও সব দুর্নীতি হয়।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, দুর্নীতির কথা অন্য সময়ের হতে পারবে মা, এখন বাস্তবের দিকে চল।

তিন

পথিক, যেমন গাছতলায় বাধিয়া খড়িয়া ঝাঁড়টা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং তখন যেমন চাহিয়া দেখে না ঝাঁড়টা ভাঙল কি ক'ছিল, সংসারে শতকরা নব্বই জন লোক ঠিক এমন করিয়াই সরস্বতীর কাছ হইতে লাভ চানিয়া করিয়া মা'লক্ষ্মীর লাভপথের ধারে নির্মমভাবে তাঁহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—একবার সন্নিহিত হইবে না, তখন ভাঙিলেন, কি বাঁচিলেন। গুণেন্দ্র সেইরূপ করে নাই। সে চিন্তিত হইত যে এককালে কাল্যায় সেবা করিয়া আসিয়াছিল, উকিল হইয়াও ঠিক তেমন করিয়াই সরস্বতীর সেবা করিতে লাগিল। তাহার পতিবার ঘর পুস্তকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘরের মধ্যে হেমললিতা নামে অশ্রুয পাতল গুণেন্দ্র শুছান প্রকৃতির লোক ছিল না বলিয়া তাহার যে পুস্তক একবার আলমারির বাহিরে আসিত, তাহা শীঘ্র আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইত না। টেবিল, চেয়ার, অবশেষে নীচের আলমারির উপর পতিয়া পড়িয়া সুদীর্ঘকাল পরে যদি কোনগতিকে নন্দার সাহায্যে তা'রে প্রবেশ করিত, তাবশ্যক হইতে আর বাহির হইত না—এমনি মিশিয়া যাইত। একটা পুস্তকের তালিকাও তাহার ছিল বটে, কিন্তু সেসবকে কাজে লাগাইবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না।

হেম এর বেশছন্দ দুই চরিত্রের মধ্যেই ঠিক করিয়া ফেলিল। একদিন একটা আলমারি খালি করিয়া সমস্ত বই নাচ নামাইয়াছে, এমন সময়ে গুণেন্দ্র ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া হেম বলিল, শুভানন্দ, এই বইগুলো ওই আলমারিতে, আর ওই বইগুলো এই আলমারিতে রাখতে ভারী সুবিধে হয়। গুণেন্দ্র চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কি সুবিধে হয়?

হেম বলিল, বাবা, সুবিধে হবে না দেখাচ না, এই বইগুলো এইটাকে রাখলে কেন—

গুণেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখতে পাচ্ছি বটে, খুব সুবিধে হবে।

হেম একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, যাও—করব না, তে'র ভাল করতে নেই।

গুণেন্দ্র একখানা বই তুলিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এই ঘরটিতে হেমললিতা দিব্যবাত্রা থাকিত বলিয়া, গুণেন্দ্র সকাল তাহার শোবার ঘরে বসিয়াই পড়তেন। কবি, অকাল ববিবাবের দুপুববেলা হেম বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, শুনীদা, আসব? শুণী ভিৎবে হইতে বলিল, এস।

হেম ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, তুমি সব সময়ে এই শোবার ঘরে বসেই বই পড় কেন?

হেম কি? এ ঘরে কি বিশেষ কম হয়?

তোমার পড়বার ঘরেই কি এতদিন কম হয়েছিল?

শুশ্রূষা বলিল, কম হয়নি বটে, কিন্তু কাঁচা হয়েছিল—এই ঘরে সেগুলো পাকছে।

হেম প্রথমে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু কথটা বুঝিতে না পারিয়া গভীর হইয়া বলিল, তোমার কেবল তামাশা। একটা কথাও কি তুমি সোজা করে বলতে জান না?

শুণী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, জবাব দিল না।

হেম বলিল, আমি কিন্তু জানি। ও ঘরে আমি থাকি বলেই তুমি যাও না। আমাকে তুমি লজ্জা কর। আমি কিন্তু তোমাকে একটুকুও লজ্জা করিনে।

শুণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন কর না, করা ও উচিত।

হেম হাত দিয়া একগোছা চুল কপালের উপর হইতে পিঠের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল, তোমাকে আবার লজ্জা করতে যাব কি, তুমি কি পর? সে হবে না শুণীদা, চল সে ঘবে। বলিয়া সে বইগুলো তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।—হেমের সর্বদা ব্যবহারের জন্য হার, চুড়ি, বালা শ্রুতি কতকগুলো অলঙ্কার শুণী কিনিয়া আনিয়াছিল। সুলোচনা দেখিয়া বলিলেন, কেন বাবা এ-সব?

শুণী বলিল, এই কটিতে কি হবে মা, আরো ত ঢের চাই। শুধু-হাতে ও মেয়ে পাব হবে না।

সুলোচনা আর কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। এই দুটিতে কেনন করিয়া যে এত সহুর এত আপনার হইয়া গেল, এই কথা তিনি যখন তখন ভাবিতে লাগিলেন। একদিন তিনি শুণীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সামনের অস্থান যেন বয়ে না যায় বাবা। যেমন করে হোক, ওর বিয়ে দিতেই হবে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

শুণী বলিল, সেজন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। কিন্তু হাত-পা বেঁধে জলে ফেললে ও ত দিতে পারবে না। একটা সুপাত্র ত চাই।—সুলোচনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সুপাত্র অপাত্র ওর অদৃষ্ট, শুণী। আমাদের কাজ আমরা করব, তার পরে ভগবানের হাত।

সে ঠিক কথা মা, বলিয়া শুণী চলিয়া গেল। তাহার মুখের উপর দিয়া একটা কালোছায়া ভাসিয়া গেল, সুলোচনা তাহা লক্ষ্য করিয়া আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে কাঁচিতে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, না, ভাল হচ্ছে না—যত শীঘ্র পাবা যায় পাঠ্য কর চাই।

কয়েকদিন পরে হেম হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এখনো শুয়ে আছ—কাপড় পরনি? শিগগির ওঠ।—শুণী বিছানার উপর শুইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। হেম আলমারির কাছে গিয়া ষট কবিরী আলমারি খুলিয়া একমুঠা নোট ও টাকা লইয়া আঁচলে বাঁধিল। চাবি বন্ধ করিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি শুণীদা, আর দেরি করো না, ওঠ। দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

শুণী তাহার সাজগোজ দেখিয়া কতকটা অনুমান করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে? হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, বেশ! গাড়ি ভেরী করতে বলে দিয়েছি এক ঘণ্টা আগে। এখন তুমি বলচ কোথায় যেতে হবে।

শুণী বলিল, কোচম্যান না হয় জানতে পারে কোথায় যেতে হবে; আমি ও কোচম্যান নই, আমি জানব কি করে?

হেম হাসিয়া উঠিল, বলিল, তুমি কোচম্যান কেন হবে শুণীদা? চল, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। কোন্ দোকান?

বইয়ের দোকান গো! তোমাকে মানদা বলে যায়নি? আমি তাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলাম যে! অনেক ভাল ভাল নূতন বাংলা বই বেরিয়েছে—আমি একটা লিস্ট করেছি।

তাহার হাতে একটা কাগজের টুকরো দেখিয়া শুণী হাত বাড়াইয়া বলিল, লিস্ট দেখি।

না, তা হলে তুমি কিনতে দেবে না।

তা হলে চুরি করে কিনলেও পড়তে দেবো না।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা চল, গাড়িতে দেখাব।

সন্ধ্যার সময় তাহারা একগাড়ি বই কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। সুলোচনা দেখিয়া বলিলেন, ইস! এত বই কি হবে রে!

শুণী বলিল কি জানি মা, ও-সব হেমের বহ। কেবল কতকগুলো বাজে বই কিনে টাকা নষ্ট করে

এল। সুলোচনা বলিলেন, তুই দিলি কেন?

গুণী বলিল, আমি কেন দেব? চাৰি ওর হাতে, ও নিজে টাকা নিলে, গাড়ি তৈরি করতে বলে দিলে, তার পর নিজে গিয়ে কিনে আনলে—আমি শুধু সঙ্গে ছিলাম বৈ ত নয়।

হেম পুস্তকের রাশি নন্দাকে দিয়া, মানদাকে দিয়া এবং কতক নিজে বহিয়া লইয়া তেতলার ঘরে চলিয়া গেল।

সুলোচনা বলিলেন, গুণী, অত প্রসন্ন দিসনে বাবা! কোথায় কার হাতে পড়বে, তখন দুঃখে মারা যাবে।

গুণী উপরে পড়িবার ঘবে গিয়া দেখিল, হেম গ্যাসের আলোর নীচে বসিয়া নতুন পুস্তকের পিছনে আঠা দিয়া নম্বর আঁটিতেছে এবং বলিল, মা বলেচেন, তোমাকে আর প্রসন্ন দেখুয়া হবে না। কোথায় কার হাতে পড়ে দুঃখে—কষ্টে মারা যাবে।

হেম মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কেন মাঝা যাব? আমাকে গরীব-দুঃখীর ঘরে দিলে, আমি তার পরের দিনই পালিয়া আসব।

গুণী হাসিয়া বলিল, তবে সেই ভাল।

হেম আর জবাব দিল না, কাজ করিতে লাগিল। গুণেন্দ্র কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস দমন করিয়া লইয়া নিজেও ঘরে চলিয়া গেল।

দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেল। বিজয়্যার দিনে গাড়ি করিয়া সাকুর-ভাসান দেখিয়া ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়া হেম উপরে উঠিয়া গেল। তেতলার খোলা ছাদের উপর জোৎস্নার আলোকে গুণেন্দ্র একাকী পায়চারি করিতেছিল, হেম সুমুখে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা বসিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়িল। গুণেন্দ্র নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, একবার একটুখানি যেন লজ্জা করিয়া উঠিল। কিন্তু এখনই বলিল, আমাকে আশীর্বাদ করলে না গুণীনা?

গুণেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল করেছি বৈ কি।

কৈ কবলে?

মনে মনে করেছি।

হেম হাসি চাপিয়া বলিল, কি আশীর্বাদ করলে আমাকে বল।

গুণেন্দ্র বিপদগ্রস্ত হইয়া অবশেষে গুণীর হইয়া বলিল, আশীর্বাদ করে বলতে নেই। তা হলে কলে না। হেম বলিল, আচ্ছা সে হবে, তুমি মাকে প্রণাম করো।

সে তো রোজ করি।

হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, সে হবে না। আজ বিজয়া, আজ বিশেষ করে প্রণাম করতে হয়। শিগগির যাও—না হলে তিনি দুঃখ করবেন। গুণেন্দ্র নীচে নামিয়া গেল।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি একদিন হেম বাড়ির মত ঘরে চুসিয়াই বলিল, তোমাদের কি আর কথা নেই, আব কাজ নেই? কেন, তোমাদের কি করেছি আমি! বলিয়াই সে কানিয়া ফেলিল। গুণেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া বলিল কি হয়েছে হেম?

হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যেন কিছু ভানে না। কি হয়েছে হেম? মা বলেছিলেন, শান্তিপুরে, না কোথায়, সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে আমি যদি বিয়ে না করি, তোমরা কি জোর করে আমার হাত-পা বেঁধে বিয়ে দিতে পার?

গুণেন্দ্র এবার বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—এই কথা! বড় হয়েছে তোমার বিয়ে দিতে হবে না?

না।

না কি? বিয়ে না দিলে জাত যাবে যে।

বিয়ে না দিলে তোমাদের জাত যায় কি?

গুণেন্দ্র কহিল, আমাদের যায় না—আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু তোমাদের যখন সময়ে না বিয়ে দিলে জাত যায়, তখন দিতেই হবে।

হেম চোখ মুছিয়া বলিল, তোমরাই ঠিক। তোমরাই মানুষ, তাই মানুষকে এমন ধরে-বৈধে বধ কর না। আমি কিছুতেই এ বাড়ি ছেড়ে যাব না—তা তোমরা কেন যত মতলবই কর না!

গুণেন্দ্র তাহাকে শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিন্দকণ্ঠে কহিল, সেও খুব বড় বাড়ি। তিনি দেখতে শুনতে ভাল, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বড়লোক, সেখানে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

হেম কিছুমাত্র শাস্ত না হইয়া সবেগে মুখের উপর হইতে চুল সরাইয়া দিয়া কহিল, সে হবে না—কিছুতেই হবে না, তোমাকে আমি বলছি। আমি তোমাদের ভার-বোঝা হয়ে থাকি, আমাকে যেতে দিতে হবে না। আমি উপোস করে আমার পড়বার ঘরে পড়ে থাকব—আমি কিছু চাইব না।

গুণেন্দ্র হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, সেখানেও তোমার পড়বার ঘর পাবে। না পাও, তোমার এই ঘর আমি সেখানে তুলে দিয়ে আসব।

হেম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাদিয়া বলিল, তোমাকে কিছু করতে হবে না গুণীদা, কিছু না। এই অস্থায় মাসে? এই এক মাস পরে? তোমার দুটি পায়ে পড়ি গুণীদা, তুমি সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও।

অত্যাঃ কান্না দেখিয়া গুণেন্দ্রের নিজের চোখও ভিজিয়া উঠিয়াছিল। সে কোন মতে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, সে কি হয় ভাই? সে হয় না। কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে।

ছাই কথাবার্তা! ছাই পাকা কথা! তুমি সম্বন্ধ করেছে, তুমি ইচ্ছে করলেই ভেঙ্গে দিতে পার। আমি হাতজোড় করে বলছি গুণীদা, আমার এই কথাটি রাখো।

সুলোচনা সন্দ্বিধ-চিন্তে পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, ঘরে ঢুকিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, এ-সমস্ত তোর কি হচ্ছে হেম? এ-সব কি পাগলের মত বকচিস? সম্বন্ধ কি কখনো ভাঙ্গা যায়, না, পাকাকথার নড়চড় করা যায়? আর ভাঙ্গবই বা কেন? প্রোব ভাগ্য ভাল যে, এমন ভাই পেয়েছিস। এমন সম্বন্ধ জুটেছে—তুই বলিস কিনা, ভেঙ্গে দিতে? বাঙালীর মেয়ে স্বামিনীর মত আইবুড় খুবড়ো হয়ে থাকবি? যা নীচে যা।

হেম চলিয়া গেল, সুলোচনা গুণেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এইসব দিনবারে এই পড়াব ফল চব্বিশ ঘণ্টা নভেল, নাটক নিয়ে থাকলেই এই সমস্ত দুর্ভাগ্য হয়। অস্থায় মাসে এমন করে প্রোক ভেঙ্গে বিদায় করতেই হবে।

গুণেন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুলোচনা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দ্বারে দ্বারে নাড়িয়া গেলেন।

দিন-দুই পরে আদালত হইতে ফিরিয়া কি-একটা বইয়ের জন্য গুণেন্দ্র পড়িবার ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, ভিতর হইতে হেম বলিয়া উঠিল, এসো না গুণীদা, আমি খাচ্ছি।

গুণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খেলেই বা। আমি ঘরে ঢুকলেই কি খাওয়া নষ্ট হবে?

হেম কহিল, সমস্ত ঘরময় কাপেট পাতা রয়েছে যে।

গুণী বলিল, তোমার দাসী মানদা ঢুকলে জাত যায় না, আমি কি তার চেয়ে ছোট?

হেম অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা এসো, আমার খাওয়া হয়েছে। বলিয়া খাবারের খালিটা টেবিলের ওধারে সরাইয়া দিল।

না না, তুমি খাও, তুমি খাও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি। বলিয়া গুণী তাড়াতাড়ি চালিয়া গেল। তাহার বুকের ভিতরটা যেন জ্বালা করিতে লাগিল।

পরদিন বেলা দশটাব সময় গুণী ভাত খাইয়া উঠিবামাত্রই হেম কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই পাতা আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিল, বামুনঠাকুর, আমাকে এই পাত্রে ভাত দাও।

বামুনঠাকুর আশ্চর্য হইয়া বলিল, ওতে যে বাপু গেয়ে গেলেন!

হেম বলিল, হাঁ, হাঁ, জানি, তুমি দাও না।

পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইয়া সুলোচনা নিকটে আসিয়া বলিলেন, ও কি করচিস হেম! শুভে গুণীর এঁটো পাত? যা, কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আয়।

হেম উচ্ছিন্নবশেষ হইতে একগ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুর, ভাত দাও। গুণীদার এঁটো পাত্রে বসে খাবার যোগ্যতা সংসারের ক'জনের ভাগ্যে আছে? এ পাত্রে যেতে পাওয়া ভাগ্য।

সুলোচনা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, বামুনঠাকুর আরও ভাত তরকারি আনিয়া খালের উপর দিয়া গেল।

শুনী বারান্দার ওধারে বসিয়া মুখ ধুইতেছিল, সমস্ত শুনিতে পাইল। সন্ধ্যার পর সে হেমকে বলিল, আজ হেমের যে জাত গেল।

হেম নুতন বই লইয়া মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, তোমাকে কে বললে? যেই বলুক, জাত গেছে ত?

হেম মুখ তুলিয়া বলিল, না। তোমার পাতে বসে খেলে কার জাত যায় না—যারা জাত তৈরি করেছে—তাদেরও না।

শুনী অদূরে আর একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, তা হোক, কিন্তু কাকটা ভাল হয়নি। যাব যা জাত, তই তার মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া, মাকে দুঃখ দেওয়া হয় যে।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ যেন রাগ করিয়া বলিল, এ যেন তোমার বাড়ি নয়, তোমার জগিয়া নয়, তুমি যেন সকলের নীচে, সকলের ছোট। এ যদি বা তোমার সম্মত হয়, আমার হয় না। তোমার পাতে বসে খেলে মা দুঃখ পান, না খেলে মার চেয়ে যিনি বড়, তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়। আচ্ছা, তুমি এখন যাও—আমি বকতে পারিনে, পড়ি। বলিয়া সে খোলা বইয়ের পাতার উপর তৎক্ষণাৎ কুঁকিয়া পড়িল।

গুণেন্দ্র স্বানিকঙ্কণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। তাহার দুই চেয়ারের উপর হইতে একটা কালো পর্দা হঠাৎ যেন অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল।

চার

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে নবদ্বীপে এক বড়লোকের ঘরে হেমের বিবাহ হইয়া গেল। সে দূর হইতে শুভানুকে প্রণাম করিয়া স্বামীঘর ঘর করিতে চলিয়া গেল। সেখানে স্বস্তর, স্বস্ত্র, জা, নন্দ, কেহই ছিল না। স্বামীঘর বৃদ্ধা পিতামহী এবং স্বামীঘর অবিবাহিত ছোট ভাই—সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে

কিশোরীদাসবুর বয়স চব্বিশের কাছাকাছি। তিনি বিপত্নীক হইয়া অবধি একটি ডাগর মেয়ে সৃষ্টিতেছিলেন, তাই হেমকে না দেখিয়াই তাঁহার পছন্দ হইয়া গেল। বিবাহের পর তিনি সুলোচনাকেও এ বাড়িতে আনিবার জন্য পোড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুলোচনা সম্মত হইয়া মেয়ের কাছে পত্র লিখিলেন। তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া পূণ্যসঙ্কল্প করেন, এই ইচ্ছা।

হেম ভাববে লিখিল, তুমি যে বাড়িতে আছ মা, সে বাড়ির হাওয়া লাগে না সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। ওখানে থেকেও যদি তোমার পূণ্যসঙ্কল্প না হয়, বৈকুণ্ঠে গলেও হবে না। ওকে ছেড়ে যদি তুমি এস, আমি নিজে গিয়ে তাঁর কাছে থাকব।

মেয়েকে তিনি চিনিতেন, তাই যাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার কোথাকার অভ্যাস নবদ্বীপের আলেপালে দিবাভাে ঘুমিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এরনি করিয়া আবেশে ছয় মাস কাটিয়া গেল। একদিন তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কি একটা উৎসবের উপলক্ষ করিয়া, নন্দাকে সঙ্গে করিয়া, স্তিমাতে চড়িয়া বসিলেন। সেখানে গিয়া তিনি মেয়েকে বোঝা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, কেউ নাই মা এখানে, বোধ করি, তোর যত্ন হয় না। মেয়ে হী না একটা ভাববও দিদি না।

উৎসব শেষ হইয়া গেল, তবু তাঁহার ফিরিবার গা নাই দেখিয়া একদিন হেম বলিল, আর কতদিন জামাইয়ের বাড়ি থাকবে মা? লোকে নিন্দে করবে যে।

সুলোচনা ব্যথিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে ত্যাগ ত পারলেই বাঁচিস! এ তবু ত আপনার মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি, সেইখানেই কেন নিজের বাড়িতে ফিরে যাব, শুনি?

হেম কিছুক্ষণ অবাক হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার শেষ নেই মা, এ আমাদের মেয়েমানুষের স্বভাব। আমরা আপনার পর একদিনেই ভুলে যাই।

তিন কাটিতে লাগিল, আবার দুর্গাপূজা ঘুমিয়া আসিল। শুনী বড় ঘটা করিয়া পূজার তত্ব

পাঠাইয়াছিল। সুলোচনা হেমকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, গুণী আমার ভ্রাতা বটে, কিন্তু এ-সব জানে।

মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাড়ায় বিতরণ করিয়া, কাপড়-চোপড় সকলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি ঘরে নেই, তাই ছেলে আমার, বোনকে তত্ত্ব পাঠিয়েছে; এবং পূজা দেখিয়াই তিনি ঘরে ফিরিবেন, একথাও সকলের কাছে প্রচার করিয়া দিলেন। তাহার যাওয়া সম্বন্ধে হেম সেদিন হইতে আর কোন কথা বলিত না, আজও চুপ করিয়া রহিল। সুলোচনা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে বলিলেন, যদি কখন ডগবান দিন দেন তখন বুঝি মা, সন্তানকে ছেড়ে যেতে মায়ের প্রাণ কি করে!

কিন্তু পূজা শেষ না হইতেই সুলোচনাকে শস্ত করিয়া ম্যালেরিয়ায় ধরিল। মাস-খানেক জ্বরভোগের পরে, একদিন হেম বলিল, আর কেন মা, বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করতে হয়, যদি বাঁচতে চাও গুণীদাকে ডাক দাও। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, তার পর সেই জল ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল, সে উর্ধ্বমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

মা বলিলেন, তাই কর হেম, তাকে চিঠি লিখে দে।

হেম বাড়ির সরকারকে দিয়া মাকে লইয়া যাইবার জন্য গুণেশ্বকে চিঠি লিখাইয়া দিল।

দুইদিন পরে মানদা ও দারোয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল। হেম মানদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গুণীদা এলো না কেন রে?

মানদা বলিল, তাঁরও অসুখ। প্রায় দু হপ্তা হয়ে গেল, সর্দি-কাশি, কোনদিন বা একটু জ্বর, না হলে তিনিই আসতেন। হেম আশা করিয়াছিল, গুণীদাদা আসিবে।

সুলোচনা চলিয়া গেলেন। গুণী ঔষধ-পথোর ব্যবস্থা করিয়া দাস-দাসী সঙ্গে দিয়া ঠাঁজকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমে পাঠাইয়া দিল। যাইবার সময় সুলোচনা বলিলেন, গুণী, তুমিও আমার সঙ্গে আয় বাবা, তোরা দেহটাও ভাল নেই—চল্ দু'জনেই যাই। গুণী স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার কলিকাতার কাজ ছিল, সে রহিয়া গেল।

পশ্চিমে গিয়া সুলোচনা সারিতে লাগিলেন। তিনি নবদ্বীপে ও কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া সংবাদ জানাইলেন যে, শরীর ভাল থাকিলে মাঝে মাঝে দেশে ফিরিবেন।

গত বৎসর ছাব্বিশে অগ্রহায়ণে হেমের বিবাহ হইয়াছিল, আজ আবার ছাব্বিশে অগ্রহায়ণে ফিরিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ এই কথাটা স্মরণ করিয়া গুণী কলকালের জন্য বই হইতে মুখ তুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল, এমন সময়ে পিছনে দ্বারের বাহিরে দাঁড়িয়া নূতন দাবোয়ান ডাকিল, মহারাজ, একটো জরুরী তার আয়া।

গুণী মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দারোয়ান বুদ্ধি করিয়া পিওনকে সঙ্গে আনিয়াছে। সে খামখান হাতে দিয়া দস্তখত লইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

গুণী তার পড়িয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। হেম খবর দিতেছে, সে বওনা হইয়া পড়িয়াছে, হুগলীতে নামিয়া ট্রেনে করিয়া আসিবে, সুতরাং বেলা তিন-চারটের সময় হাওড়া স্টেশনে যেন গাড়ি পাঠান হয়। সে কি জন্য আসিতেছে, সঙ্গে কে কে আছে, কিশোরীবাবু আছেন কিংবা সে একলাই আসিতেছে, কিছুই বোঝা গেল না। বাড়িতে স্বীলোক কেহ ছিল না; মানদা সুলোচনার সতিত পশ্চিমে গিয়াছিল, তাই গুণী কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। পুরাতন কোচম্যান গাড়ি লইয়া গেল এবং সম্ভাব্য কিছু পূর্বে হেমকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে দাসী চাকর এবং কিছু জিনিসপত্র ছিল। গুণী হেমকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, এ কি-রকম পাগলের মত বেশ করে আসা হল গুণি?

হেম ভূমিৎ হইয়া প্রশ্ন করিয়া বলিল, ওপরে চল, বলচি। উপরে বসিবার ঘরে গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, মা ত মাঘ মাসের আগে ফিরিবেন না?

গুণী বলিল, না, সেই রকমই ত লিখেছেন।

তা হলে তাঁকে এর মধ্যে আর জানিয়ে কাজ নেই। কিন্তু, আশ্চর্য দেখ গুণীদা, আজকের দিনেই বিদেশ হয়েছিলাম, আজকের দিনেই ফিরে এলাম।

গুণী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ফিরে এলাম কি?

হেম সহজভাবে বলিল, ফিরে এলাম বৈ কি! আর সেখানে কি করে থাকব? কেন, তুমি কি আমার থানকাপড় দেখেও কিছু বুঝতে পাচ্ছ না? পরণ্ড কাজকর্ম শেষ হয়ে গেল, আজ চলে এলাম।

গুণী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, একটা খবরও ত দাওনি—কি হয়েছিল কিশোরীবাবুর?

হেম বলিল, ও-বুধবারের সন্ধ্যাবেলাতেই কলারার লক্ষণ টের পাওয়া যায়। ওদেশে যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করা গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পরদিন বেলা দশটার সময় মারা গেলেন।

গুণী কিছুক্ষণ পরে অলক্ষ্যে আর্দ্রচক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু মা গুনলে একেবারে মারা যাবেন। যতদিন তিনি জানতে না পারেন, ততদিনই ভাল।

হেম করিল, কি করবে গুণীদা? তোমরা ভগবানের বিকল্পে ষড়যন্ত্র করছিলে, সে কথা কেবল আমিই মনে মনে টেব পেয়েছিলাম। এখন আমার কথা তোমার গ্রাহ্য করলে না—এখন কান্না, আর হায় হায়!—খিদে পেয়েছে, কি খাই বল ত? কিন্তু ক্রান্ত হয়ে পড়েছি। আর ষড়যন্ত্র পারব না—কিছু ফলমূল খেয়েই আঙ্ককব দিন কাটাই।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, ও বেলাতেও খাওয়া হয়নি?

না। সকালে স্টিমার ধবং হইয়াছিল।

মাঘের শেষে সুলোচনা চিরিয়া আসিলেন, কিন্তু বোগমুক্ত হইয়া আসিলেন না। তার পর ঘরে আসিয়া এই দশা দেখিয়া সেইদিনই আবার গিয়া গৃহস্থ করিলেন। এ শেষে তাঁহার বৃকে শেলের মত দাঙিল। চিকিৎসা ও শ্রদ্ধাব্যয় অল্প বহিল না, কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হইতে চাহিল না। একদিন শীতের হাও-পা ফলিয়া উঠিল দেখিয়া গুণী অতিশয় চিন্তিত হইল। সেদিন তিনিও গুণীকে নিভৃত পাইয়া বলিলেন, আর কি হবে বাবা, চেষ্টা করে? আমাকে একটা শাস্তিতে যেতে দে।

গুণী চোখের ঝল চাপিয়া বলিল, এমন কি হয়েছে মা, যে, একেবারেই তুমি নিরাশ হয়ে পড়েচ? সুলোচনা বলিলেন, আচ্ছা, তুমি বলে দে, আমার আশা করবাব আর কি বাকী আছে?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া বহিল।

সুলোচনা বলিলেন, গুণী, আমি অত নির্বোধ নই বাবা, আমি জেনেগুনৈ যে পাপ করেছে, সেই পাপ আমাকে যেন ভিতর থেকে পলে পলে ভষ্ম করে আনন্দ। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, একটা কথা আমাকে সত্য করে বল গুণী। আমি বেশ জানি, একদিন তুমি আমার হেমকে স্নেহ করতিস, আর একবার চেষ্টা করলে কি তাকে আবার স্নেহ করতে পারিস নে?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বলিল, তাকে ত চিরকালই স্নেহ করি মা! সেদিন করেছি, আজও করি। তার জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি বেঁচে থাকতে সে কোন দূর পাবে না।

সুলোচনা বলিলেন, তা জানি। আচ্ছা, এই আমার শেষ আশীর্বাদ তোর উপর রইল, যদি কোনদিন আবশ্যক হয়, এ-কথা তাকে বলিস। আর একটা কথা বাবা—এখানে থাকতে হেম আমাকে চিঠি লিখেছিল,—মা, যেখানে তুমি আছ, সে বাড়ির হাওয়া লাগলে সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। ও-বাড়িতে থেকেও যদি তোমাদের পূণ্যসঙ্কল্য না হয়, বৈকুণ্ঠও হবে না। আর বাবা, আমার মরণ-কালে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর, যেন পাণ্ডমুক্ত হই। আমার অপরাধ যে কত বড় গুণী, সে আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না।

গুণী নিঃশব্দে কঁাদিতে লাগিল। সে যথার্থই সুলোচনাকে মাঘের মত ভালবাসিত।

সুলোচনা বলিলেন, হেমকে আমি কোন কথাই বলে যেতে পারি না। শব মুখের দিকে তাকালেই আমার বৃকের ভিতর ছব করে জ্বলতে থাকে। লোকে সংমার গল্প করে, আমি সংমার চেয়েও তার শত্রু।

পরদিন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইল। তাঁহার বাঁচিবার আশা সকলেই তাগ করিল। তাঁহার হাসকন্ঠের সূত্রপাতেই তিনি হেমকে কাছে ডাকাইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুষন করিয়াই কঁাদিয়া ফেলিলেন। হেম, তবে বিদায় হ'লাম মা!

হেম মাঘের বৃকের উপর পড়িয়া ফুপাইয়া কঁাদিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে তিনি ইশারায় উঠিতে

বলিয়া বলিলেন, কাদিস নে মা। সুখে-দুঃখে পনেরো বছর তোকে বুক করে কাটিয়েছি ; আজ সময় হয়েছে, তাই তোর বাপের কাছেই যাচ্ছি। আজ আমার সুখের দিন, আজ আমি কাদিতাম না হেম, আজ হেসে আমোদ করে যেতাম, যদি না তোকে এমন করে নষ্ট করতাম। আমি লজ্জায়, দুঃখে তোর মুখের পানে যে চাইতেই পারছি না মা!

হেম কাদিতে কাদিতে বলিল, কেন অমন করে তুমি বলছ মা? আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েছে, এতে তোমার হাত কি?

সুলোচনা বাধা দিয়া বলিলেন, আমার হাত ছিল, সে হাত আমি নিজের হাতেই কেটেছি। তুই বলচিস মন্দ কপাল, কিন্তু তোর কপালের মত ভাল কপাল এ রাজ্যে একটি মেয়েরও ছিল না মা, আমি যদি না মাঝে পড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিতাম। আমি যে সমস্তই জানি ; তাতেই ত এ দুঃখ রাখবার আর জায়গা খুঁজে পেলাম না। অজানা পাপের উপায় আছে, কিন্তু জেনে শুনে পাপ করার কোথায় মোচন পাব মা?

তাহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া বড় বড় অশ্রু গড়িয়া পড়িতে লাগিল। হেম আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল, কিছুক্ষণ পরে সুলোচনা পুনরায় বলিলেন, মায়ের উপর রাগ রাখিস নে মা! পাছে এ কথা বললে তোর অকল্যাণ করা হয়, তাই বলতে পারলাম না ; না হলে আজ মরণকালে, হাতজোড় করে বলতাম—

হেম তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া কাদিয়া উঠিয়া বলিল, কি কবলে তুমি সুখী হও - আমাকে বল, আমি তাই করব। আমি ত কোনদিন তোমার অবস্থা হইনি মা।

সুলোচনা অনেক কষ্টে তাহার অবশ হাতখানি হেমের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, সেইজন্যই ত পুড়ে মরিচি হেম। আমার যা বলবার, তা আমি শুণীকে বলেছি, দরকার হলে সে ই তোকে বলবে। তুই কিন্তু আজ এই কাপড়খানা তোর ছেড়ে আয়। যে কাপড় পরে এক বছর আগে এই ঘরে এই খাটের ওপর এসে বসতিস, যে-সব গয়না পরে আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল, আমায় শুণীর দেওয়া সেই কাপড়, সেই গয়না পরে আমার সামনে আয়। একদণ্ডের জন্যেও আমার নিজের পাপ থেকে আমায় মুক্তি দে।

হেম নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া তাহার আদেশ পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলে। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে যেন ঈষৎ হর্ষের আভাস খেলা করিয়া গেল। তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে বলিলেন, মা, চৌদ্দশ বছর বয়সে আমার যে জ্ঞান কোনদিন হয়নি, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি এক নির্মাণে হয়েছিল, যেদিন পশ্চিম থেকে ফিরে এসে তোকে প্রথমে দেখি। লোকে বলে, মাথায় বাজ পড়া ; কি জানি মা, কি-কেন সে, কিন্তু সেদিন আমার যে কথা বেজেছিল, তার অর্ধেক ব্যথাও যদি বজ্রাঘাতে পাড়ে, ত, সে ব্যথা আমার পরম শত্রুর জন্যেও কামনা করিনে। আমার দিবা রহিল হেম, এ বেশ আমার খুলে ফেলেন নে। কি জানি, কোন্ পাষণ্ড বিধবার সাজ তৈরি করে গিয়েছিল, আর আমি অতিসম্পন্ন্যস্ত করি, তাহলে যেন আমার মত আঘাত বুক পেতে সহিতে হয়। না না হেম, বাধা দিসনে, মা, কাল আমি আর বলতে আসব না। আজ তোকে বলি, যেন তোর বাপের কাছে গিয়ে তোকে দেখে সুখী হতে পারি।

তাহার আবার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। হেম আঁচল দিয়া ধীরে ধীরে চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া হেম মাথার উপরে কাপড় তুলিয়া দিতেই শুণী সাহেব ডাক্তার লইয়া ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলোচনা দেখিতে পাইয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, আবার ডাক্তার কেন শুণী? এখান থেকে ভিজিট দিয়ে ওকে বিদায় করে দিয়ে তুই আমার কাছে এসে একবার বোস।

শুণী বলিল মা, অন্ততঃ একবার তোমার হাতটা—

না শুণী, না। আর আমাকে দক্ষ করিস নে, যেতে দে ওকে।

সাহেব-ডাক্তার অত বুঝিল না। সে ঘরে ঢুকিয়া নিকটে চৌকি টপকিয়া লইয়া পার্শ্বমুখী হইয়া বসিতে লাগিল। সুলোচনা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ওর বুদ্ধি দেখ! ও এঁটে দিয়ে আজ আমার জপ দেখবে! যা শুণী নন্দাকে পাঠিয়ে দে, ভাল কবিরাজ ডেকে আনুক, কখন শেষ হবে আমাকে কলিবার যাক। বলে দে যেন ওষুধপত্র না আনে।

সুলোচনা গ্যাসের আলো সহ্য করিতে পারিতেন না ; তাই এ-ঘরে বরাবর মোমবাতি জ্বলিত। সন্ধ্যা হইলে দাসী সেজ জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গেল, সুলোচনা বলিলেন, আভকের রাত্রিই বোধ করি শেষরাত্রি। তাই আজ যদি না সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে পারি, আজ যদি না লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে মুখের সঙ্গে বুকের সঙ্গে এক করে দেখতে পারি, তবে ভগবান যেন আমাকে আরও শাস্তি দেন। কিন্তু তিনি নির্দোষীকে যেন আর দুঃখ না দেন! আমার পাপের ফল যেন আমার ওপর দিয়েই শেষ হয়।

তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া হঠাৎ দাঁর্বন্ধাস ফেলিয়া 'উঃ' করিয়া উঠিলেন, হেম ব্যস্ত হইয়া মুখের উপর কৃত্রিয় পাড়িয়া বলিল, কি মা?

সুলোচনা আস্তে আস্তে বলিলেন, কিছুই নয় মা। শুধু কি তুই একা হেম, আমার গুলীর যে মুখ আমি চোখে দেখেছি— পাষাণেবও বোধ করি তাতে দয়া হ'ত, কিন্তু আমার হয়নি, অথচ সে জানানোর কি না কবচে! থাক, ও-সব কথা আর তুলব না। কোনদিন তা'ব অবাধা হ'সনে মা, কোনদিন তাকে দুঃখ দিসনে। এ কথাটা কোনদিন তুলিস নে মা, ও-সব মানুষের বুকের বাথ' স্বয়ং ভগবানের বুকে গিয়া বাজে। তার যা দর্ম, তোব দর্ম ও তাঁই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁব আদেশ, যার আদেশে তোরা একদিনের দেখাতেই চিবকালের মত এক হয়ে গিয়েছিলি। ছি মা, লজ্জা কি! যিনি অস্ত্রধারী, যিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে বসে কথা কন, তাকে অস্ত্রীকার ক'রো না—তাকে অমান্য ক'রো না। তাঁব ক্রম আমার ভিতরেও কথা কয়েছিল, কিন্তু দর্প করে তা শুনিনি, অগ্রাহ্য করে অপমান করেছিলুম। এই তার ফল পাচ্ছি। কিন্তু তোদের ওপর আমার এই শেষ অনুরোধ বইল মা, আমার অনায়, আমার পাপকে চিপকাল ইঁকার করে আমার দুর্ভৃতিকে যেন অক্ষয় করে বাবিস নে। মনদা অসিয়া বলিল, মা, কাঁববাড় এসেছেন।

সুলোচনা আস্তে আস্তে বলিলেন, তাঁকে আসতে বল। হেম, তুই একবার বাইরে য' মা।

পাঁচ

মায়েব মৃত্যুর পব হইতেই হেমেব আচার-বাবহাবের অশ্লষ্য পরিবর্তন দেখা দিল। কাণ্ডে থাকিয়াও সে যেন প্রতিদিন নিজেকে কোন সুদূর অন্তরালেব দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। শুশ্রূষা চিরদিন সাংস্য় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতিব লোক। এ পরিবর্তন সে প্রথমেই টের পাইল, কিন্তু নিঃশব্দে সহ্য করিয়া রাইল। অকস্মাৎ দর্মেব মমো হেম কি রস পাইল, সে-ই জানে, সে নটক, নভেল, কাঁবতাব ব'ব তুলিয়া বাখিয়া বামাযণ, মহাভারত, গীতা ও উপনিষদের বাংলা অনুবাদদের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণকালে নিমজ্জিত কবিয়া ফেলিল। মায়েব শপথ মনে কবিয়া সে থান পড় আব পরিল না বটে এবং কানোব দুটি ইঁকোব দুল, চুড়ি এবং হাবও জ্বলিয়া বাখিল না সত্তা, কিন্তু বেধবোব সমস্ত কথোবতা অতোত্ত নিষ্ঠাব সাহিত্য সে পালন করিয়া চলিতে লাগিল। সমস্ত রকমের বাখলা বর্জন কবিয়া সে একেব'ল বাধিয়া বাইত। এইটুকু সময় এবং গৃহিণীব প্রয়োজনীয় কম সমাধা করিতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু ছাড়া সমস্ত সময়টা সে দমচচায অতিবাহিত করিতে লাগিল। যদি বা কোন সময়ে সে গুলীর কাণ্ডে আসিয়া বসিত, কিন্তু পরক্ষণেই কোন একটা কাজেব নাম কবিয়া অনাত্র চলিয়া যাইত। সে যে তা'ব সমস্তকে ভয় কাবতে শুক কাঁববাড় এ'ব আকস্মিক ব্রহ্ম পল্লভ্যনৈব দ্বাস গ্রাহ্য এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যে, বক্ষণের নিমিত্ত তুলী শূন্য দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া শুক হইয়া বসিয়া থাকিত। যত দিন কাটিতে লাগিল, তাহাব আচার-বচাবের ছোটখাট কাণ্ড এবং শব্দ সুদৃঢ় আকার ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়িিতে লাগিল। যেমন জেলের কর্তৃপক্ষ জেলের মধ্যে বেটনের পরে বেটন তুলিয়া তাহার বড় কয়েদীগুলিব পরিসর ছেটি করিয়া আনতে ব'ব, হেম যেন ঠিক তেমনি শব্দ হইয়া তাহার লম্বাঘাসী কোন এক গভীর দুর্ভুক্তকানোব চলাফেলাব পথ অগ্রসর সঙ্গী করিয়া আনিতে লাগিল।

একদিন সে হঠাৎ আসিয়া বলিল, গুলীদা, মস্তুর নেব?

গুলী মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি মস্ত, শুকমস্ত?

হাঁ।

গুণী হাসিয়া বলিল, ভয় নেই ভাই, তোমাকে আশ্বর্যকার জনো নিত্য নূতন কবচ আঁটিতে হবে না।

হেম বোধ করি এ কথা বুঝিতে পারিল না : কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, গুরু-মন্ত্রের দরকার নেই।

গুণী বলিল, আছে, কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার হয়নি। তা ছাড়া, কে তোমাদের গুরু, সে ত আমি জানিনে।

হেম বলিল, সে গুরুতে আমার কাজ নেই, আমি তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নেব।

গুণী আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমার কাছ থেকে দীক্ষা নেবে? আমি দীক্ষার কি জানি হেম? তা ছাড়া, তোমরা ইন্দু, আমি ব্রাহ্ম।

হেম বলিল, আমি সে জানিনে। মা বলেছিলেন, তোমর যা ধর্ম আমারও তাই ধর্ম। আচ্ছা গুণীদা, এ কথার অর্থ কি?

এ কথার কি অর্থ গুণী তাহা জানিত। কিন্তু তাহা না বলিয়া সহজভাবে সে বলিল, বোধ করি তিনি বলছিলেন, সব ধর্মই এক। হেম বলিল, কিন্তু সব ধর্ম ত এক নয়!

গুণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, হেম, এ-সব আলোচনা আমি কখনো পরের সঙ্গে করিনে।

হেম বলিল, কিন্তু আমি ত তোমার পর নই।

গুণী প্রত্যুত্তরে বলিয়া উঠিল, না, তুমি আমার পরমাত্মীয়, কিন্তু তোমার সঙ্গেও আমি এ-সমস্ত চর্চা করব না।

হেম হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি বলবে না, তবে আর আমি কি করে শুনব?

গুণী তাহার মুখ দেখিয়া অনূতপু হইয়া বলিল, তুমি কি শুনতে চাও?

হেম বলিল, গুণীদা, যেদিন আমি জ্ঞোর করে তোমার পাতে বসে খেয়েছিলুম, তুমি সেদিন নিবেদন করে বলেছিলে, কাজটা ভাল করনি, যার যা জ্ঞাত, তার তাই মেনে চলা উচিত, আজ বলচ, সব ধর্মই এক,—কোনটা সত্য?

গুণী কহিল, সেদিন আমি সাধারণভাবেই বলেছিলাম। তবুও দুটো কথাই সত্য। জ্ঞাত আর ধর্ম এক জিনিস নয়। একটা দেশাচার, লোকাচার, শুদ্ধমাত্র কালের বস্তু। কিন্তু অপরটা ইহকাল, পরকাল, দুই কালেরই বস্তু। কিন্তু তাই বলে ধর্ম মেনে চললেই যে জ্ঞাত মেনে চলা হয়, তাও না, আবাস জ্ঞাত মেনে চললেই যে ধর্ম মানা হয়, তাও নয়। জ্ঞাত না মেনে চলায় দুঃখ আছে, সবাই সে দুঃখ সইতে পারে না, পারার প্রয়োজনও সব সময়ে হয় না—তাই তোমাকে আমি সেদিন ও-কথা বলেছিলাম। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, হেম, এ দুটো আলাদা, অথচ মিশে আছে। মিশে আছে বলেই দেশভেদের সঙ্গে ধর্মেরও নানা ভেদ হয়ে গেছে। ধর্মের যেটা গোড়ার কথা, সেটা পরকালের কথা, মরণই শেষ নয়, এই কথা। এই বনিয়াদের ওপর তুমি হিন্দু, তুমিও দাঁড়িয়ে আছ, আমি ব্রাহ্ম, আমিও দাঁড়িয়ে আছি। ঈশ্বরকেও সকল ধর্মে হয়ত মানে না, কিন্তু মরণ হলেই যে নিষ্কৃতি পাবার জো নেই, এ কথাটা নিগ্রোধের দেশ থেকে ল্যাপল্যান্ডের দেশ পর্যন্ত সকল দেশের ধর্মই স্বীকার করে। মৃত্যুর পরের ভাবনা তাই তুমিও ভাব, আমিও ভাবি। হতে পারে, আলাদা রকম করে ভাবি, কিন্তু ভাবনার আসল বস্তুটা যে এক, এই কথাটাই মা হয়ত মরণকালে তোমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন।

হেম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, শুধু ভাবলেই ত হয় না, তার উপায় করাও ত চাই।

গুণী বলিল, চাই বৈ কি ভাই! এই উপায় বার করা নিয়েই এত ঈশ্বর, এত গণ্ডগোল। তোমার উপায়টা আমি পছন্দ করিনে, আমারটা তুমি পছন্দ কর না। এটা অনুমানের জিনিস, প্রমাণের জিনিস নয় বলেই তর্ক শেষ হয় না, ঝগড়াও থাকে না। কিন্তু তোমার বীথবার সময় হ'ল যে, হেম?

হেম নিঃশব্দে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। গুণী শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যের দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গুণীদা! গুণী চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি হেম?

হেম বলিল, আচ্ছা, আমি যে-পথে চলছি, সে কি ঠিক পথ?

কি করে বলব ভাই? সে কথা তুমিই জান। যদি আনন্দ পাও, শান্তি পাও, নিশ্চয়ই তা হ'ল ঠিক

পথ।

কিন্তু আমি ত কিছুই পাইনে।

তাহার ব্যথিত কণ্ঠস্বরে শুণীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। সে বহুক্রমে তাহা রোধ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কর কেন?

হেম বলিল, কি জানি শুণীদা, কিসে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যায়, যেন জোর করে করায়, আমি থামতে পারিনে।

শুণী কি বলিবে, হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না, তার পর বলিল, হয়ত নতুন বলেই প্রথমে সুখ পাচ্ছ না, শেষে নিশ্চয় পাবে।

হেম উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাব?

নিশ্চয় পাবে। শর্ম যদি সুখ-শান্তি না পাও, তবে আর কিসে পাবে? আমি আশীর্বাদ করি, একদিন নিশ্চয় তুমি সুখী হবে।

দিন-দুই পরে জ্যোৎস্নার আলোয় খোলা ছাদের উপর পাটি পাতিয়া শুণী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। হেম আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল—তোমার পায়ের হাত বুলিয়ে দেব শুণীদা।

শুণী 'দাও', বলিয়া চোখ বুজিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে দীপ্ত হেমের মুখের দিকে সে চাহিতে সাহস করিল না। হেম নিঃশব্দে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ বলিল, শুণীদা, বিধবার বিয়ে হওয়া কি ভাল?

শুণী চোখ বুজিয়াই বলিল, তুমি কি বল?

হেম বলিল, আমি ত বলতে আসিনি, শুনতে এসেছি।

শুণী বলিল, পায়ের হাত বুলানটা বুঝি তার ভূমিকা?

হেম সহজভাবে বলিল, না তা নয়। তোমার পায়ের কাছে এসলেই আমার হাত দেবার লোভ হয়।

শুণী চুপ করিয়া রহিল। নিজের জিভকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

হেম বলিল, কৈ, বললে না?

শুণী তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

হেম পায়ের তলায় একটি ক্ষুদ্র চিমটি কাটিয়া বলিল, বল শিগগির।

শুণী বলিল, বলব, কিন্তু আগে আমার কণ্ঠের ভাবাব দাও।

কি? তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসতে কি?

একটু না। সে কথা আমার কোনদিন মনেও হয়নি। সেখানকার একটি পরসার জিনিস সঙ্গে আনিনি, তাদের দেওয়া একখানি কাপড় পর্যন্ত পরে আসিনি। পেটে যা যাচ্ছে, তার চতুর্গুণ দিয়ে এসেছি—এমনি তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

শুণী বলিল, কিন্তু যারা সতী-লক্ষ্মী তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হলে তাঁর মুখ মনে করে আর বিয়ে করে না। তোমার মার মত 'ঠারা মরণকালে স্বামীর কাছে যাচ্ছি' মনে করেন।

হেম বলিল, আমাকে তোমরা জোর করে ধরে-বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমিও সতী-লক্ষ্মী, তাই মরণ কালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে করব। আচ্ছা শুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব?

তাঁহার কণ্ঠের মধ্যে গুড়? নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই, এ যেন কাহার কথা কে বলিয়া যাইতেছে। তখনকার হেমের সহিত আজিকার হেমের যেন সংঘর্ষ ঘটিয়াছে নাই। শুণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হেম বলিল, বল, তোমার কাছে যেতে পারব কি না?

শুণী বলিল, না।

না—কেন?

শুণী কহিল, আমার কর্মের ফল আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে আমি জানি না, তোমার কর্মফল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে তুমিও জান না। আমার কর্মসৌভাগ্য হয়ত পণ্ড হয়ে জন্মাবে, তুমি ৩-৪০ আবার বাবুনের মেয়ে হয়ে জন্মাবে, তখন আমাকে কি করে পাবে ভাই? কর্মফল যদি সত্য হয়,

স্বামী-স্ত্রীর চিরসম্বন্ধ কোনমতেই সত্য হতে পারে না। আমাদের এই কাল্পনিক সম্বন্ধ ত অতি তুচ্ছ! কত ভেদ, কত পার্থক্য, কত উচু-নীচু চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হয়ত কর্মেরই ফল। একে কোন ভালবাসার টানই নিরাকরণ করে দিতে পারে না। এ সংসারে কত পাশও স্বামীর সতী-সাধ্বী স্ত্রী থাকে, স্বামীটা হয়ত মরে গরু হয়ে জন্মায়—এ তোমাদেরই শাস্ত্রের কথা,—তুমি কি কামনা কর হেম, সতী-সাধ্বী স্ত্রী, তারা সারা-জীবনের সুকর্মের অশ্বে এই গরুর সঙ্গে গোয়ালে গিকয়ে বাস করে? সে হয় না। তা হলে ভাল কাজ, মন্দ কাজের অর্থ থাকে না। স্ত্রী নিজের কর্মে স্বর্গে যায়, স্বামী হয়ত জন্ম জন্ম নরক ভোগ করে—হাজার কামনা করলেও আর এক হবার উপায় থাকে না।

হেম বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কি সত্যিই আর মেলবার পথ থাকে না? শুণী বলিল, না। তার আবশ্যকও থাকে না। তার চেয়ে হেম, যে মেলা সবচেয়ে বড় মেলা, যার কাছে যেতে পারলে আর কারো কাছে যেতে ইচ্ছে হবে না, অথচ সমস্ত রকমের মিলনের ইচ্ছাই আপনা-আপনি পরিপূর্ণ, সার্থক হয়ে যাবে, তুমি সেই মিলনের কামনা কর। তোমার পথ থেকে তোমাকে কেউ যেন টেনে নিয়ে না যায়; আমি কায়মনে আশীর্বাদ করি, আমাদের দেওয়া সমস্ত দুঃখ একদিন যেন তোমার সার্থক হয়।

চাঁদের আলোয় হেম দেখিতে পাইল, শুণীর চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। সে উঠিয়া গেল, এমন অনেক দিনই এমন করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ যেন কেমন করিয়া শুণীর সমস্ত সংযম, সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ সে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার শিকড়ের সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, যেন চিরদিনের সুযোগ অকস্মাৎ চোখের সামনে দিয়া বহিয়া গেল, হাত বাড়াইয়া ধরা হইল না। হেম তাহাকে যে কত ভালবাসে, এ কথা সে নিঃসংশয়ে জানিত। আজ তাহার মুখ হইতে স্পষ্ট করিয়া শুনিয়াও সে কোনমতেই নিজের কথাটা বলিতে পারিল না। সলোচনার মৃত্যু হইতেই বলি-বলি করিয়াছে, বলিতে পারে নাই। কেবলি মনে হইয়াছে, এ যেন কোন বিষধর সর্প ঘুমাইয়া আছে, হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিলেই বুঝি ফণা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে। ঐ বরাবর যে ভয় তাহার হাত চাপিয়া রাখিয়াছে, আজিকার এমন রাগেও সেই ভয় তাহাকে হাত বাড়াইতে দিল না।

প্রত্যাহ প্রাতঃস্নান করিয়া হেম প্রণাম করিতে আসিত, পরদিন আসিবামাত্রই শুণী সমস্ত সঙ্কেত প্রাপণে অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন করিল, হেম, কাল তুমি বিধবা-বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন? হেম বলিল, একটা খবরের কাগজে পড়ছিলাম, তাই।

শুণী বলিল, তুমি কি ওটা ভাল মনে কর?

হেম সংক্ষেপে বলিল, ছিঃ! ও কি আবার একটা বিয়ে?

শুণী প্রশ্ন করিল, কেন নয়? এক হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর সব জাতের মধ্যেই ও বিধবা-বিবাহ আছে।

থাক গে, বলিয়া হেম বাহির হইয়া যাইতেছিল, শুণী ডাকিয়া বলিল, আর একটা কথা আছে, হেম।

হেম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি?

তোমার বয়স কত?

ষোল।

এই বয়স থেকে চিরকাল সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে?

হেম মৃদু হাসিয়া বলিল, আর কি করব? যেমন কপাল! যেমন তোমাদের দৃষ্টি!

শুণী ক্ষণকাল মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আর কি কোন পথ নেই, কোন উপায় নেই? কিছু না শুণীদা, কিছু না, বলিয়া হেম বাহির হইয়া গেল।

দিন দিন পরিপূর্ণ যৌবন যেমন হেমের সর্বদেহে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার ধর্ম-কর্মও যেন সে-সমস্ত ছাপাইয়া চলিতে লাগিল। শুণী সমস্তই দেখিতে পাইত, কিন্তু সাহস করিয়া কিছুই বলিতে পারিত না। হেমের মধ্যে এমন একটা বস্তু ছিল, যাহাতে সকলেই তাহাকে মনে মনে ভয় করিয়া চলিত। তাহার মাও তাহাকে ভয় করিতেন, শুণীও ভয় করিত। উহার কয়েকদিন পরে

একদিন শুণী আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় হেম আসিয়া আলমারি খুলিয়া ঢোক বই বাতির কাঁচা হাতে দিয়া বলিল, ফিরবার সময় ব্যাক থেকে পাঁচ শ টাকা সঙ্গে করে এনো।

শুণী, 'আচ্ছা' বলিয়া বইখানা পকেটে রাখিয়া দিল।

হেম কহিল, যোসো, সংসার-খরচের টাকাও কমে গেছে, আব দু'শ অর্মানি ঐ সঙ্গে এনো।

শুণী কিছু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ পাঁচ শ টাকা তবে কিসের জন্যে?

হেম বলিল, ও টাকা? আমি কাল কাশী যাব যে!

শুণী চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, কাল কাশী যাবে? এ বিষয়ে কারো মত নেওয়াও আবশ্যক মনে কব না?

হেম অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তোমার শুকুম নিয়ে তবে ও যাব।

শুণী বলিল, দিও কবেচ, কাল যাবে, আবাব কবে শুকুম নেবে শুনি? সঙ্গে কে যাবে?

হেম বলিল, মানদা, নন্দা আর দাগোয়ান যাবে। আজ বাস্তবে তোমাকে বলব মনে করেছিলুম শুণীদা, যাব কাল?

আচ্ছা, যোসো, বলিয়া শুণী আদালতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে হেম 'দুটি টাকা' চর্চাবন্ধ করিয়া 'বহিমা' শুণীর কাছে আসিয়া বলিল, কাল যাওয়া ভাল না।

কেন?

আজ দুপুরবেলা বামুনসকলের ঘর থেকে টোলগ্রাফ এসেছিল 'তাব মাহের বামুন' অর্থাৎ হি. মাসের '১৩' তারিখের ছুটি দিওঁচি, সে চলে গেছে।

বাসবে কেন?

যতদিন 'লোভ' না পাতয়া যায়, ততদিন আমিই বাসব। শুণীদা, তুমি একটি বিয়ে কর।

কেন?

কেন আবাব 'লোভ' বিয়ে করবে না? সংসার চালানব কেন? তোমাকে দেখবে ওনব কেন?

কুমি

হেম হাসিয়া বলিল, আমি বুঝি চিবকাল এই সংসার চাড়ে করে থাকব? আমাকে কাজ করতে হবে না?

আমাকে দেখাশোনা বুঝি কাজ নয়?

হেম হাসিমুখে বলিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারিনে। না, সে হবে না। তোমাদের দেশে বড় মেয়ে পাওয়া যায়। দেখে শুনে একটি বিয়ে কর, আমি তার হাতে সংসার দিয়ে কাশী যাই।

শুণী বলিল, আচ্ছা তুমিও একটি বিয়ে কর, আমিও করি।

এইমাত্র হেম হাসিতেছিল, একমুহুর্তে তাহার সমস্ত হাসি যেন উড়িয়া গেল। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, 'চ' 'ক' 'কি' 'তোমরা' শুণীদা? কোনদিন ও কথা মুখেও এনো না।

শুণী আব কথা তাহাতে পারিল না, মুখপানে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। হেম উঠিয়া গেল।

ছয়

মাস দুই কাশী থাকিয়া, শুণীর অসুখের সংবাদ পাইয়া হেম বর্তি আসিল। সে আসিয়া না পড়িলে অসুখ হ্রাসে কালিন হইয়া দাঁড়াইত। আসিয়া শুক্রবা কাঁচা কদুদা লবঙ্গ খেই তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল।

বাহিরে মুলদাশে বৃষ্টি পড়িতেছিল। শুণী শয্যা উপর বসিয়া সার্বীর ভিতর দিয়া তাহাই দৌখতেছিল। আর ভাবিতেছিল, হেমের কথা। একটি পরিবর্তন তাহার চোখে পড়িয়াছিল। হেম পূর্বে প্রতাহ নিয়মিত প্রণাম কাঁচা যাইত, এবারে সেটা আর দেখা গেল না। মানদাকে দিয়া হেমকে সে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, মানদা আসিয়া বলিল, দাঁদ ঠাককন জপ হচ্ছেন। ঘণ্টা দুই পরে হেম ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমাকে ডাকছিলে?

গুণী বলিল, হাঁ, একটু ব'সো।

হেম কহিল, কিন্তু এখনো যে আমার জপ সারা হয়নি।

দু' ঘণ্টাতেও জপ সারা হয়নি?

দু' ঘণ্টাতে কি হবে? গুরু বলেছেন, অদ্ভুতঃ দু'হাজার জপ করা চাই।

গুরু বলেছেন? গুরু কে?

হেম বলিল, আমি যে এবার কাশীতে মন্ত্র নিয়েছি। আমার গুরু, কাশীবাসী সন্ন্যাসী। আহা, তাঁকে দেখলে আর সংসারে ফিরতে ইচ্ছে করে না। আবার কতদিনে তাঁর চরণ-দর্শন পাব তাই ভাবি। মনে করচি, কাল-পরশুর মধ্যেই ফিরব।

গুণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাল-পরশুর মধ্যে কি করে ফিরবে? আমি ত এখনো বেশ সারিনি হেম, আমাকে দেখবে কে?

হেম একটু অশ্রুতিভ হইয়া বলিল, ও কিছু নয়,—ওটুকু দু'দিনেই সেরে যাবে।

গুণী বলিল, অদ্ভুতঃ সে দুটো দিন ত তোমাকে থাকতে হবে।

আচ্ছা, না হয় থাকব। বলিয়া হেম চলিয়া যাইতেছিল, গুণী ডাকিয়া বলিল, শোন, কাল-পরশুই যেয়ো, কিন্তু আবার কতদিন ফিরবে?

এখন বোধ হয় শীঘ্র ফিরতে পারব না। আমাকে তুমি মাসে এক শ টাকা করে পাঠিয়ো, তাতেই চলে যাবে, তার কমে হবে না।

গুণী বলিল, টাকার কথা ত হচ্ছে না, হেম! তোমার এক শ টাকার জায়গায় দু'শ টাকা লাগলেও আমি পাঠাব। কিন্তু সত্যিই কি তুমি আর ফিরবে না?

কি করতে আর ফিরব?

যদি আমার মৃত্যুসংবাদ পাও, তা হলে ফিরবে?

হেম ব্যথিত হইয়া বলিল, ও কি কথা গুণীদা?

গুণী বলিল, বলা যায় না ভাই, তাই সময় থাকতে বলে রাখা ভাল। আমার উইলের মধ্যে তোমাকে টাকা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। আর থাকবে এই বাড়িটা। যদি কখন এদেশে এস, এই বাড়িতে এই ঘরে শুয়ো, এই আমার অনুরোধ।

হেম কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া বলিল, আমি এলিচি গুণীদা, তোমার কোন ভয় নেই। এখন শরীরটা দুর্বল বলেই ও-সব মনে হচ্ছে।

বোধ হয়, তাই হবে, বলিয়া গুণী বাহিরের বৃষ্টির দিকে চাহিয়া রহিল। হেম বিবর্তমুখে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে ঘরের বাহির হইতে ঘরের মধ্যে অন্ধকার দেখিয়া হেম রাগিয়া উঠিয়া ডাকিল, নন্দা, বাবুর ঘরে আলো জ্বেলে দিসনি?

গুণী ভিতর হইতে কহিল, আমি মানা করেছিলাম।

নন্দা ছুটিয়া আসিলে হেম তাহাকে একটা সেজ জ্বালিয়া আনিতে বলিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঠাহর করিয়া গুণীর পায়ের কাছে খাটের উপর গিয়া বসিল। নন্দা ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেলে হেম গুণীর পায়ের উপর হাত রাখিতেই, সে পা সরাইয়া লইল। হেম বাধা পাইয়া বলিল, তুমি কি আর আমাকে পায়ে হাত দিতে দেবে না?

গুণী বলিল, কাজ কি ভাই, তোমার গুরুর হয়ত নিষেধ থাকতে পারে।

হেম বুঝিল যে, সে আসিয়া অবধি পায়ের ধূলা লয় নাই, গুণী তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু উত্তর দিতেও পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, গুণীদা, আমার ওপর রাগ করেছ?

আমি কি কোনদিন তোমার উপর রাগ করেছিলাম?

হেম তৎক্ষণাৎ অনুভূত হইয়া বলিল, কোনদিন না—কিন্তু আজ ও-সব কথা বলছিলাম কেন? কি কথা ভাই?

উইল করার কথা, আরো কত কি কথা,—আমি বলচি গুণীদা, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি কিছু

ভয় করে না।

গুণী একটুখানি হাসিয়া বলিল, ভাল না হওয়ায় আমার কি খুব ভয় বলে তোমার মনে হয়? হেম কান-কান হইয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ও-সব কথা বলো না। তুমি ভাল না হলে আমি বাঁচব কি করে?

তুমি চলে গেলেই বা আমি বাঁচব কি করে? তাই, যদি ধরে রাখি, যদি যেতে না দি।

হেম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আমাকে ধরে রেখে তোমার লাভ কি?

লাভ! গুণী আর বলিতে পারিল না, নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। বাহিরের বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পটপট শব্দে সাসীর গায়ে আঘাত করিতে লাগিল। এক-একবার দমকা হাওয়া খোলা দরজার ভিতর দিয়া আসিয়া সেজের বাতির আলো নিবাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। নীচে চাকরদের অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। তবুও দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গুণী শিশুকাল হইতে অত্যন্ত অভিমাত্রী, অত্যন্ত সংযমী। তাহার শৈশবের বীধ সে সুদৃঢ় করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সুলোচনার শেষ আশীর্বাদ সেই বীধের ভিত্তিমূলে সেইদিন হইতে মৃষিকের মত নিরন্তর বিবর খুঁড়িয়া নদীর জল ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বহুদূরব্যাপী ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতেছিল, কোন কখন যে সমস্তটা ধসিয়া যাইবে গ্রাহ্য স্থিরতা ছিল না। উন্মত্ত বাত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া একবার, সে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কথাগুলো আলোচনা করিয়া দেখিতে চাহিল, কিন্তু গ্রাহ্য রুগ্ন দেহ, দুর্বল মস্তিষ্ক কোন কথাই যেন পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে দিল না।

হেম হঠাৎ বলিল, গুণীদা, চুপ করে রইলে যে, কি ভাবছ?

কিছু না, কিছু না, আমার কথা তোমাকে বলবার নয়—তুমি বুঝবে না। কিন্তু যদি কোনদিন তোমার মতি ফেরে, আর তখনও যদি আমি বেঁচে থাকি—এসো।

হেম একটু সবিয়া বসিয়া বলিল, আমি সমস্ত বুঝেছি। তা অসম্ভব। যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। শেষকালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও।

গুণী একক্ষণ একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়াছিল, গ্রাহ্য চোখ জ্বলিয়া উঠিল; উঠিয়া বসিয়া বলিল, ছিঃ হেম, বুঝে কথা কও। ও কি বলচ?

হেম তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বুকেই বলছি। তুমি দুবিয়ে ঘুরিয়ে যা বলচ, আমি স্পষ্ট করে তোমার মুখের সামনেই তা বলি। তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও! বিধবার আবার বিয়ে কি গুণীদা? আমি এত শিশু নই যে, ধর্মের ভান করলেই অধর্মের পথে পা বাড়িয়ে দেব। আমি তোমার টাকা চাইনে, আশ্রয় চাইনে, কিছু চাইনে, আমার স্বপ্ন জড়িতে ফিরে যাওয়া উঠান খাঁট দিয়ে খাই, সেও ভাল, কিন্তু এ প্রহরে আমার কাজ নেই। এ কুমতি আমার যেন না হে! সেদিন বুদ্ধি তোমার ছিল কোথায়? সেদিন এমনি করে বলতে পারিনি?

গুণী স্থির হইয়া বসিয়া বলিল, হেম, দাশ হওয়াছে, আমাকে মাপ কর। আমি পীড়িত—সে-কথটা একবার ভাব।

ভেবেচি। মাপ তোমাকে আজ না হয়, দুদিন পরে করবই, কিন্তু তোমার সংস্রব আর রাখব না। কাল আমি সেখানেই ফিরে যাব, যেখান থেকে দল করে চলে এসেছিলাম। যেমন করে পারি, সেখানেই পড়ে থাকব। মনে করব, সেটা আমার কাশী, সেই আমার বৈকুণ্ঠ। তুমিও আমাকে মাপ কর গুণীদা, আমি চললাম।

হেম চলিয়া গেল, গুণী উঠে হইয়া বসিয়া রহিল—বহুহত তালবৃক্ষ যেমন করিয়া থাকে, তেমনি করিয়া। সমস্ত অভাবকে দক্ষ বঙ্কলিয়া কবছের মত স্বেভাবে খড়্গ হইয়া থাকে, সেইভাবে। তাহার গুণী পড়িবার শক্তিরূপ পশু যেন আব নাই।

আবার দুগাশুকা ফিরিয়া আসিয়াছে। অতি প্রত্যবে জানাল: বুলিয়া দিয়া হেম পূর্বদিকের অরুণ রক্তচ্ছটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এ পাড়ার কোথায় রোশনটাকির সানাইয়ের বিভাস শরতের সমস্ত করুণার সহিত মিলিয়া তাহার সবদেহে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল। অজ্ঞানসারে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কতদিন হইয়া গিয়াছে, সে গুণীর কোন সংবাদ

পায় নাই—সে মনে মনে ভাবিল, কে জানে গুণীদা আমার কোথায়, কেমন আছে। চলিয়া আসিবার সময় গুণী কাদিয়া বলিয়াছিল, হেঁম, আর দুটো দিন থাক—রাগ করে যেয়ো না। অভিমাত্রীর চোখের জলের হেম সেদিন কোন মূল্য দেয় নাই। সেদিন পাড়িত রুম্মসেহ সন্তোষ গুণী পথের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, হেঁম, তোমার মন কখনই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, যে কারণে হোক বিকৃত হয়ে উঠেছে—তাই অনুরোধ করছি, ফিরে এসে আর একটা দিনও থাক। হেঁম শোনে নাই, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছিল। গুণী গাড়ির জানালার ধারে আসিয়া শেষ মিনতি জানাইয়া বলিয়াছিল, হেঁম, হুমঃ এই কাজটা তোমার চিরকাল শেলের মত বিধে থাকবে—আমার জন্য বলছি নে ভাই, তোমার নিজের জন্যই বলছি, আজকের মত গাড়ি থেকে নেমে এস। তাহার উত্তরে হেঁম তৎক্ষণাতঃ গাড়ি হাঁকিয়া দিতে বলিয়াছিল। হেঁম ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং অনেকক্ষণ দ্বিধা কাদিয়া কাদিয়া মাথার সমস্ত চুল ভিজাইয়া শেঁষে ঘুমটিয়া পড়িল। এত দুঃখের একটা কাণ্ডও ঘটয়াছিল। তীর্থে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া সে কাল দাঁসীকে দিয়া বাটীর সরকারের নিকট পঞ্চাশটি টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। সরকার ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল, ছোটবাবুর শুকুম বাঁতীত দিতে পারিবে না। হেঁম দেবরের সহিত কথা কহিত না, আড়ানে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, আমি চেয়ে আসিলে কি পঞ্চাশটা টাকা সরকার দিতে পারে না?

দেবর উত্তর করিয়াছিল, না; আপনি শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিনী—টাকা পেতে পারেন না।

হেঁম বলিয়াছিল, কি পেতে পারি না পারি, সে আমি জানি ঠিকবন্দো! তোমার সঙ্গে টাকার জন্যে বিবাদ করতে, মামলা-মকদ্দমা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আমাকে অতঃ নিকপায় তুমি মনে করো না। এনে দিতে ইচ্ছে হয় দাও, না হলে বলছি তোমাকে, টাকার যদি কোন জোব থাকে, শ্রদ্ধা করে আমি তোমার বাড়ির এক-একটা ইট ভুলে নিয়ে গিয়ে ঐ গঙ্গাব জলে ভাসিয়ে দিতে আসব।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই টাকা আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু হেঁম গ্রহণ করিল না, ব্যথা করিয়া উঠিল। মাঝখানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরে দোর দিয়া শুইল। সমস্তদিন খটন না উঠিল না মনে মনে কাহাকে স্মরণ করিয়া কাদিতে লাগিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, তখন দুই ভাসিয়া উঠিয়া স্নান সারিয়া আসিয়া হেঁম আফ্রিক করিতে বসিবেছিল, দাঁসী আসিয়া সাংবাদ দিল। বৌমা, তোমার ভাইয়ের বাড়ি থেকে চার-পাঁচ জন তত্ত্ব নিয়ে এসেছে। বলিতে বলিতেই হেঁম আসিয়া প্রণাম করিল। হেঁম একবারমাত্র তাহার মুখপানে চাহিয়া সব ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার বলা ছড়াইয়া ছেলেমানুষের মত কাদিয়া উঠিল। কাল হইতেই তাহার চোখের জল শুকনো নাই, আর অকস্মাৎ মানদাকে পাইয়া তাহার প্রায় এক বৎসরের রুদ্ধ-অশ্রু বন্যার মত সব ভাসাইয়া দিল। মানদাকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল গুণীদা কি চিঠি লিখে নিচ্ছে, তুমিও চিঠি

মানদা কহিল, তিনি ত চিঠি দেননি।

হেঁম যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, দেননি?

মানদা বলিল, না দিদিমণি! তিনি কি উঠতে পারেন যে, চিঠি লিখবেন

হেঁম পাংশু হইয়া গিয়া বলিল, উঠতে পারেন না, কি হয়েছে তাঁর?

তুমি কিছু জান না?

না, বল। মানদা বলিল, আর কি বলব? বলিয়াই কাদিতে লাগিল।

হেঁম রুদ্ধভাবে বলিল, কাদিস পরে—এখন বল।

সে কাদিতে কাদিতে বলিল, বলবার কিছুই নেই দিদি। তুমি চলে আসার পূর্বেই দিনটুকু অসুখে পড়েন, ভাল হন, আবার জ্বরে পড়েন, আলাদা ভাল হন, আবার জ্বরে পড়েন—ফিরে গিয়ে যে দেখাতে পাব, এমন ভরসাও করেন।

হেঁম বলিল, তার পরে বল।

মানদা বলিল, তার পরে কোথায় বর্ধমান না কোথা থেকে খবর পেয়ে, কোথাকার মাসী আসে, তার পরে মেসো আসে, তার পরে মাসতুত ভাই, দৌ, বোন, ভগিনীপতি, এখন আর কেউ বাকী নেই। বাড়িতে আর জায়গা নেই।

আমি সব বিস্ময় করব—তার পর?

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বসে আছে। বাবু ওপরে পড়ে আছেন, না ডাক্তার, না বদী, না ওষুধ, না পথি।
তনি, হাওয়া বদলালে ভাল হয়, তা নিয়ে যায় কে?

হেম বলিল, তোরা কি কচ্চিস? নন্দা নিয়ে যাবনি কেন?

মানদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, সে-ই বাবুর অনেকদিনের চাকর, তাকে মেসোবাবুর ছেলে
অভয় মেরে তাড়িয়ে দিয়েচে—ছোঁড়া আবার মদ খায়—এক-একদিন বাড়িতে এসে এমন হাস্যামা
করে যে, ভয়ে কেউ বেরুতে পারে না। তাকে আমাদের বাবু পর্যন্ত ভয় করেন।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মানু, একটা কথা সঠি। বল দিদি, আমার শুধায় কি
তাহলে বাঁচবে না?—মানদা বলিল, কেন বাঁচবেন না দিদি, দেখালে শোনায়ে, চেষ্টা করলে নিশ্চয়
ভাল হবেন—কিন্তু অমন করে ফেলে রাখলে আর ক'দিন?

হেম মিনিট-খানেক চোখ বুজিয়া বসিয়া বহিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়িয়া বলিল, মানদা
তোদের ফিরে যাবার টাকা আছে?

আছে বৈ কি দিদি। ভাগ্যেই তা বাবু এক টাকার দলকার থাকলে সঙ্গে এক টাকা নিয়ে পড়ান—
আমাদের ভাতা আমার কাছেও আছে। বলিয়া সে আঁচলে বাঁধা নোট দেখাইল।

হেম ভিজ্ঞাসা করিল, করে যাবার কাল?

মানদা বলিল, তা'নিদি, কোনই খোঁজও হবে। 'আমি যা' একটা লোক আছে, না হলে সবই নষ্ট।
কেউ টিকতে পারবে না। যেমন মাসি, তেমন মেসো, তেমন ডেলে, তেমনি কি কৌ—বিশেষতঃ পুরুষ
যেন কদম্বের ন্যায় বঁধেব এক দাঁড় ঢেলেছিলেন। আমার নাকি বড় শক্ত প্রাণ, তাই এখনও টিকে
আছি।—অভয় ছোঁড়া আমাকেই একদিন তেড়ে মারতে এসেছিল—বাবুকে বলে, ও মলেই বাঁচ যায়।

হেমের চোখের মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল। বলিল, আমার যদি আজ সিন্ধার কখন ফিরে
যাবে তাহলে?

মানদা বলিল, আর যত্ন নাহলে পড়েই যাবার। আমি যদি থেকে তোলে এসেছি

তবে পরেই যাবে। তুমি যাও ডেকে আন।

তুমি যাবে দাদি? আজ তা' সন্ধান নাকি

কোন দিন। দাঁড়ি করালি তো। পথিও, প্রেম অমন।

সেদিন অপরাহ্ন বেলায় তখন অভয়কে খাবার দিয়া মা' কাণ্ডে বসিয়া এবং দুইকান লুচি খাইবার
জন্য পাড়াপিড়া কাঁবেতেছিলেন।—এতদে পক্ষ দিয়েই 'শেষকন্ঠি' উন্মিষার ভিত্তি। অপরিচিত ত্রেমকে
দেখিয়া বিম্বিত ও হত্যা মর্শ প্রথ করিলেন। তুমি কে না বড়?

আমি বিম্বিত, বলিয়া হেম উপরে উঠিয়া গেল।—অভয় তাহার অশ্রুত কপের দিকে নেকড়ে
গাধার মত চাহিয়া বহিল।

হেম শুধার ঘরে গিয়া দেখিল, সে সময়ের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া আছে। ভাবিয়া আছে কি
ধুমাইতেছে, বোঝা গেল না। শিয়রের কাছে চাবির গোছটা পড়িয়া ছিল, হেম সর্বগ্রে সেটা নিজে
আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিল। একটা টোঁটালের উপর সেটা দুই খণ্ডে টুকরাহে পড়িয়া ছিল, তুলিয়া লইয়া
দেখিল, গোঁবালের গায়ে পনের দান পুরে শুকিয়ে দেওয়া আছে। সমস্ত ব্যাপারটা সে স্পষ্ট বুঝিল
এর পরে সেতান সন্দেহক বুঝে, এক বই গোঁবর কাগজে যখন কয়েক সংলগ্নক পর্বচ্ছা করিয়া শুধার
দপ্তরত মিলেহয়। দেখিতেছিল, এমন সময় মর্শ ঘরে তুলিয়া এতদেব একক হইয়া গেলেন
চৌচিয়া বাসিলেন, তে' না তুমি সন্দেহক বুঝিল।

হেম কাঁলে, চৌচাও কোন ঠান উপর পড়ান।

মাসি আবার চৌচাতিয়া উঠিয়া বাসিলেন। চৌচাও কোন?

শুধা পূর্ণযাছিল, পক্ষ যিগেল। হেম বাসিল, আমি খুলব না তা' কে খুলবে? তুমি?

শুধা চাহিয়া দেখিতেছিল, দুইভনের কেহই তাহা নাকি করে নাই। মর্শ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া
উঠিলেন। শুধা আস্তে আস্তে কাঁল, হেম, কখন এসে গাই?

এই আসছি। ওঁকে বুঝিয়ে দাও—তোমার জিনিস খুললে বাইরের লোকের ঘরে ঢুকে চৌচাকো, করতে নেই। এ সমস্তই আমার, এই কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে ওঁকে যেতে বল।

ওণী সমস্ত বুঝিল। তার পর হাসিয়া বলিল, সেই সম্পর্কে একদিন পরে বুঝি সিদ্ধক খুলতে এসেচ?—হেম চেকের পাতা গুণিতে গুণিতে বলল, হাঁ।

মাসী বলিলেন, ও কে ওণী?

আমার বোন। উত্তর শুনিয়া হেম শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর চোখ তুলিয়া একটবার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মাসী বলিলেন, কৈ, এতদিন ত এ-সব কথা শুনিনি? কিরকম বোন হয়?

ওণী সে-কথার উত্তর এড়াইয়া সংক্ষেপে কহিল, ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল—ওইই সর্বস্ব মাসী!

মাসী। বিশ্বাসও করিলেন না—বুঝিতেও পরিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, ওণী হেমের দিকে ভাল করিয়া না চাহিয়াই বলিল, মরণকালে হঠাৎ এ খেয়াল কেন? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখ দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিল। হেমের মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে—সে যেন অকস্মাৎ কোন ক্রুদ্ধ তপস্বীর অভিসম্পাতে একনিমেষে পাষণ হইয়া গিয়াছে। ওণী সভয়ে ডাকিল, হেম!

হেম সাড়া দিল না, নড়িলও না—নির্মিমেব-নেত্র মেথের দিকে চাহিয়া রাসিয়া বহিল।

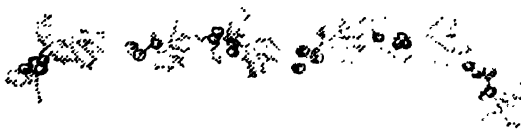
ওণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিল, হেম, কথা শোন!

হেম তদুত্তরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিল। ওণী শয্যার উপর কোনমতে উঠিয়া বসিল, তাহার পর খট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে অতি ক্রেশে হেমের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে একেবারে উপড় হইয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বিনা অপবাদের আমাকে সবাই শান্তি দেয়—তুমিও দেবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি!

ওণী নির্বাক হইয়া রহিল। শ্রাবণের আকাশভরা মেঘের মত বিপদস্ত কালো চলে তাহার দুই পটাকিয়া গিয়াছে—তাহার প্রতি চাহিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বহিল। তার পর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া হেমের মাথার উপর ডান হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, তোমাকে শান্তি দিব কি হেম, আমাকে ভালবেসেছিলে বলে আমি তোমাকেও শান্তি দিইনি। এ শান্তি নয় বোন, চার বৎসরের কড় দৃষ্টান্তের পর মরণের আগে যে শান্তি পেয়েছি, শেষদিনে আমি সে দুর্লভ বস্তুটিই তোমাকে দিয়ে যাব—চল আমরা কাশী যাই।

হেম মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, চল, কিন্তু এই কি তোমার শেষ আদেশ! এ কি আমি সহ করতে পারব?

ওণী বলিল, পারবে। যখন কুণ্ডবে, সংসারে, ভালবাসাকে মহামহিমাম্বিত করবার জন্য বিচ্ছিন্ন শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেয়েছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটারে অবজ্ঞায় যায়নি—তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে, অতুল বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এবং দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অঙ্ক সঞ্চিত করে গেছে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাখার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, ব্যাথাতেই মধুর, তখন সহিতে পারবে হেম। উঠে বস—চল, আজই আমরা কাশী যাই। যে ক'টা দিন আরো আছে, সে ক'টা দিনের শেষ সেবা তোমার, ভগবানের আশীর্বাদে অক্ষয় হয়ে তোমাকে সারা-জীবন সুপথে শান্তিতে বাখবে।



মেজদিদি

এক

কেষ্টার মা মুড়ি-কড়াই ভাজিয়া, চাহিয়া-চিস্তিয়া, অনেক দুঃখে কেষ্টধনকে চোদ্দ বছরেরটি করিয়া মারা গেলে, গ্রামে তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। বেমাএ বড় বোন কাদাধিনীর অবস্থা ভাল। সবাই কহিল, যা কেষ্ট, হোর দিদির বাড়িতে গিয়ে থাক গো। সে বড়মানুষ, বেশ থাকবি যা।

মায়ের দুঃখে কেষ্ট কাদিয়া-কাটিয়া জ্বর করিয়া ফেলিল। শেষে 'ভাল হইয়া, ভিক্ষা' করিয়া শ্রাদ্ধ করিল। তার পরে নাড়া মাথায় একটি ছোট পুটলি সঞ্চল করিয়া, দিদির বাড়ি রাজহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিদি তাকে চিনিত না। পরিচয় পাইয়া এবং 'আগমনের হেতু শুনিয়' একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। সে নিজেই নিয়মে ছেলেপুলে লইয়া ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছিল—অকস্মাৎ এ কি উৎপাত!

পাড়ান যে বুড়ামানুষটি কেষ্টাকে পথ চিনাইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল, 'তাহাকে কাদাধিনী' খুব কড়া কড়া দু'চার কথা শুনাইয়া দিয়া কহিল, 'ভাই! আমার মাসীমার কুটুমকে ভেঙে এনেছেন, ভাত মারতে সংমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, বজ্ঞাও মাগী জায়েছে একদিন খোজ নিলে না, এখন মরে গিয়ে ছেলে পাঠিয়ে শুও করেছেন। যাও বাপু, তুমি পবের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও—এ-সব দণ্ডটি আমি পোয়াতে পারব না।'

বুড়া জাতিতে নাপিত। কেষ্টার মাকে ভক্তি করিত, মা-ঠাকরুন বলিয়া ভক্তিত। তাই এত কটুক্তিতেও হাল ছাড়িল না। কাকূতি-মিনতি করিয়া বলিল, 'দিদিঠাকরুন, লক্ষ্মীর ভাড়ার তোমার। কত দাস দাসী, অতিথ-ফকির, কুকুর বেড়াল এ সংসারে পাও পেতে মানুষ হয়ে যাচ্ছে, এ ছোঁড়া দু'মুঠো বয়ে বাইরে পড়ে থাকলে তুমি জনহেতুও পারবে না। বড় শান্ত সুবোধ ছেলে দিদিঠাকরুন! তাই বলে না নাও, দুইই অন্যথ্য বামনের ছেলে বলেও বাড়ির কোণে একটু ঠাই নাও দিদি।'

এ কথাতে পুলকিত নাহোবার মন ভেঙে, কাদাধিনী মেয়েমানুষ মাত্র কাজেই সে তখনকার মত চাপ করিয়া বসিল। বুড়া কেষ্টাকে আড়ালে ডাকিয়া দুটা শলা-পরামর্শ দিয়া চোখ মুছিয়া বিদায় লইল। কেষ্ট আশ্রয় পাইল।

কাদাধিনীর স্বামী নবীন মুখজোর ধান-চালের আশ্রয় ছিল। তিনি সেই বারোটার পর বাড়ি ফিরিয়া কেষ্টাকে বন্ধ কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, এটি কে?

কাদাধিনী মুখ ভারী করিয়া জবাব দিল, 'তোমার বড়কুটুম গো, বড়কুটুম! নাও, খাওয়াও পরাও, মানুষ কর—পরকালের কাজ হোক।'

নবীন সংশোধিত মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন, ব্যাপারটা বুঝিলেন; কহিলেন, বটে! বেশ নধর গোলগাল দেহটি তো।

স্ট্রী নহিলেন, বেশ হবে না কেন? বাপ আমার বিষয়-আশয় যা-কিছু রেখে গিয়েছিলেন, সে সমস্তই মাগী ওর গব্বারে ঢুকিয়েছে। আমি ত তাব একটি কানকড়িও পেলুম না।

এলা বাচ্চা, এই বিষয় শুণ্য একস্থানি মাটির ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি বাতাবি নেবুর গাছ। ঘরটিতে বিধবা মাথা শুষ্কিয়া থাকিতেন এবং নেবুগুলি বিক্রি করিয়া ছেলের ইস্কুলের মহিন্স যোগাইতেন।

নবীন রোষ চাপিয়া বসিলেন, খুব ভাল।

কাদাধিনী কহিলেন, ভাল নয় আবার! বড়কুটুম যে গো! তাঁকে তার মত বাসতে হবে ত! এতে আমাব পাচগোপালের বরাতে এক-বেলা এক-সজ্জা জোটে ও তাই ডের! নইলে অস্বাভিত্তে দেশ ভরে যাবে। বাসমা পাশের বাড়ির দোঙলা ঘরের বিশেষ একটা খোলা জানালার প্রতি রোষকষায়িত নোচনো অগ্নিমূর্তি নিষ্ক্ষেপ করিলেন। এই ঘরটা তার মেজজা হেমঙ্গিনীর।

কেষ্ট বারান্দার একধারে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কাদম্বিনী হঠাৎ দুকিয়া একটা নারিকেল মালায় একটুখানি তেল আনিয়া, তাহার পাশে ধরিয়া দিয়া কহিলেন, ‘মহা মায়াকান্না কাদতে হবে না, যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এস গে—বলি, ফুলেল তেল টেল মাথা অভ্যাস নেই ত? বাম্বীকে উদ্দেশ্য করিয়া চোঁচাইয়া বলিলেন, তুমি চান করতে যাবার সময় বাবুকে ডেকে নিয়ে যেয়ো গো, নইলে ডুবে মলে-টলে বাড়িসুদ্ধ লোকের হাতে দড়ি পড়বে।

কেষ্ট ভাত খাইতে বসিয়াছিল। সে স্বভাবতই ভাতটা কিছু বেশী খাইত। তাহাতে কাল বিকান হইতে খাওয়া হয় নাই, আজ এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—বেলাও হইয়াছে। নানা কারণে পাগেল ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়াও তাহার ঠিক ক্ষুধা মিটে নাই। নবীন অদূরে খাইতে বাসিয়াছিলেন, লজ্জা করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, কেষ্টকে আর দুটি ভাত দাও গো—

‘ই, বলিয়া কাদম্বিনী উঠিয়া গিয়া পরিপূর্ণ একথাল ভাত আনিয়া সমস্তটা তাহার পাশে ঢাকিয়া দিয়া, উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই হয়েছে! এ হাতির খোরাক নিতা যোগাতে গেলে যে আমায় আড়ত খালি হয়ে যাবে! ওবেলা দোকান থেকে মগ-দুই মোটা চাল পাশিয়ে দিয়া, নইলে দেউতাকে হইতে দেরি হবে না, তা বলে রাখছি।

মর্যাদিক লজ্জায় কেষ্টের মুখখানি আরও বুকিয়া পড়িল। সে এক মায়ের এক ছেলে। দুঃখিনী জননীর কাছে সরু চাল খাইতে পাইয়াছিল কিনা, সে খবর জানি না, কিন্তু পেট ভরিয়া খাওয়ায় অপরাধে কোনদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয় নাই, তাহা জানি। তাহার মনে পড়িল, তাহার বেশী খাইয়াও কখন মায়ের মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। মনে পড়িল, এই সেদিনও ঘুড়ি লস্কিহি কিনিবার জন্য দু’মুঠা ভাত বেশী খাইয়া পয়সা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ভাতের খালের উপর নিঃশব্দে ধরিয়া পড়িতে লাগিল, সে সেই ভাত মাথা গুঁজিয়া গিলিতে লাগিল,—বী-হাটটা তুলিয়া মুছিতে পশ্চিম সাহস করিল না, পাছে দিদির চোখে পড়ে। অনতিপূর্বেই মায়াকান্না কাদার অপরাধে বুকনি খাইয়াছিল। সেই ধমক তাহার এতবড় মাতৃ-শোকেরও ঘাড় চাপিয়া বাধিল।

দুই

পৈতৃক বাড়িটা দুই ভায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিল।

পাশের দোতলা বাড়িটা মেজভাই বিপিনের। ছোটভায়েব অনেকদিন মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিনেরও খান-চালের কারবার। তাহার অবস্থাও ভাল, কিন্তু বড়ভাই নবীনের সমান নয়। তাহারি ইহাও বাড়িটি দোতলা। মেজবৌ হেমাসিনী শহরের মেয়ে। সে দাসদাসী রাখিয়া, লোকজন খাওয়াইয়া, জাকজমক থাকিতে ভালবাসে। পয়সা বাঁচাইয়া গরিবী চালে চলে না বলিয়াই বহুব-চারেক পূর্বে দুই ভায়ে কলহ করিয়া পৃথক হইয়াছিল। সেই অবধি প্রকাশ্য কলহ অনেকবার হইয়াছে, অনেকবার মিটিয়াছে, কিন্তু মনোমালিন্য একটি দিনের জন্যও ঘুচে নাই। কারণ, সেটা বড়জা কাদম্বিনীর একলাব হাতে। তিনি পাকা লোক, ঠিক বুঝিতেন, ভাসা হাঁড়ি জোড়া লাগে না। কিন্তু মেজবৌ অত পাকা নয়, অমন করিয়া বুঝিতেও পারিত না। ঝগড়াটা প্রথমে সেই করিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু সেই মিটিবাবর জন্য, কথা কহিবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ছটফট করিয়া একদিন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া বসিত। শেষে, হাতে-পায়ে পড়িয়া কাদিয়া-কাটিয়া, ঘাট মানিয়া, বড়-ভাকে নিজের ঘবে ধরিয় আনিয়া ভাব করিত। এমনই করিয়া দুই জায়ের অনেকদিন কাটিয়াছে। আজ বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময়, হেমাসিনী এ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কূপের পাশে সিমেন্ট-বাঁধান বসীদ উপর রোদে বসিয়া কেষ্ট সাবান দিয়া একরাশ কাপড় পরিষ্কার করিতেছিল। কাদম্বিনী দূরে দাঁড়াইয়া, অল্প সাবান ও অধিক গায়ের জোরে কাপড় কাচিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিতেছিলেন। মেজভায়ে দেখিবাণাত্রই বলিয়া উঠিলেন, মাগো,—ছোঁড়াটা কি মোংলা কাপড় চোপড় নিয়েই এসেছে!

কথাটা সত্য। কেষ্টার সেই লাল-পেড়ে খুঁটিটা পরিয়া এবং চাদরটা গায়ে দিয়া কেহ কুটুমবাড়ি যায় না। দুটোকে পরিষ্কার করার আবশ্যক ছিল বটে, কিন্তু রজকের অভাবে ঢের বেশী আবশ্যক

হইয়াছিল পুত্র পাঁচগোপালের জোড়া-দুই এবং তাহার নিতার জোড়া-দুই পরিষ্কার করার। কেঁটা আপাততঃ তাহাই করিতেছিল। হেমাঙ্গিনী চাহিয়াই টের পাইল বৎগুলি কাহাদের। কিন্তু সে উদ্বেষ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলটি কে দিদি? ইতিপূর্বে নিজের ঘরে বসিয়া আড়ি পাতিয়া সে সমস্তই অবগত হইয়াছিল। দিদি ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, দিদি ছেলটি ত! মুখের ভাব তোমার মতই দিদি। বলি, ভাষের বাড়ির কেউ না কি?

কাদম্বিনী বিরক্ত-মুখে জবাব দিলেন, ঠা, আমার বৈমাত্ৰ তাই। ওরে, ও কেঁটা, তোর মেজদিকে একটা প্রশ্নাম কর না রে! কি অসভ্য ছেলে বাবা! গুরুজনকে একটা নমস্কার করতে হয়, তাও কি তোর মা মাগী শিখিয়ে দিয়ে মরেনি রে?

কেঁটা পতমত বাইয়া উঠিয়া আসি। কাদম্বিনীর পায়েব কাছেই নমস্কার করিতে তিনি দমকাটয়া উঠিলেন, আ মব, তাবা কাল' নাকি। কাকে প্রশ্নাম করতে বললুম, কাকে এসে করলে!

বস্তুতঃ, আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রাম আঘাতে তাহার মাথা যৌতিক হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঝাঞ্জে ব্যস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া হেমাঙ্গিনীর পায়েব কাছে সর্বদা আসিয়া শির অবনত করিতেই সে হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিল—থাক থাক, হয়েছে ভটি—চিরজীবা হও! কেঁটা মৃত্যের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এ দেশে এমন করিয়া যে কেহ কথা বলিতে পারে, ইহা যেন তাহার মাথায় ঢুকিল না।

তাহার খেঁচা কুজিত ভীত অসহায় মুখখানির পানে চাহিবামাত্রই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁপিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া, মতসা এই হতভাগ্য অনাথ বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার পবিত্রাশ্রয় ঘমাধৃত মুখখানি নিজের ঘাঁচলে মুছাইয়া দিয়া, ভাবকে কঠিল, অহা, একে দিয়ে কি কাপড় কাচিয়া নিতে আছে দিদি, একটা ঢাকের ভস্কনি কেন?

কাদম্বিনী এমত অবাক হইয়া গিয়া জবাব দিতে পারিলেন না, কিন্তু নিম্নরে সামলটয়া লইয়া বসিয়া উঠিয়া বলিলেন, অম্মি ত তোমার মত বড়মানুষ নই মেজদেবী যে, বাড়িতে দশ-বিশটি দাসদাসী আছে। আমায়ও গেরত হবে—

কথটা শেষ হইবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী নিজের ঘরের দিকে মুখ তুলিয়া মনেবে ডাকিয়া কহিল, উমা, শিবুরে এদবার এ বাড়িতে পাঠিয়ে দে ত মা, বড়সুকুবে আর পঁচুর ময়লা কাপড়গুলো পুকুর থেকে কেড়ে গুকেড়ে নিক। বড় জায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এ বেলা কেঁটা আর পাঁচগোপাল আমার ওখানে থাকে দিদি। যে উদুল থেকে এলেই পাঠিয়ে দিয়ে, আমি বস্কল একে নিয়ে যাই। কেঁটকে কঠিল, ওব মঃ, অম্মিও তোমার দিদি হই কেঁটা—এসে আমার সঙ্গে। লিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া নিজেদের বাড়ি চলিয়া গেল।

কাদম্বিনী রাগ দিলেন না। অমিকন্তু হেমাঙ্গিনী-প্রদত্ত এত বড় বৈচিত্র্যও নিঃশব্দে হস্তম কবিলেন। তাহার কাবণ, যে ব্যক্তি খেঁচা দিয়াছে, সে এ বেলা স্ববচীও বাঁচাইয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর পয়সার বড় সংসারে আর কিছু ছিল না। তাই, গাভী দুধ দিতে দাঁড়ইয়া পা ছুড়িলে তিনি সহিতে পারিতেন।

তিন

সন্ধ্যার সময় কাদম্বিনী প্রণ করিলেন, কি হয়ে এলি রে কেঁটা

কেঁটা সলজ্জ নতমুখে কহিল, লুচি।

কি দিয়ে খেলি?

কেঁটা তেমনি ভাবে বলিল, কইমাছের মুড়োর তবকারি, সন্দেশ, রসগো—

ইস! বলি মেজ-ঠাকরুন মুড়োটা কার পাতে দিলেন?

ইহাও এই প্রায় কেঁটার মুখখানি পশুর হইয়া গেল। উদাত্ত প্রহরণেব সমুখের বজ্জবজ্জ জানেয়ারের প্রাণটা যেমন করিয়া উঠে, কেঁটার বুকের ভিতরটা তেমনিধরা করিতে লাগিল। দেবি দেখিয়া কাদম্বিনী কহিলেন, জোর পাতে বুঝি?

গুরুতর অপরাধীর মত কেঁট মাথা হেঁট করিল।

অদূরে দাওয়ায় বসিয়া নবীন তামাক খাইতেছিলেন। কাদম্বিনী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বলি, শুনেল ত?

নবীন সংক্ষেপে হাঁ বলিয়া ইঁকায় টান দিলেন।

কাদম্বিনী উষ্ণার সহিত বলিতে লাগিলেন, খুড়ী আপনার লোক, ব্যবহারটা দেখ! পাঁচুগোপাল আমার কুইমাছের মুড়ো বলতে অজ্ঞান, সে কি তা জানে না? তবে কোন আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে দিলে? বলি হাঁরে কেঁট, সন্দেশ-রসগোল্লা খুব পেট-ভরে খেলি? সাতজন্মে কখন তুই এ-সব চোখেও দেখিস নি। স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যারা দুটি ভাত পেলে বেঁচে যায়, তাদের পেটে লুচি-সন্দেশ কি হবে! কিন্তু, আমি বলচি তোমাকে, কেঁটকে মেজগিনী বিগড়ে না দেয় ত আমাকে কুকুর ব'লে ডেকে।

নবীন মৌন হইয়া রহিলেন। কারণ স্ত্রী বিদ্যমানে মেজবৌ তাহাকে বিগড়াইয়া ফেলিতে পারিবে, এরূপ দুর্ঘটনা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তাহার স্ত্রীর কিন্তু স্বামীর উপরে বিশ্বাস ছিল না বরং হোল আনা ভয় ছিল, সাদাসিধা ভালোমানুষ বলিয়া যে-কেহ তাহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে। সেইজন্য ছোটভাই কেঁটের মানসিক উন্নতি-অবনতির প্রতি সেই অবধি তিনি শ্রবণ দৃষ্টি পাতিয়া রাখিলেন।

পরদিন হইতেই দুটো চাকরের একটাকে ছাড়ান হইল, কেঁট নবীনের খান-চালের আড়তে কাজ করিতে লাগিল। সেখানে সে ওজন করে, বিক্রি করে, চার-পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনে, দুপুরবেলা নবীন ভাত খাইতে আসিলে দোকান আগলায়। দিন-দুই পরে একদিন তিনি আহর-নিদ্রা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গেলে, সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল। তখন বেলা তিনটা। কেঁট পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইতেছেন। তাহার তখনকার ক্ষুধাব ভাড়াইয়া বোধ কবি বাঘের মুখ হইতেও খাবার কাড়িয়া আনিতে পারিত, কিন্তু দিদিকে ডাকিয়া ডুলিবে, এ সাহস হইল না।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে চুপটি করিয়া দিদির ঘুমভাঙ্গার আশাষ বসিয়াছিল, হঠাৎ ডাক শুনিла—কেঁট?

সে আহান কি স্নিগ্ধ হইয়াই তাহার কানে বাজিল। মুখ ডুলিয়া দেখিল, মেজদি তাহাৎ দোতলায় ঘরের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেঁট একটবার চাহিয়াই মুখ নামাইল। খানিক পরে হেমাসিনী নামিয়া আসিয়া, সমুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'দিন দেখিনি ত? এখানে চুপ করে বসে কেন, কেঁট?

একে ক্ষুধায় অল্পেই চোখে জল আসে, তাহাতে এমন রেহাশ কষ্টস্বব। তাহার দু'চোখ টলটল করিতে লাগিল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, উদ্ভর দিতে পারিল না।

মেজখুড়ীমাকে সব ছেলেমেয়েরা ভালবাসত। তাহার গলার স্বর শুনিয়া কাদম্বিনীর ছোটমেয়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চৈচাইয়া বলিল, কেঁটমামা, রান্নাঘরে তোমাব ভাত ঢাকা আছে, খাও নে, মা খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে।

হেমাসিনী অবাক হইয়া কহিলেন, কেঁটের এখনও খাওয়া হয়নি, তোর মা খেয়ে ঘুমোচ্ছে কি রে—হাঁ কেঁট, আজ এত বেলা হল কেন?

কেঁট ঘাড় হেঁট করিয়াই রহিল। চুনি তাহার হইয়া জবাব দিল, কেঁটমামার বোজ ত এমন বেলাই হয়। বাবা খেয়ে দেয়ে দোকানে ফিরে গেলে তবে ত ও খেতে আসে।

হেমাসিনী বুঝিলেন, কেঁটকে দোকানের কাজে লাগান হইয়াছে। তাহাকে বসাইয়া দাওয়ায় হইবে, এ আশা অবশ্য তিনি করেন নাই; কিন্তু একবার এই বেলায় দিকে চাহিয়া, একবার এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আর্ত শিশুদের পান চাহিয়া, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি বাড়ি চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুই পরে একবাটি দুধ হাতে ফিরিয়া আসিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কেঁট খাইতে বসিয়াছিল। ~~একটি~~ ~~কি~~ তলের থালার উপর ঠাণ্ডা শুকনো ডালাপাকান ভাত।

একপাশে একটুখানি ডাল ও কি একটু তরকারির মত। দুধটুকু পাইয়া তাহার মলিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেউ খাওয়া শেষ করিয়া পুকুরে আঁচাইতে চলিয়া গেলে একটবার মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, পাতে গোনা একটিও ভাত পড়িয়া নাই ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই অন্ন নিঃশেষ করিয়া খাইয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর ছেলে ললিতও প্রায় সেই বয়সী। নিজের অবর্তমানে নিজের ছেলেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কল্পনা করিয়া ফেলিয়া কান্নার ঢেউ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। তিনি সেই কান্না চালিতে চালিতে কাড়ি চলিয়া গেলেন।

চার

সর্দি উপলক্ষ করিয়া হেমাঙ্গিনীর মাঝে মাঝে জ্বর হইত, দিন-দুই থাকিয়া আপনি ভাল হইয়া যাইত। দিন-কয়েক পরে এমনি একটু জ্বর বোধ হওয়ায় সন্ধ্যার পর বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। ঘরে কেহ নাই, হঠাৎ মনে হইল, কে যেন অতি সন্তুর্পণে কব্যাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া উকি মারিয়া দেখিতেছে। ডাকিলেন, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে, ললিত?

কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিতে, আড়াল হইতে জবাব আসিল, আমি।

কে আমি রে? আয়, ঘরে এসে দাঁস।

কেউ সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিয়া দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বসিয়া সম্মুখে কাছের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রে কেউ?

কেউ আবও একটু সরিয়া আসিয়া, মলিন কৈশোর বৃষ্টি খুলিয়া দুটি অশ্রু-পক্ষা পেয়ারা বাতির করিয়া বলিল, জ্বরের উপর খেতে বেশ।

হেমাঙ্গিনী সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, কোথায় পেলি রে? আমি কাল থেকে লোকের কত খোশামোদ করছি, কেউ এনে দিতে পারে নি, বলিয়া পেয়ারাসুন্ধ কেউ হাতখানি ধরিয়' কাছে বসাইলেন। কেউ লজ্জায় আত্মদে আরক্ত মুখ হেঁট করিল। যদিও, এটা পেয়ারার সময় নয়, হেমাঙ্গিনীও খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই, তথাপি এই দুটি সংগ্রহ করিয়া অনিতে দুপুরবেলায় সমস্ত বোদটা কেউই মাথাব উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, হী কেউ, কে থেকে বললে আমার জ্বর হয়েচে?

কেউ জবাব দিল না।

কে বললে রে আমি পেয়ারা খেতে চেয়েছি?

কেউ তাহারও জবাব দিল না। সে সেই যে মুখ হেঁট করিল, আর তুলিতেই পারিল না। ছেলেটি যে অতিশয় লাজুক ও তাঁক-খড়ব, হেমাঙ্গিনী তাহা পূর্বেই টের পাইয়াছিলেন। তখন তাহার মাথায় মুখে হাত খুলিয়া দিয়া, অন্দর করিয়া 'দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আরও কত কি কৌশলে তাহার ভয় ভাসাইয়া, অনেক কথা জানিয়া লইলেন। কিন্তু অনুসন্ধান পেয়ারা-সংগ্রহ করিবার কথা হইতে শুরু করিয়া, তাহাদের দেশের কথা, মায়ের কথা, খাওয়া-দাওয়া'র কথা, দোকান কি কাজ করিতে হয় তাহার কথা, একে একে সমস্ত বিবরণ গুনিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, এই তোর মেজদিকে কখনও কিছু লুকোস্ নে কেউ যখন দরকার হবে চুপি চুপি এসে দাঁস—নিদি ত?

কেউ আত্মদে মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

সত্যকার স্নেহ যে কি, তাহা দুঃখী মায়ের কাছে শিখিয়াছিল। এই মেজদীর মধ্যে তাহাই আশ্রয় করিয়া কেউই কখনো মাতৃশোক আঁজ গলিয়া ধরিয়' গেল। উঠিবার সময় সে মেজদীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া যেন বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু, তাহার দিদির আকোশ তাহার প্রতি প্রতিদিনই বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কারণ, সে সংসার ছেলে, সে নিরুপায়। অখ্যাতির ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াও যায় না, বিলাইয়া দেওয়াও যায় না। সুতরাং যখন রাগিতেই হইবে, তখন যতদিন তাহার দেহ বহে, ততদিন কথিয়া খাটাইয়া লওয়াই ঠিক।

সে ঘরে ফিরিয়া আসিতেই দিদি ধরিয়া পড়িলেন—সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথায় ছিলি রে কেউ?

কেউ চুপ করিয়া রহিল। কাদাখিনী ভয়ানক রাগিয়া বলিলেন, বল শিগগির।

কেউ ওথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। মৌন থাকিলে যাহাদের রাগ পড়ে, কাদাখিনী সে দলের নহেন। এতএব কথা বলাইবার জন্য তিনি যতই জেদ করিতে লাগিলেন, বলহিতে না পারিয়া তাহার ক্রোধ এবং রোষ ততই চড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাঁচুগোপালকে ডাকিয়া, তাহার দুই কান পুনঃ পুনঃ মলাইয়া দিলেন এবং তাহার জন্য রাতে হাঁড়িতে চাল লইলেন না।

আঘাত যতই গুরুতর হউক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্বত-শিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত-পা ভাঙ্গে না, ভাঙ্গে শুধু তখনই—যখন—পদতলপুষ্টি কঠিনভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল কেউর। মায়ের মরণ যখন পায়ের নীচের নির্ভরস্থলটুকু তাহার একেবারে বিলুপ্ত কাঁয়া দিল, তখন হইতে বাহিরের কোন আঘাতই তাহাকে আঘাত করিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত না। সে দুঃখীর ছেলে, কিন্তু কখনও দুঃখ পায় নাই। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত তাহার পূর্বপরিচয় ছিল না, তথাপি এখানে আসা অবধি কাদাখিনীর দেওয়া কঠোর দুঃখকষ্ট সে যে অনায়াসে সহ্য করিতে পারিতেছিল, সে শুধু পায়ের তলায় অবলম্বন ছিল না বলিয়াই। কিন্তু আজ আর পারিল না, আজ সে হেমাঙ্গিনীর মাড়ান্নেহের নির্ভর-ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছিল, তাই আজিকার এই অত্যাচারে অপমান তাহাকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া দিল। মাড়াপুত্র এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় শিশুকে শাসন করিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া, অপমান করিয়া, দণ্ড দিয়া, চলিয়া গেলেন, সে অন্ধকার ভূমিশায়ায় পড়িয়া আজ অনেকদিন পর আবার মাকে স্মরণ করিয়া, মেজদিব নাম করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচ

পরদিন সকালেই কেউ হঠাৎ গুটিগুটি ঘরে ঢুকিয়া হেমাঙ্গিনীর পায়েব কাছে বিছানার একপাশে আসিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনীর পা দুইটি একটু ওটাইয়া লইয়া সম্মুখে বসিলেন, দোকানে ফাসনি কেউ এইবার যাব।

দেরি করিস নে দাদা, এইবেলা যা, নইলে এফুনি আবার গালাগালি করবে। কেউর মুখ একেবারে অস্বস্ত, একবার পাড়ুর হইল। যাই, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একেবারে ইতস্ততঃ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া আবার চুপ করিল।

হেমাঙ্গিনী তাহার মনের কথা যেন বুঝিলেন, বলিলেন, কিছু বলবি আমাকে বে?

কেউ মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, কাল কিছু বাইনি মেজদি

কাল থেকে ফাসনি! বলিস কি কেউ? কিছুক্ষণ পর্যন্ত হেমাঙ্গিনী স্থির হইয়া বসিলেন, তাহার পর দুই চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আর একবার কাছে বসাইয়া, একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন, কাল বাঁড়বেই কেন এলিনে?

কেউ চুপ করিয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার মাথাব দিবি, বইল ভাই, আজ থেকে আমাকে তোর সেই মরা মা ব'লে মনে করবি।

যথাসময়ে সমস্ত কথা কাদাখিনীর কানে গেল। তিনি নিজের বাড়ি হইতে মেজদীকে ডাক দিয়া বলিলেন, ভাই, আমি কি ঝগুয়াতে পরিনে যে, তুমি অত কথা তাকে গায়ে পড়ে বলতে গেছ? কথার ধরন দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর গা জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, যদি গায়ে পড়েই ব'লে থাকি তাতেই বা দোষ কি?

কাদাখিনী প্রশ্ন করিলেন, তোমার ছেলেটিকে ডেকে এনে আমি যদি এমন করে বলি, তোমার মানটি থাকে কোথায় শুনি? তুমি এমন করে 'নাই' দিলে আমি তাকে শাসন করি কি করে বল দেখি? হেমাঙ্গিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, দিদি, পনের বোলা বছর এক সঙ্গে ঘর করছি—

তোমাকে আমি চিনি। পেটে মেরে আগে তোমার নিজের ছেলেকে শাসন কর, তার পরে পরের ছেলেকে করো, তখন গায়ে পড়ে কথা কইতে যাবো না।

কাদম্বিনী অবাক হইয়া বলিলেন, আমার পাঁচুগোপালের সঙ্গে ওর তুলনা? দেবতার সঙ্গে বাদরের না? এর পরে আরও কি যে তুমি বলে বেড়াবে, তাই ভাবি মেজবৌ!

মেজবৌ উত্তর দিল, কে দেবতা, কে বাদর, সে আমি জানি। কিন্তু আর আমি কিছুই বলব না দিদি, যদি বলি তও এই যে—তোমার মত নিষ্ঠুর, তোমার মত বেহায়া মেয়েমানুষ আব সংসারে নেই। বলিয়া তিনি প্রত্যন্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাকালে অর্থাৎ কর্তার ঘরে ফিরিবার সময়টিতে বড়কৌ নিজের বাড়ির উঠানে দাঁড়াইয়া দাসীকে উপলক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে তর্জন গর্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন—যিনি রাত-দিন করেছেন, তিনিই এর নিতিও করবেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী! আমার ভায়ের মর্ম আমি বুঝিনে, বোঝে পরে। কখনো ভাল হবে না—ভাই-বোনে ঝগড়া বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে ধর্ম হইবেন না—তা বলে দিচ্ছি, বলিয়া তিনি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

উভয় জায়ের মধ্যে এই ধরনের গালিগালাজ, শাপ-শাপাঙ্ক অনেকবার অনেক বকম করিয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ ঝাঁজটা কিছু বেশী! অনেক সময় হেমঙ্গিনী শুনিয়াও শুনিত না, বুঝিয়াও গায়ে মাখিত না; কিন্তু আজ নাকি তাহার দেহটা বাতপ ছিল, এই উন্মিয়া অসিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া কহিল, এর মধ্যেই চুপ করলে কেন দিদি? ভগবান হইত শুনেও পাননি—আব বানিকঙ্কণ হবে আমার সর্বনাশ কামনা কর—বসন্তাকুণ্ড ঘরে আসুন, তিনি শুনুন, ইনি ঘরে এসে শুনুন—এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লে চমকে কেন?

কাদম্বিনী উঠানের উপর ছুটিয়া অসিয়া মুখ উচু করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আমি কি কোন সর্বনাশীর নাম মুখে এনেছি?

হেমঙ্গিনী ছিদ্র-দ্বারে জবাব দিল, মুখে আনবে কেন দিদি? মুখে আনবাব পাঠী তুমি নও। কিন্তু তুমি কি মাওলাও একা তুমিই সেখানে, আর পৃথিবীতে নাকি? তুমি দিয়ে নিয়ে কাব কপাল ভাঙচ, সে কি কেউ টব পায় না?

কাদম্বিনী এবার নিভৃতমুখে দাঁড়িলেন, মুখ ভাঙেইয়া হাত পা নাড়িয়া বলিলেন, টেব পেলেই বা! যে দোষে থাকবে, তাইই গায়ে লাগবে। আর একা তুমিই টেব পাও, আমি পাট নেই। কেউ যখন এলো, সাত চোখে বা কবও না, যা বলতুম, মুখ বুজে তাই কবও। আজ দুপবেলো কার জোরে কি জবাব দিয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো! এই প্রসন্নর মাকে, বলিয়া দাসীকে বইয়া দিল।

প্রসন্নর মা কহিল, সে কথা সত্যি মেজবৌমা! আজ সে ভাত ফেলে ওঠে যেতে মা বললেন,—এ শিশুই না? গিললে যখন ঘরের বাড়ি যেতে হবে, তখন এত বেজ কিসের ভাবনা? সে বলে গেল,—আমার মেজদি থাকবে কাউকে ভয় করবেন।

কাদম্বিনী সদর্পে বলিলেন, কেননা হ'ল ও কার জোরে এত বেজ শুনি? আজ আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, মেজবৌ, ওকে তুমি এক শাবীর ভেঁকো না। আমদের ভাইবোনদের কথার মধ্যে থেকো না।

হেমঙ্গিনী আর কথা কহিল না। কেঁচো সাপের মতন চক্রে ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া, তাহার বিষ্ময়ের পরিসীমা বহিল না। জানালা হইতে ফিবিয়া অসিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, কত বেশী পীড়নের দ্বারা ইহাও সম্ভব হইতে পরিয়াছে।

আবার মাথা ধরিয়া জ্বর বোধ হইতেছিল, তাই অসময়ে শয্যায়া আসিয়া নিজীবের মত পড়িয়া ছিল। তাহার স্বামী ঘরে ঢুকিয়া, ইহা লক্ষ্য না করিয়াই ক্রোধভাবে বলিয়া উঠিলেন, বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাড়িয়ে বাস আছে। কাক মানা শুনেও না, যেখানে যত ইতভাগ লক্ষ্মীছাড় আছে, দেখলেই তাব দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে, বোজ বোজ আমার এত হাস্যামা সহ্য হয় না মেজবৌ। আজ বৌঠান আমাকে নাহক দশটা কথা শুনিয়া দিলেন।

হেমঙ্গিনী প্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, বৌঠান ইক কথা করে বলেন যে আজ তোমাকে নাহক কথা বলেছেন?

বিপিন বলিলেন, কিন্তু আজ তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। তোমার স্বভাব জানি ত। সেবার বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটাকে নিয়ে এই রকম করলে, মতি কামারের ভাগ্যের অমন বাগানখানা তোমার জন্যেই মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল, উল্টে পুলিশ থামাতে এক শ দেড় শ ঘর থেকে গেল। তুমি নিজের ভাল-মন্দও কি বোঝ না? কবে এ স্বভাব যাবে?

হেমাসিনী এবার উঠিয়া বসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা,—আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনের নামে নালিশ করতে চাইনে। আমার অসুখ করেছে—আর আমাকে বকিও না—তুমি যাও। বলিয়া গায়ের রূপারখানা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

বিপিন প্রকাশ্যে আর তর্ক করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করিয়া ঐ গলগ্রহ দুর্ভাগ্যটার উপর আজ মর্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

ছয়

পরদিন সকালে জানালা খুলিতেই হেমাসিনীর কানে বড়জায়ের তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের স্বাক্ষর প্রবেশ করিল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ছোঁড়াটা কাল থেকে পালিয়ে রইল, একবার খোঁজ নিলে না?

স্বামী ভবাব দিলেন, চুলায় যাক। কি হবে খোঁজ করে?

স্ত্রী কণ্ঠস্বর সমস্ত পাড়ার ঋতিগোচর করিয়া বলিলেন, তা হলে যে নিজেদের গ্রামে বাস করা দায় হবে! আমাদের শত্রু ত দেশে কম নেই, কোথাও প'ড়ে মরে-টরে থাকলে ছেলেবুড়ো বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জেলখানায় যেতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।

হেমাসিনী সমস্তই বুঝিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা রামাঘরের দাওয়ায় বসিয়া খান-কতক রুটি খাইতেছিলেন, ইঠাং চোরের মত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া কেঁট আসিয়া উপস্থিত হইল। চুল কঁক, মুখ শুষ্ক।

কোথায় পালিয়েছিলি রে কেঁট?

পালাই নি ত। কাল সন্ধ্যার পর দোকানে শুয়েছিলুম, ঘুম ভেঙ্গে দেখি, দুপুর রাস্তির। ক্ষিদে পেয়েছে মেজদি।

ও-বাড়িতে গিয়ে খেগে যা। বলিয়া হেমাসিনী নিজের রুটির থালায় মনোযোগ করিলেন।

মিনিট-খানেক চূপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেঁট চলিয়া যাইতেছিল, হেমাসিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কাছে বসাইলেন, এবং সেইখানেই ঠাই করিয়া রাঁধুনীকে ভাত দিতে বলিলেন।

তাহার খাওয়া প্রায় অর্ধেক অগ্রসর হইয়াছিল, এমন সময় উমা বহির্বাটী হইতে ব্রহ্মব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানাইল—বাবা আসছেন যে!

মেয়ের ভাব দেখিয়া মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তাতে তুই অমন কচ্চিস কেন?

উমা কেঁটের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রত্যন্তরে তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইয়া, চোখ মুখ নাড়িয়া তেমনি ইশারায় প্রকাশ করিল—খাচ্ছে যে!

কেঁট কৌতূহলী হইয়া ঘাড় ফিরাইয়াছিল। উমার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, শঙ্কিত মুখের ইশারা তাহার চোখে পড়িল। একমুহূর্তে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। কি ভ্রাস যে তাহার মনে জন্মিল সেই জানে। মেজদি, বাবু আসছেন, বলিয়াই সে ভাত ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া রামাঘরের দোরের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি উমাও আর একদিকে পলাইয়া গেল। অকস্মাৎ গৃহস্বামীর আগমনে চোরের দল বেঙ্গল ব্যবহার করে, ইহারাও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া বসিল।

প্রথমটা হেমাসিনী হতবুদ্ধির মত একবার এদিকে একবার ওদিকে চাহিলেন, তার পরে পরিশ্রান্তের মত দেয়ালে ঠেস দিয়া এলাইয়া পড়িলেন। লজ্জা ও অপমানের শূল যেন তাহার বুকখানা এফোড়-ওফোড় করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই স্ত্রীকে

ওভাবে বলিয়া থাকিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন-মুখে প্রশ্ন করিলেন, ও কি, খাবার নিয়ে অমন করে বসে যে?

হেমাঙ্গিনী জবাব দিলেন না। বিপিন অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, আবার জ্বর হল নাকি? অত্যন্ত ভাতের খালাটার পানে চোখ পড়ায় বলিলেন, এখানে এত ভাত ফেলে উঠে গেল কে? ললিত বুঝি?—হেমাঙ্গিনী উঠিয়া বলিয়া বলিলেন, না, সে নয়—ও-বাড়ির কেণ্টা খাচ্ছিল, তোমার ভয়ে দোরের আড়ালে লুকিয়েছে।

কেন?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কেন, তা তুমিই ভাল জান। আর শুধু সে নয়। তুমি আসচ খবর দিয়েই উমাও ছুটে পালিয়েছে।

বিপিন মনে মনে বুঝিলেন, স্ত্রীর কথাবার্তা বীকা পথ ধরিয়াকে। তাই বোধ করি সোজা পথে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে সহাস্যে বলিলেন, ও বেটি পালাতে গেল কি দুঃখে?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কি জানি? বোধ করি, মায়ের অপমান চোখে দেখবার ভয়েই পালিয়েছে। পরক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেউ পরের ছেলে, সে ত লুকোবেই। পেটের মেয়েটা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারলে না যে, তার মায়ের কাউকে ডেকে একমুঠো ভাত দেবার অধিকারটুকুও আছে।—এবার বিপিন টের পাইলেন, ব্যাপারটা সত্যই—বিল্ডী হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পাছে একেবারে বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়, এজন্য অভিযোগটাকে সামান্য পরিহাসে পনিহত করিয়া চোখ চিপিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না—তোমার কোন অধিকার নেই। ভিখিরী এলে ভিক্ষাও না। সে যাক—একটা বেগুন আর মথো ধরেনি এত অমি মনে কবচি, শহর থেকে কেদার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই—না হয় একবার কলকাতায়

অসুখ ও চিকিৎসার পরামর্শটা ঐখানেই থামিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী ভিত্তাসা করিলেন, উনার সামনে তুমি কেউকে কিছু বলেছিলে?

বিপিন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—আমি? কে না। ওহো—সেদিন যেন মনে হচ্ছে বলেছিলুম—বৌঠান রাগ করেন—দাদা বিরক্ত হন—উমা বোধ কবি সেখানে দাঁড়িয়েছিল—কি জান—

জানি, বলিয়া হেমাঙ্গিনী কথাটা চাপা দিয়া দিলেন। বিপিন ঘবে ঢুকিতেই তিনি কেউকে বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, কেউ, এই চারটে পয়সা নিয়ে দোকান থেকে মুড়িটুড়ি কিছু কিনে খেগে যা। স্কিন্দে পেলেন আর আসিস নে আমাব কাছে। হোর মেজদিদি এমন জোর নো যে, সে বাইরের মানুষকে একমুঠো ভাত খেতে দেয়।—কেউ নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইয়া বিপিন তাহার পানে চাহিয়া ক্রোধে দাঁত কড়মড় করিলেন।

সাত

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন বৈকালে বিপিন অত্যন্ত বিরক্ত-মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, এ-সব কি তুমি শুক করলে মেজবৌ? কেউ তোমার কে যে, একটা পরের ছেলে নিয়ে দিন-রাত আপনা-আপনির মধ্যে লড়াই করে বেড়াচ্। অঙ্ক দেখলাম, দাদা পর্যন্ত ভারী রাগ করেছেন।

অর্নতপূর্বে নিজের ঘরে বসিয়া বড়বৌ স্বামীকে উপলক্ষ ও মেজবৌকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার-শব্দে যে-সকল অপভাষার ঠাঁই ছুড়িয়াছিলেন, তাহার একটিও মনে পড়ায় নাই। সব ক'টি আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে বিশিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি মুখে করিয়া যে পরিমাণ বিষ বহিয়া অনিয়ছিল, তাহার সহিত জ্বালাটাও কম জ্বলিতেছিল না। কিন্তু মাঝখান ভাতের বিদ্যমান থাকায় হেমাঙ্গিনী সহ্য করা ব্যতীত প্রতিকারের পথ পাইতেছিল না।

আগেকার দিনে যেমন যখনো গরু সমুখে রাখিয়া রাজপুত-সেনার উপর বাণ বর্ষণ করিত, যুদ্ধ জয় করিত, বড়বৌ মেজবৌকে আজকাল প্রায়ই তেমনি জ্বল করিতেছিলেন।

স্বামীর কথায় হেমাঙ্গিনী দগ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, বল কি, তিনি পর্যন্ত রাগ করেছেন?

এতবড় আশ্চর্য কথা, শুনলে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে! এখন কি করলে রাগ থামবে বল?

বিপিন মনে মনে রাগ করিলেন, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া সহজভাবে বলিলেন, হাজার হলেও গুরুজনের সম্বন্ধে কি—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই হেমাসিনী কহিল, সব জানি, ছেলেমানুষটি নই যে, গুরুজনের মান-মর্যাদা বুঝি! কিন্তু ছোঁড়াটাকে ভালবাসি বলেই যেন ওঁরা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে দিবারাত্র বিধতে থাকেন। তাহার কষ্টের কিছু নরম শুনাইল। কারণ, হঠাৎ ভাতুরের সম্বন্ধে শ্রোষ করিয়া ফেলিয়া, সে নিজেই মনে মনে অপ্রতিভ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারও গায়ের জ্বালাটা নাকি বড় জ্বলিতোছিল, তাই রাগ সামলাইতে পারেন নাই।

বিপিন গোপনে ও-পক্ষে ছিলেন। কারণ, এই একটা পরের ছেলে লইয়া নিরর্থক দাদাদের সঙ্গে ঝগড়াঝটি তিনি মনে মনে পছন্দ করিতেন না। স্ত্রীর এই লজ্জাটুকু লক্ষ্য করিয়া জো পাইয়া জোর দিয়া বলিলেন, বৈধার্থি কিছুই নয়। তাঁরা নিজেদের ছেলে শাসন করেন, কাজ শেখাচ্ছেন, তাতে তোমাকে বিধতে চলবে কেন? তা ছাড়া যা-ই করুন, তাঁরা গুরুজন যে!

হেমাসিনী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কারণ, এই পনের ষোল বছরের ঘনকন্মায় স্বামীর এত বড় ভাতৃভক্তি সে ইতিপূর্বে দেখে নাই। কিন্তু পরমহুর্তেই তাহার সর্বাস্ত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, তাঁরা গুরুজন, আমিও মা। গুরুজন নিজের মান নিজে নিঃশেষ করে আনলে আমি কি দিয়ে ভর্তি করব!

বিপিন কি একটা জবাব বোধ করি দিতে যাইতেছিলেন, পামিয়া গেলেন। দ্বারের বাহিরে কুণ্ঠিতকণ্ঠের বিনম্র ডাক শোনা গেল—

মেজদি—

স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হইল। স্বামীর একটু হাসিলেন, তাহাতে স্ত্রীও বিকীর্ণ হইল না। স্ত্রী অধরে ওষ্ঠ চাপিয়া কবচের কাছে সরিয়া আসিয়া নিঃশব্দে কেঁদে মুখের পানে চাহিতেই সে অশ্রুতে গলিয়া গিয়া প্রথমেই যা মুখে আসিল কহিল, কেমন আছ মেজদি?

হেমাসিনী একমুহূর্ত কথা কহিতে পারিল না। যাহার জন্য স্বামী-স্ত্রীতে এইমাত্র বিবাদ হইয়া গেল, অকস্মাৎ তাহাকেই সমুখে পাইয়া বিবাদের সমস্ত বিরক্তিতা তাহারই মাথায় গিয়া পড়িল। হেমাসিনী অনুচ্চ কণ্ঠের স্বরে কহিলেন, এখানে কি? কেন তুই বোতল নোঙ আসিস বল ত?

কেঁদে বকের ভিতরটা ধিক করিয়া উঠিল। এই কণ্ঠের কষ্টের কথা সত্যি এত কণ্ঠের শুনাইল যে, হেতু ইহার যা-ই হোক, বস্তুটা যে সম্মেহ পরিহাস নয়, বুঝিয়া লইতে এই দুর্ভাগ্য কালকটাকও বিলম্ব হইল না।

ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় মুখখানা তাহার কালিমাখা হইয়া গেল। কহিল, দেখতে এসেছি।

বিপিন হাসিয়া বলিলেন, দেখতে এসেছে তোমাকে। এ হাসি যেন দাঁত ভাঙাইয়া হেমাসিনীকে অপমান করিল। সে দলিতা ভূজঙ্গিনীর মত স্বামীর মুখের পানে একটিলার চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, আর এখানে তুই আসিস নে।—যা।

আচ্ছা, বলিয়া কেঁদে তাহার মুখের কালি হাসি দিয়া ঢাকিতে গিয়া সমস্ত মুখ আরো কালো, আরো বিশ্রী বিকৃত করিয়া আধোমুখে চলিয়া গেল।

সেই বিকৃতির কালোছায়া হেমাসিনী নিজের মুখের উপর লইয়া স্বামীর পানে আর একবার চাহিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

আট

দিন পাঁচ-ছয় হইয়া গেল, হেমাসিনীর জ্বর ছাড়ে নাই। কাল ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, সর্দি বৃকে বসিয়াছে। সন্ধ্যার দীপ সবেমাত্র জ্বালা হইয়াছিল, ললিত ভাল কাপড়-জামা পরিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, মা, দস্তদের বাড়ি পুতুল-নাচ হবে, দেখতে যাব?

মা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, হাঁ রে ললিত, তোর মা যে এই পাঁচ-ছয় দিন পড়ে আছে,

একবারটি কাছে এসেও ত বসিস নে!

ললিত লজ্জা পাইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। মা সম্মুখে ছেলের পাঠে হাত দিয়া বলিলেন, এই অসুখ যদি না সারে, যদি মরে যাই, কি করিস তুই? খুব কাঁদিস?

যাঃ—সেরে যাবে, বলিয়া ললিত মায়ের বুকের উপর একটা হাত রাখিল। মা ছেলের হাতখানি হাতে লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ছুরের উপর এই স্পর্শ তাহার সর্বদা জুড়িয়া দিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এমন করিয়া বক্ষণ কাটান। কিন্তু একটু পরেই ললিত উসখুস করিতে লাগিল, পুতুল নাচ হয়ত এতক্ষণে শুরু হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, ভিতরে ভিতরে তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ছেলের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা যা, দেখে আস, বেশী রাত কবিস নে যেন।'

না মা, এক্ষণি ফিরে আসব, বলিয়া ললিত ঘরের বাতির হটয়া গেল। কিন্তু মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, একটা কথা বলব?

মা হাসিমুখে বলিলেন, একটা টাকা চাই ত? ঐ কলুঙ্গিতে আছে নিয়ে—দাঁবস, বেটী চান্দা যেন।

না মা, টাকা চাইনে। বল, তুমি শুনেও?

মা বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, টাকা চাইনে? তবে কি কথা রে?

ললিত আর একটু কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কেউমাকে একবার আসতে দেবে? ঘরে ঢুকে না—ঐ দেবগোড়া থেকে একটিনার তোমাকে দেখাই চলে যাবে। কালকেও বাইরে এসে বসেছিল, আজকেও এসে বসে আছে।

হেমাঙ্গিনী বাস্তব হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—যা যা ললিত, এক্ষণি ডেকে নিয়ে আয়—আজ্ঞা হা, বসে আছে, তোবা কেউ আমাকে জানাস নি রে?

তবে আসতে চায় না যে, বলিয়া ললিত চলিয়া গেল। মিনিট-খানেক পরে কেউ ঘরে ঢুকিয়া মণির দিকে হাত বাকিয়া দেখালে এসিয়া দাঁড়াইল।

হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, এস দাদা, এস।

কেউ হেমাঙ্গিনীর দ্বিধা হইয়া বসিল। তিনি নিজের তখন উঠিয়া আসিয়া কেউর হাত ধরিয়া বিজ্ঞানসূচী লইয়া গেলেন। 'পাঠ' হ'ল বলাইয়া দিয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে কেউ, বকেছলুম বলে তোব মেজদিদিকে ভুলে গেছিস বুঝি?

সহসা কষ্ট ফুটিয়া কাঁদিয়া উঠিল হেমাঙ্গিনী কিছু অশ্রব্য হইলেন। 'ও, কখনও কেউ তাহাকে কাঁদিতে দেখে নাই' অনেক দূর কথা যেনা দিলেও সে ঘাড় ত্রুটি করিয়া নিঃশব্দে থাকে, লোকজনের সমুখে জন ফেলেন না। তাহাও এই সভ্যবর্তি হেমাঙ্গিনী জ্ঞানতেন বলিস্ট বড় অশ্রব্য হইয়া বলিলেন, 'হি, কায়া কিসের? বকাইলেক এতব জন ফেলতে আছে কি?'

প্রত্যুত্তরে কেউ কোঁচাব বুড়ি মুখে জাঁজয়া প্রশংসা চেষ্টায় কাঁদা বোধ করিতে করিতে বসিল, ডাক্তার বলে যে, বুকে সর্দি বসেছে।

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন—এইজন্যে 'হি হি' কি ছেলেমানুষ তুই রে? বলিতে বলিতে তাহার নিজের চোখ দিয়াও টপটপ কাঁদয়া দাঁ ফোটা জন শতইয়া পড়িল। কাঁদাত দিয়া বুড়িয়া ফেলিয়া তাহার মাথায় একটা হাত দিয়া কোঁচুক কাঁদয়া বসিলেন সর্দি বসেছে—বসেছে—'হি হি' যদি মরি, তুই আর ললিত কাঁদে কবে গাফিয়া দিয়া আসবি? কেমন, পারবি নে?

বলি মেজদেী, কেমন আছে আজ? বলিয়া বুড়ী দেবগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ফলকাল কেউর পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই যে ইনি এত-হাঁজব হয়েছেন। আবার ও কি? মেজগিটার কাছে কেউ সহ্যে কবো হুজ? যা না কা আসব, ওত ফন্দি জানে।

ক্রান্তিবশতঃ হেমাঙ্গিনী এইমাত্র গালিশে ফেলান দিয়া কাঁচ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তীব্রের মত সোজা উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, দিদি, আমার ছ সাতদিন ছুবে, তোমার পায়ে পড়ি, আজ তুমি যাও।

কাদাম্বিনী প্রথমটা খতমত বাইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে

ত বলিনি মেজবৌ। ভাইকে শাসন করছি, তুমি অমন মারমুখী হয়ে উঠচ কেন?

হেমাসিনী বলিল, শাসন ত রাত্রিদিনই চলচে—বাড়ি গিয়ে করো, এখানে আমার সামনে করবার দরকার নেই, করতেও দেব না।

কেন, তুমি কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না কি?—হেমাসিনী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার বড় অসুখ দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, হয় চূপ কর—নয় যাও।

কাদম্বিনী বলিলেন, নিজের ভাইকে শাসন করতে পাব না?

হেমাসিনী জবাব দিল, বাড়ি গিয়ে কর গে।

সে আজ ভাল করেই হবে। আমার নামে লাগান-ভাতান আজ বার করব—বজ্জাত মিথ্যাক কোথাকার! বললুম গরুর দড়ি নেই কেউ, দু-আঁটি পাট কেটে দে—না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, পুতুলনাচ দেখে আসি—এই বুঝি পুতুলের নাচ হচ্ছে রে? বলিয়া কাদম্বিনী শুমশুম করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাসিনী কতক্ষণ কাঠের মত বসিয়া থাকিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, কেন তুই পুতুলনাচ দেখতে গেলিনি কেউ? গেলে ত আর এইসব হ'ত না। আসতে যখন তোকে ওরা দেয় না ভাই, তখন আর আসিস নে আমার কাছে।—কেউ আর কথাটি না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের গায়ের বিশালাক্ষী ঠাকুর বড় জাগ্রত মেজদি, পূজো দিলে অসুখ সেরে যায়। দাও না মেজদি।

এইমাত্র নিরর্থক ঝগড়া হইয়া যাওয়ায় হেমাসিনীর মনটা ভারী বিগড়াইয়া গিয়াছিল, ঝগড়াভাটি ত হয়ই—সেজন্যও নয়। এমন একটা রসাল ছুঁতা পাইয়া এই হতভাগ্যর দুর্দশা যে কি কষ্ট হইবে, আসলে সেই কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ফোটে ও নিকপৎ আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কেউ ফিরিয়া আসিতেই হেমাসিনী উঠিয়া বসিল, এবং কাছ বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া বলিল, আমি ভাল হয়ে তোকে লুকিয়ে পূজো দিতে পাঠিয়ে দেব। পারবি একলা যেতে?

কেউ উৎসাহে দুই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বলিল, একলা যেতে খুব পারব। তুমি আজকে আমাকে একটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দাও না, মেজদি—আমি কাল সকালেই পূজো দিয়ে তোমাকে প্রসাদ এনে দেব। সে খেলে তক্ষণি অসুখ সেরে যাবে! দাও না মেজদি আজকেই পাঠিয়ে।

হেমাসিনী দেখিলেন, তাহার আর সবুর সয় না। বলিলেন, কিন্তু কাল ফিরে এলে তোকে যে এরা ভারী মারবে! মারধরের কথা ওনিয়া প্রথমটা কেউ দমিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রফুল্ল হইয়া কহিল, মারুক গে। তোমার অসুখ সেরে যাবে ত।

আবার তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, হ্যাঁ রে কেউ, আমি তোর কেউ নই, তবে আমার জন্যে তোর এত মাথাব্যথা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ কোথায় পাইবে? সে কি করিয়া বুঝাইবে, তাহার পাড়িত আত্ম হানির দিবারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মাকে ঝুঁজিয়া ফিরিতেছে। একটুখানি মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার অসুখ যে সারচে না মেজদি—বুকে সর্দি বসেছে যে!

হেমাসিনী এবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমার সর্দি বসেছে তাতে তোব কি? তোব এত ভাবনা হয় কেন?

কেউ আশ্চর্য হইয়া বলিল, ভাবনা হবে না মেজদি, বুকে সর্দি বসা যে বড় ঝাঝপ। অসুখ যদি বেড়ে যায়, তা হলে?

তা হলে তোকে ডেকে পাঠাব। কিন্তু না ডেকে পাঠালে আর আসিস নে ভাই।

কেন মেজদি?

হেমাসিনী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তোকে আর আমি এখানে আসতে দেব না। না ডেকে পাঠালেও যদি আসিস তা হলে ভারী রাগ করব।

কেউ মুখপানে চাহিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বল, কাল সকালে কখন ডেকে পাঠাবে?

কাল সকালেই আবার তোর আসা চাই?

কেউ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আচ্ছা, সকালে না হয় দুপুরবেলায় আসব—না মেজদি? তাহার চোখে মুখে এমনই একটা ব্যাকুল অনুনয় ফুটিয়া উঠিল যে, হেমাঙ্গিনী মনে মনে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু আর ত তাঁহার কঠিন না হইলে নয়। সবাই মিলিয়া এই নিরীহ একান্ত অসহায় বালকের উপর যে নির্যাভন শুরু করিয়াছে, কোন কারণহেই আর ত তাহা বাড়িয়া দেওয়া চলে না। সে হয়ত সহিতে পারে, মেজদির কাছে আসা-যাওয়া করিবার দণ্ড যত গুরুতর হোক সে হয়ত সহ্য করিতে পিছাইবে না; কিন্তু, তাই বলিয়া তিনি নিজে কি করিয়া সহিবেন?

হেমাঙ্গিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল; তথাপি তিনি মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধবরে বলিলেন, বিরক্ত করিস নে কেউ, যা এখান থেকে। ডেকে পাঠালে আসিস, নইলে যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করিস নে।

না বিরক্ত করিনি ত, বলিয়া তাঁও লজ্জিত মুখখানি হেঁট করিয়া তাড়াহাড়ি কেঁট উঠিয়া গেল। এইবার হেমাঙ্গিনীর দুই চোখ বাঁহিয়া প্রস্রবণের মত জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি সুস্থপটু দেখিতে লাগিলেন, এই নিরুপায় অনাথ ছেলেটা মা হারাইয়া তাঁকেই মা বলিয়া আশ্রয় করিতেছে। তাহারই আঁচলের অঙ্গ একটুখানি মাধ্যম টানিয়া লইবার জন্য কাঁড়ালের মত কি করিয়াই না বেড়াইতেছে।

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিয়া মনে মনে বলিলেন, কেউ, মুখখানি অমন করে গেলি ভাই, কিন্তু হোর এই মেজাদ যে হোর চেয়েও নিরুপায়। তোকে জোর করে বুক টেনে আনবে সে ক্ষমতা যে হাব নেই ভাই:

উমা আসিয়া কহিল, মা, কাল কেটমামা এগাদায় না গিয়ে, হোমার কাছে এসে বসেছিল বলে, জ্যাঠামহাশয় এমন মার মারলেন যে, নাক দি—

হেমাঙ্গিনী ধমকিয়া উঠিলেন—আচ্ছা—হয়েচে—হয়েচে—যা তুই এখন থেকে। অকস্মাৎ ধমকানি বাইয়া উমা চমকিয়া উঠিল। আব কোন কথা না' কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল; মা ডাকিয়া বলিলেন, শোন রে। নাক দিয়ে কি খুব রক্ত পড়েছিল?

উমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বহিল, না খুব নয়, একটুখানি।

আচ্ছা তুই যা।

উমা কবাক্টব কাছে আসিয়াই বলিয়া উঠিল, মা, এই যে কেটমামা ঠাণ্ডিয়ে রয়েছে।

কেউ শুনিতে পাইল। বোধ করি ইহাকে অভ্যর্থনা মনে করিয়া মুখ বাড়িয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল, কেমন আচ্ছ মেজদি?

কোরে, দুঃখে, অভিমানে হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্তবৎ চাঁৎকার করিয়া উঠিলেন,—কেন এসেচিস এখানে? যা, যা বলচি শিগগির। দূর হ' বলচি—

কেউ মুঢ়ব মত ফাল্গফাল করিয়া চাহিয়া রহিল,—হেমাঙ্গিনী অধিকতর তাঁক্ষ তাঁতকটে বলিলেন, তবু দাঁড়িয়ে বইলি হতভাগা—গেলিনে?

কেউ মুখ নামাইয়া শুধু 'মার্জি' বলিয়াই চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী নিজীবের মত বিচনার একধারে শুইয়া পড়িয়া অশ্রুটে ক্রুদ্ধবরে বলিয়া উঠিলেন, এব শ'বার বলি হতভাগাকে, আসিস নে আমার কাছে—ওব 'মেজদি'! শিবুকে বলে দিস ত তাঁ—ক না আর ঢুকতে দেয়।

উমা জবাব দিল না। ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাঞ্চে হেমাঙ্গিনী খামাকে ডাকাইয়া আনিয়া কঁচ-কঁচ পলায় বলিল, কোনদিন ও হোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ এই অসুখের উপর একটা ভিক্ষা চাইচ, দেবে:

বিপিন সন্দ্বিধ কণ্ঠে প্রণয় করিলেন কি চাই?

হেমাঙ্গিনী বলিল, কেউকে আমাকে দাও—ও বচাওঁ বড় দুঃখী মা-বাগ নেই—ওকে ওবা মেবে ফেলচে,—এ আর আমি চোখে দেখতে পারচি নে।

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা হলে চোখ বুজে থাকলেই ত হয়।

স্বামীর এই নিষ্ঠুর বিদ্ৰূপ হেমাঙ্গিনীকে শূল দিয়া বিধিল, অন্য কোন অবস্থায় সে ইহা সহিতে পারিত না, কিন্তু আজ নাকি তাহার দুঃখে প্রাণ বাহির হইতেছিল, তাই সহ্য করিয়া লইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার দিবিয় করে বলচি, ওকে আমি পেটের ছেলের মত ভালবেসেচি। দাও আমাকে—মানুষ করি—খাওয়াই-পরাই—তার পরে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের তাই করো। বড় হলে আমি একটি কথাও কবো না।

বিপিন একটুখানি নরম হইয়া বলিলেন, ও কি আমার গোলার ধান-চাল যে তোমাকে এনে দেব? পরের ভাই, পরের বাড়ি এসেচে—তোমার মাঝখানে পড়ে এত দরদ কিসের জন্যে?

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিল। খানিক পরে চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি ইচ্ছে করলে বইঠাকুরকে বলে, দিদিকে বলে, স্বচ্ছন্দে আনতে পার। তোমার দুটি পায়ে পড়চি, দাও তাকে।

বিপিন বলিলেন, আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমিই বা এত বড়মানুষ কিসে যে, তাকে প্রতিপালন করব?

হেমাঙ্গিনী বলিল, তুমি আগে আমার একটা তুচ্ছ কথাও ঠেলতে না, এখন কি অপরাধ করবেচি যে, যখন এমন করে জানাচ্ছি,—বলচি, সত্যিই আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে—তবু এই সামান্য কথাটা রাখতে চাইচ না? সে দুর্ভাগা বলে কি তোমরা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেলবে? আমি তাকে আমার কাছে আসতে বলব, দেখি ওঁরা কি করেন।

বিপিন এবার রুস্ত হইলেন। বলিলেন, আমি খাওয়াতে পারব না।

হেমাঙ্গিনী কহিল, আমি পারব। আমি কি বাড়ির কেউ নই যে, নিজের ছেলেকে খাওয়াতে পারব না। আমি কালই তাকে আমার কাছে এনে রাখব। দিদিরা জোর করেন ও আমি তাকে থানায় দারোগার কাছে পাঠিয়ে দেব।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিপিন ক্রোধে অভিমানে ক্ষণকাল অশ্রুক হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে, বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রভাত হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল, হেমাঙ্গিনী জানালাটা খুলিয়া দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন, সহসা পাঁচুগোপালের উচ্চ কলধর কানে গেল। সে ঠেঁচাইয়া বলিতেছিল, মা, তোমার গুণধর ভাই ভলে ভিজতে ভিজতে এসে গছির হয়েচে।

খ্যাংরা কোথায় রে? যাচ্ছি আমি, বলিয়া কাদাম্বিনী ওস্তাদ দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া মাথায় গামছা দিয়া দ্রুতপদে সদর-বাড়িতে ছুটিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনীর বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ললিতকে ডাকিয়া বলিলেন, যা ও বাবা, ও বাড়ির সদরে। দেখত, তোর কেউমামা কোথা থেকে এল?

ললিত ছুটিয়া চলিয়া গেল, এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাঁচুদা তাকে নাড়িয়েছেন করে মাথায় দুটো থান ইট দিয়ে বসিয়ে রেখেছে।

হেমাঙ্গিনী শুকমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করেছিল সে?

ললিত বলিল, কাল দুপুরবেলা তাকে তাগাদ করতে পাঠিয়েছিল গয়লাদের কাছে, তিন টাকা আদায় করে নিয়ে পালিয়েছিল, সব খরচ করে এই আসচে।

হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, কে বললে, সে টাকা আদায় করেছিল?

লক্ষণ গয়লা নিজে এসে বলে গেছে, বলিয়া ললিত পড়িতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই-তিন আর কোন গোলযোগ শোনা গেল না। বেলা দশটার সময় বামুনী খান কতক রুটি দিয়া গিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাণ্ডারই ঘরের দাতিবে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। বড়গিন্নীর পশ্চাতে পাঁচুগোপাল কেঁটার কান ধরিয়া হিঙহিঙ করিয়া টানিয়া আনিতেছে, সঙ্গে বড়কর্তাও আছেন। মেজক ঠাকেও আনিবার জন্য দোকানে লোক পাঠান হইয়াছে।

হেমাঙ্গিনী শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের একপাশে সবিয়া দাঁড়িতেই বড়কর্তা তাঁর কাঁটকটে গুরু করিয়া দিলেন, তোমার জন্যে আর ও আমরা বাড়িতে টিকতে পারিন মেজবোমা। বিপিনকে বল, আমাদের বাড়ির দামটা ফেলে দিক, আমরা আর কোথাও উঠে যাই।

হেমাসিনী বিষয়ে হতবুদ্ধি হইয়া নিশেধে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন বড়গিন্নী যুদ্ধপরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বারের ঠিক সমুখে সরিয়া আসিয়া, হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন, মেজবৌ, আমি বড়-জা, তা আমাকেও কুকুর-শিয়াল মনে কর—তা ভালই কর, কিন্তু হাজার দিন বলেচি, মিছে লোক-দেখান আত্মদ দিয়ে, আমার ভায়ের মাথাটি খেয়ো না—কেমন এখন ঘটল ত ? ওগো, দু'দিন সোহাগ করা সহজ, কিন্তু চিরকালের ভারটি ত তুমি নেবে না—সে ত আমাকেই সইতে হবে ?

ইহা যে কটুক্তি এবং আক্রমণ তাহাই শুধু হেমাসিনী বুঝিল—আর কিছু নয়। মৃদু-কণ্ঠে ভিত্তাসা করিলেন, কি হয়েছে ?

কাদম্বিনী আরো বেশী হাত-মুখ নাড়িয়া কহিলেন, বেশ হয়েছে—খুব চমৎকার হয়েছে। তোমার শেখানোর গুণে আদায়ী টাকা চুরি করতে শিখেচে—আব দু'দিন কাছে ভেঁকে আরো দুটো শলাপারামশ দাও, তা হলে সিদ্ধুক ভাসতে, সিঁদ কটিতেও শিখবে।

একে হেমাসিনী পাঁড়িত, তাহার উপর এই কদর্য বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ—অন্ত সে জ্ঞান হারাইল। ইতিপূর্বে কখনও কোন কারণে ভাণ্ডারের সমুখে কথা কহে নাই ; কিন্তু অজ্ঞ আব থাকিতে পাবিল না। মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমি কি তাকে চুরি-ডাকতি করতে শিখিয়ে দিয়েছি দিদি ?

কাদম্বিনী খচকেন বলিলেন, কেমন করে জানব, কি তুমি শিখিয়ে দিয়েচ, না দিয়েচ। এ হতভাব তার ত আগে ছিল না, এখনই বা হ'ল কেন ? এও লুকোচুরির কথাবার্তাই বা তোমাদের কি, আব এও আত্মদ দেওয়াই বা কি জনো ? ওতদিনের পুঞ্জীভূত আবদ্ধ বিদ্বেষরাসি যে এই একটা পথ পাইয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহা যিনি সব দেখেন, তিনি দেখিতে পাইলেন ;

মুহূর্তকালের জন্য হেমাসিনী হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমন নিষ্ঠুর আঘাত, এত বড় নির্লজ্জ অপমান, মানুষ মানুষকে যে করিতে পারে, ইয়া যেন তাহার মাথায় প্রবেশ করিল না। কিন্তু ঐ মুহূর্তকালের জন্য। পরক্ষণেই সে মর্মান্তিক আহত সিংহীর মত দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া বাহির হইয়া আসিল। ভাণ্ডারকে সমুখে দেখিয়া মাথায় কাপড় আর একটা টানিয়া দিল, কিন্তু রাগ সম্বলহীতে পারিল না। বড়-জাকে সম্বোধন করিয়া মৃদু অথচ কঠোরস্বরে বলিল, তুমি এতবড় চামাচ যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। তুমি এতবড় বেহায়া মেয়েমানুষ যে, ঐ ছোড়টিকে ভাই বলেও পরিচয় দিচ্চ। মানুষ জানোয়ার পয়লে তাকেও পেট ভরে খেতে দেয়, কিন্তু ঐ হতভাগটিকে দিয়ে যত বকমেব ছুটি কাজ করিয়ে নিয়েও তোমরা অজ্ঞ পর্যন্ত একদিন পেট ভরে খেতে দাও না। আমি না থাকলে এতদিনে ও না খেতে পেয়েই মরে যেত। ও পেটের জ্বলন্ত পুষ্টি ছুটে আসে আমার কাছে, সোহাগ আত্মদ করতে আসে না।

বড়-জা বলিলেন, আমবা খেতে দিইনে, শুধু খাটিয়ে নিই,—আর তুমি ওকে খেতে দিয়ে কাঁচিয়ে রেখেচ ?

হেমাসিনী জবাব দিল, ঠিক হই। আজ পর্যন্ত কখনও ও'কে দু'বেলা তোমরা খেতে দাওনি—কেবল মাংসের কবেচ, আর যত পেটে খাটিয়ে নিয়েচ। তোমার ভয়ে আমি হাজার দিন ওকে আসতে পারণ কবেচি, কিন্তু যিদে বদমাশ কবেচ পারে না, আর আমার কাছে পেট ভরে দুটো খেতে পার বলেই ছুটে ছুটে আসে—চুরি-ডাকতিব পরামশ নিতে আসে না। কিন্তু তোমাব, এতবড় হিংসুক যে, এও চোখে দেখতে পার না।

এবার ভাণ্ডার জবাব দিলেন, কেঁদুকে সমুখে টানিয়া আনিয়া তাহার খুঁট বুলিয়া একটা কলাপাতার চোঙ্গা বাহির করিয়া সন্ধ্যাবে বলিয়া উঠিলেন, হিংসুক আমরা ! কেন যে ও, ' ভাল চোখে দেখতে পারিলে, তা তুমিই নিজের চোখে দ্যাখো। মেজবো, ১. তোমার শেখানার গুণেই ও আমার টাকা চুরি করে তোমার ভালোর জন্যে কোন একটা ঠাকুরের পূজা দিয়ে প্রসাদ এনেচে—এই নাও ; বলিয়া তিনি গোটা-দুই সন্দেশ ও ফুল বেলপাতা চোঙ্গায় ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন।

কাদম্বিনী চোখ কপালে জুলিয়া বলিলেন, মা গো ! কি মিটিমিটে শয়তান, কি খড়িবাজ ছেলে ! বেশ ত মেজবৌ, এখন তুমি বল না, কি মতলবে ও চুরি করেছে ? ও কি আমার ভালোর জন্যে ?

হেমাসিনী ক্রোধে জ্ঞান হাবাইল। একে তাহার অসুস্থ শরীর, তাহাতে এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ,

সে দ্রুতপদে কেঁটার সম্মুখীন হইয়া তাহার দুই গালে সশব্দে চড় কষাইয়া দিয়া কহিলেন, বদমাইস চোর, আমি তোকে চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েছি? কতদিন তোকে আমার বাড়ি ঢুকতে বারণ করেছি, কতবার তোকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, তুই চুরির মতলবেই যখন তখন এসে উকি মেরে দেখাভিস।

ইতিপূর্বেই বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। শিবু কহিল, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি মা, পরণ্ড রাস্তিরে ও তোমার ঘরের সুমুখে আঁধারে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। আমি এসে না পড়লে নিশ্চয় তোমার ঘরে ঢুকে চুরি করত।

পাঁচুগোপাল বলিল, জানে মেজখুড়ীমার অসুখ শরীর—সজ্জা হলেই ঘুমিয়ে পড়েন—ও কি কম চালাক!

মেজবোয়ের কেঁটার প্রতি আজকার ব্যবহারে কাদম্বিনী যেকণ প্রসন্ন হইলেন, এই মোল বৎসরের মতো এখনও একপন হন নাই। অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিলেন, ভিজে বেড়াল! কেমন করে জানব মেজবোঁ, তুমি ওকে বাড়ি ঢুকতেও বারণ করেচ। ও বলে বেড়ায়, মেজদি আমাকে মায়েণ চোয়ে ভালবাসে। ঠোঙ্গাসুজ্জ নির্মাল্য টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, টাকা তিনটে চুপি কবে কোথা থেকে দুটো ফুলটুল কুড়িয়ে এনেচ।

বাড়ি লইয়া গিয়া বড়কর্তা চোরের শাস্তি শুরু করিলেন। সে কি নির্দয় প্রহাব! কেঁট কথাও কহে না, কাদেও না। এদিকে মারিলে ওদিকে মুখ ফিরায়, ওদিকে মারিলে এদিকে মুখ ফিরায়। ভাদি গাড়িসুজ্জ গরু কাদায় পড়িয়া যেমন করিয়া মার খায় তেমন করিয়া কেঁট নিঃশব্দে মাং খাইল। এমন কি, কাদম্বিনী পর্যন্ত স্বীকার করিলেন, ইঁ মার খাইতে শিখিয়াছিল বটে। কিন্তু ভগবান জানেন, এখানে আসার পূর্বে নিরীহ স্বভাবের গুণে কখন কেহ তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

হেমাসিনী নিজের ঘরের ভিতর সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়াছিলেন। উমা মার দেখিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, জ্যাঠাইমা বললেন, কেঁটমামা বড় ভাল ডাকাও হবে। ওদের গায়ে কি ঠাকুর আছে—

উমা—?

মায়ের অশ্রুবিকৃত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে উমা চমকাইয়া উঠিল। কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

ইঁ রে, এখনো কি তাকে সবাই মিলে মারচে? বলিয়াই তিনি মোক্কেব উপর উপড় হইয়া পড়িয়া কাদিয়া উঠিলেন।

মায়ের কান্না দেখিয়া উমাও কাদিয়া ফেলিল। তার পর কাছে বসিয়া, নিজের আঁচল দিয়া জননীকে চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, পেসন্নর মা কেঁটমামাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে।

হেমাসিনী আর কথা কহিলেন না, সেইখানে তেমন করিয়াই পড়িয়া বহিলেন। বেলা দু তিনটার সময় সহসা কম্প দিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল। আজ অনেক দিনের পর পথা করিতে বসিয়াছিলেন সে খবার তখনও একধারে পড়িয়া শুকাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর বিপিন ও-বাড়িতে বৌঠানের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ক্রোধভরে স্থান ঘরে ঢুকিতেছিলেন, উমা কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, মা জুরে অজ্ঞান হয়ে আছেন।

বিপিন চমকাইয়া উঠিলেন—সে কি রে, আজ তিন-চারদিন জ্বর ছিল না ত।

বিপিন মনে মনে স্বীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কত যে বাসিতেন, তাহা বছর চাবপাঁচ পূবে দাদাদের সহিত পৃথক হইবার সময় জানা গিয়াছিল। ব্যাকুল হইয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন, তখনও তিনি মাটির উপর পড়িয়া আছেন। ব্যস্ত হইয়া শয্যায় তুলিবার জন্য গায়ে হাত দিতেই হেমাসিনী চোখ মেলিয়া, একমুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাদিয়া উঠিলেন— কেঁটকে আশ্রয় দাও, নইলে, এ জ্বর আমার সারবে না। মা দুর্গা আমাকে কিছুতে মাপ করবেন না।

বিপিন পা জড়াইয়া হেমাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া সাহুনা দিতে লাগিলেন।

হেমাসিনী বলিলেন, দেবে?

বিপিন সজল চক্ষু হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন, তুমি যা চাও তই হবে, তুমি ভাল হয়ে ওঠ।

হেমাসিনী আর কিছু বলিলেন না, বিদ্যনায় উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন।

জ্বর রাত্রেই ছাড়িয়া গেল, পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া লোকানে বাহির হইতেছিলেন, হেমাসিনী আসিয়া বলিলেন, মার খেয়ে কেঁটার ভারী জ্বর হয়েছে, তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসছি।

বিপিন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তাকে এ-বাড়িতে আনবাব দরকার কি? যেখানে আছে সেখানেই থাক না।

হেমাসিনী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিলেন, কাল রাতে যে তুমি কথা দিলে, তাকে অশ্রয় দেবে।

বিপিন অপরাজভরে নাথা নাড়িয়া বলিলেন, ঠী— সে কে যে, তাকে ঘরে এনে পুসতে হবে। তুমি যখন।

কাল ব্যাধে ঠীকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া যাহা ঠীকবে করিয়াছিলেন। আজ সকালে ঠীকাতর সুস্থ দেখিয়া অত্যন্ত চোখে করিয়া দিলেন। ছাত্রটি বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়িয়া বলিলেন, পানপানি কদ না। দাদাবা ভদ্রী চটে যাবেন।

হেমাসিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠ কহিলেন, দাদাবা চটে গিয়ে কি হোক বুন করে, সেসবই পানপান না আমি নিয়ে এসে সমসারে, কেউ হোক অটিকে রাখতে পারে। আমার দুটি সন্তান ছিল, কাল হোক তিনটি হয়েছে। আমি কেঁদে মার।

অজ্ঞা, সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া বিপিন চলিয়া যাইতেছিল, হেমাসিনী সুমুগ্ন অসিয়া দাঁড়িয়া বলিলেন, এ বাড়িতে তাকে অশ্রয় দেবে না।

সব সব কি পানপানি কদ? বলিয়া বিপিন চোখ লজ্জিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমাসিনী ডাকিলেন, শিশু একটা গরুর গাড়ি ডাকে আস, আমি বাগেরে বর্জি যাব।

বিপিন শুনিলেও পঠিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, ইস! ভাব দেখানো হচ্ছে। তবে পরে দেখানো চলিয়া গেলেন।

কেরী চণ্ডীমণ্ডপের একশায়ে ছেঁড়া মাদুরের উপর জ্ববে, গায়েব কাধায় এবং কোথ করি বুকেরে যথায় আচ্ছাদ্যেব মত পড়িয়া ছিল। হেমাসিনী ডাকিলেন, কেরী

কেরী যেন প্রস্তুত হইয়া ছিল। এইবারে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বসিল। মেজদিদি পরক্ষণে সলজ্ঞ হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। যেন তাহার কোন অসুখ-বিসুখ নাই, এই ভাবে মহা উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়িয়া, কোঁচ দিয়া ছেঁড়া মাদুর কাড়িতে কাড়িতে বলিল, বাস

হেমাসিনী তাহার হাত ধরিয়া বুকেরে কাছে টানিয়া অনিয়া বলিলেন, আর ত কসব না লস। অথ আমায় সঙ্গে, আমাকে বগপেব বর্জি অজ্ঞা তোরো পৌছে দিতে হবে যে।

চল, বলিয়া কেরী তাহার ভাঙ্গা ছাড়টা বগলে চাপিয়া লইল এবং ছেঁড়া পানচখানা কাঁধে ফেলিল।

নিজেদের বাড়ির সদরে, গায়েন দাঁড়িয়াছিল, হেমাসিনী কেরীকে লইয়া চাডয়া বলিলেন। গাড়ি যখন গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন পশ্চাতে ডাকডাকি চাৎকারে গলডবান গাড়ি ডাকিল। হেমাসিনী কলেবরে আবদ্ধ মুখে বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সভয়ে এক কাঁবলেন, কোথায় যাও মেজবৌ?

হেমাসিনী কেরীকে দেখাইয়া বলিলেন, এদের গ্রামে।

কখন ফিববে?

হেমাসিনী গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠ উত্তর দিল, ভগবান যখন ফেরাবেন, তখনই ফিবব।

তাব মানে?

হেমাসিনী পুনর্বার কেরীকে দেখাইয়া বলিল, কখনও যদি কোথাও এও অশ্রয় জোড়ী, তবেই ত একা ফিববে আসতে পারব, না হ'ল, এক নিয়েই থাকতে হবে।

বিপিনের মনে পড়িল, সেদিনও স্ত্রীর এমন মুখের ভাব দেখিয়াছিলেন এবং এমন কঠোরই শুনিয়াছিলেন, যেদিন মতি কামারের নিঃসহায় ভাগিনেয়ের বাগানখানি বাঁচাইবার জন্য তিনি একাকী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। মনে পড়িল, এ মেজবৌ সে নয়, যাহাকে চোখ রাসহিয়া টলান যায়।

বিপিন নব্রহ্মের বলিলেন, মাপ কর মেজবৌ, বাড়ি চল।

হেমাসিনী হাতজোড় করিয়া কহিলেন, আমাকে তুমি মাপ কর—কাজ না সেবে আমি কোনমতেই বাড়ি ফিরিতে পারব না।

বিপিন আর একমুহূর্ত স্ত্রীর শাস্ত দৃঢ় মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন তাহার পর সহসা সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেঁটার ডান-হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কেঁটা, তোর মেজদিকে তুই বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আয় ভাই; শপথ করছি, আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাই বোনকে আর থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না। আয় ভাই, তোর মেজদিকে নিয়ে আয়।

দর্পচূর্ণ

এক

সন্ধ্যার পর ইন্দুমতী বিশেষ একটা সাজসজ্জা করিয়া তাহার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, কি হচ্ছে?

নরেন্দ্র একখানি বাঙ্গলা মাসিকপত্র পড়িতেছিল; মুখ তুলিয়া নিঃশব্দে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সেখানি হাতে তুলিয়া দিল।

ইন্দু খোলা পাড়টার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া, জোড়া ভ্রু ঈষৎ কৃষ্ণিত করিয়া বিষ্ময় প্রকাশ করিল—ইস, এ যে কবিতা দেখছি! তা বেশ—বসে না থাকি, বেগান খাটি। দোঁখ এখানে কি কাগজ? ‘সরস্বতী’? ‘স্বপ্রকাশ’ ছাপালে না বুঝি?

নরেন্দ্রর শাস্ত দৃষ্টি ব্যথায় স্তান হইয়া আসিল।

ইন্দু পুনরায় প্রশ্ন করিল, ‘স্বপ্রকাশ’ ফিরিয়ে দিলে?

সেখানে পাঠাই নি।

পাঠিয়ে একবার দেখলে না কেন? ‘স্বপ্রকাশ’, ‘সরস্বতী’ নয়, তাদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এইজন্যেই আমি যা আ কাগজ কখনো পড়িনে।

একটু হাসিয়া ইন্দু আবার কহিল, আচ্ছা, নিজের লেখা নিজেই খুব মন দিয়ে পড়। ভাল কথা, আজ শনিবার, আমি ও-বাড়ির ঠাকুরঝিকে নিয়ে বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি। কমলা ঘুমিয়ে পড়েছে কাব্যের ফাঁকে মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো। চললুম।

নরেন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, যাও।

ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা গভীর নিঃশ্বাস কানে যাইতেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কিছু একটা করতে চাইলেই তুমি অমন করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল কেন, বলত? এতই যদি তোমার দুঃখের স্বালা, মুখ ফুটে বল না কেন, আমি বাবাকে চিঠি লিখে যা হোক একটা উপায় করি।

নরেন্দ্র মুহূর্তকাল মুখ তুলিয়া ইন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল যেন সে কিছু বলিবে। কিন্তু কিছুই বলিল না, নীরবে মুখ নত করিল।

নরেন্দ্রের মামাত ভগিনী বিমলা ইন্দুর সখী। ও-রাস্তার মোড়ের উপরেই তাহার বাড়ি। ইন্দু গাড়ি দাঁড় করাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিম্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, ও কি ঠাকুরঝি! কাপড় পরনি কেন! খবর পাওনি নাকি?

বিমলা সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, পেয়েছি বৈ কি, কিন্তু একটু দেরি হবে ভাই। উনি এইমাত্র একটুখানি বেড়াতে বেরুলেন—ফিরে না এলে ত যেতে পারব না।

ইন্দু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। একটা বোঁচা দিয় প্রশ্ন করিল, প্রভুর স্বকুম পাওনি বুঝি?

বিমলার সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে ভরিয়া গেল। এই বোঁচাটুকু সে যেন ভাবী উপভোগ করিল। কহিল, না, দাসীর আর্জি এখনও পেশ করা হয়নি, হলে যে না-মঞ্জুর হবে না, সে ভবসা করি।

ইন্দু আরও বিরক্ত হইল। প্রশ্ন করিল, তবে পেশ হয়নি কেন? খবর ত তোমাকে আমি বেলা পাকতেই পাঠিয়েছিলুম।

তখন সাহস হ'ল না কৌ। অফিস থেকে এসেই বললেন, মাথা ধরেছে। ভাবলুম, ভালটল খেয়ে একটু ঘুরে আসুন, মনটা প্রফুল্ল হোক—তখন জানাব। এখনও ত দেরি আছে, একটু ব'সো না ভাই, তিনি ফিরে এলেন বলে।

কি জানি, কিসে তোমার হাসি আসে ঠাকুরঝি! আমি এমন হলে লজ্জায় মরে যেতুম। আচ্ছা, থাকে কিংবা বেগাবটাকে বলে কি যেতে পার না?

বিমলা সভয়ে বলিল, বাপ রে! তা হলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন—এ-ভায়ে আর মুখ দেখবেন না।

ইন্দু ক্রোধে বিষ্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, দূর করে দেবেন! কোন্ আইন? কোন্ অধিকার শুনি?

বিমলা নিতান্ত সহজভাবে জবাব দিল, বাধা কি কৈ? তিনি মালিক—আমি দাসী বৈ ত নয়! তিনি এতালো, কে তাঁকে ঠেকাবে বল?

কোবে বাজা। ঠেকাবে আইন। সে চুলোর যাক! ঠাকুরঝি, কিন্তু নিজের মুখে নিজেকে দাসী বলে কবুল করতে কি একটু লজ্জা হয় না? স্বামী কি মোগল বাদশা? আর স্ত্রী কি তাঁর ক্রীতদাসী?

যে, আপনাকে আপনি এমন হীন, এমন তুচ্ছ করে গৌরব বোধ করচ?

এই ক্রোধটুকু লক্ষ্য করিয়া বিমলা আমোদ বেধি কবিল, কহিল, তোমার ঠাকুরঝি যে মুখা মেয়েমানুষ বৌ, তাই নিজেকে স্বামীর দাসী বলে গৌরব বোধ করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি ভাই, তুমি যে এত কথা বলচ, তুমিই কি বাড়ি থেকে বেরিয়েচ মামার স্বকুম না নি?

স্বকুম? কেন, কি জন্যে? তিনি নিজে যখন কোথাও যান—

আমার স্বকুমেব অপেক্ষা করেন কি? আমি যাচ্ছি, শুধু এই কথা তাঁকে জানিয়ে এসেছি। নিমেষমাত্র মৌন থাকিয়া, অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, তবে এ কথা মানি যে, আমার মত গুণের স্বামী কম মেয়েমানুষের ভাগ্যে জোটে। আমার কোন ইচ্ছেতেই তিনি বাধা দেন না।

কিন্তু এমন যদি এ-ও-হ'ত, তিনি যদি নিতান্তই অবিবেচক হতেন, তা হলেও তোমাকে বলচি ঠাকুরঝি, আমি নিজের সম্মান যোগ আনা বজায় রাখতে পারতুম; কিছুতেই তোমাদের মত এ কথা ভুলতে পারতুম না যে, আমি সঙ্গিনী, সহধর্মিণী—তার ক্রীতদাসী নই। জানো ঠাকুরঝি, এমন করেই আমাদের দেশের সমস্ত মেয়েমানুষ পুরুষের পায়ে মাথা মুড়িয়ে এত ক'রে এমন খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের সম্মান নিজে না রাখলে, কেউ কি যেতে দেয় ঠাকুরঝি?—

কেউ না। আমার ত এমন স্বামী, তবুও কখনও তাঁকে আমি এ কথা ভাববার অবকাশ দিইনি—তিনিই প্রভু, আর আমি স্ত্রী বলেই তাঁর বাদী। আমার নারাদেহেও ভগবান বাস করেন, এ কথা আমি নিজেও ভুলিনে—তাঁকেও ভুলতে দিইনে।

বিমলা চুপ করিয়া শুনিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল; কিন্তু তাহাতে লজ্জা বা অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পাইল না। কহিল, জানিনে বৌ, আশ্চর্যসম্রম আদায় করা কি; কিন্তু তাঁর পায়ে আশ্চর্যসম্রম দেওয়াটা বুঝি। ঐ যে উনি এলেন; একটু ব'সো ভাই; আমি শিগগির স্বকুম নিয়ে আসি, বলিয়া,

হঠাৎ একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া দ্রুতপায়ে প্রস্থান করিল। ইন্দু এ হাসিটুকু দেখিতে পাইল। তাহার সর্বাস্থ রাগে রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বায়স্কোপ হইতে ফিরিবার পথে ইন্দু হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ঠাকুরবি, তুমি না পেলে তু তুমি আসলে পারতে না।

বিমলা পথের দিকে চাহিয়া অনামনস্ক হইয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল, বলিল, না।

তাই আমার মনে হয় ঠাকুরবি, আমি যখন তখন এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাই বলে, তোমার স্বামী হয়ত রাগ করেন।

বিমলা মুখ ফিরিয়া কহিল, তা হলে আমি নিজেই বা যাব কেন বৌ। এবং আমার ভয় হয়, তুমি এমন করে এসো বলে দাদা হয়ত মনে মনে আমার উপর বিবর্ত্ত ওন।

ইন্দু সগর্বে কহিল, তোমার দাদার সে স্বভাব নয়। একে ত কখনো তিনি নিজের অস্বিকারের বাহ্যে পা দেন না, তা ছাড়া আমার কাছে বাগ করবেন, আমি ঠিক জানি, এ অপরাধ তাঁর স্বপ্নেও আছে না।

বিমলা মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া, গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বৌ, দাদা তোমাকে কি ভালই না বাসেন। কিন্তু তুমি বোধ করি—

এতক্ষণে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, তাঁর কথা অস্বীকার করিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হ'ল কিসে?

তা জানিনে বৌ। কিন্তু মনে হয় যেন—

কেন হয় জান ঠাকুরবি, তোমাদের মত পায়ে লুটিয়ে পড়া ভালবাসা আমার নেই বলে। তার ঈশ্বর ককন, আমার নারী-মর্যাদাকে ভিঙিয়ে যেন কোনদিন আমার ভালবাসা মাথা তুলে উঠতে না পারে। যে ভালবাসা আমার স্বাধীন সত্তাকে লঙ্ঘন করে যায়, সে ভালবাসাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।

বিমলা গোপনে শিরহিয়া উঠিল।

মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, কথা কও না যে ঠাকুরবি। কি ভাবচ?

কিছু না। প্রার্থনা করি, দাদা তোমাকে চিবদিন এমনই ভালবাসুন, কারণ, ফতেই কেন বলে না বৌ, মেয়েমানুষের স্বামীর ভালবাসার চেয়ে বিশ্বক্ৰম্মাণ্ডও বড় নয়। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া বিমলা পুনরায় কহিল, কি জানি, কি তোমার নারীমর্গাদা—আব কি তোমার স্বাধীন সত্তা? আমি ও আমার সমস্তই তাঁর পায়ে ডুবিয়ে দিয়ে বেঁচেছি। সত্যি বলচি বৌ, আমার ত এমন দশা হয়েছে, নিজেকে ইচ্ছে বলেও যেন আর কিছু বাকী নেই। তাঁর ইচ্ছেই—

ছি ছি, চুপ কর—চুপ কর—

বিমলা চমকিয়া চুপ করিল। ইন্দু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিল, আমাদের দেশের মেয়েবা কি মাটির পুতুল? প্রাণ নেই, আত্মা নেই—কিছু! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এত করে কি পেয়েচ? আমার চেয়ে বেশী ভালবাসা আদায় করতে পেরেচ কি? ঠাকুরবি, ভালবাসা মাপবার যে যন্ত্র নেই, নইলে মেয়ে দেখাতে পারতুম—যাক সে কথা—

কিন্তু কেন জান? নিজেই তোমাদের মত নীচু করিনি বলে— তোমাদের এই কাঙাল প্রতি মাথায় তুলে নিহিনি বলে। আমার ভারী দুঃখ হয় ঠাকুরবি, কেন তিনি এত শাস্ত্র, এত নিরীহ। কিছুতেই একটা কথা শুনেন না—নইলে দেখিয়ে দিতুম, তিনি যাকে গ্রাস করেন না, সেও মানুষ, সেও অগ্রহণ করতে জানে। সেও আত্মমর্যাদা হারিয়ে ভালবাসা চায় না।

ও আমার কি? মুখ ফিরিয়ে হাসচ যে?

বিমলা জোরে কবিত্তা হাসি চাপিয়া বলিল, কৈ—না।

না কেন? এখনো ত তোমার ঠ্যাট্টা হাসি লেগে রয়েছে।

বিমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, লেগে রয়েছে তোমার কথা শুনে। ওগো বৌ, অনেক পেয়েছি নইতি এত কথা বোকাচ্ছে। ইন্দু ক্রুদ্ধমুখে জিজ্ঞাসা করিল, না পেলে?

বেরত না।

ভুল—নিছক ভুল। ঠাকুরঝি, সকলেই তোমার মত নয়—সকলেই ভিকে চেয়ে বেড়ায় না। আশ্বগৌরব বোঝে, এমন নারীও সংসারে আছে।

এবার বিমলার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল বলিল, তা জানি।

জানলে আর বলতে না। যাই হোক, এখন থেকে জে' যা, যে ভিকে চায় না, নিজের জোরে আদায় করে, এমন লোকও আছে।

বিমলা ব্যথিত স্বরে বলিল, আচ্ছা। এই যে বাড়ি এসে পড়েছি। একবার নামবে না কি?

নাঃ—আমিও বাড়ি যাই। গাড়েয়ান, ঐ ও গালিতে—

দাদাকে আমার প্রশ্ন দিও বৌ!

দেবো,—গাড়েয়ান চলো—

দুই

আর নেই—সংসার-স্বরচের কিছু টাকা দিতে হবে যে।

স্বীয় প্রার্থনায় নরেন্দ্র আশ্চর্য হইলা কহিল, এর মধ্যেই দুশ টাকা ফুবিবে গেল।

না গেলে কি মিথো কথা বলছি; না, লুকিয়ে রেখে চাইছি।

নরেন্দ্রর চোখে-মুখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল। কোথায় টাকা? কি করিয়া সংগ্রহ করিবে?

সেই মুখের ভাব ইন্দু দেখিল, কিন্তু ভুল করিয়া দেখিল। কহিল, শিখাস না হয়, এখন থেকে একটা খাতা নিয়ে, বিচার লিখে লেখব। কিংবা এক কাজ কর না—

স্বরচের টাকাকড়ি নিজের হাতেই দেখ—তাতে তোমারও ভয় থাকবে না, আমিও সংশয়ের লজ্জা থেকে বেহাই পাব। বলিয়া তাঁর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল তাঁহার মুখের গাঢ় ছায়া বেদনায় গাঢ়তর হইয়াছে। নরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, অবিশ্বাস করিনে, কিন্তু—

কিন্তু কি? শিখাসও হয় না—এই ত? আচ্ছা যাচ্ছি, হতটা পারি, হিসেব লিখে আনি। উঃ—কি সুখের ঘরকন্ঠাই হয়েছে আমার! বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কিন্তু কেন? কিসের জন্য হিসেব লিখতে যাব—

আমি কি মিথো বলি? আমার মামাত বোনের বিয়েতে কাপড়-জামা লাগল—পঞ্চাশ টাকার ওপৰ। কমলার জামা দুটোর দাম বার টাকা—

সেদিন বায়ন্সোপে স্বরচ হ'ল দশ-বার টাকা—কহিয়ে দেখ দেখি,—কী থাকে কত? তাতে এই দশ পনের দিন সংসার-স্বরচটা কি এমনি বেশী যে, তোমার দুই চোখ লে উঠছে? আমার দাদার সংসারে মাসে সাত আট শ' টাকাতেও যে হয় না। সত্যি বলচি, এমন করলে আমি ত আর ঘরে টিকতে পারিনে। তার চেয়ে বরং স্পষ্ট বল, দাদা মেদিনীপুরে বদলী হয়েছেন, আমি মেয়ে নিয়ে চলে যাই—আমিও জুড়োই, তুমিও বাঁচ!

নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া, মুখ তুলিয়া কহিল, এ-বেলায় ত হবে না, দেখি যদি ও বেলায় কিছু যোগাড় করতে পারি।

তার মানে? যদি যোগাড় না করতে পার, ত উপোস করতে হবে নাকি? দেখ, কালই আমি মেদিনীপুরে যাব। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। এই দালালী বাবসা ছেড়ে দিয়ে, দাদাকে ধরে একটা চাকরি যোগাড় করে নাও। তাতে বরঞ্চ ভবিষ্যতে থাকবে ভাল, নইলে যা পার না, তাতে হাত দিয়ে নিজেকে মাটি হ'য়ে না, আমাকে নষ্ট করো না।

নরেন্দ্র জবাব দিল না। ইন্দু আরও কি বলিতে চেষ্টা করতছিল; কিন্তু এই সময়ে বেহারাটা শব্দবাবুর আগমন সংবাদ জানাইল, এবং পবক্ষণেই বাহিরে জুতার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দু পার্শ্বের দ্বার দিয়া পদার আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইল।

শব্দবাবু মহাজন। নরেন্দ্রর পিতা বিস্তর ঋণ করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্রের কাছে তাগাদা করিতে শব্দবাবু প্রায়ই শুভাগমন করিয়া থাকেন। আজিও উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মৃদুভাষী। আসন গ্রহণ

করিয়া ধীরে ধীরে এমন গুটি-কয়েক কথা বলিলেন, যাহা দ্বিতীয়বার শুনিবার পূর্বে অতি-বড় নিলজ্জও নিজের মাথাটা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দ্বিধা করিবে না। শব্দবাবু প্রস্থান করিলে, ইন্দু আর একবার সুমুখে আসিয়া দাড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে?

শব্দবাবু।

তার পরে?

কিছু টাকা পাবেন, তাই চাইতে এসেছিলেন।

সে টের পেয়েছি। কিন্তু, খার করেছিলে কেন?

নরেন্দ্র এ প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরাইয়া দিল। কহিল, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, তাই—

ইন্দু অতিশয় রুদ্ধস্বরে বলিল, তোমার বাবা কি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের কাছে দেনা করে গেছেন? এ শোধ করবে কে? তুমি? কি করে করবে শুনি?

এতগুলো প্রশ্নের এক নিশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দু নিজেও সেজন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল না—তৎক্ষণাৎ কহিল, বেশ ত, তোমার বাবা না হয় হঠাৎ মারা গেছেন, কিন্তু তুমি ও হঠাৎ বিয়ে করনি। বাবাকে এ-সব ব্যাপার তোমার ত জানান উচিত ছিল। আমাকে গোপন করাও ত কর্তব্য হয়নি। লোকের মুখে শুনি, তুমি ভারী ধর্মভীরু লোক, বলি এ-সব বৃথি তোমার শর্মশাস্ত্রে লেখে না? বলিয়া ঠিক যেন সে যুদ্ধ করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু হায় রে, এতগুলো সূতীক্ক বাণ যাহার উপর এমন নিষ্ঠুরভাবে বর্ষিত হইল, ভগবান তাহাকে কি নিরস্ত্র, কি নিরুপায় করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন! কাহাকেও কোন কারণেই প্রতিঘাত কবিবাব সাধ্যাটুকুও তাহার ছিল না; শুধু সাধা ছিল সহ্য করিবার। আঘাতের সমস্ত বেদনাই তাহার নিজের মধ্যে পাক খাইয়া, অত্যন্ত সময়ের মধ্যে শুষ্ক হইয়া যাইত; কিন্তু সেই স্বল্প সময়টুকুও অজ্ঞ তাহাৎ মিলিল না। শব্দবাবুর অভাগ্র কথার জ্বালা কণামাত্র শান্ত হইবার পূর্বেই ইন্দু তাহাতে এমন ভীষণ তীব্র জ্বালা সংযোগ করিয়া দিল যে, তাহারই অসহ্য দহনে অজ্ঞ সেও প্রত্যন্তরে একটা কঠোর কথাই বলিতে উদ্যত হইয়া উঠিল; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না।

অক্ষমের নিম্মল আড়ম্বর মাথা তুলিয়াই ফাটিয়া ভাসিয়া পড়িল। শুধু ক্ষীণস্বরে বলিল, বাবাব সম্বন্ধে তোমার কি এমন করে বলা উচিত।

না—উচিত নয়—কিন্তু আমার উচিত-অনুচিতের কথা তোমাকে মীমাংসা করে দিতে ত বলিনি; কেন তোমাদের সমস্ত ব্যাপার বাবাকে খুলে বলনি?

আমি কিছুই গোপন করিনি ইন্দু। তা ছাড়া, তিনি বাবাব বালাবন্ধু ছিলেন, নিজেই সমস্ত জানতেন।

তা হলে বল সমস্ত ভেনে-তুনেই বাবা আমাকে জলে ফেলে দিয়েছেন।

অসহ্য ব্যথায় ও বিষ্ময়ে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া শির নত করিল। ঝাঁর এই ক্রোধ যথার্থই সত্য কিংবা কলহের ছলনা মাত্র, হঠাৎ সে যেন ঠাঠর করিতে পারিল না।

এখানে গোড়ার কথা একটু বলা আবশ্যিক। এক সময়ে বঙ্গকাল উভয় পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়াছিলেন এবং বিবাহটা সেই সময়েই একরূপ হিব হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ইন্দুর পিতা নিজের মত-পরিবর্তন করিয়া, মেয়েকে একটু অধিক বয়স পর্যন্ত অদিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে মনস্থ করায় বিবাহ-সম্বন্ধও ভাসিয়া যায়। কয়েক বর্ষ পরে ইন্দুর আঠার বৎসর বয়সে আবার যখন কথা উঠে, তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনে নরেন্দ্রও পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সময় তাহার সাংসারিক অবস্থা ইন্দুর পিতা-মাতা যথেষ্ট পর্যালোচনা করিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহাদের মত পর্যন্ত ছিল না; শুধু বয়স্হা ও শিক্ষিতা কন্যার প্রবল অনুরাগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

এত কথা এত শীঘ্র ইন্দু যথার্থই তুলিয়াছে কিংবা মিথ্যা মোহে অন্ধ হইয়া নিজেকে প্রতারিত করিবার নিদারুণ আশ্বস্তানি এখন এমন করিয়া তাহাকে অহরহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র শুষ্ক-নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া বহিল।

সেই নির্বাক স্বামীর আনত মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দু আর কোন কথা না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে নিঃশব্দে গেল বটে—এমন অনেক দিন গিয়াছে ; কিন্তু আজ অকস্মাৎ নরেন্দ্রর মনে হইল, তাহার বৃকে বড় বেদনার স্থানটা ইন্দু যেন ইচ্ছাপূর্বক জোর করিয়া মাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। একবার ইষৎ একটু ঘাড় তুলিয়া দ্বীর নিক্তর পদক্ষেপ চাহিয়া দেখিল ; যখন আর দেখা গেল না, তখন গভীর—অতি গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজীবের মত সেইখানেই শুইয়া পড়িল। সহসা আজ প্রথমে মনে উদয় হইল, সমস্ত মিথ্যা—সব ফাঁকি। এই সংসার, স্ত্রী-কন্যা, প্রেম-প্রেম—সমস্তই আজ তাহার কাছে মরুভূমির মরীচিকার মত উবিয়া গেল।

তিন

কে রে, বিমল ? আয় বোন বোস ! বলিয়া নরেন্দ্র শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। তাহার উভয় ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথার যে চিহ্নটুকু প্রকাশ পাইল, তাহা বিমলার দৃষ্টি এড়াইল না।

অনেক দিন দেখিনি দিদি, ভাল আছিস ত ?

বিমলার চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। সে দীরে দীরে শয্যা প্রান্তে আসিয়া বলিল, কেন দাদা তোমার অসুখের কথা আমাকে এতদিন জানাও নি ?

অসুখ তেমন তো কিছুই ছিল না বোন, শুধু সেই বৃকের বাধাটা একটু—

বিমলা হাত দিয়া এক ফোটা চোখের জল মুছিয়া বলিল, একটু বৈ কি। উঠে বসতে পার ন—ডাক্তার কি বললে ?

তাঁহা ডাক্তার কি হবে রে, ও আপনি সেবে যাবে।

এ্যা! ডাক্তার পর্যন্ত ডাকাও নি ? ক'দিন হল ?

নরেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, ক'দিন ? এই ত সেদিন রে। দিন-সাতেক হবে বোধ হয়।

সাত দিন ! তা হলে দৌ সমস্ত দেখেই গেছে !

না না, দেখে যাবনি বোধ হয়—অসুখ অজ্ঞানার নিশ্চয় সে বুঝতে পারেনি। আমি তার যাবার দিনও উঠে গিয়ে বাইরে বসে ছিলাম। না না, হাজার হোক তাই কি তোরা পারিস বোন ?

হৌ তা হলে রাগ কবে গেছে, বল ?

না, রাগ নয়, দুঃখ-কষ্ট—কত অভাব জানিস ত ? ওদের এ-সব সহ্য করা অভ্যাস নেই, দেহটাও তাই বড় ধাবান হয়েচে, নইলে অসুখ দেখলে কি তোরা রাগ কবে থাকতে পারিস ?

বিমলা অশ্রু চাপিয়া কঠিনস্বরে বলিল, পাবি বৈ কি দাদা, তুমিও বড় অসুখ কান্ড কিছু নেই। না হলে, তোমরা বিছানায় না শোয়া পর্যন্ত আর আমাদের চোখে ? না! ভোলা, পালকি এলো বৈ ?

আনতে পারিয়েছি মা।

এব মধোই যাবি দিদি ? এখনো ত সজ্জা হয়নি, হার একটু বোস না ?

না দাদা, সজ্জা হলে হিম লাগবে। ভোলা, পালকি একেবারে ভিতরে আনিস।

ভিতরে কেন, বিমল ?

ভেতরেই ভাল দাদা। এই বাথা নিয়ে তোমার বাইরে গিয়ে উঠতে কষ্ট হবে।

আমাকে নিয়ে যাবি এই পাগল দেখ ! কি হয়েছে যে, এত কাণ্ড করতে হবে ? এ ত আমার প্রায়ই হয়। প্রায়ই সেয়ে যায়।

তাঁহি যাক দাদা। কিন্তু তাই ও আমার আর নেই যে, তোমাকে হারালে ওর একটি পাব। ঐ যে পালকি—এই রাপারখানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে। ভোলা, আর একটু এগিয়ে আনতে বল—না দাদা, এ সময়ে তোমাকে চোখে চোখে না রাখতে পারলে আমার তিলার্থ স্বস্তি থাকবে না।

কিন্তু, নিয়ে যেতে চাইবি বুঝিলে যে তোকে আমি খবরই দিচ্ছি না।

বিমলা মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমাদের বোঝা তোমাদেরই থাক দাদা, আমাকে আর তনিয়ে না। আচ্ছা, কি করে মুখে আনলে বল ত ? এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে

পারি? সত্যি কথা বল!—নরেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে চল যাই।

দাদা!

কি রে?

আজ রাতেই বৌকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, কাল সকালেই চলে আসুক।

নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না, না, সে দরকার নেই।

কেন নেই? মেদিনীপুর ত বেশী দূর নয়, একবার আসুক, না হয় আবার চলে যাবে।

না রে বিমল, না। সত্যিই তার দেহটা ভাল নেই—দু'দিন জুড়োক।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বিমল, আমি তোরা কাছে থেকে ভাল না হতে পারি ত আর কিছুতেই পারব না। হী রে, আমি যে যাচ্ছি, গগনবাবু শুনেচেন?

বেশ যা হোক তুমি! তিনি ত এখনো অফিস থেকেই ফেরেন নি।

তবে—

তবে আবার কি? তোমার ভয় নেই দাদা, তাঁর বেশ বড় বড় দুটো চোখ আছে, আমরা গেলেই দেখতে পাবেন।

নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, বিমল, আমার যাওয়া ত হতে পারে না।

বিমলা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

গগনবাবুর অমতে—

অমন করলে মাথা খুঁড়ে মরব দাদা! একটা বাড়ির মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে যে, আমাকে অপমান করচ?

অপমান করচি? ঠিক জানিস বিমল, ভিন্ন মত থাকে না?

বিমলা আবশ্যক বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইতেছিল, সলজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দাদা, আজ বাখাটা তত টের পাচ্চ না, না?

একেবারে না। এ আট দিন তোরদের কি কষ্টই না দিলুম—এখন বিদেয় কর দিদি।

করব কার কাছে? আচ্ছা দাদা, এই ষোল-সতের দিনের মধ্যে বৌ একখানা চিঠি পর্যন্ত দিলে না?

না, দিয়েচেন বৈ কি। পৌছান-সংবাদ দিয়েছিলেন, কালও একখানা পেয়েছি—বরং, আমিই জবাব দিতে পারিনি ভাই।

বিমলা মুখ ভার করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিল, সেখানে গিয়ে পর্যন্ত সে ভাল নেই—সদ্দি-কাসি, পরন্তু একটু জ্বরের মতও হয়েছিল, তবু তার ওপরেই চিঠি লিখেছেন।

আজ তাই বুঝি সেখানে টাকা পাঠিয়ে দিলে?

নরেন্দ্র অধিকতর লজ্জিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিছুই ত তার হাতে ছিল না—বাড়ির পাশেই একটা মেলা বসচে,—লিখেচেন, সেটা শেষ হয়ে গেলেই ফিরতে পারবেন—তোমাকে বুঝি চিঠিপত্র লিখতে পারেন নি?

পেরেচেন বৈ কি। কাল আমিও একখানা চাপপাতা-গোড়া চিঠি পেয়েছি—

পেয়েছিস? পাখি বৈ কি—তার জবাবটা—

তোমার ভয় নেই দাদা—তোমার অসুখের কথা লিখেনো না। আমার নষ্ট করবার মত অত সময় নেই। বলিয়া বিমলা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে খোলা জানালার ভিতর দিয়া লাল আকাশের পানে চাহিয়া নরেন্দ্র স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল, বিমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চুপ করে কি ভাবছ দাদা?

নরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, কিছুই ভাবিনে বোন, মনে মনে তোকে আশীর্বাদ করছিলাম, যেন এমন সুখেই তোরা চিরদিন কাটে।

বিমলা কাছে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাখায় লইয়া একটা টোঁকির উপর বসিল।

আচ্ছা, দুপুরবেলা অত রাগ করে চলে গেলি কেন বত ত?

আমি অনায়াসেইতে পারিনে। কেন তুমি অত—

অত কি বল? ইন্দুর দিক থেকে একবার চেয়ে দেখ দেখি? আমি ত তাকে সুখে রাখতে পারিনি?

সুখে থাকতে পারার ক্ষমতা থাকা চাই দাদা! সে যা পেয়েছে এত ক'জন পায়? কিন্তু সৌভাগ্যকে মাথায় তুলে নিতে হয়; নইলে—কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই বিমলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

নরেন্দ্র নীরবে বিন্দু-সমূহ দৃষ্টিতে এই ভগিনীটির সর্বাস্ত অভিব্যক্ত করিয়া দিয়া, কলকাল পরে কহিল, বিমল, লজ্জা করিস নে দিদি, সত্য বল ত, তুই কখনো ঋগড়া করিস নে?

উনি বলেচেন বৃষ্টি? তা ত বলবেনই।

নরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, না, গগনবাবু কিছুই বলেন নি—আমি তোকেই জিজ্ঞাসা করছি।

বিমলা আরও মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাকে সঙ্গে ঋগড়া করে কে পাববে বল? শেষে হাতে-পায়ে পড়ে—ওখানে দাঁড়িয়ে কে?

আমি, আমি—গগনবাবু। থামলে কেন—বলে যাও। ঋগড়া করে কার হাতে-পায়ে কাকে পড়তে হয়—কথাটা শেষ করে ফেল।

যাও—যে সাধু-পুরুষ লুকিয়ে গোনো, তার কথায় আমি জবাব দিইনে। বলিয়া, বিমলা কৃত্রিম ক্রোধের আড়ালে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মোটা তাকিয়াটা হেলান দিয়া বসিল। গগনবাবু বলিলেন, এ-বেলায় কেমন আছ ত?

ঐ, হয়ে গেছি। এবার বিদায় দাও ভাই।

বিদায় দাও? বাস্তব হয়ে না হে— দু'দিন থাকো। তোমার এই কোনটির আশ্রয়ে যে যত্ন দিন বাস করতে পায়, তার তত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে খবর জেন?

জানিনে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

গগনবাবু দুই চক্ষু বিশ্কারিত করিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করি কি হে, এ যে প্রমাণ করা কথা। বাস্তবিক নরেন্দ্রবাবু, এমন রক্তও সংসারে পাওয়া যায় 'ভাগ্য' 'ভাগ্য' ভাগ্য ফলতি—কি হে কথাটা? নইলে আমার মত হতভাগ্য যে এ বস্তু পায়, এ ত স্বপ্নের অগাধর! বৈঠককন—না হে না, থেকে যাও দু'দিন—এমন সংসারে ছেড়ে স্বর্গ গিয়েও আরাম পাবে না, তা বলে দিচ্ছি ভাই।

বিমলা বহু দূরে যায় নাই, ঠিক পর্দার আড়ালেই কান পাতিয়াছিল—চোখ মুছিয়া উঁকি মারিয়া, সেই প্রায়াক্ষকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া নরেন্দ্রদাদার মুখখানা একবার জুলিয়া উঠিয়াই যেন ছাই হইয়া গেল।

চার

দিন পনের পরে দুপুরবেলা গাভিতে ইন্দু মেয়ে লইয়া মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী ও কন্যাকে সমুদয় দেখিয়া নরেন্দ্রের শীর্ণ পাতুর মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে ঘুমন্ত কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছ ইন্দু?

বেশ আছি। কেন?

তোমার জীবের মত হইছিল শুনে ভাবী ভাবনা হয়েছিল। সেয়ে গেছে?

না হলে ডাক্তার ডাকলে না কি?

নরেন্দ্রের হাসিমুখ মলিন হইল। কহিল, না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কি হবে করে? এদিকে ও পঞ্চাশটি টাকা ঠিয়ে চিঠির ওপর চিঠি যাচ্ছিল—কেমন আছ—কেমন আছ—সাবধানে থেকে! সাবধানে থেকে! আমি কি কচি খুঁকি, না, পঞ্চাশটি টাকা দাদা আমাকে দিতে পারতেন না? ও টাকা পাতিয়ে সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দেবার কি দরকার ছিল? সেদিন বাড়িতে যেন একটা হাসি পড়ে গেল।

নরেন্দ্র শ্রান মুখ আরও শ্রান করিয়া অশ্রুতে কহিল, যোগাড় করতে পারলুম না।

না পাঠিয়ে তাই কেন লিখে দিলে না? উঃ—আবার সেই নিত্য নেই—দাও দাও—বেশ ছিলুম এতদিন। বাস্তবিক বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে পড়ার মত মহাপাপ আর সংসারে নেই, বলিয়া সেই পরম সত্যে স্বামীর হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া ইন্দু অনাত্র চলিয়া গেল।

মাসাধিক পরে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বাহিরে আসিয়া ইন্দু ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিজের শোবার ঘরে ঢুকিয়া ভারী আশ্চর্য হইয়া দেখিল, বাড়ির অন্যান্য স্থানের মত এখানেও সমস্ত বস্তু রীতিমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, এত ঝাড়া-মোছা হচ্ছে কেন রে?

নূতন ঝি বলিল, আপনি আসবেন বলে।

আমি আসব বলে?

হাঁ মা, বাবু তাই ত বলে দিলেন। আপনি ময়লা কিছু দেখতে পারেন না—আজ তিন দিন থেকে তাই—

ইন্দু অন্তরের মধ্যে একটা বড় রকমের গর্ব অনুভব করিল। কিন্তু সহজভাবে বলিল, ময়লা আবার কে দেখতে পারে? তবু ভাল যে—

হাঁ মা, লোক লাগিয়ে ওপর-নীচে সমস্ত সাফ করা হয়েছে।

ঝি, রামটহলটাকে একবার ডেকে দাও ত, বাজার থেকে কিছু ফলমূল কিনে আনুক।

ফলটল ত সব আছে মা। বাবু আজ সকালে নিজে বাজারে গিয়ে সমস্ত ঝুটিয়ে কিনে এনেছেন।

ডাব আছে? আঙুর—

আছে বৈ কি। এখন নিয়ে আসচি, বলিয়া দাসী চলিয়া গেল। ইন্দুর মুখের উপর হইতে বিদিক্তির মেঘখানা সম্পূর্ণ উড়িয়া গেল। বরং অনতিপূর্বে স্বামীর মলিন মুখখানা বৃকের কোথায় যেন একটু খচখচ করিতেও লাগিল।

বিশ্রাম করিয়া ঘণ্টা-দুই পরে সে প্রসন্নমুখে স্বামীর বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, নরেন্দ্র ৮শমা খুলিয়া খুব ঝুকিয়া বসিয়া কি লিখিতেছে। কহিল, অত মন দিয়ে কি লেখা হচ্ছে?—কবিতা?

নরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কি তবে?

ও কিছু না, বলিয়া সে লেখাগুলো চাপা দিয়া রাখিল।

ইন্দুর প্রসন্ন মুখ মেঘাবৃত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কিছু না'ব উপর অত ঝুকে না পেড়ে বরং যাতে দুঃখ-কষ্ট ঘোচে এমন কিছুতেই মন দাও। শুনলুম, দাদার হাতে নাকি গোটাকতক চাকরি খালি আছে। বলিয়া ভাল করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, এই চাকুরি করার কথাটা তাঁহাকে চিরদিন আঘাত করে। আজ কিন্তু আশ্চর্য হইয়া দেখিল, আঘাতের কোন বেদনাই তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইল না।

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল, চাকরি করবার লোকও সেখানে আছে।

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে ইন্দু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল অনাক হইয়া থাকিয়া বলিল, তা জানি। কিন্তু সেখানে আছে, এখানে নেই নাকি? আজকাল ভাল কথা বললে যে, তোমার মন্দ হয় দেখছি! ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে গসে কবিতা লিখতে তোমার লজ্জা ক'নে না? বলিয়া সে চোখ-মুখ রাস্তা করিয়া ঘর ছাড়িয়া গেল। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

অ্যা—এ যে বৌ! কখন এলে?

পরশু দুপুর বেলা।

পরশু—দুপুর বেলা! তাই এত তাড়াতাড়ি আজ সন্ধ্যাবেলায় দেখা দিতে এসেচ? না ভাই বৌ, টানটা একটু কম করো!

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তিষ্ঠি লিখে জবাব পর্যন্ত পাইনি। আমি একা আর কত টানব ঠাকুরকি? বিমলা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, জবাব পাওনি?

সে না পাওয়াই। চার পাতার জবাব চার ছত্র ত?

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তখন একটুকু সময় ছিল না ভাই। এ ঘরে দাদা যদি বা একটু সারলেন, ওদিকে আমার নতুন ভাড়াটে যায় যায়।

ইন্দু কথটার একবর্ণও বুঝিল না। হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিমলা সেদিকে মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল, সেই মঙ্গলবারটা আমার চিরকার মনে থাকবে। সাতদিনের দিন খবর পেয়ে দাদাকে নিয়ে এলুম, তার দু'দিন পরে দাদার বৃকের ব্যথার যেমন বাড়াবাড়ি, অধিকাবাবুর অসুখটাও তেমনি বেড়ে উঠল—তোমাকে বলব কি বৌ, সেক দিতে দিতে আর ফোমেন্ট করতে করতে বাড়িসুদ্ধ লোকের হাতের চামড়া উঠে গেল—সারা দিন-রাত কারু নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত হ'লো না। হাঁ, সতী-সাক্ষী বলি ওই অধিকাবাবুর স্বীকে। ছেলেমানুষ বৌ কিন্তু কি যত্ন, কি স্বামীসেবা! তার পুণেই এ যাত্রা তিনি বন্ধ পেয়ে গেলেন—নইলে ডাক্তার-বদীর সাধ্য ছিল না।

অধিকাবাবু কে?

কি জানি ঘাটালের কাছে কোথায় বাড়ি। চিকিৎসার জন্যে এখানে এসে আমাদের ঐ পাশের বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন। লোকজন নেই, পরসা-কড়িও নেই, শুধু বেঁচি—

ইন্দু মাঝখানেই প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার বৃকি খুব বেড়েছিল?

বিমলা ওষ্ঠাধর কৃষ্ণত করিয়া কহিল, সে রাতে আমার ও সতিই ভয় হয়েছিল। ঐ তাকের ওপর ওষুধের খালি শিশিগুলো চেয়ে দেখ না—তিনজন ডাক্তার—আব,—আচ্ছা, বৌ, দাদা বৃকি এ-সব কথা আমাকে চিঠিতে লেখেন নি?

ইন্দু অনামমনস্তের মত কহিল, না।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এসে বৃকি শুনলে?

ইন্দু তেমনিভাবে জবাব দিল, হাঁ।

বিমলা বলিতে লাগিল, আমি ও তোমাকে প্রথম দিনেই টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলুম : মাত্র দু'দিন খণ্ডার পথ স্বচ্ছন্দে আসতে পারতে, কিন্তু দাদা কিছুতেই দিলেন না। হাসিয়া কহিল, কি যে তাঁকে ভুনি কবেচ, তা তুমিই জানো বৌ, পাছে অসুস্থ শরীরে তুমি ব্যস্ত হও, এই ভয়ে কোনমতেই খবর দিতে চাইলেন না। যাক—ঈশ্বরেচ্ছায় ভাল হয়ে গেছে—নইলে—

নইলে তার কি হ'তো ঠাকুরকি? অসুখ সারতেও আমাকে দরকার হয়নি, না সারলেও হয়ত দরকার হ'তো না। বলিয়া ইন্দু উঠিয়া গিয়া, ঔষধের শূনা এবং বর্ধশূনা শিশিগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া লেবেলের লেখা পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এ কি হইল? কখনও যাহা হয় নাই—আজ অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হইয়া গেল। কেন, সে কি কেহ নয় যে, এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, অথচ তাহাকে জানানো পর্যন্ত হইল না। সে নিজের এমন কি পাঁজার কথা লিখিয়াছিল যাহাতে সংবাদ দেওয়াটাও কেহ উচিত মনে করিলেন না।

তিনি ভাল হইয়াও ও কতকগুলো পত্রে কত কথা লিখিলেন, শুধু নিজের কথটাই বলিতে ভুলিলেন? বেশ, এখানে আসিয়াও ও তিন দিন হইল, তবু কি মনে পড়িল না?

ইন্দুর হঠাৎ অভিমানের সুব বিমলা টের পাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শিশিবোতল নাড়াচাড়া করে আব কি হবে বৌ, ওবা কখনও মিথো সাক্ষী দেন না, তা যতই জেরা কর না। এসো, তোমার চা দেওয়া হয়েছে :

চল, বলিয়া ইন্দু অলঙ্কা চোখের জল মু'খ ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে, বিমলা কি জানি ইচ্ছা করিয়া আঘাত দিল কি না—কহিল, সে এক হাসির কথা বৌ। এক বাড়িতে দুই রোগী, কিন্তু দুজনের কি আশ্চর্য ভিন্ন ব্যবস্থা।

দাদা মর মর হয়েও তোমাকে খবর দিতে দিলেন না, পাছে ব্যস্ত হও—পাছে তোমার শরীর খারাপ হয়—আর অধিকাবাবু একদণ্ডও তাঁর স্বীকে সুমুখ থেকে নড়তে দিলেন না। তার ভয়, সে চোখের সুমুখ থেকে গেলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে!

এমন কি, সে ছাড়া তিনি কারও হাতে বিশ্বাস করে ওষুধ খেতেন না—এমন কখনও শুনেচ বল। আমাদের একে তোমরা সবাই তামাশা কর, কিন্তু অধিকাৰাবুরা সকলকে ডিঙিয়ে গেছেন ; খেটে খেটে এই মেয়েটির ঠিক মড়ার মত আকৃতি হয়েছে।

ইন্দু 'ই' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আর একদিন এসে তোমার সতী-সাক্ষী বৌটির সঙ্গে আলাপ করে যাব—আজ গাড়ি এসেচে, চললুম।

তা হলে কাল একবার এসো। আলাপ করে বাস্তবিক সূখী হবে।

দেখা যাবে যদি কিছু শিখতে পারি, বলিয়া ইন্দু মুখ ভার করিয়া গাড়িতে গিয়া, উঠিল। অধিকাৰাবুর পাগলামি তাহার মনের মধ্যে আজ সমস্ত পথটা তাহার স্বামী'র গভীর মস্তলেক্ষার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া লজ্জা দিতে দিতে চলিল।

পাঁচ

দিন-দুই পরে কথায় কথায় ইন্দু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যদি সত্যি কথা শুনেলে রাগ না কর, তা হলে বলি ঠাকুরঝি, বিয়ে করা তোমার দাদাবও উচিত হয়নি, এই অধিকাৰাবুরও হয়নি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কারণ, প্রতিপালন করবার ক্ষমতা না থাকলে এটা মহাপাপ।

উত্তর শুনিয়া বিমলা মর্মাহত হইল। ইন্দুকে সে ভালবাসিত। স্বামিক পরে কহিল, অধিকাৰাবুর অনায়াস হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী' নিজে'র কর্তব্য কবাবে না? তাকে ত মরণ পর্যন্ত স্বামিসেবা করতে হবে?

কেন হবে! তিনি অনায়াস করবেন, যাতে অধিকার নেই তাই করবেন—তবে ফলভোগ কবাবে আমরা? তুমি ইংরাজী পড়নি, আর পাঁচটা সভা সমাজের খবর রাখ না, নইলে বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কর্তব্য শুধু একদিকে থাকে না। হয় দু'দিকে থাকবে, না হয় থাকবে না। পুরুষেরা এ কথা আমাদের বুঝতে দেয় না; দেয় না বলেই আমরা অধিকাৰাবুর স্ত্রীর মত মৃত্যুপণ করে সেবা করি।

বিমলা মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, না হলে কবত্তাম না? হৌ, সেবা কবটো কি স্বা'র বড় দুঃখের কাজ বলে মনে কর? অধিকাৰাবুর স্ত্রীর বাইরের ক্রেশটাই দেখতে পাও, তার ভেতরের আনন্দটা জানতে পাও কি?

আমি জানতেও চাইনে।

স্বামী' ভালবাসাটাও বোধ করি জানতে চাও না?

না ঠাকুরঝি, অকুচি হয়ে গেছে। বরং ওটা কম করে নিজের কর্তব্যটা কবলেই ইচ্ছা ছেড়ে বসি।

বিমলা দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ঠিক এই কথাটাও আগেও একবার বলেচ। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও বুঝতে পারলুম না। আমার দাদা তাঁর কর্তব্য করেন না! কি সে, তা তুমিই জানো। অনেক বই পড়েচ, অনেক দেশের খবর জানো—তোমার সঙ্গে তর্ক করা সাজে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামী' ন্যায় অনায়াস যাই করুন, তাঁর ভালবাসা অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা কোন দেশের স্ত্রীরই নেই। আমার ত মনে হয়, ও জিনিস হাবানোর চেয়ে মরণ ভাল; তার পরেও বৈধে থাকা শুধু বিড়ম্বনা।

আমি তা মানিনে।

মানো নিশ্চয়ই, বলিয়া বিমলা হাসিয়া ফেলিল। তাহা'র সংসা' মনে হইল, এ সমস্তই পবিত্রাস। সভাই ত পরিহাস ভিন্ন নারীর মুখে ইহা আর কি হইতে পারে! কহিল, কিন্তু ওগু বলি হৌ, আমার কাছে যা মুখে আসে বলচ, কিন্তু দাদার সামনে এ-সব নিয়ে বেশী চালাকি করো না। কেন না, পুরুষমানুষ যতই বুদ্ধিমান হোন, অনেক সময়ে—

কি—অনেক সময়ে?

তামাশা কি না, ধরতে পারে না।

সে তাঁর কাজ। আমি তা নিয়ে দুর্ভাবনা করিনে।

কিন্তু আমি যে না ভেবে থাকতে পারিনে বৌ।

ইন্দু জোর করিয়া হাসিয়া শ্রম করিল, কেন বল ত?

বিমলা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, রাগ ক'রো না বৌ; কিন্তু সেই অসুখের সময় আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, দাদা যে তোমাকে পাবার জন্যে একসময় পাগল হয়ে উঠেছিলেন, সেই যে কি বলে 'পায়ে কাঁটা ফুটলে বুকে পেতে দেওয়া'—কিন্তু সে ভাল আর বুঝি নেই।

হঠাৎ ইন্দুর সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালি লেপিয়া দিল। তারপরে, সে জোর করিয়া শুকনো হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে ব'লো, আমি দৃষ্কেপও করিনে। আর তুমিও ভাল করে বুঝো, আমার নিজেই ভালমন্দ নিজেই সামলাতে জানি। তা নিয়ে পরের মাথা গরম করাটাও আবশ্যক মনে করিনে।

ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু স্বামীর ঘরে ঢুকিয়াই শ্রম করিল, আমি মেদিনীপুরে গেলে তোমার ব্যামো হয়েছিল?

নরেন্দ্র খাতা হঠাতে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, ব্যামো নয়—সেই ব্যাথাটা।

খণ্ড বাঁচাবার জন্যে ঠাকুরঝির ওখানে গিয়ে পড়েছিলেন?

স্বীয এই অভ্যস্ত কটু ইঙ্গিতে নরেন্দ্র খাতাটার উপর পুনর্বার ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া মুদকণ্ঠে বলিল, বিমল এস নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি ওনতে পেলে বলে দিতুম, অক্ষমদের জন্যই হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েছে। পরের ঘাড়ে না চড়ে সেইখানে যাওয়াই তাদের উচিত।

নরেন্দ্র আর মুখ তুলিল না—একটি কথাও কহিল না।

ইন্দু টান মারিয়া পর্দাটা সবাইয়া বাহির হইয়া গেল। ধাক্কা লাগিয়া একটা ক্ষুদ্র টিপাই ফুলদানি-সমেত উলটাইয়া পড়িল। সে ফিরিয়াও চাহিল না।

মিনিট-পাচেক পরে, তেমনিন সংগারে পলি সরাইয়া দিবিয়া আসিয়া কহিল, ঠাকুরঝি খবর দিতে চেয়েছিলেন, তুমি মানা করেছিলেন কি জন্যে? ভেবেছিলে বুঝি আমি এসে ওসুখের সঙ্গে বিধি মিশিয়ে দেব।—নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই বলিল, না, তা ভাবিনি। তোমার শরীর ভাল ছিল না—

ভালই ছিল। যদিও খবর পেলেও আমি আসতুম না, সে নিশ্চয়। কিন্তু, আমি সেখানে যে, রোগে মরে যাচ্ছিলাম, এ কথাও তোমাকে চিঠিতে লিখিনি।

অনর্থক কষ্টকণ্ডো মিথো কথা বলে ঠাকুরঝিকে নিষেধ করবার হেতু ছিল না। বলিয়া সে যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্রও তেমনিন 'না' খাতাটার পানে ঝুঁকিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত লেখা তাহার লেপিয়া মুছিয়া চোখের সন্মুখে এককোণে হইয়া রহিল।—ইন্দু পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারকে কহিল, আপনিই গণনাবাবুর বাড়িতে আমার স্বামীর চিকিৎসা করেছিলেন?

বুড়া ডাক্তার চোখ তুলিয়া ইন্দুর উদ্বেগ-মলিন মুখখানের পানে চাহিয়া, ঘাড় নাড়িয়া সায দিলেন।

ইন্দু কহিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। এই আপনার ফি-ব টাকা—আজ একরাব ওবেলা যদি দয়া করে বন্ধুভাবে এসে তাঁকে দেখে যান বড় উপকার হয়।

ডাক্তার কিছু বিস্মিত হইলেন।

ইন্দু বুঝাইয়া বলিল, ওঁর স্বভাব চিকিৎসা করতে চান না। ওসুখের প্রেসক্রিপসনটা আমাকে লুকায়ে দেবেন। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।—ডাক্তার সম্মত হইয়া বিদায় লইলেন।

রামটল আসিয়া সংবাদ দিল, মাজী, বলভ স্বকরা এসেছে।

এসেচে? এদিকে ডেকে আন।

ও বলভ, একটু কাজের জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম, তুমি আমাদের বিশ্বাসী লোক—এই চুড়ি ক'গাছা বিক্রি করে দিতে হবে। বড় পুরানো ধরনের চুড়ি বপু, আর পরা যায় না। এ দামে নতুন একজোড়া কিনবো মনে কচ্ছি।

বেশ ত মা, বিক্রি করে দেব।

নিজি এনেচ ত? ওজন করে দেখ-দেখি কত আছে? দামটা কিন্তু বাপু আমাকে কালই দিতে হবে। আমার দেরি হলে চলবে না।

তাই দেব।—বল্লভ চুড়ি হাতে করিয়া বলিল, এ যে একেবারে টাটকা জিনিস মা। বেচলেই ত কিছু লোকসান হবে।—তা হোক বল্লভ। এ গড়নটা আমার মনে ধরে না। আর এ সম্বন্ধে বাবুকে কোনও কথা বলো না।

বাবুদের লুকাইয়া অলঙ্কার বেচা-কেনার ইতিহাস বল্লভের অবিদিত ছিল না। সে একটু হাসিয়া চুড়ি লইয়া গেল।

ছয়

ডাক্তারবাবু, পাঁচ-সাত শিশি ওষুধ দিলেন, কিন্তু বৃকের ব্যথাটা ত গেল না।

গেৎ না? কৈ, তিনি ত কিছু বলেন না?

জানেন ত, ঐ তাঁর স্বভাব; কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, একটু ব্যথা লেগেই আছে—তা ছাড়া, শরীর ত সারচে না!

ডাক্তার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখুন আমারও সন্দেহ হয়, শুধু, ওষুধে কিছু হবে না। একবার জল-হাওয়া পরিবর্তন আবশ্যিক।

তাই কেন তাঁকে বলেন না?

বলেছিলাম একদিন। তিনি কিন্তু প্রয়োজন মনে করেন না।

ইন্দু রুগ্ন হইয়া বলিয়া ফেলিল, তিনি মনে না করলেই হবে? আপনি ডাক্তার, আপনি যা বলবেন, তাই ত হওয়া চাই।—বৃদ্ধ চিকিৎসক একটুখানি হাসিলেন।

ইন্দু নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া বলিল, দেখুন আমি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। আপনি ওঁকে খুব ভয় দেখিয়ে দিন।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, এ-সকল রোগে ভয় ত আছেই।

ইন্দুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিল, সত্যি ভয় আছে?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া ডাক্তার সহসা জবাব দিতে পারিল না।

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল, বলিল, আমি আপনার মেয়ের মত ডাক্তারবাবু, আমাকে লুকোবেন না। কি হয়েচে, খুলে বলুন।

ঠিক যে কি হইয়াছে তাহা ডাক্তার নিজেও জানিতেন না। তিনি নানা রকম করিয়া যাহা কহিলেন, তাহাতে ইন্দুর ভয় হ্রাসিত না। সে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিকালবেলা নরেন্দ্র হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া খোলা জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল, ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। নরেন্দ্র একবার মুখ ফিরাইয়া, আবার সেইদিকেই চাহিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে ইন্দু টাকা চাহে নাই; আজ সে যে কিজন্য আসিয়া বসিল, তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহার বৃকের ভেতরটা টিপটিপ করিতে লাগিল।

ইন্দু টাকা চাহিল না; কহিল, ডাক্তারবাবু বলেন ব্যথাটা যখন ওষুধে যাচ্ছে না, তখন হাওয়া বদলানো দরকার। একবার কেন বেড়াতে যাও না।

নরেন্দ্র বাস্তবিক চমকিয়া উঠিল। বহুদিন অজ্ঞাত বড় স্নেহের ধন যেন কোথায় লুকাইয়া তাঁহাকে ডাক দিল। ইন্দুর এই কঠোর সে ত ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই মুখ ফিরাইয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য কি যেন মনে মনে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

ইন্দু কহিল, কি বল? তা হলে কালই শুদ্ধিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। বেশী দূরে কাজ নেই—এই বদিনাথের কাছে—আমরা দু'জন, কমলা আর ঝি—রামটহল পুরানো কিশোরী লোক, বাড়িতেই থাক। সেখানে একটা ছোট বাড়ি নিলেই হবে। তাহলে আজ থেকেই শুছোতে আরম্ভ করুক না কেন?

কেন প্রকার খরচের কথাতেই নরেন্দ্র ভয় পাইত। এই একটা বড় রকমের ইঙ্গিতে তাহার মেজাজ

একেবারে বিগড়ানিয়া গেল। প্রসন্ন করিল, এই ডাক্তারটিকে এখানে আসতে বলিলে কে?

ইন্দু জবাব দিবার পূর্বে সে পুনরায় কহিল, বিমলাকে ব'লো আমার পিছনে ডাক্তার লাগিয়ে উত্তাক্ত করবার আবশ্যক নেই; আমি ভাল আছি।

বিমলা প্রচণ্ড থাকিয়া ডাক্তার পাঠাইতেছে,—বিমলাই সব। ইন্দু অন্তরে আঘাত পাইল। কিন্তু চাপা দিয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত সত্যি ভাল নেই। ব্যথাটা ত সারেনি।

সেরেচে।

তা হলেও শরীর সারেনি—বেশ দেখতে পাচ্ছি। একবার ঘুরে এলে, আর যাই হোক—মন্দ কিছু ত হবে না।

নরেন্দ্র ভিতরে-বাহিরে এমন জায়গায় উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে সহ্য করিবার ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তবুও ধাক্কা সামলাইয়া বলিল, আমার ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দু জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না। প্রাণটা ত বাঁচানো চাই।

এই জিদটা ইন্দুর পক্ষে এতই নূতন যে, নরেন্দ্র সম্পূর্ণ ভুল করিল। তাহার নিশ্চয়ই মনে হইল, তাহাকে ক্রেশ দিবার ইহা একটা অভিনব কৌশল মাত্র। এতদিনের খেয়ের বীধন তাহার নিম্নে ছিন্ন হইয়া গেল। চোঁচিয়া উঠিল, কে বললে প্রাণ বাঁচানো চাই? না, চাই না। তোমার পায়ে পড়ি ইন্দু, আমাকে রেহাই দাও, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

স্বামীর কাছে কটু কথা শোনা ইন্দু কল্পনা করিতেও পারিত না। সে কেমন যেন জড়সড় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্র জানিতে পারিল না; বলিতে লাগিল, তুমি ঠিক জানো, আমি কি সন্ধ্যার মাথখানে দিন কাটাচ্ছি। সমস্ত জেনেও নেও আমাকে কেবল কষ্ট দেবার জন্যেই অহনিশি খোঁচাচ্। কেন, কি করেচি তোমার? কি চাও তুমি?

ইন্দু ভয়ে বিবর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

চোঁচামেচি উত্তেজনা নরেন্দ্রের পক্ষে যে কিরূপ অস্বাভাবিক, তাহা এইবার সে নিজেই টের পাইল। কষ্টস্বর নত করিয়া বলিল, বেশ, স্বীকার করলুম আমার হাওয়া বদলানো আবশ্যক, কিন্তু কি করে যাব? কোথায় টাকা পাব? সংসার-খরচ যোগাতেই যে আমার প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দু নিজে কোনও দিন ধৈর্য শিক্ষা করে নাই; অবনত হইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। আজ কিন্তু সে ভয় পাইয়াছিল। নম্রকণ্ঠে কহিল, টাকা নেই বটে, কিন্তু অনেক টাকার গয়না ত আমাদের আছে—

আছে, কিন্তু আমাদের নেই, তোমার আছে। তোমার বাবা দিয়েছেন— আমাকে। আমার তাতে একবিন্দুও অধিকার নেই—এ কথা আমার চেয়ে তুমি নিজেই টের বেশী জানো।

বেশ, তা না নাও—আমি নগদ টাকা দিচ্ছি।

কোথায় পেলো? সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়েচ?

ইহা চুড়ি বিক্রির টাকা। ইন্দু সহজে মিথ্যা কহিতে পারিত না। ইহাতে তাহার বড় অপমান বোধ হইত। আজ কিন্তু সে মিথ্যা বলিল। নরেন্দ্রের মুখের ভাব ভয়ানক কঠিন হইল। ধীরে ধীরে বলিল, তা হলে রেখে দাও, গয়না গড়িয়ে। আমার বুকের অনেক রক্ত জল করে যা এমা হয়েছে, তা এভাবে নষ্ট হতে পারে না।

ইন্দু, কখনও তোমাকে কটু কথা বলিনি, চিরদিনই ওনে আসছি। তুমি না সেদিন দস্ত করে বলেছিলে, কখনও মিথ্যা বল না? ছিঃ—কমলা পর্দা ফাঁক করিয়া ডাকিল, মা, পিসীমা এসেছেন।

কি হচ্ছে গো বৌ? বলিয়া বিমলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু মেয়েকে আনিয়া, তাহার গলার হারটা দুই হাতে সজোরে ছিড়িয়া ফেলিয়া, স্বামীর মুখের সামনে ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, মিথ্যা বলতে আমি জানতাম না—তোমার কাছেই শিখেছি। তবুও এখনও পেতলকে সোনা বলে চালাতে শিখিনি। যে স্বীকে ঠকায়, নিজের মেয়েকে ঠকায়, তার আর কি বাকী থাকে! সে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে কি করে?

নরেন্দ্র ছিন্ন হারটা ভুলিয়া প্রসন্ন করিল, কি করে জানলে পেতল? যাচাই করিয়েচ?

তোমার বোনকে যাচাই করে দেখতে বল। বলিয়া সে দুই চোখ রান্না করিয়া বিমলার দিকে চাহিল।—বিমলা দু' পা শিছাইয়া গিয়া বলিল, ও—কাজ আমার নয় বৌ, আমি এত ইতর নই যে, দাদার দেওয়া গয়না সেকরা ডেকে যাচাই করে দেখব।

নরেন্দ্র কহিল, ইন্দু, তোমাকেও দু-একখানা গয়না দিয়েচি, সে যাচাই করে দেখেচ?

দেখিনি, কিন্তু এবার দেখতে হবে।

দেখো, সেগুলো পেতল নয়।

ভাগিনীর মুখের পানে চাহিয়া হারটা দেখাইয়া কহিল, এটা সোনা নয় বোন, পেতলই বটে। যে দুঃখে বাপ হয়ে ঐ একটি মেয়ের জন্মদিনে তাকে ঠকিয়েচি সে তুই বুঝবি। তবুও, মেয়েকে ঠকাতে পেরেচি, কিন্তু নিজের ক্রীকে ঠকাতে সাহস করিনি।

সাত

কথা শোনো বৌ, একবার পায়ে হাত দিয়ে তাঁর ক্ষমা চাও গে।

কেন, কি দুঃখে? আমার মাথা কেটে ফেললেও আমি তা পারব না ঠাকুরঝি।

কেন পারবে না? স্বামীর পায়ে হাত দিয়ে লজ্জা কি? বেশ ত, তোমার দোষ না হয় নেই, কিন্তু তাঁকে হ্রস্ব করা যে সকল কাজের বড়।

না—আমার তা নয়। ভগবানের কাছে খাঁটি থাকাই আমার সকল কাজের বড়। যতক্ষণ সে অপরাধ না করচি, ততক্ষণ আর কিছুই ভয় করিনে।

বিমলা রাগিয়া বলিল, বৌ, এ-সব পাকামির কথা আমারও জানি, তখন কিছুই কোন কাজে আসবে না বলে দিচ্চি। চোখ বুজে বিপদ এড়ানো যায় না। দাদা সত্যি তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেনে।—ইন্দু উদাসভাবে বলিল, তাঁর ইচ্ছে।

বিমলা মনে মনে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, সেই ইচ্ছে টের পাবে, যেদিন সর্বনাশ হবে। দাদা যেমন নিরীহ, তেমনি কঠিন। তাঁর এ-দিক দেখেচ, ও-দিক দেখতে এখনো বাকী আছে—তা বনে দিচ্চি।

আচ্ছা, দেখতে পেলে তোমাকে খবর দিয়ে আসব।

বিমলা আর কিছু বলিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা সত্যি। বিশ্বাস হয় না বটে, স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হবো। কিন্তু সে-মানুষ যে দাদা নয়—অসুখের সময় তাঁকে ভাল করে চিনেচি। বুকের কপাট তার একবার বন্ধ হয়ে গেলে আর খোলা যাবে না।

একবার ইন্দুও মুখ গভীর করিল। কহিল, খোলা না পাই, বাইরেই থাকব। খুলে দেবার জন্য তাঁর পায় ধরেও সাধব না—তোমাকেও সুপারিশ করতে ডাকব না। ও কি রাগ করে চললে না কি?

বিমলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, রাগ নয়—দুঃখ করে যাচ্চি। বৌ, নিজের বোনের চেয়েও তোমাকে বেশী ভালবেসেচি বলেই প্রাণটা কঁদে কঁদে ওঠে। দাদা যে অমন করে বলতে পারেন, আমি চোখে দেখে না গেলে বিশ্বাসই করতুম না!

ইন্দু হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল, অত বক্তৃতা আর কখনো তাঁর মুখে শুনেব না।

বক্তৃতা তুমিও কিছু কম করনি বৌ। তবে তিনি যে আর কখন করবেন না তা আমারও মনে হয়। এক কথা এক শ'বার বলবার লোক তিনি নন।

ইন্দু আবার হাসিয়া বলিল, সেও বটে,—তবে আর একটা গুরুতর কারণ ঘটেচে, যাতে আর কোনদিন স্বপ্নেও চোখ রান্নাতে সাহস করবেন না। আমার বাবার চিঠি পেলুম। তিনি আমার নামে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। কি বল ঠাকুরঝি, পায়ে ধরবার আর দরকার আছে বলে মনে হয়?

বিমলার মুখ যেন আরও অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, বৌ, এর পূর্বে কখনো তোমাকে তিনি চোখ রান্না নি। যা করে তাঁকে ফেলে রেখে তুমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলে, সে-আমি ও জানি; কিন্তু

তবুও কোনোদিন এতটুকু তোমার নিশ্চয় করেন নি। হাসিমুখে তোমার সমস্ত দোষ আমার কাছেও ঢেকে রেখেছিলেন—সে কি তোমার টাকার লোভে? বৌ, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা থাকে না। যে জিনিস তুমি তেজ করে হেলায় হারাচ্চো—সেদিন টের পাবে যেদিন যথার্থই হারাবে। কিন্তু এই একটা কথা আমার মনে রেখো বৌ, আমার দাদা অত নীচ নয়। আর না, সন্ধ্যা হয়—চললুম; কাল-পরশ একবার সময় হলে আমাদের বাড়ি এসো।

আচ্ছা! বলিয়া ইন্দু শিচ্ছেন শিচ্ছেন সদর দরজা পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মৃদু পদশব্দ বিমলা যে শুনিয়াও শুনিল না, তাহা সে বুঝিল। গাড়িতে উঠিয়া বসিলে মুখ বাড়িয়া চিরদিন এই দুটি সখী পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, হাসিয়া কপাট বন্ধ করে। আজ গাড়িতে ঢুকিয়াই বিমলা দরজা টানিয়া দিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু কমলাকে বৃকের কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া পড়িল।

বিমলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার খরতাপ কথাগুলো রাখিয়া গেল। ইহার উত্তাপ যে কত, এইবার ইন্দু টের পাইল। এই তাপে তাহার অহঙ্কারের অপ্রভেদী তুষারস্থূপ যতই গলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই এক-একটি নূতন বস্তু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। এত কাদামাটি—আবর্জনা—এত কর্কশ-কঠিন শিলাখণ্ড যে এই ঘনীভূত জলতলে আবৃত হইয়াছিল, তাহা সে ত স্বপ্নেও ভাবে নাই!

হঠাৎ তাহার অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, এ কেমন হয় ইন্দু, যদি তিনি মনে মনে তোমাকে ত্যাগ করেন? তুমি কাছে গিয়ে বসলেও যদি তিনি ঘুণায় সরে বসেন? তাহা হইলে কীটা দিয়া উঠিল।

কমলা কহিল, কি মা?

ইন্দু তাহাকে সঙ্গে করে বৃকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখে চুমা খাইয়া বলিল, তোর পিসীমা এত ভয় দেখাতেও পারে!

কিসের ভয়, মা?

ইন্দু আর একটি চুমা খাইয়া বলিল, কিছু না মা, সব মিথ্যে—সব মিথ্যে। যা ত মা, দেখে আয় ত তোর বাবা কি কচ্ছেন?

মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল। আজ দু'দিন স্বামী-স্ত্রীতে একটা কথাও হয় নাই। কমলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বাবা চুপ করে শুয়ে আছেন!

চুপ করে? আচ্ছা, তুই শুয়ে থাক মা, আমি দেখে আসি, বলিয়া ইন্দু নিঃশব্দে চলিয়া গেল। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাই বটে। তিনি উপরের দিকে চাহিয়া সোফায় শুইয়াছেন। মিনিট পাঁচ-ছয় দাঁড়াইয়া দেখিয়া ইন্দু ফিরিয়া আসিল। আজ প্রবেশ করিতে সাহস হইল না দেখিয়া সে নিজেই ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল।

কমলা!

কি মা?

তোর বাবার বোধ হয় খুব মাথা ধরেছে। যা মা, বসে বসে একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দি গে।

মেয়েকে পাঠাইয়া দিয়া ইন্দু নিজে আড়ালে দাঁড়াইয়া উদ্গ্রীব হইয়া দুজনের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।—কন্যা প্রশ্ন করিল, কেন এত মাথা ধরেছে বাবা?

পিতা উত্তর দিলেন, কৈ ধরেনি ত মা!

কন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মা বললেন যে খুব ধরেছে?

পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন, তোমার মা জানে না।

পর্দা টেলিয়া ইন্দু সহজভাবে ঘরে ঢুকিল। টেবিলের আলোটা কমাইয়া দিয়া কহিল, রোগা শরীরে এত পরিশ্রম কি সহ্য হয়? যা ত মা কমলা, ওখর থেকে ওডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আয়—আর সামটুকুকে একটু বরফ কিনে আনতে বলে দে।

মেয়েকে ডুকিয়া দিয়া ইন্দু শিররে আসিয়া বসিল। চুলের মধ্যে হাত দিয়া বলিল, আশুন উঠছে

যেন।—নরেন্দ্র চোখ বুজিয়া রহিল—কিছুই বলিল না। ইন্দু নীরবে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সম্মুখে কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আজ বুকের ব্যাথাটা কেমন আছে?

তেমনি।

তবে এই যে রাগ করে দু'দিন ওষুধ খেলে না, বেড়ে গেলে কি হবে বল ত?

নরেন্দ্র চোখ মেলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, আমার শরীরটা ভাল নেই—একটু চুপ করে থাকতে চাই ইন্দু।

এই কথার এই জবাব।

ইন্দু ভড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তাই থাকো। আমার ঘাট হয়েছে তোমার ঘরে ঢুকেছিলুম।

ঘারের কাছে আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, নিজের প্রাণটা নষ্ট করে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, বাবা আমাকে দশ হাজার টাকা উইল করে দিয়েছেন। বলিয়া বাঁ হাতের চিঠিটা সোফার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর মুখে আঁচল গুঁজিয়া কান্না চাহিতে চাপিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

কথা সহিতে, হার মানিতে সে শিখে নাই—অনেক নারীই শিখে না—তাই আজ তাহার সমস্ত সাধু-সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফিরিয়া আসিল।

আট

ও কি ঠাকুরবি—তোমরা কাদছিলে নাকি? চোখ দুটি তোমাদের যে জ্বাফুল হয়েছে?

অধিকাবাবুর স্ত্রী শুনিতেছিলেন এবং বিমলা উপড় হইয়া বই পড়িতেছিল; ষড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল,—উঃ! দুর্গামণির দৃষে বুক ফেটে যায় বো!

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, কে দুর্গামণি?

ন্যাকা সেজো না বো। আনো না, কে দুর্গামণি? চারিদিকে যে এত সুখ্যাতি বেরিয়েছে তা ঠিক বটে।

ইন্দু আর কিছুই বুঝিল না, শুধু বুঝিল একখানা বইয়ের কথা হইতেছে। হাত বাড়াইয়া কহিল, দেখি বইটা।

হাতে লইয়া উপরেই দেখিল গ্রন্থকার—তাহার স্বামীর নাম লেখা। পাতা উলটাইতেই চোখে পড়িল উৎসর্গ করা হইয়াছে বিমলাকে। ইন্দু বইখানা আগাগোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখিয়া দিল। লেখা হইয়াছে, ছাপা হইয়াছে, দেওয়া হইয়াছে—অথচ সে তাহার বিম্ব-বিসর্গও জানে না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিমলা আর একটা প্রশ্ন করিতেও সাহস করিল না। তখন ইন্দু নিজেই বলিল, আমার নাটক-নভেল পড়তে ইচ্ছাও করে না, ভাল লাগে না। যা হোক, ভাল হয়েছে শুনে সুখী হলুম।

অধিকাবাবুর চাকর আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবু জিজ্ঞেসা কচ্ছেন, আজ তাঁর যে বাসুঘর দেখতে যাবার কথা ছিল—যাবেন?

এই বধুটি সকলের চেয়ে ছোট; সে লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, না, তাঁর শরীর এখনো তেমন সারেনি—আজ যেতে হবে না।

চাকর চলিয়া গেল, ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল এমন আশ্চর্য কথা সে জীবনে শোনে নাই।

ভোলা আসিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু অফিস থেকে জানতে লোক পাঠিয়েছেন—একটা বড় আলমারি-দেওয়ান নীলাম হচ্ছে! বড় ঘরের জন্য কেনা হবে কি?

বিমলা কহিল, না, কিনতে মানা করে দে। একটা ছোট বুককেস হলেই ও-ঘরের হবে।

ভোলা চলিয়া গেল। ইন্দু মহাবিস্ময়ে অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই স্বামীদের প্রমত্তলোভেও সে বেশী প্রভুত্ব দেখিতে পাইল না, ইহাদের স্ত্রী-দুটির আদেশগুলোও তাহার কাছে ঠিক দাসীদের মত শুনাইল না। অথচ, তাহার নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা বাজিতে লাগিল। কেবলই

মনে হইতে লাগিল, কি করিয়া যেন ইহাসের কাছে সে একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় বিমলা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বৌ, সত্যি কি তুমি দাদার এই বইটার কথা জানতে না?

ইন্দু তাহিল্লোর সহিত কহিল, না। আমার ও-জন্মে মাথাব্যথা করে না। সারাদিন বসেই ত লিখচে—কে অত খোঁজ করে বল? ভাল কথা ঠাকুরঝি, কাল বাপের বাড়ি যাচ্ছি।

বিমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, না, বৌ, যেয়ো না।

কেন?

কেন সে কি বুঝিয়ে বলতে হবে বৌ? দাদা তোমাকে তাঁর দুঃখের সুখের কোন ভারই দেন না—তাও কি চোখে দেখতে পাও না? স্বামীর ভালবাসা হারাচ্ছ—তাও কি টের পাও না?

ইন্দু হঠাৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, অনেকবার বলেছি তোমাকে, আমি চাইনে—চাইনে—চাইনে। আমি দাদার ওখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকব; ইনি আর যেন আমাকে আনতে না যান—আর যেন আমাকে জ্বালাতন না করেন।

এবার বিমলাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, এ-সব বড়াই পুরুষমানুষের কাছে কোরো বৌ, আমি ত মেয়েমানুষ, আমার কাছে কোরো না। তোমার বাপেরা বড়লোক, তোমার সংস্থান তাঁরা করে দিয়েছেন—এই ত তোমার অহঙ্কার? আচ্ছা, এখন যাচ্চো যাও; কিন্তু একদিন ঈশ হবে, যা হারালে তার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীটাও ছোট।

বৌ, যা তুমি পেয়েছিলে, কম মেয়েমানুষই তা পায়—সে জানি, কিন্তু যে অপব্যয় তুমি করলে, তাতে অক্ষয়ও ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। বোধ করি গেলও তাই।

সেই বইখানা বিমলার হাতেই ছিল। তাহাব প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ইন্দুর বুকের ভিতরটা আর একবার কঁপ করিয়া উঠিল। বলিল, অহঙ্কার করবার থাকলেই লোকে করে। কিন্তু, আমার সর্বনাশ হয় হবে, যায় যাবে, সেজন্মে ঠাকুরঝি তুমিই বা মাথা গবম কর কেন, আর আমিই বা যা-তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি কেন? আমার থাকতে ইচ্ছে নেই,—থাকব না। এতে যা হয় তা হবে—কাল পরামর্শ নিতেও চাইনে, ঝগড়া কবতেও চাইনে।

বিমলা মৌন হইয়া রহিল। তাহার বাথা অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু এ অপমানের পরে আর সে তর্ক কবিল না।

ইন্দু অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই কহিল, দাঁড়াও ত বৌ, তুমি সম্পর্কে বড়, একটা প্রশ্ন কর।

নয়

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সমস্ত আকাশ ঝাঁপিয়া মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ইন্দু মেয়ে লইয়া বিদ্যনায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। আজ তার ছোট-ভগিনীপতি আসিয়াছিলেন, পাশের ঘর হইতে তাঁহাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো গল্প-গুজবের অশ্রুট কলধ্বনি যতই ভাসিয়া আসিতে লাগিল, ততই কিসের অবাক লজ্জায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিন মাস হইতে চলিল, সে মেদিনীপুরে আসিয়াছে। ছোটভগিনীও আসিয়াছে। তাহার স্বামী এই দুই মাসের মধ্যেই শান্তিপুর হইতে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়বার অস-যা-... করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র একটাবারও আসিলেন না, একখানা চিঠি লিখিয়াও খোঁজ করিলেন না।

কিছুদিন হইতে বাপারটার উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং প্রায়ই আলোচনা হইতেছে। ছোট-ভগিনীপতির ঘরে সকলের সম্মুখে পাছে এই কথাটিই উঠিয়া পড়ে, এই ভয়েই ইন্দু অসময়ে পলাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল।

স্বামী আসেন না। তাহার অবহেলায় বেদনা কত, সে ইন্দুর নিজের কণ্ঠ—সে যাক। কিন্তু ইহাতে এত যে ভয়ানক লজ্জা, এ কথা সে ত একদিনও কল্পনা করে নাই। মুগ্ধতা, নরহত্যার মত এ যে কেবল লুকাইয়া ফিরিতে হয়! মরিয়া গেলও যে কাহারো কাছে স্বীকার করা যায় না, স্বামী ভালবাসেন

না।

এতদিন স্বামীর ঘরে স্বামীর পাশে বসিয়া তাঁহাকে টানিয়া পিটিয়া নিজের সন্ত্রম ও মর্যাদা বাড়াইয়া তুলিতেই সে অহরহ ব্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন পরের ঘরে, চোখের আড়ালে সমস্তই যে ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে—কি করিয়া সে খাড়া করিয়া রাখিবে?

আজ ভগিনীপতি আসার পর ইহাতে যে-কেহ তাহার পানে চাহিয়াছে, তাহার মনে হইয়াছে, তাহাকে করুণা করিতেছে। কমলাকে কেহ তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্দু মরমে মরিয়া যায়, বাড়ি ফিরিবার প্রস্তাব করিলে লজ্জায় মাটিতে মিশিতে চায়।

অথচ, আসিবার পূর্বে স্বামীকে সে অনেকগুলো মর্মান্তিক কথায় বলিয়া আসিয়াছিল,—প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা হইলে যেন লইয়া আসে।

হঠাৎ ইন্দুর মোহের ঘোর কাটিয়া গেল—কমলা, কীদচিস কেন মা?

কমলা রুদ্ধস্বরে বলিল, বাবার জন্যে মন কেমন কচ্ছে।

ইন্দুর বুকের উপর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল, সে মেয়েকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাদিয়া ফেলিল।

বাহিরের প্রবল বরিবর্ষণ তাহার লজ্জা রক্ষা করিল—কন্যা ছাড়া এ কান্না আর কেহ শুনিতে পাইল না।

তাহার জননী শিখাইয়া দিলেন কি না জানি না, পরদিন সকাল হইতেই কমলা পিতার কাছে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল। প্রথমে ইন্দু অনেক তর্জন-গর্জন করিয়া, শেষে দাদাকে আসিয়া কহিল, কমলা কিছুতেই থামে না—কলকাতায় যেতে চায়।

দাদা বলিলেন, থামাবার দরকার কি বোন, কাল সকালেই তাকে নিয়ে যা। কেমন আছে নরেন? সে আমাকে ত চিঠিপত্র লেখে না, তোকে লেখে ত?

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, হঁ।

ভাল আছে ত?

ইন্দু তেমনি করিয়া জানাইল, আছেন।

বিমলা অবাক হইয়া গেল—কখন এলে বৌ?

এই আসচি।

ভৃত্য গাড়ি হইতে ইন্দুর তোরঙ্গ নামাইয়া আনিল। বিমলা দারুণ বিরক্ত কোনমতে চাপিয়া কহিল, বাড়ি যাওনি?

না। শুধু কমলাকে সুখ থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেচি। শুধু তার জন্যেই আসা নইলে আসতুম না।

বিমলা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই ভাল করতে বৌ। ওখানে তোমার আর গিয়েও কাজ নেই।—ইন্দুর বুকের ভিতরটা খড়াস করিয়া উঠিল—কেন ঠাকুরঝি?

বিমলা সহজ গম্ভীরভাবে কহিল, পরে শুনো। কাপড় ছাড়ো, মুখহাত ধোও—যা হবার সে ত হয়েই গেছে—এখন, আজ শুনলেও যা, দু'দিন পরে শুনলেও তাই।

ইন্দু বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, সে হবে না ঠাকুরঝি, না শুনে আমি একবিন্দু জলও মুখে দেব না। তাঁকে দেখতে পেয়েচি, তিনি বেঁচে আছেন—তবুও সেখানে আমার গিয়ে কান্দে নেই কেন?

বিমলা খানিক ধামিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যিই ও বাড়িতে তোমার জায়গা নেই। এখন তোমার পক্ষে এখানেও যা, বাপের বাড়িতেও তাই। ও-বাড়িতে তুমি থাকতে পারবে না।

ইন্দু কান্না চাপিয়া বলিয়া উঠিল, আমি আর সইতে পারিনে ঠাকুরঝি কি হয়েছে খুলে বল। বিয়ে করেচেন?

বিশ্বাস হয়?

না। কিছুতেই না। আমার অপরাধ যত বড়ই হোক, কিন্তু তিনি অন্যায় কিছুতে করতে পারেন

না। তবুও কেন আমার তাঁর পাশে স্থান নেই, বলবে না? বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিমলার নিজের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু অশ্রু করিল না। বলিল,—বৌ, আমি ভেবে পাইনে, কি করে তোমাকে বোঝাব, সেখানে আর তোমার স্থান নেই। শঙ্কুবাবু দাদাকে জেলে দিয়েছিল। ইন্দুর সর্বান্ত কঁটা দিয়া উঠিল—তার পরে?

বিমলা বলিল, আমরা তখন কাশীতে। শঙ্কুবাবু টাকা যোগাড় করবার দুর্দিন সময় দেয়। কিন্তু চার হাজার টাকা যোগাড় হয়ে ওঠে না। ধরে নিয়ে যাবার পরে দাদা ভোলাকে আমার কাছে কাশীতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আমরা তখন এলাহাবাদে চলে যাই।

সে ফিরে আসে, আবার যায়; ঐ—রকম করে দশ দিন দেরি হয়ে যায়। তার পরে আমি এসে পড়ি। আমার কাছেও নগদ টাকা ছিল না, আমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে, এগার দিনের দিন দাদাকে বার করে নিয়ে আসি। তোমারও ত চার-পাঁচ হাজার টাকার গয়না আছে বৌ, মেদিনীপুরও দূর নয়। তোমাকে খবর দিতে পারলে এ-সব কিছুই হতে পারত না। দাদা বরং দশ দিন জেল ভোগ করলেন, কিন্তু তোমার কাছে হাত পাতলেন না। আর তোমার তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? অনেক সুখই ত তাঁকে তুমি দিলে, এবার মুক্তি দাও—তিনিও বাঁচুন, তুমিও বাঁচো।

ইন্দু একমুহূর্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একে একে গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, বিমলার কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, এই নিয়ে তোমার নিজের জিনিস উদ্ধার করে এনো ঠাকুরঝি,—আমি তাঁর কাছেই চললাম। তুমি বলচ স্থান হবে না—কিন্তু আমি বলচি, এইবারেই আমার তাঁর পাশে যথার্থ স্থান হবে না। যা এতদিন আমাকে আলাদা কবে রেখেছিল, এখন তাই তোমার কাছে ফেলে দিয়ে, আমি নিজের স্থান নিতে চললুম। কাল একবার যেয়ো ভাই,—গিয়ে তোমার দাদা আর বৌকে দেখে এসো,—চললুম। বলিয়া ইন্দু গাড়ির জন্যে অপেক্ষা না করিয়াই বাহিব হইয়া গেল।

ওবে ভোলা সঙ্গে যা, বলিয়া বিমলা চোখ মুছিয়া, পিছনে পিছনে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।



আঁধারে আলো

এক

সে অনেকদিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে ; বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা, কথা শোন, একবার দেখে আস।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাস হতে পারব না।

কেন পারবি নে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাস হতে তোর কি বাধা হবে আমি ত ভেবে পাইনে, সত্।

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাঁসনে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েছি বাবা, আমার মান রাখবি নে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে ত মায়ের সন্ত্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিখবার মেয়ে, বড় দুঃখী—কথা শোন সত্য, রাজী হ।

আচ্ছা, পরে বন্ধব, বলিয়া সত্য বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারি শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-জ্ঞানের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। স্ত্রনরী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাস করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূর হাতে জমিদারি এবং সংসারের সমস্ত ভারার্ণ করিয়া নিশ্চিত হইবেন। ইহাব পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অনারূপ ঘটনা দাঁড়াইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাড়িতে এতদিন পর্যন্ত কোন কাজকর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষ্যে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃতঅতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহাব বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তার পর কেমন না পছন্দ হয়, দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্বক হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গায় ঠিক সমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকরুনটি কে হীরামুন্ডায় সাজিয়া বসিয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স।

সত্যর চমক ভাঙ্গিল। সে খতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিস নে—ঐ এককোঁটা মেয়ের সামনে তোর আর লজ্জা কি!

আমি কলকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল।

মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকেমুখে ঠুজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বসতে পারব না—আমার ভারী মাথা ধরেচে। বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাঠিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চৌচামচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এসব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, তাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?

শুতে নয়, পড়িতে যাচ্ছি। এম. এ.'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট করলে চলবে কেন? বলিয়া সে গৃঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুমদুম শব্দ করিয়া উপবে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে কান বাড়া করিয়া শু নিল—ঝুম্। আর একমুহূর্ত—ঝুমঝুম। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই অপাদমন্তক গহনা-পরা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যস্তব খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারানী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দুই

একফোটা রাধারানীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম. এ. পাস করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পবিত্রাগুলি উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না। সে বিবাহই করিবে না। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া নুনের আশ্বসস্ত্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন কি একরকম করিয়া ওঠে, কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখিলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকেই আবৃত্ত করিয়া দিয়া, একাকী বিরাজ করে; সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন; অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোনমতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ, হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ ব্যর্থব্যর্থ শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে-কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাস হইতে গঙ্গা দূর নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুভ বস্ত্র জিন্মা রাখিয়া জলে নমিত, তাহারই উদ্দেশ্যে আসিতে গিয়া, একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিশ্বেয়ে শুভ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশী নয়। পরনে সাদাসিধা কালাপেড়ে ধুতি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপলে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রশাসী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদমুখের ঝাতিরে ত্যাগ করিয়া হাতের হাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুদ্ধ বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দু'জনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সঁতার কাটা হইল না, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য উপরে উঠিল, তখন সেই অসামান্য রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজ্জারো টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া, আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্বদিনের মত আজিও তিনি ললাট চিহ্নিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্বাস্থে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তিনি

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যাষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু—পূর্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু, মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে বিদ্যা পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনে ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিন্তবস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক-ওদিক চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক-চক্কে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ও বড় ভালো হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যের মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অশ্রাপা কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারিনে—আপনারও দেখচি এ বদ অভ্যাস আছে। সত্য আশ্চর্যে আশ্চর্য জবাব দিল, আজ্ঞে হী, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

চোরবাগানে আমার বাসা।

আমাদের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই যাব।

বক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হইল না। চিংপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি—এবার যেতে পারব—নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় শুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পক্ষশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনি বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবেন না, কি উদ্ভাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস—সব রাস্তা দেখায়, সমস্ত চেতনা কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, এককণ্ড প্রাণহীন চমক-শলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উদ্মুক্ত হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা বাথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল; সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে বার্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হাবামজান, এত বেলা হয়েছে, তুলে দিতে পারিস নি? যা, তোর এক টাকা জরিমানা।

সে বেচারী হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুই-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকিতে শুধু করিয়া, বাস্তার দুইদিকেই শ্রাণপণে চোখ পাতিয়া দখিল। কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া, ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বদল মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিষ্কিন্তু একটা অমূল্য বস্তু জুড়াইয়া পাইল।

গাড়ি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পৰিচয়ের মত বলিলেন, এত দেবি যে? আমি আশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শিগগির নেয়ে নিন, অক্ষণ্ড আমার ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে ওলে গিয়া নামিল। সীতার কণ্ঠ তাহার কোথায় গেল! সে কোনমতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ি গেল কোথায়? রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে দিয়ে কবেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন!

দিলামই বা! চলুন। বলিয়া আর একবার সুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিঃসীহ, যত অনায়াস ই হোক, একবারও সন্দেহ হইত—এ-সব কি!

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোরবাগানে?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে?

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

আপনি ও চোরের রাস্তা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্বাক মরাল-গমনে চলিতে লগিলেন। আজ কন্দের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল শব্দে—অর্থাৎ ওরে মুক্ত—ওরে অঙ্গ যুবক! সাবধান! এ-সব ছন্দা—সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার বাজ, একবার ভিরঝির করিতে লাগিল। মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুট মৃদুকণ্ঠে জ্বাখ দিল, সে ত আপনার দেওয়াই হয়েছে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে?

আমার আর আছে কি যে দেব! যা ছিল সমস্তই ত তুমি চুরি-ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচেষ্টা ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎস্রোতের মত তাহার

সংশয়ের জাল আশ্রয় বিদীর্ণ করিয়া বৃকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্তে সাধ হইল, এই একশ্য রাজপথেই এই দুটি রাক্ষাস পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্কের নিমিষে গভীর লঙ্কার তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ ভুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাথে তাহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চ কেন? বলি, কিছু আছে টাছে? দু'পয়সা টানতে পারবে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানিনে, কিন্তু হাবাগোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি! কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্ৰ! যেমন চোখমুখ, তেমন রঙ। তোমাদের দুটিকে দিবা মানায়—দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে, যেন একটি জোড়া-গোলাপ ফুটে ছিল।

রমণী মুখ টিপিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

চার

জানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ, অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বোচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক ইহা অতি সত্য কথা, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্ জুয়ানের বাঙলা তর্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা শহরের পথেঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না।

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়—না?

সত্য সরলা শ্রদ্ধে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল; আন্তে আন্তে বলিল, হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট! আচ্ছা, সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড়জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্যন্ত ভালবাসা কি, জানতেও পায় না। জানবার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান-বাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগতে পারেই না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছে করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, তাহা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার দ্রাণ্ডর,—স্ত্রীর অতবড় অভ্যাচারেও তার রাগ হ'ল না। সত্য চূপ করিয়া রহিল।

সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়েমানুষ! আমি থাকতুম ত রাক্ষসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাকতে কি করে? প্রমদা বলে সত্যই ত কেউ ছিল না,—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় না যে সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্যি বিন্ধিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড়?

রমণী কহিল, ইংরেজী জানিনে ত, বাংলা বই যা বেরোয়, সব পড়ি। এক-একদিন সারা-রাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ি, যত বই আছে সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি?

হী, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছি ছি—

ছি ছি কিছু নেই—চল।

না না, আজ না—আজ থাক, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ তাহার এই অপরিচিতা প্রেমাম্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

পাঁচ

সকাল স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চারদিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর তিনি গঙ্গারূপে আসেন না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দৃষ্টিক্রান্ত মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই, হয়ত বা মৃত্যুশয্যা! কে জানে!

সে গলিটাজানো বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি, কোথায় বাড়ি, কিছুই জানে না। মনে করিলে অনুশোচনায় আত্মগোষ্ঠানিতে হৃদয় দক্ক হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই,—কেন সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল?

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ সত্যই পবিত্র, স্নেহজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েছে তাঁর? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না।

দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখতে চাইছেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সত্রে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?

দাসী কহিল, না, তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ি দ্বারের কাছে বসিয়া একজন পুঙ্খানুপুঙ্খ দারোয়ান কিম্বাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া ভেতরকার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু

দেখা যায়, মনে হইল, সেগুলি চমৎকার সাজান। কোণের ঘর হইতে উচ্চ-হাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙ্করের শব্দ আসিতেছিল। দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর—চলুন। ঘরের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চকণ্ঠে বলিল, দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

ভীত হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্য সমস্ত মস্তিষ্ক গুলট-পালট হইয়া গেল; তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোনমতে দোর ধরিয়া, সে সেখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়াম, একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিয়া আছে,—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি, এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন; দুই পায়ে একরাশ ঘুঙ্কর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্বত্র ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি চুলচুল করিতেছে; স্বরিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যের একটা হাত ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মিরগি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিস নে, ওঠ—এসবে আমার ভারী ভয় করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, ইহার করস্পর্শে সত্যের আপাদমস্তক তেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতী বিজলী—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?—

সমস্ত লোকগুলা হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া গুইয়া পড়িল—কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজলী কৃত্রিম রেগেবর স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম, বাড়াবাড়ি করিস নে—আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম, ভাগে গোহায়নু

আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল

পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা

টুটল সবৎ সন্দেহ।

জীবন যৌবন সফল করি মাননু

পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ

দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।

মলয় পবন বহু মন্দা।

আজু মনু গেহ গেহ করি মাননু

অব সো ন যবৎ মরি পরিহোয়ত—

আজু মনু দেহ ভেল দেহ।

তবৎ মানব নিরু দেহা—

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু—

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ্ক সাজাচ্ছ?

বিজলী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ, মিছামিছি কিসে? ও সত্যিকারের সঙ্ক বলেই ত এখন আমাদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাশা দেখাচ্ছি। আজ্ঞা, মাথা খাস গাবু, সত্যি বল ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গান্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মণও নই, মোচলমান খ্রীষ্টানও নই। হিন্দুর ঘরের এতবড় ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা—কি মতলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল ত? বিয়ে করবি বলে, না, ছুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?

ভায়ী একটা হাসি উঠিল। তার পর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। সত্য একটুবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবই বা কে? থাক সে।

বিজলী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ ত আমি! যা ক্ষামা, শিপগির যা—বাবুর খাবার নিয়ে আর; মান করে এসেচেন—বাঃ, আমি কেবল তামাশাই কচ্ছি যে। বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বহুশব্দ কণ্ঠের অকৃত্রিম সম্ভ্রম অনুভূতি যথার্থই

জুড়িয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথোলা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজলী নিজে হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জ্ঞাত যাবে? আমি হাড়ী না মুচি?

সত্য তেমনি শাস্তকণ্ঠে বলিল, তা হলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজলী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবু ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখছি! বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু তাহা শব্দ মাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, 'হাবু' নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু, নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেছি।

বিজলী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোয়া খাবে না? না।

বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল; জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলচি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দু'দিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েছে, কিন্তু আপনারও ভুল হচ্ছে। আর নয়, আগামী জন্মে নয়—কোনকালেই আপনার ছোয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমন সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, বিজলীবিবি, অবসিকেশু রহস্য নিবেদনম্! যেতে দাও—যেতে দাও—সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে।

বিজলী জবাব দিল না শুদ্ধিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে ত কল্পনাও করে নাই, এমনি মুখচোরা শাস্ত্র লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী মৃদুস্বরে কহিল, আর একটু বসো।

মাতাল ভূমিতে পাইয়া ঠেঁচাইয়া উঠিব, উ ষ্ট ষ্ট, প্রথম চোট একটু... খেলবে—যেতে দাও—যেতে দাও—সুতো ছাড়ে—সুতো ছাড়ে—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল; বিজলী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই, নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় উপরোধ হয়েছে—সত্য অনাদিকে মুখ কবিয়া চুপ কবিয়া রহিল।

সে পুনর্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটিবার এসো, মাপ চাচ্ছি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজলী পিছনে ফিরে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে?

না। আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কাল্যায় বিজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; টোক... সিয়া জোর করিয়া গলা পারিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা আমার বিশ্বাস করবে?

ভগ্নস্বর গুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর-ষোল দিন এরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে-মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিপ্লবী বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে করিবে কি? হায়, হায়! প্রত্যয় করাইবার

সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জনার মত বহুস্তে কাট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

সত্য গ্রহণ করিল, কি বিশ্বাস করব?

বিজ্ঞানীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুতারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই। বিজ্ঞানী মুখ না তুলিয়াই বুকিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাজরগুলো ভাঙ্গিয়া ওঁড়াইয়া দিতেছে।

সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে সে এই স্নানের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ভ্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে। সে যে দাগী আসামী! অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাস্থে মাখিয়া বিচারের সুমুখে পাঁড়িয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বৃষ্টিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে?—

সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে বলিল, চললুম।

বিজ্ঞানী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও, কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস করো, সকলেই দেহতো ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু ধামিয়া কহিল, সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না! বিজ্ঞানী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ! ঘণ্টা-খানেক পরে কখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাক্ষিত, অর্ধমৃত নারীশ্রুতি অমৃতস্পর্শে ভাঙ্গিয়া বসিয়াছে। এই অত্যন্ত সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালাটা পর্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল,—কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি, ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না! দাঁও দাঁও, থালাটা এগিয়ে দাঁও ত হ্যাঁ, বলিয়া নিজেই টানিয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটি কথাও বিজ্ঞানীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা শুল্করের তোড়া যেন বিচার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে?

বিজ্ঞানী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পরব না বলে।

অর্থৎ?

অর্থৎ, আর না। বাইজী মরেছে—

মাতার সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে অঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদেব বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু।

হয়

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়িতে অমিয়ারের ছেলের অগ্রপ্রাণন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসব করিয়া আমোদ-আহুলা, নাচ-গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারটি নর্তকী—ইহারই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারাণী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কি দেখচ বল ত?

রাধারানী স্বামীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে—বাইজীদের সাজসজ্জা—কিন্তু, ইঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছি, তাই একটু গল্প করতে এলাম।

ইস!

সত্যি! আচ্ছা, দেখচ ত, বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোনটিকে তোমার পছন্দ হয়?

এটিকে, বলিয়া রাধারানী আঙুল তুলিয়া, যে স্ট্রীলোকটি সকলের পিছনে নিত্যন্ত সাদাসিধা পোশাকে বসিয়াছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু, বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-উয়না এদের মত নেই। সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা হবে। কিন্তু, এদের মজুরি কত জান?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দু'জনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে পরাঁব বলচ, তার দু'শ টাকা।

রাধারানী চকিয়া উঠিল—দু'শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে ওনিনি কখনো। লোকে বলে, চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত,—কিন্তু, এখন পারবে কিনা বলা যায় না।

ওবে, অত টাকা দিয়ে আনলে কেন?

তার কমে ও আসে না। এতেও আসতে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েছে।

রাধারানী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি! দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।—কথাটা রাধারানী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ধৈর্যিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই। কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিলে কে—

গুনবে?

ই, বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজলী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রানী, ঘরে যাবে?

যাব, চল, বলিয়া রাধারানী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পাখের কাছে বসিয়া সমস্ত গুনিয়া রাধারানী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আচ্ছ ওঁকে অপমান করে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রের নিজেও চাঞ্চল ও শুদ্ধ ছিল না, অনেকবার গলাগিও শরিয়্য আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারানী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভক্তলোকে আসার ভরিয়্য গিয়াছে এবং উপরের বারান্দায় বহু স্ট্রীকটের সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজলী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া

আসিয়াছে, বাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু, সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভালিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

আপনাকে ডাকচেন—।

বিজ্জলী মুখ তুলিয়া দেখিল পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

বিজ্জলী কিংবাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে আমাকে ডাকচেন?

মা ডাকচেন।

তুমি কে?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজ্জলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এসো।

ঝলক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্জলী ত? আপনাকেই ডাকচেন,— আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজ্জলী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর বুলিয়া ফেলিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমামেস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাখারানী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রহ্ম কুণ্ডিত পদে বিজ্জলী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই সে সসন্ত্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল; এবং একটা চোকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার?

বিজ্জলী বিষ্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাখারানী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোটবোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে; কিন্তু, এটাকে না চিনতে পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্জলী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহাব আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যাসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যবিকশিত গোলাপ সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাখারানী নিস্তব্ধ। বিজ্জলী নির্নিমেধ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখারানী কহিল, চিনেচ দিদি?

চিনেচি বোন।

রাখারানী কহিল, দিদি, সমুদ্র-মহন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোটবোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যোক্তের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া বিজ্জলী একদৃষ্টে দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই যে অমৃত বোন। আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই খোদ পাণিষ্ঠাকে অমর করেছে।

রাখারানী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি?

বিজ্জলী একমুহূর্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অশ্রুশূন্যটাকে চিনতে পেরে, বিষম ষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলেন, আবার দেখ হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু, সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারা আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিলেন! তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানে না বোন! বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, শ্রাবের জ্বালায় ভগবানকে নির্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাণিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেছেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সবদিকে মাটি হয়ে যেতুম। তাঁকেও পেতুম না,

নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম।

কাল্যায় রাখারানীর গলা রক্ত হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজুলী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনও দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি—এর বেশী আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখারানী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে দেখা হবে দিদি?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইটে বিক্রি করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল?

লজ্জায় রাখারানীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চূপ করিয়া রহিল।

বিজুলী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝি। আমাকে অপমান করবেন বলে, না? তা ছাড়া, এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার ত কোন কারণই দেখিনে।

রাখারানীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজুলী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন? তবে তাঁরও ভুল হয়েছে। তাঁর পায়ে আমার পতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজেব বলে আর কিছু নেই। অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি!

নমস্কার বোন! বলসে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—
আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।



কালীনাথ

এক

রাত্রি চাবটার সময় গ্রনাস্ত্রে পূজাহীন সমাপ্ত করিয়া টিকিটি বেশ ২, করিয়া বাঁধিয়া কালীনাথ যখন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের টোল-ঘরের বারান্দায় বসিয়া দর্শনের সুত্র ও ভাষ্য শুনশুন স্বরে কটকট করিত, তখন তাহার বাহ্য-জগতের কথা আর মনে থাকিত না। প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘাকৃতি কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শন-শাস্ত্র-গহনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে দিশেহারা করিয়া ফেলিত। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া কত লোক কত কথা বলিত। কেহ কহিত, সে তাহার পিতার ন্যায় পণ্ডিত হইবে। কেহ বলিত, পিতার ন্যায় পড়িয়া পড়িয়া হয়ত বা পাগল হইয়া যাইবে। যাহারা তাহার বাতুল হইবার আশঙ্কা করিতেন, তাহাদের মধ্যে কালীনাথের মাতুল একজন। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, বাপু, তুমি গরীবের ছেলে, তোমার অত পড়িয়, কি হইবে? যাহা শিখিয়াছ, তাহাতেই কোনরূপে একমুষ্টি আতপ-তপস, একখানা গামছা ও দুটো তৈজসপত্রের স্বচ্ছন্দে যোগাড় হইবে। ৬৩ পড়িয়া কি শেষে স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ঘরের কোণে চূপ করিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতে থাকিবে? এখন যাহা আশা আছে, তখন তাহাও থাকিবে না। এ-সকল কথা কালীনাথের এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিত, অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত।

বাতুল হইয়া যাইবার আশঙ্কায় মাতুল তিরস্কার করিতেন : সংসারের কাজকর্ম কিছুই দেখে না বলিয়া মাতুলানী তাড়না করিতেন ; বাকরণ-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া ব্যয়োজ্যোত মাতুলপুত্রের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত ; কিন্তু কালীনাথ হয় এ-সকল অকাডরে সহ্য করিত, নয় এ-সকল

কথার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিত না।

যাহা হউক, ফল একই পৌঁড়িয়াছিল ; সে নিত্য যাহা করিত, নিত্য তাহাই করিত। সন্ধ্যার সময় কখনও মাঠে মাঠে আপনার মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কখনও নদীতীরের একটা পুরাতন অশ্বখ-বৃক্ষের শিকড়ের উপর বসিয়া, অন্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা কেমন করিয়া একটির পর একটি করিয়া আকাশের গায় মিলাইয়া যায়, দেখিতে থাকিত, কখনও গ্রামের জমিদার-বাটার শিবমন্দিরে শিবের আরতি অধিনির্মীলিতনেত্রে অনুভব করিতে থাকিত, কখনও বা এ-সকল কিছুই করিত না, শুধু মাতুলের চণ্ডীমণ্ডপের অঙ্ককার নিভৃত কোণে কবলের আসন পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

যেন জগতে তাহার কর্ম নাই, উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। এখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে—এই ছয় বৎসর কাল মাতুলভবনে এইরূপে কাটিয়া যাইতেছে। সে এখন কি করিতেছে, পরে কি করিবে, আগে কি করিয়াছিল, এখন কি করা প্রয়োজন ও উচিত, এ-সব কথা তাহার মনে আদৌ স্থান পাইত না। যেন তাহার এমনই করিয়া চিরদিন কাটিবে, যেন এমনই ভাবে চিরদিন মামার বাড়ির দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ও তিরস্কার খাইতে পাইবে। যেন তাহাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না—আর কিছুই করিতে হইবে না। তাহার সেই নীরব নিস্তব্ধ অঙ্ককার কোণটি যেন চিরদিন তাহারই অধিকারে থাকিবে, কেহ কখনও সেটা দখল করিতে আসিবে না, কিংবা সরিয়া অন্যত্র বসিতে বলিবে না। পাড়ার কোনও লোক দয়া করিয়া কখনও ডাকিয়া বলিত, কালীনাথ, এমন করিয়া কখনও কাহারও চলে নাই, তোমারও চলিবে না ; যাহা হউক, একটা কিছু কর। কালীনাথ জবাব দিত না ; শুধু মনে মনে ভাবিত, কি করিতেছি এবং কি বা আমাকে করিতে হইবে? এমনই করিয়া কালীনাথের দিন কাটিতেছিল।

দুই

ও-গ্রামের জমিদারের নাম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথবাবু মহাকুর্লীন ও প্রতিশয় ধনবান ; যখন দেখিলেন, এক কুলের খাতিবে এত বড়লোক হইয়াও সর্বরূপগুণযুক্ত পাত্র ন্ত অনুসন্ধান করিয়াও মিলিল না, তখন তিনি কৌলীন-প্রথার উপর একেবারে চটিয়া গেলেন। গৃহীণাকে এ কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, আমার এক বৈ মেয়ে নেই, আমার আর কুল নিয়ে কি হবে?

গ্রামেই গুরুদেবের বাটা ; তাহার মত জিজ্ঞাসা কবায় তিনি বলিলেন, হরি, হরি--এও কি কখনও সম্ভব? তোমার অর্থের ভাবনা নাই, কোন দরিদ্র কুর্লীন সন্তানকে কন্যা দান করিয়া, জামাতা ও কন্যা নিজের বাড়িতেই রাখিয়া দাও—ইহা দেখিতেও ভাল হইবে, শুনিতেও ভাল হইবে। এত বড় বংশ, এত বড় কুল, ইহার মর্যাদা কি ছোট করিতে আছে! প্রিয়বাবু বাড়িতে আসিয়া এ কথা জানাইলেন। গৃহীণী সাঙ্গুদে মত দিয়া বলিলেন, তাহি কর। যে ক'টা দিন বাঁচি, কলম আমার কাছেই থাক।

তাহাই হইল। দরিদ্র দেখিয়া বিবাহ দিয়া নিজের কাছেই রাখিলেন বলিয়া, প্রিয়বাবু একদিনস মধুসূদন মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন শর্মা তখন যজ্ঞমান বাড়িতে নিত্যপূজা করিতে যাইতেছিলেন। সহসা এতবড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে অত্যন্ত সন্দ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, কোথায় বসিতে দিবেন তাহা বুজিয়া পাইলেন না।

প্রিয়বাবু বসিলেন, মধুসূদন কিঞ্চৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন ; হাসিয়া বলিলেন, মহাশয়ের নিকট কিছু প্রয়োজন আছে, চলুন ভিতরে গিয়ে বসি।

আজ্ঞে হাঁ—চলুন ; কিন্তু—তা—

না—তা কিছুই নয়—চলুন, বসে সকল কথা বলিচি।

তখন দুইজন চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার ভাগিনেয়টি কোথায়? আর কোথায়! ভট্টাচার্যমশায়ের টোলে পড়চে।

একবার ডেকে পাঠান।

পাঠাচ্ছি ; কোনও প্রয়োজন আছে কি?

বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মধুসূদন ভট্টাচার্য কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, সে অকর্মণ্য ছোঁড়াটার সহিত এত বড় সম্বন্ধ লোকের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে। বরং একটু ভীত হইয়া কহিলেন, কিছু করেছে কি? কি করবে?

তবে?

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, তাকে নিজের জামাতা করব মনে করেছি এবং সেই সূত্রে আপনি আমার বৈবাহিক। বলিয়া প্রিয়বাবু জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। যে কথা মনে হওয়ায় তাঁহার হাসি পাইয়াছিল, মধুসূদন তাহা জানিতে পারিলে বোধ হয় আর কথাই কহিতেন না। ভট্টাচার্য বিশ্বয়বিস্ফারিত নয়নে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কাকে—কাশীনাথকে? হাঁ।

কেন?

অত বড় কুলীনসন্তান আমি আর সন্ধান করে পেলাম না। আপনার এ বিবাহে অমত আছে কি? অমত! এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা—কিন্তু সে যে পাগল।

পাগল? কৈ, এ কথা ত কখন শুনি নাই?

তার পিতা পাগল ছিল।

কাশীনাথের পিতাকে প্রিয়বাবু বিলক্ষণ চিনিতেন; এবং ইহাও জানিতেন, তাঁহাকে অনেকেই পাগল বলিত। প্রিয়বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, ছেলেটির নাম কি?

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাকে ডেকে পাঠান—আমি একবার দেখব।

মধুসূদন ভট্টাচার্য তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। যে ডাকিতে গেল, সে তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র! সে গিয়া ডাকিল, কাশীদাদা! কাশীদাদা উত্তর দিল না। আবার ডাকিল, কাশীদাদা!

এবার কাশীনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, কি?

তোমাকে বাবা ডাকছেন।

কেন?

ও ভাবিনে। ও গায়ের জমিদারবাবু এসেছেন, তিনিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কাশীনাথ ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিয়া বাটী আসিয়া যেখানে প্রিয়বাবু ও তাহার মাতুল মহাশয় বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপবেশন করিল।

প্রিয়বাবু তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কাশীনাথ! কোথায় ছিলে?

ভট্টাচার্য মহাশয়েব টোলে পড়ছিলাম।

ব্যাকরণ পড়েচ? কাশীনাথ ঘাড় নাতিয়া জবাব দিল, সে পড়িয়াছে।

সাহিত্য পড়েচ?

সামান্যই পড়েছি।

এখন কি পড়েচ?

সাহিত্য-দর্শন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আচ্ছা যাও, পড় গো।

কাশীনাথ চলিয়া গেল। ওহাকে কেন ডাকাইয়া আনা হইল, কেন শইতে বলা হইল, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। টোলে আসিয়া পুনরায় পুঁথি তুলিয়া বসিল। সে চলিয়া গেলে প্রিয়বাবু বলিলেন, কি পাগলের, না কিসের কথা বলছিলেন?

মধুসূদন কহিলেন, না, পাগল ঠিক নয়, কিন্তু এ একরকম, তাই কেউ কেউ ওকে পাগল বলে।

কি রকম?

সর্বদা পুঁথি নিয়ে বসে থাকে, না হয় আপন মনে ঘুরে বেড়ায়—কোনও কথায় বা কোনও কাজে থাকে না—এই রকম।

আর কিছু করে?

হয়ত কখনও বা একটা অন্ধকার ঘরের কোণে একা চুপ করে বসে থাকে।

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, আর কিছু?

এ হাসির অর্থ মধুসূদন ভট্টাচার্য যেন কতক বুঝিতে পারিলেন। অল্প অপ্রতিভভাবে বলিলেন, না, আর কিছু নয়।

তবে বাটীর ভেতর একবার জিজ্ঞাসা করে আসুন। তাঁদের যদি মত হয় ত এই মাসের মধ্যে বিবাহ দিয়ে ফেলি।

ভিতরে আসিয়া মধুসূদন গৃহিণীকে এ কথা জানাইলে তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কিম্বদের মাত্রা কিঞ্চিৎ শমিত হইলে বলিলেন, কাশীর সঙ্গে প্রিয়বাবুর মেয়ের বিয়ে? তুমি কি পাগল হলে নাকি?

এতে পাগলের কথা আর কি আছে?

নাই কি?

কাশীনাথ কত বড় কুলীনের ছেলে মনে আছে কি?

গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার হরির সঙ্গে হয় না?

দুইজনেই জানিতেন, তাহা হয় না। কর্তাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মত কি?

গৃহিণী বিষণ্ণভাবে বলিলেন, মত আর কি— হয় হোক।

কর্তা বাহিরে আসিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণীর এতে আনন্দের সীমা নাই। উনিই কাশীর জননীস্থানীয়া—যখন কাশীনাথ দু'বছরের, তখন আমার ভগিনীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি একরকম উনিই মানুষ করেছেন। তার পর যখন স্বর্গীয় বাঁড়ুযো মশায়ের পরলোক হয়, তদবধি ত এইখানেই আছে।

প্রিয়বাবু কহিলেন, সমস্তই আমি জানি। তবে আজই সমস্ত স্থির করে ফেলুন।

কি স্থির করতে হবে? আপনার যেদিন সুবিধা হবে, সেইদিনই আমি আশীর্বাদ করে আসব।

সে কথা নয়; কৌলীন্যের মর্যাদাটা?

সে-বিষয়ে আমি আর কি স্থির করব? মশায় যা অনুমতি করবেন তাই হবে। তবে আপনার ভাই জামাতার মাতুলানী—তিনিই মাতৃস্থানীয়া—তাঁর মত একবার শোন। আবশ্যক।

অবশ্য, অবশ্য! তাই ত বলছিলাম।

পরে মাতুলানীর মত লইয়া, প্রিয়বাবুর স্ব-ইচ্ছায় স্থির হইয়া গেল যে, জননীস্থানীয়া ভট্টাচার্যগৃহিণী এক সহস্র নগদ না লইয়া কাশীনাথের কিছুতেই বিবাহ দিবেন না। তাহাই হইল, প্রিয়নাথবাবু ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

তিন

পূর্বে যাহাই হউক, যখন দেখিল, সে রীতিমত স্থায়ীরূপ ঘরজামাই হইয়া পড়িয়াছে, তখন কাশীনাথের মনে আর সূখ রহিল না। এখন সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আর যাইতে পারে না; যথা ইচ্ছা তথায় দাঁড়াইতে পায় না; যাহার তাহার সহিত কথা কহিতে পায় না, সব জিনিস হইতে তাহাকে যেন পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। সে যেখানে যাইতে চাহে, সেইখানেই হয়ত তাহার স্বপ্নের অমত হয়, না হয় শাওড়ী ঠাকুরানী স্বাক্ষর দিয়া বলিয়া উঠেন, কি, আমার জামাই অমুকের মাটিতে মাড়াইবে? জামাই এমনই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কেন এমন হইল, কেন তাহাকে এমন করিয়া বাধা হইতেছে, এমন করিয়া কাহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, কাশীনাথ তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, আমি কি আর যে-সে লোক আছি যে, যা তা করিব। কিন্তু ভিতরটা কঁদিয়া বলে, বস্তি পাই না—বস্তি পাই না। সে কষ্টকরময় বনে বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বপ্নিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উন্মাদ সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুর্দিক বেধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে সে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল তাহা নহে—সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল;

কিন্তু এ নির্মল সরোবর তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক-একসময়ে মনে হইত, যেন এক কটাহ উল্লস জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে; সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে খালি গা নাই, সে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বখ বৃক্ষ নাই, চণ্ডীমণ্ডপের কোণ নাই—কিছুই নাই।

সে নবজন্ম লাভ করিয়া পূর্বজন্মের সমস্ত বস্তু ছাড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিংবা তাহার দেহ আর মন যেন বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় মনটা যখন নদীর ধারের অশ্বখ-বৃক্ষমূলে, কি মাঠের ভিতরে কৃষকদিগের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে, দেহখানা তখন হয়ত চমৎকার বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া গাড়ি চড়িয়া বেড়াইয়া আসে। মনটা যখন কোমরে গামছা বাঁধিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, দেহটা হয়ত তখন জল-চৌকির উপর বসিয়া ভূতাহস্তে সাবান-জলে পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এইরূপে একটা কাশীনাথ সর্বদা দুইটা কাজ করিয়া বেড়ায়, অথচ কোনটাই তাহার সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, সম্পূর্ণও হয় না।

কতদিন এইরূপে কাটিল। এক মাস দুই মাস করিয়া স্বপ্তরালে তাহার এক বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম কয়েক মাস তাহার মন অভিবাহিত হয় নাই। আমোদ-উৎসাহে বিশেষ একটা নূতনত্বের মোহে সে নিজের অবস্থার দোষভগ্ন বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার সময় পায় নাই; যখন পাইল, তখন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। অপর কেহ এ কথা না বুঝিতে পারিলেও কমলা বুঝিল; তাহার চক্ষু স্বামীর অবস্থা ধরিয়া ফেলিল। একদিন সে বলিল, তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন?

কে বললে?

আমার চোখ বললে।

ভুল বলচে।

কমলা ধরিয়া শ্মিল, কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

কিছুই ত হয়নি! হয়েছে।

হয়নি।

নিশ্চয় হয়েছে। আমার মন সব জ্বলতে পারে।

কাশীনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুমি বড় বিরক্ত কর, আমি এখান থেকে যাই।

কাশীনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া কমলা হাত ধরিল; কাতর হইয়া কহিল, যেও না—আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। কাশীনাথ একবার বসি-; কিন্তু পরক্ষণেই চলে চলিয়া গেল। কমলা আর বসিতে বলিল না, কিন্তু চলিয়া গেলে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিলে লাগিল।

কাশীনাথ বাহিরে আসিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার উপর কাহারও চক্ষু নাই। তখন ঘীরে ঘীরে ফটক পার হইয়া রাস্তা বাহিয়া চলিতে লাগিল। অনেকদূর গিয়া দোষতে পাইল, একজন দরওয়ান তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। কাশীনাথ বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া কহিল, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

সে সেলাম করিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে যেতে হবে না—তুই ফিরে যা।

সন্ধ্যার সময় একা যেড়াবেন?

কোন উত্তর না দিয়া কাশীনাথ চলিতে লাগিল। দরওয়ান বোকারী কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একটা দাঁড়াইয়া নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া স্থির করিল, যাওয়াই উচিত। কাশীনাথ তাহা কিছুই লক্ষ্য করিল না। আপন মনে চলিতে চলিতে মামার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের প্রবেশ করিয়া শ্রুতমনে একটা ঘরের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, হরিবাবু বেড়াইতে যাইতেছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়াছে, বারান্দায় অন্ধ অন্ধকারও হইয়াছে, সুতরাং চিনিতে পারিলেন না। নিকটে আসিয়া বলিলেন, কে ও?

কাশীনাথ বলিল, আমি।

হরিবাবু অভিযয় বিশ্বস্তের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, কে ও, জামাইবাবু নাকি?

কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল। তখন হরিবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, ও মা, দেখে যাও, জমিদারদের জামাইবাবু এসেছেন—বসবার জায়গও কেউ দেয়নি।

হরির মা বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, তাই ত! দুঃখী মামীকে মনে পড়েচে বাবা?

কাশীনাথ বরাবর চুপ করিয়াই রহিল। তখন মাতুলানী আপনার কন্যা বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, একবার এদিকে আয় মা—তোরা কাশীদাদা এসেছেন, একটা বসবার আসন দে, আমি ততক্ষণ আফিকটা সেয়ে আসি।

বিন্দুবাসিনী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। গৃহস্থধরের বৌ বলিয়া বাপের বাড়িতে বড় একটা আসিতে পারে না। আজ মাস-খানেক হইল এখানে আসিয়াছে। আসিয়া অবধি তাহার কাশীদাদার সহিত দেখা হয় নাই। কাশীদাদাকে সে বড় ভালবাসিত, তাই নাম শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, শুধু একজন বাবু অঙ্ককারে বারান্দায় বসিয়া আছে। এরূপ কাশীদাদা পূর্বে সে দেখে নাই। বড়লোকের জামাতা হইয়াছে এবং বাবু হইয়াছে দেখিয়া তাহার হাসি আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া অঙ্ককারেও দাদার মুখখানা এত স্নান বোধ হইল যে, সে আর হাসিতে পারিল না। কাশীনাথের মুখ স্নান হইতে পূর্বে কেহ দেখে নাই, বিশেষ বিন্দু—বাড়ির মধ্যে সেই কেবল কাশীনাথকে কিঞ্চিত্‌ চিনিতে পারিয়াছিল। সে নিকটে আসিয়া সন্নেহে হাত ধরিয়া বলিল, কাশীদাদা! এখানে একলা কেন? চল, আমার ঘরে গিয়ে বসবে চল। কাশীনাথ বিন্দুর ঘরে আসিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিল।

বিন্দু কহিল, কাশীদাদা, আমি কতদিন এসেচি, তুমি একদিনও দেখতে আসনি কেন?

আসতে পারিনি বোন।

কেন আসতে পারনি?

কাশীনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আসতে দেয় না।

আসতে দেয় না? সে কি?

কাশীনাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল, ঐ রকম।

বিন্দু দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে দেয় না?

না, দেয় না। আমি কোথাও গেলে স্বত্তরমশায়ের অপমান বোধ হয়।

বিন্দু বুঝিল, এ-সকল কথা বলিতে কাশীনাথের ক্রেশ বোধ হইতেছে, তাই অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, দাদা, তোমার বৌ দেখালে না?

কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল।

বিন্দু আমার বলিল, কেমন বৌ হয়েছে?

ভাল।

তবে আমি একদিন গিয়ে দেখে আসব।

কাশীনাথ মুখ তুলিয়া বিন্দুর মুখের পানে চাহিল; ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যেও।

এমন সময়ে গুমগুম শব্দে একখানি গাড়ি আসিয়া সদরে থামিল। বিন্দু বলিল, ঐ বুঝি তোমাদে গাড়ি এল।

বোধ হয়। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবে?

কোথায়? বৌ দেখতে।

বিন্দু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার যবে সুবিধা হবে, সেই দিন এসে নিয়ে যেও।

কাল আসব?

এসো।

পরদিন কাশীনাথ গাড়ি লইয়া নিজে আসিল। বিন্দুর যাইবার সময় কোথা হইতে হরিবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিবার সময় গাড়ি দেখিয়া কাশীনাথের আগমন কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। ভিতরে আসিয়া বিন্দু কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, বৌমাকে একবার দেখতে যাচ্ছে।

কোন বৌমাকে? জমিদারের মেয়েকে?

গৃহিণী কথা কহিলেন না। তখন হরিবাবু মহাগম্ভীরভাবে কহিলেন, কিন্তু যদি ওখানে যায়, তা হলে এ জন্মে আমি আর ওর মুখ দেখব না।

মা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে কি রে! ভাইয়ের বৌকে দেখতে যাবে তাতে দোষ কি?

দোষের কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার সময় নাই। কিন্তু যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে এ বাড়িতে সে যেন আর না আসে।

হরিদাস কী প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তাহা অবদিত ছিল না। সে নিঃশব্দে ঘরে গিয়া কাপড়-চোপড় খুলিয়া রাখিল। কাশীনাথ দাঁড়ইয়া সব দেখিল। তাহার পর স্নানমুখে গাড়িতে আসিয়া বসিল।

সন্ধ্যার সময় কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কৈ, ঠাকুরঝি এলেন না?

কাশীনাথ কাণ্ডরভাবে বলিল, তাঁরা পাঠালেন না।

কেন?

তা জানি না। বোধ হয়, এখানে পাঠাতে তাঁদের লজ্জা বোধ হয়। কথাগুলি কমলার বুকের ভিতর গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

চার

জমিদার প্রিয়বাবুর একটিমাত্র সন্তান কমলা। প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংসার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাণ্ডে সন্তানাদি হয় নাই। সে সমস্ত গত হইলে, মনের দুঃখে বৃদ্ধবয়সে আব একটি সংসার পাতাইলেন—তাহার ফল একটি মাত্র কন্যারত্ন। নিঃসন্তানের সন্তান হইলে পুত্র-কন্যার ভেদ রাখে না। তাই কমলা কর্তার উপর কর্তা, গৃহিণীর উপরও গৃহিণী। তাহার কথা কাটে, কিংবা অমান্য করে, বাড়ির মধ্যে এ ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কমলা ধনবতী, বিদ্যাবতী, রূপবতী, গুণবতী—সর্ববিষয়ে সৰ্বমুখী কন্যা; তথাপি একজনকে কিছুতেই সে আয়ত্ত করিতে পারিল না; যাহাকে পারিল না, সে তাহার স্বামী। কমলা অনেক করিয়া দেখিয়াছে। রাগ করিয়া দুঃখ করিয়া দেখিয়াছে, মান করিয়া অভিমান করিয়া দেখিয়াছে, আদর-যত্ন করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন দখল করিতে পারে নাই। দখল করা দূরে থাকুক, তাহার বোধ হয় কাছে যাইতেও পারে নাই। একটা দরিদ্র লোক যে কত বড় মন লইয়া তাহার স্বামী হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। নিতাই দুইবেলা কমলা প্রার্থনা করিত, ঠাকুর, শ্রীর মনটি আমাকে ধরিয়ে দাও। সময়ে সময়ে মনে করিত, বোধ হয় মনই নাই। তাই ধরিতে পারি না। কমলার নিকট তাহার স্বামী একটি জটিল রহস্য বলিয়া মনে হইত। যত দিন যাইতে লাগিল, উদ্ভেদের পন্থা পাওয়া র থাক, তত অধিক জটিল বলিয়া মনে হইত। কখনও সে ভাবিত, স্বামীর এত স্বামীর এত অধিক ভালবাসা বোধ হয় মনই নাই। তাই ধরিতে পারি না। কমলার নিকট তাহার স্বামী একটি জটিল বহস্য বলিয়া মনে হইত; যত দিন যাইতে লাগিল, উদ্ভেদের পন্থা পাওয়া দূবে থাক, তত অধিক জটিল বলিয়া মনে হইত। কখনও সে ভাবিত, স্বামীর এত অধিক ভালবাসা বোধ হয় কোনও স্ত্রী কখনও লাভ করে নাই; কখনও মনে হইত, এত দারুণ উপেক্ষাও বোধ হয় কখন কাহাকেও ভোগ করিতে হয় নাই। তথাপি কমলার দিন কাটিতে লাগিল; শুধু কাটে না কাশীনাথের; পৃথিতেও আর মন বসে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও বিরক্তি বোধ হয়, কথাবার্তা আমোদ-আহ্লাদেও প্রবৃত্তি হয় না। অমন হস্তপুষ্ট শরীর ক্লান্ত হইতে লাগিল, অমন শৌর্য বর্ণ কালো হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ৩২ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কমলা কপালে করাঘাত করিল। পূর্বে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আর রক্ষা করা চলিল না। স্বামী আসিলে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিল। কাশীনাথ বিব্রত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না।

কি হয়েছে, কীদা কেন?

কমলা কথা কহিল না। বচক্ষণ কীদিয়া-কাটিয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া কহিল, তুমি আমাকে একেবারে মেরে ফেল, এমন একটু একটু করে পুড়িও না।

কাশীনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল—কেন, করেচি কি?

তা কি তুমি জান না?

কৈ, কিছুই না।

আর যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমার দাঁড়াবার একটু স্থান রেখো।

এবার কাশীনাথ কমলাকে তুলিতে পারিল, কাছে বসাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে, বেশ করে বুঝিয়ে বল দেখি?

তুমি রোজ রোজ এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমার শরীর কি বড় মন্দ হয়েছে?

কমলা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছিল; সেইভাবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হয়েছে।

আমিও বুঝতে পারি, হয়েছে—কিন্তু কি করব বল?

কমলা! মুখ তুলিয়া বলিল, ওষুধ খাও।

কাশীনাথের হাসি আসিল, কহিল, ওষুধে সারবে না।

তবে কিসে সারবে?

তা জানিনে।

ওষুধে সারবে না, কিসে সারবে তাও জান না; তবে কি আমার কপালটা একেবারে পুড়িয়ে দেবে?

কাশীনাথ সাদাসিধা মানুষ, টোলে-পড়া বিদ্যা, সোহাগ-আদরও জানিত না; শ্রণয়-সম্ভাষণও তাহার আসিত না; কিন্তু এখন স্বাভাবিক স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সে বলিল, এখানে সুখ পাই না—তাই বোধ হয় এমন হয়ে যাচ্ছি।

তবে এখানে থাক কেন?

না থাকলে কোথায় যাব?

এখান ছাড়া কি আর জায়গা নেই? যেখানে সুখ পাও, সেখানে গিয়ে থাক।

তা হয় না।

কেন হয় না?

এখানে না থাকলে, কি শ্বশুরমশায়ের ভাল বোধ হবে?

আর এমন করে শুকিয়ে গেলেই কি তাঁর ভাল বোধ হবে?

ভাল বোধ হবে না, কিন্তু উপায় কি? তোমার বাবা গরীব দেখে—

কমলা মুখ চাপিয়া ধরিল—ছি, ও-সব কথা বল না। আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি উপায় করে দেব।—কাশীনাথ চিন্তা করিয়া কহিল, সব কথা তোমাকে খুলে বলা যায় না। আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এই-সব দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের এ বিয়ে না হলেই ভাল হ'ত।

কেন?

তুমিই বল দেখি, আমাকে পেয়ে কি একদিনের তরেও সুখী হয়েচ? আমি সোহাগ জানিনে, আদর জানিনে, ধরতে গেলে কিছুই জানিনে। তোমাদের এই বয়সে কত সাধ, কত কামনা, কিন্তু তার একটিও কি আমাকে দিয়ে পূর্ণ হয়? আমি যেন তোমার স্বামী নয়, শুধু তার ছায়া।

কমলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সব কথা সে ভাল বুঝিতেও পারিল না। একটা কথা তাহার অন্তরের ভিতর হইতে এতক্ষণ ধরিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছটফট করিতেছিল, সেটাকে যেন বলপূর্বক একটা বায়ুহীন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, বিবম পীড়াপীড়ি করিয়া এইবার বাহির হইয়া পড়িল। কম্পিতকণ্ঠে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি তুমি দেখতে পার না?

সে কথা আর একদিন বলব।

না, বল—কিন্তু আমাকে বিয়ে করে কি তুমি সুখী হওনি?

কি জানি, হয়ত না।

অন্য কাঁকে বিয়ে করলে কি সুখী হতে?

তাও ত ঠিক বলতে পারিলে।

শুনিয়া কমলার সর্বাস জ্বালা করিয়া উঠিল। এই সময় একজন দাসী বাহির হইতে বলিল, দিদিমণি, মার বড় ছুর হয়েছে—তোমাকে ডাকচেন।—কমলা চক্ষু মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

পাঁচ

গৃহিণীর সে ছুর আর সারিল না। পনের দিবসমাত্র ভুগিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পত্নীশোক প্রিয়বাবুর বড় বাজিল। এই বৃদ্ধবয়সে তিনিও বুঝিলেন, তাঁহাকেও অনেকদিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। এইবার কমলার অনেক কাজ পড়িল; নিজের সুখ-চিন্তা ব্যতীতও পৃথিবীতে অনেক কিছু করিতে হয়। বৃদ্ধ পিতা ক্রমশঃ অপটু হইয়া আসিতেছেন, কমলা সর্বদাই পিতার নিকট থাকিতে লাগিল। আর কালীনাথ? সে সুষ্টিছাড়া লোক; এইবার যেন সময় বুঝিয়া পুস্তকের রাশি লইয়া গৃহের কবাত রুদ্ধ করিয়া বসিল। যখন পুস্তকে মন লাগে না, তখন বাহির হইয়া যায়। কখন হইত একাদিক্রমে দুইদিন ধরিয়া বটীতেই আসে না। কোথায় আহার করে, কোথায় নিদ্রা যায়, কেহই জানিতে পারে না। এ-সব দেখিয়া শুনিয়া কমলা একরকম হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে যুবতী হইলেও এখনও বালিকামাত্র। স্বামী-প্রীতি, স্বামী-ভক্তি এখনও তাহার শিক্ষা হয় নাই। শিখিতেছিল—বাধা পড়িয়াছে; আবার স্বামী-কর্তৃকই বাধা পড়িয়াছে। তাহার দোষ কি? সে যাহা শিখিয়াছিল, ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিল। যে-সব সোনার দাগ বৃকের মাঝে ঝুৎ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও উজ্জ্বল হয় নাই, বাহিরের সৌন্দর্য এখনও ভিতরের প্রতিবিম্বিত হইতে পারে নাই—অথন্ত্রে অসাবধানে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যখন একেবারে মিলাইয়া গেল—কমলা তখন জানিতেও পারিল না। একখানা ভগ্ন অটালিকার দুই-একখানা ইট, দুই-একটুকরা কাঠ-পাথর বৃকের মাঝে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত আছে—কখনও কখনও দেখিতে পাইত, কিন্তু সে-সকল একত্র করিয়া আবার জোড়া দিয়া অটালিকা গাঁথিবাব তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। এখানে এক সময়ে একটা রাজপ্রাসাদ ছিল, শ্রমোদকানন ছিল—স্বপ্নের ঘোরে অসিয়াছিল, স্বপ্নশেষে চলিয়া গিয়াছে। সে স্বপ্ন ফিরিয়া দেখিবারও তাহার আর সাধ নাই। যাহা গিয়াছে—তাহা গিয়াছে।

বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়া, দাসদাসীকে আদর-যত্ন করিয়া, কর্মসূত্রে তাহার দিন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু একের যাহাতে সুখ হয়, অন্যের তাহাতে ত হয় না! কমলা যে সুখ অনুভব করিতে লাগিল, বুড়া ষি তাহাতে মর্মে ক্রেশ পাইতে লাগিল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে গোপনে একদিবস প্রিয়বাবুকে কহিল, জামাইবাবু যেন কি-রকম হয়ে যাচ্ছেন, কখন বাড়িতে যাবেন, কখন চলে যান—কখন কি করেন, বাড়ির কেউ জানতে পারে না। দিদিমণির সঙ্গেও বে... হয় কথাবার্তা নেই।

প্রিয়বাবু নিজের শরীর ও মন লইয়া বিব্রত ছিলেন, এ-সকল দেখিতে পাইতেন না। বৃদ্ধা দাসীর কথায় তাহার চেতনা হইল। কমলা আসিলে সন্নেহে কহিলেন, মা, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার যথার্থ উত্তর দেবে?

কমলা পিতার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা বাবা?

দেখ মা, আমাকে লজ্জা করবার আবশ্যক নাই; বাপের কাছে বিপদের সময় কোনও কথা গোপন করতেও নাই, আমাকে সব কথা খুলে বল—আমি নিজে সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে যাব।

কমলা মৌন হইয়া রহিল। প্রিয়বাবু আবার কহিলেন, সেখ... বলে তোমাকে সুপাত্রের হাতে দিয়েছি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই—কিন্তু তোমাকে অসুখী দেখে মরেও আমার সুখ নেই। বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কমলার চক্ষু দিয়াও জল পড়িতেছিল। বৃদ্ধ সে অশ্রু সন্নেহে মুছাইয়া বলিলেন, সব কথা আমাকে খুলে বলবে নোনা? কিন্তু কি বলিতে হইবে কমলা তাহা বুঝিয়া পাইল না। প্রিয়বাবু কিছুকণ মৌন থাকিয়া আবার কহিলেন, ঝগড়া হয়েছে বুঝি? কমলা ভাবিল, ভাব থাকলে ত ঝগড়া হবে! ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

ঝগড়া হয়নি? তবে সে বুঝি তোকে দেখতে পারে না?

কমলার এককণ্ঠ ইচ্ছা হইল—বলে, তাই বটে! কিন্তু তাহা পারিল না। স্বামী তাহাকে দেখিতে

পারে না বলিতে তাহার বুকে বাজিল। সে চূপ করিয়া রহিল।

প্রিয়বাবু স্নানমুখে হাসিয়া বলিলেন, তবে তুই বুঝি দেখতে পারিস নে?

কমলা ভাবিল, তাই হবে বুঝি। আমিই হয়ত দেখতে পারিনে। কিন্তু সে কি কথা! আমি আমার স্বামীকে দেখতে পারিনে? কমলা শিহরিয়া বুকের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখিবার প্রয়াস করিল—দেখিল, সেখানকার গীত-বাদ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে; শুধু মাঝে মাঝে দুই-একজন জিনিসপত্র সরাইয়া লইতে আসিতেছে, যাইতেছে; তাঁহাদেরই করস্থিত বাদ্যযন্ত্রে অসাবধানে কখনও হয়ত একটু-আধটু সুর বাহির হইয়া পড়িতেছে; কখনও হয়ত দুই-একজন অভিনেতা পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। কমলা কাঁদিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু আবৃত করিল।

প্রিয়বাবু অতিশয় কাতর হইলেন; বলিলেন, কেন কাঁদিচ্ছ মা?

বাবা আমরা যেন কেউ কারো নয়।

প্রিয়বাবু ধীরে ধীরে কন্যাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ছি মা, ও-কথা কি মুখে আনে? তুই যার মেয়ে সে যে আমার সর্বস্ব ছিল; এখনও রোজ রাতে সে আমার পায়ের কাছে এসে বসে থাকে—শুধু তোদের ভয়ে দিনের বেলা আসে না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, যদি সে এসে তোর এ কথা শুনতে পায় তা হলে মনে বড় দুঃখ পাবে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ঘরটায় অন্ধকারও হইয়ছিল; কমলা সচকিতে চড়দিকে চাহিয়া দেখিল, বাস্তবিক কেহ ঘরে আসিয়াছে কি না। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। সে তখন বাহিরে আসিল, তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল; শরীর এত দুর্বল বোধ হইতেছিল, যেন অর্ধেক বস্তু কেহ বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহার কাজকর্ম সমাপ্ত করিয়া, যে ঘরে কাশীনাথ মাটির উপর আসন পাতিয়া প্রদীপ জালিয়া পুঁথি খুলিয়া বসিয়া ছিল, সেইখানে গিয়া উপবেশন করিল।

কাশীনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা। বিষ্ময়ে বলিল, তুমি যে?

আমি এসেছি।

বস, বলিয়া কাশীনাথ আবার পুঁথিতে মন সংযোগ করিল। কমলা বন্ধকল ধরিয়া তাহার পুঁথি পাঠে দেখিল, তাহার পর হাত দিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া দিল। কাশীনাথ আশ্চর্য হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, বন্ধ করলে যে?

দুটো কথা কও। রোজ পড়—একটু না পড়লে ক্ষতি হবে না।

এই জন্য বন্ধ করে দিলে?

শুধু তাই নয়; বিরক্ত হবে, বকবে—এজন্যও বটে।

কাশীনাথ অল্প হাসিয়া বলিল, কেন বিরক্ত হবে কমলা? তোমাকে কখনও কি আমি বকেছি? কথা কও না, কাছে এস না, বই না পড়লে কেন্ন করে দিন কাটবে বল দেখি? একটু হাসিয়া বলিল, জ্বর হয়েছে, আঙ্গ দু'দিন কিছুই খাইনি, তা তুমি ও একবার খোঁজ নাওনি।—কমলা মুখ তুলিয়া দেখিল, স্বামীর মুখ বড় শুষ্ক; কপালে হাত দিয়া দেখিল, গা গরম। এখন কাঁদিয়া স্বামীর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি আমার দোষ ভুলে গিয়ে আর একবার আমাকে নাও, তোমার সব ভাব আমাকে নিতে দাও।

আমি পারি, কিন্তু তুমি রাখতে পারবে কি?

কেন পারব না?

দেখি।

আমাকে নাও।

অনেকদিন নিয়চি, কিন্তু তুমি বুঝতে পার না, এখনও হয়ত সব সময় ঠিক বুঝতে পারবে না।

কমলা প্রদীপের আলোকে সে মুখ যতখানি পারিল দেখিয়া লইল। একবার যেন মনে হইল, সে মুখে ছাই-ঢাকা অনেক আঙন আছে, মোম-ঢাকা অনেক মধু আছে। মৃদুত্বের জন্য তাহার আশ্রয়স্থিটি ঘটিল। সে পূর্বাংগে কহিয়া উঠিল, কেন তুমি এতদিন তোমাকে চিনতে দাওনি? কেন এতদিন আমাকে লুকিয়ে রেখে আমাকে এত কষ্ট দিলে? আনন্দের উজ্জ্বাসে কমলা স্বামীর গলা জড়াইয়া

ধরিল। কাশীনাথের চক্ষু দিয়াও সেদিন জল পড়িতে লাগিল।

ছয়

পরদিন প্রিয়বাবু কাশীনাথকে ডাকিয়া পাঠাইয়া কহিলেন, বাপু, আমি আর অধিক দিন বাঁচব না। আমার নেই পুত্র, বিষয়-আশয় যা কিছু রেখে যেতে পারলাম, তা সমস্তই তোমাদের রইল। যে ক'টা দিন বাঁচি, তার মধ্যে সমস্ত বুঝে-সুঝে নাও—না হলে কিছুই থাকবে না, অপরে সমস্ত ফাঁকি দিয়ে নেবে।—কাশীনাথ অবনত মস্তকে কহিল, আজ্ঞা করুন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আজ্ঞা আর কি করব! কাল হতে সকালবেলাটা একবার করে কাছারি-ঘরে গিয়ে বস।—যে আজ্ঞে, বলিয়া কাশীনাথ প্রস্থান করিল। প্রিয়বাবু কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, বুড়া হয়েচি, বিষয় দেখিতে পারি না, তাই কাশীনাথকে আমার জমিদারির সমস্ত ভার দিলাম। উত্তরকালে তার কাজ করতে অসুবিধা না হয়, এজন্য মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেব। কয়েক দিবস তিনি নিজে কাছারি-ঘরে গিয়া কাশীনাথকে জমিদারি-সংক্রান্ত অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। সেও হাতে একটা কাজ পাইয়া খুশী হইল। জমিদার-বাড়ির ভিতরে ভিতরে যে একটা দাহ উপস্থিত হইয়াছিল, অনেকদিন পরে তাহার জ্বালা যেন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল।

কাশীনাথ নিয়মিতভাবে কাছারির কাজকর্ম করে, কমলা নিয়মিতভাবে সংসার চালাইয়া যায় এবং প্রিয়বাবু নিয়মিতভাবে শয্যা শুইয়া থাকেন। সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কিছু দিবস পরে প্রিয়বাবুর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। একদিনসে তিনি কমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উইল করেচি। পরে উপাধানেব নিম্ন হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।—আমার স্বাবর-অস্বাবর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার ভ্রাতৃত্ব কাশীনাথকে ও অপর অর্ধেক কন্যা কমলা দেবীকে দান করিলাম। কেমন ভাল হয়নি মা? কমলা কথা কহিল না। প্রিয়বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন মা, তোমার মনোমত হয়নি কি? এ উইল তিনি বিশেষ করিয়া কমলাকে বুঝী করিবার জন্যই করিয়াছিলেন। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, তাহার স্বামী সম্পত্তির সত্যকার মালিক হইলে কমলাও অত্যন্ত প্রীত হইবে। কিন্তু কমলা যে কথা ভাবিতেছিল, তাহা মুখে বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। প্রিয়বাবু পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বলবে কি?

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কি মা?

কমলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, সমস্ত বিষয় আমার নামে ি নাও।

সে কি কথা মা?

কমলা মুখ নত করিয়া বসিয়া বহিল।

প্রিয়বাবু প্রাচীন লোক। সংসায়ে অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন; কমলার মনের কথা তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন রহিল না। একে একে সব কথা যেমন তলাইয়া বুঝিতে লাগিলেন, অল্প অল্প করিয়া তেমনই অপরসমুদায় তাহার শবীর ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। উপাধানে ভব দিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, এখন সেই উপাধানে মধ্যে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধকণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না। সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু কাজটা ভাল হবে ন—স্বর্গীন্দ্র করি, বুঝী হও। কিন্তু সে ভরসা আর কবেও পারি না। দীর্ঘজীবনে অনেক দেখেছি, নিজেও তিনবার বিবাহ কবেছি—একপ মন নিয়ে জগতে কোনও স্ত্রী কখন সুখী হতে পা় না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া, আবার বলিলেন, দেখতে ভাল হবে, তুমি বুঝী হবে, এই মনে করে, তোমাদের দু'জনকেই সমান ভাগ করে সমস্ত বিষয় দিয়ে যাচ্ছিলাম, জানতাম, তুমি আর সে ভিন্ন নও। আজ্ঞা, বল দেখি মা, কিজন্য তার বিষয়প্রাপ্তিতে তোমার অমত হচ্ছে?

কমলা কাদ-কাদ স্বরে কহিল, বিষয় পেলে আর আমার পানে ফিরে চাইবেন না।

বিষয় না পেলে?

আমার হাতে থাকবেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আমি কাশীনাথকে চিনি, কিন্তু তুমি চেন না। সে ঠিক তার বাপের মত। যদি তোমায় দেখতে না পারে, তা হলে বিষয় পেলেও দেখতে পারবে না, না পেলেও দেখতে পারবে না। আর কমলা! এমন করেই কি স্বামীকে হাতে রাখা যায়? জোর করে বনের বাঘ বশ করতে পারা যায়, কিন্তু জোর করে একটি ছোট ফুলকেও ফুটিয়ে রাখা যায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রার্থনা করি সফল হও—কিন্তু এ ভাল উপায় নয়। সে যদি তোমাকে না নেয়, তা হলে কতটুকু তোমার অবশিষ্ট থাকবে? যেটুকু থাকবে, তাতে অর্ধেক সম্পত্তিতে কি চলে না? আরও এক কথা, স্বামীকে দেহ মন আত্মা পার্শ্বব অপার্শ্বব সব দিতে হয়—যাকে সব দিতে হয়, তাকে এই অর্ধেক বিষয়টুকু কি দেওয়া যায় না? কমলা, এমন করিস নে না। যদি কখনও সে জ্ঞানতে পারে, মনে কষ্ট পাবে।

কমলা কোনও উত্তর দিল না, প্রিয়বাবুও আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দু'জনে প্রায় আধ-ঘণ্টা মৌন হইয়া রহিলেন। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, দাসী প্রদীপ দিয়া গেল। কমলাও চক্ষু মুছিয়া আপনার নিত্যকর্মে প্রস্থান করিল।—পরদিন প্রিয়বাবু তাহার উকিলকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উইল বদলাব।—উকিল জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ বদলাবেন?

আমার জামাতার নাম কেটে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাকে লিখে দেব।

কেন?

সে কথার প্রয়োজন নাই। যা বললাম, সেইরূপ লিখে দিন।

সাত

প্রিয়বাবুর মৃত্যুর পর প্রাঙ্কশান্তি হইল, উইল দেখিয়া কাশীনাথ কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত হইল না। জগতে যাহা নিত্য ঘটে, যাহা ঘটা উচিত—তাহাই ঘটিয়াছে; ইহাতে দুঃখই বা কি, আর আশ্চর্য বা কেন! তথাপি দেওয়ান মহাশয় কাশীনাথকে নিভূতে পাইয়া বলিলেন, ভ্রামাইবাবু, কর্তা মহাশয় যে এরূপ উইল করিবেন, তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। পূর্বে তিনি একবার উইল করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনাকে ও তাঁহার কন্যাকে সমান ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। সে উইল যে কাহার কথা গুনিয়া বা কি ইচ্ছায় বদলাইয়া দিলেন, তাহা কিছুই বৃত্তিতে পারিতেছি না।

কাশীনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, বুঝবার প্রয়োজনই না কি? যার বিষয় সে পেয়েছে; তাহাে আমারই বা কি, আর আপনারই বা কি?

দেওয়ানজী অপ্রতিত হইয়া বলিলেন, তবুও—তবুও—

কিছুই 'তবুও' নাই। বস্তুতঃ আমার সম্পত্তিতে অধিকার কি? বরং আমাকে অর্ধেক দিয়ে গেলেই আশ্চর্য হবার কথা ছিল বটে। আবও, আমাকে অর্ধেক দেওয়াও যা, তাকে সমস্ত দেওয়াও তাই। কিছু প্রভেদ আছে কি?—দেওয়ান এবার বিলক্ষণ অপ্রতিত হইলেন। শুদ্ধমুখে বলিলেন, না না, প্রভেদ কিছু নাই, আমি শুধু কর্তামশায়ের কথা বলছিলাম। তাঁর অভিপ্রায় আমি অনেক জ্ঞানতাম, এই জনাই এ কথা বলছিলাম।

তিনি তাঁর কর্তব্যই করেছেন। ভেবে দেখুন, স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন গতি নাই, কিন্তু স্বামীর স্ত্রী ভিন্ন অন্য গতি আছে। আমি দরিদ্র; একেবারে অতটা বিষয় নিষ্ঠু হাতে পেলে হয়ত কুফল ফলতে পারে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় পূর্বের উইল বদলিয়ে গিয়েছেন।

বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয় কাশীনাথকে বরাবর পণ্ডিত-মুখ টুলো ভট্টাচার্য মনে করিতেন; তাহার মুখে এরূপ বুদ্ধির কথা গুনিয়া ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে বৃদ্ধ দেওয়ান উত্তরোত্তর কাশীনাথের বিজ্ঞতার যত পরিচয় পাইতে লাগিলেন, অন্যদিকে কমলার উত্তরোত্তর তত অজ্ঞতাও পরিচয় পাইতে লাগিলেন। দিনের মধ্যে শতবার সে আপনাকে প্রশ্ন করে, ইনি কেমনতর মানুষ? শতবার বিফল প্রশ্ন শুদ্ধমুখে ফিরিয়া আসিয়া কহে, বৃত্তিতে পারি না।

সহস্র পরিশ্রমে সহস্র চেষ্টায় কমলা কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এই দুই-হাত-পা-সমভি

মানুষটা কিসে নির্মিত। মনটা তাহার নিজের শরীরের ভিতর রাখিয়াছে, না আর কাহারও কাছে জমা দিয়া আসিয়াছে? সে দেখে, সকলে যাহা করে, তাহার স্বামীও তাহাই করে। আহার করে, নিদ্রা যায়, জমিদারির কাজকর্ম, সংসারের কাজকর্ম সমস্তই করে, সমস্ত বিষয়ে বন্ধুশীল, অথচ সমস্ত বিষয়েই উদাসীন। কি যে তাহার স্বামী ভালবাসে, কিসে যে তাহার অধিক স্পৃহা, এতদিনেও কমলা তাহা ধরিতে পারিল না। কমলার অসুখের সময়ে কালীনাথ অনিমেষচোখে দিবারাত্রি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত; সে মুখে কাতরতা, সে বুকে কতক স্নেহ, কত ভালবাসা, যেন তাহা ফুটিয়া বাহির হইত; আবার ভাল হইবার পর কমলা পথের মাঝে পড়িলেও কালীনাথ ফিরিয়া চাহে না, মুখ তুলিয়া দেখে না। আপনার মনে আপনার কর্মে চলিয়া যায়। কমলা অভিমান করিয়া দুইদিন কথা না কহিয়া দেখিয়াছে, কোন ফল নাই, কালীনাথ কাছে আসিয়া আবার চলিয়া যাইত; না সাধিত, না কাদিত, না কথা কহিত। আবার কথা কহিলে হাসিয়া কথা কহিত; না কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করিত, না কোনদিন জিজ্ঞাসা করিত, কেন দুইদিন কথা কহ নাই, কেন রাগ করিয়াছিল? কমলা দিন-কতক পরে নিজের মনে পরামর্শ আঁটিয়া এরূপ ভাব ধরিল, যেন সে তাহার উদাসীন স্বামীটিকে জানাইতে চাহে, তুমি আমাকে উপেক্ষা করিলে আমিও উপেক্ষা করিতে জানি। আর এত তোমাকে ভালবাসি না যে, তুমি মাড়িয়া যাইবে, আর আমি ধুলার মত তোমার চরণতলে জড়িয়া থাকিব। কমলা দেখা হইলে অন্যমনে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যায়; যেন প্রকাশ করিতে চাহে, তোমাকে দয়া করিয়া স্বামী করিয়াছি বলিয়া এমন মনে করিও না যে, তোমার পায়ে প্রাণ পড়িয়া আছে এবং সেইজন্য যখনই দেখা হইবে, তখনই মিষ্ট হাসিয়া শ্রীতি-সম্ভাষণ করিব। আমার কাছের সময় সামনে পড়িলে আমিও দোহাও পাই না। এখন সে কোন দাসদাসীকে তিরস্কার করিতে থাকে তখন কালীনাথ দৈবাৎ যদি কোনও কথা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে কথা আদৌ কানে না তুলিয়া যাহা বলিতেছিল, তাহাই বলিতে থাকে; যেন বলিতে চাহে, আমার দাস, আমার দাসী, আমার বাড়ি, আমার ঘর : যাহাকে যাহা বুশি বলিব, তুমি তাহাকে অযাচিত মধ্যস্থ হইতেছ কেন?

কিন্তু ইহাতে কি তৃপ্তি হয়? এমন করিয়া কি বাচনা পূরে? তৃপ্তি হইতে পারিত যদি কালীনাথকে একবিন্দু টলাইতে পারিত। যাহাই কর, সে তাহার প্রশান্ত গম্ভীর মুখখানি লইয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতো আপনি নিশ্চল বসিয়া আছে, সুমেরু শিখরের মত তাহাকে একবিন্দু স্থানচ্যুত করিবার ক্ষমতাও তোমার নাই। যত বুশি বড়-বৃষ্টি তোল, যত ইচ্ছা গাছপালা ওলট-পালট করিয়া দাও, কিন্তু আমাকে টলাইতে পারিবে না।

আচ্ছা, কমলা কি ভালবাসে না? বাসে, কিন্তু সে ভালবাসা অনন্ত - লেন্স্পর্শী নহে; কমলা যেন রেখা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে চাহে, তুমি ইহার বাহিরে যাইও না। যাইতে আমি সহ্য করিতে পারিব না। হয়ত তথাপিও ভালবাসিব কিন্তু তোমার মর্যাদা রক্ষা করিব না।

একদিন সে বুদ্ধা দাসীর কাছে মনের দুঃখে কাঁদিয়া বলিল, বাবা আমাকে একটা জানোয়ারের হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন।

কেন দিদি?

কেন আবার জিজ্ঞাসা করিস? তোরা সবাই মিলে আমাকে কেন হাত-পা বেঁধে ভলে ফেলে দিসনি?

ও-কথা কি বলতে আছে দিদি?

কেন বলতে নেই? তোরা যে কাজটা করতে পারলি, আমি তার কথা মুখেও একবার বলতে পারব না!

না না, তা নয়। উনি দিবা মানুষ; তবে একটু পাগলামির ছিট আছে। গঁর বাপেরও একটু ছিল, তাই জামাইগণেরও—

তুই চুপ কর। পাগলের কথা মুখে আনিস নে। বাপ পাগল হলেই কিছু আর ছেলে পাগল হয় না। পাগল একটুকুও নয়, শুধু ইচ্ছা করে আমাকে কষ্ট দেয়।—স্বামী পাগল, এ কথা স্বীকার করতে কমলার বুকে বাজিল।

আজ তিনদিন হইল কাশীনাথের দেখা নাই। দুইদিন কমলা ইচ্ছাপূর্বক কোন খোঁজ লইল না, কিন্তু তৃতীয় দিবসে উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরে দেওয়ানকে বলিয়া পাঠাইল, বাবু দুইদিন ধরিয়া বাটাতে আসে নাই, তোমরাও কোনও সন্ধান কর নাই, তবে কিজন্য এখানে আছ?

দেওয়ান ভাবিল, মন্দ নয়! কে কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার আমি কিরূপে সন্ধান রাখিব? পরে খাজাখীর নিকট খবর পাইল যে জামাইবাবু তিন সহস্র টাকা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কিংবা কবে ফিরিবেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই।

কমলা কিছুক্ষণ কপালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল; পরে তাহার পিতার উকিলবাবুকে ডাকিয়া বলিল, আমার বিষয়-সম্পত্তি দেখতে পারে, এমন একজন লোক এক সপ্তাহের মধ্যে বাহাল করে দিন; যেমনই বেতন হোক, আমি দেব।

আট

কালকাতার একটা ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গলির ভিতর একখানা ছোট একতলা বাটাতে, সমস্তদিন জলে ভিজিয়া, এক হাঁটু কাদা-পাক লইয়া কাশীনাথ প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুই শিশি ঔষধ, এক টিন বিস্কুট ও চাদরে বাঁধা বেদনা প্রভৃতি কতগুলি দ্রব্য ছিল।

এই বাটার একটি কক্ষে নীচের শয়্যা একজন রোগী শয়ান ছিল, এবং নিকটে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক তাহার মস্তকে হাত বুলাইতেছিল। কাশীনাথ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকটি কহিল, কাশীদাদা, এত জলে ভিজে এলে কেন? কোথাও দাঁড়ালে না কেন?

তা কি হয় বোন? জলে ভিজে ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দাঁড়ালে হয়ত হ'ত।

তা বটে! বিন্দু বুকিয়া দেখিল, কাশীদাদার কথা অসত্য নহে—তাই চপ করিয়া রহিল।

এই কয় বৎসর ধরিয়া বিন্দু যে ক্রেশ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা কেবল সেই জানে! আমবা তাহার বাপের বাড়িতে তাহাকে শেষ দেখিয়াছিলাম, আর দেখি নাই। এখন একটু তাহার কথা বলি। যেদিন সে ভ্রমদারের মেয়েকে দেখিতে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াও যাইতে পায় নাই, তাহার পরদিনই গোপালবাবুর (তাহার স্বশুরের) সহসা কঠিন ব্যাধির সংবাদ পাইয়া তাহাকে স্বামী-ভবনে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। সে আসিয়া দেখিল, তাহার স্বশুরের যথার্থই কড় কঠিন পীড়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইল, কিন্তু গোপালবাবুর কিছুতেই প্রাণরক্ষা হইল না। পীড়া বড় বাড়িয়া উঠিলে গোপালবাবু কহিলেন, ছোটবৌমাকে একবার নিয়ে এসে—তাকে একবার দেখব। ছোটবৌমা আমাদিগের বিন্দুবাসিনী। মৃত্যুর দুই-এক দিবস পূর্বে গোপালবাবু বিন্দুকে বলিলেন, মা, এই চাষি নাও, এ বাস্কে যা রইল সব তোমাকে দিলুম। বিন্দু হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। অন্যান্য বস্তুরা মনে করিল, বৃদ্ধ মরিবার সময় বিন্দুকেই সব দিয়ে গেল। আরও এক কথা, গোপালবাবু পীড়ার মধ্যেই একদিন চারি সন্তানকেই কাঁচে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বাবু, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কিছুমাত্র মিল নাই এবং তোমাদের জননীও জীবিত নাই, তখন আমার মৃত্যু হলে তোমরা আর এক সংসারে থেকে না। মিথ্যা কলহ করে ভিন্ন হবার পূর্বে যেটুকু সম্ভাব আছে, তা নিয়ে পৃথক হও। যা কিছু বেছে গেলাম, তার উপর কিছু কিছু উপার্জন করলে তোমাদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলবে।

পিতার মৃত্যুর পরে সকলে পৃথক হইলে, বিন্দু একদিন বাস্ক খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একখানি রামায়ণ ও একখানি মহাভারত ভিন্ন আর কিছুই নাই। আশায় নিরাশ হইলেও বিন্দু স্বর্ণীয় স্বশুর মহাশয়ের দান মাথায় তুলিয়া লইল। বিন্দু অশ্রুটধরে বলিল, তাহার স্নেহের দান—ইহাই আমার বস্তু।

দিন-কতক বিন্দুর সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিল, তাহার পর বিপদের আরম্ভ হইল। বিন্দুর স্বামী যোগেশবাবু পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বিন্দু শরীরপাত করিয়া সেবা-ওষধা করিল, কয়েকখানি ভ্রমি বন্ধক দিয়া চিকিৎসা করাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গ্রামস্থ কয়েকজন প্রাতিবাসী তখন কলিকাতায় যাইয়া চিকিৎসা করাইতে আসিল। বিন্দুবাসিনী আপনার সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়া স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। এখানেও কয় রকমে চিকিৎসা করাইতে অবশিষ্ট ভ্রমিগুলি ক্রমশঃ বন্ধক পড়িল। কিন্তু রোগের কিছু হইল না। অর্থাভাবে এখন উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইবার উপায় রহিল না। বিন্দু

স্বামীর অগ্রজকে সব কথা লিখিয়া জানাইল। কিন্তু কোন ফল হইল না ; তিনি উত্তর পর্যন্ত লিখিলেন না। তখন সে তাহার অপর দুই ভাণ্ডারকে লিখিল, কিন্তু তাহারাও অগ্রজের পন্থা অবলম্বন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু বুঝিল, এখন হয় উপবাস করিতে হইবে, না হয় বিষ খাইয়া মরিতে হইবে।

স্ত্রীর মুখ দেখিয়া যোগেশবাবু সমস্তই বুঝিতে পারিতেন। একদিন তাহাকে নিকটে বসাইয়া সম্মুখে হাত ধরিয়া বলিলেন, বিন্দু, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল ; মরতে হয়, সেইখানেই মরব—এখানে ফেলবার লোক পাবে না।—এইবার বিন্দু দেখিল, মরণই নিশ্চিত ; কেননা, অন্য উপায়ও নাই, স্বামীকে বাড়ি ফিরাইয়া লইয়া যাইবারও উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে এ অবস্থায় রাখিয়া কেমন করিয়া মরিবে? আর যদি মরিতেই হয়, তখন লজ্জা করিয়া কি হইবে? অনেক বিতর্কের পর সে লজ্জার মাথা খাইয়া এ কথা কাশীনাথকে পত্রদ্বারা বিদিত করিল। পরের ঘটনা আপনারদের অবদিত নহি।

আসিবার সময় কাশীনাথ অনেক টাকা আনিয়াছিল। সেই টাকা দিয়া শহরের উৎকৃষ্ট ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসা করায় সকলেই কহিল যে, বায়ু-পরিবর্তন না করিলে আরোগ্য হইবে না। কাশীনাথ সকলকে লইয়া বৈদ্যনাথ উপস্থিত হইল। এখানে থাকিয়া মাস-দুয়ের মধ্যে সবাই বুঝিতে পারিল, যোগেশবাবু এ যাত্রা বঁচিয়া গেলেন ; তথাপি ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই। সেই জন্য তাহাদিগকে এখানে রাখিয়া কাশীনাথ বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

প্রাতঃকালে কমলার সহিত দেখা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলে?

বাড়ী এসেছি।

কমলা সম্প্রদায় কর্মে চলিয়া গেল। কাশীনাথ বাড়িরে আসিয়া কাছারি-ঘরে প্রবেশ করিল। ওচাদিনের পর তাহাকে দেখিয়া কর্মচারিগণ দাঁড়াইয়া উঠিল। শুধু একজন সাহেবী পোশাক-পরা যুবক আপনার কাণ্ডে চোয়াবে বসিয়া বহিল। একজন আগন্তুককে দেখিয়া অপরাপর কর্মচারীরা যে সম্মান করিল, নবাবাবু বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন না। কাশীনাথ নিজে একটা কেদারা টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। এত লোকটি নুতন ম্যানেজার হইয়া আসিয়াছেন, নাম শ্রীবিজয়কিশোর দাস। কলিকাতায় বি এ পাস করিয়াছিলেন, এবং অতিশয় কমলক লোক, তাই উকিল বিনোদবাবু ইহাকেই ম্যানেজারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ম্যানেজার অনেকক্ষণের পর কাশীনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, মশাইয়ের কোনও প্রয়োজন আছে কি?

না, প্রয়োজন নাই, কাজকর্ম দেখছি মাত্র।

এবার দেওয়ান মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইনি আমাদের জম্মাইবা

বিজয়বাবু গাছোথান কবিতা শ্রীতিসম্ভাষণ করিলেন। এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বিজয়বাবুকে কহিল, ভিতরে মা একবার আপনাকে ডাকছেন।

বিজয়বাবু প্রস্থান করিলে কাশীনাথ ডাকিয়া কহিল, ইনি কে?

নুতন ম্যানেজার।

কে বাথলে?

মা দেখেছেন।

কেন?

বোধ হয় কাজকর্ম সুবিধামত হইছিল না বলে।

এখন কোথায় গেলেন?

বাড়ির ভিতরে।

কাশীনাথ আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া ভিতরে আসিল। আসিবার সময় দেখিল, একটা ঘরের পর্দা সম্মুখে বিজয়বাবু দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে আর একজন মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। কাহার কথা কহিতেছে কাশীনাথ বুঝিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া, সে দিলে একবার না চাহিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে কমলার সহিত আর একবার তাহার দেখা হইল।—কমলা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, শরীর ভাল আছে ত?

কাশীনাথ সেইরূপভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছে।

আর কোন কথা না কহিয়া কমলা চলিয়া গেল। দাঁড়াইয়া কথাবার্তা, গল্প-শুভব করিবার সময় এখন আর তাহার নাই, এখন সহস্র কাজ পড়িয়াছে; বিশেষতঃ নিজের বিষয় নিজের হাতে লইয়া তাহার আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই।

একদিন সকালবেলা কাশীনাথ ম্যানেজারবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যমুখে ম্যানেজার জবাব দিলেন, এখন সময় নাই, সময় হলে আসব। কাশীনাথ তখন স্বয়ং কাছারি-ঘরে আসিয়া বিজয়বাবুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল, আপনার সময় নাই বলে আমি নিজে এসেছি। আজ আমার পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন আছে; সময় হলে তা উপরে পাঠিয়ে দেবেন।

কি প্রয়োজন?

তা আপনার শুনবার প্রয়োজন নাই।

নই সত্য। কিন্তু মালিকের অনুমতি বিনা কেমন করে দেব?

কাশীনাথ বৃথিল, কথাটা অন্য রকমের হইয়াছে। কহিল, আমার কথাই বোধ হয় যথেষ্ট। অন্য অনুমতির প্রয়োজন আছে?

বিজয়বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, আছে। যাকে তাকে টাকা দিতে নিষেধ আছে।

কাশীনাথ কমলার সহিত দেখা করিয়া কহিল, তোমার নতুন লোকটাকে ডাঙিয়ে দাও।

কাকে?

যে তোমার ম্যানেজার হয়ে এসেছে।

কেন, তার দোষ কি?

আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি।

কি করেছে?

আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু না এসে—চাকরদের মুখে বলে পাঠালে আমার সময় নাই যখন হবে তখন যাব।

কমলা সহাস্যে বলিল, হয়ত সময় ছিল না। সময় না থাকলে কেমন করে আসবে?

কাশীনাথ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, বেশ, সময় ছিল না বলে যেন আসতে পারেনি, কিন্তু আমি নিজে গিয়ে যখন টাকা চাইলাম, তখন বললে যে মালিকের শুকুম ছাড়া দিতে পারি না।

কমলা মধুরতর হাসিয়া বলিল, কত টাকা চেয়েছিলেন?

পাঁচ শ।

দিলে না?

না। তুমি আমায় টাকা দিতে কি নিষেধ করেছ?

হী, যা তা করে টাকাগুলো উড়িয়ে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।

কাশীনাথ—পাথরের কাশীনাথ হইলেও মর্মে পাড়া পাইল। একপ ব্যবহার বা একপ কথা সে পূর্বে আর শুনে নাই। বড় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমাকে দেখুও কি উড়িয়ে দেখুও?

যেমন করেই হোক, নষ্ট করার নামই উড়িয়ে দেখুও।

প্রয়োজনে ব্যয় করার নাম নষ্ট করা নয়।

কিসের প্রয়োজন?

একজনকে দিতে হবে।

দিতে ত হবে, কিন্তু পাবে কোথায়? নিজের থাকে ত দাও গে। আমি বারণ করব না।

কাশীনাথ চুপ করিয়া রহিল, কথাটা তাহার কানে অগ্নিশলাকার মত প্রবেশ করিল। ব্যাভিবে আসিয়া সে আপনার বড়ি আণ্টে প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া পাঁচ শত টাকা পৈয়শনাথে পাঠাইয়া দিল। নীচে একস্থানে লিখিয়া দিল, আর কিছু চাসনে বোন, আমার আর কিছুই নেই।

সেইদিন হইতে কাশীনাথ আর ভিতরে প্রবেশ করে না; কমলাও কোনও খোঁজ লয় না। এমনই দিন-কতক গত হইবার পর একদিন একটা ভৃত্য আসিয়া কহিল, আপনার কাছে একজন ব্রাহ্মণ

আসতে চান।

পরক্ষণেই কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিল, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাতে পৈতা জড়াইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনি মহৎ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণকে সর্বস্বান্ত করবেন না।

কাশীনাথ ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েছে?

ব্রাহ্মণ কহিল, আপনার কণ্ড আছে, কিন্তু আমার ঐ জমিটুকু ভিন্ন অন্য উপায় নাই; ওটুকু আর নেবেন না। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

কাশীনাথ ব্যস্ত হইয়া ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সব কথা বুঝে বলুন। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আপনি ধার্মিক ব্যক্তি, শপথ করে বলুন দেখি যে, ক্ষেত্রপালের দকন জমিটা আমার নয়?

কে বলেছে আপনার নয়?

ওবে বিজয়বাবু আপনার নতুন মালিকভাব, আমার নামে নালিশ করেছে কেন?

নালিশ করেছে, আমি ও জানি না।

সমন দেবত্ৰিয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, যখন মকদ্দমা হয়েছে, তখন মকদ্দমা করব এবং আপনাকে সাক্ষী মানাব, আমি দাবী, আপনার সঙ্গে বিবাদ সত্যে না। ওখনি সর্বস্বান্ত হবার পূর্বে নিজের সম্পত্তি দিন। আপনাকে ছেড়ে দেব না।

ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া হাত ধরিয়া কাশীনাথ পুনর্বার তাঁহারে বসাইয়া বলিল, যাতে ভাল হয়, সে চেষ্টা আমি করব, পরে আপনার যেমন ইচ্ছা সেকরণ করবেন।

কাশীনাথ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া বিজয়বাবুকে তর্কিয়া বলিল, ও জমিটা আমাদের নয়, মিথ্যা ব্রাহ্মণকে ক্রোধ দিচ্চেন কেন? মনিবের প্রকৃম।

কাশীনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, মনিব কি পরের জিনিস চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েছে?

ওটা আমাদের জিনিস।

না, আপনার নয়।

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, আমি ভূতা মাত্র; যেকোন আজ্ঞা হয়েছে, সেকরণই করোঁচ এবং করব। —এ কথা কমলাকে জানাইতে কাশীনাথকে লজ্জা করিতেছিল; তথাপি বলিল, ও জমিটা তোমার নয়, ব্রাহ্মণের প্রকৃম অপহরণ করে না। অপহরণ করি কে বললে?

যেই বলুক—ও জমিটা তোমার নয়, মিথ্যা মকদ্দমা করতে বিজয়বাবুকে নিষেধ করে নাও।

কমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, বিজয়বাবু কাজের লোক, তিনি নিজেও জ বুদ্ধিতে পারেন। তাঁর কাজে তোমার হাত দেবার প্রয়োজন নাই।

দিন-কয়েক পরে বিচারের দিন। সাক্ষী-মধ্যে দাঁড়াইয়া কাশীনাথ কহিল, আমি স্বীয় স্বপ্নবৎসল্যের সময় হইতে বিষয় দেখে আসছি এবং পরে নিজেও বরদীন তত্ত্বাবধান করেছি; আমি জানি ও জমি কমলা দেবীর নয়।

বিজয়বাবু মকদ্দমা হারিয়া শুদ্ধমুখে বাড়ি ফিবিয়া আসিলেন। অপদ পক্ষ দুই হাত তুলিয়া কাশীনাথকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

নয়

পদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিজয়বাবু মকদ্দমার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সর্বশেষে নিজের টাকা-টিকনি ও মোহমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেবল জমাইবাবু! অন্য আমরা এ মকদ্দমা খেলা গেলাম। তখন পদার অন্তরালে একগুণ কমলা দলগুণ হইয়া ফুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর হইতে কমলা কহিল, আপনি ভিতরে আসুন, অনেক কথা আছে। বিজয়বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ মৃদু মৃদু কথা হইল, তাহার পর বিজয়বাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আজ বরদানের পর কাশীনাথের আহার করিয়া তারবার সময় কমলা আসিয়া বসিল। এখন আর তাহার পূর্বের উগ্রমতি নাই, এবং সম্পূর্ণ শান্ত ও স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে কমলা কহিল, ঘরভেনী বিভ্রমের

জন্য সোনার লঙ্কাপুরী ছাই হয়ে গিয়েছিল—জান?

আহার করিতে করিতে কাশীনাথ কহিল, জানি।

কমলা কহিল, জানবে বৈ কি! সেও ত পরের অঙ্গেই মানুষ কিনা!

কাশীনাথ কোন কথা কহিল না।

কমলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, তাই ভাবি, যে চিরকাল পরের খেয়ে মানুষ এখনও যাকে পরের না খেলে উপোস করতে হয়, তার সত্য কথা বলবার শখই বা কেন, আর এত অহঙ্কারই বা কেন?

কাশীনাথ নিঃশব্দে একটির পর একটি করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

যার খায়, তার গলায় ছুরি দিতে কসাইয়ের মনেও দয়া হয়।

কমলা!

যে খীর অঙ্গে প্রতিপালিত, তার তেজ শোভা পায় না। তোমার দিন দিন যেরকম ব্যবহার হচ্ছে, তাতে চক্ষুলাজ্ঞা না থাকলে—

কাশীনাথ হাসিয়া বলিল, বাড়ি থেকে দূর করে দিতে।

দিতামই ত।

অর্ধভুক্ত অন্ন ঠেলিয়া রাখিয়া কাশীনাথ কমলার প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, কমলা! আমি পূর্বে কখনও রাগ করি নাই, কখনও তোমায় কাচ কথা বলি নাই, কিন্তু তুমি যা বললে, তা পূর্বে শোনা হয় আর কেউ বলে নাই। আচ্ছ হতে তোমার অন্ন আর খাব না। দেখ, যদি এতে সুখী হতে পার। কাশীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কমলাও সগর্বে দাঁড়াইয়া কহিল, যদি সত্যবাদী হও, যদি মানুষ হও, তা হলে আপনার কথা রাখবে।

তা রাখব। কিন্তু তুমি যে-কথা বললে, তা তোমারই চিরশত্রু হয়ে রইল। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে কি ক্ষমা করবেন?

কমলা আরও জ্বলিয়া উঠিল—তোমার শাপে আমার কিছুই হবে না। তাই হোক। ভগবান জানেন, আমি তোমাকে শাপ দিই নাই, বরং আশীর্বাদ কবচি—ধমে মাত বেছে সুখী হও।

বাহিরে আসিয়া কাশীনাথ ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, শ্রুতি—সমস্ত একে একে ছিন্ন করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল, ভূতাবর্গকে ডাকিয়া নিজের যাহা কিছু ছিল, বিলাইয়া দিল। তাহার পর রাতে কমলাকে কক্ষদ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, কমলা! কমলা জর্জরিতা ছিল, কিন্তু উত্তর দিল না। ছাব খোলা ছিল, কাশীনাথ ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চোখ বুজিয়া কমলা শয্যায় পড়িয়া আছে। কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাশীনাথ আবার ডাকিল, কমলা! কোন উত্তর নাই। যাবার সময় আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, বলিয়া কাশীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কাশীনাথ প্রস্থান করিলে, কমলা শয্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রূণালায় আসিয়া বসিল। বাসিয়া বাসিয়া প্রভাত হয় দেখিয়া সে আবার শয্যায় শয়ন করিল। যখন মিত্রা ভাঙ্গিল, তখন কমলা দেখিল, বেলা হইয়াছে এবং বাড়িময় বিদ্রুম হ্রৈঃ পড়িয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ জাগরিত হইবার পূর্বেই একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, সর্বনাশ হয়েছে মা, জামাইবান্ধু খুন হয়েছে।

কাহারও সঙ্গে এক কটাহ জ্বলন্ত তৈল নিক্ষেপ করিলে সে ঘোমন করিয়া উঠে, কমলাও ঘোমন করিতে করিতে নীচে আসিয়া কহিল, একেবারে খুন হয়ে গেছে।

কে একজন সবাব দিল, একেবারে।

বিবসনা-প্রায় কমলা যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া পড়িল, তখন রক্তসিক্ত চৈতন্যহীন। কাশীনাথ একটা শোফার উপর পড়িয়া ছিল, সমস্ত অঙ্গে মূলা ও রক্ত জমাট দাঁধিয়া আছে; নাক, মুখ, চোখ দিয়া অজস্র রক্ত নির্গত হইয়া সেইখানে শুকহিয়া চাপ দাঁধিয়া গিয়াছে। চীৎকার করিয়া কমলা মাটির উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সমস্ত গ্রামময় রাঙা হইয়া গিয়াছে, ভূমিদার-জামতিবান্ধু অজ্ঞকার রাঙে একা কোথায় যাঁহিঠেছিলেন,

পথিমধ্যে খুন হইয়া গিয়াছেন।

দুইদিন পরে কালীনাথের ম্মান হইলে, পুলিশের সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, কে এমন করেছে?
কালীনাথ উপবপানে চাহিয়া বলিল, উনি করেছেন।

বৃদ্ধ নায়েব সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সাহেব আবার বলিল, বাবু, তাদেব কি আপনি চিনতে পারেন নাই?

কালীনাথ অক্ষুণ্ণে কহিল, হাঁ।

সাহেব ব্যগ্র হইয়া কহিল, কে তারা?

কালীনাথ একটু মৌন থাকিয়া কহিল, আমি ভুল বলেছি। তাদের চিনতে পারি নাই।

সাহেব আরও বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

কালীনাথ আর দ্বিতীয় কথা কহিল না। পরদিন নায়েবকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, বৈদ্যনাথে আমার ভগিনী বিন্দুবাসিনী আছে, তাকে একবার দেখব; আপনি আনতে লোক পাঠান।

তিনদিন পরে বিন্দুবাসিনী ও যোগেশবাবু আসিয়া পড়িলেন। বিন্দু শব্দ শ্রবণে, সে কমলার মত নড়ে; তাই চাৎকারও করিল না, মুখও গেল না। শুধু চোখের জল মুছিয়া কাদ-কাদ স্বরে বলিল, কালীদাদা, কে এমন করেছে?

কেনন করে জানব?

কাবল ওপর সন্দেহ হয় কি?

সে কথা জিজ্ঞাসা করো না বোন।

বিন্দু চুপ করিয়া কালীনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সকলই জানিত, কালীনাথ এ অধ্যাত কটটিয়া উঠিতে পারিবে না। মৃত্যু যেন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। আজ অনেক রাতে জ্বরের প্রকোপে ছটফট করিতে করিতে কালীনাথ চাৎকার করিয়া উঠিল, বল কমলা, এ কাজ তুমি করনি।

বিন্দু কাছে আসিয়া দাদাব মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলচ দাদা?

কালীনাথ বিন্দুকে কমলা ভ্রম করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া করুণকণ্ঠে আবার বলিল, আমি মরেও সুখ পাব না কমলা, শুধু একবার বল, এমন কাজ তোমার দ্বারা হয়নি?

দল

জ্ঞানে, অজ্ঞানে, তন্ময় আচ্ছন্ন মত কমলার দুইদিন কাটিয়া গেল। এর জন্য ডাক্তারের মনে মনে আশঙ্কা ছিল, তাই তাহার উপদেশে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাকে সকলে খরিয়া বসিয়াছিল। আজ দুইদিন অবিশ্রাম চেষ্টা-শুক্রবায় সন্ধ্যার পরে তাহাকে সচেতন করিয়া উঠাইয়া বসাইল।

ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া কমলা দেখিল, যে একক্ষণ তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

অপরিচিতা কহিল, আমি বিন্দু, তোমার স্বামীর ভগিনী।

কমলা একক্ষণ পর্যন্ত নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে হাত নাড়িয়া ঘরের সমস্ত লোককে বহির্ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি এক্ষণ এমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি ঠাকুরবাড়ি?

বিন্দু কহিল, পরশু সকালে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে বৌ, এর মধ্যে আর ত সোমার ঝঁস হয়নি।

পরশু কমলা একবার চমকাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। তাহার পরে মাথা হেঁট করিয়া শুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার কোন প্রকার সাড়া না পাইয়া বিন্দু শঙ্কিত-চিন্তে তাহার ডান হাতেরনি নিজে, হাতেব মধ্যে টানিয়া লইয়া ডাকিল, বৌ!—কমলা মুখ তুলিল না, কিন্তু সাড়া দিল। কহিল, ভয় করো না ঠাকুরবাড়ি, আমি আর অজ্ঞান হব না।

সে যে অন্তরের মধ্যে আপনাকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, বিন্দু তাহা বুঝিল। তাই সেও সৈধ্য ধরিয়া মৌন হইয়া বহিল।

আরও কিছুক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়া কমলা কথা কহিল ; বলিল, তুমি যে আমাকে নিয়ে এই দু'দিন বসে আছ ঠাকুরবি, আমার সেবা করতে কি করে তোমার প্রবৃত্তি হ'ল? আমি নিজেও কখন এমন করতে পারতাম না!

বিন্দু কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কেন প্রবৃত্তি হবে না বৌ, তুমিও আমার পর নও! আমাদের পরিচয় নেই বটে কিন্তু দাদার মত তুমিও আমার আপনাত। তাঁর মত তোমার সেবা করাও ত আমার কাজ। বৌ, তুমি জান না, কিন্তু এসে পর্যন্ত আমার কি করে যে দিন কেটেছে, সে ভগবানই জানেন। একবার দাদার ঘর, আর একবার তোমার ঘর। তাঁর কাছে যখন যাই তখন তোমার জন্যে প্রাণ ছটফট করে, আবার তোমার কাছে এসে বসলে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। বিকেলবেলা থেকে তিনি একটু সুস্থ হয়ে ধুমুছেন দেখে তোমার কাছে স্থির হয়ে বসতে পেরেছিলাম। এ যাত্রা দাদা রক্ষে পবেন, এ-আশাই ত করো ছিল না বৌ।—কমলা বলিয়া উঠিল, বেঁচে আছেন?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেঁচে আছেন বৈ কি। ডাক্তার বললেন, আর ভয় নেই, জ্বর কমে গেছে।

কমলার মুখখানি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াই তাহা মুণ্ডেব মত বিবর্ণ হইয়া গেল। একবার তাহার আপাদমস্তক খবখব করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পদক্ষেপেই সংজ্ঞা হারাইয়া বিন্দুর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল।

বিন্দু চোঁচামেচি করিয়া কাহাকেও ডাকিল না— তাহান মাথা কোলে করিয়া বসিয়া নিঃশব্দে পাতান বাতাস করিতে লাগিল। এই মেয়েটির স্বাভাবিক ধৈর্য যে কত বড়, সে পরীক্ষা তাহার স্বামীর পৌড়ার সময়েই হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু যাহার স্বামীর শিয়ারে আসিয়া বসিয়াও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, এখন কমলার জন্যে সে অস্থির হইয়া উঠিল না। কিছুক্ষণে সংজ্ঞা পাইয়া কমলা চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, সে কোথায় আছে; তাহার পদে সেই কোলের উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে ব্রহ্মদেব এত গাঢ়, এত গুরুভার যে, তাহা বিন্দুর ক্রোড়েব মধ্যেই শুকুটিয়া ভয়ট পাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার একবিন্দু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারও কানে পৌঁছিল না। নির্জন পাহিরে বসিবার আঁধার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, শুধু এই এই স্বাভাবিক কক্ষের মধ্যে এই দুটি গুরুতর রমণী, একজন তাহাব্যবস্থার বক্ষের সমস্ত জ্বলা আর একজনের শরীরে শাখা ক্রোড়েব মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল।

ক্রমশঃ শান্ত হইয়া কমলা স্বামীর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেন যে নিজে গিয়া তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না, তাহা বিন্দু কিছুতেই ভাবিয়া পায় নাই। একবার এমনও ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছিল, হয়ত নভোলোকদের এমনই শিক্ষা এবং সংস্কার। সেবা শুদ্ধতার ভাব চাকর দাসীদের উপর দিয়া বাহির হইতে সবার লওয়াই তাহাদের নিয়ম।

হঠাৎ কমলা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ঠাকুরবি, তোমার দাদার জ্ঞান হলে আমাকে কি একবারও শোজ করেন নি?

একবার করেছিলেন, বলিয়াই বিন্দু হঠাৎ থামিয়া গেল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া শুধু উৎসুক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বিন্দু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দাদার জ্ঞান হলে তিনি আমাকে তুমি মনে করে গলা ধরে টেঁচিয়ে উঠেছিলেন—বল কমলা, এ-কাজ তুমি করনি? আমি মনেও সুস্থ প'ব না কমলা, শুধু একবার বল, এ-কাজ তোমার দ্বারা হয়নি?

কমলা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পবে?

বিন্দু কহিল, আমি ত জানিনে বৌ, তিনি কোন কথা জানতে চেয়েছিলেন।

আমি জানি ঠাকুরবি, তিনি কি জানতে চান, বলিয়া কমলা একবারে সোজা উঠিয়া বসিল।

বিন্দু কমলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি সে ঘরে যেয়ো না বৌ।

কেন যাব না?

ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন, তুমি গেলে ক্ষতি হতে পারে।

আমার ক্ষতি, আমার চেয়ে ডাক্তার বেশী বোঝে না ঠাকুরঝি, আমি তাঁর কাছেই চললুম ; ঘুম ভেঙ্গে আবার যদি জানতে চান, আমাকে ত তার জবাব দিতে হবে? বলিয়া কমলা বিন্দুর হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া বিনীত-কণ্ঠে কহিল, আমি মাথা সোজা রেখে চলতে পারব না বোন, আমাকে দয়া করে একবার তাঁর কাছে দিয়ে এস ঠাকুরঝি।

মনে মনে কহিল, ভগবান, হাতের নোয়া যদি এখনো বজায় রেখেছে ঠাকুর, তা হলে সত্যি-নিখোর পিচার করে আর তা কেড়ে নিয়ে না। দশ আমার গেছে কোথায়—সে ত সমস্তই তোলা রইল। শুধু এই করো প্রভু, তোমার সমস্ত কঠিন শাস্তি যাতে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে পরি, আমার সেই পথটুকু ঘুচিয়ে দিয়ো না।

স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া কমলা কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার দুইদিনের উপবাসক্ষণ দেহ ও তাত্ত্বিক দুর্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া গেল।

কাশীনাথ জাগিয়া ছিল। কে একজন প্রহর পায়ের কাছে বিছানার উপর পড়িল, তাহা সে টের পাইল, কিন্তু ঘাভ তুলিয়া দেখিবার সাধ্য ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল, কে, বিন্দু?

বিন্দু বলিল, না দাদা, বৌ। কমলা? তুমি এখানে কেন?

বিন্দু জবাব দিল। শিয়রে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে দাদা।

কাশীনাথ চপ কবিয়া দহিল, বিন্দু পুনরায় কহিল, আর রাতে আসতে আমি মানা করেছিলাম। আমি নিশ্চয় জানতাম, দুদিনের পরে এইমাত্র যাব প্রাণ হয়েছে, সে কিছুতেই এ ঘরে ঢুকে নিজেকে সম্মানে রাখতে পারবে না।

দুই দিন পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কমলা নীরবে পড়িয়া ছিল, তাহার অবস্থিতি তন্তু অন্ধর দণ্ডে কাশীনাথ নাজে আপনাব শীতল পায়ে উপরে অনুভব করিতেছিল; তাই ধীরে ধীরে কহিল, ঠা' বোন, না এলেই তার ভাল ছিল।

কমলার প্রতি চাহিয়া বিন্দুর নিজেব চোখে ভাল আসিয়া পড়িয়াছিল, আঁচলে মুছিতে মুছিতে বলিল, সে ভাল কি কেউ পারে দাদা? তুমি ভাল হয়ে ওঠো, কিন্তু এই দুটো দিন বৌয়ের যে কেমন করে কেটেছে সে আমি জানি আর ভগবান জানেন; নিজেও বোধ করি জানে না।

ভগবানের নামে কাশীনাথ চোখ বুজিয়া তাহার বাহিরের দৃষ্টি নিঃস্বের মধ্যে ফিরাইয়া অন্তরের দিকে প্রবেশ করিল। যেখানে বিশ্বের সমস্ত নরনারার অন্তর্যামী চির, অধিষ্ঠিত আছেন, তাহার শ্রীচরণে যেন এই প্রণ নিবেদন করিয়া দিয়া সে মূহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর চোখ দিয়া চাহিয়া কহিল, আমার প্রাণের আর কোন আশঙ্কা নেই কমলা, উঠে বসো—

বিন্দু কহিল, দাদা, তুমি আমার কাছে যে-কথা জানতে চেয়েছিলে, বৌ তার উত্তর দিতে এসেছে।

কাশীনাথের পাশে ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিল, আর কারকে কোন জবাব দিতে হবে না বিন্দু, যে দুদিন ও অচেতন হয়ে পড়েছিল, তাব মধ্যে আমার সমস্ত জবাব পৌছে গেছে। বলিয়া ঐ হাতে ভর দিয়া কাশীনাথ উঠিয়া বসিল। ডান হাতে কমলার মাথাটি স্কার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল, কমলা।

কমলা সাড়া দিল না, তেমনি সজোরে পায়ের উপর মুখ পড়িয়া রহিল, তেমনি তাহার দৃষ্টি বাহিয়া প্রবেশ বহিতে লাগিল।

বিন্দু বাস্তব হইয়া উঠিল, তুমি উঠো না দাদা, স্কার বলেন, আবার যদি—

কাশীনাথ হাসিমুখে কহিল, ডাক্তার যাই বলুন বোন, আমি তোদের বলছি, আর ভয় নেই, এ যাত্রা আমাকে তোবা ফিরিয়ে এনেচিস।

তাব পরে কমলার কক্ষ চুলগুলি হাতের মধ্যে লইয়া কক্ষকাল নীরবে নাড়াচাড়া করিয়া কাশীনাথ পুনরায় শুইয়া পড়িল।

আলো ও ছায়া

এক

প্রথমেই যদি তোমরা ধরিয়া বস, এমন কথখনো হয় না, তবে ত আমি নাচার। আর যদি বল ইহাতেও পারে—জগতে কত কি যে ঘটে, সবই কি জানি? তা হলে এক কাহিনী পড়িয়া ফেল, আমার বিশ্বাস, তাহাতে কোন মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। আর গল্প লিখিতে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া বস। হুঁ না যে, সবটুকু ঝাঁটি সত্য বলিতে হইবে। হ'লই বা দু-এক ছত্র ভুল, হ'লই বা একটু-আধটু মতভেদ—এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়? তা নাযকের নাম হইল যজ্ঞদত্ত মুখুজ্জো—কিন্তু সুরমা বলে আলোমশাই। নায়িকার নাম ত শুনিলে, যজ্ঞদত্ত তাকে বলে ছায়াদেবী। দিন-কতক তাহাদের ভারী কলহ বাধিয়া গেল, কে যে আলো—কে যে ছায়া, কিছুতেই মীমাংসা হয় না, শেষে সুরমা বৃথাইয়া দিল, এটা তোমার স্মৃষ্ণবুদ্ধিতে আসে না যে, তুমি না থাকিলে আমি কোথাও নাই—কিন্তু আমি না থাকিলে তুমি চিরকাল চিরজীবী; তাই তুমি আলো, আমি ছায়া।

যজ্ঞদত্ত হাসিল, এক তবফা ডিগ্গী পেতে চাও কর, কিন্তু বিচারটা কোন কাজেই হ'ল না।

সুরমা। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে আলোমশাই, আব খগড়া করতে হবে না। তুমি আলোমশাই, আমি শ্রীমতী ছায়াদেবী বলিতে বলিতে ছায়াদেবী নানাকালে আলোমশাইকে বাস্তব করিয়া তুলিল।

গল্পের এতটুকু ত হ'ল। কিন্তু এইবার তোমাদের সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না বাধিয়া গেলে বাঁচি। তুমি কহিলে, ইহা বা স্ত্রী-পুরুষ, আমি কহিব, স্ত্রী পুরুষ ঘটে, কিন্তু স্বামী স্ত্রী নয়। নিশ্চয় তুমি চোখ রাখাইবে, তবে কি অবৈধ প্রশ্ন? আমি বলিব, খুব শুদ্ধ ভালবাসা। কিছুতেই তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না, মুখ ভার করিয়া ভিজ্ঞাসা করিলে, কত বয়স? আমি কহিব, আলোব বয়স তেইশ, আব ছায়ার বয়স আঠার। এর পরেও যদি শুনিতে চাও, আরম্ভ করিতেছি।

যজ্ঞদত্তের ছোট করিয়া দাড়ি ছাটা, চোখে চশমা, মাথায় ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, পরনে কৃষ্ণের ঢাকই কাপড়, সার্টে এসেল মাখন, পায়ে মখমলের কাজ-করা স্লিপার—ছায়া স্বহস্তে ফুল তুলিয়া দিয়াছে লাইব্রেরিতে এক-ঘর পুস্তক, বাটীতে বিস্তার দাসদাসী। টেবিলের ধারে বসিয়া যজ্ঞদত্ত পত্র লিখিতেছিল সম্মুখে মস্ত মুকুর। পর্দা সরাইয়া ছায়াদেবী সাবধানে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা, চুপি চুপি চোখ টিপিয়া ধরে, পিঠের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইতে গিয়া সম্মুখে দর্পণে নিজের পড়িল। দেখিল, যজ্ঞদত্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সুরমাও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, কেন দেখে ফেললে?

যজ্ঞ। সেটা কি আমার দেহ?

সুরমা। তবে কার?

যজ্ঞ। অধেকটা তোমার, আর অধেকটা ঐ আরশিকানার?

সুরমা। এখনই আমি ওটা ঢেকে দেব।

যজ্ঞ। তা দিও, কিন্তু বার্কীটাব কি হবে?

সুরমা। বার, দুই নড়িয়া চড়িয়া কঠিল, আলোমশাই!

যজ্ঞ। কেন ছায়াদেবী?

সুরমা। তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

যজ্ঞ। তা ত আমার বিশ্বাস হয় না।

সুরমা। তুমি পাও না কেন?

যজ্ঞদত্ত হাসিয়া উঠিল—সুরো, কোম্পল করতে এসেচ?

সুরমা। হাঁ।

যজ্ঞ। আমি তাতে রাজী নই।

সুরমা। তুমি বিয়ে করবে না কেন?

যজ্ঞ। সে জবাব ও রোজই একবার করে দিয়ে এসেছি।

সুরমা। না, করতেই হবে।

যজ্ঞ। সুরো, তুমি একটি বিয়ে কর না কেন?

সুরমা যজ্ঞদত্তের হাত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া কহিল, ছিঃ, বিধবার কি বিয়ে হয়?

যজ্ঞদত্ত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কে জানে? কেউ বলে হয়, কেউ বলে হয় না।

সুরমা। তবে আমাকে এ নিমিত্তের ভাগী করবার চেষ্টা কেন?

যজ্ঞদত্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে কি চিরকাল শুধু আমারই সেবা করে কাটাবে?

ও, বলিয়া সে ধরঝর করিয়া কাদিয়া ফেলিল।

যজ্ঞদত্ত অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, সুরো, কি তোমার মনের সাধ, আমাকে খুলে বলবে না?

সুরমা। আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।

যজ্ঞ। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

সুবমার মুখ দিয়া কথা বাতির হইল না—দক্ষিণে ও বামে বার-দুই মাথা নড়িতে গিয়া চোখের
জল উৎসের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দুই

সুরমা। যজ্ঞদাদা, সেই গল্পটা আবার বল না!

যজ্ঞ। কোনটা সুরো?

সুরমা। সেই যে আমাকে যবে বৃন্দাবনে কিনেছিলে; কত টাকায় কিনেছিলে গো?

যজ্ঞ। পঞ্চাশ টাকায়। আমার তখন আঠার বছর বয়স। বি. এ. একজামিন দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে
যাই। মা তখন বেঁচে, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। একদিন দুপুরবেলায় মালতী-কুঞ্জের ধারে একদল বৈষ্ণবী
গান গাইতে আসে, তবই মধ্যে প্রথম তোমাকে দেখতে পাই। যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়ে
কণ্ঠটাকে এমন সস্ত্রী দেখতে হয় যে, শুধু নিজের দুটি চোখে সে মাদুর্য্য সবটুকু উপভোগ করতে
পারা যায় না, সাধ হয়, মনের মতন আর দুটি চোখ এমনি করে এসসাথে এমন শোভা সম্ভোগ
করতে পারে যদি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি—ও। ক. সুরমা, কীদচ তে

সুরমা। না—তুমি বল।

যজ্ঞ। তুমি তখন তের বছরের নবীন বৈষ্ণবী, হাতে মন্দিরা, গান গাইছিলে।

সুরমা। যাও—আমি বুঝি গান গাইতে পারি?

যজ্ঞ। তখন ও পারতে, তাব পব অনেক পরিশ্রমে তোমাকে পাই, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে,
গোবিন্দবা। মা তোমাব তাঁথে এসে আর ফিরে যেতে পারেন নি—স্বর্ণে গিয়েছেন। আমার মার কাছে
তোমায় এনে দিই, তিনি বুকে নিলেন—তার পর মৃত্যুকালে আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুরমা। যজ্ঞদাদা, আমাব বাড়ি কোথায়?

যজ্ঞ। শুনেছি, কৃষ্ণনগরের কাছে।

সুরমা। আমার আর কেউ নেই?

যজ্ঞ। আমি আছি, তাই যে তোমার সব, সুরমা।

সুরমার চক্ষু আবার জলে ভিজিয়া আসিল, কহিল, তুমি আমাকে আবার বেচতে পার?

যজ্ঞ। না, তা পারি না। নিজেকে না বেচে ফেললে ওটি কিছুতেই হতে পারে না।

সুরমা কথা কহিল না, তেমনিভাবে সজল-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বহুকাল পরে ধীরে
দাঁবে কহিল, তুমি দাদা, আমি ছোট বোন—আমাদের দু'জনার মাঝখানে একটি বৌ আন না দাদা!

যজ্ঞ। কেন বল দেখি?

সুরমা। সমস্ত দিন ধরে সাজিয়ে শুজিয়ে তাকে আমি তোমার কাছে বসিয়ে রাখব।

যজ্ঞ। তা কি শ্রাণ ধরে পারবে?

সুরমা মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ পাতিয়া কহিল, আমি কি তেমনি অধম যে হিংসা করব? যজ্ঞ। হিংসা নাই করলে, কিন্তু নিজের স্থানটি বিলিয়ে দেবে?

সুরমা। বিলিয়ে কেন দিতে যাব! আমি রাজা, রাজাই থাকব, শুধু একটি মন্ত্রী বাহাল করব, দু'জনে মিলে তোমার রাজ্যটা চালাতে আমোদ হবে।

যজ্ঞ। দেখ ছায়া, বিবাহে প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু তোমার যদি একজন সাথীর বড় প্রয়োজন হয়ে থাকে ত বিবাহ করব।

সুরমা। হী, নিশ্চয় কর, খুব আমোদ হবে : দু'জনে খুব মনের সুখে দিন কাটাব। মনে মনে কহিল, তিন কলে আমার কেউ নাই, আমার মান-অপমান তাও নাই, কিন্তু তুমি কেন আমাকে নিয়ে বিশ্বের কলঙ্ক ফুড়াবে? দেবতা আমার! তুমি বিবাহ কর, তোমার মুখ চেয়ে আমার সব সহিবে।

তিন

কলিকাতায় প্রতিবাসীর খবর অনেকে রাখে না। অনেকে আবার খুব বাখে। যাহারা বাখে তাহারা বলে, যজ্ঞদত্ত এম. এ. পাস করুক, কিন্তু ব্যাটে ছেলে। ইশাবায় তাহারা সুবমার কথাটা উল্লেখ করে। সুরমা ও যজ্ঞদত্ত মাঝে মাঝে তাহা শুনিতে পায়। শুনিয়া দুইজনে হাসিতে থাকে।

কিন্তু তুমি ভাল হও আর মন্দ হও, বড়মানুষ হইলে তোমার বাড়িতে লোক আসিবেই, বিশেষ মেয়েমানুষ। কেহ বা বলে, সুরমা, তোমার দাদার বিয়ে দাও না।

সুরমা। দাও না দিদি, একটি ভাল মেয়ে খুঁজে পেতে।

যে সুবমার সখী সেই হাসিয়া ফেলে— তাইত, ভাল মেয়ে মেল শক্ত, তোমার কাপে যাব চোখ ভরে আছে,—তার—

দূর, পোড়ারমুখী! বলিতে বলিতে কিন্তু সুবমার সমস্ত মুখমণ্ডল রেত ও গর্বে বঞ্জিত হয়ে উঠে।

সেদিন দুপুরবেলা ঝুপঝাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুরমা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, একটি মেয়ে পছন্দ করে এলাম।

যজ্ঞদত্ত। আঃ, একটা দুর্ভাবনা গেল। কোথায় বল দেখি।

সুরমা। ও-পাড়ার মিস্ত্রিরদের বাড়ি।

যজ্ঞদত্ত। বাবুন হয়ে কায়েতের ঘরে?

সুরমা। কায়েতের ঘরেকি বাবুন থাকতে নেই? তাব মা ও বাড়িতে বৈদে যেতো, মেয়েটি শুনিতে ভাল; দেখে এসে যদি মনে ধরে ত ঘরে আন।

যজ্ঞদত্ত। আমি কি এমনি হতভাগা যে, রাজ্যের ভিখিরী ছাড়া আমার আর জুটবে না।

সুরমা। ভিখিরী কুড়িয়ে আনা কি তোমার নতুন কাজ?

যজ্ঞদত্ত। আবার!

সুরমা। না যাও, দেখে এস। মনে ধরে ত না বলি না।

যজ্ঞদত্ত। মনে কিছুতেই ধরবে না।

সুরমা। ধরবে গো ধরবে— একবার দেখেই এস না।

ছায়াদেবী তখন আলোকমশাইকে এমন সাজহিয়া দিল, এত গজ লাগিয়া; মাঝিয়া ঘষিয়া ১০০ আঁচড়িয়া দিয়া এমনভাবে আরশির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল যে, যজ্ঞদত্তের লজ্জা করিতে লাগিল। ছিঃ, এ যে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

সুরমা। তা হোক, দেখে এস।

গাড়ি করিয়া যজ্ঞদত্ত মেয়ে দেখিয়ে গেল, সঙ্গে একজন বন্ধুকেও তুলিয়া লইল। চল, মিষ্টান্ন বাড়িতে জলযোগ করে আসি।

বন্ধু। তার মানে?

যজ্ঞদত্ত। সে বাড়িতে একটা ভিথিরীর মেয়ে আছে। তাকে বিয়ে করতে হবে।

বন্ধু। বল কি, এমন প্রবৃত্তি কে দিলে?

যজ্ঞদত্ত। তোমরা যার হিংসেয় মরে যাও তিনিই, সেই ছায়াদেবী।

যজ্ঞদত্ত। বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখতে ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া, পরনে দেশী কাপড়, কিন্তু অনেক ধোপপড়া সূতাওলা মাঝে মাঝে জালের মত হইয়া গিয়াছে। হাতে খেলোয়ারি চুড়ি এবং একজোড়া পাক দেওয়া তামার মত রংয়ের সোনার বালা—মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় ভিতরের গালাটা দেখা যাইতেছে। মাথায় এত তেল যে কপালটা পর্যন্ত চকচক করিতেছে, ব্রহ্মাত্মুর উপব শক্ত খোঁপাটা কাঠের মত উঁচু হইয়া আছে। দুই বন্ধুতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসি চাপিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বড় বড় কালো চোখ দুটো শান্তভাবে তাহার মুখের প্রতি রাখিয়া কহিল, প্রতুল।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুর গা টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, ওহে, গলাধর নয় ত?

বন্ধু ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, জ্যাঠামি করো না, তাড়াহাড়ি পছন্দ করে নাও।

ঈ। এই নিই—

বেশ—বেশ, কি পড়?

কিছু না।

‘‘মারো ভালো।

কিন্তু কর্ম করতে জানা এক প্রতুল মাথা নাড়িল—নিকটে একজন কি দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যাখ্যা করিয়া দিল—ভারী কর্মী মেয়ে বান্ধ, পাধা-বাড়া সংসারের কাজ-কর্মে মায়ের হাত পেয়েচে। আর, মুখে কথাটি নেই—ভাবী শাস্ত্র।

ঐ বুঝেছি।

তোমার বাপ কেঁচে নেই?

না।

মাও মরে গেছেন?

ঈ।

যজ্ঞদত্ত দাঁখল, এই হাবা মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে।—তোমার কি কেউ নেই?

না।

আমার বাড়ি যাবে?—সে ঘাড় নাড়িল ঠুঁ। এই সময় জানালার ক নজর পড়ায় সে দেখিল

বড় বড়ির ফাঁক দিয়া দুটো কালো চোখ যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, ভয় পাইয়া সে বলিল, না।

বাহিরে আসিয়া মিস্ত্রিমহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ।

কেমন দেখলেন?

বেশ।

বিবাহের তবে দিন স্থির হোক।

হোক।

চার

বার-তের বৎসরের বালকের হাত হইতে কোন নির্দয় রসহীন অভিভাবক তাহার অর্ধ-পাঠিত কৌতুকপূর্ণ নভেলটা টানিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহার যেমন অবস্থায়, যে, ভিতরের প্রাণটা ব্যাকুলভাবে সেই শুদ্ধমুখ শক্তিত বালককে এ-ঘর ও-ঘর ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়, ভয়ে ভয়ে তীব্র চক্ষু দুটি শুধু এমন সেই প্রিয় পদার্থটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য বাস্তব এবং বিরক্ত হইয়া থাকে, আর সর্বদাই যেন কাহার উপর রাগ করিতে ইচ্ছা করে, তেমনিভাবে সুবমা যজ্ঞদত্তের জন্য ছটফট করিতে লাগিল। কি যেন কি একটা ঝুঁজিয়া বাহির করিবে। চেয়ার, বেঞ্চ, শোফা, লম্বা, ঘর, বারান্দা—সবগুলোর উপরেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাস্তার দিকের একটা জানালাও তাহার পছন্দ হইল না,

একবার এটাতে, একবার ওটাতে বসিতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত ঘরে ঢুকিলেন।

কি হ'ল আলোমশাই? আলোমহাশয়ের মুখ গম্ভীর।

সুরমা। পছন্দ হল?

যজ্ঞ। হ'ল।

সুরমা। কবে বিয়ে?

যজ্ঞ। বোধ হয় এই মাসেই।

নিরানন্দ উৎসাহে সুরমা কাছে আসিল, কিন্তু কোনরূপ উপদ্রব করিল না—আমার মাথা ঝাণ্ড, সত্যি বল।

কি বিপদ, সত্যিই ত বলচি!

আমার মরামুখ দেখ—বল, পছন্দ হয়েছে?

হাঁ

ইঠাৎ যেন সুরমা আর কোন কথা বুজিয়া পাইল না। বালক-বালিকারা ধমক খাইয়া কাঁদিত। পূর্বে যেমন এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়িয়া একটা অর্থহীন কথা বলিয়া ফেলে, সুরমা তেমন ছেলেমানুষটির মত মাথা হেলাইয়া গাড়ঘরে কহিল, তবে বলেছিলাম ত—

যজ্ঞদত্ত নিজের ভাবনায় ব্যস্ত ছিল, তাই বুঝিতে পারিল না যে, এ কথাব একেবারে কোন অর্থই নাই; কেননা, প্রথমতঃ 'পছন্দই হবে' এমন কথা সুরমা কোনকালে উচ্চারণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, সে নিজেও মেয়ে দেখে নাই বরং এমনটি সে মোটেই আশা করে না যে, এত অল্পে পছন্দ হইবে, এবং এত শীঘ্র সম্বন্ধ পাকা হইবে। তাই সে সমস্ত দিনটা নিজের ঘরে বসিয়া এই কথা ভোলপাড় করিতে লাগিল। দু'দিন পরে কিন্তু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা বুঝিতে পারিল, কহিল, সুবো, এ বিয়ে দিও না দিদি।

সুরমা। বাঃ তা কি হয়? সব যে স্থির হয়ে গেছে।

যজ্ঞ। স্থির কিছুই নয়।

সুরমা। না, তা হতে পাবে না, দুঃখীর মেয়েকে সুখী কববে এটাও ভেবে দেখ, বিশেষ কথা দিচ্ছি ফেরাবে?

যজ্ঞদত্তের প্রভুলকুমারীর মুখ মনে পড়িল, সহিবৃত্তা ও শান্তভাবের নিগূঢ় ছায়া যেন সেদিন তাহার কালো চোখ দুটিতে সে দেখিতে পাইয়াছিল—তাই সে চুপ করিয়া বহিল, তবু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সুরমার কথাই বেশী ভাবিল। বর্ষার দিনে বাদলপোকাগুলো হঠাৎ যেমন ঘর ভরিয়া দেয় তেমন তাহার মনটা যেন অস্থিরিতে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদিগের নিভৃত বাসগহ্বরটা যেমন কিছুতেই বুজিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি সুরমার মুখের কথাগুলো মনের কোন গুপ্ত আকাজক ভিতর দিয়া দলে দলে বাহির হইতে লাগিল, সেইটাই বুজিয়া পাইল না। চোখে তাব এমনি ব্যাপস জাল লাগিয়া রহিল যে, কোনক্রমেই মুখখানি সুস্থপষ্ট দেখিতে পারিল না।

পাঁচ

বিবাহ করিয়া যজ্ঞদত্ত বধু ঘরে আনিল। বিকারগস্ত রোগী ঘরে লোক না থাকিলে যেমন সমস্ত শক্তি এক করিয়া কালের ঘড়াটার পানে ছুটিয়া গিয়া ঠাঁকুড়িয়া ধরে, সুরমা তেমনি করিয়া নৃতন বধুকে আলিঙ্গন করিল। নিজের যতগুলি গডনা ছিল পরাইয়া দিল, যতগুলি বস্ত্র ছিল সমস্ত তাহার বাক্সে ভরিয়া দিল। শুদ্ধমুখে সমস্ত দিন ধরিয়া বধু সাজাইবাব ধুম দেখিয়া যজ্ঞদত্ত মুখ চুন করিয়া রহিল। গাড় স্বপ্নটা সহ্য হয়—কেননা, অসহ্য হইলেই ধুম ভাসিয়া যায়, কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখাটায় যেন দম আটকাইতে থাকে, কিছুতেই সেটা শেষও হয় না—ধুমও ভাসে না। মনে হয় একটা স্বপ্ন মনে হয় এটা সত্য, 'আলো ও ছায়া'র দু'জনেরই এই ভাবটা আসিতে লাগিল। একদিন ঘরে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, ছায়াদেবী!

কি যজ্ঞদাদা?

আলোমশাই বললে না?

মুখ নত করিয়া সুরমা কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞদত্ত দুই হাত বাড়াইয়া কহিল, অনেকদিন কাছে এস নাই—এস।

সুরমা একবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল; পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, বাঃ, আঁঠি ত শুব! বৌকে একলা ফেলি এসেছি। বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

বাগের মাথায় যদি হঠাৎ কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের গালে চড় মারা যায়, আর সে যদি শান্তভাবে ক্ষমা করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে মনটা যেমন খারাপ হইয়া থাকে, তেমন ক্ষমাশ্রান্ত অপরাধীর মত তাহাবও মনটা ক্রমাগত দমিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলি মনে হয়, সে অপরাধ করিয়াছে আর সুরমা প্রাণপণে ক্ষমা করিতেছে।

সুরমা সর্বাভাবনা নববদুকে জেদ করিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। সন্ধ্যা হইলেই বাহির হইতে বই করিয়া আলো বন্ধ করিয়া দেয়। গগনে হাত দিয়া যজ্ঞদত্ত ভাবিতে থাকে। বৌও কতক বুঝিতে পারে, সে সেওয়ানা মেয়ে নয়, তবুও সে নাই। সাধারণ ঈর্ষাবুদ্ধিটুকু হইতে ভগবান কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। সেও সাবো বারি ভাবিয়া থাকে। আজ আট দিনও বিবাহ হয় নাই, এরি মধ্যে যজ্ঞদত্ত একদিন শুধু সুরমাকে ভাবিয়া কহিল, সুরো, বর্ধমানের পিসীমাকে বৌ দেখিয়ে আনি।

দামোদর পারে পিসীমার বাড়ি। সেখানে পৌছাইয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, পিসীমা, বৌ এনেচি, দেখ। পিসীমা, ওমা, বিয়ে করেছিস বুঝি, আতা বেঁচে থাক। দিবা চাঁদপানা বৌ, এইবার মানুষের মত ঘর সাজা।

যজ্ঞ। সেই জনেই ত সুরো জেদ করে বিয়ে দিলে।

পিসীমা। সুরো বুঝি বিয়ে দিয়েছে?

যজ্ঞ। সেই ত দিলে, কিন্তু কপাল মন্দ—বৌ নিয়ে ঘর করা চলে না।

পিসীমা। কেন রে?

যজ্ঞ। জনো ত পিসীমা, আমার নর-গণ বৌয়ের হ'ল বাক্স-গণ। একসঙ্গে থাকলে গণৎকার বলে বাঁচি না বাঁচি।

পিসীমা। ষটি মাটি, সে কথা—

যজ্ঞ। ওশন তাড়াতাড়ি এসব দেখা হয়নি, এখন ত তোমার কাছে থাকবে, মাসে পঞ্চাশ টাকা পাহার, তাতে চলবে না পিসীমা?

পিসীমা। হ্যাঁ তা চলে যাবে, পাড়গিয়ারে বিশেষ কষ্ট হবে না। আহা, দেব মত মেয়ে, ডাগর ওয়েড়ে, হাঁসের যজ্ঞ, একটা শান্তি-স্থায়ন কবলে হয় না?

যজ্ঞ। হতে পারে। আমি ভট্টাচার্যের মত নিয়ে যা ভাল হয় তোমাকে জানাব।

পিসীমা। এ জানাস বাছা।

সন্ধ্যার সময় বৌকে কাছে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, তবে তুমি এখানেই থাক।

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

যা তোমার দরকার হবে আমাকে জানিয়ে।

আচ্ছা।

তুমি চিঠি লিখতে জান?

না।

তবে কি করে জানাবে?

নববদু গুপ্পালতা হরিবার মত চকু দুইটি স্বামীব মুখের উপর বাখিয়া চূপ করিয়া রহিল। যজ্ঞদত্তও মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

পিসীমার বাটীতে বৌ ভাবে উঠিয়া কাজ করিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে সে শিখে নাই, নৃতন লোক হইলেও সে পরিচাওব মত ঘরকন্নার কাজ করিতে শুরু করিল। দুই-চার দিনেই পিসিমা বুঝিলেন, এমন মেয়ে সত্যি গড়ে হবে না।

বৌয়ের অনেক গহনা, পাড়াসুদ্ধ বৌটিয়ে লোক তা দেখতে আসে।

কে দিয়েচে গা? তোমার বাপ?

না, বাপ-মা আমার নাই, ঠাকুরঝি দিয়েচেন।

কু-একদিন সন্ধ্যাসীর সহিত ভাব হইলে তাহারা খুটিয়া খুটিয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তোমার ঠাকুরঝি বুঝি খুব বড়লোক?

হ্যাঁ।

সব গহনা তারি?

সব। তাঁর দরকার নেই, তিনি বিধবা, এ-সব পরেন না।

কত বয়স বৌ?

আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তিনি জোর করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার বর বুঝি তাঁর খুব অনুগত?

হ্যাঁ, তিনি সতীলক্ষ্মী, সবাই তাঁকে ভালবাসে।

ছয়

উপরের জানালা হইতে সুরমা দেখিল, যজ্ঞদত্ত বাড়ি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সঙ্গে বৌ নাই। মনের প্রবেশ করিলে কহিল, যজ্ঞদত্তা, বৌকে কোথায় রেখে এলে?

পিসীর বাড়ি।

সঙ্গে আনলে না কেন?

থাক্ কিছুদিন পরে আনলেই হবে।

কথাটা সুরমার বুকে বিধিল। দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়জনের সহিত তর্ক কবিত্তে গিয়া হঠাৎ বচসা হইয়া গেলে যেমন দুইজনেই কিছুক্ষণ ক্ষুদ্রমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, এ দুইজনও কিছুদিন তেমন চুপচাপ দিন কাটাইতে লাগিল। সুরমা কহে, নেয়ে খেয়ে নাও, অনেক বেলা হল। যজ্ঞদত্ত বলে, হ্যাঁ এই যাই, এমনি করিয়াও কিছুদিন কাটিল। একসঙ্গে ঘর কবিত্তে গিয়া চিবদিন এভাবে চলে না, তাই আবার মিল হইতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত আবার আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন - ও ছায়ামেধী! ছায়া কিন্তু অর আলোমশাই বলে না—যজ্ঞদত্তা বলে, কখনও লা শুধু দালা বলিয়াই ডাকে।

সুরমা একদিন কহিল, দাদা, প্রায় তিনমাস হতে চলল, এইবার বৌকে আনো। যজ্ঞদত্ত কাটাইয়া দেয়, হ্যাঁ তা হবে এখন।

মনের ভাব বুঝিয়া সুরমা চুপ করিয়া থাকে।

পিসীর পত্র মাঝে মাঝে আসে। পিসী লেখেন, বৌয়ের মালেরিয়া জ্বর হইতেছে, চিকিৎসা শুণ্ডা প্রয়োজন। মনের ভাব বুঝিয়া যজ্ঞদত্ত কতকগুলো টাকা বেশী করিয়া পাঠাইয়া দেয়। আবার মাস খানেক কোন কথা উঠে না।

এমন সময় একদিন হঠাৎ চিঠি আসিল যে, পিসী মরিয়া গিয়াছে। যজ্ঞদত্ত বর্ধমানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সুরমা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিল, বৌকে নিয়ে এস।

বর্ধমানে পিসীর শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে একদিন দুপুরবেলা যজ্ঞদত্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাঁড় যাইবার কথা ভাবিতেছিল। উঠানে একটা ধানের মরাইয়ের পাশে, নতুনবৌ দাঁড়াইয়া, চোখে পড়িল। দ্রোণাচোষি হইবামাত্র সে হাত দিয়া উপায়া কবিয়া ডাকিল।

যজ্ঞদত্তও স্বীয় নিকটে পৌছিল।

কি?

আপনাকে কিছু বলব।

বেশ ত বল।

নতুন বৌ ঢোক গিলিয়া কহিল, একদিন আপনি বলেছিলেন যদি আমার কোন দরকার হয় - যজ্ঞদত্ত। বেশ ত, কি দরকার বল?

বৌ। বাড়িতে সবাই বলাবলি করছিলেন, আমি বড় অলক্ষণা, তাই এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না।

যজ্ঞদত্ত। কোথায় থাকতে চাও?

বৌ। কলকাতায় যদি কোন ভদ্র-পরিবারে স্থান পাই—আমি ও সব কাজ করতে পারি।

যজ্ঞদত্ত। তোমার নিজের বাড়িতে যাবে?

বৌ। আমার নিজের বাড়ি? সে আবার কোথা? তাঁরা কি আর থাকতে দেবেন?

যজ্ঞদত্ত হাত দিয়া স্বীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, আমার বাড়িতে যাবে?

বৌ। যাব।

যজ্ঞদত্ত। সুরমা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে।

সুরমাব কথায় তাহাব মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—ঠাকুরবি আমায় মনে করেন?

যজ্ঞদত্ত। করেন বৈ কি।

বৌ। তবে নিয়ে চলুন।

ভগতে একরকমের লোক আছে, তাহারা পরের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বুদ্ধি কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু এমন একটা সহজ বুদ্ধি রাখে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের সম্বন্ধে অপরের পরামর্শ মোটেই প্রয়োজন বোধ করে না। নূতন বৌটি এট শ্রেণীর। সে নিজের কথা নিজেই ভাবে—পবকে ভিজ্ঞাসা করে না। ভাবিয়া কহিল, আপনাদের অকলাণ কববার বড় ভয় আমার, কিন্তু থাকি বা না থাকি, আমি নাচাই থাকব, সব কাজকর্ম করতে নাচে থাকাই সুবিধের।

যজ্ঞ। উপরে এক তোমার থাকবার ঘর নেই?

বৌ। আছে, কিন্তু নাচের ঘরেই বেশ থাকবো।

যজ্ঞদত্ত আর কোন কথা কহিল না। ভাবিতে লাগিল যে, খুব বোকার মত ত এ কথাগুলো নয় এটা কয়েকবার মনে করিল, বলিয়া ফেলিল যে সে অলক্ষণা নহে, রাক্ষস-গণ প্রভৃতি মিথ্যা কথা। কিন্তু 'মিথ্যা' কথার কাণ্ডটি কি, তা কি করিয়া বলা যায়! বিশেষ বাড়ি গিয়া সে তাহার অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারে সে বেশ মিল করিয়া তুলিতে পারিলে, সে ভরসাও মনে করিতে পারিল না।

সাত

সুরমা দেখিল বৌ আসিয়াছে। উগ্র নেশার প্রথম ঝোকটা কাটাইয়া দিয়া সে হির হইয়াছে। তাই বৌ লেখতে বাড়াবাড়ি কবিল না। শান্ত দাঁরভাবে এরসম্ভাষণ করিল—মীথিক নহে, অন্তরগত মঙ্গলচ্ছা তাহার শুদ্ধ মুখের উপর জ্যোতি ফিরাইয়া আনিল।

বৌ, কৈ ভাল ছিলে না ত?

বৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, মাঝে মাঝে জ্বর হ'ত।

সুরমা তাহাব কপালের ঘাম মুছাইয়া বলিল, এখানে চিকিৎসা হলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

দুপুরবেলা সুরমা সংবাদ পাইল যে, বৌয়ের জন্য নাচে ঘর পরিষ্কার হইতেছে। অপমানে তাহার মাঝে জল আসিল। সংবরণ করিয়া যজ্ঞদত্তের কাছে গিয়া বলিল, দাদা, বৌ কি নাচে শোবে? তুমি কিছু বলবে না?

আর কি বলব? যার যা খুশি তা করুক।

সুরমা লজ্জা ও শিকারে আপনাকে শাসন করিতে পারিল না, সম্মুখেই কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। অপরের গোলযোগটা কিন্তু নাচে পৌঁছিল না।

নূতন বৌ নূতন কবিতা সংসারের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে সুরমার সব কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু উপরে যায় না—স্বামীর সহিত দেখা করে না। ক্রমে সুরমাও উপর ছাড়িয়া দিল। বৌ প্রথম গম্ভীরমুখে কাজ কবিত, সুরমা পাশে বসিয়া থাকিত। একজন দেখাইও কর্ম করিয়া কত সুখ, অপর ব্যস্ত কর্মস্রোতে অনেক দুঃখ ভাসাইয়া দেতি পারা যায়। দু'জনের কেইই বেশী কথা কহে না, তাহাদের সহানুভূতি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে নুতন বধূর প্রায় জ্বর হয়, দুই-চারিদিন উপবাস থাকিয়া আপনি সারিয়া উঠে। ঔষধে প্রবৃত্তি নাই, ঔষধ খায় না। সে-সময়ের কাজকর্মগুলা দাসদাসীতেই করে; সুরমা পারিয়া উঠে না, ইচ্ছা থাকিলেও ক্লমর্থো কুলায় না। সোনার প্রতিমা সুরমা দেবীর এখন সে রং নাই, সে কাঙ্ক্ষি নাই, অতঃপাশ্চাত্য দুই মাসের মধ্যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। বৌ মাঝে মাঝে বলে, ঠাকুরঝি, তুমি দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

আমি? আচ্ছা বৌ, শরীরটা ভাল করবার জন্যে আমি যদি বিদেশে যাই, তোমার কষ্ট হবে না ত?

হবে বৈ কি।

তবে যাব না?

না ঠাকুরঝি, যেয়ো না, তুমি ঔষধ খেয়ে এখানেই ভাল হও।

সুরমা স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

একদিন সুরমা যজ্ঞদত্তের খাবার সাজাইতেছিল। যজ্ঞদত্ত তাহার মলিন কৃষ্ণ মুখখানি সংস্কার চক্ষে দেখিতেছিল। সুরমা মুখ তুলিলে, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হয় মলেই বাঁচি।

কেন? বলিতেই সুরমার চক্ষে জল আসিল। ভয় হয় আর কতদিন এ প্রাণটাকে বেয়ে বেড়াতে হবে। বন্দুকের গুলি খাইয়া বনের পশু যেমন মাটি ছাড়িয়া আকাশে পলাইবার জন্য প্রাণপণে লাফাইয়া উঠে, কিন্তু আকাশ তাহার কেহ নয়, তাই সেই আশ্রয়শূন্য মরণাগত জীব শেষে চিৎকারে আশ্রয় পৃথিবীকেই জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণত্যাগ করে, তেমনি ছটফট করিয়া সুরমা প্রথমে আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, তার পর তেমনি করিয়া ভুলুটিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, যজ্ঞদত্ত, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার শত্রু, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে, তুমি সুখী হও।

তখন হয়ত দাসী আসিয়া পড়িবে, যজ্ঞদত্ত হাত ধরিয়া তাকে তুলিয়া ধরিল। সম্মুখে অশ্রু মুছাইয়া কহিল, ছিঃ, ছেলেমানুষি কর না।

অশ্রু মুছিতে মুছিতে সুরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আট

তার পরে একদিন সুরমা বৌকে টানিয়া কাছে লইয়া কহিল, বৌ, দাদা কি তোমাকে কখন কিছু বলেছেন?

বৌ সহজভাবে উত্তর দিল, কি আবার বলবেন?

তবে তুমি কখন তাঁর কাছে যাও না কেন? তোমার কি যেতে ইচ্ছা করে না?

বৌয়ের প্রথমটা লজ্জা করিত লাগিল, পরে মুখ নত করিয়া কহিল, করে দিদি, কিন্তু যাবার জো নেই!

কেন বৌ?

তোমার কি মনে নেই?

কৈ না।

ওঃ, তুমি বুঝি ভুলে গেছ ঠাকুরঝি, আমার যে বাপস গণ, ওঁর নব গণ।

কে বলেছে?

উনিই পিসীমাকে বলেছিলেন, তাইতো—

সুরমা শিহরিয়া উঠিল—এ যে মিছে কথা বৌ!

মিছে কথা?

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে সুরমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সুরমা বাব বাব শিহরিয়া উঠিল—মিছে কথা বৌ, ভয়ানক মিছে কথা।

আমার বিশ্বাস হয় না, উনি মিছে কথা বলবেন।

সুরমা আর সহিতে পারিল না—দুই বাছর মধ্যে দুট করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া

উঠিল, বৌ, আমি মহাপাতকী।

বধু আপনাকে ছাড়িয়ে লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, কেন ঠাকুরঝি?

উঃ, তা আর শুনেছে চেয়ো না। আমি বলতে পারব না।

বড়ের মত সুবমা যজ্ঞদত্তের সম্মুখে আসিয়া পড়িল,—বৌকে এমন করে ঠকিয়ে রেখেচ, উঃ, কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী তুমি।

যজ্ঞদত্ত অবাক হইয়া গেল। ও কি সূরো!

কৃতবিন্দা তুমি, ছি ছি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

যজ্ঞদত্ত অর্থ বুঝিল না, শুধু কটকথা শুনিতে লাগিল।

কি ভেবে বিয়ে করবেছিলে? কি ভেবে ত্যাগ করে আছ? আমার জ্ঞান? আমার মুখ চেয়ে এই প্রহারণা কবে আসিচ?

সুবমা, পাগল হয়ে গেলে?

পাগল আমি? তোমার চেয়ে আমার জ্ঞান আছে, দাঁও আমাকে কোথাও পাঠিয়ে সুরমার চক্ষু বন্দবণ, হাঁপাইতে হাঁপাইতে করিল, এক দণ্ডও আমি থাকতে চাই না, ছিঃ ছিঃ!

যজ্ঞদত্ত চাঁৎকার করিয়া বাকিল, কি বলচ?

বলচি তুমি মিথ্যাবাদী—প্রহারক।

নিমেষে যজ্ঞদত্তের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অকারণে মনে হইল, তাহার ভিতরের প্রসূরিত বর্ষা হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ডাকিতেছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া সে টেবিলের উপরিত্তিত ভারী রক্তাশ তুলিয়া লইয়া চাঁৎকার করিয়া কহিল, আমি অধম, আমি প্রতারক, আমি মিথ্যাবাদী, এই তাব প্রার্থনাস্ত কবচি।

নিপুল বলের সহিত যজ্ঞদত্ত স্ব-মস্তকে ভীষণ আঘাত করিল। মাথা ফাটিয়া খবর খরিয়া বক্ষঃস্থলে বহিল। সুবমা অশ্রুটে ডাকিল মাগো! তার পর অচেতন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যজ্ঞদত্ত তাহা দেখিল, দেখিল তাহা সমস্ত মুখ বন্ধে ভাসিতেছে, চোখের ভিতর রক্ত ঢুকিয়া সমস্ত আপসঃ বোধ হইতেছে। সে উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল, আব কেন? এই সময় পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল। ফির্বিয়া দেখিল, স্ত্রী, কান্দিয়া বলিল, তুমি? স্বন্ধের উপর মাথা রাখিয়া সেও মুহুর্ন্ত হইয়া পড়িল।

সুবমা যেমন করিয়া নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসিল, নূতন বধু তাশতে আশ্চর্য ও শঙ্কিত হইয়া নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়িয়া সব কথা শুনিল সব কাঁদে। অনেকখানি সত্য তাহার মাথার ভিতরে সূর্যের আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইল, তাহার ও বক্ষঃস্থল দ্রুত হইয়া অসিয়াছিল, চক্ষুর বাহিরে কৃষ্ণাটিকার সৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু সে আপনাকে সামলিয়া লইয়া বিপদের সময় দ্বারীকে এগাড় করিয়া বলিল।

নয়

ছয় দিন পরে ভাল করিয়া জ্ঞান হইলে, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কেমন আছেন?

দাদা কহিল, ভাল আছেন।

আমি দেখে আসব। কিন্তু উঠিতে গিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

দাদা কহিল, তুমি বড় দুর্বল, তাতে জ্বর হয়েছে, উঠো না, ডাক্তার বাবণ করেছে।

সুবমা আশা করিল যজ্ঞদাদা দেখিতে আসিলে বৌ দেখিতে আসিবে।

একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবু কেহ আসিল না, কেহ খোঁজও লইল না।—জ্বর সারিয়াছে, কিন্তু বড় দুর্বল। উঠিতে চেষ্টা করিলে হয়ত উঠিতে পারিত, কিন্তু বিষম অপ্রমানে তাহার শয্যাভ্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। নিজের মনে ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিত, চোখ মুছিয়া দ্রাব্য - তাহাদের আলো ও ছায়ার কাহিনী।

দীপ্ত আলো ও গাঢ় ছায়া লইয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, এখন আলো নিভিয়া

আসিতেছে। মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমে ঝুকিয়াছে, গাড় ছায়া তাই অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া শ্রেতের মত কঙ্কালসার হইয়াছে। অজানা অন্ধকারের পানে সে ছায়া যেন মিশিয়া যাইবার জন্য ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুরমা ঘুমাইয়া পড়িল।

গায়ের উপর তপ্ত হস্ত বাখিয়া কে যেন ডাকিল, দিদি!—সুরমা উঠিয়া বলিল, একি বৌ? চক্ষু তাহার রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় যেন কালিমাখা।—কেন বৌ, কি হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে আমার! তুমি আমাকে এ-বাড়িতে এনেছিলে, তাই বলতে এসেছি দিদি, ছুটি দাও আমাকে। আমি যাব—

কেন দিদি, কোথা যাবে?

নূতন বধু সুরমার পায়ের উপর মাথা বাখিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুরমা দেখিল তাহার দেহ আগ্নের মত উত্তপ্ত।—একি! এ যে বড় জ্বর হয়েছে।

এমন সময় একজন দাসী চাঁৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, দিদি, বৌ কোথা গেল? ওমা জ্বরের বৌকে পালিয়ে এসেছেন! আজ আট দিন বৈশ্য হয়ে পড়েছিলেন। মা গো! কি কবে এলেন?

আট দিন জ্বর! ডাক্তার দেখেছে?

কেন না দিদি, কেউ না, পরশুদিন সকালবেলাও বৌমা এক ঘণ্টা কলতলায় মাথা পেতে বলেছিলেন, এত মানা করলুম, কিছুতেই শুনলেন না।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরমা যজ্ঞদত্তের ঘরে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল, দাদা, বৌ আর বাঁচে না।

বাঁচে না! কি হয়েছে?

আমার ঘরে এসে দেখ দাদা, বৌ বুঝি বাঁচে না।

দুই-তিনজন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল, প্রবল বিকল। সমস্ত বর্গাও নিঃশল পরিশ্রম করিয়া তাহারা ভোরবেলায় চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি যজ্ঞদত্ত মাথার শিয়বে বাঁসিয়া বহিল, কতবার মুখেব কাছে মুখ লইয়া গেল, বধু কিন্তু স্বামিকে চিনিতে পারিল না।

ডাক্তার চলিয়া গেলে যজ্ঞদত্ত কাঁদিয়া উঠিল, বৌ, একবার চেয়ে দেখ, একবার বল 'কম' কবলে?

সুরমা পায়ের উপর মুখ লুকাইয়া অশ্রুতে বলিল, বৌদিদি, কেন ও শাস্ত দিখে গেলে?

কে কথা কহিবে? সমস্ত মান, অভিমান, 'প্রাণ্ডল', 'অনহেলা সবইয়া' দিয়া সে ধাতব দপ্তর অনন্তে মিলাইয়া গেল।

সুরমা কহিল, দাদা কোথায়?

দাসী উত্তর করিল, কাল তিনি পশ্চিমে চলে গেছেন।

কবে আসবেন?

জানিনে, বোধ হয় শিগগির আসবেন না।

আমি কোথায় থাকব?

সরকারমশায়কে বলে গেছেন, যত ইচ্ছে টাকা নিয়ে তোমার যেখানে বুঝি গেলো।

সুরমা আকাশপানে চাহিয়া দেখিল, জগতের আলো নির্ভিয়া গিয়াছে—সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, একটি তারাও দেখা যায় না। পাশে চাঁদ্রিয়া দেখিল, সে অশ্রুট ছায়াটিও কোথায় সাবসা গিয়াছে। চতুর্দিক ঘনান্ধকার, বন্ধ-স্পন্দন তাহার যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে, চক্ষের কোণটি ম্লান ও স্থির ওঠিয়া আসিতেছে।

দাসী ডাকিল, দিদি!

উর্ধ্বনেত্রে সুরমা ডাকিল, যজ্ঞদাদা!

তার পর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

মন্দির

এক

এক গ্রামে নদীর তীরে দু'ঘর কুমোর বাস করিত। তাহারা নদীর মাটি ভুলিয়া ছাচে ফেলিয়া পুতুল শ্রব করিত, আর হাটে বিক্রয় করিয়া আসিত। চিরকাল তাহারা এই কাজ করে, চিরকাল এই মাটির পুতুল তাহাদিগের পর্বনের পত্ন ও উদনের অম্ল যোগিয়া থাকে। মেয়েরা কাজ করে, ভাল তুলে, 'দাঁদিয়া' দামা পুত্রে খাওয়ায় এবং নিবান ভগ্নদুপের ভিতর হইতে পোড়া পুতুল বর্গিত করিয়া আঁচল দিয়া দাঁদিয়া চিত্রিত হইবার জন্য পুরুষদের হাতের কাছে আগিয়া দেয়।

শক্তিনাথ এই কুস্তকার পরিবারের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্রিষ্ট ক্ষীণদেহ এই বৃদ্ধকুমার, তাহার বন্ধুবান্ধব, খেলাধুলা, লেখাপড়া সব ছাড়িয়া দিয়া এই মাটির পুতুলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝাঁকিয়া পাড়িল। সে বাঁশের ছবি ধুইয়া দিত, ছাঁচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মণি চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকর্ষিত ও অসম্ভবচিত্রে পুতুলের চিত্রাঙ্কন-কার্য কেমন অসাধারণভাবে করিতেন। হইত, তাকেই দেখিত। কালি দিয়া পুতুলের মূ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত। কোনটার মূ, মেটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নাচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। শক্তিনাথ অমায় প্রেমসূক্ত আবেদন করিত, সরকারদাদা, অমন তাচ্ছিল্য করে আঁকচ কেন? সরকারদাদা অর্থাৎ কারিগর সম্মুখে হাসিয়া জবাব দিত, বামুনঠাকুর, ভাল করে আঁকতে গেলে বেশী নম্ব জাগে, অতঃকালে বল? এক পয়সার পুতুল আর চার পয়সায় বিক্রাবে না।

দুই

এ সহজ কথাটার অনেক আলোচনা করিয়াও শক্তিনাথ আধখানা মাত্র বলিয়াছিল। এক পয়সার পুতুল দিক পয়সায় বিক্রাইবে, তাহার মূ, থাকুক, আধখানা মূ, নাই থাকুক। দুই চক্ষু সমান অসমান হইত, সেই এক পয়সা! মিছামিছি কে এত পরিশ্রম করিবে? আর কিনিবে বালক, দুন্দুও প্রত্যেক আদব করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে কবিবে—তার পব, দিয়া ফেলিয়া দিবে—

শক্তিনাথ বাটা হইতে সকালবেলা যে মুড়িমুড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহার ভুস্তাবশিষ্ট এখনো বাঁধা আছে, তাহাই খুলিয়া অতিশয় অনামনস্বভাবে চিবিহিতে চিবিহিতে ছড়াইতে ছড়াইতে সে প্রত্যেকের জ্ঞান বাটায় প্রাপ্তি আসিয়া পাড়াইল। বাটাতে কেহ নাই। ভগ্নদ্বারা বৃদ্ধ পিতা সামান্যবাটাতে মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়াছেন। ভিজা আলোচাল, কলা, মূলা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে নেবেদা দাঁদিয়া আনিবেন, তাহার পব পাক করিয়া পুত্রে খাইরাবেন, নিজেও খাইবেন। সরকারদাদা বৃদ্ধকুমার, বন্ধুবান্ধব ও শেফালীকুলগাছে পূর্ণ পুতুলসমূহান বাটাটাই সবাই জঙ্গল, তাহাতে পুতলা নাই কাহারো পাঁচপাটা নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মৃদু, কোনকালে দিনপাত করেন। শক্তিনাথ ফুল পাড়িয়া, ভাল নাড়িয়া, পাতা ছিড়িয়া উঠানময় অনামনস্বভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রত্যদিন সকালবেলা শক্তিনাথ কুমোর-বাড়ি যায়। আজকাল সে পুতুলে রং দিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার সরকারদাদা সত্যে সবচেয়ে ভাল পুতুলটা তাহাকে বাছিয়া দিয়া বলে, নাও দাদাঠাকুর 'দাম চাঁদুর' কব। দাদাঠাকুর একবেলা ধরিয়া একটি পুতুল চিত্রিত করে। হয়ত খুব ভালই হইবে। এক পয়সার বেশী নম্ব উঠে না। সরকারদাদা কিন্তু বাটা আসিয়া বলে, বামুনঠাকুরের চিত্রিত পুতুলটি দু'পয়সায় বিক্রিয়ে। শুনিয়া শক্তিনাথের আর আনন্দ ধরে না।

দিন

এ গ্রামের জমিদার কার্যহ। দেবদ্বিজে তাঁহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকবনির্মিত মদনমোহন-বিগ্রহ; পার্শ্বে সুবর্ণনির্মিত শ্রীরাধা—অদ্ভুত মন্দিরে রৌপ্য-সিংহাসনে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনলীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির-পাশে সংলগ্ন। উপরে কিংবাণের চম্ভাডল, তাহাতে পতখাশার কাড় দুলিতেছে। এক পার্শ্বে মর্মর-কৌর উপর উপকরণ সম্বিত, এবং নিতানিবেদিত পুষ্প-চন্দনের নসৌরভে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। বৃষ্টি, স্বগসুখ ও সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করিয়া দিতে এই পুষ্প ও গন্ধ পূজার প্রথম উপচার ইহা আছে, এবং তাহারই সুকোমল সুরভি বায়ুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মন্দিরবায়ুকে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছে।

চর

অনেকদিনের কথা বলিতেছি। জমিদার রাজনারায়ণবাবু যখন প্রৌঢ়বয়সে সোমায় পা দিয়া প্রথম বৃষ্টিলেন যে, এ জীবনের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, যেদিন সর্বপ্রথম বৃষ্টিলেন যে, এ জমিদারি ও ধন-ঐশ্বর্য ভোগের মিয়াদ প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, প্রথম যেদিন মন্দিরবয় এক পার্শ্বে দাঁড়িয়া চোখ দিয়া অনুতাপকে বিগলিত হইয়াছিল, আর্মি সেইদিনের কথা বলিতেছি। তখন তাহার একমাত্র কন্যা অপর্ণা—পাঁচ বৎসরের বালিকা। পিতার পায়ে কাছ দাঁড়িয়া একমনে সে দেবিত, মধুসূদন ভট্টাচার্য চন্দন দিয়া কালো পুতুলটি চর্চিত করিতেছেন, ফুল দিয়া সিংহাসন বেটন করিতেছেন এবং তাহারই নিকট গন্ধ আশীর্বাদের মত যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিতেছে। সেইদিন হইতে প্রতিদিনই এই বালিকা সন্ধ্যার পর পিতার সহিত ঠাকুরের আরাতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল-উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে—ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া গ্রহণাত্মক হবে, সেও তাহাই করিতে লাগিল, এবং পিতার নিত্য আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটি সে ততদণ্ডে গন্ধ-পুষ্প-ভোগের মত, এ কথা সে তাহার সমস্ত কর্ম ও খেলাশুলাব মধ্যেও প্রমাণ করিতে নিম্নলিখিত সমস্ত দিন হইতে মন্দিরের কাছাকাছি থাকিত এবং একটি শুদ্ধ ভূগ বা একটি শুদ্ধ ফলও সে মন্দিরবয় ভিতরে পড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। এক ফোঁটা জল পড়িলে সে সম্বন্ধে আঁচল দিয়া তাহার মুখিয়া লইত। রাজনারায়ণবাবুর দেবনিষ্ঠা—লোকে বাড়াবাড়ি মতে কবিত, কিন্তু অপর্ণার স্নেহসেবাপনায়িতা সে সীমাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। সাবেক পুষ্পপাত্রে আর ফুল আঁটে না—একটা বড় আসিয়াছে চন্দনের পুরাতন বাটিটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ভোজ্য ও নৈবেদ্যের বদল দেওয়া বড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, নিত্য নূতন ও নানাবিধ পূজার আয়োজন ও তাহার নির্বৃত্ত বন্দোবস্তের মাঝে পড়িয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদার রাজনারায়ণবাবু এসব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তি-স্নেহে গাঢ়স্বরে কহিতেন, ঠাকুর আমার ঘরে তাহাব নিজের সেবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তোমরা কেহ কিছু বলিলো না।

পাঁচ

যথাসময়ে অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। মন্দির ছাড়িয়া এইবার যে তাহাকে অনাহুত যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি অসময়ে শুকাইয়া গেল। দিন দেখান হইতেছে, তাহাকে স্বত্ব-বর্জিত যাইতে হইবে। পরিপূর্ণ বিদ্যা বৃদ্ধে চাপিয়া বর্ষাব দানকর্য্য মেঘখণ্ড যেমন অবশেষে গৌরবের শুষ্কভাগে স্থির হইয়া কিছুকাল আকাশের গায়ে কর্ণপান্দ্রুতভাবে দাঁড়িয়া থাকে, তেমনি স্থির হইয়া একদিন অপর্ণা তুলিল যে, সেই দেখান-দিন আজ আসিয়াছে। সে পিতার নিকট গিয়া কহিল, বাবা, আর্মি ঠাকুরসেবার যে বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, তাহার যেন অন্যথা না হয়। বৃদ্ধ পিতা কাদিয়া ফেলিলেন—তাঁহি ত মা! না, অন্যথা কিছুই হবে না।

অপর্ণা নিশ্চেষ্টে চলিয়া আসিল। তাহার মা নাই। সে কাদিতে পারিল না। বৃদ্ধ পিতার দুচোখ-

তারা জল, সে রোধ করিবে কি করিয়া? তাহার পর, যোদ্ধা যেমন করিয়া তাহার কবিত্ত ক্রন্দনোন্মুখ বীর-হৃদয় পৌরুষ-বৃত্ত হাসিতে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণপূর্বক চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অপর্ণা শিবিকারোহণে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অজানা কর্তব্যের শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুহিতে গিয়া তাহার মনে পড়িল—নিতার অশ্রু মুহাইয়া আসা হয় নাই। তাহার নিজের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত তাহার কাছে যেন কত নালিশ করিতে লাগিল। একে তাহার হৃদয় শত বাধায় বিদ্ধ, তাহার পর কোথায় কোন গ্রামান্তরে মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শব্দ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্ম-পরিচিত আরতির আহান-শব্দ তাহার কানের ভিতর দিয়া মর্মে নৈরাশ্যের হাহাকার বহন করিয়া আনিল। ছটফট করিয়া অপর্ণা শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া ফেলিল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, এবং ছায়া-নিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু-শিখায় একটা পরিচিত মন্দিরের সমুন্নত চূড়া কল্পনা করিয়া সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার শব্দ-বর্টার একজন দাসী পিছনেই চলিয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, ছি বৌমা, অমন করে কি কাঁদতে আছে মা, শব্দ-ঘর কে না করে? অপর্ণা দুই হাতে মুখ চাপিয়া রোদন নিবারণ করিয়া পালকির কবট বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়টিতে মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে দুপদুনার ধূমে ও চক্কুজালে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্তির অনিন্দ্যসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নির্দীক্ষণ করিতেছিলেন।

অপর্ণা স্বামীগৃহে। সেথায় তাহার ইচ্ছাহীন স্বামী-সম্ভাষণের ভিতর এতটুকু আবেগ। এতটুকু চাক্ষুস ও প্রকাশ পাইল না। প্রথম প্রশ্নের স্নিগ্ধ সঙ্কোচ, মিলনের সলজ্জ উদ্বেজনা, কিছুই তাহার জ্ঞান চক্কু দুটি পূর্বদৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল না। প্রথম হইতেই স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই যেন পরস্পরের কাছে কোন দুরোধা অপরাধে অপরাধী-হইয়া বহিল, এবং তাহারই ক্ষুদ্র বেদনা কুলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিতা এতদিনে ন্যায় একটা দুর্লভ্য ব্যবধান নির্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অনেক বাত্রে অমরনাথ ধীরে ধীরে ডাকিয়া কহিল, অপর্ণা, তোমার এখানে থাকতে কি ভাল লাগে না?

অপর্ণা জাগিয়া ছিল, বলিল, না।

বাপের বাড়ি যাবে?

যাব।

কাল যেতে চ'ও?

চাই।

ক্ষুদ্র অমরনাথ ভাবা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আর যদি যাওয়া না হয়?

অপর্ণা কহিল, ও হলে যেমন আছি তেমনি থাকব।

আবার কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া থাকিল; অমরনাথ ডাকিল অপর্ণা!

অপর্ণা অনামনস্কভাবে বলিল, কি!

অমাকে কি তোমাব কোন প্রয়োজন নাই?

অপর্ণা গায়ের কাপড়চোপড় সর্বাস্থে বেশ করিয়া টা। যা দিয়া স্বচ্ছন্দে শুইয়া বলিল, ও-সব কথায় বেড় ঝগড়া হয়, ও-সব বলো না।

ঝগড়া হয়—কি করে জানলে?

জানি, আমাদের বাপের বাড়িতে মেজদা ও মেজবৌ এই নিয়ে নিত্য কলহ করে। আমার ঝগড়া-কলহ ভাল লাগে না।

তুনিয়া অমরনাথ উল্লেখিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে যেন এই কথাটাই এতদিন

বুজিতেছিল, হঠাৎ আজ যেন তাহা হাতে ঠেকিল, বলিয়া উঠিল, এস অপর্ণা, আমরাও ঝগড়া করি। এমন করে থাকার চেয়ে ঝগড়া কলহ ঢের ভাল।

অপর্ণা স্থিরভাবে কহিল, ছি, ঝগড়া কেন করতে যাবে? তুমি ঘুমোও।

তাহার পর অপর্ণা ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও অমরনাথ বুজিতে পারিল না।

প্রত্যুষে উঠিয়া সজ্জা পর্যন্ত সমস্ত দিন অপর্ণার কাজকর্ম ও ভূপে-ভূপে কাটিয়া যায়। এতটুকু রসরস বা কৌতুকের মধ্যে সে প্রবেশ করে না, দেখিয়া তাহার সমবয়সীরা বিমূঢ় করিয়া কত কি বলে, ননদেরা 'গোসাই ঠাকুর' বলিয়া পরিহাস করে, তথাপি সে দলে মিশিতে পারিল না। কেবলই তাহার মনে ইহতে লাগিল, দিনগুলো মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোণিত-বিন্দু হৈ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির-অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমা-উদ্বেলিত সিন্ধুগাভির মত হৃদয়ের কুল-উপকূলে অহরহ আছড়িয়া পড়িতেছে,—তাহার সংযম কিসে হইবে? ঘবকল্লাব কাঙে, না ছোটখাট হাসা-পরিহাসে? ক্ষুদ্র অসুস্থচিত্ত তাহার এই যে বিপুল প্রাপ্তি মাথায় করিয়া আপনা আপনি পাক খাইয়া মরিতেছে, তাহার নিকট স্বামীর আদর ও শ্রদ্ধা, পরিজনবর্গের ঐতিহ্য-সম্ভাবনা ঘেষিবে কি কবিয়া? কি কবিয়া সে বুঝিবে, কুমারীর দেবসেনা দ্বারা নবীন্দ্রের কর্তব্যের সবটুকু পবিত্র পরিপূর্ণ করা যায় না?

সাত

অমরনাথের বুদ্ধিবাদ ভুল—সে উপহার হইয়া স্থির থাকে অসিয়ারে। বৈরাগ্যের জন্য দলিতা স্নানান্তে অপর্ণা পূজা করিতে বাইতেছিল। গলার সব যতটা সম্ভব মসৃণ করিয়া অমর কাঁচল অপর্ণা, তোমার জন্য কিছু উপহার এনেছি, দয়া করে নেবে কি?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল, নেব বৈ কি!

অমরনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে লৌকিক ক্রমোন্নয় বীণা একটি বংশুর ডালা ধুলিতে বসিল। ডালার উপরে অপর্ণার নাম সোনার জলে লেখা। এখন একবার সে অপর্ণার মুখখান দেখিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল, মানুষ কাহ্নের নকল চোখ পরিয়া যেমন করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ একনিমিষে নিবিয়া গিয়া যেন অর্থহীন এক ফোঁটা শুষ্ক তপসি মাঝে আপনাকে লুকুটিয়া ফেলিতে চাহিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাস্তব ডালা ধুলিয়া গোটা-কটক কুড়লোনের লিপি, আরো কিছু বাহির করিতে উদাত হইল অপর্ণা বাধা নিষা কহিল, এনেছি কি আমার জন্য।

অমরনাথের হইয়া আর কে যেন জবাব দিল, হী, তোমার জন্যই এনেছি। দেলখোসপুত্রে অপর্ণা ভিজাসা করিল, বাস্কাটাও কি আমাকে দিল?

নিশ্চয়ই।

তবে আর কেন মিছে ও-সব বেদ করবে, বাস্কাহেই থাক।

তা থাক। তুমি ব্যবহার করবে ও?

অকস্মাৎ অপর্ণা বুকুজিত করিল। সমস্ত দুনিয়ার সতিত লড়াই করিয়া তাহার ক্ষতি-বিক্ষতি হু-ন পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণপূর্বক নিভৃত চূপ করিয়া পসিয়াছিল, সহসা তাহার গায়ে এই মেয়ে-অনুরোধ কুণ্ঠিত বিদ্রূপের আঘাত করিল। চঞ্চল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিল, বলিল নষ্ট হবে না, রেখে দাও। আমি ছাড়াও আরও অনেকে ব্যবহার করিতে পারেন। এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া অপর্ণা পূজার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। আর অমরনাথ, বিদ্রূপের মত সেই প্রত্যাখ্যান উপহারের উপর হস্ত রাখিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। প্রথমে সে সন্তোষের মনে মনে আপনাকে নির্দোষ বলিয়া তিরস্কার করিল। বক্তৃতা পাবে সে পৌর্ণমিথাস ফেলিয়া বলিল, অপর্ণা পাশাণী। তাহার চোখ জ্বলে আসিয়া আসিল। সেইখানে বসিয়া একবারে ক্রমাগত চক্ষু মুড়িতে লাগিল। অপর্ণা তাহাকে যদি সম্পূর্ণ ভাবায় প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলে কল্যাণ অনাকলপ দাঁড়াইত।

পারিত। সে যে প্রত্যাখ্যান না করিয়াও প্রত্যাখ্যানের সবটুকু জ্বালা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার সে কি করিয়া করিবে? অপর্ণাকে তাহার পূজার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই সম্মুখে তাহার উপেক্ষিত উপহারটা নিজেই লাথি মারিয়া ভাসিয়া ফেলিবে, এবং সর্বসমক্ষে তাঁর প্রতীক্ষা করিবে যে, সে তাহার মুখ আর দেখিবে না। সে কি করিবে, কত কি বলিবে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবে, হয়ত ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী হইবে, হয়ত অপর্ণার কোন দারুণ দুর্দিনের দিনে অপ্রত্যাৎ কোথাও হইতে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। এমন সম্ভব ও অসম্ভব কতরকম উত্তর-প্রত্যাগ, বাদ-প্রতিবাদ তাহার অপমানপীড়িত মস্তিষ্কের ভিতর অধীরতার আলোড়ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। ফলে কিন্তু সে তেমনি বসিয়া রহিল, এবং তেমনি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার এই আগাগোড়া বিশৃঙ্খল সঙ্কল্পের সুদীর্ঘ তালিকা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

আট

তাহার পর দুই দিন দুই রাত্রি গত হইয়াছে, অমরনাথ ঘরে শুইতে আসে নাই। মা জানিতে পারিয়া একে ডাকিয়া ঈষৎ ওর্চনা করিলেন, প্রত্যেক ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, দিদিশাণ্ডী এই সূত্রে একটু একটু লইলেন। এমন সাত-পাঁচে ব্যাপারটা লঘু হইয়া গেল।

বারে অপর্ণা স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, বলিল, যদি মনে কষ্ট দিয়ে থাকি ত আমাকে ক্ষমা করে। অমরনাথ কথা কহিতে পারিল না। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া বিছানার চাদর বার বার টানিয়া পান বার বার কাঁদে লাগিল। নামুখেই অপর্ণা দাঁড়াইয়া, মুখে তাহার ম্লান হাসি। সে আবার কহিল, ক্ষমা করলে না?

অমরনাথ মুখ নীচু করিয়াই বলিল, ক্ষমা কিসের জন্য? ক্ষমা কববার অধিকারই বা আমার কি? অপর্ণা স্বামীকে দুই হাত আপনাব হাতেব ভিতব লইয়া বলিল, ও-কথা বলো না। তুমি স্বামী, তুমি আমার পিতা, কি আমার চলে? তুমি ক্ষমা না করলে আমি দাঁড়াব কোথায়? কেন রাগ করচে, না?

অমরনাথ আর হইয়া কহিল, দাত ত করি নাই!

বল নাই ত?

না, অপর্ণা কলহ ভালবাসিত না, বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করিল। কহিল, তাই ভাল। তাহার পর নিঃশব্দ নির্ভাবনায় বিছানার এক প্রান্তে শুইয়া পড়িল।

অমরনাথ কিন্তু ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেবলই সে মনে মনে কৌতুক করিতে লাগিল যে, এ কথা তাহার স্ত্রী বিশ্বাস করিল কি করিয়া! সে যে দু'দিন আসে নাই, সে কথা কব নাই, তথাপি সে রাগ করে নাই—এটা কি বিশ্বাস করিবার কথা? এত কাণ্ড এত শীঘ্র মুক্তি মর কথা হইয়া গেল? তাহার পর যখন সে বুঝিতে পারিল অপর্ণা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একেবারে উঠিয়া বসিল, এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া জোর করিয়া ডাকিয়া ফেলিল, অপর্ণা, তুমি পড়ে ঘুমিয়েছ? ও অপর্ণা!—অপর্ণা জাগিয়া উঠিল, বলিল, ডাকচ?

হ্যাঁ, তাল আমি কলকাতায় যাব।

সে, সে কথাও আমি শুনি নাই। এত শীঘ্র তোমার কলকাতায় ছুটি ফুরোল? আরো দু'দিন থাকতে পার না?

না, আর থাকার হয় না।

অপর্ণা একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, তুমি কি আমার উপর রাগ করে যাচ্ছ?

ইহা সে সত্য কথা অমরনাথ তাহা জানিত, কিন্তু সে-কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সম্ভ্রান্ত হুসিয়া তত্বের যেন কৌতুক খুঁট দিয়া টানিয়া ফিরাইল। আশঙ্কা হইল পাছে সে আপনার অপদার্থতা প্রদর্শন করিয়া অপর্ণার সম্মুখ হাসি করিয়া বসে; এমন করিয়া কৌতুক-বিমুখ নারীর নিশ্চেষ্টতা তাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্বামিত্বের যেটুকু তেজ সে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সেটুকু এই এক পাঁচ মাস ধরিয়া দিনে দিনে অপর্ণা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে

ক্রোধ প্রকাশ করিবে কোন সাহসে?

অপর্ণা আঁবর বলিল, রাগ করে কোথাও যেয়ো না। তা হলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগবে।

অমরনাথ মিথ্যা ও সত্যে বাহা বানাইয়া বলিতে পারিল—তাহার অর্থ এই যে, সে রাগ করে নাই এবং তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ সে আরো দুই দিন থাকিয়া যাইবে। থাকিলও তাই। কিন্তু কাদিয়া জরী হইবার একটা লজ্জাজনক অবস্থি লইয়া বাড়িতে থাকিল।

নয়

ঝাড়া বৃষ্টির একটা সুবিধে আছে—তাহাতে আকাশ নির্মল হয়। কিন্তু টিপিটিপি বৃষ্টিতে মেঘ কাটে না, শুধু পায়ের নীচে কাদা ও চতুর্দিকে নিরানন্দময় ভাব বাড়িয়া উঠে। বাড়ি হইতে যে কাদা মাঝিয়া অমবনাথ কলিকাতায় আসিল, তাহা ধুইয়া ফেলিবার একটুখানি জলও সে বৃহৎ নগরীর ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। এখানে তার পূর্বপরিচিত যে-সব সুখ ছিল, তাহাদের কাছে এই পঙ্কিল পা দু'খানি বাহির করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। না লাগে লেখাপড়ায় মন, না পায় আমোদ-আহ্লাদে তৃপ্তি। এখানেও থাকিতে ইচ্ছা করে না, বাড়ি যাইতেও প্রবৃত্তি নাই। সমস্ত বৃকের উপর তাহার যেন দুর্বল যন্ত্রণাভার চাপানো রহিয়াছে, এবং তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল বন্ধপঙ্কর পরস্পর ঠোকটুকি করিতেছে, কিন্তু বিফল চেষ্টা।

এমনি অন্তর্বেদনা লইয়া সে একদিন অসুখে পড়িল। সংবাদ পাইয়া পিতামাতা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অপর্ণাকে সঙ্গে আনিলেন না। অমরনাথও যে ঠিক এমনিটি আশা করিয়াছিল তাহা নয়, তবু দমিয়া গেল। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এ সময়ে স্বভাবতঃই তাহার অপর্ণাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না, পিতামাতাও তাহা বুঝিলেন না। কেবল ঔষধ পথ্য আর ডাক্তার-বেদ্য! অবশেষে সে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল— অমরনাথ একদিন প্রাণত্যাগ করিল।

বিধবা হইয়া অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তাহার মনে হইল, এ বৃষ্টি তাহারই কামনার ফল! ইহাই বৃষ্টি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। বাহিরে শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতা চীৎকার করিয়া কাদিতেছেন। এ কি সব স্বপ্ন? তিনি আসিলেন কখন? অপর্ণা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সত্য সত্যই রাজনারায়ণবাবু বালকদের মত ধূল্য লুটিয়া কাদিতেছেন। পিতার দেখাদেখি সেও এবার ঘরের ভিতর লুটিয়া পড়িল; অশ্রু-প্রবাহ মাটি ভিজাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; পিতা আসিয়া অপর্ণাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন, মা! অপর্ণা!

অপর্ণা কাদিয়া বলিল, বাবা!

তোমার মদনমোহন যে তোকে মন্দিরে ডেকেচে মা!

চল বাবা, যাই।

তোমার যে সেখানে সব কাজ পড়ে আছে মা!

চল বাবা, বাড়ি যাই।

চল মা চল। পিতা স্নেহে মস্তক চুষন করিলেন, বুক দিয়া সর্ব দুঃখ মুছিয়া লইলেন এবং তাহার পর কন্যার হাত ধরিয়া পরদিন বাটা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, ওই মা তোমার মন্দির। ওই তোমার মদনমোহন! নিরাভরণ অপর্ণার বৈধবা-বেশে তাহাকে আর একরকম দেখিতে হইল। যেন এই সাদা বস্ত্র ও রক্ত কেশে তাহাকে অধিক মানাইল। সে তাহার পিতার কথা ভাবিয়া কঁদিল, ভাবিল, দেবতার আহ্বানেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরের মুখে যেন তাই হাসি, মন্দিরে যেন তাই শতশব্দ সৌরভ। নিজে যেন সে এ পৃথিবীর অনেক উচে এইরূপ মনে হইল!

যে স্বামী নিজের মরণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত উচে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর

উদ্দেশ্যে শতবার প্রশ্ন করিয়া অপর্ণা তাহার অক্ষয়বর্গ কামনা করিল।

দল

শক্তিনাথ একমনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরী করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন্ রং বেশী মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়। কি দিয়া তাহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয়, এ-সব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দেবতার সম্পর্কে সে আপনাকে আপনি প্রশ্রয় দিয়া, সেবকের স্থান হইতে পিতার স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। তবু তাহার পিতা তাহাকে আদেশ করিলেন, শক্তিনাথ, আজ আমার জ্বর বেড়েচে, জমিদার-বাটীতে গিয়ে তুমি পূজা করে এস।

শক্তিনাথ বলিল, এখন ঠাকুর গড়চি।

বৃদ্ধ অসমর্থ পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, ছেলেখেলা এখন থাক বাবা, কাজ সেরে এস।

পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে তাহার মোটে ইচ্ছা হইল না—তবু উঠিতে হইল। পিতার আদেশে ঘান করিয়া, চাদর ও গামছা কাঁধে ফেলিয়া দেবমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্বেও সে কয়েকবার এ মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই। এত পুষ্প-গন্ধ, এত ধূপধূনার আশ্রয়, ভোজ্য ও নৈবেদ্যের এত পাচ্ছা। তাব ভারী ভাবনা হইল। এত লইয়া সে কি করিবে? কিরূপে গাংগার পূজা করিবে? সকলের চেয়ে সে অপর্ণাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কে, কোথা হইতে আসিয়াছে? এতদিন কোথায় ছিল?

অপর্ণা কাহল, তুমি কি ভট্টাচার্যমশায়ের ছেলে?

শক্তিনাথ বলিল, হ্যাঁ।

তবে পা ধুয়ে পূজা করতে বস।

পূজা করিতে বসিয়া শক্তিনাথ আগাগোড়া ভুলিয়া গেল। একটা মন্ত্রও তাহার মনে পড়ে না। সেদিকে তাহার মনও নাই, বিশ্বাসও নাই—শুধু ভাবিতে লাগিল, এ কে, কেন এত রূপ, কিজন্য বসিয়া আছে ইত্যাদি। পূজার পদ্ধতি ওলট-পালট হইতে লাগিল। কখনো ঘণ্টা বাজাইয়া, কখনো ফুল ফেলিয়া, নৈবেদ্যের উপর স্তল ছিটাইয়া এই অজ্ঞ নতুন পুরোহিতটী যে পূজার কেবল ভান করিতেছে মাএ, বিজ্ঞ পরীক্ষকের মত পিছনে বসিয়া অপর্ণা সব বুঝিল। চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া এ-সব ভাল করিয়াই জানে, শক্তিনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবে কি করিয়া? পূজাবসানে বসিন্থর অপরূপা কহিল, তুমি কখনেও ছেলে, অথচ পূজা করতে জান না!

শক্তিনাথ বলিল, জানি।

ছাই জান।

শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখপানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অপর্ণা ডাকিয়া ফিরিয়া বলিল, ঠাকুর, এ-সব বেঁধে নিয়ে যাও—কিন্তু কাল আর এসো না। তোমার বাবা আরোগ্য হলে তিনি আসবেন। অপর্ণা নিজেই তাহার চাদর ও গামছায় সমস্ত বসিয়া তাহাকে পিঠায় করিল। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বার বার শিহরিয়া উঠিল।

এদিকে অপর্ণা নতুন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা শেষ করিল।

এগার

একমাস গত হইয়াছে। আচার্য যদুনাথ জমিদার সজ্জনস্বামীবাবুকে বুঝাইয় লিতেছেন, আপনিও সমস্তই জানেন, বড় মন্দিরে বৃহৎ পূজা ভট্টাচার্যের ছেলের দ্বারা কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। বাজনারায়ণবাবু সায় দিয়া বলিলেন, অনেকদিন হ'ল অপর্ণাও ঠিক এই কথাই বলেছিল।

আচার্য মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর করিয়া কহিলেন, তা ত হবেই। তিনি হলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপ। ঠিক কি কিছু অগোচর আছে। জমিদারবাবুরও ঠিক এই বিশ্বাস। আচার্য কহিতে লাগিলেন, পূজা আমিই করি আর যেই করুন ভাল লোক চাই। মধু ভট্টাচার্য যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনিই পূজা

কবেচেন, এখন তাঁর পুত্রেরই সৌন্দর্য্যতা করা উচিত, কিছু সেরিও মানুষ নয়। কেবল পতি স্নান করে পাবে, পুতুল গড়েও জানে, পূজা অচনাও কিছুই জানে না।

রাজনারায়ণবার অনুমতি দিলেন, পূজা কন্যাবল, তবে অপর্ণাকে একবারও জিজ্ঞেসা করে দেবতা পিতার নিকট এ কথা শুনিয়া অপর্ণা মাথা নড়িয়া বলিল, হাত না হয় বামুনের হাতে নিতান্য কোথায় তাকে বিদায় করবে? যেমন জানে তেমনই পূজা করবে। পুতুল হাতেই সম্ভব হবেন।

কনার কথায় পিতার চৈতন্য হইল—এতটা আমি ভেবে দেখি নাই। মা তোমার মন্দির, তোমার পূজা, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো, যাকে ইচ্ছা তাই দিয়া। এই কথা বলিয়া পিতা প্রস্থান করিলেন। অপর্ণা শক্তিনাথকে ডাকিয়া আনিয়া পূজার ভার দিল। বহুদিন যাইতে অবশিষ্ট সে আর এদিকে আসেন নাই, মধো তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সে নিজেও কখন শুদ্ধমুখে তাহার শ্রাদ্ধ দ্বারা চিত্ত দেখিয়া অপর্ণার মায়ী হইল, কহিল, তুমি পূজা করো, যা জান তাই করো, তাহেই সন্তুষ্ট হইবেন। মো স্নেহের স্বর শুনিয়া তাহার সাহস হইল, সাবধান হইয়া মন দিয়া পূজা করিতে বসিল।

পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে সে যাহা বাইতে পাবে বসিয়া দিয়া বলিল, বেশ পূজা করেচ। বামুনঠাকুর, তুমি কি হাতে রেখে খাও?

কোনদিন রীষি, কোনদিন—যেদিন ছুর হয়, সেদিন আর রীষতে পারি না।

তোমার কি কেউ নাই?

না।

শক্তিনাথ চলিয়া গেলে, অপর্ণা তাহার উদ্দেশে বলিল, 'আহা' দেবতাকে কাছে যুক্ত করে 'হাই' হইয়া প্রার্থনা করিল, ঠাকুর ইহার পূজায় তুমি সম্ভব হইয়ো, ছেলেরমানুষের দেশে 'অপবাস লইতে না' সেইদিন হইতে প্রতিদিন অপর্ণা দাসী দ্বারা সংবাদ লইত, সে কি ব্যাধি, কি কবে, কি তাহার প্রয়োজন নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকুমারটিকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার খেঁচিয়া মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেই সেইদিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী তাহারই ভক্তি যোগে, কুল প্রতি সব এক করিয়া এই মন্দিরটিকে আশ্রয়পূর্বক জীবনের বাকী কাছড়নিজে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার সহিত মনে দেবতাকে বঝাইয়া দেয়। শক্তিনাথ গন্ধ পুষ্প হাতে দিয়া তুলিয়া লয়, অপর্ণা হস্তে দিয়া দেবতাকে বলে, বামুনঠাকুর, আজ এমন কবে সিংহাসন সাজাও দেবি, বেশ রসবাসে বসনি করিয়া এই বৃদ্ধ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল।—দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত কঠিনজন, চলেফলন হইত।

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বলিলেন, যা করে হোক মোসেটা নিজের অন্তঃকরণে ঢাকলেই বঁচি।

বার

থিয়েটারের স্টোজে যেমন পাহাড় পর্বত, পড় জল এক নিম্নে উঠিয়া দিয়া একটা মত রাজহাসাদ কোণা উঠিতে আসিয়া জোটে, আর লোকজনকে সুখ সম্পদের মধ্যে দুঃখ ভৈরবের সমস্ত চির নিদ্রাপ্ত হয়, শক্তিনাথের জীবনেও যেন সেইরূপ হইয়াছে। সে জাগিয়াছিল, এখন ঘুমাইয়া সুখের দেখিতেছে, কি বা নিদ্রায় দুঃখ স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রথমে তাহার ভাল ঠাহর হইত না। তাপাি এই দায়িত্বভার দেবসেবার সুবর্ণ শৃঙ্খল হই তাহার সকলকে জড়িয়া ধরিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া বনবন শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে, এ বিকিশ্রু পুতুলজনে মাঝে মাঝে সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইত, সে মৃত পিতার কথা মনে করিত, নিজের পূর্ব স্বাধীনতার কথা ভাবিত, মনে হইত, সে যেন বিকটিয়া গিয়াছে, তাহাকে কিনিয়াছে। অমনি অপর্ণার স্নেহ রূপে মোহের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ একদিন শক্তিনাথের সামান্য ভ্রষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভগিনী বিনায়। মামা কলিকাতায় থাকেন, সময় ভাল, কাঙেই সুখে দিনে ভাগিনেমাকে মনে পড়িয়াছে। যাইতেই উঠিল। কলিকাতা যাইবে—কথটা শক্তিনাথের খুব ভাল লাগিল। সমস্ত পাঠি সে দাদার নিকট বসিয়া কলিকাতার সুখের গল্প, শোভার কাহিনী, সমৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন মন্দিরে

যদিও তাহা হইয়া উঠিল না। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠিল। শক্তিনাথ গিয়া বলিল, আজ আমি কলিকাতায় যাব। মামা ভেঁকে পঠিয়েছেন—বলিয়াই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, কবে ফিরে আসবে?

শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল, মামা আসতে বললেই চলে আসব।

অপর্ণা আব কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই যদু আচার্য আসিয়া পূজা করিতে বসিলেন। আবার তের্মান করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজন হইল না, উচ্ছাও ছিল না।

কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যে শক্তিনাথের বেশ দিন কাটিলেও কয়েকদিন পরেই বাড়ির জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ অলস দিনগুলো আর যেন কাটিতে চাহে না। রাগে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, অপর্ণা যেন তাহাকে ক্রমাগত ডাকিতেছে, আর উত্তর না পাইয়া বাগ করিতেছে। একদিন সে মামাকে কহিল, আমি বাড়ি যাব।—মামা নিষেধ করিলেন—সে জঙ্গলে গিয়ে আর কি হবে? এইখানে থেকে লেখাপড়া কর, আমি তোমার চাকরি করে দেবো।

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।—মামা কহিলেন, তবে যাও।

বড়ো শক্তিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, কাল বুধি বাড়ি যাবে?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ যাব।

অপর্ণার জন্য মন কেমন করচে নাকি?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ।

সে তোমাকে খুব যত্ন করে, নয়?

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল, খুব যত্ন করে।—

বড়ো বুধ টিপিয়া হাসিলেন : তিনি অপর্ণার কথা পূর্বেই শক্তিনাথের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, তবে ঠাকুরপো, এই দুটি জিনিস নিয়ে যাও ; তাকে দিয়ে, সে আরো ভালোবাসবে। বলিয়া তিনি একটা শিলাব ছিপি খুলিয়া খানিকটা দেলখোস শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পূর্ণাকর্ষিত হইয়া শিলা দুইটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পরদিন বাটা ফিরিয়া আসিল।

৩৩

শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজা শেষ হইয়াছে। চাদরে সে শিলা দুইটি বাঁধা আছে—কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না। এই কয়দিনে অপর্ণা তাহার নিকট হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছে। বুধ দিগিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না—তোমার জন্য সাধ করিয়া কলিকাতা হইতে ইহা আনিয়াছি। সুতরাং তোমার দেহের তৃপ্তি হইবে, তাহি তুমিও হইবে। এইভাবে সাত অটদিন কাটিল : নিত্য সে চাদরে বাঁধিয়া শিলা দুইটি লইয়া আসে, নিত্য ফিরিয়া লইয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া পরদিনের জন্য তুলিয়া লয়। পূর্বের মত একাদিনও যদি অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে হয়ত সে তাহাকে তাহা দিয়া ফেরাত, কিন্তু এ সুযোগ আর কিছুতেই হইল না। আজ দুইদিন হইতে তাহার ঘর হইতেছে, তবু ভয়ে ভয়ে সে মন্দিরে পূজা করিতে আসে। কি একটা অজানা অশঙ্কায় সে পাণ্ডব কথাটাও বলিতে পারে না। অপর্ণা কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিত যে দুই দিন হইতে শক্তিনাথ কিছুই খায় নাই, অথচ পূজা করিতে আসিতেছে।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, তুমি দুদিন হতে কিছু খাও নাই কেন?

শক্তিনাথ শুধুমুখে কহিল, আমার বাবে শজ জ্বর হয়।

জ্বর হয়? তাব মান করে পূজা করতে এন কেন? এ কথা বল নাই কেন?

শক্তিনাথের চোখে জল আসিল। মুহূর্তে সব কথা তুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিলা দুইটি বাহির

করিয়া বলিল, তোমার জন্য এনেছি।

আমার জন্য?

হাঁ, তুমি গন্ধ ভালবাস না?

উক দুখ যেমন একটুখানি আভ্যন্তরীণ তাপ পাইবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্বস্বের রক্ত তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল—শিশি দুইটি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল ; গভীরবরে বলিল, নাও। হাতে লইয়া অপর্ণা মন্দিরের বাহিরে যেখানে পূজা-করা ফুল শুকিয়া পড়িয়া ছিল, সেইখানে শিশি দুইটি নিক্ষেপ করিল। আতঙ্কে শক্তিনাথের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, বামুনঠাকুর, তোমার মনে এত। আর তুমি আমার সামনে এসো না, মন্দিরের দ্বারাও মাড়িও না। অপর্ণা চম্পকাসুনি দিয়া বহির্দেশ দেখিয়া বলিল, যাও—

আজ তিন দিন হইল শক্তিনাথ গিয়াছে। আবার যদু আচার্য পূজা করিতে বসিয়াছেন, আবার স্নানস্থলে অপর্ণা চাহিয়া দেখিতেছে, এ বেন কাহার পূজা কে আসিয়া শেষ করিতেছে। পূজা সাঙ্গ করিয়া নৈবেদ্যের রাশি গামছার বাঁধিতে বাঁধিতে আচার্যমহাশয় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ছেলেরা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল।—আচার্যের মুখপানে চাহিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, কে মারা গেল ?

তুমি বুঝি শোন নাই? কলবিনের ছারে শক্তিনাথ, এই মধু ভট্টাচার্যের ছেলে আর সকালবেলা মারা পড়েছে। অপর্ণা ভবুও তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আচার্য দ্বারের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, পাণের ফলে আজকাল মৃত্যু হচ্ছে—সেবতার সঙ্গে কি তামাশা চলে মা!

আচার্য চলিয়া গেলেন। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কঁদিতে লাগিল ; সহস্রবার কঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঠাকুর, এ কার পাপ ?

বহুবৎ পরে সে উঠিয়া বলিল ; চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথাষ করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কঁদিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি যা নিয়ে পারি নাই—তা তুমি নাও। নিজের হাতে আমি কখনও তোমার পূজা করি নাই, আজ করচি—তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।



বোকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

সাগরপুরে আজ মহামুখ, রোশনটোঁকি আর ঢাকের বাগো গ্রাম সরগরম। সপ্তাহ ধরিয়া যে কি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে, তাহা গ্রামের এবং ভৎপার্ববর্তী চারি-পাঁচ ক্রোশের সকল লোক জানে। এ রাজসূত্র-বজ্র ঢাকটোলের এমন মহান একত্র সমাবেশ, সানাই-দলের এমন আকাশ ঐক্যভাব, কাস্টো-নির্মিত বাগবজ্রের এমন প্রচণ্ড বিক্রম দেখা গিয়াছিল যে, গ্রামের লোক ইতিপূর্বে এমন কাণ্ড কখনও আর দেখে নাই। রংবেরং বাগবজ্রের সাহায্যে মনুষ্য শ্রেণীর যে আনন্দ-কোলাহল উদ্ভিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামের পততলা অভ্যন্তর বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ পর-বাছুরের দল, ঢাকটোলের আত্মপ্রোহিত্য তাহারে মরশীড়ার আর সীমা নাই। এত সমারোহের কারণ, একটা নাবালক চতুর্দশবর্ষীয় বালকের বিবাহ। সাগর পুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হরসেব মিত্রের একমাত্র পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই এমন কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। হরসেব মিত্র বেশ বড়লোক, প্রায় পঁচিশ-চব্বিশ হাজার টাকা তাহার বাৎসরিক আয়। পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র, হেয়ার সাহেবের ঘূসে এটাল ক্লাসে সে পড়ে। অত অল্পবয়সে বিবাহের কারণ, একমাত্র সত্যেন্দ্রের বাতীর কথুখু দেখিবার একান্ত সাধ।

বর্তমান জেলার নিলজান-পুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা

সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

রাজা বৌ। সত্যেন্দ্র মহাসুখী।

দশ বছরের টুকটুকে ছোট বোটির মুখ দেখিয়া সত্যেন্দ্রের জননী বিশেষ দৃষ্টিচলিত হইলেন। বিবাহের পরবৎসরেই হরসেবাবাবু বধু আনিলেন, কারণ গৃহিণীর এরূপ অভিসন্ধি ছিল না যে, বধুকে শিশুপুত্রের রাশিয়া দেন। তিনি প্রায় বলিতেন, বিবাহ হইলে মেয়েকে আর বাপের বাটিতে রাখিতে নাই। সত্যটা মনে নহে।—সত্যেন্দ্রের পাঠের সুবিধার জন্য হরসেবাবাবুকে সঙ্গীক কলিকাতাতেই থাকিতে হইত সরলা কলিকাতায় আসিল। অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সরলা হরসেবাবাবুর সহিত কথা কহিত, এমন কি সত্যেন্দ্র উপস্থিত থাকিলেও সে স্বচ্ছষ্টাকুরানীর সহিত কথা বলিতে গৃহিণীর তাহাতে সুখ ভিন্ন অসুখ ছিল না।

কিছুদিন পরে কামাখ্যাবাবু সরলাকে একবার বাটা লইয়া গেলেন, তাহার দই-এক মাস পরে সত্যেন্দ্র একদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, বইগুলোতে ছাড়া ধরেচে, দোরাতে কলি শুকিয়ে গেছে, এমন একজন নেই যে এগুলো দেখে।

কথাটা মা বুঝিলেন, হরসেবাবাবুরও কানে গেল; তিনি হাসিয়া বৌ আনিতে পাঠাইলেন লিখিলেন, আমার বাটিতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, মা ভিন্ন বোধ হয় থাকিবে না। সুতরাং মাকে পাঠাইয়া দিবেন।—আবার সরলা আসিল। সত্যর ছোটখাট কাজগুলি সে-ই করিত। বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখা, কলেজের কাপড়জামাগুলি ঠিক করিয়া রাখা, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি দুই হাতে দুই-তিনমের বোতাম কিংবা আহার করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কলেজের এক ঘণ্টা যায় যায় সময়ে, এক পায় কাপেটের অপর পায় বানিস-করা জুতা সে না পরিয়া ফেলে, ফরসা জামার উপর রক্ত-ভবনে শুভাগমনের জন্য প্রস্তুত চাদরের জুলুম না হয় এইসব কাজগুলো সরলাই দেখিত; সরলা না থাকিলে এ-সব গণ্ডগোল তাহার প্রায়ই ঘটিত। এমন অন্যান্য লোক কেহ কখনও দেখে নাই। এ-সকল কাজ সরলা ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা হইতও না বটে, আর হইলেও পছন্দ হইত না বলিয়াও বটে, কাজগুলি সরলাই করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সুখীলার ছেলের অগ্রগমন

সুখীলা সরলার বড়দিদি। তাহার ছেলের ভাত। সুতরাং কামাখ্যাবাবু দৌহিবার অগ্রগমন-উপলক্ষে সরলাকে বাটা লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

সরলার দিদি, সরলা ও সত্যেন্দ্রকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। বিশেষ, সরলা প্রায় তিন বৎসর যাবৎ দিলজানপুরে যায় নাই। সত্যেন্দ্রও যখন যাইতে সম্মত হইল, তখন কামাখ্যাবাবু পরমানন্দে জামাতা-কন্যা লইয়া দেশে আসিলেন।

গৃহিণী বহুদিনের পর তাহাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। বাহার ছেলের ভাত, সে আসিয়া দুইজনকেই অনেক কথা শুনাইয়া দিল, অনেক রকমে আগ্রাসিত করিল।

শুভকর্ম নির্বিয়ে সমাধা হইয়া যাবার পর সত্যেন্দ্র বাটা যাইতে চাহিল, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে আপত্তি করিলেন, বলিলেন এতদিনে এসেচ, আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

সরলাও ছাড়িল না। সুতরাং আরও দুই-চারিদিন থাকিতে সত্যেন্দ্র সম্মত হইল। দুই-চারিদিন কাটিয়া গেল, তবু সরলা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু না যাইলেও পড়াশুনার বিশেষ কতি হয়; পরীক্ষারও অধিক বিলম্ব নাই। আসিবার সময় সরলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে আবার কবে নিয়ে যাবে?

সত্যেন্দ্র কহিল, যখন যাবে তখনই।

তা হলে আমাকে দশ-বারদিন পরেই নিয়ে বেও।

সত্যেন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইল। সে এতটা ভাবে নাই।

তখন অক্ষয়জলের মধ্যে সরলা স্বামীকে বিদায় দিয়া হাসিয়া বলিল, দেখো, আমার জন্য কেন ডেবো না, আর রাত্রি পর্যন্ত পড়ে যেন অসুখ না হয়।

রাত্রি দশটার অধিক না পড়িবার জন্য সরলা বিশেষ করিয়া মাথার দিবা দিয়া মিল। কি একটা উদাস-পারা প্রাণ লইয়া সত্যেন্দ্র সেইদিন কলিকাতায় পৌছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ একখানা পুস্তক লইয়া বসিয়াছিল। পুস্তকের পৃষ্ঠার সহিত মনের একটা বিবম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল।

সত্যেন্দ্র গণিয়া দেখিল, সমস্ত দিন মোটে ছাব্বিশ লাইন পড়াইয়াছে। দুঃখিতভাবে সে ভাবিল বাঃ, এইরকম পড়লেই পাস হবো। ক্রমে দুঃখ ঈষৎ ফ্রোণে পরিণত হইল। সে ভাবিল, সমস্ত শোড়ামুখী সরোর দোষ। এই পাঁচদিন এসেচি, একটুকুও পড়তে পারিনি। আগে মনে হ'তো পড়ার সময় বিরক্ত করে, দশটার দেশী পড়তে গেলেই আলো নিভিয়ে দেয়, একে কোথাও পাঠিয়ে দিলে ভাল করে পড়বো। ঠিক উলটো! কালই তাকে আনতে যাবো, না হলে লজ্জার খাতির কি ফেল হবো?

যাহা হোক সত্যেন্দ্রনাথ এইরূপ একটা মতলব আঁটিতেছিল—কি করিয়া আনাই! কেমন করিয়াই বা বলি? লজ্জা করে। এত ভালই বা বাসিলাম কেমন করিয়া? দু'দিন—

একটা ভৃত্য আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম হাতে দিল, সত্যেন্দ্র অতিশয় বিম্মিত হইল, আর ভাবিবার সময় নাই, কোথাকার টেলিগ্রাম? কভার খুলিতে সত্যের হৃৎকম্প হইল। ভিতরে যাহা লেখা ছিল, তাহাতে মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। সরলা পীড়িত।

সেইদিনই হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে লইয়া দিলজ্ঞানপুর যাত্রা করিলেন।

বাগির সম্মুখে কামাখ্যাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরদেববাবু চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কেমন?

কামাখ্যাবাবু কহিলেন, আসুন, ভিতরে চলুন।

হরদেববাবু ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সরলা বিসুচিকা রোগে আক্রান্ত, একদিনে সরলাকে যেন আর চেনা যায় না। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, পদ্মের মত মুখখানিতে কালিমা পড়িয়াছে। বিস্ত্র হরদেববাবু বুঝিলেন অবস্থা ভাল নহে। চক্ষু মুছিয়া ডাকিলেন, মা সরলা!

সরলা চাহিয়া দেখিল। তখনও সরলার বেশ চৈতন্য আছে—কেমন আছ মা?

সরলা হাসিয়া বলিল, ভাল আছি ত!

দুইজনেই বুকিল, এটা আপসে মিটমাট হইয়া গেল। সকলে চলিয়া যাইলে সত্যেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিল। দারুণ আতঙ্কে কথা বাহির হইল না। তখন জোর করিয়া নীরস ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সত্যেন্দ্র ডাকিল, সরো!

শুধু ভাঙ্গা গলা। ক্ষতি কি! সেই চির-পরিচিত স্বর, সেই আদরের ডাক—সরো! এ কি ভুল হয়? সরলা চাহিল। সে হরদেববাবুকে দেখিয়া পূর্বেই সত্যেন্দ্রের আগমন অনেকটা অনুমান করিয়াছিল। সরলা স্বামীকে তামাশা করিতে বড় ভালবাসিত, হাসিয়া বলিল, কি, নিতে এসেচ?

কথা বসিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ কোনমতে সত্যেন্দ্র চক্ষুর জল চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, অবস্থা দেখিয়া সে বলির বাঁধ ভাঙিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র জানিত, এ সময়ে কীদিতে নাই। কিন্তু গোড়া চোখের জলের কি সে বিবেচনা আছে? বেশ ধীরে ধীরে বহুদূরে তাহার একটির পর একটি করিয়া কঁটায় নামিতে আরম্ভ করিল। তাহার যে সরলার জ্বলে মিশিতেছে। এ অবকাশ তাহারের কখনও হইয়াছে কি? কখনও হয় নাই। তোমার কিংবা সরলার খাতির তাহার কি এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? সরলা স্বামীকে কখনও কীদিতে দেখে নাই সেও কীদিল। অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া সে বলিল, ছি, কীদ কেন? পুরুষমানুষের কি কীদতে আছে?

এ কি? বটে সরলা? বেশ বুঝিয়াছ। অন্তর্দাহে তাহার গুহকহিয়া কাঠ হইয়া যাউক, এককঁটা জল যেন না পড়ে। অক্ষ ক্রীলোকের জন্য। পুরুষের তাহাতে হাত দিবার অধিকার নাই। বস্ত্রপায় পড়িয়া বাও, কীদিতে পহিবে না। কীদিলে ক্রীলোক হইয়া যাইবে। সরলা! এ ব্যবস্থা কি তোমায়ই করিয়াছ? সরলা স্বামীর হাত আগনার হাতে টিনিয়া ধরিয়া কীদিয়া বলিল, পরজন্ম বিবাস কর কি?

সত্যেন্দ্র কাদিতে কাদিতে বলিল, করতাম কি না জানি না, কিন্তু আজ হতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব। সরলার মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া কামাখ্যাবাবু, হরদেববাবু এবং ডাক্তারবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, আশা বড় কম, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরদিন বেলা সাতটার সময় সরলার মৃত্যু হইল।

সন্ধ্যার সময় হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আবার বিবাহ

কি যেন কি একটা হইয়া গিয়াছে। রাজশয্যায় শয়ন করিয়া ইন্দ্রদেবের সুখ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছিলাম, টানিয়া কে যেন সুখের স্বপ্নটুকু ভাসিয়া দিয়াছে। অর্ধরাত্রে উঠিয়া বসিয়াছি, ঘুম ভাসিয়া গিয়াছে—আমার অজীবন সহচর সেই অর্ধছিন্ন খট্টায় শুইয়া আছি—আমি কাদিব, না হাসিব? সুখের স্রোতে অনন্তে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ যেন একটা অজানা দলের পাশে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর বুঝি কখনও ভাসিয়া যাইতে পাইব না। সব যেন উলটাইয়া গিয়াছে। জীবনের কেন্দ্র পর্যন্ত কে টানিয়া পরিধির বাহিরে লইয়া গিয়াছে। কিছুই যেন আর ঠাহর হয় না। এ কি হইল? নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথ জানালায় বসিয়া সাগরপুরের অন্ধকার দেখিতেছিল। গাছগুলো কি একটা নিস্তব্ধ ভাব সত্যেন্দ্রের সহিত বিনিময় করিতেছিল।

সৌ সৌ করিয়া নৈশ বাতাস বহিয়া গেল। কিছু বলিয়া গেল কি? বলিল বৈ কি! সেই এক কথা। সব জিনিসেই সেই এক কথা বলিয়া বেড়ায়! হইয়াছে কি? পাগিয়া আর চোখ গেল বলে না, ঠিক যেন বলে মরে গেল। বৌ-কথা-কণ্ড পাখিও আর আপনার বোল বলে না। সেও বলে, বৌ মরে গেছে। সব জিনিস এ একই কথা বার বার করিয়া বেড়ায় কেন? সৌ সৌ করিয়া নৈশ বাতাস যেন এ কথাই কহে—নৌ, নৌ, সে নৌ!

কেনন আছ সত্য? মাথাটা কি বড় ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়? সে ত আজ অনেকদিন হইল! একটু শোও না ভাই! চিরকাল কি একইভাবে এ জানালায় বসিয়া থাকিবে? সত্যেন্দ্র অন্ধকারে নক্ষত্র দেখিতেছিল। যেটি সর্বাপেক্ষা ক্ষীণ, সেটিকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল।

চক্ষু মুদিতো সাহস হয় না—পাছে সেটি হারাইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ক্লাস্ত হইলে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আবার সেটিকে দেখিবার চেষ্টা করে। আলো ভাল লাগে না। জ্যোৎস্নায় আর আমোদ হয় না। অত ক্ষীণালোকবিশিষ্ট নক্ষত্র আলোকে দেখা যায়! সত্যেন্দ্র এম এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া গিয়াছে। পাস হইবার ইচ্ছাও আর নাই। উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে, পাস করিলে কি নক্ষত্র কাছে আসে? হরদেববাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া আসিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বলে, সে পাটি হইতেই ভাল পরীক্ষা দিতে পারিবে। শহরের অত গণ্ডগোল ভাল পড়াশুনা হয় না। সত্যেন্দ্র এখন একরকমের লোক হইয়া গিয়াছে, মুখখানা দেখিলে বোধ হয়, যেন বহুদিন কিছু খাইতে পায় নাই। যেন মস্ত পীড়া হইতে সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করিয়াছে!

দুপুরবেলা সত্য ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ফটোগ্রাফ বাড়িয়া ধুলা পরিষ্কার করে; নিজের পুরাতন পুস্তকগুলি সাজাইতে বসে; হারমোনিয়ামের কীপ খুলিয়া মিছামিছি পরিষ্কার করে। সরলার পরিদ্ধত পুস্তকগুলি আরও পরিষ্কার করে; ভাল ভাল কাগজ লইয়া সরলাকে পত্র লিখিয়া কি একটা শিরোনামা দিয়া নিজের বাস্তব বন্ধ করিয়া রাখে। সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি একা নও। অনেকের কপাল তোমারই মত অল্পবয়সে পড়িয়া যায়। সকলেই নি তোমার মত পাগল হয়! মাঝখান, সত্য! সকলেরই একটা সীমা আছে। স্বর্গীয় ভালবাসারও একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। যদি সীমা ছাড়াইয়া যাও, কষ্ট পাইবে। কেহ রাখিতে পারিবে না।

সত্যেন্দ্রের জননী বড় বুদ্ধিমতী। তিনি একদিন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, সত্য আমার কি হয়ে গেছে দেখেছ?

কর্তা বলিলেন, দেখেছি ত—কিন্তু কি করি?

আবার বিবাহ দাও। ভাল বৌ হলে সত্য আবার হাসবে—আবার কথা কবে।
সেদিন সত্য আহ্বার করিতে বলিলে জননী বলিলেন, আবার একটা কথা ওনবে?
কি?

তোমাকে আবার বিবাহ করতে হবে।

সত্য হাসিয়া কহিল, এই কথা! তা বুড়ো বয়সে, আবার ও-সব কেন?

মা পূর্ব হইতেই অক্ল সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন বিনা বাস্তবাবে নামিতে আরম্ভ করিল।
মা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, বাবা, এই একশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না। কিন্তু সরলার কথা মনে হলে
এ-সব আর মুখে আনতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমি আর একা থাকতে পারি না।

পরদিন প্রাতে হরদেববাবু সত্যোজ্ঞকে ডাকিয়া ঐ কথাই বলিলেন। সত্যোজ্ঞ কোন উত্তর দিল না।
হরদেববাবু বুকিলেন, যৌন ভাব সম্মতির লক্ষণমাত্র।

সত্যোজ্ঞ ঘরে আসিয়া সরলার কটোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ওনচো সরো, আমার বিয়ে হবে!
কটোগ্রাহক কথা কহিতে পারে না। পারিলে কি বলিত? 'বেশ ত', বলিত কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—নলিনী

সত্যোজ্ঞের এবার কলিকাতায় বিবাহ হইল। শুভদৃষ্টির সময় সত্যোজ্ঞ দেখিল মুখখানি বড় সুন্দর।
হটক সুন্দর, সে তথাপি ভাবিল, তাহার মাথায় একটা বোকা চাপিল।

বিবাহের পর দুই বৎসর নলিনী নিতৃপ্তে রহিল। তৃতীয় বৎসরে সে খবরভবনে আসিয়াছে, গৃহিণী
নূতন বধুর চাম্পানা মুখ দেখিয়া আবার সরলাকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন, আবার সংসার পাতিবার
চেষ্টা করিলেন।

রায়ে বখন দুইজনে পাশাপাশি ওইয়া থাকে, তখন কেহই কাহার সহিত কথা কহে না। নলিনী
ভাবে কেন এত অব্যস্ত? সত্য ভাবে, এ কোথাকার কে যে আমার সরোর জায়গায় ওইয়া থাকে?

নূতন বধু লজ্জার স্বামীর সহিত কথা কহিতে পারে না—সত্যোজ্ঞ ভাবে, কথা কহে না ভালই।

একদিন রায়ে সত্যোজ্ঞের ঘুম ভাঙ্গিয়া বাইলে সে দেখিল, শয্যায় কেহ নাই। ভাল করিয়া চাহিয়া
দেখিল, কে একজন জানালার বসিয়া আছে। জানালা খোলা। খোলা পথে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ
করিয়াছে, সেই আলোকে সত্যোজ্ঞ নলিনীর মুখের কিয়দংশ দেখিতে পাইল, ঘুমের ঘোরে জ্যোৎস্নার
আলোকে, মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইল।

কান পাতিয়া সে ওনিল, নলিনী কানিতেছে।

সত্য ভাবিল, নলিনী—

নলিনী চমকিয়া উঠিল। স্বামী আহ্বান করিয়াছেন! অন্য মেয়ে কি করিত জানি না, কিন্তু নলিনী
ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে বসিল।

সত্যোজ্ঞ বলিল, কানচ কেন?—কানচ কেন?

অকস্মেৎ বিগুন মাত্রায় বহিতে লাগিল, তাহার বোল বৎসর বয়সে স্বামীর এই আদরের কথা!
অনেকক্ষণ চাপিয়া চাপিয়া কানিয়া চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, তুমি আমাকে দেখতে পার
না কেন?

কি জানি কেন! সত্যরও বড় কান্না আসিতেছিল। তাহা রোধ করিয়া সে বলিল, দেখতে পারি
না তোমাকে কে বললে? তবে বন্ধ করতে পারি না।

নলিনী নিরন্তরে সকল কথা ওনিতে লাগিল।

সত্যোজ্ঞ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, ভেবেছিলাম এ কথা কাকেও বলব না, কিন্তু না বললে
কেন লাভ নাই। তোমাকে কিছু গোপন করব না। সকল কথা বুলে বললে বুঝতে, আমি এমন কেন।
আমি এখনও সরলাকে—আমার পূর্ব-স্বীকে ভুলতে পারিনি। ভুলব, এমন ভরসাও করি না, ইচ্ছাও
করি না। তুমি হতভাগ্যের হাতে পড়েচ—তোমাকে কখনও সুখী করতে পারব, এ আশা মনে হয়
না। নিজের ইচ্ছায় তোমাকে বিবাহ করিনি—নিজের ইচ্ছায় তোমাকে ভালবাসতে পারব না।

পতীর নিশীথে দুইজনে অনেককাল এইভাবে বসিয়া রহিল। সত্যোজ্ঞ বুঝিতে পারিল, নলিনী কান্দিতেছে। সে কান্দিয়াছিল কি? একে একে সরলার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই সুখখানি হৃদয়ে আগিয়া উঠিল—সেই ‘নিতে এসেচ?’ মনে পড়িল। অনাহৃত অক্ষ সত্যোজ্ঞের নরন রোধ করিল, তাহার পর গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে করিয়া পড়িল।

চক্ষু মুছিয়া সত্যোজ্ঞ ধীরে ধীরে নলিনীর হাত দুটি আপনার হাতে লইয়া বলিল, কেঁসো না নলিনী, আমার হাত কি? নিশিদিন অন্তরে আমি কি যন্ত্রণাই যে ভোগ করি তা কেই জানে না। মনে বড় কষ্ট। এ কষ্ট যদি কখনও যায়, তাহলে হয়ত তোমাকে ভালবাসতে পারবো, হয়ত তোমাকে আবার যত্ন করতে পারব।

এই বিবাদপূর্ণ স্নেহমাধা কথার মূল্য কয়জন বুঝে? নলিনী বড় বুদ্ধিমতী; সে স্বামীর কষ্ট বুঝিল। স্বামী তাহাকে ভালবাসে না, এ কথা সে তাঁহার মুখে শুনিয়া, তথাপি তাহার অভিমান হইল না। বোকা মেয়ে। বোল বৎসরে যদি অভিমান করিবে না তবে করিবে কবে? কিন্তু নলিনী ভাবিল, অভিমান আগে, না স্বামী আগে?

সেইদিন হইতে কি করিলে স্বামীর কষ্ট যায়, ইহার তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। কি করিলে স্বামী সতীনের ভুলিতে পারেন, এ কথা সে একবারও ভাবিল না। ব্যথার যদি কেহ ব্যথী হয়, কষ্টতে যদি কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে, দুঃখের কথা যদি কেহ আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার নায় বন্ধু এ জগতে আর নাই। ইহার পর সত্যোজ্ঞ নলিনীকে প্রায়ই পূর্বের কথা জানাইত। কত নিশা দুইজনের সেই একই কথায় অবসান হইত। সত্যোজ্ঞ যে কেবল বলিত, তাহা নহে, নলিনী আগ্রহের সহিত স্বামীর পূর্ব-ভালবাসার কথা শুনিতে ভালও বাসিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দুই বৎসর পরে

দুই বৎসর গত হইয়াছে, নলিনীর বয়স এখন আঠার বৎসর, তাহার আর পূর্বের মত কষ্ট নাই। স্বামী এখন আর তাহাকে অযত্ন করেন না। স্বামীর ভালবাসা জোর করিয়া সে লইয়াছে। যে জোর করিয়া কিছু লইতে জানে, সে তাহা রাখিতেও জানে, তাহার এখন আর কোন কষ্টই নাই। সত্যোজ্ঞনাথ এখন পাবনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ত্রীর যত্নে, ত্রীর ঐকান্তিক ভালবাসায় তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কাছারির কর্মের অবকাশে সে এখন নলিনীর সহিত গল্প করে, উপহাস করে, গান-বাজনা করিয়া আমোদ পায়। এক কথায়, সত্যোজ্ঞ অনেকটা মানুষ হইয়াছে। মাং খেটা পায় না, সেইটাই তাহার অভ্যস্ত প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্য-চরিত্রই এমন। তুমি অশান্তিতে আছ, শান্তি খুঁজিয়া বেড়াও—আমি শান্তিভোগ করিতেছি, তবুও কোথা হইতে যেন অশান্তিকে টানিয়া বাহির করি।

ছল ধরা যেন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ভাব। যে মাছটা পলাইয়া যায়, সেইটাই কি ছাই বড় হয়! সত্যোজ্ঞনাথও মানুষ। মানুষের স্বভাব কোথায় যাইবে? এত ভালবাসা, যত্ন ও শান্তির মধ্যে তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত অশান্তি জাগিয়া উঠে। নিমিষের মধ্যে মনের মাঝে বৈদ্যুতিক ক্রিম্মার মত যে বিগ্নব ব্যথিয়া যায়, তাহা সামলাইয়া লইতে নলিনীর অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, বুঝি আর সে সামলাইতে পারিবে না। এতদিনের চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় সমস্তই বুঝি বিফল হইয়া যাইবে। নালিনীর এতটুকু ক্রটি দেখিলে সত্যোজ্ঞ সরলা থাকিলে বোধ হয় এমনটি হইত না। হইত কি না ভগবান জানেন, হয়ত হইত না, হয়ত ইহা অপেক্ষা চতুর্গুণ হইত! কিন্তু তাহাতে কি? সে মংসা যে পলাইয়া গিয়াছে। সত্যোজ্ঞ এখনও সরলাকে ভুলিতে পারেন নাই। কাছারি হইতে আসিয়া যদি নলিনীকে সে না দেখিতে পায়, অমনই মনে করে, কিসে আর কিসে!

নলিনী বড় বুদ্ধিমতী, সে সর্বদা স্বামীর নিকট থাকে, কারণ সে জানিত, এখনও তিনি সরলাকে ভুলেন নাই। একেবারে ভুলিয়া যান, এ ইচ্ছা নলিনীর কখনও মনে হয় না; তবে অনর্থক মনে করিয়া কষ্ট না পান, এইজন্যই সে সর্বদা কাছে থাকিত, যত্ন করিত। নাই ভুলুন, কিন্তু তাহাতেও অযত্ন করেন না—ইহাই নলিনীর ঢের।

গোপীকান্ত রায় পাকনাঃ একজন সম্ভ্রান্ত উকিল। কলকাতায় তাঁহার বাটী নলিনীসের বাটীর

কাছে। কি একটা সঘন্থ থাকার নলিনী তাঁহাকে কান্না বলিরা ডাকে। রায়-খুড়ীয়া ধার দ্যতাই সত্যেন্দ্রর বাড়ি বেড়াইতে আসেন। গোপীবাবুও ধার আসেন। গ্রাম-সম্পর্কে খুড়খুড়রকে সত্যেন্দ্রনাথ অতিশয় মান্য করে। সত্যেন্দ্রর বাসা তাঁহার বাড়ি হইতে দূরে হইলেও উত্তর পরিবারে বেশ মেলামেশি হইয়া গিয়াছে।

নলিনীও মধ্যে মধ্যে কাকার বাড়ি বেড়াইতে যায়; কারণ, একে কাকার বাড়ি, তাহাতে গোপীবাবুর কন্যা হেমার সহিত তাহার বড় ভাব; বাল্যকালের সখী, কেহ কাহাকে ছাড়িতে চাহে না। সেদিন তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কাছারি চলিয়া গিয়াছে, কোন কর্ম নাই সেবিয়া নলিনী ছবি আঁকিতে বসিল, কিন্তু তৎকথাৎ গড়গড় করিয়া একখানা গাড়ি ডেপুটিবাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া লাগিল।

কে আসিল? হেম বুঝি? আর ভাবিতে হইল না। বিবম কোলাহল করিতে করিতে হেমাদিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমা আসিয়া একেবারে নলিনীর চুল ধরিল, কহিল, আর লেখাপড়ার দরকার নেই, ওঠ, আমাদের বাড়ি চল, কাল দাপার যৌ এসেছে।

নলিনী কহিল, যৌ এসেছে, সঙ্গে আনলে না কেন?

হেম কহিল, তা কি হয়? নুতন এসেছে, হঠাৎ ভোর এখানে আসবে কেন?

নলিনী কহিল, আশ্বিই তবে বাবো কেন?

হেমাদিনী হাসিয়া বলিল, ভোর খাড় বাবে, এই আমি টেনে নিয়ে যাছি। চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহিলে, নলিনী কেন, অনেককেই বাইতে হইত! নলিনীকেও বাইতে হইল।

বাইতে নলিনীর বিশেষ আপত্তি ছিল, কারণ তাহাদের বাড়ি বাহিলে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইত। দুই-একজন নলিনীর বাড়ি ফিরিবার পূর্বেই সত্যেন্দ্রনাথ কাছারি হইতে ফিরিয়াছিলেন। সেদিন অবস্থায় সত্যেন্দ্রর বড় অসুখিয়া হইত। তিনি কিছু মনে করুন আর নাই করুন, নলিনীর বড় লজ্জা করিত; কারণ সে জানিত, কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতের বাতাস না বাহিলে স্বামীর গরম ছুটিত না। বিখ্যাতর ইচ্ছা—বহুচেষ্টার আজও নলিনী সাড়টার পূর্বে ফিরিতে পারিল না। আসিয়া সে দেখিল, সত্যেন্দ্র সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে, তখনও কিছু আহার করে নাই। খাওরাইবার ভার নলিনী আপন হস্তেই রাখিয়াছিল। কাছে আসিলে সত্যেন্দ্র হাসিল, কিন্তু সে হাসি নলিনীর ভাল বোধ হইল না। সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। আসন পাতিয়া নলিনী জলখাবার খাওরাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সত্যেন্দ্র কিছু স্পর্শও করিল না। স্কুখা একেবারেই নাই। বৎ সাধ্য-সাধনাতেও সে কিছু বাহিল না। নলিনী বুঝিল এ অভিমান কেন।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কপাল ডাসিয়াছে কি?

আজ হেমাদিনী স্বতঃস্ফূর্ত বাইবে। তাহার স্বামী উপেন্দ্রবাবু তাহাকে লইতে আসিয়াছেন। নলিনী বৎ নিবস হেমার সহিত দেখা করিতে যায় নাই। তাই আজ হেমা অনেক দূর করিয়া তাহাকে বাইতে লিখিয়াছে।

নলিনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, স্বামীর অনুমতি বিনা সে আর কোথাও বাইবে না; কিন্তু আজ সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গেলে প্রিয়-সখীর সহিত আর দেখা হয় না। নলিনী বড় বিপদে পড়িল। হেমা লিখিয়াছে, তাড়াতাড়ি তিনটার টেনে রওনা হইবে। তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লওয়া কি করিয়া হয়? বৎ কু-ভর্যের পর নলিনী বাওরাই স্থির করিল। বাইবার সময় দাসীকে সে বলিয়া দিল, যেন ঠিক তিনটার সময় রাস্তারের বাড়িতে গাড়ি পাঠান হয়। গাড়ি পাঠানও হইয়াছিল, কিন্তু হেমার তিনটার টেনে যাওয়া হইল না। সুতরাং সে নলিনীকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না। অনেক ভিন করিয়াও সে হেমার হাত একাইতে পারিল না। হেমা আজ অনেক দিনের জন্য চলিয়া বাইতেছে। কতকাল আর দেখা হইবে না—সহজে কে ছাড়িয়া দেয়?

বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্বামী রাগ করিবেন, এ কথা বলিতে নলিনীর লজ্জা হইতেছিল—সত্যেন্দ্র এ কথা কে বলিতে চাইবে? এ ভীষণতা কে ভীষণ করে? বিশেষ এই কারণে? অবশেষে সে কখনও

সে বলিল, কিন্তু হেমা তাহা বিশ্বাস করিল না। সে হাসিয়া বলিল, বোকা বুঝিও না। রাগারাগির ব্যাপার আমি ঢের বুঝি। উপেনবাবুও অনেক রাগ করতে জানেন।

কথাটা হেমা হাসিয়া উড়াইয়া দিল; কিন্তু নলিনী মর্মে নীড়া পাইল। সকলের স্বামী কি এক ছাড়ে গড়া? সকলেই কি উপেনবাবুর মত?

নলিনী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া সে তনিল, বাবু বাহিরে শয়ন করিয়াছেন।

মাতঙ্গিনী ওরফে মাতু, নলিনীর বাপের ঝি, সে নলিনীর সহিত আসিয়াছিল। অনেকদিনের লোক, বিশেষ সে নলিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, তাই সে নলিনীকে আজ বিলম্ব দশ কথা জানাইয়া দিল। বাটার মধ্যে সে-ই কেবল জানিত, সত্যাবাবু বিলম্ব রাগ করিয়াই বাহিরে শয্যা রচনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

গভীর রাতে যখন শয্যা শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, যখন সেই বহুদিনগত প্রফুল্ল-কমলসদৃশ সরলার মুখের সহিত নলিনীর মুখের ঐষৎ সাদৃশ্য আছে কিনা বিবেচনা করিতেছিল, যখন সরলার ভালবাসার নিকট নলিনীর ভালবাসা সাগরের নিকট গোম্পদের জল ধারণা করিবার জন্য মনের মধ্যে বিষম ঝটিকার উৎপত্তি করিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া নলিনী মনের মধ্যে বিষম ঝটিকার উৎপত্তি করিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া নলিনী সে গৃহে প্রবেশ করিল। সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, নলিনী। নলিনী আসিয়া সত্যেন্দ্রের পদতলে বসিল। সত্যেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল। বহুকাল এইভাবেই কাটিয়া গেল দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইল, পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া পুরুষভাবে স্পষ্ট-স্বরে কহিল, তুমি এখানে কেন?

নলিনী কাদিতেছিল, কথা কহিতে পারিল না। কান্না দেখিয়া ডেপুটিবাবু আর একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল, রাত হয়েছে, যাও, ভিতরে গিয়ে শোও গে।

নলিনী কাদিতেছিল; এবার চক্ষের জল মুছিয়া সে বলিল, তুমি শোবে চল।

সত্য ঘাড় নাড়িল, বলিল, আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আর উঠতে পারব না।

কাদিলে সত্যেন্দ্র বিরক্ত হয়। নলিনী চক্ষের জল মুছিয়াছে; স্বামীর কাছে আর সে কাদিবে না। ধীরে ধীরে পায়ের উপর হাত রাখিয়া নলিনী বলিল, এবার আমাকে ক্ষমা কর। এখানে তোমার বড় কষ্ট হবে, ভিতরে চল।

সত্যেন্দ্র আর ভিতরে যাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে বলিল, কষ্টে- খা এত রাতে আর ভেবে কাজ নাই; তুমি শোও গে, আমিও ঘুমুই।

নলিনী সত্যেন্দ্রকে চিনিত। সমস্ত রাত্রি সে আপনায় ঘরে বসিয়া কাদিয়া কাটাইল। বলি, ও হেমাস্ত্রিনী, একবার দেখিয়া গেলে না? রাগারাগির ব্যাপার তুমি বোকা ভাল—একবার মিটাইয়া দিবে নাকি? পরদিনও সত্যেন্দ্র বাটার ভিতরে আসিল না, বা নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

নলিনীর একখনা পত্র মাতু সত্যেন্দ্রের হাতে দিয়েছিল। সে সেখানে না পড়িয়াই মাতঙ্গিনীর সম্মুখে ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এ-সব আর এনো না।

চারি-পাঁচদিন পরে একদিন নলিনীর বড় দাদা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পাবনায় আসিয়া পৌছিলেন। হঠাৎ দাদাকে দেখিয়া নলিনী অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ততোধিক স্নানিত হইল।

দাদা যে?

নরেন্দ্রবাবু নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাড়ি যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছি। কেন বোন?

ব্যস্ত! কথাটার অর্থ নলিনী তখনই বুঝিয়া ফেলিল। হাসিয়া সে বলিল, তোমাদের যে অনেকদিন দেখিনি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ভাদ্রিয়াছে

যেদিন স্বামীর চরণে শ্রীপাতি করিয়া নলিনী দাদার সহিত গাড়িতে উঠিল, সে রাতে সত্যেন্দ্রনাথ

একটুকুও ঘুমাইতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সত্যোজ্ঞ ভাবিতেছিল, এতটা না করিলেও চলিতে পারিত। অনেকবার সত্যর মনে হইয়াছিল, এখনও সময় আছে, এ সময়ও গাড়ি ফিরাইয়া আনি। কিন্তু হয় রে অভিমান! তাহারই জন্য নলিনীকে ফিরাইয়া আনা হইল না।

যাইবার সময় মাতৃও সঙ্গে গিয়াছিল। সে-ই কেবল যাইবার যথার্থ কারণ জানিত। নলিনী মাতৃকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, যেন সে রাস্তাতে কোন কথা না বলে। নলিনী মনে করিল, এ কথা প্রকাশ করিলে স্বামীর অপবশ করা হইবে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহার স্বামীকে লোকে মন্দ বলিবার কে?

পিড়-গৃহে যাইয়া নলিনী নিতামাতার চরণে প্রণাম করিল, ছোট ভাইটিকে কোলে লইল, শুধু সে হাসিতে পারিল না।

মা বলিলেন, নলিনী আমার একদিনের গাড়ির পরিশ্রমে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সে শুধু মুখ আর প্রফুল্ল হইল না।

পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায়, একটা সামান্য কারণ হইতে গুরুতর অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। শূর্ণপথার ঈষৎ চিন্তাফল্যই স্বর্ণ-লঙ্কা ধ্বংসের হেতু হইয়াছিল। অকিঞ্চিৎকর রূপলালসার জন্য শুধু ট্রয় নগর ধ্বংস হইয়া গেল। মহানুভব রাজা হরিশচন্দ্র অতি সামান্য কারণেই অমন বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন; জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

এখানেও একটা সামান্য অভিমানে বিষম বিপত্তি ঘটিয়া উঠিল। সত্যোজ্ঞনাথের দোষ দেব কি?

নলিনী কখনো অভিমান করে নাই, স্বামীর কষ্টের কথা মনে করিয়া সে নীরবে সমস্ত সহ্য করিত—আর পারিল না। সে ভাবিল, এই ক্ষুদ্র কারণে সে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সে মরে না কেন?

দারুণ অভিমানে নলিনী শুকাইতে লাগিল; ওদিকে সত্যোজ্ঞের অভিমান ফুরাইয়া গিয়াছে; একদণ্ড না থাকিলে যাহার চলে না, তাহার এই মিছা অভিমান কতদিন থাকে? অভিমান দারুণ কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যোজ্ঞ প্রত্যহ চাহিয়া থাকে

—আজ হয়ত নলিনীর পত্র আসিবে, হয়ত সে লিখিবে, আমার লইয়া যাও। সত্যোজ্ঞ ভাবে, তাহা হইলে মাথায় করিয়া লইয়া আসিবে, আর কখনও এবূপ অন্যায্য ব্যবহার করিবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ কে অতিক্রম করিবে? যাহা হইবার তাহা হইবেই। তুমি আমি ক্ষুদ্র শ্রানী মাত্র, আজ কাল করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল, হতভাগিনী কোন কথা লিখিবে না। পাণিষ্ঠ সত্যোজ্ঞনাথ ভাঙ্গিল, কিন্তু মচকাইল না। ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ সত্যোজ্ঞনাথের অসহ্য হইল। লুপ্ত অভিমান আবার দৃপ্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধ আসিয়া তাহাতে বোগ দিল। হিতাহিত জ্ঞান-রহিত সত্যোজ্ঞনাথ নিজের দোষ দেখিল না, ভাবিল, যাহার অহঙ্কার এত, তাহার প্রতিশোধও তদুপ শ্রয়োজন।

কেহই নিজের দোষ দেখিল না।

সেই অধর্মিলিত হৃদয় দুইটি আবার চিরকালের জন্য বিভিন্ন হইয়া চলিল। যৌবনের প্রারম্ভে সঙ্কুচিতা লতাকে কে টানিয়া বাড়াইয়াছিল, কিন্তু আর সঙ্গে না, এবার ছিড়িবার উপক্রম হইল।—সত্যোজ্ঞনাথ! তোমার দোষ মিথি না, তাহারও মিথি না। দুইজনেই ভুল করিয়াছে, দোষ আর নাই। ভুল দেখাইতে পারিলে আত্মদানি কাহার যে অধিক হইত, তাহা ভগবানই জানেন। আমরাও বৃষ্টিতে পারিতাম না, তোমরাও পারিতে না। বৃষ্টিতে পারি না—কি আকাঙ্ক্ষায়, কি সাধ পূর্ণ করিতে তোমরা এতটা করিলে!

সাধ মিটে না; মিটাইবার ইচ্ছাও নাই। কি সাধ তাহাও হয়ত ভাল বৃষ্টিতে পারি না। শুধাপি কাতর-হৃদয় কি একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সকল সময়ই হাহা করিয়া উঠে। কি যে হয়, কেন যে অদৃশ্য গতি ঐ লক্ষ্যহীন প্রান্তে পরিচালিত হয়, কিছুতেই তাহা নির্ণয় করা যায় না।

যাহা ঘটবার তাহা ঘটিবে। ইচ্ছা হইলেও মনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াও তোমাকে অপরাধ হইতে

অব্যাহতি দিব। দিব কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কুলশাখা

অমন রূপে-গুণে বৌ, পুত্রের পছন্দ হয় না! গৃহিণীর বড় দুঃখ। অমন চাঁদপানা বৌ লইয়া ঘর করিতে পারিলেন না ভাবিয়া গৃহিণী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া আছেন। জননীর শত চেষ্টাতেও পুত্রের মত ফিরিল না। এখন আর উপায় কি? ছেলেরই যদি পছন্দ হইল না, তখন কিসের বৌ? ছেলের আদরেই ত বৌয়ের আদর! আর আমারই বা হাত কি? নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিলে আমি কি আটকাইতে পারি? ইত্যাদি মৃদু বচন আওড়াইতে আওড়াইতে অভ্যাসানুসারে গৃহিণী বরণডালা সাজাইতে বসিলেন।

দুই বৎসর পূর্বে হরদেববাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। সে কথা স্মরণ হইল—চক্ষে জল আসিল, আবার নলিনীর কথা মনে পড়িল—জলবেগ আরও বর্ধিত হইল। কি জানি, কেমন বৌ আসিবে? কর্তা ঝাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় পোড়াকপালীর এ দুরবস্থা দেখিতে হইত না।

সত্যাত্ম বিবাহ করিয়া আসিল। মা বৌ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। আবার পোড়া চোখে জল আসিল। জল মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন, চোখে কি পড়েচে, কেবল জল আসছে। গিরিবালা বড় মুখাফোড় মেয়ে—বিশেষ নলিনীর সহিত তাহার বেহান পাতানো ছিল, সে বলিয়া ফেলিল, এই বয়সে তিনবার, আরও কতবার চোখে কি পড়বে কে জানে!

কথাটা গৃহিণী শুনিলেন, সত্যরও কানে গেল। কাল সাধের ফুলশয্যা।

কোথা হইতে একটা ভারী জমকালো রকম তন্তু আসিয়াছে। বর-কনের ঢাকাই শাড়ি, খুতি, চাদর ইত্যাদি বড় সুন্দর রকমের। কনের বারাণসী ঢেলীখানির মত সুন্দর ঢেলী গ্রামে ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোথাকার তন্তু? এক-একবার ঢোক গিলিয়া বলিতেছেন, সত্যর কে একজন বন্ধু পঠিয়েচে।—গৃহিণী চক্কর চল চাপিয়া, যথার্থ সংবাদ চাপিয়া হাসিকান্না-মিশ্রিত মুখে তন্তুর মিষ্টান্নাদি বণ্টন করিলেন।

সকলে যে যাহার ভাগ লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় রাজবালা বলিল, বেশ তন্তু করেছে। নৃত্যকালী বলিল, তা আর হবে না? বড়লোক তন্তু পাঠালে এমনই পাঠায়। ক্রমশঃ এ কথা চাপা পড়িল। তখন যোগময়া বলিল, আচ্ছা, আবার বিয়ে করলে কেন? জ্ঞানদা কহিল, কি জানি বোন, অমন রূপে-গুণে বৌ! কে জানে ও-সব বোঝা যায় না।

রামমণি জ্ঞাতিভ্রাতৃ নাপিতের কন্যা; তবে অবস্থা ভাল, দেখিতেও মন্দ নহ, এই নাকটি সামান্য চণা মাত্র। কোন কোন পরশ্রীকাতর লোক তাহার চক্করও দোষ দিত, বলিত, হাতির চোখের চেয়েও ছোট।

যাক, এ নিন্দাবাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। রামমণি একটু হাসিয়া বলিল, তোমাদের ঘটে যদি বুদ্ধি থাকত তা হলে কি আর ও-কথা বল? ছুড়ি সদাসর্বদা যে ফিকফিক করে হেসে কথা বলত, তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল, স্বভাব-চরিত্র মন্দ লো, স্বভাব-চরিত্র মন্দ। না হলে চাকরি স্থান থেকে তড়িয়ে দেয়? আবার বে করে? মুখে কিছু না বলিলেও কথাটা অনেকের মতের সহিত মিলিল।

ইহার দুই-একদিন পরে, গ্রামের প্রায় সকলেই জানিল যে, রামমণি জমিদারের বাটীর গুড়রহস্য ভেদ করিয়াছে। নাপিতের মেয়ে না হইলে এত বুদ্ধি কি বামন কাম্বুজের মেয়ের হয়? কথাটা অনেকেরই স্বীকার করিল।

এবার গৃহিণীর পালা। এ কথা যখন তাঁহার কানে পৌঁছ, তিনি ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া একেবারে ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন। আমার নলিনী কুলটা! কি জানি কেন গৃহিণী সরলা অপেক্ষা নলিনীকে অধিক ভালবাসিয়াছিলেন। জন্মের মত সেই নলিনীর কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৃহিণী মনে মনে ভাবিলেন, সত্য হয় ভালই—না হয় আমি নলিনীকে লইয়া কাশীবাসী হইব। পোড়াকপালীর এ-জন্মের মত সব সাধই ত মিটিয়াছে।

ওখন তিনি দ্বার খুলিয়া মাতৃকে ডাকিয়া আনিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিলেন। মাতৃই তন্তু লইয়া

আসিয়াছিল।

দুইজনের চক্ষুজলের বহু বিনিময় হইল। কেমন করিয়া নলিনীর সোনা বর্ণ কালি হইয়াছে, কি অপরাধে সত্যোত্তর তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছে, কত কাতরবচনে সে ঠাকুরানীকে প্রশাম জানাইয়াছে, ইত্যাদি বিবরণ মাভজিনী বেশ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহিনীকে তুলিল। ওনিতে ওনিতে গৃহিনীর পূর্ব-স্নেহ শতগুণ বর্ধিত হইয়া উঠিল, পুত্রের উপর দারুণ অভিমান জন্মিল। মনে মনে তিনি ভাবিলেন, আমি কি সত্যর কেউ নহি? সকল কথাই কি আমার উপেক্ষার যোগ্য? আমার কি একটা কথাও থাকিবে না? আমি আবার নলিনীকে গৃহে আনিব। অমন লক্ষ্মীর কি এ দশা করিতে আছে?

সেইদিন সন্ধ্যার জননী পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, নলিনীকে নিয়ে এসো।

পুত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।—জননী কাদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, ওরে আমার নলিনীর নামে গ্রামমর কলঙ্ক রটচে যে, তুই তার স্বামী—তার মান রাখবি নি?

কিসের কলঙ্ক?

অমন করে ভাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করলে আমি কার মুখ বন্ধ করব?

মুখ বন্ধ করে কি হবে?

তবু আনিবি নি? না।

জননী অভিযয় ক্রুদ্ধা হইলেন, ক্রুরূপ ক্রুদ্ধা হইতে হইবে এবং তখন কি কথা বলিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং কিছু ভাবিতে হইল না, বলিলেন, তবে কালই আমাকে কানী পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে একদণ্ডও আর থাকতে চাই না।

সত্য আর সে সত্য নাই। সরলার আদরের ধন ক্রীড়ার দ্রব্য, শব্দের জিনিস—অন্যমনস্ক, উচ্চমনা, সরল-হৃদয় প্রকৃষ্টবদন স্বামী, নলিনীর বহু যত্নের বন্ধক্ৰেশের, মনের মত সত্যোত্তরনাথ আর নাই। সেও যুকে পাবাশ চাপাইয়াছে, লজ্জা-শরম হিতাহিত জ্ঞান সকলই হারাইয়াছে—সে অন্যায়সে বলিল, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় যাও। আমি আর কাকৈও আনতে পারবো না।

সত্যর মুখে এ কথা ওনিবেন, যা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—কাদিতে কাদিতে চলিয়া গেলেন। বাহিবার সময় একবার বলিলেন, বৌ আমার কুলটা নয়, তা বেশ জেনো। গ্রামের লোকে যা ইচ্ছা হয় বলে, কিছু আমি কখনও তা বিশ্বাস করব না।

পরদিন পিসীমা সত্যোত্তরকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার এক বন্ধু তোমাকে ভদ্র করেচে, দেখেচ কি?—সত্য ঘাড় নাড়িল। বলিল, না, কে বন্ধু?

জানি না। ব'সো, কাপড়গুলো নিয়ে আসি।

অল্পকণ পরে পিসীমা একতাপাড়া কাপড় লইয়া আসিলেন। সত্য দেখিল, বেশ মূল্যবান বস্ত্র। সে বিস্মিত হইল। কোন্ বন্ধু পাঠাইয়াছে? চেলীখানি বেশ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে লক্ষ্য করিল, এক কোশে কি একটা বাঁধা আছে। বুলিয়া দেখিল, একখানা ক্ষুদ্র পত্র।

হস্তাক্ষর দেখিয়া সত্যোত্তর মাথা ঝাঁক করিয়া উঠিল। লেখা আছে—

ভগিনী, স্নেহের উপহার প্রত্যাহ্বান করিতে নাই। তোমার দিদি বাহা পাঠাইল, গ্রহণ করিও।

সে-রাত্রের কুলশয্যা সত্যোত্তর পক্ষে কটকশয্যা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ—সত্যোত্তরনাথের পত্র

যুবক অভিমান কোন বালকে দেখিয়াছে কি? সত্যোত্তর নাথ অভিমান করিয়া এতটা অনর্থপাত করিতে কোন বালককে দেখিয়াছে কি? ছেলেকেয়ার পুস্তক লইয়া খেলা করিতাম বলিয়া পিতার নিকট শাস্তি ভোগ করিয়াছি। সত্যোত্তরনাথ! তুমি হৃদয় লইয়া খেলা করিয়াছ; শাস্তি পাইবে, ভয় হয় কি?

তোমরা যুবা; সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন; কিন্তু বলা দেখি, তোমাদের কাছারও কি এমন একটা সময় আসে নাই—যখন প্রাণটা বাস্তবিকই ভার বোধ হইয়াছে? যখন জীবনের প্রত্যেক প্রহিণ্ডলি লব্ধ হইয়া ক্লান্তভাবে চলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে? না হইয়া থাকে একবার

সত্যেন্দ্রনাথকে দেখ। ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় বহুদে ঘৃণা কর। ঘৃণা কর, সহানুভূতি প্রকাশ করিও না। ঘৃণা কর, কিছু বলিবে না ; দয়া করিও না, মরিয়া যাইবে।—পানী যদি মরিয়া যায়, প্রারম্ভিক ভোগ করিবে কে? সত্যেন্দ্র শ্রান্ত জীবনের প্রত্যেক দিন এক-একটা দুঃসহ বোঝা লইয়া আসে। সমস্ত দিন ছোটকট করিয়াও যেন সে বোঝা আর নামাইতে পারে না।

সত্যেন্দ্রের মাঝে মাঝে বোধ হয়, যেন তাহার অতীত জীবন সমস্ত বিন্দুত হইয়া গিয়াছে ; শুধু কিছুতেই ভুলিতে পারে না তাহার সাধের নলিনী পাবনায় চরিত্রহীনা হইয়াছিল, তাই সে তাহার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।—প্রায় দুইমাস গত হইল, সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে। আজ একখানা পত্র ও একটি ছোট পার্শেল আসিয়া সত্যেন্দ্রের নিকট পৌছিল।

পত্রটি নলিনীর দাদা নরেন্দ্রবাবুর, সেখানি এই—

সত্যেন্দ্রবাবু,

অতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে আপনাকে পত্র লিখিতেছি, সে কেবল আমার প্রাণাধিকা ভগিনী নলিনীর জন্য। মৃত্যুর পূর্বে সে অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছে, যেন এই অঙ্গুরীয়টি আপনার নিকট পুনঃপ্রেরিত হয়। আপনার নামাক্তি অঙ্গুরীয়টি পাঠাইলাম। ভগিনীর ইচ্ছা ছিল এইটি আপনার নূতন স্ত্রীকে পরাইয়া দেন, ভরসা করি তাহার আশা পরিবে। আর মৃত্যুর পূর্বে সে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিয়া গিয়াছে, যেন তাহার ছোট ভগিনীটি ক্রেশ না পায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ

নলিনীর গহন একটি ছোট পুত্র-সন্তান হইয়া মরিয়া যায়, সত্যেন্দ্রনাথ এই অঙ্গুরীয়টি তাহার হস্তে পরাইয়া দিয়াছিল ; সে-কথা মনে পড়িয়াছিল কি?

সত্যেন্দ্রনাথ আর পাবনায় যান নাই। যে কারণেই হোক মাতাঠাকুরানী আর কাশীবাসী হইতে পারিতেন না। নূতন বধুর নাম ছিল বিধু। বিধু বোধ হয় পূর্বজন্মে নলিনীর ভগিনী ছিল।

অনুপমার প্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরহ

একাদশদর্শ বয়ঃক্রমের মধ্যে অনুপমা নবল পড়িয়া পড়িয়া মাথাটা একেবারে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে মনে করিল, মনুষ্য-হৃদয়ে যত প্রেম, যত মাধুরী, যত শোভা, যত সৌন্দর্য, যত তৃষ্ণা আছে, সব খুঁটিয়া বাছিয়া একত্রিত করিয়া নিজের মস্তিষ্কের ভিতর জমা করিয়া ফেলিয়াছে ; মনুষ্য-স্বভাব, মনুষ্য-চরিত্র তাহার নন্দদর্পণ হইয়াছে। জগতের শিখিবার পদার্থ আর তাহার কিছুই নাই ; সব জ্ঞানিয়া ফেলিয়াছে, সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সত্যীত্বের জ্যোতি সে যেমন দেখিতে পায়, প্রশ্নের মহিমা সে যেমন বুঝিতে পারে, জগৎ আর যে কেহ তেমন সমঝদার আছে, অনুপমা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না।

অনু ভাবিল, সে একটি মাধবীলতা ; সম্প্রতি মঞ্জুরিয়া উঠিতেছে, এ অবস্থায় অসং সহকার-শাখা-বেগিটা না হইলে, ফোট ফোট কুঁড়িগুলি কিছুতেই পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিবে না। তাই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি নবীনকান্তি-সহকারে মনোনীত করিয়া লইল এবং দুই-চারি দিবসেই তাহাকে মন-প্রাণ জীবন-যৌবন সব দিয়া ফেলিল। মনে মনে মন দিবার বা নিবার সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু জড়াইয়া ধরিবার পূর্বে সহকারটার মতামতেরও ইবাং প্রয়োজন হয়। এইখানেই মাধবীলতা কিছু বিপদে পড়িয়া গেল। নবীন নীরোদকান্তকে সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে তাহার মাধবীলতা—সুটনোশুখ হইয়া পাড়াইয়া আছে ; তাহাকে আশ্রয় না দিলে এখনই কুঁড়ির ফুল লইয়া মাটিতে

লুটাইতে লুটাইতে প্রাণত্যাগ করিবে।

কিন্তু সহকার এত জানিতে পারিল না। না জানুক, অনুপমার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমতে গরল, সুখে দুঃখ, প্রশ্নে বিচ্ছেদ চিরপ্রসিদ্ধ, দুই-চারি দিবসে অনুপমা বিরহ-ব্যথায় জর্জরিত-তনু ইহা মনে মনে বলিল, হামিন্ তুমি আমাকে লও বা না লও, ফিরিয়া চাহ বা না চাহ, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ ব্যয় তাহাও স্বীকার, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ জন্মে না পাই, আর জন্মে নিশ্চয়ই পাইব; তখন দেখিবে, সতী-সাক্ষীর ক্রুদ্ধ বাহুতে কত বল।

অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, বাটীসংলগ্ন উদ্যানও আছে, মনোরম সরোবরও আছে; সেথা চাঁদও উঠে, পদ্মও ফুটে, কোকিলও গান গায়, মধুপও বজ্রার করে; এইখানে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। এলোচুল করিয়া অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া গায়ে ধূলি মাখিয়া প্রেমের যোগিনী সাজিয়া, সরসীর জলে কখনও মুখ দেখিতে লাগিল; কখনও নয়ন-জলে ভাসাইয়া গোলাপ-পুষ্প চুষন করিতে লাগিল; কখনও অঞ্চল পাতিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া হা-হতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল; আহা হে কটি নাই, শয়নে ইচ্ছা নাই, সাজসজ্জায় বিবহ বিরাগ, গল্প-ওজবে রীতিমত বিরক্তি—অনুপমা দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

দেখিয়া ওনিয়া অনুর জননী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন—এক বৈ মেয়ে নয়, তার আবার এ কি হইল? জিজ্ঞাসা করিলে সে কি-যে বলে, কেহ বৃষ্টিতে পারে না; ঠোটের কথা ঠোটেই মিলাইয়া যায়। অনুর জননী একদিবস জগবন্ধুবাবুকে বলিলেন, ওগো, একবার কি চেয়ে দেখবে না? তোমার একটি বৈ মেয়ে নয়, সে যে বিনি চিকিৎসায় মরে যায়।

জগবন্ধুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি হ'ল ওর?

তা জানিনে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ওনিয়া বলিলেন, অসুখ-বিসুখ কিছু নাই।

তবে এমন হয়ে যায় কেন? জগবন্ধুবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা কেমন করে জানব?

তবে মেয়ে আমার মরে যাক?

এ ত বড় মুশকিলের কথা, জ্বর নেই, বালাই নেই, শুধু শুধু যদি মরে যায় ত আমি কি ধবে রাখব?—গৃহিণী শুভমুখে বড়বধূমাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বৌমা, অনু আমার এমন করে বেড়ায় কেন? কেমন করে জানব মা?

তোমাদের কাছে কি কিছু বলে না? কিছু না।

গৃহিণী প্রায় কাদিয়া ফেলিলেন—তবে কি হবে? না খেয়ে না শুয়ে এমন করে সমস্তদিন বাগানে ঘুরে বেড়ালে ক'দিন আর বাঁচবে? তোরা বাছা যা হোক একটা বিহিত করে দে—না হলে বাগানেও পুকুরে একদিন ডুবে মরব।—বড়বৌ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, দেখে ওনে একটা বিয়ে দাও। সংসারের ভার পড়লে আপনি সব সেরে যাবে।

বেশ কথা, তবে আজই এ কথা আমি কর্তাকে জানাব।

কর্তা এ কথা ওনিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, কলিকাল! দাও—বিয়ে দিয়েই দেখ, যদি ভাল হয়।

পরদিন ঘটক আসিল। অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, তাহাতে রূপবতী, পাত্রের জন্য ভাবিতে হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটকঠাকুর পাত্র স্থির করিয়া জগবন্ধুবাবুকে সংবাদ দিলেন। কর্তা এ কথা গৃহিণীকে জানাইলেন; গৃহিণী বড়বৌকে জানাইলেন; ক্রমে অনুপমাও ওনিল।

দুই-একদিন পরে, একদিন দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে মিলিয়া অনুপমার বিবাহের গল্প করিতেছিল, এমন সময়ে স এলোচুলে, আলুখালু-বসনে একটা শুভ গোলাপফুল হাতে করিয়া ছবিটির মত আসিয়া পড়িল। অনুর জননী কন্যাকে দেখিয়া ইষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা যেন আমার যোগিনী সাজছেন।—বড়বৌঠাকুরনও একটু হাসিয়া বলিল, বিয়ে হলে কোথায় সব চলে যাবে। দুটো-একটা ছেলে-মেয়ে হলে শু কথাই নেই।—অনুপমা চিত্তার্ণবতার ন্যায় সকল কথা ওনিতে লাগিল। বৌ আবার বলিল, মা, ঠাকুরবির বিয়ের কবে দিন ঠিক হ'ল?

দিন এখনো কিছু ঠিক করা হয়নি। ঠাকুরজামাই কি পড়েন? এইবার বি. এ. দেখেন?

তবে ত বেশ ভাল বর। তাহার পর একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, দেখতে কিছু খুব ভাল

না হলে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।

কেন পছন্দ হবে না? জামাই আমার বেশ দেখতে।

এইবার অনুপমা একটু গ্রীবা বক্র করিল; ঈশৎ হেলিয়া পদনখ দিয়া মুক্তিকা খনন করিবার মত করিয়া নখ বুড়িতে বুড়িতে বলিল, বিবাহ আমি করব না।

জননী ভাল শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মা?

বড়বৌ অনুপমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাকুরঝি বলছে, ও কখনও বিয়ে করব না।

বিয়ে করবে না? না।

না করুক গে! অনুর জননী মুখ টিপিয়া একটা হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী চলিয়া যাইলে বড়বধু বলিল, তুই বিয়ে করবি নে?—

অনুপমা পূর্বমত গম্ভীরমুখে বলিল, কিছুতেই না।

কেন?

যাকে তাকে গছিয়ে দেওয়ার নামই বিবাহ নয়! মনের মিল না হলে বিবাহ করাই ভুল।

বড়বৌ বিস্মিত হইয়া অনুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, গছিয়ে দেওয়া আবার কি লা? গছিয়ে দেবে না ত কি মেয়েমানুষে দেখে শুনে পছন্দ করে বিয়ে করবে?

নিশ্চয়!

তবে তোমার মতে আমার বিয়েটাও ভুলে হয়ে গেছে? বিয়ের আগে ত তোমার দাদার নাম পর্যন্ত আমি শুনিনি।

সবাই কি তোমার মত?

বৌ আব একবার হাসিয়া বলিল, তোমার কি তবে মনের মানুষ কেউ জুটেছে নাকি?

অনুপমা বধ্যাকুরানীর সহাস্য বিদ্রুপে মুখখানি পৰ্বাপেক্ষা চতুর্গুণ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌ, ঠাট্টা করছ নাকি? এখন কি বিদ্রূপের সময়?

কেন লো—হয়েচে কি?

হয়েচে কি? তবে শোন—অনুপমার মনে হইল, তাহার সম্মুখে তাহার স্বামীকে বধ করা হইতেছে—সহসা কতলু খাঁর দুর্গে ভগ্নমঞ্চ-সম্মুখে বিমলা ও বীলেন্দ্র সিংহের দৃশ্য তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। অনুপমা ভাবিল, তাহার যাহা পারে, সে কি তাহা পারে না? স্ত্রী স্ত্রী জগতে কাহাকে ভয় করে? দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অনৈসর্গিক প্রভায় ধকধক করিয়া হু হুয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে অঙ্গলখানা কোমরে জড়াইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া বড়বধু তিন হাত শিঁছাইয়া গেল। নিমেষে অনুপমা পার্শ্ববর্তী খাটের বুরো বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া উর্ধ্বমুখে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, প্রভু, স্বামী, শ্রাণনাথ, জগৎসমীপে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, তুমিই আমার শ্রাণনাথ, প্রভু, তুমি আমার, আমি তোমার! এ খাটের বুরো নয়, এ তোমার পদযুগল—আমি ধর্ম সাক্ষী করে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি, এখনও তোমার চরণ স্পর্শ করে বলছি—এ জগতে তুমি চাড়া অন্য কেউ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না; কার সাধ্য শ্রাণ থাকতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে। মা গো, জগৎজননী—

বড়বধু চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল—ও মা দেখ গে, ঠাকুরঝি কেমন খারাপ করে!

দেখিতে দেখিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। বৈতাকরনের চীৎকার বাহির পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল—কি হয়েছে—হল কি? কর্তা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন। কর্তা-গিন্নীতে, পুত্র-পুত্রবধুতে, দাস-দাসীতে মুহূর্তে ঘরে ভিড় হইয়া গেল। অনুপমা মুর্ছিত হইয়া খাটের কাছে পড়িয়া আছে। গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, অনুর আমার কি হ'লো? ডাক্তার ডাক! জল আন! বাতাস কর!—ইত্যাদি চীৎকারে পাড়ার অর্ধেক প্রতিবাসী বাড়িতে জমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে চক্ৰবর্তীলন করিয়া অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, আমি কোথায় ?

তাহার জননী মুখের নিকট মুখ আনিয়া স্নেহে বলিলেন, কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ।—অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু মৃদু কহিল, ওঃ, তোমার কোলে। ভাবছিলাম আমি আর কোথাও কোন স্বপ্নরাজ্যে তাঁর সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি। দরবিগলিত অক্ষ তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। জননী তাহা মুহূর্ত্তে কাতর হইয়া বলিলেন, কেন কাঁচত মা ? কার কথা বলচ ? অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বড়বধু চন্দ্রাবাবুকে একপাশে ডাকিয়া বলিল, সবাইকে যেতে বল, আর কোনও ভয় নেই ; ঠাকুরঝি ভাল হয়েছে।

ক্রমশঃ সকলে প্রস্থান করিলে রাত্রে বড়বৌ অনুপমার কাছে বসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হ'স ?

অনুপমা চক্ৰ মুদ্রিত করিয়া কহিল, সুখ-দুঃখ আমার কিছুই নেই ; সেই আমার বামী—

তা ত বুঝি—কিন্তু কে সে ?

সুরেশ ! সুরেশই আমার—

সুরেশ ? রাখাল মজুমদারের ছেলে ?

হাঁ, সে-ই। —রাত্রে গৃহিণী এ কথা শুনিলেন। পরদিন অমনি মজুমদারের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুরেশের জননীকে বলিলেন, তোমার ছেলেব সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। সুরেশের জননী হাসিয়া বলিলেন, মন্দ কি !

ভাল-মন্দর কথা নয়, দিতেই হবে।

তবে সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। সে বাড়িতেই আছে ; তার মত হলে কর্তার অমত হবে না।

সুরেশ বাড়ি থাকিয়া তখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—একমুহূর্ত্ত তাহার এক বৎসর। তাহার মা বিবাহের কথা বলিলেন, সে কানেই তুলিল না। গৃহিণী আবার বলিলেন, সুরো, তোকে বিয়ে করতে হবে।

সুরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, তা ত হবেই, কিন্তু এখন কেন ? পড়ার সময় ও-সব কথা ভাল লাগে না।

গৃহিণী অগ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না না—পড়ার সময় কেন ? এগজামিন হয়ে গেলে বিয়ে হবে। কোথায় ?

এই গাঁয়ে জগবন্ধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে।

কি ? চন্দ্রর বোনের সঙ্গে ? যেটাকে খুকী বলে ডাকত ?

খুকী বলে ডাকবে কেন—তার নাম অনুপমা।

সুরেশ অঙ্গ হাসিয়া বলিল, হাঁ অনুপমা ! দূর তা—দূর সেটা ভারী কুৎসিত।

কুৎসিত হবে কেন ? সে বেশ দেখতে।

তা হোক বেশ দেখতে ; এক জায়গায় খণ্ডরবাড়ি, বাগের বাড়ি আমার ভাল লাগে না। কেন, তাতে আর দোষ কি ?

দোষের কথাই কাজ নেই, তুমি এখন বাও মা, আমি একটু পড়ি ; কিছুই এখনো হয়নি।

সুরেশের জননী কিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সুরো ত এক গাঁয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। কেন ?

তা ত জানিনে ?

অনুর জননী মজুমদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিলেন, তা হবে না তাই। এ বিয়ে তোমাকে নিতে হবে।—

ছেলের অমত, আমি কি করব বল ?

না হলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

তবে আজ থাক। কাল আর একবার বুঝিয়ে দেখব—যদি মত করতে পারি।

অনুর জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জগবন্ধুকে বলিলেন, ওদের সুরেশের সঙ্গে যাতে অনুর আমার বিয়ে হয়, তা কর।

কেমন বল দেখি? রায়গ্রামে ত একরকম সব ঠিক হয়েছে। সে সম্বন্ধ আবার ভেঙ্গে কি হবে? কারণ আছে?

কি কারণ?

কারণ কিছু নয়; কিন্তু সুরেশের মত অমন রূপে-গুণে ছেলে কি পাওয়া যাবে? আর ও, আমার একটিমাত্র মেয়ে, তার দূরে বিয়ে দেব না। সুরেশের সঙ্গে হলে যখন বুশি দেখতে পাব।

আচ্ছা, চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়—নিশ্চিত দিতে হবে।

কর্তা নয় নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—তাই হবে গো।

সন্ধ্যার পর কর্তা মজুমদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহীণীকে বলিলেন, বিয়ে হবে না।

সে কি কথা?

কি করব বল? ওরা না দিলে ত আমি জোর করে ওদের বাড়িতে মেয়ে দিয়ে আসতে পারিনে।

দেবে না কেন?

এক গায়ে বিয়ে হয়—ওদের মত নয়।

গৃহীণী কপালে করাম্বা করিয়া বলিলেন, আমার কপালের দোষ! পরদিন তিনি পুনরায় সুরেশের জনমীর নিকট আসিয়া বলিলেন, দিদি, বিয়ে দে!

আমাব ত ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলের মত হয় কৈ?

আমি লুকিয়ে সুরেশকে আরো পাঁচ হাজার টাকা দেব।

টাকার লোভ বড় লোভ। সুরেশের জননী এ কথা, সুরেশের পিতাকে জানাইলেন। কর্তা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, সুরেশ, তোমাকে এ বিবাহ করতেই হবে।

কেন?

কেন আবার কি? এ বিবাহে তোমার গর্ভধারিণীর মত, আমারও নত; সঙ্গে সঙ্গে একটু কারণও হয়ে পড়েছে।—সুরেশ নতমুখে বলিল, এখন পড়াশুনার সময়—পরীক্ষার ক্ষতি হবে।

তা আমি জানি বাপু, পড়াশুনার ক্ষতি করে তোমাকে বলছি না। পরীক্ষা শেষ হলে বিবাহ করো। যে আজ্ঞা।

অনুর জননীর আনন্দের সীমা নেই। এ কথা তিনি কর্তাকে বলিলেন। দাসদাসী সকলকেই মনের আনন্দে এ কথা জানাইয়া দিলেন।

বড়বৌ অনুপমাকে ডাকিয়া বলিল, ওলো! বর যে ধরা দিয়েছে।

অনু সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা আমি জানতাম।

কেমন করে জানলি? চিঠিপত্র চলত নাকি?

প্রেম অস্ত্রধারী! আমাদের চিঠিপত্র অস্ত্রে চলত।

ধনি মেয়ে তুই!—অনুপমা চলিয়া যাইলে বড়বধূঠাকুরানী মদ মদু বলিল, পাকামি গুনলে গা জ্বালা করে! আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে খেঁচ খেঁচাতে এলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভালবাসার ফল

দুর্লভ বসু বিস্তর অর্থ রাখিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার বিশ্বেশ্বরীয়ার একমাত্র পুত্র ললিতমোহন শ্রদ্ধাশাস্তি সমাপ্তি করিয়া একদিন স্কুলে যাইয়া মাস্টারকে বলিল, মাস্টারমশায়, আমার

নামটা কেটে দিন।

কেন বাপু?

মিথ্যে পড়ে-ওনে কি হবে? বেজন্য পড়াশুনা, তা আমার বিস্তর আছে। বাবা আমার জন্যে অনেক প'ড়ে রেখে গিয়েছেন।—মাস্টার চকুটিশিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, তবে আর ভাবনা কি? এইবার চরে খাও গে। এইখানেই ললিতমোহনের বিলাভাস ইতি হইল।

ললিতমোহনের কাঁচা বরস, তাহাতে বিস্তর অর্থ, কাজেই স্কুল ছাড়িবারাত্র বিস্তর বন্ধুও ছুটিয়া গেল। ক্রমে তামাক, সিঁছি, গাঁজা, মদ, পায়ক, গারিকা ইত্যাদি একটির পর একটি করিয়া ললিতমোহনের বৈঠকখানা পূর্ণ করিল। এদিকে শিভসংকিত অর্থরানিও জলবৎ ঢেউ খেলিয়া তরতর করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার জননী কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক বুকাইলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। একদিন ঘৃণিত-লোচনে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিল, মা, এখন আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও। মা বলিলেন, একটি পসর্যাও আমার নেই।

ললিতমোহন দ্বিতীয় বাক্যবায় না করিয়া একটা কুড়ুল লইয়া জননীর হাতবার চিরিয়া ফেলিয়া পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

পরদিন পুত্রের হস্তে লোহার সিন্দূকের চাবি দিয়া বলিলেন, বাবা, এই লোহার সিন্দূকের চাবি নাও; তোমার বাপের টাকা যেমন ইচ্ছা খরচ করো, আর আমি বাধা দিতে আসব না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি গেলে তোমার চোখ ফোটে।

ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় যাবে?

তা জানিনে। আত্মঘাতী হলে কোথায় যেতে হয় তা কেউ জানে না, তবে ওনেছি সদগতি হয় না। তা কি করব বল, আমার যেমন কপাল!

আত্মঘাতী হবে?

না হলে আর উপায় কি? তোমাকে পেটে ধরে আমার সব সুখই হল। এখন নিতি নিতি তোমার লাগি-কাঁটা খাওয়ার চেয়ে যমদূতের আগুনকণ্ড ভাল।

ললিতমোহন জননীকে চিনিত। সে বিলম্ব জ্ঞানিত যে, তাহার জননী মিথ্যা ভয় দেখাইবার লোক নহেন; তখন কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পা ছড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা, তুমি আমাকে মাপ কর, এমন কাজ আর কখন করব না। তুমি থাক, তুমি যেও না।

জননী রুদ্ধভাবে বলিলেন, তাও কি হয়? তোমার বন্ধুবান্ধব—তারা সব যাবে কোথায়?

আমি কাউকে চাইনে। আমি টাকাকড়ি, বন্ধুবান্ধব কিছুই চাইনে, শুধু তুমি থাক।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

কেন মা, আমি তোমার মন্দ সন্তান, তা বলে অবিশ্বাসের কাজ কি কখনও করেছি? তুমি এখন থেকে ইচ্ছা-সুখে যা দেবে, তার অধিক এক পয়সাও চাব না।

ইচ্ছা-সুখে তোমাকে এক পয়সাও দিতে ইচ্ছা হয় না—কেননা, এই এক বৎসর পেড় বৎসরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েছ, তার অর্ধেকও কখনও তোমার জীবনে উপার্জন করতে পারবে না।

তুমি আমাকে কিছুই দিও না।

জননী কোমল হইলেন—না, অতটা তোমার সবে না, আমিও তা ইচ্ছে করিনে। মাসে এক শ' টাকা গেলে তোমার চলবে কি?

রহস্যম্।

তবে তাই হোক।

দুই-একদিনের মধ্যেই তার বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন দুই-একজনের বাগীতে ডাকিতে গেল; কেহ বলিল, কাল যাব; কেহ বলিল, আজ কাজ আছে। কলভ:

কেহই আর আসিল না। এখন সে সম্পূর্ণ একা। একা মদ খায়, একা ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার মনে করিল, আর মদ খাইবে না ; কিন্তু সময় কিরাপে কাটিবে? কাজেই মদ ছাড়া হইল না। একটা পথে সে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত ; এ পথটা জগবন্ধুবাবুর বাগানের পার্শ্ব দিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন বলিয়া মদ খাইয়া এখানেই বেড়াইবার অধিক সুবিধা হইত। মাতাল বলিয়া তাহার গ্রামময় অখ্যাতি ; কাহারও বাড়িতে যাওয়া ভাল দেখায় না—কাজেই মত খাইয়া নিজের সঙ্গে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইত।

আজকাল তাহার আর একজন সঙ্গী জুটিয়াছে—সে অনুপমা। আসিতে বাহিতে সে প্রায়ই দেখে, তাহারই মত অনুপমাও বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। অনুপমাকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজকাল তাহাতে যেন একটু নতনত্ব দেখিতে পায়। জগবন্ধুবাবুর বাগানের প্রাচীরের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেইখানে একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দেখে, অনুপমা উদ্যানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তরুতলে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, কখনও বা ফুল তুলিতেছে, এক-এক সময় বা সরসীর জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া বালিকা-সুলভ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে তাহার বেশ লাগে ; ইতস্ততঃ-বিস্তৃপ্ত চুলগুলি, অযত্নরস্কিত দেহলতা, আলুথালু বসন-ভূষণ ও সকলের উপর মুখখানি তাহার মদের চোখে একটী পদ্মফুলের মত বোধ হইত। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, জগতে সে অনুপমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। রাত্রি হইলে বাড়িতে গিয়া শয়ন করে, যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, ততক্ষণ অনুপমার মুখই মনে পড়ে। স্বপ্নেও কখনও কখনও তাহার অনিন্দসুন্দর বদনমণ্ডল হৃদয়ে উল্লসিত উঠে।

এমনই করিয়া কতদিন যায়। জগবন্ধুবাবুর উদ্যানের সেই ভগ্ন অংশটিতে বৈকাল হইতে বসিয়া থাকা আজকাল তাহার নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক নহে, অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল যে, অনুপমাকে বাস্তবিকই অতিশয় অধিক রকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু এরূপ ভালবাসায় লাভ নাই—সে জানিত, সে মাতাল ; সে অপদার্থ মূর্খ ; সে সকলের ঘৃণিত জীব—অনুপমার কিছুতেই যোগ্য পাত্র নহে। শত চেষ্টাতেও তাহাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে আর এমন করিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ কি? কাল হইতে আর আসিবে না। কিন্তু থাকিতে পারিত না—সূর্য অস্তগত হইলে সে মদটুকু খাইয়া সেই ভাঙ্গা পাঁচিলটির উপর আসিয়া বসিত। তবে ভিতরে একটা কথা আছে—কাহাকেও ভালবাসিলে মনে হয়, সেও বুঝি আমাকে ভালবাসে ; আমাকে কেন বাসিবে না? অবশ্য এ কথা প্রতিপন্ন করা যায় না।

একদিন ললিতমোহন প্রাচীরে উঠিয়াছে। এমন সময় চন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল।

চন্দ্রবাবু দ্বারবানকে হাঁকিয়া বলিলেন,—কো পাকড়ো।

দ্বারবান প্রথমে বুঝিতে পারিল না কাহাকে ধরিতে হইবে, পরে যখন বুঝিল, ললিতবাবুকে তখন সেলাম করিয়া তিন হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রবাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—কো পাকড়কে থানামে দেও।

দ্বারবান অধা বাঙলা অধা হিন্দীতে বলিল, হামি নেহি পারবে বাবু।

ললিতমোহন ততক্ষণ ধীরে ধীরে প্রাচীর উপর হইয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে চন্দ্রবাবু বলিলেন, কাছে নেহি পাকড়ো—দ্বারবান চূপ করিয়া রহিল। কখন মালী ললিতকে বিলক্ষণ চিনিত, সে বলিল, ও বেটা ভোজপুত্রীর সাধা কি ললিতবাবুকে ধরে? ওর মত চারটে দারোয়ানের সাধা ওর এক ঘূষিতে ভেসে যায়।

দ্বারবানও তাহা অস্বীকার করিল না, বলিল, বাবু, নোকরি করনে আয়া, না জান দেনে আয়া?

চন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়াবিদ্যার পাত্র নহেন। তিনি ললিতের উপর পূর্ব হইতেই বিলক্ষণ চটা ছিলেন, এখন সময় পাইয়া, সাক্ষী জুটাইয়া অনধিকার-প্রবেশ এবং আরও কত কি অপরাধে আদালতে নালিশ করিলেন। জগবন্ধুবাবু ও তাহার স্ত্রী উভয়েই এই মকদ্দমা করিতে নিবেদন করিলেন ; কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই ওলিলেন না। বিশেষ মর্মপীড়িতা অনুপমা জিদ করিয়া বলিল যে, পানীকে শাস্তি না দিলে

ভাষার মন কিছুতেই সুস্থির হইবে না।

ইন্সপেক্টর বাটিতে আসিয়া অনুপমার এজাহার লইল। অনুপমা সমস্তই ঠিকঠাক বলিল। শেষে এমন পাড়ছিল যে, ললিতের জননী বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াও পুত্রকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তিন বৎসর ললিতমোহনের সত্ৰম কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার একেবারে প্রথম হইয়াছে। গ্রামময় সুখ্যাতির একটা স্রোত শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনুপমার জননীর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে সুরেশের জননীকে গিয়া বলিলেন, নিজের কথা নিজে বলতে নাই, কিন্তু দেখ দেখি আমার মেয়ের পর।

সুরেশের মা সহাস্যে বলিলেন, তা ত দেখছি।

একবার বিয়ে হোক, তারপর দেখিস—তোরা ছেলে রাজা হবে। অনু যখন জন্মায় তখন একজন গণকর এসে গুণে বলেছিল যে, এ মেয়ে রানী হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকেনি, থাকবে না ; যত সুখ তোমার মেয়ের হবে।

কে বলেছিল?

একজন সম্মানী।

কিন্তু তুমি তোমার জামাইকে একখানা বাড়ি কিনে দিও।

তা দেব না? চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলে বলেই জানি, কিন্তু অনুরও ত কঠোর অর্থক বিষয় পাওয়া উচিত, আমি বেঁচে থাকলে তা পাবেও।

তাই হোক, ওরা রাজা-রানী হয়ে সুখে থাক—আমরা যেন দেখে মরি।—দুইদিন পরে রাখাল মজুমদার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, এই বৈশাখে তোমার বিবাহের দিন স্থির করলাম।

এখন বিবাহ হয়, আমার একেবারে ইচ্ছে নয়। আমি Gilchrist Scholarship পেয়েচি, তাতে আমি ইচ্ছা করলে বিলাতে গিয়ে পড়তে পারি।

পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অমন কথা আর মুখে এনো না।

বিনা পরসায় যখন এ সুবিধা পেয়েচি, তখন দোষ কি?

রাখালবাবু এ কথায় একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন—নাস্তিক বেটা! দোষ কি? পরের পরসায় যদি বিব পাওয়া যায় ত কি খেতে হবে?

সে-কথায় এ-কথায় অনেক প্রভেদ।

প্রভেদ আর কোথায়? একদিকে জাত শোয়ান, স্নেহ হওয়া, আর অপরদিকে বিবভোজন, ঠিক এক নয় কি? চুল চুল মিলে গেল না কি?

সুরেশ আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্তুরে গ্রহণ করিল। সে চলিয়া যাইলে রাখালবাবু আপনা-আপনি হাসিয়া বলিলেন, বেটা পাভা-দুই ইংরেজী পড়ে আমাদের সঙ্গে ভর্ক করতে আসে। কেমন কথাটা বললাম—পরের পরসায় বিব পেলো কি খেতে হবে? বাছাধন আর দ্বিতীয় কথাটি বলতে পারলে না। এ অকটা যুক্তি কি ও কাটতে পারে।

বিবাহের সমস্ত পাকা-রকম স্থির হইয়া যাইলে বড়বু একদিন অনুপমাকে বলিলেন, কি লো! বরের সুখ্যাতি যে গ্রামে ধরে না।

অনুপমা মুখ হাসিয়া বলিল, যার সতীসাক্ষী স্ত্রী, জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুক্ত থাকে। তবু ত এখনো বিয়ে হয়নি লো!

বিবাহ আমাদের অনেকদিন হয়েছে, জগৎ জানে না পটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে কখনো আমাদের পূর্ণিলেন হয়ে গিয়েছে।

বড়বু অঙ্গ হাসিল, ওঁত ঈষৎ কুচিচ করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, এ কথা আর কোথাও বলিস নে, আমরা বুড়ো দাদী, আমাদের ত বলা দূরে থাক—এমনথারা ওনলেও লজ্জা করে ; সব কথাই তুই কেন খিরেটরে আঁট করতে থাকিস। এমন করলে লোকে পাগল কলবে যে।

আমি প্রেমে পাগল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ

আজ এই বৈশাখ। অনুপমার বিবাহ-উৎসবে আজ গ্রামটা তোলপাড় হইতেছে। জগবন্ধুবাবুর বাটীতে আজ ভিড় ধরে না। কত লোক যাইতেছে, কত লোক হাঁকাহাঁকি করিতেছে। কত খাওয়ান দাওয়ানর ঘটা, কত বাজনা-বাস্যের ধুম। যত সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, ধুমধাম তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; সন্ধ্যা-লগ্নেই বিবাহ, এখনই বর আসিবে—সকলেই উৎসাহে আগ্রহে উদ্ভূত হইয়া আছে।

কিন্তু বর কোথায়? রাখালবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার প্রাকালেই কলরব বাধিয়া উঠিয়াছে, সুরেশ গেল কোথায়? এখানে খোঁজ, ওখানে খোঁজ, এদিকে দেব, ওদিকে দেখ। কিন্তু কেহই সুরেশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কুসংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হয় না, বজ্রগ্নির মত এ কথা জগবন্ধুবাবুর বাটীতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। বাড়িসুদ্ধ লোক সকলেই মাথায় হাত দিয়া বলিয়া পড়িল; সে কি কথা!—আটটার সময় বিবাহের লয়, কিন্তু নয়টা বাজিতে চলিল, কোথাও বরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জগবন্ধুবাবু মাথা চাপড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৃহিণী কাদিয়া আসিয়া তাঁহাব নিকটে পড়িলেন, কি হবে গো?

কর্তব্য তখন অর্থক্ষিপ্তাবস্থা। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হবে আমার শ্রাদ্ধ—আর কি হবে? এই হতভাগা মেয়ের জন্য বৃদ্ধবয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল, এখন একঘরে হয়ে থাকতে হবে। কেন মরতে বুড়ো বয়সে তোমাকে আবার বিয়ে করেছিলাম, তোমারই জন্য আজ এই অপমান। শাস্ত্রেরি আছে, স্ত্রীবৃদ্ধিঃ শ্রলয়ঙ্করী। তোমার কথা শুনে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেচি। যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

আহা! গৃহিণীর দুঃখের কথা বলিয়া কাজ নাই। এদিকে এই, আর ওদিকে আর এক বিপদ। অনুপমা ঘন ঘন মূর্ছা যাইতেছে।

এদিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে—দশটা, এগারোটা, বারোটা করিয়া ক্রমশঃ একটা দুইটা বাজিয়া গেল; কিন্তু কোথাও সুরেশের সন্ধান হইল না।

সুরেশকে পাওয়া যাক আর না যাক, অনুপমার বিবাহ কিন্তু দিওঁ হইবে। কেননা আজ রাতে বিবাহ না হইলে জগবন্ধুবাবুর ভাতি যাইবে।—রাত্রি আশ্রাজ্জ তিনটার সময় পঞ্চাশবর্ষীয় কাসরোগী রামদুলাল দস্তকে পাডার পাঁচজন—জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।

অনুপমা যখন শুনিল, এমনি করিয়া তাহার মাথা ঝাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মূর্ছা ছাড়িয়া দিয়া জননীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল—ও মা! আমার রক্ষা কর, এমন করে আমার গলায় ছুরি দিও না। এ বিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হব।

মা কাদিয়া বলিলেন, আমি কি করব মা!

মুখে যাহাই বলুন না, কন্যার দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই কাদিয়া কাটিয়া আবার স্বামীর কাছে আসিলেন—ওগো, একবার শেষটা ভেবে দেখ, এ বিয়ে দিলে মেয়ে আমার বিধি থাকবে।

কর্তা কোন কথা না কহিয়া একেবারে অনুপমার নিকটে আসিয়া গভীরভাবে বলিলেন, ওঠো, ভোর হয়ে যায়।

কোথায় যাব কণা?

এখনই সম্প্রদান করব।

অনুপমা কাদিয়া ফেলিল—বাবা, আমাকে মেরে ফেল, আমি বিধি বাব।

বা ইচ্ছে হলে কাল খেয়ে মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তারপর বেমন খুশি করো, বিধি খেও, জলে ডুবে মরো, আমি একবারও ব্যর্থ করব না।

কি নিদারণ কথা! এইবার যথার্থই অনুপমার ভিতর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল—বাবা। আমায় রক্ষা কর।—কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোন কথাই খাটিল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অগবত্বাবু সেই রাতেই বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হস্তে অনুপমাকে সম্ভ্রমণ করিলেন।

বহুকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ নাই। দুইখানি পুরাতন ইটকনির্মিত ঘর, একটু শাক-সবজির বাগান—ইহাই দম্ভজীর সাংসারিক সম্পত্তি। বহুক্রমে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বিবাহ করিয়া পরদিন অনুপমাকে বাড়ি আনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনেক ষাণ্ডাঘা আশিল; অনেক দাসদাসী আশিল—কোন ক্রেশ নাই, ছয়-সাতদিন তাঁহার পরম সুখে অভিবাহিত হইল। বড়লোক খণ্ডর—আর তাঁহার কোনও ভাবনা নাই; বিবাহ করিয়া কপাল ফিরিয়াছে। কিন্তু অনুপমার স্বতন্ত্র কথা; আর দিন-দুই থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া দাসদাসীরাও গোপনে চক্ৰ মুছিল।

বাড়ি গিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এ পরামর্শ অনুপমা স্বামিভবন হইতেই হির করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার যথার্থ মরিবার বাসনা হইয়াছে। অনেক রাতে সকলে নিদ্রিত হইলে সে নিঃশব্দে ষিড়কির দ্বার খুলিয়া, বাগানের পুকুরশীতল সোপানে আসিয়া বসিল। আজ তাহাকে মরিতে হইবে, মুখের মরা নয়, কাজের মরা মরিতে হইবে। অনুপমার মনে পড়িল, আর একদিন সে এইখানে মরিতে গিয়াছিল, সেও অধিকদিন নয়, কিন্তু তখন মরিতে পারে নাই; কেননা একজন ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আজ সে কোথায়? জেলখানায় কয়েদ খাটিতেছে। কোন অপরাধে? শুধু বলিতে আসিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালবাসে। কে জেলে দিল? চন্দাবু। কেন? তাহাকে দেখিতে পারিত না বলিয়া, সে মাতাল বলিয়া, সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু অনুপমা কি বাঁচাইতে পারিত না? পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই, বরং জেলে দিতে সহায়তাই করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, ললিত কি যথার্থই ভালবাসিত? হয়ত বাসিত, হয়ত বাসিত না। না বাসুক, কিন্তু, তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার কি ইষ্ট-সিদ্ধি হইয়াছে? জেলে পাথর ভাসিতেছে, ঘানি টানিতেছে, আরও কত কি নীচ কর্ম করিতে হইতেছে; ইহাতে হয়ত চন্দ্রাবুর লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি? সে দণ্ডিত না হইলে কি তাহাকে পাইতে পারিত?—যিনি এখন মনের আনন্দে নিজের উন্নতির জন্য জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছেন? অনুপমা সেইখানে বসিয়া বহুকাল ধরিয়া কাঁদিল, তাহার পর জেলে নামিল। এক হাঁটু, একবুক, গলা করিয়া, ক্রমশঃ ডুবন-জলে আসিয়া পড়িল। আশ মিনিট কাল জলতলে থাকিয়া অনেক জল খাইয়া সে আবার উপরে বাসিয়া উঠিল; আবার ডুব দিল, আবার ভাসিয়া উঠিল। সে সাতার দিতে জানিত, তাই সমস্ত পুকুরশীটা ভর তরল করিয়াও কোথাও ডুবন-জল মিলিল না। অনেকবার ডুব দিল, অনেক জলও খাইল, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না। সে দেখিল, মরিতে হিরসঙ্কল্প হইয়াও ডুব জিয়া, নিশ্বাস আটকাইয়া আসিবার উপক্রম হইলেই নিশ্বাস লইতে উপরে ভাসিয়া উঠিতে হয়। এইরূপে পুকুরশীটা সাতার কাটিয়া প্রায় নিশাশেষে যখন সে তাহার ক্লান্ত অবসর নিজীব দেহখানা কোনরূপে টানিয়া আনিয়া সোপানের উপর ফেলিল, দেখিল, যে-কোনও অবস্থায় যে-কোনও কারণেই হোক এমন করিয়া একটু একটু করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে।

পূর্বে সে বিরহ-ব্যথার জর্জরিতভনু হইয়া দিনে শতবার করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত, প্রাণটা রাখা না-রাখা নায়ক-নায়িকার একেবারে মুঠার ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধস্তাধস্তি করিয়াও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ সে বিলম্বিত বুকিল তাহাকে জন্মের মত বিদায় দেওয়া—তাহার একাদশবর্ষীয় বিহরবাথায় কুলাইয়া উঠে না।

ভোরবেলায় যখন সে বাটী আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপিতেছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনু, এত ভোরেই মেয়ে এলি মা? অনু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

এদিকে দম্ভহাশ্বর একরূপ চিরহরীরূপে খণ্ডর-ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম আমাই-আদর তাহার কতকটা মিলিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাও কম পড়িয়া আসিল। বড়িসুদ কেই প্রায় তাহাকে দেখিতে পারে না; চন্দ্রনাথবনু প্রতি কথায় তাহাকে ঠাট্টা-বিহুণ, অপদম্ভ, লালিত করেন। তাহার

একটু কারণও হইয়াছিল : একে ত চন্দ্রবাবুর হিসাপরবশ অন্তঃকরণ, তাহাতে আবার অকর্মণ্য জামাতা বলিয়া জগবন্ধুবাবু কিছু বিষয়-আশয় দিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। অনুপমা কখনও আসে না ; শাওঁঠাঁকুরানীও কখনও সে বিষয়ে তত্ত্ব লন না ; তথাপি রামদুলালের মনের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যত্ন-আত্মীয়তার তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার উপর দু'বেলা পরিতোষজনক আহার ঘটিতেছে, বৃদ্ধাবস্থায় দস্তমহাশয় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতেন। কিন্তু তাহার সুখ ভোগ করিবার অধিকদিনও আর বাকী ছিল না। একে জীর্ণ-শীর্ণ শরীর, তাহার উপর পুরাতন সখা কাসরোগ অনেকদিন হইতে তাহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসরই শীতকালে তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিত ; এবারও শীতকালে বিষম টানটানি করিতে লাগিল। জগবন্ধুবাবু দেখিলেন, যত্না রামদুলালের অস্থিমজ্জায় প্রাণ গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগায়ে সূচিকিৎসা হইবে না জানিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কিছুদিন সূচিকিৎসার পর সর্দা-নাফী অনুপমার কল্যাণে দুটি বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সদানন্দ রামদুলাল সংসার-ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈধবা

তথাপি অনুপমা একটু কঁদিল। স্বামী মরিলে বাঙালীর মেয়েকে কাদিতে হয়, তাই কঁদিল। তাহার পর স্ব-ইচ্ছায় সাদা পরিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। জননী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, অনু, তোর এ বেশ ত আমি চোখে দেখতে পারি না, অন্ততঃ হাতে একজোড়া বালাও রাখ।

তা হয় না, বিধবার অলঙ্কার পবতে নেই।

কিন্তু তুই কাঁচ মেয়ে।

তাহা হোক, বাঙালীর মেয়ে বিধবা হইলে কাঁচ বুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়। জননী আর কি বলিলেন? শুধু কাদিতে লাগিলেন। অনুপমার বৈধবো লোকে নূতন করিয়া শোক করিল না। দুই-এক বৎসরেই সে যে বিধবা হইবে তাহা সকলেই জানিত। কেহ বলিল, মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে কি আর সম্ভবা থাকে? কর্তাও এ কথা জানিতেন, গৃহিণীও বুঝিতেন, তাই শোকটা নূতন করিয়া হইল না, শুনিল না, তথাপি অনুপমা কঠোর বৈধবা-ব্রত পালন করিতে লাগিল। রাত্রে জলস্পর্শ করে না, দিনে একমুষ্টি স্বহস্তে সিদ্ধ করিয়া লয়, একাদশীর দিন নিরাম্বু উপবাস করে। আজ পূর্ণিমা, কাল অমাবস্যা, পরশু শিবরাত্রি, এমন করিয়া মাসের পনের দিন সে কিছু খায় না। কেহ কোনও কথা বলিলে বলে, আমার ইহকাল গিয়াছে, এখন পরকালের কাজ করিতে দাও। এত কিন্তু সহিবে কেন? উপবাসে অনিয়মে অনুপমা শুকায় অধিক হইয়া গেল। দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার সে মরিয়া যাইবে। কর্তাও ভাবিলেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই একদিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, অনুর আবার বিয়ে দি।—গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি হয়? ধর্ম যাবে যে!

অনেক ভেবে দেখলুম, দু'বার বিয়া দিলেই ধর্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্মের সঙ্গে এ বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করে খুন করলেই ধর্মহানির সম্ভাবনা।

তবে দাও।

অনুপমা কিন্তু এ কথা শুনিয়া খাড়া নাড়িয়া দৃশ্বরে বলিল, তা হয় না।

কর্তা তখন নিজে অনুকে ডাকিয়া বলিলেন, খুব হয় মা।

তা হলে আমার ইহকাল পরকাল—দুই কালই গেল।

কিছুই যায় নাই, যাবে না—বরং না হলেই যাবার সম্ভাবনা। মনে কর, তুমি যদি গুণবান পতিলাভ কর, তা হলে দুই কালেরই কাজ করতে পারবে।

একা কি হয় না?

শরৎ (প্রথম খণ্ড)—৫৭

না মা, হয় না। অত্যন্ত বাঙালীর ঘরের মেয়ের দ্বারা হয় না। ধর্মকর্মের কথা ছেড়ে দিয়ে সামান্য কোন একটা কর্ম করতে হলেই তামিকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় ; বামী ভিন্ন তেমন সাহায্য আর কে করতে পারে বল ? আরও, কি দোষে তোমার এত শাস্তি ?

অনুপমা আনতমুখে বলিল, আমার পূর্বজন্মের ফল।

গৌড়া হিন্দু জগবন্ধুবাবুর কর্ণে এ কথাটা খট্ করিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তাই যদি হয়, তবুও তোমার একজন অভিভাবকের প্রয়োজন ; আমাদের অবর্তমানে কে তোমাকে দেখবে ?

দাদা দেখবেন।

ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি না দেখে ? সে তোমার মার পেটের ভাই নয় ; বিশেষ, আমি যতদূর জানি, তার মনও ভাল নয়। অনুপমা মনে মনে বলিল, তখন বিষ খাব।

আরও একটা কথা আছে অনু, পিতা হলেও সে কথা আমার বলা উচিত—মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক একরকমই থাকবে, তা কেউ বলতে পারে না ; বিশেষ, যৌবনকালে প্রবৃত্তিগুলি সর্বদা বশ রাখতে মূনি-ঋষিরাও সমর্থ হন না।

কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুপমা কহিল, জ্ঞাত যাবে যে!

না মা, জ্ঞাত যাবে না—এখন আমার সময় হয়ে আসছে—চোখও ফুটেছে।

অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল, তখন জ্ঞাত গেল, আর এখন যাবে না! যখন চক্ষু কর্ণ বন্ধ করে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারও চক্ষু ফুটেছে—আমিও ভালরূপ প্রতিশোধ দেব।

কোনরূপে তাহাকে টলাইতে না পারিয়া জগবন্ধুবাবু বলিলেন, তবে মা, তাই ভাল ; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে চাই না। তোমার খাবার-পরবার ক্রেশ না হয়, তা আমি করে যাব। তার পর ধর্ম মন রেখে যাতে সুখী হতে পার, করো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রাবুর সংসার

তিন বৎসর পরে ঝালার হইয়াও ললিতমোহন বাড়ি ফিরিল না। কেহ বলিল, লজ্জায় আসিতো না। কেহ বলিল, সে গ্রামে কি আর মুখ দেখাতে পারে? ললিতমোহন নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে সহস্র একদিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী আনন্দে পুত্রের শিরশ্চূষন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন—বাবা, এবার বিবাহ করে সংসারী হও, যা কপালে ছিল তা ত ঘটে গিয়েছে, এখন সেজন্য আর মনে দুঃখ করো না। ললিতও যাহা হয় একটা করিবে স্থির করিল।

পাঁচ বৎসর পরে কিরিয়া আসিয়া ললিত গ্রামে অনেক পরিবর্তন দেখিল, বিশেষ দেখিল, জগবন্ধুবাবুর বাটীতে। কর্তা-গিন্নী কেহ জীবিত নাই। চন্দ্রনাথবাবু এখন সংসারের কর্তা, অনুপমা বিধবা হইয়া এইখানেই আছে, কারণ তাহার অন্যত্র স্থান নাই। পূর্বেই জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, পরে পিতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাবিয়াছিল, পিতা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কোনও তীর্থস্থানে থাকিবে এবং সেই টাকায় পুণ্যধর্ম, নিয়মব্রত করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু প্রাক্কশান্তি হইলে উইল দেখিয়া সে মর্মাহত হইল, পিতা কেবল তাহার নামে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহার বড়লোক, এ সামান্য টাকা তাহাঙ্গণের নিকট টাকাই নহে ; বাস্তবিক, এই অর্থে কাহারও চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহিত হইতে পারে না। গ্রামে অনেকেই কানাদুবা করিল, এ উইল জগবন্ধুবাবুর নহে, ভিতরে কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে কথায় ফল কি, নিরুপায় হইয়া অনুপমা চন্দ্রাবুর বাটীতেই রহিল।

লোকে বলে, পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রামে চিনতে পারা যায় না ; সংভাবিকও সেইরূপ পিতার জীবিতকাল পর্যন্ত চিনিতে পারা কঠিন। এতদিন পরে অনুপমা জানিতে পারিল, তাহার দাদা

চন্দ্রনাথবাবু কি চরিত্রের মানুষ। যত প্রকার অধমশ্রেণীর মানুষ সেখানে পাওয়া যায়, চন্দ্রনাথবাবু তাহাদের সর্বনিকৃষ্ট। হৃদয়ে একভিল দয়ামায়া নাই, চক্ষে একবিন্দু চামড়া পর্যন্ত নাই। অনুপমার এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি তাহার সহিত বেল্লপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতি কথায়, এমন কি উঠিতে বসিতে ভিন্নকৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিতেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনুপমাকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু আজকাল ত অধিক না দেখিতে পারিবার কারণ তিনিই ভাল জানেন। বড়বধূ পূর্বে তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু এখন তিনিও দেখিতে পারেন না। যখন অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল, যখন তাহার বাপ-মা বাঁচিয়াছিল, যখন তাহার একটা কথায় পাঁচজন ছুটিয়া আসিত, তখন তিনিও ভালবাসিতেন। এখন সে দুঃখিনী, আপনার বলিতে কেহ নাই, টাকাকড়ি নাই, পরের অন্ন না খাইলে দিন কাটে না, তাহাকে কে এখন ভালবাসিবে? কে এখন যত্ন করিবে? বড়বধূর তিন-চারিটি ছেলেমেয়ের ভার অনুর উপর; তাহাদিককে খাওয়াইতে হয়, স্নান করাইতে হয়, পরাইতে হয়, কাছে করিয়া শুইতে হয়, তথাপি কোনও বিষয়ে একটু ক্রটি হইলেই অমনি বড়বধূঠাকুরানী রাগ করিয়া রীতিমত পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেন। ইহা ভিন্ন অনুপমাকে নিত্য দু'বেলা চন্দ্রবাবুর জন্য দুই-চারিটা ভাল তরকারি রান্নািতে হয়; পাচক ব্রাহ্মণ তেমন প্রস্তুত করিতে পারে না। আর না হইলে চন্দ্রবাবুরও কিছু খাওয়া হয় না। একাদশীই হোক, আর দ্বাদশীই হোক, আর উপবাসই হোক, সে রান্না তাহাকে রান্নািতেই হইবে। বিধবা হইয়া অনুপমা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পঙ্কজ কলসি; এখন তাহাকে সে সময়টুকুও দেওয়া হয় না। একটু বিলম্ব হইলেই বড়বধূঠাকুরানী বলিয়া উঠেন, ঠাকুরবি, একটু হাত চালিয়ে নাও, ছেলেরা কাদছে—এখন পর্যন্ত কিছু খেতে পায়নি। অনুপমা যা-তা করিয়া উঠিয়া আসে, একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। একাদশীর দীর্ঘ উপবাস করিয়াও তাহাকে রাতে রন্ধন করিতে যাইতে হয়; তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে মাথা টিপটিপ করিতে থাকে, গা ঝিমঝিম করে, তবু কথা কহে না। অবস্থার পরিবর্তনে সহ্য করিবার ক্ষমতাও হয়। কেননা, জগদীশ্বর তাহা শিখাইয়া দেন—না হইলে অনুপমা এতদিন মরণ্য যাইত।

এ সংসারে তাহার অপেক্ষা দাসদাসীরা শ্রেষ্ঠ; জোর করিয়া তাহাদের দুটো বলিলে তাহারও দুটো ভোগের কথা বলিতে পারে, অন্ততঃ আমার মাহিনাপত্র চুকাইয়া দিন, বাড়ি যাই—এ কথাও বলিতে পারে কিন্তু অনু তাহাও বলিতে পারে না। সে বিনামূল্যে, কীতদাসী, মারো, দুটো, তাহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর কোথাও যাইবার জো নাই, সে বিধবা, সে বড়লোকের বন্যা। অনুপমার অবস্থা বৃদ্ধাইতে পারা যায় না, বৃদ্ধিতে হয়; বাঙালীর ঘরে পরাম্প্রদ্যাপিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বৃদ্ধিতে পরিবেন, অন্য না বৃদ্ধিতেই পারে।

আজ দ্বাদশী। সকাল সকাল স্নান করিয়া অনুপমা পূজা করিতে বসিল। তখনও পনের মিনিট হয় নাই, বড়বধূ ঘরের বাহির হইতেই একটু বড় গলায় বলিলেন, ঠাকুরবি, তোমার কি আজ সমস্তদিনে হবে না? এমন করে চলবে না বাপু। অনুপমা শিবের মাথায় জল দিতেছিল, কথা কহিল না; বড়বধূ তিনমিনিট পরে পুনর্বার ধুরিয়া আসিয়া সেইখান হইতেই চীৎকার করিলেন—অত পুণ্য ছালায় আঁটে না গে, অত পুণ্য করে না—এ অত পুণ্য-খর্ব্ব শখ থাকে ত বনে বনে গিয়ে কর গে, সংসারে থাকে অত কাড়াবাড়ি সইতে পারা যায় না। তথাপি অনুপমা কথা কহিল না।

বড়বধূ দ্বিগুণ চৈতন্য উঠিলেন—বলি, কেউ খাবে দাবে না—না?

অনুপমা হস্তস্থিত বিষপত্র নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আমার অসুখ হয়েছে, আজ আমি কিছুই পারব না।

পারবে না? তবে সবাই উপোস করুক?

কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই? ঠাকুরের কি হল?

ঠাকুর হয়েছে—আর উনি ঠাকুরের রান্না খেতে পারেন?

না পারেন—তুমি রেখে গে।

আমি রাঁধব? মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, একটা কবিরাজ চকিশ ঘণ্টা আমার লিছনে লেগে আছে—আর আমি আঙনের তাতে যাব?

অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, তবে সবাইকে উপোস করতে বল গে।

তাই যাই—তোমার দাদাকে এ কথা জানাই গে। আর তোমার অসুখ হবে কেন? এই নেয়ে-ধুয়ে এলে, এখনি গিলবে কুটবে, আর বড়ভাইকে একটু রেঁখে খাওয়াতে পার না?

না, পারিনে। বড়বৌ, আমি তোমাদের কেনা বাদী নই যে, যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি এ-সব কথা দাদাকে জানাব।

বড়বৌ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, তাই জানাও গে—তোমার দাদা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক! অনুপমা কিছুকণ শুদ্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, তা জানি, দাদা ভাল হলে আর তোমার এত সাহস!

কেন, তিনি করেছেন কি? যেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন—আবার কি করবেন! সত্যি সত্যি ও আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় মাথায় করে রাখতে পারেন না—এজ্ঞা আর মিছে রাগ করলে চলবে কেন?

সমস্ত বস্তুরই সীমা আছে। অনুপমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে।

সে এতদিন যাহা বলে নাই, আজ তাহা বলিয়া ফেলিল; বলিল, দাদা আমাকে খাওয়াবেন পরাবেন কি—যে বাপের টাকায় তিনি খান—আমি সেই বাপের টাকায় খাই।

বড়বৌ ক্রুদ্ধ হইল—তাই যদি হ'ত, তা হলে বাপ আর পথের কাঙাল করে রেখে যেত না।

পথের কাঙাল তিনি করে যাননি, তোমরাই করেছ। গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসঞ্চল রেখে যাননি। সে টাকা দাদা চুরি না করলে আজ আমাকে তোমার মুখনাড়া যেতে হ'তো না।

বড়বধূর মুখ প্রথমে শুকাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল—গ্রামসুদ্ধ সবাই জানে—উনি চোর? তবে এ কথা ওঁকে জানাব?

জানিও—আরও ব'লো যে, পাপের ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সেদিন এমনই গেল। অবশ্য এ কথা চন্দ্রবাবু শুনিতে পাইলেন; কিন্তু কোনরূপ উচ্চাচা করিলেন না।—চন্দ্রনাথবাবুর সংসারে ভোলা বলিয়া একজন ছোঁড়া মত ভূতা ছিল। পাঁচ-ছয় দিন পরে চন্দ্রবাবু একদিন তাহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। চীৎকার-শব্দে অন্যান্য দাসদাসীরা ছুটিয়া আসিল—তখনও অসম্ভব মার চলিতেছে। অনুপমা ঘরের ভিতর পূজা করিতেছিল, পূজা ফেলিয়া সে-ও ছুটিয়া আসিল। ভোলার নাক-মুখ দিয়া তখনও রক্ত ছুটিতেছিল। অনুপমা চীৎকার করিয়া উঠিল, দাদা কর কি—মরে গেল যে!

চন্দ্রবাবু বিচাইয়া উঠিলেন—আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেলব। তাকেও সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতাম, কিন্তু শুধু মেয়েমানুষ বলে তুই বেঁচে গেলি। আমার সংসারে এত পাপ আমি বরদাস্ত করব না। বাবা তোকে পাঁচ শ' টাকা দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে তুই আজই আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা।

অনুপমা কিছুই বুঝিতে পারিল না, শুধু বলিল, সে কি?

কিছুই নয়। আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূর হয়ে যাও। বাইরে গিয়ে যা খুশি কর গে।

অনুপমা সেইখানেই মুর্ছিত হইয়া গেল। দাসদাসীরা সকলেই এ কথা শুনি। কেউ মুখে কাপড় দিয়া হাসিল, কেহ হাসি চাপিয়া ভাল মানুষের মত সরিয়া গেল, কেহ বা ছুটিয়া অনুপমাকে তুলিওঁতে আসিল। চন্দ্রবাবু মৃতপ্রায় ভোলার মুখে আর একটা পদাঘাত করিয়া বাইরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ —শেষ দিন

আজ অনুপমার শেষ দিন। এ সংসারে সে আর থাকিবে না। জান হইয়া অবধি সে সুখ পায় নাই। ছেলেবেলায় ভালবাসিয়াছিল বলিয়া নিজের শান্তি নিজে ঘুচাইয়াছিল; অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি

করিয়াছিল বলিয়া বিধাতা তাহাকে একডিলও সুখ দেন নাই। যাহাকে ভালবাসিত মনে করিত, তাহাকে পাইল না ; যে ভালবাসিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়িয়া দিল। পিতা নাই, মাতা নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, ক্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন সতীত্বের সুশ, তাহাও ঈশ্বর কাড়িয়া লইতে বসিয়াছেন। তাই আর সে সংসারে থাকিবে না। বড় অভিমানে তাহার হৃদয় কাটিয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ নিশ্চিত কৌমুদী-রজনীতে খিড়কির দ্বার খুলিয়া, আবার—বার বার ডিনবার—পুঙ্খরিণীর সেই পুরাতন সোপানে আসিয়া উপকেশন করিল। এবার অনুপমা চালাক হইয়াছে। আর বার সত্তরশ-শিকটা তাহাকে মরিতে দেয় নাই, এবার তাহা বিফল করিবার জন্য কাঁকে কলসী লইয়া আসিয়াছে। এবার পুঙ্খরিণীর কোথায় ডুবন-জল আছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে—এবার নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে।

মরিবার পূর্বে পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখায়। ঘরবাড়ি, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, তারা, জল, ফুল, লতা, গুল্ম—সব সুন্দর হইয়া উঠে ; যেদিকে চাও সেইদিকেই মনোরম বোধ হয়। সব যেন অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে থাকে, মরিও না, দেখ আমরা কত সুখে আছি—তুমিও সহ্য করিয়া থাক, একদিন সুখী হইবে। না হয় আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাকে সুখী করিব ; অনর্থক ক্লান্তিদণ্ড আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না। মরিতে আসিয়াও মানুষ তাই অনেক সময় ফিরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া দেখে, জগতে তাহা একডিলও সুখ নাই, অসীম সংসারে দাঁড়াইবার একবিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে একজনও নাই, তখন আবার মরিতে চাহে, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ভিতর হইতে বলিতে থাকে, ছি ছি! ফিরিয়া যাও—এমন কাজ করিও না। মরিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হইল? কেমন করিয়া জানিলে ইহা আপেক্ষা স্মরণ ও গভীর দুঃখে পতিত হইবে না? মানুষ অমনি সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়ায়। অনুপমার কি এ-সব কথা মনে হইতেছিল না? কিন্তু অনুপমা তবুও মরিবে, কিছুতেই আর বাঁচিবে না।

পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথা মনে হইল। যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত। যাহারা তাকে ভালবাসিত, তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে। শুধু একজন এখনও জীবিত আছে। সে ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে পূজা গ্রহণ করে নাই এবং অপমানিত করিয়া তাড়িয়া দিয়াছিল। শুধু কি তাই? জেলে পর্যন্ত দিয়াছিল। ললিত সেখানে কত ক্রেশ পাইয়াছিল, হয়ত অনুপমাকে কত অভিসম্পাত করিয়াছিল, তাহার মনে হইল, নিশ্চিত সেই পাণেই এত ক্রেশ, এত যন্ত্রণা। সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাল হইয়াছে, মদ ছাড়াইছে, দেশের উপকার করিয়া অস্বাভাবিক যশ কিনিতেছে। সে কি আজও তাহাকে মনে করে? হয়ত ব'লে না, হয়ত বা করে—কিন্তু তাহাতে কি? তাহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তিনি কি তাহা শুনিয়াছেন? যখন গ্রামময় রটিবে যে, আমি কলঙ্কিনী হইয়া ডুবিয়াছি, কাল যখন আমার দেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, ছি ছি! কত ঘৃণায় তাহা শুনি কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে।

অনুপমা অঞ্চল দিয়া গলদেশে কলসী বাঁধিল। এমন সময় কে একজন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, অনুপমা!—অনুপমা চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক আবার ডাকিল। অনুপমার মনে হইল, এ স্বর আর কোথাও শুনিয়াছে, কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না। চূপ করিয়া বহিল।

অনুপমা আত্মহত্যা করো না।

অনুপমা কোনও কালেই ব্রীড়ানত লজ্জাবতী লতা নহে ; সে সাহস করিয়া বলিল, আমি আত্মহত্যা করব, আপনি কি করে জানলেন?

তবে গলায় কলসী বেঁধে কেন?

অনুপমা মৌন হইয়া রহিল। আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আত্মঘাতী হলে কি হয় জান?

অনন্ত নরক।

অনুপমা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কলসী খুলিয়া রাখিয়া বলিল, এ সংসারে স্থান নাই।

ভুলে গিয়েচ। আমি মনে করে দিছি। প্রায় ছ'বছর পূর্বে ঠিক এইখানে একজন তোমাকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে চেয়েছিল—স্মরণ হয়?

অনুপমা লজ্জার রক্তমুখী হইয়া বলিল, হয়।

এ সকল ত্যাগ কর।

আমার কলঙ্ক রটেছে—আমার বাঁচা হয় না।

মরলেই কি কলঙ্ক যায়?

যাক না যাক, আমি তা শুনেতে যাব না।

ভুল বুঝেছ অনুপমা। মরলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মত তোমার নামের পাশে ঘুরে বেড়াবে। বেঁচে দেখ, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হবে না।

কিন্তু কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকব?

আমার সঙ্গে চল!—অনুপমার একবার মনে হইল তাহাই করিবে। চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে, আমাকে ক্ষমা কর। বলিবে, তোমার অনেক অর্থ, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও—আমি গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি। পরে অনেকক্ষণ যৌন থাকিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, আমি যাব না।

কথা শেষ হইতে না হইতে অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অনুপমা জ্ঞান হইলে দেখিল নুসন্ধ্যিত হর্ম্যে পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে, পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুস্মীলন করিয়া কাতরভাবে বলিল, কেন আমাকে বাঁচালে?



ষোড়শী

নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

জীবনানন্দ চৌধুরী

প্রবুল রায়

এককন্ডি নন্দী

জনার্দন রায়

নির্মল বসু

শিবেন্দ্র

ভারদ্বাজ চক্রবর্তী

সাগর সর্গার

পূজারী, ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর, কমন্ড ডাক্তার, কবির,

হরিহর, বিশ্বস্তর, ভিক্টরিয়ান, মহাবীর, বেহারী, ভূতা, পথিক, গাড়োয়ান,

পাহিকগণ ইত্যাদি।

ঈ

ষোড়শী

হৈমবতী

চণ্ডীগড়ের জমিদার

জীবনানন্দের সেক্রেটারী

এ গোমস্তা

মহাস্তন

এ জামাতা ও ব্যাবিস্টার

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

ষোড়শীর পিতা

ষোড়শীর অনুচর

গড়চৌরী চৈরবী

জনার্দনের কন্যা ও নির্মলের স্ত্রী

ভিক্টর-কন্যা, নারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—চণ্ডীগড়—গ্রাম্যপথ

[বেলা অপরাহ্ন-প্রায়। চণ্ডীগড়ের সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথের পরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিতেছে। অদূরে বীজগাঁ'র জমিদারী কাছারিবাটার ফটকের কিংয়দংশ দেখা যাইতেছে। জন-দুই পথিক দ্রুতপদে চলিয়া গেল, তাঁহাদেরই পিছনে একজন কৃষক মাঠের কর্ম শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তাহার বাঁ-কাখে লাঙ্গল, ডান হাতে ছড়ি, অগ্রবর্তী অদৃশ্য বলদযুগলের উদ্দেশে হাঁকিয়া বলিতে বলিতে গেল, “ধলা, সিধে চ বাবা, সিধে চল! কেলো, আবার আবার! আবার পরের গাছপালায় মুখ দেয়!”]

কাছারির গোমস্তা এককড়ি নন্দী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল এবং উৎকণ্ঠিত শব্দায় পথের একদিকে যতদূরে দৃষ্টি যায় গলা বাড়িয়া কিছু একটা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পিছনের পথ দিয়া দ্রুতপথে বিশ্বস্তর প্রবেশ করিল। সে কাছারির বড় পিয়াদা, তাগাদায় গিয়াছিল, অকস্মাৎ সংবাদ পাইয়াছে বীরগাঁ'র নবীন জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী চণ্ডীগড় আসিতেছেন। ক্রোশ-দুই দূরে তাহার পালকি নামাইয়া বাহকেরা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লইতেছিল, আসিয়া পড়িল বলিয়া]

বিশ্বস্তর। নন্দীমশাই, দাঁড়িয়ে করতেছ কি? হজুর আসছেন যে!

এককড়ি। (চমকিয়া মুখ ফিরাইল। এ দুঃসংবাদ ঘণ্টা-খানেক পূর্বে তাহার কানে পৌছিয়াছে। উদ্ভট-কষ্ট কহিল) হঁ।

বিশ্বস্তর। হঁ কি গো? স্বয়ং হজুর আসছেন যে!

এককড়ি। (বিকৃত-স্বরে) আসছেন ত আমি করব কি? খবর নেই, এস্তালা নেই—হজুর আসছেন। হজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারবে না!

বিশ্বস্তর। (এই আকস্মিক উদ্বেজনার অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া শুশু কহিল) আর, তুমি কি মরিয়া হয়ে গেলে নাকি?

এককড়ি। মরিয়া কিসের? আমার বিষয় পেয়েছে বৈ ত কেউ আর বাপের বিষয় বলবে না! তুই জর্নিস নিশু, কালীমোহনবাবু ওকে দুঃ করে দিয়েছিল, বাড়ি চুকতে পর্যন্ত দিত না। তেজাপুতুরের সমস্ত ঠিকঠাক, হঠাৎ খামকা মরে গেল বলেই ত জমিদার! নইলে থাকতেন আজ কোথায়? আমি ভাবি নে কি!

বিশ্বস্তর। কিন্তু জেনে সুবিধেট! কি হচ্ছে শুনি! এ মাঝা নয়, ভায়ে! কথা ঘুণাগ্রে কানে গেলে তোমার মস্তকো দিতেও কাউকে বাকী রাখবে না। ধরবে আর দুম ক' গুলি করে মারবে। এখন এক গণ্ডা এরই মধ্যে মেরে পুতে ফেলেছে জানো? ভয়ে কেউ কথাটি পর্যন্ত কয় না।

এককড়ি। হাঁ—কথা কয় না! মগের মমুক কিনা!

বিশ্বস্তর। আরে মাতাল যে! তার বি ইশ পবন আছে, না দয়া-মায়া আছে! বন্দুক-পিস্তল-ছুরি-চাঁবা ছাড়' এক পা কোথাও ফেলে না। মেরে ফেলে তখন করবে কি শুনি?

এককড়ি। তুই ত সেদিন সদরে গিয়েছিলি—দেখেচিস তাকে?

বিশ্বস্তর। না, ঠিক নেখিনি বটে, তবে সে দেখাই। ইয়া গালপাটা, ইয়া গাঁফ, ইয়া বুকের ছাতি, জনফুলের মত চোখ ভাঁটার মত বন্দুক করে ঘুরচে—

এককড়ি। নিশু, তবে পালাই চ।

বিশ্বস্তর। আরে পালিয়ে ক'দিন তার কাছে বাঁচবে নন্দীমশাই? চুলের ঝুটি ধবে টেনে এনে খাল ঝুঁতে পুতে ফেলবে।

এককড়ি। কি তবে হবে বল? মাতালটা যদি বলে বসে শান্তিকুঞ্জেই থাকব?

বিশ্বস্তর। কতদূর ত বলেছি নন্দীমশাই, এ কাজ করো না, করো না, করো না। বছরের পর বছর নাত্যায় কেবল শান্তিকুঞ্জের মিথো মেরামতি খরচই লিখে গেলে, গরীবের কথায় ত আর কান দিলে না।

এককড়ি। তুইও ত কাছারির বড় সদার, তুইও ত—

বিশ্বস্তর। দেখ, ও-সব শয়তানি ফন্দি করেনা না বলচি! আমার ওপর দোষ চাপিয়েছ কি—ওগো, ওই যে একটা পালকি দেখা যায়!

[নেপথ্যে বাহকদিগের কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল। বিশ্বস্তর পলয়ানোদ্যত এককড়ির হাতটা ধরিয়া ফেলিতেই সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে]

এককড়ি। ছাড়না হারামজাদা।

বিশ্বস্তর। (অনুচ্চ চাপাকর্ষে) পালাচো কোথায়? ধরলে গুলি করে মারবে যে!

[এমনি সময় পালকি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে উভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পালকির অভ্যন্তরে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়াছিলেন, তিনি দ্বিধা একটুখানি মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]

জীবানন্দ। ওহে, এ গ্রামে জমিদারের কাছারি বাড়িটা কোথায় তোমরা কেউ বলে দিতে পার?

এককড়ি। (করজোড়ে) সমস্তই ত হজুরের রাজ্য।

জীবানন্দ। রাজ্যের খবর জানতে চাইনি। কাছারিটার খবর জানো?

এককড়ি। জানি হজুর। ওই যে।

জীবানন্দ। তুমি কে?

[এককড়ি ও বিশ্বস্তর উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

এককড়ি। হজুরের নফর এককড়ি নন্দী।

জীবানন্দ। ওহো, তুমিই এককড়ি—চণ্ডীগড়-সাম্রাজ্যের বড়কর্তা? কিন্তু দেখ এককড়ি, একটা কথা বলে রাখি তোমাকে। চট্টবাক্য অপছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু তার একটা কাণ্ডক্ষান থাকটাও পছন্দ করি! এটা ভুলো না! তোমার কাছারির তলিস কত?

এককড়ি। আজ্ঞে, চণ্ডীগড় তালুকের আয় প্রায় হাজার-পাঁচেক টাকা।

জীবানন্দ। হাজার-পাঁচেক?—বেশ।

[বাহকেরা পালকি নীচে নামাইল। জীবানন্দ অবতরণ করিলেন না, শুধু পা দুটা বাহির করিয়া ভূমিতলে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন]

বেশ। আমি এখানে দিন পাঁচ-ছয় আছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমার হাজার-দশেক টাকা চাই এককড়ি। তুমি সমস্ত প্রজাদের খরব দাও যেন কাল তারা এসে কাছারিতে হাজির হয়।

এককড়ি। যে আজ্ঞে। হজুরের আদেশে কেউ গরহাজির থাকবে না।

জীবানন্দ। এ গাঁয়ে দুই বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো?

এককড়ি। আজ্ঞে, না তা এমন কেউ—শুধু তারাদাস চক্ৰোপ্তি—তা সে আবার হজুরের প্রজা নয়।

জীবানন্দ। তারাদাসটা কে?

এককড়ি। গড়চণ্ডীর সেবায়েত।

জীবানন্দ। এই লোকটাই কি বছর-দুই পূর্বে একটা প্রজা-উৎখাতের মামলায় আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) হজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায় না। আজ্ঞে, এই সেট তারাদাস।

হঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল। এ কতখানি জরি ভোগ করে?

এককড়ি। 'মনে মনে হিসাব করিয়া) বাঠ-সস্তর বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ। একে তুমি আজই কাছারিতে ডেকে আনিয়া জানিয়ে দাও যে, বিঘেহ্রতি আমার দশ টাকা নজর চাই।

এককড়ি। (সম্বুদ্ধিত হইয়া) আজ্ঞে, সে যে নিজের দেবোত্তর, হজুর।

জীবানন্দ। না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে এককড়িটা নেই। সেলামি না পেলে সমস্ত বাজিয়াপু হয়ে যাবে।

এককড়ি। আজই তাকে হুকুম জানাচ্ছি।

জীবানন্দ। শুধু হুকুম জানানো নয়, টাকা তাকে দুদিনের মধ্যে নিতে হবে।

এককড়ি। কিন্তু হজুর—

জীবানন্দ। কিন্তু থাক এককড়ি। এই সোজা বাকুইয়ের তীরে আমার শান্তিকুঞ্জ, না?—মহাবীর, পালকি তুলতে বল। [বাহকেরা পালকি লইয়া প্রস্থান করিল]

এককড়ি। যা ভেবেচি তাই যে ঘটল রে বিত্ত। এ যে গিয়ে শান্তিকুঞ্জে ঢুকতে চায়।

বিশ্বম্ভর। নয় ত কি তোমার কাছারিতে খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে চাইবে?

এককড়ি। সেখানে হয়ত ঢোকবার পথ নেই। হয়ত সোর-জানালা সব চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে, হয়ত বা ঘরে ঘরে বাঘ-ভালুকে বসবাস করে আছে—সেখানে কি যে আছে আর কি যে নেই, কিছুই যে জানিনে বিশ্বম্ভর!

বিশ্বম্ভর। আমি কি জানি নাকি তোমার দোর-জানালা খবর? আর বাঘ-ভালুকের কাছে ত আমি খাজনা আদায়ে যাইনি গো!

এককড়ি। এই রাস্তিরে কোথায় আলো, কোথায় লোকজন, কোথায় খাবার-দাবার—

বিশ্বম্ভর। বাস্তায় দাঁড়িয়ে কাদলে লোকজন জুটে পাবে, কিন্তু আলো আর খাবার-দাবার—

এককড়ি। তোর কি! তুই ত বলবিই নে নচ্ছার পাঞ্জী ব্যাটা হারামজাদা— [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—শান্তিকুঞ্জ

[বাকুই নদীতীরে বীজগার জমিদার রাধামোহনের নির্মিত বিলাসভবন ‘শান্তিকুঞ্জ’। সংস্কারের অভাবে আন্ত তাত্রা জীর্ণ, শ্রীণীন, ভগ্নপ্রায়। তাহারই একটা কক্ষে তক্তপোশের উপর বিছানা, বিছানায় চাদরের অভাবে একটা বড়োলা শাল পাতা; শিয়রের দিকে একটা গোল টেবিল, তাহাতে মোটা পাখানো একখানা বইয়ের উপর আখপোড়া একটা মোমবাতি। তাহারই পাশে একটা পিস্তল। হাতের কাছে একটা টুল, তাহাতে সোডার বোতল, সুরাপূর্ণ গ্লাস ও মদের বোতল। বোতলটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পার্শ্বে দামী একটা সোনার ঘড়ি—ঘড়িটা ছাইয়ের আধারস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—আখপোড়া একটা ফল্ট হইতে তখনও ধূমের রেখা উঠিতেছে। সম্মুখের দেওয়ালে গোটা-দুই নেপালী মূর্তি হইতে রক্তের ধারা বহিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা শূন্য মদের বোতল; একটা ভিঙ্গে উচ্চিষ্ট ভূক্তাবশেষ তখনও পরিচ্ছন্ন হয় নাই, সন্নিকটে একখানা দামী ঢাকাই চাদরে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেটা মেঝেতে লুটাইতেছে। জীবানন্দ চৌধুরী বিছানায় আড় হইয়া পড়িয়া। পায়ের দিকের জানালাটা ভাঙ্গা, তাহার ঝাঁক দিয়া বাহিরের একটা গাছের ডালের শানিকটা ভিতরে ঢুকিয়াছে। দুইটিকে দুইটি দরজা—দরজা তেলিয়া জীবানন্দের সেকেন্ডারি প্রস্থান প্রবেশ করিল]

প্রস্থান। সেই লোকটা এখানেও এসেছিল দাদা।

জীবানন্দ। কে বল ত?

প্রস্থান। সেই মাত্রাজী সাহেবের কর্মচারী, যিনি আখের চাষ আর চিনির কারখানার জন্যে সমস্ত নাকশের মাঠটা কিনতে চান। সতাই ষি ওটা বিক্রি করে দেবেন?

জীবানন্দ। নিশ্চয়। আমার এখন ভয়ানক টাকার দরকার।

প্রস্থান। কিন্তু অনেক প্রজার সর্বনাশ হবে।

জীবানন্দ। তা হবে, কিন্তু আমার সর্বনাশটা বাঁচবে।

প্রস্থান। আর একটি লোক বাইয়ে বসে আছেন, তাঁর নাম জনার্নান রায়। আসতে বলব?

জীবানন্দ। না ভায়া, এখন থাক। সাধু-সন্দর্শন যখন-তখন হবে—নেই—শান্ত্রে নিবেশ আছে।

প্রস্থান। (হাসিয়া) লোকটা শুনেছি খুব ধনী!

জীবানন্দ। শুধু ধনী নয়, গুণী। চিঠা, স্বত, তাম্বাক, দলিল, যথা-ইচ্ছা ষি প্রস্তুত করে দিতে পারেন—নকল নয়, অনুকরণ নয়, একেবারে অভিনব, অপূর্ব, যাকে বলে সৃষ্টি। মহাপুরুষ ব্যক্তি।

প্রস্থান। এ-সব লোককে প্রশ্রয় দেবেন না, দাদা।

জীবানন্দ। তার প্রয়োজন নেই প্রস্থান, ইনি নিজের প্রতিভায় যে উচ্চে বিচরণ করেন, আমার প্রশ্রয় সেখানে নাগাল পাবে না।

প্রস্থান। ওনলাম সমস্ত মাঠটা আপনার একার নয়, দাদা। ও সব হচ্ছে—

জীবানন্দ। না। প্রকৃত, এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি কথা কইতে দেব না। ফেনার গলা পর্যন্ত ঢুবে আমি, এর পরে তোমার সং-অসত্যের ছুত খাড়ে চাপলে আর রসাতলে ডালিয়ে যাবার মেরি হবে না।

[একপায়ে মদ পান করিয়া]

জীবানন্দ। তুমি ভাৰ্য্য রসাতলের মেরিই বা কত? মেরি নেই সে আমি জানি। আরও একটা কথা তোমার চেয়ে বেশি জানি প্রকৃত, এর কুল-কিনারাও নেই।

[প্রকৃত নিঃশেষে মুখ তুলিয়া চাহিল]

জীবানন্দ। ওই তোমার মস্ত ঘোষ প্রকৃত, শেষ হওয়া জিনিসটাও নিঃশেষে চলে তুলে তোমার চোখ হলহল করে আসে। যাও ত ভায়া, এককড়িকে পাঠিয়ে দাও ত। আর দেখ, তোমাকে একবার সমরে গিয়ে মাদ্রাজী সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা কইতে হবে। বুঝলে?

প্রকৃত। (মাথা নাড়িয়া) তা হলে এখনো ত বেলা আছে, আজই ত যেতে পারি। সাহেবের সঙ্গে গাড়ি আছে।

জীবানন্দ। বেশ, তা হলে ঐর গাড়িতেই যাও। [প্রকৃতের প্রধান ও এককড়ির প্রবেশ]

জীবানন্দ। টাকা আদায় হচ্ছে এককড়ি?

এককড়ি। হচ্ছে প্রকৃত।

জীবানন্দ। তারাদাস টাকা দিলে?

এককড়ি। সহজে দিতে চায়নি। শেষে কান ধরে ঘোড়দৌড়, ব্যাঙের নাচ নাচাবার প্রস্তাব করতেই দিতে রাজী হয়ে বাড়ি গেছে। আজ দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দ। তার পরে?

এককড়ি। মহাবীর সিংকে সঙ্গে দিয়ে প্রকৃতের পালকি বেহারাদের পাঠিয়েছি তাকে ধরে আনতে।

জীবানন্দ। (মদ্যপান করিয়া) ঠিক হয়েছে। তোমাদের এখানে বোধ করি বিলিতি মন্দের দোকান নেই। তা না থাক, যা আমার সঙ্গে আছে তাতেই এ ক'টা দিন চলে যাবে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে এককড়ি।

এককড়ি। আচ্ছা করুন।

জীবানন্দ। দেখ এককড়ি, আমি বিবাহ—হাঁ—বিবাহ আমি করিনি—বোধ হয় কখনো কবকও না। (একটু পরে) কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব—বলি মহাভারত পড়ে ত? তার ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি—ওকদেব হয়েও উঠিনি—বলি কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই?

[একপায়ে লজ্জার মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল]

জীবানন্দ। অপর সকলের মত যাকে-তাকে দিয়ে এ-সব কথা বলতে আমি ভালোবাসি নে, তাতে ঠকতে হয়। আচ্ছা এখন যাও।

এককড়ি। আমি তারাদাসকে দেখি গে। সে এব মধ্যে প্রজা বিগড়ে না দেখ। (যাইতেছিল)

জীবানন্দ। প্রজা বিগড়ে দেবে? আমি উপস্থিত থাকতে?

এককড়ি। প্রকৃত, পারে ওবা।

জীবানন্দ। তারাদাসকেই ত জানি, আবার 'ওরা' এল কারা?

এককড়ি। চকোভির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চকোভিমশাই নিজে তত লোক মন্ড নয়, কিন্তু মেয়েটাই হচ্ছে আসল সর্বনাশী। দেশের বত বাঘেটে কলমশগুলো হয়েয়ে যেন একেবারে তাৎ গোলায়।

জীবানন্দ। বটে! কত বয়স? দেখতে কেমন?

[ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ সজ্জার আবছায়া ঘনহিয়া আসিতে লাগিল]

এককড়ি। বয়স পঁচিশ-ছাশিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন প্রকৃত ত সে যেন এক কটিখোঁটা সিপাই। না আছে মেয়েলি গিরি, না আছে মেয়েলি হাঁস। যেন চুড়াক, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে। তাতেই ত দেশের ছোটলোকগুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্ছেন সাক্ষাৎ

চণ্ডী।

জীবানন্দ। (উৎসাহ ও কৌতূহলে সোজা উঠিয়া বসিয়া) বল কি এককড়ি? ভৈরবীর ক্যাপারটা কি খুলে বল ত ওনি?

এককড়ি। ভৈরবী ত কারু নাম নয় হজুর। গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ওই হলো উপাধি। বর্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী, এর আগে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল শ্রাতঙ্গিনী। মার আসেলে তাঁর সেবায়ত কখনো পুরুষ হতে পারে না, চিরদিন মেয়েরাই হয়ে আসছে।

জীবানন্দ। তাই নাকি? এ ত কখনো ওনিনি।

এককড়ি। মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীকে আর ভৈরবীর স্পর্শ করবারও জো নেই। তাই দূরদেশ থেকে দুঃখী গরীবদের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়াও দেখতে পায় না। এই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসছে।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) বল কি এককড়ি, একেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ, রাগে নিরিবিলা একপাত্র সুধা ঢেলে দেওয়া—গরমমশলা দিয়ে চাট্টি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো—একেবারে কিছুই কবতে পায় না?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) না হজুব, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই, কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গায়ে আব পুরুষ নেই? মাতৃ ভৈরবীকেও দেখেচি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখছি। লোকপালা কি আর খামকা—তার সাক্ষী দেখুন না—কথায় কথায় হজুরের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা গাথয়ে দেয়।

জীবানন্দ। মেয়ে-মোহন্ত আর কি। তাতে দোষ নেই। এককড়ি, আলোটা জ্বালা ত!

এককড়ি। (আলো জ্বালিয়া) এখন আসি, হজুর।

জীবানন্দ। আচ্ছা যাও। বইখানা দিয়ে যাও ত। [বই দিয়া প্রণাম করিয়া এককড়ি প্রস্থান করিল]

[জীবানন্দ বইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন একটু পরে বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ হইল]

জীবানন্দ। কে?

সর্দার। (ষোড়শীকে লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিল) শালা তারাদাস ভাগ্ গিয়া। হজুর, উস্কো চৌকো পাকড লায়া।

জীবানন্দ। (বই ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্মিতভাবে) কাকে? ভৈরবীকে? (কিছুক্ষণ পরে) ঠিক হয়েছে। আচ্ছা যা। [সর্দার অনুচর পহিঁচর লইয়া প্রস্থান করিল]

জীবানন্দ। তোমাদের আভ টাকা দেবার কথা। টাকা এনেচ? (ঙ্গনীর কঠবর ফুটিল না) আনো নি জানি। কিন্তু কেন?

ষোড়শী। আমাদেব নেই।

জীবানন্দ। না থাকলে সমস্ত রাঈ তোমাকে পাইকদর ঘরে আটকে থাকতে হবে। তার মানে জানো।

[ষোড়শী দ্বারের চৌকাঠটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া মুখা হইতে আশ্রয়কার চেষ্টা করিতে লাগিল, এই ভয়ানক বিবর্ণ মুখের চেহারা জীবানন্দের চোখে পড়িল, মিনিট-বানেক সে ভেমন যেন আচ্ছন্ন ন্যায় বাসিয়া বহিল; তারপরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া ষোড়শীর কাছে গেল। আলোটা তাহার মুখের সম্মুখে ধরিয়া ৫, ৬, ৭ ষোড়শীর গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রক্ত কেশভাব, তাহার পাণ্ডুর গুটাধর, তাহার সবল সুস্থ শব্দ দেখে সমস্তই সে যেন দুই বিস্ময়িত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল। তাহাে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে পর]

জীবানন্দ। (কিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দিয়া মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপবৃগরি পান করিয়া) তোমার নাম ষোড়শী না? (ষোড়শী নীরব) তোমার বয়স কত? (কোন উত্তর না পাইয়া কঠিন-স্বরে) চুপ কবে থেকে বিশেষ কোন লাভ হবে না, জবাব দাও।

ষোড়শী। (মৃদু স্বরে) আমার বয়স আটাল।

জীবানন্দ। বেশ। তা হলে খবর যদি সত্যি হয় ত, এই উনিশ-কুড়ি বৎসর ধরে তুমি ভৈরবীগিরি

করেচ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েছ। দিতে পারবে না কেন?

ঝোড়নী। আপনাকে আগেই ত জানিয়েছি আমার টাকা নেই।

জীবানন্দ। না থাকলে আরও দশজন বা করছে তাই কর। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে জমি বাধা দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক দাও গে।

ঝোড়নী। তারা পারে, জমি তাদের। কিন্তু দেবতার সম্পত্তি বাধা দেবার, বিক্রি করবার ত আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ। (হঠাৎ হাসিয়া) নেবার অধিকার কি ছাই আমারই আছে? এক কপর্দকও না। তবুও নিচ্ছি, কেন না আমার চাই। এই চাওয়াটাই হচ্ছে সংসারের খাঁটি অধিকার, তোমারও যখন দেওয়া চাই-ই, তখন—বুঝলে? (কিছু পরে) যাক, এত রাত্রে কি একা বাড়ি যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে তাদের আর সঙ্গে দিতে চাইনে।

ঝোড়নী। (সবিনয়ে) আপনার হুকুম হলোই যেতে পারি।

জীবানন্দ। (সবিনয়) একলা? এই অন্ধকার রাত্রে? ভারী কষ্ট হবে যে! (হাসিতে লাগিল)

ঝোড়নী। না, আমাকে এখনি যেতেই হবে।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) বেশ ত, টাকা না হয় নাই দেবে ঝোড়নী। তা ছাড়া আরো অনেক রকমের সুবিধে—

ঝোড়নী। আপনার টাকা আপনার সুবিধা আপনারই থাক, আমাকে যেতে দিন।

[কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সেই পাইকদের সম্মুখে কিছুদূর
বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনিই ধর্মকিয়া দাঁড়াইল]

জীবানন্দ। (মুখ অন্ধকার করিয়া কঠিন-স্ববে) তুমি মদ খাও?

ঝোড়নী। না।

জীবানন্দ। তোমার কয়েকজন পুরুষ বন্ধু আছে ওনেছি। সত্যি?

ঝোড়নী। (মাথা নাড়িয়া) না, মিছে কথা।

জীবানন্দ। (কণকাল মৌন থাকিয়া) তোমার পূর্বকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন—সত্যি? মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভাল ছিলো না—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি, না মিছে?

ঝোড়নী। (সঙ্কীর্ণ মুদুকঠে) সত্যি বলেই ওনেছি।

জীবানন্দ। ওনেছ? ভালো। তবে হঠাৎ তুমিই বা এমন দলছাড়া, গোত্রছাড়া ভাল হতে গেলে কেন? (হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া পুরুষ-কণ্ঠস্বরে) মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্কও আমি করিনে, তাদের মতামতও কখনো জানতে চাইনে। তুমি ভাল কি মন্দ, চুল-চিরে তার বিচার করবারও আমার সময় নেই। আমি বলি, চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যেভাবে কেটেছে তোমারও তেমনিভাবে কেটে গেলেই বখেট। আজ তুমি এই বাড়িতেই থাকবে।

[হুকুম ওনিয়া ঝোড়নী বজ্রহস্তেব ন্যায় একেবারে কাঠ হইয়া গেল]

জীবানন্দ। তোমার সম্বন্ধে কি করে যে এতটা সহ্য করিচ্ছি জানিনে, আর কেউ এ বৈষাদপন করলে এতক্ষণ তাকে পাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েছি।

ঝোড়নী। (অকস্মাৎ কাঁদিয়া কেঁপিয়া, গলায় আঁচল দিয়া করজোড়ে) আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ। কেন বল ত? এরকম কান্নাও নতুন নয়, এরকম ভিক্ষেও এই নতুন ওনচি নে! কিন্তু তাদের সব স্বামি-পুত্র ছিল—কতকটা না হয় বুঝতেও পারি। (ঝোড়নী নিঃশব্দে উঠিয়া) কিন্তু তোমার ত সে বলাই নেই। পনের-বেলা বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে তুমি ত চোখেও দেখনি। তা ছাড়া তোমাদের ত এতে দোষই নেই।

ঝোড়নী। (করবোড়ে অশ্রুস্রব্দকঠে) স্বামীকে আমার ভালো মনে নেই সত্যি, কিন্তু তিনি ত আছেন। বর্ষা বর্ষি আপনাকে, কখনো-কোন অন্যায়ই আমি আজ পর্যন্ত করিনি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন—

জীবানন্দ। (হাঁক দিয়া) মহাবীর—

ষোড়শী। (আতঙ্কে কাঁদিয়া) আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন, কিন্তু—

জীবানন্দ। আজ্ঞা, ও বাহাদুরি কর গে ওদের ঘরে গিয়ে। মহাবীর—

ষোড়শী। (মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া) কারও সাধ্য নেই আমার প্রাণ থাকতে নিয়ে যেতে পারে। আমার যাকিছু দুর্দশা—যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক—আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপন আভ্যন্তরীণ ভ্রমলোক।

জীবানন্দ। (কঠিন নিষ্ঠুর হাস্য করিল) তোমার কথাগুলো শুনে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না। আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের উপর আমার এতটুকু লোভ নেই—ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে—নেশা না কাটলে ঠাণ্ডার পাচ্ছিনে।

মহাবীর। (দাবপ্রান্তে আসিয়া) হজুর!

জীবানন্দ। (সম্মুখের কবচটায় অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী। (গলদশ্রলোচনে) আমার সর্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন হজুর! কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।

জীবানন্দ। দু'একদিন। তার পবে পারবে। সেই নিভারের ব্যথাটা আজ সকাল থেকেই টের পাচ্ছিলোম। এখন হঠাৎ ভারী বেড়ে উঠল—আর বেশী বিরক্ত করো না—যাও—

মহাবীর। (হাত দিয়া) আরে, উঠনা মাগী—চাল!

জীবানন্দ। (ভয়ানক ধমক দিয়া) স্ববরদার, গুয়োরের বাচ্চা, ভালো করে কথা বল! ফের যদি কখনো আমার হুকুম ছাড়া কোন মেয়েমানুষকে ধরে আনিস ত গুলি করে মেরে ফেলব। (মাথার বালিশটা পেটের কাছে টানিয়া লইয়া উপড় হইয়া ওইয়া যাতনায় অশ্রুট আঁর্জন করিয়া) আজকের মত ও ঘরে শুই থাকো, কাল তোমার সর্ভাঙ্গের বোকাপড়া হবে। আঃ—এই, যাঁনা আমার সুমুখ থেকে একে সরায়ে নিয়ে।

মহাবীর। (হস্তে হস্তে বলিল) চলিয়ে—

[ষোড়শী নির্দেশমত নিরুত্তরে পাশের অন্ধকার ঘরে যাইতেছিল]

জীবানন্দ। ষোড়শী, একটা দাঁড়াও, প্রফুল্ল নেই, সে সদরে গেছে—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী। জানি।

জীবানন্দ। তা হলে একটা কাজ করে যাও। ওই যে ব্যাগটা, ওর ম . আর একটা কাগজের বাস্স পাবে। ওয়েকটা ছোট-বড় শিশি আছে, যার গায়ে বাঙলায় 'মরফিয়া' লেখা তার থেকে একটুখানি খুঁবে ওখুঁ দিয়ে যাও, কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর, আলোটা ধর।

[মহাবীর আলো ধরিল]

ষোড়শী। (বোতল আলোকে কম্পিত-হস্তে শিশিটা বাহির করিয়া) কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ। (ঐত্বে ব্রহ্মদেয় অবাক ধ্বনি করিয়া) ঐ ত বললুম খুব একটুখানি। আমি উঠতেও পারছি নে, আমার হাতের ও ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাঁচের বিনুক আছে, তার মধ্যে থেকেও কম একটু বেশি হয়ে গেলে ও খুম তোমার হাতীর বাবা এসেও ভাসাতে পারবে না।

[পরিমাণ ঠিক করিতে ষোড়শীর হাত কাঁপিতে লাগিল, অনেক বয়ে অনেক সাবধানে নির্দেশমত ঐখুঁ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

জীবানন্দ। (হাত বাড়াইয়া সেই বিষ লইয়া ও . বুজিয়া মুখে ফেলিয়া দিল) খুব কমই দিয়েচ—ফল হবে না হয়ত; আজ্ঞা এই থাক।

[ষোড়শী পাশের ঘরে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় এককড়ি নিভাঙ্গ বাস্ত ও ব্যালুন্ভাবে প্রবেশ করিয়া ও এমিক-ওমিক চাহিয়া জীবানন্দের কানের কাছে চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল। জীবানন্দের মুখেও ভাব বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। ষোড়শী দাবপ্রান্তে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

জীবানন্দ। (হাত গড়িয়া ষোড়শীকে) তোমার ভয় নেই, কাছে এসো, (ষোড়শী আসিলে)

পুলিশের লোক বাড়ি ঘিরে কেলেছে—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেছেন—এলেন বলে। (বোড়শী চমকিয়া উঠিল) জেলার ম্যাজিস্ট্রেট টুরে বেরিয়ে ক্রোশ-খানেক দূরে তাঁবু কেলেছিলেন, তোমার বাবা এই রাতেই তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত জানিয়েছেন। কেবল তাতেই এতটা হতো না, কে-সাহেবের নিজেরই আমার উপর ভাবী রাগ। গত বৎসর দু'বার কাদে কেলবার চেঁচা করেছিল, কিন্তু পারেনি—আজ একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেচে—(একটু হাসিল)

এককড়ি। (মুখ চুন করিয়া) হজুর, এবার বোধ হয় আমাদেরও আর রক্ষা নেই।

জীবানন্দ। সম্ভব বটে। (বোড়শীকে) শোধ নিতে চাও এই-ই সমস্ত। আমাকে জেলে দিতেও পার। বোড়শী। এতে জেল হবে কেন?

জীবানন্দ। আইন। তা ছাড়া, কে-সাহেবের হাতে পড়েছি। বাদুড়বাগানের মেসে থাকতে এরই কাছে একবার দিন-কুড়ি হাজতবাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলে না—আর জামিনই বা তখন হতো কে!

বোড়শী। (উৎসুক-কণ্ঠে) আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন?

জীবানন্দ। হাঁ। ওই সময়ে একটা প্রশয়কাতোর বৃক্ষে হয়েছিলুম—ব্যাটা আয়ান ঘোব কিছুতে ছাড়লে না—পুলিশে দিলে। যাক, সে অনেক কথা। কে আমাকে ভোলেনি, বেশ চিনে। আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু বাথার শয্যাগত হয়ে পড়েছি, নড়বার জো নেই।

বোড়শী। (কোমল-কণ্ঠে) বাথটা কি আপনার কমচে না?

জীবানন্দ। না, তা ছাড়া এ সারবার বাথও নয়।

বোড়শী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আমাকে কি করতে হবে?

জীবানন্দ। শুধু বলতে হবে তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেচ, নিজের ইচ্ছায় এখানে আছ। তার বদলে তোমাকে সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেব, হাজার টাকা নগদ দেব, আর নজরের টাকার ত কথাই নেই।

[এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবাব কি বলিতে গেল, কিন্তু রুদ্ধবাবে

পুনঃ পুনঃ করাসাভের শব্দ শুনিয়া বিবর্ণমুখে থামিয়া গেল।]

জীবানন্দ। (সাদা দিয়া) খোলা আছে, তিতরে আসুন।

[দরজা উন্মুক্ত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্সপেক্টর, কয়েকজন কনস্টেবল ও তারাদাস চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন]

তারাদাস। (ভিতরে ঢুকিয়াই কাদিয়া) ধর্মাবতার, হজুর! এই আমার মেয়ে, মা-চণ্ডীর তৈরবী। আপনার দয়া না হলে আজ ওকে টাকার জন্যে খুন করে কেলত ধর্মাবতার।

ম্যাজিস্ট্রেট। (বোড়শীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমারই নাম বোড়শী? তোমাকেই বাড়ি থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

বোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না, আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি। কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি। তারাদাস। (চোঁচামেচি করিয়া উঠিল) না হজুর, ভয়ানক মিথো কথা, গ্রামসুখ সাধী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পহিক গিয়ে তাকে বাড়ি থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। (জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া বোড়শীকে কহিলেন) তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্য কথা বল। তোমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনেছে?

বোড়শী। না, আমি আপনি এসেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন তোমার কি প্রয়োজন?

বোড়শী। আমার কাজ ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট (চোঁচাইয়া) না হজুর, সমস্ত মিছে—সমস্ত বানানো, আগাগোড়া মিথ্যাবাদী কথা।

ম্যাজিস্ট্রেট। (তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া হাসিলেন এবং শিশু মিত্রে মিত্রে প্রশংসা করিয়া) এবং পরে পিন্ডলটা তুলিয়া লইয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন। I hope you have permission for this.

[ঘীরে ঘীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন

ম্যাজিস্ট্রেট। (নেপথ্যে) হামারা বোড়া লাও।

[বোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। তারাদাস হত-

আনের ন্যায় শুদ্ধ অভিজ্ঞভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া]

তারাদাস (অকস্মাৎ বুককাটা ক্রমশে সকলকে সচকিত করিয়া পুলিশ-কর্মচারীর পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিয়া) বাবুমশায়, আমার কি হবে। আমাকে যে এবার জমিদারের লোক জ্যাক্ট পুতে ফেলবে।

ইনস্পেক্টার (তিনি বয়সে প্রবীণ, শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া সদয়কণ্ঠে) ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেমন থাকো গে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার সহায় বইলেন—আর কেউ তোমাকে জ্বলুম করবে না। (কটাক্ষে জীবানন্দের দিকে চাহিলেন)

তারাদাস। (চোখ মুছিতে মুছিতে) সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু'

ইনস্পেক্টার। (মুচকি হাসিয়া) না ঠাকুর, রাগ করেন নি, তবে আজকের এই ঠাট্টাটুকু তিনি সহজে ভুলতে পারবেন, এমন মনে হয় না। তা ছাড়া আমরাও মরিনি, থানাও যা হোক একটা আছে। (আডচোখে জীবানন্দের দিকে চাহিয়া, কিছু পরে) এখন চল ঠাকুর, যাওয়া যাক। এই রাত্রে যেতেও ত হবে অনেকটা।

সাব ইনস্পেক্টার। (বয়সে তরুণ, অল্প হাসিয়া) মেয়েটি রেখে ঠাকুরটি কি তবে একাই যাবেন নাকি?

[কথাটায় সবাই হাসিল—কনস্টেবলগুলো পর্যন্ত। এককড়ি কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল]

তারাদাস। (বোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া সগর্জনে) যেতে হয় আমি একাই যাব। আবার ওন মুখ দেখব—আবার ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেব আপনারা ভেবেচেন?

ইনস্পেক্টার। (সহাস্যে) মুখ তুমি না দেখতে পার কেউ মাথার দিবি দেবে না ঠাকুর! কিন্তু হার কড়ি, তাকে কড়ি ঢুকতে না দিয়ে আর যেন নতুন ক্যাসাদে পড়ো না।

তারাদাস। (আশ্চর্যজনক করিয়া) বাড়ি কার? বাড়ি আমার। আমিই ভৈরবী করেচি, আমিই ওকে দূব করে ত্যাগাব। কলকাতা এই তারা চক্কোস্তির হাতে। (সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া) নইলে কি ও জানেন? শুনবেন ও মায়ের—

ইনস্পেক্টার। (থামাইয়া দিয়া) থামো ঠাকুর, থামো, রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেলতে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। (বোড়শীর প্রতি) তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিবাপদে ঘরে পৌছে দিতে পারি। চল, আর দেখি এরো না।

[বোড়শী অথোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না]

সাব-ইনস্পেক্টার। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) যাবার বিলম্ব আছে কুঁকি?

বোড়শী। (মুখ তুলিয়া চাহিয়া ইনস্পেক্টারের প্রতি) আপনারা যান, আমার যেতে এখনো দেরি আছে।

তারাদাস। (উদ্ভ্রান্তের মত) দেরি আছে। হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোস্তির ছেলে নই! (লাফাইয়া উঠিয়া বোড়শীকে আঘাত করিতে গেল)

ইনস্পেক্টার। (তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া) ফের যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব। চল, ডালমানুশের মত ঘরে চল।

[তারাদাসকে টানিয়া লইয়া তিনি ও পুলিশ-কর্মচারী প্রস্থান করিল, এককড়িও পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল। দূর হইতে তারাদাসের গর্জন ও গাল। 'লি কীণ হইতে কীণতর শোনা যাইতে লাগিল]

জীবানন্দ। (ইঙ্গিতে বোড়শীতে আরো একটু কাছে ডাকিয়া) তুমি এঁদের সঙ্গে গেলে না কেন?

বোড়শী। এঁদের সঙ্গে ত আমি আসিনি।

জীবানন্দ। (কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'চারদিন দেরি হবে, 'কলকাতা' কি তুমি আজই নিয়ে যাবে?

বোড়শী। তাই দিন।

জীবানন্দ। (বিছানার তলা থেকে একডাড়া নোট বাহির করিল। সেইগুলো গণনা করিতে করিতে বোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল) আমার কিছুতেই লজ্জা করে না, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হাতে তুলে দিতে বাধবাধ ঠেকছে।

বোড়শী। (শান্ত নম্রকণ্ঠে) কিন্তু তাই ত দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দ। কথা যাই থাক বোড়শী, আমাকে বাঁচাতে তুমি যা খোয়ালে, তার দাম টাকায় ধার্য করচি, এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচাই ছিল ভালো।

বোড়শী। (তার মুখে হিরদৃষ্টি চাহিয়া) কিন্তু মেয়েমানুষের দাম ত আপনি এই দিয়েই চিরদিন ধার্য করে এসেছেন। (জীবানন্দ নিরুত্তর—কিছু পরে) বেশ, আজ যদি আপনার সে মত বদলে থাকে, টাকা না হয় রেখেই দিন; আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেন নি? ভালো করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ। (বীরবে বহুক্ষণ নিম্পলক চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া) বোধ হয় 'পেরেচি' ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?

বোড়শী। (তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল) আমার নাম বোড়শী। ঠেৱবী দশমহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোন নাম থাকে না। কিন্তু অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ। (নিরুৎসুক-কণ্ঠে) কিছু কিছু মনে আছে বৈ কি। তোমার মায়ের হোটলে মাঝে মাঝে যেতে যেতাম। তখন তুমি ছোট ছিলে। কিন্তু আমাকে ত তুমি অন্যায়সে চিনতে 'পেরেচি'।

বোড়শী। অন্যায়সে না হলেও 'পেরেচি'। অলকার মাকে মনে পড়ে?

জীবানন্দ। পড়ে। তিনি বেঁচে আছেন?

বোড়শী। না—বছর-দশেক আগে তাঁর কান্দীলাভ হয়েছে। আপনাকে তিনি বড় ভালোবাসতেন, না?

জীবানন্দ। (উদ্বেগে) হী—একবার বিপদে পড়ে তাঁব কাছে একশ' টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি।

বোড়শী। না, কিন্তু আপনি সেজ্ঞা মনে কোন ক্ষমা কোভ রাখবেন না। কারণ অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেননি, জামাইকে যৌতুক বলে দিয়েছিলেন। (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) ঐকটা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে, সে দিনটাও ঠিক এমন দুর্দিন ছিল। আজ বোড়শীর কণ্ঠটাই খুব ভারী বোধ হচ্ছে, কিন্তু সেদিন ছোট অলকার কুলটা মায়ের কণ্ঠটাও কম ভারী ছিল না—ঐশ্বরীমশাই।

জীবানন্দ। তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ঐ কটা টাকার জন্যে তাঁব মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন।

বোড়শী। বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেন নি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি নিজে। কিন্তু, যাক ও সব বিস্তী আলোচনা। বিবাহ আপনি করেন নি, করেছিলেন শুধু একটু তামাশা। সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তার পরে আজ প্রথম দেখা।

জীবানন্দ। কিন্তু তার পরে ত তোমার সত্যিকারের বিবাহই হয়েছে তুনেচি।

বোড়শী। তার মানে আর একজনের সঙ্গে? এই না? কিন্তু নিকপায় বালিকার ভাগে এ বিউখনা যদি ঘটেই থাকে, তবুত আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ। নাই থাক কিন্তু তোমার মা জানতেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাবার চাপ ছেড়ে আসালা রাখলার জন্যেই তিনি যা হোক একটা—

বোড়শী। বিবাহের গাঠী টেনে দিয়েছিলেন? তা হলেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, এবং আমিই অলকা কিনা, এতকাল পরে তা নিয়েও দৃষ্টিভ্রান্তি করবার আপনাব দরকার নেই।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ বীরবে নতমুখে থাকিয়া) কিন্তু, ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ করে বল, তা হলে—

বোড়শী। আসল কথাটা কি? বিবাহের কথা? কিন্তু সেই ত মিথ্যে। তা ছাড়া সে সমস্যা অলকার, আমার নয়। সারারাত এখানে লাটিয়ে গিয়ে ও-গল্প-করলে বোড়শীর সর্বনাশের পরিমাণ তাতে এতটুকু

কমবে না।

জীবানন্দ। (কয়েক-মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) ষোড়শী, আজ আমি এত নীচে নেবে গেছি যে, পৃথিবীর কূলবধূর লোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাসবে, কিন্তু সেদিন অলসকে বিবাহ করে বীজগীর জমিদার বংশের বধু বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভাল কাজ হতো।

ষোড়শী। সে ঠিক জানিনে, কিন্তু সত্যি কাজ হতো এ জানি। কিন্তু আমি মিথ্যে বকচি, এখন এ-সব আর আপনার কাছে বলা নিষফল। আমি চললাম—আপনি কোন কিছু দেবার চেষ্টা করে আর আমাকে অপমান করবেন না।

[এককড়ির প্রবেশ]

জীবানন্দ। (এককড়ি প্রবেশ করিতেই তাহাকে) এককড়ি, তোমাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন? একবার শব্দ দিয়ে আনতে পার? তিনি যা চাবেন আমি তাই দেব।

এককড়ি। ডাক্তার আছে বৈ কি হজুর—আমাদের বন্দিত ডাক্তারের বাসা হাতযশ। (ষোড়শীর দিকে চাহিল)

জীবানন্দ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) তাঁকেই আনতে পাঠাও এককড়ি, আর এক মিনিট দেরি করো না।

এককড়ি। আমি নিজেই যাচ্ছি। কিন্তু হজুরকে একলা—

জীবানন্দ। (দুঃসহ বেদনায় মুহূর্তে বিবর্ণ ও উপুড় হইয়া পড়িয়া) উঃ—আর আমি পারিনে।

ষোড়শী। তুমি বন্দিত ডাক্তারকে ডেকে আনো গে এককড়ি, এখানে যা করবার আমি করব এখন।

[এককড়ি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল]

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ উপুড় হইয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া) ডাক্তার আসেনি? কতদূরে থাকেন জানো?

ষোড়শী। কাছেই থাকেন, কিন্তু তাই বলে তিন-চার মিনিটেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ। তবে তিন-চার মিনিট? আমি ভেবেচি আধ-ঘণ্টা—কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি থাকে আনতে গোয়ে: (উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল) হয়ত তিনিও ভয়ে এখানে আসবেন না অলকা! (তাহার কণ্ঠস্বরে ও চোখের দৃষ্টিতে নিরাশ্বাসের অবধি রহিল না)

ষোড়শী। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে) ডাক্তার আসবেন বৈ কি!

জীবানন্দ। বোধ করি আমি বাঁচব না। আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আর বৃষ্টি হওয়া নেই।

ষোড়শী। আপনার কি বড় কষ্ট হচ্ছে?

জীবানন্দ। হাঁ। অলকা, আমাকে তুমি মাপ কর। (একটু ধামিয়া) আমি ক্ষুর-দেবতা মানিনে, দরকারও হয় না। কিন্তু একটু আগেই মনে মনে ডাকিছিলাম। জীবনে অনেক পাপ করেছি, তার আর আদি-অন্ত নেই। আজ থেকে কেবল মনে হচ্ছে বৃষ্টি সব দেনা মাথায় নিয়ে যেতে হবে। (ক্ষণেক ধামিয়া) মানুষ অমর নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ মাপ দিয়ে রাখেনি—কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারছি নে—উঃ—মা গো! (বাধাব্যতীত সর্বশরীরে যেন আকুল হইয়া উঠিল)

[ষোড়শী একটু ইতস্ততঃ করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অঁচল দিয়া ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিয়া, পাখার অভাবে অঁচল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। জীবানন্দ কোন কথা কহিল না, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে ধীরে কোলের উপর টানিয়া নইল]

জীবানন্দ। (ক্ষণেক পরে) অলকা—

ষোড়শী। আপনি আমায় ষোড়শী বলে ডাকবেন।

জীবানন্দ। আর কি অলকা হতে পাব না?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। কোনদিন কোন কারণেই কি—

ষোড়শী। আপনি অন্য কথা বলেন। (জীবানন্দ নীরবে রহিল, ক্ষণেক পরে) কষ্টটা কি কিছুই কমনি?

জীবানন্দ। (খাড় নাড়িয়া) বোধ হয় একটু কমেছে। আজ যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার

শব্দ (প্রথম বক্তা)—এ৮

করতে পারিনে?

বোড়শী। না, আমি সন্ন্যাসিনী—আমার নিজের কোন উপকার করা কারো সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। আচ্ছা এমন কিছুই কি নেই, যাতে সন্ন্যাসিনীও খুশী হয়?

বোড়শী। তা হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্য কোন আপনি বাস্তব হচ্ছেন?

জীবানন্দ। (একটু কীপ হাসিয়া) আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে বাস্তব হয়ে পড়ি এ দোষ আজও কেউ দেখেনি। তা ছাড়া এখন বলছি বলছি যে ভালো হয়েও বলব, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—এমনিই বটে! এমনিই বটে! সারাজীবনে এ ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

[বোড়শী নীরবে তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল]

জীবানন্দ। (হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া) সন্ন্যাসিনীর কি সুখ-দুঃখ নেই? সে খুশী হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?

বোড়শী। কিন্তু সে ত হাতের মধ্যে নয়।

জীবানন্দ। যা মানুষের হাতের মধ্যে? তেমন কিছু?

বোড়শী। তাও আছে, কিন্তু ভালো হয়ে যদি কখনো ভিজ্ঞাসা করেন তখনই জানাব।

জীবানন্দ। (তাহার হাতটাকে বুকের কাছে টানিয়া) না, না, আর ভালো হয়ে নয়—এই কঠিন অসুখের মধ্যেই আমাকে বল! মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা, পরের আশার কথাটা একটু তনে নিই। নিজের দুঃখের একটা সঙ্গতি হোক।

[বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। বোড়শী নিজের হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইল]

বোড়শী। ডাক্তারবাবু বোধ হয় এলেন। [ডাক্তার ও এককড়ি প্রবেশ করিল। ডাক্তার বোড়শীকে এখানে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কিন্তু কিছু না বলিয়া নীরবে শয্যাশ্রান্তে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন; বোড়শী এই সময়ে প্রস্থান করিল]

এককড়ি। যদি ভালো করতে পারেন ডাক্তারবাবু, বকশিশের কথা ছেড়েই দিন—আমরা সবাই আপনার কেনা হয়ে থাকব।

ডাক্তার। (পরীক্ষা শেষ করিয়া) অত্যাচার করে রোগ জন্মেছে; সাবধান না হলে শিলে কি লিভার পাকা অসম্ভব নয়, এবং তাতে ভয়ের কথা আছে। তবে সাবধান হলে নাও পাকতে পারে এবং তাতে ভয়ের কথাও কম। তবে এ কথা নিশ্চয় যে ওষুধ ষাওয়া আবশ্যিক।

জীবানন্দ। এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া সম্ভব কিনা তা বলতে পারেন?

ডাক্তার। যদি যেতে পারেন তা হলেই সম্ভব, নইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। এখানে থাকলে ভাল হবে কিনা বলতে পারেন?

ডাক্তার। (বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া) আরে না হজুর, তা বলতে পারিনে। তবে এ কথা নিশ্চয় যে এখানে থাকলেও ভালো হতে পারেন, আবার কলকাতা গিয়ে ভালো নাও হতে পারেন।

এককড়ি। হজুরের ব্যথাটা—

ডাক্তার। একরকম ব্যথা হঠাৎ বাড়ে, আবার হঠাৎ কমে যায়। কাল সকালেই হজুর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, আমাকে আবার আসতে হবে।

[এককড়ির কাছ থেকে ভিজিট লইয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন]

জীবানন্দ। কি হবে এককড়ি?

এককড়ি। ভয় কি হজুর, ওষুধ এম বলে! বলভ ডাক্তারের একশিশি মিকচার খেলেই সব ভালো হয়ে যাবে!

জীবানন্দ। (বোড়শী যে-দ্বারপথে একটু আগে বাহির হইয়া গেছে সেইদিকে উৎসুকচোখে চাহিয়া)

ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে— [এককড়ি বাহিরে গিয়া কণেক পরে পুনরায় প্রবেশ করিল]

এককড়ি। তিনি নেই, বাড়ি চলে গেছেন হজুর। ভোর হয়ে এসেছে।

জীবানন্দ। (ব্যগ্র ব্যাকুল-কণ্ঠে) আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন, না। এমন হতেই পারে না এককড়ি!

এককড়ি। হাঁ হাজুর, তিনি ডাক্তারবাবু আসবার পরেই চলে গেছেন। বাহিরে সর্পার বসে আছে, সে দেখেছে তৈরবী-ঠাকরন সোজা চলে গেছেন।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ চোখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকিয়া) তা হলে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তুমিও যাও এককড়ি, আমি একটু ঘুমুব।

[এককড়ি আলো নিভাইয়া গিল। জীবানন্দ বেদনা-স্নানমুখে পাশ ফিরিয়া গইলেন। আলো নিভাইতেই অতি শত্রুঘ্নের আবছায়া আভা জানালা দিয়া ঘরে ছড়াইয়া পড়িল]

তৃতীয় দৃশ্য—চণ্ডী-মন্দিরের পথ! বেলা—পূর্বাহ্ন

[জনৈক ভিক্ষুক ও তাহার কন্যার প্রবেশ]

কন্যা। আর যে চলতে পারিনে বাবা, মায়ের মন্দির আর কত দূরে?

ভিক্ষুক। ঐ যে আগে কত লোক চলে যাচ্ছে মা, বোধ হয় আর বেশী দূরে নয়।

কন্যা। কে গান গাইতে গাইতে আসচে বাবা, ওকে শুধোও না?

[গান গাইতে গাইতে দ্বিতীয় ভিক্ষুকের প্রবেশ]

তোর পাওয়ার সময় ছিল যখন, ওরে অবোধ মন,
মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন।

প্রথম ভিক্ষুক। মায়ের মন্দির আর কত দূরে বাবা?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। ঐ যে— তখন ছিল, মগি, ছিল মণিক

পথের ধারে গারে—

এখন ডুললো তারা দিনের শেষে
বিষম অন্ধকারে।

প্রথম ভিক্ষুক। হাঁ গা—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। কি গো কি?

প্রথম ভিক্ষুক। বিষ্ণু গাঁ থেকে আসছি বাবা, পথ যেন আর ফুরায় না। শুনি যে জনার্দন রায়মশায়ের নাতির কল্যাণে আজ মায়ের পূজো। বামুন বোষ্টম ভিখারী যে যা চাইছে তাই নাকি বায়মশায়—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। বায়মশায় নয়, রায়মশায় নয়। তার জামাই। পশ্চিম মুন্সুকের ব্যারিস্টার—রাজা বললেই হয়। দু' সরা ছিড়ে মুড়কি, এক সরা সশেঁ, আর আট-গুণা—য়সা নগদ—

ভিক্ষুক-কন্যা। (পিতার প্রতি) হাঁ বাবা, তুমি যে বলেছিলে মেয়েদে, একখানা করে রাসা-পেড়ে কাপড় দেবে?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। দেবে, দেবে। যে যা চাইবে। রায়মশায়ের মেয়ে হৈমবতী কাউকে না করতে জানে

আজ মিথো রে তোর খোঁজা-খুঁজি

মিথো চোখের জল,

তার কোথায় পাবি বল,

(তোর) অতল ভলে তলিয়ে গেল।

শেষ-সাদনার ধন।

ভিক্ষুক-কন্যা। বাবা, চাইলে হয়ত তুমিও পাবে একখানা— না?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। পাবে পাবে, একটু পা চালিয়ে এসো।

তোর পাওয়ার - ৭ ছিল যখন,

ওরে অবোধ মন,

মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন। [সকলের প্রস্থান]

[কথা কহিতে কহিতে বোড়শী ও ফকিরসাহেব প্রবেশ করিলেন]

ফকির। যে-সব কথা আমার কানে গেছে মা, চূপ করে থাকতে পারলাম না, চলে এলাম। কিন্তু

আমি ত কিছুতেই ভেবে পাইনে বোড়শী, সেদিন কিসের জন্য ও লোকটাকে তুমি এমন করে বাঁচিয়ে দিলে।

বোড়শী। ঐ নীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানই কি উচিত হতো ককিরসাহেব?

ককির। সে বিবেচনার ভার ত তোমার ছিল না মা, ছিল রাজার, তাই তাঁর জেলের মধ্যেও হাসপাতাল আছে, নীড়িত অপরাধীরাও তিনি চিকিৎসা করেন। কিন্তু শুধু এই যদি কারণ হয়ে থাকে ত তুমি অন্যায় করেছ বলতে হবে।

[বোড়শী নিঃশব্দে তাঁর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল]

ককির। যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ত্রুটি তোমাকে ওধরে নিতে হবে বোড়শী।

বোড়শী। তার অর্থ?

ককির। ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই এ তুমি জানো। শাস্তি হওয়া উচিত।

বোড়শী। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) আমি সমস্ত জানি। তাঁকে শাস্তি দেওয়াই হয়ত আপনারদের কর্তব্য, কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবার নয়। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোনদিন পারব না।

ককির। সেদিন পারো নি সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও কি পারবে না?

বোড়শী। না।

ককির। আশ্চর্যকার জন্যও না!

বোড়শী। না, আশ্চর্যকার জন্যও না।

ককির। আশ্চর্য! (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তুমি ত এখন মন্দিরে যাচ্ছ বোড়শী, আমি তা হলে চললাম। [বোড়শী হেঁট হইয়া নমস্কার করিল; ককির প্রস্থান করিলেন। অনামনস্কের ন্যায় বোড়শী চলিবার উপক্রম করিতেই সাগর দ্রুতবেগে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল]

সাগর। হী মা, তোমার বাবা তারাদাস ঠাকুর নাকি ঘরে ঘরে তাল্লা বন্ধ করে তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে? তারা সবাই মিলে নাকি মতলব করেছে, তোমাকে চণ্ডীমন্দির থেকে বিদায় করে আবার নতুন ভৈরবী আনবে? সে হবে না, সাগর সর্গার বেঁচে থাকতে তা হবে না বলে দিচ্ছি।

বোড়শী। এ স্বর তুমি কোথায় ওনলি সাগর?

সাগর। ওনেছি মা, এইমাত্র ওনতে পেয়ে তোমার কাছে জানতে ছুটে এসেছি। তুমি মেয়েমানুষ, তোমাকে একলা পেয়ে যদি জমিদারের লোক বাড়ি ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে সে কি তোমার অপরাধ? অপরাধ সমস্ত গ্রামের। অপরাধ এই সাগরের, যে কুটুম-বাড়িতে গিয়ে আমোদে মেতেছিল—মায়ের স্বর রাখতে পারেনি। অপরাধ তার খুড়ো ইরিহর সর্দারের, যে গাঁয়ের মধ্যে উপস্থিত থেকেও এতবড় অপমানের শোধ নিতে পারেনি।

বোড়শী। কিন্তু এই যদি সত্যি হয়ে থাকে সাগর, তোরা দুজন বুড়ো-ভাইপোতে উপস্থিত থাকলেই বা কি করতিস বল ত? জমিদারের কত লোকজন একবার ভেবে দেখ দিকি!

সাগর। তাও দেখিচি মা। তাঁর ঢের লোক, ঢের পাইক-পিয়ালা। গরীব বলে আমাদের দুঃখ দিতেও তারা কম করে না। কিন্তু দিক আমাদের দুঃখ, আমরা ছোটলোক বৈ ত না। কিন্তু তোমার হুকুম পেলে মা, ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার একবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুকুমকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা অটকাতে পারবে না।

বোড়শী। (শিহরিয়া) বলিল কি সাগর, তোরা কি এত নিষ্ঠুর, এমন ভয়ঙ্কর হতে পারিস? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের?

সাগর। এইটুকু? তোমার গায়ে হাত দেওয়াকে তুমি এইটুকু বল মা? তারাদাস ঠাকুরকেও আমরা মাপ করতে পারি, জনাৰ্জন রায়কেও হয়ত পারি, কিন্তু সুবিধে পেলে জমিদারকে আমরা সহজে ছাড়ব না। (ক্ষণেক ধামিয়া) কিন্তু ওরা যে সব কলাবলি করে মা, তুমি নাকি শুঁকেই সে-রায়ে হাকিমের হাত থেকে রক্ষা করেছ? নাকি বলোছ, তোমাকে ধরে নিয়ে কেউ যায় নি, নিজে ইচ্ছে করেই পিঁরেছিলো?

বোড়শী। এমন ত হতে পারে সাগর, আমি সত্য কথাই বলেছিলাম।

সাগর। তাই ত কিম্বা ঘটক সেখানেই মা, তোমার দুখ নিয়ে ত কখনো মিছে কথা যায় হয় না।

তবে এ কি। কিন্তু সে যাই হোক, যাই কেন না গ্রামসূত্র লোকে বলে বেড়াক, আমরা ক' বছর ছোটজাত তোমার ভূমিজ প্রজারা তোমাতেই মা বলে জেনেছি; যদি চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাও মা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাব যে কারা গেল।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

ষোড়শী। সাগর! একটা কথা তোকে বলতে পারলেম না বাবা, তাদের দায়িত্ব হয়ত আর বইতে পারব না।

[এককড়ির প্রবেশ]

ষোড়শী। কে, এককড়ি?

এককড়ি। (সসন্ত্রমে) আপনার কাছেই এলাম। হজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ষোড়শী। কোথায়?

এককড়ি। কাছাবিতে বসে প্রজাদের নালিশ শুনছেন। যদি অনুমতি করেন ত পালকি আনতে পারছি।

ষোড়শী। পালকি? এটি তাঁর প্রস্তাব, না তোমার সুবিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি। প্রাজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ স্বয়ং হজুরের আদেশ।

ষোড়শী। (হাসিয়া) তোমার হজুরের বিবেচনা আছে তা মানি, কিন্তু সম্প্রতি পালকি চড়বার আমার যুবসন্ত নেই এককড়ি। হজুরকে বলো আমার অনেক কাজ।

এককড়ি। ও-বেলায় কিংবা কাল সকালেও কি সময় হবে না?

সংসারী

এককড়ি। কিন্তু হলে ভাল হতো। আরও দশজন প্রজার নালিশ আছে কিনা।

ষোড়শী। (কটোর স্বরে) তাঁকে বলো এককড়ি, বিচার করার মত বুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের পতনের ককণ্ড। আমি তাঁর প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে।

[ষোড়শী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং এককড়ি কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অপর নিক দিয়া হৈম ও নির্মল প্রবেশ করিল। হৈমের হাতে পূজার উপকরণ]

হৈম। যে দয়ালু লোকটি তোমাকে সেদিন অন্ধকার রাতে বাড়ি পৌছে দিয়েছিলেন, সত্যি বল : তিনি কে? তাঁকে আমি চিনিছি।

নির্মল। চিনেছ? কে বল ত তিনি?

হৈম। আমাদের ভৈরবী। কিন্তু তুমি তাঁকে গেলে কোথায়, তাই শুধু? যে ঠাউরে উঠতে পারিনি!

নির্মল। পাবেননি? পেয়েছিলাম তাঁকে অনেক দূরে। তোমাদের কবি-সাহেবের সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা কথা শুনে ভাবি কৌতূহল হয়েছিল তাঁকে দেখবার। বুঁজে বুঁজে চলে গেলাম। নদীর পারে তার আশ্রম, সেখানে গিয়ে দেখি তোমাদের ভৈরবী আছেন বসে।

হৈম। তার কারণ, ফকিরকে তিনি গুরুর মত ভক্তি-প্রজ্ঞা করেন। কিন্তু সত্যিই কি তোমাকে প্রত্যয়ে হাত ধরে অন্ধকারে বাড়ি পৌছে দিয়ে গেলেন?

নির্মল। সত্যিই তাই। যে মুহুর্তে তিনি নিশ্চয় বুঝলেন প্রচণ্ড ঝড়জলের মধ্যে ভয়ঙ্কর অন্ধকার প্রভাবনা পথে আমি অন্ধের সমান, নাথী হয়েও তিনি অসঙ্কোচে হাত বাড়িতে দিয়ে বললেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু গুরুর জন্য এ কাজ তুমি পারতে না হৈম।

হৈম। না।

নির্মল। তা জানি। (ক্ষণেক থামিয়া) দেখ হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিনতে পারিনি সত্যি, কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বুঝি এঁর সম্বন্ধে। তার করার ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটে না। হয়, সন্তোষ জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই বাহ্যিক বস্তু—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেন না, না হয় সুনাম-দুর্নাম এঁকে স্পর্শ পর্যন্তও করতে পারে না।

হৈম। তুমি কি সেইদিনের জমিদারের ঘটনা মনে করেই এই-বব বলচ?

নির্মল। আশ্চর্য নয়। শাস্ত্রে বলে সাত পা একসঙ্গে গেলেই বজ্র হয়। অতবড় পথটায় ওই দুর্ভেদ্য আগারে একমাত্র তাঁকেই শাস্ত্র করে অনেক পা গুটিগুটি একসঙ্গে গেলাম, একটি একটি করে অনেক

প্রশ্নই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু পূর্বেও যে রহস্যে ঢাকা ছিলেন পরেও ঠিক তেমনি রহস্যে পা ঢাকা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন—কিছুই তাঁর হমিস পেলাম না।

হৈম। তোমার জেরাও মানলেন না, বন্ধুত্বও স্বীকার করলেন না?

নির্মল। না গো, না, কোনটাই না।

হৈম। (হাসিয়া কেলিল) একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্মল। এতবড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়েই বার করে নিতে চাও নাকি? কিন্তু নিজেকে জানতেও যে ঘেরি লাগে হৈম।

হৈম। ঘেরি লাগুক তবু পুরুষের হয়। কিন্তু মেয়েমানুষের এমনি অভিলাষ, আমরণ নিজের অপটু বৃত্তিতেই তার কেটে যায়।

নির্মল। (হৈমের হাত ধরিয়া) তুমি কি পাগল হয়েছ হৈম? চল, আমরা একটু তাড়াতাড়ি বাই, হয়ত পূজার বিলম্ব হয়ে যাবে। [উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য—নাট্যমন্দির

[গড়চতীর মন্দির ও সংলগ্ন প্রশস্ত অলিন্দ। সম্মুখে দীর্ঘ প্রাকারবেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে নাট্যমন্দিরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। দক্ষিণদিকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পথ। সকালে কাঁচা রোদের আলো চারিদিকে পড়িয়াছে; মন্দিরের অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনার্দন রায়, শিরোমণি ঠাকুর, নির্মল বসু, বোড়শী, হৈম এবং আরও কয়েকজন নরনারী।]

শিরোমণি। (বোড়শীকে) আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিতেছেন। তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না, তাঁর এই সম্বন্ধে তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য সুসিদ্ধ হবে না।

বোড়শী। (পাত্তর-মুখে) বেশ, তাঁর যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

শিরোমণি। কেবল এইটুকুই ত নয়! আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থির-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না। মায়ের ভৈরবী তোমাকে বাশলে আব চলবে না। কে আছে, একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাক ত; [একজন ডাকিতে গেল]

বোড়শী। কেন চলবে না?

জনৈক ব্যক্তি। সে তোমার বাবার মুখেই শুনেতে পাবে।

জনার্দন। আগামী চৈত্রসংক্রান্তিতে নতুন ভৈরবীর অভিব্যেক হবে, আমরা স্থির করেছি।

[তারাদাস একটি দল বছরের মেয়ে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিল]

হৈম। (তারাদাসের দিকে চাহিয়া) যা সমস্ত শুনিচি বাবা, তাতে কি শুঁও কথাই সত্যি বলে মনে নিতে হবে?

জনার্দন। নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম। (ছোট মেয়েটিকে দেখাইয়া) এটিকে যখন উনি যোগাড় করে এনেছেন তখন মিথো বলা কি শুঁও এতই অসম্ভব? তা ছাড়া সত্যি মিথো ত যাচাই করতে হয় বাবা, ও ত একতরফা রায় কেওতা? চলে না। [সকলেই বিম্বিত হইল]

শিরোমণি (স্থিতহস্যে) বেটী কৌসলীর গিন্নী কিনা, তাই চেঁচা ধরেছে। আচ্ছা, আমি দিচ্ছি থাকিয়ে, (হৈমকে) এটা দেবীর মন্দির—পীঠস্থান! বলি এটা ত মানিস?

হৈম। (খাড় নাড়িয়া) মানি বৈ কি!

শিরোমণি। তা যদি হয়, তা হলে তারাদাস বামুনোর ঘেসে হয়ে কি দেবমন্দিরে গাড়িয়ে মিছে কথা কইতে পাগলী? (প্রকল হাস্য করিলেন)

হৈম। আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণিমাশ! অথচ এই দেবমন্দিরে গাড়িয়েই ত মিছে কথা বৃষ্টি করে গেলেন। আমি ত একবারও বলিনি ঐকে দিয়ে কাজ করালে আমার সিদ্ধ হবে না।

[শিরোমণি হতবুদ্ধির মত হইলেন]

জনার্ন। (কুণ্ঠিত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে) বলনি কি রকম?

হৈম। না বাবা বলিনি। বলা দূরে থাক, ও-কথা আমি মনেও করিনে। বরঞ্চ ঠকে দিয়েই আমি পূজো করাব, এতে ছেলের আমার কল্যাণই হোক, আর অকল্যাণই হোক। (ষোড়শীর প্রতি) চলুন মন্দিরের মধ্যে—আমাদের সময় বয়ে যাচ্ছে।

জনার্ন। (গৈর্য হারাইয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ-কণ্ঠে) কথখনো না, আমি বেঁচে থাকতে ওকে কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে দেব না। তারাদাস, বল ত ওর মায়ের কথাটা। একবার শুনুক সবাই।

শিরোমণি। (সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া) না তারাদাস, থাক। ওর কথা আপনার মেয়ে হয়ত বিশ্বাস করবে না রায়মশায়। ও-ই বলুক। চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজে বলে নাক। কি বল চাটুঘো? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্টাচার্য? কেমন? ও-ই নিজে বলুক।

[ষোড়শী বখ বিবর্ণ হইয়া গেল।]

হৈম। আপনারা ঠর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নিনেন, এতবড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেব না। (ষোড়শীর প্রতি) চলুন আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে—

ষোড়শী। না বোন, আমি পূজো করিনে, যিনি এ কাজ নিত্য করেন তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়। (পূজারী বর্গের প্রতি) কিন্তু—ডেউঠাকুরমশাই, তুমি ইতস্ততঃ করচ কিসের জন্য? আমার আদেশ রইল সর্বদা পূজা ব্রতদীর্ঘ সেবে তুমি নিজেব প্রাণা নিয়ে। বাকী মন্দিরের ভাঁড়ারে বস্তু করে চাবি আমাকে পাহায়ে দিয়ে। (হৈমের প্রতি) আমি আবার আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, এতেই তোমার ছেলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে।

[ষোড়শী প্রাঙ্গণ হইতে নিস্তান্ত হইয়া গেল এবং পুরোহিত

পূজার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন]

জনার্ন। (চৈতন ও হৈমের প্রতি) যাও মা তোমরা—পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে যাও—পূজোটি যাতে সুসম্পন্ন হয়। (সঙ্গে সঙ্গে)

[নির্মল ও হৈম মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন]

জনার্ন। সন্ন্যাসী বৎস! শিরোমণিমশায়, ষোড়শী আপনাই চলে গেল। ছুঁড়ি জ্বিদ করে যে তোমার মন্দিরে আসুক পূজাটি পূর্ণ করে দিলে না এই ঢেব।

শিরোমণি। এতে ওকেই হবে ভায়া, মা মহামায়া! মায়া কি রোধ করতে পারে? এ যে ওঁরই ইচ্ছে। এই সন্ন্যাসী তিনি যুক্তকরে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

যোগেন ভট্টাচার্য। (স্বল্য বাতাইয়া দেখিয়া) আঁা, এ যে যয়ং চক্ৰবর্তী বহেন।

[সকলেই হস্ত এবং চকিত হইয়া উঠিল, জীবানন্দ ও

হৈমের পক্ষান্তরে কয়েকজন পাইক ও ভৃত্য প্রভৃতি প্রবেশ করিল]

শিরোমণি ও জনার্ন। আসুন, আসুন, আসুন, আসুন।

[কেহ নমস্কার করিল, অনেকেই প্রণাম করিল]

জনার্ন। আমার পবন সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন। আজ আমার নৌহিল্লের কল্যাণে মায়ের পূজা দেওয়া হচ্ছে।

জীবানন্দ। বটে? তাই বুঝি বাইরে এত জন-সমাগম? [জনসংখ্যায় মুখ নত করিলেন]

শিরোমণি। চক্ৰবর্তীর সেইটি ভাল আছ?

জীবানন্দ। দেহ? (হাসিয়া) হাঁ, ভালই আছে। 'ই ত আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, বতলাকে ভিড় কবে এইদিকে আসচে। সঙ্গ নিলাম। অদ্ভুত শ্রম ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণ এবং সাধু-সঙ্গ তিনটেই বরাতে জুটে গেল। কিন্তু বায়মশায়কে জানি, আপনারকে ত বেশ চিনতে পারলাম না ঠাকুর? জনার্ন। ইনি সর্বেশ্বর শিরোমণি। প্রাচীন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। গ্রামের মাথা বললেই হয়।

জীবানন্দ। বটে? বেশ, বেশ, বড় আনন্দ লাভ করলাম। তা এইখানেই একটু বস। যাক না কেন?

[শিস্তে উদাত্ত হইলে সকলেই বাস্তু হইয়া উঠিল]

শিরোমণি। (চীৎকার করিয়া) আসন, আসন, বসবার একটা আসন নিয়ে এস কেউ—
জীবানন্দ। ব্যত্ হবেন না শিরোমণিমশাই, আমি অতিশয় বিনয়ী লোক। সমরধিপেয়ে ওয়ে
পড়তেও অভিমান বোধ করিনে—এ ত ঠাকুরবাড়ি। বেশ বস। বাবে।

[জীবানন্দ উপবেশন করিলেন]

জনার্দন। একটা গুরুতর কার্যোপলক্ষে আমরা সবাই আপনার কাছে বাব হির করেছিলাম, শুধু
আপনি পীড়িত মনে করেই যেতে পারিনি।

জীবানন্দ। গুরুতর কার্যোপলক্ষে?

শিরোমণি। হাঁ হজুর, গুরুতর বৈ কি। বোড়শী ভৈরবীকে আমরা কেউ চাইনে।

জীবানন্দ। চান না?

শিরোমণি। না, হজুর।

জীবানন্দ। একটুখানি জনকৃতি আমার কানেতেও পৌছেচে। ভৈরবীর বিরুদ্ধে আপনাদের
নাশিষ্টা কি শুনি? [সকলেই নীরব রহিল]

জীবানন্দ। বলতে কি আপনাদের করুণা বোধ হচ্ছে?

জনার্দন। হজুর সর্বজ্ঞ, আমাদের অভিযোগ—

জীবানন্দ। কি অভিযোগ?

জনার্দন। আমরা গ্রামস্থ বোল-আনা ইতর-ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ। (একটু হাসিল) তা দেখতে পাচ্ছি। (অমূল্য-নির্দেশ করিয়া) ওইটি কি সেই ভৈরবীর
বাগ তারাদাস ঠাকুর নয়? [তারাদাস সাড়া দিল না, মাটিতে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিল]

শিরোমণি। (সবিনয়ে) রাজার কাছে প্রজা সজ্ঞান-তুল্য, তা সে দোষ করলেও সজ্ঞান, না করলেও
সজ্ঞান। আজ কথটা একরকম ওরই। ওর কন্যা বোড়শীকে আমরা নিশ্চয় হিব করেছি, তাকে আর
মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমার নিবেদন, হজুর তাকে সেবায়তের কাজ থেকে
অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জীবানন্দ। (চকিত) কেন? তার অপরাধ?

দু'তিনজন ব্যক্তি। (সম্মুখে) অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ। তিনি ইঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেছেন রায়মশায়, যার জন্যে তাঁকে তাড়ানো
আবশ্যক। [জনার্দন শিরোমণিকে বলিতে চোখের ইঙ্গিত কবিল]

জীবানন্দ। না, না, উনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, বুড়ো মানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই,
ব্যাপারটা আপনিই ব্যস্ত করুন।

জনার্দন। (চোখে ও মুখে বিধা ও সঙ্কোচের ভাব আনিয়া) ব্রাহ্মণ-কন্যা—এ আদেশ আমাদের
করবেন না।

জীবানন্দ। গো-ব্রাহ্মণ আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কারও অবদিত নেই। কিন্তু এতগুলি
ইতর-ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উঠেপড়ে লেগেছেন, তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা
আমার বিশ্বাস হয়েছে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

জনার্দন। (শিরোমণির প্রতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানিয়া) হজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্ছেন তখন আর ভয়
কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন না।

শিরোমণি। (কৃত্ত হইয়া) সত্যি কথার ভয় কিসের জনার্দন? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ
রাখব না হজুর। তার বভাব-চরিত্র ভারী মন্দ হয়ে গেছে—এই আপনাকে আমরা জানিতে দিচ্ছি।

[জীবানন্দের পরিহাস-বীণ প্রকৃত্ত মুখ অকস্মাৎ গভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল]

জীবানন্দ। তাঁর বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন?

[সকলে খাড় নাড়িল]

জীবানন্দ। তাই সুবিচারের অশায়ে বেছে বেছে একেবারে ভীষ্মদেবের পরণামের হয়েছেন
রায়মশায়?

শিরোমণি। আপনি দেশের রাজা—সুবিচার বলুন, অবিচার বলুন, আপনাকেই করতে হবে। আমাদেরও তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চতুর্দিক ত আপনাই।

জীবানন্দ (মুদু হাসিয়া) দেখুন শিরোমণিমশায়, অতি-বিনয়ে আপনাদেরও খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি-গৌরবে আমাদেরও আকাশে তোলবার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু জানতে চাই, এ অভিযোগ কি সত্য? [অনেকেই উত্তেজনার চক্কর হইয়া উঠিল]

শিরোমণি। অভিযোগ? সত্য কিনা!—আচ্ছা, আমরা না হয় পর, কিন্তু তারাদাস, তুমিই বল ত। রাজদ্বার, যথার্থ বলো— [তারাদাস একবার পাণ্ড একবার রাজা হইয়া উঠিতে লাগিল। জনার্দনের ক্রুদ্ধ একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা মরিয়া যেন তাহাকে বাংগাবার তাড়না করিতে লাগিল। সে একবার টোক গিলিয়া একবার কঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল]

তারাদাস। হজুর—

জীবানন্দ। (হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া) ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কলঙ্কের কথা আমি যথার্থ বললেও গুনব না। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথার্থ বলুন।

[ভূত অস্তুরালে ছিল, সে টমুরার ভরিয়া হইলি সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া

দিল। তিনি এক নিশ্বাসে পান করিয়া বেয়ারার হাতে ফিরাইয়া দিলেন]

জীবানন্দ। আঃ—বাঁচলাম। আপনাদের অজ্ঞান বাক্য-সুধা পান করে তেঁস্তায় বুক পর্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপচাপ যে! কি হলো আপনাদের যথার্থমের?

[শিরোমণি নাকে কাপড় দিয়াছিলেন]

জীবানন্দ। (সহাস্যে) শিরোমণিমশায় কি ঘ্রাণে অর্ধভোজনের কাজটা সেরে নিলেন নাকি?

[অনেকেই হাসিয়া মুখ ফিরাইল]

শিরোমণি। (হতবুদ্ধি হইয়া) এই যে বলি হজুর। আমি যথার্থই বলব।

জীবানন্দ। (খোঁচ নাড়িয়া) সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট চবিত্তের কাহিনী তাব অসম্মানে বলার মধ্যে আপনার কথাটা যদি বা থাকে, ধর্মটা থাকবে কি? আমার নিজের কোন বিশেষ আপত্তি নেই—ধর্মধর্মের বালাই আমার বর্ধন ঘুচে গেছে—তবু আমি বলি, ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা ভিক্ষাসা করি তার জবাব দিন। বর্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতাড়ি চান—এই না?

সকলে। (মাথা নাড়িয়া) হাঁ, হাঁ।

জীবানন্দ। একে নিয়ে আর সুবিধা হচ্ছে না?

জনার্দন। (প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা তুলিয়া) সুবিধে-অসুবিধে কি হজুর, গ্রামের ভালর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া ফেলিয়া) অর্থাৎ গ্রামের ভালমন্দের আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আপনার ভালমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কিনা জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই; কিন্তু আর কোন একটা অভ্যুত্থান তৈরি করা যায় না? দেখুন না চেঁচা করে। বরঞ্চ আমাদের এককড়িটিকেও না হয় সঙ্গে নিন, এ বিষয়ে তার বেশ একটু হাতবশ আছে।

[সকলে অবাক হইয়া রহিল]

জীবানন্দ। এদের স্ত্রীপনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং স্মরণীয় তাকে আর নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাকলেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবদেরও ভৈরবী নইলে চলে না, এ অতি সনাতন প্রথা—সহজে টলানো যাবে না। দেবী ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত বা দেবী নিজেও পূর্ণা হবেন না—একটা হাস্যাত্মক বাধবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা-পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাকি হাতে গোনা যেত না। কি বলেন, শিরোমণিমশায়, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব?

শিরোমণি (শুদ্ধমুখে জনান্তিকে) কি জানি, ওনেছি নাকি? [প্রকৃত প্রবেশ করিল, তার হাতে ইংরিজি বাংলা কয়েকখানা সংবাদপত্র ও কতকগুলো খোলা চিঠিপত্র]

জীবানন্দ। কিহে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে? প্রফুল্ল। (ছাড় নাড়িয়া) সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হতো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এতলো দেখবার কি এখন সময় হবে? অভ্যস্ত জরুরী।

জীবানন্দ। তা বুকেছি, নইলে এখানে আনবে কেন? কিন্তু দেখবার সময় আমার এখনও হবে না, অন্য সময়েও হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্ছে। ওই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি তাঁর উকিলের, না একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা ত দেখছি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতি সুধার গন্ধ যেন কাগজ ফুড়ে বার হচ্ছে। কি বলেন সাহেব? ডিক্রি জারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেন—জানাচ্ছেন? আঃ—সেকালের ব্রাহ্মণ্যভেজ যদি কিছু বাকী থাকত ত এই ইহুদি ব্যাটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধতে হতো না।

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল হইয়া) কি বলচেন দাদা? থাক, থাক, আর একসময়ে হবে। (কিরিতে উদ্যত হইল)

জীবানন্দ। (সহাস্যে) আরে লজ্জা কি ভায়া, এরা সব আপনার লোক, জাতগোষ্ঠী, এমন কি মণিমাণিক্যের এপিঠি-ওপিঠি বললেও অত্যাঙ্কি হয় না! তা ছাড়া তোমার দাদাটি যে কঙ্করী-মুগ, সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে তাই? প্রফুল্ল, রাগ করো না ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে বড় বাকী রাখিনি, কিন্তু এই চম্পিটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারব বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ নোট-টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আনতে পারতে হে—

প্রফুল্ল। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিয়া) দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবে না। সত্য ভেবে যদি কেউ—

প্রফুল্ল। (গম্ভীর হইয়া) সন্ধান করে নিয়ে আসেন? তা হলে ও বেঁচে যাই প্রফুল্ল! রায়মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাওনা কি এমন কেউ—

জনার্নন। (মানমুখে উঠিয়া) বেলা হলো যদি অনুমতি করেন ত—

জীবানন্দ। বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লর জ্বাক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া ভৈরবীর কথাটা শেষ হয়ে যাক। কিন্তু আমি যাও বললেই কি সে যাবে?

জনার্নন। সে তার আমাদের।

জীবানন্দ। কিন্তু তাঁর কাউকে ত বাহাল করা চাই, ও ত খালি থাকতে পারে না।

অনেকে। সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ। যাক বাঁচা গেল, তবে সে যাবেই। এতগুলো মানুষের বিশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা-চণ্ডীও সামলাতে পারেন না। আপনারদের লাভ-লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমাদের এমন অবস্থা যে, টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্ধাবস্থে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভালো কথা, কেউ দেখে ত রে এককড়ি আছে না গেছে; কিন্তু গলগটা এদিকে যে নকড়ি হয়ে গেল।

বেয়ারা। (প্রবেশ করিয়া প্রভুর বাগ-ব্যাকুল দৃষ্টে পূর্ণপাত্র দিয়া) তিনি বাগাবাড়ার দরওয়ানো দেখছেন।

জীবানন্দ। এর মধ্যেই? ডাক তাকে। (মদ্যপান)

[ইয়ার পর হইতে পূজাবীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল ও পূজা শেষ করিয়া বাহির হইয়া বাহিরে লাগিল—ভাস্কর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। এককড়ি প্রবেশ করিল।]

জীবানন্দ। আজ যে ভৈরবীকে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিল?

এককড়ি। আমি নিজে গিয়েছিলাম।

জীবানন্দ। তিনি এসেছিলেন?

এককড়ি। আজ্ঞে না।

জীবানন্দ। না কেন? (এককড়ি অধোমুখে নীরব) তিনি কখন আসবেন, জানিয়েছেন?

এককড়ি। (ভেমনি অধোমুখে, এত লোকের সামনে আমি সে কথা জিজ্ঞাস্যে পেশ করতে পারব

না।

জীবানন্দ। এককড়ি তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আসবেন না,—না? এককড়ি। না।

জীবানন্দ। কেন?

এককড়ি। তিনি আসতে পারবেন না। তিনি বললেন, তোমার হজুরকে বলো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যো-বুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে—আমার বিচার করবার জন্যে আদালত খোলা আছে।

জীবানন্দ। (অঙ্ককার-মুখে) হাঁ। আচ্ছা তুমি যাও। [এককড়ির প্রস্থান]

জীবানন্দ। প্রকৃত, সেই যে চিনির কোম্পানির সঙ্গে হাজার বিঘে জমি বিক্রির কথা হয়েছিল, তার দলিল লেখা হয়েছে?

প্রকৃত। আজ্ঞে হয়েছে।

জীবানন্দ। একুশি তুমি গিয়ে সেটা পাকাপাকি কর গে। লিখে দাও জমি তারা পাবে।

প্রকৃত। তাই হবে। [পূজার্থী ও পূজার্থীরা যাইতেছে আসিতেছে]

জীবানন্দ। আজ যে পূজার বড় ভিড় দেখছি। না, রোজই এইরকম?

জনার্দন। আজকের একটু বিশেষ আয়োজন ত আছেই, তা ছাড়া এই চড়কের সময়টায় কিছুদিন ধরে এমনিই হয়। লোকজনের ভিড় এখন বাড়তেই থাকবে।

জীবানন্দ। তাই নাকি? বেলো হলো এখন তা হল আসি। (হাসিয়া) একটা মজা দেখেছেন রায়মশায়, চণ্ডীগড়ের লোকগুলো প্রায়ই ভুলে যায় যে, জমিদার এখন কালীমোহন নয়—জীবানন্দ চৌধুরী। অনেক প্রভেদ, না? [জনার্দন কি যে জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না।

গুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

জীবানন্দ। এখানে বৈষ্ণবদের প্রজা নয় এমন একটা প্রাণীও নেই। ঠিক না শিরোমণিমশায়?

শিরোমণি। তাতে আর সন্দেহ কি হজুর।

জীবানন্দ। না, আমার সন্দেহ নেই, তবে আর কাহও না সন্দেহ থাকে। আচ্ছা, নমস্কার শিরোমণিমশায়, চললাম। (হাসিয়া) কিন্তু ভৈরবী-বিদায়েব পালটা শেষ করা চাই। প্রকৃত, যাওয়া যাক। [প্রস্থান]

শিরোমণি। (জমিদার সতাই গেল কিনা উঁকি মাঝিয়া দেখিয়া) কল্যাণ, কিরূপ মনে হয় ভায়া?

জনার্দন। মনে ত অনেক কিছুই হয়।

শিরোমণি। মহাপাপিষ্ঠ—লজ্জা-শরম আলো নেই।

জনার্দন। (গম্ভীরমুখে) না।

শিরোমণি। ভাবী দুমুখ। মানব মান-মর্যাদার জ্ঞান নেই।

জনার্দন। না।

শিরোমণি। কিন্তু দেখলে ভায়া কথার ভঙ্গী? সোজা না বাঁকা, সত্য না মিথ্যা, তামাশা না ভিত্তিকার, ভেবে পাওয়াই যায়, অশ্লোক কথা ত বোঝাই গেল না, যেন কোঁসালি। পাশও সত্যি বললে, না আমাদের বান্দর নাচালে ঠিক হারব করা গেল না। ভানে সব, কি বল? [জনার্দন নিরুত্তর]

শিরোমণি। যা ভাবা। গয়েছিল বাটা হাবা-গোবা নয়—বিবাহ-সম্বন্ধ হবে না বলেই যেন শঙ্কা হচ্ছে, না?

জনার্দন। মায়ের অভিক্রটি।

শিরোমণি। তাব আর কথা কি? কিন্তু ব্যাপারটা এখন কিছুড়ি পাকিয়ে গেল। না গেল একে ধরা, না গেল ভায়া মারা। তোমাব কি ভায়া, পয়সার জোর আছে, হুঁড়ী যন্ত্রের মত আগলে আছে, গেলে সুমুখের বাগান-বেড়াটা তোমার গনা দিয়ে চৌকোস হতে পারবে। কিন্তু বাঘের গর্তের মুখে বান্দ পাড়তে দিয়ে না শেষে আমি মারা পড়ি।

জনার্দন। জ্ঞান কি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?

শিরোমণি। না না, নয় নয়,—কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেলে তা ত তোমারও মুখ দেখে

অনুভব হচ্ছে না। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই—কথাও যেমন হৈয়ালী, কাজও তেমনি অল্পুত। ও যে ধরে গলা টিপে মদ খাইয়ে নেয়নি এই আশ্চর্য। এককড়ির মুখে ভৈরবী ঠাকুরনের হুমকিও ত ওনলো? তোমরা চুপ করে ছিলে, আমিই মেলা কথা করেছি—ভাল করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় নাকি। দুয়ের মাঝখানে পড়ে শেবকালে না বেড়া জালে ধরা পড়ি।

জনাবর্ন। (উদাস-কণ্ঠে) সকলই চতীর হচ্ছে। বেলা হলো, সন্ধ্যার পর একবার আসবেন।

শিরোমণি। তা অসব। কিন্তু এ যে আবার এঁরা ফিরে আসছেন হে!

[মন্দির-প্রাঙ্গণের একটা দ্বার দিয়া বোড়শী ও তাহার পাশ্চাতে সাগর ও তাহার সঙ্গী প্রবেশ করিল। অন্য দ্বার দিয়া জীবানন্দ, প্রফুল্ল, ভূতা ও কয়েকজন পাইক প্রবেশ করিল]

জীবানন্দ। চলে যাচ্ছিলাম, শুধু তোমাকে আসতে দেখে ফিরে এলাম। এককড়িকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এবং তারই মুখে তোমার জবাবও ওনলাম। তোমার বিরুদ্ধে রাজার আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার বুদ্ধি আমার নেই, কিন্তু নিজের প্রজাদের শাসনে রাখবার বিদ্যাও জানি। সমস্ত গ্রামের প্রার্থনা-মত তোমার সম্বন্ধে কি আবেশ করেছি ওনেহ?

বোড়শী। না।

জীবানন্দ। তোমাকে বিদায় করা হয়েছে। নতুন ভৈরবী করে, তাকে মন্দিরের ভাঁব দেওয়া হবে। অভিষেকের দিনও স্থির হয়ে গেছে। তুমি রায়মশায় প্রভুত্বের হাতে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুকিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিদ্ধকের চাবি দেবে। এ বিষয়ে তোমাব কিছু বলবার আছে?

বোড়শী। আমার বক্তব্যে আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ। না, নেই। তবে আজ সন্ধ্যার পবে এইখানেই একটা সভা হবে। ইচ্ছা কর্তে তুমিও দল্লেশ সামনে তোমার দুষ্ট জানাতে পার। ভালো কথা, ওনতে পেলাম আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের নাকি তুমি বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা করচ?

বোড়শী। তা জানিনে। তবে আমার নিজের প্রজাদের অপনার উপগ্রহ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।

জীবানন্দ। (অধর দংশন করিয়া) পারবে?

বোড়শী। পারা না, পারা না-চতীর হাতে।

জীবানন্দ। তাস্তা মরবে।

বোড়শী। মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

[ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যে সে কষ্টে আপনাকে সংবৃত করিয়া বসিয়াছে।]

জীবানন্দ। (একমুহূর্ত্ত স্বস্তি থাকিয়া) তোমার নিজের প্রজা আজ কেউ নাই। তারা যাব প্রজা তিনি নিজে দস্তখত করে দিয়েছেন। তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

বোড়শী। (মুখ তুলিয়া) আপনার আর কোন ঝগড়া আছে? নেই? তা হলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা ওনুন।

জীবানন্দ বল।

বোড়শী। আজ দেবীর অস্থাবর সম্পত্তির বুকিয়ে দেবার সময় আমার নেই, এই সন্ধ্যায় মন্দিরের কোথাও সভা-সমিতি স্থানও হবে না। এতলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি। (দহস্য চীৎকার করিয়া) কখনো না! কিছুতেই নয়! এ-সব চালাকি আমাদের কাছে বাটবে না বলে দিচ্ছি— [জীবানন্দ ছাড়া সকলেই ইহার প্রতিপত্তি করিয়া উঠিল]

জনাবর্ন। (উদ্ভার সহিত) তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর জায়গা কেন হবে না তুমি ঠাকুরন?

বোড়শী। (বিনীত-কণ্ঠে) আপনি শু জানেন বারমশাই, এখন চড়কের ঔৎসব। বাড়ীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়?

জনাবর্ন। (আত্মবিস্মৃত হইয়া সপর্জনে) হতেই হবে! আমি কলি হতে হবে।

ষোড়শী। (জীবনানন্দকে) ঝগড়া করতে আমার যুগা বোধ হয়। তবে ও-সব করবার এখন সুযোগ হবে না, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিতে বলে দেবেন। আমার সময় অল্প ; আপনারদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চললাম।

জীবনানন্দ। (তপ্তবরে) কিন্তু আমি কিছুমি নিয়ে যাচ্ছি, আজই এ-সব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

ষোড়শী। জোর করে?

জীবনানন্দ। হাঁ, জোর করে।

ষোড়শী। সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক।

জীবনানন্দ। হাঁ, সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক।

ষোড়শী। (পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে সাগরকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া) সাগর, তোদের সমস্ত ঠিক আছে?

সাগর। (সবিনয়ে) আছে মা, তোমার আশীর্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী। বেশ। জমিদারের লোক আজ একটা হাস্যাম বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে। এই গাজনের সময়টায় রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ, এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। হঠাৎ মারিস নে—তুণ্ড বার করে দিবি।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ষোড়শীর কুটীর

[সন্ধ্যা এইমাত্র উদীয় হইয়াছে। গৃহের অভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাহিরে ষোড়শী উপবিষ্ট। এমন সময়ে নির্মল ও হৈম প্রবেশ করিল। পিছনে ভৃত্য]

ষোড়শী। এস, এস, কিন্তু এ কি কাণ্ড! তোমাদের যে আজ দুপুরের গাড়িতে যাবার কথা ছিল?

[নির্মল ও হৈম নিকটে উপবেশন করিল]

হৈম। কথা ছিল, কিন্তু যাইনি। ঐকেও যেতে দিইনি। দিদির এই নতুন ঘরখানি চোখে দেখে না গেলে দুঃখ কবতে হতো।

নির্মল। চোখে দেখে গিয়েও দুঃখ কম করতে হবে মনে হয় না।

হৈম। সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখলেই ছিল ভালো। এ ঘরের আব শা দোষ থাক, অপব্যয়ের অপবাদ শিবোন্নয়নশায় কেন, বোধ হয় আমার বাবাও দিতে পারেন না। কিন্তু এ পাগলামি কেন করবে দিদি, এ ঘরে ত তুমি থাকতে পারবে না!

ষোড়শী। এবে চেয়েও কত ঝারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাকতে হয় ভাই।

হৈম। তা হলে সত্যিই কি তুমি সব ছেড়ে দেবে?

নির্মল। তা ছাড়া কি উপায় আছে বলতে পার? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক নির্দোষ বিবাদ কবে টিকতে পারে না।

হৈম। আমরা সমস্তই ওনেছি। তুমি সন্ন্যাসিনী, সবই তোমার সইবে, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী। দুর্নাম যদি মিঃ হৈ হয় সইবে না কেন? হৈম, সংসার মিথ্যা কথার অভাব নেই, কিন্তু সেই মিথ্যা কথার সঙ্গে ঝগড়া করে মিথ্যা কাজের সৃষ্টি করতে আমার লজ্জা করে বোন।

হৈম। দিদি, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার শপথকে কোন এক ১ গ একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় জানো? আমার শপথকে কোন এক ১ গ একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন। ঝাপঝানো তার ধূলো বালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ঘরেনি। সে যেমন সোজা, তেমন খাঁটি, তেমন কঠিন। তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয় দেশসুদ্ধ লোকে সবাই ভুল করেছে, আসল কথা কেউ কিছুই জানে না।

ষোড়শী। (হৈমর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া) আজ তোমাদের কেন বাওয়া হলো না হৈম? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে, না?

হেম। আমার হেলের কথা তুললেই তুমি রাগ কর, সে আর বলব না, কিন্তু ভরতর দুর্বোপের রাস্তে আমার এই অন্ধ মানুষটিকে যিনি হাতে ধরে নবী পার করে এনে নিঃশব্দে গিয়ে গেছেন, তাঁর পারের খুশো না নিয়েই বা আমরা যাই কি করে? কিন্তু বাবার আগে এই কথাটি আজ দাও নিমি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয়, এই ধবাসী বোনটিকে তখন তুলো না।

হেম। (বোড়শীকে নীরব দেখিয়া) কথা দিতে বুকি চাও না নিমি?

বোড়শী। কথা দিলাম, তুলব না। তুলিওনি হেম। আঘাত পেয়ে আজই তোমাকে একখানা চিঠি লিখছিলাম, ভেবেছিলাম, তুমি চলে গেলে সেখানা তোমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু শেষ করতে পারলাম না, হঠাৎ মনে পড়ল এর জন্যে হয়ত তোমার বাবার সঙ্গেই শেষ পর্বত বিবাদ বেধে যাবে।

হেম। যেতেও পারে। কিন্তু আরও যে একটা মস্ত কথা আছে নিমি। আমার এই অন্ধ মানুষটিকে তুমি রকে করেছ, তার চেয়ে বড় সংসারে ত আমার কিছুই নেই।

বোড়শী। সত্যিই কিছু নেই হেম?

হেম। না, নেই। আর এই সত্যি কথাটিই বলে যাব বলে আজ বেতে পারিনি।

বোড়শী। (হাসিয়া) কিন্তু এই ছোট কথাটুকুর জন্যে ত একজনই যথেষ্ট ছিল তাই, নির্মলবাবুকে ত অন্যরাসে যেতে দিতে পারতে?

হেম। একে? একলা? হায়, হায়, দিদি, বাইরে থেকে তোমরা তাব শ্রুত ব্যারিস্টার, মন্তলোক। কিন্তু আমিই জানি শুধু এই বিনি-মাইনের দাসীটিকে পেয়েছিলেন বলেই উনি জগতে টিকে গেলেন। বাস্তবিক দিদি, পুরুষমানুষদের এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। বাইরের দিকে যিনি যত বড়, যত দুর্গম, যত শক্তিমান, ভিতরের দিকে তিনি তেমনি অক্ষম, তেমনি দুর্বল, তেমনি অশুট। দরকারের সময় কোথায় হারাবে এদের কাগজপত্র, বার হবার সময়ে কোথায় যাবে জামা-কাপড়-পোশাক, স্বাস্থ্যের খেরিয়ে কোথায় কেসবে পকেটের টাকাকড়ি—কোন ভরসায় একলা ছেড়ে দিই বল ত? (সহাস্যে) একটুখানি চোখের আড়াল করেছিলাম বলেই ত সেদিন অমন বিরাট বাধিয়েছিলেন। ভাগ্যে তুমি ছিলে!

ভূতা। মা, কালকের মত আজও বড়-জল হতে পারে—মেঘ উঠেছে।

হেম। আজ তা হলে উঠি। মেঘের জন্যে নয় দিদি, তোমার কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কাল সকালেই যাত্রা করতে হবে—আজ যেন আর কাজের অন্ত নেই। একে নিয়ে পালিয়ে এসেছি, লুকিয়ে বাড়ি ঢুকতে হবে—বাবা না দেখতে পান। এতকণে খোকা হয়ত ঘুম ভেঙ্গে উঠে বলে কীদখে, তাকে আবার দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে, এর খাওয়া-দাওয়া লম্বা ছাড়া আর কেউ বোঝে না, আড়ালে থেকে সে ব্যবস্থা করতে হবে—তার পরে রেলগাড়িতে দীর্ঘ পথের সমস্ত আরোহণই আমাকে নিজের হাতে করে নিতে হবে। কারও উপর নির্ভর করবার জো নেই। হার্মী, পূত্র, চাকর-বাকর—তার কত স্বপ্নটি, কত ভার—আমার নিঃশ্বাস কেসবারও সময় নেই দিদি।

বোড়শী। এতে ত তোমার কষ্ট হয় বোন?

হেম। (হৃদয়স্পর্শে) তা হয়। তবু এই আশীর্বাদ আমাকে কর তুমি, যেন এই কষ্ট যাত্রার নির্যাসে একদিন বেতে পারি। আর কিরে যদি আবার জন্ম নিতেই হয়, যেন এমনি কষ্টই বিধাতা আমার অশ্রুতে লিখে দেন। সেদিনও যেন এমনি নিঃশ্বাস কেসবারও অবকাশ না পাই।

বোড়শী। তোমার কথাটা আমি বুঝি হেম। এ যেন তোমার আনন্দের মণ্ডুচু। ভার বতই বড়চে ততই এর রক্ত মধুতে ভরে ভরে উঠেছে। তাই হোক, এই আশীর্বাদই তোমাকে আজ করি:

হেম। (সহসা পদধূলি লইয়া) তাই কর দিদি, মেরেমানুষের জীবনের এর বড় আশীর্বাদ কি আছে! নির্মল। আঃ, কি বকে ব্যতো বল ত? আজ তোমার হলো কি?

হেম। কি যে হয়েছে, তুমি তার জানবে কি?

বোড়শী। জানার শক্তিই আছে নাকি আপনারদের?

নির্মল। আপনারদের অর্থাৎ পুরুষদের ত? না, এতবড় কঠিন তত্ত্ব কলস্রম করবার সাধ্য নেই আমাদের সে কথা মানি, কিন্তু আপনিই বা এ সত্য জানলেন কি করে?

হেম। কেন? সেবীর ভৈরবী বলে? কিন্তু ভৈরবী কি নারী নয়? তবো কখন, এ তত্ত্ব আমাদের চোখে করে নিখতে হয় না। আমাদের জন্মকালে বিধাতা যখনই তাঁর দুই হাত পূর্ণ করে আমাদের বুকের

মধ্যে ঢেলে দেন। সে সম্পদের কাছে ইজ্ঞাপীর ঐশ্বর্যও কামনা করিনে এ কি সত্যি নয় দিদি? বোড়শী। সত্যি বৈ কি ভাই।

ভূতা। মা, মেঘ যে বেড়েই আসচে?

হৈম। এই যে উঠি বাবা। অনেক বাচালতা করে গেলাম দিদি, মাণ করো।

নির্মল। হৈমকে যে চিঠিখানা লিখছিলেন তাঁর হাতে দিলে সময়ও বাঁচত, খরচও বাঁচত।

বোড়শী। (হাসিয়া) না দিলেও বাঁচবে। হয়ত আর ৮৭ প্রয়োজনই হবে না।

নির্মল। ঈশ্বর করুন নাই যেন হয়, কিন্তু হলে আপনার প্রবাসী ভক্ত-দুটিকে বিশ্বস্ত হবেন না।

হৈম। আসি দিদি। (পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) তোমার মুখের পানে চেয়ে আজ কত-কি যেন মনে হচ্ছে দিদি! মনে হচ্ছে, এমন যেন তোমাকে আর কখনো দেখিনি—যেন সহসা কোথায় কত দূরেই চলে গিয়েছ।

নির্মল। নমস্কার। প্রয়োজনে যেন ডাক পাই।

[সকলের প্রস্থান]

বোড়শী। হৈম, তুমি যেন আজ আমার কত যুগের চোখের ঠুলি ঝুলে দিয়ে গেলে বোন।—কে?

[সাগরের প্রবেশ]

সাগর। আমি সাগর।

বোড়শী। তোদের আর সবাই? কাল যারা দল বেঁধে এসেছিল?

সাগর। আজও তারা তেমন দল বেঁধেই গেছে হজুরের কাছারি-বাড়িতে। আর বোধ হয় তোমারই বিরুদ্ধে—

বোড়শী। বলস কি সাগর? আমাদেই বিরুদ্ধে?

সাগর। আশ্চর্য হবার ত কিছু নেই মা। সর্বপ্রকার আপদে বিপদে চিরকাল তোমার কাছে এসে দাঁড়ানই সকলের অভ্যাস, প্রথমটা সেই অভ্যাসটাই বোধ হয় তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজ ভক্তিদলের এমটা চোখ-রাশ্মিনিতেই তাদের ইশ হয়েছে।

বোড়শী। ভালো। কিন্তু সভাটা যে গুনেছিলাম মন্দিরে হবার কথা ছিল?

সাগর। কথাও ছিল, হজুরের ভোক্তপুটীগুলোর ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু গ্রামের কেউ রাজী হলেন না।

বোড়শী। ও এদিককার মানুষ—আমাদের বুড়ো-ভাইপোকে হয়ত চেনন।

বোড়শী। কি স্থির হলো সভাতে?

সাগর। তা সব ভালো। এই মঙ্গলবারেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তোমারও ভাবনা নাই—কলিকাতার সবচেয়ে প্রাধান্য জ্ঞানোই শ'খানেক টাকা দেবে পারবে।

বোড়শী। প্রাধান্য জ্ঞানোতে হবে বোধ করি হজুরের কাছে?

সাগর। বোধ হয় তাই।

বোড়শী। আজ ভক্তিজমা যাদের সমস্ত গেল, তাদের উপায় কি স্থির হলো?

সাগর। ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তার অনাথা হবে না।

বোড়শী। আর হোদেব?

সাগর। আমাদের বুড়ো-ভাইপোর? (একটু হাসিয়া) সে বাবুহাও রায়মশায় করেছেন, নিতান্ত চুপ করে বসেছিলেন না পাশে লোক, দারোগা পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ-দশেকের মধ্যে একটা ডাকাতি হলে যা দেরি

বোড়শী। (ভয় পাইয়া) হাঁবে, একি তোরা সত্যি বলে মনে কারে?

সাগর। মনে কারে? এ ও চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা। আমাদের জেলের বাইরে রাখতে পারে এ সাধ্য আর কারও নেই। (একটু থামিয়া) তা বোলে যাদের জেল হবে না তাদের দুর্ভাগ্য কিছু কম নয় মা।

বোড়শী। (ভয় পাইয়া) হাঁবে, একি তোরা সত্যি বলে মনে করিস?

সাগর। মনে কারে? এ ও চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা। আমাদের জেলের বাইরে রাখতে পারে এ সাধ্য আর কারও নেই। (একটু থামিয়া) তা বোলে যাদের জেল হবে না তাদের দুর্ভাগ্য কিছু কম নয় মা।

ঝোড়নী। কেন রে?

সাগর। তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যা হোক আমরা দুটো খেতে পাব, কিন্তু এরা তাও পাবে না। রায়মশায়ের কাছে ধার করে জমিদারের সেলামি ছুগিয়েছে, সেই খতগুলো সব ডিগ্রি হতে বা বিলম্ব, তার পরে তাঁর নিজ জোতে জন খেটে দুমুঠো জোটে ভালো, না হয়—

ঝোড়নী। না হয় কি?

সাগর। না হয় আসামের চা-বাগান আছেই। কেন মা, তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেলডাঙাটার আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাড়ির বসতি ছিল?

ঝোড়নী। (বাড় নাড়িয়া) পড়ে।

সাগর। আজ তারা কোথায়? কতক গেল করলা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগানে। কিন্তু আমি দেখেছি ছেলেবেলায় তাদের জমিজমা, হাল-বলদ দু'মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায়মশায়ের।

ঝোড়নী। (স্তম্ভ থাকিয়া) আচ্ছা সাগর, এ-সব তুই শুনি কার মুখে?

সাগর। স্বয়ং ছজুরের মুখেই।

ঝোড়নী। তা হলে এ-সকল তাঁরই মতলব?

সাগর। (চিন্তা করিয়া) কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ঝোড়নী। এ ত গেল তাদের কথা সাগর। কিন্তু আমি ত একা। জমিদার হচ্ছে করলে ত আমারও প্রতি অভ্যাসের করতে পারেন?

সাগর। তা জানিনে মা, শুধু জানি তুমি একা নয়। (কণকাল নিশেবে থাকিয়া) মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই, শুক্লর নিষেধ আছে (বংশদত্ত সজোরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া)—হরিহর সর্গারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোকে জানে—তোমার উপর অভ্যাসের করবার মানুষ ত মা পক্ষাশ্রয়ানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবে না।

ঝোড়নী। (দুই চক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল) সাগর, এ কি সত্যি?

সাগর। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাতের লাঠি ঝোড়নীর পারের কাছে রাখিয়া) বেশ ত মা, সেই আত্মবীর্ষ্যই কর না, যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ঝোড়নী। (চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়া আবার তেমনি জ্বলিতে লাগিল) আচ্ছা সাগর, আমি ত শুনেছি তাদের গ্রামের ভয় করতে নেই?

সাগর। (সহাস্যে) মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বলছি নে মা।

ঝোড়নী। কেবল গ্রাম দিতেই পারিস, আর নিতে পারিস নে?

সাগর। পারিনে? এই আদেশের জন্য কত ভিক্ষেই না চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই যে ঝকুমটু তোমার মুখ থেকে বার করতে পারলাম না মা।

ঝোড়নী। না সাগর, না। অমন কথা তোরা মুখেও আনিস নে বাবা।

সাগর। কিন্তু মন থেকে যে কথাটা তাড়াতাড়ি পারি নে মা!

[পূজারি প্রবেশ করিল]

পূজারী। মন্দিরের দোর বন্ধ করে এলাম মা।

ঝোড়নী। চাবি?

পূজারী। এই যে মা। (চাবির গোছা হাতে দিয়া) রাখ হগো এখন তা হলে আসি।

ঝোড়নী। এস, বাবা।

[পূজারীর প্রস্থান]

ঝোড়নী। সাগর, ককিরসাহেব চলে গেছেন। তিনি কোথায় আছেন, খোঁজ নিয়ে আমাকে জানানো পারিস বাবা?

সাগর। কেন মা?

ঝোড়নী। তাঁকে আমার বড় ধরোজন। তোরা ছাড়া তাঁর চেয়ে সুভাসজ্ঞানী আমার কেউ নেই।

সাগর। কিন্তু তোমার কাছেই ত কতবার শুনেছি তিনি সাধুপুত্র। যেখানেই থাকুন তাঁকে বখাও

মন দিয়ে ডাকলেই এসে উপস্থিত হন।

বোড়শী। (চমকিয়া) তাই ত সাগর, এতবড় কথাটা আমি কি করে ভুলেছিলাম! আর আমার চিন্তা নেই, আমার এতবড় দুঃসময়ে তিনি না এসে কিছুতেই পারবেন না।

সাগর। আমারও বিশ্বাস তাই। কিন্তু কথার কথার রাত্রি অনেক হলো মা, তুমি বিশ্রাম কর, আসি? বোড়শী। এসো।

সাগর। (হাসিয়া) ভয় নেই মা, সাগর তোমাকে একলা রেখে কোথাও বৈশীকণ থাকবে না।

[তখন পর্বত বোড়শীর অস্থির প্রকৃতি নিত্যকার

সমাধা হয় নাই, সে এই আরোজেন ব্যাপ্ত থাকিয়া]

বোড়শী সাগর আমাকে কতবড় কথাই না স্মরণ করিয়ে দিলে। ফকির-সাহেব! যেখানে থাকুন, এ বিপদে আপনার দেখা আমি পাবোই পাব।

নেপথ্যে। আসতে পারি কি?

বোড়শী। (সচকিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে) আসুন, আসুন—আমি যে সমস্ত মন দিয়ে শুধু আপনাকেই ডাকছিলাম!

[জীবানন্দ প্রবেশ করিলেন]

জীবানন্দ। এতবড় প্রতিভক্তি কলিকালে দুর্লভ। আমার পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি কৈ?

বোড়শী। ঋণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া, সভয়ে আপনি? আপনি এসেছেন কেন?

জীবানন্দ। তোমাকে দেখতে। একটু ভয় পেয়েছি বোধ হচ্ছে। পাবারই কথা। কিন্তু চেঁচিও না। সঙ্গে পিছল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

[বোড়শী নির্বাক হইয়া রহিল]

জীবানন্দ। তবু দোরটা বন্ধ করে একটু নিশ্চিত হওয়া যাক। কি বল?

[এই বলিয়া জীবানন্দ অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন]

বোড়শী। (ভয়ে কণ্ঠস্বর তাহার কানিতেছিল) সাগর নেই—

জীবানন্দ। নেই? বাটা গেল কোথায়?

বোড়শী। আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ। জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? অর্নি : বাপ্পও জানতেন না।

বোড়শী। নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আমার প্রতি অত্যাচার করতে এলেন? কিন্তু আপনার কি করেছে আমি?

জীবানন্দ। লোক নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছি? তোমার প্রতি? মাইরি না! বরঞ্চ, মন কেমন করছিল বলে ছুটে দেখতে এসেছি।

[বোড়শীর চোখে জল আসিতেছিল, এই উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। জীবানন্দ অদূরে বসিয়া তাহার মুখের প্রতি লুপ্ত ভূমিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন]

জীবানন্দ। অলকা?

বোড়শী। বলুন।

জীবানন্দ। তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নেই বৃষ্টি?

[বোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল]

জীবানন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া) ব্রজেশ্বরের কপাল ভাল ছিল। দেবীরানী তাকে ধরিয়ে আনিরেছিল সত্যি, কিন্তু অশুভ্রী তামাকও খাইয়েছিল, এবং ডোহনাতে দক্ষিণাও দিয়েছিল। বিদায়ের পালাটা আর তুলব না, বলি বক্তিমবাবুর বইখানা পড়েছ ত?

বোড়শী। আপনাকে ধরে আনলে সেইমত ব্যবস্থাও থাকত—অনুযোগ করতে হত না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) তা বটে। চানা-হেঁচড়া দড়িদড়ার বাঁধাবাঁধি মানুষের নজরে পড়ে।

ভোজপুরী পেরালা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াসূত্ব সকলেই দেখে ; কিন্তু যে পেরালাটিকে চোখে দেখা যায় না—হী অলকা, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে? অতনু, না? বেশ তিনি। (কলেক নীরব থাকিয়া) বৎসামান্য অনুরোধ ছিল ; কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরতুলো সন্ধান পেলেই জামাই আদর করবে না। এমন কি খণ্ডরবাড়ি এসেছি বলে হয়ত বিশ্বাস করতেই চাইবে না—ভাববে থাকের দায়ে বৃষ্টি মিথ্যেই বলচি।

[লজ্জার ঝোড়শী আরও অনবত হইল]

জীবানন্দ। তামাকের ধূয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চলত, কিন্তু ধূয়া নয় এমন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত বাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক, নেই কিছু অলকা?

ঝোড়শী। কিছু কি? মন?

জীবানন্দ। (হাসিয়া মাথা নাড়িয়া) এবারে তুল হলো। ওর জন্যে অন্য লোক আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েছ—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারব না। অতএব তোমার কাছে বলি চাইতেই হয়, চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের পথে ঠেলে দেয় না। ভাল, ভাত মেঠাইমণ্ডা, চিড়ে, মুড়ি, যা হোক লাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই?

[ঝোড়শী নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল]

জীবানন্দ। আজ সকালে মন ভাল ছিল না। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ সুস্থদেহ যে কি আমি জানিনে। সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম, কত যে হীটলাম বলতে পারিনে—কিরতে ইচ্ছেও হলো না। সূর্যমুখের অস্ত গেলেন, একলা জলের ধারে পাঁড়িয়ে কি যে ভাল লাগল বলতে পারিনে। কেবল তোমাকে মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল আমার কাছারি-বাড়িতে এতকাল শোক জমেছে—তোমাকে নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থাটা আজ শেষ করাই চাই। ফিরে এসে সভ্যর যোগ দিলাম, কিন্তু টিকতে পারলাম না। একটা ছুতো করে পালিয়ে এসে পাঁড়ালান ওই মনসা গাছটার পিছনে।

ঝোড়শী। তার পরে?

জীবানন্দ। সেখি পাঁড়িয়ে সাগর সর্বার এবং তুমি। আলাপ-আলোচনা সমস্তই কানে গেল, তাৎপর্য গ্রহণ করতেও বিলম্ব হলো না। ডাবলাম, আমাদের মত সাধু ব্যক্তিয়া যে এ-হেন নির্বোধ ভৈরবীকে দূর করে দিতে চেয়েছে সে ঠিকই হয়েছে। সে-রাত্রি বাড়ি ঘেরাও করে পুলিশ পেরালা হাতকড়া নিয়ে হাজির, সামান্য একটা মুখের কথায় জন্য হয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত কি পাঁড়াপাঁড়ি—আর তুমি বললে কিনা আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি! আর ছোট্ট একটুখানি হুকুমের জন্য সাপেরটাদের কত অনুনয়-বিনয়, কি সাধাসাধি—আর তুমি বলে বসলে কিনা অমন কথা মুখেও আনিস নে বাবা। অভিযানে বাবাজীবন মুখখানি স্নান করে চলে গেলেন সে ত স্বচক্ষেই দেখলাম। মনে মনে সাত্যাসে প্রসিপাত করে বললাম, জয় মা চণ্ডীগড়ের চণ্ডী! তোমার এই অধম সন্তানের প্রতি এত কৃপা না থাকলে কি আর এই মেয়েমানুষটির বার বার এমন করে বুদ্ধি লোপ কব! এখন একবার একে বিদায় করে আমাকে তাকে বসাত মা, জনার্দন আর এককড়ি, এই দুই ভাল-বেতালকে সঙ্গে নিয়ে আমি এমনি সেবা তোমার গুরু করে দেব যে, একদিনের পূজোর চোটে তোমার মাটির মূর্তি আত্মা একেবারে পাখর হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তি-ভক্তের এ-সব বড় বড় কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু এখন কিম্বের জ্বালায় যে আর পাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক নেই কিছু অলকা?

ঝোড়শী। কিন্তু বাড়ি গিয়ে ত অনারাসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ। অর্থাৎ, আমার বাড়ির খবর আমার ঠেয়ে তুমি বেশি জানো। (এই বলিয়া সে একটুখানি হাসিল)

ঝোড়শী। আপনি সারাদিন খাননি, আর বাড়িতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই, এ কি কখনো হতে পারে?

জীবানন্দ। না পারবে কেন? আমি বাঁচনি বলে আর একজন উপোস করে থাকা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে এ স্ববস্থা ত করে রাখিনি। (আজ খামকা রাখ করলে চলবে কেন অলকা? বলিয়া সে

ওহেনি মধু হাসিল) আমার যে শান্তিময় জীবনব্যাপ্তি সেদিন চোখে দেখে এসেছে সে বোধ হয় তুলে গেছে। আজ তা হলে আসি?

ষোড়শী। (ব্যাকুল-কণ্ঠে) দেবীর সামান্য একটু প্রসাদ আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন? জীবনানন্দ। খুব পারব। কিন্তু সামান্য একটু প্রসাদ। কিন্তু সে ত নিশ্চয় তোমার নিজের জন্যে অন্য অলকা?

ষোড়শী। নইলে কি আপনার জন্যে রেখেছি এই আপনি মনে করেন?

জীবনানন্দ। (হাসিমুখে) না, তা করিনে, কিন্তু ভাবটি, তোমাকে ত বঞ্চিত করা হবে।

ষোড়শী। সে ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমাকে বঞ্চিত করায় আপনার নূতন অপরাধ কিছু হবে না।

জীবনানন্দ। না, অপরাধ আর আমার হয় না। একেবারে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি। কিন্তু ১৯৭ একটা অল্পত খেয়াল মনে উঠছে অলকা, যদি না হাসো ত তোমাকে বলি।

ষোড়শী। বলুন।

জীবনানন্দ। কি জানো, মনে হয়, হয়ত আজও বাঁচতে পারি, হয়ত আজও মানুষের মত—কিন্তু এমন কেউ নেই যে আমার—কিন্তু তুমিই পারো শুধু এই পালিষ্ঠের ভার নিতে—নেবে অলকা?

ষোড়শী। কি বলছেন?

জীবনানন্দ। (আত্মসমর্পণের আশ্চর্য কণ্ঠস্বরে) বলছি আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা।

ষোড়শী। (স্বকিয়া, একমুগ্ধত থামিয়া) অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করছেন, আমাকে দিয়ে এতটাই প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান। আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

জীবনানন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি। তোমার বিচার করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবল মনে হয়েছে, এই কণ্ঠের আশ্চর্য রমণীকে অভিভূত করেছেন সে মানুষটি কে?

ষোড়শী। (আশ্চর্য হইয়া) তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি?

জীবনানন্দ। না, আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বার বার চুপ করে গেছে। যাক, এবার আমি যাই, কি বল?

ষোড়শী। কিন্তু আপনার যে কি কাজের কথা ছিল?

জীবনানন্দ। কাজের কথা? কিন্তু কি যে ছিল আমার আর মনে পড়ছে না। শুধু এই কথাই মনে পড়ে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। অলকা, তোমার কি সত্যিই আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী। আবার কিরকম? সত্যি বিয়ে আমার এত মাত্রই হয়েছে

জীবনানন্দ। আর তোমার মা যে তোমাকে আমাকে দিয়েছিলেন সেটাই কি সত্যি নয়?

ষোড়শী। না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেননি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্য কোথাও ছিল না।

জীবনানন্দ। (কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া; যেন কতদূর হইতে কথা কহিল) অলকা, এ কথা আমার সত্য নয়।

ষোড়শী। কোন্ কথা?

জীবনানন্দ। তুমি যা জেনে রেখেছ। ভেবেছিলাম সে কাহিনী তখনো কাউকে বলব না, কিন্তু সেই কণ্ঠের মধ্যে আজ তোমার ফেলতে পারছি নে! তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু ভগবান তোমাকে ঠকাবার সুযোগ আমাকে দেননি। আমার একটা অনুরোধ—

ষোড়শী। বলুন?

জীবনানন্দ। আমি সত্যবাদী নই; কিন্তু আজকের "আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবার মতলব আমার ছিল না—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য। কিন্তু সে রাতে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না বলে কিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আর হলো না।

ষোড়শী। তবে কি ইচ্ছে হলো?

জীবনানন্দ। থাক, সে তুমি আর গুনতে চেয়ো না। হয়ত শেষ পর্বন্ত গুনলে আপনিই বুঝবে, এবং

সে বোঝার কতি বৈ লাভ আমার হবে না। কিন্তু এরা তোমাকে বা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়, আমি তোমাকে ফেলে পালাই নি।

বোড়শী। আপনায় না পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

জীবানন্দ। আমি নির্বোধ নই, যদি ব্যক্তই করি, তার সমস্ত কলাকল জেনেই করব। তোমার মায়ের এতবড় ভয়ানক প্রভাবও কেন রাজী হয়েছিলাম জানো? একজন খ্রীশোকের হার আমি চুপি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত করব। সে শান্ত হলো, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেন্ট শান্ত হলো না। হুঁমাস জেলে গেলাম—সেই যে শেষ রাত্রে বার হয়ে ছিলাম, আর কেরবার অবকাশ হলো না।

বোড়শী। (কুদ্ধ-নিশ্বাসে) তার পরে?

জীবানন্দ। (মৃদু হাসিয়া) তার পরেও মন্দ নয়। জীবানন্দবাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেন্ট ছিল। মাস-কয়েক পূর্বে রেলগাড়িতে একজন বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্হিত হন। অতঃপর আরও দেড় বৎসর। একুনে বছর-খুঁই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁরের ভাবী জমিদারবাবু বখন রত্নমকে পুনঃপ্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা আর কোথায় বা তার মা! (দুঃজন্যেই কণিক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল) আর একবার সভায় যেতে হবে। অলকা, আসি তা হলে।

বোড়শী। সভায় আপনার অনেক কাজ, না গেলই নয়। কিন্তু কিছু না খেয়েও ত যেতে পারবেন না।

জীবানন্দ। পারব না? তা হলে আনো। কিন্তু মস্ত বদ অভ্যাস আমার, খেয়ে আর নড়তে পারিনে।

বোড়শী। না পারেন এখানেই বিশ্রাম করবেন।

জীবানন্দ। বিশ্রাম করব! যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

বোড়শী। (হাসিয়া) সে সম্ভাবনা ত রইলই। কিন্তু পালানো না যেন! আমি খাবার নিয়ে আসি।
[প্রস্থান]

[গৃহকোনে একখানা পত্রের খণ্ডাংশ পড়িয়া ছিল, জীবানন্দের দৃষ্টি পড়িতেই। তাহা সে তুলিয়া লইয়া দীপালোকে পড়িয়া কেলিল। তাহার মুহূর্তকাল পূর্বের সরস ও প্রফুল্ল মুখের চেহারা গভীর ও অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। বোড়শী খাবারের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার মনে পড়িল ঠাই করা হয় নাই, তাই সে পাত্রটি ভাড়াভাড়ি একধারে রাখিয়া আসনের অভাবে কন্ডলই পুঙ্ক করিয়া পাতিল এবং নিজের একখানি বস্ত্র-পাট করিয়া দিতেছিল, এমন সময় জীবানন্দ কথা কহিলেন।]

জীবানন্দ। ও কি হচ্ছে?

বোড়শী। আপনার ঠাই করচি। শুধু কন্ডলটা ফুটবে।

জীবানন্দ। ফুটবে, কিন্তু আতিশয্যাটা ঢের বেশী ফুটবে। যত জিনিসটায় মিটি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করটার না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাটকে দিচো।

[কথা শুনিয়া বোড়শী বিন্ময়ে অবার হইয়া গেল]

জীবানন্দ। (হাতের কাগজ দেখাইয়া) হেঁড়া চিঠি—সবটুকু নেই। বাকি লিখেছিলে ঠার নামটি ওনতে পাইনে?

বোড়শী। কার নাম?

জীবানন্দ। যিনি দৈত্য-বধের জন্য চণ্ডীগড়ে অবতীর্ণ হবেন, যিনি দ্রৌপদীর সখা—আর বলবে?

[এই ব্যঙ্গোক্তি বোড়শী উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার চোখের উপর হঠাৎ অশ্রুক্ষেপ পূর্বের মোহের গবিনকা খানখান হইয়া ছিড়িয়া গেল]

জীবানন্দ। এই আছান-লিপির প্রতি ছত্রটি বীর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করবে ঠার নামটি?

বোড়শী। (আপনাকে সযত করিয়া লইয়া) ঠার নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ। প্রয়োজন বৈ কি। পূর্বাঙ্কে জানতে পারলে হয়ত আশ্চর্য্যকার একটা উপায় করতে পারি বোড়শী। আশ্চর্য্যকার প্রয়োজন ত একা আপনারই নয় ঐশ্বরীমশায়। আমারও ত থাকতে পারে

জীবানন্দ। পারে বৈ কি!

বোড়শী। তা হলে সে নাম আপনি ওনতে পাবেন না। কারণ, আমার ও আপনার একই সসে

এক পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ। বেশ, তা যদি না থাকে রক্ষা পাওয়াটা আমারই দরকার এবং তাতে লেশমাত্র ক্রটি হবে না জেনো। (ষোড়শী নিরুত্তর) তুমি জবাব না দিতে পারো, কিন্তু তোমার এই বীরপুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা নয়।

ষোড়শী। জানবেন বৈ কি। পৃথিবীর বীরপুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ। সে ঠিক। কিন্তু এই কাপুরষকে বার বার অপমান করার ভারটা তোমার বীরপুরুষটি সইতে পারলে হয়। যাক, এ চিঠি ছিড়লে কেন?

ষোড়শী। এর জবাব আমি দেব না।

জীবানন্দ। কিন্তু সোজা নির্মল সাহেবকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন? এ শব্দভেদী বাণ কি এই শেখানো নাকি?

ষোড়শী। তার পরে?

জীবানন্দ। তার পরে আজ আমার সম্মেহ গেল। বন্ধুর সংবাদ আমি অপরের কাছে শুনেচি, কিন্তু বদমাশ্যকে মতই প্রমাণ করেচি, ততই তিনি চুপ করে গেলেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্ৰোশটাই সবচেয়ে কেন বেশি।

ষোড়শী। (সচকিত) নির্মলের সম্বন্ধে আপনি কি শুনেছেন?

জীবানন্দ। সমস্তই। তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাসতে পারিনি না—আমি অবশেষে আনন্দ করবার এ কথা নয়। সেই ঝড়-জল অঙ্ককার রায়ে একাকী তার হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া মনে পড়ে? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী ব্যাটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই জানাবার জো নেই। আমি যখন গাড়ি ব্যাগ নিয়ে পালাই, ভেবেছিলাম কেউ ধরবে।

ষোড়শী। যদি সত্যি তাই করে থাকি সে কি এতবাদ দোষের?

জীবানন্দ। কিন্তু গোপন করার চেষ্টাটা? এই চিঠির টুকরোটা? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত তুমি মনে হয় আমার মত ইনিও একবার তোমার বিচার করতে বলেছিলেন না? দেখচি, তোমার কথার সবসময় বিপদ আছে। (এই বলিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিল। ষোড়শী নিরুত্তর) এ আমি সঙ্গে নিয়ে চললাম, অবশ্যক হলে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ক্রটি হবে না। এই কটা ছত্র আমার পুরুষের চোখেই যখন ফাঁকি দিতে পারেনি, তখন আশা করি হৈমকেও ঠকাতো পারবে না।

[ষোড়শী নিরুত্তর]

জীবানন্দ। কেমন, অনেক কথাই জানি?

ষোড়শী। হাঁ।

জীবানন্দ। এ সব তবে সত্যি বলে?

ষোড়শী। হ্যাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ। (আহত হইয়া) ওঃ—সত্যি! (স্তিমিত দীপশিখটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিয়া) এখন তাহলে তুমি কি করবে মনে কর?

ষোড়শী। কি আমাকে সঙ্গনি করতে বলেন?

জীবানন্দ। তোমাকে? (স্বপ্নকাল স্বপ্ন থাকিয়া, দীপশিখা পুনরায় জ্বলিয়া উঠিয়া) তা হলে এক সঙ্গে যে তোমাকে অসতী বলে—

ষোড়শী। এদের বিকল্পে আপনার কাছে ত আমি গ্লানি জানাই নি। আমাকে কি করতে হবে

এই বলুন: কারণ সেখাবার প্রয়োজন নেই।

জীবানন্দ। ও বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যা কথা বলে, আর তুমি একাই সত্যবাদী এই কি আমাকে জান বোঝাতে চাও অলকা?

[ষোড়শী নিরুত্তর]

জীবানন্দ। একটা উত্তর দিতেও চাও না?

বোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না।

জীবানন্দ। অর্থাৎ আমার কাছে কৈরিত্ব দেওয়ার চেয়ে দুর্নামও ভালো। বেশ, সবাই স্পষ্ট বোকা গেছে! (এই বলিয়া তিনি ব্যঙ্গ করিয়া হাসিলেন)

বোড়শী। স্পষ্ট বোকা যাবার পরে কি করতে হবে তাই শুধু বলুন।

[তাহার এই উত্তরে জীবানন্দের ক্রোধ ও অধৈর্য নতওশে বাড়িয়া গেল]

জীবানন্দ। কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে দেবমন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতেই হবে। এর যথার্থ অভিভাবক তুমি নয়, আমি। পূর্বে কি হতো জানিনে, কিন্তু এখন থেকে তৈরবীকে তৈরবীর মতই থাকতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে।

বোড়শী। বেশ তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে সে নিয়ে আমি বিবাদ করব না। আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভালো হবে আমি যাব।

জীবানন্দ। তুমি যে যাবে সে ঠিক। কারণ, যাতে যাও সে আমি দেখব।

বোড়শী। কেন রাগ করছেন, আমি শু সত্যিই যেতে চাচ্ছি। কিন্তু আপনার ওপর এই ভার রইল যেন মন্দিরের যথার্থই ভালো হয়।

জীবানন্দ। কবে যাবে?

বোড়শী। যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এখন—

জীবানন্দ। কিন্তু নির্মলবাবু? জামাইসাবে?

বোড়শী। (কাতর-কণ্ঠে) তাঁর নাম আর করবেন না।

জীবানন্দ। আমার মুখে তাঁর নামটা পর্বত তোমার সহ্য হয় না। ভাল। কিন্তু কি তোমাকে দিতে হবে?

বোড়শী। কিছুই না।

জীবানন্দ। এ ঘরখানা পর্বত ছাড়তে হবে জানো? এও দেবীর।

বোড়শী। জানি। যদি পারি, কালই ছেড়ে দেব।

জীবানন্দ। কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

বোড়শী। এখানে থাকব না, এর বেশি কিছুই ঠিক করেনি। একদিন কিছু না কেনেই আমি তৈরবী হরেহিলাম, আজ বিদায় নেওয়ার বেলাতেও এর বেশি ভাবব না। আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ডালোমন্দিরের ভার আপনার পরে রেখে যেতে শেষ সময়ে আপ আমি দ্বিধা করব না। কিন্তু আমার বাবা ভারী দুর্বল, তাঁর উপরে নির্ভর করে যেন আপনি নিশ্চিন্ত হবেন না।

জীবানন্দ। তুমি কি সত্যিই চলে যেতে চাও নাকি?

বোড়শী। আর আমার দুঃখী দরিদ্র ভূমিক প্রভারা। একদিন তাদের সমস্তই ছিল—আজ তাদের মত নিঃস্ব নিরুপায় আর কেউ নেই। ডাকাত বলে বিনাশে লোকে তাদের জেল দিয়েছে। এদের সুখ-দুঃখের ভারও আমি আপনাকেই দিয়ে গেলাম।

জীবানন্দ। আজ, তা হবে হবে। কি তারা চায় বল ত?

বোড়শী। সে তারাই আপনাকে জানাবে।

[এই বলিয়া সে সহসা জানালা দিয়া বাঁহরের দিকে চাহিয়া দড়ির আলনা হইতে গামছা ও কাপড় হাতে নইল]

বোড়শী। আমার রান করতে যাবার সময় হলো।

জীবানন্দ। রানের সময়? এই রাতে?

বোড়শী। রাত আর নেই—এবার আপনি বাড়ি যান। (এই বলিয়া সে বাইতে উদ্যত হইল)

জীবানন্দ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কিন্তু আমার সকল কথাই যে ব্যক্তি রয়ে গেল?

বোড়শী। থাক, আপনি বাড়ি যান।

জীবানন্দ। না। কোথায় যেন আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে অলকা, কথা আমার শেষ না হওয়া পর্বত আমি—

ষোড়শী। না সে হবে না, আপনি বাড়ি যান। আমার বন্ধু কতিপয় করেছেন, এ জীবনের শেষ সর্বনাশ করতে আর আপনাকে দেব না।

জীবানন্দ। আচ্ছা, আমি চললাম অলকা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীগড় গ্রাম—গাভ্রের সঙ

গতি (১)

বড় প্যাঁচে পড়ছে এবার ভোলা দিগম্বর।
অভিমাত্রী উমারানী বলেনি তার প্রাণেশ্বর।।
অনেকদিনের পরে এবার এল শ্বশুরবাড়ি।
ভেবেছিল আসবে গৌরী পরে পাটের শাড়ী।।
চাঁদ-বদনে কইবে কথা
ঘুচবে ভোলার প্রাণের ব্যথা
কোন কথা না বলে সে পালিয়ে এল ছেড়ে ঘর।
ভানের ঘোরে ছিল অচেতন
ভেবে চিন্তে পেল নাকো হলো এ কেমন—
এবার শান্ত-শিষ্ট গৃহবাসী
করবে তোমায় হে সন্ন্যাসী
ভটা বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে সাজিয়ে দেবে প্রেমের বর।।

গীত (২)

দৌ নিতে এসেছে এবার আপনি মহেশ্বর।
তুই নাকি সেই বলেছিলি।
করবি না আর স্বামীর সঙ্গ
পাঁচ বছরে করে পঞ্চতপা
তোর হাতে তোর মা-ভ্রমণী সঁপেছেন স্ক্যাপা,
নাথতে যদি পারিস নি তায়,
তাই বলে কি হবে সে পর?
(তাই বলে পর হয়ে কি যায়)
একবার নাকি গিয়েছিল কুচুনী পাড়ায়
সত্যি কথা তোব কাছে সেই যদিই সে ভাঁড়ায়।
ফলার জিনিস নয় ত সে তোর বোন
ধুয়ে পুঁছে তুল গে যা তার ঘর।

তৃতীয় দৃশ্য—ঘোড়ার কুটার

[নির্মলের প্রবেশ]

ষোড়শী। এ কি, এই রাতে শেষে অকস্মাৎ আপনি যে নির্মলবাবু?

[নির্মল নিরুত্তর]

(হাসিয়া) ওঃ—বুদ্ধি। যাবার পূর্বে লুকিয়ে বুঝি একবার দেখে যেতে এলেন?

নির্মল। আপনি কি অন্তর্ধর্মী?

বোড়শী। তা নইলে কি ভৈরবীগিরি করা যায় নির্মলবাবু? কিন্তু এখানটার ভেতন আলো নেই, আসুন, আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে বসবেন চলুন।

নির্মল। রাতে একাকী আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে চান, আপনার সাহস ত কম নয়?

বোড়শী। আর সে-রাতে অন্ধকারে যখন হাত ধরে নদী মাঠ পার করে এনেছিলাম তখন কি ভয়ের লক্ষণ দেখতে পেরেছিলেন নাকি? সেদিনও ত এমনি একাকী।

নির্মল। সত্যি আপনার সাহসের অবধি নেই।

বোড়শী। অবধি থাকবে কি করে নির্মলবাবু, ভৈরবী যে! আসুন ঘরে।

নির্মল। না, ঘরে আর বাব না, আমাকে এখনি ফিরতে হবে।

বোড়শী। তবে এইখানেই বসুন।

[উভয়ের উপবেশন]

বোড়শী। আজ তা হলে চলে যাওয়াই স্থির?

নির্মল। না, আজ যাওয়া স্থগিত রইল। রাতে কিরে গিয়ে তনতে পেলাম আজ সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরের মধ্যে আপনার বিচার হবে। সে সভায় আমি উপস্থিত থাকতে চাই।

বোড়শী। কিসের জন্যে? নিছক কৌতূহল, না আমাকে রক্ষে করতে চান?

নির্মল। প্রাণপণে চেষ্টা করব বটে।

বোড়শী। যদি ক্ষতি হয়, কষ্ট হয়, শ্বশুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়, তবুও?

নির্মল। হী, তবুও।

[বোড়শী হাসিয়া ফেলিল]

(হাসিমুখে) আপনি হাসলেন যে বড়? বিশ্বাস হয় না?

বোড়শী। হয়। কিন্তু হাসচি আর একটা কথা ভেবে। শুনি, আগেকার দিনে ভৈরবীরা নাকি বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখত, আজ্ঞা, ভেড়া নিয়ে তারা কি কবত নির্মলবাবু? চাষিয়ে বেড়াত, না লড়াই বাঘিয়ে দিয়ে তামাশা দেখত? (বলিতে বলিতে ছেলে-মানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল)

নির্মল। (পরিহাসে) যোগ দিয়া, নিজেও হাসিয়া) হয়ত বা মাঝে মাঝে নাহেব স্থানে বলি দিয়ে যেতো।

বোড়শী। সে ত ভয়ের কথা নির্মলবাবু।

নির্মল। (সহাস্যে মাথা নাড়িয়া) ভয় একটু আছে বৈ কি।

বোড়শী। একটু থাকা ভালো। হৈমকেও সাবধান করে দেওয়া উচিত।

নির্মল। তার মানে?

বোড়শী। মানে কি সব কথাই থাকে নাকি? (হাসিয়া) কুটুমের অভ্যর্থনা ত হলো। অবশ্য হাসি বৃশী দিয়ে বটটুকু পারি ততটুকু,—তার বেশী ত সম্বল নেই তাই—এখন আসুন দুটা কাজের কথা কওয়া যাক।

নির্মল। বলুন।

বোড়শী। (গভীর হইয়া) দুটি লোক সেবতাকে বক্তিত করতে চায়। একটি দায়মশায়, আর একটি জমিদার—

নির্মল। আর একটি আপনার বাবা।

বোড়শী। বাবা? হী, তিনিও বটে!

নির্মল। আমার শ্বশুরের কথা বৃথি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রকৃতিকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্য আপনার শত্রুতা করছেন?

বোড়শী। দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রি করে ফেলতে চান। কিন্তু আমি থাকতে ত কোনমতেই হবার জো নেই।

নির্মল। (সহাস্যে) সে আমি সম্মান্যে পারব।

ষোড়শী। কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেন না।

নির্মল। কি সে-সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী। (শান্ত-স্বরে) সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্য হোক মিথ্যে হোক, তাই নিরোই ত ভৈরবীর জীবন নির্মলবাবু। আমি এই কথাটাই তাঁদের বলতে চাই।

নির্মল। (সবিস্ময়ে) নিজের মুখ দিয়ে এ কথা যে স্বীকার করার সমান!

ষোড়শী। তা হবে।

নির্মল। কিন্তু ওরা যে বলে—অনেকেই বলে সে সময়ে, অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের আসার রাতে আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী। তারা কি দেখেছিল নাকি? তা হবে, আমার ঠিক মনে নেই; যদি দেখে থাকে সে সত্যি। তাঁর সেদিন ভারী অসুখ, আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি শুয়েছিলেন।

নির্মল। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) তার পরে?

ষোড়শী। কোনমতে দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিন থেকেই কিছুতে আর মন বসাতে পারিনে, সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকেছে।

নির্মল। কি মিথ্যে?

ষোড়শী। সব। ধর্ম, কর্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এতদিনের যা-কিছু সমস্তই—

নির্মল। তবে কিসের জন্যে ভৈরবীর আসন রাখতে চান?

ষোড়শী। - নিই। আর আপনি যদি বলেন এতে কাজ নেই—

নির্মল। না না, আমি কিছুই বলিনে। কিন্তু এখন আমি উঠলাম। আপনার হয়ত কত কাজ নষ্ট করলাম।

ষোড়শী। কুটুম্বের অভ্যর্থনা, বন্ধুর মর্যাদা রক্ষা করা, এ কি কাজ নয় নির্মলবাবু?

নির্মল। সকল হলো, এখন আসি?

ষোড়শী। আসুন। আমারও স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আমিও চললাম।

[উভয়ের প্রস্থান]

[সাগর সর্দার ও ফকিরসাহেবের প্রবেশ]

সাগর। না, এ চলবে না—কোনমতেই চলবে না ফকিরসাহেব। মা - তি বলেছেন সমস্ত ত্যাগ করে যাবেন, আপনাকে বলছি এ চলবে না।

ফকির। কেন চলবে না সাগর?

সাগর। তা জানিনে, কিন্তু যাওয়া চলবে না। গেলে আমরা তাঁর শীন-দুঃখী প্রজারা সব থাকব কোথায়? বাঁচব কি করে?

ফকির। কিন্তু তোমরা কি শোননি ষোড়শী কত বড় লজ্জা এবং ঘৃণার সমস্ত ত্যাগ করে যাচ্ছেন?

সাগর। শুনেছি এই আবও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনি কিসের জন্যে মা সাহেবের হাত থেকে সে রাতে জমিদারকে বাঁচাতে গেলেন। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) ভেবে নাই পেলাম ফকিরসাহেব, কিন্তু এটুকু ত ভেবে পেয়েছি, যাকে মা বলে ডেকেছি সন্তান হয়ে আমরা তাঁর বিচার করতে যাব না!

ফকির। তোমরা জন-কড়ক বিচার না করলেই কি চণ্ডীগড়ে তার বিচার করবার মানুষের অভাব হবে সাগর?

সাগর। কিন্তু তারাই কি মানুষ? আমরা তাঁর ছেলে—আমাদের অন্তরের বিশ্বাসের চেয়ে কি তাদের বাইরের বিচ্যবটাই বড় হবে ফকিরসাহেব? তাদের কি আমরা চিনি? একদিন যখন আমাদের সর্ব্ব্ব কোড়ে নিলে তারা, সেও যেমন সন্তা-পাণ্ডনার দাবীতে, আবার জেলে যখন দিলে সেও তেমন সন্তা-সাক্ষীর জোরে।

ফকির। সে আমি জানি।

সাগর। কিন্তু সব কথা - জানো না। বুড়ো-ভাইপোর জেল খেটে কিরে এসে পাঁড়ালাম। বললাম,

মা, আমরা যে মরি। মা রাগ করে বললেন, তোরা ডাকাত, তোদের মরাই ভালো। অভিমানে ঘরে ফিরে গেলাম। খুড়ো বললে, ভগবান! পরীষকে বিশ্বাস করতো কেউ নেই। পরের দিন সকালবেলা মা আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোদের কাছে আমি মস্ত অপরাধ করেছি বাবা, আমাকে ভোয়া করা কর। তোদের কেউ বিশ্বাস না করুক আমি বিশ্বাস করব। এখনো বিবে-কুড়ি জরি আমার আছে, তাই তোরা ভাগ করে নে। চণ্ডীর খাজনা তোরা যা ইচ্ছে দিস, কিন্তু অসং পথে কখনো পা দিবে, এই আমার শর্ত।

ফকির। কিন্তু লোকে যে বলে—

সাগর। বলুক। কিন্তু মা জানলেই হলো সে বিশ্বাস আমরা কখনো ভাসিনি। জানো ফকিরসাহেব, আমাদের জন্যেই এককড়ি তাঁর শত্রু, আমাদের জন্যেই রায়মশায় তাঁর দুশমন। অথচ, তারা জানেও না কার দয়ার আশ্রয় তারা বেঁচে আছে।

ফকির। কিন্তু আমাকে তোরা ধরে আনলি কেন?

সাগর। কেন? ওনেছি, মুসলমান হয়েও তুমি তাঁর গুরু চেয়ে বড়, তোমার নিষেধ ছাড়া মাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

ফকির। কিন্তু এতবড় অন্যায় নিষেধ আমি কিসের জন্যে করব সাগর?

সাগর। করবে মানুষের ভালর জন্যে।

ফকির। কিন্তু বোড়শী ঘরে নেই। বেলা যায়, আমিও ত আর অপেক্ষা করতে পারি না। এখন আমি চললুম।

সাগর। পারবে না থাকতে? করবে না নিষেধ? কিন্তু ফল তাঁর ভাল হবে না।

ফকির। এ-সব কথা মুখেও এনো না সাগর।

সাগর। মা-ও বলেন ও-কথা মুখে আনিস নে সাগর। বেশ মুখে আর আনব না—আমাদের মনেব মধ্যেই থাক। [ফকিরের প্রস্থান]

সাগর। সন্ন্যাসী ফকির তুমি, জানো না ডাকাতের বৃকের জালা। আমাদের সব গেছে, এর ওপর মা-ও যদি ছেড়ে যায় আমরা বাকী কিছুই রাখব না। [প্রস্থান]

[নির্মল ও বোড়শীর প্রবেশ]

বোড়শী। ডেকে নিয়ে এলাম সাথে! ছি, ছি, কি দাঁড়িয়ে যা তা ওনছিলেন বলুন ত! মেসীর মন্দিরে, তাঁর উঠানের মাঝখানে জটলা করে কতকগুলো কাপড়খ মিলে বিচারের ছলনায় দুজন অসহায় ক্রীলোকের কুংসা রচনা করচে,—তাও আবাব একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। আসুন আমার ঘরে।

[দুরারে আসন পাতা ছিল, নির্মলকে সমাদর করিয়া

তাহাতে বসাইয়া বোড়শী নিজে অদূরে উপবেশন করিল]

বোড়শী। আপনি নাকি বলেছেন আমার মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন। এ কি সত্যি? নির্মল। হী, সত্যি।

বোড়শী। কিন্তু কেন নেবেন?

নির্মল। বোধ হয় আপনার প্রতি যত্নাচার হচ্ছে বলে।

বোড়শী। কিন্তু আর কিছু বোধ করেন না ত? (এই বলিয়া সে মুচকিয়া হাসিল) থাক, সব কথাই যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে এই কুট-কচালে শাস্ত্রের, না? আচ্ছা সে বাক। মকদ্দমার ভার যেন নিলেন, কিন্তু যদি হারি তখন তার কৈ নেবে? তখন পেছোবেন না ত?

নির্মল। না, তখনও না।

বোড়শী। ইস! পরোপকারের কি ঘটা! (হাসিয়া) আমি কিন্তু হৈম হলে এইসব পরোপকার-বর্জিত বুদ্ধিরে নিতাম। অত ভালমানুষই নই—আমার কাছে কীকি চলত না। হাম্বি-জিন চোখে চোখে রেখে নিতাম।

নির্মল। (ফিরয়ে, ভয়ে, আনন্দে) চোখ চোখে রাখলেই কি রাখা যায় বোড়শী? এর বীধন যেখানে

কর হয় তোমের দৃষ্টি যে সেখানে পৌছায় না, এ কথা কি আজও জানতে পারনি তুমি।

ষোড়শী। পেরেছি বৈ কি। (হাসিল; বাহিরের শব্দ শুনিয়া গলা বাড়িয়া চাহিয়া) এই যে ইনি এসেছেন।

নির্মল। কে? ককিরসাহেব?

ষোড়শী। না, জমিদারবাবু। বলেছিলেন সভা ভাঙলে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আসছেন।

নির্মল। (বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া) তা হলে আপনি আমাকে এ কথা বলেন নি কেন?

ষোড়শী। বেশ! একবার 'তুমি' একবার 'আপনি'! (হাসিয়া) ভয় নেই, উনি ভারী ভদ্রলোক; লড়াই করেন না। তা ছাড়া আপনারের পরিচয় নেই; সেটাও একটা লাভ। (দ্বারের নিকটে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন।

জীবানন্দ। (প্রবেশ করিয়াই ধমকিয়া দাঁড়াইয়া) ইনি? নির্মলবাবু বোধ হয়।

ষোড়শী। হী, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) বিলম্ব। বন্ধু নয় ত কি? ওঁদের কপালেই ত টিকে আছি, নইলে আমার জমিদারি পাওয়া পর্যন্ত সে-সব কীর্তি করা গেছে তাতে চণ্ডীগড়ের শাস্তি-কুঞ্জের বদলে ত এতদিন আত্মমানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হতো।

ষোড়শী। চৌধুরীমশাই, উকিল-ব্যারিস্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওঁরাই পাবেন। আত্মবিশ্বাস একটু বড় ব্যাপারে না হোক, কিন্তু ছোট বলে এদেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়—দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতেও পারে না?

জীবানন্দ। (অশ্রুত হইয়া) ধন্যবাদ পাবার সময় হলই পাবে।

ষোড়শী। (হাসিয়া) এঁই যেমন সভায় দাঁড়িয়ে এইমাত্র এক দফা দিয়ে এলেন?

[জীবানন্দ স্তব্ধ হইয়া বাঁহিল]

ষোড়শী। নির্মলবাবু না থাকলে আজ আপনার সঙ্গে আমি ভারী ঝগড়া করতাম! ছি—এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই পারে? তা ছাড়া কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সেদিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলেন, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন করব। আপনিও আপনার বন্ধু সম্পর্কে করেই জানিয়েছিলেন। এঁই নিন সিদ্ধকে চাবি এবং নিন হিসাবের খাতা। (অঞ্চল হইতে সিদ্ধকের চাবি তুলিয়া এবং তাকে উপর হইতে একখানা খেঁবে খানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দের কাছে বাঁহিয়া দিল) মায়ের যা-কিছু অলঙ্কার, ২. কিছু দলিলপত্র সিদ্ধকের ভিতরেই পাবেন, এবং আর একখানা কাগজ ঐ খাতার মধ্যে পাবেন, যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েছি।

জীবানন্দ। (অবিশ্বাস করিয়া) বল কি! কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী। তাতেই লেখা আছে দেখতে পাবেন।

জীবানন্দ। তাই যদি হয় ত এই চাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

ষোড়শী। তাঁকেই যে দিলাম।

জীবানন্দ। (মলিন-মুগ্ধ ও সন্দেহ-কণ্ঠে) কিন্তু এ ত আমি নিজে পারিনি ষোড়শী। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে সিদ্ধকে বাখা জিনিসগুলোও যে এক হবে। সে কী করে বিশ্বাস করব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচভনের কাছে বুঝিয়ে দিয়া।

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) আমার সে আবশ্যক নই। কিন্তু চৌধুরীমশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ চাবিটুকু নেবার সাহস নেই, এ আমি মানিনি। নিন, ধরুন। (খাতা ও চাবি তুলিয়া জীবানন্দের হাতের মধ্যে একরকম জোর করিয়া গুজিয়া দিল) আজ আমি বাঁচলাম। (কোমল কণ্ঠস্বরে) আর একটিমাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাব, সে আমার গরীব-দুঃখী প্রজাদের ভবিষ্যৎ। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি—আপনি অনায়াসে পারবেন। (নির্মলের প্রতি) আমার কথাবার্তা শুনে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না নির্মলবাবু?

নির্মল। (মাথা নাড়িয়া) ওখ আশ্চর্য নয়, আমি প্রায় অভিজ্ঞ হইয়া পড়েছি। তৈরবীর আসল ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্বত সই করে রেখেছেন, এ বর ত আপাকে যুগান্তে জানান নি?

বোড়শী। আমার অনেক কথাই আপনাকে জানান হয়নি, কিন্তু একদিন হয়ত সমস্তই জানতে পারবেন। কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন যাকে সকল কথাই জানিয়েছি, সে আমার ককিরসাহেব।

নির্মল। এ-সকল পরামর্শ বোধ হয় তিনিই দিয়েছেন?

বোড়শী। না, তিনি এখন পর্যন্ত কিছুই জানান নি, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলছেন সে আমার একটু আগের রচনা। যিনি এ কাজে আমাকে প্রবৃতি দিয়েছেন, ওখ তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখব।

জীবনন্দ। মনে হচ্ছে যেন ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাশা করচ বোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই 'মরফিয়া' খাওয়ার চেয়েও শক্ত ঠেকচে।

নির্মল। (হাসিয়া জীবনন্দের প্রতি চাহিয়া) আপনি ওখ এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাশা দেখছেন, কিন্তু আমাকে কাজকর্ম, বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে এই তামাশা দেখতে হচ্ছে। আর এ যদি সত্য হয় ত আপনি যা চেয়েছিলেন সেটা অস্বস্তি: পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমাব ভাগ্যে বোল আনাটি লোকসান। (বোড়শীকে) বাস্তবিক এ সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

বোড়শী। না নির্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি-তামাশার সময়? আমি সত্য। সত্যই অবসর নিলাম।

নির্মল। তা হলে বড় দুঃখে পড়েই এ কাজ আপনাকে করতে হলো। আমি আপনাকে বাঁচাতেও হয়ত পারতাম, কিন্তু কেন যে তা হতে দিলেন না তা আমি বুঝেছি। বিষয় একা হতো, কিন্তু কুৎসার চেউ তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সে থামাবার সাধা আমাব ছিল না। (এই বলিয়া সে কটাক্ষে জীবনন্দের প্রতি চাহিল)

নির্মল। এখন তা হলে কি করবেন স্থির কবেছেন?

বোড়শী। সে আপনাকে আমি পরে জানাব।

নির্মল। কোথায় থাকবেন?

বোড়শী। এ বরও আপনাকে আমি পরে দেব।

নির্মল। (হতবুদ্ধি দেখিয়া) ব্রাত প্রায় দশটা। আচ্ছা, এখন আমি তা হলে, - আপাকে আর কোদ হয় কোন আবশ্যক নেই?

বোড়শী। এতবড় অহঙ্কারের কথা কি বলতে পারি নির্মলবাবু? তবে মক্ষির নিয়ে আর কোদ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার প্রয়োজন হবে না।

নির্মল। আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আপা কবি।

বোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না।

নির্মল। হেঁম আপনাকে বড় ভালবাসে। যদি অবকাশ পান হাতে মার্শে একটা বরদা দেবেন

[নির্মল প্রস্থান করিল]

জীবনন্দ। তত্ত্বলোকটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বোড়শী। না পারলেও আপনাব ক্ষতি হবে না।

জীবনন্দ। আমার না হোক তোমার ত হতে পারে। মনে রাখিব যেনো কি ব্যাকুল প্রার্থনাটি জানিয়ে গেলেন।

বোড়শী। সে ওনেছি। কিন্তু আমি বতখানি জানি তার অর্থকও আমাকে জানলে আজ অতবড় ব্যক্তি আবেদন তাঁর করতে হতো না।

জীবনন্দ। অর্থাৎ?

বোড়শী। অর্থাৎ এই যে চতুর্দশের তৈরবী-পদ অনারাসে জীবনন্দের মত ত্যাগ করে যানি সে

শিক্ষা কোথায় পেলাম জানেন? ঈশ্বরের কাছে। মেরেমানুবের কাছে এ যে কত কীকি, কত মিথ্যা, সে বুকেছি কেবল হৈমকে দেখে। অথচ এর বাস্পও কোনদিন তাঁরা জানতে পারবেন না।

জীবানন্দ। তথাপি এ হৈয়ালি হৈয়ালিই রয়ে গেল অলকা। একটা কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে আমার ভাঙ্গী লজ্জা করে; কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্য জবাব দিতে পারতেন?

বোড়শী। (সহাস্যে) আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন, তখন আমিও তেমনি কোন একটা অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কিনা, এ আমি জানিনে—কিন্তু আশ্চর্য কাজ করবার আপনার প্রয়োজন নেই—আমি বুকেছি। অপবাদ সকলে মিলে দিয়েছে বলেই তাকে সত্য করে ভুলতে হবে তার অর্থ নেই। আমি কিছুই জেনেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ করব না। আমার যাকী আছেন, কোন লোভেই সে কথা আমি ভুলতে পারব না। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরীমশাই?

জীবানন্দ। তুমি আমাকে চৌধুরীমশাই ভল কেন?

বোড়শী। তবে কি বলব? ছদ্ম?

জীবানন্দ। না। অনেকে যা বলে ডাকে—জীবনানন্দবাবু।

বোড়শী। বেশ, ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু রাগি হয়ে যাচ্ছে আপনি বাড়ি গেলেন না? আপনার লোকজন কৈ?

জীবানন্দ। আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েছি।

বোড়শী। একলা বাড়ি যেতে আপনার ভয় করবে না?

জীবানন্দ। না, আমার পিস্তল আছে।

বোড়শী। তবে তাই নিয়ে বাড়ি যান, আমার ডের কাজ আছে।

জীবানন্দ। তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাব না।

বোড়শী। (দ্রব্বর চোখে, অথচ শাস্ত্রবলে) আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিছি তারা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জীবানন্দ। (অপ্রতিভ হইয়া) ডাকতে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাছি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না; তাই শুধু আমি বলছিলাম। তুমি কি সত্যই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

বোড়শী। (খাড়া নাড়িয়া) হাঁ।

জীবানন্দ। কবে যাবে?

বোড়শী। তি জানি, হঠাৎ কালই যেতে পারি।

জীবানন্দ। কাল? কালই যেতে পার? (একান্ত স্তব্ধ রহিয়া) আশ্চর্য! মানুষের নিজের মন বুঝতেই কি ভুল হয়? যাতে তুমি যাও সেই শুকনো হয়ে গেল। তোমাকে তাদ্রাতে পারলে, ওই যে জমিটা সেনার দ্বায়ে বিক্রি কবেছি সে নিয়ে আর গোলমাল হবে না—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর... আর তোমাকে যা কিছু করব তাই তুমি করতে বাধ্য হবে, এই দিকটাই কেবল দেখতে পেয়েছি। কিন্তু আরও যে একটা দিক আছে, যেছায় তুমি সমস্ত ত্যাগ করে আমার মাথাতেই বোঝা চাপিয়ে দিলে সে তার বইতে পারবে কিনা, এ কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি। আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে আমার মত তোমারও ভুল হচ্ছে,—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি! জবাব নাও না যে?

বোড়শী। জবাব খুঁজে পাইনে। হঠাৎ বিষয় লাগে এ কি আপনার কথা!

জীবানন্দ। তবে এই কথাটা বল, সেখানে তোমার চলবে কি করে?

বোড়শী। অত্যন্ত অনাবশ্যক কৌতুহল চৌধুরীমশাই।

জীবানন্দ। তাই বটে, অলকা তাই বটে: আজ আমার আবশ্যক-অনাবশ্যক তোমাকে বোঝাব আমি কি দিয়ে!

[বাহিরে পূজারীর কলি ও পায়ের শব্দ
ওনা গেল। অতঃপর তিনি প্রবেশ করিলেন]

পূজারী। মা, সকলে বন্দুকে মন্দিরের চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকুরের হাতেই দিলাম। রায়মশায়,

শিরোমণি—এরা উপহিত ছিলেন।

বোড়শী। ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি সাগরের ওখানে একবার যাব।

জীবানন্দ। এতলোও তা হলে তুমি রায়শায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

বোড়শী। না, সিন্ধুকের চাবি আর কারও হাতে গিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না।

জীবানন্দ। তবে কি বিশ্বাস হবে শুধু আমাকেই?

[বোড়শী কোন উত্তর না দিয়া জীবানন্দের পারের কাছে গড় হইয়া

প্রশ্ন করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষয়ে অভিভূত পূজারীকে কহিল]

বোড়শী। চল বাবা, আর দেরি করো না।

পূজারী। চল, যা চল।

[পূজারী ও বোড়শী প্রস্থান করিলে একাকী জীবানন্দ

সেই জনপ্ৰিয় কুটীর-অঙ্গনে বসে হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—নাট্যমন্দির

[চতীর প্রান্তস্থিত নাট্যমন্দিরের একাংশ। সময়—অপরাহ্ন। উপস্থিত—শিরোমণি, জনার্নন রায় এবং আরও দুই-চারিজন প্রাসের ভদ্রব্যক্তি]

শিরোমণি। (আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলিয়া জনার্ননের প্রতি) আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও, ভায়া, সংসারে, এসে বৃদ্ধি ধরেছিলে বটে।

জনার্নন। (হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া) আজ এই নিয়ে নির্মলকে দুটো তিরস্কার করতে হলো, শিরোমণিশাহই, মনটা তেমন ভালো নেই।

শিরোমণি। না থাকবারই কথা। কিন্তু এ একপ্রকার ভালই হলো ভায়া। এখন বাবাভীর চৈতন্যোদয় হবে যে, স্বতঃ এবং সিদ্ধব্যাহীনীরদের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রত্যাশা আছে। আর, এ যে হতেই হবে। সর্বদলসমরী চতীমাতার ইচ্ছা কিনা!

প্রথম ভদ্রলোক। সমস্তই যারের ইচ্ছা। তা নইলে কি বোড়শী ভৈরবী বিনা ব্যাকব্যয়ে চলে যেতে চায়।

শিরোমণি। নিঃসন্দেহ। মন্দিরের চাবিটা ত পূজারীর কাছে থেকে কৌশলে আদায় হয়েছে, কিন্তু আসল ছবিটা ওনটি নাকি গিয়ে পড়েছে জমিদারের হাতে। বাটা পাড় মাভাল, সেখো ভায়া, শেষকালে যারের সিন্ধুকের সোনারূপো না চুকে যায় শূঁড়িও সিন্ধুকে। পাপের আর অবধি থাকবে না জনার্নন। এটে খেয়াল করা হয়নি।

শিরোমণি। না, এখন সহজে দিলে হয়। দশদিন পরে হয়ত বলে বসবে, কৈ, কিছুই ত সিন্ধুকে ছিল না। কিন্তু আমরা সবাই জানি ভায়া, বোড়শী আব যাই কেন না ককক, যারের সম্পত্তি অশংক্য করবে না—একটি পাই-পরসা না।

[অনেকেই এ কথা বীকাস করিল]

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। এর চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভাল।

শিরোমণি। চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই।

অনেকে। চাই চাই—অবিলম্বে চাই।

প্রথম ভদ্রলোক। আমি বলি, চলুন, আমরা চল বেঁধে গাই জমিদারের কাছে। বলি যে, চাবিটা দিন, কি আছে না আছে মিলিয়ে দেখি গে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। আমিও তাই বলি।

প্রথম ভদ্রলোক। আজ বেলা তৃতীয় প্রহরে—বজুর ঘুমটি থেকে উঠে মল খেতে বসেছেন।

মেজাজ, খুশ্‌ আছে—ঠিক এমন সময়টিতে।

অনেকে। ঠিক ঠিক এই ঠিক মতলব।

শিরোমণি। (সভয়ে) কিন্তু অভ্যস্ত মন্যপান করে থাকলে যাওয়া সম্ভব হবে না। কি বল জনার্দন?

[অকস্মাৎ ইহাদের মধ্যে একটা চাকল্য দেখা দিল। কে একজন কহিল, 'স্বয়ং হজুর আসছেন যে!' পরক্ষণেই জীবানন্দ ও প্রকৃত্ত প্রবেশ করিলেন। যাহারা বসিয়াছিল অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির উপরে বসিতে বাইতে-ছিলেন, সকলে সম্মুখে বলিয়া উঠিল, 'আসন, আসন, শীঘ্র একটা আসন নিয়ে এস']

জীবানন্দ। (উপবেশন করিয়া) আসনের প্রয়োজন নাই।—দেবীর মন্দির, এর সর্বত্রই ত আসন বিছানো।

জনার্দন। তাতে আর সম্ভেহ কি! কিন্তু এ আপনারই যোগ্য কথা।

[প্রকৃত্ত সিঁড়ির একাংশে গিয়া বসিল, এবং হাতে তাহার যে খবরের কাগজখানা ছিল তাহাই খুলিয়া নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল]

শিরোমণি। যাদুশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদুশী। মেঘ না চাইতে জল। আজই দ্বিপ্রহরে আমরা হজুরের কাছে যাব স্থির করেছিলাম, কিন্তু পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এইজন্যই—

জীবানন্দ। বাননি? কিন্তু হজুর ত দিনের বেলা নিদ্রা দেন না।

শিরোমণি। কিন্তু আমরা যে শুনি হজুর—

জীবানন্দ। শোনেন? তা আপনারা অনেক কথা শোনেন, যা সত্য নয় এবং অনেক কথা বলেন, যা মিথ্যা: এই যেমন, আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—

[এই বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার

দল খতমত বাইয়া একেবারে দুসড়িয়া গেল]

জনার্দন। মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে তা আশা ছিল না। নির্মল যে-বকম বৈকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ। তিনি সোজা হলেন কি প্রকারে?

শিরোমণি। (খুশী হইয়া সদর্পে) সমস্তই মায়েস ইচ্ছা হজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আব বইতে পারছিলেন না।

জীবানন্দ। তাই হবে! তার পরে—

শিরোমণি। কিন্তু পাপ ত দূর হলো, এখন—বল না জনার্দন, হজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বল না।

জনার্দন। (চকিত হইয়া) মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিইয়েচি। আজ তিনি সকালে মায়েস দোর খুলেছেন, কিন্তু সিদ্ধুকের চাবিটা ওনতে পেলাম, ঘোড়শী হজুরের হাতে সমর্পণ করেছে!

জীবানন্দ। তা করেছে। ভ্রমা-বরচের খাতাও একখানা দিয়েছে।

শিরোমণি। বেটী এখনও আছে, কিন্তু কখন কোথায় চলে যায় সে া বলা যায় না।

জীবানন্দ। (মুহূর্তকাল স্তব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া) কিন্তু সেজন্য আপনাদের উদ্বেগ কিসের? তাকে ডাড়ানও শু চাই। কি বলেন রায়মশায়?

জনার্দন। দলিলপত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা-কিছু তাহে গ্রামের প্রাচীর ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণিমশায় বলছেন যে, 'শাড়শী থাকতে থাকতেই এগুলো সব মিলিয়ে দেখলে ভালো হয়। হয়ত—

জীবানন্দ। হয়ত নাই? এই না? কিন্তু না থাকলেই বা আপনারা আদায় করবেন কি করে?

জনার্দন। (হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে বলিলেন) কি জানেন, তবু ত জানা যাবে হজুর।

জীবানন্দ। তা যাবে। কিন্তু শুধু শুধু জানা গিয়ে আর লাভ কি?

শিরোমণি। (প্রথমে স্তব্ধলোকের প্রতি অলক্ষ্যে) সেয়েছে!

জনাব্দন। কিন্তু কোনদিন ত জানতেই হবে হুকুর।

জীবানন্দ। তা হবে। কিন্তু আজ আর আমার সময় নেই রায়মশায়।

শিরোমণি। (ব্যস্ত হইয়া) আমাদের সময় আছে হুকুর। চাখিটা জনাব্দন ভারার হাতে দিলেই সন্ধ্যার পরে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখতে পারি। হুকুরেরও কোনও দারিদ্র থাকে না—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল যে ভোমরা? ঠিক বলেছি কিনা?

[সকলেই এ প্রভাবে সম্মতি দিল, দিল না শুধু বাহার হাতে চাবি]

জীবানন্দ। (ঈষৎ হাসিয়া) যত্ন কি শিরোমণিমশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত ডিবিয়ার কাছ থেকে আর আদায় হবে না। আজ থাক, যেদিন আমার অবসর হবে আপনাদের খবর দেব।

[মনে মনে সকলেই ক্রুদ্ধ হইল]

জনাব্দন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু দারিদ্র একটা—

জীবানন্দ। সে ত ঠিক কথা রায়মশায়। দারিদ্র একটা আমার রইল বৈ কি।

[সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে

জমিদারের শ্রুতিপথের বাইরে আসিয়া]

শিরোমণি। (জনাব্দনের গা টিশিয়া) দেখলে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোকাই তার। ওয়োট্টা কথা কর যেন হৈয়ালি। মনে চুর হয়ে আছে। বাঁচবে না বেশিদিন।

জনাব্দন। হ। বা ভয় করা গেল তাই হলো দেখচি।

শিরোমণি। এবার গেল সব তুড়ির দোকানে। বেটী যাবার সময় আচ্ছা জন্ম করে গেল।

প্রথম ভদ্রলোক। হুকুর আর দিচ্ছেন না।

শিরোমণি। আবার? এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে। (কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্বাস্ত্র রোমান্থিত হইয়া উঠিল)

[সকলের প্রস্থান]

প্রকুর। (খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দাদা, আবার একটা নূতন হাস্যামা জড়ালেন কেন? চাখিটা ওদের দিয়ে দিলেই ত হতো।

জীবানন্দ। হতো না? প্রকুর, হলে দিতাম। পাছে এই দুখটনা হবে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েছে।

প্রকুর। সিন্ধুকে আছে কি?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) কি আছে? আজ সকালে তাই আমি বাতাবানা পড়ে দেখলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পাখা, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানা রকমের জড়োরা পরনা, কত কি দলিলপত্র, তা ছাড়া সোনা-রূপার বাসন-কোসনও কম নয়। কতকাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চতুর্দশের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, আমি যত্নও ভাবিনি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে তৈরবীরা বোধ করি কাউকে জানতেও দিত না।

প্রকুর। (সভরে) বলেন কি! তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র-সমর্পণ ভাইনীর হাতে?

জীবানন্দ। নিতান্ত মিথ্যে বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। অথচ এ আমি চাইনি। বতই তাকে পীড়ানীড়ি করলাম, জনাব্দনকে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে পুঁজে দিলে।

প্রকুর। এর কারণ?

জীবানন্দ। বোধ হয় সে ভেবেছিল এ দুর্নায়ের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপালে তার আর সইবে না। এদের সে চিনেছিল।

প্রকুর। কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারেনি।

জীবানন্দ। (হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না) সে দেখ ভায়, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আর বত লিখেই করে থাকি প্রকুর, আমাকে চিনতে না দেওয়ার অপরাধ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য এই পৃথিবী, এক ভায় চেরেও আশ্চর্য এর মানুষের জন। এ যে কি খেতে কি দ্বিগ্ন করে দেয় কিছুই

কলবার হো সেই। এর দুটিটা কি জানো ভাবা, সেই যে তার হাত থেকে একদিন মরকিরা চেয়ে নিয়ে চোখ বুজে শেরেহিলাম, সেই হলো তার সকল ভর্তুকি বড় ভর্তুকি—সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে রাতে আর যে কোন উপায় ছিল না—সে ছাড়া যে আর কারও পানে চাইবার কোথাও কেউ ছিল না—যে নিজের প্রাণটা অসংশয়ে তার হাতে নিতে গেরেছিল তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি করে! বাস, যা কিছু ছিল চোখ বুজে নিলে আবার হাতে তুলে। প্রকৃত, দুনিয়ার ভয়ানক ঢালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসারটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যেত, কোথাও রসের বাষ্পটুকু অবশ্যই ঠাঁই পেত না।

প্রকৃত। অতিশয় খাঁটি কথা দাশ। অতএব অবিলম্বে বাতাবানা পুড়িয়ে ফেলে তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক বিন—জামানো মোহরতলোর যদি সলোমন সাহেবের সেনাটা শোধ যায় তা ওখু রসের বাষ্প কেন, খুবলবারে বর্ষণ শুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ। প্রকৃত, এই জনসৈন্য তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রকৃত। (হাত জোড় করিয়া) এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাশ। রসের উৎস আপনার অকৃত্রিম হোক, কিন্তু মোসাহেবি করে এ অধীনের গলার চুনিটা পর্বত কাঠ হয়ে গেছে। এইবার একবার বাহিরে গিয়ে দুটো ডালভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল-পরও আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে ক'বার নেওয়া হলো প্রকৃত?

প্রকৃত। বাত-ভারেক। (হাসিয়া কেলিয়া) তগবান দুখটা গিরেহিলেন, তা বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই মিন পেল। দুটো বড় কথাও যদি না মাঝে মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাত অপরাধও সেই দাশ। বহুকাল ধরে আপনারদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচ বলে এ সেহটায় মেদ-মাসেই কেবল পরিপূর্ণ করেছি, সত্যিকারের রক্ত বলতে আর ছিটেকোটাও বাকী রাখিনি। আজ ভাবি এক কাজ করব। সন্ধ্যার আবেছার পা-ঢাকা দিয়ে গিয়ে খণ করে ভৈরবীঠাকুরনের এক খামচা পায়ের দুলো নিয়ে ফেলব। আপনার অনেক ভালো-মন্দ সবাই ত আজ পর্বত উন্নয়ন করেছি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবে না, পেটে লোহার মত ফুটেবে।

জীবানন্দ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আজ উল্লাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে প্রকৃত।

প্রকৃত। (যুক্তহস্তে) তা হলে বসুন দাশ, এটা শেষ করি। মোসাহেবির পেলন বলে সেমিন যে উইলখানার হাজার-পাঁচেক টাকা লিখে রেখেছেন, সেটার ওপরে দগা করে একটা কলমের খাঁড় দিয়ে রাখবেন—চণ্ডীর টাকটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবে না, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুগুণি করবেন না।

জীবানন্দ। তা হলে এবার আমাকে ফুঁমি সতাই ছাড়লে?

প্রকৃত। আশীর্বাদ করুন এই সুমতিটুকু যেন শেষ পর্বত বজায় থাকে। কিন্তু কবে বরজেন তিনি?

জীবানন্দ। জানিনে।

প্রকৃত। কোথায় বাচেন তিনি?

জীবানন্দ। তাও জানিনে।

প্রকৃত। জেনেও কোন লাভ নেই দাশ। বাপ রে! মেরেমানুব ত নর, যেন পুরুষের বাবা। যদিও দাঁড়িয়ে সেমিন অনেককণ চেয়েছিলাম, মনে হলো পা থেকে মাথা পর্বত যেন পাখরে গড়া। যা মেরে পুঁতো করা যাবে, কিন্তু আওনে গলিয়ে ইচ্ছে-মত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন, সে বস্তাই নয়। পারেন ত ও মডলবটা পরিচালনা করবেন।

জীবানন্দ। (বিস্ময়ের ধরে) তা হলে প্রকৃত, এবারে নিতান্তই বাচ্ছে?

প্রকৃত। গুরুজনের আশীর্বাদের জোর থাকে ত মনকা। সিদ্ধ হবে বৈ কি।

জীবানন্দ। তা হতে পারে। আচ্ছা, বোড়শী সতাই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রকৃত। হয়। কারণ, সংসারে সবাই প্রকৃত নয়। ভালো কথা দাশ, একটা খবর নিতে আপনাকে ছুলেছিলাম। কাল রাতে নদীর ধারে বেড়াছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ককিরসাহেব আপনাকে বিনি তাঁর কটপাহে দুখ শিকার করতে যেননি—বলুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। কুর্নিশ করে কুশল প্রশ্ন করলাম, ইচ্ছে ছিল খুশরোচক পুঁটো বোলামোষ চোলামোদ করে যদি একটা কোন ভালরকমের ওখু-

টুকু বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেট নিয়ে বেচে দু'পয়সা রোজগার করব। কিন্তু ব্যাটা ভারী চালাক, সেলিক দিয়েই গেল না। কথার কথার ওনলাম তাঁর ভৈরবী মাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন চলে বাচ্ছেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে নিয়ে চলে বাচ্ছেন তাঁর কাছেই ওনতে পেলাম।

জীবানন্দ। ঐর সদুপদেশের কলেই বোধ হয়?

প্রকুর। না। বরঞ্চ, উপদেশের বিরুদ্ধেই বাচ্ছেন।

জীবানন্দ। বল কি হে, ককির যে ওনি তাঁর গুরু! গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রকুর। এক্ষেত্রে ভাই বটে।

জীবানন্দ। কিন্তু এতবড় বিরাগের হেতু?

প্রকুর। হেতু আপনি। কি জানি, এ কথা শোনানো আপনাকে উচিত হবে কিনা, কিন্তু ককিরের বিশ্বাস আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন। পাছে কলহবিবাদের মধ্যে দিয়েও আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সবচেয়ে দুশ্চিন্তা। নইলে ভয় তাঁর মিথ্যা কলঙ্কেও নয়, গ্রামের লোককেও নয়।

[জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে নীরবে চাহিয়া রছিলেন]

প্রকুর। দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেননি, কিন্তু সর্ব্ব স্বয়ং করে কাল তিনিই মনোহর ভুল করলেন, না হাত পেতে নিয়ে আপনিই মনোহর ভুল করলেন, সে যীমাসো আজ বাকী রয়ে গেল। বেঁচে থাকি ত একদিন দেখতে পাব আশা হয়।

[জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়া রছিলেন। সহসা

বেয়ারা পাত্র ভরিয়া মদ লইয়া প্রবেশ করিতেই]

জীবানন্দ। আঃ—এখানেও? বা নিয়ে যা—দরকার নেই।

[বেয়ারা প্রস্থান করল

প্রকুর। রাগ করেন কেন দাদা, যেমন শিক্ষা। বরঞ্চ কখন দরকার সেইটেই বলে দিন না। আকস্মাৎ অন্তে অরুচি যে দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) অরুচি নয়, কিন্তু আর খাব না।

প্রকুর। (হাসিয়া) এই নিয়ে ক'বার হলো দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এই যীমাসোটাও আজ না হয় বাকী থাক প্রকুর, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

[বেয়ারা পুনরায় প্রবেশ করিল]

বেয়ারা। এই পিড়লটা তুলে টেবিলের ওপর কেলে রেখে এসেছিলেন।

জীবানন্দ। তুলেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু ওতেও আর কাজ নেই, তুই নিয়ে যা।

প্রকুর। কিন্তু রাত প্রায় এগারটা হলো, বাড়ি চলুন।

জীবানন্দ। না, বাড়ি নয় প্রকুর, এখন একলা অন্ধকারে একটু ঘুরতে বার হবে।

প্রকুর। একলা? নিরস্ত্র? না না, সে হয় না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে-ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। অন্ততঃ নিত্য-সহচরটিকে সঙ্গে রাখুন। (এই বলিয়া সে তৃত্যের হাত হইতে পিড়ল লইয়া গিতে গেল)

জীবানন্দ। (পিড়লিরা দিয়া) ও জীবনে ওকে আর আমি হুঁকিনে প্রকুর। আজ থেকে আমি এখন একাকী বার হবে, কেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার। আমার থেকেও কারও কোন না ভয় হোক; তার পরে যা হয় জু' খটুক, আমি কারও কাছে নাগিন করব না।

প্রকুর। হঠাৎ হলো কি? না হয়, পাইকনের কাউকে ডেকে সিঁহ?

জীবানন্দ। না, পাইক-পেরাঙ্গা আর নয়। তোমরা বাড়ি যাও।

প্রকুর। আপনার অবস্থা হবে না দাদা, আমরা চললাম, কিন্তু আপনিও বেশী বিলম্ব করবেন না আমার অনুমোদন।

[প্রকুর ও বেয়ারা প্রস্থান করিল

[জীবানন্দ ধীরে ধীরে নটিশবিরের আর একটা দিকে আসিয়া উপহিত হইল। একজন খাম চেস দিয়া বসিয়া মুদুকঠে দাম-পান করিতেছিল এবং অনূরে চার-পাঁচজন লোক চাপর খুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। জীবানন্দ হেঁট হইয়া অজ্ঞকারে ভাষাকে সেবিবার চেষ্টা করিল]

গীত

পূজা করে তোরে তারা
সার সন্নি হর নরনখারা,
তুভকরী নাম তবে মা
ধরিস কেন দুঃখ-হরা।
কি পাগেতে বল্ মা কালী
মাখালি কলঙ্ক-কাল—
এখন ভরসা কেবল কালী
তুই মা বরাভর-করা।

জীবানন্দ। তুমি কে হে?

পথিক। আচ্ছ, আমি একজন বাবী বাবু।

জীবানন্দ। বাবু বলে আমাকে চিনলে কি করে?

পথিক। অহা, তা আর চেনা যায় না? ভদ্রলোক ছাড়া এমন ধপধপে কাপড় আর কানের থাকে বাবু?

জীবানন্দ। ওঃ—তাই বটে। কোথা থেকে আসচ? কোথায় যাবে? এরা বুঝি তোমার সঙ্গী?

পথিক। আসিতি মানকুম জেলা থেকে বাবু, যাব পুরীধামে। এসেচ কারও বাড়ি মেদিনীপুরে, কারও বাড়ি আর কোথাও—কোথায় যাবে তাও জানিনে।

জীবানন্দ। আচ্ছ, কত লোক এখানে রোজ আসে? যাত্রা থাকে তারা দু'বেলা যেতে পায়, না?

পথিক। (লজ্জিত হইয়া) কেবল খাবার জন্যেই নয় বাবু! আমার পা কেটে গিয়ে ঘায়ের মত হয়েচে দেখেই মা-ভৈরবী নিজে হুকুম দিয়েছিলেন যত দিন না সারে তুমি থাকো।

জীবানন্দ। তোমাকে যেতে বলিনি ভাই, বেশ ত থাকো না। জায়গার ত আর অভাব নেই।

পথিক। কিন্তু ভৈরবী মা ত আর নেই ওনতে পেলাম।

জীবানন্দ। এরই মধ্যে ওনতে পেয়েছ? তা নাই তিনি গুলেলেন, তাঁর হৃৎ ত আছে? তোমাকে যেতে বলে কার সাধ্য? বাড়ি কোথায় তোমার ভাই?

পথিক। বাড়ি আমার ছিল বাবু মানকুমের বংশীতট গাঁয়ে। গাঁয়ে আর নেই, জল নেই, ডাক্তার-কদি নেই—জমিদার থাকেন কলকাতায় কখনো তাঁকে কেউ দুঃখ জানাতে পারিনে। আছে শুধু গোমস্তা টাকা আদায়ের জন্যে।

[জীবানন্দ নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া সায় দিল]

পথিক। উপরি উপরি দু' সন বৃষ্টি হলো না, ক্ষেতের ফসল জ্বলে-পুড়ে গেল, এও সয়েছিল বাবু,—কিন্তু—(কায় তাহার গলা বুজিয়া আসিল)

জীবানন্দ। তাই বুঝি তীর্থ-দর্শনে একবার বেরিয়ে পড়লে?

পথিক। (মাথা নাড়িয়া) এই কাগুনে পরিবার মারা গেল, একে একে দুঃখ হেলে ওলাউঠায় চোখের সামনে মারা গেল বাবু, এককোঁটা ওষুধ কাউকে দিতে পারলাম না।

[বলিতে বলিতে লোকটি উচ্ছ্বসিত শোকে কাদিয়া কেলিল।]

জীবানন্দ আমার হাতের চোখ মুছিতে লাগিলেন।]

পথিক। মনে মনে বললাম, আর কেন? ভাঙ্গা কুঁড়েখানি বিধবা ভাইবিকে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—বাবু, আমার চেয়ে দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ। ওরে ভাই, তাই সারটা চোর বড় জায়গা, এর কোথায় কে কিভাবে আছে বলবার জো

নেই।

পথিক। কিন্তু আমার মত—

জীবানন্দ। দুঃখী। কিন্তু দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বীথানে রাখা নেই। তা হলে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে পারত। হৃদয়ভূত করে বখন যাড়ে এসে পড়ে তখনই কেবল মানুষ টের পায়। আমার সব কথা তুমি বুঝবে না ভাই, কিন্তু সনোরে তুমি একলা নও। অন্ততঃ একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তাকে তুমি টিনডেও পারোনি। কিন্তু তুমি মায়ের নাম করছিলে—

[সহসা সাগর ও হরিহর দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে
গিয়া দাঁড়াল। জীবানন্দ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল]

হরিহর। আমাদের মায়ের সর্বনাশ বে করেছে তার সর্বনাশ না করে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

সাগর। মায়ের চৌকাঠ হুঁয়ে নিখি করলাম খুড়ো, কীলি যেতে হয় ডাও বাব।

হরিহর। হঃ—আমাদের আবার জেল, আমাদের আবার কীলি। যা আগে যাক—

হরিহর ও সাগর। জয় মা চতী!

[উভয়ের প্রস্থান]

জীবানন্দ। বাস্তবিক, ঠাকুর-দেবতার মত এখন সহস্রের শ্রোতা আর নেই। হোক না বিখ্যা দত্ত, তবু তার দাম আছে। দুর্বলের বার্থ পৌরষ তবু একটু পৌরষের স্থান পায়।

পথিক। কি বললেন বাবু?

জীবানন্দ। কিছু না ভাই, মায়ের নাম করছিলে আমি বাবা মিলাম। আবার ওর কর, আমি চললাম। কাল এমনি সময়ে হরত আবার দেখা পাবে।

পথিক। আর ত দেখা হবে না বাবু, আমি পাঁচদিন আছি, কালই সকালে চলে যেতে হবে।

জীবানন্দ। চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বললে তোমার পা এখনো সারেনি, তুমি হাঁটতে পার না?

পথিক। মায়ের মন্দির এখন রাজাবাবুর। হজুরের হুকুম তিনদিনের বেশি আর কেউ থাকতে পারবে না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) ভৈরবী এখনও যারনি, এরই মধ্যে হজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে? মা-চতীর কপাল ভালো! আজ্ঞা, আজ অভিখিলের সেবা হলো কিরকম? কি খেলে ভাই?

পথিক। যাদের তিনদিনের বেশি হয়নি তারা মায়ের প্রসাদ সবাই পেলে।

জীবানন্দ। আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশি হয়ে গেছে?

পথিক। ঠাকুরমশাই কি করবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কিনা।

জীবানন্দ। কাল আমি আবার আসব, কিন্তু ভাই, চুপিচুপি চলে যেতে পাবে না।

পথিক। ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলে?

জীবানন্দ। বললেই বা। এত দুঃখ সহিতে পারলে, আর বামুনের একটা কথা সহিতে পারবে না? রাত হলো এখন বাই, কিন্তু যেন থাকে যেন।

[এমনি সময়ে বোড়শী প্রদীপ-হস্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের

দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, জীবানন্দ শিহন হতেই ডাক দিল]

জীবানন্দ। অলকা?

বোড়শী। (চমকিয়া) আপনি? এত রাতে আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ। কি জানি, এমনি এসেছিলাম। তুমি ব্যস্তার আগে ঠাকুর-প্রণাম করতে যাক, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে বাই।

বোড়শী। আমার সঙ্গে বাবার বিপদ আছে সে ত আপনি জানেন!

জীবানন্দ। বিপদ? জানি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ জীবনে আর বাই কেন না বীকার করি, আমার শত্রু আছে এ আমি একটা দিনও আর মানব না।

বোড়শী। কিন্তু কি হবে আমার সঙ্গে সিরে?

জীবানন্দ। কিছু না। শুধু যতক্ষণ আছে সঙ্গে থাকব, তার পর যখন সময় হবে তোমাকে পাড়িতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাব। বাবার দিন আজ আর আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না। আমার আত্ম দাম জানো, হয়ত আর দেখাও হবে না। আমাকে যে তুমি কতরকমে দয়া করে গেলে, শেবলিন পর্যন্ত আমি সেই কথাই স্মরণ করব।

বোড়শী। আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে।

[রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে গিয়া বোড়শী প্রণাম করিল। জীবানন্দ বলিতে লাগিল]

জীবানন্দ। তোমাকে আমার প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলে না? বোড়শী। না।

জীবানন্দ। একটা দিন?

বোড়শী। না।

জীবানন্দ। তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা কর।

বোড়শী। কিন্তু তাতে কি আপনার প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ। এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায়, সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বৃষ্টি আর কেউ নেই।

[বোড়শী জীবানন্দের কাছে আসিয়া স্তম্ভ হইয়া নীরবে দাঁড়াইল।]

জীবানন্দ। (স্ব-স্বপ্না) আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ অলকা, সবাই জানবে আমি শান্তি দিইছি, তুমি সহ্য করছ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। এতবড় মিথ্যে কলঙ্ক আমি সুইব কেমন করে? তাও সব যদি একটি দিন—শুধু কেবল একটি দিনও তোমাকে কাছে রাখতে পারি।

বোড়শী। (পিছছিয়া গিয়া) চৌধুরীমশাই, কিসের জন্যে এত অনুনয়-বিনয়? আপনার পাইক-পেয়াদাদের গায়ের জোড়ের ত আজও অভাব হয়নি। আপনি ত জানেন, আমি কারো কাছে নালিশ করবো না।

জীবানন্দ। (পথ ছাড়িয়া সরিয়া) তা হলে তুমি যাও। অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে আমি নীড়ন করব না। পাইক-পেয়াদা সবাই আছে অলকা, তাদের জোড়ের অভাব হয়নি। কিন্তু যে নিজে দয়া দিলে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোকা বয়ে বেড়াবার জোর আর আমার গায়ে নেই।

বোড়শী। (গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দের পায়ের ধূলা মাথার তুলিয়া) আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—

জীবানন্দ। কি অনুরোধ অলকা?

[বাহিরে গরুর গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ হইল]

বোড়শী। দয়া করে একটু সাবধানে থাকবেন।

জীবানন্দ। সাবধানে থাকব! কি জানি, সে বোধ হয় আর পেয়ে উঠব না। কিছুক্ষণ পূর্বে এই মন্দিরে কে দুজন দেবতার চৌকাঠ ছুঁয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল, তাদের মায়ের সর্বনাশ যে করেছে, তার সর্বনাশ না করে ভারী বিব্রাহ করবে না—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সব শুনলাম—দুদিন আগে হলে হয়ত মনে হতো, আমিই বৃষ্টি তাদের লক্ষ্য—দুষ্টিভার সীমা থাকত না, কিন্তু আজ কিছু মনেই হলো না—কি অলকা? চমকালে কেন?

বোড়শী। (পাণ্ড-মুখে) না কিছু না। এইবারে ত আপনার চণীগড় ছেড়ে বাড়ি যাওয়া উচিত? আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ। (অন্যমনস্তার) কাজ নেই?

বোড়শী। কৈ আমি ত আর দেখতে পাইনে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যেই আপনি এসেছিলেন। আমার মত অসতীকে নির্বাসিত করার পর আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখতে পাইনে।

জীবানন্দ। (জোষ মেলিয়া চাহিয়া রহিয়া) কিন্তু তুমি ত অসতী নও!

[পাড়ারানের প্রবেশ]

পাড়ারান। যা, আর কি বেশী দেরি হবে?

বোড়শী। না বাবা, আর বেশী দেরি হবে না।

[পাড়ারান প্রস্থান করিল]

চণ্ডীপুক থেকে আপনাকে কিন্তু বেতেই হবে তা বলে মিছি।

জীবানন্দ। কোথায় যাব বল?

বোড়শী। কেন, আপনার নিজের বাড়িতে। বীজপায়ে।

জীবানন্দ। বেশ, তাই যাব।

বোড়শী। কিন্তু কালকেই বেতে হবে।

জীবানন্দ। (মুখ তুলিয়া) কালই? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জলনিকাশের একটা সাকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব কিরিরে নিতে হবে, সে ত তোমারই হুকুম। তা ছাড়া মনিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই—অতিথি-অভ্যাগত বান্ধা আসে তাদের ওপর না অত্যাচার হয়—এ-সব না করেই কি তুমি চলে বেতে বলচ?

বোড়শী। (মুশকিলে পড়িয়া) এ-সব সাধুসন্তর কি কাল সকাল পর্বত থাকবে? (জীবানন্দ নীরব রহিল) কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশী থাকবেন না আমাকে কথা দিন। এবং সে-ক'টা দিন আগেকার মত সাথখানে থাকবেন হলুন?

জীবানন্দ। (সে কথার কান না দিয়া) আমার কৃতকর্মের ফল বনি আমি ভোগ করি সে অভিযোগ আমি কার কাছে করব না—কিন্তু বাবার সময় তোমার কাছে আমার শুধু একটিনা পাকী আছে—(পকেট হইতে একখানি পর বাহির করিয়া বোড়শীর হাতে দিয়া) এই চিঠিখানি ককিরসাহেবকে দিও।

বোড়শী। দেবো। কিন্তু এ পর কি পড়তে পারিনে?

জীবানন্দ। পার, কিন্তু আবশ্যক নেই। এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবে না। আমাকে মুখে থেকে বাঁচবার জন্যে তার ঢের বেশী মুখ তুমি নিজে নিরেচ। নইলে এমন করে হয়ত আমাকে—কিন্তু থাক সে। আমার শেব অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা যদি রাখতে পার, তার চেয়ে আনন্দ আর আমার নেই।

বোড়শী। তা হলে পড়ি?

[বোড়শী নীরবে চিঠিখানি পড়িল, তাহার মুখে ভাবের একান্ত পরিবর্তন]

বটিল, জীবানন্দকে আড়াল করিয়া তাড়াতাড়ি সজল চক্ষু মুছিয়া কেলিল]

বোড়শী। আমি যে কুষ্ঠাঙ্গমের দাসী হয়ে বাচি এ খবর তুমি জানলে কি করে?

জীবানন্দ। কুষ্ঠাঙ্গমের কথা জানেই জানে। আর তোমার কথা? আচ্ছ! যেমতোর হুনে পড়িয়ে যাত্রা শপথ করে গেল, নিজের কানে ওনেও আমি বাবের চিনতে পারিনি, তুমি তাদের চিনলে কি করে?

বোড়শী। তোমার কি সংসারে আর মন নেই? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে খেরিয়ে বেতে চাও নাকি?

জীবানন্দ। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মত, আমি মানুষের মত বাঁচতে চাই। যদি চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই—আর স্বরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে বেতে চাই। কিন্তু এ প্রার্থনা জানাব আমি কার কাছে?

[পাড়ারানের প্রবেশ]

পাড়ারান। হা, শৈবালগীষি সাত-আট কোশের পথ, এখন বার না হলে পৌছতে কোলা হবে যাবে।

বোড়শী। চল বাবা, বাচি।

[গাভোয়ান গ্রহান করিল। বোড়শী পুনরায় জীবানন্দকে গ্রহণ করিয়া]

আমি চললাম।

জীবানন্দ। এখনি? এত রাত্রে?

বোড়শী। প্রজারা জানে আমি ভোরবেলার বাজা করব তারা এলে পড়বার পূর্বেই আমার বিদায় হওয়া চাই। [গ্রহান]

জীবানন্দ। (একাকী অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া) অলকা! অলকা! একদিন তোমার মা আমার হাতে তোমাকে দিয়েছিলেন; তবু তোমাকে পেলাম না; কিন্তু সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে এমন করে কেলে বেতে পারতেন না।

[বাহির হইতে গরুর গাড়ি চালানোর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শাড়িকুঞ্জ

[জমিদারের 'শাড়িকুঞ্জ' তিন-চারদিন হইল ভস্মীভূত হইয়াছে। ভরাবহ অগ্নিকাণ্ডের বহু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। সবই পুড়িয়াছে, মাত্র ভৃত্যদের খান-দুই ঘর রক্ষা পাইয়াছে। ইহার মধ্যেই জীবানন্দ প্রায় লটাইছেন। নখুখের খোপা জানালা দিয়া বারুই নদীর জল দেখা যাইতেছে; প্রভাতবেলার সেইদিকে চোখ মেলিয়া জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। মুখে চাকলা বা উত্তেজনার কোন প্রকাশ নাই, শুধু সারারাত্রি ধরিয়া উৎকট রোগ-ভোগের একটা অবসর জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সর্বসমেহে পরিকাণ্ড হইয়া আছে।]

[প্রফুল্ল প্রবেশ করিল]

প্রফুল্ল। এখন কেমন আছেন দাদা?

জীবানন্দ। ভালো আছি।

প্রফুল্ল। বসকালের অভ্যাস, ওষুধ বলেও যদি এক-আধ আউল—

জীবানন্দ। (সহাস্যে) ওষুধই বটে। না প্রফুল্ল, মত আমি খাব না।

প্রফুল্ল। রাত্রিটা কাল কি উৎকণ্ঠাতেই আমাদের স্লেটছে। যন্ত্রণার কান পা পর্বন্ত ঠাণ্ডা হরে আসছিল।

জীবানন্দ। তাই এই গরম করার প্রস্তাব?

প্রফুল্ল। বরষা ডাক্তারের ভয়, হয়ত হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে।

জীবানন্দ। হার্ট ত হঠাৎই ফেল করে প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। কিন্তু সেজন্য ত একটা—

জীবানন্দ। (নিজের হার্ট হাত দিয়া দেখাইয়া) ভায়া, এ বেচারী বহু উপদ্রবেও সমানে চলতে কোনদিন ফেল করেনি। সৈবৎ একদিন একটা অকাজ যদি করেই বসে ত যাপ করা উচিত।

প্রফুল্ল। কি একগুণে মানুষ আপনি দাদা। ভাবি, এতবড় জিন এতকাল কোথায় লুকানো ছিল।

জীবানন্দ। ভালো কথা, ডোমার ডালভাতের জোগাড় বার হবার ষাট সাথ প্রস্তাব ছিল তার কতদূর?

প্রফুল্ল। ঘাট হয়েছে দাদা। আপনি ভালো হয়ে উঠুন ডালভাতের চিন্তা তার পরেই করব।

জীবানন্দ। আমার ভালো হবার পর ত? যাক তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

[তারাদাস ও পূজারীর প্রবেশ]

তারাদাস। মন্দিরের খানকয়েক থালা-ঘটি-বাটি পাওয়া যাচ্ছে না।

জীবানন্দ। মা গেলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে। [ব্যস্ত হইয়া এককড়ির প্রবেশ]

এককড়ি। (ডাক ছাড়িয়া) এ কাজ সাগর সর্গায়ের। আজ বকর পাঁচটা পেন, ডাকে আর তার দু'জন সঙ্গীকে সেদিন অনেক রাত পৰ্যন্ত এনিকে ঘুরে বেড়াতে লোক মেখেতে। আমার সংবাদ পাঠিয়েছি, পুলিশ এল বলে। সমস্ত ছুটিজ তত্বকে যদি না আমি এই স্থাপারে আদামাসে পাঠাতে পারি ত আবার নাইই এককড়ি নশী নর—বুখাই আমি এতকাল হজুরের সরকারে গোলাঘি করে মরছি।

জীবানন্দ। (একটু হাসিয়া) তা হলে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে বেতে হয় এককড়ি। ছায়াবাদের গোলাঘিগিরি কাছে ছুটি বাসের ঘর ছায়াবাদের সে ত আমি জানি। এদের আঙন নিতে কেউ চোখে মেখেনি, কেবল সন্ধ্যের উপর যদি তাদের শান্তি ভোগ করতে হয়, আদাম-অপরায়ণের জন্য তোমাকেও ত তার ভাগ নিতে হয়।

এককড়ি। (প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া, পরে শুক হাস্যের সহিত) হজুর মা-বাগ। আদামের সাত-পুরুষ হজুরের গোলাঘি। হজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, কীসি যাওয়ার আদামের অহকার।

জীবানন্দ। বা পুড়েছে সে আর কিভাবে না; কিন্তু এর পর যদি পুলিশের সঙ্গে ছুটে নতুন আদামা বাধিয়ে দু'পরসা উপরি রোজপারের চেষ্টা কর, তা হলে হজুরের লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে এককড়ি।

পূজারী। বিদ্রী এসেছে হজুরের কাছে নাগিশ জানাতে।

জীবানন্দ। কিসের নাগিশ?

পূজারী। মন্দিরের মেঝায়-কাছে ঘটনাচক্রে তার বিশেষ লোকসান হয়ে যায়। বা বলেছিলেন, কাজ শেষ হলে তার কতিপূরণ করে দেবেন। আমি শুধন উপস্থিতি হিলাম হজুর।

জীবানন্দ। তবে কেওরা হয় না কেন?

পূজারী। (ভারানাসকে ইশিত করিয়া) উনি বলেন, যে বলেছিল তার কাছে গিয়ে আদাম করতে।

[জীবানন্দ কুচ্চ-চকে তারানাসের প্রতি চাহিতে]

তারানাস। অনেকগুলো টাকা—

জীবানন্দ। অনেকগুলো টাকাই মেবে ঠাকুর।

তারানাস। কিন্তু খরচটা ন্যায্য কিনা—

জীবানন্দ। দেখ তারানাস, ও-সব শরতানি মতলব ছুটি ছাড়ে। বোড়শীর ন্যায়-অন্যায় বিচারের তার-তোবার ওপরে নেই। বা বলে গেছেন তাই কর যে। (পূজারীর প্রতি) বিদ্রী ঠাকুরে আছে?

পূজারী। আছে হজুর।

জীবানন্দ। চল, আমি নিজে গিয়ে সমস্ত মিটিয়ে দিছি।

[জীবানন্দ, হজুর, তারানাস ও পূজারীর প্রস্থান। রবিল শুধু এককড়ি]

[নিরোহনি ও জনার্ন রায়ের প্রবেশ]

জনার্ন। বাবু পেন্সেন কোথা?

এককড়ি। (ভিত্তকটে) কে জানে!

জনার্ন। কে জানে কি হে? পুলিশ বকর মেঝার কণ্ঠটা উঠে বলেছিলে?

এককড়ি। পয়েন, আপনিই কনুন না।

জনার্ন। স্থাপার কি এককড়ি?

এককড়ি। কে জানে কি স্থাপার। না আছে মেঝায়ের ঠিক, না পাই কোন কথার ঠিকানা। তার ঠাকুরকে ভেঙে ফারতে পেন্সেন, আদামকে পাঠাতে চাইলেন জেনে—

নিরোহনি। অভাবিক ম্যাপানের কল। হজুর কি এমনি ফিরে আসবেন হলে হয়?

এককড়ি। বুকেলেন রায়কর, মিথ্যে সন্ধ্য করে সাগর সর্গায়ের নাম পুলিশে আদামে চলেবে না।

জনার্ন। মিথ্যে সন্ধ্য কি হে? এ যে 'একরকর' স্পষ্ট চোখে দেখা।

নিরোহনি। একেবারে প্রত্যক কলসেই হয়।

এককড়ি। বেশ, তাই একবার বলে দেখুন না?

জনার্নন। কলবই ত হে। নইলে কি গুডবর্ণ মিলে পুড়ে করলা হবে। বোড়শীকে ডাকানোর কাজে আমিও ত একজন উদ্যোগী।

শিরোমণি। আমার কলবই না কেন? তারা শুনেছে।

জনার্নন। হ্যাঁ এতবড় জমিদারের বাড়িতে আঙন নিতে পারে, তারা পারে না কি?

এককড়ি। আমিও তাই ভাবি।

জনার্নন। তেবো পরে। এখন শীঘ্র কিছু একটা করো। এখানে বসি প্রায় পাঁচ ত আধাকে ঘরে শিকল দিয়ে জানকচুর মত সেদ্ধ করে ছাড়বে।

শিরোমণি। ব্যাটারা গুরুর লোহাই মানবে না। ডাকাত কিনা! হরত বা ব্রহ্মহত্যাই করে বসবে। (শহরীয়া উঠিলেন)

জনার্নন। আর শুধু কি কেবল বাড়ি? আমার কত ধানের গোলা, কত খড়ের মাড়, সবসুদ্ধ যদি—

শিরোমণি। সেখ ডাড়া, আমি বরক মিল-কতক শিষ্যবাড়ি থেকে ঘুরে আসি গে।

জনার্নন। কিন্তু আমার ত শিষ্যবাড়ি নেই? আর থাকলেও ত ধানের গোলা, খড়ের মাড় নিয়ে শিষ্যবাড়ি ওঠা যায় না?

শিরোমণি। না। পেলেও ও সকল কিরিরে আনা কঠিন। আজকালকার শিষ্য-সেবকদের মতিগতিও হয়েছে অন্য প্রকার।

এককড়ি। চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন করে রাখুন।

জনার্নন। এ ত রেখেছি, কিন্তু পাহারা কি তোমাদেরই কম ছিল এককড়ি।

এককড়ি। আর একটা কথা শুনেছেন? ভূমিজ প্রজারা গিয়ে কাল আদালতে নালিশ করে এসেছে। ওনটি কাগজাটি ওনে স্বয়ং হুকিম আসবেন সরজমিন তদারকে।

জনার্নন। বল কি হে। চণ্ডীগড়ে বাস করে জমিদার আর আমার নামে নালিশ?

শিরোমণি। শিষ্যগণের আহ্বান উপেক্ষা করা আমার কর্তব্য নয় জনার্নন।

এককড়ি। দেখুন আশ্চর্য! জীবনে বেনীদিন হারা পেটভরে খেতে পার না, নীতের রাত্তে হারা বসে কাটায়ে, মড়কের দিনে হারা কুকুর-বেড়ালের মত মরে—

জনার্নন। আবার আশ্বাসের দিনে একমুঠা বীজের জন্যে আমারই দরজার বাইরে পড়ে হত্যা দেয়—

এককড়ি। সেই নিমকহারার ব্যাটারা আদালতে নীড়াবার টাকা পেলেই বা কোথা? এ দুর্বতি দিলেই বা তাদের কে?

জনার্নন। এই সোজা কথাটা ব্যাটারা বোঝে না যে, কেবল জেলা আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলেও একটা-কিছু আছে যেখানে জীবানন্দ চৌধুরী জনার্নন রাবকে ডিভিজে সাগর সর্দার বেতে পারে না।

এককড়ি। নিশ্চয়। টাকা বার মোকদ্দমা তার। আপনার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিস্টার জাহাজ আছে, কত উকিল-মোতার আছে; নালিশ যদি করেই, আপনার ডাবনা কিসের?

জনার্নন। (চিন্তিতভাবে) না এককড়ি, কেবল জমি বিক্রিই ত নয় (ইঙ্গিত করিয়া) আরো যে-সব কাজ করা গেছে, কৌজলারী লণ্ডবিনি কেতাবের পাতার পাতার তার কলঙ্কটি ত সহ্য নয়!

এককড়ি। তা জানি। কিন্তু এই ছোটলোক চাষার লল হুকিমের কাছে আমল পেলো ত!

জনার্নন। বলা যায় না; এই কথাই আজ তোমার মনিবের কাছে পাড়ো গে। এখন চললাম।

এককড়ি। আসুন। আমিও ইতিমধ্যে একটা কাজ সেরে রাখি গে।

[শিরোমণি, এককড়ি ও জনার্ননের প্রস্থান]

[কথা কহিতে কহিতে জীবানন্দ ও প্রকুর প্রবেশ করিলেন]

জীবানন্দ। না প্রকুর, সে হয় না। হাঠের জল-নিকালী সীকো তৈরির পরমা যদি নামেবকশারের ঠাণ্ডিল না থাকে ত এখানকার বাড়ি মেরামতও বন্ধ থাক।

প্রকৃত। বেশ থাক। কিন্তু দেশে কিরে চলুন।

জীবানন্দ। না।

প্রকৃত। না কিরকম? এ বাড়িতে আপনি থাকবেন কি করে?

জীবানন্দ। যেমন করে আছি। এ সহ্য হয়ে বাবে। মানুষের অনেক কিছুই সর প্রকৃত।

প্রকৃত। সয় না দাদা, তারও সীমা আছে। শরীরটা যে হঠাৎ ভরানক ভেসে গেল। বর্ষা সুমুখে।

এই ভাঙ্গা মশিরে কি এই ভাঙ্গা দেহে সে দুর্বোণ সইবে? রকে করুন, এবার বাড়ি চলুন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এই ভাঙ্গা দেহের দেহ-ভেদের আলোচনা আর একদিন করা বাবে তারা, এখন কিন্তু নায়েবকে চিঠি লিখে দাও এ টাকা আমার চাই-ই। প্রজারা বছর বছর টাকা বোগাছে আর মরচে, এবার তাদের মরণ আটকাতে যদি জমিদারিটা মরে শু মরুক না।

[এককড়ির প্রবেশ]

জনার্দন। হজুর কি নিচ্ছে—বয়ং হকুম দিয়ে আমার—

জীবানন্দ। কি হকুম রায়মশায়?

জনার্দন। আমার পুকুরখারের জায়গায় বেড়া ভেসে মশিরের জমির সঙ্গে এক করিয়ে দিয়েছেন?

জীবানন্দ। কোন জায়গাটা বলছেন? যেখানে বছর-ছুড়ি পূর্বে মশিরের গোশালা ছিল?

জনার্দন। আমি শু জানিনে কবে আবার—

জীবানন্দ। অনেকদিন হয়ে গেল কিনা! বোধ হয় নানা কাকের কণ্ঠাতে কণ্ঠাটা ভুলে গেছেন।

জনার্দন। (দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া) কিন্তু এ-সব করার আগে হজুর ত আমার কাছে একটা শবর পাঠাতে পারতেন।

জীবানন্দ। শবর নৌছেবেই জানি। দু'দণ্ড আগে আর পরে। কিছু মনে করবেন না।

জনার্দন। কিন্তু আগে জানলে মামলা-মকদ্দমা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ। এতেও বাধা দেওয়া উচিত নয় রায়মশায়। ভৈরবীদেব হাতে দেবীর বহু সম্পত্তিই বেহাত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো হাত-বদল হওয়া দরকার।

জনার্দন। (শুদ্ধ হাস্য করিয়া) তার চেয়ে আর ভালো কথা কি আছে হজুর। গুনতে পাই সমস্ত গ্রামবানাই একদিন মা-চণ্ডীর ছিল। এখন কিন্তু—

জীবানন্দ। জমিদারের গর্ভে গেছে? তা গেছে। তারও ক্রটি হবে না রায়মশায়! মশিরের দলিল, নকশা, ম্যাপ প্রভৃতি বা-কিছু আছে কলকাতায় এটর্নির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার একলার সাধ্য কি? আপনারা একাজে আমার সহায় থাকবেন।

জনার্দন। থাকব বৈ কি হজুর। আমরা চিরকাল হজুর সরকারের চাকর বৈ শু নয়।

[জনার্দন প্রস্থান করিল। জীবানন্দ সঙ্কোচক হাসিমুখে

তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষনকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

প্রকৃত। দাদা কি শেষে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাবেন নাকি?

জীবানন্দ। যদি বাধে সে ভাগ্যের কথা প্রকৃত। তার জন্যে দেবতাদের একদিন তপস্যা করতে হয়েছিল।

প্রকৃত। দেবতারা পারেন। লঙ্কার বাইরে বসে তপস্যা করার পুণ্যও আছে, দৃষ্টিভ্রান্তও কম। কিন্তু লঙ্কার ভিতরে বসে বাস করে, লঙ্কাকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের ভাগ্যকে ঠিক সৌভাগ্য বলা চলে না। এসে পর্বত প্রাকসূড় লোকের সঙ্গে বিবাদ করে বেড়ানো আপনার গৌরবেরও নয়, প্রয়োজনও নয়। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার কাৰ্যই শু করা গেল, এখন কাজ দিচ্ছে চলুন বাড়ি কিরে যাওয়া যাক।

জীবানন্দ। সময় হলোই বাব।

প্রকৃত। তাই যাবেন। যাই হোক দাদা, আপনার বাবার সময়ের শু একটা আশ্রয় পাওয়া গেল, কিন্তু আমার বাবার সময় যে কবে আসবে তার কল-কিনারাও চোখে পড়ে না।

[এককড়ির প্রবেশ]

এককড়ি। মিল্লী দাঁড়িয়ে আছে। পূন্দের কাজটা কোথা থেকে আরম্ভ হবে জানতে চায়।

জীবানন্দ। চল না প্রফুল্ল, একবার মাঠে গিয়ে আমাদের কাজটা দেখিয়ে আসি গে।
প্রফুল্ল। চলুন।

[জীবানন্দ প্রফুল্লকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। অন্যান্য
শিয়া শিরোমণি ও জনার্দন রায় প্রবেশ করিলেন]

জনার্দন। বাবু গেলেন কোথায় এককড়ি?

এককড়ি? মিস্ট্রীকে দেখাতে গেলেন। মাঠে সাঁকো তৈরি হবে।

জনার্দন। পাগলের খেয়াল।

শিরোমণি। মদ্যপান-জনিত বুদ্ধি-বিকৃতি।

এককড়ি। এই শনিবারে হাকিম সরজমিন-তদন্তে আসবেন। ছোটলোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা
কে যোগাচ্ছে ঠিক জানতে পারলাম না, কিন্তু এইটুকু জানতে পারলাম তারা সাক্ষী মানলে হজুর
গোপন কিছুই করবেন না। দলিল তৈরির কথা পর্যন্ত না।

জনার্দন। (সহাস্য) আমার বয়সটা কত হয়েছে ঠাণ্ডাও এককড়ি? চণ্ডীগড়ের জনার্দন ব্যাংকে
ও-ধারায় কাত করা যাবে না, বাপু, আর কোন মতলব ভেঁজে এসো গো। (এক-মুহূর্ত মৌন থাকিয়া)
তবে, এ কথা মানি তোমার হাতে গিয়ে একটু পড়েছি। মোচড় দিয়ে দু'পয়সা উপরি রোজগারের
সময় এই বটে। কিন্তু তাই বলে যা রয় সয় কর।

এককড়ি। সত্যি বলচি আপনাকে রায়মশায়—

জনার্দন। আহা, সত্যিই ত বলচ! এককড়ি নন্দী আবার মিথ্যে কবে বলেন? সে কথা নয় ভায়া,
আমার না হয় শ'শ'নকে বিয়ে টান ধরবে, কিন্তু তাঁর নিজের বাবে কত? সেটা কি তোমার মনিব
খতিয়ে দেখেন নি? না দেখে থাকেন ত দেখাও গে চোখে আঙুল দিয়ে। তার পরে না হয় আমাকে
প্যাচ করো।

এককড়ি। জায়গা-জমির কথাই হচ্ছে না রায়মশাই, কথা হচ্ছে দলিলপত্র তৈরি করার। জিজ্ঞাসা
করলে সমস্তই বলবেন, কিছুই গোপন করবেন না।

জনার্দন। তার হেতু? শ্রীঘরে যাবার বাসনা ত? কিন্তু একা জনার্দন যাবে না এককড়ি, মহারানী
হজুর বলে বেয়াত করবে না, কথটা তাঁকে বলো।

এককড়ি। (অভিমান-সুরে) বলতে হয় আপনি নিজেই বলবেন।

জনার্দন। বলব বৈ কি হে। ভালো করেই বলব। হাকিমের কাছে কবুল জবাব দিয়ে সাধু সাজা
ঠাট্টা-তামাশা নয়। (ইঙ্গিতে দেখাইয়া) হাতকড়ি পড়বে।

এককড়ি। সে-আপনি বুঝবেন আর তিনি বুঝবেন।

জনার্দন। আর তুমি? শ্রীমান এককড়ি নন্দী? বাড়ি বখনি পুড়েছে তবনি জানি কি-একটা ভেতরে
হচ্ছে। কিন্তু জনার্দনকে অত নরম মাটি ঠাউরো না ভায়া, পস্তাবে। নিম্নলিখে আটকে রেখেছি, সে-
ই তোমাদের বুঝিয়ে দেবে।

এককড়ি। আমার ওপরে মিথ্যে রাগ করছেন রায়মশায়, যা জানি তাই শুধু জানিয়েছি। বিশ্বাস
না হয়, হজুর ত এই সামনের মাঠেই আছেন, একটু ঘুরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেই যান না।

জনার্দন। ওই যাব। শিরোমণিমশায়, আসুন ত?

শিরোমণি। চল না ভায়া, ভয় কিসের? [দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া সহসা পিছন ফিরিয়া]

শিরোমণি। (এককড়ির প্রতি) বলি, অত্যধিক মদ্যপান করে 'নই' ত? তা হলে না হয়—

এককড়ি। মদ তিনি খান না! (হঠাৎ কণ্ঠস্বর সংবত করিয়া) কিন্তু যেতেও আর হবে না। হজুর
নিজেই আসছেন। [জীবানন্দ ও প্রফুল্ল তর্ক করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন]

জনার্দন। (কাছে গিয়া বাতাবিক ব্যাকুলতার সহিত) হজুর, সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে
দেখুন।

জীবানন্দ। কিসের রায়মশায়?

জনার্দন। জরি-বিক্রির ব্যাপারে হাকিম নিজে আসছেন তদন্ত করতে। হয়ত ভায়া মকদ্দমাই
বান্ধবে। কিন্তু আপনি নাকি—

জীবনন্দ। ওঃ! কিন্তু উপায় কি রায়বাবু? সাহেব জমি হাফতে চার না, সে সত্তার কিসেতে।
মকদ্দমা ত বাধবেই। সুতরাং বাহলা জেতা ছাড়া আমাদের আর ত পথ দেখিলে।

জনাবর্ন। (আকুল হইয়া) কিন্তু আমাদের পথ?

জীবনন্দ। (কণকাল চিন্তা করিয়া) সে ঠিক, আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

জনাবর্ন। (সহিয়া হইয়া) এককড়ি তা হলে সত্যি বলসে। কিন্তু বহুর, পথ তখু দুর্গম নয়—জেল
বাটতে হবে, এবং আমরা একা নয়, আপনিও বাক থাকেন না।

জীবনন্দ। (একটুখানি হাসিয়া) তাই বা কি করা বাবে রায়বাবু। পথ করে যখন পাহ পৌতা
গেছে, কল তার খেতে হবে বৈ কি।

জনাবর্ন। (চীৎকার করিয়া) এ আমাদের সর্বনাশ করবে এককড়ি।

[পাগলের মতবড়ের বেগে জনাবর্ন বাহির হইয়া গেল, তাহার
পিছনে এককড়ি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল, নেপথ্যে কোলাহল]

জীবনন্দ। (কণকাল ভ্রতভাবে থাকিয়া) কারা যার প্রকুর?

প্রকুর। বোধ হয় আপনার মাটি-কটি খাঙড়-কুলীর দল।

জীবনন্দ। একবার ডাক ত, ডাক ত হে। ওনি আজ বাঁধের কাজ কতখানি করলে।

প্রকুর। (স্ববৎ অগ্রসর হইয়া) ওহে, ও সর্দার? শোন শোন, একবার ওনে যাও।

[স্ত্রী ও পুরুষ কুলীদের প্রবেশ]

সর্দার। কি রে, ডাকচিস্ কেনে?

জীবনন্দ। বাবারা, কোথায় চলেচিস্ বল ত?

সর্দার। ভাত খাবার লাগি রে।

জীবনন্দ। সেবিস বাবারা, আমার বাঁধের কাজ যেন বর্বার আগেই শেষ হয়।

সকলে। (সম্মুখের) সব হোয়ে বাবে রে, সব হোয়ে বাবে। তুই কিছু ভাবিস্ না। চল।

[কুলীদের প্রস্থান]

[নির্মল প্রবেশ করিল]

জীবনন্দ। (সামনে) আসুন, আসুন, নির্মলবাবু।

নির্মল। (নমস্কার করিয়া) আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবনন্দ। আর একদিন হলে হয় না?

নির্মল। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবনন্দ। তা বটে। অকাজের বোঝা টানতে বাঁকে আটক থাকতে হয় তাঁর সময় নষ্ট করা চলে
না।

নির্মল। অকাজ মানুষে করে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌবুরীমশাই।

জীবনন্দ। কিন্তু কাজের ধারণা ত সকলের এক নয় নির্মলবাবু। বারমশায়ের আমি অকলাপ
কামনা করিনে, এবং আপনার উদ্দেশ্য সকল হলে আমি বাস্তবিকই খুশী হব, কিন্তু আমার কর্তব্যও
আমি হির করে কেসেছি, এ থেকে নড়চড় করা আর সম্ভব হবে না।

নির্মল। এ কথা কি সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবনন্দ। সত্য রৈ কি।

নির্মল। এমন ত হতে পারে আপনার কবুল অব্যবহে আপনিই শুধু শান্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে
বৈতে যাবেন।

জীবনন্দ। খুব সম্ভব বটে। কিন্তু সেজন্যে আমার কোন অভিযোগ নেই নির্মলবাবু। নিজের
কৃতকর্মের কল আমি একা ভোগ করলোই যথেষ্ট। নইলে রায়মশায় নিজের লাভ করে সুস্থসেই সংসার-
যাত্রা নির্বাহ করতে থাকুন, এবং আমার এককড়ি নবীমশায়ও আর কোথাও গোলমালি-কর্মে
উজ্জ্বল জীবিত লাভ করতে থাকুন, কারণ প্রতি আমার আশ্রয় নেই।

নির্মল। আশ্রয়কার সকলেরই ত অধিকার আছে, অন্তএব খণ্ডরমণ্যকেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মাঝলা-মকদ্দমার বিবরণ নিতে বাওরা বাহ্য—শেষ পর্বত হরত বা বিব দিয়ে বিবের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ। চিকিৎসক কি জাল-করার বিবে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন?

নির্মল। (রাগ সংবরণ করিয়া) এমন ত হতে পারে কারণ কোন শাস্তিভোগ করারই আবশ্যক হবে না, অথচ কতিও কাউকে স্বীকার করতে হবে না।

জীবানন্দ। (ভৎস্বাং সম্মত হইয়া) বেশ ত পারেন ভালোই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ এ শুধু অন্ন-বস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাত-পুরুষের চাষ-আবাসের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাকীর সম্পর্ক। এ তাদের নিতেই হবে। (একটু চুপ করিয়া) আপনি ভালোই জানেন, অন্য পক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর-জুলুম চলাবে না। চলতে পারে কেবল চাবাদের উপর, কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসছে, আর হতে আমি দেব না।

নির্মল। আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারি ; এই ক'টা চাবার কি আর তাতে হান হবে না? কোথাও না কোথাও—

জীবানন্দ। না না, আর কোথাও না—এই চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর করে সেমিন তাদের কাছে অনেক টাকা আদায় করেছি—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দন রায়। এ কণ-পরিণোদ করতে আমাকে হবেই। এবং আরও যে কতবড় একটা শূল তাদের বিদ্ধ করেছি, সে কথা শুধু আমিই জানি। কিন্তু যাক। অপ্রীতিকর আলোচনায় আর আমার প্রবৃত্তি নেই নির্মলবাবু, আমি মনস্থির করেছি।

[জীবানন্দ প্রস্থান করিলেন]

[সেই দিকে চাহিয়া নির্মল অভিভূতের ন্যায় স্থির হইয়া

বহিল। এমনি সময়ে ফকিরসাহেব প্রবেশ করিলেন]

ফকির। জামাইবাবু, সেলাম। বাবু কৈ?

নির্মল। (অভিবাদন করিয়া) জানিনে। ফকিরসাহেব, বোড়শীকে আমাদের বড় প্রয়োজন। তিনি যেখানেই থাকুন একবার আমাকে দেখা করতেই হবে। বলুন, কোথায় আছেন।

ফকির। আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্বনাশে উল্লসত হয়েছিল, তখন আপনিই শুধু তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন।

নির্মল। আজ আবার ঠিক সেইটি উলটে দাঁড়িয়েছে ফকিরসাহেব। এখন কে? যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত শুধু তিনিই। কোথায় আছেন এখন?

ফকির। শৈবালদীঘির কুটাম্রমে।

নির্মল। কুটাম্রমে? সেখানে কি সুখে আছেন?

ফকির। (মৃদু হাসিয়া) এই নিন। মেয়েমানুষের সুখে থাকার খবর যেখানারা জানেন না, আমি ও আবার সন্ন্যাসীমানুষ। তবে, যা আমার শাস্তিতে আছেন এইটুকুই অনুমান করতে পারি।

নির্মল। (কণকাল মৌন থাকিয়া) এখানে আপনি কোথায় এসেছিলেন?

ফকির। জমিদার জীবানন্দ— এই চিঠি পেয়ে তাঁরই সঙ্গে একবার দেখা করতে। এই চিঠি আপনার পড়া প্রয়োজন। নিন পড়ুন। (চিঠিখানি দিতে গেলেন)

নির্মল। (সসঙ্কোচে) জীবানন্দের লেখা? ও আমি হৌব না। প্রয়োজন থাকে আপনিই পড়ুন।

ফকির। প্রয়োজন আছে। নইলে বলতাম না। পর ভাংকেই লেখা।

[ফকির ধীরে ধীরে চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন এবং নির্মলের

মুখের ভাব সংশয় ও বিষয়ে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল]

ফকির। (পর পাছে—)

“ফকির সাহেব—

বোড়শীর আসল নাম জলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুটুম্বের কল্যাণে কামনা করি কিন্তু তাহাকে বিদ্যা কোন ছোট কাজ করাইবেন না। আশ্রম বেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবালগীষি আমার। এই গ্রামের মুনাকা ধার পাঁচ-ছয় হাজার টাকা। আপনাকে জানি। কিন্তু আপনার অবর্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অধৰ্ম্মাণা করে, এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রামখানি তাহাকে নিলাম। আপনি নিজে একদিন আইস-ব্যবসারী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা কিছু প্রয়োজন, করিবেন, সে খরচ আমিই দিব। কাপড়পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজেষ্টারি করিয়া দিব।

শ্রীজীবানন্দ চৌধুরী।

ককির। (নির্বলের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া) সংসারে কত বিষয়ই না আছে!

নির্বল। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) কেলিরা, যাড় নাড়িরা) হাঁ। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি?

ককির। সত্য না হলে এ দান নেবার জন্যে বোড়শীকে কিছুতেই আনতে পারতাম না।

নির্বল। (যত্নকণ্ঠে) কিন্তু তিনি কি এসেছেন? কোথায় আছেন?

ককির। আছেন আমার কুটারে, নদীর পরপারে।

নির্বল। আমার যে এখন একবার যাওয়া চাই ককিরসাহেব।

ককির। চলুন। (হাসিয়া) কিন্তু বেলা পড়ে এল, আবার না তাঁকে হাত ধরে রেখে বেতে হয়।

[উত্তরের প্রস্থান]

[সহসা অন্তরাল হইতে কয়েকজনের সতর্ক, চাপা কোলাহলের শব্দ হইতে প্রকৃত্তর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল—“সাবধানে! সাবধানে! দেখো যেন খাফা না লাগে!” এবং পরকণ্ঠেই তাহার দ্বারাধরি করিয়া জীবানন্দকে বহিয়া আনিয়া বিছানার শোয়াইয়া মিল। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত। সঙ্গে প্রকৃত্তর]

প্রকৃত্তর। এখন কেমন মনে হচ্ছে দাদা?

জীবানন্দ। ভালো না। আমি অজ্ঞান হয়ে সীকো থেকে পড়ে গিরেছিলাম প্রকৃত্তর?

প্রকৃত্তর। না দাদা, আমরা ধরে কেলিছিলাম। কতবার বলছি এ রূপমেহে এত পরিচয় সইবে না, কিছুতে কান দিলেন না। কি সর্বনাশ করলেন বলুন ত?

জীবানন্দ। (চক্ষু মেলিয়া) সর্বনাশ কোথায় প্রকৃত্তর, এই ত আমার পার হবার পাথর। এ ছাড়া এ জীবনে আর সম্ভব ছিল কৈ?

[ব্রতবেগে এককড়ি প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটা কাঁচের শিশি]

এককড়ি। (প্রকৃত্তর প্রতি) এখনি ছুঁরকে এটা খাইয়ে দিন। বরুড ডাক্তার গৌড়ে আসছে—এলো বলে।

প্রকৃত্তর। (শিশি হাতে লইয়া জীবানন্দের কাছে গিয়া) দাদা। এই ওষুধটুকু যে খেতে হবে।

জীবানন্দ। (চক্ষু মুদ্রিত) খেতে হবে? দাও। (উবধ পান করিয়া) কোথায় যেন ভয়ানক ব্যথা, প্রকৃত্তর, যেন এ ব্যথার আর সীমা নেই। উঃ—

প্রকৃত্তর। (ব্যাকুল-কণ্ঠে) এককড়ি, দেখ না একবার ডাক্তার কত দূরে—যাও না আর একবার ছুটে।

এককড়ি। ছুটেই বাচ্চি বাবু—

জীবানন্দ। ছুটোছুটিতে আর কি হবে প্রকৃত্তর? মনে হচ্ছে যেন আজ আর তোমরা ছুটে নাগাল পাবে না।

প্রকৃত্তর। (নিকটে হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া) এমন ত কতবার হয়েছে, কতবার সেরে গেছে দাদা। আজ কেন এ-রকম ভাবছেন?

জীবানন্দ। ভাবছি? না প্রকৃত্তর, ভাবিনি। (স্বপ্ন হসিয়া) অসুখ কববার হয়েছে এবং কববার সেরেছে সে ঠিক। কিন্তু এবার যে আর কিছুতেই সারবে না সেও ত এমনই ঠিক প্রকৃত্তর।

[এককড়ি ও বরুড ডাক্তারের প্রবেশ]

প্রকৃত্তর। (উঠিয়া দাঁড়িয়া) আসুন ডাক্তারবাবু।

বরুড। ছুঁরের অসুখ—ছুটেতে ছুটেতে আসি। ওষুধটা খাওয়ানো হয়েছে ত?

এককড়ি। হয়েছে ডাক্তারবাবু, তখুনি হয়েছে। ওষুধের শিশি হাতে উঠি ত পড়ি করে ছুটে এসেছি। [বরুড কাছে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া নাকী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত

করিল। মাথা নাড়িয়া প্রকৃতকৈ ইমিতে জানাইল যে অবস্থা ভালো ঠেকিতেছে না]

এককড়ি। (আকুল-কণ্ঠে) কি হবে ডাক্তারবাবু! খুব ভাল জোরালো একটা ওষুধ দিন—আমরা ডবল ডিজিট দেব—বা চাইবেন দেব—

প্রফুল্ল। যা চাইবেন দেব? ওষুধ এই? সে আর কতটুকু এককড়ি? আমরা তারও অনেক, অনেক বেশি দেব। আমার নিজের প্রাণের দাম বেশি নয়, কিন্তু সে দেওয়াও ত আজ অতি দুঃখ মনে হয় ডাক্তারবাবু।

বরভ। (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) সমস্তই ঈশ্বর হাতে প্রকল্পবাবু নইলে আমার আর কি! নিমিষমাত্র। লোকে ওষুধ মিথ্যে ভাবে বৈ ত না যে, চণ্ডীগড়ের বরভ ডাক্তার মরা বাঁচাতে পারে! ওষুধের বাস্তব সঙ্গেই এনেছি, এ-সব ভুল আমার হয় না। চলুন নন্দীমশাই, শিগগির একটা মিকচার তৈরি করে দিই। [এককড়ির ও বরভের প্রস্থান]

জীবানন্দ। চোখ বুজে শুয়ে কত কি মনে হচ্ছিল প্রফুল্ল। মনে হচ্ছিল, আশ্চর্য এই পৃথিবী। নইলে আমার জন্যে চোখের জল ফেলতে তোমাকে পেয়েছিলাম কি করে?

প্রফুল্ল। আপনি ত জানেন—

জীবানন্দ। জানি বৈ কি প্রফুল্ল! কিন্তু এককড়ি তার কি জানে? সে জানে তারই মত তুমিও ওষুধ একজন কর্মচারী, এক পাখও জমিদারের ভেতনি অসাধু সঙ্গী। কত যে করেছে, নীরবে কত যে করেছে, বাইরের লোকে তার কি খবর রাখে। মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয়েচে দুটো ভাতভাল যোগাড়ের ছল করে ত্যাগ করে যেতে চেয়েছে, কিন্তু যেতে আমি দিইনি। আজ ভাবি ভালোই করেছি। সত্যই ছেড়ে চলে যদি যেতে প্রফুল্ল, আজকের দুঃখ রাখবার জায়গা পেতে কোথায়?

প্রফুল্ল। দাদা—

জীবানন্দ। একটুখানি কাগজ-কলম আনো না প্রফুল্ল, তোমার দাদার স্নেহের দান—

প্রফুল্ল। (পদতলে নটজানু হইয়া বসিয়া) স্নেহ আপনার অনেক পেয়েছি দাদা, সেই ওষুধ আমার সম্বল হয়ে থাক। আপনি কেবল আমাকে এই আশীর্বাদ করুন, নিজের পরিশ্রমে যা-কিছু পাই এ জীবনে তার বেশি না লোভ করি।

জীবানন্দ। (কণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) বেশ, তাই হোক প্রফুল্ল। দান করে তোমাকে আমি খাটো করে যাব না। কিন্তু স্নোভী তুমি ত কোনদিনই নও!

[বরভ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া ঔষধের পাত্র প্রফুল্লের হাতে দিয়া তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল]

প্রফুল্ল। দাদা! এই ওষুধটুকু খান। [প্রফুল্ল কাছে আসিয়া ঔষধ জীবানন্দে— মুখে ঢালিয়া দিয়া নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত মুছাইয়া দিল]

জীবানন্দ। কি ভয়ানক অঙ্ককার প্রফুল্ল! রাত্রি কত হলো তাই?

প্রফুল্ল। রাত্রি ত এখনো হয়নি দাদা।

জীবানন্দ। হয়নি? তবে আমার দু'চক্ষে এ নিবিড় আঁধার কিসের প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। অঙ্ককার ত নেই দাদা! এখনো যে সূর্যোদয় হয়নি।

জীবানন্দ। হয়নি? যারনি সূর্য এখনো ডুবে? তবে বোল, খোল,—আমার সূন্থের জানালা খুলে দাও প্রফুল্ল, একবার দেখি তাঁকে। যাবার আগে আবার শেষ নমস্কার তাঁকে জানিয়ে বাই।

[প্রফুল্ল সম্মুখের বাতায়ন খুলিয়া দিল এবং কাছে আসিয়া জীবানন্দে— হাত-মত তাঁহার মাথাটি সমস্তে উঁচু করিয়া দিল। অদূরে বালুইয়ের শীর্ণ জলাধারা মন্ববেগে বহিতেছে। পরপারে সূর্য অস্তগমনোন্মুখ। দূরে নীল বনানী আরক্ত আভাষ রঞ্জিত হঠাৎ দূসর বালুকারাশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে]

জীবানন্দ। (চোখ মেলিয়া কল্পিত দুই হস্ত যুক্ত করিয়া দলোটে স্পর্শ করাইলেন। কণকাল তত্ক্ষণাবে থাকিয়া) বিশ্বদেব! কে বলে তুমি অচেনা? তুমি চির-সহস্রো ঢাকা? জন্মান্তরের সমস্ত পরিচয় যে ভাঙ যাবার দিনে তোমার মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। (এক-মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) ভেবেছিলাম, হয়ত তোমাকে দেখে ভয় হবে—হয়ত এ জীবনের শতক গ্লানি দীর্ঘ কালো ছায়া মেলে আজ মুখ

ভেঁষার ঢেকে দেবে, কিন্তু সে ত হতে দাতনি। বন্ধু, এ-জন্মের শেষ সময়ের তুমি গ্রহণ কর। (জাতিতে ঢলিয়া পড়িয়া) উঃ—দাখা!

প্রকৃত। (হাতুল কঠে) দাখা কোথার দাখা?

জীবানন্দ। কোথার? মাথার, বুকের, আমার সর্বাসে, প্রকৃত—উঃ—

[দ্রুতগনে বোড়শী প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে এককণ্ঠি ও বরত ডাক্তার]

বোড়শী। এ কি কথা এরা সব বলে প্রকৃত। (জীবানন্দের পদতলে বসিয়া পড়িল) তোমাকে নিয়ে বাবার জন্যে যে আজ সমস্ত ছেড়ে চলে এসেছি। কিন্তু নিচুঁর—অভিযানে এ কি করলে তুমি।

প্রকৃত। দাখা, তেরে দেখুন অলকা এসেছেন।

জীবানন্দ। অলকা? এসে তুমি? (বীরে বীরে মাথা নাড়িয়া) কিন্তু, সমর নেই আর।

বোড়শী। কিন্তু, এই যে সেদিন বললে, তুমি সংসারে বাঁচতে চাও—মানুষের হাতখানে মানুষের মত হয়ে। তুমি বাড়ি চাও, ঘর চাও, স্ত্রী চাও, সম্ভ্রাম চাও—

জীবানন্দ। (মাথা নাড়িয়া) না। আজ কীকি নিয়ে আর কিছুই চাইনে অলকা। চিরদিন কেবল কীকি নিয়ে পেরে পেরেই স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম, এমনই যুধি। কিন্তু আজ তার কৈরিতম দেখার দিন এসেছে। সৌভাগ্য এ-জীবনে অর্জন করিনি অলকা, সেই ত—সে বোকা আর যেন আমার না বাড়়ে। [বোড়শী জীবানন্দের বুকের উপরে মাথা রাখিতে তিনি বীরে বীরে তাঁহার অক্ষয় হাতখানি বোড়শীর মাথার পরে রাখিলেন]

জীবানন্দ। অর্ডিমাস ছিল বৈ কি একটু। তবু বাবার আগে এই ত তোমাকে পেলাম। এর অধিক পাওয়া সংসারের নিত্য কাজে হরত বা কখনো ছুঃ, কখনো বা স্নান হতো, কিন্তু সে তর আর রইল না। এ মিলনের আর বিচ্ছেদ নেই, অলকা, এই ভালো। এই ভালো।

[বোড়শী কথা কহিতে পারিল না, দুঃসহ রোমনের বেগে

তাহার সমস্ত বন্ধ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল]

জীবানন্দ। উঃ! পৃথিবীতে কি আর হাওয়া নেই প্রকৃত?

প্রকৃত। কট কি খুব বেশি হচ্ছে দাখা? ডাক্তারকে কি একবার ডাকব?

জীবানন্দ। না না, আর ডাক্তার-খনি নয় প্রকৃত, শুধু তুমি আর অলকা। উঃ—কি অন্ধকার। সূর্য কি অন্ধ পেল তাই?

প্রকৃত। এইমাত্র পেল দাখা।

জীবানন্দ। তাই। হাওয়া নেই, আলো নেই, বিশ্বমেব। এ-জীবনের শেষ দান কি তবে নিঃশেষ করেই নিলে? উঃ—

বোড়শী। বাবী!

প্রকৃত। প্রকৃতকে কি আর সত্যিই ছুটি দিলে দাখা!

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥